বনফুল উপন্যাস সমগ্র

(প্রথম খণ্ড)

শ্রী বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

Banaphool Upannyas Samagra (1st Part)

প্রকাশক ঃ
শ্রী প্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা- ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ
১৯শে জুলাই ১৯৬০

প্রচ্ছদ ঃ
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রক ঃ
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটিড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

দাম ঃ
দুশো পঁচাত্তর টাকা

সূচীপত্র

প্রাক্‌কথন

কৈশোর ও প্রথম যৌবন থেকে কবিতা ও গল্প লেখা শুরু করলেও বনফুল উপন্যাস রচনায় রত হন প্রগাঢ় যৌবন কালে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'তৃণখণ্ড' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে যখন তাঁর বয়স ছত্রিশ। তারপর নিরবচ্ছিন্ন ও অক্লান্তভাবে তিনি উপন্যাস লিখে গেছেন আজীবন। তাঁর লেখা উপন্যাসের সংখ্যা ছাপ্পান্ন। আকারে আঙ্গিকে স্বাদে ও ধরণে এত বৈচিত্র্যময় প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে খুব কমই দেখা গেছে। 'কিছুক্ষণ' ও 'ভুবন সোম'-এর মতো ছোট উপন্যাস যেমন তিনি লিখেছেন, তেমনি আবার তাঁর হাত থেকেই বেরিয়েছে 'জঙ্গম', 'ডানা', 'স্থাবর' ইত্যাদি মহাকাব্যিক উপন্যাস। 'অলংকারপুরী'র মতো কিশোরদের উপযোগী রূপকথাধর্মী ছোট উপন্যাসও লিখেছেন তিনি। শুধুমাত্র পরিমাণের দিক থেকেও এ আয়োজন পাঠকদের মনে বিস্ময় এনে দেয়। অথচ তার মানে এই নয় যে তিনি নিরন্তর নিযুক্ত ছিলেন শুধুই উপন্যাস রচনায়। তাঁর লেখা গল্পের সংখ্যা ছয়শ ছয়। ছোটবড় মিলিয়ে নাটকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। তাছাড়া কবিতাতেও ছিল তাঁর অবাধ সঞ্চরণ যার মধ্যে রয়েছে স্নিগ্ধ রোমান্টিকতা থেকে ব্যঙ্গের বিষাক্ত কশাঘাত। স্মৃতিকথা ও প্রবন্ধ লেখাতেও ক্লান্তি ছিল না তাঁর। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এমন বহু প্রজতার মধ্যেও কিন্তু বনফুল প্রাণ প্রাচুর্য ও প্রকাশের নান্দিকতা থেকে স্খলিত হয়েছেন কদাচিৎ। এ হিসেবে বনফুল বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিরল ব্যক্তিত্ব।

(২)

বনফুল যখন আবির্ভূত হন লেখক হিসেবে বিশ শতকের বিশের দশকে তখন চলছে পরিপূর্ণভাবে রবীন্দ্রযুগ। তাঁর সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে মুক্ত হবার সাধ্য ছিল না বাঙালি কোনো লেখকেরই। গোটা উনিশ শতক জুড়ে বাঙালি রেনেসাঁসের যা কিছু অর্জন, তার সার্থকতম অভিব্যক্তি ঘটেছিল রবীন্দ্র সাহিত্যে। মানবতা বিশ্বকল্যাণ শান্তি প্রভৃতি বিষয় দিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতাকে প্রগাঢ় করে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অনুরাগে বিরাগে সমর্থনে প্রতিবাদে নির্মিত হয়েছিল আমাদের যে আবেগ ও মনন, তার মধ্যে কিঞ্চিৎ বিচলন ঘটলেও বিশের দশকেও তার রেশ নিতান্ত অলক্ষ্য ছিল না। বাঙালির উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজে তার আগেকার অর্ধশতক ধরে গঠিত হয়ে চলেছিল যে বিশ্বাসের স্থিতি তাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকরণ করে নিতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তার শিল্পিত প্রকাশও ঘটিয়েছিলেন সমর্থভাবে।' সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব হতে জাগ্রত যে ভালো, সেই তো আমার ভালো, এমন প্রত্যয়যুক্ত অনুভবের সার্থক অনুবাদ তো সম্ভব ছিল একমাত্র রবীন্দ্রনাথেই।

কিন্তু বিশ শতকের গোড়াতেই দেখা দিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের দুনিয়ায় ব্যাপক ফাটল। বাঙালি মধ্যবিত্ত ক্রমে পিছিয়ে পড়তে লাগল তার সফলতার পথ থেকে। প্রথমে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সার্থকতা ও ব্যর্থতা, তার সূত্র ধরে সাম্প্রদায়িকতার সূক্ষ্ম সম্প্রসারণ, কলকাতা থেকে সাম্রাজ্যের রাজধানীকে দিল্লিতে সরিয়ে নেওয়া ইত্যাকার বিবিধ সংঘটনা বাঙালিকে ক্রমশ দুর্বল করে তুলতে লাগল। ঠিক এসময়েই ভারতের রাজনীতিতে ঘটল মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব। বোম্বাই গুজরাটে প্রায় যেন সমাপতনের মতোই বিকাশ-ঘটল ভারতীয় পুঁজিবাদীদের। তার মানে সারা উনিশ শতক জুড়ে রাজনীতি ও সীমাবদ্ধভাবে হলেও অর্থনীতিতে বাঙালির যে নেতৃত্ব তার কেন্দ্র বিচলিত হল। মার্কেন্টাইল ক্যাপিটাল দ্রুত পরিণত হচ্ছিল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালে এবং সেখানে বাঙালির প্রায় প্রবেশাধিকারই রইল না। ইতিমধ্যে জমির উপসত্ত্ব ভোগ, চাকুরির সুযোগ এবং জীবিকার অন্য সব উপকরণও ক্রমে অপ্রতুল হয়ে উঠল। এমন সময় ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে শুরু হল যুদ্ধ যার ব্যাপকতার জন্য অচিরেই তা অভিহিত হল 'বিশ্বযুদ্ধ' বলে।

সর্বাত্মক এ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচলনের জন্যেও অবশ্য ঘটল রুশবিপ্লব ১৯১৭-তে কিন্তু তার প্রভাব এখানে এসে পৌছল অত্যন্ত ক্ষীণভাবে। তাই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই দেখতে পেলেন তাঁর বিশ্বাসের ভিত্ কেমন দ্রুত নড়বড়ে হয়ে পড়ছে। তিনি অবশ্য এ ভাঙনকে চিহ্নিত করলেন 'এ আমার এ তোমার পাপ' বলে, লিখলেন 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' ও অজস্র প্রবন্ধ, আমাদের সচেতন করে তুলতে চাইলেন 'আকারগ্রাসী পরিণাম গ্রাসী এ সংকট সম্পর্কে, কিন্তু তার লেখা গল্প ও উপন্যাসে তার প্রকাশ তেমন পেল না। কেন না আমাদের কথা সাহিত্যে তখনো পর্যন্ত আশ্রয় করে ছিল মূলত নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনকে। একথার মধ্যে দিয়ে অবশ্য একটি যান্ত্রিক সিদ্ধান্তে পৌছনোর চেষ্টা হচ্ছে না যে নাগরিক জীবন মাত্রেই অপাঙক্তেয়, একমাত্র মুক্তি রয়েছে গ্রামজীবনের একান্ত রূপায়নে। সব জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন যদি তার প্রকাশ হয় শিল্পিত। আসলে বাঙালি রেনেসাঁসের থেকে উদ্ভুত নাগরিক জীবনের চেহারা ঐতিহাসিক কারণেই ছিল সীমিত ও সঙ্কুচিত। ইংরেজ সৃষ্ট এ রেনেসাঁস বাংলার গরিষ্ঠ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল তার সফলতা থেকে, শহর ও গ্রামের মধ্যে গড়ে তুলেছিল এক গভীর ব্যবধান। অথচ সমাজের ব্যাপকতাকে আশ্রয় না করলে অন্তত উপন্যাসের জগতে ক্রমে সংকুচিত হতে বাধ্য। শ্রেণীসীমানা অতিক্রম করলেই ঘটতে পারে তার মুক্তি। রবীন্দ্র-শরৎ অধ্যুষিত বাংলা উপন্যাস তাই ব্যাকুল প্রতীক্ষায় ছিল ভিন্নতর জীবন উপলব্ধির বিন্যাসের জন্য। সেই মুক্তি অবশেষে এল বিভূতি তারাশংকর-মানিক প্রভৃতির ব্যাপক অন্বেষণের মধ্য দিয়ে, যার অন্যতম অংশীদার হলেন বনফুলও। তাঁরা মধ্যবিত্তের শ্রেণীসীমানা অতিক্রম করলেন সময়ের নিজস্ব চাপে। তাই মানিকের উপন্যাসে দেখা দিল পদ্মাপারের জেলেরা। তারাশংকরে এল সাঁওতাল কাহার ডোম প্রভৃতি সমাজের প্রান্তবাসী মানুষ বিভূতিভূষণের জগৎ জুড়ে রইল বিভিন্ন জীবিকার সঙ্গে যুক্ত অজস্র সাধারণ মানুষ এবং বনফুলের গল্প উপন্যাসে মুখ্য হয়ে উঠল বাংলা বিহার ব্যাপী বিস্তীর্ণ ভূগোলের বৈচিত্র্যময় জনজীবন। মধ্যবিত্তেরা তাঁদের রচনায় ভালোমন্দ নিয়ে জড়িয়ে রইলেন অবশ্যই, কিন্তু তাঁদের সঞ্চরণ অবারিত থাকল জনজীবনের বিস্তারের বর্ণনায়।

(৩)

'কোথা যাও পান্থ, কোথা যাও
আমি নহি পরিচিত মোর পানে ফিরিয়ে তাকাও
বল মোরে নাম তব—'

এমন ব্যাকুল আহ্বান তরুণ রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন তাঁর অপরিচিত বিপুল জনতার কাছে। প্রতিদিন আমরা প্রচুর মানুষ দেখি এবং ভুলি। খুব কম মানুষের সঙ্গেই আমাদের প্রাত্যহিক ওঠা বসা। অথচ একথাই নাকি সত্য যে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জীবনের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে অন্তত একটি করে উপন্যাস ও বেশ কিছু গল্প। সাধারণ মানুষের উদাসীনতার কাছে তারা কিন্তু অস্পষ্ট থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তা চেয়েছিল এ অস্পষ্টতার মধ্যে অবয়বের আরোপ। আসলে সব কথাশিল্পীই কামনা করেন তাঁর রচনায় যেন প্রাণ পায় অপরিচিত মানুষসমূহের জীবনচিত্র তাদের যাবতীয় কামনা বাসনা সহ। বাংলা সাহিত্যে বনফুল সম্ভবত এ বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন সবচাইতে বেশি। বাংলা বিহার মিলিয়ে বিস্তৃত জনজীবনের বিপুল সমারোহকে তিনি যত বেশি সম্ভব নিয়ে আসতে চেয়েছিল নিজের সাহিত্যের পরিসরে। কোনও আগ্রহী সমালোচক যদি কখনো একটি পরিসংখ্যান তৈরি করেন এই মর্মে যে বনফুলের সমগ্র কথাসাহিত্যে কত ধরনের কত সংখ্যক মানুষ ঠাঁই পেয়েছে, তাহলে একটি আশ্চর্য জগতের সন্ধান মিলে যেতে পারে।

বক্ষ্যমান আলোচনায় এ সুযোগ নেই। কেননা তাঁর উপন্যাস সমগ্রের বর্তমান খণ্ডটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মাত্র দশটি উপন্যাস এবং তাদের মধ্যে আকারে ছোট রয়েছে বেশ কয়েকটি। তাই আমরা সে ধরনের কোনো প্রচেষ্টার মধ্যে আপাতত না গিয়ে অবলম্বিত উপন্যাসগুলির কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রতি মনোযোগী হতে আগ্রহী হব।

বর্তমান সংকলনের মধ্যে যে দশটি উপন্যাস গ্রথিত হয়েছে তাদের একটি প্রাথমিক পরিচয় এখানে পরিবেশিত হচ্ছে। আগেই বলা হয়েছে কবিতা ও গল্প বনফুল কৈশোর ও যৌবনে লিখলেও উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন পরিণত বয়সে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'তৃণখণ্ড' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে যখন তাঁর বয়স ছত্রিশ। একটু দেরিতে শুরু করলেও উপন্যাস রচনার কিন্তু তারপর থেকে তিনি আর ক্ষান্তি দেননি। পরবর্তী পয়তাল্লিশ বছরে অন্যান্য রচনার সঙ্গে তিনি অক্লান্তভাবে উপন্যাস লিখে গেছেন যার সংখ্যা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। এ সবের মধ্যে যেমন 'জঙ্গম', 'ডানা', 'স্থাবর' প্রভৃতি মহাকায় রচনা রয়েছে তেমনি আবার আকারে মাঝারি ও ছোট বেশ কিছু উপন্যাসও আছে। এখানে যে দশটি উপন্যাস সংকলিত হয়েছে তাদের কোনোটারই আকার অতিকায় নয়। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা প্রথমে কালানুক্রমিকভাবে উপন্যাস দশটিকে সাজিয়ে নেব ঃ

১. তৃণখণ্ড ঃ ১৯৩৫ খ্রিঃ
২ বৈতরণী তীরে ঃ ১৯৩৬ খ্রিঃ
৩. নিরঞ্জনা ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ
৪. মহারানী ঃ ১৯৫৮ খ্রিঃ
৫. ভুবন সোম ঃ ১৯৫৯ খ্রিঃ
৬. অগ্নীশ্বর ঃ ১৯৫৯ খ্রিঃ
৭. মানসপুর ঃ ১৯৬৫ খ্রিঃ
৮. এরাও আছে ঃ ১৯৭২ খ্রিঃ
৯. নবীন দত্ত ঃ ১৯৭৪ খ্রিঃ
১০. হরিশ্চন্দ্র ঃ ১৯৭৯ খ্রিঃ

এ তালিকা পর্যালোচনা করলে অন্তত দুটি বিষয় পাঠকের কাছে স্পষ্ট হতে পারে। প্রথমত, বনফুলের উপন্যাস রচনার সমগ্র কালটিকেই এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আবার পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে বনফুলের উপন্যাস রচনার কাল ১৯৩৫ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত। সে হিশেবে এ সংকলন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণতার দাবী রাখে। অবশ্য এ কথাও সমান সত্য এখানে বাদ গেছে উপন্যাস রচনার প্রথম যুগের প্রায় বিশ বছর। চল্লিশের দশকের উপন্যাস একটিও অন্তর্ভূক্ত হয়নি। পরবর্তী খণ্ড সমূহে তাদের ক্রমে উপস্থাপিত করা হবে। আসলে প্রতিটি খণ্ডে স্বাদের বিচিত্রতা পরিবেশনের বাসনায় এ পদ্ধতি এখানে নেওয়া হয়েছে।

(৪)

সতর্ক পাঠক লক্ষ্য করবেন পরিবেশিত দশটি উপন্যাসের মধ্যে এমন কতগুলো লক্ষণ রয়েছে যাকে বিশ্লেষণ করে কিছু সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়া যায়। এখানে তা ক্রমান্বয়ে উল্লিখিত ও যথাসাধ্য বিশ্লেষিত হল।

সংকলিত দশটি উপন্যাসের মধ্যে অন্তত চারটির কেন্দ্রীয় চরিত্র একজন করে চিকিৎসক। বনফুল ব্যক্তিগত জীবনে চিকিৎসক ছিলেন। তাই এধরনের চরিত্রের প্রতি তার একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। আন্তন চেকভও চিকিৎসক ছিলেন, তাই তার লেখাতেও লক্ষ্য করা যায় বেশ কিছু চিকিৎসক চরিত্রের সমাবেশ। প্রসঙ্গত 'ওয়ার্ড নং ছয়' নামের গল্পটি এবং 'ভানিয়া মামা' ও 'তিন বোন' নাটক দুটির কথা বলা যায়। পেশায় চিকিৎসক হবার সুবাদেই সম্ভবত উভয়ের লেখাতেই প্রকাশ পেয়েছে একটি বিবিক্তিপূর্ণ আসক্তি। জীবিকার সূত্রেই বিপুল সংখ্যক বিচিত্র ধরণের মানুষ চিকিৎসকদের সংস্পর্শে আসেন। তার ফলে মানুষের ভেতর ও বাইরের চেহারা তাঁদের

সন্ধানী মনোযোগকে ধনী করে তুলতে পারে। ডক্টর অভ্রভ বা ডক্টর আস্ত্রেই এফিমির এর মতো চরিত্র যে কোনো সাহিত্যেই বিরল। অগ্নীশ্বর এর মতো মানুষও কি সাহিত্যে সহজলভ্য?

চিকিৎসক কেন্দ্রিক উপন্যাস চারটি হল ঃ 'তৃণখণ্ড', 'বৈতরণী তীরে', 'অগ্নীশ্বর' ও 'এরাও আছে'। এ চারটি ছাড়াও চিকিৎসককে কেন্দ্রে রেখে বনফুল আরো বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন। আগ্রহী পাঠকের প্রসঙ্গত 'হাটে বাজারে'-র কথা নিশ্চয়ই মনে পড়বে।

বর্তমান খণ্ডে আলোচ্য এ চারটি উপন্যাসেরও আবার দুটি ধারায় ভাগ করা যায়। এ দুটি ধারা হল এক, চিকিৎসকের চোখ দিয়ে জীবনমৃত্যুর প্রবাহকে বিশেষভাবে অবলোকন করা। 'তৃণখণ্ড' ও 'বৈতরণী তীরে' এ ধারার অন্তর্গত।

'তৃণখণ্ড' জাগতিক জীবনের দুঃখ-সুখ কামনা-বাসনা ব্যর্থতা-সাফল্যের যেন একটি নাতিদীর্ঘ সমারোহ। কিন্তু তারা ভেসে যায় সরে যায়, জীবনেরে করে যায় কিছুটা বিদ্রূপ। একটু যেন দূরে দাঁড়িয়ে বনফুল নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করে চলেছেন জীবনের অবিশ্রান্ত প্রবাহ যার মধ্যে ভাসমান কাবুলিওয়ালা থেকে উকিলবাবু, গোয়ালা থেকে মহিন্দর, হরিশবাবু থেকে ঝাকড়া ভুরু, রানীজী থেকে আসমানী। লেখকের সন্ধানী দৃষ্টির কাছে সকলেই নিজস্ব বিশিষ্ট ছাপ নিয়ে অপাদৃত হয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যের জন্যই মোহিতলাল মজুমদার মন্তব্য করেছিলেন, 'প্রত্যেক বাস্তব বহির্জীবনের সঙ্গে লেখকের একজন অতিশয় আত্মসচেতন ব্যক্তিত্বশালী Cultured soul-এর যে সংঘর্ষ, তাহাই এই বইখানির আসল কথাবস্তু'। সেকালে প্রথম উপন্যাস লিখে মোহিতলালের মতো সমালোচকের এ ধরনের মন্তব্য আকর্ষণ করা সহজ ব্যাপার ছিল না।

আত্মজীবনী 'পশ্চাৎপট'-এর এক জায়গায় বনফুল জানিয়েছেন প্রতিটি মানুষের মধ্যেই নাকি আছে নানা রঙ। এ রঙের রহস্যভেদই তাঁর সাহিত্যজীবনের মূল লক্ষ্য বলেই আমাদের মনে হয়। লেখক জীবনের গোড়ায় বিবিধ গল্পের মধ্য দিয়ে ঘটেছিল যার উদ্বোধন উপন্যাসের বিস্তারে ঘটেছে তারই বিস্ফোরণ।

'তৃণখণ্ড' গদ্যপদ্য মিশিয়ে লেখা উপন্যাস। বনফুল একে 'চম্পুকাব্য' বলে স্বীকার করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্য পদ্য মেশানো একধরনের রচনাকে 'চম্পুকাব্য' বলা হত। অবশ্য সংস্কৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'তৃণখণ্ড'-কে পুরোপুরি এ শ্রেণীর লেখা হয়তো বলা যায় না কিন্তু স্বাদে ও মেজাজে তার আদলটি এ উপন্যাসে বেশ অনুভব করা যায়। বাংলা সাহিত্যে এ ধরণের উপন্যাস খুবই বিরল। কোনো কোনো আলোচক এটিকে পুরোপুরি আমাদের সাহিত্যে নজিরবিহীন বলেছেন কিন্তু 'শেষের কবিতা'র মধ্যেও এ বৈশিষ্ট্য বেশ খানিকটা রয়ে গেছে এ কথাও স্মরণযোগ্য। তবে তৃণখণ্ড-এর মধ্যে জীবনমৃত্যুর যে আশ্চর্য রহস্য অভিব্যক্ত হয়েছে তার তুলনা খুব কমই মেলে।

.....স্রোতমুখে তৃণখণ্ডসম বক্ষে তার প্রেম-মরীচিকা,
দুঃখে সুখে কাঁপে তার স্নায়ুসঙ্গ
আঁধারে পড়িতে চাহে অদৃষ্টের রহস্য লিপিকা
লয়ে অল্প অনিশ্চিত আয়ুসঙ্গ

'তৃণখণ্ড' উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটছে এ পঙক্তি সমূহ নিয়ে। 'অল্প অনিশ্চিত আয়ু' নিয়ে 'অদৃষ্টের রহস্য লিপিকা' অথবা প্রেম মরীচিকায় কম্পিত দুঃখ সুখের স্নায়ুর চম্পুকাব্য' এ উপন্যাস।

'বৈতরণী তীরে' যেন ঘটেছে 'তৃণখণ্ড' এরই ব্যাপকতর বিন্যাস। জীবন মরণের সীমানা ছাড়িয়ে নয়, জীবন মৃত্যুকে একই সূত্রে গ্রথিত করে এ উপন্যাসে বনফুল প্রকাশ করেছেন এক রহস্যময় বাস্তবতা। সংস্কৃত কাব্যতাত্ত্বিকরা সাহিত্যিককে প্রজাপতি ব্রহ্মার সঙ্গে সমান আসনে বসিয়েছেন, কেননা তাঁদের মধ্যেই নাকি থাকে ব্রহ্মার মতো অঘটন ঘটন পটিয়সী সৃজনক্ষমতা। বনফুলের এ উপন্যাসটি যেন তারই এক সমর্থ উদাহরণ।

এ উপন্যাসেও মূল চরিত্র একজন চিকিৎসক। শুধু তাই নয়, তারই চোখ দিয়ে দেখানো হয়েছে জীবনের অনন্ত প্রবাহ এবং মৃত্যুর পরপারে কল্পিত জীবনের বিচিত্র চেহারা। বরং যেন বলা যায় বাস্তব জীবনের তুলনায় এ রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে নিরালম্ব বায়ুভূতের দল যাদের কামনা বাসনা কখনোই নিরালম্ব হতে পারে না। বহু বর্ণে বিচিত্রিত গম্বুজ থেকে বিচ্ছুরিত যে আলোকোজ্জ্বল ইটারনিটির কথা বলেছিলেন ইংরেজ কবি শেলী, তারই যেন তির্যক ও শিল্পিত প্রকাশ ঘটেছে এ উপন্যাসে। এ উপন্যাসের ডাক্তারবাবুর বয়ানে বনফুল লিখেছেন, 'আশ্চর্য আমার এই বাতায়নটি। এই বিশ্বজগতের তুলনায় ইহা তো কিছু নয়। আকাশভরা লক্ষ কোটি নক্ষত্রসমাজে কত ক্ষুদ্র আমাদের এই সৌর জগতের সীমা। সেই সৌরজগতের ক্ষুদ্র একটি গ্রহ আমাদের পৃথিবী। সেই পৃথিবীর এক কোণে কত নগণ্য আমার ছোট ঘরখানি। সেই ঘরের দেওয়ালে ছোট একটি জানালা। কত সামান্য অথচ কত অসামান্য। এই ক্ষুদ্র বাতায়ন-কক্ষে বাহিরের পৃথিবীর খবর পাই। আকাশপটে বিশ্বরূপ দেখি। আলো আসে, অন্ধকারও আসে।'

জানালার ভেতর দিয়ে আলো অন্ধকার মাখা বিশ্বরূপের একটি বিশ্বাসযোগ্য শিল্পরূপ 'বৈতরণী তীরে'। রবীন্দ্রনাথ এ ক্ষুদ্রকায় উপন্যাস সম্পর্কে বনফুলকে লিখেছিলেন, 'কিছুদিন পূর্বে বৈতরণীর পারে বইখানি পেয়েছি। এর মধ্যে বীভৎস রস ও করুণ রসের যে মিশ্রণ ঘটিয়েছ তাতে তোমার সাহস ও নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে – এর মধ্যে রচনার অপূর্বতা আছে।' রবীন্দ্রনাথ অবশ্য উপন্যাসটিকে ভুল নামে অভিহিত করেছেন কেননা এটির নাম 'বৈতরণীর পারে' নয় 'বৈতরণী তীরে', তবু রসবিশ্লেষণে যে সত্যে তিনি উপনীত হয়েছেন তার অনিবার্যতাকে অস্বীকার করা চলে না। জীবনের এপারে ওপারে গ্রথিত রয়েছে প্রবল প্রাণপ্রবাহ। এ জগতের সুখদুঃখ সমেত তাই যেন প্রসারিত হয়েছে মরণোত্তরে। অসুখ আত্মহত্যা, দুর্ঘটনা প্রভৃতি স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মৃত্যুমিছিলে সংলগ্ন অজস্র নরনারী নায়কের দিনযাপনকে মুড়ে রেখেছে। মৃত্যুকে শেক্সপিয়র অভিহিত করেছিলেন 'অনাবিস্কৃত মহাদেশ' বলে। বনফুল তাকেই যেন ধরতে চেয়েছেন প্রকাশের তপস্যায়। বিচিত্র সব চরিত্রের মধ্যে রয়েছেন এক কবিও যার মধ্য দিয়ে বনফুল রেখে গেছেন আত্ম অভিক্ষেপের চিহ্ন—

'বলিতে পারি তাই তো জীবনে মরণে
কত অঞ্জলি সাজাই তোমার চরণে
গন্ধ বয়ণে কত না ছন্দ-বাহিনী
কত ক্রন্দন কাহিনীঙ্গ

উপন্যাসের কবি চরিত্রের এ রচনা সম্পর্কে নায়কের মন্তব্য, 'কামের আর এক মনোহর রূপ। ছন্দে মিলে অনুপ্রাসে নিজের অন্তরের সত্য ও মিথ্যাকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।'

চিকিৎসক চরিত্রটির এ অনুভব 'অন্তরের সত্য ও মিথ্যা' র এ প্রকাশ কি স্বয়ং লেখক বনফুলের নিজের নয়? প্রসঙ্গত বিভূতিভূষণের 'দেবযান' উপন্যাসটির কথা বলা যেতে পারে যদিও দুটি উপন্যাসের অভিঘাত আলাদা।

(৫)

'অগ্নীশ্বর' ও 'এরাও আছে' উপন্যাস দুটিরও কেন্দ্রীয় চরিত্র দুজন চিকিৎসক। 'তৃণখণ্ড' বা 'বৈতরণী তীরে' র সঙ্গে এ দুটি উপন্যাসের অবশ্য মূলগত তফাৎ রয়েছে। 'তৃণখণ্ড' ও 'বৈতরণী তীরে' প্রকাশ করেছে চিকিৎসকের চোখ দিয়ে দেখা সমাজ ও জীবনকে। 'অগ্নীশ্বর' ও 'এরাও আছে' তে চিকিৎসকদের দেখা হয়েছে সমাজ ও জীবনের প্রেক্ষিতে। এ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারণ পাঠক পেতে পারেন বনফুলের আরো কিছু উপন্যাসে যাদের মধ্যে অন্যতম হল 'হাটে বাজারে'।

অগ্নীশ্বর' লেখা হয়েছিল একজন বাস্তব মানুষের চরিত্রের আদলে। তাঁর নাম বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। বনবিহারী অধুনা বাংলা সাহিত্যে প্রায় বিস্মৃত একজন ব্যক্তিত্ব। অথচ এক সময়ে তার গল্প কবিতা উপন্যাস ও কার্টুন রসিক বাঙালি চিত্তকে জয় করেছিল। বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৮৮৬ - ১৯৬৫) সম্পর্কে অন্তরঙ্গ ও রস সমৃদ্ধ আলোচনা পাওয়া যাবে পরিমল গোস্বামীর 'স্মৃতিচিত্রণ' ও অন্যান্য লেখায়। সজনীকান্ত দাসের আত্মস্মৃতি-তে এবং সর্বোপরি বনফুলের 'পশ্চাৎপট' গ্রন্থে। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক সংখ্যা 'এক্ষণ' পত্রিকাতে বনবিহারীকে নিয়ে বিশেষ আলোচনা আগ্রহী পাঠক দেখে নিতে পারেন।

বনবিহারী বনফুলের শিক্ষাগুরু ছিলেন। মেডিকেল কলেজে তাঁর ছাত্র ছিলেন বনফুল। ছাত্রোত্তর জীবনেও বনবিহারীর সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা ঘটেনি তাঁর। নিজের বিদ্যায় সার্থক, তেজিয়ান, স্পষ্ট বক্তা, যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে অক্লান্ত প্রতিবাদী, সুরসিক, মরমী প্রভৃতি নানা বিচিত্র গুণের অপূর্ব রাসায়নিক সম্মেলন ঘটেছিল বনবিহারীর অদম্য চরিত্রের মধ্যে। জিজ্ঞাসু অথচ আপোষহীন মানব-প্রেমী কিন্তু যে কোনো দূর্বলতার প্রতি ক্ষমাহীন এ ধরনের মানুষ প্রায় কারুর প্রীতিভাজন হতে পারেন না। বিদ্যাসাগর যেমন তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রৌঢ় বয়সে একলা হয়ে পড়েছিলেন, বনবিহারীও প্রায় অনুরূপভাবেই আপন-জনদের কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য হয়েছিলেন। এহেন ব্যতিক্রমী বাস্তব চরিত্রকে অবলম্বন করে অনুরাগ শ্রদ্ধা, মমতা ও কল্পনায় 'অগ্নীশ্বর'-কে রূপ দিয়েছেন বনফুল।

বনবিহারী প্রয়াত হলে বনফুল তাঁকে স্মরণ করে একটি সনেট লিখেছিলেন। অগ্নীশ্বরকে বোঝবার জন্য সনেটটি উদ্ধৃত হতে পারে

পাষাণে আঘাত হানি, অসি তীক্ষ্ণধার
চূর্ণ-বিচূর্ণিত হল? কঙ্কর কণ্টক
জয়ী হল বিক্ষত করিয়া বার বার
বলিষ্ঠ পথিক পদ? ধূর্ত ও বঞ্চক
সাধুরে লাঞ্ছিত করি বিজয়কেতন
আস্ফালন করিল আকাশে? অন্ধকার
গ্রাসিল কি রবি? না-না-নতি-নিবেদন
করি' পদে উচ্চকণ্ঠে কহি বারংবার
নহে ব্যর্থ, পরাজিত, হে বহ্নি-কমল
তমোহন্ত্রী, হে প্রদীপ্ত মশাল-বর্তিকা,
অয়ি তব অনির্বাণ চির-সমুজ্জ্বল
অনবদ্য অপরূপ উর্দ্ধমুখী শিখাঙ্গ
মহাপ্রস্থানের পথে বিগত অর্জ্জুন
অস্ত্রাগারে রেখে গেছে শরপূর্ণ তূণঙ্গ

বনফুল সৃষ্ট অগ্নীশ্বরও ব্যর্থ ও পরাজিত নন, তিনি বহ্নি-কমল ও তমোহন্ত্রী। তাঁর চরিত্রও অনবদ্য অপরূপ উর্দ্ধমুখী শিখা। কর্তব্যে কঠোর অবিচল ও ক্ষমতায় পরিপূর্ণ হৃদয়, অন্যায়ের প্রতি ক্ষমাহীন ও আপোষহীন, প্রয়োজন হলে অক্লেশে ছেড়ে যেতে পারেন পরম প্রিয়জনকে, এমনকী পুত্রকেও, এ হেন মানুষের প্রতি ভীতি মিশ্রিত শ্রদ্ধা পাঠকের মনে জাগাতে চেয়েছেন বনফুল। অজ্ঞেয়বাদী অগ্নীশ্বর তাই ব্যক্তিগত জীবনে তেমন শান্তি পাননি, কিন্তু ব্যক্তিত্বের বিকিরণে পরিচিত জনকে প্লুত করেছেন আজীবন। ভারতীয়দের কাছে কল্পিত পঞ্চকন্যাকে অগ্নীশ্বর যেভাবে নতুন ব্যাখ্যা করেছেন তার মধ্য দিয়ে বনফুলের বৈশিষ্ট্যও অভিব্যক্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বনফুলের অধ্যয়নের পরিধি ছিল ব্যাপক। বিভিন্ন দেশের পুরাণ, প্রাক্-ইতিহাস, ধর্মগ্রন্থ,

কাব্য, বিবিধ বিজ্ঞান, প্রভৃতি পাঠ করেছিলেন বনফুল এবং প্রয়োজনে নিজের সাহিত্যকর্মে তার সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। পঞ্চকন্যার নতুন ব্যাখ্যা তাই তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়েছিল।

'অগ্নীশ্বর' উপন্যাসকে ফিল্মে রূপ দিয়েছিলেন বনফুলের ছোটভাই অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। অগ্নীশ্বরের ভূমিকায় অবিস্মরণীয় অভিনয় করেছিলেন উত্তমকুমার। আত্মজীবনীতে বনফুল ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন ফিল্মটি জনরঞ্জিত হয়নি বলে। কিন্তু এ ক্ষোভের তেমন সঙ্গত কারণ নেই কেননা রসিকজনের কাছে আদৃত হয়েছিল ফিল্মটি। অন্তত এ ধরনের আদর্শবাদী চরিত্র নিয়ে তৈরি ফিল্ম যতটা সমাদর পেতে পারে, তাই পেয়েছিল। অবশ্য ছবি করার সময় উপন্যাস থেকে চিত্রনাট্যটি অনেকটাই সরে এসেছিল।

'এরাও আছে' বনফুলের লেখা শেষ পর্বের উপন্যাস। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রও একজন চিকিৎসক, তাঁর নাম হিরন্ময়। এধরনের লেখায় বনফুল সাধারণত যে পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রচুর মানুষের সুখ ও দুঃখ আশা ও ব্যর্থতা এবং ভালমন্দের বৈচিত্র্য উপন্যাসটিকে স্বাদু করে তুলেছে। তবে প্রায় দশবছর আগে লেখা 'হাটে বাজারে'র রচনাশৈলী ও মেজাজ এ উপন্যাসে অলক্ষ্য থাকে না। বরং বলা যায় এটি যেন 'হাটে বাজারে' বই অনুবর্তন। পার্থক্য এই 'হাটে বাজারে' সদাশিব ভট্টাচার্য দুর্বৃত্তের আক্রমণে নিহত হয়েছিলেন উপন্যাসের উপসংহার ঘটেছিল বিষন্নতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু 'এরাও আছে'তে হিরন্ময়ের জন্য বনফুল বরাদ্দ করেছিলেন বিপরীত সমাপ্তি। অমিতাকে ঘিরে বিগত জীবনে রচিত হয়েছিল যে রোমান্স, প্রৌঢ়তার সীমায় পৌঁছে তাই পরিণত হল পরিণয়ে। বিবাহ যে শুধু শরীরের সীমায় আবদ্ধ নয়, পরস্পরের মানসিক আশ্রয় হিশেবেই তার যথার্থ অবস্থান, বনফুলের এমন অভিমত অনূদিত হয়েছে এ উপন্যাসে। এ উপন্যাস লেখার সময় বনফুল সত্তর পেরিয়েছেন, নিজের দাম্পত্য জীবন দিয়েই তিনি অনুভব করেছিলেন প্রৌঢ় প্রেমের অনির্বচনীয় মাধুর্যকে। হিরন্ময়ের সংযত ব্যাকুলতা তাই অন্ধ অমিতার মধ্যেও সঞ্চারিত হতে দিয়েছিলেন তিনি। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনে এ ধরনের ঘটনা বাস্তবতা পেতে পারে কিনা তা নিয়েও তাই আর ভাবিত হননি বনফুল। সুতীব্র দেহাতীত অনুরাগ মিশ্রিত এ উপন্যাসকে বৈচিত্র্য দিয়েছে বীণা আফজল খাঁ বিষাণ অনুমান মাগাতি মাসি প্রভৃতি অজস্র জীবন্ত চরিত্র। উপন্যাসের উৎসর্গপত্রে বনফুল লিখেছিলেন

'এরাও আছে। এরাই সংখ্যায় বেশি। সমাজের এরাই সুদৃঢ় ভিত্তি, এরাই আদর্শবাদী, এরাই নমস্য—'

সমাজের সুদৃঢ় ভিত্তি এ নমস্য আদর্শবাদী সমূহ চরিত্রদের প্রতি বনফুলের ছিল প্রচণ্ড পক্ষপাত। তাঁর সাহিত্যের গরিষ্ঠ অংশ এ পক্ষপাতেরই নিদর্শন।

(৬)

সমাজের সুদৃঢ় ভিত্তি আদর্শবাদী ও নমস্য মানুষের প্রতি গভীর আসক্তি নিয়ে বনফুল অক্লান্তভাবে বিচরণ করেছেন সমষ্টির অজস্রতা থেকে ব্যষ্টির একাকিত্ব পর্যন্ত। তাঁর বেশ কিছু উপন্যাসেই পাঠকদের পরিচয় ঘটে এধরনের চরিত্রের সঙ্গে। ভিড়ের মধ্যে থাকলেও তারা স্বভাবত স্বতন্ত্র। আদর্শের প্রতি আনুগত্যের জন্য তারা ক্রমে সুদূর নির্জনে উত্থিত হতে থাকেন। অগ্নীশ্বরের মধ্যে আমরা তার প্রতিফলন দেখেছি। হরিশচন্দ্র ও নবীন দত্ত উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র দুটিও যেন তারই সম্প্রসারণ।

বনফুল মনে করতেন সমাজের যে স্তরেই অবস্থান করুন না কেন আদর্শবাদী মানুষের জন্য প্রতীক্ষা করে থাকে একই ধরনের ভবিতব্য। তাই জোতদার ধনী হরিশচন্দ্র ও মধ্যবিত্ত অবসরপ্রাপ্ত নবীন দত্তের মধ্যে থেকে যায় এক অন্তর্লীন সমানধর্মিতা। হরিশচন্দ্র প্রগতিবিরোধী নন, কিন্তু বিজ্ঞানের দ্বারা অর্জিত বিলাসিতা বিরোধী। তাঁর

সঙ্গে প্রজাবৃন্দের আন্তরিক যোগ কখনোই বিনষ্ট হয় না। তিনি তাদের সুখদুঃখের সঙ্গে সর্বদাই জড়িয়ে থাকেন ওতপ্রোত। অথচ নিজের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠায় সততই থাকেন বিনম্র ও আপোষহীন। তাই তিনি ভাইঝি শীর্ষার সঙ্গে বন্ধু উপানন্দের বিবাহ দেন কিন্তু অক্লেশে সংসার ছেড়ে চলে যান পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন না বলে। চিঠি লিখে জানিয়ে যান, 'এবার আমি আমার ভালবাসার লোকেদের কাছে চললাম। তারা দরিদ্র, তারা অসহায়, তাদের নানারকম দোষ আছে। বর্তমান বিলাসিতার যুগে তারা বঞ্চিত লুব্ধ, অনেকে চরিত্রহীন, অনেকে চোর। তবু তাদেরই আমি ভালবাসি, কারণ তারা বড় অসহায়, অথচ তারাই আমাদের দেশের লোক। ....সর্বস্ব ত্যাগ করে তাই তাদের কাছেই চললাম।' যন্ত্রসভ্যতার বিলাসের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে ঘটেছে উপন্যাস থেকে হরিশচন্দ্রের নিষ্ক্রমণ।

নবীন দত্তও পালিয়েছিলেন সভ্যতার তথাকথিত উন্নতি থেকে। স্ত্রী পারুলবালা, পুত্র প্রতাপ, স্নেহধন্য শিশুসমা এবং অন্য কেউ তাঁর আভ্যন্তরীণ নির্জনতা ঘোচাতে সমর্থ হয়নি। তাই তিনি জীবনের অন্তিম প্রহরে চলে যান কার্মাটাড়ে। 'বিদ্যাসাগরও শেষ বয়সে কার্মাটাড়ে ছিলেন এইটেই তাঁর সান্ত্বনা। সমস্ত দিন তিনি মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ান, মনে হয় লাঞ্ছিত বিদ্যাসাগরের আত্মাকে তিনি খুঁজছেন। জানেন দেখা পাবেন না, তবু খুঁজছেন।' (নবীন দত্ত)

বিদ্যাসাগরের একাকী সংগ্রামী আদর্শবাদী জীবন বনফুলকে আকর্ষণ করে এসেছে আজীবন। তাঁর চরিত্র নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ও একটি একাঙ্ক নাটকও লিখেছিলেন তিনি। মধুসূদন যার উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন Wisdom of an ancient sage, energy of an Englishman and heart of a Bengali mother. তাঁর সমস্ত প্রজ্ঞা, উৎসাহ ও সহৃদয়তার সত্ত্বেও চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন সুদূর কার্মাটাড়ে। বিদ্যাসাগরের প্রতি অনুরাগই বনফুলকে নিয়োজিত করেছে নবীন দত্তকে এমন উপসংহারে পৌঁছে দিতে। নবীন দত্তের শেষ প্রহরগুলোর সান্ত্বনা বিদ্যাসাগরের ছবিটা তিনি সঙ্গে এনেছিলেন।

কঠিন আদর্শের প্রতি এ আনুগত্যের প্রকাশে বনফুল কখনো কখনো উপন্যাসের আভ্যন্তরীণ যুক্তিক্রমকেও অগ্রাহ্য করতে কুণ্ঠিত হননি। 'হরিশচন্দ্র' ও 'নবীন দত্ত' চরিত্রদুটির মধ্য দিয়ে বনফুল যেন আত্ম-অভিক্ষেপ ঘটাতে চেয়েছেন।

(৭)

অতিলৌকিকের প্রতি বনফুলের একটি আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। তার বেশ কিছু ছোট গল্প ও একাধিক উপন্যাসে তার প্রকাশ ঘটেছে। 'বৈতরণী তীরে' নিয়ে আগেই এ বিষয়ে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান সংকলনের অন্তর্গত অন্তত আরো দুটি উপন্যাস বনফুলের এ আসক্তির প্রতিফলন রয়েছে।

'মানসপুর' ও 'মহারানী' অবশ্য সমশ্রেণিক উপন্যাস নয়। 'মহারানী'তে বনফুল বাস্তবতার বাতাবরণকে ক্ষুণ্ণ করতে চাননি। কিন্তু বিষয় বিন্যাস ও চরিত্র নির্মাণ বাস্তবতার সীমা ছাড়িয়ে প্রায়শই পৌঁছে গিয়েছে প্রায় এক অলৌকিক দুনিয়ায়। সিংহের পিঠে করে মহারানীর ঘোরা, প্রেম ও অপ্রেমের দ্বন্দ্ব, সিপাহিবিদ্রোহের অন্যতম নায়ক নানাসাহেবের আগমন ও নিষ্ক্রমণ, শত্রুর মুণ্ডচ্ছেদ, নানাধরণের ষড়যন্ত্র ও অমিতাচার সব মিলিয়ে এ উপন্যাস অনেক সময়েই সম্ভাব্যতার সীমা ছাড়াতে চেয়েছে। বাস্তবকে অনুসরণ করেও একটি অবাস্তবতাকে বনফুল আদ্যন্ত প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন। উৎকল্পনায় এক অভাবনীয় নিদর্শন এ উপন্যাস। মহারানীর সঙ্গে সিংহের সম্পর্কটি বালজাকের 'এ প্যাশন ইন দ্য ডেজার্ট', গল্পটিকে মনে পড়িয়ে দেয়।

'মানসপুর'ও বনফুলের একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাস। অসাধারণ রূপবান জীবনে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বদীপ কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে নিজের মধ্যে রচনা করে নিয়েছে এক

মানসপুর। সেখানে আছে বসুধরা নদী, রং বাহারী, কিছু ফুলপরী, এমনকী কুষ্ঠরোগগ্রস্ত একজন 'সিংহ' যারা দৈনন্দিন বাস্তবতা থেকে ছিনিয়ে বিশ্বদীপকে নিয়ে যায় এক আশ্চর্য কল্পলোকে। সেখানে বাস্তব জীবনের অধীনস্থ শ্রমিক সম্প্রদায়, ব্যবসার আদান প্রদান, মঞ্জরীর নীরব ভালবাসা এবং বিদুলার নিবেদিত প্রেমও তার হৃদয়ে কোনো স্থিতির সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলতে পারে না। অসুখ তাকে অনিকেত করে দিয়েছে যেমন দিয়েছে আলবেয়র কামুর উপন্যাসের কোনো কোনো নায়ককে। কামু বনফুলের প্রিয় লেখক ছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর বেশ কিছু লেখায়। কিন্তু পাশ্চাত্য অস্তিবাদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে তিনি গড়ে তুলেছেন আধুনিক রূপকথার জগত। তাই রূপকথায় যেমন ঘটে, বাস্তব থেকে অবাস্তবে এবং অবাস্তব থেকে বাস্তবে অবিরাম চংক্রমণ এখানেও তাই ঘটেছে। বিশ্বদীপও অবশ্য শেষ পর্যন্ত চলে যায় আফ্রিকায় এবং সেখানেও 'মানসপুরের দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ প্রসারিত হয়ে ছিল তাঁর চোখের সামনেই সেখানে তাঁর সঙ্গ ছাড়ে না ফুলপরীর দল --- মানসপুরের তরলা, তুহিনা তুফানী, হাওয়া ও হিল্লোলা। প্রকৃতি পরম সান্ত্বনার মতো জড়িয়ে থাকে বিশ্বদীপকে, বাস্তব ও অবাস্তবতার মধ্যে নির্মাণ করে নিরাময়ের এক গভীর উদ্ভাস। এ উদ্ভাসকেই যেন নিরন্তর অন্বেষণ করে বেরিয়েছেন বনফুল।

(৮)

আনাতোল ফ্রাঁসের 'থেইস' উপন্যাসের বাংলা রূপান্তর হল 'নিরঞ্জনা'। বনফুল তাঁর সাহিত্য জীবনে বেশ কিছু বিদেশী উপন্যাস ও অন্তত একটি একাঙ্ককে আত্তীকৃত করেছিলেন। তাদের মধ্যে উপন্যাস 'ভীমপলশ্রী' ও একাঙ্ক 'কবয়' কে কখনোই বিদেশি বলে মনে হয় না। এমন সার্থক আত্তীকরণ বিশেষ করে উপন্যাসে কদাচিৎ ঘটে থাকে।

বিদেশি থেইস ও বাংলায় নিরঞ্জনার রূপ নিয়েছে। বহু গুণসম্পন্না রূপোপজীবিনী নিরঞ্জনাকে সত্য ও মঙ্গলের আলো দেখানোর অভীপ্সা নিয়ে নিগূঢ় তপস্যার নির্বাসন থেকে বেরিয়ে আসেন মহর্ষি সাবর্ণি। নানা বিরোধ ও বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে অতঃপর সাবর্ণির জীবন যে উপসংহারে পৌঁছয় তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি আতঙ্কজনক। সমষ্টির কল্যাণ থেকে বিচ্যুত হয়ে শুধুমাত্র কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির কল্যাণকামনা সাধকের কখনো কাম্য হতে পারে না। বুদ্ধদেব আম্রপালীর উজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন সমগ্রেরই প্রেক্ষিতে। সাবর্ণি এ মাহাত্ম্য থেকে স্খলিত হয়ে পরিণত হলেন নররাক্ষসে।

প্রসঙ্গত অনেকের হেরমান হেস রচিত 'সিদ্ধার্থ' উপন্যাসের কথা মনে পড়তে পারে। অবশ্য স্বাদে ও মেজাজে 'থেইস' বা 'নিরঞ্জনা' এবং 'সিদ্ধার্থ' একেবারেই আলাদা। তবু প্রাচীন কাহিনীর মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগের আর্তিকে স্পর্শ করার ব্যাকুলতা এ দুটি উপন্যাসের মধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ সাযুজ্যের সৃষ্টি করে বনফুল 'নিরঞ্জনা' র মধ্য দিয়ে সে আর্তিকেই রূপ দিতে চেয়েছেন।

(৯)

'ভুবন সোম' শুধু বনফুলের কেন, বাংলা সাহিত্যেরও একটি অন্যতম উপন্যাস বলে স্বীকৃত হতে পারে। অবশ্য বনফুলের গল্পের যে ইংরেজি সংকলন বেরিয়েছে যার নাম Wild fire and other stories, সেখানে 'ভুবন সোম' গৃহীত হয়েছে গল্প হিসেবে। গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য কোন্ কোন্ লক্ষণের উপর নির্ভর করে সেসব আঙ্গিকগত বিতর্কের অবকাশ আলোচনার এ পরিসরে নেই। শুধু এটুকু বলা যায় সাহিত্যের এ দুটি প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য নির্ভর করে আকারের উপর নয়, অভিঘাতের উপর। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের বিশ্ববন্দিত উপন্যাস 'বুড়ো ও সমুদ্র'--- যা লেখককে নোবেল প্রাইজে সম্মানিত করেছিল---তার আকার বেশ ছোট। আসলে একটি বৃদ্ধ নাবিকের নিরলস সংগ্রাম এবং আপাত ব্যর্থতার মধ্যেও তার অপরাজেয় মনোভাব

হেমিংওয়ে প্রকাশ করেছিলেন সরল সংহত আবেগময় কাব্যভাষায়। তাই উপন্যাসটির মধ্যে বিধৃত হয়েছে এক মহাকাব্যিক বিস্তার।

'ভুবন সোম' উপন্যাসেও স্বল্প পরিসরেও বনফুল এক সরল অথচ গভীর, আবেগময় কিন্তু সংযত, চরিত্রে প্রাচুর্য এড়িয়ে মাত্র তিন চারটি মানুষকে নিয়ে যে আকর্ষণ বিকর্ষণের কাব্যময় প্রকাশ ঘটিয়েছেন তার সাক্ষাৎ সাহিত্যে বেশি মেলে না। সৎ 'আপোষহীন' অনুভবী অন্তরে একাকী ভুবন সোম কর্তব্যের খাতিরে নিজের ছেলেকেও ক্ষমা করেন না। অথচ সেই মানুষটিই যখন পাখি শিকার করতে গিয়ে ক্রমশ মিশে যেতে থাকেন সরল অশিক্ষিত দেহাতি অধিবাসীদের সঙ্গে, নিজেকে জড়িয়ে নেন তাদের সুখদুঃখের অন্তরমহলে। বিশেষ করে বিদিয়ার সানুরাগ সহযোগিতা ও সস্নেহ প্রশ্রয় ভুবন সোমকে আক্ষরিক অর্থেই যেন অন্য এক ভুবনে নিয়ে যায়। যে সখীচাঁদকে শাস্তি দেবার জন্য তার এ অঞ্চলে আগমন ঘটনাচক্রে সোম সাহেব যখন জানতে পারেন বিদিয়া সেই ঘুষখোরেরই স্ত্রী এবং তার চাকরি চলে গেলে বিদিয়ার আর শ্বশুর বাড়িই যাওয়া হবে না, তখন তিনি গভীর এক আত্মিক সংকটে পড়ে যান। অবশেষে নিজের বিবেককে পীড়িত করেও তিনি এক মহৎ অন্যায়ের আশ্রয় নেন এবং নিজের চরিত্র বিরুদ্ধ একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। সখীচাঁদকে তিনি শুধু ক্ষমাই করেন না বরং সাহেবগঞ্জে বদলি করে দেন যেখানে সখীচাঁদের ভাষায়, 'ওটা খুব ভাল স্টেশন। অনেক উপরি--- '

সম্মান ও সাফল্যের চূড়ায় বসে ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা ও অতৃপ্তি সোম সাহেবকে নিরন্তর পীড়ন করে চলেছিল। এ যন্ত্রণা থেকে তাঁকে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল বনলতা সেন নয়, সামান্য এক দেহাতি যুবতী বিদিয়া। সূক্ষ্মতম আস্তরণের মতো সোমসাহেব বিদিয়ার মধ্যে সম্পর্কের এক গভীরতর নির্মাণ চলতে থাকে সারা উপন্যাস জুড়ে। বাসনার এ ব্যাপ্তিকরণ বনফুল প্রকাশ করেছেন অপরূপ কাব্যভাষায়। সারাজীবন অন্তরে অতৃপ্ত থেকেছেন সোমসাহেব, কোনো নারীর প্রেম তাঁকে উজ্জীবিত করেনি কখনো, তাই বিদিয়ার মধ্যে তার নিরলঙ্কার অভিব্যক্তি দেখে তার নিজের মনেও এসেছে মানসিক পরিবর্তন। তাই পাখি শিকারের তীক্ষ্ণতাও তার অন্তর থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। বহুকষ্টে সংগৃহীত পাখিটিকেও তাই তিনি মুক্তি দিয়ে যান। প্রেম, সহৃদয়তা শান্তি প্রভৃতি শব্দ সমূহ যেন এক মুহূর্তে শরীরী হয়ে ওঠে। ভুবন সোম এর অভিঘাত তাই পাঠকের মনে কিছুতেই ফুরোতে চায় না।

এ উপন্যাসকে অবলম্বন করে মৃণাল সেন একটি সার্থক চলচ্চিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। এ অসাধারণ ফিল্মে অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন উৎপল দত্ত সোম সাহেবের চরিত্রে। বিদিয়া হিসেবে সুহাসিনী মুলেও ছিলেন অনন্য। ভুবন সোম চরিত্রে রূপদান করেই উৎপল দত্ত অভিনয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'ভরত' পুরস্কার পেয়েছিলেন। মৃণাল সেনও পেয়েছিলেন পরিচালক হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

বিষ্ণু বসু

তৃণখণ্ড

।। এক ।।

কম্প দিয়া জ্বর আসিয়াছে। হ্যাঁ, জ্বর বই কি! তাহাকে বসিয়া চিঠি লিখিতেছি। অন্যায়, তবু লিখিলাম। সে অপরের বাগ্‌দত্তা জানিয়াও আমার কাব্য-প্রেরণা কিছুমাত্র কমিতেছে না। জ্বরে প্রলাপ বকিতেছি।

মনের আকুতি বুঝাব কেমনে কথায় বলি,
কি করে প্রকাশ করিব বল না—কিছু না জানি,
গভীর সাগরে বাড়ব-অনল মরিছে জ্বলি,
বুঝাব কি করে সাগর-জলের জ্বালার বাণী!
ঘরের কোণেতে বসিয়া যখন হারায় দিশা,
দিবসে যখন ঘনাইয়া আসে আঁধার নিশা,
হিমানীর বুকে জাগে হায় যবে অনল তৃষা,
ভাষাও তখন নীরব হয় যে অবাক মানি।

ভাষায় কখনো সে-কথা জীবনে যাবে না বলা,
তবু কি বোঝনি? বুঝিতে এখনো আছে কি বাকী?
গভীর রাতের গহন আঁধারে, হে চঞ্চলা,
আমার প্রাণের প্রবল পরশ পাইলে না কি?
তোমারি লাগিয়া একাকী জাগিয়া যে আকুলতা,
মদির মধুর নিবিড় নিথর যে নীরবতা,
গোপনে ও মনে কহেনি কি কোন নিগূঢ় কথা—
আঁখিতে তোমার দেয়নি কি কোন আবেশ আঁকি?

আমারে স্মরিয়া শিহরি কখনো ওঠেনি তনু?
স্বপনে কভু কি লুকায়ে তোমারে দিইনি দেখা?
তোমার মনের মেঘেতে আঁকে না ইন্দ্রধনু—
আমার মনের তপ্ত তপন-কিরণ রেখা?
তোমারে ঘিরিয়া যত ফুল ফোটে আমার মনে,
সুরভি তাহার পাও না কি তুমি সঙ্গোপনে?
তোমার লাগিয়া যে কবিতা জাগে ক্ষণে ক্ষণে,
ছন্দ কি তার আজিও তোমার হয়নি শেখা?

মনে হয় যেন আমার লাগিয়া উতলা প্রিয়া,
গাহো মনে মনে, "আমারি যে তুমি—নহ তো কারো";
বুকের বেদনা ঢেকেছ মুখের হাসিটি দিয়া,
আমারে ভুলিতে যত চাও তত ভুলিতে নারো!
আমারি মতন তোমারো মুখেতে ছলনাবাণী
মনের ভিতর ঘনায়ে তুলেছে বেদনাখানি,
যতই আমারে সরাও দূরেতে আঘাত হানি'
মনের নিভৃতে ততই চাহিছ নিকটে আরো!'

প্রেমেই পড়িয়াছি। অন্ধকার বন্ধ ঘরের জানালার ফুটা দিয়া কিরণ-রেখা প্রবেশ করিয়াছে। বন্ধ ঘরে আলোকস্বপ্ন। সেই আলোক-রেখায় শত-শত ধূলিকণার উন্মাদ আবর্তন, বাসনার কলুষ। তবু তাহা আলো। শরাহত পশুর ন্যায় অন্ধকার মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। স্বপ্ন দেখিতেছে। মৃত্যুর?

"ডাক্তারবাবু—"

চমকাইয়া উঠিলাম। "কে? ভিতরে আসুন।"

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। হাসিয়া বলিলেন—"একটু কষ্ট দিতে এলাম। দেখুন ডাক্তারবাবু, কয়েকদিন থেকে আমার স্ত্রীর কেমন মাথা গোলমাল হয়ে গেছে। পাশের বাড়িতে যাত্রা শুনতে গিয়ে এই ব্যাপার মশাই!"

"কি রকম?"

"বেশ ভাল মানুষ—যাত্রা শুনতে গেল। রাত ১১টা নাগাদ ফিরে এল—একটি বদ্ধ উন্মাদ। এসেই বল্‌লে, আমার নন্দদুলালা! কই—আমার নন্দদুলালা? বলেই গান! সেই থেকে মশাই এক-নাগাড়ে চলছে। আর তো পেরে উঠ্‌ছি না। একটা কিছু ব্যবস্থা করুন।"

"কোথায় আছেন তিনি?"

"বাইরে গাড়িতে বসে আছেন। আনব?"

"আনুন।"

আসিলেন একটি যুবতী। আলুলায়িত-কেশ, অবিন্যস্ত-বেশবাস, চোখে উদাস দৃষ্টি। আসিয়াই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় ডেকেছেন কেন? আপনি ডাকছেন আমায়?"

বলিলাম—"হ্যাঁ—বসুন ওইখানে।"

নিকটস্থ চেয়ারটায় ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

"কেন ডেকেছেন আমায়—বলুন না!"

"আপনার কি হয়েছে? এমন করছেন কেন?"

খানিকক্ষণ ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—"কই কিছু হয়নি ত?"

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

"আপনার স্বামী যে বলছেন, আপনি বাড়িতে মহা উৎপাত আরম্ভ করেছেন। নন্দদুলাল কে?"

"নন্দদুলালের গান শুনবেন? শোনেন নি আপনি?" বলিয়াই—

কোথায় আমার নন্দদুলাল
কোথারে তুই ননী চোরা—

হঠাৎ আবার গান বন্ধ হইয়া গেল।

"আস্‌বে খোকা আমার কাছে, এস।"

ফিরিয়া দেখিলাম, পাশের বাড়ির হরিশবাবুর ছোট খোকাটিকে কোলে করিয়া ঝি দাঁড়াইয়া আছে। খোকাটির তিনদিন হইতে জ্বর—আমাকে রোজ দেখাইতে লইয়া আসে।

"এস না—কেমন পুতুল দেব তোমাকে! এস আমার কাছে। আস্‌বি না—তবে রে দুষ্টু—"

বলিয়া উন্মাদিনী হঠাৎ উঠিয়া ছোঁ মারিয়া খোকাকে কাড়িয়া লইয়া প্রাণপণে বুকে চাপিয়া ধরিল। খোকা তারস্বরে চীৎকার করিতেছে—ঝি হৈ-রৈ তুলিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া খোকাকে উদ্ধার করিলাম। তরুণীর চোখ দিয়া টস্‌ টস্‌ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—"আমার কাছে কোন খোকাই আসে না! কেউ আসে না। কেন বলুন না।"

রমণীটিব পরীক্ষা-কার্য শেষ করিয়া তাঁহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিলাম। তাহার পর স্বামীটিকে কয়েকটি প্রশ্ন করা প্রয়োজন বুঝিলাম।

"কতদিন পূর্বে আপনার 'গনোরিয়া' হয়েছিল?"

লোকটা থতমত খাইল, কিন্তু সত্যকথাই বলিল—"দশবছর আগে; তখন আমার বয়স উনত্রিশ-ত্রিশ হবে।"

"ছেলেপিলে হয়নি?"

"একটি হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে—আর হয়নি!"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার স্ত্রীর সর্বাঙ্গে কালো-কালো দাগ দেখলাম। চাবুকের দাগের মত। মেরেছেন না কি?"

ভদ্রলোক একটু চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"হ্যাঁ, দু'চার ঘা দিয়েছিলাম একদিন। বন্ধু-বান্ধবেরা সব বল্লেন কিনা যে ওসব ন্যাকামির একমাত্র ওষুধ, প্রহার। তাই একটু, এমন বেশী-কিছু নয়—অর্থাৎ—"

"আচ্ছা, আর মারধোর করবেন না। এখন শুনুন। আপনার স্ত্রীর ছেলেপিলে না হলে অসুখ সারবে না; ছেলেপিলেও যে হবে তারও সম্ভাবনা অল্প। তবু চেষ্টা করে দেখা যাক। আপনার নাম কি?"

"পাঁচুগোপাল বসাক।"

ব্যবস্থাপত্র দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিতে না করিতেই প্রতিবেশী হরিশবাবু আসিয়া উপস্থিত।

"কি হয়েছিল মশাই? একটা পাগ্‌লি না কি খোকাকে গলা-টিপে ধরেছিল!"

তাঁহাকে সব বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন—"যাক্‌ খুব ফাঁড়াটা কেটে গেছে! আপনি একবার ছেলেটাকে দেখে যাবেন। কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে।"

"আচ্ছা। গ্লুকোজটা খাওয়াচ্ছেন ত?"

"ওটা এখনো কেনাই হয়নি—না হয় আজ কিনেই আনি, বুঝতেই ত পাচ্ছেন ডাক্তারবাবু! এই অল্প মাইনেতে সাত-আটটি ছেলেপিলে নিয়ে—তবু আপনাদের পাঁচজনের দয়া আছে বলে টিকে আছি। আপনি একবার দয়া করে দেখে যাবেন। আনছি আজই গ্লুকোজ।"

"আচ্ছা।"

হরিশবাবু চলিয়া গেলেন। গরীব মানুষ, কাচ্চাবাচ্ছা লইয়া বিব্রত। অথচ সেদিন পর্যন্ত Viriligen ইনজেকশন লইবার জন্য ঝুলোঝুলি করিয়াছেন! আশ্চর্য মানুষের মন। আমার নিজের মনের দিকে তাকাইয়া দেখি—আর বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাই।

ছাত্র-জীবনের কথা মনে পড়ে। অত্যন্ত গোঁড়া ছিলাম। আমার স্টোভে একটি ছেলে মুর্গির ডিম সিদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া স্টোভ ফেলিয়া দিই। আজ ত মুর্গির মাংস না হইলে চলেই না। এমন কি গোমাংসেও আপত্তি নাই। মানুষের অহরহ বিবর্তন! আজকের-আমি দশ বৎসর কেন, কয়েক মাস পরেই আর একজন লোক হইয়া যাইব। স্কুল, কলেজ, ধর্ম, হিতোপদেশ, সকলে সমস্বরে শিখাইল—পর-স্ত্রী জননীবৎ। অথচ সেই পর-স্ত্রীর প্রেমেই ত পড়িয়াছি। কিছুদিন পূর্বেও কি ইহা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল? ছিল না। আপনারা হাসিতেছেন ত? হাসিবেন না। পর-স্ত্রী নয়। তবে স্ত্রী বটে। আমার সমস্ত সত্তাকে সে পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজমান, অথচ—যাক্। বর্ণনা করিব না। আমি ডাক্তার—আমি কবিও। আমার জীবন-কাহিনী যদি শুনিতে চান, তবে আমার কবিতাও পড়িতে হইবে। তাহাই আমার জীবনের সত্য প্রকাশ।

"—ডাক্তারবাবু।"

"কে? ভেতরে আসুন।"

।। দুই ।।

চতুর্দিকে নিবিড় অন্ধকার। নদীর উপর নৌকায় চলিয়াছি। দূর গ্রামে কোন গৃহস্থ তাঁহার একমাত্র পুত্রের অসুখে বিপন্ন। সুতরাং আমাকেও খানিকটা বিপন্ন হইতে হইয়াছে।

নিবিড় অন্ধকারে নদীর ভাষা শুনিতেছি। বেগবতী তরঙ্গিনীর ভাষা—চলন্ত স্রোতের কল-কল ধ্বনি। ধীরে ধীরে সে আমার কাছে আসিয়া বসিল। কোন কথা নাই। নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে, স্রোত কথা কহিতেছে, সময় বহিয়া চলিয়াছে। শতাব্দী পার হইয়া গেল, তাহার স্পর্শ যেন অনুভব করিতেছি। সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ। মনের কানায় কানায় কান্না জমিয়া উঠিতেছে। এই যে মধুর বেদনাময় অনুভূতি, ইহার ভাষা কোথায়? ছন্দে ছন্দে সমস্ত হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে—

অন্ধকারে আঁখি মুদি দেখিতেছি তাহার স্বরূপ,
নাহি কোন ছদ্মবেশ আর,
নয়ন-সম্মুখে তার সত্যমূর্তি জাগে অপরূপ,

আলো তারে দিল অন্ধকার!
দিবসের আলো যেন আড়াল করিয়াছিল তারে,
ছলনায়, লোক-ভয়ে, ছোট-বড় শত মিথ্যাচারে,
আবরিয়া রেখেছিল আপনার নিগূঢ় আত্মারে,
স্পর্শ যেন পাইতেছি তার!
দিবসে বলেছে যাহা চুপি চুপি এসে অন্ধকারে,
করিতেছে তাহা অস্বীকার।

তাহার সেই অস্বীকারের ভাষা শুনিতেছি। সে যেন বলিতেছে— "দিবালোকে আমি ত তোমার কেহ নই। আমি তখন পৃথিবীর, আমি সমাজের। কিন্তু এ গভীর গহন অন্ধকার রাত্রে—"

ওগো তুমি বল কেগো—ওগো মোর অন্তর-শায়িতা,
বৃথা কেন কাল নষ্ট কর,
দিবসের তীব্রালোকে অনায়াসে রহি লুক্কায়িতা,
অন্ধকারে হও স্পষ্টতর!

তাহার নিশ্বাসের স্পর্শ যেন গায়ে লাগিতেছে। তাহার চুল আমার সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিল।

আকাশ-কুসুম যাহা দিবসের সুতীব্র আলোকে,
অন্ধকারে তারি মালা গাঁথি আমি স্বপ্নাতুর চোখে;
সুনিবিড় তমিস্রায় ধরা দাও, বুঝিবে না লোকে
অপরূপ কি যে মূর্তি ধর।
দিবসে হারায়ে ফেলি—খুঁজে ফিরি বাণীহীন শোকে
আপনারে কোথায় সংহর!

অনন্ত আকাশে অগণ্য নক্ষত্র। অন্ধকারকে উপেক্ষা করিয়া জ্বলিতেছে। অন্ধকার যেন বলিতেছে—"আমাকে উপেক্ষা করিও না—আমি আছি বলিয়াই তোমরা জ্বলিতেছ; দিবসে তোমরা কোথায় থাক? আমার নিবিড়তায় তোমাদের প্রকাশ।"

"তুমি মিথ্যা, তুমি মোহ"—দিবসের এ তীব্র-ভাষণ
বিজ্ঞানের নানা যুক্তি বহে,
অন্ধকারে ভেসে যায় বিজ্ঞতার সকল শাসন,
অন্ধকার কহে—নহে নহে।
অন্ধকারে প্রিয়া সে যে মোর লাগি আকুলা উন্মনা,
বাহুভরা আলিঙ্গনে, উন্মাদিনী, অজস্র-চুম্বনা,
অলস রভস-ভরে শ্রুতিমূলে প্রণয়-গুঞ্জনা,
অকারণে কত কি যে কহে।
আবার দিবস আসে—মিলাইয়া যায় সে মূর্চ্ছনা,
আঁধার প্রতীক্ষা করি রহে।

সমস্ত অন্তর ভরিয়া হে অন্ধকার, তোমাকে নমস্কার করি। হে নক্ষত্রপ্রকাশক হে অনন্ত, অখণ্ড, তোমাকে প্রণাম করি। স্বপ্ন-সাগরের নাবিক তুমি, অসম্ভবকে সম্ভব কর—সুদূরকে নিকটে আন—অন্তরকে বাহিরে লইয়া যাও। তুমি মহৎ, তুমি স্নিগ্ধ, তুমি নীরব। তুমি আমার প্রণতি গ্রহণ কর। কিন্তু একটু পরে ত আর তুমি থাকিবে না! আলোকের রথ-ঘর্ঘর ধ্বনি যে শোনা যাইতেছে। সেই মুখর, সেই স্পষ্ট, সত্যবাদী কর্মী, সে ত আসিল বলিয়া! তখন তুমি কোথায় আত্মগোপন কর? তখন তোমার এ স্নিগ্ধ কান্তি কোথায় লুকাইয়া রাখ? তাহার নিশ্বাসের বেগ বাড়িতেছে! তাহার আলিঙ্গন যেন শিথিল হইয়া আসিতেছে। আলুলায়িত কেশবাস সম্বরণ করিয়া সে যেন উঠিয়া দাঁড়াইল। "আর একটু থাকো"। তাহার তনুর গন্ধে আমার স্বপ্ন মদির। সে চলিয়া গেল।

কেবা সত্য—কেবা মিথ্যা—কে বলিয়া দিবে মোরে কহ,
দিবস, না—গভীর আঁধার!
যুক্তি কভু মুক্তি দেয়? চিত্ত মোর ভাবে অহরহ,
উদ্বেলিছে প্রশ্নের পাথার!
সে পাথারে একখানি ভাসিতেছে দুঃসাহসী তরী,
তোমারে পাওয়ার আশা দুলিতেছে শিহরি শিহরি,
এ জীবনে হাসিয়াছি বহুদিন মন-প্রাণ ভরি'
বাকী আছে এখনো কাঁদার;
অসম্ভব সাধনায় পূর্ণ করি দিবা-বিভাবরী
বাকী আছে দুঃসাধ্য সাধার!

"বাবু, একটু উঠ্‌তে হবে!" মাঝি আসিয়া বলিল।

"কেন?"

"একটা মড়া এসে নৌকোটাতে ঠেকেছে।"

উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। মড়াই বটে—একটা স্ত্রীলোকের। চুলগুলি ভাসিতেছে। ঠোঁট এবং গালের খানিকটায় মাংস নাই। বীভৎস হাসি হাসিতেছে!

যাঁহাদের বাড়ি যাইতেছিলাম—তাঁহারা লোকজন, লণ্ঠন প্রভৃতি লইয়া ঘাটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমি নামিবামাত্রই রোগীর পিতা নয়নবাবু আসিয়া আমার দুইটি হাত ধরিয়া বলিলেন, "একটু পা চালিয়ে যেতে হবে ডাক্তারবাবু—বড় বেশী বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে সন্ধ্যে থেকে!"

পা চালাইয়া চলিলাম।

"কয় দিন থেকে অসুখ?"

"আজ আট দিন।"

"ইতিপূর্বে কে দেখ্‌ছিলেন?"

"অ্যালোপ্যাথি ওষুধ আমাদের ধাতে সয় না বলে হোমিওপ্যাথি করছিলাম—কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি দেখে আজ আপনাকে খবর পাঠিয়েছিলাম।"

"ও।"

বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। রোগীর ঘরে গেলাম। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ডবল নিউমোনিয়া। অবস্থা খুব সঙ্গীন। রাত কাটিবে না। রোগী প্রলাপ বকিতেছে—

"কচাকচ কেটে ফেলছে—দেখ্‌তে পাচ্ছো না তুমি! উঃ কত রক্ত। —আমাকে নিয়ে চল এখান থেকে, ওই আর একটা মুণ্ডু পড়ল, থানায় খবর দেওয়া চাই—চল চল--আঃ—"

বাহিরে আসিয়া বৃদ্ধ-পিতাকে সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তাহলে আজ রাতটা আপনি থেকে যান ডাক্তারবাবু, আপনার ফিস যা লাগে তা আমি দেব।" আমি যতই বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে আমার থাকা বৃথা, ততই তাঁহাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে থাকিতে হইল। তখন তাঁহাদের বলিলাম —"তা হলে এক কাজ করুন। আজ সমস্ত রাত ওর কাছে এক জনের থাকা দরকার। আপনারা পালাপালি করে সেটা করুন। আমি পাশের ঘরেই কোথাও থাক্‌ব, মাঝে মাঝে দেখে যাব। কজন আছেন আপনারা?"

"আমি, মহিন্দর, বৌমা আর আমার স্ত্রী। গোড়ার দিকটায় না হয় বৌমাই থাকুন। আমার স্ত্রীর আবার যা মাথা ধরেছে, সেখানে আবার একজনের থাকা দরকার। তাঁকেও একবারটি দেখুন না হয়। গেরো কি একরকম ডাক্তারবাবু--"

দেখিলাম তাঁহার স্ত্রীকে। যোড়শী যুবতী। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীরা সাধারণতঃ যাহা হইয়া থাকেন তাহাই। মাথাধরার যে ঔষধই দিই না কেন, সারিবে না। একবড়ি অ্যাস্‌পিরিন খাইয়া ঘুমাইতে বলিয়া বৃদ্ধের দিকে ফিরিয়া বলিতে হইল, "উনি বড় কাতর রয়েছেন, আপনি এইখানেই থাকুন। আপনার যদি দরকার হয় খবর দেব এখন।"

তখন আসিয়া আসল রোগীর ব্যবস্থাদি করিলাম, ইনজেকশন দিলাম। মাথার শিয়রে দেখি তাহার স্ত্রী বসিয়া জলপট্টি দিতেছে। মহিন্দর অর্থাৎ ছেলের পিসামহাশয় নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি বলিলেন, "ডাক্তারবাবু— চলুন এইবার একটু যা হোক মুখে দেবেন। আপনি চা খান কি?"

"হ্যাঁ—খাই বই কি।"

বাহিরের বারান্দায় বসিয়া জলযোগ করিতে করিতে শুনিলাম, রোগী প্রলাপ বকিয়া চলিয়াছে, "ধর ধর—আহাহা—আউট্ হয়ে গেল—আজকাল নরেনটা কিচ্ছু খেলতে পারে না। এই একটা বিড়ি দে ত--ওরে—আহাহা—"

বাহিরের ঘরে আমি আর মহিন্দর।

মহিন্দর বলিতেছে—"হাড়-কেপ্পন মশাই! আমি না এসে পড়লে কি আপনাকে ডাক্‌ত না কি?"

আমি মৃদু হাসিয়া বলিলাম—"এসেই বা আর বিশেষ কি করলাম। ওর ত জীবনের কোন আশা দেখি না।"

কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া পিসেমশাই বলিলেন—"আহা—তাতে আপনার আর দোষ

কি? গোড়া থেকে যদি দেখতেন, তাহলেও বা একটা কথা ছিল। হাড়-কেপ্পন মশাই—চেনেন না আপনি ওকে। আমি আফিংখোর মানুষ, তোর ছেলের অসুখ শুনে দৌড়ে এলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই, এক ফোঁটা দুধ এসে-ইস্তক পেটে পড়েনি। চামার—চামার।"

প্রসঙ্গ ফিরাইবার মানসে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ছেলেটি করেন কি?"

"করবে আবার কি। বি-এ ফেল করে বিয়ে করেছে। এই মাস-ছয়েক মাত্র হল। ওর ভাবনাই বা কি বলুন—বাপের এক ছেলে; নগদ টাকা, তেজারতি, বিষয়-আশয় যথেষ্ট। তবে অংশীদার জুটতেও পারে। বাপের চেষ্টার ত্রুটি নেই। পটাপট্ বিয়েই করে চলেছে। প্রথম বৌটা মোলো বেঘোরে, বিনা চিকিৎসায়। দ্বিতীয়টা গেল সর্পাঘাতে। সেও প্রায় বেঘোরে। এইবার এইটেকে ধরেছে—দেখা যাক্।" খানিকক্ষণ চুপ করিয়া আবার মহিন্দর বলিল—"হাড় কেপ্পন—চামার—চামার। আমি আফিংখোর লোক, এক ফোঁটা দুধ দিতে ওর বুক ফেটে যায়।"

আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিবার আর একবার চেষ্টা করিলাম। বলিলাম— "আপনি বসুন একটু— দেখে আসি ও ঘরে একবার।"

হাত-ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিলাম—দেড়টা।

পাশের ঘরে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে চক্ষু স্থির হইয়া গেল। শ্বাস উঠিয়াছে। বধূ পাশে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হাতে তখনও পাখাটি ধরা। সমস্ত মুখে গভীর পরিশ্রান্তি। সিঁথির সিঁদুরে আগুন জ্বলিতেছে। তাহাকে আর উঠাইলাম না। ব্যাগ হইতে একটা ইনজেকশন বাহির করিয়া দিতে যাইব এমন সময় সব শেষ হইয়া গেল। মহিন্দরকে খবর দিলাম। সে আসিয়া বলিল —'যাক্!—ওর ছেলে কি কখনো বাঁচে?"

"ওখানে ওটা ঢাকা রয়েছে কি?"

আমি বলিলাম, "দুধ বোধ হয়।"

"এঁটো না কি?"

"না, এঁটো নয় বোধ হয়।"

"তবে আর এটা কেন নষ্ট হয়"—এই বলিয়া মহিন্দর সেই মৃতদেহের পাশে দাঁড়াইয়া লোভী শিশুর মত ঢক্ ঢক্ করিয়া দুধটা খাইয়া ফেলিল।

বধূর ঘুম ভাঙিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি জড়সড় হইয়া উঠিয়া হাওয়া করিতে লাগিল। এখনও বেচারা জানে না!

ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। আমি বাহিরের ঘরে অপরাধীর মত বসিয়া আছি। পিসেমশাই আসিয়া ফীস-এর টাকাটা হাতে দিলেন। বলিলেন—"বাজিয়ে নিন্ মশাই—ও যা চামার! হয়ত সবগুলোই খারাপ দিয়েছে।"

আবার নৌকায় চড়িয়া ফিরিতেছি। আকাশে আলো ফুটিতেছে। আমার অন্তর-লোকবাসিনীরও ঘুম ভাঙিল। সে হাসিয়া আমার পানে চাহিল। আমার মন কিন্তু তখন বিষণ্ণ। সামান্য হাসিলাম মাত্র।

নদী বহিয়া চলিয়াছে।

নৌকা হইতে নামিয়া দেখি, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—"কাল সন্ধ্যে থেকে আপনার খোঁজ করছি।"

ভদ্রলোককে চিনিতাম না।

জিজ্ঞাসা করিতে হইল, "আপনি কোথায় থাকেন?"

"আমি এখানে থাকি না। দু-চার দিনের জন্যে চেঞ্জ-এ এসেছি।"

"ও"।

ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম—ভদ্রলোকের বয়স যদিও পঁয়তাল্লিশের উপর—কিন্তু পোযাক-পরিচ্ছদে তাদৃশ গাম্ভীর্য নাই—বরং সৌখীনতাই বেশী।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি দরকার?"

"আমাদের বাড়ি একবার যেতে হবে—আমার ভাগ্নেটির তিন-চার দিন থেকে জ্বর হয়েছে। বাড়িতে আর অন্য লোকও কেউ নেই। আপনি একবার যাবেন? ঘোষপাড়ার লালবাড়িটাতে আছি আমরা।"

"আচ্ছা ---যাব।"

ঘোষপাড়ার লালবাড়িতে গেলাম। প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রাণকৃষ্ণবাবু, দেখিলাম দাঁড়াইয়া আছেন। ভিতরে গেলাম, তাঁহার ভাগিনেয়কে দেখিলাম—ব্যবস্থাদিও করিলাম। প্রেসক্রিপশন্ লিখিতে লিখিতে হঠাৎ একবার লক্ষ্য করিলাম, প্রাণকৃষ্ণবাবু জানালা দিয়া পাশের বাড়ির ছাদের দিকে নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া আছেন এবং তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলাম একটি মেয়ে ছাদে কাপড় শুকাইতে দিতে আসিয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করিলাম যে মেয়েটি নির্বিকার—কিন্তু প্রাণকৃষ্ণবাবু মুগ্ধ।

ভাগিনেয় দেখিলাম স-জ্বর অবস্থাতেও মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছে। ব্যাপার কি?

হঠাৎ প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিয়া উঠিলেন—"ওঃ।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হল?"

"না, কিছু নয় —তা' আপনাকে বলতে বাধাই বা কি থাকতে পারে? এ এক বিপদ হল দেখছি! চলুন বাইরের ঘরে—"

বাহিরের ঘরে গেলাম। প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "মশাই, বিপদ কি এক রকম! পাশের বাড়ির ছাদে যে মেয়েটি দেখলেন—দেখেন নি?"

"হ্যাঁ, দেখলাম বটে একটি মেয়েকে—"

ভদ্রলোক তখন আমার কানের গোড়ায় মুখ আনিয়া অতি চুপি চুপি বলিলেন—"মেয়েটি আমার প্রেমে পড়েছে। Hopelessly in love."

"বলেন কি! কেমন করে বুঝলেন?"

"আমি ওঘরে গেলেই ঠিক ছাদে আস্‌বে। মুখচোখ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে আমাকে দেখলেই!"

কি আর বলিব—একটু হাসিলাম মাত্র!

এমন সময় শ্যামবর্ণ মোটাসোটা একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "আসুন সনাতনবাবু, এই যে ডাক্তারবাবু এসেছেন। সনাতনবাবুই আপনার কাছে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ডাক্তারবাবু। আপনাদের আলাপ-পরিচয় আছে নিশ্চয়ই।"

আলাপ-পরিচয় ছিল না। তবু সনাতনবাবুকে নমস্কার করিলাম।

সনাতনবাবু বলিলেন, "কেমন দেখলেন প্রাণকৃষ্ণবাবুর ভাগ্নেকে? জ্বরটা কি বলে মনে হয়?"

সত্যকথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, বিশেষ কিছুই বুঝিলাম না। আন্দাজে ম্যালেরিয়ার ঔষধ দিয়াছি। রোগীর এবং আমার যদি কপাল ভাল হয় উহাতেই সারিয়া যাইবে।

কিন্তু রোগীর আত্মীয়স্বজনের কাছে সরল সত্য কথা বলা চলে না, অস্পষ্টতার আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়। বলিলাম—"রেমিটেন্ট গোছের মনে হচ্ছে। তবে কুইনিন্‌টা গোড়ায় গোড়ায় একটু দিয়ে রাখা ভাল। দিনদুয়েক দিয়ে দেখা যাক!" সনাতনবাবু দেখিলাম অত সহজে ভুলিবার পাত্র নহেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার diagnosis কি?"

"সে ত আর একদিনে চট্‌ করে বলা চলে না। রক্তটা পরীক্ষা করলে হয়ত ধরা যেতে পারে—"

সনাতনবাবু ইহাই চাহিতেছিলেন। বলিলেন—"আজকাল আপনাদের ওই হয়েছে এক ফ্যাশান! অমুক পরীক্ষা কর, তমুক পরীক্ষা কর। সেকালের সব ডাক্তাররা কিন্তু এ সবের ধার ধারতেন না। ছিলেন আমাদের হেমন্ত ডাক্তার"—ইত্যাদি অনর্গল বলিয়া গেলেন।

হেমন্ত ডাক্তার নাড়ী দেখিয়া পেটে টিউমার হইয়াছে বুঝিতে পারিতেন। রমেশ ডাক্তার রোগীর ফোটো দেখিয়া তাহার জ্বর আছে কিনা বুঝিতেন। বিশ্বম্ভর ডাক্তার, পঁতিত কবিরাজ, হরিকিশোর কম্পাউণ্ডার, সকলেই চিকিৎসাশাস্ত্রে আমাদের অপেক্ষা বেশি পারদর্শী ছিলেন বুঝিলাম।

হাসিয়া বলিলাম—"হ্যাঁ ওঁদের মতন কি আমরা পারি? আমাদের এর বেশী আর বিদ্যে নেই।"

সনাতনবাবু যেন একটু প্রসন্ন হইলেন।

বলিলেন—"সেকালের সব ব্যাপারই ছিল আলাদা রকমের। খেতে পারতাম কত আমরা! ভরপেট খাওয়ার পর অবলীলাক্রমে দু'সের সন্দেশ, দশ-বারোটা ল্যাংড়া আম কতবার খেয়েছি। গোটা পাঁঠা পারেন খেতে একলা?"

স্বীকার করিতে হইল, "পারি না।"

"তবে?"

ইহার কোন্ সদুত্তর দিব ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ সনাতনবাবু বুকের পেশী ও হাতের গুলি দেখাইয়া বলিলেন—"দেখুন, এখনও ব্যাপারখানা দেখুন!" দেখিলাম, ভদ্রলোক পেশীবহুল সন্দেহ নাই। সনাতনবাবুর বয়স অন্ততঃ ষাটের কাছাকাছি; এ বয়সের হিসাবে শরীরে বাঁধন আছে স্বীকার করিতেই হইবে।

"আমার একবার নাড়ীটা দেখুন ত!"

সনাতনবাবুর নাড়ী দেখিলাম। মনে হইল যেন high blood pressure; বলিলাম। শুনিয়া সনাতনবাবু হাসিয়া বলিলেন—"ওটাও একটা আজকাল ফ্যাশান, হাই ব্লড্ প্রেশার!"

এমন সময় প্রাণকৃষ্ণবাবু আড়ালে লইয়া গিয়া সনাতনবাবুকে কি বলিতে লাগিলেন। একটু পরে আবার দুইজনে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

সনাতনবাবু ছাদটার পানে চাহিয়া মুচ্কি হাসিয়া বলিলেন, "তাই না কি? আজকালকার মেয়েরা যা হয়েছে, বিচিত্র নয় কিছুই!"

বুঝিলাম প্রাণকৃষ্ণ প্রেমকাহিনী বর্ণনা করিয়াছে! লোকটা পাগল না কি? দর্শনী লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সবে ঘুমটি আসিয়াছে।

রাত্রি কত হইয়াছে বলা শক্ত। হাত-ঘড়িটা বন্ধ।

"ডাক্তারবাবু!"

ধড়মড় করিয়া উঠিলাম। বাহিরে গিয়া দেখি, লণ্ঠন-হাতে একটি লোক দাঁড়াইয়া আছে।

"কি চান?"

"শিগ্গির একবার চলুন, সনাতনবাবুর বাড়ি।"

"কেন, কি হল?"

"তিনি পাইখানা থেকে এসে কেমন করছেন। শুয়ে পড়েছেন।"

পদগতিতে যতটা দ্রুত যাওয়া সম্ভব, গেলাম। গিয়া দেখি, সনাতনবাবু আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া শুইয়া আছেন। শিয়রে বসিয়া স্ত্রী আকুলভাবে বাতাস করিয়া চলিয়াছেন।

"সনাতনবাবু, দেখি একবার আপনার হাতটা।"

কোন উত্তর নাই।

আবরণ উন্মোচন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, মারা গিয়াছেন!

পেশী-বহুল দেহ ঠিকই আছে! প্রাণ নাই।

অ্যাপপ্লেক্সি।

ফিরিয়া আসিতেছিলাম; একাই।

হঠাৎ একটা অন্ধকার গলির ভিতর হইতে কে ডাকিল, "ডাক্তারবাবু না কি!"

"কে?"

দেখি, গলি হইতে বাহির হইলেন প্রাণকৃষ্ণবাবু।

"আপনার টর্চটা একবার দিন ত ডাক্তাববাবু।"

"কেন, ব্যাপার কি?"

চুপিচুপি প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিলেন—"এই সন্ধ্যের সময় ওই গলিটার ভেতর—সেই মেয়েটা কাগজের মত কি একটা যেন ফেললে! ঠিক লভ্ লেটার।" দেখিলাম গলিটা সেই ছাদ ও প্রাণকৃষ্ণবাবুর বাড়িব ঠিক মাঝখানে। কৌতূহল হইল। টর্চ লইয়া গেলাম গলির ভিতর।

সেখানে নানাবিধ আবর্জনা। তাহার মধ্যে একটা সাদা কাগজের মত কি রহিয়াছে দেখিলাম। প্রাণকৃষ্ণবাবু উন্মাদের মত ছুটিয়া গিয়া তাহা লইয়া আসিলেন। কাগজে মোড়া কি একটা যেন!

খুলিয়া দেখা গেল—কতকগুলি চুল!

মেয়েরা প্রসাধন-শেষে মাথার ওঠা-চুলগুলি অনেক সময় কাগজে মুড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়—তাহাই!

"দেখছেন ডাক্তারবাবু—"

"হ্যাঁ চিঠি কই, ও ত চুল, ফেলে দিন—"

"বড় বেরসিক লোক আপনি! ইংরিজি নভেলে পড়েন নি আপনি, মেয়েরা তাদের প্রণয়ীকে চুল উপহার দেয়?—এ তাই!" তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রাণকৃষ্ণবাবুর দিকে চাহিয়া দেখিলাম। চোখে পাগলের দৃষ্টি!

ঠিক ত! পাগলই।

ঘরে শক্ত ব্যারাম, আর এই প্রৌঢ় ভদ্রলোক রাত্রি দ্বিপ্রহরে গলির মধ্যে প্রণয়-নিদর্শন খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন! মনে পড়িল এইরকম পাগলদের কথা পড়িয়াছিলাম বটে। একজনকে দেখিয়াছিলামও, তাঁহার ধারণা সম্রাট পঞ্চম জর্জ গোপনে তাঁহার নিকট টাকা কর্জ লইয়া শোধ দিতেছেন না! অন্য সব বিষয়ে ইঁহারা সাধারণ লোকের মতই। কিন্তু একটি কোন বিশেষ বিষয়ে তাঁহারা পাগল। একেবারে বদ্ধ উন্মাদ। ইঁহার ধারণা, মেয়েরা দেখিবামাত্র ইঁহার প্রেমে পড়ে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার ভাগ্নে কেমন আছে?"

চুলগুলি সযত্নে বুকপকেটে রাখিতে রাখিতে প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিলেন—"সমস্ত দিন এই বিদ্যেধরীর জ্বালায় কি আর অন্য কিছু করবার অবসর পেয়েছি? বার-পাঁচেক ছাদে এসেছে, জানলাতেও তিনবার উঁকি দিয়েছে। জ্বালাতনে পড়া গেছে!"

পাগলের সহিত আর কতক্ষণ বকিব!

বলিলাম—"আচ্ছা, বাড়ি যান।"

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় আবার শুইলাম। ভাবিতে লাগিলাম, প্রাণকৃষ্ণবাবুকে পাগল বলিতেছি—আমি নিজে কি তাই নয়? যাহার হাসি, ছলনা, লজ্জা লইয়া আমি স্বপ্নের প্রাসাদ রচনা করিয়াছি, সে হয়ত আমাকে মোটেই ভালবাসে না। ওই ছাদের মেয়েটির মতই হয়ত সে আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন—আমি প্রাণকৃষ্ণবাবুর মত অন্ধকার গলিতে বৃথাই ঘুরিয়া মরিতেছি!

নিবিড় বর্ষা নামিয়াছে।

সকালে উঠিয়া অবধি দেখিতেছি আকাশে বাতাসে বর্ষার আয়োজন। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি—আকাশের গুরু গুরু ডাক। উঠানে কদম্ব গাছটায় অসংখ্য ফুল। হাতে কোন কাজকর্ম নাই, একটিও রোগীর দেখা নাই।, ভজুয়া চাকরটাকে কাল ছুটি দিয়াছি, এখনও পর্যন্ত সে আসিল না।

অলসভাবে বিছানায় বসিয়া বর্ষা-সমারোহ দেখিতেছি। 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'—মনে পড়িতেছে। আজ আষাঢ় মাসের তেসরা, এবং আরও অনেক অমিল আছে, কিন্তু মিলও যে প্রচুর। বলিতে ইচ্ছা করিতেছে—

আজিকে যদিও সখী, আষাঢ়ের তৃতীয় দিবস
এবং যদিও নাম মোর
নহে কবি কালিদাস, নহি উজ্জয়িনীবাসী,
ছদ্মবেশ ত্যাগ করিতে পারি না!
পৃথ্বীরাজরা কি মরিয়াছে, সংযুক্তারা কোথায়?........
ইচ্ছা করে, চীৎকার করিয়া তাহাকে বলি—
ঝঞ্ঝাসম তব দ্বারে হানা দিতে আজি আসিয়াছি,
অকস্মাৎ প্রাণ-ভরে অকারণে ভালবাসিয়াছি,
আপনার আচরণে শতবার কত শাসিয়াছি,
তবু ভাসিয়াছি!
ভাসিয়াছি আজি আমি সীমাহারা মহাপারাবারে,
অতল সে কালো জলে নিঃশেষে নিজেরে হারাবারে,
আপনারে বন্দী রাখি হিসাবের ক্ষুদ্র কারাগারে,
সখী, যারা পারে
নিক্তিতে ওজন করি করিতে প্রণয় নিবেদন,
আমি তাহাদের নহি।—মোর নহে ক্ষীণ আবেদন!
চিরকাল যুগে যুগে গণ্ডী-দেওয়া শান্তি-নিকেতন,
করি উচ্ছেদন—
মর্মান্তিক তীব্র দাহ—এ পথের পাথেয় আমার,
তাই বলে ভাবিছ কি ঝরাইব নয়ন-আসার!
পুরুষ কাঁদে না কভু—চিরকাল এক দাবী তার,
'তুমি যে আমার'—
আমার আমারই তুমি—এ জীবনে নাই বা পেলাম,
স্পষ্টভাষে দাবীটুকু শুধু আজ জানাতে এলাম!
বেদনার বিষ-ভাণ্ড নিজ হস্তে তুলিয়া খেলাম,
মরিয়া গেলাম!
নিষ্কৃতি পেলে না জেনো—চিরকাল রহিব ঘিরিয়া,
চন্দ্রালোকে, বর্ষা-রাতে দেখা দিব মরম চিরিয়া,
দিবারাত্রি জীবনের ছোটবড় শত ফাঁক দিয়া।
আসিব ফিরিয়া!

চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, অথচ পারি না। এই যে সংযম, ইহাই ত জীবনের চরম ট্র্যাজেডি! হয়ত তাই এত সুন্দর!

নগেনের ঘরে ঢুকিয়া দেখি—হৈ হৈ ব্যাপার।

সেই ক্ষুদ্র-পরিসর ঘরের মধ্যে এক বিরাট ষাঁড়কে ঢোকান হইয়াছে—রোগী তাহার পুচ্ছ স্পর্শ করিবে! "গৌ-দান" হইতেছে! অর্থাৎ মুমূর্ষু রোগী যদি এই কার্য না করে তবে তাহার মৃত্যুর পর সে নাকি বৈতরণী পার হইতে পারিবে না! দমিয়া গেলাম। শেষ অবস্থা নাকি? ষাঁড়টাকে কোন-ক্রমে বাহির করিয়া নগেনকে দেখিলাম! শক্ত ব্যাপার বটে— মেনিন্‌জাইটিস্‌।

বাহিরে আসিয়া বসিলাম। রোগীর ব্যবস্থাদি করিয়া, হাতমুখ ধুইয়া একটু শুইবার জোগাড় করিতেছি; এমন সময় মাথায় প্রকাণ্ড-পাগড়ী এক ভদ্রলোক আসিয়া আমার নিকট বসিলেন। ধপ্‌ধপে গায়ের রং—গোঁফ-দাড়ী কামান—চোখে বুদ্ধির জ্যোতি জ্বল জ্বল করিতেছে— কপালে সিঁদুরের প্রকাণ্ড একটা টীকা। মাথায় সাদা কাপড়ের পাগড়ী!

তিনি ইহাদের গুরু। নগেনের অসুখ শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত জ্যোতিষীও। নগেনের কোষ্ঠীবিচার করিয়াছেন। আমাকে বলিলেন—"আজ রাত্রি বারোটা যদি পার করে দিতে পারেন—তাহলে ও এ যাত্রা রক্ষে পাবে। তা নাহলে নয়। আপনি যে কোন ওষুধ দিয়ে, যেমন-করে হোক্ রাত্রি বারোটা পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখুন। আমিও ক্রিয়া কর্ম যা করবার তা করছি।"

তাঁহার ভাষাটা অবশ্য সংস্কৃত-ঘেঁষা হিন্দী, আমি তর্জমা করিয়া নিলাম!

গভীর রাত্রি। কয়টা জানি না। আকাশে চতুর্দিকে ঘনঘটা, ঘনঘন বিদ্যুৎ, অবিরাম মেঘ-গর্জন। নগেনের শয্যাপার্শ্বে একা বসিয়া তাহাকে অল্প অল্প করিয়া ব্র্যাণ্ডি খাওয়াইতেছি।

"এই ফুলেশ্বরী!"—

নগেন প্রলাপ বকিতেছে। ফুলেশ্বরী তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী। অনেকদিন হইল মারা গিয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শিয়রে বসিয়া সেবা করিতেছে আর শুনিতেছে যে তাহার স্বামী একবারও তাহার নাম করিল না—বারবার ডাকিতেছে ফুলেশ্বরীকে!

পাশের ঘরে শুদ্ধ সাত্ত্বিক কুলগুরু রুষ্ট গ্রহের তুষ্টিবিধানের জন্য হোমাগ্নি জ্বালিয়া স্তব পাঠ করিয়া চলিয়াছেন।

আমি অসহায়ের মত বসিয়া একটু একটু ব্র্যাণ্ডি খাওয়াইতেছি।

নগেন মাঝে মাঝে চীৎকার করিতেছে—"ফুলেশ্বরী!"

নগেনের স্ত্রী বসিয়া চোখ মুছিতেছে।

বাহিরে মেঘ, জল আর বিদ্যুৎ!

হঠাৎ সব থামিয়া গেল যেন। —বাহিরের মেঘ-গর্জন কমিয়া গেল, প্রকৃতির শান্ত-ভাব ফিরিয়া আসিল। নগেন হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"একি, তুমি কখন এলে?"

তাহার পর তাহার স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিল—"কমলা, বালিশটা একটু ঠিক করে দাও তো!"

কমলা কৃতার্থ হইয়া গেল। পণ্ডিতজী জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন—কটা বাজিয়াছে।

দেখি, বারোটা বাজিয়া দশ মিনিট। নগেন বাঁচিয়া গেল।

নগেন ভাল হইয়া গিয়াছে। প্রাণকৃষ্ণবাবুর ভাগিনেয় টাইফয়েডে ভুগিয়া ভাল হইয়াছে। ভাল হইয়া সে তাহার পাগল মামাটিকে লইয়া স্থানত্যাগ করিয়াছে।

আমার প্র্যাক্‌টিস্ ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

অন্তরের পিপাসাও বাড়িতেছে।

বাহিরে আমি এত ভদ্র—অথচ ভিতরে আমি এত বর্বর! সেই আদিম যুগের কেভ্‌ম্যান্ আজিও আমার মধ্যে বাঁচিয়া আছে। সভ্যতার সমস্ত চেষ্টাই তো সে পণ্ড করিয়া দিতেছে। নীতিকথা বলিয়া কিছুতেই তাহাকে থামান যাইতেছে না!

কিন্তু বাহিরের ভদ্র বেশও তো খুলিয়া উলঙ্গ পশুটাকে লইয়া সমাজে বিচরণ করিতে পারি না।

আমার মনে যে এত অশান্তি, এত দ্বন্দ্ব, বাহিরে আমাকে দেখিয়া কে তাহা বলিবে!

"এই যে ডাক্তারবাবু"

সহাস্য নমস্কারে কহিলাম—"আসুন।"

"রামগঞ্জে যেতে হবে একবার, কলেরা হয়েছে!"

"চলুন।"

।। তিন ।।

"তুমি আমাকে ভালবাস না?"

কোন উত্তর নাই।

"বল না।"

তথাপি কোন উত্তর নাই!

"বল না!"

" কি বলব?"

"আমাকে ভালবাস কি না—"

"জানি না।"

বলিয়া সে চলিয়া গেল। বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম। তবে কি আমাকে ভালবাসে না? কিন্তু আমার অন্তর্যামী তাহা তো স্বীকার করে না। কিন্তু বলে না কেন?

বসিয়া মনের গোপন গহন গভীরে,
কেন গো উতলা করিছ আকুল কবিরে,
ওগো বল না!

তোমার স্বপন আমার নয়নে আঁকিয়া,
সুখ পাও কেন আড়ালে লুকায়ে থাকিয়া,
ওগো বল না!
কাছাকাছি আছ তবু মোরে ধরা দাও না,
তার মানে কিগো মনে মনে মোরে চাও না,
ওগো বল না!
তাই যদি হও ডাকো কেন নানা সুরেতে,
ভুলাইয়া কেন লয়ে যাও মায়া পুরেতে,
ওগো বল না—

সে যেন আবার আসিয়াছে। পিছন দিকে দাঁড়াইয়া আছে। আমি ফিরিয়া চাহিলাম না, আপন মনে লিখিয়া চলিলাম। তাহার আঁচলের স্পর্শটুকু পিঠে লাগিতে লাগিল।

লঘু হাসি তব, অকারণে কাছে আসা এ,
চকিত-চাহনি, নহে কি প্রণয় ভাষা এ?
ওগো বল না!
নহে যদি তবে বল না কেন তা খুলিয়া,
সন্দেহটুকু দাও নাকো উন্মুলিয়া,
ওগো বল না--

মনে হইল যেন আনত নয়নে সে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সমস্ত মুখে লজ্জার স্নিগ্ধ শোভা। অধর কাঁপিতেছে।

সহজ নয়নে চাহ না মুখের পানে তো,
আঁখি নত কর বুঝি না তাহার মানে তো
ওগো বল না!
ডাকি যবে তুমি চলে যাও সম্বরিয়া,
ডাকি না যখন নানাছলে এস সরিয়া,
ওগো বল না!
যে কথা জলকে নয়নে অধরে পলকে,
যে কথা কাঁপিছে উড়ে-পড়া ওই অলকে,
ওগো বল না!
ফুল ফুটে শেষে জান না কি যায় ঝরিয়া?
যৌবন, সখী, জান না কি যায় মরিয়া?
ওগো বল না—

আরও কাছে সরিয়া আসিল। তবু ফিরিয়া দেখিলাম না; আমার কি অভিমান নাই? কবিতায় কিন্তু অভিমান ফুটিতেছে না, শুধু অনুনয়, —ইচ্ছার বিরুদ্ধে লিখিয়া চলিয়াছি।

যেমন রেখেছি তব পায়ে দিব বলিয়া,
অকারণে সখী কেন যাও তারে দলিয়া,
ওগো, বল না!
ওই তো অধরে মুচকি হাসিটি ফুটেছে,
নয়নের কোণে সরম ফুটিয়া উঠেছে,
ওগো বল না!
জানি মনে মনে, তবুও ভাষায় বল গো,
সে কথাটি— যার লাগি' আমি চঞ্চল গো,
ওগো বল না!
বল না আমারে বল বল সখী, বল না,
অকারণে কেন এত অকরুণ ছলনা,
ওগো বল না!—

ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে যেন দেখিতেছে। ফিরিয়া বসিলাম। সে তো নয়!

"কে তুমি?"

অপ্রস্তুত হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

"আমি দুখিনী, বাবু, শুনেছি আপনাব বড় দয়া। তাই সাহস—"

"দিনের বেলা আসতে কি হয়?"

"দিনের বেলা আপনি নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাই।"

"কি হয়েছে তোমার?"

দেখিলাম। সর্বাঙ্গে বড় বড় চাকা চাকা ঘা। নাকটা ফুলিয়াছে। ঠোঁটের কোণে সাদা সাদা ঘা। চক্ষু দুইটি লাল। কুষ্ঠ নয় তো?

"কতদিন হয়েছে?"

"দু মাস থেকে—"

"ইনজেকশন দিতে হবে। খরচ লাগবে।"

"আমি গরীব মানুষ—আমাকে একটু দয়া করুন; ভগবান আপনার ভাল করবেন।"

"ভগবান রাজী হয়েছেন?"

বুঝিতে না পারিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। "আমাকে ভাল করে দাও, ভাল করে দাও, ভাল করে দাও।" দুই হাত বাড়াইয়া সে আমার পা দুইটি জড়াইয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লইলাম।

মহা মুস্কিল! কি করা যায়।

বলিলাম—"আচ্ছা আমার ফী দিতে হ : না। ওষুধের দামটা দিতে পারবে তো?"

"আমার কিছু নেই, আপনি দয়ার সাগর—"

"চুপ কর।"

একটা প্রেসক্রিপশন লিখিয়া তাহার হাতে একটি টাকা দিয়া বলিলাম—"বত্রিশ দাগ ওষুধ পাবে। আর এসো না আমার কাছে। ভাল যদি হয় ওতেই হবে।"

প্রণাম করিয়া সে চলিয়া গেল। ভাবিতে লাগিলাম, টাকা পাইলে উহাকে বোধ হয় এত অযত্ন করিয়া দেখিতাম না। তাড়াতাড়িতে আন্দাজে সিফিলিসের একটা প্রেসকৃপশন লিখিয়া দিলাম। ঠিক হইল কি?

মনের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। তাহার মুখের পানে চোখ তুলিয়া চাহিতে লজ্জা করিতে লাগিল। তাহার কাছে যেন ছোট হইয়া গিয়াছি।

।। চার ।।

"আমায় মাপ করবেন হরিশবাবু, আমি পারব না।"

সেই আমার প্রতিবেশী হরিশবাবু। তিনি কেরানী, ইনসিওরেন্সের দালালও। আমি তাঁর কম্পানির ডাক্তার। তিনি একটি কেস আনিয়াছেন। লোকটা মোটা, ইউরিনে সুগার আছে। হার্টটাও সুবিধার নয়। হরিশবাবুর অনুরোধ, সর্বাঙ্গসুন্দর রিপোর্ট যেন একটা লিখিয়া দিই। ফার্স্ট ক্লাস লাইফ না হইলে তাঁহার কম্পানি লইবে না। কিন্তু তাহা-কি করা যায়? দিনকে রাত্রি করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

হরিশবাবু বলিলেন—"কত কষ্টে কত খোসামোদ করে লোকটাকে রাজী করালাম, আর আপনি দু মিনিটের মধ্যে সব শেষ করে দিলেন? আপনার অবিদিত তো কিছুই নেই। ছেলেটা আজ প্রায় মাসাবধি ভুগছে। ওষুধপথ্য জোগাতেই জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে। এই কেসটা হলে কিছু টাকা পাওয়া যেত, একটু বিবেচনা—"

"তা হয় না হরিশবাবু, মাপ করবেন।"

"মাপ আপনিই আমাকে করুন। করে দিন দয়া করে। আমার যে কি অবস্থা! আচ্ছা ছেলেটির কি বাঁচবার আশা নেই?"

"শক্ত ব্যারাম, টাইফয়েড্ হয়েছে। বুঝতেই তো পারেন!"

"এসব জেনেও আপনি আমার অবস্থার প্রতি একটু দয়া করবেন না?"

"মাপ করুন।"

হরিশবাবু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"দিন তাহলে ছেলের প্রেসক্রিপশনটা লিখে।"

"ভাইটামিন 'ডি' টা?"

"ওটা এখনও কেনা হয়নি। দেখি যদি আজকে—"

হঠাৎ হরিশবাবু আমার হাত দুখানা ধরিয়া বলিলেন—"সত্যি বড় দুরবস্থায় পড়েছি ডাক্তারবাবু, ওটা যদি করে দিতে পারতেন!"

তখন নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে বলিতে হইল—"তার চেয়ে বরং এক কাজ করুন, এই দশটা টাকা না হয় আপনি—"

কথা শেষ করিতে পারিলাম না। উত্তেজিত হইয়া হরিশবাবু বলিয়া উঠিলেন—"আপনি এমন করে আমায় অপমান করতে সাহস করলেন! আজ আমি না হয় কপাল-দোষে দরিদ্র হয়েছি, জানেন আমি কত বড় বংশের ছেলে? রতনগঞ্জের চাটুজ্যেদের নাম এখনও ও অঞ্চলে লোকে ভোলে নি। কম করে দ'শ খানা পাতা আমাদের বাড়িতে পড়ত, আর আপনি আজ দশ টাকা আমাকে ভিক্ষে দিতে এলেন! আপনার—"

হরিশবাবু আর বলিতে পারিলেন না। দুই ফোঁটা জল তাঁহার চোখে টলটল করিতেছে দেখিতে পাইলাম।

অপ্রস্তুতের চরম!

হরিশবাবু যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—থ্যাঙ্ক ইউ।

বৈকালে হরিশবাবুর বাড়িতে তাঁহার ছেলেকে দেখিতে গিয়াছি।

হরিশবাবু বাড়িতে নাই। তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ বাবা, টাইফয়েড্ বলছ—কিন্তু ছেলে এমন বিড়-বিড় করে কি বক্‌ছে? মাঝে মাঝে আঁৎকে উঠছে।"

"টাইফয়েডে ওরকম হয়।"

"কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সেই যে সেদিন এক পাগলি ছেলেকে আঁক্‌ড়ে ধরেছিল, সেই কিছু নজর-টজর দেয় নি তো?"

"না, না, ও কিছু নয়।"

"সেই দিন থেকেই বাছা কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে।" কিছু বলিলাম না। একটু পরে বলিলাম—"দেখুন এই ওষুধটা রেখে দিন। রোজ দশ-বারো ফোঁটা করে দেবেন খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে—ভাইটামিন 'ডি'। ভুলবেন না যেন।"

"আচ্ছা। দাম কত এর?"

"দাম লাগবে না। এমনিই স্যাম্পল পেয়েছিলাম—"

মিথ্যা কথা বলিয়া এত সুখ কখনও পাই নাই।

হরিশবাবু আসিলেন। আসিয়াই বলিলেন—"আপনি তো কিছুতে দিলেন না—কিন্তু অল ইণ্ডিয়া লাইফ অ্যাশ্যুরেন্স কম্পানির এজেন্ট কেস্‌টিকে বেশ বাগিয়ে নিলে! আর খগেনডাক্তার কেমন সুন্দর ফার্স্ট ক্লাস লাইফ রিপোর্ট দিয়ে-দিয়েছে দেখে এলাম। আপনার যত সব ইয়ে—"

চুপ করিয়া রহিলাম।

হরিশবাবুর স্ত্রী বলিতে লাগিলেন—"দেখ, আজ অয়েল ক্লথ আনা দরকার একটা। বিছানা বড্ড ভিজে যাচ্ছে।"

হরিশবাবু বলিলেন—"আচ্ছা—"

"গ্লুকোজটাও ফুরিয়েছে—"

"আচ্ছা।"

কিরকম যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। বলিলাম—"এবার তাহলে উঠি?"

রাত্রে—গভীর রাত্রে, হরিশবাবুর ছেলে মারা গেল। একা উৎকর্ণ হইয়া মায়ের বুক-ফাটা কান্না শুনিতেছি। পাশে মিলের বড় চোঙটা হইতে মৃদু শব্দ করিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে—ফঃ—ফঃ—ফঃ—ফঃ।

মনে হইল একটা পাগলি যেন হাসিতেছে!

নিজেকে বড় অপরাধী মনে হইতে লাগিল। হয়তো ছেলেটার ভাল সেবা হয় নাই। ভিজা কাঁথায় শুইয়া শুইয়া—ভাল পথ্য না পাইয়া বোধহয় ছেলেটা মারা গেল। ছোট ছেলেরা তো প্রায় টাইফয়েডে মরে না! তবে?

দারিদ্র্য!—হরিশবাবুর সেই লাইফটা ফার্ষ্ট ক্লাস লিখিয়া দিলে ক্ষতি ছিল কি? খগেন-ডাক্তার তো দিয়াছে। আমাদের বিচারই কি নির্ভুল। ওই মোটা বহুমূত্র রোগী তাহার খারাপ হার্ট লইয়া হয় তো বহুকাল বাঁচিয়া থাকিবে — আর যে সব লাইফ ফার্ষ্ট ক্লাস বলিয়া লিখিতেছি—তারা হয়তো দুইদিন পরেই মারা যাইবে। কে জানে? হরিশবাবুর শুধু কিছু টাকা লোকসান করাইয়া দিলাম।—কোনটা ঠিক? সত্য কি? মিলের চোঙে পাগলি হাসিতেছে—ফঃ ফঃ ফঃ ফঃ ফঃ!

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

স্বপ্নে দেখিলাম, সে আসিয়াছে। দুই হাত দিয়া আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া চুম্বন দিয়া যেন বলিতেছে, "তুমি ঠিক করেছ—"। ঘুম ভাঙিয়া গেল। তখন ভোর। তখনও হরিশবাবুর বাড়ির কান্না থামে নাই! পাগলিও সমানে হাসিয়া চলিয়াছে—ফঃ-ফঃ-ফঃ! এলোমেলো ধোঁয়ার কুণ্ডলী সার বাঁধিয়া ভোরের আকাশে উড়িতেছে। যেন পাগলিনীর আলুলায়িত কেশভার!

।। পাঁচ ।।

"আমাকে রসুলপুর যেতে হবে।"

নিরীহ গোয়ালা চুপ করিয়া গেল। রসুলপুর তাহার জমিদারের বাড়ী, সুতরাং সেখানেই আমার সর্বাগ্রে যাওয়া অবশ্যকর্তব্য ইহা সে অস্বীকার করিতে পারিল না। তাছাড়া গরীব মানুষ—ফী সব সময়ে দেয় না। মাঝে মাঝে দুধটা -দইটা দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। সে চুপ করিয়া রহিল। তাহাকে বলিলাম—"ফেরবার পথে তোর ওখানে দেখে যাব; তুই বিকেলের দিকে বাড়িতে থাকিস্।" সে চলিয়া গেল।

"ভাল আছেন তো ডাক্তারবাবু—" কে? দেখি আমাদের সেই মহিন্দর। "ভাল আছেন তো?"

"হ্যাঁ, এই একরকম চলে যাচ্ছে! —কি মনে করে?"

"কিছু বিশেষ নয়। একটু চুলকানি হয়েছে—তাই—"

দেখিলাম। সত্যই বিশেষ কিছু নয়। ঔষধ লিখিয়া দিলাম।

"এইটে ঘসে' ঘসে' লাগাবেন। তাহলে আমি চলি? আমাকে অনেক ঘুরতে হবে এখন। আপনি কোথায় উঠেছেন? খাওয়া দাওয়া হয়েছে তো?"

মহিন্দর দেখিলাম উস্‌খুস করিতেছে।

বলিলাম—"বেশতো আমার ওখানেই চাট্টি খাবেন—এই ভজুয়া—"

ভৃত্য ভজুয়া আসিল। তাহাকে বলিলাম—"বাবুকে বাইরের ঘরে বসতে দাও, ঠাকুরকে বলে দাও উনি খাবেন এবেলা।"

নানাস্থানে ঘুরিলাম।

কাহারও দাঁতে ব্যথা, কাহারও টাইফয়েড, কাহারও যক্ষ্মা। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, আমাশয়, বেরিবেরি—রোগের শেষ নাই! কাহারও আবার কিছুই নয়, মানসিক অস্বস্তি। দিব্য স্বাস্থ্য, তাঁহার কিন্তু বিশ্বাস, হজম হয় না। যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করিতে হয়। অনেক বড়লোকের দেখি, অসুখের কারণ টাকা! হয় অত্যধিক খায়, নতুবা মাতাল, না হয় দুশ্চরিত্র। ইহার যদি কোনটাই না হয়, তাহা হইলে তাঁহার বিশ্বাস যে—হয় তাঁহার ধাতুদৌর্বল্য না হয় ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য ঘটিয়াছে।

সকলেরই ব্যবস্থা করি!

বাড়ি ফিরিয়া দেখি, অর্দ্ধেক টাকা অচল।

বেলা দুইটায় ফিরিয়া শুনিলাম, মহিন্দর খাইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমিও ঊর্দ্ধশ্বাসে খাইয়া লইলাম। রসুলপুর যাইতে হইবে। জমিদার বাড়ির গাড়ি আসিল, প্রকাণ্ড মোটর।

যাইবার সময় আলোয়ানটা চতুর্দ্দিকে খুঁজিলাম। পাওয়া গেল না। ভজুয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিল। আমিও করিলাম, আলোয়ানটা কিছুতে আর পাইলাম না। বাড়িতে একটা স্ত্রীলোক না থাকিলে চলা অসম্ভব। অন্তরলোকবাসিনী মুখ টিপিয়া হাসিলেন!

মোটর ছুটিতেছে।

তীর বেগে ছুটিয়া চলিয়াছি। স্পীড-এর যুগ! জীবনের গোনা-দিন কয়েকটি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে কাটাইয়া দিতে হইবে। কতটুকু মানুষের আয়ু! যতটা পারি ছুটাছুটি করিয়া দেখিয়া লই। নাইবা হইল সবটা ভাল করিয়া দেখা। ক্ষণিকের চাক্ষুষ পরিচয়, সেটাও কি কম! সুন্দর ফুলেভরা গাছটা, তাহার পর একপাল গোরু, একজন পথিক, একটা পুল, দুটো কুকুর, আবার একটা গাছ, চমৎকার মেয়েটি, একরাশ ধূলা উড়াইয়া আর একটা মোটর, ধূলা ভেদ করিয়া একঝাঁক অশোক ফুল চট্ করিয়া দেখা দিয়া মিলাইয়া গেল— বাঃ পাশের মাঠে পুকুরটি কি সুন্দর! গোরুর গাড়ির সারি চলিয়াছে, দুটি বুড়ো-বুড়ি মোট বহিয়া যাইতেছে, সাঁওতাল মেয়েটির যৌবন কি নিটোল, মুর্গীগুলো ছুটিয়া গেল—রোখো, রোখো, যাক্ ছেলেটা বাঁচিয়া গিয়াছে!

তীরবেগে ছুটিয়াছি।

এইরূপ তীরবেগে ছুটিতে ছুটিতে সন্ধ্যা-নাগাদ রসুলপুর পৌঁছান গেল।

রসুলপুরের জমিদার বছর দুই হইল মারা গিয়াছেন।

নিঃসন্তান যুবতী বিধবা-রাণীজি —সম্পত্তির অধিকারিণী।

আমাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন, জমিদারের নূতন নায়েব—কুঞ্জলালবাবু। তিনিই এখন সর্বেসর্বা এবং তাঁহার কর্মদক্ষতায় জমিদারির উন্নতিও হইয়াছে বিস্তর। লোকটি দেখিলাম, বিনয়ের অবতার।

আমি গাড়ি হইতে নামিবামাত্র তিনি হেঁট হইয়া আমার পদধূলিই লইয়া ফেলিলেন। আমি সন্ত্রস্ত হইয়া হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলাম। তিনি বলিলেন,—"সে কি! আপনি ব্রাহ্মণ, তা বললে কি চলে?"

রসুলপুর জমিদার-বাড়িতে এই আমার অল্পদিন যাতায়াত সুরু হইয়াছে।

নায়েবটিকে ইতিপূর্বে চিনিতাম না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"অসুখ কার?"

"ভেতরে আসুন, বসুন, ঠাণ্ডা হোন। অসুখের কথা তো হবেই।" ভিতরে গেলাম। গিয়া দেখি সমারোহ ব্যাপার। দুইজন ভৃত্য চেয়ার আগাইয়া দিল। হাতমুখ ধুইবার জল, চা, জলখাবার, পান, তামাক, বিনয়-বচন—ক্রমান্বয়ে আসিতে লাগিল।

আমি যেন বাড়িতে জামাই আসিয়াছি। বলিলাম—"চলুন। এবার রোগী দেখা যাক।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন!"

"অসুখ কার?"

"রাণীজির।"

পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম, পাঁচ মাস হইবে। ভয়ের কারণ তো কিছু দেখিতেছি না। অথচ, নিমেষের মধ্যে কারণটা বুঝিতে পারিলাম। বিধবা যে! হিন্দুর ঘরের বিধবা!

"টাকার জন্যে নয়, ওসব আমার দ্বারা হবে না।"

"হাজার টাকা পেলেও নয়?"

"না। আমাকে মাপ করবেন।"

"আশা করি কথাটা গোপন রাখবেন।"

"নিশ্চয়।"

ফী লইয়া বাহির হইয়া আসিলাম। এবারে কুঞ্জলালবাবুর পদধূলি লইবার আগ্রহ দেখিলাম না।

বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া চলিয়াছি। সমস্ত অন্তঃকরণে দারুণ বিতৃষ্ণা। অনর্থক আমার এতটা সময় নষ্ট করাইল।

"এই রোখো—"

নামিয়া পড়িলাম। সকালে কারু-গোয়ালাকে বলিয়াছিলাম, ফিরিবার সময় তার বাড়ি

যাইব। মাঝামাঝি রাস্তা দিয়া হাঁটিয়াই চলিলাম। অত্যন্ত অন্যমনস্ক। কতক্ষণ চলিয়াছিলাম খেয়াল নাই। বারুইপুর গ্রামের ভিতর আসিতেই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল, চমক ভাঙিল।

সন্ধান করিয়া কারু গোয়ালার বাড়ি বাহির করিলাম।

কাছে গিয়া বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল।

কান্নার শব্দ!

আগাইয়া গেলাম। কারুর ছেলে একটু আগেই মারা গিয়াছে।

কলেরা হইয়াছিল।

সময়ে চিকিৎসা করিলে বোধ হয় বাঁচিত!

কারুর স্ত্রীর আর্তনাদ কানে আসিতে লাগিল—"ওগো ডাক্তারবাবু, এত দেরী করে কেন এলে গো—আমার বাছা যে চলে গেছে।"

।। ছয় ।।

বাড়ি ফিরিয়া কিছু খাইলাম না।

মনটা খারাপ। ভজুয়া সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "একটু চা বানিয়ে দেব?"

উপুড় হইয়া শুইয়া ছিলাম। বলিলাম—"না।"

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানি না।

ঘুম যখন ভাঙিল তখন চন্দ্র অস্তোন্মুখ। ম্লানায়মান জ্যোৎস্নায় সমস্ত পৃথিবী তন্দ্রাতুর। আশ্চর্য মানুষের মন! কয়েক ঘণ্টা পূর্বে পৃথিবীর সমস্ত-কিছু বিস্বাদ মনে হইতেছিল, এই নির্জন শেষরাত্রে ঘুমন্ত পৃথিবীর দিকে চাহিয়া করুণায় সমস্ত মন ভরিয়া গেল। অসহায় পৃথিবী ঘুমাইতেছে। আজন্ম রুগ্না! রোগের নানা যন্ত্রণার পর হঠাৎ যেন গভীর অবসাদে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পাণ্ডুর জ্যোৎস্না যেন পৃথিবীর বিষণ্ণ হাসি!

সামনের বাগানটায় পায়চারি করিতেছি। শেফালি ফুলগুলি ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। ঘাসে ঘাসে শিশির। কে যেন সারারাত বসিয়া কাঁদিয়াছে। কে সে? সে কি রাত্রে লুকাইয়া আসে?

নীরব চারিদিক,
　　গহন চারিধার,
এসো না এ সময়ে
　　এসো না একবার!
আকাশে তারা ছাড়া,
নাহিতো কারো সাড়া,
কেহতো জানিবে না
　　এ নিশি-অভিসার!

।। সাত ।।

বিরক্ত বোধ হইতেছিল।

"দেখুন, আপনি আমাকে না চিনলেও নলিনীবাবুকে চেনেন তো! তিনি আমার পিস্‌তুতো শালা হন। তা ছাড়া পূর্ণিয়ায় যিনি আজকাল সবজজ, তিনিও হলেন আমাদের নিকট-আত্মীয়, সম্পর্কে বেহাই বলতে পারেন। ওই যে আপনাদের মিলের ম্যানেজার সর্বেশ্বরবাবু, তিনি হলেন গিয়ে আমার জ্যাঠতুতো বোনের মামা। আপনাদের বাড়িও গেছি। তখন আপনি বোধ হয় খুবই ছেলে মানুষ। সেটা হবে গিয়ে নাইন্টিন টুয়েলভ্‌। ওই যে নাম করছিলাম ব্রহ্মাপুরের ডাক্তার, তিনি হলেন গিয়ে আমার খুড়তুতো ভায়ের আপন শালা। তা ছাড়া এ অঞ্চলে আমাদের চেনা-শোনা ঢের লোক রয়েছে, ওই কালীকিঙ্কর—ওই যে কমিশনার সাহেবের ওখানে কাজ করেন, ওঁকে তো মেসো বলেই বরাবর ডাকি। তা-ছাড়া আজকাল যিনি হরিহরপুরের দারোগা, তিনি হলেন আমার মামার শ্বশুর! আপনাদের পাড়াতেও রয়েছেন জীবনবাবু—তিনি গিয়ে—"

তাঁহাকে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"বুঝলাম। কিন্তু আপনি চান কি?"

"এই একটু দরকারে পড়ে এসেছি। খগেন ডাক্তারটা এত বেশী টাকা চায় যে আমাদের মতন গেরস্ত লোকের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। আপনার শুনতে পাই দয়াধর্ম আছে—"

"দরকারটা কি?"

"একখানা সার্টিফিকেটের। খগেন-ডাক্তার আমার পিসের বোন-পো কি না, সেই ভরসায় গিয়েছিলাম। শিক্ষা হয়ে গেল। যোল টাকা চায়—একটা সার্টিফিকেট দিতে! ডাক্তার না ডাকাত!"

আদ্যোপান্ত সব শুনিলাম। বলিলাম—"আমায় মাপ করবেন। মিথ্যে সার্টিফিকেট আমি দিই না।"

"মিথ্যে মানে? আমি যা বলছি তা কি মিথ্যে বলে মনে করছেন?"

"মিথ্যে বলে মনে করছি না। হতে পারে সত্যি! কিন্তু শোনা-কথার ওপর নির্ভর করে কোন সার্টিফিকেট আমি দিতে পারব না।"

লোকটা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া গেল। ভদ্রলোকের ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া ভুরু, কানে গোছা-গোছা চুল, নাকের ভিতর দিয়া খানিকটা চুল দেখা যাইতেছে। অনুমান করিলাম, বক্ষে ও পৃষ্ঠদেশেও রোমের অসদ্ভাব নাই। মাথায় টাক, গোঁফ-দাড়ী কামান। কিন্তু তিন-চার দিন বোধ হয় কামান হয় নাই। খোঁচা-খোঁচা হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষণপরেই তাঁহার মুখে মৃদুহাস্য খেলিয়া গেল।

"আমার এমন বিপদে যদি সাহায্য না করেন, তা হলে যাই কোথায় বলুন।"

"কি করব বলুন, আমি নাচার।"

"ফী আমি আপনাকে দেব, তবে একটু কনসেশন করতে হবে। চাকরি করে সংসার চালাতে—"

"আমাকে মাপ করবেন, দিতে পারব না।"

"বেশ, পুরো ফী-ই দেব আপনার। কত নেন আপনি?"

"টাকার জন্যে আটকাচ্ছে না। ওরকমভাবে আমি সার্টিফিকেট দিই না!"

"তবে কি বলতে চান, আমার চাকরিটা যাক!"

"তার মানে?"

"মানে আমি দরখাস্ত করেছি যে এই গ্রামে এসে আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছি। এক মাসের ছুটি চাই। তারা বলেছে অবিলম্বে একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট দাও। একমাস কামাই করেছি এখন তার সঙ্গত কারণ দেখাতে না পারলে হয়ত দূর করে দেবে। করি কি বলুন তো? মেডিকেল সার্টিফিকেট মানে আপনি আর খগেনবাবু। খগেনবাবু ছুরি শানিয়ে বসে আছেন, আপনি বিবেক শানিয়ে বসে আছেন! আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়লাম তো!"

ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া ভুরু কুঞ্চিত করিয়া ভদ্রলোক বসিয়া একদৃষ্টে আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম।

ভজুয়া আসিয়া খবর দিল, বাহিরে দুইজন লোক অপেক্ষা করিতেছে। ঝাঁকড়া-ভুরু প্রশ্ন করিলেন—"একটু বিবেচনা করে যদি দেখতেন।"

"মাপ করবেন, পারব না।"

ভদ্রলোক উঠিলেন। দ্বার পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"আপনি যেন মনে করবেন না আমি অসুখে পড়িনি। সত্যি আমার অসুস্থতার জন্যেই আমি কাজে জয়েন করতে পারিনি। কিন্তু আমি কখনো অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাই না। আমার নিজের হোমিওপ্যাথির বাক্স আছে। নিজের চিকিৎসা নিজেই করি আমি। নিজের সার্টিফিকেটও যদি লিখতে পারতাম! যাই খগেনের কাছেই। He is more amenable to reasons. He sells his services, but at an exorbitant rate—এই যা মুস্কিল।"

হঠাৎ ভদ্রলোকের আলোয়ানখানার দিকে দৃষ্টি পড়িল! ঠিক আমার আলোয়ানটারই মত।

ভদ্রলোক আমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আলোয়ানটা দেখছেন? কাল এই আলোয়ানটা কিনতে গিয়েই তো হাতের টাকা গেল ফুরিয়ে। তা নাহলে খগেনের কাছেই নিতাম সার্টিফিকেট! —বারো টাকায় ড্যাম চীপ্! কি বলেন? এর দাম অন্ততঃ পক্ষে ষাট টাকা।"

বলিলাম—"পঁচাত্তর।"

"ওঃ, তাই নাকি?"

"কোথা থেকে কিন্‌লেন আপনি?"

"আপনি চিনবেন কি? ওপারের একটি লোক। মহিন্দর তার নাম। এসে বল্লে, 'ভাই মুস্কিলে পড়েছি, এই আলোয়ানটা রেখে কিছু টাকা দে।' দেখে লোভ হল। কিনে ফেল্লাম। ঠকিনি তো?"

"না!"

আমার আলোয়ান গায়ে দিয়া ঝাঁকড়া-ভুরু চলিয়া গেল। আমি বসিয়া শীতে কাঁপিতে লাগিলাম। পুলিসে খবর দিতে প্রবৃত্তি হইল না।

মনের ভিতর কে যেন বলিতে লাগিল, পুলিসেই যখন খবর দিলে না, একটা আইন যখন ভঙ্গ করিলে, তখন সার্টিফিকেটটাও দিয়া দিলে না কেন? লোকটাও খুশী হইত, তোমারও টাকা হইত। তাছাড়া লোকটার সত্যই অসুখ করিয়াছিল তো!—না হয়, তোমাদের ঔষধ খায় নাই। ভজুয়া আসিয়া আবার খবর দিল, বাহিরে লোকেরা অপেক্ষা করিতেছে।

।। আট ।।

গেলাম বাহিরে।

প্রথমেই দেখা হইল এক কাবুলীর সঙ্গে। সে সেলাম করিয়া সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করিল যে তাহার পারার ব্যারাম হইয়াছে। চিকিৎসা করাইতে চায়। তাহাকে ব্যবস্থা দিবামাত্র সে যথারীতি ফী দিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। আসিল একজন বাঙালী।

"একটু প্রাইভেটে আপনার সঙ্গে 'টক' করব।"

"বেশ তো।"—প্রাইভেটে 'টক' করিলাম

"কি মনে হচ্ছে আপনার?"

"আমার তো মনে হয় সিফিলিস।"

"কি করে হল?"

"সে তো আপনিই ভাল বলতে পারবেন।"

ভদ্রলোক একটু কাচুমাচু হইয়া গেলেন।

"কখনও কোন ইম্‌পিওর কানেকশন হয়নি আপনার?"

জিব্ কাটিয়া তিনি বলিলেন—"আজ্ঞে না।"

তখন বলিলাম—"রক্তটা পরীক্ষা করান তাহলে। আমার দেখেতে' ওই ছাড়া আর অন্য কোন সন্দেহ হয় না।"

"আচ্ছা—গামছা-টামছার ছোঁয়াচ লেগে—কিম্বা কিছু ডিঙিয়ে—"

"হাঁ, হতে সবই পারে। ওই আকাশের সূর্যটাও এক্ষণি দপ করে নিভে যেতে পারে। আটকায় কে? সবই সম্ভব।"

"উপায়?"

"রক্ত পরীক্ষা করান। ইত্যবসরে এই ওষুধগুলো ব্যবহার করুন।"

সচ্চরিত্র বাঙালী ভদ্রলোক বিদায় লইলেন। বলিয়া গেলেন, ফী-টা পরে পাঠাইয়া দিবেন।

তারপর আসিল একজন মাড়োয়ারী। তাহার 'সিকায়েৎ' অর্থাৎ ধাতুদৌর্বল্য! বগলে করিয়া এক বাণ্ডিল প্রেসক্রিপশন্ আনিয়াছে। দিল্লীর হাকিম হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট-বড় বহু চিকিৎসকদের 'দাওয়াই' সে করিয়াছে—কিন্তু কিছুমাত্র ফল হয় নাই। আমার নামডাক শুনিয়া সে অনেক আশায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছে—বিজলিকা 'ইলহাজ' করাইবার বাসনা। শেঠজী

অনেক 'রূপেয়া' খরচ করিয়াছে এবং এখনও করিতে প্রস্তুত আছেন—যদি তাঁহার রোগটা সারিয়া যায়। দেখিলাম দুগ্ধবতী গাভী বটে—সামান্য একটি টর্চের সাহায্যে ইহাকে বেশ কিছুদিন দোহন করা চলে। কিন্তু কেমন দুর্বুদ্ধি হইল, মামুলি একটা হজমের ঔষধ লিখিয়া দিয়া লোকটাকে বিদায় করিলাম। ফী টা কিন্তু শেঠজী নগদই দিয়া গেল।

তাহার পর আসিলেন ও পাড়ার হারাণদা।

"ওহে ডাক্তার, একটা ব্যবস্থা কর মাইরি। আর তো পারা যায় না। ভয়াবহ হয়ে উঠল ক্রমে।"

"ব্যাপার কি?"

"গিন্নী আবার কাল রাত্তিরে একটি কন্যা-রত্ন প্রসব করেছেন। এই নিয়ে পাঁচটি হ'ল—চারটি ছেলে ছাড়া। একটা উপায় বাৎলাও ভাই। তা নাহলে তো গেলাম। কন্ট্রাসেপশন নাকি সব তোমাদের আজকাল আছে—তাই একটা কিছু করতে হচ্ছে এবার।"

হাসিয়া বলিলাম—"ফুল-প্রুফ কোন কন্ট্রাসেপশন আছে নাকি? আমার তো জানা নেই।"

"তার মানে—আমি কি ফুল, বলতে চাও!"

"তা নাহলে ত্রিশ টাকা মাইনেব ওপব নির্ভর করে বিয়ে করে বস!"

"তাহলে বাংলা দেশে কটা বাঙালী ছেলে বিয়ে করার উপযুক্ত আমাকে বলতো!"

"একটাও নয়—"

"তাহলে কি বলতে চাও, বাঙালীর বংশ লোপ হোক।"

"হোক্ না! ভিখারীর বংশ বৃদ্ধি না-ই বা হল হারাণদা—"

হারাণদা হাসিয়া বলিলেন—"তাই বুঝি তুমি নিজে এখনও বিয়ে করনি? রোজগার তো বেশ করছ, এবার একটা বিয়ে-থা কর। তোমার ছেলে-পিলেরা ত আর ভিখারীর বংশধর হবে না।" বুঝিলাম হারাণদার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিয়াছে।

বলিলাম—"আমরা সবাই সমান।"

হারাণদা বলিলেন—"এখন রক্তের তেজ আছে, বুঝতে পারছ না, কিন্তু কিছুকাল পরে বুঝবে—ছেলেপিলে না থাকলে সংসার মরুভূমি—"

পিয়ন চিঠি দিয়া গেল। 'শুভ বিবাহ' মার্কা লাল খাম। কে আবার বিবাহ করিতেছে! খুলিয়া দেখিলাম,—জনৈক যাদুগোপাল বসাকের জ্যেষ্ঠ পুত্র পাঁচুগোপাল বসাকের সহিত হারাধন দাসের কন্যা চঞ্চলা দাসীর শুভ পরিণয় হইবে। আমি যেন সবান্ধবে—ইত্যাদি।

কে পাঁচুগোপাল বসাক?

খামের ভিতর হইতে আর একটা কাগজ বাহির হইল। হাতে-লেখা চিঠি। তাহাতে লেখা—

"ডাক্তারবাবু, আশা করি মনে আছে। আমার যে স্ত্রীকে আপনার কাছে লইয়া গিয়াছিলাম—(সেই 'নন্দদুলাল' গান) তিনি আত্মহত্যা করিয়া মারা গিয়াছেন।

আবার বিবাহ করিতেছি। আশীর্বাদ করুন, যেন সুখী হই। যদি আসিতে পারেন, অত্যন্ত আনন্দিত হইব।—পাঁচুগোপাল।" সেই সন্তান-লালায়িতা পাগলিনী আত্মহত্যা করিয়াছে!

"যাক!" —উঠিয়া পড়িলাম।

হারাণদা বলিলেন—"উঠ্‌লে যে!"

"আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাক্‌ত, কি করতাম জানেন?"

হারাণদা বলিলেন—"কি?"

"সক্কলকে গুলি করতাম। তোপের মুখে দাঁড় করিয়ে উঠিয়ে দিতাম!"

বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেলাম। একবার মনে হইল, উক্ত চঞ্চলা দাসীর পিতা হারাধন দাসকে টেলিগ্রাম করিয়া মানা করি যেন পাঁচুগোপালের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ না দেয়। উহার গণোরিয়া আছে। কিন্তু একটু আগে যেমন পুলিসকে খবর দিতে পারি নাই। ইহাও পারিলাম না।

অথচ বিবেক লইয়া বড়াই করি!

।। নয় ।।

ক্যাঁচ করিয়া বাড়ির সামনে মোটরটা থামিল।

একি, এ যে রসুলপুরের জমিদার বাড়ির মোটর। ড্রাইভার আসিয়া সেলাম করিয়া একখানি পত্র হাতে দিল। খাম ছিঁড়িয়া দেখি—

"এবারে অসুখ খুব মর‍্যাল এবং অত্যন্ত আর্জেন্ট।

আপনি পত্রপাঠমাত্র চলিয়া আসুন। কুঞ্জলাল।"

চলিলাম। অরণ্যপ্রান্তর পার হইয়া মোটর ছুটিতেছে!

সেখানে গিয়া যাহা শুনিলাম, তাহা সংক্ষেপে এই : আমি আমার ডাক্তারিবিবেক লইয়া যাহা করিতে অসম্মত হইয়াছিলাম, একটা সামান্য দাই টাকার লোভে তাহা করিয়াছে, এবং তাহার ফলে ব্যাপার যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহা অতি সাংঘাতিক।

কুঞ্জলালবাবু বলিলেন—"আপনি বাঁচান ডাক্তারবাবু।"

ভাবিয়া দেখিলাম এখন তো আমার ডাক্তারি এটিকেটে বাধিবার কথা নয়। এখন সে রোগী। কারণ যাই হোক। বলিলাম—"বেশ, যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। এই জিনিসগুলো গাড়ি পাঠিয়ে আনিয়ে নিন।"

"এক্ষুণি"—গাড়ি ছুটিল!

রাণীজি প্রাণে রক্ষা পাইবেন, যদি আর কোন কম্‌প্লিকেশন না হয়। আমার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি ও কৌশল যেন সার্থক হইল। অথচ গোড়ার দিকটাই বা করিলাম না কেন? তাই ভাবিতেছি! সেই অসহায় শিশু ত রক্ষা পাইল না। সমাজ যাহাকে চায় না, তাহাকে বাঁচাইবে কে?

অথচ দাই না করিয়া আমি করিলে জিনিসটা এত অবৈজ্ঞানিক ভাবে করিতাম না। শিশু তো গিয়াছে, জননীও যে যায়-যায়! যাই হোক এ-যাত্রা বোধ হয় বাঁচিয়া গেল! কিন্তু যাক্ আর ভাবিব না।

সমস্ত রাস্তা কিন্তু ভাবিতে ভাবিতেই আসিলাম। কি অসহায় আমরা ডাক্তারেরা! কতকগুলা অসম্পূর্ণ জ্ঞানের বোঝা মাথায় করিয়া রোগীর হাটে তাহা ফেরি করিয়া বেড়াইতেছি। বিবেক বলিয়া যাহা মনে করি, তাহা আর কিছুই নয়, ফাঁকি! একই বিবেক নানা কথা কয়। যাহা যুক্তিযুক্ত, বিবেক তাহা করিতে চাহে না, যাহা অন্যায় বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাতে দেখি বিবেকের সায় আছে! বিবেক মানে যুক্তি-মার্জিত বুদ্ধি নয়, বিবেক, সামাজিক বুদ্ধি। এই বিবেক-বলেই লোকে এককালে সতীদাহ করিত, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন দিত; আজও সেই বিবেকই কাপালিককে নরবলিতে প্রণোদিত করে, বিধবাকে উপবাসে দেহ শীর্ণ করিতে পরামর্শ দেয়, অসুখে পড়িলে ঔষধ না খাইয়া মাদুলী লইতে প্রবুদ্ধ করে। সেই একজাতীয় বিবেকই ডাক্তারকে নির্বিচারে একটা পশু করিয়া ফেলিয়াছে। সে 'ফর্ম' মানিয়া চলিয়াছে, যুক্তির ধার ধারে না।

তাছাড়া আমরা করিতেই বা পারি কি? কতটুকু ক্ষমতা আমাদের! যাহার জন্য প্রাণপণ করিয়া খাটিলাম, ঔষধের পর ঔষধ দিলাম, রক্ত, মলমূত্র, সমস্ত পরীক্ষা করিলাম, ব্যাধি হয়তো ধরা পড়িল, হয়তো পড়িল না। ধরা পড়িল, কিন্তু তবু সারিল না। ধরা পড়িল না অথচ সারিয়া গেল!

ইহাতে কি প্রমাণ হয়? আমরা অসহায়! নিতান্ত অসহায়। অথচ রোগী মনে করে আমরা যেন তাহার প্রাণটা পকেটে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি! আমাদের টাকা, খোসামোদ—নানা প্রকারে স্তুতি করিয়া চলিয়াছে সে!

বাড়ি যখন পৌঁছিলাম, তখন প্রায় রাত্রি ন'টা। আমি নামিবামাত্র একটি স্ত্রীলোক আসিয়া প্রণাম করিল।

"কে?"

নতমুখে সে দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল—"আমি আসমানী।"

"কি চান আপনি?"

"কিছু নয়। এমনি দেখা করতে এসেছিলাম।"

"বেশ, ভেতরে আসুন।"

তাহাকে সঙ্গে লইয়া ভিতরে গেলাম। চিনিতে পারিলাম না।

"কে আপনি?"

"আমাকে চিনতে পারছেন না? এই কিছুদিন আগে আপনার কাছে এসেছিলাম। সেই যে আর এক দিন সন্ধ্যে বেলা, আমার গা-ময় ঘা ছিল। আপনি একটা টাকা দিয়ে আমাকে একটা ওষুধের প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন— সেই ওষুধ খেয়ে আমার সব সেরে গেছে। আরো খেতে হবে কি?"

আমি অভিভূত হইয়া গেলাম। নিতান্ত অবহেলা-ভরে তাহাকে যে প্রেসক্রিপশনটা লিখিয়া দিয়াছিলাম, তাহার এই ফল দেখিয়া আমার নিজেরই মুখে কথা সরিতেছিল না। এত অসামান্য রূপ তাহার ওই কদর্য রোগটার তলায় চাপা পড়িয়াছিল। আশ্চর্য!

বলিলাম—"আচ্ছা আর এক শিশি কিনে খেও। হাতে পয়সা আছে তো? কোথা থাক তুমি?"

"রংবাজারে—হ্যাঁ এবার আমি কিনে খেতে পারব।"

বুঝিলাম রূপজীবিনী সে। স্বাস্থ্য ও রূপ যখন সে ফিরিয়া পাইয়াছে, তখন তাহার পয়সার অভাব কি?

সে চলিয়া গেল। আমি বিবেককে ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এটাও কি ঠিক কাজ হইল? এমন একটা মোহিনী অগ্নি-শিখাকে সমাজে ছাড়িয়া দিয়া কি সৎকার্য করিলে! এ তো নিভিয়া গিয়াছিল প্রায়। আমিই তো আবার তাহাকে জ্বালাইয়া তুলিলাম! উচিত হইল কি?

হারাণদা আসিয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন—"আচ্ছা ডাক্তার, হরিশবাবুর সঙ্গে কি তোমার কোন ঝগড়া হয়েছে না কি?"

বলিলাম—"না। কেন বল তো?"

"তিনি তোমার নামে নানারকম সব রটিয়ে বেড়াচ্ছেন। তুমি নাকি তাঁর ছেলের অসুখের সময় গলায় পা দিয়ে তোমার প্রাপ্য আদায় করেছ। ফী পাওনি বলে সময়মত নাকি যাওনি! বেঘোরে ছেলেটা তোমার হাতে পড়ে বিনা চিকিৎসায় নাকি মারা গেছে?"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, সেদিন খগেন-ডাক্তারের ওখানে বসে তোমার খুব নিন্দে করছিলেন হরিশবাবু। তুমি নাকি দাম্ভিক—কত রকম সব বলছিলেন!"

সামান্য একটু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

হারাণদা বলিয়াই চলিলেন—"তোমার নাকি স্বভাব-চরিত্রও আজকাল খুব খারাপ হয়ে উঠেছে। ভদ্রলোকের বাড়িতে নাকি তোমাকে ডাকা বিপজ্জনক!"

"কি রকম?"

"রংবাজারের একটা মাগী নাকি তোমার বাড়িতে সন্ধ্যেবেলা আসে। হরিশবাবু স্বচক্ষে দেখেছেন! তাছাড়া তুমি নাকি কচি বয়েসের একটা ঝি রেখেছ আজকাল! তোমার না চাকর ছিল আগে একটা?"

"হ্যাঁ, ঝিটা তারই বউ। সে ছুটিতে বাড়ি গেছে। তার স্ত্রী, তার হয়ে কাজ করছে। সে নিজেই রেখে গেছে। আমি বাহাল করিনি।"

"তোমার রান্না করে কে?"

"ওই ঝি।"

"বল কি। ওর হাতে খেতে তোমার প্রবৃত্তি হয়?"

"ওর স্বামীর হাতে খেতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল, ওর হাতেই বা হবে না কেন?"

হারাণদা একটু চুপ করিয়া গেলেন।

ক্ষণপরে বলিলেন—"এটা ঠিক নয়, ডাক্তার। বলা যায় না কিছুই, দুর্বল মানুষের মন তো! বিচলিত হতে কতক্ষণ?"

"বিচলিত হয় বৈকি!"

"বল কি?"

"হ্যাঁ, এখন যেমন বিচলিত হয়েছে তোমার নাকে একটা ঘুষি মারবার জন্য! এ ইচ্ছাকে যেমন দমন করছি—তেমনি সে ইচ্ছাও দমন করি। ভয় পেয়ো না।"

হারাণদা বলিলেন—"আমার নাকে তোমার ঘুষি মারতে ইচ্ছে করছে? অপরাধ আমার!"

"কি দরকার ছিল তোমার এই সব সুসংবাদগুলি বহন করে এনে আমার এমন নির্জন অবসরটা মাটি করবার! কি অপরাধ করেছি তোমার! তোমার বাড়িতে বিনা-পয়সায় দেখি এবং তোমার সঙ্গে আত্মীয়ের মত ব্যবহার করি, এই?"

হারাণদা বলিলেন—"আহাহা—অত চট কেন! তোমাকে ভালবাসি, তাই বলছি। না হলে কি দরকার আমার!"

"আচ্ছা, এখন উঠি তাহলে"—ভিতরে চলিয়া গেলাম।

নির্জন বাড়ি। এলোমেলো বিছানা। বিছানার উপর এক গাদা বই—অগোছাল পড়িয়া আছে। মশারির খানিকটা হাওয়ায় উড়িতেছে। চায়ের বাটিটা পিরিচের উপর কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে—সকালের খাওয়া-চা এখন পর্যন্তও ধোয়া হয় নাই। ঘরে চাবি দেওয়া ছিল চাকরাণীর দোষ নাই। সামনের দেয়ালে বিবেকানন্দের ছবির উপর দেখিলাম একটা টিক্‌টিকি—লাঙ্গুল আস্ফালন করিতেছে। মহাত্মা গান্ধীর ছবির উপরে দেখি আর একটা। তাহারও লাঙ্গুলে শিহরণ। একটা বই লইয়া ক্যাম্প-চেয়ারটায় শুইয়া পড়িলাম। বইটা খুলিতেই একটা দশ টাকার নোট বাহির হইয়া পড়িল! কবে যেন রাখিয়া ভুলিয়া গিয়াছিলাম! আকাশের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। চাঁদ আর মেঘে লুকোচুরি—পুরাতন ছবি—

অথচ চির নূতন!

উতরোল নদীজল কহে থাকি থাকি
        'তরী ভাসিল না'—
ভাবিতেছি বসে বসে একান্ত একাকী,
        ভালবাসিল না।
দীর্ঘ দিবা-বিভাবরী সমস্ত অন্তর ভরি
রয়েছে তবুও তারে বাহিরে সন্ধান করি!
অন্ধকারে ধীরে ধীরে শেফালি পড়িছে ঝরি,
        সে তো আসিল না!
ভাবিতেছি বসে বসে একান্ত একাকী,
        ভালবাসিল না।
অনিমেষে আকাশের তারাগুলি চায়
        নিশীথ গগনে,
অনামা ফুলের গন্ধ ভেসে আসে হায়
        উতলা পবনে।

মনে হয়, চিত্ত মোর ফুটিয়াছে কদম্ব শাখায়,
ছুটিয়াছে মহাশূন্যে বিহঙ্গের উড়ন্ত পাখায়,
বিগলিয়া পড়িতেছে চাঁদিনীতে বিনিদ্র রাকায়
—স্বপনে স্বপনে!
অনিমেষে আকাশের তারাগুলি চায়
নিশীথ গগনে!

কোথায়? মানুষের কথার এত মূল্য? একবার কথা দিলে তাহার আর নড়চড় হইবার জো নাই! ভালবাসার মূল্য নাই। কথারই মূল্য! আশ্চর্য আমাদের সমাজ!

"ডাক্তারবাবু"—

"কে!—ভেতরে আসুন।"

একি, এ যে হরিশবাবু!

"কি খবর?"

"একবার আমাদের ওখানে যেতে হবে। আমার স্ত্রীর হঠাৎ পেটে বেদনা উঠেছে একটা। ছটফট করছে—"

হারাণদার কথা মনে পড়িল। মনে করিলাম, যাইব না।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইল, হরিশবাবুর স্ত্রী তো কোন দোষ করেন নাই। ব্যাগটা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

হরিশবাবুর ব্যবহারে মনটা ভাল ছিল না।

এমন সময় সকালবেলা ডাকাডাকি করিয়া এক ভদ্রলোক আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখি একজন চেনা উকীল। দাঁড়াইয়া চশমা মুছিতেছেন।

"কিছু মনে করবেন না, ঘুমটা ভাঙালাম।"

"না-না কিছু না। বসুন। কি খবর?"

"দুঃসংবাদ। ডাক্তারের কাছে যখন এসেছি তখন বিপদ নিশ্চয়ই কিছু। তবে একটু 'ফেভার' করতে হবে।"

বিরক্ত হইলাম।

বলিলাম—"ব্যাপারটা কি আগে শুনি।"

উকীলবাবু আবার চশমা মুছিতে শুরু করিলেন—"ফুলহাটির নন্দ মিত্তিরদের চেনেন তো? তাদেরই ফ্যামিলির। আজকাল বেচারারা বড় গরীব হয়ে পড়েছে। তার ওপর রোগও ধরেছে বিষম। চিকিৎসাও হল অনেক রকম। ডাক্তারি, কবরেজি, হোমিওপ্যাথি, হকিমি পর্যন্ত। উপস্থিত গঙ্গার ধারে চেঞ্জে আছেন। দেখে ভারি কষ্ট হয়। আপনি তার চিকিৎসার ভারটা নিন!"

রূঢ়ভাবে বলিয়া ফেলিলাম—"এসব কেসে ফেভার করতে পারব না, মাপ করবেন। আমাকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে হলে ফী লাগবে।"

"বড় গরীব কিন্তু—"

"বেশতো, আপনার যখন দয়া হয়েছে, আপনি তাঁর হয়ে ফী-টা দিয়ে দিন। আপনি তো গরীব নন। দয়া জিনিসটাও খারাপ নয়। কিন্তু আপনার মনে দয়ার সঞ্চার হল, তার জন্যে আমার আর্থিক লোকসান করাটা কি ঠিক?"

চশমা মুছিতে মুছিতে উকীলবাবু একটু বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন—"বেশতো ফী আপনার দেওয়া যাবে! কিন্তু ডাক্তারদের কি দয়াধর্ম থাকতে নেই? লোকে তো বলে আপনার দয়া-ধর্ম আছে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"আমার স্বকীয় দয়ার দরুন যা আর্থিক ক্ষতি ও মানসিক অশান্তি তা তো আমাকে ভোগ করতেই হয়। তাই যথেষ্ট আমার পক্ষে। দুনিয়ার লোকের দয়ার বোঝা যদি আমাকে বইতে হয়, তাহলে তো আমি নাচার। আমি অক্ষম, স্বীকারই করছি।"

উকীল-ভদ্রলোক খানিকক্ষণ নীরবে চশমা মুছিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন—"বেশ, তাহলে যাচ্ছেন কখন?"

"বিকেলের দিকে যাব। চারটে-পাঁচটা আন্দাজ।"

"বেশ, তাই ঠিক রইল। যাই তাহলে"—বলিয়া তিনি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে বলিলাম—"বসুন, বসুন। চা-টা খেয়ে যান। অত রাগ করছেন কেন?"

উকীলবাবু আবার বসিলেন।

বলিলাম—"দেখুন মশাই, আমার ক্রমশঃ ধারণা হচ্ছে যে দয়া-দাক্ষিণ্য করে আমরা কিছুতেই কারো উপকার করতে পারি না। অন্ততঃ এদেশে। ওদেশে কি হয় জানি না। নিন্, সিগারেট নিন্।"

উকীলবাবু বলিলেন—"দয়া-দাক্ষিণ্য করে উপকার করতে পারছেন না, মানে? বুঝলাম না।"

"তার মানে, আমি যদি বিনা পয়সায় চিকিৎসা করি তাহলে আমাকে কেউ আর ডাকবে না। কেউ ডাকেও যদি—তাহলেও আমি যা বল্‌ব তা করবে না। আমার প্রেসক্রিপশনের উপর ভক্তি কমে যাবে।"

"না-না, তা কি কখনও হয়?"

"আমি নিজে দেখেছি, তাই বলছি! এই সেদিনই তো আমাদের পাড়ার একটা লোককে দেখে হঠাৎ আমার করুণার সঞ্চার হল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে তোর?' সে বল্লে যে বিগত তিন মাস যাবৎ সে জ্বরে ভুগছে। পেটে পিলে, লিভার—আর জল। দীন, দরিদ্র অসহায় ভেবে দয়ার সঞ্চার হল। নিজের সময় খরচ করে তার রক্ত-পেচ্ছাব পরীক্ষা করলাম, দেখলাম কালাজ্বর। রীতিমত ইন্‌জেকশন না দিলে মরে যাবে। কি করি, গাঁটের পয়সা খরচ করে ওষুধ কিনে তার চিকিৎসা শুরু করলাম। ফল কি হল বলুন দেখি?"

"আশা করি সে ভাল হয়েছে।"

"না। সে দুটো ইনজেকশন নিয়ে সরে পড়েছে। খবর নিয়েছি সে এখন রামু-কবরেজের দাবাই করছে এবং তার মা নিজের খাড়ু বিক্রী করে অর্থ সরবরাহ করছে। What do you say?"

"সব ক্ষেত্রেই যে লোকে এমন অকৃতজ্ঞ হবে—তা কে বললে আপনাকে?"

"আহা, আপনি বুঝছেন না! এটা অকৃতজ্ঞতা নয়—এইই মানুষের স্বভাব। যা সুলভ, আমরা তার মূল্য বুঝি না। দুর্লভের দিকে আমাদের স্বাভাবিক টান। আপনারও, আমারও।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ আপনি যদি নিজে আজ টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে আমাকে ডাকেন এবং আমি যদি বিনা পয়সায় আপনার চিকিৎসা শুরু করি, তাহলে বড়-জোর তিনচার দিন আপনি আমার চিকিৎসায় টিকে থাকবেন। যদি আপনি ভদ্রলোক হন, আপনি আমাকে বল্‌বেন, 'অমুক ডাক্তারকে একবার কনসাল্ট করলে হত না!' অমুক ডাক্তারকে আপনি তখন টাকা দিয়ে ডেকে তৃপ্তি পাবেন। আপনার টাকা যদি বেশি থাকে, তাতেও আপনার তৃপ্তি হবে না, যতক্ষণ কলকাতা থেকে কোন হোমরাচোমরা ডাক্তার এসে আপনাকে শোষণ না করছেন। এই করবেন, যদি আপনি ভদ্রলোক হন। আর যাঁরা অভদ্র লোক—যা আমাদের দেশের অধিকাংশই—তারা তিন দিন জ্বর ছাড়তে না দেখলে চতুর্থ দিন আপনাকে না ডেকে বেশি ফী-ওলা একজন ডাক্তার ডাকবে, আপনার নিন্দে করবে এবং যেহেতু তাকে টাকা দিয়ে ডেকেছে সেই হেতু তার ওষুধ শেষ পর্যন্ত খেয়ে দেখবে। 'টাইফয়েড' অবশ্য যখন সারবার তখন আপনিই সারবে। কিম্বা সারবার না হলে সারবে না। বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা হয় না। ওটা একটা সস্তায় নাম কেনবার উপায়—আহা অমুক ডাক্তার দয়ার অবতার। কিন্তু আশ্চর্য, অসুখ একটু শক্ত হলেই লোকে 'অবতার'কে ত্যাগ করে, চামারের আশ্রয় গ্রহণ করে! এই মনুষ্য-ধর্ম!"

উকীলবাবু তখন বলিলেন, "কি জানি মশায়—"

"জানাজানি কিছু নেই, এই হল ফ্যাক্ট। আপনার এই মিত্তিরমশাই—ইনি এত চিকিৎসা যে করিয়েছেন খুব সম্ভবতঃ কাউকে রীতিমত পয়সা দেননি। তাই নানা চিকিৎসক চেখে বেড়াচ্ছেন!"

"হ্যাঁ, তা বটে। সবাই ওর উপর দয়াই করেছেন!"

"Here you are. সেই জন্যে কারো ওপর বিশ্বাস হয়নি। কারো ওষুধও উনি বোধ হয় ভাল করে খাননি।"

"আজ বিকেলে তা হলে—"

"হ্যাঁ চারটের সময় যাব।"

উকীলবাবু বিদায় লইলেন।

উঠিতে যাইব, এমন সময় ব্যাগ-হস্তে এক এজেন্টের প্রবেশ!

"নমস্কার! আজ তিন দিন থেকে আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। আমি অমুক কম্পানিকে রেপ্রেজেন্ট করছি" বলিয়া তিনি একখানি কার্ড হাতে দিলেন এবং বলিলেন, "এই সব আমাদের লিটারেচর, এই একখানা আপনার জন্য ডাইরি, আর এইগুলো সব স্যাম্পল।"

"ধন্যবাদ।"

"এই ওষুধটা আপনি 'ট্রাই' করেছেন?" বলিয়া তিনি একটা ঔষধের স্যাম্পল তুলিয়া দেখাইলেন।

"না, ওটা এখনো দিইনি কাউকে। নামই মনে থাকে না!"

ভদ্রলোক একটু হাসিয়া বলিলেন, "ওটা 'ট্রাই' করে দেখুন। থাইসিসে একেবারে 'ওয়ানডারফুল'! কলকাতায় ডক্টর অমুক, ডক্টর তমুক, এ ছাড়া তো আজকাল কিছু লেখেনই না।" বলিয়া তিনি কয়েকজন নামজাদা ডাক্তারের নামই করিলেন এবং বলিলেন, "এই দেখুন না—কত টেষ্টিমোনিয়াল দিয়েছেন"—বলিয়া এক গোছা ছাপান কাগজ আমার নাসিকাগ্রে ধরিয়া দিলেন। দেখিলাম, নামজাদা কয়েকজন ডাক্তারের সহি করা প্রশংসাপত্র রহিয়াছে বটে। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

বলিলাম, "দেখুন; ওসব ডাক্তারদের নাম বেশি করবেন না আপনারা আমাদের কাছে। তাহলে আপনাদের ওষুধের প্রতি যা-ও আমাদের একটু শ্রদ্ধা আছে—কমে যাবে। ওসব ডাক্তারদের সম্বন্ধে আমাদের সত্যিকার ধারণা কি জানেন?"

"কি?"

"ওঁরা হাতুড়ে ডাক্তার। ডাক্তারি খেতাবধারী পেটেন্ট মেডিসিনের ভেণ্ডার। ওঁরা দেশের দুঃখ বোঝেন না, রোগীর ভালমন্দ বিচার করেন না, যে ওষুধের বিজ্ঞাপন পান, সঙ্গে সঙ্গে তাই লিখে দেন। যাঁর প্রেসক্রিপশন যত দুষ্প্রাপ্য তিনি তত বড় ডাক্তার!—সুতরাং ওঁদের কথার ওপর সত্যিকার ডাক্তার যাঁরা, তাঁরা মোটেই বিশ্বাস করেন না। তাঁদের দ্বারস্থ হতে হয় রোগীর খাতিরে। দায়ে প'ড়ে। স্বেচ্ছায় নয়!"

"রোগীর খাতিরে কেন?"

"কারণ, রোগীর বিশ্বাস, কোন বড় ডাক্তার দেখলেই রোগ সেরে যাবে। দামী ওষুধ না খেলে ব্যারাম দমবে না। রোগীরা বৈজ্ঞানিক নয়—তারা সাধারণ মানুষ। মানুষের স্বভাবই হচ্ছে যা দুর্লভ, তাই পাবার চেষ্টা করা। আমরা অনর্থক স্বাভাবিক বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ করব কেন? রোগ যদি দুঃসাধ্য হয়, রোগীর যদি পয়সা এবং বিশ্বাস থাকে আমরা তাকে তার বিশ্বাস-অনুসারে চলতে বাধা না দিয়ে তাকে কোন 'বড় ডাক্তারে'র হাতে সঁপে দিয়ে আসি। মরা বাঁচা? কে কিসে মরে, কে কিসে বাঁচে, জানি না। তবে আপনি যে-সব ডাক্তারদের নাম করছেন ওদের প্রতি শ্রদ্ধা নেই। ওঁরা ব্যবসাদার, বুদ্ধিমান, ধনবান—কিন্তু বৈজ্ঞানিক নন। দরকারে পড়লে ওঁদের শরণাপন্ন হই, কিন্তু শ্রদ্ধা করতে পারি না।"

এজেন্ট-ভদ্রলোক একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, "আপনি যা বলেছেন তাই বোধ হয় ঠিক। কি করব বলুন মশাই—আমাদের চাকরি করতে হয় পেটের দায়ে। কোন ওষুধ ভাল—কোনটা মন্দ সে আপনারাই বোঝেন। তবে এটা ঠিক, এই অঞ্চলে যদি এ ওষুধটার 'সেল' না বাড়ে তাহলে হয় আমাকে আসাম অঞ্চলে বদলি করবে—না হয় দূর করে দেবে—"

চকচকে সুটের ভিতর হইতে সহসা দীন-দরিদ্র বাঙালী মূর্তি আত্মপ্রকাশ করিল!

প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না।

উপরন্তু বলিতে হইল, "আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখব।"

"-মুস্কিল কি জানেন, এসব ওষুধের কম্পোজিশন প্রভৃতি না জেনে লিখতে কেমন যেন বাধবাধ ঠেকে!"

"কলকাতায় ওঁরা ত বেশ লেখেন!"

"হ্যাঁ সে তো জানি। সেজন্য আমাদের মাঝে মাঝে অপবাদও সহ্য করতে হয় যে আমরা আপ-টু-ডেট নই। অনেক রোগী এজন্য হাতছাড়াও হয়ে যায়। আচ্ছা, রেখে যান, লিটারেচারটা পড়ে দেখব।"

এজেন্ট বিদায় লইলেন।

আসিলেন হারাণদা—তাহার স্ত্রীর জ্বর ছাড়িতেছে না।

হারাণদার সহিত আসিলেন কুমুদবাবু। তিনি হারাণদার প্রতিবেশী। সবজান্তা ভদ্রলোক। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা ডাক্তারবাবু, কুইনিনটা আর কত দিন দেবেন?"

"আরও দিন দুই চলুক।"

"আর কুইনিন দেওয়াটা কি ঠিক? ওটা শুনেছি পয়জন। শরীর গরম করে।"

ইচ্ছা করিল, ঠাস করিয়া একটা চড় মারি।

তৎপরিবর্তে হাসিয়া বলিলাম, "না, ওতে কিছু হবে না।"

তাঁহারা চলিয়া গেলে আসিলেন রামবরণ সিং। ইনি তেজস্বী পুরুষ। রাগিয়া এক জনের মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিলেন। সেই ফাটা-মাথার আমি চিকিৎসা করিয়াছিলাম। এখন মোকদ্দমা বাধিয়াছে। রামবরণ সিং আসিয়াছেন আমার কাছে তদ্বির করিতে। আমি একজন প্রধান সাক্ষী। রামবরণ সিং ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া গেলেন।

তৃণখণ্ড ভাসিয়া চলিয়াছি।

বৈকালে ফুলহাটির মিত্রবংশের বংশী মিত্রকে দেখিতে গেলাম। গেটে ঢুকিতে গিয়া দেখি, চার পাঁচটা ছাগল রহিয়াছে। হঠাৎ চোখে পড়িল, ছাদের উপরও অনেক ছাগল---আলিসা হইতে গলা বাড়াইতেছে। কি সর্বনাশ, বারান্দা যে ছাগলে পরিপূর্ণ। ব্যাপার কি? ছাগলের রাজত্ব যে!

বৈঠকখানায় বসিয়া ভিতরে খবর পাঠাইলাম! বৈঠকখানাতেও দেখিলাম ছাগলের অভাব নাই। স্বচ্ছন্দে তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এত ছাগল কেন এ বাড়িতে? আমার আগমনবার্তা শুনিয়া উকীলবাবু বাহিরে আসিলেন। উকীলবাবুটি ইহাদের নিকটআত্মীয়। বলিলেন, "চলুন ভিতরে।"

ভিতরে রোগীর ঘরে দেখি, সেখানেও ছাগল। ইহাদের কি মাথা খারাপ?

জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিলাম না।

"এত ছাগল কেন বলুন তো! চতুর্দিকেই দেখছি!"

"ওঁর বুকের ব্যারাম কিনা! কবিরাজ মহাশয় বলেছেন, বাড়িতে ও রোগীর ঘরে ছাগল রাখতে।"

"সর্বনাশ! তাই বলে এত ছাগল!"

রোগীকে পরীক্ষা করিলাম।

বৃদ্ধ জরাজীর্ণ ভদ্রলোক। মুখময় পাকা দাড়ী ও গোঁফ। ক্র-মাগত কাশিতেছেন। সর্বদা জ্বর ভোগ করিতেছেন। বুঝিতে দেরী হইল না যে যক্ষ্মাই হইয়াছে। কবিরাজ মহাশয় রোগ ঠিকই ধরিয়াছেন। সে-কথা আর রোগীর সম্মুখে উচ্চারণ করিলাম না। ছাগল-প্রসঙ্গই চালাইব মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কতদিন থেকে এ সব ছাগল পুষছেন?" হঠাৎ পাশের ঘর হইতে নারীকণ্ঠে একজন উত্তর দিল, "আমি তো বিয়ে হয়ে অবধি দেখছি এই ছাগল।" পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, পরদার অন্তরালে কেহ দাঁড়াইয়া আমাদের কথাবার্তা শুনিতেছেন।

বলিলাম, "ছাগল রাখা এ ব্যারামের পক্ষে ভালই"—পরদার অন্তরাল হইতে কোন জবাব আসিল না।

উকীলবাবু বলিলেন, "চলুন আমরা বাইরে গিয়ে বসি। আপনার দেখা হয়ে গেছে তো?"

"হ্যাঁ চলুন।"

বাহিরে গিয়া দেখি, বৈঠকখানায় যে-চেয়ারটায় আমি বসিয়াছিলাম তাহার উপর স-দাড়ী এক ছাগল দাঁড়াইয়া আছে!

বলিলাম, "ছাগল তো একটা সমস্যা দেখছি এ বাড়িতে।"

বলেন কেন? তাড়ান দেখি আপনি একটি ছাগল—বংশীবাবুর মা তাহলে আর কাউকে আস্ত রাখবেন না!"

"বংশীবাবুর মা বেঁচে আছেন না কি?"

চশমা মুছিতে মুছিতে উকীলবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ। তা আছেন। মহা মুস্কিল: কি রকম বুঝলেন?"

"বুঝলাম যা, তা বলতে ইচ্ছে করছে না।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ উনি বাঁচবেন না। থাইসিস হয়েছে।"

দ্রুততর বেগে চশমা মুছিতে মুছিতে উকীলবাবু বলিলেন, 'বলেন কি? থাইসিস তো ভারি ছোঁয়াচে রোগ—না?"

"—হ্যাঁ ছোঁয়াচে বই কি।"

"আপনি থাইসিস বলে ডিক্লেয়ার করছেন?"

"আশঙ্কা করছি। কোন জিনিস জোর করে ডিক্লেয়ার করার মত অহঙ্কার আমার নেই। মনে হচ্ছে খুব সম্ভবতঃ থাইসিসই। স্পিউটামটা পরীক্ষা করে দেখলে অনেকটা বোঝা যাবে।"

"তাই করুন তাহলে।"

"কাল তাহলে স্পিউটাম পাঠাবেন আমার কাছে। আর এক কথা। রোগীকে এসব কথা বলবেন না যেন! তাছাড়া আমার মনে হয়, কবরেজি চিকিৎসা যেমন চলছে চলুক না। আমাকে আর কেন জড়াচ্ছেন ওর মধ্যে।"

"না-না, আপনাকে কেসটা হাতে রাখতে হবে। আপনার উপরই আমাদের 'ফেথ' বেশি।"

বিনা বাক্যব্যয়ে সকালের সেই নূতন ঔষধটা প্রেসক্রিপশনে লিখিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম।

আসিবার সময় উকীলবাবু পুরা ফী-ই দিলেন।

পরদিন সকালে বংশীবাবুর স্পিউটাম পরীক্ষা করা হইল, যক্ষ্মাই হইয়াছে।

রোজই বৈকালে মৃত্যুপথযাত্রী বংশীবাবুর বাড়ি যাইতে হয়। বাঁচিবে না জানিয়াও যাইতে হয়। লম্বা-চওড়া কথাও বলিতে হয়। থাইসিস শুনিবার পর হইতে উকীলবাবুটি কিন্তু আর এ বাড়িতে পদার্পণ করেন না।

সাবধানী লোক!

প্রায় একমাস পরে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বংশীবাবুর বাড়িতে গিয়াছি।

বাড়িতে তিনটি প্রাণী। রুগ্ন বংশীবাবু, তাঁহার বৃদ্ধা মাতা এবং বংশীবাবুর স্ত্রী। উকীলবাবু আর আসেন না। ঝি-চাকর আছে। তাহারাই কাজকর্ম সব করে।

আমাকে প্রায়ই যাইতে হয়। বংশীবাবুর মাতা আমাকে পুত্র সম্বোধন করিয়াছেন এবং বংশীবাবুর স্ত্রীও আমার সামনে বাহির হইতেছেন। অল্প বয়স, বছর কুড়ি-বাইশ হইবে।

বংশীবাবুর স্ত্রীর মত অসামান্যা রূপসী সচরাচর চোখে পড়ে না। সেদিন সন্ধ্যাবেলা গিয়া দেখি, বংশীবাবুর স্ত্রী দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রসাধন করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া মাথায় কাপড় দিয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলিলেন—"আসুন, বসুন।"

বলিলাম, "মা কোথায় আপনার?"

"তিনি শিবমন্দিরে পুজো দিতে গেছেন।"

"তাহলে বংশীবাবুকে দেখি গিয়ে চলুন। কেমন আছেন আজকাল? কাল টেম্পারেচার কত উঠেছিল?"

"১০১ পর্যন্ত। আপনি কিন্তু এক্ষুণি পালাতে পারবেন না; মা বলে গেছেন যে আপনি এলে যেন তাঁর জন্য অপেক্ষা করেন। আমি চুলটা ওঘরে ততক্ষণ বেঁধে নি। তারপর ওই সব ছাগল তাড়িয়ে তাড়িয়ে ঘরে ঢোকাতে হবে। এ এক ভাল কাজ হয়েছে আমার!"

বধূ চলিয়া গেল। আমি বংশীবাবুকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, ক্রমশঃই দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। বংশীবাবু রোগ-বিষয়ক নানা প্রশ্ন করিয়া চলিয়াছেন।

আর রোগ সারিতে কতদিন লাগিবে—হার্টটা কেমন? ইত্যাকার নানারূপ প্রশ্ন।

দেওয়ালে একটা ঘড়ি টক্ টক্ টক্ করিয়া শব্দ করিতেছে।

আশে পাশে ছাগল ঘুরিতেছে।

বংশীবাবু কাশিতেছেন। আর প্রশ্ন করিতেছেন।

আমি বসিয়া মিথ্যা কথা বলিয়া চলিয়াছি!

মিনিট পনর পরে চামচিকার মত একটি শিশু কোলে করিয়া বংশীবাবুর স্ত্রী আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেন। বলিলেন, "চলুন ওঘরে আপনি বসবেন। ওরে কানাইয়া, তুই বাবুর কাছে একটু বোস।"

আমি বিস্মিত হইয়া দেখিতেছিলাম। যাহার স্বামী মর-মর তাহার প্রসাধনের এই পারিপাট্য! কপালে খয়েরের টিপটি পর্যন্ত পরিতে ভুল হয় নাই। ডুরে শাড়ীটি দিব্য কায়দা করিয়া

পরিয়াছেন। তাছাড়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে কানাইয়াকে বসাইয়া তিনি আসিলেন আমার সঙ্গে গল্প করিতে।

বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তার চেয়ে চলুন-না বংশীবাবুর ঘরে বসেই গল্প করা যাক।"

"সর্বনাশ!—মা এসে যদি দেখেন যে আমি ওঁর কাছে আছি তাহলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হবে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ! যে কবরেজ এই সব ছাগল পুষতে পরামর্শ দিয়েছে, সেই বলে গেছে যে এসব রোগে স্ত্রীর সাহচর্যও বিষবৎ! মরবার সময় স্বামীর যে একটু সেবা করবো—তা-ও দেবেন না আপনারা!" তাঁহার চোখ দুইটা যেন হিংস্র ক্ষোভে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তারপর নিজের মনেই বলিয়া ফেলিলেন,, "আমার আবার স্বামী-সেবা! মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে কি জানেন? গঙ্গায় ঝাঁপ দিই!"

"কেন?"

"কেন নয়? আমার কতদিন বিয়ে হয়েছে জানেন? মাত্র চার বছর! আবার বাবা সব জেনেশুনে ওই ঘাটের মড়ার সঙ্গে আমার বিয়ে দিলেন। সবই অদৃষ্ট। —না না দ্বিতীয় পক্ষ নয়—প্রথম পক্ষই। উনি আজীবন কৌমার্য রক্ষা করবেন ঠিক করে জীবনের পঞ্চাশটা বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর যখন রোগে ধরল তখন মায়ের অনুরোধে পড়ে বিবাহ করলেন আমাকে— বংশরক্ষার জন্য! এই দেখুন বংশধর"—বলিয়া সেই চামচিকার মত শিশুটাকে তুলিয়া ধরিলেন। ছেলেটা আচমকা ঘুম ভাঙিয়া চীৎকার জুড়িয়া দিল। আমি কি আর বলিব! চুপ করিয়া রহিলাম। মনে হইল পিঠের দিকে যেন কিসে একটা ঠেলা দিতেছে! ফিরিয়া দেখি একটা লোমশ ছাগল।

বংশীবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আমার এখন একমাত্র কাজ হয়েছে ওই দুর্গন্ধ ছাগলগুলো চরান আর এই বংশধরকে পালন করা!"

সদর দরজায় শব্দ শোনা গেল।

শুদ্ধ পট্টবস্ত্র-পরিহিতা বৃদ্ধা নারী পুত্রের কল্যাণে শিবপূজা করিয়া ফিরিতেছেন।

দুই দিন পরে।

বাড়ি ফিরিতেই ভজুয়া এক চিঠি দিল।

আলো জ্বালিয়া দেখি একি কাণ্ড! গদ্যে এক প্রেম পত্র: কোন এক কমলা তাহার প্রাণেশ্বরকে লিখিতেছে। খামটা উল্টাইয়া দেখিলাম—আমারই তো নাম লেখা। ডাক্তার না লিখিয়া 'শ্রীযুক্ত' লিখিয়াছে!

এ কি-রকম হইল? আমার চিঠি তো নয়! কার এ? পত্রখানি আদ্যোপান্ত পড়িলাম। বিশ্রী হাতের লেখা, বানান-ভুলে পরিপূর্ণ, মধ্যে মধ্যে অশ্লীল ইঙ্গিতও আছে, কিন্তু তবু চিঠিখানি

পড়িয়া ভারি ভাল লাগিল। কত সরলতা, কত আবেগ, কত আগ্রহ চিঠিখানিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সংসারের কত খুঁটিনাটি সংবাদ, কত তুচ্ছ ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া কত উদ্বেগ!

চিঠিখানি দ্বিতীয়বার পাঠ করিতেছি, এমন সময় ভজুয়া সংবাদ দিল বাহিরে এক ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন, দেখা করিতে চাহেন।

চিঠিখানি রাখিয়া বাহিরে গেলাম। অচেনা ভদ্রলোক। তিনি বলিলেন যে পাট খরিদ করিতে তিনি অদ্য এস্থানে আসিয়াছেন। তাঁহার নামে একটি চিঠি আসিবার কথা ছিল। ডাকঘরে খোঁজ করিয়াছিলেন, পিওন বলিয়াছে যে আমাদের উভয়ের নাম এক হওয়াতে—ইত্যাদি।

"হ্যাঁ চিঠি আছে আপনার। ভুল করে খুলে ফেলেছিলাম, কিছু মনে করবেন না।"

পত্র লইয়া ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন, কিন্তু আমার মনে তরঙ্গ তুলিয়া গেলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া শুইতে গেলাম। ঘুম আসিল না। সে কি সত্যই কোনদিন আসিবে না? সম্ভাবনা তো নাই। যাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই, যাহা অসম্ভব, তাহাই মানুষ চায়—তাহা লইয়াই মানুষ স্বপ্ন-রচনা করে। সেদিন সকাল-বেলা এই লইয়া কত বক্তৃতাই না করিলাম। সত্যই তো!

কত রাত্রি হইয়াছে জানি না।

জানালা দিয়া লুব্ধক নক্ষত্র দেখা যাইতেছে! কি উজ্জ্বল!

একবার যদি কলিকাতা যাই সে কি আমার সঙ্গে দেখা করিবে?

না করিবার কারণ তো নাই!

কবে তুমি দেখা দেবে—থেমে যাবে কথা মোর
নীরব হইয়া বাহু-বন্ধে,
তোমারে পাই না কাছে, তাইতো বাসনা ঘোর
কবিতায় কেঁদে মরে ছন্দে!
শরতে বা বরষায়, প্রভাতে বা সন্ধ্যায়,
হৃদয় প্লাবিয়া যায় যে অলকনন্দায়,
তারি কলকল্লোল,
ছন্দের তোলে রোল,
—সাগর চুমিতে চাহে চন্দ্রে!
সাগরের মন্ত্র কি শুনেছ কখনো প্রিয়া,
নির্জন সৈকতে একান্ত মন দিয়া?
দেখেছ কি প্রান্তরে,
পবন অশান্তরে,
উন্মাদ বনানীর গন্ধে!

নাঃ! লিখিতেও ভাল লাগে না। কথার পর কথা গাঁথা! কথায় কখনো উদ্বেলিত অন্তরের আকুলতা প্রকাশ করা যায়? এ যেন ক্ষুদ্র চামচে সমুদ্রকে ধরিয়া দেখাইবার চেষ্টা! প্রকৃতির মত

যদি ভাষা পাইতাম। প্রভাতের সুবঞ্জিত আকাশ, বরষার ঘনঘোর মেঘে বিদ্যুতের শিহরণ—ঢল-ঢল পুষ্পের পেলবতা—কথাহীন, অথচ কি ভাষাময়! কত স্পষ্ট—কত স্বচ্ছ—কত প্রাণময়!

"ডাক্তারবাবু—"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে গেলাম। দেখিলাম বংশীবাবুর চাকর কানাইয়া।

"কি রে?"

"জলদি্ চলিয়ে—বাবুকা হালৎ বড়া খারাপ—"

বংশীবাবু তো মারা গেলেন। আর এক বিপদ। বংশীবাবুর স্ত্রী—সত্য-সত্যই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছেন।

"ধর—ধর—ধর—"

পাড়ার দুইজন উৎসাহী ছোক্‌রা লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলিয়া ফেলিল। অনেক সেবা-শুশ্রূষার পর তাঁহার জ্ঞান-সঞ্চার হইলে তিনি চক্ষু খুলিয়া আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "একি আমি তাহলে মরিনি! কেন আমাকে তুললেন আপনারা? আমার জীবনে কি আছে যার জন্যে আমি বাঁচব? দরিদ্র স্বামীর চিকিৎসায় সর্বস্ব গেছে, স্বামী গেছে, বাপ-মা বেঁচে নেই! দিনকতক পরে না খেয়ে আমার ছেলেটা আমার চোখের সামনে মারা যাবে। দগ্ধে দগ্ধে মারবার জন্যে বাঁচালেন আমাকে আপনারা? কেন তুললেন বলুন —কেন তুললেন—"

বলিবার কিছু নাই। তাঁহাকে তুলিয়া এবং বাঁচাইয়া সত্যই যেন নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে হইতে লাগিল! ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিল।

।। দশ ।।

দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিছু ঘটে নাই। ডাক্তারি-জীবনের নিত্য ঘটনার তালিকা আর না-ই লিখলাম। হাতে দুইটা টাইফয়েড রোগী আছে—নিঃসহায়ের মত তাহাদের চিকিৎসা করিয়া চলিয়াছি। রোগ আপনি বাড়ে, আপনি কমে। আমি মাত্র দুইবার করিয়া তাহাদের বাড়ি গিয়া প্রত্যহ কিছু টাকা লইয়া আসি।

ও পাড়ার হারাণদার স্ত্রীর যক্ষ্মা হইয়াছে। বেচারীর বাঁচিবার জন্য কি আগ্রহ! অথচ বাঁচিবে না। তাহাকে রোজ সান্ত্বনা দিয়া আসিতে হয়—"ভাল হয়ে যাবেন বৈ কি!"

হারাণদা কন্ট্রাসেপশন করিতেছেন।

ঘোষাল-পাড়ার কালাজ্বর-রোগীটা বেশ ভাল হইয়া আসিতেছিল। হঠাৎ তাহার পেট খারাপ হইয়াছে। চিন্তায় আছি।

ম্যালেরিয়া, আমাশয়, বেরিবেরি, ফোড়া, দাদ—মানুষের ব্যাধিরও শেষ নাই, আমাদের অজ্ঞতারও শেষ নাই! অথচ মজ্জমান লোকে তৃণখণ্ড জানিয়াও তাহার দিকে হাত বাড়াইবে,

ইহা তাহার মজ্জাগত দুর্বলতা। আমরা সেই হতভাগ্য তৃণখণ্ড। ভাসিয়া চলিয়াছি—ডুবন্ত মানুষ কখন আমাদের দিকে হস্ত প্রসারণ করিবে!

রসুলপুরের রাণীজী ভাল আছেন। তিনি আমাকে "বাবা" বলিয়া সম্বোধন করেন। আমার প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা। কুঞ্জলাল আমাকে দেবতা বলিয়া মনে করে। রাণীজির জমিদারীতে আমার প্র্যাকটিস একচেটিয়া!

"ডাক্তারবাবু—"

"কে? ভেতরে আসুন।"

আসিল, রং বাজারের আসমানী! এ কি!—চেহারা এত খারাপ কেন? খুক্ খুক্ করিয়া কাশিতেছে। আসিয়া বসিয়া পড়িল।

"কি হল তোমার আবার?"

"আজ মাসখানেক থেকে জ্বরে ভুগছি। কেউ কাছে নেই যে একটা খবর পাঠিয়ে জানাই আপনাকে। তাছাড়া রোজ-রোজ যে নিয়ে যাব আপনাকে, সে পয়সাও কোথায় পাব ডাক্তারবাবু। মরতে মরতে তাই নিজেই এলাম—"

আসমানী হাঁপাইতে লাগিল।

তাহার গলা, বুক, নাড়ী যথারীতি পরীক্ষা করিলাম। জ্বর আছে।

"রক্ত উঠেছিল মুখ দিয়ে?"

"হ্যাঁ, আজ চার-পাঁচ দিন থেকে একটু একটু উঠেছে কাশির সঙ্গে। কাশতে কাশতে গলাটা চিরে গেছে বোধ হয়।"

"রাত্রে কি ঘাম হয়?"

"হ্যাঁ, বিছানা বালিশ একেবারে ভিজে যায়।"

বুঝিলাম, করাল রোগে ধরিয়াছে। যক্ষ্মা। আসমানীর জীবন-নাট্যলীলা শেষ হইবার আর বেশি দেরী নাই।

ঔষধ লিখিয়া দিলাম। সে চলিয়া যাইবার পূর্বে জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কবে আসব?"

"তোমাকে আর আসতে হবে না। আমি যখন ওদিকে যাব, দেখে আসব তোমায়। ফী দিতে হবে না। কোনখানটায় থাক তুমি?"

"রং বাজারে সেই যে শিবমন্দিরটা আছে—তারই সামনের গলিতে আমার বাসা।" বলিয়া সে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

আসিলেন হরিশবাবু। তাঁহার স্ত্রীর 'কলিক' আমার চিকিৎসায় সারিয়াছে। সুতরাং আমি ভাল লোক এবং সেই জন্যই বোধ হয় খগেন ডাক্তারের নিন্দা আমাকে প্রত্যহ শুনিতে হইত, যদি না সেদিন হঠাৎ তাহা থামাইয়া দিতাম।

বলিয়াছিলাম, "দেখুন হরিশবাবু—বসে বসে কারো নিন্দে-টিন্দে করবার স্থান এ নয়। আপনাদের ক্লাব রয়েছে—"বান্ধবসমাজ' রয়েছে কি-করতে তা হলে?"

হতবুদ্ধি হরিশবাবু বলিলেন, "নিন্দে মানে? খগেন ডাক্তারের মত অমন 'কাটথ্রোট' দুটি আছে নাকি! এ তো তার মুখের ওপর বলতে পারি আমি। আমি কারু কিছু ইয়ে করি নাকি!"

"যাই হোক, ওসব আলোচনা আমার এখানে হয়, এটা আমি পছন্দ করি না!"

"আচ্ছা বেশতো!" সেই হইতে হরিশবাবু ওকথা আর বলেন না!

হরিশবাবু আসিলেন।

হরিশবাবু পুত্রশোক ভুলিয়াছেন।

আসিয়াই বলিলেন, "আচ্ছা ডাক্তারবাবু, 'ওকাসা' জিনিসটা কেমন? কখনও ব্যবহার করেছেন?"

"না, আমার নিজের কোন অভিজ্ঞতা নেই। আপনি এ-বয়েসে ওসব উত্তেজক ওষুধ আর না-ই ব্যবহার করলেন!"

"না—না আমার জন্যে নয়।—আমার এক ফ্রেণ্ডের জন্যে।"

হরিশবাবুর রসনা যাহাই বলুক—তাঁহার মুখচোখ আসল কথা ফাঁস করিয়া দিল।—দুর্বল মানুষ! আমিও তো দুর্বল!

নয়ন মল্লিকের বাড়ি যখন পৌঁছিলাম, তখন ভোর।

নয়ন মল্লিককে মনে আছে? সেই যাঁহার বাড়িতে মহিন্দরের সঙ্গে দেখা হয়। মল্লিক মহাশয় দেখিলাম, একটি ভাঙা মোড়ার উপর বসিয়া দাঁতন করিতেছেন।

"আসুন, আসুন ডাক্তারবাবু। ওরে একটা মোড়া দে—"

বসিয়া প্রশ্ন করিলাম, "অসুখ কার?"

"অসুখ হচ্ছে গিয়ে আমার স্ত্রীর এক গ্রাম-সম্পর্কে দাদা আছেন তাঁর। তিনি এখানে আসেন প্রায় মাঝে মাঝে। এবার এসে জ্বরে পড়ে গেছেন।"

"মহিন্দর বাবু কোথা?"

"কি জানি! সে যে কখন কোন চুলোয় থাকে সেই জানে " বলিয়া খড়ম চট-চট করিতে করিতে মল্লিকমহাশয় ভিতরে গেলেন। মল্লিকমহাশয়ের তিনকুলে কেহ নাই এক পরিবার ছাড়া। শুনিয়াছি, লক্ষপতি লোক! অথচ ঘর-দ্বার পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহা বোঝা শক্ত। মহিন্দরের কথা মনে পড়িল।

মল্লিকমহাশয় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "চলুন তবে। শ্যামলালকে দেখেই নিন আগে। তারপরে চা-টা হবে এখন! কি বলেন?"

"হ্যাঁ, সেই ভাল।"

শ্যামলালকে দেখিলাম। সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান যুবক। জ্বর একটু হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা বিশেষ কিছু নয়। অর্থাৎ এমন কিছু নয় যাহার জন্য দূর হইতে পঁচিশ টাকা ফী খরচ করিয়া ডাক্তার আনা প্রয়োজন। সাধারণ ম্যালেরিয়া বলিয়াই বোধ হইল! অথচ ইহার জন্য কৃপণ মল্লিক সহসা কেন এতগুলো টাকা ব্যয় করিতেছেন বুঝিতে পারিলাম না।

ফিস-ফিস করিয়া মল্লিক-পত্নী মল্লিককে বলিলেন, "তুমি আহ্নিকটা সেরে নাও না! ডাক্তারবাবু শ্যামদাদাকে ততক্ষণ দেখুন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—এই যাই"—ত্রস্ত মল্লিক আহ্নিক করিতে গেলেন।

ব্যাপারটা ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইতে লাগিল। দেখিলাম, শ্যামদাদার জন্য মল্লিক-পত্নীর উৎকণ্ঠার অবধি নাই। নানারূপ প্রশ্নে তিনি আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। বেদানা কতখানি করিয়া রোজ খাওয়ান প্রয়োজন—শহর হইতে দামী পেটেন্ট ঔষধ কি কি আনাইতে হইবে—শরীরটা সারিয়া গেলে ইহাঁর পক্ষে বায়ু পরিবর্তন করিবার উপযোগী স্থান মসুরি, শিলং, না পুরী, এই সব নানা কথা। শেষটা, তিনি প্রসঙ্গতঃ বলিলেন, "উনি টাকা না দেন, আমি দেব। আপনি যা যা ব্যবস্থা করা দরকার মনে করেন, সমস্ত খোলাখুলি একটা কাগজে লিখে দিয়ে যান। হ্যাঁ, আর শ্যামদাদাকে ভাল করে বলে যান তো আপনি, যে দুধ খাওয়াটা কত উপকারী এই রোগা-শরীরে; কিছুতে উনি দুধ খাবেন না!"

দুধ খাইতে বলিতে আর আপত্তি কি? বলিলাম।

দেখিলাম, অর্ধনিমীলিত নয়নে, স্মিতমুখে, শ্যামলাল নিরানব্বুই ডিগ্রী জ্বর লইয়া শুইয়া আছেন—মল্লিকপত্নী আন্তরিকতার সহিত তাঁহার মাথায় হাওয়া করিয়া চলিয়াছেন। ভ্রাতৃবৎসলা মল্লিক-পত্নী!

আহ্নিক সারিয়া মল্লিকমহাশয় দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন। "চলুন ডাক্তারবাবু, বাইরে গিয়ে বসা যাক!"

বাহিরে বসিয়া চা পান করিতেছি। মল্লিকমশায়ের বাড়ির চা যে কি বস্তু তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত! চায়ের সহিত তাহার যাহা সাধারণ মিল আছে তাহা এই-যে তাহা গরম।

মল্লিকমহাশয়ও দেখিলাম প্রাতকালিক জলযোগ করিতেছেন। কিন্তু ছোলাভিজা ও মিছরি। মিছরি-খাওয়ার পদ্ধতিটি একটু বিচিত্র। না চিবাইয়া—চাটিয়া চাটিয়া খাইতেছেন।

আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "জিভকে ঠকাচ্ছি ডাক্তারবাবু!" তাহার পর মল্লিক কাজের কথা পাড়িলেন—"কেমন দেখলেন?"

"ভয়ের কোন কারণ নেই, ভাল হয়ে যাবেন।"

"আচ্ছা, বেদানাটা কি খুব বেশী খাওয়া ভাল, জ্বরের ওপর?"

"দিতে পারেন। আপত্তি কি?"

বৃদ্ধ চুপ করিয়া গেলেন।

আবার বলিলেন, "এবারে কিন্তু ফী-টা কিছু মাপ করতে হবে আমায়। দরিদ্র মানুষ আমি। আপনাদের যথাযোগ্য দর্শনী কি দিতে পারি!"

বলিলাম, "তাহলে আমাদের চলে কি করে বলুন!"

"আচ্ছা, কিছু কম করে দিন।"

এই পৃথিবীতে ভাগ্যিস শ্যামলাল-দাদারা আছেন—তবু আমরা করিয়া খাইতেছি।

ফী কিছু কমই লইতে হইল।

মল্লিকমহাশয় না-ছোড়!

।। এগারো ।।

আরও পনর দিন কাটিয়াছে।

দিনের বেলা কাজ ছিল না। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলাম! সে যেন আসিয়াছে। বাগানে নির্জন জ্যোৎস্নায় যেন তাহার সহিত মুখোমুখি বসিয়া আছি।

"সেই কতকাল আগে—তোমার একটা কবিতায় চিঠি পেয়েছিলাম। আর ত চিঠি লেখো না। ভুলে গেলে আমায়?"

"না, ভুলিনি—তবে—"

"তবে কি?"

"ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়—"

"তুমি এর আগে এমন করে ভালবেসেছ কাউকে?"

"হ্যাঁ--নার্স ব্রাউনকে!"

"আর?"

"অত মনে নেই। তোমাকে পেয়ে সব্বাইকে ভুলে গেছি।"

"আর কবিতা লেখো না আজকাল?"

"বল তো মুখে-মুখে বানাই একটা—"

"বানাও তো।"

স্বপ্নের ঘোরে কবিতা রচনা করিতে লাগিলাম। বেশ মনে আছে, সে আমার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া আছে। আমি স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া বলিয়া চলিয়াছি—

ভুল্‌ব কবে কাহার কথা কি-ভাবে.
নিজেই আমি জানি না তার খবর;
কোন্ শিখাটি মন যে কবে নিভাবে,
কখন খোঁড়া হবে যে কার কবর -
কেমন করে বলব বল সখী,
নিজের কাছে নিজেই আমি ঠকি,
তোমার চোখে অশ্রু-ধারা,—ওকি?
হঠাৎ দেখি বিপদ হল জবর।
কাল কি হবে ভাবছ কেন সে-সব?
আজকে তুমি মনিব, আমি নফর!

সখী, আমার সারা হৃদয় জুড়ে যে
আজকে তুমি পেতেছ এই আসন,

জানো সেথায় কত আগুন পুড়েছে?
কত দিনের কত স্মৃতি-নাশন?
আগুন কত জ্বলে এবং নেভে,
সে-সব কথা লাভ কি বল ভেবে,
অশ্রু মুছে এক্ষুনি তো দেবে
চুম্বনেতে উচ্ছ্বসিত ভাষণ!
ইনশিওরেন্স প্রেমের চলে কি?
মান্‌বে কি তা প্রীমিয়ামের শাসন?

প্রথম মনে লাগল যবে আগুন,
লকলকিয়ে রক্ত-রাঙা ঝলকে,
ভুলেই গেছি আশ্বিন কি ফাগুন,
হিসাব তার এখন রাখে বল কে!
হঠাৎ জ্বলে' হঠাৎ পুনরায়,
দীপ্ত শিখা লুপ্ত হয়ে যায়,
তাহার পানে মন কি ফিরে চায়,
তোমায় দেখে গেলাম ভুলে পলকে;
ভুলেই গেছি আশ্বিন কি ফাগুন।
হিসাব রাখে এখন তার বল কে?

পুড়েই যদি যেতাম হ'ত ভালো কি?
এক প্রেমের আলো এবং ধূমেতে?
মদির হ'ত তাহলে এই আলো কি,
সুধায় ভরা তোমার মধু-চুমেতে!
ক্ষণিক তরে সকল ভুলে থাকা,
অধরখানি অধর 'পরে রাখা,
সরমভরে সোহাগটিরে আঁকা,
স্বপন দেখে জড়িয়ে ধরা ঘুমেতে!
পুড়েই যদি যেতাম হ'ত ভালো কি?
এক প্রেমের জ্বালা এবং ধূমেতে!

পুষ্পে নানা,—ওগো আমার ললিতে,
একটি পূজা করছি চিরকালই তো,
একই মন্ত্রে একই রকম বলিতে,

প্রতিমাটাই বদল হয় খালি তো!
একটি সুরে বাজল বাঁশী নানা,
সত্যি সখী নাইকো তব জানা?
একই আগুন ফিরছে দিয়া হানা
বারে বারেই নানা প্রদীপ জ্বালি' তো!
পুষ্পে নানা, ওগো আমার ললিতে,
একটি পূজা করছি চিরকালই তো!

আজকে সখী, আকাশ ভরা জ্যোছনা,
হৃদয় মোর চল্‌ছে দ্রুত, গোন তো—
কাঁদছ কেন? সত্যি কথা বোঝ না?
বুকের 'পরে কান পাতিয়া শোন তো!
চক্‌মকিয়ে দুলছে দুটি দুল,
মন্দ বায়ে কাঁপছে দুটি চুল,
বলেছি যা ভুল সে-সব ভুল,
উতল প্রাণ তোমার পায়ে প্রণত!
কাঁদছ কেন? ঠাট্টা তুমি বোঝ না!
বুকের 'পরে কান পাতিয়া শোন তো!

"ডাক্তারবাবু—"

ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। 'খক্ খক্ খক্' বাহিরে কে কাশিতেছে। উঠিয়া কপাট খুলিলাম। দেখি, আসমানী দাঁড়াইয়া আছে। হাতে তাহার একটি পুঁটুলি।

"একি আসমানী, হঠাৎ!"

"আপনি দু-তিন দিন যাননি, তাই একবার দেখাতে এলাম।"

"কেমন আছ? ভেতরে এসো।"

"ভাল নেই, ডাক্তারবাবু। এবার আমার অসুখটা সারছে না কেন বলুন তো?"

"সেরে যাবে। দু'চার দিন সময় নেবে।"

"কমছেও না তো, বরং যেন বাড়ছে, কাল সারা-রাত্তির আমার ঘুম হয়নি। সারারাত বসে কেশেছি।"

আবার সে খক্ খক্ করিয়া কাশিতে শুরু করিল।

একটু পরে সে আবার সসঙ্কোচে বলিল, "কিছু যদি মনে না করেন ডাক্তারবাবু, একটা কথা বলব?"

"কি কথা বল।"

"আমার গয়না পত্তর যা অল্পস্বল্প আছে, আপনার কাছে এনেছি। আপনি যদি দয়া করে নিয়ে—"

"তোমার গয়নাপত্তর? আমি নেব কেন?"

"কতদিন আর বিনা-পয়সায় আপনাকে কষ্ট দেব! সেবার এক শিশি ওষুধ খেয়েই আমার সেরে গেল—এবারে সারছে না কিছুতে! আপনি বরং ভাল করে দেখে একটা ওষুধের ব্যবস্থা করুন।"

তাহার মনস্তত্ত্ব বুঝিলাম। সে ভাবিতেছে যে বুঝি বিনা-পয়সায় দেখি বলিয়া তাহার ভাল চিকিৎসা করিতেছি না। ভিক্ষার চাউল আকাঁড়া তো হইবেই।

তাহাকে বলিলাম, "তোমাকে ভাল ওষুধই তো দিচ্ছি। সেবারেও তো তুমি আমাকে কিছু দাওনি। খারাপ ওষুধ দিয়েছিলাম কি?"

একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া আসমানী কহিল, "না। আমি তা ভাবি না। পাঁচির মা বলছিল কিনা যে বদ্যির কড়ি না দিলে ব্যামো সারে না! তাই আমি—"

"আচ্ছা, আগে ভাল হয়ে ওঠ, পরে দিও এখন। দেবার সময় ঢের পাবে।"

"তাহলে একটা ভাল-দেখে ওষুধ লিখে দিন। যাতে চট করে সেরে যাই। কত ভুগব!"

চোখের কোণে তাহার অশ্রু জমিয়া উঠিল। তাহার সে শ্রী নাই, গালের হাড় দুটো উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, বিবর্ণ রক্তহীন মুখে জীবনের ভাতি নিভিয়া আসিতেছে, কোটরগত চক্ষু-দুটিতে অস্বাভাবিক জ্যোতি। বসিয়া কাশিতেছে, খক্ খক্ খক্। তাহাকে বলিলাম, "আচ্ছা এবারে একটা দামী ওষুধ লিখে দিলাম, খাও, ভাল হয়ে যাবে।"

অনেক আশ্বাসবাণী দিয়া তাহাকে বাড়ি পাঠাইলাম।

তৃণখণ্ডের আশ্বাস-বাণী!

।। বারো ।।

কতক্ষণ এইভাবে বসিয়াছিলাম জানিলাম না।—যতই দিন যাইতেছে, ততই নিজের অসারতা নিজের কাছে ধরা পড়িতেছে। ছদ্ম-বেশ খুলিয়া খসিয়া যাইতেছে।

জ্ঞানের অহংকার!—কতটুকু আমাদের জ্ঞান? এ যেন সামান্য শঙ্কিত দীপশিখা জ্বালিয়া বিশ্ব-ব্যাপী অন্ধকারকে আলোকিত করিবার চেষ্টা! অনেকের প্রদীপে আবার শিখাও নাই, শুধুই প্রদীপটা লইয়া ঘুরিতেছি।

বিবেক? প্রচলিত আইনের মত! সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার শৃঙ্খল। ন্যায় অন্যায়-সম্পর্ক-বিরহিত। দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতার তোয়াক্কা রাখে না। সময় ও সুবিধা-অনুযায়ী নিজের বেশ-পরিবর্তন করে।

আমার বাহিরে যাইবার 'সুট', ও আমার বিবেক—প্রায় একই বস্তু। 'সুট' বহিরাবরণ মাত্র—আমার জীবন্ত ত্বকের সহিত তাহার আকাশ-পাতাল তফাৎ।

হঠাৎ বাহিরে কলরব উঠিল!

কে যেন কাহাকে মারিয়াছে! মহা হৈ-চৈ!

ক্ষণ-পরে হরিশবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া উপস্থিত! মাথা দিয়া রক্ত গড়াইতেছে!—কামিজটা ভিজিয়া গিয়াছে!

—ব্যাপার কি?

ভজুয়া তাহার মাথায় লাঠি মারিয়াছে!

ভজুয়া? আমার চাকর ভজুয়া?

হঠাৎ! খোঁজ করিয়া যাহা জানিলাম তাহা এই—

হরিশবাবু নাকি ভজুয়ার স্ত্রীর প্রতি—বাকীটা আর না-ই লিখিলাম! ভজুয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে—"মার ডালেঙ্গে"—অনেক কষ্টে তাহাকে থামাইয়া রাখিয়াছি!

সমাপ্তি কিন্তু এখানেই নয়।

হরিশবাবু আমারই দেওয়া ব্যাণ্ডেজ মাথায় বাঁধিয়া বন্ধুমহলে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন যে আমারি প্ররোচনায় ভজুয়া তাঁহাকে মারিতে সাহস করিয়াছে। তা না হইলে ভজুয়ার সাধ্য কি—ইত্যাদি।

লোকটাকে চাবকাইয়া দিব?

কিন্তু আমি অশিক্ষিত ভজুয়া নই। সে যাহা পারে, আমি তাহা পারি না। সুতরাং বোধ হয় মনে মনে হরিশবাবুকে ক্ষমাই করিলাম! এবং প্রত্যহ তাঁহার ফাটা-মাথা জোড়া দিবার চেষ্টায় স্মিতমুখে ড্রেস করিয়া চলিতে লাগিলাম।

"কে?"

হরিশবাবুর চাকর—রামধন।

হরিশবাবুর স্ত্রী, আমার জন্য একটু তরকারী পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ভদ্রমহিলা সত্যই আমাকে স্নেহ করেন।

অথচ স্বামী-স্ত্রী!

একখানা চিঠি হাতে করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি।

নয়নবাবুর পত্র, নয়ন মল্লিকের। তিনি লিখিয়াছেন, মহিন্দর জেলে গিয়াছে এবং তৃতীয় পক্ষও পক্ষবিস্তার করিয়া উড়িয়া গিয়াছেন। শ্যামলাল সহকারী।

নয়নবাবু লিখিতেছেন, "সংসারে আর সুখ নাই। মনে বৈরাগ্য আসিয়াছে। আমার নগদ দেড়লক্ষ টাকা এবং বিষয়-সম্পত্তি কোন সৎকার্যে দান করিয়া যাইতে চাই। আমি একটা উইল করিতে চাই যে আমার পত্নী—যেখানেই থাকুন—আমার সম্পত্তি হইতে ভরণ-পোষণ খরচা পাইবেন। তাঁহাকে আমি ভালবাসিতাম। একটা ভুল করিয়াছেন সত্য। কিন্তু উদরের দায়ে যেন

সে ভুলটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে বাধ্য না হন—এই আমার অভিপ্রায়। আমিও তো ভুল করিয়াছিলাম—এই বয়সে একটা কচি মেয়েকে বিবাহ করিয়া! ভুলের কিছু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাইতে চাই। আমার বাকী টাকা ও সম্পত্তি স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের জন্য খরচ হউক—ইহাই আমার ইচ্ছা। আপনাকে ট্রাষ্টী করিতে চাই। আপনার মতামত ও পরামর্শ জানাইবেন।"

ভাবিতেছি, মানুষের কতটুকু চিনি আমরা?

আচ্ছা তাহাকেও কি আমি ঠিক চিনিয়াছি? সেই কি তাই, যাহা আমি ভাবি! সে তো আমার এত ভালবাসা অগ্রাহ্য করিয়া অপরের বাগদত্তা হইয়া বসিয়া আছে!— আমাকে একছত্র চিঠিও লেখা দরকার মনে করে না! তবে কি—কিন্তু হায় মানুষের মন! সমস্ত যুক্তিকে তুচ্ছ করিয়া সে স্বপ্ন দেখিতেছে—

মনে হয় যেন বাতায়নে আছ দাঁড়ায়ে একা,
　　ঘুমায় সকলে, শয়ন-ঘরের নিভেছে বাতি,
আঁধারের বুকে চাহিছ আমার বারেক দেখা,
　　আকাশ জুড়িয়া থম্ থম্ করে নিশীথ রাতি!
মেঘের মতন উদাসী হৃদয় ভাসিয়া চলে,
মূর্ত কামনা জ্বলিছে নিভিছে তারার দলে,
সহসা নয়ন ভরিয়া উঠিছে নয়নজলে,
　　ক্ষণিকের তরে চাহিছ আমারে স্বপন-সাথী।
এ কি মিছে কথা? হয়তো বা তাই—বলো না তবু,
　　ভেঙো না সে ভুল—ভেঙো না, এ ভুল অনেক দামী,
হোক মিছে কথা, কল্পনা হোক, ভেঙো না কভু,
　　ভেঙো না ভেঙো না, ভুলেরই স্বপন দেখিব আমি!
যদি কভু মোরে ধরা নাহি দাও সর্বনাশী,
তোমারি স্মরণে বাজুক আমার বিরহ-বাঁশী,
ছলনা তোমার, চাহনি তোমার, তোমার হাসি
　　নানা সুরে মোরে আকুল করুক দিবস-যামী।

।। তেরো ।।

ডাক্তারের দিন কাটিতেছে।

রোগী বাঁচে, রোগী মরে, টাকা রোজগার করি। বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়। আবার যেদিন 'কল' কম থাকে, সেদিনও শান্তি পাই না। কি চাই? বুঝিতে পারি না। এই জন্যই বোধহয় মানুষ

শেষবয়সে ভগবানকে চায়—অর্থাৎ এমন একটা জিনিসকে আকাঙ্ক্ষা করে যাহা পাওয়া যায় না। সুতরাং মোহ ফুরায় না! শিশুর চাঁদ পাওয়ার মত। আমি মাঝে মাঝে চোখ বুজিয়া চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু যদি কোন ছবি মানসপটে ভাসিয়া ওঠে সে ছবি ভগবানের নয়, তার। অবর্ণনীয় সে চাহনি!

জীবনের গোনা-দিনগুলি একে একে ফুরাইয়া যাইতেছে। এ জীবনে আর তাহাকে পাইলাম কই! পাই নাই? আমার সমস্ত প্রাণমন পরিপূর্ণ করিয়া এই তো সে অহরহ বসিয়া আছে, তবু তাহাকে পাই নাই! তাহাকে বাহিরে চাই, বাহিরে পাইয়া হারাইতে চাই! আশ্চর্য!

—সত্যই তো জীবনের দিনগুলি একে একে চলিয়া যাইতেছে, একদিন মরিয়া যাইব; —তাহাকে পরজন্মে পাইব কি? পরজন্ম কি আছে? বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়, আছে। বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়, এই জীবনের পরপারে আবার আমাদের মিলন হইবে। সেখানে সে কাহারও বাগ্‌দত্তা নয়। সেখানে সে কেবল আমার, আমারই।

"ডাক্তারবাবু।"

"কে? ভেতরে আসুন।"

আসিলেন ঝাঁকড়া-ভুরু।

"ডাক্তারবাবু, আপনি কি আসমানীর চিকিৎসা করছিলেন?"

"হ্যাঁ, কেন বলুন তো?"

"চলুন একবার দয়া করে', তার অবস্থা বড় খারাপ।"

"আসমানীকে আপনি চিনলেন কি করে?"

"সে আমার মেয়ে।"

"আপনার মেয়ে?"

"হ্যাঁ, আমারই মেয়ে, বাড়ি থেকে এক ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়ে যায়। সেই থেকে খুঁজছি তাকে। সেই জন্যই অসুখের মিথ্যে সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়ে ছুটি নিচ্ছি। আমার অসুখ-টসুখ সব মিছে কথা। আমার আসল অসুখ এই।"

ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন!

"কার মুখে শুনেছিলাম, হতভাগী এইখানেই কোথায় লুকিয়ে আছে। তাই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। আজ তাকে পেয়েছি, কিন্তু এ কি অবস্থায় পেলাম! কি হয়েছে তার? তার মুখে শুনলাম, আপনি তার ওপর অনেক দয়া করেছেন। বলুন না' ডাক্তারবাবু, কি হয়েছে তার! বাঁচবে তো?"

বলিতে পারিলাম না।

কেবল বলিলাম, "চলুন গিয়ে দেখি।"

আসমানী মরিয়াছে।

সবাই মরিবে। আমিও মরিব, হয় তো কালই। তাহার কথা কেবলি ভাবিতেছি। আসমানীর

নয়, তাহার। আশ্চর্য মানুষের মন! এ সময় সে আসিয়া মন জুড়িয়া বসিল! এই তো জীবন, আজ আছে কাল নাই!

আঁধার—আঁধার খালি, চতুর্দিকে গাঢ় অন্ধকার,
তীব্র বেগে বহিতেছে বায়ু,
খুঁজি কারে হাতে লয়ে ক্ষুদ্র দীপ ত্রস্ত শিখা তার,
অতি অল্প অনিশ্চিত আয়ু!
অচিরাৎ বায়ুবেগে নিভে যাবে ক্ষুদ্র দীপ-শিখা,
অকস্মাৎ অন্ধকারে চূর্ণ হবে স্বপ্ন-অট্টালিকা,
স্রোতমুখে তৃণ-খণ্ড! বক্ষে তার প্রেম-মরীচিকা,
দুঃখে সুখে কাঁপে তার স্নায়ু!
আঁধারে পড়িতে চাহে অদৃষ্টের রহস্য-লিপিকা
লয়ে অল্প অনিশ্চিত আয়ু!



বৈতরণী-তীরে

মড়া কথা কহিতেছে।

আশেপাশে মড়া ঘুরিতেছে।

বই হাতে করিয়া একা জাগিয়া আছি।....কিছুতেই ঘুমাইতে পারি না। আমি নিজে ডাক্তার, ঘুমের কোন ঔষধ বাকি রাখি নাই। নরম বিছানা শক্ত বিছানা নানা রকম করিয়া দেখিয়াছি, কিছুতেই কিছু হয় না। ঘর অন্ধকার করিয়া রাখিলেও যাহা ফল, আলো জ্বালিয়া রাখিলেও তাহাই। আলোর রঙ বদলাইয়াও দেখিয়াছি, পয়সা খরচ হয় মাত্র, ঘুম হয় না। চোখ বুজিয়া কতদিন এক হইতে এক হাজার পর্যন্ত গণনা কবিয়াছি, কল্পনা করিয়াছি, পাহাড় বাহিয়া মেষের পাল নামিতেছে—এক, দুই, তিন, চার....দশ....বিশ....শত....সহস্র। ঘুম আসে না। কিছুতেই ঘুমাইতে পারি না।

অন্ধকার দুর্যোগের রাত্রে বই হাতে করিয়া জাগিয়া আছি। আশেপাশে মড়া ঘুরিতেছে। ইহাদের এককালে আমি চিনিতাম, প্রত্যেককে আমি চিরিয়াছি। সরকারী চাকুরির দৈনন্দিন কর্তব্য, রোজ মড়া চিরিতে হয়। অনেক চিরিয়াছি। তাহাদেরই কয়েকজন আজ আমাব চতুর্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, কথা কহিতেছে। সকলেই নিজেব কাহিনী শুনাইতে ব্যগ্র।

"তুমি তো জান, আমি আফিং খেয়ে মরেছিলাম। আমার পেট চিরে সে খবব তুমি বার করেছিলে—ছুরি দিয়ে চিরে। উঃ, কি ধারালো তোমাদের ছুরিগুলো—কি চকচকে! কিন্তু একটা খবর তুমি পাও নি ডাক্তারবাবু। আফিং খাওয়ার আগেই আমি মরেছিলাম। সে খবর আমার পেটে ছিল না—মনে ছিল। মনকে তো আর ছুরি দিয়ে চেরা যায় না। যতই ধারালো হোক না কেন তোমাদের ছুরি!"

একটি উদ্ভিন্নযৌবনা ষোড়শী সুন্দরী। মুখখানি এখনও কোমল। অমন সুন্দর ধপধপে গায়ের রঙ অহিফেনের বিষে নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। মনে হইতেছে, যেন একটি অর্ধবিকশিত নীলপদ্ম। একটু থামিয়া মেয়েটি আবার বলিতে লাগিল—"হ্যাঁ, আমি আগেই মরেছিলাম। মৃত্যু কত রকম হয় জান? তোমবা তো মরণ নিয়ে দিনরাত কারবার কর? আত্মা অমর বলে জান তো? সেটা মিছে কথা। আত্মাও মরে। তোমাদের চাবপাশে কত যে জীবন্ত শব রোজ ঘুরে বেড়ায়, তা যদি টের পেতে! কেউ হয়তো তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, কেউ হয়তো পিতা, কেউ স্ত্রী! অনেকের আত্মা মরে যায়, তোম'' বুঝতে পার না। তাদের মৃত আত্মাব দুর্গন্ধ তাদের কথায় ব্যবহারে চিন্তায় সকলকে অতিষ্ঠ করে তোলে, তবু তোমরা বুঝতে পার না যে, তারা মড়া। তবু তাদের তোমরা পুড়িয়ে ফেল না। আমারও আত্মা মরে গিয়েছিল।"

বলিয়া একটু হাসিয়া মেয়েটি বলিল—"তুমি ভাবছ, প্রেমের গল্প শুরু হল এবার। প্রেমের নয়—মৃত্যুর। সে প্রণয়ী নয়, যম। কিন্তু কি মনোহর সে! তার দোষও ছিল না তত।

আমিই তাকে ফাঁদ পেতে ধরেছিলাম। নিজের মৃত্যুকে নিজে ডেকে এনেছিলাম। সাপুড়ে যেমন সাপকে নিয়ে খেলা করে, আমিও ঠিক তাকে তেমনিই খেলিয়েছি। আমার বাঁশীর তানে মুগ্ধ হয়ে সেই চিক্কণ চিত্রিত বিষধর কত খেলাই না খেলেছে ফণা বিস্তার করে! নিজের কৃতিত্বে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যেতাম। কিন্তু একদিন সে দংশন করলে—করাল সে দংশন। মারা গেলাম।" বলিয়া সে চুপ করিল।

আমার টেবিল-ল্যাম্পটাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ছোট বড় নানা রঙের পোকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ একটা বড় রঙিন ফড়িং আসিয়া ডানা ঝটপট করিয়া বাতিটার কাচের উপর আছড়াইয়া পড়িল। দুইজনে নীরবে সেইদিকে চাহিয়া রহিলাম।

আবার সে ধীরে ধীরে বলিল—"আমার সে মৃত্যুর খবর তুমি পাও নি ডাক্তারবাবু। সে শোচনীয় মৃত্যু। জননী হয়ে সন্তানহত্যা করেছিলাম। হেসো না। আমি একা হত্যা করি নি। সমাজ শিশুটার পা ধরেছিল, শাস্ত্র হাত ধরেছিল, আমি তার টুঁটি চেপে ধরেছিলাম। রুদ্ধ আর্তনাদ করে সে মরে গেল। আর সেই সঙ্গে আমিও মরে গেলাম। আমার আত্মা, আমার ইহলোক, পরলোক সমস্ত একসঙ্গে মরে গেল—শোচনীয় সে মৃত্যু। সমাজ কিন্তু এখনও মরে নি, শাস্ত্র এখনও বেঁচে আছে! আমার এ মৃত্যুর খবব তুমি জানতে?"

"না।"

"আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে তোমাব?"

"আমি কিছু বিশ্বাস করি না।"

"বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা?"

"না।"

মেয়েটি উৎসুক নয়নে আমার দিকে চাহিয়া আছে। দৃষ্টি হইতে একটা অব্যক্ত বেদনা ঝরিয়া পড়িতেছে। মিনতি করিয়া সে আবার বলিল—"আমি মিছে কথা বলি নি ডাক্তারবাবু। বেঁচে থাকতে অনেক মিছে কথা বলেছিলাম, এখন যা বলছি সব সত্যি। আফিং খেয়ে মরেছে আমার দেহটা, আমি মরেছি তার পূর্বে। আমার সে শব-জীবন বয়ে বেড়াতে পারলাম না। আফিং খেয়েছিলাম বাঁচবার আশায়। আমি আবার বাঁচতে চাই—সর্বান্তঃকরণ দিয়ে বাঁচতে চাই—বিশ্বাস কর—"

তাহাকে থামাইয়া দিয়া একটি যুবক আগাইয়া আসিল। তাহার মাথার খুলিটা ফাটিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছে। একটা ফাটল দিয়া খানিকটা মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মুখময় খোঁচা-খোঁচা গোঁফ-দাঁড়ি—যেন কয়েক দিন কামানো হয় নাই।

যুবকটি বলিতে লাগিল—"দেখ, পৃথিবীর মানুষেব কাছে দুঃখের কথা জানানো বৃথা। তা কি আজও বোঝ নি? এরা যতক্ষণ বেঁচে আছে, ততক্ষণ স্বার্থের কথা ছাড়া কিছু বোঝে না—বুঝতে পারে না। ওরা এক রকম সোনাই চেনে, স্বার্থের কষ্টিপাথরে যার দাগ পড়ে। পৃথিবীর বাকি সব জিনিস ওদের কাছে বাজে।"

লোকটি আগাইয়া আসিয়া আমার টেবিল-ল্যাম্পটার কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া পোকাগুলা দেখিতে লাগিল। বিচিত্রবর্ণ ফড়িংটার দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া সে হাসিয়া

বলিল—"যখন বেঁচে ছিলাম, এদের নিয়ে কবিতা লিখেছি। কত রকম উপমাই যে দিয়েছিলাম! নারী যেন আলোকের শিখা, পুরুষ যেন পতঙ্গ। পতঙ্গ আলোকশিখার মোহে তাতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ভারি মুখরোচক সব উপমা!" লোকটি আবার খানিকক্ষণ সেই আলোক-লুব্ধ পতঙ্গটির দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পরে সেই মেয়েটির দিকে চাহিয়া বলিল—"পৃথিবীর মানুষ স্বার্থের কথা ছাড়া কিছু বোঝে না। নিঃস্বার্থভাবে তারা যা করে, তার মধ্যেও স্বার্থ আছে—আত্মতৃপ্তি। আমি ছিলাম কবি। কারও কোন অনিষ্ট করি নি। নিজের মনে নিজের কোণে থাকতাম। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে খুব কমই আমার সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু সবাই আমাকে এমন ভুল বুঝতে শুরু করলে যে সরে পড়তে বাধ্য হলাম। আমার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলে ঠিক করেছিল, আমি পাগল। ছন্দের পর ছন্দ গেঁথে যার বন্দনা করলাম, সে সুদ্ধ আমাকে ভুল বুঝলে, সে সুদ্ধ আমাকে—" বলিয়া ছোকরা হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাসিতে হাসিতেই বলিতে লাগিল—"এখন শুনেছি, সে নাকি অনুতাপ করে। শুনেছি, আমার মৃত্যুর পর সেও নাকি মরেছে। কোথা গেছে খুঁজে পাই না। এখানে যাদের দেখি, সবাই অচেনা। যদি দেখতে পাও তাকে, ডেকে দিও তো আমার কাছে।"

মেয়েটি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি তাকে ভালবাসতেন?" কবি কোন উত্তর দিল না। তাহার সমস্ত মুখখানা সহসা রক্তবর্ণ হইয়া আবার কেমন ফ্যাকাশে হইয়া গেল। মাথার ফাটলটা দিয়া আরও খানিকটা মস্তিষ্ক গলগল করিয়া বাহির হইয়া আসিল। কোন কথা সে বলিল না।

মেয়েটি বলিল—"উত্তর দিচ্ছেন না যে?"

"ও কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না। 'ভালবাসতাম' এই কথাটা এত সস্তা, এত বেশি রকম খেলো হয়ে গেছে যে, ওটা ব্যবহার করতে আমার লজ্জা হয়। মনে হয় তাকে অপমান করা হবে। মনে আছে, একবার একটা কবিতায় লিখেছিলাম—

আমার মনের রঙিন কথাটি
মনের ভিতরে আছে,
তাহারে মুরতি দিবে বলি মোরে
কবিতা আসিয়া যাচে।
এত রঙ তাব আছে কি ভাষায়?
ভয় হয় মোর খালি,
কলমের মুখে লিখিতে গিয়া সে
লাগাইয়া দিবে কালি।"

মেয়েটি আবার প্রশ্ন করিল—"কেমন দেখতে সে?"

"দেখতে? কালো রঙ। একপিঠ চুল। বড় বড় চোখ। মুখে তার হাসি লেগেই থাকত। ঠোঁটে যখন হাসি থাকত না, চোখ দুটি হাসত। আশ্চর্য তার হাসি! আমি যেদিন রাত্রে রিভল্‌ভার দিয়ে মাথার খুলিটা উড়িয়ে দিলাম, শুনেছি, ঠিক তার পরদিনই সেও পুড়ে

মরেছে—গায়ে কেরোসিন তেল লাগিয়ে। কেন সে মরতে গেল? তার অমন স্বামী, অমন সংসার। তার যদি দেখা পাও—এ কি, কোথা গেলে?" সন্তান হত্যাকারিণী নিঃশব্দে কখন মিলাইয়া গিয়াছিল, কবি জানিতেও পারে নাই। সে তখন আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—"দেখুন, তাকে যদি কখনও দেখতে পান, আমার কথা বলবেন। বলবেন, আমি তাকে খুঁজছি। বলবেন, সেদিন রাত্রে তো কিছুই বলা হয় নি, দেখা পেলে এখন বলব। সে আমাকে ভুল বুঝেছিল—তার ভুলটা ভেঙে দিতে চাই।"

যুবক বাহিরে চলিয়া গেল।

নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি!

আশেপাশে কাছে দূরে শবেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

হঠাৎ কে যেন কথা কহিয়া উঠিল।

দেখিলাম, বিচিত্রবর্ণ সেই প্রজাপতিটি বলিতেছে—

"হে মনুষ্যনির্মিত বর্তিকা, তোমাকে দেখিয়া আমার করুণা হইতেছে। হে আলোকশিখা, হে বন্দিনী, তোমার দুর্দশা দেখিয়া অনুকম্পায় আমার সমস্ত অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। মানবের হস্তে ক্ষুদ্র ক্রীড়নক তুমি, বিধাতার অভিপ্রেত এই বিপুল অন্ধকারকে বিদূরিত করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরিতেছ। অন্ধকারকে তুমি আলোকিত করিতে পার না—শুধু তাহার স্নিগ্ধতাটুকু নষ্ট করিয়াছ। তোমার এই অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্ব যে কতদূর হাস্যকর, তাহা তুমি নিজেও বুঝিতে পার না। তোমাকে দেখিয়া আমার দয়া হইতেছে।"

কম্পিত আলোকশিখা তাহাকে সভয়ে প্রশ্ন করিল—"কে তুমি?"

"আমি? আমি আলোকের উপাসক। সুদূর আকাশচারী প্রদীপ্ত সূর্য আমার উপাস্য দেবতা। আমার এই বহুবর্ণ-বিচিত্রিত পক্ষ দুইটিতে ভর করিয়া প্রতিদিন তাঁহারই উদ্দেশ্যে আকাশযাত্রা করি। কিন্তু বেশি দূর যাইতে পারি না, দুর্বল পক্ষ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। পৃথিবীর টানে আবার মাটিতে নামিয়া আসি। দিবাকর অস্তাচলগামী হয়—অন্ধকার আসিয়া পৃথিবী ছাইয়া ফেলে! অন্ধকারের নিবিড়তায় আমি সেই মহাজ্যোতিষ্মান সূর্যেরই ধ্যান করিতেছিলাম! তুমি আমার তপোভঙ্গ করিয়াছ। তোমাকে আমি অভিশাপ দিতাম, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আমার করুণা হইতেছে। হে নকল জ্যোতিষ্ক, হে ছদ্মবেশী অহঙ্কার, হে কালিমাবিতরণকারী কেরোসিন-শিখা, দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তুমি নির্বাপিত হও।"

আলোকশিখা কাঁপিতে লাগিল।

"আইন বিশ্বাস কর?"

একটি ছিপেছিপে পাতলা যুবক আসিয়া আমাকে প্রশ্ন করিল। খড়েগর মত তাহার নাকটা। শীর্ণ মুখের কোটরগত চক্ষু দুইটিতে অস্বাভাবিক দীপ্তি। জ্যোতি নয়—জ্বালা। মাথার সম্মুখ দিকটা কেশবিরল। বাকি চুলগুলি দীর্ঘ—অবিন্যস্ত। কানের কাছের দুই গোছা চুল ললাট ও কপোলের খানিকটা অংশ ঢাকিয়া দিয়াছে। মনে হইতেছে, যেন দুই টুকরা অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। শীর্ণ সূচালো চিবুকের উপর দুই-চারিগাছা রোম উদগ্র হইয়া রহিয়াছে। ঠোঁট দুইটি কাঁপিতেছে।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আবার প্রশ্ন করিল—"আইন বিশ্বাস কর? আইন? যার জন্যে এত আদালত, এত জজ, এত কেতাব, এত উকিল—এত সব? যে আইনকে সাহায্য করবার জন্যে তুমি দিবারাত্রি ছুরি হাতে করে বসে আছ? বিশ্বাস কর সেই আইনে?" তাহার চোখ দুইটি জ্বলিয়া উঠিল—চাহিয়া দেখিলাম, যেন দুইটি জ্বলন্ত অঙ্গার। তাহার নাসারন্ধ্র হইতে উষ্ণ বাষ্প বাহির হইতেছে। মুখখানা সে আমার আরও কাছে লইয়া আসিয়া একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার তপ্ত নিশ্বাস যেন আমার মুখে লাগিতে লাগিল। কম্পিত অধর দুইটি সহসা ফাঁক হইয়া গেল—"বিশ্বাস কর আইনে?"

বলিলাম—"করি বইকি। আইনে বিশ্বাস না করলে বাঁচব কি করে?"

লোকটির অধর দুইটিতে এক ঝলক বিদ্যুতের মত তীক্ষ্ণধার হাসি খেলিয়া গেল। জ্বলন্ত চক্ষু দুইটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া সে বলিতে লাগিল—"ও, ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি যে এখনও বেঁচে আছ। তুমি তো করবেই। সমাজের জীবন্ত মানুষ তুমি। তুমি তো বিশ্বাস করবেই আইনে—তুমি তো বিশ্বাস করবেই—তুমি তো বিশ্বাস করবেই।"

সে হঠাৎ চুপ করিয়া গেল।

তাহার পর আবার আপন মনেই বলিতে শুরু করিল—"যতক্ষণ ভাঁড়ার-ঘর আছে, ততক্ষণ ইঁদুর ধরবার জন্যে কল তো পাততেই হবে। কচাকচ সেই কলে রোজ ইঁদুর পড়বেই। ইঁদুরের বিচার করবার অবসর জীবন্ত মানুষের থাকতে পারে না। 'স্ট্রাগ্‌ল্ ফর এক্‌জিস্‌টেন্স্'—সুন্দর কথাটা বার করেছ তোমরা। ওই এক মন্ত্র আউড়ে লক্ষ কোটি বলি হচ্ছে। আইন তোমরা তো বিশ্বাস করবেই। আমিও যখন বেঁচে ছিলাম, অনেক মামলা করেছি। প্রগাঢ় ভক্তি ছিল আইনের ওপর। অনেক উকিলের অনেক পকেট আমার টাকায় ভর্তি হয়েছে। সে কি সোজা ভক্তি? বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সবাই বলছে—'পারবে না, হেরে যাবে, ছেড়ে দাও।' আমি ছাড়ি নি। আইন-আদালতের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি তখন আমার। ভক্তির পুরস্কারও পেয়ে গেলাম। দেশসুদ্ধ লোকের সামনে সেদিন আইনত প্রমাণ হয়ে গেল, আমার স্ত্রী সতী আর নির্মল একজন সচ্চরিত্র যুবক। 'অনারেব্‌লি অ্যাকুইটেড'। আইন! এখন আর আইনে বিশ্বাস করি না, টাকায় বিশ্বাস করি। নির্মল ছোকরার অনেক টাকা ছিল।"

লোকটি সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমি একা বসিয়া রহিলাম। যে বইটি পড়িতেছিলাম, তাহাই আবার তুলিয়া পড়িতে শুরু করিলাম। ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডের গল্প। একটি বিদেশী যুবককে একটি ল্যাপ্-যুবতী পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে। যুবকটি বলিতেছে—

"মেয়েটি আমার আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কি সুন্দর তার চেহারা আর কি অপূর্ব তার বেশ! বল্‌গা হরিণের চামড়া দিয়ে তৈরী তার অঙ্গচ্ছদ, মাথায় লাল উলের টুপি। কোমরে চওড়া বেল্ট। বেল্টে হলুদ আর নীল সুতোর কাজ করা, বেল্টের গায়ে খাঁটি রুপোর বড় বড় ডুমো ডুমো বোতাম—কোনটা চৌকোনা, কোনটা গোল। বেল্টে ঝুলছে একখানা ছোরা, তামাকের একটা থলি আর জল খাবার একটা মগ। গাছপালা কাটবার জন্যে একটা ছোট কুড়ুলও গোঁজা রয়েছে দেখলাম। তার পায়ের গোছ নরম ও সাদা বল্‌গা

হরিণের চামড়া দিয়ে ঢাকা—লেগিং বলে তাকে। পরনে হরিণের চামড়ার ব্রিচেস। গোছের লেগিং ব্রিচেসের সঙ্গে বেশ শক্ত করে আঁটা। পায়েও হরিণের চামড়ার জুতো—নীল সুতো দিয়ে সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত। পিঠে তার বোচকা। বোচকাটি বার্চগাছের ছাল দিয়ে তৈরি, আর তাতে আছে নানাবিধ প্রয়োজনীয় জিনিস। আমার কাঁধেও একটা বোচকা ছিল; কিন্তু ও বোচকাটা ডবল ভারী।

বড় বড় ঢালু পাহাড়ের ওপর দিয়ে সে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। নিঃশব্দ তার গতি। সামনে গাছের গুঁড়ি বা ছোট পাহাড়ী নদী পড়লে অনায়াসে লাফিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। সামনে হয়তো একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড—খুব উঁচু! পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি হরিণীর নৈপুণ্যে তার ওপর লাফিয়ে উঠে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, পথ কোন্ দিকে! পাহাড় থেকে নেমে দেখলাম, একটা বেশ বড় স্রোতস্বিনী। বেশ চওড়া—লাফিয়ে পার হওয়া যাবে না। ভাবছি, কি করে পার হব। দেখি, মেয়েটি নিঃশঙ্কচিত্তে জলে নেমে পড়েছে। আমিও তার অনুসরণ করলাম। সেই তুহিনশীতল বরফ-গলা-ঠাণ্ডা জলে বিনা দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম—"

"ওটা কি পড়ছ?"

দেখিলাম, সেই আইন-পাগল লোকটি আবার আসিয়াছে। তাহার জ্বলন্ত চোখ দুইটা আমার মুখের উপর রাখিয়া সে বলিল—"ওসব গল্পের বই রাখ। আমাব কথা শোন এখন। তখন কতদূর বলেছিলাম?"

"নির্মল অনারেব্‌লি অ্যাকুইটেড হয়ে গেল।"

"হ্যাঁ, অনারেব্‌লি অ্যাকুইটেড। খবরের কাগজে সে কি আন্দোলন! আমার একবার ইচ্ছে হয়েছিল—কি ইচ্ছে হয়েছিল বল তো?" বলিয়া আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর আমার মনের কথাটা যেন পড়িয়া লইয়া তীব্র ব্যঙ্গহাস্যে বলিযা উঠিল—"না না, আপীল করতে নয়, খুন করতে। হাতে কিন্তু একটি পয়সা ছিল না। খুন করব কি করে? বন্দুক না হলেও অন্তত পক্ষে একটা ছোরা চাই তো। হাতে এমন একটি পয়সা ছিল না যে, ছোরা কিনি। অস্ত্রের মধ্যে ঘরে ছিল একটা ভোঁতা জাঁতি আর তার চেয়েও ভোঁতা একটি বঁটি। আইনের মত তীক্ষ্ণ অস্ত্রও যার কাছে ব্যাহত হয়ে ফিরে এল, তাকে খুন করতে হলে খুব শানিত হাতিয়ার দরকার। অর্থাৎ খুন করতে গেলেও পয়সা চাই। নিতান্ত নিঃস্ব যে, সে কাউকে খুন করতে পারে না; বিশেষত সে যদি আমার মত দুর্বল হয়!"

হাসিতে লাগিল। বিশ্রী সে হাসি। মনে হইতে লাগিল, যেন চিতার আগুন দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে।

একটু পরে সে আবার বলিল—"ভেবে দেখলাম, দুর্বলের মৃত্যু ছাড়া পথ নেই। মৃত্যুই তার একমাত্র বন্ধু, একমাত্র পথ। কিন্তু একটি কথা আমার বিশ্বাস কর—মরতে আমার বড় কষ্ট হয়েছে। মরবার ইচ্ছে ছিল না। আমি অপেক্ষা করেছিলাম—হ্যাঁ, তার জন্যে অনেক দিন অপেক্ষা করেছিলাম। সে অসতী জেনেও তাকে আমি ভালবাসতাম। এখন মনে হচ্ছে,

হয়তো অসতী বলেই বেশি ভাল লাগত তাকে। তা ছাড়া ভালবাসা ভাল-মন্দ সতী-অসতী বিচার করে না। ভেবেছিলাম—আশা করেছিলাম, সে ফিরে আসবে। কিন্তু এল না......"

চুপ করিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার শুরু করিল—"নির্মলের প্রকাণ্ড চকচকে মোটরখানা চড়ে সে আনন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমার ভাঙা কুঁড়েতে সে এল না।

তখন মৃত্যুরই শরণ নিলাম।

দেখলাম, উঠানের কল্‌কেগাছটায় অনেক ফল ধরেছে—অজস্র। যত্ন করে গাছটা ছেলেবেলায় পুঁতেছিলাম, সে আমাকে স্নেহভরে ডাক দিলে। আকুল আগ্রহে ছুটে গিয়ে তার ফলগুলো কড়মড় করে চিবিয়ে খেলাম। মৃত্যু হল বটে, কিন্তু বড় কষ্ট পেয়েছিলাম। সায়ানাইড খেলে শুনেছি কোন কষ্ট হয় না—"

"বাজে কথা।"

আব একজন আগাইয়া আসিল।

"আমি সায়ানাইড খেয়ে মরেছিলাম। ভয়ঙ্কব কষ্ট! এই ডাক্তারবাবুকে জিগ্যেস কর, কত কষ্ট! কিন্তু কষ্ট পেয়েছি বলেই সুখী, আরও কষ্ট পেলে আর একটু তৃপ্তি পেতাম। প্রায়শ্চিত্তটা পুরো হয়ে যেত। ভাবছ, প্রায়শ্চিত্তের জন্যে আমি এত ব্যগ্র কেন?—এ কি, কোথা গেল!'

কল্‌কে ফুলের বিচি খাইয়া যাহার মৃত্যু হইয়াছিল, সে তখন অন্তর্ধান করিযাছে।

চাহিয়া দেখিলাম, আগন্তুক একটি অল্পবয়স্ক যুবক। বয়স বড়জোর উনিশ কি কুড়ি। নিটোল স্বাস্থ্য, উন্নত প্রশস্ত ললাট, বিস্তৃত বক্ষ, সর্বাঙ্গের মাংসপেশীগুলি সুপুষ্ট ও সুন্দর। সুবিন্যস্ত চুল। সুন্দব ভাসা ভাসা দুইটি চোখ। দাঁতগুলি পরিষ্কার ঝকঝকে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ যুবাটিকে দেখিলেই মন স্নেহসিক্ত হইয়া উঠে। আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—"গল্পটা শুনতে চান কি? গল্প নয়, সত্য কাহিনী। সময় আছে আপনার? আপনি ডাক্তার মানুষ। আপনার সময়ের দাম আছে তো। সংক্ষেপে বলি।"

বলিয়া ছেলেটি একটু হাসিল। পরিষ্কার সুন্দর দাঁতগুলি থাকাতে হাসিটি তাহার সুন্দর।

"দেখুন, কলেজে পড়তাম। স্বপ্নের মত সেসব কথা মনে পড়ছে এখন। সে যেন একটা স্বপ্ন-জগতে বাস করতাম। প্রথম যেদিন বুঝতে পারলাম যে, আমাদের চিরপরিচিত জল দুটো গ্যাসের সম্মিলনে সৃষ্ট হয়েছে, সেদিন আমি অবাক হয়ে গেলাম। বিস্ময় ক্রমে বেড়েই চলল। সামান্য নুনের মধ্যে কে জানত অমন একটা দারুণ গ্যাস আছে—ক্লোরিন!"

খানিকক্ষণ সে চুপ করিয়া রহিল। তাহার সে তন্ময় আত্মমগ্ন রূপ দেখিয়া মনে হইল, সে যেন কিসের ধ্যান করিতেছে। চক্ষু দুইটি চাহিয়া আছে, অথচ কিছুই দেখিতেছে না।

"ভোল্টা, গ্যাল্‌ভানি, ল্যাভয়শেয়ার এদের জীবনী পড়লাম। দেখলাম, কি অদ্ভুত এদের সাধনা! সত্য আবিষ্কার করবার জন্যে কি তপস্যা! আমারও সাধ হল, আমিও ওদের মত হব। কি আকুলতা নিয়েই যে সে দিনগুলো কেটেছে! হঠাৎ একদিন সব উল্টে-পাল্টে গেল। আমাদের সংসারে—আমার জীবনে—একটা আঁধি ঝড় এল। দাদাকে পুলিসে নিয়ে গেল।"

আবার চুপ করিল!

"বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল। অপরাধ—রাজদ্রোহ! সঙ্গে সঙ্গে আমিও ভোল্টা, গ্যাল্‌ভানি, ল্যাভয়শেয়ার সকলের ফাঁসি দিয়ে দিলাম। মনে হল ওরা আমার কেউ নয়, সব শত্রু। দাদা রাজদ্রোহী ছিলেন কিনা জানি না, আমি কিন্তু হলাম—অগ্নিমন্ত্রের সাধক।"

বলিয়া সে একটু মৃদু হাসিল।

"আমার মত ভীরু ভাবপ্রবণ লোকের এ কাজে হাত দেওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু মায়ের অবিশ্রান্ত কান্না, বউদিদির বিধবা-বেশ, আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছিল। তখন বিচার করবার অবসর ছিল না, আমি এ কাজের উপযুক্ত কি না। তখন ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমি ভাবের বাষ্পে স্ফীত একটা রবারের রঙিন বেলুন মাত্র। আমার গায়ে আলপিনের খোচাটিও সইবে না। কিন্তু তখন বিচার করে কে? সামান্য ফানুস যখন আবেগভরে হঠাৎ আকাশে উড়ে গিয়ে নিজেকে নক্ষত্রদের সগোত্র বলে মনে করতে চায়, তখন সে বাধা মানবে কেন? আমিও মানলাম না। বোমার দলে ভিড়ে গেলাম। অগ্নিমন্ত্র! সুন্দর কথাটা! অগ্নিও যে না ছিল তা নয়।"

বলিয়া সে আবার একটু হাসিল।

"ও রকম অগ্নি আমি দেখি নি। দূর থেকে মনে হয় স্বপ্ন, কাছে গেলে মনে হয় শিখা। দূর থেকে কাছে টানে—কাছে গেলে দূর করে দেয়। হেঁয়ালি ভেঙেই বলি—প্রেমে পড়লাম। আমাদেরই দলের একটি মেয়ে। 'আনন্দমঠ' পড়েছেন? মেয়ে জুটেই সব মাটি হয়ে গেল। আমাদেরও তাই হল। আমাদেরও কাজ হল, তার মনস্তুষ্টি করা। সবাই মিলে তার চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ালাম। সেই হল আমাদের আরাধ্য দেবতা—দেশ নয়। সেই হল লক্ষ্য—দেশ উপলক্ষ মাত্র।"

আলোটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গুঞ্জনধ্বনি শুনিতে পাইলাম।

প্রজাপতি আলোকশিখাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে—"তোমার জ্যোতি আছে, শিখা আছে, উত্তাপ আছে স্বীকার করি। কিন্তু কত ক্ষুদ্র তুমি—কত হীন তুমি। সামান্য একটা কাচের কারাগারে বন্দী হইয়া আছ! তুমি কি অগ্নি? তুমি কি সেই অনলের সগোত্র, যাহার দ্যুতি সূর্যে নক্ষত্রে বিদ্যুতে ইন্দ্রধনুতে নিত্য প্রতিভাত? দাবানলে, বাড়বানলে যাহার প্রকাশ? তাই যদি হয়, তাহা হইলে ধিক্ শত ধিক্ তোমাকে! দেবতা তুমি, সামান্য মানবের হস্তে বন্দী হইয়া সামান্য ভৃত্যের ন্যায় জীবন-যাপন করিতেছ!"

"স্বদেশ উদ্ধারের নেশা ছুটে গেল"—যুবকটি বলিতে লাগিল—"নতুন নেশায় বিভোর হয়ে গেলাম। অদ্ভুত সে উন্মাদনা! ভোল্টা, গ্যাল্‌ভানি ল্যাভয়শেয়ার, শোকাতুরা মা, সদ্য-বিধবা বউদিদি, দেশের কাজ—সব ভেসে গেল। শুধু সে আর আমি। সে দেবী, আমি তার পূজারী। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম—নিজের চোখে দেখলাম, সে বরদান করেছে আমাকে নয় আর একজনকে। নিজের চোখে দেখলাম, সে আর একজনের—আমার নয়। সেই আর একজন কে জানেন? আমারই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। স্ফীত রবারের বেলুনটায় এবার আলপিনের খোঁচা লাগল। নিমেষের মধ্যে চুপসে গেলাম। অ্যাপ্রুভার হয়ে তাকে ধরিয়ে দিলাম। বন্ধু? হ্যাঁ, বন্ধু ছিল বইকি—অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অমন বন্ধু জীবনে পাইনি,

পাবও না। তথাপি ধরিয়ে দিলাম তাকে। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ ঈর্ষার শরশয্যায় শুয়ে ছটফট করছিল। ধরিয়ে না দিয়ে পারলাম না। কাগজে আপনারা পড়েছেন নিশ্চয়। কাগজে যা বেরিয়েছে, তা ভুল। তাকে ধরিয়ে দেবার আসল কারণ এই। তার ফাঁসি হয়ে গেল। আমি ছাড়া পেয়ে গেলাম। সেই মেয়েটি? সে ধরাই পড়েনি।

দেবীপূজায় সাধারণতঃ পশু বলিদান দেওয়া হয়। আমি দেবীপূজায় আমার বন্ধুর মত অত বড় একজন মহামানবকে বলিদান দিলাম—আমার বিবেককে বলিদান দিলাম—আমার যা কিছু প্রিয় ছিল, সব ত্যাগ করলাম। দেবী কিন্তু প্রসন্ন হল না। দেবী কি করলে, বলুন দেখি?"

বলিয়া ছেলেটি আমার দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"না না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আত্মহত্যা সে করেনি—সন্ন্যাসিনীও হয়ে যায় নি। সে বিয়ে করেছে একজন বিলেত-ফেরত আই. সি. এস.কে। তার জর্জেট শাড়ির এখন নিত্য নূতন রঙ। মোটর ছাড়া সে রাস্তায় বেরোয় না। নানা রঙের নানা আকারের ছোট কুকুর তার কোলে কোলে ফিরছে। হাতে অদ্ভুত রকম কাজ-করা ভ্যানিটি ব্যাগ। সঞ্চারিণী অগ্নিশিখার মত এখনও সে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

যুবক চুপ করিল। দেখিলাম, তাহার ভাসা ভাসা বড় চক্ষু দুইটিতে অশ্রু টলটল করিতেছে।

"আমাকে কিন্তু সে ভোলে নি! তার সুপারিশের জোরেই তার আই. সি. এস. স্বামী আমাকে একটা চাকরি করে দেবেন বলে ভরসা দিয়েছিলেন। আমাকে মাঝে মাঝে টি-পার্টিতে নেমন্তন্নও করতেন। কিন্তু পারলাম না। সায়ানাইড সংগ্রহ করতে হল। কষ্ট হয়েছিল বই কি? কিন্তু ওঁর মুখে শুনলাম, কল্‌কে ফুলের বিচি আরও কষ্টকর। আগে জানলে তাই খেতাম। আমার শাস্তি হওয়ার দরকার আছে। লোকে ফাঁসির পর কোথায় যায় জানেন?"

"জাহান্নামে।"

চমকাইয়া উঠিলাম।

দেখিলাম, কুচকুচে কালো দীর্ঘাকৃতি একটা লোক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এত কালো লোক খুব কম দেখা যায়। মাথার চুল কোথায় শুরু হইয়াছে বোঝা যায় না—এত কালো। প্রকাণ্ড তাহার মাথাটা। ভাঁটার মত বড় বড় চোখ দুইটা অদ্ভুত রকম সাদা। ঠোঁটে ধবল কুষ্ঠ। গলদেশে ভীষণ একটা কাটা ঘা দগদগ করিতেছে।

লোকটা সেই স্বদেশী যুবকটির দিকে ফিরিয়া আবার চিৎকার করিয়া উঠিল—"জাহান্নামে গিয়ে খোঁজ কর। ও-রকম ফাঁসির আসামীরা সেইখানে যায়। তুমিও সেইখানে—জাহান্নামে যাও—সব্বাই তোমরা জাহান্নামে যাও।"

তার স্বর উত্তরোত্তর চড়িতে লাগিল।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্ষতটা ভরিয়া রক্তের বুদ্বুদ ফেনাইয়া উঠিল। স্বদেশী যুবকটি কখন অন্তর্হিত হইয়াছিল বুঝিতে পারি নাই।

তখন সেই কৃষ্ণমূর্তি আমার দিকে আরও খানিকটা আগাইয়া আসিয়া তাহার গলাটা

বাড়াইয়া দিল—"দেখ তো ডাক্তার, সেলাই-টেলাই করে এটাকে কোনোক্রমে জোড়া লাগানো যায় কি না! বড় দুঃখে বড় জোরের সঙ্গে ক্ষুরটা চালিয়েছিলাম। ভাল ক্ষুর ছিল। বেশ দাম দিয়ে কিনেছিলাম। বেইমানি করে নি। মরে এখন আপসোস হচ্ছে।..... আমার অতগুলো ছেলেমেয়ে না খেতে পেয়ে মরে যাবে যে। তিনমাসের বাড়িভাড়া বাকী ছিল—বাড়িওলা নিশ্চয়ই তাদের পথে বার করে দিয়েছে। আমার গলাটা জুড়ে দাও ডাক্তার—আমি ফিরে যাই আবার।"

বলিয়া সে তাহার গলাটা বাড়াইয়া রহিল।

"দাও না জুড়ে গলাটা।"

কি বলিব, চুপ করিয়া আছি।

"দেবে না জুড়ে?"

"ও আর জোড়া যাবে না।"

"তাই নাকি? টং টং করে নগদ ফীস গুনে দিলেও যাবে না? তোমরা তো টাকা পেলে সব পার।"

লোকটা হাসিতে লাগিল।

আবার তাহার গলার ক্ষতে রক্ত ফেনাইয়া উঠিল।

সমস্ত মুখে তিক্ত বিদ্রূপের হাসি।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

"রাগ করলে ডাক্তারবাবু? রাগ করো না। বড় দুঃখে বলেছি কথাটা। দুনিযায় কেউ আমার প্রতি সুবিচার করে নি—কেউ না। জীবনে যতটুকু সুবিধে পেয়েছি, টাকা দিয়ে কিনতে হয়েছে। বেটাছেলে হয়ে জন্মেছিলাম বলেই বোধ হয় মা ছেলেবেলায় বিনা পয়সায় দুধ খেতে দিত—ভবিষ্যৎলাভের আশায়। মেয়ে হয়ে জন্মালে অশেষ দুর্গতি হত। আমার একটা বোন ছিল, আমারই মত কুৎসিত। মা তো সেটাকে দু-চক্ষে দেখতে পারত না। মাই-দুধ হয়তো তাকে দিয়েছিল—মাই টনটন করত বলে, গাই-দুধ কখনও তাকে খেতে দেখি নি। বাবা মা উভয়ে এ বিষয়ে একমত ছিলেন—'মেয়েমানুষে আবার দুধ খাবে কি?' এর চেয়ে রাজপুতরা ঢের বেশি সদাশয় ছিল—মেয়ে হলে আঁতুড়ঘরেই মুখে নুন দিয়ে মেরে ফেলত। আফ্রিকায় শুনেছি কচি কচি মেয়েকে বঁড়শিতে গেঁথে ওরা কুমীর ধরে। মেয়ের চেয়ে কুমীর দামী জিনিস। একটা কুমীর ধরতে পারলে অনেক টাকা হয়। বাপ-মাই যখন টাকার অনুপাতে ছেলেমেয়েদের প্রতি কম বেশি ভালবাসা দেখান, তখন তোমরা টাকা না পেলে—"

আমি বলিলাম—"ভুলে যাচ্ছ কেন তুমি মরে গেছ? মরা মানুষ বাঁচাতে পারি কি আমরা? টাকা পেলেও পারি না।"

লোকটি আবার হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"আমার বিশ্বাস টাকা পেলে মরা মানুষ বেঁচে উঠে। দিতে পার আমাকে কিছু টাকা? এক্ষুণি দেখ বেঁচে উঠবে।"

"কত টাকা চাই তোমার?"

"দেবে- দেবে? ভারি ভাল লোক তো তুমি।"

"এই সামনের দেরাজে আছে, টেনে দেখ, যা আছে নিয়ে যাও।"

"কোথা? কোন দেরাজে?"

দেরাজটা দেখাইয়া দিলাম। লোকটা লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া সেই দিকে চলিয়া গেল। আমি আবার পুস্তকে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় সে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল—

"এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! আমি দেরাজের হাতলটা কিছুতেই ধরতে পারলুম না। কেমন যেন ফসকে ফসকে যাচ্ছে। আমার দেহটা কি হাওয়া হয়ে গেছে?"

সে বারম্বার নিজের প্রসারিত বাহু দুইটা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, হাত দুইটা বারম্বার মুষ্টিবদ্ধ করিয়া খুলিয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার সমস্ত মুখে এক বিচিত্র হাসি। খানিকক্ষণ পরে সে আবার বলিল, "তাই তো। সব বদলে গেছে দেখছি। আমাকে দেখতে পাচ্ছ তুমি?"

"হাঁ।"

"আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?"

"পাচ্ছি।"

"কিন্তু সব যেন আশ্চর্যরকম বদলে গেছে। সব হাওয়া হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, শক্ত টান দিয়েও দেরাজটা খুলতে পারলুম না। টাকা পেলে আমি বেঁচে যেতাম। কিন্তু একি হল, এখন টাকা পেয়েও যে নিতে পারছি না। আচ্ছা, বেঁচে থাকতে তোমার সঙ্গে যদি দেখা হত হয়তো আমি মরতাম না। হয়তো আমার —"

"কেন মরেছিলে তুমি?"

"কেন? ওই যে ছোঁড়াটা এসে বক্তৃতা দিচ্ছিল, ওরাই তো আমার এই দুর্দশার কারণ। পথে ঘাটে কাগজে দেওয়ালে এক রব তুললে 'বয়কট ফরেন গুডস'। এই সব ছোকরাদের বক্তৃতার চোটে আমার দোকানখানা ডুবে গেল। আমার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কি সব পিকেটিং করবার ধুম। বয়কট ফরেন 'গুডস'। ওদের ওই বুলিটাই যে 'ফরেন', সে তখন ওদের বোঝাবে কে? দোকানখানা আমার ডুবিয়ে দিলে ব্যাটারা, আমাকেও ডুবিয়ে দিলে। সে দোকান থাকলে কি আমার মেয়ের বিয়ের পণের অভাব হয়?"

লোকটা হাঁফাইয়া পড়িয়াছিল, একটু থামিয়া আবার শুরু করিল- "বাজারে দর বাড়তে লাগল, মেয়েরও বয়স বাড়তে লাগল। আমার মেয়ে, বুঝতেই পারছেন, কিরকম কালো সে। বাজার দর যাচিয়ে দেখলাম। অন্তত পক্ষে তিনটি হাজার টাকা দরকার। সদাগরী আপিসের একটি প্রৌঢ় কেরানীর দ্বিতীয় পক্ষ করবার দরকার হয়ে পড়েছিল। তিনি বললেন যে, একটি প্রতিমার মত পাত্রী তাঁর জন্যে সেজে বসে আছে দুটি হাজার টাকা নিয়ে। মিছে কথা নয়। ভেবে দেখলাম, আমার ওই মেয়ের যুবক পাত্র জোটানো আমার পক্ষে অসম্ভব। অন্তত পক্ষে কুড়িজন ছোকরাকে জলখাবার খাইয়েছি—কেউ মেয়ে পছন্দ করে নি। শেষে সদাগরী আপিসের সেই কেরানীবাবুটিকেই ধরে পড়লাম আমার শালার মারফত। আমার

শালার সঙ্গে তিনি একসঙ্গে পড়েছিলেন। তিনি অবশেষে দয়া করে আমার কালো মেয়েকেই বিয়ে করতে রাজী হলেন—কিন্তু তিনটি হাজার টাকা চাই। টাকার জন্যে পাগলের মত ঘুরতে লাগলাম। কত লোকের কাছে যে হাত পেতেছি! মাঝে মাঝে চুরি করতেও ইচ্ছে হয়েছে। আহা, তখন যদি আপনার সঙ্গে দেখা হত! কিন্তু টাকার আমার আর দরকার হল না। একদিন সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে দেখলাম মেয়ে আমার উধাও হয়েছে। মজা দেখুন, মেয়ে কালো বলে পাত্র জুটল না কিন্তু প্রণয়ী জুটে গেল! এর মূলেও ওই হতভাগা ছোড়াগুলো ওই হারামজাদা ব্যাটারা— জাহান্নামে যাক সব।"

তাহার গলার ক্ষত দিয়া দরদর করিয়া রক্ত পড়িয়া তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। যাইবার পূর্বে সে বলিয়া গেল—

'তবু আমি মরতাম না কিন্তু মুখরা স্ত্রীর বাক্য যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারলাম না। আশ্চর্য, কিন্তু এখন তার জন্যেই মন কেমন করছে। সত্যি বলছি, বড্ড মন কেমন করছে।'

ছায়া মূর্তি মিলাইয়া গেল।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া কয়টা বাজিল, গুনিলাম না। প্রবৃত্তি নাই।

চতুর্দিক নিস্তব্ধ।

একা বসিয়া আবার সেই ল্যাপল্যাণ্ডের গল্পে মনোনিবেশ করিয়াছি।

দুইজনে বরফ গলা শীতল জল সাতার দিয়া পার হইতেছে—সেই যুবক এবং যুবতী কেহ কাহারও ভাষা বোঝে না যুবক সুইডেনবাসী —যুবতী ল্যাপল্যাণ্ডবাসিনী।

যুবক বলিতেছে

'ওপারে গিয়ে যখন উঠলাম, তখন শরীর ঠাণ্ডায় প্রায় জমে গেছে। ওপারের তীর কিন্তু সমতল নয় - চড়াই ভেঙে উঠতে হয়। উঠতে উঠতে শরীর গরম হয়ে উঠল। মেয়েটি বিশেষ কোন কথাবার্তা বলছিল না। বললেও বিশেষ কিছু সুবিধা হত না – তার ভাষা আমার পক্ষে দুর্বোধ্য। চড়াই ভেঙে আমরা একটু পরে ওপরে উঠলাম। ওপরে উঠে আমরা শৈবালাসনে বসে আহারে প্রবৃত্ত হলাম -যবের শুকনো রুটি, টাটকা মাখন আর পনির। ধোঁয়ায় সেকা বলগা হরিণের জিবও ছিল। মেয়েটি তার মগে করে পাহাড়ী ঝরণার ঠাণ্ডা জল নিয়ে এল। এত তৃপ্তি করে বহুকাল খাই নি। খাওয়া-দাওয়ার পর দুজনে পাইপ ধরিয়ে বসে পরস্পরের ভাষা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

ওই পাখিটির নাম জান?' তাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'লাহোল। হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।

পাখিটির গলার স্বর ঠিক বাঁশির মত—ভারি কোমল। ল্যাপল্যাণ্ডবাসীদের নির্জনতার সহচর এই পাখিটি। কাছেই একটি ঝোপ থেকে আর একটি পাখি গান গেয়ে উঠল। আশ্চর্য তার স্বর—নীল রঙের গলাটি।

'জিলো—জিলো—' মেয়েটি হেসে বলে উঠল।

ল্যাপদের ধারণা এই নীলকণ্ঠ পাখিটির গলার ভেতরে নাকি একটি ঘণ্টা আছে আর এরা

নাকি একশো রকম বিভিন্ন সঙ্গীত জানে। ঠিক আমাদের মাথার ওপর প্রকাণ্ড একটা কালো ক্রস নীল আকাশের গায়ে স্থিরনিবদ্ধ হয়ে আছে দেখলাম। পক্ষীরাজ ঈগল তার গতিবেগকে সংহত করে নিজের নির্জন সাম্রাজ্য পরিদর্শন করছেন। দূরে পাহাড়ের হ্রদ থেকে হাঁসের বিচিত্র শব্দ ভেসে আসছে। সমস্তটা যেন ইন্দ্রজাল।

'বো বো রেইক-' মেয়েটি বলতে লাগল।

এর অর্থ 'আজ দিন ভাল—আজ দিন ভাল।'

হ্রদ থেকে হাঁস উত্তর দিলে—'ভাব লুক, ভাব লুক, লুক্ লুক।'

মানে—'বৃষ্টি হবে, বৃষ্টি হবে—হবে হবে।'

আমি সোজা লম্বা হয়ে শুয়ে দেখতে লাগলাম, মেয়েটি তার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছে। একটি ছোট নীল উলের শাল, আর এক জোড়া হরিণের চামড়ার সুন্দর জুতো, চার্চে পরবার জন্যে চমৎকার এমব্রয়ডারি করা এক জোড়া লাল দস্তানা, একটি বাইবেল। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম —কি সুন্দর তার হাত দুটি।"

"ডাক্তারবাবু, শুনুন। সেই মেয়েটি যদি আসে, সেই কালো মেয়েটি—"

দেখিলাম সেই কবি আসিয়াছে। বই বন্ধ করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া বসিলাম। তাহার মাথার ফাটা খুলিটা হইতে আরও খানিকটা রক্তমাখা মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

"দেখুন ডাক্তারবাবু, সেই মেয়েটি যদি আসে, সেই কালো মেয়েটি—তাকে বলবেন যে, তার জন্যে একটা কবিতা লিখেছিলাম। তাকে শোনানো হয়নি। শোনাবার অবসর পাই নি—অবসর সে দেয় নি।"

তাহার পর একটু ইতস্তত করিয়া বলিল -

"শুনবেন আপনি? আপনি ডাক্তার মানুষ, আপনার হয়তো কবিতা ভাল লাগে না। তবু "

তাহার সমস্ত চোখে মুখে কেমন একটা করুণ মিনতি ফুটিয়া উঠিল। সেতারের তারে ঝঙ্কার দিলে তারগুলি যেমন কাঁপিতে থাকে, তাহার দৃষ্টি দেখিলাম সেইরূপ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

"শুনবেন কবিতাটা? সে যদি আসে, বলবেন তাকে—"

"আচ্ছা, শোনাও।"

কবি আবৃত্তি করিতে লাগিল। বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। শুনিতে শুনিতে আমার মনটাও সুদূর অতীতে ফিরিয়া গেল।—

"তুমি এসেছিলে।
বহি সুখ, বহি দুঃখ, বহি জ্বালা, বহি জটিলতা
এসেছিলে জীবনে আমার।
ক্ষুদ্র জলাশয়
সহসা ধরিয়াছিল সাগরের রূপ

তব আবির্ভাবে।
রবি শশী গ্রহ তারা-দীপ্ত নীলাকাশ,
পথহারা ধূমকেতু
প্রসব বেদনাতুরা কত নীহারিকা
সন্ধ্যা, উষা, জ্যোৎস্না, অন্ধকার,
সেই সাগরের বুকে ধরেছিল মূর্তি অভিনব
বহুবর্ণ বিচ্ছুরিত স্বপন উৎসবে।

কোটি ঊর্মি শিহরিত সে সমুদ্র মাঝে
কত কি যে ছিল।
কি ঐশ্বর্য —কি দারিদ্র্য তার।
সূর্যালোকহীন সেই আঁধার অতলে
মুক্তা ছিল, শঙ্খ ছিল—ছিল কত কি।
ছিল কত নামহীন অপরূপ রূপের প্রকাশ।
বাড়ব অনল
জ্বলিয়া মরিতে সেথা নীরব জ্বালায়।
অনুত্থিতা উর্বশীর অন্ধ আকুলতা
ছন্দোহীন বেদনায় মরিত কাঁদিয়া।
কত সর্প, কত অজগর
বিচিত্র কুণ্ডলাকারে— ভীষণ, মোহন,
পিচ্ছিল, চিক্কণ দেহ দিত প্রসারিয়া
বহুবর্ণ প্রবাল পল্লবে ''

শুনিতে শুনিতে আমি মানসচক্ষে দেখিতে লাগিলাম, একটি কৃশ দরিদ্র যুবক নগ্নপদে পথ অতিবাহন করিতেছে পেটে অন্ন নাই, মাথার চুল তৈলহীন, পরিধানে ছিন্নবাস। কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। চক্ষু দুইটিতে তাহার তীব্র জ্যোতি— অন্তরে অমৃতের পিপাসা। অমৃতের প্রলোভন দেখাইয়া একটি কিশোরী তাহাকে ডাকিতেছে। সে চলিয়াছে তাহারই আহ্বানে। কিশোরীর আয়ত নয়ন দুইটি কি অপূর্ব। প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে ভাষাহীন সে কি নিবেদন।

''গহন সে জলতলে তরঙ্গ তুলিয়া
লোলুপ আগ্রহভরে প্রসারিয়া অষ্টবাহু তার
লুব্ধ মুগ্ধ
ছিল 'অক্টোপাস'।
রক্তলোভী 'শার্ক'
সু সতর্ক সঞ্চরণে ফিরিত সতত।
গভীর সে কালো জলে

আলোড়ন তুলি
উন্মাদিনী কত ঝঞ্ঝা প্রলয়-তাণ্ডবে
বিধূনিয়া জলরাশি মহা-অট্টহাসে
সুসজ্জিত কত তরী ডুবাল অতলে।
আরও যে কত কি ছিল
দেখি নাই স্বরূপ তাদের।
চকিতে ইঙ্গিতে শুধু
পেয়েছি আভাস।
অনন্ত আভাস-ভরা সমুদ্র বিশাল।
নিত্য তারে সুরাসুর করিতে মন্থন
মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃতের লাগি।
মোর তুচ্ছ জীবনের ক্ষুদ্র জলাশয়।
সহসা ধরিয়াছিল সাগরের রূপ
তব আবির্ভাবে।"

"[illegible] খুলে দাও, বাঁধনটা খুলে দাও তো"

চাপা রুদ্ধস্বরে কথা বলিতে বলিতে একটি যুবতী আগাইয়া আসিল। তাহার রক্তাক্ত চোখ দুইটি ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। গলার দড়িটা শক্ত করিয়া বাঁধা। দুই হাত দিয়া টানাটানি করিয়া নিজেই সে বাঁধনটা আলগা করিয়া ফেলিল। আলুলায়িত দীর্ঘ কুন্তল। পাতলা ঠোঁট দুইটিতে বিচিত্র হাসি।

"কোথায় গেলেন সেই কবি? কবিতা যে শেষকালে মৃত্যুর ফাঁসি হয়ে গলায় চেপে বসে, এ খবর কি উনি জানেন?

উঃ, কত কবিতাই জীবনে শুনলাম।

এই রূপের কত ব্যাখ্যা।

যেখানেই যাই, সহস্র চক্ষু আমার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকে— যেন গিলে খাবে। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান, বালক, বৃদ্ধ, যুবা—সকলেরই চোখে সেই এক ক্ষুধিত দৃষ্টি। কবি কবিতা লিখেছে, ধনী টাকা দেখিয়েছে, বলী বলপ্রকাশ করেছে, যার কিছু নেই নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, সে মিনতি করেছে। অসহ্য।"

মেয়েটি তাহার পর আমার আর একটু কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—"আচ্ছা ডাক্তারবাবু, একটা কথা বলতে পারেন আমাকে? ছাপা কেতাবে যে সব প্রেমের গল্প লেখা থাকে, সে সব কি সত্যি? ও-রকম কি হয়? আমার জীবনে আমি তো দেখেছি পুরুষগুলো আমাকে নিয়ে লোফালুফি করেছে খালি। আমি যেন একটা ফুটবল, আর ওরা যেন সুদক্ষ একদল খেলোয়াড়। সবারই লোলুপ দৃষ্টি আমার ওপর। কিন্তু আমাকে কাছে পাওয়া মাত্র লাথি মেরে তারা দূর ক'রে দিয়েছে। দূর ক'রে দিয়ে আবার ছুটেছে আমার পেছনে আমাকে ধরবে ব'লে। এ কি আশ্চর্য ব্যাপার বলুন তো।"

মেয়েটি আগাইয়া আসিয়া বাতিটার কাছে দাঁড়াইয়া আলোর পোকাগুলি দেখিতে লাগিল। কতকগুলি মরিয়া গিয়াছে, কতকগুলি মৃতপ্রায়—কতকগুলি এখনও বাঁচিয়া আছে। রঙিন প্রজাপতিটি এখনও সমানে আলোকশিখাকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়াছে।

"ডাক্তারবাবু, তখন তো বললেন না আমাকে—মানুষ ফাঁসি হ'লে কোথায় যায়? বলুন না।"

সেই স্বদেশী যুবকটি আসিয়াছে।

"বলুন না।"

"আমি ঠিক জানি না।"

"জানেন না?"

"না।"

"আচ্ছা, ভোল্টা, গ্যাল্‌ভ্যানি, ল্যাভয়শেয়ার, পাস্তুর, গ্যালিলিও এঁরা কেউ আসেন আপনার কাছে? এঁদের আমি অপমান করেছি ক্ষমা চাইব। কেউ আসেন এরা?"

"না।"

যুবক চলিয়া গেল। অদ্ভুত তাহার দৃষ্টি।

মেয়েটি আলোর পোকাগুলি এতক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। যুবকটি চলিয়া যাইবার পর আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ও কে?"

যতটুকু জানিতাম, বলিলাম।

মেয়েটি হাসিয়া বলিল—"সবারই পরিচয় শুনেছেন, আমার পরিচয় শুনুন। আচ্ছা, ওই ছেলেটি যাদের নাম করছিল, তারা কে? কি অদ্ভুত নামগুলো! কারা ওরা?"

"ওরা সব বড় বড় বৈজ্ঞানিক। সবাই মারা গেছেন। ছেলেটি তাঁদেরই খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"ছেলেটি খুব বিদ্বান বুঝি?"

"হ্যাঁ"

মেয়েটি কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া গেল। তারপর বলিল— "শুনবেন আমার কথা?"

"বল?"

"ভাল ব্রাহ্মণবংশের মেয়ে আমি। আমার মা নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা ছিলেন। মাসের মধ্যে অধিকাংশ দিনই উপবাস ক'রে থাকতেন। আমরা গরীব হলেও মায়ের নিষ্ঠার জন্য আমাদের খাতির ছিল খুব। মায়ের মুখখানা এখনও আমার মনে পড়ে। ধপধপে ফরসা ছিলেন তিনি, ধপধপে ফরসা থান পরে থাকতেন।"

মেয়েটি একটু চুপ করিল।

"অমন মায়ের মেয়ে হয়ে কি করে যে আমি এমন হলাম, তাই ভাবি। আমার যখন ন বছর বয়স, তখনই আমার বিয়ে হয়েছিল। মা গৌরীদান করে পুণ্য অর্জন করেছিলেন। পাড়ার লোককে বলতে শুনেছি যে, আমি নাকি গৌরীর মত দেখতে ছিলাম। আমার এই রূপের জোরেই একটি বড়লোকের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। কোন গরিবের হাতে পড়লে বোধ হয় আমার এ দুর্দশা হত না।"

একটু হাসিল।

"সবাই আমাব এই রূপেব প্রশংসা কবেছে—এক আমাব স্বামী ছাড়া। তিনি আমাব দিকে কোনদিন চেয়েও দেখেন নি বোধ হয। মদ নিয়ে এত মশগুল থাকতেন যে, আমাব প্রতি দৃষ্টি দেবাব তাঁব অবসব হত না। তিনি আছেন টেব পেতাম, যখন বাত্রে তাঁব দুর্গন্ধি বমিগুলো পবিষ্কাব কবতে হত। স্বামী দেবতা হলেও ভাগ্যে অমব নয তাই নিষ্কৃতি পেয়েছিলাম। দেবতাবা শুনেছি স্বর্গে থাকেন। পচা লিভাবটা নিয়ে আশা কবি তিনিও স্বর্গেই আছেন। থাকুন থাকুন যেতে চাই না আমি সে স্বর্গে।"

তাহাব চোখে মুখে যেন একটা আগুনেব হলকা বহিয়া গেল।

"স্বামী স্বর্গে গেলেন যখন তখন আমাব বযস তেবো বছব। বিয়েব সময শুনেছিলাম তাবা বড়লোক। আগে বড়লোকই ছিলেন। আমাব স্বামীব প্রপিতামহ টাকা বোজগাব কবেছিলেন—এবা দু তিন পুরুষ ধবে সেটা নানা ভাবে খবচ কবেছিলেন। আমাব স্বামীব অংশে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, সেটুকু তিনি মদ খেয়ে নিঃশেষে খবচ কবে মববাব আগে কিছু ধাবও বেখে গেলেন। ভাল লাগছে শুনতে আপনাব?"

না। তব বল শুনব।"

ন া(হ•   পচা মড় চিবতে ভাল লাগে, মিথ্যে প্রেমেব উপন্যাস পড়তে ভাল লাগে আব আমাব জীবনেব এই সত্যি ঘটনাটা ভাল লাগছে না?'

' সত্য সবদাই অপ্রিয। তুমি বল।"

মেয়েটি বলিতে লাগিল—

"হ্যাঁ, কি বলছিলাম, স্বামী স্বর্গে চলে গেছেন আমি মর্ত্যে থেকে গেলাম। আব থেকে গেলেন আমাব স্বামীব মামাতো ভাই, পুলক ঠাকুবপো। তিনিই আমাব প্রথম প্রেমিক। মেয়েটি সহসা একটু মুচকি হাসিয়া বলিল "আমাদেব দেশে সতীদাহ প্রথাই ঠিক ছিল, স্বামীব সঙ্গে মেয়েটাকে পুড়িয়ে মেবে ফেলত ব স, নিশ্চিন্ত এ বকম দগ্ধে দগ্ধে মবতে হত না। এই দেশে কখনও সতীদাহ প্রথা লোপ পেতে পাবে? আজও এ দেশেব ঘবে ঘবে বিধবা সতীবা পুড়ে মবছে। আগুনেব চেহাবাটা শুধু বদলেছে। আগে ছিল চিতানল, এখন হয়েছে তুষানল। আমাব সাবা জীবন ভবে তাব প্রমাণ পেয়েছি। এই তুষানল নেবাবাব নানা চেষ্টা আমি কবেছি জল পাই নি। মরুভূমিতে কখনও জল পাওযা যায? পাই নি। মরুভূমিব চেয়েও খাবাপ। এই মর্ত্যলোক আমাব কাছে নবক হয়ে উঠেছিল, আব সে নবক আমি গুলজাব কবেও তুলেছিলাম। কি কবে আমাব এই সামান্য দেহটা দিয়ে যে এত লোককে আমি কাবু কবেছিলাম তাই ভাবি। সে কি এক আধটা লোক? প্রতি দিন প্রতি বেলা নূতন লোক। একটা সামান্য বাবাঙ্গনাব জীবন কাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা কবে আপনাব বিবক্তি ঘটাব না। এইটুকু শুধু জেনে বাখুন সাধ কবে গলায দড়ি দিই নি। সম্ভব হলে ছ্যাকড়াগাড়িব ঘোড়াগুলোও আত্মহত্যা কবত। পাবে না বলেই কবে না।

জীবনে আমাব সবচেয়ে বেশি দুঃখ কি জানেন? কাউকে ভালবাসি নি। ভালবাসবাব মত কেউ আমাব কাছে আ স নি। অথচ টাকাব লোভে অহবহ ভালবাসাব ভান কবতে হয়েছে।

কি আশ্চর্য এই পুরুষমানুষগুলোর প্রবৃত্তি! তারা ঘরে সতী স্ত্রী ফেলে আমাদের কাছে ছুটে আসে। আমার স্বামীও যেতেন শুনেছি। পুরুষদের ষোলআনা লোভ এই অসতী মেয়েগুলোর প্রতি। অসতী বলেই তারা আমাদের কাছে আসে, অথচ এসেই একনিষ্ঠতা দাবী করে বসে। আর আমরা ও টাকার লোভে একনিষ্ঠতার অভিনয় করতে থাকি। মরেছি কি সাধে?"

হাসিতে হাসিতে সে চলিয়া গেল।

খোলা জানালাটা দিয়া হু হু করিয়া একটা হিমশীতল বাতাস ঘরে আসিয়া ঢুকিতে লাগিল।

সেই প্রজাপতি শুনিলাম আলোকশিখাকে বলিতেছে-

"আমি নীলাকাশচারী জ্যোতির্ময় সবিতার উপাসক, মুক্ত আলোকে, নির্মল বাতাসে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াই। এই বদ্ধ ঘরের সঙ্কীর্ণতায় আমার সমস্ত অন্তর অবরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে।'

বাতায়ন পথে আবার খানিকটা ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকিল। আলোকশিখা দেখিলাম একটু কাঁপিয়া আরও যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

পতঙ্গ আবার তাহাকে ঘিরিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে মৃদু গুঞ্জনে কি যেন বলিতে লাগিল বুঝিতে পারিলাম না

বিনিদ্র নয়নে বাতায়নের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি।

আশ্চর্য আমার এই বাতায়নটি! এই বিশ্বজগতের তুলনায় ইহা তো কিছুই নয় আকাশভরা লক্ষ কোটি নক্ষত্রসমাজে কত ক্ষুদ্র আমাদের এই সৌরজগতের সীমাই! সেই সৌরজগতের ক্ষুদ্র একটি গ্রহ আমাদের পৃথিবী! সেই পৃথিবীর এক কোণে কত নগণ্য আমার ছোট ঘরখানি! সেই ঘরের দেওয়ালে ছোট একটি জানালা। কত সামান্য অথচ কত অসামান্য! এ ক্ষুদ্র বাতায়ন পথে বাহিরের পৃথিবীর খবর পাই, আকাশপটে বিশ্বরূপ দেখি আলো আসে অন্ধকারও আসে

"ডাক্তারবাবু ডাক্তারবাবু, দেখ তো "

সেই সন্তানহত্যাকারিণী জননীটি আসিয়াছে। কোলে তাহার একটি মরা শিশু।

"দেখ তো ডাক্তারবাবু এখনও বেঁচে আছে কি না! মনে হচ্ছে বুকের কাছে যেন এখনও একটু ধুকধুক করছে। দেখ না একটু নদীর ধারে পড়ে ছিল। একটা কুকুরে এর হাতটা চিবিয়ে খাচ্ছিল। দেখ না- বেঁচে আছে কি না"

মৃত শিশুটা সে বাড়াইয়া ধরিল নিস্পন্দ প্রাণহীন দেহ একটি চোখ নাই হয়তো কাকে ঠুকরাইয়া তুলিয়া ফেলিয়াছে। কচি হাতটিতে সত্যই কয়েকটি আঙুল নাই, কুকুরে চিবাইয়া খাইয়াছে।

"ডাক্তারবাবু এখানে এই কালো দাগটা কিসের?"

"ওই জায়গাটায় তুমি টিপে ধরেছিলে।"

ছেলেটি কোলে করিয়া যুবতী দেখিলাম থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

"এখনও যে এর একটু একটু নিশ্বাস পড়ছে, বেঁচে আছে কি? দেখ না একটু।"

কি বলিব?

মিথ্যা কথা বলিলাম।

"হ্যাঁ, এখনও প্রাণ একটু আছে।"

"আছে?"

চুম্বনে চুম্বনে উন্মাদিনী সেই মৃত শিশুটার সর্বাঙ্গ ভরিয়া দিল। তাহার অঙ্গের বসন বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, বেণী বিস্রস্ত—"বাবা আমার, মানিক আমার, সোনা আমার—"

বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, মৃত শিশুর অধর দুইটি যেন নড়িয়া উঠিল, অভিমানভরে সে যেন বলিল, মা--মা!

বাহিরে হাওয়ার বেগ বাড়িতেছে।

জানালা দিয়া দেখিতেছি, ঘনকৃষ্ণ পুঞ্জীভূত মেঘমালা আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে ছুটিয়া চলিয়াছে। নক্ষত্রবিহীন অন্ধ রাত্রি ঘনাইয়া আসিল। চিরকালের সেই উজ্জ্বল শাশ্বত নক্ষত্রগুলি দেখিতে পাইতেছি না। সামান্য মেঘের কি অসামান্য ক্ষমতা, নক্ষত্র বিলুপ্ত করিয়া দেয়!

সমস্ত তিমির ভেদ করিয়া মন সুদূরে ভাসিয়া চলিয়াছে। সীমাহীন স্মৃতির সমুদ্রে সমস্ত অন্তঃকরণ হাবুডুবু খাইতেছে, যেন একখানি ক্ষুদ্র অসহায় ভেলা। চতুর্দিকে কোটি তরঙ্গ.....। মানসচক্ষে একটি ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে।

গ্রামের একটি পুষ্করিণী। তীরে নারিকেল, সুপারি, আম, জাম, কাঁটালের বাগান। চতুর্দিকে শ্যামল শ্রী। সূর্য অস্ত যাইতেছে। একটা কোকিল কোথায় যেন ডাকিতেছে, সরসর করিয়া একটি গিরগিটি শুষ্ক পত্রগুলিকে সচকিত করিয়া সরিয়া গেল।

পুষ্করিণীর অপর পাড়ে একটি জীর্ণ দেবালয়—বুড়া শিবের মন্দির। সেখান হইতে ধূপধুনার গন্ধে সন্ধ্যার বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত।

ঘাটে স্নানার্থিনীর দল। সমস্ত দিন উপবাসের পর জননীগণ সন্তানের মঙ্গলকামনায় শিবের পূজা করিতে আসিয়াছেন। নীলষষ্ঠী।

প্রত্যেক জননীর মুখে, চোখে, আচারে, অবয়বে একই ভাষা ফুটিয়া উঠিতেছে, সন্তানের যেন কোন অনিষ্ট না হয়—"হে দেবতা, হে শঙ্কর, আমার ছেলেদের সুখে রাখিও।"

ভাবিতেছি, এই জননীও প্রয়োজন হইলে সন্তানহত্যা করে। পৃথিবীতে প্রয়োজনের তাগিদে শিবপূজাও করে, শিশুহত্যাও করে। ভাবিয়া দেখিতেছি, এ জগতে প্রয়োজনের দাবীটাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দাবি। দয়া, মায়া, বিবেক, নীতি সমস্ত গুঁড়া করিয়া দিয়া প্রয়োজনের এই লৌহ-'রোলার' টা দুনিয়ার রাজপথ দিয়া সগর্জনে চলিয়াছে। ইহার চাপে মা-ও ছেলের গলা টিপিয়া ধরে। স্বামী স্ত্রীকে অপরের—

"আমার দড়িটা ফিরিয়া দাও।"

চমকিয়া দেখিলাম, আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে একটি বৃদ্ধা চাহিয়া আছে। মুখের চামড়া বলিরেখাঙ্কিত---কুঁচকাইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মাথাটা জরাভারে কাঁপিতেছে। মাথার চুলগুলা শ্বেত নয়, পীতবর্ণ। নিষ্প্রভ চক্ষুর দৃষ্টিটা আমার মুখের ওপর নিবদ্ধ করিয়া বৃদ্ধা আবার বলিল -

"ফিরিয়ে দাও আমার দড়িটা, ফিরিয়ে দাও। আমার গলার দড়িটা কেন তুমি খুলে দিয়েছিলে? কোথা রেখেছ সেটা, দাও। আবার আমি গলায় দড়ি দেব। আমার নিশ্চয় এখনও ভাল করে মরা হয় নি। আমার সব মনে পড়ছে, সমস্ত মনে পড়ছে।"

বৃদ্ধা বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

"একে কি মরা বলে? নিশ্চয় আমি বেঁচে আছি এখনও। আমার হাতটা দেখ ডাক্তারবাবু, বোধহয় আমি বেঁচে আছি। আমার সব মনে পড়ছে যে! দেখ তো —"

বৃদ্ধা তাহার কম্পিত দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া আরও খানিকটা আগাইয়া আসিল। তাহার পর পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিল।

"দাও আমার দড়ি ফিরিয়ে, আমি ঠিক বেঁচে আছি। না, বেঁচে থাকতে আমি পারব না, পারব না, আমি পারব না। আমায় আবার মেরে ফেল তুমি।"

"তুমি তো মরে গেছ। প্রায় এক মাস আগে "

"মিছে কথা। এক মাস আগে আমি মরবার জন্যে গলায় দড়ি দিয়েছিলাম, কিন্তু মৃত্যু আমার হয় নি। আমার সব মনে পড়ছে যে! আমার গলার দড়ি তুমি খুলে দিয়েছিলে।"

চুপ করিয়া রহিলাম।

ভ্রূকুটি করিয়া তীব্রস্বরে বৃদ্ধা প্রশ্ন করিল —"খুলে দাও নি তুমি?"

"দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার মৃত্যুর পর।"

আমার সব মনে পড়ছে কেন?"

'কি মনে পড়ছে?"

'উঃ, মর্মান্তিক সেই কথাটা! পটাপট সে আমার মুখে জুতো মেরে গেল, চুলের মুঠি ধ'রে উঠোনে ফেলে পেটে লাথির পর লাথি মারলে, আমার বুকের পাঁজরার হাড় গুঁড়িয়ে গেল তার লাথির চোটে,—এই দেখ।"

যে স্থানটা চিরিয়া ভগ্ন অস্থিটি পরীক্ষা করিয়াছিলাম, বৃদ্ধা সেই ক্ষতস্থানটা দেখাইল।

"আমি আবার মরব সত্যি বলছি ডাক্তারবাবু, আবার আমাকে মরতে হবে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি ডাক্তারবাবু, আমায় মেরে ফেলো তুমি।"

তাহার গণ্ড বাহিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িল।

"মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু কে জান? নিজের পেটের ছেলে। এত বড় শত্রু আর হয় না। বিশেষত সে যদি আমার মত বিধবার একমাত্র সন্তান হয়। শত্রু—শত্রু দারুণ শত্রু। গর্ভে যতদিন ছিল, আমার রক্ত শোষণ করেছে। ভূমিষ্ঠ হবার পরও তার শোষণ বন্ধ হয় নি। চোঁ-চোঁ করে শতমুখে সে আমার রক্ত শুষেছে। দেহের রক্ত থেকেই না দুধ হয়? সেই দুধ সে আট বছর ধ'রে খেয়েছে! শুনেছেন কখনও, আট বছরের ছেলে মাই খায়? কত ঠাকুর দেবতার দোর ধরে, কত মানত পূজো করে এই ছেলেকে মানুষ করেছি! একটা ষষ্ঠী কখনও বাদ দিই নি, উপোসে উপোসে শরীর শীর্ণ হয়ে গেছে আমার।"

চকিতের মধ্যে আমার মনে সেই পুষ্করিণী তীরের নীলষষ্ঠীর ছবিটা আবার ভাসিয়া আসিল। দেখিলাম, সবুজ গাছগুলিতে আগুন লাগিয়াছে—গগনস্পর্শী অনলশিখা দাউ দাউ

কবিযা জ্বলিতেছে। অস্তগামী সূর্যেব সে দীপ্তি আব নাই, যেন একটা অঙ্গাবখণ্ড। কোকিলটা দেখিতে দেখিতে শকুনি হইযা গেল। পুষ্কবিণীব জল বক্তে রূপান্তবিত হইযাছে। তাহাতে শত শত লোলুপ কুম্ভীব একে একে আসিযা জননীদেব গ্রাস কবিতেছে। জননীব আর্তনাদে চতুর্দিক মুখবিত। জীর্ণ শিবমন্দিবে বসিযা আছে—শিব নয, একটা বিকট বাক্ষস, জননীদেব দুর্দশা দেখিযা হা-হা কবিযা হাসিতেছে।

"একমাত্র ছেলে আমাব। কত কষ্ট ক'বে যে মানুষ কবেছি। যখন সে যা চেযেছে, তাই দিযেছি। তাব আকাঙ্ক্ষা মেটাবাব জন্যে আমাব যা কিছু ছিল, সব গেছে। শুনেছ কখনও তেবো বছবেব ছেলে হাতে রূপোব হাত ঘডি বেঁধে ইস্কুল যায? শুনেছ কখনও, যে ছেলে একটাও পাস কবতে পাবে নি, তাব বোজ বোজ নতুন পোশাক চাই? কত বঙেব কত ধবনেব পাঞ্জাবি যে তাব কিনে দিযেছি। কত বকমেব জুতো, কত বকমেব ছডি। গ্রামেব ইস্কুলে তাব পডতে মন হল না। শহবে গেল কত কষ্টে যে তাব খবচ যুগিযেছি। আমাব কষ্ট তুমি বুঝবে না ডাক্তাববাবু, মাযেব কষ্ট তুমি বুঝতে পাববে না। নিজেব পেটেব ছেলে যখন মদ খেযে এসে জুতো মাবে তখন মাযেব মনে কি যে হয, তা বোঝবাব তোমাব ক্ষমতা নেই সে তুমি বুঝতে পাববে না, সে তুমি বুঝতে পাববে না— দডিটা আমায ফিবিযে দাও। আমি আবাব মবি।"

কাহাকে দডি ফিবাইযা দিব?

কোথায গেল সে?

বাতাযন পথে চাহিযা দেখিলাম, চতুর্দিক মেঘাচ্ছন্ন। কেবল সামান্য একটু আকাশ এখনও নির্মেঘ বহিযাছে। তাহাতে জ্বলজ্বল কবিযা একটা তাবা জ্বলিতেছে। সমুদ্রেব মধ্যে যেন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে আলো জ্বলিতেছে। কোন্ পথহাবা পথিককে ও পথ দেখাইতেছে? ওই মেঘেব সমুদ্রে কি কোন নাবিক আছে? থাকিলেও কি তাহাব পথ হাবায? পথ হাবাইলে কি ওই তাবাব আলোয সে পথ পাইবে? তাবাব আলোয কি পথ হাবায না?

কিন্তু কি সুন্দব—কি উজ্জ্বল ওই তাবাটি! আর্দ্রা নক্ষত্র কি? পুঞ্জীভূত এই তমিস্রাব মধ্যে ওই একক নক্ষত্রটি দেখিযা ভবসা হয। মনে হয, সমস্ত কালো নয, আলোও আছে। মনে ধীবে ধীবে আশাব সঞ্চাব । দেখিতে দেখিতে নির্মেঘ আকাশটুকুও মেঘে ঢাকিযা গেল। নক্ষত্র ঢাকা পডিল। মেঘেব গুরু গুরু গর্জনে অন্ধকাব শিহবিযা উঠিল। ভাবিতেছি, আকাশ যাহাব সৃষ্টি, মেঘও কি তাহাবই সৃষ্টি? আলো এবং অন্ধকাব কি একই কবিব কবিতা? পাপ এবং পুণ্য? সত্য এবং মিথ্যা?

"সত্য মিথ্যাব সৃষ্টিকর্তা আমবাই। মবে সেটা বুঝতে পেবেছি। আমাকে একটু জল দিতে পাবেন? বড জ্বালা। আগুনটা এখনও যেন নেবে নি।"

একটি উলঙ্গ অর্ধদগ্ধ নাবী দাঁডাইযা থবথব কবিযা কাঁপিতেছে। তাহাব পেট, বুক এবং

পায়েব খানিকটা পোড়া। পেটের ও বুকেব স্থানে স্থানে ছাল উঠিয়া গিয়া লাল মাংস বাহিব হইয়া পড়িয়াছে। সর্বাঙ্গে বড় বড় ফোস্কা।

এত দুঃখেও কিন্তু সে হাসিতেছে। এক পিঠ চুল। কালো মুখটিতে বড় বড় চোখ দুইটি বেদনাতুব, তবু যেন কৌতুকদীপ্ত।

"দিন না একটু জল। জ্বালা কমে নি এখনও—বড্ড জ্বলছে। মবে গেছি, তবু জ্বালা কমে না কেন বলুন তো?"

কাঁদিতে কাঁদিতেও মেয়েটি যেন হাসিতেছে। হাসি কান্না যেন মেঘ ও বৌদ্রেব মত তাহাব মুখে আসা-যাওয়া কবিতেছে। কালো, কিন্তু কি চমৎকাব মুখশ্রী। হঠাৎ মনে হইল, এ কি সেই মেয়েটি, যাহাব কথা কবি—

সেই মেয়েটি হাসিয়া বলিল—"কি ভাবছেন বলব?"

"কি?"

"সেই কবিব কথা। সে এসেছিল বুঝি আপনাব কাছে? বেচাবা। তাব সব গল্প বিশ্বাস কবেছেন আপনি? কবিতা শুনিয়েছে সে আপনাকে? বেশ কবিতা, নয়?"

তাহাব বড় বড় কৌতুকভবা সজল চক্ষু দুইটি আমাব মুখেব উপব স্থাপিত কবিয়া ক্ষণকাল নীবব হইয়া বহিল।

"বেচাবা আসল কথাটা যদি জানত। ভুলটা তাব কোনদিন ভেঙে দিই নি আমাব স্বার্থ ছিল কিনা। এখন দেখা পেলে ভেঙে দিতাম। যদি সে আসে তাব ভুলটা ভেঙে দেবেন আপনি?"

"কি ভুল?"

"একদিনেব জন্যও তাকে আমি ভালবাসি নি। কবিতা টবিতা আমাব মোটে ভাল লাগে না। আমাব মনে হয়, ওসব ন্যাকামি। হয়তো আমি বুঝতে পাবি না। তাই বলে ভাববেন না যে আমি আমাব স্বামীকেই ভালবাসতাম। স্বামীকেও আমি দেখতে পাবতাম না। সে বক্তমাংসেব শক্ত মানুষ ছিল না। যেমন লিকলিকে তাব দেহ—তেমনি লিকলিকে তাব মন। তাব দেহ বা মনে এতটুকু শক্তিব সন্ধান কখনও দেখতে পাই নি। সে যদি শক্ত সমর্থ বর্বব একটা দস্যুও হত, তা হলেও আমি ঢেব বেশি সুখী হতাম। এম এ ডিগ্রী নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব? না, এম এ পাস প্রফেসাব স্বামীকে আমাব মোটে পছন্দ হয় নি। আমাব একটা গল্প শুনবেন? গল্প নয়, সত্যি কথা। যখন বেঁচে ছিলাম, তখন নিজেব কাছেই কথাটা স্বীকাব কবতে লজ্জা হত। এখন লজ্জা কি, ভয়ই বা কি?"

আব একটু কাছে সবিয়া আসিল।

"আমাদেব বাড়িব পাশে একটা ছোটলোক থাকত, বুঝলেন, ছোটলোক মানে গবিব লোক। আমাদেব বাড়িব জানলা থেকে তাদেব বাড়িব উঠোন দেখা যেত। কি যণ্ডা লোকটা—মাথায় বাববি-চুল, প্রকাণ্ড গোঁফ, গালপাটা দাড়ি। দেখলে মনে হত, যেন যমদূত। সে বোজ এসে তাব বউটাকে চুলেব ঝুঁটি ধবে ঠেঙাত। বউটাব কান্নাব জ্বালায় পাড়াব সবাই অস্থিব হয়ে উঠতাম। এক-একদিন আবাব সেই লোকটা বউটাকে আদবও কবত দেখতে

পেতাম। অত অজস্র আদব কবতেও কাউকে দেখি নি কখনও। অত সোহাগ কোন পুরুষ যে কোন স্ত্রীকে কবতে পাবে, তা আমাব ধাবণাব অতীত ছিল। সত্যি বলছি, সেই বউটাকে দেখে আমাব হিংসে হত। আহা-হা, অমন সুন্দব প্রজাপতিটা পুড়ে গেল, দেখুন।"

দেখিলাম, সেই বঙিন প্রজাপতিটা দীপশিখায় পড়িয়া সত্যই পুড়িতেছে। একটা ডানা পুড়িয়া গিয়াছে, ছটফট কবিতেছে। শুনিতে পাইলাম, সে যেন বলিতেছে—"যত হীন তোমাকে মনে কবিয়াছিলাম তত হীন তুমি নও, বন্দিনী, তবু তুমি সুন্দবী।"

পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গেল। একটা বিকট গন্ধে চতুর্দিক ভবিয়া উঠিল দীপশিখা দেখিলাম হাসিতেছে।

বিশ্বেব সমস্ত নিস্তব্ধতা যেন ঘবটাতে ঘনাইয়া আসিল। কাহাবও মুখে কোন কথা নাই।

হঠাৎ সেই মেয়েটি আবাব কথা কহিল—

"ভাল আমিও বেসেছিলাম। কাকে জানেন? ওই কবিবই একটি ভাই ছিল, তাকে। সুন্দব ছেলে সে কবিতাও লিখত না, লেখাপড়াও বেশি জানত না। কিন্তু চমৎকাব ছেলে, কি তাব স্বাস্থ্য, কত বলিষ্ঠ তাব মন। বেশি কথা বলত না। নিজেব পড়াশোনা নিয়েই থাকত। বি এ না কি পড়ত এখনও তাব লেখাপড়া শেষ হয় নি। বীবেন তাব নাম কবিব কাছে কবিতা শোনবাব ছুতোয় যেতাম তাকেই দেখতে। কবি মনে কবত, আমি বুঝি তাবই প্রেমে পড়েছি কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়েছি, তাই নানা ছুতোয় বোজ যাই। কি ভীষণ অহঙ্কাবী এই কবিবা।"

"আমি যেতাম বীবেনকে দেখতে কত মিথ্যেই যে সত্যেব মুখোশ পবে। কবি ছিলেন আমাব স্বামীব বন্ধু। একটা বড় বাড়িব দুটি বিভিন্ন অংশে থাকতাম আমবা কবিব বাড়িতে আমাব অবাধ যাতায়াত ছিল তাই বলে ভাববেন না যে, স্বামী আমাব উদাবমতাবলম্বী ছিলেন একেবাবেই তা নয়। সাহস কবে বাবণ কববাব মত বলিষ্ঠতা তাব ছিল না তাব দুর্বলতাব এই সুযোগ নিয়ে আমি যখন খুশি ওদেব বাড়ি চলে যেতাম। আব একটা সুযোগও ছিল। কবিব একজন বৃদ্ধা জ্যেঠাইমা ছিলেন বাড়িব কর্ত্রী। তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন। বাব বাব আমায় ডেকে পাঠাতেন, তাঁব কাছে যাওয়াব নাম কবে বোজ যেতাম সেখানে। কবি আমাকে একলা পেলেই কবিতা শোনাতেন। বুঝতাম, কবিতাব মাবফত প্রেম নিবেদন কবছেন সব বুঝতাম, কিছু বলতাম না। ববং মুগ্ধ হবাব ভান কবতাম। ভান কবতে আমবা কত পটু, তা জানেন তো?"

ফিক্ কবিয়া একটু হাসিল। তাহাব পব আর্তনাদ কবিয়া উঠিল—"উঃ, বড় জ্বালা কবছে। সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল আমাব। আগুনটা কি নেবে নি এখনও? একটু ব্যবস্থা করুন না।"

"গল্পটা আগে শেষ কব।"

"এ অসমাপ্ত গল্প। বীবেনকে আমি পাই নি। লোকে ঘেয়ো কুকুবকে যেমন দূব দূব কবে তাড়িয়ে দেয়, সে তেমনই কবে একদিন তাড়িয়ে দিলে আমাকে। একদিন মাত্র তাকে একা পেয়েছিলাম। পাঁচ মিনিটেব জন্যে মাত্র পাঁচ মিনিট, তাও বোধহয় নয়। লজ্জাব মাথা খেয়ে সেদিন তাব কাছে সমস্ত মনখানা মেলে ধবেছিলাম। সে কি বললে জানেন? "দ্বিতীয় বাব এ

কথা আর আমার কাছে উচ্চারণ করবেন না। আমি জানতাম, আপনি ভাল। এ কি আপনার ব্যবহার, ছি ছি। বাড়ি যান।" এই বলে সে বেরিয়ে চলে গেল। বজ্রাহতের মত নির্বাক হয়ে রইলাম। মনে হতে লাগল, যেন পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। আমার সমস্ত ইহকাল, সমস্ত সত্তা যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, সমস্ত বিশ্বভুবন যেন আমার চোখের সামনে দুলতে লাগল। ঠিক সেই সময় কবিও এলেন। তিনি আমাকে একা পেলেন। তাঁর মানসী যে আমি ছাড়া আর কেউ নয়, এ কথা তিনিও এতকাল বলবার শুভযোগ খুঁজে পান নি। সেই স্নিগ্ধ সন্ধ্যার সুদুর্লভ নির্জনতার নিবিড়তায় —কি ছাই আমার ভাল মনেও নেই সে সব ভাষা। মোট কথা তিনিও প্রেমনিবেদন করলেন সেদিন। বীরেনের কথাগুলো আমার কানে বাজছিল। অবিকল সেই কথাগুলি আবৃত্তি করে দিলাম।"

মেয়েটি আবার চুপ করিয়া গেল।

'কি হল তারপর?"

"তারপর তো আপনি সব জানেন। কবি সেই দিন রাত্রেই বিভল্‌ভার দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। পরদিন আমিও পুড়ে মলাম। পুড়ে মরবার আগে অবশ্য স্বামীর সঙ্গে আমার ঝগড়া প্রায় রোজই যেমন হত তেমনই হয়েছিল। পাড়ার লোকে জেনেছে, আমার মৃত্যুর কারণ আমার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া। আমার স্বামী বুঝলেন, মৃত্যুর কারণ কবির সঙ্গে প্রেম। কবির ধারণা হয়েছিল বোধহয় যে, আমি তাকে ভালবাসতাম। কবির মৃত্যুর কারণ আপনারা ঠিক করেছিলেন বুঝি পাগলামি টেম্পরারি ইনস্যানিটি। বীরেন কি ভেবেছে সেই জানে। সত্য মিথ্যার কেমন একটা হেঁয়ালি বলুন তো?"

মেয়েটি হাসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আবার তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। চক্ষু দুইটিতে কাতর মিনতি ফুটিয়া উঠিল আবার।

'উঃ বড় জ্বালা। একটু কিছু করুন না, ডাক্তারবাবু। বড় জ্বালা।"

জীবিতের চিকিৎসা হয়তো কিছু জানি। মৃতের কি চিকিৎসা করিব? শিখি নাই তো

মূঢ়ের মত বসিয়া শুনিতেছি— "বড় জ্বালা—বড় জ্বালা বড় জ্বালা বড় জ্বালা বড় জ্বালা।"

ধীরে ধীরে আর্তস্বর অন্ধকারে মৃদুতর হইয়া মিলাইয়া গেল।

বাতায়ন পথে চাহিয়া বসিয়া আছি।

নীরন্ধ্র অন্ধকারকে চিরিয়া চিরিয়া সর্পাকৃতি বিদ্যুৎশিখা আকাশ ব্যাপিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। সামনের মাঠে কুলগাছটা যেন প্রেতিনীর মত দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মাথায় অসংখ্য জোনাকি। প্রেতিনীর সহস্র জ্বলন্ত চক্ষু যেন অন্ধকারে কাহাকে খুঁজিতেছে।

কাহাকে?

একটা দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকিল।

বইয়ের পাতাগুলা ফরফর করিয়া উড়িতে লাগিল। বইটা তুলিয়া লইয়া আবার গল্পে মন দিলাম।

.....''খুব সঙ্কীর্ণ পথ। দুই ধারে আকাশচুম্বী খাড়া উঁচু পাহাড়। গিরিসঙ্কটের ভিতর বেশ অন্ধকার। মেয়েটির চোখে মুখে একটা চকিত ভাব। রাত্রি আসবার আগে সে এই সঙ্কীর্ণ পথটুকু অতিক্রম করে যেতে পারলে যেন বাঁচে। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মটাস করে একটা গাছের ডাল ভাঙার শব্দ যেন শুনতে পেলাম। অন্ধকারে—প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে, কি যেন একটা দাঁড়িয়ে আছে মনে হল। কি ওটা?

'ছুটে পালাও তুমি'—মেয়েটি মনে হল বলছে। তার মুখ সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ডান হাত দিয়ে সে তার ছোট কুড়ুলের বাঁটটি চেপে ধরেছে।

শক্তি থাকলে হয়তো আমি ছুটে পালিয়েই আসতাম। কিন্তু আমি নড়তে পারলাম না। ভয়ে আমার পায়ের পেশীগুলো যেন অসাড় হয়ে গেল। চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলাম। এইবার সেই বস্তুটাকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম—একটা শ্বেতভল্লুক। ঝোপের ভেতর থেকে মুণ্ড আর সামনের পা দুটো বের করে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। মুখে একগোছা 'বেরি'ফল। তার আহারে আমরা বিঘ্ন উৎপাদন করেছি। প্রকাণ্ড বড় ভল্লুক। গায়ের লোম দেখলে মনে হয়, খুব বড়।

'পালাও' আমিও মেয়েটির কানে কানে বললাম। আমার মনে সহসা কেন জানি না একটা পৌরুষভাব জেগে উঠল। মনে হল, মেয়েটি পালিয়ে যাক, আমি বুক দিয়ে ওকে আগলাব। ভালুকের সঙ্গে লড়তে হয় যদি, তাও স্বীকার। মনে মনে এই পুরুষোচিত সঙ্কল্প করলাম বটে, কিন্তু তখনও আমার সর্বাঙ্গ অবশ। বৃহৎ পশুটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। মেয়েটি কিন্তু পালাল না। সে যা করলে, তাও কেউ যে কোনদিন করতে পারে, তা কখনও কল্পনা করি নি। সে না পালিয়ে ভালুকটার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে সে তার অঙ্গাচ্ছদ খুলে ফেললে। খুলে ফেলে সে আঙুল দিয়ে তার 'ব্রিচেস' ভালুকটাকে দেখাতে লাগল, এই রকম চওড়া 'ব্রিচেস' মেয়েরা পরে। অর্থাৎ সে যে নারী এই কথাটি সে ভালুককে বোঝাবার চেষ্টা করলে। ভালুকটা একবার চেয়ে দেখলে, ফলের গোছাটা মুখ থেকে তার পড়ে গেল। নাসারন্ধ্র থেকে বার দুয়েক ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করে জঙ্গলের নিবিড়তায় দেখলাম সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর ফিরে এল না।

ল্যাপদের ধারণা, শ্বেতভল্লুক মেয়েদের কিছু বলে না—''

''আমরা কিন্তু শ্বেতভল্লুক নই, আমরা মানুষ। নারীমাংসে আমাদের অরুচি নেই।''

''কে?''

চমকাইয়া উঠিলাম।

একটা মুণ্ড শূন্যে ঝুলিতেছে। পুরু পুরু ঠোঁট দুইটিতে পাশবিক একটা হাসি। মাথার চুলগুলো খোঁচা খোঁচা এবং খাড়া। মুখের গোঁফ 'ড়িও সেইরূপ। একটা সজারু যেন সর্বাঙ্গের কাঁটাগুলাকে উদ্যত করিয়া শূন্যে ঝুলিয়া আছে।

''নারীমাংস আমার ভারি প্রিয় জিনিস ছিল। অভাবও কোনদিন হয় নি। বাবা প্রচুর টাকা রেখে গিয়েছিলেন। বাদ সাধল কিন্তু বিবেক। এই বিবেকের টুঁটি চেপে ধরবার জন্যে কি কম আয়োজন করেছিলাম? মোসায়েব, মদ, আফিং, গাঁজা, কোকেন, যত রকম হতে পারে। কিন্তু

পাবলাম না। বিবেককে হত্যা কবতে পাবলাম না। বিবেকই আমাকে হত্যা কবলে। আচ্ছা, ডাক্তাব, হত্যা কবলে মানুষেব ফাঁসি হয়, বিবেকেব ফাঁসি হয় জান? বিবেকেব প্রবোচনায় কত হত্যাকাণ্ড বোজ হয় না? অনেক এক-আধটা নয়, অনেক। অথচ এই বিবেককে কেউ শাস্তি দেয় না, কেমন তোমাদেব আইন?''

লোকটা স্থিব দৃষ্টিতে আমাব দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া বহিল। তাহাব পব নিজেব প্রশ্নেব জবাব নিজেই দিয়া হাসিয়া উঠিল—''আইনেব দোষ কি? বিবেককে তো আব ধবা যায় না। তাব হাতে হাতকড়ি লাগাবাবও উপায় নেই। আশ্চর্য অশবীবী জিনিস এই বিবেক। অথচ কি ভযঙ্কব। আমাব ঘাড ধবে নিয়ে গিয়ে বেল লাইনেব ওপব মুখটা গুঁজড়ে ধবে বেখে দিলে, যতক্ষণ না বম্বে মেলটা আমাব ঘাড়েব ওপব দিয়ে চলে গেল। কিছুতে নডতে পাবলাম না আমি। আচ্ছা, ডাক্তাব, আমাব ধডটা কোথা গেল বলতে পাব? ধডটা না হলে যে চলছে না।''

কাটা মুণ্ড আবাব শূন্যে মিলাইয়া গেল। যেন ওই ক্যালেণ্ডাবখানাব পাশে অন্তর্হিত হইল

সম্মান। একটা ক্যালেণ্ডাব।

তাহাবই দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি। ক্যালেণ্ডাবেব ছবিটাকে এত ভাল কবিয়া আব কোনদিন দেখি নাই। ছাযামুণ্ডটা উহাব পাশ দিয়া মিলাইয়া গেল, তাই ছবিটাব দিকে নজব পডিল। অগ্রাহ্য কবিবাব মত ছবি তো নয়। রূপদক্ষ শিল্পীব অন্তবেব সৌন্দর্যবোধ তুলিব টানে টানে যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। নীলাম্ববী শাডিব আবেষ্টনীতে সুন্দব মুখখানি অপরূপ এতকাল ধবিয়া সম্মুখে টাঙানো আছে, লক্ষ্যই কবি নাই। আশ্চর্য।

মানুষেব জীবনে সব সময়ে সব জিনিস লক্ষ্য কবিবাব সুযোগ আসে না। মানুষ এক সময় একটা জিনিস লইয়াই মাতিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাকি জিনিসগুলাব সহিত সে বাহিক লৌকিকতা বক্ষা কবে মাত্র অন্তব দিয়া একই কালে সমস্ত জিনিসেব সত্তাকে সে সমান আগ্রহে অনুভব কবে না। কবিতে পাবে না। ইহা তাহাব ক্ষমতা ও অক্ষমতা। ফুলকে যখন দেখি, পাখিব কথা বিস্মৃত হই।

চিত্রার্পিতা সুন্দবী একদৃষ্টে আমাব দিকে চাহিয়া আছে। ভাবিতেছি, ছবি কি ভালবাসে? আমাদেব মত উহাব বুকেও কি সুখ দুঃখেব দোলা লাগে? লাগিলেও কি আমাদেব মত বিচলিত হয়? ছবি কি কখনও কাঁদে? হয়তো কাঁদে। আমবা দেখিতে পাই না। ছবিব ক্রন্দনেব ভাষা হযতো অশ্রু নয়, আব কিছু। জড ও চেতনেব মধ্যে সত্যই কি কোন তফাৎ আছে? এই নিখিল বিশ্বেব বিবাট বস্তুপ্রবাহেব মধ্যে কে জড়, কে চেতন, কে ঠিক কবিয়া দিবে? সীমাবেখা কোথায? সীমা বলিয়া কিছু আছে কি? সীমা যদি কিছু থাকে, তবে তাহা আমাদেব বুদ্ধিব। আমাদেব নিজেদেব বুদ্ধি সীমাবদ্ধ বলিয়া আমবা প্রত্যেক জিনিসেব সীমা নির্দিষ্ট কবিতে চাই। সীমা না পাইলে আমবা অসীমেব কল্পনা কবিতে পাবি না। গণ্ডিব ভিতব আছি বলিযাই ভূমাব কল্পনা কবি। ভূমাব কল্পনা কবি, কিন্তু গণ্ডি বচনা কবিতেও ছাডি না। সাবাজীবন নানা ভাবে গণ্ডিব পব গণ্ডি বচনা কবিয়া চলিযাছি। তাহাতেই আমাদেব তৃপ্তি।

অথচ একটু ভাবিয়া দেখিলেই সমস্ত সীমা বিলুপ্ত হইয়া যায়, চেতন জড় হয়—জড়ের চেতন জাগিয়া উঠে। সমস্ত গণ্ডি মুছিয়া যায়। জীবন ও মরণের ব্যবধান আর থাকে না।...

মনে হইল, ছবির চোখেব যেন পলক পড়িল। পীবর বক্ষটি যেন দুলিয়া উঠিল, দীর্ঘনিশ্বাস মোচনের শব্দ যেন পাইলাম। মনে হইতেছে, এইবার যেন কথা কহিবে।

একা অন্ধকার রজনীর নিঃসঙ্গতার মধ্যে ওই ক্যালেণ্ডারের ছবিখানিকে অত্যন্ত নিকট আত্মীয় বলিয়া মনে হইতেছে। ইচ্ছা করিতেছে, উহাকে ডাকিয়া বলি—"হে সুন্দরী, বেখার বন্ধনে কে তোমাকে বন্দী কবিয়া বাখিয়াছে? তুমি প্রাণময়ী হও, সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও। প্রমাণ করিয়া দাও যে, জড় ও চেতনাব কোন প্রভেদ নাই।"

সহসা এক ফালি জ্যোৎস্না আসিয়া বাতায়ন-পথে প্রবেশ করিল। চাহিয়া দেখিলাম মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীয়মাণ চন্দ্র উঠিতেছে। মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম, আশেপাশে এখনও কালো কালো মেঘ ভাসিযা বেড়াইতেছে।

মনে হইল, ওই কৃষ্ণপক্ষেব ম্রিযমাণ চন্দ্রকলাব মুখে একটা বেদনাব হাসি ফুটিয়া উঠিযাছে। সুদূব আকাশ হইতে মনে হইল তাহার কথা আমি শুনিতে পাইতেছি—

"আমাকে দেখিযা অত মুগ্ধ হইযা চাহিযা আছ কেন? এখন তো আমাব মধ্যে মুগ্ধ হইবাব মত কিছু নাই। একদিন ছিল বটে, যখন আমার পর্বতের শিখরে শিখরে আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত মহিমা প্রধূমিত হইয়া উঠিত, প্রতি পরমাণুতে প্রাণের স্পন্দন অনুভব কবিতাম, প্রদীপ্ত জ্বালায় নিজের কক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে একদা আমিও আকাশের দীপালীতে আমাব অন্তর দীপটিকে সগৌরবে তুলিয়া ধবিয়াছিলাম, আজ কিন্তু আমার কিছু নাই। এখন আমি নিবিয়া গিয়াছি। এখন আমি আমার পূর্ব-গৌরবেব কঙ্কাল মাত্র। মহাকাশে প্রেতের মত ঘুরিযা বেড়াইতেছি। জীবন্ত সূর্যের করুণা-কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া এই যে আমার প্রকাশ, ইহাতে আমার গৌরবের কিছুই নাই। আমি মৃত, আমি প্রেতাত্মা।"

মেঘ আসিয়া কৃষ্ণ যবনিকা টানিয়া দিল।

চন্দ্রমা অবলুপ্ত হইল।

একটা ভেকের আর্তস্বর অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিতেছে: সাপে ধবিয়াছে। কোঁক-কোঁক-কোঁক—একটানা একঘেয়ে শব্দ একটা—সুর আছে, তালও আছে।

সঙ্গীত?

মনে হইল কে যেন একখানা অতি শীতল হস্ত আমার কাঁধের উপর রাখিয়াছে। ফিরিয়া দেখি, একটি মেয়ে। কিশোরী, যুবতী, কি বৃদ্ধা বুঝিবার উপায় নাই। একদা হয়তো পরমা সুন্দরী ছিল, জানি না, এখন বীভৎস। সমস্ত মুখখানা ফুলিয়া পচিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে মাংস নাই। বিদীর্ণ স্ফীত উদরটা হইতে পচা অন্ত্রগুলা বাহিরে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বিগলিত দৃষ্টিহীন চক্ষু দুইটি নিষ্পলক।

'কোথা গেল সে? কোথায় হারিয়ে গেল। আমরা যে একসঙ্গে জলে ডুবেছিলাম, আর তো তাকে দেখতে পাচ্ছি না! কোথায় গেল? মরেও কি তাকে পাব না? তাকে যে আমি চাই। ওগো, কে তুমি, খুঁজে দাও না তাকে, আমি খুঁজে পাচ্ছি না যে! চারিদিকে এ কি অন্ধকার –'

হাতড়াইতে হাতড়াইতে মেয়েটি অন্ধকারে ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া গেল। চক্ষু দুইটিতে অন্ধের অর্থহীন দৃষ্টি।

মুখে হাত চাপা দিয়া কে যেন খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখি, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে তাকাইয়া আছেন। মুখটা রক্তহীন, ফ্যাকাশে।

"ভুল ভাবছেন আপনি। সব আত্মহত্যার কারণ প্রেম নয়। আমি প্রেমে পড়ে মরি নি। আমি মরেছি আপন খুশিতে সজ্ঞানে বহাল তবিয়তে। তাই বলে ভাববেন না যে, জীবনে কখনও প্রেমে পড়ি নি। অনেকবার পড়েছি। পড়েছি এবং উঠেছি। কিন্তু আত্মহত্যা করবার প্রয়োজন কোনদিন অনুভব করি নি।"

ভদ্রলোক পিছন দিকে দুই হাত দিয়া শিস দিতে দিতে ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ভাবটা যেন—'আত্মহত্যা করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাতে এমন আর কি হইয়াছে, যাহা লইয়া ক্রমাগত কবিত্ব করিতে হইবে।"

হঠাৎ আমার কাছে আসিয়া আবার তিনি বলিলেন—

"ব্যথা, অভিমান কিছুই নয়। বিদ্রোহ। জীবনে কখনও কোন ব্যাপারে হার মানি নি। এম এ পর্যন্ত সব পরীক্ষায় বরাবর ফার্স্ট হয়েছি। শুধু পড়াশোনাতেই নয়, লেখাতেও ফার্স্ট। এমন কি তাস খেলাতেও।"

ভদ্রলোক স্মিতমুখে আমার দিকে চোখ বড় বড় করিয়া চাহিলেন।

"প্রেমের ব্যাপারেও চিরকাল জিতেছি। পেটের জন্যেও কারও কাছে হাত পাতবার দরকার হয় নি। 'ব্যাচিলার' মানুষ, আনন্দেই ছিলাম। হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখি—কি দেখলাম বলুন তো?"

সকৌতুকে আমার দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"না না, ব্যাঙ্ক ফেল নয়। সকালে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, দু একগাছা চুল পেকেছে। সমস্ত সকালটা মন খারাপ হয়ে রইল। খবরের কাগজে মন দিতে পারলাম না। বন্ধুরা এলেন। আলাপ জমল না।

দিনটা একরকম কাটল। রাত্রে কিন্তু ওই পাকা চুল দুটো বড় জ্বালাতন করতে লাগল। যেই একটু ঘুম আসে, অমনই মনে হয়, যেন মাথার পাকা চুল দুটো সাদা সাদা প্রেতমূর্তির মত সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলছে, ওহে ভাগ্যবান ধনীর দুলাল, এইবার তো সময় হল। এইবার হার মানতে হবে। আর দেরি নেই। ঘুম হল না। এমনই প্রায় রোজ। আমাদের বাড়ির পাশে একজন থুড়থুড়ে বুড়ো থাকত। একদিন স্বপ্নে দেখলাম, সে যেন বলছে, "কি হে ছোকরা, ভারি যে আমাকে অনুকম্পা করতে। এইবার?' বলছে আর হাসছে।"

ভদ্রলোক চুপ করিলেন।

"বুড়োটা সত্যিই সকলের কৃপা পাত্র ছিল মুখে একটি দাত ছিল না চোখে দেখতে পেত না। উপযুক্ত ছেলে মেয়ে নাতি নাতিনী সবাই একে একে চোখের সামনে মরে গেল বুড়োর কিন্তু মৃত্যু নেই। মহাকাল যেন চারকাচ্ছে তাকে ধরে।

আমারও মনে হল এই তো আমারও নোটিস এসে গেছে। এইবার কোনদিন এসে চুলের মুঠিটা ধরবে। তারপর শুরু হবে টানাটানি। এক দিকে ধরবে আত্মীয় স্বজনরা, আর এক দিকে যমদূতরা সেই টানাটানির মধ্যে দারুণ যন্ত্রণায় প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। অসহ্য! এ চিন্তাও অসহ্য। শেষকালে জবাব কাছে পরাভব স্বীকার করব? কেন স্বীকার করব— বিভলভার থাকতে? ভাল করি নি "

হাসিমুখে ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন।

'মাথায় গুলি করি নি। তার কারণ, আমার এমন সুন্দর চেহারাটা নষ্ট করতে মায়া হল। আচ্ছা এখন তো ভাক্তারবাবু আমার মুখের চেহারা ঠিক আছে তো?'

ভদ্রলোক স্মিত মুখে নিজের মুখটা তুলিয়া ধরিলেন। তাহার পর কোটের বোতামগুলি ধরে ধরে খুলিয়া তিনি দুই হাত দিয়া কোটটা ফাক করিয়া বলিলেন —

' … হৃৎপিণ্ডের উপর টোকা দিয়েছি।'

বুকে ঠিক হার্টের উপর নিদারুণ ক্ষতটা দপদপ করিতেছে। মনে হইল যেন হাসিতেছে

ভদ্রলোক কোটের বোতামগুলি লাগাইয়া বলিলেন 'এত সহজে মরেছিলাম তার … পৃথিবীতে … বেঁধে রাখবার মত কেউ ছিল না। বাবা মা ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিলেন সুখের পারাবতের মত কতকগুলি বান্ধব বান্ধবী এসে চারিদিকে বকবকম করতেন বটে কিন্তু তাদের আকর্ষণ এত শক্ত ছিল না, যার খাতিরে জবার অত্যাচার সহ্য করা যায়।'

ভদ্রলোক নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন দেখলাম মুখে হাসি মিলাইয়া গিয়াছে

'ওটা আপনার ভুল ধারণা। সব মৃত্যুর কারণ প্রেম নয়, অপ্রেমও হতে পারে জীবনে আমার কোন বন্ধন ছিল না তাই সহজে মরেছি।"

আবার একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন হঠাৎ মনে হইল, তাঁহার চোখে কি যেন চকচক করিতেছে। অশ্রু নাকি?

ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার পূর্বে ছায়ামূর্তি অন্তর্হিত হইল।

মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, ক্যালেণ্ডারের মেয়েটি হাসিতেছে।

বাতায়ন পথে চাহিয়া বসিয়া আছি।

আকাশের আবার রূপ বদলাইয়াছে। পুঞ্জীভূত মেঘ বিদীর্ণ করিয়া আবার চাঁদ উঠিতেছে। প্রকাণ্ড একখানা নিকষকৃষ্ণ মেঘ চৌচির হইয়া ফাটিয়া গিয়াছে। সেই ফাটল দিয়া অবিরলধারে জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়িতেছে।

সৃষ্টি জুড়িয়া আলো আঁধারের এই চিরন্তন লীলা। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আছে, শেষ পর্যন্ত থাকিবে। রৌদ্রে, জ্যোৎস্নায়, ইন্দ্রধনুতে, বর্ণালঙ্কৃত মেঘমালায় ঋতুতে ঋতুতে আলো

আঁধারের যুগলরূপ নানা বেশে রূপায়িত হইয়া আছে। ইহাদের বিরহ-মিলনের অনবদ্য প্রকাশে দশ দিক সুরঞ্জিত।

আঁধার-বিরহিত আলোক সমস্ত দিনের তীব্র রৌদ্রদাহে কামনা করে স্নিগ্ধ অন্ধকারকে। দিবসের এই আঁধার-কামনা মূর্ত হয় ঘনকৃষ্ণ মেঘমালায়, গভীর জলরাশির ঘন নীল কান্তিতে, অরণ্যের ছায়ার স্নিগ্ধতায়। আলোক-বিরহিত গাঢ় অন্ধকার রাত্রির নির্জনতায় ধ্যান করে আলোকের শুভ্র মূর্তি। অন্ধকারের আলোক-স্বপ্ন মূর্ত হয় লক্ষ কোটি নক্ষত্রে, জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আবেশে, অনন্ত-প্রসারিত শুভ্র ছায়াপথে।

হঠাৎ মনে হইল, আকাশের গায়ে যেন কবির মুখখানা ফুটিয়া উঠল। ওই বিদীর্ণ মেঘখানা যেন তাহার বিদীর্ণ মাথাটা, জ্যোৎস্নাধারা—যেন তাহার বিগলিত মস্তিষ্ক গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। মনে হইল, সমস্ত আকাশ, সমস্ত অন্ধকার পরিপূর্ণ করিয়া কবির গম্ভীর স্বর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল—

"গভীর বিরহ মাঝে কত যে মাধুরী আছে
তৃপ্ত ও অতৃপ্ত কত সাধ।
কত সত্য, কত ভ্রান্তি কত জ্বালা, কত শান্তি,
কত তীব্র হরষ-বিষাদ।
কে বুঝিবে তার মূল্য? কিবা আছে তার তুল্য?
বুঝিবে না—চাহি না বুঝাতে,
চাহি না আনিতে টানি কাহারও সান্ত্বনা-বাণী,—
এই অশ্রু হবে না মুছাতে।
ভরি সর্ব চেতনারে অন্তরে বেদনারে
স্নেহভরে করির লালন
বেদনাই প্রিয়তম চিত্ত ভরি থাক মম,
চাহি না তা করিতে ক্ষালন।"

অকস্মাৎ বাতাসের বেগ বাড়িয়া উঠিল।

প্রকাণ্ড কালো কালো মেঘের দল চতুর্দিক হইতে দানবের মত ছুটিয়া আসিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিল। সোঁ—সোঁ—সোঁ—সোঁ। অন্ধকারের বক্ষ হইতে যেন লক্ষ লক্ষ কালনাগিনী জাগিয়া উঠিয়াছে। চাঁদ ঢাকা পড়িয়া গেল। কবি ও তাহার কবিতা, ঝড়ের বেগে কোথায় উড়িয়া চলিয়া গেল। উন্মত্ত বাতাস ঘরে প্রবেশ করিয়া তাণ্ডব-নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে। টেবিল হইতে একখানা খাম উড়িয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্যালেণ্ডারের হাস্যমুখী তন্বীর অধরে আর হাসি নাই।

সে ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া একটা ক্রন্দন গুমরিয়া উঠিল।

"ডাক্তারবাবু, সেই ছেলেটি কি আর এসেছিল?"

সেই সুন্দরী বারাঙ্গনাটি আসিয়াছে। জীবনে কাহাকেও ভালবাসিতে পারে নাই বলিয়া একদিন গলায় দড়ি দিয়াছিল যে সেই।

সত্যই অপূর্ব সুন্দরী। মৃত্যু তাহাকে মলিন করে নাই।

একটু ইতস্তত করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "সেই বোমার দলের ছেলেটি আবার আসবে কি?"

"কি করবে তা জেনে?"

দেখিলাম, ঠোঁট দুইটি তাহার কাঁপিতেছে।

"ঠাট্টা করবেন না?"

"না।"

"দেখুন, আমার আকণ্ঠ পিপাসায় ভরে আছে। সারা জীবনটা এক বিন্দু ভাল ঠাণ্ডা জল পেলাম না। পচা নর্দমার জল কখনও খাওয়া যায়? জীবনে একটাও নদী দেখতে পাই নি, খালি নর্দমা—কেবল দুর্গন্ধ পচা জল। দারুণ পিপাসায় তাও কতবার তো খেয়েছি। তবু মৃত্যু হয় নি। মরবার জন্যে শেষটায় দড়ি খুঁজতে হল। কিন্তু মৃত্যুর পরও দেখছি, পিপাসা তো সমানই আছে। একটুও কমে নি। সমস্ত সত্তা এক বিন্দু ভাল জলের জন্যে এখনও হাহাকার করছে। একটু জল পেলে যেন বাঁচি। সেদিন সেই কবিকে ঠাট্টা করলাম বটে, কিন্তু সে ঠিকই বলছিল বোধহয়। জীবনে প্রেমের আবির্ভাব হলে ক্ষুদ্র জলাশয় সমুদ্র হয়ে ওঠে, লোহা সোনা হয়ে যায়। সেদিন সেই যে ছেলেটি দেখলাম আপনার কাছে, কোথায় সে? আহা, ঠিক যেন ঝরনা! ও কি—ও কে—এ কি—মৃত্যুর পরও লোকটা সঙ্গে সঙ্গে এসেছে! এখানেও মুখপোড়ারা সঙ্গ ছাড়বে না!"

রমণী অন্তর্হিত হইল।

দেখিলাম, সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি লোক টলিতেছে।

লম্বা শীর্ণ তাহার দেহ। গালের হাড় দুইটা অসম্ভব রকম উঁচু। জবাফুলের মত চক্ষু দুইটা বিস্ময়-বিস্ফারিত করিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে। জড়িতস্বরে শুনিলাম বলিতেছে—

"ডাক্তার, কতখানি মাল আমার পেট চিরে পেয়েছিলে বল তো বাবা? সেদিন কি সোজা মাল টেনেছিলাম! দু বোতল নির্জলা হুইস্কি। পরের পয়সায়। মাইরি বলছি—"

লোকটা আবার টলিতে লাগিল।

"পরের পয়সায় বাজি রেখে খেয়েছিলাম। গলাটা জলে পুড়ে খাক হয়ে গেস্‌ল, মাইরি বলছি। আমার মতন পাঁড় মাতাল সঙ্গে সঙ্গে কাত—কোন্ শালা মিছে কথা বলে—এক্কেবারে বেহুঁশ।"

আবার খানিকক্ষণ টলিয়া সে শুরু করিল—

"পরের পয়সায়, মাইরি বলছি। নিজের পয়সা পাব কোথা? ট্যাঁক তো হরদম গড়ের মাঠ। এক জমিদার-পুত্তুর কাপ্তেন পাকড়েছিলাম, সেই শালার সঙ্গে বাজি রেখে তারই পয়সায় এই কাণ্ড! মাইরি বলছি। ভেবেছিলাম, ঘুমিয়ে পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন তো দেখছি, যা বাবা, সব ফরসা—মরেই গেছি। এমন বেকুব আর জীবনে কখনও হই নি।

মাইরি বলছি হ্যাঁ। আমাদের বিন্দীর গলার আওয়াজটা যেন শুনলাম। আমাদের বিন্দী বাঈজী চেনো তাকে? ভাল নাম বোধহয় বিনোদিনী। বেড়ে নাচে বেটী। ওর কোমর ঘোরানো যদি দেখ একবার। একখানি 'চিজ' মাইরি বলছি।"

এই পর্যন্ত বলিয়া লোকটা বিড়বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিল। চক্ষু দেখিলাম বুজিয়া আসিতেছে। হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া বলিল —"আচ্ছা ডাক্তার, এ অঞ্চলে আবগারির দোকান কোনখানটায় আছে জান কি? মদের ভাঁটি? অন্ততপক্ষে তাড়িখানা? একটু না টানলে কেমন যেন বেজুত মনে হচ্ছে, মাইরি বলছি।"

টলিতে টলিতে লোকটা অন্ধকারে মিলাইয়া গেল

বিনিদ্র নয়নে একা বসিয়া আছি।

মনে হইতেছে ।

বাঁচিয়া আছি, অথচ বাঁচিয়া থাকার অর্থ বুঝি না। মৃত্যুর সহিত প্রত্যহ মুখামুখি দেখা হয়, তাহাকেই চিনি কি? রোজ তো তাহার কত রূপই দেখিতেছি। কত জননীর কোল খালি করিয়া ফুটন্ত ফুলের মত কত শিশু সে ছিঁড়িয়া লয়। আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্যম পূর্ণ কত উন্মুখ জীবন অকালে শেষ করে। কত স্বপ্ন চূর্ণ করে, কত সাধের বাগান বিশুদ্ধ করিয়া দেয়। নির্মম সে, নির্দয় হস্তে নির্বিচারে সংহার করিয়া চলিয়াছে।

আবার সেই একই মরণের আর এক রূপ। করুণাময় আবির্ভাব। অনাহারক্লিষ্ট অভিশপ্ত জীবনের সকল আগুন সে মুহূর্তে নিবাইয়া দেয়, বার্ধক্যপীড়িত জরাগ্রস্ত লোলচর্ম বৃদ্ধের সকল অশান্তির অবসান করে। জীবনের সকল অপমান, সকল লজ্জা, সকল কলঙ্ক, সকল শোক, সকল দুঃখের উপর স্নিগ্ধ অন্ধকার যবনিকা টানিয়া দেয়। মহামুক্তিময় বিস্মৃতির দেশে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়।

গল্প পুস্তকে আবার মনোনিবেশ করিয়াছি।

"ওপারে উঁচু টিবের চড়াই ভাঙিয়া তাহারা প্রকাণ্ড এক জলাভূমিতে উপস্থিত হইল। বরফ শীতল তাহার জল। সেই জল ভাঙিয়া যাইতে হইবে। মেয়েটির চোখে কেমন যেন একটা অনিশ্চয়তার ভাব ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল, সে যেন পথ ঠিক করিতে পারিতেছে না। এই জলাভূমিতে পথ হারাইলেই মুশকিল।

হঠাৎ সে দূরে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "বগ।" দেখা গেল, দূর দিগন্ত হইতে মেঘের মতন কি যেন একটা তাহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

একটু পরেই বোঝা গেল, কুয়াশা। নিমেষমধ্যে তাহারা ঘন কুজ্ঝটিকায় আবৃত হইয়া গেল। দুইজনে দুইজনের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, পাছে পরস্পরকে হারাইয়া ফেলে।

হাঁটু পর্যন্ত বরফ গলা জল

চতুর্দিকে নিবিড় কুয়াশা।

পথ হারাইয়া গিয়াছে।"

"আসল পথ টাকা, বুঝলেন?"

যে ভদ্রলোকটি কলকেফুলের বিচি খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, তিনি আসিয়াছেন।

খড়্গের মত তাঁহার নাকটা আরও যেন উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে, কোটরগত চক্ষুর দৃষ্টি আরও প্রখর।

"টাকা থাকলে পথ হারায় না! মৃত্যুর কুয়াশাতেও পথ পাওয়া যায়। জীবন আর মৃত্যু। আলো আর কুয়াশা, জল আর বরফ!.....কখনও জল জমে বরফ হচ্ছে, কখনও আবার বরফ গলে জল হচ্ছে। ও কিছু নয়, আসল জিনিস টাকা। টাকা থাকলে মৃত্যুও সহনীয় হয়, টাকা না থাকলে জীবনও অসহ্য।"

অদ্ভুত একটা হাসি হাসিয়া ভদ্রলোক অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন—

"টাকাই দরকার। যেমন করে হোক, পরজন্মে প্রচুর ধনী হতে হবে। ওই নির্মল ছোকরাকে চরম শিক্ষা দিয়ে দিতে হবে। শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতিটাও ঠিক করে ফেলেছি। কি করব জানেন? পিছমোড়া করে বেঁধে জ্বলন্ত সাঁড়াশি দিয়ে তার ড্যাবডেবে চোখ দুটো প্রথমেই উপড়ে ফেলব। যদি চীৎকার করে, টুঁটি চেপে ধরব তার—জিব কেটে ফেলব।"

ভদ্রলোক হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বিকট সে হাসি!

"তারপর সর্বাঙ্গ ফালা ফালা করে চিরে নুন, লঙ্কা সেই কাটা ঘায়ে বেশ করে লাগিয়ে দেব---আচারে যেমন করে মশলা দেয়। দয়া-মায়া করব না। একটুও না। দয়া বলে কোনও জিনিস আছে নাকি?...এতেও যদি না মরে, ফুটন্ত তেলে ফেলে পুড়িয়ে মারব তাকে। বউটাকে? তাকে মারব না। তাকে মোটরগাড়ি কিনে দেব। দুনিয়ায় যত মোটরগাড়ি আছে সব কিনে দেব তাকে, আর বলব 'চড়ে বেড়াও'। এক মুহূর্ত বিশ্রাম দেব না। ক্রমাগত মোটরে চড়ে বেড়াতে হবে। দেখি, সে কত মোটর চড়তে পারে! মোটর থামাতে পারবে না—ক্রমাগত ঘুরে বেড়াতে হবে। থামালেই চাবুক। আইন? প্রচুর টাকা থাকলে আইনের ভয় থাকে নাকি? নির্মল যে আমার বউটাকে গালে চড় মেরে কেড়ে নিয়ে গেল, কিছু হল তার? কিছু হল না। টাকা থাকলে কিছু হয় না। টাকা থাকলে পৃথিবীতে কিছুই আটকায় না। মৃত্যুও কিছু করতে পারে না। প্রচুর টাকা দুই হস্তে বিতরণ করে যদি মরতে পারেন, ইতিহাসে আপনার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তৈমুর, চঙ্গিস, নাদির শা, এরা কেউ মরেছে? কত ভাল লোক মরে বিস্মৃতির তলায় তলিয়ে গেল কেবল টাকার অভাবে। টাকা চাই। যেমন করে হোক অনেক টাকা চাই। পরজন্মে কোটিপতি হয়ে জন্মাতে চাই। এর জন্যে যে কোন তপস্যা, যে কোন কৃচ্ছ্রসাধন করতে আমি প্রস্তুত আছি। নির্মলকে একবার দেখে নেব। এমন শিক্ষা তাকে দিয়ে দেব যে, পাথরও শিউরে উঠবে। দলে, পিষে, পুড়িয়ে মেরে ফেলতে চাই। টাকা চাই—টাকা চাই—টাকা—টাকা—টাকা—"

চক্ষু দুইটি হইতে আগুনের হলকা ছুটিতে লাগিল।

ক্যালেণ্ডারের ছবিখানাও দেখিলাম ঔৎসুক আগ্রহে শুনিতেছে। তাহার চক্ষুতেও ভাষা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেও যেন বলিতেছে—

"ঠিক বলিয়াছ বন্ধু, টাকাই সব। আমার এই প্রস্ফুটিত যৌবনটিকে শিল্পীর দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলাম টাকারই জন্য। বর্ণের বন্ধনে বন্দী হইয়া টাকারই বন্দনা করিতেছি। আমার দেহের সমস্ত মাধুরী দিয়া প্রলুব্ধ দর্শকের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে প্রসারিত

করিয়াছি শুধু টাকার জন্য। আমার অঙ্গের এই প্রদীপ্ত বর্ণবিন্যাস, বিকশিত এই যৌবনশ্রী নীরব ভাষায় সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে—টাকা দাও, টাকা দাও, ওগো, কিছু টাকা দিয়া যাও।"

বাহিরে অকস্মাৎ এক ঝলক তীব্র বিদ্যুতের আলো অন্ধকারকে চিরিয়া ঝলসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বজ্রপতনের শব্দ। তাহার পর সব চুপচাপ।

বাতাসের বেগে আলোটা নিবিয়া গিয়াছিল। উঠিয়া আবার জ্বালিয়া দিলাম। জ্বালিয়া দেখি, সেই প্রজাপতিটা আবার উড়িয়া বেড়াইতেছে। একটু আগেই তো পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। মুমূর্ষু ভেকের করুণ আর্তনাদটা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বিমূঢ়ের মত বসিয়া আছি।

সহসা নিজের বিগত জীবনটা মনে পড়িল।

কি দুঃখের সে জীবন। বাবা ছিলেন অতি সামান্য একজন কেরানী। মাহিনা পাইতেন পঁয়তাল্লিশ টাকা। খোলার বাড়িতে বাস করিতাম। আমরা ছিলাম তিন ভাই, পাঁচ বোন। আমাদের এই ধর্মপ্রাণ দেশে কেরানীর ঘরে মেয়ে। কি কষ্ট করিয়াই যে ছেলেবেলাটা কাটিয়াছে, এখন মনে হয়, যেন দুঃস্বপ্ন।

আমার বাবার কথা মনে পড়িতেছে। জীবনে তিনি এতটুকু শান্তি পান নাই। সকালে কোনক্রমে দুইটি ভাত মুখে দিয়া আপিসে যাইতেন, ফিরিতেন রাত্রি আটটায়। ফিরিয়া আসিয়াও যে শান্তি পাইতেন তাহা নহে। বাড়িতে মায়ের গঞ্জনা তাঁহার দৈনিক বরাদ্দ ছিল মায়েরও দোষ ছিল না। তিনিও মানুষ ছিলেন তো, শরীরে রক্ত মাংস ছিল। সুতরাং একটা ভাঙা খোলার ঘরে অতগুলি ছেলেমেয়ে লইয়া একা হাতে সংসার চালাইবার পর মানসিক সামঞ্জস্য রক্ষা করা তাঁহার দ্বারা সম্ভবপর হইত না। মুখে মিষ্ট কথা ফুটিত না। সাধারণ কথাও কটু হইয়া উঠিত। মেয়েরা নীরবে নিজেদের ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্ট হয়তো সহ্য করিতে পারে। কিন্তু সন্তানের দুঃখ বহন করা তাহাদের সাধ্যাতীত। সন্তানদের একটু ভাল খাবার খাওয়াইবার জন্য কিংবা একটু ভাল জামা-কাপড় কিনিয়া দিবার জন্য দরিদ্র জননীরা অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন করেন। আমার মা ও কম কৃচ্ছ্রসাধন করিতেন না। আমার একই মা পয়সা বাঁচাইবার জন্য ধোপানী, চাকরানী, রাঁধুনী সবই ছিলেন। বাড়িতে হাতে সেলাই করিয়া দরজীর কাজও করিতেন। কিন্তু এত পরিশ্রম করিয়াও তিনি তিন পুত্র এবং পাঁচ কন্যার অধিকাংশ অভাবই মিটাইতে পারিতেন না। নিকটেই আর এক উপদ্রব ছিল। পাশের বাড়িতে একজন ধনী থাকিতেন। তাঁহার বাড়িতে নিত্য উৎসব। তিন চারখানা মোটরকার নানা বিচিত্র শব্দ করিয়া বারম্বার যাতায়াত করিত। গ্রামোফোন দিনরাত বাজিতেছে। একদল ফুটফুটে ছেলেমেয়ে। কাহারও চাঁপা-রঙের সুন্দর সিল্কের ফ্রকের উপর দোদুল্যমান বেণী, কেহ 'সেলার্স সুট' পরিয়া বগলে ফুটবল লইয়া চলিয়াছে, কাহারও মুখে সুন্দর বাঁশী, কাহারও হাতে রঙিন বেলুন। নিত্য নূতন খেলনা লইয়া নিত্য নূতন রঙিন পরিচ্ছদ পরিয়া তাহারা আমাদের নয়ন ধাঁধিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। তালি দেওয়া কাপড় এবং শতছিন্ন জামায় অঙ্গ

আবৃত করিয়া আমরা প্রলুব্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিতাম। কি যে ভাবিতাম, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন।

সুতরাং আমার মায়ের মনে শান্তি ছিল না। প্রতিক্রিয়াটা গিয়া পড়িত বাবার উপর। তাঁহার উপরই তিনি যেন শোধ তুলিতেন।

বাবা কোনদিন কিছুই বলিতেন না। এই গঞ্জনাটাও অন্যান্য বহুবিধ দুঃখের মত তিনি নীরবে সহ্য করিতেন। অসাধারণ তাঁহার সহ্যশক্তি ছিল। মা কিন্তু এই সহ্যশক্তির মর্যাদা দিতেন না। এই সহ্যশক্তির জন্যই মায়ের কাছে তাঁহার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। তাঁহাকে কদিন বলিতে শুনিয়াছি—

"মানুষের রক্ত কি তোমার গাযে নেই, না কি? এই যে ছেলেগুলোর গায়ে একটা জামা নেই, মেয়েটা সর্দিতে ঝামরে রয়েছে, দেখতে পাও না তুমি? তোমার ওগুলো মানুষের চোখ, না পাথরের?"

বাবা কখনও কোন প্রত্যুত্তর করিতেন না। তাঁহার মনে কোনদিন কোন বিকার দেখি নাই। আপিসেব জামা-জুতা ছাড়িয়া হাত-মুখ ধুইয়া নির্বিকার চিত্তে তিনি সন্ধ্যাহ্নিক করিতে বসিয়া যাইতেন। হয়তো পবমব্রহ্মের চিন্তাই করিতেন।

"দেখুন তো ডাক্তাববাবু, আমি কি দেখতে খুব খারাপ?"

স্থূলাঙ্গিনী কালো একটি মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

"সত্যি কি দেখতে আমি খুবই বিশ্রী? কেউ আমাকে পছন্দ করলে না। দলে দলে লোক এল আর চলে গেল। কেউ আমাকে পছন্দ করলে না। কিছুতেই বিয়ে হল না।"

মেয়েটি যে কুৎসিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"বলুন না আপনি, আমি কি দেখতে খুব খারাপ?"

অসঙ্কোচে বলিলাম—"না।"

"তবে আমাকে কেউ পছন্দ করলে না কেন? কেন এমন করে আফিং খেয়ে মরতে হল আমাকে? আমার এই দেহটা তো আমি সৃষ্টি করি নি। কে সৃষ্টি করেছিল জানেন আপনি? ঠিকানা জানেন তাব?"

তাহার দুই চক্ষু ব্যাঘ্রীর মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

"এই যে আমার রঙ কালো, ঠোঁট পুরু, সামনের দাঁত উঁচু, নাকের ডগাটা শুকচঞ্চুর মত নয়, এর জন্যে দায়ী কে? আমি তার কাছে জবাবদিহি চাই। আমি তাকে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করতে চাই, কেন তুমি একজনকে রূপসী, আর একজনকে কদাকার করেছ? কেন—কেন—কেন? কি অপরাধ করেছিলাম তোমার কাছে?"

চীৎকার করিতে করিতে সে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

আমার বাবাও কি কম ভুগিয়াছিলেন মেয়েদের লইয়া! এক-আধটা নয়, পাঁচ-পাঁচটি

মেযে। তিনটিব বিবাহ দিতেই তাঁহাব সর্বস্ব বিক্রয হইযা গেল। দেশে দশ বিঘা জমি ছিল তাহাও গেল, পূর্বপুরুষেব ভিটাটি ছিল সেটুকুও গেল। কিছুই আব অবশিষ্ট বহিল না।

"ডাক্তাববাবু, ডাক্তাববাবু।"

সেই অ্যানার্কিস্ট ছোকবাটি ছুটিযা আসিযাছে। ভযে তাহাব মুখ শুকাইযা গিযাছে সর্বাঙ্গ থবথব কবিযা কাঁপিতেছে।

"ওই লোকটাকে চলে যেতে বলুন না। দেখলেই আমাকে তাডা কবছে। এই দেখুন, কামডে দিযেছে।"

সেই দীর্ঘাকৃতি কালো লোকটা আসিযা দাঁডাইল। গলায ক্ষুবেব ক্ষতচিহ্নটা বক্তাক্ত। সমস্ত মুখ হিংস্র। সে চীৎকাব কবিযা বলিযা উঠিল—

"কামডে আমি তোমাব গলাব টুঁটি ছিঁডে ফেলব। জুযাচোব, বদমাযেস, পাজি কোথাকাব। বল, কোথায আমাব মেযে?"

যুবকটি কাতব স্ববে বলিল—"আমায বিশ্বাস করুন। আমি আপনাব মেযেব কোন খবব জানি না। আমি কখনও দেখি নি তাঁকে।"

ভীমগর্জনে লোকটি উত্তব দিল —"তুমি না জান, তোমাব বন্ধুবা জানে। খুঁজে আন, যেখান থেকে পাব খুঁজে আন। তা না হলে তোমাব টুঁটি কামডে ছিঁডে খেযে ফেলব আমি।"

লোকটা মুখব্যাদান কবিযা দুই পাটি প্রখব দন্ত মেলিযা তাহাব দিকে আগাইযা গেল।

যুবক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিযা পলাইযা আত্মবক্ষা কবিল।

"কিচ্ছু শুনতে চাই না আমি। আমাব দোকান ফিবিযে দাও, আমাব মেযে ফিবিযে দাও।"

তাহাব গলাব ক্ষতটা বক্তেব ফেনায ভবিযা গেল।

আবাব সব চুপচাপ।

প্রজাপতিব প্রেতাত্মা আলোকশিখাকে প্রদক্ষিণ কবিযা চলিযাছে।

ইহাদেব সহিত নিজেব জীবন মিলাইযা দেখিতেছি। কি আব এমন বেশি তফাত। বিশেষ কিছুই নাই। যে অবস্থায পডিযা ইহাবা আত্মহত্যা কবিযা মবিযাছে, সেই অবস্থায আমিও তো পডিযাছিলাম। কেন যে আত্মহত্যা কবি নাই, আশ্চর্য।

আমি যেবাব আই. এস-সি পাস কবিলাম, তখন ছোট ভাই দুইটি ম্যাট্রিক ক্লাসে। দুইজনেই তাহাবা এক ক্লাসে পডিত। আমবা তিনজনেই লেখাপডায ভাল ছিলাম, ক্লাসে কেহ কখনও সেকেণ্ড হই নাই। স্কলাবশিপেব টাকাতেই আমাদেব লেখাপডাব খবচ ববাবব চলিযাছে। আমাদেব নানা দৈন্যেব মধ্যে এইটুকুই সুখ ছিল।

যেবাব আমি আই.এস-সি পাস কবিলাম, সেইবাবই বাবা আব কালবিলম্ব না কবিযা আমাকে তাঁহাব আপিসে ঢুকাইযা দিলেন। ইহাব ঠিক পবে যাহা ঘটিল, তাহাব মত আশ্চর্য ব্যাপাব আমি জীবনে আব দেখিযাছি বলিযা মনে হয না। হযতো কাকতালীযবৎ ঘটনা, কিন্তু খুবই বিস্ময়জনক।

যেদিন আমার চাকরি হইল, সেই দিনই বাবারও মৃত্যু হইল। আশ্চর্য সেই মৃত্যু! রাত্রে রোজ যেমন খাওয়া দাওয়া করিয়া শুইয়া পড়িতেন, সেদিনও তেমনই শুইয়াছিলেন। কোন অসুখ ছিল না। সকালে উঠিয়া আমরা দেখিলাম, তিনি মারা গিয়াছেন। আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রের চাকুরি জুটাইয়া দিয়া আশা করি তিনি পরম নিশ্চিন্তেই অন্তিম নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন। অবনী ঠাকুরের "শেষ বোঝা" ছবিটা দেখিয়া বাবার কথা মাঝে মাঝে মনে হয়।

আর মা?

তিনিও কি কম দুঃখ-কষ্ট পাইয়াছেন জীবনে! দরিদ্র জননীর অন্তর্নিহিত ব্যথা বেদনার পরিমাপ করা আমার সাধ্যাতীত। কত অপূর্ণ সাধ, কত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মাতৃ-হৃদয়কে আলোড়িত করিত তাহা জানি না। এইটুকু জানি যে, বহুদিন তিনি অনাহারে কাটাইতেন। নানারূপ ব্রত উপবাস তো ছিলই। আহারও সব দিন কুলাইত না। বাবার মৃত্যুর পর আমাদের আয় কমিয়া গিয়াছিল। যাহা জুটিত তাহা অল্পই, এবং তাহার সমস্তটাই মা আমাদের দিয়া নিজে কোন ছুতায় উপবাস করিতেন।

"ডাক্তারবাবু, এ তো বেঁচে নেই, কেন মিছে কথা বলে আমাকে ভোলাচ্ছ তুমি?"

সন্তানহত্যাকারিণী সেই জননী, আর তাহার কোলে সেই মৃত শিশু।

"এ কি কখন বাঁচতে পারে? বাঁচা কি সম্ভব? মা যখন নিজের ছেলের গলা টিপে ধরে, তখন সে ছেলে কি আর বাঁচে? আমার মত পিশাচী আর কজন দেখেছ তুমি ডাক্তারবাবু? পৃথিবীতে কি রোজ এমনই শিশুহত্যা হয়? অনেক হয়? চন্দ্রসূর্য কি উঠছে এখনও? ভূমিকম্পে পৃথিবী এখনও ফেটে যায় নি?

মৃত সন্তানটিকে বুকে জড়াইয়া চাপিয়া ধরিল।

"বাছা আমার বাছা আমার –"

অনেকক্ষণ কাহারও মুখে কোন কথা নাই।

তাহার পর ধীরে ধীরে সে আমার আরও কাছে আসিয়া বলিল—

"কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার কি জান ডাক্তারবাবু? কি বল তো? তাকে এখনও আমি ভুলি নি। সেই কালসর্প এখনও বসে আমার মনের বাঁশি শুনছে। ফণা বিস্তার করে এখনও আমার বুকের ভেতর কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে সে। কিছুতেই নড়বে না। কিছুতেই তাকে তাড়াতে পারছি না। একটা উপায় বলে দাও, কি করলে আমি সব ভুলতে পারি, আমায় বলে দাও, কি করে এই স্মৃতির হাত থেকে রক্ষা পাই, আমাকে সমস্ত ভুলিয়ে দাও তুমি।"

তাহার শুষ্ক নয়ন-পল্লবে এক ফোঁটা জল নাই।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল, সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা জলের ঝাপটা। বাহিরের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন! বৃষ্টি নামিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী অঝোরঝরে কাঁদিতেছে। বিদ্যুৎ নাই, বজ্র নাই, কেবল বৃষ্টি। অশ্রান্ত কান্নার মত অবিশ্রান্ত বর্ষণ।

ক্যালেণ্ডারের ছবিটার দিকে চাহিয়া দেখিলাম।

তাহার চোখেও জল।

বর্ষণমুখরিত অন্ধকারকে বিক্ষুব্ধ করিয়া কবির গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতে লাগিল—

"পড়ি নাই ঘুমায়ে তো, ছিলাম না জাগিয়াও,
চোখে এসেছিল বুঝি তন্দ্রা!
সেই তন্দ্রার ঘোরে এসেছিলে সখী মোর—
আহা যেন গীতি মধু-ছন্দা!

তন্দ্রায় ভর করি
এসেছিলে মরি মরি
জাগরণে বসে আজি সে কথা স্মরণ করি,
সে কথা গুমরি ওঠে গভীর আঁধার ভরি
বুকে করি রাখে নিশিগন্ধা!

সে স্বপন ক্ষণিকার,
জ্যোতি যেন মণিকার
মনের আঁধার ভরি ঠিকরিছে অনিবার,
আকাশের শশীতারা সে আলোক-কণিকার
প্রসাদ না পেলে হত বন্ধ্যা!"

চতুর্দিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। রিম-ঝিম রিম-ঝিম বর্ষণের সুরের সহিত কবির উদাত্ত গম্ভীর স্বর এক অপরূপ ঐকতান সৃষ্টি করিল। জানালা দিয়া হিমশীতল বাতাস প্রবেশ করিতেছে। কম্পমান দীপশিখাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রেত-পতঙ্গটি অবিরাম ঘুরিয়া মরিতেছে। কবি ধীরে ধীরে আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার বিদীর্ণ মস্তক হইতে কপাল বাহিয়া বিধ্বস্ত মস্তিষ্কটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। অনাবৃত মস্তিষ্কের উপর বৃষ্টির ছাট লাগিতেছে। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, কালো কালো যাহা লাগিয়া আছে, তাহা রক্ত নয়—কাদা। কবি আসিল ও আবার ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

আমিও প্রেমে পড়িয়াছিলাম।

বাবা কত কষ্ট করিয়া যে চাকরিটি যোগাড় করিয়া দিয়া মারা গেলেন, আমি তাহা রাখিতে পারিলাম না। এক মাস যাইতে না যাইতে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম।

কেন আসিলাম? নিজেকে সহস্রবার জিজ্ঞাসা করিয়া যে উত্তর পাইয়াছি, তাহা সদুত্তর নহে।

আত্মসম্মানে আঘাত লাগিয়াছিল সত্য, কিন্তু ঠিক সেইজন্যই যে আমি চাকুরি ছাড়িয়া দিলাম, তাহা সত্য নহে। আরও একটা কারণ ছিল। প্রেমে পড়িয়াছিলাম। মানুষ যখন প্রেমে পড়ে, তখন কোন হীন কাজ করিতে সে সঙ্কোচবোধ করে। তাঁহার কাছে নিজেকে একটা কুড়ি টাকা মাহিনার কেরানী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা করিত।

পঙ্ক হইতেই পঙ্কজের উদ্ভব। আমার দারিদ্র্যের মলিনতাকে ধন্য করিয়া জীবনে প্রেমের ফুল ফুটিয়াছিল। কালো মেঘে কি আলো প্রতিভাত হয় না?

এক সহপাঠীর বাড়িতে আমার গতিবিধি ছিল। কলেজে ভাল ছেলে বলিয়া আমার খাতির—সরস্বতীর দরবারে ধনী দরিদ্রের জাতিভেদ নাই, সেখানে আমার ললাটেই বিজয়ীর বরমাল্য। চেহারাও খুব যে কুৎসিত ছিল, তা নয়। সুতরাং আমার বন্ধুর ভগ্নী মুগ্ধ হইলেন, আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। আমিও মুগ্ধ হইলাম।

জীবনে নূতন পালা শুরু হইল।

"গল্পটা বেশ জমিয়েছেন তো!"

ফিরিয়া দেখি, একটা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ভিখারী দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। হাতে একটিও আঙুল নাই। নাক মুখ চোখে কুৎসিত ব্যাধিটার প্রকোপ নিদারুণ বীভৎসতায় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

"গল্পটা বেশ জমিয়েছেন আপনি। কিন্তু তার আগে আমার কবিতাটা শুনে নিন। যদিও জীবনে কবি বলে বাজারে নাম ছিল না, আমার একটা কবিতাও কখনও মাসিকপত্রে বেরোয় নি; কিন্তু আমার মনে কবিতা ছিল! যদিও খেতে পেতাম না, ভিক্ষে করে খেতে হত, তবু আমি কবি ছিলাম।"

বলিয়া সে কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল—

"চিরটা কাল কষ্ট পেলাম
জীবনভরা দুঃখ-জরা
মধ্যে মাঝে ভুলে যেতাম
সুন্দরী এ বসুন্ধরা।

সবুজ কচি দূর্বাদলে
স্বর্ণরবি পূর্বাচলে
কজ্জলিত স্নিগ্ধ মেঘে
মুগ্ধ হত মনটা ঠিকই

কিন্তু তবু সর্বখনে
সর্বদেশে সর্বমনে
ব্যাধি এবং ক্ষুধার জ্বালা
কি যন্ত্রণা বলুন দিকি!

কি যন্ত্রণা ভোগ করেছি
হায় রে, অহোরাত্রি ভরা,
মধ্যে মাঝে ভুলে যেতাম
সুন্দরী এ বসুন্ধরা।
কোন্ লগনে, কার তাগিদে,
কিসের মোহে, কাহার স্নেহে,
কোন্ জননী জন্ম দিল
জানি না তো সে কোন্ গেহে!

অভাগাটার জন্য হা রে
কোন্ রমণী স্তন্যধারে
সুধার ধারা ঝরিয়েছিল
ঠিকানা তার দিল না কেউ!
সত্যি সে কি আমার লাগি
দীর্ঘ নিশি থাকত জাগি?
মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা!
আমার কভু ছিল না কেউ।

স্নেহের কভু দেয় নি আভাস
ব্যাধিই দিল সর্বদেহে
কোন্ জননী জন্ম দিল
জানি না তো সে কোন্ গেহে!

কাহার পাপে জন্ম হল?
কাহার শাপে হেথায় এলাম?
কোথা সে মোর পিতামাতা,
যাদের লাগি শাস্তি পেলাম!

নাকটা বসা—চোখটা কানা
দুষ্ট ব্যাধি অঙ্গে নানা
কুষ্ঠ বলে করত ঘৃণা
সুস্থ যারা মর্ত্যবাসী।
লজ্জানত মস্তকেতে
তাদের দ্বারে হস্ত পেতে
পেটের দায়ে তাড়িয়ে কুকুর
কুড়িয়ে খেয়ে শুকনো বাসি।
দিন কেটেছে মর্ত্যলোকে;
এর বেশি আর কিবা পেলাম!
মোটর চাপা পড়ে সেদিন
সত্যি আমি বেঁচে গেলাম।
একটি শুধু দুঃখ আমার
ত্রাণ করেছে যে আমারে
সে নাকি আজ পাচ্ছে সাজা
মর্ত্যলোকে কারাগারে!

আমার কথা ভুলে গেলেন ডাক্তারবাবু? আমার সেই মোটর-চাপা শবদেহটা আপনি কেটে-ছিঁড়ে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। এত করেও কিন্তু সুবিচার করতে পারলেন না আপনারা। বিচারে 'ড্রাইভার' বেচারা দোষী বলে সাব্যস্ত হল। কিন্তু সে বেচারার কোন দোষ ছিল না। আমি ঝাঁপিয়ে গিয়ে তার মোটরের তলায় পড়ে আত্মহত্যা করেছিলাম। সে আমাকে চাপা দেয় নি। সাধ্যমত বাঁচাবার চেষ্টাই করেছিল। আপনারা সবাই দয়ালু, সবাই আমাদের বাঁচাবার চেষ্টাই করেন।"

লোকটাব চোখ-মুখে একটা অদ্ভুত বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল—"আপনারা সবাই মহাদয়ালু, আপনারা সক্কলে—কেউ কখনও একটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে, কেউ এক মুঠো চাল দিয়ে, কেউ—"

হঠাৎ তাহার কথা থামিয়া গেল। সে সামনের দেওয়ালটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া নিস্তব্ধ হইয়া গেল। দেখিলাম, সে ক্যালেণ্ডারের ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছে। মুখে একটি কথা নাই। ক্যালেণ্ডারের ছবিখানাও দেখিলাম তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।

সেই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকটা ধীবে ধীরে সেই ছবিখানার দিকে আগাইয়া গেল। ছবিটার সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইযা বলিতে লাগিল—

"তোমাকে যেন চিনি বলে মনে হচ্ছে। তুমিই কি আমার মা? এত আপনাব বলে মনে হচ্ছে কেন তোমাকে? কে তুমি—বল, বল, কথা কও, কে তুমি? ঠিক তুমি আমার মা। আমার মা! এত সুন্দরী ছিলে তুমি, অথচ আমি এত কুৎসিত!"

একটা দমকা হাওয়া ঘবে ঢুকিয়া ক্যালেণ্ডারখানাকে মেঝেতে ফেলিয়া দিল। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকটা সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইল। আমি উঠিযা ক্যালেণ্ডারখানা কুড়াইযা আবার টাঙাইয়া বাখিলাম।

ছবিখানা কাঁদিতেছে?

মেয়েমানুষ কত সহজে কাঁদে—আবার কত সহজে হাসে। সেও কাঁদিযাছিল। যে মুহূর্তে নিঃসংশয়ে ঠিক হইয়া গেল যে আমাদের মিলন অসম্ভব, সে মুহূর্তে আমার বুকে মুখ লুকাইয়া সে কি কান্না! বিবাহের পর আবার তাহাকে হাসিতেও দেখিয়াছি। সর্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার, সীমন্তে সিন্দুব, দেহের প্রতি পরমাণুতে যৌবনের মাদকতা। ধনীর দুহিতা, ধনীর বনিতা, ধনীব পুত্রবধূ। হাসিবে না কেন? তাহার কান্নাও যেমন সত্য, হাসিও তেমনই সত্য।

জীবনে আমার সেই প্রথম প্রেম এবং প্রথম ব্যর্থতা। যাহাকে ভালবাসি সে যখন চলিয়া যায়, তখন মনে হয়, বিশ্বের হাটে একেবারে দেউলিয়া হইয়া গেলাম যেন। মূলধন যে তখনই হাতে আসিল, সে কথা বুঝিতে দেরি লাগে।

তাহাকে পাই নাই ইহাই তো পরম দুঃখ। কিন্তু যখন বুঝিলাম যে, আমি গরিব বলিয়াই তাহাকে পাই নাই, তখন সে মর্মান্তিক বেদন৷ হীনতার ছোঁয়াচ লাগিয়া অত্যন্ত শ্রীহীন হইয়া উঠিল। নিজেই নিজেকে বিদ্রূপ করিয়া বারম্বার হাসিলাম—"বামন হইয়া চাঁদে হাত দিবার শখ মিটিয়াছে তো? যাহাকে অতবড় একটা নেটিভ স্টেটের দেওয়ান সাধিয়া পুত্রবধূপদে বরণ করিয়া লইয়া গেল, তাহাকে তুমি অধিকার করিতে চাও! স্পর্ধা তোমার কম নয়!"

সত্যই আমার স্পর্ধা কম ছিল না। গগনস্পর্শী স্পর্ধা অচিরেই ধুলিসাৎ হইল।

আরও কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা আমার অদৃষ্টে বাকি ছিল। দারিদ্র্যের অনল চতুর্দিক হইতে শত শিখা বিস্তার করিয়া আমাকে বেড়িয়া ধরিল।

নিঃসম্বল অবস্থায় বাড়িভাড়া দিয়া থাকা সম্ভব ছিল না। যতদিন আমি একটা কিছু জুটাইতে না পারি, ততদিন যদি মামারা আশ্রয় দেন—এই আশা লইয়া মা আমার চতুর্থ বোনটিকে লইয়া পিত্রালয়ে গেলেন। আমি একটা খোলার ঘরে বাকি কয়জনকে লইয়া সংবাদের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

সমস্যার সমাধান হইয়া গেল কিন্তু অন্য প্রকারে। মা চলিয়া যাইবার দুই দিন পরে আমার দুই ভাই এবং ছোট বোনের এক দিনে কলেরা হইল। আমি যে কেন রক্ষা পাইলাম জানি না। গরিবের ঘরে কলেরা হইলে যে কি ব্যাপার হয়, তাহা চোখে না দেখিলে বুঝিতে পারা শক্ত। সে দৃশ্য আমি জীবনে কখনও ভুলিব না।

তখন দীন-দরিদ্র আমরা ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসা করাইবার কথা ভাবিতেও পারি না। ওলাবিবির শরণাপন্ন হইলাম। ওলাবিবিও দয়া করিলেন না। তখন একদিন এক দাতব্য-চিকিৎসালয়ে ভিখারীর দলে গিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইলাম ডাক্তারবাবুর দাক্ষিণ্যের আশায়। শুনিয়াছিলাম, দরিদ্রদের জন্য দাতব্য-চিকিৎসালয়; সেখানে গিয়া দেখিলাম দরিদ্রের দল এক জায়গায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে বটে, ডাক্তারবাবু তাহার বড়লোক রোগীদের লইয়া ব্যস্ত। প্রায় দেড় দুই ঘণ্টা কাল দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা চাকুরি করেন, চিকিৎসা করিবার অবসর তাঁহাদের নাই। এই ভিখারীর দলকে এগারোটার মধ্যে বিদায় করিতে হইবে—এই তাঁহাদের লক্ষ্য। এই যাঁহার লক্ষ্য, সমাগত দেড় শত লোকের নানাবিধ ব্যাধির বিস্তৃত ইতিহাস শুনিবার ধৈর্য তাঁহার থাকিবার কথা নয়।

সুতরাং আমার কথা শুনিতে শুনিতেই ডাক্তারবাবু প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখিতে শুরু করিলেন এবং কথা শেষ হইবার পূর্বেই প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনখানা আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"যাও, দিনে রাতে তিনবার করে খাওয়াবে। বার্লি ছাড়া আর কিছু খেতে দিও না।"

বলিলাম, "তাদের পেটে জল পর্যন্ত থাকছে না—।" এ কথা ডাক্তারবাবু বোধ হয় শুনিতে পাইলেন না। কারণ তখন সামনে একজন মোটা লোক জিভ বাহির করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ডাক্তারবাবু জিভের দিকে লক্ষ্য না করিয়া এক হাতে তাহার নাড়ীটা ধরিয়া অন্য হাতে লেখনী চালনা করিতেছেন।

হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল।

ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিলাম, জীবনে তাহা কোনদিন ভুলিব না। গিয়া দেখিলাম, একজনও বাঁচিয়া নাই। মরিয়া যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু কি ভয়াবহ সে মৃত্যু! মল-মূত্র-বমির মধ্যে জড়াজড়ি করিয়া তিনজন শুইয়া আছে। মানুষ নয়, যেন কৃমি!.....তাহাদের সেই জ্যোতিঃহীন নিশ্চল চক্ষুগুলি আজও আমি ভুলি নাই। তিনটি সুন্দর ফুলকে ছিঁড়িয়া, মলিন করিয়া, চিতার আগুনে ফেলিয়া দিয়া মহাকাল যেন হা-হা করিয়া হাসিতেছে।

আজ আমি ডাক্তার হইয়াছি। অনেক কলেরা-রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আজ দরিদ্রের ক্রন্দনে আমার হৃদয় বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। মনে হয়—

"শোন, শোন।"

সেই বিন্দি। অ্যানার্কিস্ট যুবকটিকে ডাকিতেছে। বিন্দির সে চেহারা নাই। সুন্দর খোঁপা

বাঁধিয়াছে, খোঁপায় বেলফুল গোঁজা। এত সব পাইল কোথা! গালে রঙ, ঠোঁটে রঙ, সুন্দর টানা-টানা চোখ দুইটিতে কাজল পরিযাছে। পরনে মখমল-পাড় সুন্দর ফিনফিনে শাড়ি। রীতিমত মোহিনী বেশ।

অ্যানার্কিস্ট যুবকটি বলিল—"কি বলছ?"

ফিক করিয়া হাসিয়া বিন্দি বলিল--"বেশি কিছু নয়, আমার পেছনে এই সেফ্‌টিপিনটা লাগিয়ে দাও না, এই পিঠের দিকে।"

বলিয়া রঙ্গভবে পিছু ফিরিয়া দাঁড়াইল।

অ্যানার্কিস্ট ছোকরাটি একটু ইতস্তত কবিয়া শেষে সেফটিপিন লাগাইয়া দিতে লাগিল।

লাগানো তাহাব আর শেষই হয না।

যে হতভাগিনী বাঁচিয়া থাকিতে পুরুষেব মনোযোগেব জ্বালায অস্থির হইযা গলায দড়ি দিযাছিল, মৃত্যুব পব সেও অভিসাবিকা সাজিযাছে এবং ভুলাইতেছে সেই ব্যর্থ প্রণযীকে, যে নাবীব উপব অভিমান করিয়া সায়ানাইড গিলিযাছিল শান্তির আশায।

বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, ঝড়েব বেগ প্রশমিত হইতেছে। পাতলা মেঘেব স্তর ভেদ কবিয়া জ্যোৎস্নার আভাস ফুটি ফুটি কবিতেছে। বৃষ্টি এখনও সম্পূর্ণ থামে নাই। সামনেব মাঠে ফুলগাছটা দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে। প্রেতিনীব সমস্ত চক্ষু অন্ধ হইযা গিযাছে। জোনাকি একটিও নাই। একটা অস্ফুট মর্মবধ্বনি সমস্ত অন্ধকাবকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। কাছে দূবে অবিবাম ঝিল্লীবব। সহসা খানিকটা মেঘ সবিযা গেল। দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ফুটিযা উঠিল। মনে হইল, যেন কাহাব দুইটি আঁখি কৌতুকভরে আমাব দিকে চাহিযা আছে। দেখিতে দেখিতে আবাব তাহা মেঘে ঢাকিযা গেল।

বৃষ্টিব শব্দ কমিযা আসিতেছে।

ভেকের আর্তরবটা এখনও শোনা যাইতেছে।

এখনও তাহার মৃত্যু হয নাই।

আমবাও কি ওই সর্প কবলিত ভেকেব মত পলে পলে মরিতেছি না?

মহাকাল কৌতুকও কবিযাছেন মাঝে মাঝে। জীবন যখন দুঃসহ হইযা উঠিযাছিল, যখন নিজের অভিশপ্ত জীবনটাকে কোথায লুকাইব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না, যখন অকূল পাথারে ঝঞ্ঝা আর ঢেউ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়িতেছিল না, তখন সহসা কূল দেখা দিল। আমার সহপাঠী বন্ধুর পিতা আমার দুঃখের ইতিহাস শুনিয়া আমার প্রতি দয়াপরবশ হইলেন। তাহারই কৃপায় এবং অর্থ সাহায্যে আমি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইলাম। আমার মা অনূঢ়া ভগ্নীটিকে লইয়া পিত্রালয়ে রহিয়া গেলেন। আশা করিতে লাগিলেন, আমি ডাক্তার হইয়া বাহির হইলে সমস্ত দুঃখের অবসান হইবে।

মায়ের গহনাগুলি বিক্রয় করিয়া সানন্দে কলেজের বই কিনিয়া ফেলিলাম। ওই গহনাগুলিই ছিল আমাদের শেষ সম্বল। রহিল শুধু মায়ের আশীর্বাদ এবং আমার অদৃষ্ট।

পড়াশোনার ব্যাপারে অদৃষ্ট বরাবরই ভাল ছিল। ভারতী কোনদিন বরদান করিতে সঙ্কোচ করেন নাই। মেডিকেল কলেজের সমস্ত পরীক্ষাগুলিতেই ফার্স্ট হইলাম। সমস্ত স্কলারশিপ এবং মেডেল আমার করায়ত্ত হইল।

হইল তো, কিন্তু আবার দুঃখের পালা আসিল। নির্মল আকাশ মেঘে ছাইয়া গেল—বজ্র বিদ্যুতের ঘটায় আবার চতুর্দিক শিহরিয়া উঠিল।

আমার বন্ধুর পিতা, যাঁহার করুণায় মেডিকেল কলেজে ঢুকিয়াছিলাম, অকস্মাৎ একদিন মারা গেলেন। দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হইলাম। শুধু পিতৃহীন হইলাম যে তাহা নয়, বন্ধুহীনও হইলাম। আমার বন্ধু বি. এস-সি পড়িতেছিলেন, তিনি একদিন আসিয়া আমাকে বলিলেন—"তুমি ভাই ওই মড়ার হাড়-টাড় নিয়ে বাইরের ঘরটাতে থাক—মা এসব পছন্দ করছেন না। আমিও আজ কদিন থেকে এমন সব বিশ্রী স্বপ্ন দেখছি রাত্তিরে—"

মড়ার হাড় লইয়া আমি তো দুই বৎসর আছি। এতদিন তো মায়ের কোন আপত্তি উঠে নাই—বন্ধুও স্বপ্ন দেখেন নাই! হঠাৎ এই সব হইতে শুরু করিল কেন? কেন যে এমন হইল, প্রথমে তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমার ব্যবহারে নালিশ করিবার মত কিছুই ছিল না। তবে কেন এমন হইল?

অনেক দিন পরে বুঝিয়াছি, ইহার কারণ কি। কারণ আর কিছুই নয়, কারণ আমার কৃতিত্ব। আমি ভাল ছেলে, প্রতি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইতেছিলাম। অথচ আমার বন্ধু বি. এস-সি পরীক্ষায় বারম্বার ফেল করিতেছিলেন। ইহাই তো যথেষ্ট গ্লানির কারণ। ঈর্ষা মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি। খুব কম লোকই ইহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই ঈর্ষা না করিতে পারে এমন জিনিস নাই। অধিকাংশ কলহের মূলে এই ঈর্ষা হয় প্রত্যক্ষভাবে, না হয পরোক্ষভাবে বিরাজমান।

যাই হোক, ইহার ফল দাঁড়াইল এই যে, আমার বন্ধুর বাড়ি হইতে আমাব বাস উঠিল। তাঁহাদের বাড়িতে দুই বেলা খাইতে ও শুইতে পাইতাম, তাহা বন্ধ হইয়া গেল।

বোঝাব উপর শাকেব আঁটিটাব মত প্রাইভেট ট্যুইশনির ভারও স্কন্ধে তুলিয়া লইলাম। সমস্ত দিন কলেজের হাড়ভাঙা খাটুনির পর একটি ধনীর দুলালকে লইয়া বসিতাম। কি যে তাহাকে পড়াইতাম, তাহা জানি না। বস্তুত কিছুই পড়াইতাম না। সে আপন মনে যাহা খুশি করিয়া যাইত, আমি বসিয়া বসিয়া তাহা দেখিতাম। তাহাকে জোব করিয়া কিছু করিতে বলিলে সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিত। শীর্ণকায় বিষণ্ণ একটি দশ বৎসবের শিশু—নাকটা বসা, দাঁতগুলা খাওয়া-খাওয়া। পিতা-মাতার নয়নমণি। তাহাকে কিছু বলিবার জো নাই। তাহার পড়াশোনা কিছুমাত্র অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া তাহার বাবাকে একদিন বলিলাম—"ছেলেটিকে একটু শাসন করা দরকার।" ভদ্রলোক নির্বিকারচিত্তে উত্তর দিলেন—"শাসন করবার দরকার নেই! সেজন্য আপনাকে রাখা হয় নি। আপনি সন্ধ্যেবেলাটা ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আটকে রাখুন। পড়াশোনা একটু আধটু করে ভাল, না করে বেশি জোরজবরদস্তি করবার দরকার নেই। দেখবেন খালি, সন্ধ্যেবেলা কিছুতে যেন ওপরে না যায়।" ভদ্রলোক বেশ মোটা রকম বেতন দিতেন। তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিলাম না। কিছুদিন পরেই বুঝিয়াছিলাম, ছেলেটির সন্ধ্যার সময় উপরে যাওয়ার বাধা কি। ছেলেটির মা পাগল। তাঁহাকে একটি ঘরে তালাবন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় তাঁহাকে জোর করিয়া কিছু খাওয়ানো হয়। জোর করিয়া মুখ ফাঁক করিয়া নল দিয়া খানিকটা খাবার প্রত্যহ তাঁহার মুখে ঢালিয়া না দিলে তিনি অনাহারে মারা যাইবেন—ডাক্তারেরা এইরূপ আশঙ্কা

করিয়াছেন। জোর করিয়া খাওয়ানো ব্যাপারটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু জিনিস। ভদ্রলোক তাই নিজের পুত্রকে নীচে আটকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। লেখাপড়া উপলক্ষ মাত্র।

"আমি তোমাকেই বিয়ে করব। তোমার তো চোখ নেই—তুমি তো দেখতে পাও না। তোমাকেই বিয়ে করব আমি।"

সেই কালো মোটা মেয়েটি কথা কহিতেছে। সম্মুখে একটা কবন্ধ দুই লোলুপ বাহু প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

মেয়েটি বলিতেছে—"ওগো, তুমিই আমাকে নাও। যাদের চোখ আছে, তারা আমার কষ্ট দেখতে পেলে না। তোমার ভাষা নেই, তোমার চোখ নেই, তুমি হয়তো আমার ব্যথা বুঝবে।"

একটা দমকা বাতাস ঘরে ঢুকিয়া আলোটা নিবিয়া গেল।

উঠিয়া আবার আলোটা জ্বালিলাম। দেখিলাম, কেহ নাই। কেবল ঘরের মধ্যে খামখানা পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। তুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিলাম। দরকারী চিঠি।

পাগল মায়ের একমাত্র ছেলেকে আটকাইয়া আমার প্রতিসন্ধ্যা কাটিত। ইহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইলে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, ভদ্রমহিলা কেন পাগল হইয়াছিলেন। কারণ আর কিছুই নয়, উপর্যুপরি সাত-সাতটি সন্তান মারা গিয়াছে। এই ক্ষীণজীবী পুত্রটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। সাতটি সন্তানের মৃত্যুর কারণও পরে জানিতে পারি। ভদ্রলোকের দারুণ চরিত্রহীনতা। এত শোক পাইবার পরও তাঁহার স্বভাব বদলায় নাই। পাগলিনী স্ত্রীকে তেতলার ঘরে তালাবন্ধ করিয়া রাখিয়া, ছেলেটিকে আমার তত্ত্বাবধানে দিয়া ভদ্রলোক প্রতিদিন দেখিতাম অভিসারে বাহির হইতেন। গায়ে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে পেটেন্ট লেদারের পাম্‌শু, হাতে যুঁইফুলের মালা জড়ানো। মদিরা-পানে চক্ষু দুইটি আরক্ত, ডান হাতে একটি দামী সিগার—চকচকে দামী মোটরে চড়িয়া বাহির হইয়া যাইতেন। রাত্রে ফিরিতেন না। মানুষের মধ্যে এই কামপ্রবৃত্তিটা ভগবান দিয়াছিলেন হয়তো সৃষ্টিরক্ষার জন্য। কিন্তু মানুষ সভ্য হইবার পর—কিংবা হয়তো তাহার আগেও—এই প্রবৃত্তিটাকে সৃষ্টি ধ্বংস করিবার উপায় করিয়া ফেলিয়াছে।

কবি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।

অদ্ভুত তাহার চেহারা! মস্তিষ্কটা সবটা যেন বাহির হইয়া আসিয়াছে। চোখের কোণ দিয়া রক্ত গড়াইতেছে।

"আমার ঘুমেতে স্বপন আঁকিয়া আঁকিয়া
মনের মাঝারে পরশ-মাধুরী রাখিয়া
শোভন শরমে মোহন মোহের আড়ালে
সহসা আসিয়া দাঁড়ালে!

তোমার উজল কাজল নয়ন-কিনারে
কোন্ সে দেবতা বাজাল মনের বীণারে

আঁধারে আলোকে চন্দ্রে তারায় তপনে
আধ-জাগরণ স্বপনে!
কার সে মাধুরী তোমার তনুটি ভরিয়া
আমার আঁখির নিমেষ নিল গো হরিয়া!
কহিল মরমে কোন্ সে কাহিনী কি ভাষে
বেহাগ—ললিত—বিভাসে!
তোমার মাঝারে কাহারে দেখি গো গোপনে
স্বপনে তুমি কি ভেবেছ কখনো শোভনে?
ছন্দে ও গানে হয়েছি কাহার পূজারী
মরমখানিরে উজাড়ি?

হয়তো, হে মোর গোপন-মানস-হারিণী,
পাব না তোমারে,—তবু তো বলিতে পারি নি
শুধু মায়া তুমি আর কিছু নও মায়া গো
মিছে ছলনার ছায়া গো!

বলিতে পারি নি তাই তো জীবনে মরণে
কত অঞ্জলি সাজাই তোমার চরণে
গন্ধে বরনে কত না ছন্দ-বাহিনী
কত ক্রন্দন-কাহিনী।"

আসিল এবং চলিয়া গেল।

কামের আর এক মনোহর রূপ। ছন্দে মিলে অনুপ্রাসে নিজের অন্তরের সত্য ও মিথ্যাকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

অনিবার্য।

সত্যই অনিবার্য।

হঠাৎ একদিন মায়ের চিঠি পাইলাম। চিঠি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম, কারণটা নিতান্ত তুচ্ছ নয়। আমার ভগ্নীটির বিবাহ প্রায় ঠিক হইয়া গিয়াছে। আমি গিয়া প্রয়োজনীয় কথাবার্তাদি শেষ করিয়া দিলেই শুভকর্ম সমাধা হইয়া যাইবে। প্রয়োজনীয় কথাবার্তার মধ্যে যেটুকু ভীতিপ্রদ, সেইটুকু এ ক্ষেত্রে নাই। টাকাকড়ির জন্য কিছুই আটকাইবে না। পাত্র চপুকে দেখিয়া পছন্দ করিয়াছে। পণ লাগিবে না। প্রফুল্লিত অন্তঃকরণে মাতুলালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম।

সেখানে গিয়া চক্ষুস্থির হইয়া গেল। স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—পাত্রের বয়স পঁয়ষট্টি, না পঁচাত্তর, না আরও বেশি? প্রত্নতাত্ত্বিক না হইলে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার চক্রবর্তীর ঠিক বয়স নির্ণয় করা শক্ত। গ্রামে তাঁহার সমবয়সী আর কেহ বাঁচিয়া নাই।

চপুর মুখের হাসি শুকাইয়া গিয়াছে। মায়ের চোখের জল মুখের হাসিতে রূপান্তরিত হইয়া আরও করুণ হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী ব্রাহ্মণের ঘরে কন্যাদায় যে বিষম দায়! মা ওই বৃদ্ধের সহিতও চপুর বিবাহ দিবার জন্য উন্মুখ।

মাকে বলিলাম—"এর চেয়ে চপুকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দাও না।"

মা উত্তর দিলেন—"কেষ্ট চক্কবত্তি যে সুপাত্র নয় তা আমি জানি, তা আর তোমাকে বলে বোঝাতে হবে না। কিন্তু যাদের হাতে একটি কানা-কড়িও নেই, তারা এর চেয়ে ভাল পাত্র কি করে জোটাবে বলতে পারিস? চপুর বয়স যে সতরো পেরিয়ে আঠারোয় পড়ল, তার হিসেব রাখিস? কেষ্ট চক্কবত্তির একটু বয়স হয়েছে এই যা, তা না হলে লোক ভাল। এ অঞ্চলে একটা মানী লোক। ঘরে দু-পয়সা আছে—জমি, বাগান, পুকুর, খাওয়া-দাওয়ার কোন কষ্ট কোনদিন পাবে না। কেষ্ট চক্কবত্তি যখন নিজে থেকে কথাটা পেড়েছেন, তখন এ সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নয়। আমরা গরিব মানুষ, এর চেয়ে ভাল আর পাব কোথায়?"

যুক্তি সাববান সন্দেহ নাই। কিন্তু ওই কামকণ্টকিত লোলুপ লোলচর্ম বৃদ্ধটার হস্তে আমার অমন সুন্দরী বোনটাকে সঁপিয়া দিতে ইচ্ছা হইল না। বৃদ্ধের দন্তহীন মুখের সেই লালায়িত কথাগুলা এখনও আমার কানে বাজিতেছে। তাহার কোটরগত চক্ষুর লুব্ধ দৃষ্টিটা যেন এখনও আমার বুকে বিঁধিয়া বসিয়া আছে।

মাকে বলিয়া আসিলাম—"আরও দিন কতক তুমি সবুর কর, আমি ভাল পাত্রের চেষ্টা দেখছি। আমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে দেখি না একবার খোঁজ করে।"

কলিকাতায় ফিরিয়া বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে খোঁজ করিতে লাগিলাম।

মা দেশে বসিয়া সবুব করিতে লাগিলেন।

আমি খোঁজ করিবার ত্রুটি করিলাম না।

দেশে যে পাত্রের অভাব ছিল, তাহাও নয়। কিন্তু কিছুতেই জুটিল না। বিনা পণে বিবাহ করিতে পারে, এমন একজন অপরিণামদর্শী সচ্চরিত্র যুবক মিলিল না। সকলেই পরিণামদর্শী। ভবিষ্যৎচিন্তা না করিয়া কেহই এক পা অগ্রসর হইতে চাহে না। সকলেই আমার ভগ্নীর গুরুভাব স্কন্ধে তুলিয়া লইতে রাজি, যদি ভারবহনের মজুরিটা আমরা দিয়া দিতে পারি। কিন্তু সে সামর্থ্য আমাদের তখন ছিল না। দুইজন যুবক বিনাপণে বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছিলেন। তবু হইল না। একজন লেখাপড়া-জানা মেয়ে চান, এবং আর একজন চান নিখুঁত সুন্দরী। আমার বোনকে লেখাপড়া শেখানো হয় নাই এবং নিখুঁত সুন্দরীও সে ছিল না। সৌন্দর্যে তাহার খুঁত ছিল। চুল খুলিয়া দিলে হাঁটু পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিত না।

সুতরাং আমি ক্রমাগত খুঁজিতেই লাগিলাম এবং মা-ও ক্রমাগত সবুরই করিতে লাগিলেন। এই রকমই চলিতেছিল এবং কত দিন চলিত তাহা বলা কঠিন, এমন সময় মামার বাড়ির গ্রামের একটি সদাশয় ছোকরা আসিয়া খবর দিল—

"বাঁচান, বাঁচান আমাকে ডাক্তারবাবু।"

তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে সেই অ্যানার্কিস্ট ছোকরাটি ছুটিয়া আসিল, তাহাব পশ্চাতে সেই দীর্ঘাকৃতি কালো লোকটা। তাহার প্রকাণ্ড কালো মুখে সাদা চোখ দুইটা ধকধক করিয়া জ্বলিতেছে—তাহাতে উন্মাদের হিংস্র দৃষ্টি। তাহার গলার ক্ষতটা লাল হইয়া উঠিয়াছে। মনে হইতেছে, যেন একটা প্রকাণ্ড অঙ্গার অগ্নিযোগে নীরবে পুড়িতেছে।

"কারও বাপের সাধ্যি নেই তোমাকে বাঁচায়। আমার মেয়ে নিয়েছ, আমার দোকান নিয়েছ, ছেড়ে দেব তোমাদের? কড়মড় করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলব। পাজি, হারামজাদা, শুয়ার—"

বলিয়া ছুটিয়া গিয়া সত্যই সে তাহার গলায় কামড়াইয়া ধরিল।

"বাঁচান—বাঁচান—বাঁচান আমাকে।"

আর্তনাদে সমস্ত অন্ধকার শিহরিয়া উঠিতেছে। লোকটার সমস্ত মুখ রক্তে ভরিয়া গেল।

সহসা বিন্দি ছুটিয়া আসিল। কালো লোকটার চুলের মুঠি ধরিয়া জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি।"

ঝাঁকানি খাইয়া কালো লোকটা যুবকটিকে ছাড়িয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল—"কে তুই?"

"যেই হই, তুমি ওকে ছেড়ে দাও, ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

বিন্দি হঠাৎ নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল।

বাতায়ন পথে চাহিয়া দেখিলাম, কৃষ্ণপক্ষের শীর্ণ চন্দ্র মেঘের গাঢ় তমিস্রা ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিতেছে। তাহার মুখে প্রেতের হাসি। এই জীবন্ত কর্দমাক্ত পৃথিবীর দিকে চাহিয়া মৃত জ্যোতিষ্কটা যেন নীরবে অট্টহাস্য করিতেছে। নিকটেই কালপুরুষের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়া আবার মেঘলোকের নিবিড় রহস্যে আত্মগোপন করিল। প্রকাণ্ড বড় একখানা কালো মেঘ ধীরে ধীরে আসিয়া সব ঢাকিয়া দিল। চাঁদও ঢাকা পড়িল ক্ষীণ জ্যোৎস্নাটুকু মরিয়া গেল

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে।

ক্ষান্তবর্ষণ গভীর রাত্রির অন্ধকারকে বিঘ্নিত করিয়া ভেকের মৃত্যুকাতর যন্ত্রণাধ্বনি রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। বাহিরে গাঢ় অন্ধকার। ঘরে কম্পিত দীপশিখাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পতঙ্গটা এখনও ঘুরিতেছে।

যেন একটা এরোপ্লেন।

শিখা আর পতঙ্গ।

আমার বোন

তাহাকে গুণ্ডায় হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। আমার বুড়ি মা ও তাহাদের পাশবিক অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পান নাই।

আমার মা-বোনকে যখন গুণ্ডারা ধর্ষিত করিতেছিল, তখন আমি মেডিকেল কলেজে একটি রূপসী নার্সের সহিত নানা ছুতায় আলাপ করিতেছিলাম। তাহার সহিত আলাপ করিতে সকলেই উৎসুক হইত। আমিও সুযোগ পাইলে আলাপ করিতাম। আলাপ না বলিয়া প্রেমালাপ বলিলে খুব বেশি অত্যুক্তি হইবে না।

কত কথাই মনে হইতেছে। মনে হইতেছে, সেই সপ্ত মৃত পুত্রের সিফিলিস গ্রস্ত পিতা, কবিতামুখর প্রেমিক ওই কবি, বিবাহোন্মুখ লোলচর্ম সেই বৃদ্ধ, নারীধর্ষণকারী গুণ্ডা এবং নার্সের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী আমি—একই জিনিস। বিশেষ তফাত তো দেখি না।

কিন্তু না, আমি সব ভুলিতে চাই। নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে চাই সব। কিছুতেই পারি না। অদ্ভুত আমার স্মরণশক্তি। কিছু ভুলি না। ছেলেবেলায় একটা পাগলা কুকুরকে

ঠেঙাইয়া মারিতে দেখিয়াছিলাম।....তাহার ফাটা মাথা, থেঁতলানো চোখ দুইটা আমি যেন এখনও দেখিতে পাইতেছি। কুকুরটার চেহারা আমার স্পষ্ট মনে আছে। কালো রঙ, একটা কান একটু বেশি ঝোলা, লেজের কাছে একটা প্রকাণ্ড ঘায়ে পোকা কিলবিল করিতেছে। সব মনে আছে। কিছুই আমি ভুলি না। কোথায় কবে ছারপোকাটি মারিয়াছি, তাহার চেহারাটা পর্যন্ত স্পষ্ট মনে আছে।

নিস্তব্ধ রাত্রে আমার সঙ্গে জাগিয়া আছে আমার স্মরণশক্তি।

প্রেতিনী।

বাবার মুখখানা মনে পড়িতেছে। শান্ত ধীর শীর্ণ মুখটা। দারিদ্র্যের জন্য কোন অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নীরবে নিজের কর্তব্য করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুও তাঁহাকে কোন কষ্ট দেয় নাই। ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন যেন।

একটা ভাষাহীন চীৎকার অন্ধকারকে চিরিয়া চলিয়া গেল।....পেচকের শব্দ? একটা আকুল ক্রন্দন যেন। ল্যাপল্যাণ্ডের হিমশীতল জলাভূমিতে দুইটি অপরিচিত যুবক যুবতী দাঁড়াইয়া আছে না? চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা, কেহ কাহারও ভাষা বোঝে না। কুয়াশা নিবিড় হইয়া আসিতেছে। তাহাদেরই অন্তরের আকুলতা গভীর নিশীথে নৈশ-বিহঙ্গমের করুণ স্বরে মূর্ত হইয়া উঠিল নাকি?

"ডাক্তারবাবু!"

চমকাইয়া উঠিলাম। সেই ভদ্রলোক আসিয়া হাজির হইয়াছেন, যিনি জরার প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মহাকালের উপর টেক্কা দিয়া বুকে গুলি করিয়াছিলেন।

"দেখুন তো ডাক্তারবাবু, আমার চেহারাটা ঠিক আছে কিনা!"

ভদ্রলোক শিস্ দিতেছেন।

"ঠিক আছে।"

"চুল আর পাকে নি?"

"না।"

ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন।

কালো মেয়েটি আসিয়া হাজির হইল।

"বড় জ্বালা ডাক্তারবাবু, বড় জ্বালা, বড় জ্বালা।"

তাহার পা, পেট, বুক দুর্গন্ধ বড় বড় ক্ষতে ভরিয়া উঠিয়াছে। বাম স্তনটা পচিয়া পুঁজ গড়াইয়া পড়িতেছে।

"বড় যন্ত্রণা, জ্বলে গেল, সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল আমার।"

নির্বাক হইয়া বসিয়া শুনিতেছি।

"আমার জ্বালা কমিয়ে দিন, আপনার পায়ে পড়ি।"

"এর ওষুধ আমি জানি না।"

"হ্যাঁ, তুমি জান। তুমি এত বড় ডাক্তার, তুমি জান না?"

কি বলিব? একবার ইচ্ছা হইল, গীতার একটা শ্লোক আবৃত্তি করি। হয়তো যদি কোন উপকার—

'ওযাক, ওযাক— "

মাতালটা আসিযা মেয়েটার গাযে হুড়হুড় করিযা বমি করিযা দিল।

"দাদা, একটু জল দাও, একটু জল দাও, উঃ, পাযে বড় খিল ধরছে।"

ভাই বোনগুলার হাহাকার এখনও ভাসিযা আসিতেছে কোথা হইতে? কলেরা রোগীর আকণ্ঠ পিপাসা কি এখনও মিটে নাই?

কবন্ধটা মোটা কালো মেয়েটার গলা জড়াইযা আগাইযা আসিল। কাটা মুণ্ডটাও শূন্যে দেখা দিল। মুখে বিকট হাসি।

"ঠকিযেছে! ভারি ঠকিযেছে! ছেড়ে দে, ওরে, ওটাকে ছেড়ে দে! কালো মোটা কুৎসিত মেয়েটা! নারীমাংস আমার প্রিয বটে, কিন্তু ওই পেত্নীটাকে নিযে থাকতে পারব না। ছেড়ে দে, ছেড়ে— "

কবন্ধটা তৎক্ষণাৎ মেয়েটাকে ছাড়িযা পিছাইযা গেল।

মুণ্ডটা হাসিতে লাগিল, হা—হা -হা--হা –।

ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে।"

কবি সেই পোড়া মেয়েটাকে জড়াইযা ধরিযাছে। তাহার বিদীর্ণ খুলি হইতে মস্তিষ্কটা বাহির হইযা মেয়েটার চোখে মুখে লাগিযা যাইতেছে। কবি তাহাকে কিছুতেই ছাড়িবে না।

ঘরের কোণে দাঁড়াইযা সেই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকটা হি হি করিযা হাসিতেছে। তাহার সিংহের মত মুখটা হইতে বিষাক্ত লালা ঝরিযা ঝরিযা আমার ঘরের মেঝে ভাসিযা গেল।

যেমন করে হোক নির্মলকে দেখে নিতে হবে। টাকা চাই –"

'ঠিক বলেছ ভাই, টাকা চাই, টাকা চাই, টাকা –টাকা—টাকা— কই কোথায় ?"

কালো লোকটা লম্বা হাত বাহির করিযা শূন্যে হাতড়াইতে লাগিল।

সর্পকবলিত ভেকটা তারস্বরে শেষ চীৎকার করিযা থামিযা গেল হঠাৎ।

ক্যালেণ্ডারের ছবিখানার সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ

নিরঞ্জনা

।। এক ।।

পুরাকালে হিমালয়ের পাদদেশে অতি বিস্তৃত এক অরণ্যে বহু গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী বসবাস করিতেন। সংসারবিরাগী হইয়া পরমার্থের সন্ধানে কৃচ্ছ্রসাধন করাই তখন বহু ভদ্রসন্তানের জীবনাদর্শ ছিল। এই উদ্দেশ্যে কেহ অরণ্যে, কেহ পর্বতগুহায়, কেহ বা মরুভূমিতে গিয়া বাস করিতেন। যে অরণ্যের কথা বলিতেছি, সে অরণ্যে সন্ন্যাসীদের একটা সমাজই গড়িয়া উঠিয়াছিল। অরণ্যে স্থানাভাব ছিল না, সুতরাং প্রত্যেকেই তাঁহারা নির্জনতাসুখ উপভোগ করিবার সুযোগ পাইতেন, আবার বিপদের সময় পরস্পরকে সাহায্যও করিতে পারিতেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ যজ্ঞকুণ্ড ছিল, তাহাতেই তাঁহারা নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী নিজ নিজ আরাধ্য দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিয়া ফল-লাভের প্রত্যাশা করিতেন। কেহ কেহ আবার যজ্ঞে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁহারা গভীর অরণ্যমধ্যে ছোট ছোট কুটীর নির্মাণ করিয়া নির্জন তপস্যায় মগ্ন থাকিয়া আত্মার নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার প্রয়াস পাইতেন।

শুধু সংযত নয়, অতিশয় কঠোর জীবন যাপন করিতেন ইঁহারা। অনেকেই সমস্ত দিন উপবাস করিয়া সূর্যাস্তের পর সামান্য কিছু ফলমূল সেবন করিতেন, শয়ন করিতেন ভূমিশয্যায় অথবা খর্জুরপত্রনির্মিত মাদুরের উপর। অনেকেই উপাধান ব্যবহার করিতেন না, যাঁহারা করিতেন প্রস্তরখণ্ডই তাঁহাদের উপাধান হইত। গৈরিক বহির্বাস এবং উত্তরীয় ছাড়া তাঁহাদের অন্য কোন আবরণ থাকিত না। কেহ কেহ সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়াও থাকিতেন। সাধনমার্গে যাঁহারা বেশি অগ্রসর, তাঁহারা ভূমিতে গভীর গর্ত খনন করিয়া তাহার মধ্যে আত্মগোপন করতঃ তৃপ্তি লাভ করিতেন।

তপস্যাই ছিল তাঁহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য তাঁহারা এমন সব কাজ করিতেন যাহা সাধারণ মানুষ করিতে পারে না। তাঁহারা বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেন, উদাত্তকণ্ঠে মন্ত্রপাঠ করিয়া নৈশ অন্ধকারকে বাঙ্‌ময় করিয়া তুলিতেন, কখনও রুদ্ধশ্বাসে দুরূহ আসনে বসিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন, কখনও শারীরিক কামনা-বাসনাকে নিষ্পিষ্ট করিয়া দমন করিবার উদ্দেশ্যে আত্মনির্যাতনে প্রবৃত্ত হইতেন। বস্তুত দেহকে নানাভাবে নির্যাতন করিয়া তাঁহারা এক অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। শরীরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মনোযোগী হওয়া লজ্জাকর ছিল তাঁহাদের চক্ষে। কোনপ্রকার প্রসাধনে তাঁহাদের রুচি তো ছিলই না, প্রত্যহ স্নান করাটাও অনেকে প্রয়োজন মনে করিতেন না। অনেকের চর্মরোগ হইত। ইহাতে চিন্তিত বা লজ্জিত না হইয়া তাঁহারা বরং আনন্দিতই হইতেন। ভাবিতেন, দেহটা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অন্তরায় মাত্র, পীড়া তাহাকে ন্যায্য শাস্তিই দিতেছে।

সকলেই যে সর্বদা আত্মার সন্ধানে ব্যাপৃত থাকিতেন—এ কথা অবশ্য সত্য নয়। সাধারণ সাংসারিক কর্মের প্রতিও অনেকের আকর্ষণ ছিল। অনেকে বাসগৃহ-সংলগ্ন ভূখণ্ডে কৃষিকর্ম

করিতেন, অনেকে খর্জুরপত্র সংগ্রহ করিয়া মাদুর বুনিতেন, অন্নসংগ্রহের জন্য নিকটবর্তী গ্রামে গিয়া কেহ কেহ ভিক্ষাও করিতেন, কেহ কেহ বা মজুরের কাজও করিতেন। গ্রামের অধিকাংশ গৃহস্থগণের হৃদয়ে যদিও তাঁহাদের শ্রদ্ধার আসনই প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু নাস্তিক প্রকৃতির এমন কয়েকজন দুষ্ট লোকও ছিলেন যাঁহারা তাঁহাদের সম্বন্ধে নানারূপ কটূক্তিও করিতেন; অনেকে বলিতেন, গ্রামে যে সব ছোটখাটো চুরি ডাকাতি হয় তাহা এই সন্ন্যাসীদেরই কাজ। বলা বাহুল্য, এ সব অভিযোগ মিথ্যা। এই সব সন্ন্যাসী পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে সত্যই বীতরাগ ছিলেন। তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল পরলোকের দিকে, ইহলোকের দিকে নয়।

মধ্যে মধ্যে এই অরণ্যে অলৌকিক অসম্ভব কাণ্ড ঘটিত। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, কখনও দেবতা কখনও বা দানব নাকি এই সন্ন্যাসীদের সম্মুখে আবির্ভূত হইতেন। দেবতারা দিব্যকান্তি ধরিয়া দেখা দিতেন, আর দানবেরা আসিতেন কখনও বর্বরের বেশে, কখনও বা পশুর রূপ ধরিয়া। প্রভাতে দূরবর্তী ঝরনায় জল আনিতে গিয়া তাঁহারা বালুকার উপর নানারূপ অদ্ভুত পদচিহ্ন দেখিতে পাইতেন। তাঁহাদের মনে হইত হয়তো কোনও দুষ্ট দানব অদ্ভুতাকৃতি পশুর রূপ ধারণ করিয়া গভীর নিশীথে কাহাকেও প্রলুব্ধ করিতে আসিয়াছিল। মনে হইত তাঁহাদের কেন্দ্র করিয়া এই অরণ্যভূমিতে দেব-দানবের একটা যুদ্ধ চলিতেছে—কখনও প্রকাশ্যে, কখনও বা অদৃশ্যভাবে। দেবতারা মোক্ষলিপ্সু ভক্তগণকে সৎপথে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন আর দানবেরা চেষ্টা করিতেছে তাঁহাদের সে পথ হইতে ভ্রষ্ট কবিতে। তাঁহাদের দৃষ্টিতে অরণ্যভূমি দেব-দানবের যুদ্ধভূমি হইয়া উঠিত।

দানবদের এই হীন প্রচেষ্টা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তপস্বীরা নানারূপ প্রতিক্রিয়া অবলম্বন করিতেন। কখনও উপবাস, কখনও ব্রত, কখনও অনুতাপ করিয়া তাঁহারা দেবতাগণের কৃপালাভ করিবার প্রয়াস পাইতেন। তাঁহাদের শীর্ণ দেহ শীর্ণতর হইয়া যাইত, কিন্তু সেদিকে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না, দানবদের হীন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিতে পারিলেই তাঁহারা নিজেদের কৃতার্থ মনে করিতেন। কিন্তু হায়, এত চেষ্টা সত্ত্বেও ষড়রিপু—বিশেষ করিয়া কাম—তাঁহাদের মাঝে মাঝে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিত। তখন তাঁহারা তার-স্বরে রোদন করিতেন। মনে হইত, অরণ্যের অন্ধকারে ক্ষুধার্ত হায়েনার দল বুঝি চীৎকার করিতেছে! তাঁহাদের এই কামাতুর অবস্থায় দানবেরা মায়াবলে রূপসী যুবতীর বেশে মাঝে মাঝে তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইত। শুধু তাহাই নয়, নানাবিধ কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করিয়া তাঁহাদের অভিভূত করিবার চেষ্টাও করিত। তখন তাপসগণ যজ্ঞকুণ্ডের ভস্ম সর্বাঙ্গে লেপন করিয়া দার্শনিক চিন্তায় মনকে ব্যাপৃত রাখিবার প্রয়াস পাইতেন। ভাবিতেন, "যত সুন্দরীই হোক না কেন, উহার দেহ মাংসপিণ্ড মাত্র, দুর্গন্ধচর্মজড়িত, শত শত কৃমিপূর্ণ মূত্রবিষ্ঠালিপ্ত। উহা মৃত্যুর দ্বার, ওই মুখপদ্ম একদা দন্তসর্বস্ব করোটিতে পরিণত হইবে...।" এই ধরনের বিশুদ্ধ চিন্তার ফলে দানবদের স্বরূপ প্রকটিত হইয়া পড়িত, উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করা ছাড়া তখন তাহাদের গত্যন্তর থাকিত না। বস্তুত অনেক সময় উষাকালে অনেকে দেখিতে পাইত যে, কোনও রোরুদ্যমানা যুবতী তাপস-পল্লী হইতে ত্বরিতপদে

পলাযন কবিতেছে। প্রশ্ন কবিলে সে উত্তব দিত—"একজন তাপস আমাকে লাঠিপেটা কবে কবে তাডিযে দিযেছে, তাই আমি কাঁদছি।"

এই সব জ্ঞানবৃদ্ধ তাপসগণ নিজেদেব শক্তি সম্বন্ধে খুবই সচেতন ছিলেন। শুধু তাহাই নয। পাপীদেব সৎপথে ফিবাইযা আনিবাব জন্য তাঁহাবা সে শক্তি প্রযোগ কবিতেও ইতস্তত কবিতেন না। অনেক সময কঠোব শাস্তি বিধান কবিতেন। এজন্য তাঁহাদেব অভিশাপকে সকলে ভয কবিত। সকলেবই ধাবণা ছিল, ইঁহাদেব ক্রোধ উদ্রিক্ত কবিলে অপঘাতে মৃত্যু ঘটিবেই। মৃত্যুব পব অনন্ত নবকবাসও ঘটিতে পাবে। সুতবাং সকলেই তাঁহাদেব সমীহ কবিযা চলিত, বিশেষ কবিযা নট-নটীবা, নর্তক-নর্তকীবা এবং রূপজীবীবা অনেকেব এ ধাবণাও ছিল যে, বনেব পশুবাও নাকি এই সকল তপোবল-সম্পন্ন ঋষিদেব সহাযক। ঋষিদেব আযু নিঃশেষ হইযা গেলে বন্য ব্যাঘ্র বা সিংহ তাঁহাদেব প্রাণহীন দেহটাকে মুখে কবিযা তুলিযা কোনও পুণ্যতোযা নদী স্রোতে লইযা গিযা নাকি তাঁহাদেব শেষকৃত্য সম্পন্ন কবিত।

কিছুকাল পূর্বে মহর্ষি কাবণ্ডব তাঁহাব দুই প্রিয শিষ্য হংসপক্ষ এবং কঙ্কধীমানকে লইযা কৈলাস ও মানসসবোবব অভিমুখে যাত্রা কবিযাছিলেন। আব ফিবেন নাই। তাঁহাদেব মহাপ্রস্থানেব পব সেই অবণ্য ঋষি সমাজে মাগধী ঋষি সাবর্ণিই সর্বশ্রেষ্ঠ তপস্বী বলিযা স্বীকৃত হইযাছিলেন। সত্যই তাঁহাব তপোবল অনন্যসাধাবণ ছিল। মহর্ষি উপলচবিতেব অনেক শিষ্য ছিল বটে, মহর্ষি বনস্পতিবও খ্যাতি কম ছিল না, কিন্তু উপবাস এবং কৃচ্ছ্রসাধনে মহর্ষি সাবর্ণিই অগ্রণী ছিলেন। দিনেব পব দিন তিনি নিবম্বু উপবাস কবিতে পাবিতেন, কর্কশ বোম নির্মিত একটি কম্বল ব্যতীত তাঁহাব অন্য কোনও দেহাববণেবও প্রযোজন হইত না। দৈহিক এবং মানসিক কামনাকে বশীভূত বাখিবাব নিমিত্ত তিনি প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায নিজ অঙ্গে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত পর্যন্ত কবিতেন। অনেক সময দেখা যাইত, তিনি ধূলিতে উপুড হইযা শযন কবিযা বহিযাছেন, সাষ্টাঙ্গে যেন কোনও অদৃশ্য দেবতাকে প্রণাম কবিতেছেন।

তাঁহাব চব্বিশটি শিষ্য ছিল। শিষ্যেবা গুরুদেবেব কুটিবেব পাশে-পাশে ছোট ছোট কুটীব নির্মাণ কবিযা বাস কবিতেন এবং গুরুব মহান আদর্শ অনুসবণ কবিবাব প্রযাস পাইতেন। মহর্ষি সাবর্ণি তাঁহাদেব প্রতি স্নেহশীল ছিলেন, কিন্তু তাঁহাব স্নেহে আসক্তিব লেশমাত্র ছিল না। শিষ্যদেব যে উপদেশ তিনি দিতেন তাহাব মূল কথা —বিগত জীবনেব পাপেব জন্য অনুতপ্ত হও। তাঁহাব শিষ্যদেব মধ্যে অনেকেব বিগত জীবনে পাপেব প্রাধান্যও ছিল। এমন লোকও ছিল যাহাবা পূর্বে ডাকাতি কবিত। মহর্ষি সাবর্ণিব চাবিত্রিক আদর্শ ও অমূল্য উপদেশে অনেক বত্নাকবই বাল্মীকিত্ব লাভ কবিয়াছিল। তাহাদেব জীবন এত পবিত্র হইযাছিল যে, তাহাদেব সাহচর্য লাভ কবিযা অন্যান্য শিষ্যগণও নিজেদেব ধন্য মনে কবিতেন। মধ্যপ্রদেশেব বাজা ইন্দ্রদ্যুম্নেব এক পাচক তাঁহাব শিষ্য হইয়াছিল। দীক্ষার পব তাহাব অনুতাপ এমন প্রবল হইল যে, সে সর্বদাই অশ্রুবিসর্জন কবিত। আব একজন শিষ্য ছিলেন পণ্ডিত হরানন্দ। তিনি পণ্ডিত তো ছিলেনই, বক্তাও ছিলেন। তিনি সংসাব ত্যাগ করিয়া সাবর্ণির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন বোধ হয় বাঞ্ছারাম

নামক কৃষকটি। তাঁহার সরলতার জন্য সকলে তাঁহাকে বালক বাঞ্ছা নামে ডাকিত। তাঁহার অতি সরলতার জন্য অনেকে অনেক সময় তাঁহাকে উপহাস করিত বটে, কিন্তু স্বয়ং ভগবান তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। তাই মাঝে মাঝে বিস্ময়কর দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া তিনি নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিতেন।

ইঁহাদের লইয়া মহর্ষি সাবর্ণির সময় ভালই কাটিতেছিল। কখনও তপস্যায়, কখনও অধ্যাপনায়, কখনও বা শাস্ত্রপাঠে তিনি মগ্ন থাকিতেন। শাস্ত্রের জটিল রূপক ও দুরূহ শব্দার্থ তাঁহাকে প্রায়ই বাহ্যজ্ঞানশূন্য করিয়া রাখিত। তিনি বয়সে তরুণ ছিলেন, কিন্তু জ্ঞানে প্রবীণতা লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য যে সব দানব অন্য সন্ন্যাসীদের বিব্রত করিয়া তুলিত, সাবর্ণির নিকট তাহারা আসিতে সাহস পাইত না। রাত্রিকালে প্রায়ই দেখা যাইত, সাতটি শৃগাল তাঁহার কুটিরের অনতিদূরে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে কি যেন শুনিতেছে। অন্যান্য সন্ন্যাসীদের ধারণা জন্মিয়াছিল, তপস্যাপ্রভাবে সাবর্ণি দানবকে শৃগালে রূপান্তরিত করিয়া ভৃত্যের মত কুটিরের সম্মুখে বসাইয়া রাখিয়াছেন।

পাটলীপুত্র নগরীতে এক ধনীগৃহে সাবর্ণি জন্মলাভ করিয়াছিলেন। সে যুগে ধনীপুত্রেরা সাধারণত যেরূপ বিলাস ও ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিতপালিত হইতেন তিনিও সেইরূপ হইয়াছিলেন। যে শিক্ষা তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্রও ছিল না। যে সব সাহিত্য, কাব্য, নৃত্যগীত সে যুগে ধনীপুত্রদের চিত্তকে কলুষিত করিত তাহা সাবর্ণির চিত্তকেও একদা মলিন করিয়াছিল। এ সকল কথা স্মরণ করিলে অনুতাপে এখনও তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হয়, লজ্জায় তিনি অধোবদন হইয়া পড়েন। অন্যান্য তাপসদের তিনি গল্পচ্ছলে প্রায়ই বলিতেন, সে সময় তিনি যেন মিথ্যা আনন্দের উত্তপ্ত তৈলে কামনা কটাহে ভাজা ভাজা হইতেন; অর্থাৎ রসনাতৃপ্তিকর খাদ্য, নয়নলোভন মহার্ঘ পরিচ্ছদে, মদিরাক্ষী রমণীর আলিঙ্গনে নিজের অস্তিত্বকেই তিনি বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন কুড়ি বৎসর, তখন পর্যন্ত তাঁহার জীবনে এই সব ভয়াবহ কাণ্ড চলিতেছিল। মহর্ষি মঙ্গলমৌলির সাক্ষাৎ না পাইলে তিনি হয়তো অনন্ত নরকেরও অন্ত-সীমায় উপনীত হইতেন। মহর্ষি মঙ্গলমৌলি যখন তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন তখনই মনুষ্যজীবনের প্রকৃত স্বাদ পাইলেন, তখনই বুঝিলেন— আনন্দ কোথায়, সত্য কি এবং কোন পথে গেলে শিব-সুন্দরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই সন্ধানের আগ্রহ যেন তাঁহাকে পাইয়া বসিল। তিনি বলিতেন, একটা তীক্ষ্ণ তরবারির মতো তাহা যেন তাঁহার অন্তরে গাঁথিয়া গেল। দীক্ষা লইবার পর গুরুর আদেশে তিনি মহেশ্বরের উপাসনায় নিজেকে নিযুক্ত করিলেন। এক বৎসর কাটিয়া গেল, কিন্তু মহাকালের স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। একদিন এক শৈব যোগী তাঁহাকে বলিল—পার্থিব বিষয় ত্যাগ না করিলে মহেশ্বরের সাধনা সফল হয় না। মহেশ্বর মহাভিক্ষুক। প্রাসাদে বসিয়া তাঁহাকে পাওয়া যায় না। এ কথা শুনিবার পর তিনি তাঁহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদের দান করিয়া দিলেন এবং প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন।

দশ বৎসর তিনি অরণ্যবাস করিয়া কৃচ্ছ্রসাধনে নিরত আছেন। মিথ্যা আনন্দের উত্তপ্ত তৈলে কামনা-কটাহে ভর্জিত হইবার সুযোগ আর নাই। পুরাতন ক্ষতগুলিতে অনুতাপ-ঔষধি লেপন করিয়া বিমল আনন্দই তিনি উপভোগ করেন। কিন্তু অতীতের ওই অপবিত্র কামনাক্লিন্ন দিনগুলিব কথা কিছুতেই তিনি ভুলিতে পারেন না। প্রায়ই সে সব কথা মনে পড়ে।

একদিন তিনি এই অতীত জীবনের কথা, তাঁহার পশু-জীবনের কথা ভাবিতেছিলেন। বিশ্লেষণ কবিতেছিলেন, কি কি দোষ কি ভাবে তাঁহার জীবনে আসিয়া কি ভাবে তাঁহাকে ভ্রষ্ট কবিযাছিল। সহসা নিবঞ্জনার কথা মনে পড়িল।—অভিনেত্রী নিরঞ্জনার কথা। শুধু নিপুণা নর্তকী নয়, অপরূপ রূপসী ছিল সে। যখন সে নৃত্য কবিত তখন দর্শকদের চিত্তে ঝড় বহিত, তুফান জাগিত, কামনার শিখা লেলিহান হইযা উঠিত। আকুল হইয়া পড়িত সকলে—প্রমত্ত যুবক স্থবির ধনী, স্বল্পবৃত্ত প্রৌঢ় সকলেই। নিরঞ্জনা সকলকেই লালায়িত করিয়া তুলিত, ফুলের মালা লইয়া সকলেই ছুটিত তাহার গৃহের উদ্দেশে, গৃহের বদ্ধদ্বারের সম্মুখে মাল্য অর্ঘ্য দান করিযাই অনেকে তৃপ্তিলাভ করিত। তাহাব প্রদীপ্ত যৌবনের অন্তবালে ছিল পাপ। সে পাপ তাহাব আত্মাকে তো মলিন কবিযাইছিল, যাহাবা তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছিল তাহারাও কলুষিত হইয়াছিল।

সার্বর্ণিও তাহার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। তখন কতই বা তাঁহার বয়স? তখনও তিনি কিশোর। সেই কিশের বয়সেই নিবঞ্জনা তাঁহার অন্তরে কামনা বহ্নি প্রজ্বলিত কবিযাছিল। তিনি তাহার গৃহেব দ্বার পর্যন্ত গিযাছিলেন, আর অধিকদূর অগ্রসব হইবাব সাহস হয নাই, আশঙ্কা হইযাছিল নিবঞ্জনা হয়ত তিরস্কার কবিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দিবে তখন তাঁহার কতই বা বযস? মাত্র পঞ্চদশ বর্ষ। ভগবানই তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তখন কিন্তু তাঁহার এ কথা মনে হয় নাই। তখন পাপপুণ্যবোধই ছিল না তাঁহাব' কিসে নিজেব হিত হয়, কিসে অহিত হয় তাহা তিনি বুঝিতেন না।

...নিজের নির্জন কুটিরে যে শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত শিবলিঙ্গটি ছিল, তাহারই সম্মুখে তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কামনা-বাসনারই নানা কাল্পনিক চিত্র তাঁহার মানসপটে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। নিজের ভাগ্য-দেবতাকে তিনি বারম্বার প্রণাম করিলেন— কি ভয়ঙ্কর গহ্বরেব মুখ হইতেই না তিনি তাঁহকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন! প্রার্থনা করিতে করিতে তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলেন। প্রহর অতিবাহিত হইয়া গেল। যখন চক্ষু খুলিলেন তখন মনে হইল, শিবলিঙ্গের পিছনে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। পার্বতী না কি! কিন্তু পরক্ষণেই চিনিতে পারিলেন—নিরঞ্জনা! ঠিক তেমনি সুন্দরী, দশ বৎসর পূর্বে যেমন দেখিয়াছিলেন। হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল, এবং পরমুহূর্তেই আবার দেখা দিল উর্বশীর বেশে। পাটলিপুত্র নগরীর এক প্রমোদাগারে দশ বৎসর পূর্বে নিরঞ্জনাকে তিনি উর্বশীর বেশে দেখিয়াছিলেন মনে পড়িল। ঠিক সেই দৃশ্যটিই আবার যেন মূর্ত হইয়া উঠিল। বিশাল সমুদ্রের তরঙ্গ-হিল্লোলে উর্বশী যেন দুলিতেছে, আর দুলিতেছে, তাহার কম্বুগ্রীবা, লীলায়িত

বাহুযুগল, পীবর স্তনদ্বয়। নয়নে বিলোল কটাক্ষ, আবেগভরে নাসার অগ্রভাগ কম্পিত হইতেছে, ঈষৎ ব্যায়ত আননের ফাঁকে মুক্তার সারির মতো দন্তগুলি দেখা যাইতেছে। ললাটে করাঘাত করিয়া মহর্ষি সাবর্ণি আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

বলিতে লাগিলেন, "ভগবান ভূতনাথ, এ কি দেখিতেছি! এ যে আমারই কামনার কদর্য মূর্তি!"

উর্বশীর মুখভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তন দেখা দিল। তাহার অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। মনে হইল, সে যেন কোনও নিগূঢ় বেদনায় কাতর হইয়া পড়িতেছে,— তাহার নয়নের দীপ্তি যেন অশ্রুজলে নিবিয়া আসিতেছে, মনে হইতেছে যেন ঝটিকা আসন্ন। নিরঞ্জনার এই মূর্তি সাবর্ণিকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। নতজানু হইয়া তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—

"হে ভগবান, প্রভাতে তৃণদলের উপর শিশিরবিন্দুর মতো আমাদের অন্তরে তুমি করুণা দিয়াছ, তোমাকে প্রণাম করি। কিন্তু হে দেবাদিদেব, যে করুণা পাপকে প্রশ্রয় দেয়, আমার অন্তর হইতে তুমি সে করুণা অবলুপ্ত করিয়া দাও। আমাকে শক্তি দাও, তোমার মধ্যেই যেন আমি সকলকে ভালবাসিতে পারি, কারণ তুমি ছাড়া আর সবই নশ্বর। তোমারই সৃষ্টি বলিয়া এই নারী আমার অনুকম্পার পাত্রী, সম্ভবত, স্বর্গের দেব-দেবীরাও ইহার অধঃপতনে করুণার্দ্র। নিরঞ্জনার মতো অনবদ্য সৃষ্টি কি তোমার স্নেহপাত্রী নয়? কিন্তু পবিচিত-অপরিচিত-নির্বিশেষে সকলে যে উহাকে কলঙ্কিত করিয়া দিতেছে, তোমার এমন সুন্দর সৃষ্টিটিকে এমনভাবে কলুষিত হইতে দেওয়া কি উচিত? উহার জন্য আমার অন্তর বিগলিত হইয়া যাইতেছে। যে পাপে সে লিপ্ত তাহা জঘন্য— এ কথা চিন্তা করিলেও আতঙ্কে আমার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। কিন্তু সে পাপীয়সী বলিয়াই কৃপাপাত্রী। তাহার পাপের মাত্রা বেশি বলিয়াই বেশি করুণা সে দাবী করিতে পারে। নিদারুণ পাপের জন্য তাহাকে অনন্ত নরক ভোগ করিতে হইবে—এ কথা চিন্তা করিলে আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারি না...."

প্রার্থনা শেষ করিয়া সাবর্ণি অনেকক্ষণ মুদিতনেত্রে বসিয়া রহিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে চক্ষু খুলিয়া তিনি যাহা দেখিলেন তাহা অপ্রত্যাশিত। দেখিলেন, একটি শিবলিঙ্গের সম্মুখে একটি কৃষ্ণকায় বানর বসিয়া রহিয়াছে। তাঁহার সহিত চোখাচোখি হইবামাত্র বানরটি দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান করিল। সাবর্ণি বিস্মিত হইয়া গেলেন। বানর কোথা হইতে আসিল? কুটিরের দ্বার তো বন্ধ ছিল! .....সাবর্ণি বুঝিলেন, কোনও মায়াবী মা নিশ্চয়ই তাঁহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছিল। তিনি শিবলিঙ্গের সম্মুখে পুনরায় প্রণত হইলেন এবং পুনরায় নিরঞ্জনার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন, "হে শঙ্কর, হে নীলকণ্ঠ, তুমি যদি আমাকে শক্তিদান কর, নিরঞ্জনাকে ঐ পঙ্ককুণ্ড হইতে আমি উদ্ধার করিবই..."

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া তিনি প্রবীণ মহর্ষি শুভঙ্করের নিকট গেলেন। মহর্ষি শুভঙ্কর কিছুদূরে এক খণ্ড বিস্তীর্ণ জমির উপর কুটীর নির্মাণ করিয়া তাপস-জীবন যাপন করিতেন। কৃষিকর্মে তাঁহার আগ্রহ ছিল। সাবর্ণি দেখিলেন, শুভঙ্কর নিজের বাগানে কি যেন খুঁড়িতেছেন! বৃদ্ধ শুভঙ্করের কুটীর-সংলগ্ন ছোট একটি বাগান ছিল। বাগানটি লইয়াই তিনি

সাবাদিন কাটাইতেন। সকলে বলিত, শুভঙ্কব এত ভাল লোক যে বনেব পশুবাও নির্ভয়ে তাঁহাব কাছে আসে, ভূত প্রেত বা শযতান তাকে বিব্রত কবে না। সদাহাস্যমুখ প্রসন্নচিত্ত লোক তিনি। তিনিও সাবর্ণিব মতো শিবেব উপাসক। পবামর্শ কবিবাব জন্য সাবর্ণি তাঁহাব নিকট গেলেন।

মহর্ষি সার্বর্ণিকে শুভঙ্কব হাস্যমুখে অভ্যর্থনা কবিলেন।

"জয শঙ্কব! সব কুশল তো?"

"জয শঙ্কব! ভালই আছি আপনাব কৃপায। আশা কবি, আপনাবও সব মঙ্গল।"

কপালেব ঘাম মুছিয়া শুভঙ্কব হাস্যমুখে বলিলেন, "মঙ্গলেব অভাব তো দেখি না। তাবপব তাঁব সব খবব কি?'

'আমাদেব আব খবব কি থাকতে পাবে বলুন? তাঁব খববই একমাত্র খবব, তাঁব খববই নানাভাবে আলোচনা কবে আমবা ধন্য। তাঁবই মহিমাব একটা দিক প্রকট কববাব আশায আপনাব কাছে এসেছি—"

শুভঙ্কব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া বহিলেন।

সার্বর্ণি বলিলেন, 'একটা পবামর্শ কবতে এসেছি আপনাব সঙ্গে। আজ আমাব অন্তবে সহসা একটি কল্পনা অঙ্কুবিত হযেছে।'

'মহেশ্বব কৃপা বর্ষণ কবে আমাব শাকেব ক্ষেতটিকে শ্রীসম্পন্ন কবেছেন, তোমাব কল্পনাব অঙ্কুবটিকেও তেমনি শ্রীমণ্ডিত কববেন সন্দেহ নেই। তাঁব কৃপাব কি অন্ত আছে? বোজ সকালে উঠেই তাঁব কৃপা প্রত্যক্ষ কবি, প্রতি তৃণখণ্ডে শিশিববিন্দু ঝলমল কবছে। আমাব বাগানেব শশায কুমড়োয দেখি তাঁব মহিমা। আমি বোজ কেবল প্রার্থনা কবি, তিনি আমাদেব এই সহজ শান্তিটুকু যেন বজায বাখেন, আব কিছু চাই না। কাবণ চাবিদিকে কামনা বাসনাব যা দাপট দেখি তাতে ভয হয। উদ্দাম কামনাব চেযে ভযঙ্কব আব তো কিছু নেই কামনাব পাল্লায পড়লে ঠিক মাতালেব মতো অবস্থা হয, সোজা হযে চলতে পাবি না কখনও ডাইনে হেলি, কখনও বাযে হেলি, সর্বদাই পড় পড় ভাব। কামোন্মত্ত অবস্থায এক ধবনেব আনন্দ হয বটে, কিন্তু কামুকেব সে আনন্দ শযতানেব হাসিব খোবাক জোগায খালি। সে আনন্দ মনকে পবিত্র কবে না, বুদ্ধিভ্রংশ কবে কেবল। আব একটা মজা কি জান? ওই কামনা দুঃখেব রূপ ধবেও আসে কখনও কখনও সে আবও ভযঙ্কব। ভাই সাবর্ণি, আমি বুদ্ধিমান নই, তপস্বীও নই, আমাব পাপেবও সীমা নেই কিন্তু আমাব দীর্ঘ জীবনে কিছু অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয কবেছি। একটি অভিজ্ঞতা হচ্ছে – দুঃখেব চেযে বড় শত্রু আমাদেব আব নেই। দুঃখেব অনুভূতি কুযাশাব মতো সমস্ত আত্মাকে আচ্ছন্ন কবে ফেলে, আলোব পথ বোধ কবে। তখন আমবা অসহায হযে পড়ি, সর্বদাই যেন ভয ভয কবে। যে কুবুদ্ধি, যে মাব আমাদেব বিব্রত কববাব জন্যে সর্বদা ওত পেতে আছে, সে সর্বদা চেষ্টা কবে সাধুদেব হৃদযকে বিষাদাচ্ছন্ন কবে দিতে। কাবণ সাধুদেব অন্তবে দুঃখেব কালো ছাযা ফেলতে পাবলেই তাব মনস্কামনা সিদ্ধ হয। কামনাব মোহিনীরূপ দেখিযে সে আমাদেব তত কাবু কবতে পাবে না, যত পাবে আমাদেব মনে দুঃখ জাগিযে। তাব ছলনাব তো অন্ত নেই। মহর্ষি

কারগুবের মতো সাধু পর্যন্ত নাকাল হয়ে পড়েছিলেন। একটা কালো শিশুর জন্য অশ্রু বিসর্জন পর্যন্ত করতে হয়েছিল তাঁকে। শঙ্করের কৃপায় অবশেষে তিনি নিস্তার পান। তিনি যতদিন এখানে ছিলেন আমি তাঁর সাহচর্য লাভ করে ধন্য হয়েছি। সদানন্দ পুরুষ ছিলেন, শিষ্যদের সর্বদা আনন্দে রাখতেন, দুঃখকে হতাশাকে আমলই দিতে চাইতেন না। ওঁর মতো লোকও দুঃখের কবলে পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কথায় কথায় আসল কথাটাই চাপা পড়ে গেছে। শঙ্কবের মহিমা প্রকট করবার জন্যে কি একটা পরামর্শ তুমি আমার কাছে চাইতে এসেছ, বললে না? কি পরামর্শ? কি কল্পনা অঙ্কুরিত হয়েছে তোমার মনে? শঙ্করেব মহিমা-প্রচার করাই যদি তার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আমি সাহায্য করব। সানন্দে করব। করে কৃতার্থ হব। ব্যাপারটা কি বল দেখি?"

সাবর্ণি বলিলেন, "শঙ্করের মহিমাকে উজ্জ্বলতর করাই আমার উদ্দেশ্য। আপনি জ্ঞানী, পাপ কখনও আপনার বুদ্ধিকে ম্লান করেনি, তাই আপনার পরামর্শ পেলে আমি নির্ভয় হব।"

শুভঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিলেন, "সাবর্ণি, তোমার পাদুকা স্পর্শ করবার যোগ্যতাও আমার নেই। তুমি জ্ঞানে তপস্যায় আমার চেয়ে অনেক বড়। আমার জীবন পাপে পরিপূর্ণ, মরুভূমি যেমন বালুকণায় পরিপূর্ণ। তবে আমি বৃদ্ধ হয়েছি, অভিজ্ঞতা দিয়ে তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি।"

"ব্যাপারটা শুনুন তা হলে। পাটলিপুত্র গ্রামে নিরঞ্জনা নামে একটি তরুণী আছে। সে রূপজীবিনী, কলুষিত জীবনযাপন করে সমাজকে কলঙ্কিত করছে সে। তার কথা ভেবে আমি বড়ই বিষণ্ণ হয়েছি।"

"বিষণ্ণ হবারই তো কথা। শহুরে সমাজে অনেক স্ত্রীলোকেবই ওই দশা। তুমি কি ওদের উদ্ধার করবার কোন উপায় ঠাউরেছে?"

"মহর্ষি, ঠিক করেছি, পাটলিপুত্রে গিয়ে আমি নিরঞ্জনাকে খুঁজে বার করব এবং শঙ্কর যদি আমার সহায় হন পাপের পঙ্ক থেকে তাকে তুলে সৎপথে নিয়ে আসব। এই আমার সঙ্কল্প। এতে আপনার সম্মতি আছে আশা করি।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শুভঙ্কর বলিলেন, "দেখ ভাই সাবর্ণি, গোড়াতেই তোমাকে বলেছি আমি স্বল্পবুদ্ধি লোক। পাপও জীবনে অনেক করেছি। এ বিষয়ে মতামত দেবার মতো বুদ্ধি আমার নেই। কিন্তু মহর্ষি কারগুব একটা কথা বলতেন মনে পড়ছে। তিনি বলতেন—"যেখানেই তুমি থাক না কেন, সে জায়গাটি চট করে ছেড়ো না।"

"আমার এ সঙ্কল্পের মধ্যে আপনি কি মন্দের কোনও আভাস পাচ্ছেন মহর্ষি?"

"কারও কোনও সঙ্কল্পের মধ্যে মন্দ অভিপ্রায় আবিষ্কার করবার মতো বুদ্ধি শঙ্কর আমাকে দেননি।" মহর্ষি কারগুব আর একটা কথা বলতেন, মনে পড়ছে। সেটাও শোন। তিনি বলতেন—"মাছকে ডাঙায় তুললে সে মরে যায়। সন্ন্যাসীরা যদি নিজের গুহা বা আশ্রম ছেড়ে সংসারের লোকের সঙ্গে মেশেন তাঁদেরও দুর্গতি হয়।"

এই কথাগুলি বলিয়া তিনি পুনরায় মাটি কোপাইতে আরম্ভ করিলেন। একটি ডুমুর গাছের গোড়ার মাটি তিনি আলগা করিতেছিলেন। সাবর্ণি লক্ষ্য করিলেন, ডুমুর বৃক্ষটি

ফলভারনম্র, প্রতি শাখায় অজস্র ফল ধরিয়াছে। শুভঙ্করের কথার উত্তরে তিনি কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বলা হইল না। একটি বন্য হরিণ একলম্ফে বেড়া ডিঙাইয়া বাগানে প্রবেশ করিল, কয়েক মুহূর্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তাহার পর আরও দুই লম্ফে মহর্ষি শুভঙ্করের নিকট আসিয়া তাঁহার অঙ্গে মাথা ঠেকাইতেই তিনি তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাহার পর স্নেহভরে বলিলেন, "বুঝেছি, বুঝেছি, কি মতলবে এসেছ। চল, দিচ্ছি। জয় শঙ্কর জয় ত্রিলোচন—"

কোদাল রাখিয়া তিনি কুটীর অভিমুখে গেলেন, হরিণটিও তঁহার পিছু পিছু গেল। কুটীরের ভিতর হইতে তিনি কয়েকখানা যবের রুটি বাহির করিয়া আনিলেন। হরিণটি তাঁহার হাত হইতেই সেগুলি খাইতে লাগিল।

মৃত্তিকায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মহর্ষি সাবর্ণি কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন রহিলেন। শুভঙ্করের সহিত আর আলোচনা করিতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি যাহা শুনিলেন তাহাই ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে নিজের কুটীরে ফিরিয়া গেলেন।

তাঁহার মনে হইল, মহর্ষি শুভঙ্কর অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি সন্দেহ নাই। প্রকৃত জ্ঞান তাঁহার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অথচ তিনি আমার এ সঙ্কল্পে তেমন উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না। আশ্চর্য! নিরঞ্জনাকে কামনা-রাক্ষসের কবল হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা না করাটা কি অসঙ্গত হইবে না? এতবড় হৃদয়হীন হওয়া কি উচিত? না, আমি তাহা পারিব না। ভগবান শঙ্কর আমার সহায় হোন, তাঁহার নির্দেশ সম্বল করিয়াই আমি যাত্রা করিব।

.....সাবর্ণি স্থির করিয়া ফেলিলেন যে, নিরঞ্জনাকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি পাটলিপুত্র অভিমুখে যাত্রা করিবেন। চলিতে চলিতে একটি অপ্রত্যাশিত দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পথেব ধারে তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি টিট্টিভ পক্ষী শিকারী জালে ধরা পড়িয়া ছটফট করিতেছে। নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, পক্ষী নয়, পক্ষিনী। আর আশ্চর্য ব্যাপার, পুরুষ পক্ষীটি উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া ঠোঁট ও নখের সাহায্যে জালটি ছিঁড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। কয়েকবার চেষ্টার পর অবশেষে সত্যই সে জালের খানিকটা ছিঁড়িয়া ফেলিল। সাবর্ণির মনে হইল, ওই ছিদ্র দিয়া তাহার সঙ্গিনী এই বার অনায়াসে বাহির হইয়া আসতে পারিবে। এই দৃশ্য মহর্ষি সাবর্ণির চিত্তে যে মহতী কল্পনা উদ্রিক্ত করিল তাহা তাঁহার মতো সাধু ব্যক্তির চিত্তেই উদ্ভবযোগ্য। এই দৃশ্যে তিনি যেন একটি রূপককে মূর্ত দেখিলেন। তিনি যেন প্রত্যক্ষ করিলেন, ওই পক্ষিনীই নিরঞ্জনা, কামনার জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। আর ওই পুরুষ পক্ষীটি যেমন নখ চক্ষু দ্বারা জাল ছিন্ন কবিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাঁহাকেও তেমনি উপদেশ দ্বারা ওই অদৃশ্য কামনাজাল ছিন্ন করিয়া নিরঞ্জানাকে উদ্ধার করিতে হইবে। এই দৃশ্য তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিল। তিনি চক্ষু বুজিয়া মনে মনে ইষ্টদেবতা শঙ্করকে স্মরণ করিবার পর তাঁহার সঙ্কল্প দৃঢ়তর হইল। কিন্তু আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অন্তরে আশঙ্কারও ছায়াপাত হইল। তিনি দেখিলেন, জালের জটিলতায় পক্ষিনীর পায়ের নখগুলি এমন আটকাইয়া গিয়াছে যে, ছিদ্র সত্ত্বেও সে বাহির হইতে পারিতেছে না।

সমস্ত রাত্রি তিনি ঘুমাইতে পারিলেন না। অতি প্রত্যুষে তাঁহার নয়নে এক অলৌকিক দৃশ্য প্রতিভাত হইল। তিনি দেখিলেন, নিরঞ্জনা যেন আসিয়াছে। তাহার মুখভাবে কামনা বা লালসার কোনও চিহ্ন নাই, পোশাক পরিচ্ছদেও অতি স্বচ্ছ ঘাগড়া বা ওড়নার অভব্যতা নাই। একটা ঘনকৃষ্ণ আচ্ছাদনে তাহার সর্বাঙ্গ আবৃত, মুখেরও খানিকটা ঢাকা রহিয়াছে। দেখা যাইতেছে কেবল অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুইটি। মহর্ষি সাবর্ণিও অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই অভাবিত ঘটনার মধ্যে যে ভগবান দেবাদিদেবের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আভাসিত হইয়াছে ইহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এই দৃশ্য তাঁহাকে যেন দ্বিধামুক্ত করিল। ভগবান শঙ্করের প্রতীক ত্রিশূলটি হস্তে লইয়া তিনি কুটীর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

তাহার নিকট বহু দুষ্প্রাপ্য শিবস্তোত্র ছিল। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে যাহাতে সেগুলি নষ্ট হইয়া না যায় সেজন্য তিনি কুটীরদ্বার ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর প্রতিবেশী সাধু ভূমানন্দকে ডাকিয়া তিনি তাঁহার নিজ শিষ্যগণের ভার অর্পণ করিলেন। সমস্ত সারিয়া গৈরিকমাত্র সম্বল করিয়া তিনি যাত্রা করিলেন গঙ্গানদীর উদ্দেশে। পাটলিপুত্র গঙ্গাতীরে অবস্থিত। গঙ্গানদীকে অনুসরণ করিলেই তিনি পাটলিপুত্রে পৌঁছিয়া যাইবেন, পথ ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করিয়া অতিশয় দ্রুতবেগে তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা তাহার গতিরোধ করিতে পারিল না, দৈহিক ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া তিনি ধূলিকঙ্করময় পথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন। কিছুদূর গিয়া অবশ্য তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন কিন্তু ক্লান্তিও তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। তিনি হাটিতেই লাগিলেন। অবশেষে তাহার চেষ্টা ফলবতী হইল। সমস্ত দিন পথ চলিবার পর সন্ধ্যার পূর্বে তিনি গৈরিকবর্ণা গিরিকন্যার দর্শন লাভ করিলেন। তরঙ্গমুখরা গঙ্গানদীর তীরে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহার সমস্ত অন্তর ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া গেল। মর্ত্যে অবতরণকালে ব্রহ্ম কমণ্ডলু হইতে উচ্ছলিত হইয়া জাহ্নবী যে শিবের জটাজালে নিপতিত হইয়াছিলেন—এই পৌরাণিক কাহিনী তাঁহার মনে পড়িল। তিনি জানু পাতিয়া গঙ্গাস্তব করিতে লাগিলেন। করজোড়ে প্রার্থনা করিলেন, দেবি, তোমার স্পর্শে ভস্মীভূত সগরবংশ নবজন্ম দান করে। মহেশ্বরের কৃপায় আমি যেন তাহাকে মুক্ত করিতে পারি, মহেশ্বরের মর্যাদা যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। প্রার্থনা শেষ করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং আবার হাঁটিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি নদীতীরবর্তী এক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রামে ঢুকিয়া কিন্তু তিনি যখন ভিক্ষা করিতে গেলেন তখন অনেকেই তাঁহাকে তাড়া করিয়া আসিল। গৃহস্থদের এরূপ ব্যবহারে তিনি প্রথমে আশ্চর্য হইলেন, কিন্তু পরে বুঝিতে পারিলেন এটি বৌদ্ধ গ্রাম। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বহু লোক তখনও এ দেশে ছিল তাহারা নিজেরাই অধঃপতিত হইয়াছিল।—বৌদ্ধধর্মের মর্যাদা রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের নামে বৈষ্ণব, শৈব বা বেদপন্থী সন্ন্যাসীদের নির্যাতন করিতে তাহারা ছাড়িত না। গৃহস্থদের অভদ্র আচরণ দেখিয়া মহর্ষি সাবর্ণি স্থির করিলেন, কোনও গ্রামের ভিতর তিনি আর প্রবেশ করিবেন না। তাঁহার মনে হইল, গ্রামে প্রবেশ করিলে গ্রামবাসীদের দুর্ব্যবহারই কেবল যে তাঁহাকে বিপন্ন করিবে তাহা নয়, পথে

ক্রীড়ারত বালকেবাও হয়তো দল বাঁধিয়া তাঁহার পিছু লইবে, কিংবা কূপের নিকট যুবতীগণের বিলোল কটাক্ষ চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিবে। তাঁহাব মনে হইল, সমাজের সংস্পর্শই কলুষময়, কি যে কখন ঘটিবে কিছুই বলা যায় না। সুতরাং গ্রাম শহর যথাসম্ভব এড়াইয়া তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা আসিলে শ্মশানে গিয়া রাত্রি যাপন কবিতেন এবং শ্মশানবিলাসী শঙ্করের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন।

এই ভাবে ছয় দিন হাঁটিবাব পর তিনি পর্বতমালাবেষ্টিত এক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানেও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তাঁহার নয়নগোচর হইল। দেখিলেন, পর্বতগাত্রে নানা ভঙ্গীর বুদ্ধমূর্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এক পর্বতের পাদদেশে বিরাটাকার এক ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ মূর্তিটির দিকে তিনি নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার অন্তরে এক অদ্ভুত আশঙ্কার উদয় হইল। মনে হইল, কোনও মন্ত্রবলে এই বিবাট পুরুষ সঞ্জীবিত হইয়া যদি তাঁহাকে আক্রমণ কবে! দুরাচাব পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিকেবা কোথাও আত্মগোপন কবিয়া নাই তো! সুযোগ পাইলে শৈব সন্ন্যাসীদেব নিষ্ঠুরভাবে হত্যা কবিতেও যে তাহারা ইতস্তত করে না, এ ধরনের সংবাদ তাঁহার তিনি অনেক শুনিয়াছিলেন। সেই নির্জন গিবিবেষ্টিত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া তাঁহাব ভয় করিতে লাগিল। তিনি জানু পাতিয়া বসিযা শিবস্তোত্র আবৃত্তি কবিতে লাগিলেন। ঐকান্তিকভাবে শিবস্তোত্র আবৃত্তি করিলে যে সর্বপ্রকাব বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় — এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল। কিছুক্ষণ শিবস্তোত্র আবৃত্তি করার পর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। বিরাট বুদ্ধমূর্তিব পিছন হইতে একটা বাদুড়ছানা ঝটপট করিয়া উড়িয়া গেল। সাবর্ণির মনে হইল, শিবস্তোত্রেব প্রভাবে বুদ্ধমূর্তি বুঝি পাপমুক্ত হইল। বৈদিক ধর্মের বিরোধিতা করিয়া এই রাজপুত্র যে পাপ সংগ্রহ করিয়াছিলেন শিবনামেব গুণে তাহাই বোধ হয় বাদুড় রূপ ধারণ করিয়া উড়িয়া গেল। সহসা তাঁহাব মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। সনাতন হিন্দুধর্মকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া লোকটা দেশের কি অনিষ্টই না কবিয়াছে! তিনি আগাইয়া গেলেন এবং একটি প্রস্তরখণ্ড তুলিযা মূর্তিটির দিকে নিক্ষেপ করিলেন। প্রস্তরটি মূর্তির কপালের মাঝখানে গিয়া আঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অদ্ভুত ব্যাপাব ঘটিতে লাগিল। মহর্ষি সাবর্ণি লক্ষ্য করিলেন, মূর্তি যেন সজীব হইয়া উঠিতেছে, তাহার মুখভাব পরিবর্তিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহার সমস্ত মুখমণ্ডল বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, মনে হইতে লাগিল এখন বুঝি চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িবে। সেই বিরাট মূর্তিব বিরাট মুখমণ্ডলে এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সাবর্ণিব হৃদয় করুণার্দ্র হইল। আর একটু আগাইয়া গিয়া মূর্তিকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, আশা করি তুমি এবার হৃদয়ঙ্গম করেছ যে, দেবদেবীবর্জিত ধর্ম প্রচার করলে সমাজের কি অনিষ্ট হয়। শিবনাম উচ্চারণে তোমার পাপ স্খালন কর। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি। শিবনাম করে তুমি পাপমুক্ত হও—"

সাবর্ণির মনে হইল, বুদ্ধমূর্তির চক্ষুদ্বয় যেন আলোকিত হইয়া উঠিতেছে, চক্ষুপল্লব যেন ঈষৎ কম্পিত হইল, তাহার অধরোষ্ঠ ঈষৎ বিভিন্ন হইয়া গেল, মনে হইল সত্যই যেন সে শিবনাম উচ্চারণ করিতেছে।

মহর্ষি সাবর্ণি তখন দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া সেই প্রস্তরমূর্তিকে পুনরায় আশীর্বাদ করিলেন। আবার পথ চলা শুরু হইল।

আরও কিছুদূর যাইবার পর তিনি এক বিশাল নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চতুর্দিকে বহু ভগ্ন প্রাসাদ, প্রাকার ও মন্দির রহিয়াছে। যে সব মন্দির তখনও ভূমিসাৎ হয় নাই, সাবর্ণি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেইগুলিকেই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, মন্দির মধ্যে কোনও দেব-দেবীর বিগ্রহ নাই। একটি মন্দিরে আলিঙ্গন-বদ্ধ একটি নব-নারীর প্রস্তর মূর্তি রহিয়াছে। নারীটির দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন, পুরুষটির নাসিকাগ্র নাই। মন্দিবগাত্রেও দেখিলেন, বহু অশ্লীল চিত্র খোদিত রহিয়াছে— নগ্ন রমণী, নগ্ন পুরুষ, মৈথুনরত নব-নারী জীব-জন্তু ছাড়া অন্য কোনও চিত্রই নাই। তাঁহাব মনে হইল, প্রতিটি মূর্তি যেন তাঁহাকেই নির্নিমেষে দেখিতেছে। পুনরায তিনি ভীত হইয়া পড়িলেন এবং দেবাবদিদেব মহাদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, সম্ভবত কোনও শক্তিশালী হিন্দুরাজা অধঃপতিত বৌদ্ধদের এই সব লালসা-উদ্দীপক কাম-চিত্রগুলিকে অবলুপ্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু সম্যকরূপে কৃতকার্য হন নাই। ভগ্ন বিধ্বস্ত হইয়াও ইহারা এখনও কাম-লীলা প্রকটিত কবিতেছে।

এই ভাবে তিনি সপ্তদশ দিবস নানারূপ কুৎসিত দৃশ্য দেখিতে দেখিতে পথ অতিবাহন করিলেন। শিবমন্ত্রের বর্মে আবৃত ছিলেন বলিযাই সম্ভবত তাঁহার আর কোনরূপ বিপদ ঘটিল না।

অষ্টাদশ দিবসে এক গ্রামের বাহিরে তিনি তালপত্রনির্মিত একটি কুটীর দেখিতে পাইলেন। কুটীরটি তাঁহার অন্তরে পুলক সঞ্চার করিল। কারণ কুটীরটির ভগ্নদশা দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, এটি নিশ্চয়ই কোন সংসার-বিরাগী সাধুর কুটীর। কয়েক মুহূর্ত মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া তিনি কুটীরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আশা হইল, হয়তো কোনও শৈব সন্ন্যাসীরই সাক্ষাৎ পাইবেন। সমীপবর্তী হইয়া লক্ষ্য করিলেন, কুটীরে দ্বার বা বাতায়ন নাই, চতুর্দিকেই খোলা কয়েকটি বংশদণ্ডের উপর চালটি কোনক্রমে টিকিয়া আছে। ঘরের মেঝেতে রহিয়াছে কয়েকটি বেল, একটি মাটির কলসী এবং তৃণশয্যা।

সাবর্ণি স্বগতোক্তি করিলেন, "বেল যখন রয়েছে তখন নিশ্চয় কোন শিবভক্তের আস্তানা এটি। কিন্তু গেলেন কোথা ভদ্রলোক? দেখা হলে দুজনে মিলে শিবনাম করতাম খানিকক্ষণ। শিবেব দযা হলে আহারেরও ব্যবস্থা হয়ে যেত হয়তো। ভদ্রলোক শিবেব নামে বিল্বফল উৎসর্গ করে আমাকে একটু প্রসাদ কি আর না দিতেন! কোথা গেলেন তিনি? একটু সন্ধান করি--"

তাঁহাকে বেশী দূর যাইতে হইল না। একটু আগাইয়াই তিনি দেখিতে পাইলেন, গঙ্গার তীরে পদ্মাসনে এক ঋজু-দেহ ব্যক্তি বসিয়া আছেন। আরও কাছে গিয়া দেখিলেন, লোকটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। চুল ও দাড়ি একেবারে শুভ্র, গায়ের রঙ গাঢ় রক্তবর্ণ। সাবর্ণির সন্দেহ রহিল না যে, ইনিই সেই সন্ন্যাসী। যথারীতি সম্ভাষণপূর্বক সাবর্ণি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

"ভদ্র, ভগবান শঙ্কর আপনার মঙ্গল করুন। তাঁহার করুণা আপনাকে অক্ষয় আনন্দের অধিকারী করুক—"

লোকটি কিন্তু কোনও উত্তর দিল না। এমনভাবে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল যেন কোনও কথাই শুনিতে পায় নাই। সাবর্ণির সহসা মনে হইল, হয়তো বা সন্ন্যাসী সমাধিস্থ হইয়া আছেন। আর উচ্চবাচ্য না করিয়া তিনিও করজোড়ে নতজানু হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং শিব-প্রার্থনায় নিরত হইলেন। অনেকক্ষণ কাটিল। ক্রমশ সূর্য অস্ত গেল। কিন্তু ওই উলঙ্গ রক্তবর্ণ সাধুর কোন ভাবান্তর লক্ষিত হইল না।

সাবর্ণি সসঙ্কোচে পুনরায় বলিলেন, "প্রভু, আপনার যদি ধ্যানভঙ্গ হয়ে থাকে আমাকে আশীর্বাদ করুন, যেন আমি আপনার মতো শিবভক্ত হতে পারি।"

এইবার ফল ফলিল।

ঘাড় না ফিরাইয়াই লোকটি উত্তর দিল, "আগন্তুক, তোমার কথার কোন অর্থবোধ হচ্ছে না। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব কেন, তোমার এই শিবই বা কে?"

মহর্ষি সাবর্ণি শিহরিয়া উঠিলেন।

"সে কি! আপনি দেবাদিদেব মহাদেবের শিবনাম শোনেন নি—এ কি সম্ভব?"

"খুবই সম্ভব। পৃথিবীতে ধ্রুব সত্য বলে কিছু নেই, তা না হলে বলতাম ধ্রুব সত্য।"

মহর্ষি সাবর্ণি লোকটির নিদারুণ অজ্ঞতায় মর্মাহত হইলেন।

"আপনি কি ভারতবাসী?"

"ভাবতবর্ষে যখন জন্মেছি, তখন ভারতবাসী বই কি।"

"অথচ আপনি মহাকাল ত্রিলোচনের নাম শোনেননি! মৃত্যুর পর অনন্ত সুখময় জীবন লাভ করবার ইচ্ছা কি আপনার নেই? দেবাদিদেবের মহিমা উপলব্ধি না করলে সবই যে বৃথা—এ কথা তো প্রত্যেক ভারতবাসীর জানা উচিত।"

"আমার মনে হয় সবই বৃথা। জন্ম-মৃত্যুও আমার কাছে সমান।"

"বলেন কি! অনন্ত স্বর্গ লাভ করবার ইচ্ছে আপনার নই? আপনার ওই কুটীর আর আপনার ধ্যানমগ্ন মূর্তি দেখে আমার ধারণা হয়েছিল, আপনি সন্ন্যাসী।"

"আপনার ধারণা ভুল না হতে পারে।"

"আপনি উলঙ্গ। এর থেকে মনে হয় আপনি সর্বত্যাগী।"

"হতে পারে।"

"আপনার ঘরে মাত্র কয়েকটি বেল দেখলাম। তাই মনে হল হয়তো আপনি ফলাহারী ব্রহ্মচারী।"

"তাও না হয় হল। তাতে কি হয়েছে?"

"তার মানে আপনি জীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য আড়ম্বর ত্যাগ করেছেন।"

"লোকে সাধারণত যে সব জিনিসকে ঐশ্বর্য বলে মনে করে বৃথা আস্ফালন আড়ম্বর করে, তা আমি ত্যাগ করেছি।"

"তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আপনি আমারই মতো দরিদ্র, আমারই মতো নির্মলচরিত্র,

এক কথায় আমারই মতো সন্ন্যাসী। কিন্তু আপনি মহাদেবের নাম পর্যন্ত শোনেননি — এ বড় আশ্চর্য ঠেকছে আমার কাছে। ইহলোকের ঐশ্বর্যসম্ভার ত্যাগ করে দারিদ্র্য পীড়িত বঞ্চিত জীবন যাপন করবার সার্থকতা কি, যদি পরলোকে অনন্ত সুখশান্তি পাওয়ার আশা না থাকে?''

''আগন্তুক, আমি নিজেকে একটুও পীড়িত বা বঞ্চিত বলে মনে করি না। যে জীবনদর্শন আমি আবিষ্কার করেছি তাতেই আমি সন্তুষ্ট আছি, সূক্ষ্ম বিচার করে তাকে ভাল বা মন্দ কোনও পর্যায়ে ফেলবার চেষ্টাই আমি করিনি। পৃথিবীতে কিছুই ভাল বা মন্দ নয় সম্মানজনকও কিছু নেই। ন্যায় অন্যায়ও আমাদের সৃষ্টি। আমরা নিজেরাই গুণ বা দোষ আরোপ করে প্রত্যেক জিনিসকে স্বধর্মভ্রষ্ট করি — মসলা যেমন ব্যঞ্জনের প্রকৃত স্বাদকে বিকৃত করে ''

'তা হলে আপনার মতে সত্য বলে কিছু নেই? দেখছি, সামান্য প্রতিমা উপাসকেরাও যে ধ্রুবের সন্ধান করেন সে সম্বন্ধেও আপনি অজ্ঞ আপনি দার্শনিক, না, পশু তা বুঝতে পারছি না সন্দেহ হচ্ছে পশুর মতোই আপনি অজ্ঞতার কর্দমে নিমজ্জিত রয়েছেন।''

পশু বা দার্শনিককে গাল দেওয়া বৃথা। পশু যে কি তা আমরা জানি না, আমরা নিজেরা যে কি তাও জানি না। কিছু জানি না আমরা —''

'নাস্তিক বলে এক অদ্ভুত সম্প্রদায় আছে শুনেছি। আপনি কি সেই দলের নাকি। তারা কিছুই মানে না। গতিও না, স্থিতিও না। দিনের আলো রাতের অন্ধকার দুইই তাদের কাছে সমান।''

''বন্ধু আমি নাস্তিকই। নাস্তিকের মতবাদ তোমার কাছে হয়তো হাস্যকর, কিন্তু আমার কাছে নয় আমি বিভিন্ন সময়ে বা বিভিন্ন মানসিক অবস্থায় একই জিনিসের বিভিন্ন রূপ দেখি বিরাট মন্দির প্রভাতের স্বর্ণকিরণে ঝলমল করে আবার সান্ধ্য আকাশের উজ্জ্বল রঙীন পটভূমিকায় সেই মন্দিরকেই দেখায় কষ্টিপাথরের স্তূপের মতো। ওর সত্য রূপ কি আমি জানি না। আমি জানি সবই বদলায় সূর্যকে হিরণ্ময় পাত্রের মতো দেখি, কিন্তু কেন দেখি তা জানি না অগ্নির তাপ অনুভব করি, কিন্তু অগ্নি কেন যে উত্তপ্ত তা জানি না। বন্ধু, তুমি ক্ষুণ্ণ হয়েছ মনে হচ্ছে কিন্তু একটা কথা মনে রেখো দার্শনিকের চক্ষে সবই সমান।''

তাই যদি হয় তা হলে আপনি সুখভোগে লিপ্ত না থেকে এমন নির্জনে ওই ভগ্নকুটিরে বসে থেকে এমন দুর্দশায় আছেন কেন? কেন তা হলে এই কষ্ট সহ্য করছেন? আমিও আপনারই মতো নির্জনের কৃচ্ছ্রসাধনা করি। কিন্তু আমার একটা লক্ষ্য আছে, আমি দেবাদিদেবকে প্রসন্ন করতে চাই। তিনি প্রসন্ন হলে আমি অনন্ত সুখের অধিকারী হব - এই আমার বিশ্বাস। তাই আমার আচরণ নিরর্থক নয়, ভবিষ্যৎ সুখের জন্য বর্তমানে কষ্ট সহ্য করা প্রয়োজন। কিন্তু আপনি এ কি করছেন। ভবিষ্যৎ অনন্ত জীবনের অস্তিত্বে আপনার যদি আস্থা না থাকে, তা হলে এ দুঃখভোগ কি অনর্থক নয়? এ তো তা হলে বাতুলতার নামান্তর আমি যদি আপনার মতো নাস্তিক হতাম এই ভয়ঙ্কর উক্তির জন্য শঙ্কর আশা করি আমাকে ক্ষমা করবেন — আগমে নিগমে শাস্ত্রে পুরাণে সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবনচরিতে

যে শিবমহিমা কীর্তিত তাতে যদি আমাব বিশ্বাস না থাকত, আত্মার পবিশুদ্ধিব জন্যই শাবীবিক কৃচ্ছ্রসাধন প্রয়োজন এ সত্যে আমি যদি আস্থাবান না হতাম, সংক্ষেপে আপনাব মতো আমিও যদি অজ্ঞান তিমিবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতাম, তা হলে আমি সন্ন্যাসী হতাম না, সংসাবেই থাকতাম। সংসাবেব ভোগবিলাসেই গা ঢেলে দিতাম। বিলাসেব সঙ্গী-সঙ্গিনীদেব ডাক দিয়ে বলতাম- নিয়ে এস তোমাদেব সুবা আব সুধা, নিয়ে এস অলঙ্কাব আব অহঙ্কাবেব উপচাব আডম্বব, চল, আনন্দেব হিল্লোলে ভেসে যাই। আপনাব তাই কবা উচিত ছিল। আপনি যা কবছেন তাতে আপনাব বুদ্ধিব কোন পবিচয় পাচ্ছি না। বর্তমানেব সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়েছেন, অথচ ভবিষ্যতেব কোনও সুখ আশা কবেন না, মনে হচ্ছে আপনি একূল দুকূলই হাবিয়ে মাঝখানে দিশাহাবা হয়ে আছেন, অথচ তা বুঝতে পাবছেন না। এ বকম সাধু সাজবাব অর্থ কি। আপনাব আচবণ বড়ই অদ্ভুত মনে হচ্ছে, পশুদেব ব্যবহাবেবও একটা সঙ্গতি থাকে। ব্যাপাবটা কি বলুন তো?"

সার্বর্ণিব কণ্ঠস্ববে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ ও উত্তাপ ছিল। বৃদ্ধ কিন্তু বেশ শান্ত কণ্ঠেই উত্তব দিলেন, "ভাই, যে ব্যক্তিকে তুমি পশুবও অধম বলে মনে কবছ তাব কথা জেনে লাভ কি?"

বৃদ্ধেব শান্ত কণ্ঠস্ববে সাবর্ণি ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। সত্য সম্বন্ধে কৌতূহলই তাহাকে ভব্যতাব গণ্ডী লঙ্ঘন কবাইয়াছিল —বৃদ্ধকে অপমান কবা তাঁহাব উদ্দেশ্য ছিল না।

তিনি বলিলেন, "সত্য জানবাব আগ্রহে আমি যদি শোভনতাব সীমা অতিক্রম কবে থাকি আমাকে ক্ষমা কবুন। আপনাব উপব ব্যক্তিগতভাবে আমাব বাগ বা আক্রোশ থাকবাব কথা নয়। কিন্তু আপনি যে অন্ধকাবে নিমজ্জিত হয়ে আছেন, সেই অন্ধকাব আমি ঘৃণা কবি। আমি ভাবতেও পাবি না যে, এমন ভাবতবাসী থাকতে পাবেন যিনি শিবেব নাম পর্যন্ত শোনেননি। আপনাব মধ্যেই আমি শিবকে প্রচ্ছন্ন দেখছি এবং মনে মনে প্রার্থনা কবছি, আপনাব কাছেও তিনি আত্মপ্রকাশ করুন। শিব মহিমাব শুভ্র আলোকে আপনাব তমসাচ্ছন্ন বুদ্ধিব মুক্তি হোক। একটি অনুবোধ কবছি আপনাব এই অদ্ভুত আচবণেব স্বপক্ষে যদি কোনও যুক্তি থাকে আমাকে বলুন, আমি এখনই তা খণ্ডন কবব।"

বৃদ্ধ শান্তভাবেই উত্তব দিলেন, "যুক্তি বিবৃত কবতে আমাব আপত্তি নেই, কিছু না বলে চুপ কবে থাকতেও আপত্তি নেই। আপনি শুনতে চাচ্ছেন শুনুন। আমাব যুক্তিব উত্তবে কিন্তু আপনি যা বলবেন তা আমি শুনব না। শোনবাব প্রবৃত্তি নেই। আপনাব সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল আমাব জাগেনি। আপনি আপনাব মধ্যেই আপনাব সুখ-দুঃখ বর্তমান-ভবিষ্যৎ যুক্তি তর্ক নিবদ্ধ কবে বাখুন। তা নিয়ে সময় নষ্ট কবতে বা মাথা ঘামাতে আমি ইচ্ছুক নই। আপনাব প্রতি প্রেম বা ঘৃণা কিছুই জাগেনি আমাব মনে দার্শনিকেব কাছে তৃষ্ণা বা বিতৃষ্ণা দুই সমমূল্য। এখন মনে পড়েছে, শিব নামক যে দেবতাটিব আপনি নাম কবলেন তাঁব নাম একেবাবে শুনিনি যে তা নয়, ছেলেবেলায় একবাব শুনেছিলাম। কিন্তু তাঁকে নিয়ে মাতামাতি কবিনি কখনও। প্রয়োজনই হয়নি। দেবতা তো একটি নন, শুনেছি সংখ্যায় তাঁবা তেত্রিশ কোটি, হয়তো আবও বেশি, কিন্তু আমাব জীবনে তাঁদেব কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তাই তাঁদেব কথা চিন্তা কবি না কখনও।"

"আপনার নাম কি?"

"আমার নাম কৌশিক। জাতিতে আমি লিচ্ছবি। শুনেছি, আমার পূর্বপুরুষরা রাজা ছিলেন। কিন্তু রাজত্ব তাঁদের বেশি দিন টেকেনি। আমার পিতামহের কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল, কিন্তু তিনি শেষকালে নিঃস্ব হয়ে দেশত্যাগ করেন। সৌরাষ্ট্রে চলে যান তিনি। সেইখানেই আমার পিতার জন্ম হয়। আমার পিতাও প্রথম জীবনে যথেষ্ট দারিদ্র্য ভোগ করেছিলেন। পরে তিনি এক বণিকের সহকাবী হয়ে বাণিজ্য আরম্ভ করেন। বাণিজ্যে তাঁর বেশ লাভ হল এবং ক্রমশ তিনি সৌরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ ধনীদের অন্যতম হয়ে পড়লেন। আমার দুই দাদা ছিলেন। তাঁদের উনি ওই ব্যবসাতেই লাগালেন। আমাকে দিলেন বিদ্যালয়ে। আমি পড়াশোনায় মন দিলাম। ভালই দিন কাটছিল আমাদের কিন্তু তার পরেই বিপদের ছায়াপাত হল। ব্যাপারটায় সূত্রপাত হল বড়দার বিয়ে নিয়ে। বাবা তাঁর এক ব্যবসায়ী বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে জোর করে বড়দার বিযে দিলেন। ফল বিষময় হল। অদ্ভুত কান্ড হল একটা। বড়দা বৌদিদিকে একেবারে সহ্য করতে পারতেন না, মেজদা কিন্তু তাঁব প্রতি আকৃষ্ট হলেন। পবে জানা গেল, তাঁর সঙ্গে একটা অবৈধ যোগাযোগও ঘটেছে। বৌদিব মনোভাব ছিল কিন্তু একেবাবে অন্যরকম। তিনি আমার দুই দাদাকেই ঘৃণা করতেন। তিনি ভালবাসতেন এক বাঁশীওলাকে, বিয়ের আগে থেকেই সম্ভবত ভাব ছিল তার সঙ্গে। সে গভীর রাত্রে গোপনে বৌদিব ঘবে আসত। একদিন সে ধরা পড়ল। দুই দাদা মিলে তাকে এমন চাবকান চাবকালেন যে, সে মরেই গেল। তাব আর্তনাদ অনুনয় অশ্রু নিবৃত্ত করতে পাবলে না দাদাদের। এর পর যা হল তা আরও ভয়ঙ্কর। বৌদি পাগল হয়ে গেলেন। আমার দুই দাদাও। তাঁরা রাস্তায় বাস্তায় চীৎকার করে বেড়াতে লাগলেন। পশুব মতো চীৎকার করে বেড়াতেন তাঁবা। এত চীৎকাব করতেন যে মুখ দিয়ে ফেনা গড়াত। কারও দিকে চাইতেন না তাঁবা। মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকতেন। একপাল ছেলে তাদের পিছু নিয়েছিল, ছেলেদের যা স্বভাব তাই করত তাবা, ওই পাগল তিনটিকে লক্ষ্য করে দূর থেকে ঢিল ছুঁড়ত। কিছুদিন পরে তাঁরা মারা গেলেন— তিনজনেই মারা গেলেন। বাবা বেঁচে ছিলেন তখনও, তাঁকেই শ্রাদ্ধশান্তি করতে হল। কিছুদিন কাটল, কি ভাবে কাটল অনুমান করতে পারছেন আশা করি। তারপর বাবার পালা এল। তাঁব পেটে একটা যন্ত্রণা হতে লাগল। শুধু তাই নয়, যা খেতেন বমি হয়ে যেত। এশিয়ার সমস্ত খাদ্যদ্রব্য কিনে ফেলবার মতো অর্থ তাঁর ছিল। কিন্তু তিনি মারা গেলেন অনাহারে। পেটে কিছুই থাকত না। আমি অবশেষে তাঁর বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলাম। তাঁব ইচ্ছে ছিল না যে, আমি তাঁর উত্তরাধিকাবী হই। কিন্তু গত্যন্তর ছিল না। সমস্ত টাকাটা আমাব হাতেই পড়ে গেল। গৃহের পরিবেশ ভাল লাগল না আমার। আমি বেরিয়ে পড়লাম দেশভ্রমণে। ভারতবর্ষ ঘুরলাম। সিংহলে, শ্যামদেশে, যবদ্বীপেও গেলাম। অনেক বড় বড় মঠে, বড় বড় বিদ্যাপীঠে, বড় বড় মন্দিরে, বড় বড় বিদ্বানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। আলাপও হল। তাঁদের তর্ক করবার প্রবল ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গেলাম আমি। প্রত্যেকেই মহা তার্কিক, অপরকে হীন প্রতিপন্ন করে নিজের বিদ্যা জাহির করতে চায় প্রত্যেকে। একদিন কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে হরিদ্বারের কাছে গঙ্গাতীরে এমন একজনকে দেখলাম যে আমার তাক

লেগে গেল। দেখলাম গঙ্গাতীরে সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি লোক পদ্মাসনে স্থির হয়ে বসে আছেন। সবাই বললে—উনি একজন উঁচুদরের সন্ন্যাসী, ত্রিশ বৎসর ধরে ঠিক ওই এক‌ভাবে বসে আছেন। দেখলাম, তাঁর শীর্ণ দেহ লতায় ঘিরেছে, তাঁর রুক্ষ জটায় পাখী বাসা বেঁধেছে। অথচ তিনি বেঁচে আছেন। আমার দুই দাদা বৌদি, সেই বাঁশীওলা আর বাবার কথা মনে পড়ল, কি দুঃখই না তাঁরা পেয়েছেন। বুঝলাম, এই গঙ্গাতীরবাসী সন্ন্যাসীই প্রকৃত জ্ঞানী। আমার যেন একটা উপলব্ধি হল, মনে হল যেন পথ দেখতে পেলাম। বুঝলাম মানুষের দুঃখের একমাত্র কারণ কামনা। আমরা যেটাকে আনন্দ-জনক বলে মনে করি, সেইটেই কামনা করি। কাম্য বস্তু না পেলেই দুঃখ হয়, আবার পেলেও সর্বদা ভয় ভয় করে—পাছে সেটা হাতছাড়া হয়ে যায়। এটা আনন্দজনক, ওটা দুঃখজনক—এই সব বিশ্বাসই দুঃখের হেতু। এই সব বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিলেই দুঃখ, বর্জন করলে দুঃখের হাত থেকে অনেকটা রেহাই পাওয়া যায়। সেই সাধুর আদর্শই আমি অনুসরণ করছি। এটা ভাল, ওটা মন্দ—এ বোধ ত্যাগ করে যতদূর সম্ভব নির্বিকার হয়ে নির্জনে স্থির হয়ে বসে থাকাটাই আমি একমাত্র শ্রেয়ঃ বলে মনে করছি।"

মহর্ষি সাবর্ণি অভিনিবেশ সহকারে কৌশিকের কথাগুলি শুনিতেছিলেন। কৌশিকের বক্তব্য শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "আপনি যা বললেন তা যে একেবারে অর্থহীন তা নয়। পার্থিব সুখ সত্যই বর্জনীয়। অপার্থিব সুখলাভের জন্যই বর্জনীয়। ঋষিরা যাকে অপার্থিব অনন্ত সুখ বলে বর্ণনা করেছেন, সেটাকে কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া চলে না। সেইটাই হল লক্ষ্য। এই সত্যকে অবজ্ঞা করলে স্বয়ং ভগবানকেই অবজ্ঞা করা হয় যে! নিতান্ত পাগল ছাড়া আর কেউ তা করতে সাহস করবে না। কৌশিক, আপনার অজ্ঞতায় আমি ব্যথিত হয়েছি। আপনি এইটুকু শুধু উপলব্ধি করতে চেষ্টা করুন যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিমূর্তিতেই পরম সত্য প্রকাশিত। একই তিন, আবার তিনই এক। আপনি আমার কথাগুলি শুনুন ভাল করে—"

কৌশিক বাধা দিলেন, "আগন্তুক, ক্ষান্ত হও। তোমার শাস্ত্র-ব্যাখ্যা আমি শুনতে চাই না। জোর করে আমাকে দলে টানবার চেষ্টা করো না, পারবে না। আমি কোনও মতবাদই মানি না। কোন সিদ্ধান্তই শেষ কথা বলতে পারেনি, সমস্ত শাস্ত্র-আলোচনাই বন্ধ্যা—এই আমার মত। এই মত অনুসরণ করে আমি মোটামুটি ভালই আছি। তুমি তোমার গন্তব্য পথে চলে যাও। বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করবার পর যে নির্লিপ্ত নির্বিকার অবস্থায় আমি নিজেকে মগ্ন করতে পেরেছি, সেখান থেকে আমাকে টেনে তোলবার চেষ্টা করো না। তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও।"

মহর্ষি সাবর্ণি প্রকৃতই একজন শাস্ত্রপারঙ্গম প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ঈশ্বরের করুণা এখনও এই দুর্ভাগ্য কৌশিকের উপর বর্ষিত হয় নাই। ইহার চিত্ত সাংসারিক কষ্টে এত বেশী বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, মহেশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত ইহার নাই। মুক্তি বা অনন্ত জীবনের কল্পনা করা এখনও ইহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি এ বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না, কারণ তিনি জানিতেন অপাত্র বা অনধিকারীর সহিত শাস্ত্রীয় বাদানুবাদ করিলে অনেক সময় বিষময় ফল হয়, অবিশ্বাসীরা জেদ

করিযা যেন নিজেদের পাপের মাত্রা আরও বাড়াইযা দেয। এই সব চিন্তা করিযা মহর্ষি সাবর্ণি বলিলেন, "কৌশিক, ভগবান তোমাকে সুমতি দিন। আমার আর কিছু বক্তব্য নেই। আমি চললাম।"

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইযা আসিতেছিল। সেই অন্ধকারেই সাবর্ণি সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

উষাকালে দেখিতে পাইলেন, গঙ্গার তীরে মুণ্ডক নামক সারস-জাতীয পক্ষী একপদে স্থির হইযা দাঁড়াইযা রহিযাছে। গঙ্গার জলে তাহাদের মূর্তি প্রতিফলিত হইযাছে। আশেপাশে ঝাউবন। শ্বেতপক্ষ বলাকার শ্রেণী ত্রিভুজাকারে নীল আকাশে উড়িযা চলিযাছে। ঝাউবনের ভিতর হইতে নানাপ্রকার জলচর পক্ষীর বিচিত্র কণ্ঠস্বর ভাসিযা আসিতেছে।

সাবর্ণি দাঁড়াইযা রহিলেন। এই দৃশ্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। অসংখ্য তরঙ্গ তুলিযা সুরধুনী সাগরসঙ্গমে চলিযাছেন, যতদূর দৃষ্টি যায নৌকার সারি পাল তুলিযা চলিযাছে। নদীর তীরে মানুষের বসবাস। কোথাও গগনচুম্বী শ্বেত অট্টালিকা, কোথাও বা কুটীর শ্রেণী, আর সকলকে আবৃত করিযা রাখিযাছে একটা অর্ধস্বচ্ছ কুহেলিকা। কুহেলিকা ধীরে ধীরে যেন নিজেকে প্রসারিত করিতেছে। অনেক বাগান দেখা যাইতেছে, প্রত্যেকটিই ফলে ফুলে ভরা ক্ষেতে ক্ষেতে শস্যসম্ভার যেন উছলিযা পড়িতেছে, পক্ষী কলরবে চারিদিক মুখরিত, জীবনধাত্রী ধরিত্রী জীবনের বিচিত্র বিকাশে যে আত্মহারা হইযা পড়িযাছেন। তাঁহার সে আনন্দ শস্যশীর্ষে কাঁপিতেছে, ধূলিকণায বিচ্ছুরিত হইতেছে।

মহর্ষি সাবর্ণি নতজানু হইযা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—

"হে দেবাদিদেব মহেশ্বর, তোমার কৃপায আমার যাত্রা সফল হতে চলেছে তোমাকে নমস্কার। হে মদনান্তক, তোমার যে মহিমার বিচিত্র প্রকাশে প্রকৃতি সমুজ্জ্বলা, তোমার সেই মহিমার প্রভাব নিরঞ্জনাকেও কলুষমুক্ত করুক। যে প্রেমে তুমি বিশ্বপ্রকৃতিকে মধুময করে রেখেছ, নিরঞ্জনা যে তা থেকে বঞ্চিত এ আমি ভাবতে পারি না। হীন প্রবৃত্তির যে কালিমা তাকে কলঙ্কিত করে রেখেছে হে সবকলঙ্ক পাবক যোগীশ্বর, তুমি তা অপসারিত করে কুসুমেরই মতো স্বর্গীয সুষমায আবার তাকে ফুটিযে তোল"

প্রার্থনা শেষ করিযা আবার তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। পথে পুষ্পিত তরু বা সুন্দর পাখী দেখিলেই নিরঞ্জনার কথা মনে পড়িতে লাগিল।

গঙ্গার দক্ষিণ তীর দিযা চলিতে চলিতে বহু সমৃদ্ধ নগর ও গ্রাম অতিক্রম করিযা কযেকদিন পরে অবশেষে তিনি পাটলিপুত্রের সমীপবর্তী হইলেন।

তখন প্রভাত হইতেছিল। নিকটে একটি ক্ষুদ্র পর্বত-সদৃশ উচ্চভূমি দেখিযা তাহাতেই তিনি আরোহণ করিতে লাগিলেন। সেই উচ্চভূমির শীর্ষদেশে আরোহণ করিযা বহুকাল পরে তিনি সেই বিশাল নগরীকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন, নবোদিত সূর্যালোকে অসংখ্য সৌধমালা সমুজ্জ্বল হইযা উঠিযাছে। চতুর্দিক যেন ঝলমল করিতেছে। তাঁহার আনন্দ হইল, দুঃখও হইল। তাঁহার মনে হইল, এ আনন্দ কামজ। মনে হইল, যাহা দেখিতেছি তাহাতে মূঢ়

মানবদের মোহিনী কামনাই কেবল শতরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। দম্ভ, বিলাস, আত্মপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নাই।

সাবর্ণির অধরে একটা বক্র হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। অতীতের সমস্ত স্মৃতি ধীরে ধীরে তাঁহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতেছিল। তিনি নির্নিমেষে কিছুকাল চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে অন্তরের ভাবকে ভাষা দিলেন।

তিনি বলিতে লাগিলেন, "ওই নগরেই কামনার ফলস্বরূপ একদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম। ওই নগরের বিষাক্ত সুরভিত বাতাসে নিশ্বাস গ্রহণ করে কুহকিনী রাক্ষসীদের গান শুনে ছলাকলায় মুগ্ধ হয়ে আনন্দের সাগরে পাড়ি দেবার প্রয়াস পেয়েছিলাম আমি। জন্মের দিক থেকে বিচার করলে ওই আমার শৈশবের লীলাভূমি, সমাজের দিক থেকে দেখলে ওই গৃহ। লোকচক্ষে সে লীলাভূমি পুষ্পাকীর্ণ, সে গৃহ আভিজাত্যমণ্ডিত। পাটলিপুত্র, তোমার সন্তানেরা যে তোমাকে জননী বলে শ্রদ্ধা করে তাতে অস্বাভাবিকতা নেই কিছু। সত্যিই তোমার ক্রোড়ে তারা জন্মেছে, সত্যিই তাদের লালন করেছ তুমি। বিলাসবেশে সজ্জিত হয়ে আমিও তোমার বুকে মানুষ হয়েছিলাম একদিন। কিন্তু আমি ত্যাগ করেছি তোমাকে, স্বেচ্ছায় শুভ বুদ্ধিবশে ত্যাগ করেছি। মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠ গুণীরাও ওই উপদেশই দিয়েছেন। যারা বিদ্রোহী, তাঁরাই সন্ন্যাসী, তাঁরা প্রকৃতির পারবশ্য মানতে চান না। বৈদান্তিকেরা পার্থিব সুখ-দুঃখকে স্বপ্নবৎ অলীক মনে করেন, তপস্বীরা মানব জীবনকে প্রবাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন, সাধু মাত্রেই সংসারের সংস্রব ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ মনে করেন। পাটলিপুত্র, তাই তোমার প্রেমালিঙ্গন -পাশ ছিন্ন করেছি আমি। আমি তোমাকে ঘৃণা করি। ঘৃণা করি তোমার ঐশ্বর্যকে, তোমার বিজ্ঞানকে, তোমার ভদ্রতাকে, তোমার চাকচিক্যকে। প্রকৃত মানবতার তুমি জননী হও, তুমি দানবধাত্রী, তোমাকে আমি অভিশাপ দিই। অভিশাপ দিই তোমার ছদ্মবেশী ভদ্রতাকে। হে সর্বত্যাগী শঙ্কর, হে শ্মশানচারী মহাকাল, হে কৈলাসপতি মহেশ্বর, কুবেরের ঐশ্বর্য তোমাকে মুগ্ধ করেনি; তুমি সতীনাথ, তুমি উমাপতি, প্রতি কুমারীর আরাধ্য দেবতা তুমি, কিন্তু তবু তুমি কাম পঙ্কে নিমগ্ন নও, মদনকে ভস্ম করেছ তুমি। হে মহাশক্তিধর, আমাকে শক্তি দাও, আমি পাপ-পুরীতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি—"

প্রার্থনা শেষ করিয়া তিনি পর্বত হইতে অবরোহণ করিতে লাগিলেন।

...কিছুক্ষণ হাঁটিবার পর পাটলিপুত্রের বিরাট সিংহদ্বার তাঁহার নয়নগোচর হইল। দেখিলেন, প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভের ছায়ায় বসিয়া বহু ফল-বিক্রেতা ফল বিক্রয় করিতেছে। আশেপাশে অনেক ভিক্ষুকও রহিয়াছে। তাহাদের করুণ কণ্ঠ, শীর্ণ ক্লান্তি, লোলুপ দৃষ্টি দেখিয়া সাবর্ণি বিচলিত হইলেন। ছিন্নবাসা এক ?ন জানু পাতিয়া বসিয়া ছিল। সে সাবর্ণির বহির্বাসের প্রান্তভাগ চুম্বন করিয়া করুণকণ্ঠে কহিল, "ঠাকুর, আমাকে আশীর্বাদ কর, ভগবান যেন দয়া করেন আমাকে। এ জীবনে অনেক দুঃখ ভোগ করেছি, পরকালে যেন শান্তি পাই। তুমি পুণ্যাত্মা, তোমার পায়ের ধুলো মাথায় দাও আমার—"

"জয় শঙ্কর—"

বৃদ্ধার মাথায় হস্তার্পণ করিয়া তিনি আশীর্বাদ করিলেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আবার চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর গিয়া একদল ছেলের পাল্লায় পড়িয়া গেলেন তিনি। রাস্তার অভব্য ছেলের দল। তাহারা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শুধু তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে যাহা বলিতে লাগিল তাহা অশ্লীল, অশ্রাব্য।

"ওরে দেখ্ দেখ্, এক ব্যাটা ভণ্ড সাধু চলেছে! ব্যাটার গায়ের রঙ যেন কাকেব মতো। আর দাড়ি দেখেছিস? ঠিক যেন ছাগল-দাড়ি। মাঠের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিলে কাক-তাড়ুয়ার কাজ হয়। না না বাবা, মাঠে গিয়ে কাজ নেই ওর। ওকে দেখলে মাঠের ফসলই শুকিয়ে যাবে? শীষ ঝরে যাবে সব। যমের বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও স্থান নেই ওব। এখানে কোথা থেকে জুটল...."

এই ধরনের চীৎকার করিতে করিতে তাহারা ক্রমাগত ঢিল ছুঁড়িতে লাগিল।

"অবোধ শিশুদের ভগবান মঙ্গল করুন"— মনে মনে এই কথা বলিতে বলিতে তিনি দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, " এই বৃদ্ধাটির ব্যবহাব কতো শ্রদ্ধাপূর্ণ, আর এই ছেলেগুলো কি অভদ্র! বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে একই বস্তুকে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন মূল্য দেয়। বৃদ্ধ কৌশিক নাস্তিক হলেও যা বলেছে তা ঠিক। সে অন্ধ বটে, কিন্তু এ জ্ঞান তার আছে যে সে অন্ধ, আলো কি তা জানে না, জানবাব স্পৃহাও নেই। মানুষকে একটা কোনও নির্দিষ্ট মানদণ্ড দিয়ে মাপবার উপায় নেই। পৃথিবীতে একমাত্র শঙ্করই স্থির, আর সবই মায়া, সবই চঞ্চল—"

দ্রুতবেগে তিনি পথ অতিবাহন করিতেছিলেন। দশ বৎসর পরে তিনি জন্মভূমিতে ফিরিয়াছেন, আশা করিতেছিলেন অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করিবেন। কিন্তু কই, সবই তো ঠিক তেমনিই রহিয়াছে! পথ তেমনি প্রস্তরাকীর্ণ, মনে হইতেছিল প্রতিটি প্রস্তবখণ্ড যেন তাঁহার পরিচিত। মনে পড়িতেছিল প্রতিটি প্রস্তরখণ্ডের সহিত যেন তাঁহার পদস্খলনের ইতিহাস জড়িত আছে। উঃ, কি জীবনই না তিনি যাপন করিয়াছিলেন। সহসা তাঁহাব অন্তব ক্ষোভে দুঃখে অনুতাপে তিক্ত হইয়া উঠিল। প্রস্তরখণ্ডগুলির উপর পদাঘাত করিতে করিতে তিনি চলিতে লাগিলেন। তাঁহার চরণ রক্তাক্ত হইয়া গেল, কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। বরং রক্ত দেখিয়া তাঁহার আনন্দ হইল, মনে হইল প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। বৌদ্ধধর্ম তখনও সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয় নাই। কিছু দূর গিয়া তিনি একটি বৌদ্ধমন্দির দেখিতে পাইলেন। সেটিকে বামে রাখিয়া তিনি যেন পথ ধরিলেন, সেই পথই তিনি সন্ধান করিতেছিলেন। পথের দুই পার্শ্বে সারি সারি উদ্যান বাটিকা। চন্দন চম্পক প্রভৃতি সুগন্ধি বৃক্ষশ্রেণী পথটিকে ছায়াময় ও সুরভিত করিয়া রাখিয়াছে। উদ্যান-বাটিকাগুলি মোটেই বাটিকা নয়, প্রত্যেকটিই এক একটিই হর্ম্য। প্রতিটি হর্ম্যই মনোরম কারুকার্য-খচিত। কোথাও প্রবালের রক্তদ্যুতি, কোথাও মর্মরের শুভ্রকান্তি, কোথাও বা স্বর্ণ গম্বুজের সমুজ্জ্বল শোভা। অর্ধ-উন্মুক্ত তোরণদ্বার দিয়া কোনো উদ্যান-বাটিকার অভ্যন্তর দৃষ্ট হইতেছিল। কোথাও মর্মর-বেদিকার উপর পিত্তলের মূর্তিসকল কাননের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, কোথাও সুরভিত জলের ফোয়ারা কাননের পুষ্পপত্র ও

পরিবেশকে শীকর-স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, কোথাও বা কৃত্রিম পর্বত বাহিয়া নির্ঝরিণী নামিয়া আসিতেছে। মনে হইতেছে, প্রত্যেকটি বাড়ি যেন শান্তির নিলয়। কোথাও কোন শব্দ নাই, মাঝে মাঝে দূরাগত বংশীধ্বনি শোনা যাইতেছে।

সাবর্ণি একটি ক্ষুদ্র মনোরম প্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া গতিবেগ রোধ করিলেন। এই প্রাসাদটিই তিনি সন্ধান করিতেছিলেন। প্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি প্রাসাদটির সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রাসাদের স্তম্ভগুলি অপরূপ, সেগুলিতে যেন পাষাণের কাঠিন্য বা রূঢ়তা নাই, প্রত্যেকটিতে যেন তন্বী যুবতীর দেহলাবণ্য প্রস্ফুটিত হইয়াছে। প্রাসাদের অলিন্দে বুদ্ধ মহাবীর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের পিত্তলমূর্তিসমূহ শোভা পাইতেছে। প্রত্যেকটিই যে এক বা একাধিক শিল্পীর প্রতিভা-নৈপুণ্যের নিদর্শন, দেখিলেই তাহা বোঝা যায়। মূর্তিগুলি দেখিয়া মহর্ষি সাবর্ণি কিন্তু আনন্দিত হইলেন না। তাঁহার অন্তরে ক্ষোভই সঞ্চারিত হইল। দ্বারে করাঘাত করিতে করিতে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। "পিতল দিয়েই তৈরি কর বা সোনা দিয়েই তৈরী কর, এ সব বাজে সন্ন্যাসীর মহিমা কখনও চিরস্থায়ী হবে না। এরা নাস্তিক, নরকেই এদের মহিমা চিরস্থায়ী হতে পারে। এদের ভ্রান্ত মতবাদ মানুষকে ভ্রান্ত পথেই নিয়ে যায়। লম্বা লম্বা বক্তৃতা করলেই সাধু হওয়া যায় না, বড় বড় প্রাসাদ তৈরি করলে তা মন্দিরও হয় না, যদি তাতে দেবতা না থাকেন। ও সব ভাঁওতায় সাধারণ লোকও বেশিদিন ভোলে না।"

একজন ক্রীতদাস দ্বার খুলিয়া দেখিল, ছিন্ন মলিন আলখাল্লা-পরা একটা কিম্ভূতকিমাকার কুৎসিত লোক ধূলামাখা পায়ে মর্মর শুভ্র বারান্দায় উঠিয়াছে। সে তাড়া করিয়া গেল।

"নেমে যাও, নেমে যাও। এখানে ভিক্ষে মিলবে না, অন্য কোথাও যাও। নামছ না যে, মার খাবে নাকি?"

সাবর্ণি শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "আমি ভিক্ষা চাই না। আমাকে তোমার প্রভু সিন্ধুপতি বর্মার কাছে নিয়ে চল।"

এ কথা শুনিয়া ভৃত্যটি আরও চটিয়া গেল।

"আমার প্রভুর কি আর কাজ নেই যে, তোমার মত লক্ষ্মীছাড়া ভূতের সঙ্গে তিনি দেখা করবেন! আর কথা বাড়িও না, কেটে পড়।"

"বৎস, যা বলছি শোন। তোমার প্রভুকে গিয়ে বল যে, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমার প্রয়োজন আছে।"

ভৃত্যটি এবার ক্ষেপিয়া গেল।

"দূর হ, দূর হ, ব্যাটা ভণ্ড কোথাকার—"

ভৃত্যটির হস্তে একটি যষ্টি ছিল। তদ্দ্বারা সে সাবর্ণিকে আঘাত করিল। সাবর্ণি কিন্তু বিচলিত হইলেন না। মাথা পাতিয়া তিনি আঘাত গ্রহণ করিলেন এবং শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "বৎস, যা বলছি কর। তোমার প্রভুকে খবর দাও। মিনতি করছি, আমার অনুরোধটি রাখ।"

এবার ভৃত্য অবাক হইয়া গেল। একটু ভীতও হইল। প্রহারে বিচলিত হয় না, লোকটি তো সাধারণ লোক নয়। সে ছুটিয়া গিয়া প্রভুকে খবর দিল।

সিন্ধুপতি তখন স্নান করিতেছিলেন। তিনি সদানন্দ পুরুষ, তাঁহাকে দেখিলেই ভাল লাগে। তাঁহার অধরে নয়নে একটি শান্ত মৃদুহাস্য সর্বদাই তাঁহার মুখমণ্ডলকে প্রদীপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে অবশ্য বোঝা যায় যে, তাঁহার ওই শান্ত হাসিটি অন্তরের প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের বহিঃপ্রকাশ।

সাবর্ণি ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সোল্লাসে ছুটিয়া আসিলেন।

"আরে, আরে, সাবু না কি! বাল্যবন্ধুর এমন আকস্মিক পুনরাবির্ভাব তো কল্পনা করতে পারিনি! তোমাকে দেখেই চিনেছি আমি, খুশীও হয়েছি, কিন্তু তোমার এ কি চেহারা হয়েছে! তুমি যে ভদ্রবংশের ছেলে তা তোমাকে দেখে আর বোঝবার উপায় নেই! ছি ছি, কি হয়ে গেছ তুমি! মনে হচ্ছে মানুষ নয় যেন একটা জানোয়ার। ব্যাপার কি বল দেখি?"

সিন্ধুপতি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

"আমরা একসঙ্গে ব্যাকরণ অলঙ্কার আর দর্শন পড়েছিলাম, না? আমাদের আচার্য জ্ঞানকুম্ভ উপাধ্যায়কে মনে আছে? টোলেই তোমার কেমন যেন একটা বুনো বুনো ভাব ছিল, অনেকটা যেন ঘোড়ার মতো ছিলে তুমি। চট করে ডাকে যেতে, চট করে লাফিয়ে উঠতে। মনে আছে?"

মহর্ষি সাবর্ণি কোনও উত্তর দিলেন না। তাহার নয়নের দৃষ্টি অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল।

সিন্ধুপতি বলিয়া চলিলেন, "সব মনে আছে আমার। কাউকে বিশ্বাস করতে না তুমি এমন কি নিজেকেও নয়। তবে মেজাজ তোমার দরাজ ছিল, তার পরিচয় তুমি দিয়েছ। তোমার ধনদৌলত বিষয়সম্পত্তি, এমন কি নিজের জীবনটাও এমন ভাবে ছুড়ে ফেলে দিয়েছ তুমি, যেন একমুঠো ধুলো। তোমার এই অদ্ভুত স্বভাব – প্রতিভা বলতেও আপত্তি নেই আমার — অবাক করে দিয়েছিল আমাকে। তুমি যখন সব ছেড়েছুড়ে চলে গেলে সত্যি বলছি, খুব কষ্ট হয়েছিল, মনে হয়েছিল মস্ত একটা ক্ষতি হয়ে গেল। যাক, এতদিন পর যে তোমার আবার সুমতি হয়েছে, আবার যে তুমি ফিরে এসেছ, এতে সত্যি বলছি খুব খুশী হয়েছি। ধর্মের ভেক কি ভদ্রলোকের মানায়? অরণ্যে বাস করাও কোন ভদ্রলোকের পোষায় না বেশীদিন। তুমিও যে ফিরবে তা জানতাম। আজ একটা শুভদিন বলতে হবে। ছন্দা, নন্দা, আমার বন্ধুটিকে একটু ভদ্র করে তোল তো। ওর হাতে পায়ে গায়ে দাড়িতে চুয়া বেশ করে ফুলেল তেল লাগাও—"

সিন্ধুপতি ঘাড় ফিরাইয়া দুইজন ক্রীতদাসীকে আদেশ করিলেন। তাহারা মৃদু হাস্য করিয়া চলিয়া গেল এবং ভৃঙ্গার, গন্ধপাত্র, তৈল, ধাতব দর্পণ প্রভৃতি আনয়ন করিল। কিন্তু সাবর্ণি হস্ত উত্তোলন করিয়া তাহাদের নিবৃত্ত করিলেন এবং আনতনয়ন হইয়া রহিলেন কারণ ক্রীতদাসী দুইটি সম্পূর্ণ নগ্না ছিল। সিন্ধুপতি স্মিতমুখে ক্ষণকাল দাড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর নিজেই গিয়া পাদ্য অর্ঘ্য আসন এবং খাদ্য পানীয় আনিয়া করজোড়ে বলিলেন, 'মহর্ষি, সদয় হোন। আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন।"

মহর্ষি কিন্তু কিছু গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু এইবার তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইল। বলিলেন, "সিন্ধুপতি, তুমি ভুল করেছ। আমি ধর্ম ত্যাগ করে তোমার কাছে আসি নি। ধর্মেই যে সার সত্য নিহিত আছে— এ কথা আমি ক্ষণকালের জন্যও ভুলি না। শব্দই যে শঙ্কর — এ কথা আমি উপলব্ধি করেছি। শঙ্করই ব্রহ্মারূপে বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, বিষ্ণুরূপে তা পালন করছেন এবং মহাকালরূপে তা ধ্বংস করছেন—এ সত্য বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব আমার পক্ষে। আমি জানি, তিনি যা সৃষ্টি করেন নি তা এখনও অসৃষ্ট আছে। তিনিই আদি-উৎস, আদি-প্রাণ, চিরন্তন লীলা—"

"আরে সর্বনাশ—"

অর্ধ-স্ফুটকণ্ঠে কথা দুইটি উচ্চারণ করিয়া সিন্ধুপতি একটি সুরভিত অঙ্গচ্ছেদ পরিধান করিতে লাগিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন "দেখ ভাই সাবু, ব্রহ্মা-ট্রহ্মা শুনে ঘাবড়াবার ছেলে আমি নই। আমি বনে যাইনি বটে, কিন্তু ও-রকম বড় বড় বচন অনেক পড়েছি, অনেক শুনেছিও। নিজেও দর্শনশাস্ত্র চর্চা কম কবি নি—একসঙ্গেই তো শুরু করেছিলাম মনে নেই? তুমি উপনিষদ বা পুরাণ থেকে দু-চারটে বচন আউড়ে আমাকে ঘায়েল করতে পাববে না, সন্তুষ্ট করতে পারবে না। সমস্ত উপনিষদ, সমস্ত পুরাণ তন্ন তন্ন করে ঘেঁটেছি আমি, কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারি নি, পিপাসাও মেটেনি। ওসব পড়ে মনে হয়েছিল মানুষের মধ্যে যে চিরন্তন ছেলেমানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে তাকে ভোলবার জন্যেই মুনি-ঋষিরা নানা রকম রূপকথা বানিয়ে গেছেন। শাস্ত্রই বল বা বেদ-উপনিষদই বল, গল্প ছাড়া আর কিছু নয়। হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রে পশু-পক্ষীরা কথা কইছে, বত্রিশ সিংহাসনে পুতুলরা জীবন্ত হয়ে উঠেছে— এসব আশা করি তুমি সত্য বলে মনে কর না। চল, ভিতরে চল—"

মহর্ষি সাবর্ণির হাত ধরিয়া তিনি ভিতরের দিকে একটি ঘরে প্রবেশ করিলেন।

"এটি আমার গ্রন্থশালা। পাটলিপুত্রে রাজপ্রাসাদেও এ রকম পুঁথি-সংগ্রহ নেই। সমস্ত আমি পড়ে দেখেছি। আমার কি মনে হচ্ছে জান? ওসব অসুস্থ মনের অস্বাভাবিক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।"

তিনি জোর করিয়া সাবর্ণিকে একটি গজদন্তনির্মিত আসনে বসাইয়া দিয়া নিজে আর একটি আসন গ্রহণ কবিলেন। সাবর্ণি তাঁহার সযত্নরক্ষিত গ্রন্থগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার চোখে বিষণ্ণতার ছায়া ঘনাইয়া আসিল। অবশেষে বলিলেন, "ওগুলো পুড়িয়ে ফেল।"

"পুড়িয়ে ফেলব! বল কি? মানব সভ্যতার ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে তা হলে যে! বলছ কি তুমি! ওগুলো অসুস্থ মনের কল্পনা হতে পারে, কিন্তু পড়তে যে চমৎকার! এই সব অস্বাভাবিক স্বপ্ন আর অসুস্থ কল্পনাই তো সরস করে রেখেছে জীবনকে। ওগুলো লোপ পেলে পৃথিবীর সমস্ত রূপ-রসও লোপ পাবে সঙ্গে সঙ্গে। আমরা তখন অত্যন্ত স্বাভাবিক বস্তু হয়ে পড়ব তা হলে—"

মহর্ষি সাবর্ণির মনে চিন্তা উদ্রিক্ত হইয়াছিল। নিজের চিন্তার সূত্র ধরিয়াই তিনি বলিলেন,

"শাস্ত্র নামে অভিহিত এমন অনেক গ্রন্থ আছে যা অসার কল্পনা ছাড়া কিছু নয় মানছি। কিন্তু যিনি সত্য, যিনি শঙ্কররূপে মূর্ত, তিনি কি মিথ্যা কল্পনা হতে পারেন? মানুষের হিতের জন্য তিনি এসেছেন আমাদের মধ্যে—এ কথা কি শোন নি?"

সিন্ধুপতি সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "শুনেছি বইকি! চমৎকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছ তুমি। এটা তুমি নিশ্চয় মানবে, যিনি মানুষের মতোই চিন্তা করেন, মানুষের মতোই কথা বলেন, খান ঘুমোন বেড়িয়ে বেড়ান, সুযোগ পেলে স্ত্রীসঙ্গও করেন, তিনি মানুষই। তুমি তাঁকে দেবতা বলে ভাবছ কেন? বৈদিক যুগেব ঋষিবা সূর্য চন্দ্র অগ্নি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশে প্রচুব ঘি পোড়াতেন, উপনিষদ যুগেব ঋষিরা বললেন—ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে, দেবতারা এক ফোঁটাও পাননি, পেতে পারেন না। তাবপব এলেন বুদ্ধদেব, তিনি ওদিক দিয়েই গেলেন না। তিনি অষ্ট নিয়মে সকলকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নির্বাণেব পথ দেখালেন। তাঁব জীবদ্দশায় কেউ কেউ হয়তো তাঁকে অনুসরণ করেছিল, কিন্তু পরে দেখছি তাঁব চেলারা কামনার আগুন জ্বালিয়ে তুললেন দাউ দাউ করে। তারপর এলেন কুমারিল ভট্ট, এলেন শঙ্কবাচার্য। একের পর এক এসেই যাচ্ছেন! দেবতাবাও কি স্থিব হয়ে দাঁড়াতে পাচ্ছেন? বিদ্যের কুলোয় তেত্রিশ কোটিকে তুলে আছড়াচ্ছে সর্বদা। যাক, ওসব থাক এখন। তোমাব কথা শুনি। খেতেও চাইছ না, কাপড় পর্যন্ত ছাড়তে চাইছ না, ব্যাপাব কি বল দেখি? তোমাকে নিয়ে কি করি আমি—"

"ইচ্ছে করলে একটি মহদুপকার করতে পার। তুমি যেমন সুগন্ধি পোশাক পবেছ, তেমনি একটি পোশাক ধার দাও আমাকে। সুবর্ণখচিত পাদুকাও দাও এক জোড়া। আমার চুলে আর দাড়িতে লাগাবার জন্য দু-এক শিশি সুগন্ধি তেল পেলেও ভালু হয। আব আমি অত্যন্ত খুশী হব, যদি তুমি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিতে পার আমাকে। দেবে? যদি দাও, বড় কৃতজ্ঞ হব। এই জন্যেই তোমার কাছে এসেছি।"

সিন্ধুপতি সুছন্দা ও সুনন্দা নাম্নী ক্রীতদাসী দুইটির দিকে ফিরিয়া তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদটি আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে তাঁহাব আদেশ প্রতিপালিত হইল। পোশাকটি কাশ্মীরী কাজ করা, বর্ণে গন্ধে সৌন্দর্যে অপরূপ। সুছন্দা সুনন্দা যখন সেটিকে খুলিয়া তুলিয়া ধবিল, তখন মনে হইতে লাগিল যেন একটি অদ্ভুত আকৃতির বিচিত্র পুষ্প অদৃশ্য বৃন্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারা প্রত্যাশা করিতেছিল, মহর্ষি সাবর্ণি যে ময়লা শতচ্ছিন্ন দুর্গন্ধ আলখাল্লাটি পরিধান করিয়া আছেন তাহা খুলিয়া তবে নূতন পোশাকটি পরিধান করিবেন। কিন্তু মহর্ষি সাবর্ণি কিছুতেই তাঁহার আলখাল্লা খুলিতে চাহিলেন না। বলিলেন, তিনি বরং গায়েব চামড়া ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু আলখাল্লা ছাড়িবেন না, পোশাকের উপর তিনি আলখাল্লা পরিবেন। সুতরাং আলখাল্লার নিচেই তাঁহাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদটি পরাইতে হইল। ক্রীতদাসী হইলেও সুছন্দা সুনন্দা মহর্ষি সাবর্ণিকে দেখিয়া ভীত হয় নাই, কারণ প্রথমত তাহারা যুবতী, দ্বিতীয়ত রূপসী। সাবর্ণির অদ্ভুত সাজ দেখিয়া তাহারা হাসিতেছিল। সুনন্দা তাঁহাকে মহারাজ সম্বোধন করিয়া তাঁহার সম্মুখে দর্পণটি তুলিয়া ধরিল। সুছন্দার সাহস আরও বেশী। সে তাঁহার দাড়িতে হাত বুলাইয়া মুচকি হাসিতে লাগিল। মহর্ষি

সাবর্ণি এসব কিছুই দেখিতেছিলেন ন', তিনি চক্ষু বুজিয়া শঙ্করকে ডাকিতেছিলেন। সুবর্ণখচিত পাদুকাদ্বয় পরিধান করিয়া এবং স্বর্ণমুদ্রা পূর্ণ পেটিকাটি কটিবন্ধে ভাল করিয়া বাঁধিয়া সাবর্ণি সিন্ধুপতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, সিন্ধুপতিও মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

সাবর্ণি বলিলেন, "সিন্ধুপতি, উপহাস করো না। বিচলিতও হয়ো না। আমাকে যা যা দিলে আমি তাব সদ্ব্যবহারই কবব, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

সিন্ধুপতি হাসিযা উত্তব দিলেন, "ভাই, আমি নিশ্চিন্তই আছি। সৎ অসৎ কোন কিছু নিযেই আমি মাথা ঘামাচ্ছি না, কখনও ঘামাইও না। আমি জানি কোনও মানুষেব পক্ষে সৎ হওয়াও যেমন অসম্ভব, অসৎ হওয়াও তেমনি অসম্ভব। আসলে ও দুটো জিনিসের অস্তিত্বই নেই। আমবা নিজেদের সুবিধার জন্য—তা-ও সাময়িক সুবিধার জন্য—ভাল-মন্দ সৎ-অসৎ প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ করেছি। সবাই আবাব এ বিষযে একমতও নই। তুমি যেটা ভাল মনে কব, আমি সেটা করি না। যাঁবা বুদ্ধিমান তাঁরা ঝামেলা বাঁচিযে চলেন। অর্থাৎ প্রচলিত নিয়ম আব সংস্কাব মেনে চলেন, না চললে সমাজে শান্তিতে বাস করা যায না। বর্তমান পাটলিপুত্র সমাজেব সব বকম সংস্কাব মেনে আমি চলি, ভাল-মন্দ বিচাব কবি না। তাই শহবে আমি গণ্যমান্য লোক। বন্ধু, তোমাকে যে সামান্য উপহাব দিযেছি তা নিয়ে তুমি মনেব আনন্দে যা খুশী কবে বেড়াও, আমাব কিছুতেই আপত্তি হবে না-—"

ক্ষণকাল চিন্তা কবিযা সাবর্ণিব মনে হইল, সিন্ধুপতিকে অকপটে সব কথা খুলিয়া বলাই উচিত।

"আচ্ছা, বছর দশেক আগে নিরঞ্জনা বলে এক নটী রঙ্গমঞ্চে নাচত তাকে মনে আছে তোমাব? তাকে চেন কি?"

"চিনি মানে! রূপসী নিবঞ্জনাকে পাটলিপুত্রে কে না চেনে। এই কিছুকাল আগে আমিই তো ক্ষেপেছিলাম তাকে নিয়ে। প্রচুর টাকা খবচ কবে রেখেও ছিলাম তাকে কিছুদিন। ওর জন্যে খানিকটা জমিদাবি বিক্রি করে ফেলতে হযেছে।" তাহার পর একটু থামিয়া একটু হাসিযা বলিলেন, "তিন-তিনখানা মোটা কবিতার বইও লিখতে হয়েছে, ও-রকম বাজে কবিতা আমার কলম দিয়ে কি করে যে বেরুল তা ভেবে পাই না। কিন্তু কি করি বল, উপায় ছিল না কিছু। মেয়েমানুষের ব্যাপার, বিশেষত নিরঞ্জনার মত রূপসীর, ধন মান বুদ্ধি বিবেক সমস্ত তার পদপ্রান্তে রেখে হাতজোড় করে থাকতে হয়েছিল কিছুদিন। চিরকাল যদি থাকতে পাবতাম, কৃতার্থ হয়ে যেতাম। চিরকাল যদি অপরূপ সৌন্দর্যে ডুবে থাকা সম্ভব হত তা হলে শাস্ত্রফাস্ত্র ব্রহ্ম-ট্রহ্ম নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। কিন্তু তা সম্ভব হয় না। তুমি কিন্তু আমাকে অবাক করেছ সাবু। গভীর অরণ্যে এতকাল তপস্যা করেও নিবঞ্জনাকে মনে আছে তোমার? ওব টানেই এসেছ না কি! আমরা তা হলে আর কল্কে পাব না দেখছি—"

সিন্ধুপতি হাসিলেন না দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। মহর্ষি সাবর্ণি কিন্তু স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। লোকটা এত বড় গর্হিত পাপের কথা সরস ভঙ্গীতে স্বচ্ছন্দে বলিয়া গেল! পৃথিবী বিদীর্ণ হইল না, বিদীর্ণ পৃথিবীর ভিতর হইতে নরকের অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া তাহাকে গ্রাসও করিল না! সব যেমন ছিল তেমনি রহিল। সিন্ধুপতির মুখের দিকে কঠোর

দৃষ্টিতে তিনি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, সে বিষণ্ণ চিত্তে তাহার বিগত যৌবনের অন্তর্হিত দিনগুলির কথা চিন্তা করিতেছে। কারণ সত্যই তাহার মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছিল।

মহর্ষি সাবর্ণি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "নিরঞ্জনার জন্যই আমি এসেছি। কিন্তু তুমি যা ভাবছ সেজন্য আসিনি। আমি এসেছি নিরঞ্জনাকে উদ্ধার করবার জন্যে। আমি তাকে কামের পঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে যাব। নিয়ে গিয়ে সমর্পণ করব সেই শঙ্করের চরণে, যিনি সতীনাথ, যিনি উমাপতি, যিনি মদনকে ভস্ম করেছিলেন, অথচ যিনি অনন্ত প্রেমেব আকর। ভগবান নীলকণ্ঠ যদি আমার প্রতি বিরূপ হন, তা হলে নিরঞ্জনা আজই পাটলিপুত্র ত্যাগ ক'রে মঠে প্রবেশ করবে -"

সিন্ধুপতির অধরে মৃদু হাস্যরেখা ফুটিল।

"একটি কথা কিন্তু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি বন্ধু। নীলকণ্ঠ কন্দর্পকে ভস্ম করেছিলেন, কিন্তু বিলুপ্ত করতে পারেননি। বিদেহী কন্দর্প আরও ভয়ানক। তিনি আগে ছিলেন পঞ্চ-শর, এখন হয়েছেন অসংখ্য শর। নিবঞ্জনা মূর্তিমতী রতি। তাকে সন্ন্যাসিনী করবার চেষ্টা করলে কন্দর্পের রোষে পড়বে বন্ধু। কথাটা মনে রেখো।"

"স্বযং শঙ্কর আমাব সহায়। শঙ্করের কাছে এ প্রার্থনাও আমি জানাচ্ছি তিনি তোমাকেও বক্ষা করুন। তুমিও পাপের পঙ্কে ডুবে আছ সিন্ধুপতি—"

এই কথা বলিয়া সাবর্ণি বাহির হইয়া গেলেন, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার হইল না। সিন্ধুপতি কিন্তু সঙ্গ ছাড়িলেন না, কিছু দূর গিয়ে তিনি সাবর্ণির কানে কানে পুনবায় বলিলেন, "কন্দর্পকে চটিও না। তাঁর রোষ ভয়ঙ্কর, প্রতিশোধ আরও ভয়ঙ্কব।"

সাবর্ণি এ কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, সিন্ধুপতির সহিত আলাপ করিয়া তিনি মোটেই সুখী হন নাই, তাঁহার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সতীর্থ সিন্ধুপতি যে একদিন নিরঞ্জনার প্রণয়ী ছিল, সে যে অর্থের বিনিময়ে নিরঞ্জনাকে ধারাবাহিকরূপে কিছুদিন ভোগ করিয়াছে—এই নিদারুণ সংবাদ যেন সাবর্ণিব বুকে শেল হানিতেছিল। সুরত-প্রসঙ্গ মাত্রেই তাঁহার বিশুদ্ধ চিত্তে জুগুপ্সার সঞ্চার কবে, কিন্তু নিরঞ্জনা সম্পর্কে এ প্রসঙ্গ তাঁহার চিত্তকে মথিত করিয়া বিষোদগীরণ করিতে লাগিল। তাঁহাব মনে হইতে লাগিল, এতদপেক্ষা ঘৃণ্যতর পাপ পৃথিবীতে আর যেন কিছু নাই, হইতেও পারে না। একটা অদৃশ্য ঈর্ষার অনলে তিনি যেন দগ্ধ হইতে লাগিলেন। সিন্ধুপতিকে বারম্বার অভিশাপ দিলেন আর মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—হে শঙ্কর, আমাকে শক্তি দাও— শক্তি দাও। প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহার মানসিক শক্তি সত্যই যেন বর্ধিত হইল। তিনি মনে মনে পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলেন, নটী নিরঞ্জনাকে যেমন করিয়া হোক পাটলিপুত্রবাসীদের কবলমুক্ত করিয়া তিনি লইয়া যাইবেন।

নিরঞ্জনার সহিত দিনের বেলা দেখা করা যায় না। সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। সাবর্ণি যখন পাটলিপুত্রের পথে পুনরায় বাহির হইলেন তখন প্রভাতও উত্তীর্ণ হয় নাই। শঙ্করের কৃপালাভ করিবার জন্য তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, যতক্ষণ না নিরঞ্জনার সহিত

দেখা হয় ততক্ষণ তিনি জলস্পর্শ পর্যন্ত করিবেন না। অনাহারেই তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে তাঁহার সমস্ত হৃদয় তিক্তরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মাঝে মাঝে একটা দেবমন্দির তাঁহার নয়নগোচর হইতেছিল। তাহারই কোন একটাতে প্রবেশ করিয়া শঙ্করের ধ্যানে তিনি সমস্ত দিন নিমগ্ন থাকিতে পারিতেন। কিন্তু একটিতেও তিনি প্রবেশ করিলেন না। তিনি জানিতেন, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সমস্ত মন্দিব অপবিত্র করিয়া দিয়াছে। যেখানে ভগবান শঙ্করের বা বিষ্ণুর মূর্তি ছিল সেখানে বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। ঈশ্বর অস্বীকৃত হইয়াছেন। ভক্তের হৃদয়ে ত্রাস সঞ্চার করিয়া নাস্তিক বৌদ্ধরা নিরীশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছে। ওই সব চূড়াসমন্বিত বৃহৎ হর্ম্যগুলি আর ধর্মমন্দির নাই, উহাবা ধার্মিক ভোগীদের লীলা নিকেতনে পরিণত হইয়াছে। না, একটি মন্দিরেও তিনি প্রবেশ করিলেন না।

তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। পাটলিপুত্রের পথে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল, তাঁহার আচরণ যেন প্রকৃত শৈবের মতো হয়, মুখভাবে যেন কোনও অভব্যতা প্রকটিত না হইয়া পড়ে। তাই সন্ন্যাসীসুলভ বিনয়ে তাঁহার দৃষ্টি কখনও ভূমিনিবদ্ধ, কখনও বা তপস্বীসুলভ আনন্দে আকাশমুখী হইতে লাগিল। শিব-চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে তিনি নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গঙ্গাবক্ষে এক সুসজ্জিতা ময়ূরপঙ্খী দক্ষিণা বাতাসে রঙীন পাল তুলিয়া পাড়ি জমাইতেছে। বলিষ্ঠকায় নাবিকেরা আরও পাল তুলিয়া ময়ূরকণ্ঠিনী তরণীটিকে আরও বেগবতী করিবার প্রয়াস পাইতেছে। তরণীর অভ্যন্তর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে সুমিষ্ট বাঁশীর সুর। হালের কাছে একটি অপ্সরীমূর্তি শূন্যে দুই বাহু মেলিয়া যেন আকাশে উড়িয়া যাইতে চাহিতেছে। সাবর্ণি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। তাঁহাব মনে পড়িল, তিনিও একদিন জীবন-সমুদ্রে ঠিক ওই ভাবেই পাড়ি জমাইতে চাহিযাছিলেন। কিন্তু শঙ্কর তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। মায়া বা মোহের কবলে পড়িয়া তিনি বিভ্রান্ত হন নাই। অপ্সরী তাঁহাব জীবনেও আসিয়াছিল কিন্তু টিকিতে পারে নাই, উড়িযা গিযাছে, উড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে।...

নিকটেই এক স্থানে মোটা মোটা কাছি স্তূপীকৃত ছিল। তাহার উপর তিনি উপবেশন করিলেন। অনেকক্ষণ পথ চলিয়া তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার মনে হইল একটু বিশ্রাম না করিলে তিনি দুর্বল হইয়া পড়িবেন। নিরঞ্জনার সহিত সাক্ষাতের সময় দুর্বল হইয়া পড়িলে চলিবে না। ঘুমে তাঁহার চোখের পাতা ভারী হইয়া আসিতেছিল, সেই কাছির উপরই তিনি শুইয়া পড়িলেন।

ঘুমের ঘোরে এক অতি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিলেন তিনি। মনে হইল চতুর্দিকে যেন তূর্যধ্বনি হইতেছে, আকাশ গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। স্বপ্নের ঘোবে তিনি আতঙ্কিত হইলেন, তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল প্রলয় বুঝি আসন্ন। ভীতকম্পিত চিত্তে শঙ্করকে স্মরণ করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন দীর্ঘ পদক্ষেপে এক বিরাট পুরুষ তাঁহার সমীপবর্তী হইতেছেন। সবিস্ময়ে দেখিলেন, এ বিরাট পুরুষ তাঁহার পূর্বপরিচিত। মনে পড়িল, আসিবার সময় পর্বতমালা—বেষ্টিত গ্রামে তিনি পাষাণময় যে বিরাট বুদ্ধমূর্তি দেখিয়াছিলেন তাহাই সঞ্জীবিত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল প্রসন্ন হাস্যে সমুজ্জ্বল।

লোকে যেমন শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লয়, দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তিনিও তেমনি তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তাহার পর আবার চলিতে লাগিলেন। বহু নদ নদী পর্বত প্রান্তর পার হইয়া, রাজ্যের পর রাজ্য অতিক্রম করিয়া অবশেষে তিনি যে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তাহা ভয়ঙ্কর। চতুর্দিকে কেবল রুক্ষ পর্বতমালা আর ভস্ম---উত্তপ্ত ভস্ম। পর্বতগুলি রন্ধ্রময়, প্রতি রন্ধ্র হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। একটি প্রকাণ্ড গহ্বরের নিকটবর্তী হইয়া সেই বিরাট পুরুষ নিজ গতিবেগ রোধ করিলেন এবং তাঁহাকে কোল হইতে নামাইয়া দিলেন।

বলিলেন, "দেখ—"

সাবর্ণি গর্তের মুখে উঁকি দিয়া দেখিলেন। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। গহ্বরে ভিতরে অসংখ্য কৃষ্ণ প্রস্তরমালা এবং সেই প্রস্তরমালার ভিতর হইতে এক ভয়ঙ্করী অগ্নিতরঙ্গিণী প্রবাহিত হইতেছে। সেই অগ্নিস্রোতের রক্তাভ আলোকে যাহা দেখা যাইতেছে তাহা আরও ভয়ঙ্কর। অসংখ্য পিশাচ অসংখ্য মৃত-ব্যক্তির আত্মাকে নির্যাতন করিতেছে। আশ্চর্যের বিষয়, মৃতব্যক্তিদের দেহ বা পরিচ্ছদ বিকৃত বা বিলুপ্ত হয় নাই। প্রত্যেককে চেনা যাইতেছে। সাবর্ণি সবিস্ময়ে ইহাও লক্ষ্য করিলেন, নির্যাতনে ইঁহারা কেহই বিচলিত হইতেছেন না। সকলেরই মুখভাব শান্ত, কষ্টের কোন চিহ্ন নাই। দেখিলেন, এক দীর্ঘকায় গৌরাঙ্গ পুরুষ (সম্ভবত ইনি একজন কবি) অর্ধনিমীলিত নয়নে উদাত্ত কণ্ঠে গান করিতেছেন। ক্ষুদ্রকায় একদল দানব তাঁহার অধরে কণ্ঠে উত্তপ্ত লৌহশলাকা বিদ্ধ করিতেছে। কবির কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি তন্ময়চিত্তে গানই গাহিয়া চলিয়াছেন। নিকটেই একজন জ্যোতিষী উপুড় হইয়া বসিয়া ধূলির উপর গণিতের অঙ্কপাত করিতেছিলেন, আর একটা পিশাচ তাঁহার কর্ণে উত্তপ্ত তৈল ঢালিতেছিল, কিন্তু তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিতেছিল না। সাবর্ণি বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন। তিনি আরও দেখিলেন, সেই অগ্নি-নদীর তপ্ত সৈকতে বহু বিদ্যার্থী নিবিষ্ট চিত্তে পাঠে মগ্ন---কেহ বা আলাপ করিতেছে, মনে হইতেছে কোনও তপোবনে যেন গুরু শিষ্যদের উপদেশ দিতেছেন। আরও একটু দূরে তিনি বৃদ্ধ কৌশিককেও দেখিতে পাইলেন। মনে হইল তিনি এসব কিছুই দেখিতেছেন না, কেবল অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িতেছেন। ভূগর্ভ হইতে একজন দেবদূত উঠিয়া আসিল। সে যে দেবদূত তাহা তাহাকে দেখিযাই সাবর্ণি বুঝিতে পারিলেন। দেবদূত আসিয়া সম্মুখে দিব্য স্বর্গীয় আলোক বিকীর্ণ করিতে লাগিল, কিন্তু কৌশিক তাহাও দেখিতে পাইলেন না।

হতবুদ্ধি হতবাক সাবর্ণি তখন সেই বিরাট বৃদ্ধমূর্তির দিকে চাহিতে গেলেন, দেখিলেন তিনি নাই! একটি অবগুণ্ঠিতা নারী দাঁড়াইয়া আছে।

সে বলিল, "ভাল করে দেখ, প্রণিধান কর। নরকে এসেও এদের চৈতন্য হয়নি। মর্ত্যলোকে যে সব মিথ্যা মায়া এদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা এখনও এদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মৃত্যু এদের মোহমুক্ত করতে পারে নি। মরলেই ভগবানকে পাওয়া যায় না। জীবনে যারা সত্যকে উপলব্ধি করে নি, মৃত্যুর পরও তারা সে উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। যে সব পিশাচ আর দানব এদের নির্যাতন করছে তারা নির্মম নিয়তির মূর্ত প্রতীক। ওই অন্ধ মূঢ় আত্মারা এদেরও দেখতে পায় না, এদের নির্যাতনও অনুভব করতে

পারে না, এদের শাসনের মর্মও বুঝতে পারে না। কোনরূপ সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করবার ক্ষমতা এদের নেই। নিজেদের সর্বনাশও এরা বুঝতে পারে না। এদের অন্তরে মোহের পাষাণ চেপে আছে, এদের দুঃখবোধও নেই, সে বোধ সঞ্চার করবার ক্ষমতা স্বয়ং ভগবানেরও নেই—"

সাবর্ণি বলিলেন, "ভগবান-সর্বশক্তিমান।"

অবগুণ্ঠিতা রমণী উত্তর দিল, "ভগবানও অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন না। এদের শাস্তি দিতে হলে সর্বাগ্রে এদের অন্তরে চেতনার আলোকপাত করতে হবে। সত্য সম্বন্ধে এরা যদি সচেতন হয় তবেই এদের মুক্তি হবে—"

মহর্ষি সাবর্ণি ভীত চিত্তে পুনরায় গর্তের ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এবার তিনি যেন সিন্ধুপতির আত্মাকে দেখিতে পাইলেন। মনে হইল, একটি অর্ধ-দগ্ধ চামেলীকুঞ্জের নিকট সে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পাশে দাঁড়াইয়া আছে বারাঙ্গনা অম্ব-পালী। অম্বপালীর স্বর্ণাভ অঙ্গচ্ছেদে, অপূর্ব মুখভাবে, কোমল দৃষ্টিতে লালসা ও তিতিক্ষা, সত্য ও মায়া যেন যুগপৎ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ভীষণ অগ্নিপ্রবাহ তাহাদের যেন কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত করে নাই, বরং মনে হইতেছে তাহারা যেন আসন্ন প্রভাতের উষালোকে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের পদতলে যেন উত্তপ্ত সৈকত-ভূমি নাই, শ্যামল তৃণাস্তরণ রহিয়াছে। সিন্ধুপতিকে দেখিবামাত্র সাবর্ণি ক্রোধে আত্মহারা হইলেন। চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ভগবান শঙ্কর, ওকে ধ্বংস কর, নিপাত কর। ও নিরঞ্জনাকে নষ্ট করেছে—'

সাবর্ণির নিদ্রা ভঙ্গ হইল। দেখিলেন, একটি শক্তিশালী ব্যক্তি তাঁহাকে তুলিয়া ধরিয়াছে। বলিতেছে, "কে মশাই আপনি, আপনার মাথা খারাপ না কি? এমনভাবে এখানে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন? এ কি ঘুমোবার জায়গা! আর একটু হলে জলে গড়িয়ে পড়ে যেতেন যে! ভাগ্যে আমি এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। উঠুন, দাঁড়ান।"

সাবর্ণি কেবল দুইটি মাত্র কথা বলিলেন, "জয় শঙ্কর!" তাহার পর তিনি চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে অদ্ভুত স্বপ্নের কথাই তাঁহার মনে হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, স্বপ্নটি শয়তানের 'রসাজি ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ স্বপ্নে নরকের যে দৃশ্য তাঁহার মানস-পটে প্রতিফলিত হইল তাহা ভগবদ-মহিমাবর্জিত, উহা নরকের সত্য চিত্রই নহে। কোন্ স্বপ্ন শুভ অশুভ, কোনটাতে দেবতার প্রভাব, কোনটাতে দানবের—তাহা তিনি সহজেই নির্ণয় করিতে পারিতেন, কারণ বহুকাল মনুষ্য-সমাজের বাহিরে বহুদূরে আরণ্য পরিবেশে বাস করিয়া তিনি নানাপ্রকার অদেহী দেবদানবের পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। দানবেরা যে মায়ারূপ ধারণ করিয়া সাধুদের সর্বদাই বিপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে—এ কথা তিনি ভালভাবেই জানিতেন। শ্রীরামচন্দ্রের মতো লোককেও স্বর্ণ মৃগের পশ্চাতে ছুটিতে হইয়াছিল। দানবেরা খুবই ধূর্ত, তাহাদের স্বরূপ নির্ণয় করাও কঠিন। সীতা কি সন্ন্যাসী-বেশী রাবণকে চিনিতে পারিয়াছিলেন? নল যখন নিদ্রিতা দময়ন্তীকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, তখন কি তিনি ঘৃণাক্ষরেও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কে তাঁহাকে এই হীনকার্যে প্ররোচিত করিতেছে? না, মায়াবী দানবের চেনা খুব সহজ নয়। কিন্তু মহর্ষি সাবর্ণিকে ফাঁকি দেওয়াও খুব সহজ নয়। তিনি অচিরাৎ বুঝিতে পারিলেন, যে স্বপ্নটি

তিনি এখন দেখিলেন তাহা দানবীর মায়া মাত্র। চন্দ্রমৌলি ধূর্জটি তাঁহাকে এমনভাবে দানবের কবলে কেন নিক্ষেপ করিলেন—এই কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি পথ চলিতেছিলেন। সহসা লক্ষ্য করিলেন—তিনি জনস্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া চলিতেছেন, তাঁহার চতুর্দিকে ভীড়। ইহাও তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, স্রোতের গতি একমুখী, অর্থাৎ সকলেই একই স্থান অভিমুখে চলিয়াছে। নগরের জনতায় সুষ্ঠুভাবে চলিবার অভ্যাস তাঁহার ছিল না, সুতরাং নদীস্রোত বাহিত জড়পদার্থের ন্যায় তিনি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন। নিজেরই গৈরিক অঙ্গচ্ছেদে পা জড়াইয়া দুই একবার পড়িয়াও গেলেন। তিনি বুঝিতেই পারিলেন না, এতগুলি লোক এত দ্রুতবেগে কোথায় চলিয়াছে। কোথাও কি আগুন লাগিয়াছে, না, আর কোনও দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে? জনতার মধ্যে একজনকে ডাকিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "আপনারা এমন দ্রুতবেগে কোথায় চলিয়াছেন?"

লোকটি উত্তর দিল, "আপনি শোনেননি নাকি? আজ রঙ্গমঞ্চে পৌরাণিক নাটক অভিনয় হচ্ছে যে। অনেক বড় বড় অভিনেতা নামবেন, দ্রৌপদীর ভূমিকায় নামছেন স্বয়ং নিরঞ্জনা। সকলেই তাই সেখানে চলেছে আপনি যদি যেতে চান, আসুন আমার সঙ্গে।"

নিরঞ্জনা নামিতেছে? মহর্ষি সাবর্ণি ক্ষণিকের জন্য কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এতগুলি লোকের লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখে নিরঞ্জনা কি ভাবে নিজেকে প্রকটিত করিবে? সে দৃশ্য কি তিনি সহ্য করিতে পারিবেন? দ্রৌপদীর ভূমিকায়? পঞ্চপতির স্ত্রী দ্রৌপদী । তাহার পর সহসা আবার তাঁহার মনে হইল, এই ভীড়ের মধ্যেই নিরঞ্জনার সহিত দেখা হওয়া ভাল। দূর হইতে নিরঞ্জনার চেহারা হাবভাব প্রভৃতি লক্ষ্য করিলে তিনি বুঝিতে পারিবেন, সে আয়ত্তাতীত কি না? তিনি লোকটির সঙ্গ লইলেন। বেশীদূর যাইতে হইল না, অনতিদূরেই রঙ্গ মঞ্চ দেখা গেল।

রঙ্গমঞ্চের সম্মুখভাগ বেশ মনোরম মনে হইল। সম্মুখেই অর্ধবৃত্তাকার বারান্দা, তাহাতে বহুমূর্তি সুসজ্জিত। জনতাকে অনুসরণ করিয়া মহর্ষি সাবর্ণি ও তাঁহার সঙ্গী একটি সঙ্কীর্ণ গলি পার হইয়া অবশেষে বৃত্তাকার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, চতুর্দিক আলোকে আলোকময়। অনেক দর্শক ইতিমধ্যেই আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহারাও উভয়ে পাশাপাশি দুইটি আসন গ্রহণ করিয়াছেন। সাবর্ণি দেখিলেন, রঙ্গমঞ্চে কোনও যবনিকা নাই। রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া একটি আলোকিত প্রান্তরে বেদীর মতো একটি উচ্চ স্থান রহিয়াছে এবং তাহার এক পার্শ্বে একটি দণ্ডের উপর একটি গোলাকার চক্রের মধ্যে একটি মৎস্য বিলম্বিত রহিয়াছে। আকাশপটে চক্রটি অদ্ভুত দেখাইতেছিল। বেদীটির আশেপাশে কাছে দূরে ক্ষুদ্র বৃহৎ কতকগুলি শিবিরও দৃশ্যমান হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতি শিবিরের সম্মুখে তরবারি ঝুলিতেছে, শিবিরশীর্ষে শোভা পাইতেছে পুষ্পাশোভিত স্বর্ণময় ঢাল। সাবর্ণি বিস্ফারিত নয়নে দেখিতে লাগিলেন। দর্শকদের গুঞ্জন ধ্বনি ছাড়া চতুর্দিকে আর কোন শব্দ নাই। সকলেরই দৃষ্টি ওই বেদী এবং শিবিরগুলির উপর নিবদ্ধ। মহর্ষি সাবর্ণি সহসা চক্ষু মুদিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কোনও কথা বলিবার প্রবৃত্তি তাঁহার হইল না। কিন্তু যাঁহার সঙ্গে তিনি আসিয়াছিলেন তাঁহার প্রকৃতি অন্যরূপ। কথা না বলিয়া তিনি থাকিতে পারেন না। তিনি নাট্যশিল্পের অধঃপতন সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন।

বলিতে লাগিলেন, "আগে আগে অভিনেতারা উদাত্ত কণ্ঠে কাব্য আবৃত্তি করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করতেন। তাঁদের আবৃত্তিতেই কাব্যরস মূর্ত হয়ে উঠত সবার মনে, টিকা বা ভাষ্যের প্রয়োজনই হত না। এখন আবৃত্তি উঠে গেছে, তার জায়গায় এসেছে অভিনয়, মানে অঙ্গভঙ্গী—কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী। উদ্দেশ্য ইতর লোককে খুশী করা। এখন আর রসিকের স্থান কোথাও নেই মশাই, যেখানেই যান, দেখবেন বেরসিকের দল কিলবিল করছে। মেয়েরাও প্রকাশ্যে অভিনয়ে যোগ দিচ্ছে আজকাল। এমনিতেই তো মেয়েরা আমাদের পরম শত্রু, আমাদের মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিয়ে গোল্লায় পাঠাচ্ছে আমাদের তার উপর যদি এখন খোলাখুলিভাবে রঙ্গ মঞ্চে অঙ্গভঙ্গী করবার সুযোগ পায় তা হলে ভবিষ্যৎ ভয়াবহ—"

মহর্ষি সাবর্ণি বলিলেন, "ঠিকই বলেছেন আপনি, মেয়েরাই আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। তারা আনন্দদায়িনী, সেই জন্যই বোধ হয় ভয়ঙ্করী। আপনার নামটি জানতে পারি কি? "

"আমার নাম ডমরু। ক্ষমা করবেন, আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। মেয়েরা মোটেই আনন্দদায়িনী নয়, ঠিক উলটো। আমাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, সমস্ত চিন্তা ভয়ের কারণ ওরাই। আমাদের তীব্রতম বেদনার কারণ কি জানেন? প্রেম। সম্রাট অশোকের নাম নিশ্চয় শুনেছেন আপনি?"

"শুনেছি।"

"তিনি বুড়ো বয়সে তিষ্যরক্ষিতা নামে এক নর্তকীর প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করেছিলেন—এ-ও নিশ্চয় আপনার অজানা নয়?"

"এ কথাও শুনেছি।"

"তিষ্যরক্ষিতা কি করেছিল স্মরণ আছে কি আপনার?"

"না, ঠিক মনে পড়ছে না। তবে মনে হচ্ছে তিনি কি একটা যেন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন।"

"ব্যভিচার বলে ব্যভিচার। অশোকের যুবকপুত্র কুণালকে পাপ-পথে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু কুণাল যখন তাতে অসম্মত হলেন, তখন সে অশোকের কাছে মিথ্যা নালিশ করলে যে, কুণাল জোর করে তার ধর্ম নষ্ট করতে চায়। এ কথা শুনে অশোক কুণালের চোখ দুটো উপড়ে নিয়ে দূর করে দিলেন তাকে দেশ থেকে। অন্ধ কুণাল পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াতে লাগলেন। এক শিল্পী অন্ধ কুণালের একটি চমৎকার ছবি এঁকেছিলেন। সে ছবিটি আমি অনেক টাকা দিয়ে কিনেছি, কিনে টাঙিয়ে রেখেছি আমার শোবার ঘরে। ছবিটি প্রতিদিন আমাকে মনে করিয়ে দেয়— নারী ভয়ঙ্করী।"

মহর্ষি সাবর্ণি কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কিসে আপনি সুখ পান ডমরু?"

"আমি?"—ডমরু ম্লান হাসিয়া উত্তর দিলেন, "অমি অক্ষম পেট-রোগা লোক, বেশী সুখ ভোগ করবার সামর্থ্য আমার নেই। কেবল একটি মাত্র জিনিসে আমি সুখ পাই—চিন্তা। আমাকে আপনি চিন্তাশীল বলতে পারেন।"

ডমরুর এই মনোভাবের সুযোগ লইয়া মহর্ষি সাবর্ণি তাঁহার চিত্তে আধ্যাত্মিক আলোকপাত করবেন মনস্থ করিলেন।

"ভাই ডমরু, যদি প্রকৃত সুখের অভিলাষী আপনি হন, আমি কিছু সাহায্য করতে পারি—"

"বলুন, শুনি।"

"শুনুন তা হলে। সত্যই সুখের উৎস। এই উৎসের স্বরূপ কি এবং কি করলে তা আয়ত্ত করা যায় তা বলবার আগে—"

"চুপ, চুপ, চুপ করুন।"

বহু লোক হাত তুলিয়া সাবর্ণিকে থামাইয়া দিল। চতুর্দিকে নিবিড় নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। তাহার পর সহসা শিবিরগুলির ভিতর হইতে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল।

অভিনয় আরম্ভ হইল। সুসজ্জিত ক্ষত্রিয় নৃপতিরা একে একে শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিলেন। তাহার পর সেই বেদী উজ্জ্বল আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সকলে সবিস্ময়ে ও সহর্ষে দেখিলেন, দ্রৌপদী-বেশিনী নিরঞ্জনা দ্রুপদ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নেব পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দর্শকের অন্তরে আনন্দের শিহরণ সঞ্চারিত হইল। ক্ষণ পরেই সেই বেদীব উপব হোমশিখা জ্বলিয়া উঠিল, দ্রুপদেব কুলপুবোহিত তাহাতে আহুতি প্রদান কবিলেন এবং মন্ত্র পাঠ করিবার পর হস্ত উত্তোলন করিলেন। সমস্ত বাদ্য নীরব হইল।

ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "সমাগত বীরগণ, আজ ষোড়শ দিবস। আমার ভগ্নী কৃষ্ণা আজ স্নানান্তে উত্তম বসন, উপযুক্ত অলঙ্কার এবং কাঞ্চনী মাল্য ধাবণ করে সভায় অবতীর্ণা হয়েছেন, তিনি স্বয়ম্বরা হবেন। আমার পূজনীয় পিতৃদেব মহারাজ দ্রুপদ ঘোষণা করেছেন, তাঁব প্রদত্ত ধনুতে গুণ পরিয়ে শূণ্যে স্থাপিত যন্ত্রমধ্যস্থ মীনের প্রতিবিম্ব দর্শন করে যিনি উক্ত মীনের চক্ষু ভেদ করতে পারবেন তিনি কৃষ্ণাকে পাবেন। পার্শ্বেই জলপাত্রে মীনেব প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়েছে, এই সেই ধনু, এই বাণ এবং ওই লক্ষ্য। যন্ত্রটিব মধ্যে ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্রের ভেতর দিয়ে পাঁচবার শরসন্ধান করে লক্ষ্যভেদ করতে হবে। উচ্চ কুলজাত, রূপবান যে বর এই দুঃসাধ্য কর্ম করতে পারবেন, আমার ভগ্নী কৃষ্ণা তাঁর ভার্যা হবেন—এই সত্য আমি সর্বসমক্ষে প্রকাশ্যে ঘোষণা করছি।" তাহার পর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীকে সমাগত রাজন্যবর্গের পরিচয় প্রদান করিলেন। দুর্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, কর্ণ, শকুনি, অশ্বত্থামা, ভোজরাজ, বিবাটরাজ, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, ভগদত্ত, কলিঙ্গরাজ, মদ্ররাজ শল্য, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি সকলের পরিচয় বিবৃত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, এইবার আপনারা একে একে শর-সন্ধান করুন।"

ব্রাহ্মণদের বেশ ধারণ করিয়া পঞ্চপাণ্ডবগণও ব্রাহ্মণদের সহিত মঞ্চস্থলে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং তাঁহাদের ছদ্মবেশ সত্ত্বেও তাঁহাদের চিনিতে পারিলেন। তাঁহাদের মত্তগজেন্দ্রবৎ আকৃতি ও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ দীপ্তি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

ইহার পর শর-সন্ধান আরম্ভ হইল।

অধিকাংশ বাজা যদিও দ্রৌপদীকে লাভ কবিবাব জন্য লোলুপ হইয়া উঠিযাছিলেন, কন্দর্পবাণে আহত হইযা সদর্পে পবস্পবেব সহিত স্পর্ধিত বাক্য বিনিমযও কবিতেছিলেন, কিন্তু লক্ষ্যভেদে তাদৃশ সফলকাম হইলেন না। অনেকে ধনুতে গুণ পর্যন্ত পবাইতে অক্ষম হইলেন। অনেকে ধনুব আঘাতে ভূশাযী হইযা জনতাব উপহাসেব লক্ষ্যস্থল হইলেন। দুই-একজন ধনু উত্তোলন পর্যন্ত কবিতে পাবিলেন না। এক-একজন বীব এইভাবে যেমনিই ব্যর্থকাম হইতে লাগিলেন, অমনই জনতাব ভিতব হইতে তুমুল হাস্যধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

অলঙ্কাবভূষিতা কাঞ্চনমাল্যশোভিতা কৃষ্ণা কিন্তু নিশ্চল প্রতিমাব ন্যায দণ্ডাযমান বহিলেন। তাঁহাব মুখেব একটি পেশীও বিচলিত হইল না। মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন তন্ময হইযা কাহাবও ধ্যান কবিতেছেন।

সার্বর্ণি মুগ্ধনেত্রে দ্রৌপদীব দিকে চাহিযা নিস্তব্ধ হইযা ছিলেন। কত কথাই তাঁহাব মনে হইতেছিল। কৃষ্ণাব গম্ভীব ধ্যানমগ্ন মূর্তিব দিকে চাহিযা তাঁহাব আশা হইতেছিল, তিনি সফল হইবেন। নিবঞ্জনাব মুখে যখন এখনও এমন পবিত্র দীপ্তি জাজ্বল্যমান, তখন পাপ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস কবিতে পাবে নাই— এখনও তাহাব উদ্ধাবেব আশা আছে।

সহসা কবচকুণ্ডলধাবী এক দিব্যকান্তি যুবা সদর্পে অগ্রসব হইযা আসিযা ধনুতে গুণ পবাইলেন এবং জ্যা আকর্ষণপূর্বক টঙ্কাবধ্বনি কবিলেন। সকলে বুঝিতে পাবিলেন মহাবীব কর্ণ শবসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছেন। জনতাব মধ্যে একটা উত্তেজনাব সঞ্চাব হইল। চতুর্দিকে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। সকলেই রুদ্ধশ্বাসে প্রত্যাশা কবিতে লাগিলেন, কর্ণ হযতো লক্ষ্য ভেদ কবিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা অঘটন ঘটিযা গেল। কৃষ্ণা এতক্ষণ প্রস্তবপ্রতিমাবৎ ধীব স্থিব নিস্পন্দ ছিলেন, সহসা তিনি সঞ্জীবিত হইলেন। এবং তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ক্ষোভে বলিযা উঠিলেন, "আমি সুতপুত্রকে ববণ কবব না। ওঁব শবসন্ধান কববাব প্রযোজন নেই -'

কর্ণেব মুখমণ্ডল ক্রোধে আবক্ত হইযা উঠিল। তাহাব পব ... হাস্য কবিযা তিনি ধনু দূবে নিক্ষেপ কবিলেন। তাহাব পব আসিলেন চেদিবাজ শিশুপাল। তিনি ধনুতে গুণ পবাইতে পাবিলেন না, জানু পাতিযা মাটিতে বসিযা পড়িলেন। মহাবীব জবাসন্ধও অপাবগ হইলেন। বক্রোক্তিতে এবং ব্যঙ্গহাস্যে চতুর্দিক মুখবিত হইতে লাগিল। তখন মদ্রবাজ শল্য সদর্পে অগ্রসব হইযা আসিলেন, কিন্তু সেই বিশাল ধনু বক্র কবিতে গিযা নিজেই ভূশাযী হইলেন। হাস্য কোলাহল তুমুল হইযা উঠিল। এইরূপ একে একে অনেক বিখ্যাত ক্ষত্রিয বীব শবসন্ধানে ব্যর্থ মনোবথ হইলেন। ক্ষোভে দুঃখে অপমানে তাঁহাদেব মুখমণ্ডল ভযঙ্কব রূপ ধাবণ কবিল। তখন ব্রাহ্মণদিগেব ভিতব হইতে ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন গাত্রোত্থান কবিলেন। এক দীন ব্রাহ্মণেব এই উচ্চাভিলাষ দেখিযা অনেকে বিস্মিত হইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বাবণও কবিতে লাগিলেন। তাঁহাবা বলিলেন, বিখ্যাত ক্ষত্রীয বীবদেব পক্ষে যাহা অসাধ্য, দুর্বল ব্রাহ্মণেব পক্ষে তাহা সাধ্য হইবে কিরূপে? আমবা এখানে হাস্যাস্পদ হইতে আসি নাই। আমাদেব প্রতিপালক বাজন্যবর্গেব বিদ্বেষভাজন হইতেও চাহি না। কোন ব্রাহ্মণ-

সন্তানেরই এই ক্ষাত্র প্রতিযোগিতায় যোগদান করা উচিত নহে। আর একদল ব্রাহ্মণ কিন্তু ঠিক বিপরীত অভিমত ব্যক্ত করিলেন ঃ এই যুবার গমনভঙ্গী সিংহের ন্যায়, আশা করা যায় ইঁহার বিক্রমও সিংহের মতো হইবে, সুতরাং ইনি সফলকাম হইতে পারেন। ইঁহাকে বারণ করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ যে সর্বকর্মকুশল হইতে পারেন, জল বায়ু বা ফলমাত্র আহার করিয়াও তিনি শক্তিমান হইতে পারেন—এই সত্য সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিতে তাঁহাকে উৎসাহিত করাই কর্তব্য—

অর্জুন অগ্রসর হইয়া আসিয়া ধনুর নিকট বিরাট পর্বতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর ধনু প্রদক্ষিণ করতঃ বরদাতা মহাদেবকে প্রণাম এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া ধনু উত্তোলন করিলেন। তাহার পর যাহা হইল তাহা সকলেই প্রত্যাশা করিতেছিলেন—অনায়াস-দক্ষতা-সহকাবে ধনুতে গুণ পরাইয়া তিনি একে একে পাঁচটি শরসন্ধান করিয়া নির্দিষ্ট লক্ষ্য ভেদ করিলেন। লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়া ভূপতিত হইল। অন্তরীক্ষ ও সভাস্থলে তুমুল জয়ধ্বনি উত্থিত হইল, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ সহর্ষে উত্তরীয় আস্ফালন করিতে লাগিলেন, তূর্যধ্বনি দশ দিক প্রকম্পিত কবিয়া তুলিল, পরাজিত রাজবৃন্দ লজ্জায় অধোবদন হইয়া 'হায়' 'হায' করিতে লাগিলেন, সূত মাগধগণের স্তুতিপাঠে রঙ্গমঞ্চ মুখবিত হইয়া উঠিল। দ্রুপদ এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন অতিশয় আনন্দিত হইলেন। আর কৃষ্ণা? তাঁহার মুখভাবে যাহা প্রকাশিত হইল তাহা অবর্ণনীয়। ইন্দ্রতুল্য অর্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, মনে হইল তাঁহাব অন্তব-দীপ যেন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, হাস্য না করিয়াও তিনি যেন হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া একটি বাক্যও নির্গত হইল না, তাঁহাব দৃষ্টিই বাঙ্‌ময হইয়া উঠিল, ভাবাবেগে তিনি বিহ্বল হইয়া গেলেন; কিন্তু তাঁহার আচবণে অশোভন চাঞ্চল্যের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

সহসা পরাজিত রাজন্যবৃন্দ ক্ষেপিয়া উঠিলেন। জয়দ্রথ চীৎকাব করিয়া ঘোষণা করিলেন, "বন্ধুগণ, আমি দ্রুপদ-কন্যাকে হরণ করিব, তোমরা আমার সহায় হও—"

তিনি সদলবলে ভীমপরাক্রমে পাঞ্চালীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু সহসা তিনি বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন কার্মুকে টঙ্কার দিয়া বীরদর্পে তাঁহাকে বাধা দিলেন। তাঁহার পর অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি লক্ষ্যভেদ করিয়া ন্যায়সঙ্গতভাবে যে কন্যাকে বধূরূপে অর্জন করিয়াছেন তাহাকে রক্ষা করুন। আমরা আপনার সহায়তা করিব—"

অর্জুন ত্বরিতহস্তে ধনুর্বাণ তুলিয়া সিংহবৎ গর্জন করিয়া উঠিলেন। সে গর্জন সত্যই ভয়ঙ্কর। সে গর্জনে জয়দ্রথের গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। তাহার পর অর্জুন যখন শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন তখন যে দৃশ্যের অবতারণা হইল তাহা যুগপৎ বিস্ময়কর ও হাস্যকর। প্রভঞ্জনের সম্মুখে শুষ্ক পত্ররাশির ন্যায় সকলে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

সহসা সাবর্ণি দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তিনি উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হস্ত আস্ফালন করিয়া তিনি তারস্বরে বলিতে লাগিলেন, "পাটলিপুত্রের অধিবাসীবা, শ্রবণ কর। আজ যে অভিনয় তোমরা দেখলে, নূতন ধরনের সে অভিনয় আর একবার হবে। তোমরা শ্রবণ কর,

ঘৃণ্য কাপুরুষদের হাত থেকে আমিও অর্জুনের মত কৃষ্ণাকে উদ্ধার করব। সে কৃষ্ণা কাব্যের নায়িকা নয়, বাস্তবের মানবী। সে জানে না যে, সে নিরঞ্জনা—"

আশেপাশে যাহারা ছিল তাহারা সকলেই সাবর্ণির দিকে ফিরিয়া চাহিল, তাঁহার অদ্ভুত উক্তি শুনিয়া বিস্মিত হইল। অনেকে ভাবিল লোকটা পাগল। অনেকে হাসিল, অনেকে ব্যঙ্গও করিল। তাহার পব কেহই তাঁহার প্রতি আব বিশেষ মনোযোগ দিল না। অভিনয় শেষ হইয়া গিয়াছিল, সকলেই বঙ্গস্থল পরিত্যাগ কবিয়া নিজ নিজ গন্তব্য পথে চলিতে লাগিল।

ডমরুও সাবর্ণিব এই অদ্ভুত আচরণে কম বিস্মিত হন নাই। এ বিষয়ে হয়তো তিনি তাঁহাব সহিত আলাপ কবিতেন, সাবর্ণি কিন্তু সে সুযোগ দিলেন না, ডমরুকে এড়াইয়া তিনি বাহিব হইযা গেলেন।

এক ঘন্টা পবে তিনি নিবঞ্জনাব দ্বারে গিয়া কবাঘাত করিলেন।

নিবঞ্জনা বাস কবিতে নগরের বাহিরে এক বিবাট সুসজ্জিত প্রাসাদে। ছায়াশীতল কাননপবিবৃত প্রাসাদটি অপরূপ। প্রাসাদসংলগ্ন বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে কৃত্রিম পাহাড়, ঝরনা, উৎস, এমন কি ছোট একটি নদী পর্যন্ত ছিল। নদীর দুই তীবে ছিল দেবদারু চন্দন বকুল প্রভৃতিব বীথি।

করাঘাতের উত্তবে দ্বাব খুলিযা গেল। সাবর্ণি দেখিলেন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ একটি ভৃত্য দাঁড়াইযা আছে, তাহাব উভয় হস্তেরই প্রতি অঙ্গুলিতে একটি অঙ্গুরীয় এবং প্রতিটি অঙ্গুরীয় বহুমূল্য প্রস্তবখচিত.

সাবর্ণি কহিলেন, "আমি নিবঞ্জনাব সঙ্গে এখান দেখা কবতে চাই। তাব কাছে আমাকে অবিলম্বে নিয়ে চল।"

সার্বর্ণিব অঙ্গে বহুমূল্য পবিচ্ছদ দেখিয়া এবং কণ্ঠস্বরে আদেশের সুর শুনিযা ভৃত্যটি আপত্তি কবিতে সাহস কবিল না। বলিল, "আপনি ভিতরে আসুন। দেবী বাগানের মধ্যে শিলানিবাসে আছেন।"

।। দুই ।।

নিরঞ্জনার শৈশব ইতিহাস অতিশয় করুণ। তাহার জন্ম হইয়াছিল একটি পান্থশালায় এবং সেই পান্থশালাতেই তাহাব শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহার পিতা মণিবজ্র সারথি নগরের প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত এই পান্থশালাটির প্রভু .এবং পরিচালক ছিলেন। পান্থশালায় নানাপ্রকার পান্থের সমাবেশ হইত। বিদেশী 'ণিকেরাও আসিতেন, তা ছাড়া আসিতেন গান্ধার, বাহ্লীক, গ্রীক, সিরিয়ার পর্যটকেরা। স্থানীয অনেক রাজকর্মচারীরাও আসিতেন—বিশেষ কবিয়া সেনা-বিভাগের লোকেরা। কিন্তু সে পান্থশালায় আর একদল লোকও যাতায়াত করিতেন, যাঁহাদের আচার আচরণ একটু অসাধারণ ছিল। তাঁহারা নিজেদের বৌদ্ধ নামে পরিচিত করিতেন বটে কিন্তু যে ধর্ম তাঁহারা অনুসরণ করিতেন সে ধর্মের নাম ছিল

গুহ্যধর্ম, কারণ তাহা প্রকাশ্যে আচরণীয় ছিল না, সে ধর্মাচরণের জন্যে গোপনতার আশ্রয় লইতে হইত। নিরঞ্জনার পিতা মণিবজ্র ছিলেন তাঁহাদের নেতা এবং গুরুস্থানীয়। সমস্তই গোপনতার আবরণে আবৃত থাকিত। পান্থশালার নিত্যপরিবর্তনশীল পরিবেশে, নিত্য নব আগন্তুকদের আবির্ভাবে এবং অন্তর্ধানে যে প্রভাব নিরঞ্জনার অজ্ঞাতসারেই তাহার চরিত্রগঠন করিতেছিল, সে প্রভাব তাহাকে দার্শনিকতার উচ্চলোকে হয়তো একদিন উন্নীত করিতে পারিত; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। পান্থশালার চলমান জীবনধারার যে স্বাদ সে পাইয়াছিল তাহা বৈচিত্র্যপূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু কলুষিত। সে আনন্দে সন্তরণ করিতে পারে নাই, খরস্রোতে বারম্বার পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গিয়া ক্রমাগত বিপর্যস্তই হইয়াছিল। আনন্দ নয়— ক্ষোভ, ভয়, বিস্ময় তাহার শৈশব জীবনকে যে বিচিত্র রূপ দান করিয়াছিল তাহা আর যাহাই হউক মহিমান্বিত ছিল না।

নিরঞ্জনার চিত্তপটে শৈশবের কয়েকটি চিত্র অঙ্কিত ছিল। তাহার মধ্যে একটি চিত্র এই।--- তাহার পিতার শিষ্যেরা একদিন গভীর রাত্রে একটি কিশোরী চণ্ডাল কন্যাকে লইয়া পান্থশালায় উপস্থিত হইলেন। সেদিন বিশেষ প্রকার আহারাদির বন্দোবস্তও ছিল। ছাগমাংস, কুক্কুটমাংসও আহারের উপকরণ হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছিল। এই শেষোক্ত মাংস সংগ্রহের জন্য একটি কৃষ্ণা কুক্কুরীকে মুদগরাঘাতে বধ করিয়াছিল। সুরা তো ছিলই। আরও সব নানাবিধ অদ্ভুত উপকরণও সঞ্চিত হইয়াছিল। সেগুলি নিরঞ্জনাকে দেখানো হয় নাই। নিরঞ্জনার মা যোগিনী এই গুহ্যপূজায় যোগ দিতেন অর্থের লোভে। নিরঞ্জনার সন্দেহ হইত, পূজার পদ্ধতিতে তাঁহার অন্তরের তেমন সায় যেন ছিল না। ওই কিশোরী চণ্ডাল কন্যাকে তিনি যেন ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার অর্থলিপ্সা তাঁহার ঈর্ষাকে পরাজিত করিয়াছিল। মণিবজ্রের শিষ্যেরা সকলেই প্রায় ধনী ছিলেন। গুহ্যপূজার আয়োজন করিবার অছিলায় যোগিনীর হস্তে প্রচুর অর্থ দিতেন। পূজার আয়োজন করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত—প্রচুর থাকিত—তাহা যোগিনীরই ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইত। যোগিনী এ লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেন না। যেদিন ওই চণ্ডাল-কন্যাকে আনা হইয়াছিল সেদিন যোগিনীর হস্তে একজন শিষ্য এক শত সুবর্ণমুদ্রা দিয়াছিলেন। অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে কেহ দিয়াছিলেন পঞ্চাশ, কেহ কুড়ি। দশের কম কেহই দেন নাই। যোগিনী শুধু লোভ-পরবশ হইয়াই যে গুহ্যপূজায় সহযোগিতা করিতেন তাহা নয়, প্রতিবাদ করিবার সাহসও তাঁহার ছিল না। মণিবজ্রকে তিনি ভয় করিতেন। কারণ ক্রুদ্ধ মণিবজ্র ক্ষিপ্ত মহিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর ছিলেন। রাগিয়া গেলে তাঁহার হিতাহিতজ্ঞান থাকিত না। প্রতিবাদ করিয়াছিল বলিয়া একবার যোগিনীকে তিনি প্রহার করিতে করিতে অর্ধমৃত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যোগিনী অবশ্য তাঁহার সংসর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার অর্থ-লোভ ছিল। ক্রমশ এ বিশ্বাসও তাঁহার হইয়াছিল যে, সহধর্মিণী হিসাবে স্বামীর ধর্মাচরণে বিঘ্ন উৎপাদন করা তাঁহার পক্ষে অনুচিত। সুতরাং গুহ্যপূজায় তিনি সহায়তা করিতেন। ওই চণ্ডাল-কন্যাকে একটি ভিন্ন ঘরে লইয়া গিয়া গভীর রাত্রে গোপনে কি ধরনের পূজা যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা নিরঞ্জনা তখন বুঝিতে পারে নাই।

গভীর রাত্রে সে কেবল শুনিতে পাইয়াছিল, চণ্ডাল-কন্যাটি চীৎকার করিতেছে। এবং তাহার সে চীৎকারের সহিত মিশিয়াছে সঙ্গীত মন্ত্রপাঠ এবং অট্টহাস্য।

মণিবজ্রের শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ নিরঞ্জনাকেও অন্তরালে লইয়া গিয়া মাঝে মাঝে কি সব বলিতেন, নিরঞ্জনা বুঝিতে পারিত না। তাঁহাদের বক্তব্য যে অশ্লীল তাহা বুঝিবার বয়সও তখন তাহার হয় নাই। কিন্তু তাহার মনের এ শুচিতা বেশীদিন অক্ষুণ্ণ রহিল না। সমর্থ পুরুষদের মনোযোগ অকালেই তাহার বয়স বাড়াইয়া দিল। ক্রমশ সে সবই বুঝিতে শিখিল।

যখন তাহার বয়স নয় বৎসর, তখন মণিবজ্রের এক শিষ্য হেবজ্র নামক এক অদ্ভুত দেবতার মূর্তি তাহাকে দেখাইয়াছিল। মূর্তিটি সত্যই অদ্ভুত। অষ্টশির, ষোড়শভূজ এক বলিষ্ঠ দেবতা এক তরুণীকে ক্রোড়ে তুলিয়া দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া আছেন, একজনের নাক আর একজনের নাক স্পর্শ করিয়া আছে। দেবতাটির পদতলে কতগুলি শবদেহ। প্রতিভাবান শিল্পীর হস্তে উৎকীর্ণ সেই প্রস্তরমূর্তি নিরঞ্জনাকে কিছুদিন সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছিল। সে সমস্ত দিন ওই কথাটা চিন্তা করিত, রাত্রে স্বপ্নও দেখিত।

...এইভাবে কিছুদিন কাটিল। নিরঞ্জনার বয়স আর একটু বাড়িল। সে ক্রমশ অনুভব করিতে লাগিল যে, পুরুষেরা নানা ছলে তাহার সান্নিধ্য কামনা করে। সন্ধ্যাবেলায় যুবকদল তাহারই উদ্দেশে গান গাহিয়া পান্থশালার আনাচে কানাচে ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেকে পান্থশালায় আসিয়া খাবার খায় তাহাকে দেখিবে বলিয়া। একদিন সন্ধ্যাকালে কয়েকজন বিদেশী বণিক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের মস্তকে বিচিত্রবর্ণের শিরস্ত্রাণ, মুখে চাপ-দাড়ি, আগুল্‌ফলম্বিত রেশমী পোশাকে উগ্র আতরের গন্ধ। প্রত্যেকেই বলিষ্ঠ। তাহারা আসিয়া দাবী করিল 'আমরা উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং পানীয় চাই। দুই রাত্রি তোমার এখানে বাস করিব। দুই দিন, দুই রাত্রির জন্য তোমাদের কন্যাটিকেও চাই, সে-ই আমাদের সর্ববিধ সেবা করিবে। অন্য কোন ভৃত্যের প্রয়োজন নাই। ইহার জন্য যত অর্থ চাও পাইবে।' মণিবজ্র দুই শত স্বর্ণমুদ্রা চাহিলেন, বণিকেরা সানন্দে সম্মত হইল। তাহাদের পরুষ স্পর্শ এবং পাশবিক ব্যবহার নিরঞ্জনার অন্তরে যেন একটা অপ্রত্যাশিত বিপ্লব ঘটাইয়া দিল। সে কেমন যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল, একটা অজ্ঞাতপূর্ব রহস্যময় অরণ্যে সে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল। শুধু যে ভীত হইল তাহা নয়, পুরুষের আচরণে একটা আত্মপ্রসাদের খোরাকও পাইল। বণিকের দল চলিয়া যাইবার পূর্বে মণিবজ্রকে দুই শত স্বর্ণমুদ্রা তো দিলই, নিরঞ্জনাকেও পৃথকভাবে দশটি স্বর্ণমুদ্রা দিল। কিন্তু সে স্বর্ণমুদ্রা নিরঞ্জনার হাতে বেশীক্ষণ থাকিতে পাইল না, বণিকের দল পথের বাঁকে অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে যোগিনী তাহা ছিনাইয়া লইলেন।

ক্রমশ যোগিনী এবং মণিবজ্র বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের কন্যাটি নিতান্ত নগণ্য নয়। ইহাও তাঁহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে ইদানীং মুখ্যত তাহার আকর্ষণেই তাঁহাদের পান্থশালায় দলে দলে পান্থসমাগম হইতেছে। একদিন মণিবজ্রের এক শিষ্য প্রস্তাব করিলেন, নিরঞ্জনাকে এইবার গুহ্যপূজার কন্যারূপে বরণ করা হোক। মণিবজ্র শিষ্যের নিকট খোলাখুলিভাবে অর্থ দাবী করিতে কুণ্ঠিত হইলেন। বলিলেন, নিরঞ্জনা এখনও দ্বাদশ বর্ষে পড়ে নাই, তা ছাড়া উহার মা যোগিনী সম্মত না হইলে গুহ্যপূজায় তাহাকে নিয়োগ করা

উচিত হইবে না। যোগিনীর সম্মতি পাইতে অবশ্য বিলম্ব হয় নাই। স্বর্ণমুদ্রার লোভে তিনি রাজী হইয়াছিলেন। মণিবজ্র গোপনে তাঁহাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন—যদি দুই শত মুদ্রা পাও রাজী হইয়া যাইবে। যোগিনী বলিয়াছিলেন, কিন্তু নিরঞ্জনা যদি রাজী না হয়! সে আজকাল ক্রমশ অবাধ্য হইয়া উঠিতেছে। ইহা শুনিয়া মণিবজ্রের চক্ষু দুইটি দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিয়াছিলেন—যদি এমনিতে রাজী না হয়, চাবুক আছে।

ইহার পর হইতেই নিরঞ্জনার জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিল। পিতৃগৃহ নবকে পরিণত হইল। অপরিচিত অসভ্য পুরুষদের সঙ্গ তাহার প্রায়ই ভাল লাগিত না, মাঝে মাঝে সে বাঁকিয়া দাঁড়াইত। কিন্তু চাবুক ছিল। মণিবজ্রের নির্মম প্রহার হইতে যোগিনীও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিতেন না। ভগবান কিন্তু একজন রক্ষক জুটাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের পুরাতন ভৃত্য কিঙ্কর। নিরঞ্জনাকে অতি শৈশব হইতে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল সে। মণিবজ্রের অমানুষিক অত্যাচার হইতে সে-ই তাহাকে রক্ষা করিত। কিঙ্করের সহায়তায় নিরঞ্জনা মাঝে মাঝে পলায়ন কবিত। কোথায় যাইত, কোথায় থাকিত তাহা কিঙ্কর ছাড়া আর কাহারও জানিবার উপায় ছিল না। অনেক সময় একাধিক দিন সে আত্মগোপন কবিয়া থাকিত, কিঙ্করই তাহাকে খাবার দিয়া আসিত। কিঙ্করেরই খোশামোদ করিয়া মণিবজ্র এবং যোগিনী—বিশেষ করিয়া যোগিনী, পুনরায় নিরঞ্জনাকে গৃহে লইয়া আসিতেন। প্রতিশ্রুতি দিতেন, আর তাহাকে কিছু বলিবেন না। কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেও তাঁহারা বিলম্ব করিতেন না, আবার সে কিঙ্করের সহায়তায় পলায়ন করিত। এইভাবেই কিছুদিন চলিল।

মণিবজ্র ও যোগিনীকে ক্রমশ এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইল যে, নিরঞ্জনা পশু নয়, মানুষ। তাহার সহায়তায় যদি অর্থোপার্জনই করিতে হয় তাহাকে পীড়ন করিলে চলিবে না। শক্তিপ্রয়োগ না করিয়া কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। বেশী জোর-জবরদস্তি কবিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার সহায়তায় অর্থোপার্জন করিতে হইলে তাহার আনুকূল্য না থাকিলে চলিবে না।

...অবশেষে তাঁহারা কৌশলই অবলম্বন করিলেন। নিরঞ্জনাকে আর তাঁহারা প্রহার বা তাড়না করিতেন না, বরং মাঝে মাঝে ছোটখাটো উপহার কিনিয়া দিয়া তাহার মনোরঞ্জনেরই প্রয়াস পাইতেন। কখনও রঙীন শাড়ি, কখনও সুদৃশ অলঙ্কার মাঝে মাঝে তাহার অদৃষ্টে জুটিতে লাগিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নিরঞ্জনার শান্তি একটুও ছিল না। গভীর রাত্রে প্রায়ই কেহ না কেহ তাহাকে লইয়া টানাটানি করিত,— কখনও বা কোনও সুরামত্ত বণিক, কখনও বা কোনও বলিষ্ঠ সৈনিক, কখনও বা আর কেহ।

এই সময় কিঙ্কর যদি কাছে না থাকিত নিরঞ্জনার জীবনধারা যে কোন পথে প্রবাহিত হইত তাহা অনুমান করা শক্ত। হয় সে আত্মহত্যা করিয়া তাহার দুঃসহ জীবনের অবসান করিয়া দিত, না হয় তাহাকে অতিশয় ঘৃণ্য নিম্নশ্রেণীর রূপজীবীর পঙ্কিল জীবন যাপন করিতে হইত।

কিঙ্কর তাহাকে একটা নূতন জগতের সন্ধান দিল। কিন্তু প্রকাশ্যে নয়, গোপনে—প্রকাশ্যে

দিবার উপায় ছিল না। যে পরিবেশে তাহারা বাস করিতেছিল সে পরিবেশে প্রকাশ্যভাবে সদাচরণ করাই অসম্ভব ছিল। সকলকেই গুহ্যধর্মের সাধন বা সমর্থক হইতে হইত। কিঙ্করকে সকলেই বৌদ্ধ বলিয়া জানিত, কিন্তু সে যে গোপনে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শৈব হইয়াছিল— এ কথা কেহ জানিত না। সে-যুগে বৌদ্ধ ধর্ম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল তাহাকে অহি-নকুলের সম্পর্ক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা প্রকাশ্য বিরোধিতা করিতে অসমর্থ ছিলেন, তাঁহারা ভণ্ডামি করিতেন। যে স্থানে বৌদ্ধ-ধর্মের আধিক্য সে স্থানে হিন্দুরা বৌদ্ধ সাজিয়া থাকিতেন। আবার যেখানে হিন্দুরা প্রবল সেখানে বৌদ্ধগণ হিন্দুত্বের ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইতেন।

কিঙ্করের একটু ইতিহাস আছে। তাহার প্রপিতামহ সত্যই একদা বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক বৌদ্ধ রাজার অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁহাকে ধর্ম পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল। তাহাদের আদি নিবাস ছিল উত্তর প্রদেশেরও উত্তরাঞ্চলে, হিমালয় সন্নিহিত এক গ্রামে। তাহাব প্রপিতামহের জীবদ্দশায় বৌদ্ধ রাজার প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। এক রাজার প্রভাব বা প্রতিপত্তি বেশীদিন থাকে না। বাজনৈতিক কারণে বৌদ্ধ বাজার বংশধরগণ ক্রমশ হীনপ্রভ হইযা পড়িলেন; তাঁহাদেব যখন শোচনীয় অবস্থা বিপর্যয় ঘটিল তখন তাহার পুত্রকে অর্থাৎ কিঙ্করেব পিতামহকে ভিটা ত্যাগ করিতে হইল, কারণ চারিদিকেই তখন বৌদ্ধ নির্যাতন চলিতেছিল। বৌদ্ধ ক্ষপণক দেখিলেই লোকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত এবং সুবিধা পাইলেই তাহাকে নানাভাবে লাঞ্ছিত কবিত। এ অবস্থায় কোনও বিশেষ ধর্মের প্রতি আস্থা রাখাই কঠিন। বৌদ্ধ বা হিন্দু কোন ধর্মের মহিমাই সাধারণ লোকের চিত্তকে তখন উদ্বুদ্ধ করিত না, ধর্মকে তখন স্বার্থ সাধনের উপায়স্বরূপ লোকে গ্রহণ করিত। কিঙ্করের পিতা শুক্লচন্দ্র কোনও ধর্মেই আস্থাবান ছিলেন না। অবস্থা এবং পরিবেশ অনুসারে নিজেকে কখনও বৌদ্ধ, কখনও হিন্দু বলিয়া পরিচিত করিতেন। ব্যবসায় উপলক্ষে তাঁহাকে দেশের নানা স্থানে পর্যটন করিতে হইত, যেখানে যেরূপ পরিচয় দিলে সুবিধা হইবে সেখানে নিজের সেইরূপ পরিচয় দিতেন। সুতরাং তিনি কোথাও হিন্দু, কোথাও বৌদ্ধ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। শেষবয়সে পাটলিপুত্রের নিকটবর্তী একটি গ্রামে এক ভৈরবীর আশ্রমে তাঁহাকে বসবাস করিতে হইয়াছিল। ইহার কারণও ছিল। তাঁহার তৃতীয় পত্নী অনুরাধা যখন নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেল তিনি তখন বংশলোপের আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। প্রথমা এবং দ্বিতীয়া পত্নীও বন্ধ্যা ছিলেন। চতুর্থবার দার পরিগ্রহ করিতে শুক্লচন্দ্রের আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাঁহার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, চতুর্থ পত্নী তাঁহাকে পুত্র দান করিতে পারিবে কি? বিগত তিনটি পত্নী রূপে গুণে বা স্বাস্থ্যে কিছুমাত্র কম ছিল না, তাহাদের গর্ভে কোনও সন্তানই তো হয় নাই, চতুর্থার গর্ভে হইবে তাহার স্থিরতা কি? তিনি সন্দেহদোলায় দুলিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার এক বন্ধু সংবাদ দিলেন যে, এক ভৈরবীর একটি পালিত কন্যা আছে, সে কন্যাটিকে তিনি যদি পত্নী-রূপে লাভ করিতে পারেন তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। কারণ ভৈরবী যোগসিদ্ধা এবং শক্তিশালিনী, কন্যাটিও সুলক্ষণা। ভৈরবী আশীর্বাদ করিলে অসম্ভবও

সম্ভব হয়। বহু স্থানে হইয়াছে। বহু নিঃসন্তান ব্যক্তি তাঁহার কৃপায় সন্তানলাভ করিয়াছে। এ কথা শুনিয়া শুক্লচন্দ্রও ভৈরবীর শরণাপন্ন হইলেন। বহু অর্থব্যয় করিয়া তাঁহার জন্য একটি আশ্রম নির্মাণ করিয়া দিলেন, অবশেষে ভৈরবীর গুরু গোরক্ষনাথের নিকট শিবমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া ভৈরবীর পালিতা-কন্যাকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইলেন। বিবাহের দুই বৎসর পরে কিঙ্করের জন্ম হইল।

ভৈরবীর গুরুদেব গোরক্ষনাথ সত্যই আসাধারণ যোগী ছিলেন। হিমালয়েই তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কৈলাস পর্বতের নিকটবর্তী কোন গুহা তাঁহার তপস্যাপীঠ ছিল—ইহাই জন-শ্রুতি। কিন্তু প্রকৃত ঠিকানা কেহ জানিত না। মধ্যে মধ্যে তিনি হিমালয় হইতে নামিয়া আসিয়া ভৈরবীর আশ্রমে কিছুদিন করিয়া থাকিতেন বটে। কিন্তু সমাজের সংস্পর্শ তাঁহাকে কাতর করিত, আশ্রমে বেশীদিন তিনি থাকিতেন না, কিছুদিন থাকিবার পরই হিমালয়ের গহনে অন্তর্ধান করিতেন। ভৈরবী শুধু যে তাঁহার শিষ্যা ছিলেন তাহা নয়, পরম স্নেহের পাত্রীও ছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে তিনি শুক্লচন্দ্রকে দীক্ষা দিয়াছিলেন, কারণ খুব কম লোকেরই তাঁহাকে গুরুরূপে পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। শুক্লচন্দ্রকে দীক্ষা দিবার পর সেই যে তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন, আর ফিরেন নাই। তাঁহার অন্তর্ধানের পর কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল এবং তৎপরে কিঙ্করের দুর্ভাগ্য দেখা দিল। এক ভীষণ মহামারীর প্রকোপে পড়িয়া ভৈরবী, শুক্লচন্দ্র, কিঙ্করের জননী নীলনলিনী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। গুরুদেবকে দেখিবার সৌভাগ্য আর তাঁহাদের হইল না। তাঁহাদের গৃহগোবিন্দ নামে একজন পুরাতন ভৃত্য ছিল। অনাথ কিঙ্করের লালনপালনের ভার তাহারই উপর পড়িল। কিঙ্করের ভাগ্যে গৃহগোবিন্দও বেশীদিন বাঁচিল না। সে বৃদ্ধ হইয়াছে, কফরোগে আক্রান্ত হইয়া সে-ও একদিন ভব-লীলা সাঙ্গ করিল। অন্তিম নিশ্বাস ফেলিবার পূর্বে কিঙ্করকে সে একটি আশ্বাস কিন্তু দিয়া গেল। বলিয়া গেল, "বাবা গোরক্ষনাথ একদিন না একদিন এখানে আসবেন। তোমার এ বিপদের কথা তিনি জানতে পারবেনই এবং সময় হলে তোমার কাছে আসবেন। তুমি যেখানেই থাক, আশ্রমের সংস্রব ত্যাগ করো না। আশ্রমে এসে মাঝে মাঝে খবর নিও, তাঁর দেখা একদিন না একদিন নিশ্চয়ই পাবে।"

গৃহগোবিন্দের মৃত্যুর পর বালক কিঙ্কর প্রথমে কয়েক দিন কিংকতর্ব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল। বালক হইলেও সে নির্বোধ ছিল না। সে যখন দেখিল সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য ক্রমশ ফুরাইয়া আসিতেছে তখন আর সে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকতে পারিল না। কাজের সন্ধানে বাহির হইল।

নিকটবর্তী এক বৌদ্ধ মঠে তাহার কাজও একটি জুটিল। সেখানে গিয়া সে বলিল, তাহার প্রপিতামহ দীক্ষিত বৌদ্ধ ছিলেন। অবস্থাবিপর্যয়ে তাহারা কুলধর্ম বজায় রাখিতে পারে নাই বটে, তাহার পিতাকে এক ভৈরবীর শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। বৌদ্ধ ক্ষপণকগণ যদি কৃপা করেন তাহা হইলে কুলধর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সে কৃতার্থ হয়। ক্ষপণকগণ কৃপা করিলেন, এবং কিঙ্কর তাঁহাদের কিঙ্কররূপে নিযুক্ত হইল।

বলা বাহুল্য, তাহা পিতা এবং পিতামহের ন্যায় কিঙ্করও অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করিল। অর্থাৎ বাহিরে যদিও সে বৌদ্ধ আচার, বৌদ্ধ পরিচ্ছদ গ্রহণ করিল, ভিতরে ভিতরে সে যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল। গৃহগোবিন্দ মৃত্যুকালে যাহা বলিয়া গিয়াছিল তাহাও বিস্মৃত হইল না। বৌদ্ধ মঠের কাজকর্ম শেষ করিয়া রাত্রে সে আশ্রমে ফিরিয়া আসিত। কিন্তু এত বড় আশ্রম সে একা ভোগ করিতে পারিল না, অনেকেরই লুব্ধ দৃষ্টি আশ্রম-ভবনের উপর নিপতিত হইল। ওই বৌদ্ধ ক্ষপণকরাই একে একে আসিয়া আশ্রমের ঘরগুলি অধিকার করিতে লাগিলেন।

কিঙ্করকে অবশ্য ক্ষপণকরা তাড়াইয়া দিলেন না। ভৃত্যদের থাকিবার জন্য দূরে যে ঘরটি ছিল সেই ঘরেই সে থাকিবার অনুমতি পাইল। ক্ষপণকরা মঠটি দখল করিয়া লইয়া কিছুদিন বেশ শান্তিতে বাস কবিলেন। কিছুদিন পরে কিন্তু শান্তি বিঘ্নিত হইল। একদিন রাত্রে এমন একটি কাণ্ড ঘটিল তাহা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি ভয়ঙ্কর। গভীর নিশীথের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিষ্ঠাকৃতি একদল লোক ভীমপরাক্রমে আশ্রম আক্রমণ করিল এবং বৌদ্ধ ক্ষপণকদের প্রহার করিতে করিতে আশ্রম হইতে বাহির করিয়া দিল। তাহাদের দীর্ঘ কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ, আবক্ত নয়ন, গুচ্ছাকৃতি শ্মশ্রু, শাল-প্রাংশু পেশী-সমৃদ্ধ দেহ এবং ব্যাঘ্রহুঙ্কার কিঙ্করকে শুধু আতঙ্কিতই করিল না হতজ্ঞানও করিল। যদিও কেহই তাহার অঙ্গস্পর্শ করে নাই, তাহার নিকটে পর্যন্ত আসে নাই, তথাপি এই ভীষণ কাণ্ড দেখিয়া নিজেব ঘরে সে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া বহিল।

..যখন জ্ঞান হইল তখন সে অনুভব কবিল, অজ্ঞান অবস্থায় সে গৃহান্তরে নীত হইয়াছে। প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল, বিরাট একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রদীপেব পাশে একটি মৃগচর্মের আসন এবং আসনেব পাশে একটি বৃহৎ শঙ্খ রহিয়াছে। তাহার পর একজন ত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মাথায় জটা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, বাম হস্তে কমণ্ডলু, মুখমণ্ডল শ্বেত শ্মশ্রুগুম্ফে সমাচ্ছন্ন, নয়নের দৃষ্টি সমুজ্জ্বল।

তিনি মৃগচর্মে উপবেশন করিয়া কিঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, কিঙ্কর, ভয় পেয়ো না। আমি তোমার পিতার গুরু গোরক্ষনাথ। তোমাকে দীক্ষা দেবার জন্যে এসেছি। আর একজনকে দীক্ষা দেবার জন্যেও আর একবার আমাকে আসতে হবে। তোমাকে দীক্ষা দিয়ে আজ আমি চলে যাব, কিন্তু আবার আসব আমি। তুমি আমার প্রতীক্ষা করো, এ আশ্রমের সংস্রব ত্যাগ করো না—"

কিঙ্কর সভয়ে বলিল, "প্রভু, আপনি আসবার কিছু পূর্বে এখানে একদল ডাকাত এসেছিল।"

"তারা ডাকাত নয়, তারা শিবের অনুচর। যে নাস্তিক পাষণ্ডের দল এই শিবস্থানকে কলঙ্কিত করছিল, তাদের শাস্তি দিতে তারা এসেছিল। আর তারা এখানে আসবে না।"

"আমি কি তা হলে এখানে একাই থাকব?"

"তোমার নিয়তি তোমাকে নানা স্থানে ঘোরাবে। এই বৌদ্ধদের সংস্পর্শেই তোমাকে থাকতে হবে অনেক দিন। বাইরে যে বেশই তুমি ধারণ করে থাক না, অন্তরে যদি তুমি

প্রকৃত শৈব হয়ে থাকতে পার, তোমার ভয় নেই। ভগবান অন্তরটাই দেখেন । শঙ্কর তা হলে তোমাকে কৃপা করবেন।"

"বৌদ্ধদের সঙ্গ আমার ভাল লাগে না। আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চলুন।"

"বৌদ্ধদের মধ্যেই তোমাকে থাকতে হবে। ওদের নরককুণ্ড থেকে একজন আর্তকে উদ্ধার করবার ভার নিতে হবে তোমাকে। যে দিন তা পারবে সেই দিন শঙ্কব কৃপা করবেন, তার কিছুদিন পরেই মুক্তি হবে তোমার। এখন এস, তোমাকে দীক্ষা দিই।"

গোরক্ষনাথ সেই রাত্রে কিঙ্করকে যথাবিধি দীক্ষা দিলেন। দীক্ষা যখন শেষ হইল, তখন পূর্বদিগন্তে ঊষা হাসিতেছিল।

গোরক্ষনাথ কিঙ্করকে বলিলেন, "তুমি এবার বিশ্রাম কর। আমি এখন যাচ্ছি, আবার আসব। ভয় পেয়ো না। শঙ্করেব সেবক তুমি—এ কথা সর্বদা মনে রাখলে আর ভয় থাকবে না।"

ধীরে ধীবে তিনি আশ্রম-প্রাঙ্গণেব আলো-আঁধারিতে মিলাইয়া গেলেন। কিঙ্কর প্রত্যাশা করিয়াছিল, পরদিন আবাব তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, কিন্তু তিনি আব ফিবিয়া আসেন নাই।

কিঙ্কর প্রহৃত ক্ষপণকদের এড়াইয়া চলিতেছিল। কিন্তু সহসা কোথাও সে জীবিকা-নির্বাহেব উপায় আবিষ্কার করিতে পারিল না। সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও পুনরায় তাহাকে সেই বৌদ্ধ আশ্রমেই ফিরিয়া যাইতে হইল। প্রহৃত ক্ষপণকগণ রাজপুরুষদের সহায়তায় দস্যুদলেব সন্ধান করিবাব প্রয়াস পাইতেছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা সফলকাম হইলেন না। তাঁহাবা ভাবিয়াছিলেন দস্যুদল কিঙ্করকে হয়তো মারিয়া ফেলিয়াছে। তাহাকে জীবিত দেখিয়া তাঁহারা হৃষ্ট হইলেন এবং পূর্বকর্মে নিয়োগ কবিলেন। কিঙ্কব গোরক্ষনাথেব সংবাদ সযত্নে গোপন করিয়া রাখিল। এই ভাবেই দিন কাটিতেছিল, কিছুদিন পরে একদিন কিঙ্করকে তাহার ভাগ্য-দেবতা স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। পাটলিপুত্র-নিবাসী মণিবজ্র এই বৌদ্ধ ক্ষপণকদের মঠে যাতায়াত করিতেন। নানা সূত্রে তাঁহার সহিত ইঁহাদের যোগ ছিল । কিঙ্করের কর্মতৎপরতায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি একদিন মঠাধিপতিকে অনুরোধ করিলেন, আমার পান্থশালায় একটি ভৃত্যের নিতান্ত দরকার। আপনি যদি অনুমতি করেন কিঙ্করকে আমি লইয়া যাই। মঠাধিপতি তাঁহাকে অনুমতি দিলেন।

কিঙ্কর যখন পাটলিপুত্রে গিয়া মণিবজ্রের পান্থশালায় নিযুক্ত হইল, তখন সবে মাত্র নিরঞ্জনার জন্ম হইয়াছে। নিরঞ্জনাকে সে শিশুকাল হইতেই মানুষ করিতে লাগিল। গোরক্ষনাথ তাহাকে যে নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা সে বিস্মৃত হইল না। বাহিরে বৌদ্ধসঙ্গ করিতে বাধ্য হইলেও অন্তরে শৈবধর্মের প্রতি তাহার নিষ্ঠা অটুট রহিল। গোরক্ষনাথ যে মন্ত্রে তাহাকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহাও সে বিস্মৃত হয় নাই, সুযোগ পাইলেই সে মন্ত্র সে প্রত্যহ জপ করিত।

এই ভাবে প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। নিরঞ্জনা তাহার নয়নের মণি হইয়া উঠিল। তখনও কিন্তু সে বুঝিতে পারে নাই যে, এই নিরঞ্জনার কথাই গোরক্ষনাথ তাহাকে দীক্ষা দিবার পূর্বেই ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন। ইহাকেই যে বৌদ্ধ নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার করিতে হইবে, ইহাকে দীক্ষা দিবার জন্যই যে গুরু গোরক্ষনাথ আর একবার হিমালয় হইতে নামিয়া

আসিবেন—এ সব কথা তাহার মনে জাগে নাই। গোরক্ষনাথের নির্দেশ অনুসারে সে অবশ্য আশ্রমের সংস্রব ত্যাগ করে নাই, প্রায়ই আশ্রমে যাইত এবং খোঁজ রাখিত কেহ আসিয়াছে কি না! আশ্রমটি সংস্কার অভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইতেছিল। বৌদ্ধ ক্ষপণকগণ আর একবার সেখানে বাস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভৌতিক উপদ্রবে বিপর্যস্ত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। সকলের মনে এই ধারণাই ক্রমশ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, ভৈরবী, শুক্লচন্দ্র এবং গৃহগোবিন্দের প্রেতাত্মা ওই আশ্রমে অদৃশ্যভাবে বসবাস করিতেছে তাহারা আর কাহাকেও সেখানে থাকিতে দিবে না। কিঙ্করের কিন্তু ভয় ছিল না, ক্ষপণকদেব যে কে বিপর্যস্ত করিতেছে তাহা গোরক্ষনাথ তাহাকে বলিয়াছিলেন। সে সুযোগ পাইলেই আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইত এবং আশ্রমের যে ঘরটি তখনও পড়িয়া যায় নাই সেই ঘরে গিয়া গোরক্ষনাথের জন্য অপেক্ষা করিত। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তিনি যখন আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন তখন আসিবেনই। মাঝে মাঝে ওই ঘরটিতে গিয়া সে রাত্রিবাসও করিত। নিরঞ্জনার উপর অত্যাচার যখন চরমে উঠিত, তখন নিরঞ্জনাকেও সে মাঝে মাঝে সেখানে লইয়া যাইত। নিরঞ্জনা তাহার মুখ হইতে গোরক্ষনাথের কথাও শুনিয়াছিল। বাল্যকাল হইতে গোবক্ষনাথেব বিষয়ে নানারূপ অসম্ভব কাহিনী শুনিযা তাহার মনে গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত অলৌকিক ধারণা হইয়া গিয়াছিল। কিঙ্কর যখন বলিত—"তিনি হিমালয়ে থাকেন, মানসসরোবরে স্নান করেন, কৈলাসে তপস্যা কবেন, মহাশক্তি মহাপুরুষ তিনি। তিনি আবার আসবেন, আমাকে বলে গেছেন আসবেন। তাঁর কথা মিথ্যা হতে পারে না। তিনি এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন তাঁর কাছে। তুমি কিন্তু এসব কথা কাউকে বলো না যেন—" তখন নিরঞ্জনাব অন্তঃকবণ উন্মুখ হইয়া উঠিত, মনে হইত কবে সেই ত্রাণকর্তা আসিবেন।

নিবঞ্জনাব জীবন ক্রমশ বিষময় হইয়া উঠিতেছিল সুরা-উন্মত্ত ধনী কামুকের দল তাহার মনে যে কামনা উদ্দীপ্ত করিত তাহাতে কিছু উন্মাদনা ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রেমহীন বলিয়া তাহাব কদর্য রূপ অচিরেই প্রকট হইয়া পড়িত; তাহার সমস্ত দেহমন পাশবিক কামের কলুষে যেন সর্বদা ক্লেদাক্ত হইয়া থাকিত, তাহাতে আনন্দ ছিল না, তাহার বীভৎসতায় সে ভীত বিমর্ষ মূহ্যমান হইযা পড়িতেছিল। এ দুর্বহ জীবনভার সে যেন আব বহিতে পারিতেছিল না।

একদিন গভীর রাত্রে এক বর্বর বণিকের আলিঙ্গনপাশ ছিন্ন করিয়া সে ছুটিয়া রাস্তায় বাহিব হইয়া পড়িল। ছুটিতে ছুটিতে সে অন্ধকার এক বৃক্ষতলে গিয়া আত্মগোপন করিল বটে; কিন্তু তাহার আশঙ্কা হইতে লাগিল, প্রমত্ত বর্বরটা হয়তো তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিবে। তাহার আশঙ্কা অমূলক ছিল না। লোকটা পশ্চাদ্ধাবনই করিয়াছিল, কিন্তু অতিরিক্ত সুরাপানের ফলে তাহার পদদ্বয় স্থির ছিল না, কিছুদূর অসংলগ্ন ভাবে ছুটিবার পর তাহার পদস্খলন হইল, সে পথের ধারে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। কিঙ্কর ছিল না। সে আশ্রমে গিয়াছিল। রাত্রে হয়তো সে আর ফিরিত না, কিন্তু একটি অতিশয় প্রয়োজনীয় ব্যাপারের জন্য তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। ফিরিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ সে দাঁড়াইয়া পড়িল। সে দেখিতে পাইল, নিরঞ্জনা ঘরেব ভিতর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। একটু পরে প্রমত্ত বণিকটাকেও সে দেখিতে পাইল, তাহার পতনও লক্ষ্য করিল। তাহার পর সে যাহা করিল তাহা অদ্ভুত।

হতচেতন বণিকটার পা ধরিয়া টানিতে টানিতে সে লইয়া গেল এবং কিছুদূরে গিয়া একটি কূপের মধ্যে তাহাকে ফেলিয়া দিল। তাহার পর সে গেল নিরঞ্জনার কাছে। নিরঞ্জনা যে একটা গাছের তলায় আত্মগোপন করিয়াছে তাহা সে দেখিতে পাইয়াছিল গাছের কাছাকাছি আসিতেই কিন্তু নিরঞ্জনা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, সেই মাতালটাই বুঝি আসিতেছে। সে আবার ছুটিতে লাগিল, কিঙ্করও পশ্চাদ্ধাবন করিল। চীৎকার করিয়া সে নিরঞ্জনার মনোযোগ আকর্ষণ কবিতে পারিত, কিন্তু নিরাপদ নহে বলিয়া তাহা আর করিল না।

কাছাকাছি আসিয়া নিম্ন কণ্ঠে সে বলিল, "নিরঞ্জনা, শোন, শোন, আমি কিঙ্কর।"

নিরঞ্জনা দাঁড়াইয়া পড়িল। সে হাঁপাইতেছিল।

কিঙ্কর কাছে আসিয়া বলিল, "আমি আশ্রম থেকে আসছি। শুভ সংবাদ আছে। গুরু গোরক্ষনাথ এসেছেন। তিনি তোমাকে ডাকছেন, দীক্ষা দিতে চান।"

"আমাকে ?"

"তোমাকে দীক্ষা দিতেই এসেছেন তিনি। চল।"

"আমার মতো মেয়েব দীক্ষা নিয়ে কি লাভ হবে কোনও?"

"হবে। না হলে তিনি আসতেন না। তিনি যখন এই জন্যেই এসেছেন, তখন নিশ্চযই কোন উদ্দেশ্য আছে তাঁর। আব দেরি করা চলবে না, চল তুমি।"

সেই বাত্রেই গোরক্ষনাথ নিবঞ্জনাকে যথাবিধি দীক্ষা দিয়া বলিলেন, "জীবনেব বাইরেব রূপ দেখে বিচলিত হয়ো না। সে রূপ কখনও ভীষণ, কখনও সুন্দব, কিন্তু তা ক্ষণিক। তোমার জীবনে অনেক দুঃখ আসবে। অনেক প্রণয়ী আসবে, অনেক সুখ আসবে, অনেক কামনা আসবে। তোমার ঐশ্বর্য অতুল হবে, খ্যাতিও অনেক হবে। দুঃখও কম পাবে না। কিন্তু বিচলিত হয়ো না। ধ্রুব সত্যের উপর বিশ্বাস রেখো। যদি রাখতে পার সেই বিশ্বাসই তোমাকে সকল প্রকার পঙ্ক থেকে উদ্ধার করবে, তোমার মুক্তি হবে। আমার কর্তব্য শেষ হল। এবাব আমি চললাম। আশীর্বাদ করি শিবের করুণা বর্মের মতো তোমাদের রক্ষা করুক।"

গোরক্ষনাথ চলিয়া গেলেন।

নিরঞ্জনার দীক্ষা হইয়া গেল বটে, কিন্তু কিঙ্কর লক্ষ্য করিতে লাগিল, কামনার যে বিষ তাহার মনে সঞ্চারিত হইযাছিল তাহা ক্রমশই যেন ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছে। পিতার পান্থশালায় সে অবাঞ্ছিত পুরুষের সংস্রবে আসিতে চাহিত না বটে, কিন্তু মনোমত যুবক পাইলে খুশীই হইত। ক্রমশ কিঙ্করকেও সে এড়াইয়া চলিতে লাগিল। সমস্ত দিনটা সে প্রায় বাহিরে বাহিরেই কাটাইয়া দিত। কিছুদিনের মধ্যেই নৃত্যগীত-প্রিয় একদল যুবকও তাহার চারিদিকে জুটিয়া গেল। তাহাদের সঙ্গে সে বাহিরে বাহিরে—কখনও নদীর ধারে, কখনও কোন ভগ্নপ্রাকারের অন্তরালে, কখনও বা জনবিরল পথে পথে নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। পিতামাতাকে সে আর ভয় করিত না, পিতামাতাও ইহা লইয়া তাহাকে আর ভর্ৎসনা

করিতেন না। কারণ প্রতিদিন সন্ধ্যায় যখন সে ফিরিত, কিছু অর্থ লইয়াই ফিরিত। এই ভাবে কিছুদিন কাটিল।

ইতিমধ্যে আর এক ব্যাপার ঘটিয়া গেল। মণিবজ্রের দলের একজন গোঁড়া বৌদ্ধ হেরুকচরণ অনেক দিন হইতেই কিঙ্করের প্রতি বিরূপ ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, কিঙ্করের চক্রান্তেই তাঁহারা নিরঞ্জনাকে নিজেদের গুহ্যসাধনামার্গে সহচরীরূপে পান নাই। একদিন গভীর রাত্রে তিনি গোপনে নিরঞ্জনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, কিঙ্কর তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল। ইহাও তাঁহার সন্দেহ ছিল যে, কিঙ্কর যদিও নিজেকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু আসলে সে বিধর্মী। বিধর্মী না হইলে একদিন সে নিজেই নিরঞ্জনাকে লইয়া গুহ্যধর্মে যোগ দিত। তাহার গুহ্যধর্মে যোগ দিবার আগ্রহ নাই, সে আবার কি রকম বৌদ্ধ? কিঙ্করকে প্রকাশ্যে কিছু বলিবার উপায় ছিল না, কিঙ্করই মণিবজ্রের পান্থশালার মেরুদণ্ডস্বরূপ, তাহাব অভাবে পান্থশালা অচল হইয়া পড়িবে। কিঙ্কর না থাকিলে যোগিনীরও চলিত না, কারণ যোগিনীও ক্রমশ সুরাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, গৃহের যাবতীয় কর্ম, এমন কি রন্ধন পর্যন্ত, কিঙ্করই করিত। সুতরাং প্রকাশ্যে কিঙ্করের বিরুদ্ধাচরণ করিবাব উপায় ছিল না। হেরুকচরণের সে সাহস হইত না, কিন্তু কোনও ছুতায় কিঙ্করকে জব্দ করিবার জন্য তিনি মনে মনে ওৎ পাতিয়া থাকিতেন।

একদিন তিনি সুযোগ পাইলেন। মণিবজ্রের পান্থশালা হইতে কিছুদূরে একটি নাতিবৃহৎ অরণ্য ছিল এবং সে অরণ্যের মধ্যে একটি ভগ্নস্তূপ ছিল। কিন্তু সে ভগ্নস্তূপটি যে আসলে একটি প্রাচীন মন্দির এবং তাহার ভিতরে যে একটি শিবলিঙ্গ বর্তমান—এ কথা অনেকেই জানিত না। কারণ স্থানটি দুর্গমও ছিল ভয়াবহও ছিল, লোকে বলিত—ওই স্থানে শঙ্খচূড় সাপ নাকি বাস করে! কিঙ্কর কিন্তু শিবলিঙ্গের অস্তিত্ব জানিত, অবসর পাইলে সেখানে নির্জনে সে শিবপূজাও করিত।

একদিন সে হেরুকচরণের নিকট ধরা পড়িয়া গেল। হেরুকচরণ এক কিশোরী চণ্ডালকন্যাকে লইয়া ওই গভীর বনে সম্ভবত গুহ্যধর্ম পালনমানসে গিয়াছিলেন। সহসা তাঁহার নজর পড়িল কিঙ্কর উক্ত ভগ্নস্তূপের পিছন হইতে বাহির হইতেছে, তাহার হাতে কিছু বিল্বপত্র এবং আকন্দ ফুল। হেরুকচরণ বিস্মিত হইলেন। সর্পসঙ্কুল বলিয়া সাধারণত কেহ ওই ভগ্নস্তূপের কাছাকাছি যায় না, কিঙ্কর ওখানে কি করিতেছে? হেরুকচরণ কৌতূহলী হইলেন। কিঙ্কর যখন চলিয়া গেলেন. তিনি সাবধানপদবিক্ষেপে ভগ্ন মন্দিরের সমীপবর্তী হইয়া শিবলিঙ্গটি আবিষ্কার করিলেন। শুধু তাহাই নহে, দেখিলেন. শিব যে নিয়মিত পূজিত হন তাহার চিহ্নও বর্তমান। কিঙ্করের স্বরূপ আবিষ্কার করিয়া হেরুকচরণ পুলকিত হইলেন, কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, ইহা লইয়া এখনই যদি হৈ-হৈ করা যায়, কিঙ্কর হয়তো ব্যাপারটা অস্বীকার করিবে। তিনি স্থির করিলেন, কিঙ্করকে একদিন হাতে-নাতে ধরিতে হইবে, সঙ্গে একজন সঙ্গীও লইয়া যাইতে হইবে। সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে বিলম্ব হইল না। কিঙ্কর একদিন হাতে-নাতেই ধরা পড়িয়া গেল। কিন্তু ফল যাহা হইল তাহা ভয়ানক। হেরুকচরণ মহামাতঙ্গ নামক জিঘাংসা-পরায়ণ রাজপুরুষদের প্রিয়

একজন বৌদ্ধকে লইয়া গিয়াছিলেন। উভয়ে যখন মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন কিঙ্কর মহাদেবকে প্রণাম করিতেছিল। মহামাতঙ্গ কিঙ্করের পশ্চাদ্দেশে এক প্রচণ্ড পদাঘাত করিয়া বলিল, "তুই শালা বাইরে নিজেকে বৌদ্ধ বলে পরিচয় দিস, এ কি করছিস তুই?"

এ ভাবে আক্রান্ত হইয়া কিঙ্কর ক্ষেপিয়া গেল। নিকটে একটা ত্রিশূল ছিল, সেটা তুলিয়া সে মহামাতঙ্গের শির লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিল। ত্রিশূলটা গিয়া বিঁধিল বুকের মাঝখানে। মহামাতঙ্গকে ধরাশায়ী হইতে হইল হেরুকচরণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন।

"এ কি করলে, এ কি করলে কিঙ্কর?"

কিঙ্কর উত্তর দিল, "আমি করিনি. স্বয়ং শিব করেছেন।

"তুমি কি শিব হয়ে উঠেছ আজকাল?"

"আমি শিবের ভক্ত। তিনিই আমার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেছেন। ভক্তেব অপমান ভগবান সহ্য করেন না।"

সহসা হেরুকচরণ লক্ষ্য করিলেন মহামাতঙ্গের কান দিয়া রক্ত বাহিব হইতেছে, নিঃশ্বাস পড়িতেছে না। তিনি একটু ভীত হইয়া পড়িলেন এবং যাহা করিলেন তাহা অপ্রত্যাশিত তো বটেই, একটু হাস্যকরও। কোনও কিছু না বলিয়া হঠাৎ তিনি উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিলেন। কিঙ্কব নিস্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ মৃতদেহটার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর সেও ধীরে ধীবে বাহির হইয়া গেল।

সেই দিনই সন্ধ্যায় নর-হত্যাব অপরাধে রাজপুরুযেবা কিঙ্করকে বন্দী কবিলেন। এক সপ্তাহ পবে তাহার বিচাব হইল। বিচারক ছিলেন বৌদ্ধধর্মালম্বী। তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে কিঙ্কর এতকাল বৌদ্ধধর্মেব মুখোশ পরিয়া সকলকে ছলনা করিতেছিল— আসলে সে শৈব, তখন কিঙ্করের প্রতি তাঁহাব কিছুমাত্র সহানুভূতি হইল না। অকস্মাৎ ক্রোধের বশে মহামাতঙ্গকে দৈবাৎ মারিয়াছে বলিয়া তিনি ইচ্ছা করিলে কিঙ্করকে লঘু শাস্তি দিতে পারিতেন, কিন্তু ভণ্ড আচরণের কথা শুনিয়া সে ইচ্ছা তাঁহার হইল না। তিনি কিঙ্করেব মৃত্যুদণ্ড দিলেন। বলিলেন, কেবল একটি শর্তে সে প্রাণে বাঁচিতে পাবে। যে যদি সর্বসমক্ষে শিবলিঙ্গের মস্তকে পদাঘাত করিয়া অনুতপ্তচিত্তে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে, তাহা হইলেই কিছু অর্থদণ্ড করিয়া তাহাকে তিনি মুক্তি দিতে পারেন। কিঙ্কর এ শর্তে মুক্তি ক্রয় করিতে সম্মত হইল না। সে মৃত্যুই বরণ করিল। ত্রিশূল আঘাতে মহামাতঙ্গকে হত্যা করিয়াছিল বলিয়া বিচারক তাহাকে শূলে দিবার আদেশ দিলেন।

যে স্থান দিয়া কিছুকাল পূর্বে কিঙ্কর নিরঞ্জনাকে গোপনে গোরক্ষনাথের নিকট লইয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই স্থানেই শূল প্রোথিত হইল। জল্লাদগণ কিঙ্করকে হস্তপদবদ্ধাবস্থায় শূলের উপর চড়াইয়া দিল। কিঙ্কর কোনও আপত্তি করিল না, কোনও আর্তনাদও করিল না। সে তারস্বরে শিবনাম কীর্তন করিতে করিতে শূলে আরোহণ করিল। কিছুক্ষণ পরেই অজ্ঞান হইয়া গেল। সে শূল তাহার দক্ষিণ স্কন্ধ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছিল। অজ্ঞান অবস্থাতেও অধরোষ্ঠ নড়িতেছিল, মনে হইতেছিল সে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছে। কেহ কেহ বলে, সে দুই-

একবার নাকি 'জয় গুরু' জয় গুরু'-ও বলিয়াছিল। তাহাকে বেশী কষ্ট পাইতে হয় নাই। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়।

কিঙ্করের যখন মৃত্যু হইল তখনও নিরঞ্জনা কিশোরী, তাহার বয়স তখন বারো বৎসর। বলা বাহুল্য, কিঙ্করের এই শোচনীয় মৃত্যু তাহার অন্তরে গভীর রেখাপাত করিল; কিন্তু তখন ইহা তাহার পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব ছিল যে, এই নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করিয়া কিঙ্কর প্রকৃত শান্তিলাভই করিয়াছে। বরং ঠিক বিপরীত কথাটাই সে যেন বুঝিয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল, সৎপথ মানেই বিপদসঙ্কুল পথ। ভাল লোক সর্বদাই বিপন্ন, তাহার কিছুতেই যেন নিস্তার নাই, অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে মরিতে হইবে। এই ব্যাপারের পর হইতে ধর্ম সম্বন্ধে তাহার কেমন যেন ভয়ই হইয়া গেল, সৎপথ তাহার নিকট ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল—ভাল পথে গিয়া দরকার নাই, এত কষ্ট আমি সহ্য করিতে পারিব না।

যৌবনে উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই তাহার প্রণয়ী জুটিয়াছিল। প্রতিবেশী ছোঁড়ার দল সুযোগ পাইলেই তাহার অনুসরণ করিত, এমন কি অনেক বৃদ্ধও তাহাকে প্রলোভন দেখাইত। এ জাতীয় প্রণয় ব্যাপাবে কিছু অর্থাগম হয়। সে অর্থ দিয়া সে প্রসাধনদ্রব্য, শাড়ি, অলঙ্কার প্রভৃতি কিনিত। ফলে, তাহাব পিতামাতা ক্রমশ তাহার উপর বিরূপ হইয়া উঠিলেন। তাহার উপার্জিত অর্থে একমাত্র তাঁহাদেরই ন্যায্য অধিকার কাছে—ইহাই তাঁহাদের ধারণা ছিল। নিরঞ্জনা বাহিরে কাটাইলেই তাঁহারা প্রত্যাশা করিতেন, উপার্জিত অর্থ সে তাঁহাদের আনিয়া দিবে। কিন্তু নিরঞ্জনা সব সময় দিত না, ফলে অশান্তির সৃষ্টি হইতে লাগিল। যোগিনী তাহাকে তিবস্কার করিতেন, প্রহার পর্যন্ত করিতেন। ফলে মাঝে মাঝে তাহাকে বাড়ির বাহিরে রাত কাটাইতে হইত। অনেক সময় নগরপ্রাকারের পার্শ্বে—যেখানে অন্ধ খঞ্জ ভিখারীর দল শ্বাপদ-সরীসৃপের সঙ্গে রাত্রি কাটায়—সেইখানে নিরঞ্জনাও রাত্রি কাটাইত। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কিঙ্কর ছিল না, অন্য কাহারও হাতে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতেও তাহার সাহস হইত না, সুতরাং পলায়ন করিয়াই তাহাকে আত্মরক্ষা করিতে হইতেছিল।

একদিন অত্যধিক প্রহৃত হইয়া সে নগর-সিংহদ্বারের নিকট বসিয়া রোদন করিতেছিল, এমন সময় এক প্রৌঢ়া মহিলা আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। প্রৌঢ়াকে দেখিলেই মনে হয়, এককালে তিনি অপরূপ রূপসী ছিলেন। ক্ষণকাল নিরঞ্জনাকে নিরীক্ষণ করিয়া সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "ওমা, সোনার প্রতিমা এমনভাবে ধুলোয় লুটোচ্ছে কেন! কার মেয়ে তুমি, তোমার বাপ-মা কোথা?"

নিরঞ্জনা কোনও উত্তর দিল না। আনত নয়নে চুপ করিয়া রহিল।

"কাঁদছিলে কেন বল তো? এমন চাঁদপানা মুখ, কিসের দুঃখ তোমার? তোমার বাপ-মা কোথা?"

এবার নিরঞ্জনা উত্তর দিল।

"আমার বাবা মাতাল, মা কৃপণ।"

"তারা তোমাকে মারধোর করে নাকি?"

নিরঞ্জনা মাথা নাড়িল। প্রৌঢ়া তখন এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর নিম্নকণ্ঠে কহিলেন, "বাপ-মা যদি অমন হয় কি দরকার তাদের কাছে থাকবার? আমার সঙ্গে যাবে? তোমাকে দেখে বড় ভাল লেগেছে আমার। আমার সঙ্গে চল তো, খুব যত্ন করে রাখব। আহা, কি চেহারা! যেন টগর ফুলটি! আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব তোমার। কি জাত তোমরা?"

"আমার বাবা বৌদ্ধ—"

"আমার ছেলে, নিজের মুখে বলতে নেই, ঠিক যেন রাজপুত্র। যদি আস আমার সঙ্গে, দেখতেই পাবে। যাবে?"

"যাব।"

সেই প্রৌঢ়ার সঙ্গে নিরঞ্জনা সেই দিনই পাটলিপুত্র ত্যাগ করিল এবং কিছুদিন পরে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রৌঢ়া মহিলাটি অন্য কেহ নহেন—বিখ্যাত নর্তকী মিশ্রকেশী, যাহাকে লোক সংক্ষেপে একদা মিশরি বলিয়া অভিহিত করিত। তাঁহার রূপ-যৌবন অন্তর্হিত হইয়াছিল, আর তিনি নাচিতে বা গাহিতে পারিতেন না, কিন্তু নৃত্য-বিদ্যা তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বিভিন্ন স্থান হইতে রূপসী বালিকা সংগ্রহ করিয়া তিনি তাহাদিগকে রীতিমত নাচ শিখাইতেন এবং তাহাবা পারদর্শিনী হইলে বড়লোকদের প্রমোদ-উৎসবে তাহাদের ভাড়া দিতেন। ইহাই তাঁহাব জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায় ছিল। নিরঞ্জনাকে দেখিবামাত্র তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইহাকে যদি ভাল করিয়া শিক্ষা দেওয়া যায়, নর্তকী হিসাবে ইহার ভবিষ্যৎ অত্যুজ্জ্বল। এমন অপরূপ দেহের গঠন, এমন লাবণ্য সচরাচর দেখা যায় না। ইহাও তাঁহার মনে হইয়াছিল, ইহাকে সত্যই যদি আপনার করিয়া লইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার ভবিষ্যৎও কম উজ্জ্বল হইবে না। নৃত্যগীত-পটিয়সী নিরঞ্জনার সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। সুতরাং তাহাকে তিনি কঠোরভাবে বেত্রহস্তে নৃত্য-গীত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। একটু বেসুরা বা বেতালা হইবার উপায় ছিল না, হইলেই তিনি বেত্রাঘাত করিতেন। নিরঞ্জনার অন্য কোথাও যাইবার উপায় ছিল না, মিশ্রকেশী সর্বদাই তাহার উপর কড়া নজর রাখিতেন। কিন্তু সে সর্বাপেক্ষা বেশী মুশকিলে পড়িয়াছিল মিশ্রকেশীর পুত্র শ্রীমন্তকে লইয়া। শ্রীমন্ত ছিল অদ্ভুত প্রকৃতির। সে যদি প্রেম করিত, নিরঞ্জনা হয়তো আপত্তি করিত না, কিন্তু সে প্রবৃত্তি তাহার ছিল না; কারণ সে ছিল অক্ষম পৌরুষহীন। কখনও সে কোনও স্ত্রীলোকের প্রেম অর্জন করিতে পারে নাই, যত স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে সে আসিয়াছিল সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিয়াছে। তাই স্ত্রীজাতির উপর সে জাতক্রোধ হইয়া উঠিয়াছিল। স্ত্রীলোকদের নির্যাতন করিয়াই সে আনন্দ পাইতে। নিরঞ্জনাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া সে নানাভাবে তাহাকে নির্যাতন করিতে লাগিল। সে নিরঞ্জনার গালে আঁচড়াইয়া দিত, চিমটি কাটিয়া তাহার বাহুমূলে ক্ষত সৃষ্টি করিত, কখনও কখনও পিছন হইতে ছুঁচও ফুটাইয়া দিত। তাহার মায়ের মতো সেও নিরঞ্জনার ভবিষ্যৎ যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিল, বুঝিতে পারিয়াছিল নিরঞ্জনা বহুভোগ্যা রূপজীবিনী হইবে। এই জন্য সে আরও হিংস্র হইয়া উঠিত,

ঈর্ষায় ক্ষোভে তাহার সমস্ত চিত্ত মথিত হইয়া যে বিষ উদগীরিত হইত তাহা ভয়ঙ্কর, তাহার একমাত্র প্রকাশ ছিল নির্যাতনে। নিরঞ্জনা তাহার না হইয়া অপরের হইবে ইহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য নির্যাতনের নব নব উপায় সে উদ্ভাবন করিত।

কিন্তু তাহার একটি গুণ ছিল। সে নাচের অদ্ভুত নকল করিতে পারিত, যে কোনও নাচের। যদিও তাহা বিকৃত নকল, কিন্তু মুখভঙ্গী দ্বারা এমন একটি রসের সৃষ্টি করিতে পারিত যাহা প্রকৃতই হাস্যরস এবং উপভোগ্য। শুধু হাস্যরসই নয়, মুখভাব এবং অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা সে সর্বপ্রকার ভাব, এমন কি গভীর প্রেমের ভাবও চমৎকার ফুটাইয়া তুলিতে পারিত। তাহার নিকট হইতে নিরঞ্জনা এই বিদ্যাটাও শিখিতে লাগিল। নারীবিদ্বেষী শ্রীমন্তের নিকট হইতে শেখা কিন্তু সহজ ছিল না। শিখাইবার ছলে সে কেবল নানা যন্ত্রণা দিত। নিরঞ্জনা কিন্তু দমিল না। বহুবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও সে নৃত্য, গীত এবং মূক অভিনয় এই ত্রিবিধ বিদ্যা শিক্ষা কবিতে লাগিল। কোনও নির্যাতনই তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। সে নির্যাতনে অভ্যস্তই ছিল, বাল্যকালে তাহার নিজের পিতা-মাতাই তো তাহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছিত করিয়াছেন। সুতরাং দৈহিক নির্যাতন তাহার পক্ষে নূতন কিছু ছিল না। সে সাগ্রহে শিক্ষা করিতে লাগিল। প্রৌঢ়া নর্তকী মিশ্রকেশীর কঠোর ব্যবহার সত্ত্বেও সে তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। কারণ তাঁহার ব্যবহার যতই কঠোর হউক না কেন, নৃত্যগীত-বিদ্যায় তিনি যে পারঙ্গমা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। নিবঞ্জনাকে তিনি যে অন্তরের সহিত শিক্ষা দিতেছেন, তাহাও নিরঞ্জনা বুঝিতে পারিত। সুতরাং তাঁহার পদ্ধতি যতই নিষ্ঠুর হউক, নিরঞ্জনা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল; কাবণ তাহার ভবিষ্যৎ তিনিই নির্মাণ করিয়াছিলেন।

নিরঞ্জনার যখন বয়স বাড়িল, নৃত্যে গীতে মূক অভিনয়ে সে-ও যখন পারদর্শিনী হইল, তখন মিশ্রকেশী তাহাকে ধনীদের উৎসব-সভায় পাঠাইতে লাগিলেন বলা বাহুল্য, অর্থের বিনিময়ে। এইখানেই মিশ্রকেশীর সর্বনাশের সূত্রপাত হইল। নিরঞ্জনা ধনী রসিকদের রসবোধকে তৃপ্ত করিতে লাগিল, ক্রমশ তাহার খ্যাতি বিস্তৃত হইল। বর্বর-প্রকৃতির ধনী কুশীদজীবীরা অনেক সময় উৎসবশেষে তাহাকে নিজেদের বাগান-বাড়িতে লইয়া যাইতে লাগিলেন। নিরঞ্জনা আপত্তি করিত না, কারণ সে তখনও প্রণয়ের আস্বাদ পায় নাই। অর্থমূল্যই তাহার নিকট পর্যাপ্ত ছিল।

একদিন কিন্তু এক অভিজাত বংশীয় যুবক তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। সে রাত্রে সে যুবকদের এক প্রীতি-সম্মেলনে নাচিতে গিয়াছিল। নৃত্য শেষ হইয়া গেলে নগর-কোটালের অনিন্দ্যকান্তি যুবক পুত্র যৌবন-উন্মাদনায় আত্মহারা হইয়া প্রণয়গদগদ ভাষায় সহসা তাহাকে সম্বোধন করিল। যাহা বলিল তাহা হাস্যকর, কিন্তু যুবকের মুখ দেখিয়া নিরঞ্জনার হাসি পাইল না। যুবক বলিল, "নিরঞ্জনা, আমি তোমার—সর্বতোভাবে তোমার। আমি তোমার মাথার মুকুট, অঙ্গের বসন, চরণের পাদুকা। তুমি তোমার পাদুকাকে যেমন পদদলিত করছ, আমাকেও তেমনি কর। আমার সোহাগই তোমার মুকুট হোক, আমার প্রেমই বসনের মতো

তোমার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে থাকুক। সুন্দরী নিরঞ্জনা, তুমি চল আমার সঙ্গে। আমার বাড়িতে চল। বাইরের পৃথিবী বাইরে পড়ে থাক্। পৃথিবীকে ভুলে যাও তুমি—"

নিরঞ্জনা যুবকটির দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, সত্যই সে রূপবান। তাহার ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল, মুখের গৌরবর্ণ তৃণবৎ সবুজ হইয়া গেল। তাহার সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, মনে হইল দৃষ্টির সম্মুখে যেন একটা মেঘ নামিয়া আসিতেছে যুবকের আমন্ত্রণ কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করিল। তাহার সহিত গেল না। যুবকের উন্মুখ-আগ্রহ, আন্তরিক অনুরোধ ব্যর্থ হইল। তখন সে তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া আলিঙ্গন করিতে গেল, তাহাতেও কোন ফল হইল না। নিরঞ্জনার মধ্যে যেন এক অজ্ঞাতপূর্ব দুর্দমনীয় শক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে বর্মাবৃত করিয়া দিল। নগর-কোটালের রূপবান পুত্র মৃগপতির অনুরোধ, আবেদন, বলপ্রয়োগ তুচ্ছ হইয়া গেল তাহার কাছে। সে দৃঢ়তার সহিত তাহার প্রেমোচ্ছ্বাসকে ব্যাহত করিয়া দিল। নিজের আচরণে নিজেই বিস্মিত হইয়া গেল সে।

নিরঞ্জনার ব্যবহারে অন্যান্য অতিথিরা বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। মৃগপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা তো যে কোনও নটীর পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। নিরঞ্জনার মতো সামান্য একটা নটী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল! তাঁহারা নিরঞ্জনার সুবুদ্ধির সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, মেয়েটা হয়তো পাগল।

মৃগপতিকে কিন্তু সে রাত্রে একাই ফিরিতে হইল। শুধু তাহাই নহে, সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইয়া প্রণয়জ্বরে সে জর্জরিত হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইতে লাগিল, নিরঞ্জনাকে না পাইলে সে আর বাঁচিবে না। পরদিন প্রভাতে সে প্রচুর পুষ্পসম্ভার লইয়া নিরঞ্জনার দ্বারদেশে পুনরায় যখন উপস্থিত হইল, তখন তাহার আকৃতি ভয়াবহ-- চোখের কোলে কালি, চুল বিস্রস্ত, মুখের বর্ণ মলিন। নিরঞ্জনা দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। কিন্তু সে দূরেই রহিল কাছে আসিল না। সেও কষ্ট পাইতেছিল, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছিল না—কষ্টটা কিসের, কষ্টটা কেন! নিজেকেই সে বারম্বার প্রশ্ন করিতেছিল, এ রকম হইল কেন, কেন তাহার কিছু ভাল লাগিতেছে না, একটা অনির্দিষ্ট বেদনা কেন সারা মন জুড়িয়া রহিয়াছে! তাহার প্রণয়ীর অভাব ছিল না, মৃগপতি ছাড়া আরও অনেকে তাহার দ্বারে হানা দিয়াছিল, কিন্তু সে কাহারও সহিত দেখা করিল না, সকলকেই বিদায় করিয়া দিল। কাহারও সান্নিধ্য সে যেন আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। সে ঘরের খিল পর্যন্ত খুলিল না, দিবালোককে পর্যন্ত ঘরে প্রবেশ করিতে দিল না। বিছানায় উপুড় হইয়া শুইয়া সমস্ত দিন কেবল কাঁদিল।

মৃগপতি ধনীর পুত্র। শুধু তাহাই নহে, গণ্যমান্য একজন রাজপুরুষের পুত্র সে। এত সহজে নিরস্ত হইবার লোক সে নয়। সে জোর করিয়া নিরঞ্জনার গৃহের দ্বার উন্মোচন করাইল। নিরঞ্জনাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবার ক্ষমতাও তাহার ছিল। কিন্তু ততটা সে করিল না। সে রসিক ব্যক্তি, সে জানিত জোর করিয়া দেহটাকে হয়তো স্বাধিকারে আনা যায়, কিন্তু মন পাইতে হইলে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। সে প্রত্যহ আসিয়া নিরঞ্জনাকে অনুনয় করিতে লাগিল, উপহারে উপহারে তাহার গৃহ ও সর্বাঙ্গ ভরিয়া দিল।

শেষে অবাধ্য শিশুকে লোকে যেমন স্নেহের ভর্ৎসনা করে তেমনি ভর্ৎসনাও তাহাকে করিল, ভয়ও দেখাইল। তবু কিন্তু নিরঞ্জনার হৃদয় কপাট খুলিল না। তাহার বাড়িতে যাইতে নিরঞ্জনা সহজে রাজী হইল না। পুরুষের প্রথম প্রণয়-স্পর্শে কুমারী যেরূপ ভীত হয়, সে নিজে একদিন যেমন হইয়াছিল, ঠিক তেমনি এক কুমারী-সুলভ ভয় তাহাকে পাইয়া বসিল। মৃগপতির সহস্রবিধ অনুনয়ের উত্তরে সে ক্রমাগত বলিতে লাগিল—না, না, না, না।

এক পক্ষ অতিবাহিত হইল, তখন সে নিজের অন্তর বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল সে মৃগপতির প্রেমে পড়িয়াছে, বুঝিতে পারিল অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহাকে ঘিরিয়া এক অপূর্ব স্বপ্নলোক নামিয়া আসিয়াছে। আর সে দ্বিধা করিল না। মৃগপতির সঙ্গে একদিন তাহার বাড়িতে গেল, আর ফিরিল না। যে জীবন তাহারা যাপন করিতে লাগিল তাহা মধুময়, স্বপ্নময়, অপূর্ব। পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহাদের যেন তৃপ্তি হইত না। কি যে বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইত না, পাইলেও ভাষা জুটিত না, শিশুদের মতো অর্থহীন অসংলগ্ন আলাপেই তাহাবা পরস্পরের মনের কথা বুঝিতে পারিত। সময়ের জ্ঞানও লোপ পাইয়াছিল। কখন গঙ্গার শুভ্র বালুসৈকতে, কখনও ঝাউবনে, কখনও রজনীর নিবিড় অন্ধকারে, কখনও জ্যোৎস্নার গভীর আবেশে তাহারা নিজেদের হারাইয়া ফেলিত, আবার ফিরিয়া পাইত। কখনও বা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া তাহারা পর্বতের সানুদেশে চলিয়া যাইত, সেখানে বন্যকুসুম চয়ন করিতে প্রভাত দ্বিপ্রহরের উত্তীর্ণ হইত তবু তাহাদের খেয়াল হইত না যে, বাড়ি ফিরিতে হইবে। একই পাত্র হইতে সুরাপান করিত তাহারা। নিরঞ্জনা যখন একটি আঙুর মুখে তুলিত তখন তাহার বিম্বাধরধৃত সেই আঙুরটিই মৃগপতি নিজ অধব দিয়া তাহার মুখ হইতে তুলিয়া লইত।

মিশ্রকেশী একদিন ক্রোধভরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মৃগপতিকে বলিলেন, "নিরঞ্জনা আমার কন্যা ও আমার নয়নের মণি, ওকে আমি দিতে পারব না। তুমি ওকে ছেড়ে দাও—"

মৃগপতি প্রচুর অর্থ দিয়া নয়নের মণির মূল্য শোধ করিয়া দিল। মিশ্রকেশী চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহাব লোভের অন্ত ছিল না। আরও অর্থের লোভে তিনি পুনরায় মৃগপতির বাসভবনে হানা দিলেন। মৃগপতি আর তাঁহাকে অর্থ দিল না, নগররক্ষকের সহায়তায় তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিল। বিচারের সময় আবিষ্কৃত হইল, তিনি বহু অপরাধে অপরাধিনী। বহু বালিকার তিনি সর্বনাশ করিয়াছেন। বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। তাঁহাব মৃতদেহ বন্য পশুদের নখদন্তে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল।

নিরঞ্জনা নিজের কল্পনার ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করিয়া মৃগপতিকে ভালবাসিয়াছিল। তাহার স্বভাবসুলভ শিল্পপ্রতিভা যেন কিছুকালের জন্য মৃগপতির মধ্যে চিরন্তন সত্যকে আবিষ্কার করিয়াছিল। সে যখন মৃগপতিকে বলিত, 'আমি চিরকাল তোমারই ছিলাম' তখন সে বাণী তাহার মর্ম হইতেই উৎসারিত হইত, তাহার মধ্যে কপটতা ছিল না। মৃগপতিও যখন বলিত, 'তুমি অনন্যা। তোমার মধ্যে আমি আর কাউকে কখনও দেখিনি' তখন তাহার মধ্যেও ভণ্ডামি ছিল না। একটা রঙীন স্বপ্ন তাহাদের ঘিরিয়া রাখিয়াছিল।

স্বপ্ন কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই ভাঙিয়া গেল। সহসা একদিন নিরঞ্জনা আবিষ্কার করিল, তাহার হৃদয় শূন্য, সে একাকিনী। তাহার স্বপ্নাচ্ছন্ন কল্পনা মৃগপতিকে যে রূপ অর্পণ করিয়াছিল তাহা সহসা অন্তর্ধান করিল, মৃগপতির রূপান্তর ঘটিল, তাহাকে আর সে যেন চিনিতে পারিল না। স্বপ্নলোক মেঘের প্রাসাদের মতো শূন্যে বিলীন হইল। ইহাতে নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেল সে। তাহার মনে হইল, মৃগপতির এ পরিবর্তন কেমন করিয়া ঘটিল। সে অসাধারণ অসামান্য ছিল, কোন মন্ত্রবলে সে সামান্য সাধারণ হইয়া গেল। যে প্রেমকে সে অমর ভাবিয়াছিল, তাহার প্রাণহীন শবমূর্তি দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

অবশেষে মৃগপতিকে ত্যাগ করিয়াই একদিন সে চলিয়া গেল। যে মৃগপতিকে সে মৃগপতির মধ্যে হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহাকেই আর কাহারও মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে—ইহাই হইল তাহার গোপন প্রেরণা। তাহার ইহাও মনে হইল, যাহাকে কখনও ভালবাসি নাই তাহার সঙ্গে বাস করা বরং কম দুঃখজনক, কিন্তু যাহাকে একদিন ভালবাসিয়াছি কিন্তু এখন আর বাসি না, বাসিতে পারি না, তাহার সহিত প্রেমহীন জীবন যাপন করা নিদারুণ।

সে আবার পথচারিণী হইল।

মন্দিরে মন্দিরে যে সব সেবাদাসী নগ্ন নৃত্য করিয়া দেবতা-পূজার ছলে কামুক ধনীদের বাসনা তৃপ্ত করে, গঙ্গাবক্ষে নৌকাবিহার করিয়া অথবা উদ্যানবাটিকায় প্রমোদে-উৎসবে মাতিয়া যাহারা রূপ যৌবনের পসরা পণ্যের মতো ফেরি করিয়া বেড়ায়, নিরঞ্জনা অবশেষে তাহাদেরই দলে যোগ দিল। প্রমত্তা নগরীর বিলাস-বসন কোনটাই সে বাদ দিল না, প্রমোদের ঘূর্ণাবর্তে সে আবর্তিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিল রঙ্গমঞ্চ। যে রঙ্গমঞ্চে নানা দেশ হইতে আগত নট-নটীরা সহস্র সহস্র লোলুপ দর্শকের চিত্তকে লোলুপতর করিয়া তোলে, সেই রঙ্গমঞ্চকে কেন্দ্র করিয়া তাহার স্বপ্ন আবার রঙীন হইয়া উঠিল।

সে নর্তকীদের, অভিনেত্রীদের—বিশেষ করিয়া যাঁহারা পৌরাণিক চরিত্রে বা দেবীদের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করিতেন তাঁহাদের—বিশেষ মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ করিত, কি নৈপুণ্যবলে, কোন মন্ত্রে তাঁহারা দর্শকদের হৃদয় হরণ করিয়াছেন! কিছুকাল পর্যবেক্ষণ করিবার পর তাহার ধারণা হইল, সুযোগ পাইলে সেও ভাল অভিনয় করিতে পারিবে। রঙ্গমঞ্চের মালিকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সে একদিন নিজের গোপন অভিলাষ ব্যক্তও করিয়া ফেলিল। তাহার অসামান্য রূপ ও অল্প বয়স দেখিয়া, মিশ্রকেশী সযত্নে তাঁহাকে যে নাচ গান মূক অভিনয় শিখাইয়াছিলেন তাহা দেখিয়া রঙ্গমঞ্চ স্বামী মুগ্ধ হইলেন। নিরঞ্জনা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল এবং নর্তকী তিষ্যরক্ষিতার ক্ষুদ্র ভূমিকায় একদিন অবতীর্ণও হইল।

তাহার অভিনয় মন্দ হয় নাই, কিন্তু তাহা লইয়া খুব একটা হৈ-চৈ হইল না। রঙ্গমঞ্চের অভিজ্ঞতা তাহার ছিল না। পূর্বার্জিত প্রশংসার অলৌকিক দ্যুতি পুরাতন অভিনেত্রীদের মস্তকে যে মহিমামুকুট পরাইয়া দর্শকদের উত্তেজিত করিয়া তোলে তাহা নিরঞ্জনা তখনও অর্জন করিতে পারে নাই, সুতরাং তাহার প্রথম অভিনয়-রজনীতে প্রেক্ষাগৃহ করতালিমুখরিত হইয়া উঠিল না। কিন্তু কয়েক মাস ছোট ছোট ভূমিকায় অভিনয় করিবার পর তাহার সৌন্দর্যের প্রভাবে রঙ্গমঞ্চ ক্রমশ প্রভাবিত হইল। শেষে এমন প্রবলভাবে প্রভাবিত হইল যে, সমস্ত নগরী চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহাকে দেখিবার জন্য সমস্ত ইন্দ্রপ্রস্থ যেন ভাঙিয়া পড়িল। নিরঞ্জনার বিপুল খ্যাতির টানে বড় বড় রাজপুরুষ এবং ধনী নাগরিকগণ তো গেলেনই, সামান্য মুটে মজুররাও আহারের পয়সা বাঁচাইয়া রঙ্গমঞ্চের প্রবেশমূল্য সংগ্রহ করিল নিরঞ্জনার উদ্দেশে কবিরা কবিতা লিখিলেন। গম্ভীর দার্শনিকরাও তাহার সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। যখন নিরঞ্জনার শিবিকা মন্দির বা মঠের পাশ দিয়া যাতায়াত করিত, তখন তাঁহারাও স্থির থাকিতে পারিতেন না, তাহাকে লইয়া অনেক সময় তাহার বিরুদ্ধেই অলঙ্কারময়ী বক্তৃতায় মুখরিত হইয়া উঠিতেন। ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীরা সাহস করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারিতেন না, মুখ ফিরাইয়া লইতেন। তাহার গৃহদ্বারে অগুরুচন্দনসুরভিত পুষ্পমাল্য স্তূপীকৃত হইতে লাগিল। তাহাকে লইয়া মাঝে মাঝে কলহও তুমুল হইয়া উঠিত, অনেক সময় শোণিতপাতও। বহু প্রণয়ী তাহার চরণকমলে অহরহ অজস্র স্বর্ণমুদ্রা ঢালিতে লাগিল, জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণেরাও পশ্চাৎপদ রহিলেন না, তাঁহাদের সযত্নসঞ্চিত ধনরাশিও নদীর স্রোতের মতো নিরঞ্জনার কামনা-সঙ্গমতীর্থের অভিমুখে প্রবাহিত হইতে লাগিল। নিরঞ্জনার চিত্ত প্রসন্ন হইল। জনসাধারণের চিত্ত জয় করিয়া গর্বে আনন্দে সত্যই সে বিজয়িনীর আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল। তাহার মনে হইল, স্বর্গের দেবতারাও বুঝি তাহার মস্তকে অদৃশ্য পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন। যে আত্মধিক্কার একদিন তাহার চিত্তকে বিষময় করিয়া রাখিয়াছিল তাহা অন্তর্হিত হইল। সকলের ভালবাসা পাইয়া সে নিজেকেও ভালবাসিতে শিখিল।

ইন্দ্রপ্রস্থের বিপুল অভিনন্দন কিছুদিন ভোগ করিবার পর একদিন একটা অদ্ভুত বাসনা তাহার মনে জাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল, পাটলিপুত্রে ফিরিয়া যাইবে। যেখানে একদিন তাহার বাল্যকাল নিদারুণ দুঃখে লজ্জায় দৈন্যে দুর্দশায় অতিবাহিত হইয়াছিল, যেখানে একদিন সে ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষীণকায় ক্ষুদ্র পতঙ্গের মতো পথে-প্রান্তরে পঙ্কে-পুষ্পে আহারের সন্ধানে ছুটিয়া বেড়াইয়াছিল সেইখানেই সে ফিরিয়া যাইবে আবার। খ্যাতি ও ঐশ্বর্যের তাহার অভাব ছিল না, সুতরাং ইচ্ছা অপূর্ণ রহিল না। সত্যই সগৌরবে সে একদিন পাটলিপুত্রে ফিরিয়া আসিল। পাটলিপুত্রও অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটি করিল না। নিরঞ্জনার খ্যাতি দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, রূপসী কলাকুশলা নর্তকী, প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী নিরঞ্জনাকে পাটলিপুত্র সাগ্রহে সম্বর্ধনা করিয়া তাহাকে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিল। পাটলিপুত্রেও তাহার অভিনয় দেখিবার জন্য রঙ্গমঞ্চে দর্শকদের ভীড় হইতে লাগিল, পাটলিপুত্রেও প্রণয়ীর অভাব

ঘটিল না। প্রণয়ীরা কিন্তু আর নিরঞ্জনাকে মুগ্ধ করিতে পারিল না, প্রণয়ীদের সম্বন্ধে তাহার মোহই কাটিয়া গিয়াছিল। আর কাহারও মধ্যে মৃগপতিকে ফিরিয়া পাইবার আশা তাহার আর ছিল না।

পাটলিপুত্রে যাঁহারা নিরঞ্জনার গৃহে প্রায় প্রত্যহই পদার্পণ করিতেন তাঁহাদের মধ্যে দার্শনিক সিন্ধুপতিও ছিলেন, যদিও তিনি নিজেকে 'নিষ্কাম' বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিতেন। অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াও তিনি পড়াশুনা ত্যাগ করেন নাই, তাঁহার আলাপ এবং ব্যবহারও ভদ্রজনোচিত ছিল। তাঁহার গভীর জ্ঞান বা উচ্চাঙ্গের ভাববিলাস কিন্তু নিরঞ্জনাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। তাঁহার প্রেমেও সে পড়ে নাই, বরং তাঁহার সূক্ষ্ম ব্যঙ্গোক্তিতে সে মাঝে মাঝে বিরক্তই হইত। আর একটা কারণও ছিল। সিন্ধুপতি ছিলেন সন্দেহবাদী, অলৌকিক বা অসম্ভব কোন কিছুতে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। নিরঞ্জনার সব কিছুতেই বিশ্বাস ছিল। সে ভগবানকে বিশ্বাস করিত, শয়তানকেও বিশ্বাস করিত। অদৃষ্ট মানিত, তুকতাক মানিত, পাপপুণ্যও মানিত। তপজপেও তাহার আস্থা ছিল। গোরক্ষনাথকে সে ভোলে নাই, মহাদেবের অস্তিত্বে তাহার বিশ্বাস ছিল। শুধু মহাদেবই নয়, বৌদ্ধ হিন্দু সমস্ত দেবদেবীকে সে মনে মনে শ্রদ্ধা করিত। কুসংস্কারও কম ছিল না— কুকুব বিড়াল কাঁদিলে সে ভীত হইয়া পড়িত, কাকের অশ্রান্ত চীৎকার বা পেচকের বিশেষ একটা ডাক তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিত। এমন কি বশীকরণেও তাহার বিশ্বাস ছিল। সে বিশ্বাস কবিত যে, রক্তাক্ত মেষলোমে পরিস্রুত সুরাপান করাইলে প্রণয়ী বশীভূত হয়। তাহার মনের প্রবণতাই ছিল ওইরূপ। অজ্ঞাত অসম্ভবের দিকে তাহার চিত্ত সর্বদাই যেন আশায় আশঙ্কায় উন্মুখ হইয়া থাকিত! মানহীন পরিচয়হীন কাহাকে যেন সে মনে মনে আহ্বান কবিত এবং অহরহ আশা করিত—সে আসিবে অপ্রত্যাশিতভাবে আসিবে। ভবিষ্যৎ ভীতিপ্রদ ছিল তাহাব কাছে। কিন্তু ওই ভবিষ্যৎকে জানিবার আগ্রহও কম ছিল না তাহার। বহু জ্যোতিষী, বহু যাদুকব, বহুতান্ত্রিককে সে প্রশ্রয় দিত। ইহাও সে বুঝিত যে তাহারা অনেকেই প্রতারক, তবু তাহাদেব দূর করিয়া দিতে পারিত না। মৃত্যুভয়ও প্রবল ছিল তাহার, সর্বত্র সে মৃত্যুর ছায়া দেখিতে পাইত। যখন সে বিলাসস্রোতে ভাসমান বা প্রণয়ীর বাহুপাশে নিষ্পিষ্ট, তখন সহসা তাহার মনে হইত কাহার তুষারশীতল অঙ্গুলি যেন তাহার স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিয়াছে সে চীৎকার করিয়া উঠিত।

সিন্ধুপতি তাহাকে আশ্বাস দিতেন ঃ "পলিতকেশে জরাজীর্ণ হয়ে অনন্ত অন্ধকারে চিরকালের মতো অবলুপ্ত হয়ে যাওয়াই যদি আমাদের নিয়তি হয়, আজকেব এই স্বর্ণকিরণোজ্জ্বল দিনই যদি আমাদের জীবনের শেষ দিন হয় তাতে হয়েছে কি? তাতে ভয় পাচ্ছ কেন? যতক্ষণ বেঁচে আছ জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করে নাও। ভোগের পরিমাপই জীবনের পরিমাপ। ছোট ভাবে ভয়ে ভয়ে সসঙ্কোচে যদি ভোগ কর, তোমার জীবনও ক্ষুদ্র শঙ্কিত সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির সমষ্টিই আমাদের বুদ্ধি, আর এই জীবনকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করারই অপর নাম তো প্রেম। যা আমরা জানি না, যা

জানবার উপায় নেই, যার আছে কি নেই বলা অসম্ভব— সে সব নিয়ে নিজেকে এমন করে কষ্ট দেওয়ার কোনও অর্থ হয় না—''

এ সব কথা শুনিয়া নিরঞ্জনার আশ্বস্ত হইত না, রাগিয়া উঠিত।

সিন্ধুপতির বক্তৃতার প্রত্যুত্তরে সে ক্রোধভরে বলিত, 'আপনারা সুবিধাবাদী ভীরু, তাই নাস্তিকতার ভান করে সব জিনিস এড়িয়ে যেতে চান। আশা করাবার সাহস নেই আপনাদের, অনিবার্যকে ভয় করবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। আপনাদের এ আস্ফালন একটুও ভাল লাগে না আমার। আমি আপনাদের মতো এড়িয়ে যেতে চাই না। আমি জানতে চাই, জানতে চাই—''

জীবনের রহস্য জানিবার জন্য সে নানাবিধ দর্শনের পুস্তক পড়িত। কিন্তু কিছুই বুঝিত পারিত না। শৈশবের অতীত জীবন মনে পড়িত তাহাব শৈশবের কথা বহুবার বহুরূপে ভাবিত সে। ভাবিতে তাহার ভাল লাগিত। অনেক সময় ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সে সেই সব গলিতে, সেই সব পান্থশালায় অথবা নদীতীবের সেই সব স্থানে বিচবণ করিয়া বেড়াইত, যেখানে একদিন অতি দুঃখে তাহার শৈশব কাটিয়াছিল। স্থানগুলির পূর্বরূপ আর ছিল না, অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, অনেক স্থানের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। তবু তাহারই মধ্যে সে নিজের শৈশবের দিনগুলির সন্ধান করিত। তাহার পিতামাতার মৃত্যু তাহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিত, কিন্তু পিতামাতাকে সে যে ভালবাসিতে পাবে নাই— এ বেদনাব কোন সান্ত্বনাই সে খুঁজিয়া পাইত না।

একদিন রাত্রে এক কৃষ্ণ পবিচ্ছদে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া কৃষ্ণ অবগুণ্ঠনে নিজেব কুঞ্চিত চিকুরদাম ঢাকিয়া সে পাটলিপুত্র নগরীর উপান্তে একাকী ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল। ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে সে একটি মন্দিবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। শুনিতে পাইল মন্দিরের ভিতর শিবস্তোত্র পাঠিত হইতেছে—

প্রভুমীশ-মনীশ-মশেষ গুণং
গুণহীন মহীশ-গণাভরণং
রণ-নির্জিত-দুর্জয়-দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম।

তখন শৈব-নির্যাতন অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল, শৈবগণ নির্ভয়ে তখন প্রকাশ্যে নিজেদের ধর্মানুষ্ঠান করিতে পারিতেন। নিরঞ্জনা উৎকর্ণ হইয়া গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠ নিঃসৃত স্তোত্রপাঠ শুনিতে লাগিল। মন্দিরের বদ্ধ দ্বারের ভিতর দিয়া উজ্জ্বল আলোক দেখা যাইতেছিল। নিরঞ্জনা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বদ্ধ দ্বার ঠেলিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। নিরঞ্জনা ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বহু লোক সমবেত হইয়াছে। শুধু পুরুষ নয়, বহু স্ত্রীলোকও আছে, বালক বালিকাও অনেক। শিবস্তোত্রের পবিত্র সূত্রে সকলেই যেন পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। যুবক-যুবতী প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, এমন কি বালক-বালিকারাও মুদিত নয়নে নতজানু হইয়া এক বিরাট সমাধির সম্মুখে আবেগভরে শ্রদ্ধাপূত চিত্তে স্তোত্র পাঠ করিতেছে। সমাধিটি নিষ্কলঙ্ক শ্বেত-প্রস্তরনির্মিত, বিল্বপত্রে ও ধুস্তুরপুষ্পে সজ্জিত। অগুরু ধূপের গন্ধ মন্দিরের বায়ুমণ্ডলকে মন্থর করিয়া তুলিয়াছে। চতুর্দিকে অসংখ্য ঘৃত-প্রদীপ জ্বলিতেছে। মন্দিরগাত্রে শিবপুরাণের

বহু কাহিনী চিত্রে উৎকীর্ণ। কোথাও নটরাজ মূর্তি, কোথাও সতীশব স্কন্ধে তাণ্ডবনৃত্যমত্ত ধূর্জটি, কোথাও তিনি মদনভস্ম করিতেছেন, কোথাও বা আবার কিরাতবেশে অজুর্নের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত, কোনও চিত্রে বিষপান করিতেছেন, কোথাও বা প্রসন্ন হাস্যে বরদান করিতেছেন তপস্বিনী অপর্ণা উমাকে। স্তবগান সহসা থামিয়া গেল। গৈরিকবসনপরিহিত পুরোহিতগণ প্রণত হইলেন। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই প্রণত হইল। নিরঞ্জনার মনে হইল, এই মন্দিরের অপূর্ব পরিবেশে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছে, নিবিড় আনন্দের সহিত নিবিড় বেদনার মধুর সংমিশ্রণ, জীবনের আনন্দ এবং মৃত্যুর বিভীষিকা সঙ্গীতে ভঙ্গীতে ভক্তিতে শক্তিতে ওতপ্রোতভাবে মিলিয়া যেন এক হইয়া গিয়াছে।

তাহার পর ভক্তগণ উঠিয়া সমাধিটিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। নিরঞ্জনা লক্ষ্য করিল, ইহারা কেহই ধনী নহে, সকলেই সামান্য লোক, চেহারা দেখিলে মনে হয় সকলেই কায়িক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করে। তাহাদের আড়ম্বরহীন সরলতা নিরঞ্জনাকে মুগ্ধ করিল। তাহাদের দৃষ্টির স্বচ্ছতা, মুখের শিশুসুলভ কমনীয়তা মন্দিরের পবিত্রতাকে যেন পবিত্রতর করিতেছিল। সকলেই একে একে সমাধিকে প্রণাম কবিযা চলিয়া যাইতে লাগিল। জননীরা ছোট ছোট শিশুদেরও দুই হাতে তুলিয়া তাহাদের মাথা সমাধির সম্মুখে নত করাইয়া দিল।

নিরঞ্জনা একজন পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কেন আজ এখানে এসেছেন? এখানে কি বিশেষ কোনও উৎসব ছিল?"

পুরোহিত উত্তর দিলেন, "ভদ্রে, আজ আমরা পরমশৈব কিঙ্করের স্মৃতিপূজা করতে এসেছি। তিনি শৈব ছিলেন—এই অপরাধে সেকালের বৌদ্ধ রাজপুরুষদের রোষদৃষ্টিতে পড়েছিলেন। মিথ্যা অপরাধের ছলে তাঁরা তাঁকে এই স্থানে শূলবিদ্ধ করে হত্যা করে। তিনি হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মত্যাগ করেননি। তাঁরই স্মৃতিপূজা করবাব জন্য আজ আমরা সমবেত হয়েছি। এটি তাঁরই সমাধি—"

নিরঞ্জনা নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার নয়ন দুইটি কখন যে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারে নাই। যখন সে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল, দেখিল পুরোহিত চলিয়া গিয়াছেন। তখন ধীরে ধীরে সেও জানু পাতিয়া সমাধির সম্মুখে বসিল এবং প্রণাম করিল। অর্ধবিস্মৃত কিঙ্করের মুখচ্ছবি তাহার মানসপটে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। মন্দিরের পবিত্র পরিবেশে, অগুরু চন্দনের গন্ধে, ফুলের শোভায়, প্রদীপের আলোকে সে ছবি ধীরে ধীরে মহিমময় হইয়া উঠিল।

নিরঞ্জনার মনে হইল—কিঙ্কর ভাল লোক ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ সে যে-লোকে উত্তীর্ণ হয়েছে তাহার গুরুত্ববিচার সাধারণ ভালমন্দের মানদণ্ডে করা যায় না। আজ সে মহৎ, আজ সে সুন্দর। তাহার স্থান আজ মানবতার বহু ঊর্ধ্বে। কোন শক্তিবলে সে এত ঊর্ধ্বে উঠিল? কি সে শক্তি যাহা পার্থিব ধনসম্পদকে অবহেলা করিয়া, দৈনিক প্রমোদ-বিলাসকে তুচ্ছ করিয়া মানুষকে চিরন্তন মহানন্দলোকে উত্তীর্ণ করিযা দেয়? কিঙ্কর কি পাইয়াছিল? সে আর দূরে বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া গিয়া সমাধিপ্রস্তরের খুব নিকটে আসিয়া

দাঁড়াইল। কিঙ্কব তাহাব যে চোখ দুইটি ভালবাসিত সেই চোখে অশ্রুবিন্দু টলমল কবিতেছিল সহসা ঘৃতপ্রদীপেব কিবণ ছটায় সেই অশ্রুবিন্দু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। নিবঞ্জনা পুনবায় জানু পাতিয়া বসিল, বহু কামনাব উদয় অবসানেব লীলাপীঠ সে অধব, সেই অধব শীতল প্রস্তবে সংলগ্ন কবিয়া সে পবম শৈব কিঙ্কবেব সমাধিকে শ্রদ্ধাভবে চুম্বন কবিল

বাড়ি ফিবিয়া দেখিল, সিন্ধুপতি তাহাব অপেক্ষায় বসিয়া বহিয়াছেন। অঙ্গে তাঁহাব অভিসাবেব বেশ। বেশ সুবভিত, অঙ্গে স্বর্ণাভ বেশমেব অবিন্যস্ত অঙ্গচ্ছেদ। তিনি নীতিবিষযক একটি পুস্তক পাঠ কবিতেছিলেন নিবঞ্জনাকে দেখিয়া দুই বাহু প্রসাবিত কবিয়া তিনি আগাইয়া আসিলেন।

"কি কষ্টই দিয়েছ তুমি আমাকে আজ।" সিন্ধুপতিব কণ্ঠস্বরে হাসিব লহব খেলিয়া গেল। "তোমাব অপেক্ষায বসে বসে আমি কি কবছিলাম জান? এই শুষ্ক কঠোব নীতিব বইটাব পাতা ওলটাচ্ছিলাম। কিন্তু এই নীতিব মধ্যেও অদ্ভুত সব জিনিস আমি আবিষ্কাব কবেছি। ধর্ম উপদেশ নয়, অহঙ্কাবেব স্বরূপনির্ণয়ও নয় এই নীবস বইটাব পাতায় আমি আবিষ্কাব কবেছি অসংখ্য নিবঞ্জনাকে। তাবা সব আকাবে ছোট ছোট, আমাব আঙুলেব চেয়ে কেউ বেশী বড় হবে না। কিন্তু কি তাদেব রূপ কি তাদেব মহিমা! মনে হল এক তুমিই যেন বহু রূপ ধবে এসেছ কাবও অঙ্গে স্বর্ণখচিত বস্ত্রাম্বব, কেউ স্বচ্ছ শুভ্র মেঘেব স্বপ্নে ভাসমান কেউ বা শ্বেত পাথবেব প্রতিমাব মতো নগ্ন। ভাষাহীনা এবং সেই জন্যেই যেন উদ্ভাসিত। সবশেষে দেখলাম তাদেব মধ্যে দুজনে হাত ধবাধবি কবে সামনে এসে দাঁড়াল দুজনে দেখতে ঠিক একবকম, তফাত বোঝা যায় না। দুজনেই আমাব দিকে চেয়ে হাসলে। একজন বললে, 'আমি প্রেম' আব একজন বললে 'আমি মৃত্যু'।"

এই সব বলিতে বলিতে নিবঞ্জনাকে তিনি বাহুপাশে আবদ্ধ কবিলেন। নিবঞ্জনাব চোখেব ঘৃণাব্যঞ্জক তীব্র দৃষ্টি লক্ষ্য কবিলে তিনি হয়তো থামিয়া যাইতেন কিন্তু তাহা লক্ষ্য না কবিয়া তিনি নিজেব কবিত্বই আস্ফালন কবিতে লাগিলেন। বুঝিতে পাবিলেন না যে, তাঁহাব একটি কথাও নিবঞ্জনাব হৃদয স্পর্শ কবিতে পাবিতেছে না

তিনি বলিয়া চলিলেন "আমি যখন পড়ছিলাম 'আত্মসংযম থেকে কখনও ভ্রষ্ট হওযা উচিত নয' তখন আমি তাব অর্থ কবছিলাম 'নিবঞ্জনাব চুম্বনমদিবা অগ্নিব চেয়েও তপ্ত, মধুব চেয়েও মিষ্ট'। আমাব মত দার্শনিকেব এ মতিভ্রম কেন হয়েছে জান? তোমাবই জন্য। তুমিই নীতিশাস্ত্রেব নূতন ভাষা সৃষ্টি কবেছিল আমাব মনে। তোমাব ভিতব দিয়েই আমি নিজেকে আবিষ্কাব কবেছি নিত্য নূতনরূপে– "

নিবঞ্জনা কিছুই শুনিতেছিল না। তাহাব মন তখনও কিঙ্কবেব সমাধিব নিকট ঘুবিযা বেড়াইতেছিল। কিঙ্কবেব কথা স্মবণ কবিযাই তাহাব দীর্ঘশ্বাস পড়িল। দীর্ঘশ্বাসে চমকিত হইযা সিন্ধুপতি তাহাব মুখটা তুলিযা ধবিযা চুম্বন কবিলেন।

"দীর্ঘশ্বাস কেন? এমন মন-মবা হয়ে আছ কেন বল তো? এই বাস্তব পৃথিবীটাকে ভুলে থাকতে পাবলেই তো সুখ। ভোলবাব উপাযও জানি আমবা। তবে দেবি কবছ কেন? এস জীবনেব সুখ দুঃখকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাই আমবা। এস না, অমন কবছ কেন? তোমাব

প্রেমের তরঙ্গে অবগাহন করবার আশায় কতক্ষণ ধরে বসে আছি। আমার দেহের প্রতি পরমাণু তৃষিত হয়ে রয়েছে—"

এইবার নিরঞ্জনা ক্ষেপিয়া উঠিল।

"প্রেম? ও কথা উচ্চারণ করবেন না আর । আপনি কখনও কাউকে ভালবাসেননি। আমিও আপনাকে ভালবাসি না। না, না, বাসি না। আমি আপনাকে ঘৃণা করি। আপনি চলে যান এখান থেকে। এখনি চলে যান। আপনার মতো অলস, কামুক ধনীদের ঘৃণা করি আমি। চলে যান আপনি এখান থেকে। যারা দরিদ্র তারাই ভাল, তাবাই মহৎ। আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন কিঙ্কর বলে এক চাকব ছিল আমার। সে শৈব ছিল বলে বৌদ্ধনামধারী কতকগুলো পিশাচ ধনী হত্যা কবেছিল তাকে। সে-ই ভালবাসত আমাকে, সে-ই জানত প্রেম কাকে বলে। আপনি প্রেমেব কি জানেন? আপনি তার পায়ের নখেরও যোগ্য নন। এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যান আপনি। আমি আর আপনার মুখদর্শন করব না—"

নিবঞ্জনা ঘরের মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইল সে। মনে মনে সংকল্প কবিল, এইবার কিঙ্করের আদর্শ অনুসরণ করিবে সে।

কিন্তু সঙ্কল্প করা সহজ, সে অনুসারে কাজ কবা কঠিন। প্রভাতে উঠিয়াই আবাব সে পূর্বের জীবনস্রোতে গা ভাসাইয়া দিল। যে সব বিলাসের আয়োজন পূর্ব হইতেই করা ছিল, তাহা লইয়াই সে আবার মাতিয়া উঠিল। কিছুদিন হইতে আর একটা বিষয়ে সে সচেতন হইয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল, রূপযৌবন বেশীদিন থাকিবে না। যতদিন থাকে ততদিন যতটুকু সুখভোগ কবা যায় ততটুকুই তো লাভ। রূপযৌবনের বিনিময়ে যতটা গৌরব আহরণ করিতে পাবা যায় ততটুকু আহরণ করিবার জন্য তাই সে ব্যগ্র হইয়া উঠিল—তাহার অভিনয় আরও নিখুঁত হইল। ভাস্কর চিত্রকর কবিদের কল্পনাকে সত্যই যেন সে রঙ্গমঞ্চে জীবন্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার অঙ্গচালনার ভঙ্গীতে এমন একটি সংযত নিখুঁত সঙ্গতিময শাশ্বত রূপ মূর্ত হইয়া উঠিত যে মনে হইত, ঠিক যতটুকু শোভন ততটুকু সে ব্যক্ত করিতেছে। বসিক ও গুণীরা বলিতেন, "নিরঞ্জনা শুধু শিল্পীই নয়। গণিতেও পারদর্শিনী।" যাহারা অজ্ঞ দরিদ্র অবনত ভীত তাহাদের সম্মুখে নিরঞ্জনা আত্মপ্রকাশ করিল, কিন্তু ভিন্নভাবে। তাহার অজস্র দানে অভিভূত হইয়া তাহারা তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া যাইত। তাহার যশেব সৌরভে দশদিক যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু তবু তাহার মনে সুখ ছিল না। মানসিক অশান্তি কিছুতেই যেন দূর হইতেছিল না, মৃত্যুভয় বাড়িতেছিল। তাহার রমনীয় প্রাসাদ, কমনীয় কানন পাটলিপুত্রের গৌরবস্থল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু প্রাসাদ-বাসিনীর কানন বিহারিণী মনে শান্তি ছিল না।

বিদেশ হইতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সে বহু রকম দুর্লভ গাছ আনাইয়া নিজের বাগানে লাগাইয়াছিল। একটি কৃত্রিম নদীও সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহাদের মূলে জলসেচন করিবার জন্য কৃত্রিম হ্রদও ছিল একটি। হ্রদের চারিদিকে নিপুণ শিল্পীরা ঐতিহাসিক প্রাচীন স্তম্ভশ্রেণীর অনুকরণ করিয়া একটা পৌরাণিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন যেন। বহু মর্মরমূর্তিও ছিল।

মনে হইত একদল নগ্না রূপসী নানা ভঙ্গীতে যেন হ্রদের জলে নিজেদের প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছে।

শিলা নিবাসটি ছিল এই বাগানের মধ্যেই। শিলা নিবাস না বলিয়া অপ্সরী-নিবাস বলিলে যেন আরও শোভন হইত, কারণ বহুমূল্য মর্মর-নির্মিত গৃহটির ঠিক দ্বারদেশে তিনটি অপরূপ অপ্সরীর মূর্তি ছিল। শিল্পী তাহাদের এমনভাবে গড়িয়া ছিলেন যে মনে হইতেছিল, তিনটি তরুণী স্নানের পূর্বে গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেলিতেছেন এবং পাছে কেহ তাঁহাদের দেখিয়া ফেলে এই আশঙ্কায় ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতেছেন, নিকটে কেহ আছে কিনা। মূর্তি তিনটি যেন জীবন্ত।

সম্মুখেই হ্রদের নীল জল। সেই নীল জলে প্রতিফলিত আলোকই শিলানিবাসকে আলোকিত করে। ঘরের ভিতর যে আলো প্রতিফলিত হয়, তাহা কোমল নীলাভ দেওয়ালে নানা রূপ ছবি মুকুট মাল্য বিলম্বিত ছিল। ছবিগুলি নিরঞ্জনারই নানা ভঙ্গীর ছবি বিবিধ প্রকার মুখোশও টাঙানো ছিল— কোনটা সুন্দর, কোনটা বা বিষাদময়। তাছাড়া ছিল রঙ্গ মঞ্চের বহু দৃশ্যের বহু আলেখ্য। অদ্ভুত জন্তুর ছবিও ছিল— অদ্ভুতাকৃতি বামন, ভীষণাকৃতি দৈত্য, মানব এবং পশুর সমন্বয়ে প্রকৃতির নানারূপ মূর্তি ও চিত্রও ছিল কোথাও কোথাও। গৃহের মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র নিকষ স্তম্ভের উপর ছিল পুষ্পধনু মদনের মনোহর একটি মূর্তি, - অপরূপ মূর্তি, হস্তিদন্তনির্মিত। সিন্ধুপতি এটি উপহার দিয়াছিলেন। এক স্থানে কুলুঙ্গিতে ছিল কষ্টিপাথরে নির্মিত একটি ছাগজননীর মূর্তি, ছয়টি শাবক তাহার স্ফীত স্তনের নিকট উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, ছাগী ঘাড় বাঁকাইয়া সম্মুখের পা দুইটি তুলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। ঘরের মেঝেতে কাশ্মীরী শাল পাতা রহিয়াছে, মাথার বালিশগুলি সিংহচর্মনির্মিত, তাহার উপর অদ্ভুত কারুকার্য। ঘরের কোণে কোণে স্বর্ণপাত্রে রক্ষিত আতর সমস্ত ঘরটিকে সুরভিত করিয়া রাখিয়াছে, পিছন দিকের দেওয়ালে একটি বিরাট কাছিমের খোলা ঠেসানো রহিয়াছে, তাহাতে অসংখ্য সোনার পেরেক ঠোকা। বিশাল কূর্মটি ভারত সমুদ্রে ধরা পড়িয়াছিল। কূর্মটি এত বৃহৎ যে তাহার পৃষ্ঠাবরণটি দিয়ে নিরঞ্জনার খাট প্রস্তুত হইয়াছে। দিনের বেলা খাটটি দেওয়ালে ঠেসানো থাকে। কল্লোল ছন্দিত, পুষ্পবিচিত্র, গন্ধমদির এই পরিবেশে নিরঞ্জনা প্রত্যহ এই কূর্মশয্যায় বিশ্রাম করে। রাত্রির আহারের পূর্বে হয় সে এখানে একা থাকে কিংবা কোনও বিশেষ বন্ধুর সহিত গল্প করে। রঙ্গমঞ্চের চিন্তা ছাড়া আর একটি চিন্তা সম্প্রতি তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। ইহার কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রতিদিন বয়স বাড়িতেছে—এই নিদারুণ সত্যটা ক্রমশ যেন তাহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।

সেদিন দ্রৌপদীর অভিনয় করিবার পর নিরঞ্জনা শিলা নিবাসে বিশ্রাম করিতেছিল। দৃষ্টি কিন্তু নিবদ্ধ ছিল দর্পণে। নিজের ক্রমশ ক্ষীয়মাণ রূপের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে ভাবিতেছিল, এইবার ক্রমশ মুখে জরার চিহ্ন দেখা দিবে, মাথার চুলও ক্রমশ পাকিবে। বিশেষ কোন মন্ত্রপাঠ করিয়া অথবা বিশেষ কোনও ঔষধ বা ধূপের ধোঁয়া এই অনিবার্য পরিণামের গতিরোধ করিবে—এই অলীক স্তোকবাক্যে তাহার মন আর প্রবোধ মানিতেছিল না। অহরহ কে যেন মনের ভিতর বসিয়া বলিতেছিল, নিরঞ্জনা, তোমার যৌবন আর থাকিবে না, তুমিও বৃদ্ধা হইবে।

তাহার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম দেখা দিয়াছিল। কিন্তু দর্পণে আর একবার স্নেহভরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সে যেন একটু আশ্বস্ত হইল। মনে হইল, পরে যাহাই হউক, তাহার রূপ এখনও কিন্তু অম্লান আছে, এখনও যাহা আছে তাহা বহু লোকের মাথা ঘুরাইয়া দিতে পারে। কথাটা মনে হইতে তাহার মুখে মৃদু হাসি ফুটিল। দর্পণকে সম্বোধন করিয়া মৃদুকণ্ঠে সে বলিল 'এত বড় পাটলিপুত্রে আমার মতো আর কে আছে? আমার মতো কমনীয় নমনীয়তা আর কারো আছে কি, এমন লীলায়িত গতিভঙ্গী, এমন অপরূপ বাহুবল্লরী? তুমি কি জান না বাহু বল্লরীই প্রেমের নিগড় রচনা করে?'

সহসা তাহার চিন্তাধারা ব্যাহত হইল। দেখিল সম্পূর্ণ অপরিচিত অদ্ভুত এক ব্যক্তি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চক্ষু জ্বলন্ত, শ্মশ্রু অবিন্যস্ত, কিন্তু অঙ্গে মহার্ঘ পরিচ্ছদ। দর্পণ ফেলিয়া সে আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল।

সার্বর্ণি নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। রূপসী নিরঞ্জনাকে দেখিয়া তাহার অন্তর মথিত করিয়া নীরবে প্রার্থনা উত্থিত হইতেছিল ভগবান, এই অপূর্ব সৌন্দর্য আমার চিত্তকে যেন কলুষিত না করে, ইহার স্পর্শে আমি যেন ধন্য হই।

একটু ইতস্তত করিয়া অবশেষে তিনি কথা কহিলেন।

বলিলেন, "নিরঞ্জনা, অনেক দূর থেকে আমি এসেছি। তোমার সৌন্দর্যের খ্যাতি আমাকে তোমার কাছে টেনে এনেছে শুনেছি তুমি অদ্বিতীয়া অভিনেত্রী, অনুপমা মোহিনী, তোমার আকর্ষণে উদ্বেলিত জনসমুদ্র নাকি তোমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে। তোমার ঐশ্বর্যের খ্যাতি, প্রেমের কাহিনী ঠিক যেন রূপকথার মতো। মনে হয় যেন পৌরাণিক ধীবরকন্যা সত্যবতী নব কলেবর ধারণ করে বহু পরাশরের হৃদয় হরণ করছ। তাই আমি এসেছি শুধু তোমাকে দেখতে নয়, তোমার পরিচয় লাভ করবার জন্যে। যা স্বচক্ষে দেখলাম তাতে মনে হচ্ছে জনশ্রুতি তোমাকে সম্যক মর্যাদা দিতে পারেনি। যা শুনেছিলাম দেখছি তুমি তার চেয়ে সহস্রগুণ বেশী সুন্দর। শুধু রূপের নয়, বুদ্ধির দীপ্তিও তোমার মুখমণ্ডলকে আরও সুন্দর করেছে। তোমার কাছে এসে এ ভয়ও আমার হচ্ছে যে, আরও কাছে গেলে আমি মাথা ঠিক রাখতে পারব না আমার মতো তপস্বীরও হয়তো হিতাহিতজ্ঞান লোপ পাবে। অর্থাৎ এ কথাটা আমি অনুভব করছি যে, তোমার কাছে এলেই আবিষ্ট হয়ে পড়তে হয় -তোমার আকর্ষণী শক্তি দুর্বার।"

সার্বর্ণি ব্যঙ্গের সুরে কথাগুলি বলিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যাহা বলিলেন, তাহা প্রণয়ীর উচ্ছ্বাসের মতো শুনাইল। তিনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কথাগুলি শুনিয়া নিরঞ্জনার কিন্তু রাগ হইল না। সার্বর্ণিকে দেখিয়া প্রথমে সে ভয় পাইয়াছিল বটে, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিবার পর সে বিস্মিত হইল। বন্য বর্বরের মতো কে এই লোকটা? চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি গম্ভীর কিন্তু আগ্রহপূর্ণ। এ রকম সমন্বয় তো প্রায় দেখা যায় না। তাহার কৌতূহল হইল। প্রত্যহ যে সব লোকের ভীড় দেখা যায় এ লোকটি তো তাহাদের কাহারও মতো নয়। বেশ একটা স্বাতন্ত্র্য আছে।

ব্যঙ্গের সুরে নিরঞ্জনা উত্তর দিল।

"আগন্তুক অত সহজে আকৃষ্ট হয়ো না। আমার রূপের বহ্নি অনেককে পুড়িয়েছে, হয়তো তোমাকেও পোড়াবে। আমার দিকে আকৃষ্ট হওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। লোকে বলে, আমি সর্বনাশিনী।"

সাবর্ণি ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। তাহার পর আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "আমি তোমাকে ভালবেসেছি নিরঞ্জনা। আমি তোমাকে জীবনের চেয়ে এমন কি নিজেব আত্মার চেয়েও বেশী ভালবাসি। তোমার জন্য আমি তপস্যা ত্যাগ করে এখানে এসেছি, নিজের ব্রত ভঙ্গ কবে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে যে সব কথা উচ্চারণ করছি তা কোন তপস্বীর পক্ষে গৌরবের নয়। আমার যা দেখা উচিত নয় তাই দেখেছি, যা শোনা উচিত নয় তা শুনেছি। সত্যিই আমার আত্মাকে বিচলিত করেছ তুমি। মনে হচ্ছে হৃদয় দুয়ার সম্পূর্ণরূপে খুলে গেছে, উন্মুক্ত হৃদয়দ্বার দিয়ে নির্বারিত ধারায় মনের ভাবধারা বেরিয়ে পড়ছে, ঠিক যেন ঝরনাধারার মতো। মনে হচ্ছে সে ঝরনাধারায় বন্য কপোত-কপোতীরা বুঝি তৃষ্ণা জল পাবে। হিমালয়ের অরণ্য অতিক্রম করে পায়ে হেঁটে তোমার জন্য আমি এসেছি। দিবারাত্রি হেঁটেছি অসীম কষ্ট সহ্য করে হেঁটেছি। পথে কঙ্কর কর্দম বৃশ্চিক কণ্টক সর্প কি না ছিল। কিন্তু আমি কিছুই গ্রাহ্য করিনি। অন্তরে প্রেম না থাকলে এ অসাধ্য সাধন আমি করতে পারতাম না। সত্যিই আমি তোমাকে ভালবেসেছি নিরঞ্জনা। কিন্তু আমার কথা শুনে একটা ভুল তুমি করো না। কামেব তাড়নায় যারা তোমার কাছে ক্ষিপ্ত কুক্কুর বা মত্ত ষণ্ডের মতো ছুটে আসে, আমাকে তাদেব দলে ফেলো না। সিংহ হরিণকে যে কারণে ভালবাসে, তারাও ঠিক সেই কারণেই তোমাকে ভালবাসে। তাদেব কামক্লিন্ন প্রেম তোমার আত্মাকে গ্রাস করছে প্রত্যহ। আমি যে প্রেম নিয়ে তোমার কাছে এসেছি তাতে কামগন্ধ নেই— তা পবিত্র, তা আধ্যাত্মিক, মহেশ্বরের বিরাট সত্তার একটা অংশরূপে তোমাকে ভালবেসেছি, এ ভালবাসার নামই স্বর্গীয় প্রেম, এর তুলনা নেই। এ প্রেম একটি মধু রজনীতেই শেষ হয়ে যাবে না, এ প্রেম সত্যশিবসুন্দরের নিত্য উৎসবেব অঙ্গ হয়ে থাকবে। এ প্রেম অবর্ণনীয়, অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য--"

নিরঞ্জনার চোখে মুখে একটা সকৌতুক হাসি ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল, সাবর্ণির বক্তৃতা তাহার মনে রেখাপাত পর্যন্ত করে নাই। হাসিয়া বলিল, "তা হলে দেখাও কোথায় তোমার সেই প্রেম। বিলম্ব করো না। আর বক্তৃতা দিও না। বক্তৃতা আমাকে ক্লান্ত করে, বক্তৃতা আমি মোটেই ভালবাসি না। যে অদ্ভুত স্বর্গীয় প্রেমের কথা বললে কোথায় তা? আমার কি মনে হয় জান, স্বর্গীয় প্রেম নেই। তুমি অনেক বক্তৃতা করলে বটে। কিন্তু সে প্রেম তুমি আমাকে দিতে পারবে না, আর পাঁচজনের মতো তুমিও অলীক স্বপ্নের জাল বুনছ খালি। স্বর্গীয় প্রেমের কথা বলা সহজ, কিন্তু তা দেওয়া সহজ নয়। স্বীকার করছি তুমি কল্পনাকুশল কবি একজন। কল্পনার জোরে তুমি যে নিষ্কাম প্রেমের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছ, বাস্তবে তা নেই— তা অসম্ভব, অজ্ঞাত। প্রেমের রহস্য জানতে আর কারো বাকী নেই। পৃথিবীতে চুম্বনের আদানপ্রদান অনাদিকাল থেকে চলছে তো। তোমার চেহারা দেখে বোধ হয় তুমি কোনও যাদুকর। প্রণয়ী হলে প্রেমের রহস্য অবিদিত থাকত না তোমার— তা নিয়ে এত বক্তৃতাও করতে না তুমি—"

"নিরঞ্জনা, ব্যঙ্গ করো না। বিশ্বাস কর, আমি সত্যিই সেই অজ্ঞাত প্রণয়ের পসরা তোমার কাছে বয়ে এনেছি—"

"তোমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে বন্ধু। কোনরকম প্রণয়ই আর অজ্ঞাত নেই আমার কাছে—"

"তুমি জান না নিরঞ্জনা —"

"সব জানি। কিছুই আমার অজানা নয়।"

"আমি যে প্রণয় তোমার কাজে নিবেদন করতে এসেছি, তা সত্যের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। তুমি এতদিন প্রেম বলে যা জেনেছ তা প্রেম নয়—কাম। তোমার সমস্ত জীবনই কামকলঙ্কিত—"

নিরঞ্জনার চোখে একটা আগুনের ঝলক ফুটিয়া উঠিল।

প্রদীপ্তনয়নে সে বলিল, "বন্ধু, যার আতিথ্য গ্রহণ করতে আজ তুমি এসেছ, তার সামনে এ কথা বলে তুমি শালীনতার পরিচয় দাওনি। হয়তো সাহসের পরিচয় দিয়েছ, কিন্তু তা দুঃসাহস। আমার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি, আমাকে কি কলঙ্কিনী বলে মনে হয়! আমি তো আমার এ জীবনের জন্য একটুও লজ্জিত নই, আমার মতো এ জীবন যারা যাপন করে তাদের জন্যও নই। সকলে হয়তো আমার মতো ধনী বা রূপসী নয়, কিন্তু তবু তাদের কলঙ্কিনী মনে করবার কল্পনাও করি না আমি! লজ্জা কেন হবে বল? আমি অন্যায় তো কিছু করিনি। আমি আমাব জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আজ পর্যন্ত কি পরিবেশন করেছি জান? আনন্দ। সেই জন্যেই আমি আজ বিখ্যাত। আজ পৃথিবীতে ক্ষমতাশালী বলে যাঁদের নাম আছে তাঁদের চেয়েও বেশী ক্ষমতা আছে আমার, কারণ তাঁরা প্রত্যেকেই আমার পদানত হয়েছেন, আমার করুণাকণা পাবার জন্যে আমার পায়ে ধরে সেধেছেন। ভাল করে চেয়ে দেখ আমার দিকে, আমার এই ছোট পা দুটির দিকেও। এই পা দুটি চুম্বন করবাব জন্যে এখনও লক্ষ লক্ষ লোক হৃদয়-শোণিত বিসর্জন করতে প্রস্তুত। আমি হয়তো মহৎ নই, ইতিহাসেব পাতাতেও আমার নাম থাকবে না, তবু আমি যা হতে পেরেছি তার জন্য আমি গর্ব অনুভব করি, লজ্জা নয়। যে সব মহাত্মা ধর্মের উচ্চ-শিখরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করেন তাদের দৃষ্টিতে হয়তো আমি বালুকণার মতোই তুচ্ছ। কিন্তু এই অতি তুচ্ছ বালুকণাকে কেন্দ্র করে কি আলোড়নই না চলছে, তা আশা করি, তোমার অবিদিত নেই। যে আনন্দ আমি পরিবেশন করছি তার কণামাত্র লাভ করবার উন্মাদনায় কত সুখ, কত হতাশা, কত ঘৃণা, কত প্রেম যে উথলে উঠছে চারিদিকে—কত হত্যা, কত শিল্প, কত পাপ, কত পুণ্য যে লীলায়িত হচ্ছে অহরহ, তার তুলনা স্বর্গে-নরকে কোথাও আছে কি? আমার মহিমায় দিগ্‌দিগন্ত সমুজ্জ্বল, আমাকে কলঙ্কিনী বলা কি শোভা পায় বন্ধু?

সাবর্ণি গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—

"অনেক সময় মানুষের চক্ষে যা মহিমময়, ঈশ্বরের বিচারে তাই কলঙ্কলিপ্ত। নিরঞ্জনা, তুমি আর আমি এক জগতের লোক নই। দুজনে দুই বিভিন্ন জগতে মানুষ হয়েছি, এত বিভিন্ন যে আমাদের চিন্তার মিল নেই, পরস্পরের ভাষাও আমরা বুঝতে পারছি না। কিন্তু

ভগবান ধূর্জটি সাক্ষী, আমি প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছি তোমার সঙ্গে আমি একমত হবই, যতক্ষণ না আমার মতের সঙ্গে তোমার মতের মিল হয় ততক্ষণ তোমার সঙ্গ আমি ছাড়ব না। এ কাজ খুবই শক্ত তা আমি জানি, কিন্তু আমি নিরস্ত হব না। যদিও এখনও পর্যন্ত আমি জানি না কোন বহ্নিতে তোমাকে গলিয়ে নিজের আর্দশের ছাঁচে তোমাকে ঢালব। কিন্তু তবু আমি থামব না, প্রাণপণে চেষ্টা করব। তুমি অনবদ্যা, তোমাকে মহনীয়া করতে চাই। তোমাকে সম্পূর্ণভাবে পেয়ে সম্পূর্ণ নূতন করে সম্পূর্ণ নূতনরূপে রূপায়িত করে চিরানন্দলোকে উত্তীর্ণ করে দিতে চাই। যদি আমি সফলকাম হই, নিজেকে আমি ধন্য মনে করব। তুমিও স্বীকার করবে যে, সত্যিই তোমার নবজন্ম হল। মন্দাকিনীর অমৃতধারা প্রবাহিত হবে তোমাকে ঘিরে, সে ধারায় স্নান করে অপাপবিদ্ধা কুমারীর পবিত্র সৌন্দর্য লাভ করবে তুমি আবার। আহা, কোনও শক্তিবলে আমি নিজেই যদি এই মুহূর্তে মন্দাকিনীতে রূপান্তরিত হতে পারতাম তা হলে এখনই তোমাকে আমি ভাসিয়ে নিয়ে যেতাম অনন্তের দিকে—"

নিরঞ্জনার ক্রোধ প্রশমিত হইল।

সে নিজের সংস্কার অনুযায়ী ভাবিল, 'লোকটি যখন অনন্তের কথা বললে, নব-জন্মের কথা বলছে, তখন নিশ্চয়ই কোনও মাদুলীটাদুলী আছে ওর কাছে। সম্ভবত কোন তান্ত্রিক। জরামৃত্যুকে জয় করবার মন্ত্র জানে। ওকে চটাব না, প্রত্যাখ্যান করব না। দেখাই যাক না কি হয়!'

সে ভয়ের ভান করিয়া কয়েক পা পিছাইয়া গেল এবং ঘরের শেষ প্রান্তে গিয়া বিছানায় উপবেশন করিয়া বুকের কাপড় সামলাইতে সামলাইতে আনত-নয়নে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার মসৃণ কপোলের উপর দীর্ঘ নয়নপল্লবের কোমল সূক্ষ্ম ছায়া, তাহার ত্রস্ত লজ্জিত দেহভঙ্গিমা, তাহার দোদুল্যমান চরণ-কমল দুটি অপরূপ করিয়া তুলিল তাহাকে। মনে হইল, কোন কুমার বুঝি স্বপ্নের ঘোরে সহসা আত্ম-আবিষ্কার করিয়াছে।

মহর্ষি সাবর্ণি নির্নিমেষে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, তিনি বুঝি আর দাঁড়াইয়াও থাকিতে পারিবেন না। তাঁহার তালু শুষ্ক হইয়া গেল, মস্তিষ্কের মধ্যে তুমুল আলোড়ন আরম্ভ হইল। পর-মুহূর্তেই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। তাঁহার দৃষ্টিও আচ্ছন্ন হইয়া গেল। মনে হইল দৃষ্টির সম্মুখে যেন সাদা মেঘ নামিতেছে। সহসা তাঁহার মনে হইল, স্বয়ং মহাদেবই বুঝি নিরঞ্জনাকে তাঁহার দৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া দিলেন, তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। মনে হইবামাত্র তাঁহার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চারিত হইল।

গম্ভীরকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "মনে হচ্ছে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে তোমার আপত্তি নেই। এও হয়তো তুমি ভাবছ, তোমার এ আত্মসমর্পণ কেউ দেখতে পাবে না। তোমার এ শিলা-নিবাস নির্জন। কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে তুমি কি লুকোতে পারবে?

নিরঞ্জনা মাথা নাড়িল।

"ঈশ্বর! শিলা-নিবাসের উপর পাহারা দেবার জন্য কে তাঁকে সাধতে গেছে? আমার মতো সামান্য নটীর জন্য তিনি মাথা ঘামাতে যাবেন কেন? যদিই বা ঘামান, যদি আমার

আচরণ তাঁর মনঃপূত না হয়, আমার বয়ে গেল। তিনি স্বচ্ছন্দে যা খুশী করতে পারেন। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের আচরণ তাঁর মনঃপূত হবেই বা না কেন? তিনিই তো আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আমাদের মধ্যে যদি কিছু মন্দ থাকে তা তাঁরই সৃষ্টি। সুতরাং তাঁর অন্তর আমাদের কামনা বাসনা দেখে রাগ করা উচিত নয়, আশ্চর্য হওয়াও উচিত নয়। সবই তো তাঁর দেওয়া। বড় বড় ধার্মিকেরা তাঁর সম্বন্ধে যা বলেন তা অত্যন্ত অসঙ্গত বলে মনে হয় আমার। খুব সম্ভবত ওসব মনগড়া কথা তাঁদের। ঈশ্বরকে কে জেনেছে বল? তুমি তাঁর কথা বলছ কোন্ অধিকারে? ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান কি আছে তোমার?"

ইহা শুনিয়া সাবর্ণি ধার-করা মূল্যবান পরিচ্ছদটি ঈষৎ উন্মোচন করিয়া নিরঞ্জনাকে নিজের গৈরিক উত্তরীয়টি দেখাইলেন।

"আমি হিমাচল অরণ্যের তপস্বী মহর্ষি সাবর্ণি। সেখান থেকেই আমি এসেছি। পৃথিবীর অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, ব্যভিচার থেকে আমি এতকাল দূরে সরে অরণ্যের গহনে শিবের ধ্যানে কালাতিপাত করেছি। মানবসমাজে এতদিন আমার অস্তিত্বই ছিল না। সহসা একদিন, কেন জানি না, তোমার মূর্তি ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। আমি অনুভব করলাম, পাপের কবলে পড়ে তুমি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছ, মহামৃত্যু তোমাকে গ্রাস করছে। তাই তোমার কাছে আমি এসেছি, তোমাকে বাঁচাতেই এসেছি। নিরঞ্জনা, তুমি জাগো, ওঠো আশ্বস্ত হও।"

মহর্ষি সাবর্ণির নাম নিরঞ্জনা শুনিয়াছিল। তাঁহার কথা, তাঁহার চেহারা, তাঁহার গৈরিক বসন দেখিয়া সে ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। তপস্বীরা যে কত শক্তিশালী তাহা তাহার অবিদিত ছিল না। তাঁহারা রুষ্ট হইলে মুহূর্তের মধ্যে যে কোনও লোকের সর্বনাশ করিয়া দিতে পারেন— এ অন্ধ বিশ্বাস তাহার ছিল। দুর্বাসা ও শকুন্তলার কাহিনী সে নিতান্ত অলীক কাহিনীমাত্র মনে করিত না। সে শশব্যস্ত হইয়া আলুলায়িত কুন্তলে উঠিয়া দাড়াইল এবং করজোড়ে মহর্ষি সাবর্ণির সম্মুখে সাশ্রুনয়নে আসিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িল।

বলিল, "যদি দোষ করে থাকি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার কাছে কেন আপনি এসেছেন, কি আপনি চান, তা জানি না। না জেনে হয়তো অপরাধ করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি জানি হিমালয়বাসী তপস্বীরা আমাদের মতো রূপজীবাদের ঘৃণা করেন। প্রায়ই আমাদের অভিশাপ দেন। আপনিও হয়তো আমাকে অভিশাপ দিতেই এসেছেন। কি আমার দোষ তা আমি জানি না, আমাকে ক্ষমা করুন আপনি। আপনার তপোবলে আমার বিশ্বাস আছে, আপনাদের আমি ভক্তি করি। আমার উপর রাগ করবেন না, আমাকে ঘৃণাও করবেন না—এইটুকু শুধু আমার অনুরোধ। অনেকে আপনাদের নিয়ে উপহাস করে, বিশ্বাস করুন, আমি কখনও তা করি নি। আপনাদের স্বেচ্ছাকৃত দৈন্যকে আমি চিরকাল শ্রদ্ধা করে এসেছি। আশা করি আমার এ ঐশ্বর্যকে আপনিও হীনচক্ষে দেখবেন না। আমি দেহ-চর্চা করেছি, হয়তো কিছু রূপও আমার আছে, নৃত্য গীত অভিনয়ই আমার বেশী—কিন্তু এসবের জন্য আমি তো দায়ী নই। আমার রূপ, আমার ভাগ্য, আমার প্রকৃতি—কিছুই আমি সৃষ্টি করিনি। আমি ভগবানের সৃষ্টি, তিনি আমাকে যেমন করেছেন আমি তেমনি হয়েছি। পুরুষকে মুগ্ধ করবার জন্যেই তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অন্যরকম হওয়ার আমার উপায় নেই। আপনি

এখনি বললেন যে, আপনি আমাকে ভালবাসেন। তাই আশা কবছি, আপনি আমাকে ক্ষমা কববেন। আবাব তাই অনুবোধ কবছি, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে অভিশাপ দিয়ে মেবে ফেলবেন না। আমাব ভয় কবছে, আমাকে বক্ষা করুন আপনি—"

নিবঞ্জনা মহর্ষি সাবর্ণিব পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

মহর্ষি সাবর্ণি তাহাকে উঠিতে ইঙ্গিত কবিলেন।

বলিলেন, "ওঠ, ওঠ, কোন ভয় নেই তোমাব। তোমাকে আমি ঘৃণাও কবি না, অভিশাপ দিতেও আসিনি। আমি তাবই নির্দেশে তোমাব কাছে এসেছি, যিনি মদনকে ভস্মীভূত কবেও পার্বতীব মনস্কাম পূর্ণ কবেছিলেন। তোমাকে আমি ঘৃণা কবব কেমন কবে? আমি নিজেও তো নিষ্পাপ নই। ভগবান শঙ্কব যে শক্তি আমাকে দিয়েছেন তাব অনেক অপব্যবহাব আমি কবেছি। বিশ্বাস কব, আমি ক্রোধবশে তোমাব কাছে আসিনি, এসেছি অনুকম্পাভবে। সত্যই তোমাকে আমি ভালবাসি। হৃদয়েব আবেগই আমাকে তোমাব দ্বাবে নিয়ে এসেছে। কিন্তু সে হৃদযাবেগেব উৎস পবার্থপবতা অন্য কিছু নয। তোমাব দৃষ্টি কামনা-কলুষে আচ্ছন্ন হয়ে আছে তা না হলে তুমি আমাব এই হৃদযাবেগে সেই পবিত্র বহ্নি প্রত্যক্ষ কবতে, যা দেবাদিদেবেব প্রসন্ন নয়ন থেকে বিচ্ছুবিত হয, যাব স্নিগ্ধ স্পর্শ জ্বালাহীন, যা কাউকে দগ্ধ কবে অঙ্গাব বা ভস্মে পবিণত কবে না যা পবিত্র কবে কৃতার্থ কবে, আলোকিত কবে যাব স্পর্শে লোহা সোনা হযে যায

নিবঞ্জনা উঠিযা দাড়াইল। সে আব সাবর্ণিকে 'তুমি' বলিযা সম্বোধন কবিতে সাহস কবিল না।

"আপনাব কথায নিশ্চিন্ত হলাম, আমাব ভাবি ভয হয়েছিল। হিমালযবাসী সন্ন্যাসীদেব কথা আগে আমি অনেকবাব শুনেছি মহর্ষি কাবণ্ডব আব তাব দুই শিষ্য হংসপক্ষ আব কঙ্কধামান তো বিখ্যাত তপস্বী, তাদেব সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য গল্প আমি শুনেছি। আপনাব নামও আমাব কাছে অজ্ঞাত নয, আপনি অল্প বযসে সংসাব ত্যাগ কবেছিলেন, তপস্যাব জোবে সাধনায অনেক অগ্রসব হযেছেন —এসব আগেও জানতাম। আমি কল্পনাও কবতে পাবিনি যে, আপনাব মতো লোক আমাব কাছে আসবেন। আপনাকে দেখেই কিন্তু আমি বুঝেছিলাম যে, আপনি সাধাবণ লোক নন। আচ্ছা, একটা কথা জানতে কৌতূহল হচ্ছে আশা কবি কিছু মনে কববেন না। বলব কথাটা?"

"বল।"

"বৌদ্ধ ক্ষপণকবা, শ্মশানচাবী তান্ত্রিকেবা, বৈদান্তিক বা সাংখ্যা পণ্ডিতেবা, ম্লেচ্ছ বা যবন যাদুকবেবা সে আশ্বাস আমাকে দিতে পাবেননি, আপনি কি তা পাববেন আপনি আমাকে ভালবাসেন বলছেন। আমাকে জবা মৃত্যুব কবল থেকে বাঁচাতে পাববেন?"

"নিবঞ্জনা, যাবা সত্যই বাঁচতে চায তাবা বাঁচে, মৃত্যু তাদেব স্পর্শ পর্যন্ত কবতে পাবে না। একটি কথা শুধু শোন। যে সব কুৎসিত ভোগবিলাস মানুষকে মৃত্যুব দিকে টেনে নিয়ে যায তা পবিত্যাগ কব। তোমাব যে অনুপম দেহ, অনবদ্য রূপবাশি স্বযং শঙ্কব সৃষ্টি কবেছেন, লোলুপ বাক্ষসদেব হাতে তা তুলে দিও না। আমি বুঝতে পাবছি, তোমাব এসব ভাল লাগছে না। তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, আমাব সঙ্গে এসে নির্জনতাব ক্রোড়ে বিশ্রাম নাও কিছুদিন।

হিমালয়ের শান্তিতে অবগাহন কর কিছুকাল। যা পাওয়ার জন্য তুমি উৎসুক নিজেই এসে আবিষ্কার কর সেটা। তুমি চাইছ আনন্দ, যে আনন্দ অমলিন, যা কখনও শেষ হবে না, কখনও নিষ্প্রভ হবে না। সে আনন্দ কি করে পাওয়া যায় জান? দারিদ্র্য বরণ করে, সর্বস্ব ত্যাগ করে, সমাধিস্থ হয়ে, ঈশ্বরের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে। আজ তোমাব আচরণ হযতো তোমাকে এই সত্য এই আনন্দ থেকে সরিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু কালই আবার তুমি সেই সত্য আনন্দের অভিমুখে অগ্রসব হতে পারবে। যা সন্ধান করছ তাই পাবে। নিজেই তুমি বলবে, প্রকৃত প্রেমের আস্বাদ পেলাম—"

নিরঞ্জনা কিন্তু অনেক দূরের কথা ভাবিতেছিল।

"আচ্ছা, আর একটা কথা বলুন তো। আমি যদি আমার বিলাস ঐশ্বর্য বিসর্জন দিয়ে বিগত জীবনের পাপের জন্য অনুতাপ করি, তা হলে স্বর্গে আমাব যে নবজন্ম লাভ হবে তাতে আমাব এই দেহ, এই রূপ বজায় থাকবে কি?"

"নিরঞ্জনা, আমি তোমাব কাছে অনন্ত জীবনেব বার্তা এনেছি। আমি যা বলছি তা সত্য "

"আচ্ছা, এসবের কি প্রমাণ আছে কোনও? আপনি যা বলছেন তা সত্য নিশ্চযই, কিন্তু যদি ধরুন আমি প্রমাণ চাই—"

"প্রমাণ স্বয়ং দেবাদিদেব মহেশ্বর, প্রমাণ আমাদেব শৈবশাস্ত্র পুবাণ ইতিহাস, প্রমাণ আমাদের জীবন। এই পথে যদি চল, তুমি নিজেই অজস্র প্রমাণ পাবে। আমাকে অবিশ্বাস করো না।"

"মহর্ষি, আপনাব কথা আমি অবিশ্বাস কবছি না। সত্যিই আমি জীবনে কোনও সুখ পাইনি। বাণীব চেয়েও ভাল ভাগ্য নিয়ে আমি জন্মেছিলাম, কিন্তু সাবাজীবন পেয়েছি লাঞ্ছনা আর কষ্ট। সত্যই আমি পরিশ্রান্ত। অনেকে আমাব ভাগ্যকে ঈর্ষা কবে, কিন্তু আমি ঈর্ষা কবি সেই স্থবিরা দন্তহীনা বৃদ্ধাকে, ছেলেবেলায় যাকে আমি নগরতোবণের পাশে বসে মিষ্টান্ন বিক্রি করতে দেখতাম। অনেকবার আমার মনে হয়েছে যে, দরিদ্ররাই ভাল লোক, তাবাই সুখী, ভগবানের আশীর্বাদ তারাই পেয়েছে, সান্ত্বনাও পেয়েছে। ঠিকই বলেছেন আপনি, দীনতার মধ্যেই মহত্ত্ব প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। আপনি আমার মনের অন্ধকার দূর করেছেন, মনেব অতলে যে সত্য ঘুমিয়ে ছিল, মনে হচ্ছে, যেন তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। জেগে উঠেছে সে। কিন্তু তবু মনে প্রশ্ন জাগছে, কি বিশ্বাস করব, কাকে বিশ্বাস করব, কি আমার ভবিষ্যৎ, জীবনের অর্থই বা কি?"

এই কথা শুনিয়া মহর্ষি সাবর্ণির মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল। একটা স্বর্গীয় জ্যোতিতে যেন তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

তিনি বলিলেন, "শোন, নিরঞ্জনা, আমি তোমার কাছে একা আসিনি। আর একজন এসেছেন আমার সঙ্গে। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না, কারণ তোমার চোখের দৃষ্টি এখনও স্বচ্ছ হয়নি, এখনও তোমার দৃষ্টির সামনে আবরণ রয়েছে, তাঁকে দেখবার যোগ্যতা এখনও লাভ করনি তুমি। কিন্তু শীঘ্রই লাভ করবে, দেখবে

সে মূর্তি কি মনোহর! তখন নিজেই তুমি বলবে, এমনটি আর কখনও দেখনি। ইনিই প্রেমের দেবতা। একটু আগে তিনি যদি হাত বাড়িয়ে তোমাকে আমার দৃষ্টি থেকে ক্ষণিকের অবলুপ্ত করে না দিতেন, তা হলে হয়তো তোমার রূপে আকৃষ্ট হয়ে আমি পাপেই লিপ্ত হতাম, কাবণ আমি এখনও দুর্বল। কিন্তু তিনি আমাদের দুজনকেই বাঁচিয়েছেন। তিনি মঙ্গলময়, তিনি শক্তিমান, তিনি ত্রাণকর্তা, তিনিই রুদ্র, আবার তিনিই আশুতোষ। তাঁর এক পলকপাতে প্রলয় ঘটতে পারে, কিন্তু তিনি পরম কারুণিক, সামান্য বিল্বপত্রেই সন্তুষ্ট। স্বয়ং কুবের তাঁর ধনবক্ষক, কিন্তু তবু তিনি অন্নপূর্ণার দ্বাবে ভিখারী, তবু তিনি দিগম্বর উদাসীন। তিনি মদনকেও ভস্ম কবেন, আবার কুমার কার্তিকেয়কেও সম্ভব করেন উমার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে। তিনি মহেশ্বর অথচ শ্মশানচারী। তিনি স্থাণু আবাব তিনিই নটরাজ। তিনিই আজ আমাব সঙ্গে এসেছেন তোমার দ্বাবে।....প্রভু, তুমি কি আসনি? তোমার চোখে যে আমি জল দেখতে পাচ্ছি। আমাদের জন্য কাঁদছ তুমি? তোমার অশ্রুধারাই পবিশুদ্ধ করবে নিরঞ্জনাকে। তোমার ঠোঁট দুটি যেন নড়ছে। কি বলবে তুমি, বল। বল, আমি শুনছি।....নিরঞ্জনা, শোন শোন, এ আমার কথা নয়, তাঁর কথা। তোমাকে উদ্দেশ করেই বলছেন—আমি যে তোমাকেই খুঁজছি, পথ হারিয়ে কোথায তুমি চলে গেছ! এতদিন পরে পেয়েছি তোমাকে। আমাব কাছ থেকে আর সবে যেও না। কোনও ভয নেই তোমার। হাত ধর, আমার সঙ্গে চল, যদি চলতে না পাব আমিই তোমাকে বহন কবব। এস নিবঞ্জনা, আমার প্রিয় শিষ্যা, আমাব কাছে এস। আমাব সঙ্গে কাঁদ, সব পাপ ধুয়ে যাবে, সব তাপ শীতল হবে—''

মহর্ষি সাবর্ণি জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলেন।

নিবঞ্জনা দেখিল, তাঁহার মুখমণ্ডল অপূর্ব প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন স্বয়ং শিবকেই প্রত্যক্ষ করিতেছে। শুধু তাহাই নয়, তাহার অর্ধ-বিস্মৃত বাল্যজীবন যেন তাহার চোখের সম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিল। মনে পড়িল কিঙ্করকে। তাহার মুখ দিয়া বাহিব হইয়া পড়িল, ''পরম শৈব কিঙ্করকে মনে পড়েছে আমার। মনে পড়েছে গুরু গোরক্ষনাথকে। যে সময আমার দীক্ষা হয়েছিল সেই সময়ই যদি আমার মরণ হত, তা হলেই ভাল হত বোধ হয়। এ ভোগ আমাকে ভুগতে হত না।''

এই কথা শুনিয়া মহর্ষি সাবর্ণি যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইযা লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং তাহার দিকে খানিকটা আগাইয়া গেলেন।

''তোমার দীক্ষা হয়েছিল। গোরক্ষনাথ তোমার গুরু! জয় শঙ্কর, জয় শঙ্কর, জয় দেবাদিদেব উমানাথ! কিসের টানে আমাকে যে তোমার কাছে টেনে এনেছে তা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। তোমাকে দেখে কেন যে এত ভাল লাগছে—এ রহস্যের গূঢ় মর্মও আর আমার অবিদিত নেই। তোমার সঙ্গে অদৃশ্য মন্ত্রের ডোরে বাঁধা আছি বলেই তোমার সন্ধানে তপোবন ত্যাগ করে এই কলুষিত নগরে আমাকে আসতে হয়েছে। এস ভগ্নি, এস, তোমাকে চুম্বন করি।''

সাবর্ণি নিরঞ্জনার ললাট চুম্বন করিলেন। তাহার পর তিনি নীরব হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল, স্বয়ং শিবই এবার নিরঞ্জনার অন্তরে নিগূঢ় ভাষায় কথা বলিবেন, তাঁহার বক্তব্য

আর কিছু নাই। নিরঞ্জনাও নত নেত্রে বসিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল। শিলা নিবাসে সহসা এক নিবিড় নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। নদীর মৃদু কলধ্বনি আর নিরঞ্জনার ক্রন্দনরব ছাড়া আর কোন শব্দই নিস্তব্ধতাকে বিঘ্নিত করিল না। মহর্ষি সাবর্ণিও যেন কতকটা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নিরঞ্জনার প্রবাহমান অশ্রুধারা দুই গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। সে কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। কিঙ্কর এবং গুরু গোরক্ষনাথের স্মৃতি তাহার চিত্তকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। কৃষ্ণাঙ্গিনী ক্রীতদাসীরা প্রবেশ করাতে সে কতকটা আশ্বস্ত হইল। ক্রীতদাসীরা পুষ্পমাল্য গন্ধদ্রব্য এবং নানাবিধ প্রসাধন সামগ্রী বহন করিয়া আনিয়াছিল। তাহাদের দেখিয়া সম্বিত ফিরিয়া পাইল নিরঞ্জনা। নিজের কর্তব্য সম্বন্ধেও সচেতন হইল। একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "কেঁদে আর লাভ কি! যা হবার তা তো হয়েছে, হবেও। আপাতত যা কর্তব্য তাই করি। আজ রাত্রে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে রাত্রে খেতে হবে আমাকে জীমূতবাহনের বাড়িতে। আরও দু-একটি সুন্দরী মেয়ের আসবার কথা আছে সেখানে। সুতরাং সাজতে হবে আমাকে একটু। তাদের কাছে একটু সেজে না গেলে মান থাকে না। এরা আমাকে সাজাতে এসেছে। মহর্ষি, আপনি একটু আড়ালে বসবেন গিয়ে?"

"এরা কে?"

"এরা প্রসাধনকুশলা ক্রীতদাসী অনেক অর্থ ব্যয় করে এদের কিনেছি। বিশেষ করে সোনার আংটি-পরা কুন্তদন্তা এই মেয়েটি এ বিষয়ে পারঙ্গমা। একজন শ্রেষ্ঠীর কাছ থেকে অনেক টাকা দিয়ে একে কিনেছি।"

মহর্ষি সাবর্ণি একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। একবার তাহার মনে হইল, নিরঞ্জনাকে নিমন্ত্রণে যাইতে দিবেন না, বাধা দিবেন—যথাসাধ্য দিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, হঠকারিতা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাহাতে হয়তো উদ্দেশ্য পণ্ড হইবে।

"জীমূতবাহন লোকটি কে? আর কে কে থাকবে সেখানে?"

"জীমূতবাহন নৌবিভাগের অধ্যক্ষ। তিনি তো থাকবেনই, তা ছাড়া থাকবেন সিন্ধুপতি। আরও জনকয়েক দার্শনিক পণ্ডিতের আসবার কথা আছে। কবি চিন্ময়ও থাকবেন শুনেছি। নৌবিহারের মহাস্থবিরও আসবেন। অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ধনী যুবকও আসবেন দু একজন। তা ছাড়া আসবেন তরুণীরা, রূপ এবং যৌবনই যাদের একমাত্র পরিচয়।"

মহর্ষি সাবর্ণি ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর সহসা আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন, "বেশ, যাও, আপত্তি করব না। কিন্তু আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আমি কোনও কথা বলব না, চুপ করে তোমার পাশে বসে থাকব কেবল।"

নিরঞ্জনা হাসিয়া উঠিল।

"আপনি যাবেন? বেশ, চলুন। কিন্তু হিমাচলবাসী এক সন্ন্যাসীকে আমার প্রণয়ীরূপে দেখলে তারা ভাববে কি?"

ক্রীতদাসীরা তাহাকে সাজাইতে আরম্ভ করিল।

।। তিন ।।

মহর্ষি সাবর্ণিব সহিত জীমূতবাহনেব গৃহে উপস্থিত হইয়া নিবঞ্জনা দেখিল, অন্যান্য অতিথিগণও আসিযা পডিযাছেন। একটি অশ্বক্ষুবাকৃতি টেবিলেব মহার্ঘ কৌচগুলিব উপব নানাভাবে অঙ্গবিস্তাব কবিযা সকলে উপবিষ্ট বহিযাছেন। টেবিলেব উপব অনেকগুলি বৌপ্য থালি সুসজ্জিত বহিযাছে, টেবিলেব মধ্যস্থলে বহিযাছে চাবিটি অপ্সবীবাহিত একটি বৌপ্যভাণ্ড। ভাণ্ডেব ভিতবে বহিযাছে সুসিদ্ধ স্বাদু মৎস্যকে স্বাদুতব কবিবাব চাটনি।

নিবঞ্জনাকে দেখিযা অতিথিবর্গ পুলকিত হইলেন এবং নানা বিশেষণে ভূযিত কবিযা তাহাকে স্বাগত জানাইলেন।

"স্বাগত সৌন্দর্য লক্ষ্মি।"

"স্বাগত সঙ্গীত সবস্বতি।"

"বন্দে দেবমানববঙ্গিণি।"

"নমস্তে চিব আকাঙ্ক্ষিতে।"

"স্বাগত দুঃখদাযিনি, দুঃখতাবিণি চ।"

'স্বাগত নির্মল মুক্তে।"

"বন্দে পাটলিপুত্র কমল কিন্নবি।"

এই ধবনেব সংস্কৃতবহুল হাস্যকব অভিনন্দনে নিবঞ্জনা ঈষৎ বিব্রত হইযা কিছুক্ষণ দাডাইযা বহিল। অভিনন্দন বর্ষণ সমাপ্ত হইলে জীমূতবাহনকে সম্বোধন কবিযা বলিল " জীমূত; আমি একজন তপস্বীকে সঙ্গে কবে এনেছি। মহর্ষি সাবর্ণি- হিমালযবাসী পবম শৈব। এঁব সাধনা উজ্জ্বলা, এঁব বাণী অগ্নিগর্ভা—"

জীমূতবাহন সসম্ভ্রমে উঠিযা দাঁডাইলেন এবং সাবর্ণিকে অভ্যর্থনা কবিলেনঃ "স্বাগত। শৈবধর্ম এখন সম্মানিত। শৈবধর্মকে ব্যক্তিগতভাবে আমিও শ্রদ্ধা কবি, যদিও নিজে আমি বৌদ্ধ। বৌদ্ধ বলেই এ বিশ্বাস আমাব আছে যে, ভগবান তথাগতেব সদ্ধর্ম সঙ্কীর্ণ নয, তা সর্বপ্রকাব সত্য ধর্মকে সানন্দে সম্মান দেখাতে পাবে। আমাদেব পূর্বপুরুষবাও বিশ্বাস কবতেন যে, প্রত্যেক দেবতাব মধ্যে, ধর্মেব মধ্যে কিছু সত্যেব বীজ নিহিত আছে। কিন্তু ওসব কথা থাক এখন আপনি আসাতে আমি কৃতার্থ হযেছি—এইটেই এখন সব চেযে বড কথা। পানাহাব কবে আনন্দ লাভ কবে আমাকে ধন্য করুন—এই আমাব সনির্বন্ধ অনুবোধ। আসুন, এবাব আমবা আবম্ভ কবি। সময তো আব বেশী নেই—"

জীমূতবাহন আন্তবিকতাব সহিতই কথাগুলি বলিলেন। কিছু পূর্বেই তিনি নব উদ্ভাবিত নূতন ধবনেব একট বণতবীব সুবিধা-অসুবিধা বিষযে গবেষণা কবিতেছিলেন। তাঁহার বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক একটি বিবাট গ্রন্থেব চতুর্থ পর্বও প্রায শেষ হইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার মনটা বেশ খুশী ছিল। মহর্ষি সাবর্ণিকে লক্ষ্য করিয়া পুনবায় তিনি বলিলেন, "মহর্ষি, আমাদেব সংসর্গ আশা কবি আপনার খুব খারাপ লাগবে না। এখানে অনেকগুলি সজ্জন

সমবেত হয়েছেন আজ। আলাপ করলে হয়তো আনন্দ পাবেন। আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি এখানকার বিহারের মহাস্থবির হর্ষগম্ভীর। এঁরা তিনজন দার্শনিক—ইনি সিন্ধুপতি, ইনি শিখিকণ্ঠ আর ইনি নভোনীল। আর ইনি হচ্ছেন কবি চিন্ময়। আর এ দুজন হচ্ছেন আমার বন্ধুপুত্র চারুদত্ত আর শুভদত্ত—এঁরা অশ্বব্যবসায়ী। আর ওঁদের কাছে বসে আছে রোহিণী আর রেবতী। ওদের পরিচয় আমি আর কি দেব! ওদের পরিচয় ওদের সর্বাঙ্গেই লেখা রয়েছে, চেয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

সিন্ধুপতি আগাইয়া আসিয়া সাবর্ণিকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কানে কানে বলিলেন, "ফাঁদে পা দিয়েছ দেখছি। তোমাকে আগেই সাবধান করেছিলাম, আবার করছি, রতিকে ঘাঁটিও না। তার পাল্লায় পড়ে তোমাকে কোথায় আসতে হয়েছে দেখ। তুমি ধার্মিক লোক, গহন অরণ্যের পর্ণকুটিরে তুমি অভ্যস্ত, কোথায় এনে ফেলেছে তোমায় বুঝতে পারছ? সাবধান ভাই, দেবতার উপর তোমার ভক্তি আছে, কিন্তু এর উপর টান হলে একেই সবার ওপরে স্থান দিতে হবে এবার। সর্বধর্মের সর্ব দেবতার জননী বলে নতি-স্বীকার করতে হবে ওর কাছে । তা না করলে তোমার নিস্তার নেই। রতিদেবী সোজা দেবী নন। পণ্ডিত জনার্দনের মতো গণিতশাস্ত্র বিশারদ কি বলেছিলেন জান? রতির কৃপা না হলে আমি ত্রিভুজের মর্ম বুঝতে পারতাম না—"

মহর্ষি সাবর্ণি সামান্য একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন মাত্র, কোন উত্তর দিলেন না।

শিখিকণ্ঠ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সাবর্ণির দিকে চাহিয়া ছিলেন। মনে করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কোথায় যেন ইঁহাকে দেখিয়াছেন। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। সহর্ষে তিনি করতালি দিয়া উঠিলেন।

"হয়েছে, হয়েছে। ইনি অভিনয় দেখছিলেন। ওঁর চেহারা, ওঁর দাঁড়ি, ওঁর পোশাক তখনই খুব অদ্ভুত মনে হয়েছিল। নিরঞ্জনা যখন দ্রৌপদীর ভূমিকায় অভিনয় করছিল তখনই খুব মেতে উঠেছিলেন ভদ্রলোক। উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করছিলেন।"

"শৈব মহর্ষি? প্রণম্য ব্যক্তি তা হলে। সাবধানে আলাপ করতে হবে, ক্ষেপে গেলে শাপশাপান্ত করে বসবেন হয়তো, চেহারা তো দুর্বাসার মতো, অন্তরে শঙ্করাচার্য আছেন সম্ভবত—"

রোহিণী ও রেবতী চক্ষু দিয়া নিরঞ্জনাকে যেন গ্রাস করিতেছিল। নিরঞ্জনার স্বর্ণাভ চিকুরে দুলিতেছিল নীলাভ অপরাজিতার একটি মালা। মালার প্রতি অপরাজিতাটিকে নীল নয়ন বলিয়া ভুল হইতেছিল, আবার কখনও মনে হইতেছিল তাহার নয়ন দুটিই বুঝি অপরাজিতা ফুল। নিরঞ্জনার রূপের ইহাই ছিল বৈশিষ্ট্য, সে রূপের স্পর্শে নির্জীব অলঙ্কারও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিত। তাহার রূপালি-জরি- বসানো শাড়িটিও একটি বিশেষ ভাবের দ্যোতক হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রতিটি পাটে পাটে ভাঁজে ভাঁজে যেন বৈরাগ্যের সুর নীরবে বাজিতেছিল। তাহা অর্থহীন হইয়া পড়িত, যদি তাহার কণ্ঠে স্বর্ণহার বা প্রকোষ্ঠে স্বর্ণকঙ্কণ থাকিত। কিন্তু সে সব ছিল না। বস্তুত সে সবের প্রয়োজনও ছিল না। নিরাভরণ কণ্ঠ ও বাহুর কমনীয়তাই

তাহাকে অনন্যা করিয়া তুলিয়াছিল। রোহিণী ও রেবতী নিরঞ্জনার প্রসাধনরুচি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহারা সে কথা তাহাকে বলিল না, অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল।

রোহিণী বলিল, "সত্যি, কি অপরূপ সুন্দরী আপনি! আপনি প্রথমে যখন পাটলিপুত্রে এসেছিলেন তখন কি এর চেয়ে বেশী সুন্দরী ছিলেন? এর চেয়ে বেশী রূপ কি হতে পারে কারও! আমি তখন শিশু, আমার মা আপনাকে তখন দেখেছিলেন। তাঁর মুখে শুনেছি, আপনি তখন নাকি অতুলনীয়া ছিলেন—"

রেবতী মুচকি হাসিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নূতন প্রণয়ীটি কে? কোথায় পেলেন এঁকে, অদ্ভুত চেহারা! হঠাৎ মনে হয় হাতীর মাহুত। কোন দেশের লোক ইনি? গুহাবাসী, না, পাতালবাসী?"

রোহিণী রেবতীর মুখে হাত দিয়া বলিল, "বোকার মতো কি যা-তা বলছিস! প্রেমের রহস্য কি সহজে বোঝা যায়? তবে আমি ও-রকম লোকের চুমু খেতে রাজী নই। মুখ তো নয় -- যেন আগ্নেয়গিরির গহ্বর। কিন্তু নিরঞ্জনা যেমন দেবীর মতো রূপসী, তেমনি দেবীর মতো করুণাময়ীও। কারো প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন না। আমাদের সঙ্গে ওঁর ওইখানে তফাত। আমরা পছন্দসই লোক না হলে কাছে ঘেঁষতে দিই না—"

নিরঞ্জনা উত্তর দিল, "ওঁর সম্বন্ধে সাবধানে কথা বলো। উনি যে-সে লোক নন। অসাধারণ শক্তিশালী যাদুকর উনি একজন। খুব আস্তে আস্তে বললেও উনি সব কথা শুনতে পান। এমন কি মনের কথাও অবিদিত থাকে না ওঁর কাছে। একটু অন্যমনস্ক হলে হয়তো হৃদয়টিই তোমার চুরি করে নেবেন, আর তার জায়গায় রেখে দেবেন কঠিন পাথর একটা। কাল জল খেতে গিয়ে বিষম খেয়ে মারা যাবে—"

ইহার পর জীমূতবাহনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল : "বন্ধুগণ, এইবার আপনারা নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করুন। ওহে, তোমরা এইবার মধু আর সুরা পাত্রে পাত্রে ঢালতে শুরু কর।"

ক্রীতদাসগণ পাত্রে পাত্রে সুরা ঢালিতে লাগিল।

জীমূতবাহন নিজের পাত্রটি তুলিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ, অবলোকিতেশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যতক্ষণ একটি প্রাণীও বদ্ধ থাকবে ততক্ষণ আমি নির্বাণে প্রবেশ করব না। যে জড়তায় আমরা আবদ্ধ, সুরা তা কথঞ্চিৎ নাশ করে। তাই সুরার এত আদর। বৈদিক ঋষিরা সুরাকে সোমরস নামে অর্চনা করতেন। আমরা মহাযানীরা কেবল নিজেরা নির্বাণ চাই না, আমরা চাই প্রত্যেকেই নির্বাণ লাভ করুক। সেই ঈপ্সিত আনন্দের যে পাথেয় প্রয়োজন, সুরাপানে আশা করি আমরা তা পাব। আসুন—"

মহর্ষি সাবর্ণি ব্যতীত আর সকলেই সুরাপান করিতে লাগিলেন। বিলাস-লালসা-ক্লিন্ন সুরাপায়ী লোকগুলির সান্নিধ্য সাবর্ণি পছন্দ করিতেছিলেন না; কিন্তু গত্যন্তর ছিল না। নিরুপায় হইয়া তিনি বসিয়া রহিলেন।

সুরাপাত্রটি এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া শিখিকণ্ঠ কহিলেন, "আমার পিতামহ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হয়তো এই ধর্মের মর্ম বুঝতেন, আমার বাবাও আশা করি বুঝতেন,

আমি কিন্তু কিছু বুঝি না। কোন ধর্মের মর্মই আমার মাথায় ঢোকে না। নির্বাণের প্রকৃত অর্থ কি তা আজও আমার বোধগম্য হল না। অশ্বঘোষ এর যে অর্থ করেছিলেন তা যদি হয় অর্থাৎ নির্বাণ মানে যদি নিবে যাওয়া হয়, তা হলে সে নির্বাণ লাভ করবার আগ্রহ আমার নেই। আমি চিরকাল জ্বলতেই চাই। মনে হয় মহামান্য জীমূতবাহনও তাই চান, না চাইলে তিনি রণতরী নির্মাণে এমনভাবে আত্মনিয়োগ করতেন না—"

জীমূতবাহন হাসিয়া উত্তর দিলেন, "শিখিকণ্ঠ, আমি জানি, সমাজ বিষয়ে তুমি উদাসীন, সামাজিক দায়িত্বের কোনও মূল্য নেই তোমার কাছে। তোমার ধারণা, ধার্মিক হলেই বুঝি লোটাকম্বল নিয়ে সংসার ত্যাগ করতে হয়। আমি কিন্তু মনে করি, ধার্মিক হয়েও দেশসেবা করা সম্ভব। আর এও মনে করি যে, দেশসেবা করতে হলে শক্তিশালী রাষ্ট্রের উচ্চকর্মচারী হিসাবে করতে পেলে অনেক সুবিধা হয়, অনেক বেশী সুযোগ পাওয়া যায়। ধর্মের মত রাষ্ট্রও মানবসভ্যতার একটা বড় সম্পদ। আর তারা পরস্পর বিরোধীও নয়। রাষ্ট্রের সেবা করা আর ধর্মের সেবা করা অনেক সময় একই জিনিস। অদ্ভুত জিনিস এই রাষ্ট্র—"

দেখা গেল, চারুদত্ত বা শুভদত্ত নির্বাণ বিষয়ে তেমন কৌতূহলী নন। হর্ষগম্ভীবের উক্তির মাঝখানেই চারুদত্ত শুভদত্তকে বলিলেন, "শ্রেষ্ঠী মিত্রশেখরের মন্দুরায় যে নতুন ঘোড়াটা এসেছে দেখেছ? চমৎকার নয়? ঘোটকী হলে তন্বী বলতাম। কি ছিপছিপে গড়ন, কি গ্রীবাভঙ্গী—"

শুভদত্ত মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলেন, "দেখেছি, কিন্তু তুমি যতটা উচ্ছ্বসিত হয়েছ, তেমন কিছু নয়। ক্ষুরগুলো দেখেছ? ক্ষুরগুলো কত ছোট লক্ষ্য করেছ? ও ঘোড়া বেশীদিন দৌড়তে পারবে না, কিছুদিনের মধ্যে খোঁড়া হয়ে পড়বে—"

ঘোড়ার আলোচনাতেও বাধা পড়িল। রেবতী হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওমা, আর একটু হলেই আমি মাছের কাঁটা গিলে ফেলেছিলাম একটা। কাঁটা তো নয়, কাটারি যেন একখানা। ভাগ্যে গিলে ফেলিনি! এ কাঁটা পেটে ঢুকলে আর রক্ষে ছিল না। ঠাকুর আমাকে ভালবাসেন, তাই বাঁচিয়ে দিলেন—"

"ঠাকুর ভালবাসেন না কি তোমাকে?" সিন্ধুপতি হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তা হলে ঠাকুরের মানুষের মতো দুর্বলতা আছে বলতে হবে। ভালবাসা মানেই দুঃখ পাওয়া। ঠাকুর-দেবতারাও দুঃখ ভোগ করেন নাকি আমাদের মতো? তা হলে তাঁরাওতো নিখুঁত নন, আমাদের মতন হতভাগ্য।"

রেবতী চটিয়া গেল।

"আপনি চুপ করুন তো, বোকার মতো যা-তা বলবেন না। অদ্ভুত আপনার স্বভাব, কোন জিনিসের সোজা মানে বুঝতে পারেন না, মনে হয় বুঝেও যেন বোঝেন না। ইচ্ছে করে সোজা জিনিসকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে দেবার মানে কি! ওসব ন্যাকামি আমার ভাল লাগে না।"

রেবতী থামিতেই সিন্ধুপতি বলিলেন, "থেমো না রেবতী, তোমার যা খুশি বলে যাও, কিন্তু থেমো না। যতবার তুমি মুখ খুলছ ততবার তোমার দাঁতগুলি দেখতে পাচ্ছি আর মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। তোমার দাঁতের কাছে কুন্দফুল সত্যিই হার মেনেছে—"

এই সময়ে ধীবপদে একজন বৃদ্ধ আসিযা প্রবেশ কবিলেন। তাঁহাব পবিচ্ছদ অতি সাধাবণ, বিলাস বা পাবিপাট্যেব কোন চিহ্ন নাই, মুখমণ্ডল গম্ভীব, গতিভঙ্গী যেন একটু উদ্ধত। তিনি অতিথিবর্গেব নিকটবর্তী হইতেই জীমূতবাহন ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিজেব পাশে বসাইলেন।

"আসুন, শীলভদ্র, আসুন। এইখানে বসুন আপনি। ইদানীং নূতন কোনও গ্রন্থে হাত দিয়েছেন নাকি? আমাব যতদূব স্মবণ হয বিবানব্বইটা অমব গ্রন্থ আপনাব অক্লান্ত লেখনী থেকে নিঃসৃত হযেছে। আমবা আবও আশা কবি। আশাব তো শেষ নেই।"

শীলভদ্র নিজেব দুগ্ধশুভ্র শ্মশ্রুতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "দোযেল পাখী সাবাজীবন গান গেযে যায। ওইটেই তাব পক্ষে স্বাভাবিক। নীতিব মহিমাকীর্তন কবাও আমাব পক্ষে তেমনি। ও ছাড়া আমি আব কিছু কবতে পাবি না, ওই আমাব একমাত্র কাজ। সাবাজীবন ওই কবে চলেছি – "

শিখিকণ্ঠ। মহর্ষি শীলভদ্র, আপনি আমাদেব সকলেব সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন আমাদেব যে সব নীতিনিষ্ঠ গম্ভীবচবিত্র পূর্বপুরুষদেব কাহিনী আমবা শুনি, আপনিই বোধ হয তাদেব শেষ প্রতীক। তাঁদেব শুভ্রমহিমাব আভাস আপনাব মধ্যেই পাই কেবল। বর্তমানযুগেব জনতায আপনি একক। আপনাব কথাও বোধ হয সকলে বুঝতে পাবে না।

শীলভদ্র ওটা তোমাব ভুল ধাবণা শিখিকণ্ঠ। নীতিব মহিমা আজও অম্লান আছে পৃথিবীতে। মগধে ইন্দ্রপ্রস্থে, এমন কি গান্ধাবেও আমাব অনেক অকপট শিষ্য আছেন। শুধু ধর্ম সম্প্রদাযেব লোকেবাই নয, বাজা, মহাবাজা, শ্রেষ্ঠী বণিক এমন কি অনেক ক্রীতদাসও বিশুদ্ধ নীতিধর্মেব সমর্থন কবে প্রাচীন ঋষিদেব সম্মান আজও অক্ষুণ্ণ বেখেছেন। আব নীতিধর্ম যদি লোপই পায, তা হলেই বা আমাব ক্ষতি কি। নীতিধর্মেব উত্থান পতনেব সঙ্গে আমাব সুখদুঃখেব কোন সম্পর্ক নেই, নীতিধর্মকে বাঁচিযে বাখবা ' দাযিত্বও আমাব নয। নির্বোধেবাই নিজেদেব শক্তি সম্বন্ধে অত্যুচ্চ ধাবণা কবে শেষে অসুখী হয। ভগবানেব যা ইচ্ছা তাই হবে, যা ইচ্ছা নয তা হবে না---এটটেই আমি জানি। সেইজন্যই আমি সহজে বিচলিত হই না কিছুতে। নির্বিকাব না হলে সুখী হওযা যায না। নীতিধর্ম যদি লোপ পায পাক, তাতে আমাব মানসিক শান্তি একটুও বিঘ্নিত হবে না। জ্ঞানচর্চা কবে বা অভযকে উপলব্ধি কবে আমি যে আনন্দ পেযেছি এতেও ঠিক সেইবকমই আনন্দ পাব। ঈশ্ববেব অনন্ত জ্ঞানকে অনুকবণ কবাই আমাব সমস্ত প্রযাসেব মূল নীতি। আমাব এও মনে হয যে, ঈশ্ববেব চেযেও এই অনুকবণ বেশী মূল্যবান, কাবণ এ অনু' বণ কবা দুরূহ তপস্যাসাপেক্ষ।

সিন্ধুপতি। বুঝেছি। এরূপ তপস্যা যে দুরূহ তাতে সন্দেহেব অবকাশমাত্র নেই। কিন্তু সুমহৎ ঈশ্ববকে নকল কবাই যদি জীবনেব লক্ষ্য হয এবং তাব জন্য অসীম কৃচ্ছ্র সাধনা কবাব নামই যদি তপস্যা হয, তা হলে যে ব্যাঙটা নিজেব দেহটাকে ফুলিযে ষাঁড়েব মতো হতে চেযেছিল তাকেও একজন উঁচুদবেব তপস্বী বলতে হবে।

শীলভদ্র। সিন্ধুপতি, তুমি ব্যঙ্গ কবছ। ব্যঙ্গে তুমি সুনিপুণ। কিন্তু যে ষাঁড়েব কথা এখনই তুমি বললে তা সত্যিই যদি ঈশ্বব হয এবং আধ্যাত্মিক প্রেবণায উদ্বুদ্ধ হযে কোনও ভেক

সত্যই যদি তাব সমতুল্য হতে পারে, তা হলে ষাঁড়ের চেয়ে ভেককেই তুমি কি বেশী বাহাদুরী দেবে না? ভেকের এ অসাধ্য-সাধনের কে না প্রশংসা করবে!

শীলভদ্রের কথা শেষ হইতে না হইতে মহার্ঘ পরিচ্ছদে সজ্জিত চারিজন ভৃত্য একটি কারুকার্যময় বিরাট রৌপ্যপাত্র বহন করিয়া প্রবেশ করিল। পাত্রের উপর ছিল একটি আস্ত বন্যশূকর। শূকরটি সম্ভবত শূল্যপক্ক নয়, সিদ্ধ করা। কারণ তাহার গাত্রের রোমাবলী নষ্ট হয় নাই। তাহার সঙ্গে ময়দার তৈরী কয়েকটি শূকছানাও থাকাতে বোঝা যাইতেছিল যে ওটি শূকব নয়, শূকবী।

মহর্ষি সাবর্ণির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দার্শনিক নভোনীল বলিলেন, "খুবই আনন্দের কথা যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একজন অতিথি আজ অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের সঙ্গদান করে আমাদের কৃতার্থ কবছেন। আরও আনন্দেব কথা যে ইনি একজন অসামান্য ব্যক্তি। ইনি অরণ্যনিবাসী বিখ্যাত মহর্ষি সাবর্ণি। শুনেছি অবণ্যেব নির্জনতায় শিবের ধ্যান করে ইনি অদ্ভুত তপস্বীজীবন যাপন করে থাকেন।"

জীমূতবাহন। আমরাও শুনেছি সে কথা। ওঁকেই আজ প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করতে আহ্বান করছি।

নভোনীল। কিন্তু আমি আর একটা কথাও বলতে চাইছি। ওঁকে শুধু প্রধান অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করলেই যথেষ্ট হবে না। ওঁর আনন্দবিধান করতে হবে। দেখতে হবে কি ওঁব সত্যিই ভাল লাগে! আমার নিজের ধারণা, খাদ্য বা পানীয়ের বৈচিত্র্য ওঁকে ততটা মুগ্ধ কববে না, যতটা করবে আলোচনার বৈচিত্র্য। উনি যে-ধর্মেব সাধক সেই ধর্মেব আলোচনাই নিঃসন্দেহে ওব পক্ষে প্রীতিকর হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমারও হবে, যদিও শৈবধর্মের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সামান্য, কিন্তু শিবের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। বিশ্বের মঙ্গলার্থ যিনি বিষপান করে নীলকণ্ঠ হয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে যে সব রূপক বা পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে তা অপরূপ। মহত্ত্বেব অসংখ্য নিদর্শন আছে সে সবের মধ্যে। এ দেশে অনেক ধর্ম আছে যা ভীতিব উপব প্রতিষ্ঠিত, যার মূল কথা ভয়ঙ্করকে নানাভাবে তোষামোদ করে তুষ্ট করা। এদেব যদি দেবতা আখ্যাও দেওয়া যায় তা হলেও বলতে হবে, এরা অতি নিম্নস্তরের দেবতা, নিম্নস্তরের লোকদেরই পূজা পাবার যোগ্য। কিন্তু অতি প্রাচীন কাল থেকে আর্যঋষিবা শিবেব যে সব কল্পনা করেছেন, তা সুস্পষ্ট হয়েও এত নিগূঢ়, এত ভয়ঙ্কর অথচ এত মনোহর, এত আপাতবিরোধী অথচ এত সত্য যে, মনে হয়, মানুষ যুগে যুগে যে সব শক্তির কাছে মাথা নত করেছে মহেশ্বরই তার প্রতীক। তিনি ধ্বংসেরও দেবতা, সৃষ্টিরও দেবতা, তিনি ভস্ম করেছেন আবার পার্বতীরও মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন। সমুদ্রমন্থনের পর যখন বিষ উঠল, যখন সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হবার উপক্রম হল, তখন বিষপান করে সৃষ্টিরক্ষা করলেন তিনিই, যাঁর কাজ হচ্ছে সৃষ্টি ধ্বংস করা। এই পরস্পরবিরোধী-গুণসম্পন্ন দেবতাকে কেন্দ্র করে আমাদের কাব্যে ধর্মে স্থপতিতে, এক কথায় আমাদের সমাজে প্রতিভার যে স্ফূরণ হয়েছে তা অলঙ্কৃত করেছে ভারতীয় সংস্কৃতিকে। একটা বিশেষ কল্পনা রূপায়িত হয়েছে শিবকে কেন্দ্র করে। সেই কল্পনা হচ্ছে এই যে, জীবন আর মৃত্যু বিভিন্ন নয়, একই ধারার

বিভিন্ন প্রকাশ। দুটো অবস্থা বিচ্ছিন্ন নয়। জন্মে যার আরম্ভ, মৃত্যুতে তারই স্বাভাবিক পরিণতি, এবং সে পরিণতি সমাপ্তি নয়,—আর এক জন্মের, নবীনতর আর এক আরম্ভের সূচনা। প্রগতিশীল আর্যসভ্যতা যুগে যুগে নূতন দৃষ্টিতে দেখেছে জীবনকে, যুগে যুগে তাব দর্শন বদলেছে. শিবকে যদি আমরা সে সবের সমন্বয় বা সার মনে করি, তা হলে—

শিখিকণ্ঠ। নভোনীল, একটু থাম ভাই। আগে আমার একটা কথা শুনে নাও। প্রগতিশীল আর্যসভ্যতার দর্শন-বৈচিত্র্য শুধু শিবকে কেন্দ্র করে কেন, ব্রহ্মা-বিষ্ণুকে কেন্দ্র করেও তো এ দেশে আবর্তিত হয়েছে—দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতীকে কেন্দ্র করেও। পুরাণ পড়ে দেখলেই আমার কথার যাথার্থ্য বুঝতে পারবে। বৌদ্ধধর্মের আওতাতেও যে সব দেব-দেবীর আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের মহিমাও কম বৈচিত্র্যময় নয়। বৈচিত্র্যকেই যদি শিব-মহিমার মাপকাঠি হিসাবে ধরো, তা হলে ব্রহ্মা-বিষ্ণুর দাবীটা অন্তত বিস্মৃত হয়ো না।

নভোনীল। দেখ ভাই শিখিকণ্ঠ, তর্ক করে বৃহৎ সত্যকে কখনও ধরা যায় না। বৃহৎ উপলব্ধিকে অনুভবে বুঝতে হয়। নির্বাণ কি, বুদ্ধদেব তা ভাষায় বলতে পারেননি। উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাবার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সাধারণ লোকেরা, এমন কি বুদ্ধিমান লোকেরাও তা বুঝতে পারেননি। পেরেছেন তপস্বীরা। সত্যের উপলব্ধি তর্ক করে হয় না, বুদ্ধি দিয়েও হয় না। তার জন্যে মনের একটা বিশেষ প্রস্তুতি, বিশেষ অনুভূতি চাই। শিবের কথা বলছিলাম, তাঁর সম্বন্ধেই বলি তাঁর অনেক নাম আছে। শিব, মহেশ্বব ত্র্যম্বক, ধূর্জটি, নীলকণ্ঠ, জলমূর্তি প্রভৃতি অনেক নাম থেকে আমি এইটুকু শুধু বুঝেছি যে, ওগুলো বিভিন্ন তপস্বীর বিভিন্ন রকম উপলব্ধির ফল। শিবকে যিনি যেমনভাবে দেখেছেন, তিনি তেমনই নামকরণ করেছেন। বৃহৎ সত্যকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেননি সবাই, যিনি যতটুকু পেবেছেন তিনি ততটুকুকেই একটা বিশেষ নামে চিহ্নিত করেছেন। এ কথাও পুরাণকারেরা বলেছেন যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মূলত একই সত্য, আমাদের বোঝবার সুবিধার জন্য আলাদা আলাদা নাম, আলাদা আলাদা রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকের মহিমার বৈচিত্র্যও তাই কীর্তিত হয়েছে আলাদা আলাদা করে—

শিখিকণ্ঠ। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা স্ত্রী দেওয়াও কি প্রয়োজন ছিল সে জন্য?

নভোনীল। ছিল বই কি। আধ্যাত্মিক জগতে স্ত্রীলোকদের বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ স্থান আছে। এটা কারও অবিদিত নেই যে, জীবজগতে স্ত্রীলোকেরাই প্রসবিতা, স্ত্রীলোকেরাই জননী। এর অর্থ বিশদ করলে এই দাঁড়ায় যে, অতি সূক্ষ্ম বীজকে ওঁরা গোপনে আহরণ করেন, গোপনে লালন করে বড় করেন, তারপর প্রসব করেন সন্তানরূপে। এই ভাবে সমস্ত জগৎকে ধারণ করে আছেন ওঁরা। তাই ওঁদের জগদ্ধাত্রীরূপে অভিহিত করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক জগতেও সেই এক ব্যাপার। সূক্ষ্মভাবকে মনের মধ্যে গ্রহণ করে লালন করবার, পালন করবার এবং অবশেষে বৃহৎ রূপে প্রসব করবার অদ্ভুত শক্তি আছে ওঁদের। আমাদের দেশে তাই ওঁদের নামই দেওয়া হয়েছে শক্তি। পুরুষদের অনুভূতিতে যা এড়িয়ে যায়, পুরুষরা যা ধরতে পারেন না, তা ওঁদের অনুভূতিতে ধরা পড়ে! শুধু ধরা পড়ে! সেই অনুভূতিকে লালন করে ওঁরা আশ্চর্য সৃষ্টিতে পরিণত করতে পারেন। পুরুষে এ ক্ষমতা নেই। পুরুষও স্রষ্টা, অজস্র সৃষ্টির

বীজ, অসংখ্য আধ্যাত্মিক প্রেরণা পুরুষই বিকিরণ করতে পারেন; কিন্তু তাকে সংহত করে সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করতে পারেন নারীরা। সেইজন্যই পুরাণে প্রত্যেক স্রষ্টার সঙ্গে এক-একজন শক্তিও যুক্ত হয়ে আছেন। ব্রহ্মার সঙ্গে বাণী না থাকলে ব্রহ্মার সৃষ্টি প্রকাশই পেত না। বাণী প্রকাশের দেবতা। বিষ্ণুর সঙ্গে লক্ষ্মী না থাকলে বিষ্ণু পালন করতে পারতেন না, কারণ লক্ষ্মীই প্রকৃত পালনের দেবতা, তাঁর শক্তি না পেলে বিষ্ণুর পক্ষে পালন করা সম্ভবপরই হত না। মহাদেবের সঙ্গে আমরা কিন্তু দেখি সতীকে, পার্বতীকে আর কালীকে। পুরাণকারেরা এই তিনটি শক্তিকে এক করে দেখবার নানা প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, দক্ষকন্যা সতী শিবনিন্দা শুনে আত্মহত্যা করেন। শিব তাঁর মৃতদেহকে স্কন্ধে তুলে নিয়ে উন্মাদের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ক্রমশ সেই মৃতদেহ খণ্ডীকৃত হয়ে ভারতের একান্ন স্থানে পড়ে একান্নটি পীঠস্থান হল। তারপর পুরাণকারদের কল্পনায় সেই সতীই আবার মূর্ত হলেন পার্বতী রূপে, জন্মগ্রহণ করলেন হিমালযদুহিতা হয়ে---মেনকার ক্রোড়ে। তিনি তপস্যা করে পেলেন মহাদেবকে পতিরূপে। এই পার্বতীরও আবার নানা রূপ। অর্ধস্ফুট কৈশোরে তিনি আলোকের মতো বলে উমা, কাঞ্চনবর্ণা বলে গৌরী। তারপর তিনি যখন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন তখন তিনি দুর্গা। শুধু তাই নয়, বিভিন্নরূপে বিনাশ করেছেন তিনি। মহিষাসুরকে মেরেছেন মহিষমর্দিনীরূপে, রক্তবীজকে সংহার করেছেন কালীরূপে, শুম্ভকে মেরেছেন তারারূপে, নিশুম্ভকে বধ করেছেন ছিন্নমস্তারূপে। কখনও বা জগদ্ধাত্রীরূপে, কখনও বা দশভুজা হয়ে অসুরবাহিনী বিনাশ করেছেন তিনি। চণ্ডীমাহাত্ম্য নারী-মহিমারই কীর্তন। যে সব অসুর মানব সভ্যতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল তাদের বিনাশ করেছেন নারী-রূপিণী শক্তি, পুরুষেরা পারেননি। ব্রহ্মকেও আবিষ্কার করেছেন নারীরা। উপনিষদে আছে, দেবতারা ব্রহ্মকে প্রথমে চিনিতে পারেননি, পেরেছিলেন উমা। সেইজন্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বরের সঙ্গে একটি করে শক্তিস্বরূপিণী নারীর সংযোগসাধন করেছেন পুরাণকারেরা।

শিখিকণ্ঠ। তোমার নারী-প্রশস্তির সঙ্গে আমার মতেরও কিছুমাত্র অমিল নেই। কিন্তু আমার আসল প্রশ্নটা ছিল নারী নয়, মহেশ্বরের মহিমা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর এই ত্রয়ীকে যদি তিনটি পৃথক সত্তা বলে মনে কর এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হয়, তা হলে কেবল মহেশ্বরকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলা শক্ত—

নভোনীল। দেখ, দেবতাদের মধ্যে কে বৃহত্তম, সে বিচার সাধারণ লোকেদের। যাঁরা তপস্বী তাঁরাও নিজেদের আরাধ্য দেবতাকে হয়তো সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন, না মনে করলে তাঁদের সাধনা হয়তো নিখুঁত হয় না। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে আমরা যখন বিচার করব তখন আমাদের দৃষ্টি উদারতর হওয়া উচিত। লাল শ্রেষ্ঠ, কি নীল শ্রেষ্ঠ কি সবুজশ্রেষ্ঠ---এ বিচার যেমন হাস্যকর, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ— সে বিচারও তেমনি হাস্যকর। আমি কেবল বলবার চেষ্টা করছিলাম যে মহাদেবকে যখন দেবাদিদেব বলা হয়েছে, তখন মনে হয় এ দেশের কবিরা মহাদেবের মধ্যেই বোধ হয় সর্বপ্রথম ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরও স্বরূপ কল্পনা করেছিলেন। ব্রহ্মার শক্তিরূপে পরে যিনি সরস্বতী হয়েছেন, তিনিই হয়তো সতী; বিষ্ণুর

লক্ষ্মীকে হয়তো প্রথমে তাঁরা পার্বতীরূপে চিত্রিত করেছেন । এসব অবশ্য আমার কল্পনা, সত্য না-ও হতে পারে। ভাই, সত্যকে পাওয়ার উপায় বিজ্ঞানও নয়, কল্পনাও নয়। আনন্দময় উপলব্ধি ছাড়া সত্যের নাগাল পাওয়া যায় না।

হর্ষগম্ভীর। এ কথাটা খুব ঠিক বলেছ নভোনীল। আনন্দই হল তাঁর স্বরূপ। দেহ বা মন সে আনন্দলাভ করতে অক্ষম। পারে শুধু আত্মা। দেহের জড়তা অতিক্রম করে মায়াময় মনোজগৎ পার হয়ে বিশুদ্ধ আত্মাই সে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হতে পারে। তখন তার কাছে মৃত্যু নবজন্মের সূচনারূপে প্রতিভাত হয়, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎকে সে তখন একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করে, তখনই সে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করে অস্তিত্বের চরমশিখরে উঠে সমাধিস্থ হয়। এব চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর নেই। এই অবস্থারই বিশেষণ নির্বিকার নিখুঁত নির্গুণ। এই অনাদি এই অনন্ত অস্তিত্ব।

সিন্ধুপতি। চমৎকার বলেছেন। কিন্তু দেখুন, আমাব মাঝে মাঝে একটু খটকা লাগে। অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্বের মধ্যে আমি কেমন যেন গুলিয়ে ফেলি, কোনও প্রভেদ দেখতে পাই না। ভাষা দিয়ে এদের তফাত কি বোঝানো যায়, যা আপনি অনন্ত অস্তিত্ব বলে বর্ণনা কবলেন তা আমাব কাছে ভয়ঙ্কর শূন্য বলে মনে হল। কাবণ শূন্য ছাড়া আর কি অনাদি বা অনন্ত হতে পারে? সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হল, একেবারে শূন্য কোন কিছু কল্পনা করাও শক্ত। আপনি যে অবস্থাকে নির্বিকার নিখুঁত নির্গুণ বলে বর্ণনা করলেন, তা পেতে হলে আমরা অস্তিত্ব বলতে যা বুঝি সেটাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতে হবে। তা হলে আর রইল কি! ভগবানকেও এই শোচনীয় অবস্থায় ফেলেছেন দার্শনিকেরা; কারণ তাঁকেও তাঁরা নির্বিকার নির্গুণ নিখুঁত বলে কল্পনা করেছেন। শূন্যের মধ্যে যদি সব হারিয়ে যায়, তা হলে অস্তিত্ব আর নাস্তিত্বেব কোনও প্রভেদ থাকে না। তখন মনে হয, আমরা কিছুই জানি না। লোকে বলে, দার্শনিকদেব মধ্যে মতের মিল হয না। যাঁরা দার্শনিক নন, তাঁদের মধ্যেও মনের মিল নেই। কিন্তু আমার মনে হয় সকলের সঙ্গে সকলের মিল শেষ পর্যন্ত হবেই, আমরা পথটা খুঁজে পাচ্ছি না।

জীমূতবাহন। দর্শনশাস্ত্রের রহস্যময় জটিলতা নিয়ে মাথা ঘামালে সময় মন্দ কাটে না। অবসর পেলে আমিও মাঝে মাঝে জট ছাড়াই। কিন্তু আমার ভাল লাগে কৌটিল্যদর্শন। ওহে, আরও মাধ্বী সুরা আন। সকলেরই পানপাত্র খালি হয়ে গেছে দেখছি। ভরে দাও আবার।

চিন্ময়। সুরা-প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত কথা মনে পড়ল একটা। যখন সুরাপান করি না, তখন সমাজেব সুখ শান্তি ঐশ্বর্যের মহিমা মনকে মুগ্ধ করে। মনে হয় লোকে পেট ভরে খাচ্ছে, প্রাণ ভরে ঘুমুচ্ছে, প্রেমে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে, কাব্যে প্রেরণা পাচ্ছে —এই সবই বুঝি আনন্দের চরম অভিব্যক্তি । কিন্তু আপনার উৎকৃষ্ট মাধ্বী সুরা পেটে পড়লেই মনের অবস্থা বদলে যায়। তখন যুদ্ধের সাধ জাগে। মনে হয় সমাজের উন্নতির জন্য যুদ্ধ করা কিংবা স্বাধীনতার জন্য রণাঙ্গনে ছুটে যাওয়ার চেয়ে বেশী আনন্দ বুঝি আর কিছুতে নেই। শান্তিময় সামাজিক জীবনকে অত্যন্ত হীন মনে হয় তখন, সে জীবন যাপন করছি বলে লজ্জা অনুভব করি। মনে

হয এ শান্তি পবাধীনতাব কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া আব কিছু নয। তখন ইচ্ছা কবে, স্বাধীনতাব জন্য আমাদেব পূর্বপুরুষেবা যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন প্রাণ বিসর্জন কবেছিলেন আমিও তেমনি কবি। স্বাধীনতাব গান গাইতে গাইতে অসিহস্তে বণাঙ্গনে লুটিযে পড়ি বক্তাক্তদেহে—

জীমূতবাহন। আমাদেব পূর্বপুরুষবা স্বাধীনতাব জন্য যুদ্ধ কবেছিলেন বটে, কিন্তু সে স্বাধীনতাও সঙ্কীর্ণ ছিল, তা সকলেব জন্য ছিল না। তাঁবা যেটা সর্বজনীন স্বাধীনতা নামে অভিহিত কবতেন, সেটা তাঁদেবই বাহুল্যবর্জিত স্বেচ্ছাচাব কি না সে বিষযে যথেষ্ট তর্কেব অবকাশ আছে। একটা জাতিব পক্ষে স্বাধীনতা যে পবম সম্পদ তা আমি জানি। কিন্তু যতই বযস বাড়ছে ততই বুঝতে পাবছি যে, কেন্দ্রে শক্তিশালী শাসনকর্তা বা শাসন পবিষদ না থাকলে দেশেব মঙ্গল হয না। সাধাবণ লোকেবা তাদেব সঙ্কীর্ণ স্বাধীনতাও নির্বিঘ্নে ভোগ কবতে পাবে না। শাসনব্যবস্থা দুর্বল বা শিথিল হলেই প্রজাদেব বিপদ। সেজন্য যাঁবা বক্তৃতা দিযে বা অন্য কিছু কবে শাসনব্যবস্থাকে শক্তিহীন কববাব প্রযাস পান, তাঁবা প্রজাদেব মিত্র নন। এটাও আমি অনুভব কবেছি, যাবনিক গণতন্ত্রবাদ প্রচলিত হবাব আগে প্রজাবা ধার্মিক শক্তিশালী বাজাদেব বাজত্বেই সুখে বাস কবত

হর্ষগম্ভীব। আমাব মতে কিন্তু, ভাই জীমূতবাহন, কোনও শাসন ব্যবস্থাই সব্যবস্থা নয। কোনও সুব্যবস্থা যে হবে সে আশাও আমাব আব নেই। যবনেবা অনেক বকম ব্যবস্থা কবেছিল, কিন্তু কিছুই টেকেনি। আমি তো কোথাও কোন আশা দেখি না। লক্ষণ দেখে ববং মনে হয সমাজ ক্রমশ উচ্ছন্ন যাচ্ছে, সমস্ত মানবজাতিটাই ক্রমশ যেন ধাপে ধাপে নেবে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আবাব মনে হয এই শোচনীয অধঃপতনে সাহায্য কবাই বুঝি আমাদেব একমাত্র কর্তব্য। আব কিছুই তো কবতে পাবছি না আমবা। আমাদেব সমস্ত বুদ্ধি বিজ্ঞান ধর্মেব আদর্শ দিযে আমবা কি আব কবছি বল? মানব জাতিব আসন্ন মবণটাকে অনুভব কবছি কেবল, উপভোগ কবছি বললেও অত্যুক্তি হবে না।

জীমূতবাহন। পশু প্রকৃতিব মানব ভযঙ্কব সন্দেহ নেই। কিন্তু বাজকোষে যদি অর্থ থাকে, নৌবহব এবং সেনাবাহিনী যদি শক্তিশালী থাকে, তা হলে

হর্ষগম্ভীব। ওই ভযঙ্কব পশু-প্রকৃতিই জযী হবে শেষে। আত্মপ্রবঞ্চনা কবে লাভ কি? সাম্রাজ্য যত বড়ই হোক, তা একদিন ধ্বংসোন্মুখ হবেই এবং সেই ধ্বংসোন্মুখ সাম্রাজ্যকে অসভ্য বর্ববেব দল একদিন লুটে খাবেই—এই ইতিহাসেব সাক্ষ্য। এই ভাবতবর্ষে আর্য মহিমাব আলো একদিন দশ দিক উদ্ভাসিত কবেছিল, এইখানেই একদিন বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ কবেছিলেন, বাজত্ব কবেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসাব, অশোক। এইখানে ভবিষ্যতে আসবে উন্মত্ত পশুব দল। সর্বত্রই আসবে। পৃথিবীতে উচ্চাঙ্গেব শিল্প সাহিত্য বা দর্শন ব'লে কিছু আব থাকবে না। ভবিষ্যতেব শিল্প সাহিত্য বা দর্শন পশুত্বেবই জযগান কববে। কেবল মন্দিব থেকে নয, মানুষেব হৃদয থেকেও দেবতাবা বিতাড়িত হবেন। মহাবাত্রি কালবাত্রি ঘনিযে আসবে। অসভ্য পশুবা কি বেদ উপনিষদ বেদান্ত সাংখ্য ত্রিপিটকেব মর্ম বুঝতে পাববে কখনও? পাববে না। ভিত্তি টলছে, সব ধসে যাবে। যে ভাবতবর্ষ একদিন জ্ঞানবিজ্ঞানে

পৃথিবীকে আলোকিত করেছিল, সেই ভারতবর্ষেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্মশান রচিত হবে। ভয়ঙ্কর মহাকালের ব্যায়ত আনন আমি দেখতে পাচ্ছি, মনে হচ্ছে আমিই বোধ হয় শেষ মন্দিরের শেষ পুরোহিত—

এই সময় ঘরের পরদা সরাইয়া এক অদ্ভুদাকৃতি কুব্জ মনুষ্যমূর্তি প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কেশহীন মস্তক গম্বুজের মতো। পরিধানে নীলরঙের আলখাল্লা, লালরঙের পায়জামাটি স্বর্ণতারকাখচিত। মহর্ষি সাবর্ণি একেশ্বরবাদী পণ্ডিত অগ্নিদেবকে অবিলম্বে চিনিতে পারিলেন। এই লোকটিকে তিনি বড় ভয় করিতেন। ইনি শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের সঙ্কীর্ণতাকে প্রখর যুক্তিবলে ছিন্নভিন্ন করিয়া একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইনি প্রচলিত সর্বপ্রকার ধর্মসম্প্রদায়েরই শত্রু। মহর্ষি সাবর্ণির আশঙ্কা হইল, এই দুর্ধর্ষ লোকটা তাঁহাকে দেখিতে পাইলে এখনই হয়তো চীৎকার করিয়া একটা অনর্থের সৃষ্টি করিবে। অর্বাচীন পণ্ডিতদের অসার বাহ্বাস্ফোটে তিনি এতক্ষণ বিচলিত হন নাই, অগ্নিদেবকে দেখিয়া কিন্তু তিনি ভীত হইলেন। তাঁহাব একবার ইচ্ছা হইল উঠিয়া পলায়ন করেন; কিন্তু নিরঞ্জনার দিকে চাহিয়া সে ইচ্ছা তিনি দমন কবিলেন। তিনি অনুভব করিলেন, নিরঞ্জনার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, দেবীত্বে উন্নীত হইতে তাহার আর বিলম্ব নাই। অগ্নিদেব সত্যই যদি ক্ষেপিয়া উঠেন, নিবঞ্জনাই তাঁহাকে রক্ষা করিবে। নিরঞ্জনা তাঁহার পাশেই বসিয়া ছিল, তিনি বাম হাত দিয়া তাহার অঞ্চলটি ধবিয়া রহিলেন। মনে মনে শঙ্করকেও স্মরণ করিতে লাগিলেন।

অগ্নিদেবের আবির্ভাব সকলকেই পুলকিত কবিল। তাঁহাব বিদ্যাবত্তা এবং বাগ্মিতা কাহারও অবিদিত ছিল না। সকলেই সহর্ষে তাঁহাকে সম্ভাষণ জানাইলেন।

হর্ষগম্ভীরই প্রথমে কথা কহিলেন—

"আপনার আগমনে আমরা সকলেই আনন্দিত হয়েছি অগ্নিদেব। খুব ভাল সময়ে এসেছেন আপনি। শৈবধর্ম নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা চলছিল। আপনার কাছ থেকে এ বিষয়ে নূতন কিছু শুনতে পাব নিশ্চয়ই। শৈবধর্ম সম্বন্ধে যে সব কথা বাজারে চলতি আছে তারই পুনরুক্তি চলছিল। আপনি নতুন কিছু শোনান। নভোনীল অনেক কথা শোনালেন আমাদের। নভোনীলকে আপনি তো চেনেন, যুক্তির চেয়ে উপমার দিকে ওঁর প্রবণতা বেশী। মহর্ষি সাবর্ণির চিত্তবিনোদনের জন্য শৈবধর্ম নিয়ে যে আলোচনা করছিলেন, তাকে কাব্য বললে খুব অন্যায় হয় না। মহর্ষি সাবর্ণি কোনও জবাব দেননি। সম্ভবত মৌনব্রত অবলম্বন করে আছেন উনি। শৈব সাধুরা ও-রকম করেন মাঝে মাঝে। যাক, নগাধিরাজের দেবতাই সম্ভবত ওঁর মুখ বন্ধ করে রেখেছেন, তা না হলে আমরাও ওঁর কাছ থেকে কিছু পেতাম। আপানিও ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারেন। আমরা সবাই জানি, আপনি এককালে শৈবধর্ম নিয়ে খুব মেতেছিলেন, বড় বড় রাজসভাতে এ নিয়ে বক্তৃতা পর্যন্ত করেছেন, শৈবধর্ম সম্বন্ধে অনেক অভিনব তথ্যও নাকি আবিষ্কার করেছিলেন শুনেছি। ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বর এই তিনজনই কি ভগবান? আমার তো ধারণা একমেবাদ্বিতীয়ম্।

অগ্নিদেব! আমারও তাই ধারণা। ভগবান এক, তাঁর বাপ-মা নেই, তিনি অজাত, তিনি

মৃত্যুহীন, তিনি অনাদি অনন্ত, তাঁর থেকেই নিখিল বিশ্ব সৃষ্ট হয়েছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ওসব ছেলে-ভোলানো রূপকথা মাত্র।

সিন্ধুপতি। এ কথা আমরাও জানি অগ্নিদেব যে, আপনার ঈশ্বরই নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু একটা কথা মনে হলে ঈশ্বরের উপর একটু অনুকম্পা হয়। সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বরকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত বেকায়দায় থাকতে হয়েছিল। অনন্তকাল ধরে নিশ্চয় তাঁকে ইতস্তত করতে হয়েছিল, সৃষ্টি করবেন কি-না! নিশ্চয়ই মানবেন, এ অবস্থা সুখকর নয়। নির্গুণ থাকবার জন্য তাঁকে নির্বিকার থাকতে হয়েছিল, তার মানে নিশ্চেষ্ট থাকতে হয়েছিল। কিন্তু নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হ'লে নিশ্চেষ্ট বা নিষ্ক্রিয় থাকাও মুশকিল। তাই আপনারা বলছেন যে, তিনি অবশেষে সৃষ্টি করাই ঠিক করলেন। আপনার কথায় বিশ্বাস করলাম অগ্নিদেব। কিন্তু নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য নিজের নির্বিকারত্ব নষ্ট করে সৃষ্টির জটিল ঝামেলায় মেতে উঠে ঈশ্বর খুব সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন বলে মনে কবি না। সে যাই হোক, ভগবান কেমন করে সৃষ্টি করলেন সেইটেই বলুন আমাদেব, শোনা যাক।

অগ্নিদেব। যাঁরা নিজেরা হিন্দু নন—যেমন নভোনীল এবং হর্ষগম্ভীর— তাঁরাও জ্ঞান অর্জন করবার আগ্রহে হিন্দুধর্মের অনেক তথ্য জেনেছেন; তাঁরা জানেন ভগবান স্বয়ং কিছুই সৃষ্টি করেননি, করেছিলেন অন্য আর একটা জিনিসের মাধ্যমে। তাকে জিনিস বা বস্তু বললে ঠিক তার স্বরূপ বোঝানো যায় না অবশ্য। কিন্তু তার মাধ্যমেই সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। বস্তুত সে-ই সৃষ্টি করল, ঈশ্বর নয়। এই যে মাধ্যম—নানাধর্মে এর নানাবকম নাম আছে।

হর্ষগম্ভীর। ঠিক বলেছেন। যবনরা একেই বোধ হয় হার্মিস, অ্যাপোলো, অ্যাডোনি প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন—

অগ্নিদেব। আমি কিন্তু ভারতীয় আর্যবংশধর, আমি একে বলব—শূন্য। এই শূন্যই একদা স্পন্দিত হল, সেই স্পন্দনই ক্রমশ রূপান্তরিত হল সৃষ্টিতে। শূন্যেব সেই স্পন্দনই সৃষ্টিকর্তা—হংসবাহন ব্রহ্মা, গরুড়বাহন বিষ্ণু বা ষণ্ডবাহন মহেশ্বর নন। ওসব স্বল্পবুদ্ধি কবিদের উদ্ভট কল্পনামাত্র। ঋগ্বেদে বিষ্ণুকে মূর্তিরূপে কল্পনাই করা হয়নি, হয়েছে সূর্যেব জ্যোতিরূপে। বেদ বা ব্রাহ্মণসংহিতায় ব্রহ্মার উল্লেখই নেই, আছে হিরণ্যগর্ভের। মহাদেব তো স্বয়ম্ভু। বেদে রুদ্র আছে, মহাদেব নেই। কারও মতে রুদ্র অগ্নিরই অন্য নাম। মোট কথা, নানারকম অবিশ্বাস্য রূপকথা উপকথার সৃষ্টি হয়েছে ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বরকে নিয়ে। বুদ্ধি একটু কম না হলে ওসবে আস্থাস্থাপন করা কঠিন।

মহর্ষি সাবর্ণি বিবর্ণমুখে সব শুনিতেছিলেন, এই কথায় তাঁহার ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল, চক্ষুর দৃষ্টিতে ক্ষণিকের জন্য আগুন জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু নীরবতা ভঙ্গ করিলেন না।

অগ্নিদেব বলিয়া চলিলেন, "শূন্যের ওই স্পন্দনকে ব্রহ্মা বিষ্ণু বা মহেশ্বর মনে করলেও ওঁদের কিছুতেই ঈশ্বর বলা চলবে না। কারণ শূন্যের ওই স্পন্দন ঈশ্বর নন, ঈশ্বরের প্রেরণা মাত্র। সিন্ধুপতি, ঈশ্বরকে নিয়ে উপহাস করো না। তুমি যা ভাবছ, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। তিনি মুটে-মজুরের মতো মাটি কেটে বা হাতুড়ি চালিয়ে এই নিখিল বিশ্ব নির্মাণ করেননি। তাঁর প্রেবণায় শূন্য স্পন্দিত হয়ে নিখিল বিশ্বরূপে আপনি বিকশিত হয়েছে, ফুল যেমন

আপনি বিকশিত হয়। তাঁর প্রেরণায় স্পন্দিত শূন্যই স্রষ্টা, তাই সে বিশ্ব নিখুঁত হয়নি, তাই তা বদলাচ্ছে; কারণ ঈশ্বর নিজে তা সৃষ্টি করেননি, করলে তা সর্বাঙ্গসুন্দর হত—ভাল-মন্দের এমন জগা-খিচুড়ি হত না।

সিন্ধুপতি। আপনাদের মতে কি ভাল কি মন্দ সেইটে তা হলে বুঝিয়ে বলুন।

কয়েক মুহূর্ত নীববতার পব হর্ষগম্ভীরই প্রশ্নটির উত্তর দিবার প্রয়াস পাইলেন। টেবিলের উপর ধাতুনির্মিত একটি ক্ষুদ্র গর্দভের মূর্তি ছিল, আর তাহার পিঠের দুই দিকে ঝুলিতেছিল দুইটি ঝুড়ি। একটিতে ছিল কালো ফল, আর একটিতে সাদা।

হর্ষগম্ভীর গর্দভটিকে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "এটির দিকে চেয়ে দেখ। কালো সাদা দু রকম ফলই চমৎকার দেখাচ্ছে আমাদের চোখে। কিন্তু এই ফলগুলির যদি ভাববার ক্ষমতা থাকত তা হলে সাদা ফলগুলি বলত, 'ফলের পক্ষে সাদা হওয়াটাই ভাল, কালো হওয়াটা মন্দ।' আব কালো ফলগুলিও ঘৃণা করত সাদা ফলগুলিকে। কিন্তু আমাদের চোখে দুইই ভাল। ভগবানেব চোখেও তেমনি সব ভাল। আমবা ফলগুলিকে যেমন পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে দেখছি, ভগবানও নিখিল বিশ্বকে ঠিক তেমনিভাবে দেখছেন। আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, আমরা সবটা দেখতে পাই না, তাই ভাল-মন্দের চূড়ান্ত বিচারও করতে পারি না। আমাদের চোখে মন্দটাই অনেক সময় ভাল বলে মনে হয়। কিন্তু যা কুৎসিত নিঃসন্দেহে তা কুৎসিত, তা সুন্দর নয়। সব সুন্দর হলে সুন্দর বলে কিছু থাকতও না। কারণ তুলনা করেই আমরা সুন্দরকে সুন্দর বলতে পারি। আর সেই জন্যই বোধ হয় সৃষ্টিতে সুন্দরের চেয়ে অসুন্দরের প্রাধান্য এবং এক হিসেবে তা বোধ হয় ভালই।

শীলভদ্র। কিন্তু সমস্যাটা নীতির দিক দিয়ে বিচার কবা উচিত। যা মন্দ, তা মন্দই। সে মন্দে অসীম সৃষ্টিকাব্যে হয়তো ছন্দপতন হয় না। কিন্তু মানুষের সীমাবদ্ধ জীবনকাব্যে হয়। যে পাপী মন্দ আচরণ করে তার পদস্খলন হয়, এবং সেটা কাম্য নয়।

জীমূতবাহন। বাঃ, বেশ বলেছেন এটা। যুক্তিটা চমৎকার।

শীলভদ্র। এটাও অবশ্য মানতে হবে, এই সৃষ্টি এক মহাকবি রচিত বিয়োগান্ত নাটক। সেই মহাকবির নাম ঈশ্বর। তিনি তাঁর নাটকে প্রত্যেককে একটি করে নির্দিষ্ট ভূমিকা দিয়েছেন। তিনি যদি তোমাকে ভিক্ষুক, রাজপুত্র বা খঞ্জ করে সৃষ্টি করে থাকেন, তোমার কর্তব্য সেই ভূমিকাটির মর্যাদা রক্ষা করা। বস্তুত তা না করেও বোধ হয় উপায় নেই, তোমার স্বাভাবিক প্রকৃতিই তোমাকে সেই দিকে নিয়ে যাবে, তোমার নীতিজ্ঞানও তদনুযায়ী হবে।

সিন্ধুপতি। তা হলে খঞ্জকে চিরকাল ন্যাংচাতে হবে, পাগল চিরকাল ঊনপঞ্চাশৎ পবনের কাছে আত্মসমর্পণ করে থাকবে, দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের আর সুচরিত্রা হবার উপায় থাকবে না, বিশ্বাসঘাতকতাকে বিশ্বাসঘাতকই থাকতে হবে, প্রতারক ক্রমাগত মিথ্যাই বলবে, খুনী চিরকাল খুনই করবে। তারপর নাটক যখন শেষ হবে তখন সমস্ত অভিনেতা—রাজা প্রজা, ন্যায়বান অত্যাচারী, সতী অসতী, মহৎ ক্ষুদ্র, ভদ্র খুনী—সবাই কবির কাছ থেকে সমান প্রশংসা পাবে। এই কি আপনার বক্তব্য?

শীলভদ্র। সিন্ধুপতি, তুমি আমার বক্তব্যটাকে দুমড়ে মুচড়ে যা-তা করে দিলে, সুশ্রী কুমারী রাক্ষসীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল যেন। তুমি এসব ব্যাপার কিছু বোঝ না। সৃষ্টি ঈশ্বব, ন্যায় অন্যায়, নীতি দুর্নীতি—এসব বিষয়ে বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই তোমার। থাকলে এসব বলতে না। তোমার জন্য দুঃখ হচ্ছে।

সিন্ধুপতি একটু স্মিত হাস্য করিলেন শুধু। কোনও প্রত্যুত্তর দিলেন না।

নভোনীল। ব্যক্তিগতভাবে আমি কিন্তু ভাল-মন্দ উভয়েরই অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। এও আমি বিশ্বাস করি, কোন মানুষই একটি মাত্র পথে চলে মুক্তি পেতে পারে না, তা সে পথ যত মহৎই হোক না কেন। মুক্তির সন্ধানে মন্দও প্রয়োজনীয় পাথেয়। পুরাণে এ নিয়ে অনেক গল্প আছে। রাবণ যদি সীতাকে হরণ না করতেন তা হলে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পেতেন না, অহল্যা যে মুহূর্তে পাপাচরণ করে পাষাণী হলেন সেই মুহূর্তেই শ্রীরামচন্দ্রেব উপব তাঁর একটা দাবি জন্মাল। সুতরাং পাপকে ঘৃণা করা বা পাপীকে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করা আমার মতে অর্থহীন। পাপই নানামূর্তিতে ভগবানকে আকর্ষণ করে। পাপ আছে বলেই ঈশ্বরের ত্রাতা নাম সার্থক। সুতরাং ভাল এবং মন্দ দুটোরই প্রয়োজন, তাই সংসারে দুটোরই অস্তিত্ব আছে।

অগ্নিদেব। ঠিকই বলেছ তুমি। মুক্তি-প্রাসাদের সব কটা ইঁটই ভাল নয়। মন্দও অনেক আছে। হয়তো বনিয়াদটাই মন্দ দিয়ে তৈরী, কে জানে।

নভোনীল। ভাল-মন্দর সঙ্গে কিন্তু সৎ অসতের অনেক সময় গোলমাল হয়। যাব অস্তিত্ব আছে তাই সৎ, যার নেই সেই অসৎ। এই সৎকেই নানা রূপে, নানা আলোতে, নানা দৃষ্টিতে দেখেছেন নানা যুগের ঋষিরা। মায়া এই সৎকে আচ্ছন্ন কবে রেখেছে বলে অনেকে মায়াব নিন্দা করেন, মায়াকে অসৎ বলেন। কিন্তু এ কথাও না মেনে উপায় নেই যে, সত্যেব সঙ্গে মায়ারূপী অসৎ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। এই মায়া নিয়ে নানা রূপক বচিত হযেছে আমাদের কাব্যে পুরাণে। এই মায়াকে কখনও বলা হয়েছে বিষ, কখনও লোভ, কখনও কাম, কখনও দম্ভ, কখনও বা আব কিছু। আপনাদের অবশ্য অবিদিত নেই কিছু, আপনাবা যদি অনুমতি দেন তা হলে বক্তব্যটা আব একটু বিশদ করে বলি—

প্রায় সকলেই নভোনীলকে তাঁহার বক্তব্য বিশদতর করিতে অনুরোধ করিলেন। ঠিক এই সময়ে বংশীধ্বনির তালে তালে পা ফেলিয়া বারোজন সুন্দরী তরুণী ভোজনকক্ষে প্রবেশ করিল। দেখা গেল, তাহাদের প্রত্যেকের মস্তকে এক-একটি সুচিত্রিত বৃহদাকার ঝাঁপি রহিয়াছে এবং প্রত্যেক ঝাঁপিতে রহিয়াছে বিবিধ প্রকার ফল। তাহারা টেবিলের উপর ফলগুলি সাজাইযা দিয়া একে একে চলিয়া গেল। চলিয়া যাইবাব সঙ্গে সঙ্গে বংশীও নীরব হইল।

নভোনীল আরম্ভ করিলেন, "সমস্ত সৃষ্টিকে যদি সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তা হলে পৌরাণিক সমুদ্রমন্থনের গল্পটা একটা অপরূপ দার্শনিক তত্ত্বের প্রতীক বলে মনে হবে। এই মায়াময় সৃষ্টি সমুদ্রকে দেব-দানব মিলে চিরকালই মন্থন করছে। সে মন্থনে সহায়তা করছেন স্বয়ং কূর্মরূপী ভগবান মন্থনরজ্জু হয়েছেন মহাতপস্বী বাসুকী। কিন্তু মন্থনদণ্ড হয়েছেন মন্দর

পর্বত—একটা বিরাট বস্তুপিণ্ড, একে আমি তামসিকতার প্রতীক বলব। এই তামসিকতাকে কেন্দ্র করেই দেব-দানবের সমুদ্রমন্থন চলছে চিরকাল। এ মন্থনে জ্ঞানীরাও যে চিরকাল সহায়তা করেছেন তার ইঙ্গিত রয়েছে তপস্বী বাসুকীর মন্থনরজ্জু হওয়াতে। ভগবান লীলাময়, সব লীলাতেই তিনি থাকেন, কিন্তু এই তামসিকতার লীলায় তিনি কূর্মরূপ ধারণ করেছেন। মায়াময় বিষয় সমুদ্র মন্থন করে তাই উঠল-—যা মানুষ চিরকাল চেয়েছে—অমৃত, ধন্বন্তরী, লক্ষ্মী, সুরা, চন্দ্র, রম্ভা, উচ্চৈঃশ্রবা কৌস্তুভ, পারিজাত, সুরভি, ঐরাবত, শঙ্খ আর ধনু। এর প্রত্যেকটির গুণ বিশ্লেষণ করিলে বোঝা যাবে বৈষয়িক জীবনে অর্থাৎ বস্তুর জগতে এসবের বেশী কাম্য মানুষের আর কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু এ রূপকের নৈতিক মহত্ত্ব তখনই সুষ্ঠুভাবে প্রকটিত হল যখন পুরাণকার দেখালেন যে, বিষয়-সমুদ্রকে বেশী মন্থন করলে শেষ পর্যন্ত বিষ ওঠে। বিষ উঠলও। আর সে বিষ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করবার জন্য তা পান করে মহাদেব হলেন নীলকণ্ঠ। এইখানেই মহাদেবের মহত্ত্ব, মহাকালের চিরন্তন লীলা। এই বিষটাকেও আমি অসৎ মনে করি না, এও সৎ, কারণ এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু একমাত্র মহাদেবের মতো যোগীই এই বিষকে আত্মসাৎ করতে পারেন, তাই তিনি দেবাদিদেব, আর তাই সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে ভাল-মন্দ দুইই ওতপ্রোতভাবে বর্তমান। বামায়ণেব স্বর্ণমৃগের কাহিনী, সীতাহরণ, অহল্যার ব্যভিচার প্রভৃতি এই সত্যেরই নানা রূপ। বিভিন্ন কবিবা আপন আপন কল্পনা অনুসারে যুগে যুগে নবরূপে সৃষ্টি করেছেন এই চিরন্তন সত্যকে।

হর্ষগম্ভীর। তারও পূর্বে যম-যমীর কাহিনীতেও হয়তো এরই ইঙ্গিত আছে। যা এখন আমরা অন্যায় বলে মনে করি, তা না করলে মনুষ্যজাতিই হয়তো অবলুপ্ত হয়ে [illegible]ত। কিন্তু তবু এটা মানতেই হবে, ওসব আচরণ এখন আর সমর্থনযোগ্য নয়। সে [illegible]ায় মানুষ একদিন বাধ্য হয়ে বা মোহগ্রস্ত হয়ে করেছে সে অন্যায়কে সভ্যযুগে [illegible]ন মান। অসঙ্গত।

নভোনীল। আমি কিন্তু মনে করি এই অন্যায় বা মন্দ বা পাপ—যে নামই দিন একে—এটা সত্যেরই একটা অঙ্গ, একটা অংশ। আমাদের বিচারে তা অন্যায় বা অসঙ্গত হলেও সৃষ্টি থেকে তা মুছে ফেলা যাবে না। অহল্যা সীতা মেনকা সূর্পণখা সবাই চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে। রাম-রাবণ পরস্পরের পরিপূরক, ওরা চিরকাল জন্মাবে।

চিন্ময়। আমি কিন্তু জানতে চাইছি, এ যুগে কোথায় তারা জন্মেছে! বিশেষ করে মেনকার খবরটা জানতে পারলে খুশী হতাম।

নভোনীল। তা জানতে হলে যে সূক্ষ্ম জ্ঞান থাকা দরকার তা কবিদের সম্ভবত নেই। কবিরা জ্ঞানী নয়, তারা কারিকর। কথার বেসাতি করে তারা, তাদের হাব ভাব বুদ্ধি অনেকটা শিশুর মতো। কথায় কথা গেঁথে অলীক রূপকথা বুড়েন আর ছন্দের টুং টাং শুনে তারা মেতে থাকে, আর পাঁচজন শিশু-প্রকৃতির লোককেও মাতায়।

চিন্ময়। ঘরোয়া ভাবে যা বললেন, তা বাইরে বিদ্বৎসমাজে কখনও যেন উচ্চারণ করবেন না। করলে গাল খাবেন। এটা কি আপনার জানা নেই যে, পৃথিবীতে প্রথম মহাকাব্য উচ্চারিত হয়েছিল কবিতায়। আপনি যে সব উদাহরণ এখন দিলেন, তা মহাকবিদের কাব্য

থেকে সঙ্কলন করে দিলেন। একমাত্র কবিতাই মানুষের অন্তরতম সত্য প্রকাশ করতে পারে। কবিতা দেবতাদেরই প্রিয়, তাই সমস্ত দেবমন্ত্র কবিতায় রচিত। এ কথা সকলেই জানে যে, কবিরাই দ্রষ্টা, তাঁদের চোখে সবই রহস্যময় অথচ সবই সুস্পষ্ট। আমি কবি, আমি তাই জানি— এ যুগের মেনকা কোথায় আছেন। আপনাকে রহস্য করে প্রশ্নটা করেছিলাম, খবরটা আমার জানা আছে। বেশী দূর নয়, আপনার কাছেই আছেন তিনি। ওই দেখুন, নীল মখমল উপাধানে হেলান দিয়ে বসে আছেন সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মী, তাঁর চোখের কোণে টলমল করছে অশ্রু, অধরকোণে চুম্বন। ওই যে বসে আছেন তিনি। শুধু পাটলিপুত্রের নয়, শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমস্ত এশিয়ার গৌরব উনি। একদা সুরসভাতলে যিনি নৃত্য করেছিলেন, বিশ্বামিত্রের যিনি তপোভঙ্গ করেছিলেন, এ যুগে তাঁর নাম নিরঞ্জনা—

রেবতী। ওমা, কি বলছেন আপনি! বিশ্বামিত্র ঋষি কি আজকের লোক! নিরঞ্জনা দেবি, সত্যি আপনি তাঁর তপোভঙ্গ করেছিলেন না কি? তাঁর কি দাড়ি ছিল?

চারুদত্ত। তাঁর দাড়ি ছিল কি না জানি না, কিন্তু এক রকম বুনো ঘোড়ার দাড়ি আছে জানি। বিশ্বামিত্র ঋষি ছিলেন না, না, ঘোড়া ছিলেন—

"আমি আর বসতে পাচ্ছি না বাবা। শুলুম।" এই বলিয়া শুভদত্ত মাটিতে গড়াইয়া পড়িলেন।

চিন্ময় দাঁড়াইয়া সুরাপাত্রটি আস্ফালন করিতে করিতে বলিলেন, "সুরাপান করতে করতে যদি মৃত্যু হয় তবে তা সুখ-মৃত্যু হবে, তাতে কোনও গ্লানি থাকবে না।"

বৃদ্ধ জীমূতবাহন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু বসিয়াই ঘুমাইতেছিলেন। তাঁহার কেশহীন প্রকাণ্ড মস্তকটি বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল।

শিখিকণ্ঠও আর নিজের দার্শনিকত্ব বজায় রাখিতে পারিতেছিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে নিরঞ্জনার নিকট আগাইয়া গেলেন এবং তাহার পাশে বসিয়া মৃদুগুঞ্জনে নিবেদন করিলেন, "নিরঞ্জনে, আমি দার্শনিক, আমার মোহমুক্ত থাকাই উচিত। কিন্তু তুমি আজ আমাকে মুগ্ধ করেছ, তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি—"

নিরঞ্জনা। এতদিন বাসেননি কেন?

শিখিকণ্ঠ। তাই মনে হচ্ছে উপবাস করে আছি।

নিরঞ্জনা। আমিও আজ কিছু খাইনি, জল খেয়ে আছি কেবল। ভালবাসার কথা ভাল লাগছে না এখন, আমাকে ক্ষমা করুন।

শিখিকণ্ঠ আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া রেবতীর নিকট চলিয়া গেলেন। রেবতী দৃষ্টির ইঙ্গিতে তাঁহাকে ভূশায়ী শুভদত্তকে দেখাইয়া দিল। তাহাকে তুলিতে বলিল। শিখিকণ্ঠকে রেবতীর নিকট যাইতে দেখিয়া নভোনীল নিরঞ্জনার নিকট উঠিয়া গেলেন, কোন ভূমিকা না করিয়া বা অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া, একেবারেই তাহার অধর চুম্বন করিয়া বসিলেন।

নিরঞ্জনা। আমি আপনাকে বেশী ধার্মিক মনে করেছিলাম।

নভোনীল। কোনও সঙ্কীর্ণ ধর্ম আমি মানি না, মানবধর্মের সম্পূর্ণতায় আমি সর্বদা পরিপূর্ণ।

নিরঞ্জনা। ও! নারী-সংসর্গে আপনার আত্মা কলুষিত হবে—এ ভয় বুঝি আপনার নেই?

নভোনীল। নারী-সংসর্গ দৈহিক ব্যাপার, ওর সঙ্গে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই।

নিরঞ্জনা। তা হলে আপনি আমার কাছ থেকে সরে যান। যিনি আমাকে কায়মনোবাক্যে, সমস্ত দেহ দিয়ে, সমস্ত আত্মা দিয়ে ভালবাসতে পারেন না, তাঁকে আমি প্রশ্রয় দিই না। দার্শনিকরা যে এত নির্বোধ— এ ধারণা আমার ছিল না।

ভোজনকক্ষের দীপগুলি একে একে নিবিয়া যাইতেছিল। ভোরের আলো ক্রমশ পরদাগুলির ফাঁক দিয়া প্রবেশ করিয়া অতিথিবর্গের জাগরণক্লিষ্ট মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতাকে ধীরে ধীবে স্পষ্টতর করিয়া তুলিতে লাগিল। মেঝের উপর শুভদত্তের পাশে চারুদত্তও পড়িয়া ছিল। নেশার ঘোরে সে ঘোড়ার স্বপ্ন দেখিতেছিল। নভোনীল রোহিণীকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন শিখিকণ্ঠ হাস্যোদ্বেলিতা রেবতীর দুগ্ধধবল গ্রীবার উপর বিন্দু বিন্দু করিয়া শোণিতবর্ণ সুরা ঢালিতেছিলেন। পদ্মরাগমণিসন্নিভ সুরাবিন্দুগুলি তাহার নগ্ন গ্রীবা ও স্তন বাহিয়া গড়াইযা পড়িতেছিল। শিখিকণ্ঠ অধর বাড়াইয়া তাহাই পান করিতেছিলেন।

প্রবীণ শীলভদ্র সহসা উঠিয়া পড়িলেন এবং সিন্ধুপতির স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, ''আপনি এখনও খাড়া আছেন দেখছি! চলুন, ওদিকে যাওয়া যাক।''

তাঁহারা ভোজনকক্ষের পশ্চাদ্দেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

শীলভদ্র। মনে হচ্ছে, আপনি ভাবছেন কিছু একটা। কি ভাবছেন?

সিন্ধুপতি। বিশেষ কিছু নয়। মনে হচ্ছিল, এই রূপজীবাদের প্রণয়লীলা অনেকটা কার্তিকপুজোর মতো।

শীলভদ্র। তার মানে?

সিন্ধুপতি। এরা প্রত্যেকেই কার্তিক পুজো করে জানেন বোধ হয়। কন্দর্পকান্তি কার্তিককে নানা বেশে সাজিয়ে ময়ূবের উপর চড়িয়ে খুব সমারোহ করে পুজো করে তার। কিন্তু পুজো ওই একদিন। পরদিনই বিসর্জন। ওদের রূপও ওই রকম, প্রণয়ও ওই রকম, শুধু ক্ষণিকের খেলা।

শীলভদ্র। হোক না। সবই তো ক্ষণভঙ্গুর, সবই তো ছায়ার মতো। আসক্তিটাই খারাপ। ওদের প্রতি আসক্ত হওয়াটাই ভুল।

সিন্ধুপতি। ওদের রূপটা যদি ছায়ার মতো হয়, কামনাটা তা হলে আলো। দুটোই ক্ষণিকের মায়া। তা হলে আসক্ত হবই না বা কেন? কামনাটা তো উড়িয়ে দিতে পারি না, সেটা থাকবেই। আলোর প্ররোচনায় ছায়ার পিছু পিছু ছুটলে তা হলে ক্ষতি কি?

শীলভদ্র। আপনার যুক্তি শুনে হাসি পাচ্ছে। বিশ্বাস করুন, একমাত্র নিরাসক্তিতেই পৌরুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত।

সিন্ধুপতি। যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ নিরাসক্ত হবে কেমন করে?

শীলভদ্র। শুনুন তা হলে বলি। বললেই বুঝবেন শীলভদ্র কি করে নিরাসক্ত থাকতে পেরেছে।

শীলভদ্র একটি মর্মর স্তম্ভে হেলান দিয়া তাঁহার বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। উষার অরুণভাতি তাঁহার ললাট স্পর্শ করিল, তাঁহার সমস্ত মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার কথা শুনিবার জন্য হর্ষগম্ভীর এবং অগ্নিদেবও তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যাঁহারা সুরাপ্রভাবে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে অসংলগ্নভাবে উন্মত্তবৎ চীৎকার বা হাস্য করিলেন, কিন্তু তাহা শীলভদ্রের গম্ভীর ভাষণকে ব্যাহত করিতে পারিল না। তাহা এমন সুষ্ঠু, এমন চমৎকার হইল যে অগ্নিদেব বলিলেন, "সত্যিই ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করবার যোগ্যতা হয়েছে আপনার।"

হর্ষগম্ভীর মন্তব্য করিলেন, "জ্ঞানীদের হৃদয়েই তো ভগবান থাকেন।"

তাঁহার পর তাঁহারা মৃত্যু বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। শীলভদ্র যেন এই আলোচনার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন।

তিনি বলিলেন, "মৃত্যু যখন আমার কাছে আসবে তখন সে যেন আমাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখতে না পায়, সে যেন দেখে আমি আত্ম সংশোধনে এবং কর্তব্যকর্মে নিরত আছি। বলিষ্ঠ দুহাত আকাশের দিকে তুলে আমি যেন বলতে পাবি—ভগবান, তুমি আমাব হৃদয়-মন্দিরে নিজেকে যেরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলে আমি তার অমর্যাদা করিনি। আমাব জীবনের অক্লান্ত সাধনা মালার মতো গেঁথে গেঁথে পরিয়ে দিয়েছি তোমার গলায়, অঞ্জলির মতো সমর্পণ করেছি তোমার চরণে। তোমার অমোঘ বিধান বর্ণে বর্ণে পালন করে আমার জীবন সার্থক হয়েছে, পরিপূর্ণ হয়েছে। যথেষ্ট বেঁচেছি—"

দুই হাত তুলিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন । দিব্য প্রভায় তাঁহাব মুখমণ্ডল আলোকিত হইয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর নিজেকে সম্বোধন কবিয়া সহর্ষে তিনি বলিলেন, "জীবনের মায়া এবার কাটাও শীলভদ্র। যে বৃক্ষ তোমাকে লালন করেছিল, যে ধরণী তোমাকে ধারণ করেছিল, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পক্ক ফলেব মতো এবার খসে পড় জীবনের বৃন্ত থেকে। এবার বিদায় নাও।"

এই বলিয়া সহসা তিনি নিজের পরিচ্ছদের ভিতর হইতে একটি শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া নিজের বক্ষে তাহা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলেন। সিন্ধুপতি, হর্ষগম্ভীর এবং অগ্নিদেব তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া যখন তাঁহাকে ধরিলেন, তখন তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে।

নারীরা চীৎকার করিয়া উঠিল। সুরাঘোরে আচ্ছন্ন অতিথিগণ বিঘ্নিত তন্দ্র হইয়া অসম্বন্ধ ভাষায় অস্ফুট আর্তনাদ করিতে লাগিলেন, প্রভাত-বায়ুতে দোদুল্যমান পরদাগুলির ছায়াসমূহ হইতেও যেন মৃদু দীর্ঘশ্বাস নির্গত হইল। হর্ষগম্ভীর এবং সিন্ধুপতি ধরাধরি করিয়া বিবর্ণ শীলভদ্রকে একটি শয্যায় শায়িত করিয়া দিলেন। বৃদ্ধ জীমূতবাহনের তন্দ্রা ছুটিয়া গিয়াছিল, তিনি সৈনিকসুলভ তৎপরতার সহিত শীলভদ্রের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে আদেশ দিলেন, "চিকিৎসক সুরসেনকে অবিলম্বে ডেকে আন।"

সিন্ধুপতি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আমরা যে ভাবে প্রণয় কামনা করি, উনি ঠিক সেই

ভাবেই মৃত্যু কামনা করেছেন। আমাদের সকলেরই মতো নিজের কামনারই তৃপ্তি সাধন করেছেন উনি। ওঁব কামনা পূর্ণ হয়েছে, এখন উনি কামনাহীন দেবলোকে উত্তীর্ণ হয়েছেন।"

জীমূতবাহন ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "ছি ছি, এত জিনিস থাকতে মৃত্যু কামনা করলেন উনি! বেঁচে থাকলে এখনও কত কাজ করতে পারতেন। কি দুর্দৈব!"

মহর্ষি সাবর্ণি এবং নিরঞ্জনা নিস্পন্দভাবে পাশাপাশি বসিযা ছিলেন। তাঁহাদেব উভয়েরই হৃদয় ঘৃণায় এবং বিরক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যেই তাঁহারা আশার আলোকও দেখিতে পাইলেন—পলায়নের এই তো সুযোগ।

সহসা সাবর্ণি নিরঞ্জনার হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মেঝের উপর যাহারা অজ্ঞান হইযা পড়িয়া ছিল তাহাদের ডিঙাইযা, যাহারা আলিঙ্গনাবদ্ধ হইযাছিল তাহাদেব এড়াইয়া তিনি নিরঞ্জনাকে সেই শোণিত-সুরাপিচ্ছিল পরিবেশ হইতে টানিযা বাহিবে লইযা আসিলেন।

পাটলিপুত্রে তখন প্রভাত হইতেছিল। মনে হইতেছিল, পথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত হর্ম্যশ্রেণীব চূড়াগুলি আকাশের আলো আঁধারিতে যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। পথের দু ধারে যদিও উচ্ছিষ্ট মাটির বাসন, শালপাতা, ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ রোমহীন দুই একটি কুকুব প্রভাতের সৌন্দর্যেব সহিত ঠিক খাপ খাইতেছিল না, তথাপি কিন্তু প্রভাতের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

মহর্ষি সাবর্ণি প্রথমেই সিন্ধুপতিব দেওয়া মূল্যবান পরিচ্ছদটি অঙ্গ হইতে খুলিয়া ধূলায় ফেলিযা দিলেন এবং পদতলে তাহা দলিত কবিতে লাগিলেন।

তাহার পর উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, "ওদের কথা তো শুনলে। কি না বললে ওরা! মদেব চাটেব সঙ্গে সৃষ্টিমাহাত্ম্যকে পর্যন্ত ওরা চিবিয়ে দিলে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর দানব -মানব দেব-দেবী সীতা-অহল্যা রাম-রাবণ—সক্কলকে এক ঢেঁকিতে ফেলে কি জঘন্যভাবে কুটলে ওরা বল তো? তোমার সঙ্গে তুলনা দিলে মেনকার! ছি ছি ছি ছি! ওর মধ্যে সব চেয়ে ভযঙ্কর লোক ওই অগ্নিদেব। সবজান্তা নাস্তিক লোক। উনি শাক্ত-বৈষ্ণব শৈব-গাণপত্য প্রভৃতি ধর্ম চেখে চেখে এখন হয়েছেন শূন্যবাদী। ও শব্দটির অর্থ কি জান? মিথ্যাবাদী। বাকী দার্শনিকগুলোর কাণ্ড দেখে আমি তো অবাক। সকলের সামনেই তোমার দিকে লুব্ধ বাহু বাড়াতে সাহস করলে ওরা। তুমি যখন তাড়িয়ে দিলে তখন বেশ সপ্রতিভ ভাবে চলে গেল আর এক দলের কাছে। তারপর আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে কি ভাবে মাটিতে লুটোতে লাগল তা তো নিজের চোখেই দেখলে। নিজেদেরই বমিতে লিপ্ত হয়ে শুয়ে পড়ল ক্রীতদাসীদের পদপ্রান্তে। পশু—পশু—পশু সব। ওই যে পাগল বুড়োটা নাটকীয় ভঙ্গীতে আত্মহত্যা করে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড করে বসল, ওর কি কখনও মুক্তি হবে ভেবেছ? আত্মঘাতীর কখনও মুক্তি হতে পারে? তোমার চোখের সামনেই যে এসব ঘটল, এঁর জন্য শঙ্করকে কোটি কোটি প্রণাম জানাচ্ছি। তিনিই ঘটালেন এসব তোমার চোখ ফোটাবার জন্যে। তুমি নিজেই আজ মর্মে মর্মে অনুভব করলে, কি জঘন্য বীভৎস ভয়ঙ্কর পরিবেশে এত কাল তোমার জীবন কেটেছে। নিরঞ্জনা, নিরঞ্জনা, বল, তুমি নিজেই বল, তুমি কি ওদের মতো হতে চাও? ওদের

কদর্য ইঙ্গিত, কুৎসিত দৃষ্টিভঙ্গী, অশ্লীল ভাষণের লক্ষ্যস্থল হয়ে ওই সব নারীরূপী বানরীদের সাহচর্যে তুমি থাকতে পারবে কি আর? বল, তুমি কি ওদের মতো হতে চাও? উত্তর দাও—"

নিরঞ্জনার সমস্ত অন্তরও গ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। পুরুষদের প্রেমহীন বর্বরতা, নারীদের অশোভন আচরণ সত্যই তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়াছিল। রাত্রিজাগরণের ক্লান্তিতেও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল সে।

সে উত্তর দিল, "প্রভু, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি । আমার মাথা ঘুরছে, কপালের শিরগুলো দপ দপ করছে, সমস্ত শরীর অবসন্ন। মনে হচ্ছে, কেউ যদি আমাকে এখন অমৃতও এনে দেয়, হাত তুলে আমি তা নিতে পারব না। বিশ্রাম ছাড়া এখন আমার আর কিছু কাম্য নেই। কিন্তু কোথায় কেমন করে তা পাব?"

"ভয় পেয়ো না বোন, সব ঠিক হয়ে যাবে। বিশ্রামের সময় আসছে তোমার এবার। তোমার সমস্ত গ্লানি, সমস্ত মলিনতাও এবার ধুয়ে যাবে। শুভ্র মেঘের মতো নির্মল হবে তুমি। কোন ভয় নেই। আমার সঙ্গে চল।"

ক্রমশ মহর্ষি সাবর্ণি নিরঞ্জনার গৃহের সমীপবর্তী হইলেন। দেখিতে পাইলেন, শিলা-নিবাসের পার্শ্ববর্তী বৃক্ষচূড়াগুলি শিশিরস্নাত হইয়া প্রভাতের মৃদু কিরণে কম্পিত হইতেছে। মর্মরমূর্তি-পরিবেষ্টিত একটি প্রাঙ্গণে কয়েকটি শিলাসন ছিল, নিরঞ্জনা তাহারই একটিতে বসিয়া পড়িল সাবর্ণির দিকে চাহিয়া করুণ কণ্ঠে বলিল, "আমাকে তা হলে কি করতে হবে বলুন।"

সাবর্ণি উত্তর দিলেন, "তোমাকে যিনি খুঁজতে এসেছেন তাঁকে অনুসরণ করতে হঁবে। যারা সুরা প্রস্তুত করে তারা যেমন পচে যাবার আগেই আঙুরগুলো লতা থেকে তুলে নেয়, তিনিও তেমনিভাবে তোমাকে সরিয়ে নিচ্ছেন সংসার থেকে। এখনই এখান থেকে আমরা চলে যেতে চাই। এখনই যদি সোজা আমরা পশ্চিম দিকে বেরিয়ে পড়ি তা হলে সন্ধ্যার কিছু পরে শিবানী-আশ্রমে পৌঁছব। সেখানে কেবল শিবের উপাসিকারা থাকেন। অনেক তপস্বী আছেন সে আশ্রমে । আশ্রমের নিয়মগুলি এত সুন্দর, জ্ঞান ও ভক্তির এমন অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে সেগুলিতে যে, মনে হয় যদি কোনও ছান্দসিক গায়ক ওগুলি সঙ্গীতে গেঁথে বীণা-তম্বুরা সহযোগে গান করেন তা হলে ধর্মকাব্য হিসাবে রসিক সমাজে তা চিরকাল আদর পাবে। যে সব তপস্বিনী সেখানে থাকেন, তাঁরাও দেবী-স্বরূপিণী। ধরণীর মৃত্তিকার উপর তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন বটে, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ স্বর্গের দিকে। মর্ত লোকেই দেবলোক সৃষ্টি করেছেন তাঁরা; মনে হয় তাঁরা মানবী নন, দেবকন্যা। মহাভিক্ষুক শিবের প্রসাদ লাভ করবার জন্যে তাঁরা সকলেই ভিখারিণী হয়েছেন, কেউ উমার মতো, কেউ বা সতীর মতো শিবের তপস্যা করছেন। শুনেছি স্বয়ং শিবও নাকি মাঝে মাঝে নানা বেশে দেখা দেন তাঁদের, উমার কাছে যেমন এসেছিলেন বৃদ্ধের রূপে, অর্জুনের কাছে কিরাতবেশে। এই শিবানী-আশ্রমেই তোমাকে নিয়ে যাব। সেখানে গিয়ে ওঁদের সাহচর্য লাভ করে নিজেই তুমি বুঝবে কি পবিত্র স্থানে তুমি এসেছ। তাঁরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন, তুমি গেলেই

ভগ্নীর মতো সস্নেহে সাদরে তোমাকে সম্বর্ধনা করবেন তারা। আশ্রমজননী শুভ্রধারা নিজে আশ্রমদ্বারে দাঁড়িয়ে তোমার ললাট চুম্বন করে বলবেন, "কন্যা, স্বাগত।"

নিরঞ্জনা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল "শুভ্রধারা! রাজকন্যা শুভ্রধারা!"

'হ্যাঁ, তিনিই। বিলাসবেশ পরিত্যাগ করে তিনি গৈরিক ধারণ করেছেন বহুকাল পূর্বে। যিনি বহু লোকের উপর কর্তৃত্ব করতে পারতেন, একজনের সেবিকা হয়ে তিনি ধন্য মনে করছেন নিজেকে।'

নিরঞ্জনার হৃদয় উদ্বুদ্ধ হইল। সে সাগ্রহে বলিল, "আমাকে নিয়ে চলুন তার কাছে।"

তাঁহার অভিযান সফল হইয়াছে দেখিয়া মহর্ষি সাবর্ণি হৃষ্ট হইলেন। নিজের উদ্দেশ্যকে স্পষ্টতর করিয়া বলিলেন, "সেখানেই তো নিয়ে যাব তোমাকে। নিয়ে গিয়ে প্রথমে পৃথক একটি ঘরে থাকবার ব্যবস্থার করব তোমার। প্রথমে তোমাকে কিছুদিন অনুতাপ করতে হবে নির্জন ঘরটিতে বসে বিগত জীবনের পাপের জন্য অনুতাপ করবে তুমি। নিষ্পাপ না হওয়া পর্যন্ত শিবানী আশ্রমের উপাসিকাদের সঙ্গে মেশাটা সমীচীন হবে না তোমার পক্ষে। তোমার সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে গেলে তখন তুমি মিশবে। তোমাকে একটি ঘরে পুরে স্বহস্তে তাতে তালা লাগিয়ে দেব ভয় পেয়ো না, তোমার এ বন্দিত্ব মুক্তিরই সূচনা। যে মুহূর্তে তুমি যোগ্যতা অর্জন করবে সেই মুহূর্তে স্বয়ং শিব এসে তোমার দ্বার উন্মোচন করে দেবেন। আমার কথা অবিশ্বাস করো না, সত্যিই তিনি আসবেন। যখন আসবেন তখন নিজেই তুমি বুঝতে পারবে, তোমার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে আনন্দ শিহরণ জাগবে, মনে হবে যেন অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হয়েছ—"

নিরঞ্জনা পুনরায় বলিল, "শুভ্রধারার কাছে নিয়ে চলুন আমাকে।"

সাবর্ণি পুলকচিত্তে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। যে পার্থিব সৌন্দর্যকে তিনি এতকাল তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন, সেই পার্থিব সৌন্দর্যই তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। চক্ষু দিয়া তাঁহার অন্তর যেন আলোকধারা পান করিতে লাগিল, কোথাকার অজানা সমীরণ তাঁহার তপ্ত ললাট স্নেহভরে স্পর্শ করিয়া গেল। সহসা প্রাঙ্গণের এক কোণে শিলা নিবাসের প্রবেশপথটি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। করিবামাত্র তাঁহার মনে পড়িল, সমীরণ কম্পিত যে তরুশীর্ষগুলিকে তিনি এতক্ষণ সানন্দে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন সেগুলি এতকাল এই রূপজীবার পাপ-নিবাসকে ছায়াশীতল করিয়া রাখিয়াছিল। ইহাও মনে হইল, যে প্রভাত-সমীরণকে এখন এত পবিত্র মনে হইতেছে, তাহা বহু ব্যভিচারী লম্পটের নিশ্বাসবায়ুতে দূষিত। এসব মনে হওয়াতে তাঁহার অন্তর দুঃখে বেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এত কষ্ট হইল যে, তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার গণ্ড বাহিয়া তপ্ত অশ্রুধারা টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল

তিনি বলিলেন, "নিরঞ্জনা, আমরা কোন দিকে না চেয়ে এখনই এখান থেকে পালাই চল। কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে। যে সব উপকরণ, বিলাসের যে দ্রব্যসম্ভার তোমার কলুষিত অতীত জীবনের সাক্ষী হয়ে আছে, যে সব জিনিস তোমাকে এতকাল মিথ্যা মোহবন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিল—ওই পরদা, ওই বিছানা, ওই ফুলদানি, ধূপদানি, ওই

দীপাধার, ওই সব পরিচ্ছদ, তুমি চলে গেলেও তারা তো তোমার কুকীর্তি ঘোষণা করতে থাকবে। এই অশুচি জিনিসগুলোকে নিয়ে যাওয়াও চলবে না। ওদের মধ্যে পাপ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, ওদের সংসর্গ করলেই প্রচ্ছন্ন পাপ আবার প্রকট হয়ে উঠবে, নানা ইঙ্গিতে কথা কইবে, দুর্নিবার আকর্ষণে আবার টানবে তোমাকে। ওদের অস্তিত্ব লোপ করতে হবে। যা যা তোমার অতীত জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে ছিল, সব ধ্বংস করে ফেল। দেরি করো না, এই সুযোগ। শহরের লোকেরা এখনও জাগেনি, সবাই ঘুমুচ্ছে। তোমার ক্রীতদাসদের আদেশ দাও, এই প্রাঙ্গণের মাঝখানে তারা কাঠ স্তূপীকৃত করুক, তাতে আগুন দিয়ে এস, তোমার অতীত জীবনের পাপের প্রতীকগুলোকে অগ্নিমুখে সমর্পণ করি। ভস্মীভূত হয়ে যাক তারা। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক।''

নিরঞ্জনা সম্মত হইল।

বলিল, ''আপনার যা ইচ্ছা হয় করুন। আপনি ঠিকই বলেছেন, অশরীরী প্রেতাত্মারা অনেক সময় প্রাণহীন জিনিসকে আশ্রয় করে থাকে। আমিও এটা লক্ষ্য করেছি। গভীর রাত্রে এক-একটা জিনিস যেন নানা কৌশলে কথা বলে। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর টক টক করে শব্দ হয় কোনটা থেকে, কোনটা থেকে মনে হয় যেন আলোর ঝিলিক বেরুচ্ছে। শিলা নিবাসে ঢোকবার মুখেই একটি নারীর মর্মরমূর্তি আছে। দেখেছেন নিশ্চয়, সে যেন স্নান করতে যাবার আগে কাপড় ছাড়ছে। একদিন আমি স্বচক্ষে দেখেছি, জীবন্ত মানুষের মত সে যেন ঘাড় ফেরাল। আমার এত ভয় হয়েছিল কি বলব! এ কথা সিন্ধুপতিকে বলেছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুই বিশ্বাস করেন না, আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেন। আমার বিশ্বাস ওই মর্মরমূর্তিটার প্রাণ আছে। একবার এক মস্ত ধনী যুবক আমার কাছে এসেছিলেন। আমাকে দেখে নয়, ওই মর্মরমূর্তিটি দেখে তিনি কামোন্মত্ত হয়ে উঠলেন। সে কি কাণ্ড! ঠিকই বলেছেন আপনি, একটা অদৃশ্য যাদুলোক ঘিরে আছে আমাকে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, প্রাণহীন মূর্তিকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে কত লোক প্রাণ দিয়েছে। তবে এতগুলো দামী জিনিস একেবারে নষ্ট করে ফেলবেন? ওগুলো বড় বড় শিল্পীদের প্রতিভার নিদর্শন। ও রকম পরদা আর সৃষ্টি হবে না। ওগুলো যদি পুড়িয়ে দেন অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। কয়েকটা পর্দায় অদ্ভুত রঙের উপর সে সূক্ষ্ম জরির কাজ আছে তা সত্যিই অতুলনীয়। যাঁরা আমাকে ওগুলো উপহার দিয়েছিলেন, অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছিল। তাঁদের অনেকে সর্বস্বান্ত হয়েছেন এজন্য। আমার কাছে এমন সব পানপাত্র, মূর্তি আর ছবি আছে যা দুষ্প্রাপ্য। বহু অর্থব্যয় করলেও যা আর পাওয়া যাবে না। ওগুলো এমন ভাবে নষ্ট করবার প্রয়োজন কি? কোনও প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দিলেও তো হয়। কিন্তু আপনিই ভাল জানেন—কি উচিত, কি অনুচিত। আপনি যা করতে চান তাই করুন। আমি আপত্তি করব না।''

এই কথা বলিয়া নিরঞ্জনা সাবর্ণির পিছু পিছু শিলা-নিবাসে প্রবেশ করিল।

ঘরের দেওয়ালে বহুরকম মুকুট, মাল্য এবং চিত্র বিলম্বিত ছিল। ঘরে ঢুকিয়া নিরঞ্জনা দ্বারপালকে আদেশ করিল সমস্ত ক্রীতদাসদের ডাকিয়া আনিতে । তাহারা যখন আসিতে

লাগিল তখন সাবর্ণি লক্ষ্য করিলেন যে, নিরঞ্জনার ক্রীতদাসরাও অসাধারণ। প্রথমেই আসিল চারিজন পীতকায় চীনা সূপকার, তাহারা প্রত্যেকেই একচক্ষু। একই জাতের চারিটি একচক্ষু ক্রীতদাস সংগ্রহ করা সহজ নহে, প্রচুর অর্থসাপেক্ষও বটে। ইহাদের দেখিয়া নিরঞ্জনাব অতিথিরা যথেষ্ট আমোদ পাইতেন। কি করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের একটি করিয়া চক্ষু নষ্ট হইল সে কাহিনী নিরঞ্জনার আদেশে তাহারা অতিথিদের শুনাইত। তাহাদের পরে একে একে আসিল ঘোড়ার সহিসেরা, শিকারীরা, পাল্কী বাহকেরা, দুইজন লোমশ মালী ও ছয়জন ভীষণ দর্শন কাফ্রী। তিনজন গ্রীসদেশীয় যবন ক্রীতদাস তাহার পরে আসিল। ইহাদের মধ্যে একজন ছিল বৈয়াকরণিক, একজন কবি এবং একজন গায়ক। তাহারা প্রাঙ্গণে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ছুটিয়া আসিল কয়েকজন ঘূর্ণিতলোচনা, বিকটবদনা, অদ্ভুতদর্শন কাফ্রী রমণী। তাহাদের পিছু পিছু ধীর মন্থরগমনে বেশবাস সম্বরণ করিতে কবিতে ছয়জন শ্বেতকায় রূপসী ক্রীতদাসীও সর্বশেষে আসিল। সাবর্ণি লক্ষ্য করিলেন, তাহাদের প্রত্যেকের পায়ে পাতলা স্বর্ণ শৃঙ্খল রহিয়াছে। প্রত্যেকের মুখভাবও অপ্রসন্ন। সকলে সমবেত হইলে নিরঞ্জনা মহর্ষি সাবর্ণিকে দেখাইয়া বলিল, "ইনি যা কবতে বলেন তাই কব তোমরা। ইনি সিদ্ধপুরুষ, এঁর আদেশ অমান্য কবলে মৃত্যু হবে।"

তাহাদের ভয় দেখাইবার জন্যই যে নিরঞ্জনা এ কথা বলিল তাহা নয়, সে নিজেও ইহা বিশ্বাস করিত। সে শুনিয়াছিল হিমালয়বাসী শৈব সাধুরা অত্যন্ত শক্তিশালী। তাঁহার কাহাকেও যদি দণ্ড দ্বারা আঘাত করেন পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া ধূম নির্গত হয় এবং আহত ব্যক্তিকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

মহর্ষি সাবর্ণি ক্রীতদাসীদের বিদায় করিয়া দিলেন। যবন ক্রীতদাস তিনটিকেও তিনি চলিয়া যাইতে বলিলেন, কারণ তাহাদের চেহারাও কমনীয়, অনেকটা নারীর মতো। অবশিষ্ট ক্রীতদাসদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "এই উঠানের মাঝখানে অনেক কাঠ এনে জমা কর। তারপর তাতে আগুন দাও। বিরাট একটা চিতাব মতো প্রস্তুত কর। চিতার আগুন যখন বেশ জ্বলে উঠবে তখন সেই লেলিহান শিখায় এ বাড়িব সমস্ত বিলাসসামগ্রী এনে এনে ফেল। বাড়ির বাইরে চারিদিকে যা যা আছে তাও আন। সমস্ত পুড়িয়ে ফেল।"

আদেশ শুনিয়া ক্রীতদাসেরা ঘাবড়াইয়া গেল। স্তম্ভিত বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল সকলে। আড়চোখে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে নিরঞ্জনার দিকে চাহিয়া দেখিল। নিরঞ্জনাকেও নীরব নিস্পন্দ দেখিয়া তাহারা পরস্পরেব আরও নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তাহাদের সন্দেহ হইতে লাগিল, ব্যাপারটা হয়তো বসিকতা।

"যা বললাম তা কর"—মহর্ষি পুনরায় আদেশ দিলেন।

ক্রীতদাসরা যখন হৃদয়ঙ্গম কবিল যে ব্যাপারটা রসিকতা নহে, তখন তাহারা তৎপর হইয়া উঠিল। অনেকে মনে মনে খুশীও হইল। যাহারা দরিদ্র তাহারা সাধারণত ধনীর ঐশ্বর্যকে সুচক্ষে দেখে না, সে ঐশ্বর্যকে ধ্বংস বা লুণ্ঠন করিতে পারিলে তাহারা আনন্দিত হয়। ক্রীতদাসদের মধ্যে অনেকেই সাগ্রহে এবং সানন্দে চিতা প্রস্তুত করিতে লাগিল।

মহর্ষি সাবর্ণি নিরঞ্জনাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার এক-একবার মনে হচ্ছিল,

তোমার এই সব মহার্ঘ বিলাস-উপকরণ, স্বর্ণরৌপ্য মণিমুক্তা প্রভৃতি ঐশ্বর্য কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠানে দান করে দিই, মনে হচ্ছিল, যা একদিন ঘৃণ্যতম পাপের সহায়ক হয়েছে তা পুণ্যকর্মে উৎসর্গিত হোক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, আমার এ চিন্তা নিতান্ত বৈষয়িক চিন্তা, ঈশ্বরের প্রেরণা এর উৎস নয়। তা ছাড়া কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠানে এসব জিনিস দান করা সে প্রতিষ্ঠানকে, সে প্রতিষ্ঠানের মহত্ত্বকে অপমান করা। তুমি যে সব জিনিস ব্যবহার করেছ, এমন কি যা তুমি স্পর্শও করেছ সে সবের একমাত্র সদ্‌গতি হচ্ছে অগ্নি। সমস্ত পুড়ে ভস্ম হয়ে যাক। তোমার যে সব ওড়না, যে সব শাড়ি, যে সব অলঙ্কার অসংখ্য প্রণয়ীর অসংখ্য চুম্বনে কলঙ্কিত হয়েছে, লেলিহান অগ্নিশিখার স্পর্শে তারা পবিত্র হোক। এর মধ্যে করুণাময় শঙ্করের অমোঘ বিধান যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। ক্রীতদাসরা দেরি করছে কেন? সব শেষ করে তাড়াতাড়ি আমরা বেরিয়ে পড়তে চাই। তুমিও ভিতরে গিয়ে তোমার শাড়ি, ওড়না গয়না, ফুলের মালা ছেড়ে তোমার দাসীদের মধ্যে যে সব চেয়ে গরীব তার কাছ থেকে একটা ছেঁড়া কাপড় নিয়ে সেইটে পরো। কারণ যে দেবতার কৃপালাভ করবার জন্য তুমি যাচ্ছ, তিনি নিজেই ভিখারী, দিগম্বর। সমস্ত ত্যাগ করে তার কাছে যেতে হবে।'

নিরঞ্জনা আপত্তি করিল না, ভিতরে চলিয়া গেল। ক্রীতদাসগণ প্রাঙ্গণে কাষ্ঠের স্তূপ সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতেছিল, অগ্নি যেই ধরিয়া উঠিল অমনি তাহারা গৃহসজ্জার মহার্ঘ উপকরণগুলি বাহির করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। হস্তীদন্তের, মেহগিনির, চন্দনকাষ্ঠের কারুকার্যখচিত পেটিকাগুলির ভিতর হইতে কত যে মূল্যবান রত্নখচিত মকুট হার কঙ্কণ অঙ্গুরীয় বাহির হইল তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। সমস্তই একে একে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইল। কুণ্ডলায়িত কৃষ্ণ ধূমরাশি ধীরে ধীরে বিরাট স্তম্ভের আকার ধারণ করিয়া আকাশের দিকে উঠিতে লাগিল। তাহার পর ভীষণ একটা শব্দ হইল, মনে হইল একটা দানব যেন সহসা গর্জন করিয়া উঠিল। পরক্ষণেই অগ্নিদেব রুদ্রমূর্তিতে প্রকটিত হইলেন, দৃশ্য এবং অদৃশ্য শিখা লকলক করিয়া উঠিল নিরঞ্জনার অলঙ্কারগুলিকে তিনি যেন গ্রাস করিতে লাগিলেন। ইহাতে ক্রীতদাসগণের উৎসাহ যেন বাড়িয়া গেল। তাহারা দ্বারে দ্বারে দোদুল্যমান স্বর্ণ রৌপ্য খচিত পরদাগুলিও টানিয়া টানিয়া আনিয়া আগুনের ভিতর ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। ভারী টেবিল, সোফা, বিছানা ও খাটের গুরুভারে তাহাদের মেরুদণ্ড বাকিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু তাহাদের উৎসাহ কমিল না। তিনজন বলিষ্ঠ কাফ্রী বহুবর্ণবিচিত্র অপ্সরী-মূর্তিগুলি দুই হাতে জাপটাইয়া তুলিয়া আনিতেছিল, তাহার মধ্যে স্নানোদ্যতা সেই অপ্সরীটিও ছিল যাহার প্রেমে পড়িয়া একজন ধনীপুত্র পাগল হইয়া গিয়াছিল। প্রজ্বলিত অগ্নির আলোকে মনে হইতেছিল তিনটি দৈত্য বুঝি নারীহরণ করিতেছে। মর্মর মূর্তিগুলি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া যখন টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙিয়া গেল। তখন মহর্ষি সাবর্ণি যেন একটা অস্ফুট আর্তনাদ শুনিতে পাইলেন।

ঠিক এই সময়ে নিরঞ্জনাও বাহির হইয়া আসিল। তাহার আলুলায়িত কেশরাশি, তাহার নগ্নপদ, অতি সাধারণ বস্ত্রাবৃত তাহার অনুপম দেহলাবণ্য তাহাকে যেন নূতন মহিমা দান করিয়াছিল, মনে হইতেছিল, মূর্তিমতী কামনা যেন সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ করিয়াছে।

বাগানের মালীটিও তাহার পিছনে আসিয়া দাড়াইল, তাহার শ্মশ্রুবাজির মধ্যে সে হস্তিদন্তনির্মিত কামদেবের একটি মূর্তি লুকাইয়া আনিয়াছিল। নিরঞ্জনা ইঙ্গিতে তাহাকে থামিতে বলিয়া মহর্ষি সাবর্ণির দিকে আগাইয়া গেল। ক্ষুদ্র মূর্তিটি তাঁহাকে দেখাইয়া বলিল, "এটিকেও কি আগুনে ফেলে দিতে বলেন? এ মূর্তিটি অতি প্রাচীন, শিল্পের অতি অদ্ভুত নিদর্শন। কোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়েও এটিকে আর পাওয়া যাবে না। নষ্ট হয়ে গেলে চিরকালের মতো চলে যাবে এটি। এখন পৃথিবীতে এমন কোন শিল্পী নেই যিনি ঠিক এর মতো আর একটি কামদেব নির্মাণ করতে পারেন। আর একটি কথাও আপনাকে বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি। কামদেব প্রেমের দেবতা, তাঁকে এমন নিষ্ঠুরভাবে অপমান করা কি উচিত হবে? প্রেমই কি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম নয়? আমি জীবনে যদি কোন পাপ করে থাকি তা প্রেমের পথে না গিয়েই করেছি, এঁর প্ররোচনায় নয়— এর নির্দেশ লঙ্ঘন করেই করেছি এঁর নির্দেশে যা করেছি তার জন্য আমি একটুও অনুতাপ করি না, যা করিনি তার জন্যই আমি অনুতপ্ত। ইনি প্রেমের পায়েই আত্মসমর্পণ করতে বলেন, পশুর পায়ে নয়। সর্বধর্মের ইনিই প্রধান দেবতা, তাই ইনি পূজনীয়। আপনি ভাল করে চেয়ে দেখুন, এই ক্ষুদ্র মূর্তিটির গঠননৈপুণ্য কি অপূর্ব! মনে হচ্ছে মালীর দাড়ির ঝোপে একটি জীবন্ত শিশু যেন লুকিয়ে আছে। সিন্ধুপতি যখন আমার প্রণয়ী ছিল তখন এটি আমাকে উপহার দিয়েছিল বলেছিল 'এ আমার কথা তোমাকে মনে করিয়ে দেবে।' কিন্তু কামদেব তার কথা আমাকে একদিনও মনে করিয়ে দেয়নি, দিয়েছিল ইন্দ্রপ্রস্থের একটি যুবকের কথা, যাকে সত্যিই আমি ভালবেসেছিলাম। সবই তো পুড়িয়ে দিলেন আপনি এটিকে পোড়াবেন না। এটিকে বরং কোন মন্দিরে দান করে দিন। যে একে দেখবে সেই মুগ্ধ হবে, তারই মন পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। প্রেমই তো ঈশ্বর— "

মালীটি ভাবিল, কামদেব বুঝি রক্ষা পাইলেন। সে মূর্তিটিকে স্নেহভরে আদর করিতে লাগিল। সহসা সাবর্ণি তাহার হাত হইতে মূর্তিটি কাড়িয়া লইয়া সজোরে তাহা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সিন্ধুপতি যখন ও মূর্তিকে স্পর্শ করেছে তখন ও অশুচি হয়ে গেছে। কোনও মন্দিরে স্থান পাবার যোগ্যতা ওর নেই "

তাহার পর তিনি পাগলের মতো ওড়না, আয়না, চিরুনি, সেতার, এস্রাজ, বীণা, বাঁশী, প্রদীপ, স্বর্ণ পাদুকা যাহা যাহা কাছে পাইলেন স্বহস্তে সব ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অগ্নিশিখা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। রাবণের চিতাও বোধ হয় এমন ভাবে জ্বলে নাই। ধ্বংসের নেশায় উন্মত্ত হইয়া ক্রীতদাসেরা উদ্বাহু হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ধুমে, স্ফুলিঙ্গে, চীৎকারে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

নিদারুণ শব্দে ঘুমন্ত প্রতিবেশীদের ক্রমশ ঘুম ভাঙিতে লাগিল। তাঁহারা বাতায়ন খুলিলেন এবং চতুর্দিক ধুমাচ্ছন্ন দেখিয়া যুগপৎ ভীত ও বিস্মিত হইলেন। তাহার পর কোথায় আগুন লাগিয়াছে জানিবার জন্য হন্তদন্ত হইয়া সকলে পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। অনেকে ইহা

পর্যন্ত লক্ষ্য করিলেন না যে, তাঁহাদের পরিচ্ছদ অসম্পূর্ণ বা বিস্রস্ত রহিয়াছে। সকলেরই মনে মুখে একই প্রশ্ন—ব্যাপাবটা কি?

যাঁহাবা নিবঞ্জনার বাড়ির সম্মুখে সমবেত হইলেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বণিক। নিরঞ্জনা তাঁহাদেব একজন প্রধান খবিদ্দার ছিল। অলঙ্কার, আতর, রেশম প্রভৃতি দেশী বিদেশী বহু জিনিস তাঁহাবা নিরঞ্জনার নিকট বিক্রয় করিতেন। ইঁহারা গলা বাড়াইয়া ঠাহর করিবার চেষ্টা করিলেন, ভিতরে এই অগ্নিকাণ্ডের অর্থ কি! যে সব অল্পবয়স্ক ছোকরা সবে উচ্ছন্ন যাইতে শিখিয়াছে. যাহারা হাতে গলায় ফুলের মালা দুলাইয়া ভোরের দিকে স্খলিত চরণে বাড়ি ফিরিতেছিল, তাহারাও দাঁড়াইয়া পড়িল এবং কোলাহল করিতে লাগিল। ক্রমশ বেশ ভীড় জমিযা গেল। ক্রমশ এ কথাও আর চাপা রহিল না যে, একজন সন্ন্যাসীর প্ররোচনায় অভিনেত্রী নিবঞ্জনা তাহার সমস্ত ঐহিক ঐশ্বর্য অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া পরলোকের সন্ধানে যৌবনেই বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই নিদারুণ সংবাদে সকলেই মুহ্যমান হইয়া পড়িল। বণিকেরা ভাবিল, নিরঞ্জনা যখন শহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তখন তাহাব নিকট আর কিছু বিক্রয করিবাব আশা নাই। এমন একটা শাঁসালো খরিদ্দার চিরকালের মতো হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে, এই ভয়ঙ্কর চিন্তা তাহাদের বিচলিত কবিয়া তুলিল। এ কথাও তাহাদেব মনে হইল, ওই সন্ন্যাসী যাদুমন্ত্রভাবে নিশ্চয়ই নিরঞ্জনার বুদ্ধিভ্রংশ করিযাছে, তাহা না হইলে এমন একটা অঘটন ঘটিবে কেন! সুতবাং অবিলম্বে ইহার একটা প্রতিকার করা প্রয়োজন। না করিলে অনেকের ব্যবসা নষ্ট হইয়া যাইবে, নিবঞ্জনাকে কেন্দ্র কবিয়াই তো অনেক দোকান গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের অবশেযে মনে হইল, ওই সন্ন্যাসীকে আমরা এমন অনর্থ করিতে দিব কেন? আমরা বাধা দিব দেশে কি আইন নাই? বিচাবক নাই? নিবঞ্জনা সমস্ত পাটলিপুত্রের সম্পদ, একটা সন্ন্যাসী আসিয়া তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া যাইবে, চালাকি না কি! তাহাকে জোর কবিয়া ধরিয়া রাখিতে হইবে।

অল্পবযস্ক ছোকরাবা ক্ষুব্ধ হইল অন্য কারণে। তাহাদের মনে হইল, নিরঞ্জনা যদি চলিয়া যায তাহা হইলে তো সব গেল, সমস্ত আমোদপ্রমোদ অভিনয় উৎসব নিবিয়া যাইবে। রঙ্গ মঞ্চে নিবঞ্জনাই তো সম্রাজ্ঞী। নিরঞ্জনার নাগাল পাইবার সামর্থ্য যাহাদের নাই, নিরঞ্জনা তাহাদেবও আনন্দের উৎস। তাহারা তাহাদের প্রণয়িনীদের মধ্যে কল্পনায় নিরঞ্জনাকেই চুম্বন করে, আলিঙ্গন করে। সমস্ত পাটলিপুত্রই নিরঞ্জনাময। সে আছে বলিযাই পাটলিপুত্রের আকাশ বাতাস মদির, তাহার অস্তিত্বই সকলকে প্রেমোন্মত্ত করিয়াছে।....

যুবকেরা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়িল। শ্রীতিলক নামক এক যুবকের সহিত কিছুকাল পূর্বে নিবঞ্জনার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। সে তারস্বরে ভণ্ড সন্ন্যাসীদের গালাগালি দিতে লাগিল। অবশেযে সকলেই নিরঞ্জনার আচবণে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। নানাপ্রকার মন্তব্য শোনা যাইতে লাগিল।

"এভাবে চলে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।"

"চুরি করে চলে যাওয়া ভীরুতারই নামান্তর।"

"আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল। হায় হায় হায়—"

"ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেলে আমাদের সংসার চলবে কি করে! মেয়েগুলোর বিয়ে হবে না যে!"

"নিরঞ্জনাকে যে মুকুটগুলো দিয়েছিলাম তার দাম না পাওয়া পর্যন্ত আমি কিছুতেই ওকে যেতে দেব না।"

"আমাকে পঞ্চাশখানা শাড়ি আনতে বলেছে, তার দামও দিয়ে যেতে হবে।"

"চতুর্দিকে ওর ধার। চলে গেলেই হল!"

"ও চলে গেলে দ্রৌপদী, উর্বশী, দময়ন্তী, মেনকার ভূমিকায় অমন অভিনয় আর কে কববে! রোহিণী বা রেবতীব সাধ্য নেই ওর কাছাকাছি হবার।"

"নিরঞ্জনা না থাকলে জীবনই তো অন্ধকাব হয়ে গেল হে। পাটলিপুত্রের আকাশে নিবঞ্জনাই সূর্য, নিরঞ্জনাই চন্দ্র, নিরঞ্জনাই নক্ষত্র।"

নগবের সমস্ত ভিক্ষুকরাও সমবেত হইয়াছিল। অন্ধ খঞ্জ পক্ষঘাতগ্রস্ত গলিতকুষ্ঠবিক্ষত বালক-বালিকা যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলে আসিয়াছিল, কেহ আর বাকি ছিল না। তাহারা জনতাব পিছনে দাঁড়াইয়া আর্তনাদ করিতেছিল।

"নিবঞ্জনা না থাকলে আমবা বাঁচব কি করে? কে আমাদেব খাওয়াবে? নিবঞ্জনার বান্নাঘর থেকে শত শত ভিক্ষুক খেতে পায রোজ। ওর প্রণয়ীরা আমাদের মুঠো মুঠো টাকা দিয়ে যায় রোজ—এখন আমাদের গতি কি হবে?"

তস্করেবাও আসিয়া জুটিয়াছিল। তাহাদের অন্য মতলব ছিল। তাহারা গগনবিদারী চীৎকার করিয়া জনতাব মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস পাইতেছিল লুটপাট করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া।

এই কোলাহলের মধ্যে বৃদ্ধ বণিক জনকদেব কেবল শান্ত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বড় ব্যবসায়ী। গান্ধার হইতে পশমের এবং সমতট হইতে কার্পাস বস্ত্রের আমদানি করিয়া তিনি পাটলিপুত্রের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিতেন। নিরঞ্জনার নিকট তাঁহার বহু টাকা বাকি ছিল। নিরঞ্জনা যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে চলিয়া যাইতে পারে— এ সংশয় তাঁহার মনে কোনও দিন জাগে নাই। তিনি উৎকর্ণ হইয়া সম্মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া নিজের সূক্ষ্মাগ্র দাড়িতে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেছিলেন। তাঁহাকে অতিশয় চিন্তাগ্রস্ত মনে হইতেছিল।

কিছুক্ষণ দাড়িতে হাত বুলাইয়া অবশেষে তিনি শ্রীতিলকের সমীপবর্তী হইলেন। বলিলেন, "আপনার সঙ্গে নিরঞ্জনার তো খুব আলাপ ছিল এককালে! চেষ্টা কবে দেখুন না একটু, সন্ন্যাসীটার কবল থেকে যদি ওকে ছাড়াতে পারেন:

"সন্ন্যাসীর সাধ্য কি ওকে নিয়ে যায়! মামাবাড়ির আবদার পেয়েছে না কি! যাচ্ছি আমি নিরুর কাছে। জাঁক করছি না, তবে আমার বিশ্বাস এতদিন পরে আমাকে কাছে পেলে ওই ভূতুড়ে সন্ন্যাসী আর আমল পাবে না। কি কালো রঙ বাবা! যেন ঝুল মেখে রয়েছে। মানুষের এ রকম রঙ দেখেছেন আপনি এর আগে? একটা ভালুক যেন! ওহে, সর সর, আমাকে যেতে দাও।"

শ্রীতিলক কাহাকেও ধাক্কা দিয়া, কাহারও পা মাড়াইয়া, কাহারও পাশ কাটাইয়া অবশেষে নিরঞ্জনার কাছে গিয়া হাজির হইলেন এবং তাহাকে এক ডাকিয়া বলিলেন, "নিরু, চিনতে পারছ আমাকে? কি কাণ্ড করছ তুমি! তুমি চলে যাবে শুনে আমি ছুটতে ছুটতে এসেছি। এখনও তোমাকে ভুলতে পরি নি নিরু, তোমাকে ভোলা যায় কি— তুমিই বল?"

শ্রীতিলক আর বেশী কিছু বলিবার অবকাশ পাইলেন না। মহর্ষি সাবর্ণি সগর্জনে অগ্রসর হইয়া নিরঞ্জনাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন।

"পাষণ্ড, মৃত্যুভয় যদি থাকে নিরঞ্জনার অঙ্গ স্পর্শ করো না। নিরঞ্জনা আর নটী নেই। সে এখন নিষ্পাপ, সে এখন ঈশ্বরের। সরে যাও এখান থেকে—"

"তুই বেটা সরে যা কুত্তা কোথাকার!"—ক্রোধে শ্রীতিলকের মুখ হইতে অভব্য ভাষা বাহির হইয়া পড়িল—"আমি আমার পুরনো সইয়ের সঙ্গে কথা কইছি, তুই শালা ভালুক সামনে এসে দাঁড়ালি কোন আক্কেলে? তোর ওই দাড়ি ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তোকেই ওই আগুনের মধ্যে ফেলে দেব জানিস? বাঁদরামি করবার জায়গা পাওনি তুমি? মেয়েমানুষকে ভোজবাজি দেখিয়ে পার করবে ভেবেছ? আমার প্রাণ থাকতে তা পারবে না।"

শ্রীতিলক নিরঞ্জনার দিকে পুনরায় হস্ত প্রসারণ করিতেই মহর্ষি সাবর্ণি আচমকা তাঁহাকে এমন জোরে একটা ধাক্কা দিলেন যে, তিনি মুখ থুবড়াইয়া সেই জ্বলন্ত স্তূপের নিকট পড়িয়া গেলেন। আর একটু হইলে তাঁহার কাপড়ে আগুন ধরিয়া যাইত।

বৃদ্ধ জনকদেব এতক্ষণ নিষ্ক্রিয় ছিলেন, এইবার সক্রিয় হইযা উঠিলেন। তিনি মহর্ষি সাবর্ণির বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন শ্রীতিলককে সন্ন্যাসী প্রহার করিয়াছে—এই অজুহাতে ক্ষিপ্ত জনতাকে উন্মত্ত করিযা তুলিবেন। হইলও তাই। অনতিবিলম্বে একদল লোক সাবর্ণিকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। শ্রীতিলকের কাপড়ে আগুন লাগে নাই বটে, কিন্তু মাথাব চুল একটু ঝলসাইযা গিয়াছিল। ক্রোধে এবং ধুমে তিনি প্রায় রুদ্ধশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনিও জনতার সহায়তা লইয়া সন্ন্যাসীকে শাস্তি দিবেন ঠিক করিয়া উন্মত্তের মতো তাহাদের দলে যোগ দিলেন এবং গালাগালি দিতে দিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার পিছু পিছু দণ্ড আস্ফালন করিতে করিতে ভিখারীর দলও আসিতে লাগিল। ভিখারীদের মধ্যে যাহারা চলচ্ছক্তিরহিত তাহারাও ক্ষান্ত হইল না। হামাগুড়ি দিয়া দল বৃদ্ধি করিল। অচিরাৎ মহর্ষি সাবর্ণি ও নিরঞ্জনাকে ঘিরিয়া যেন একটি অরণ্য গড়িয়া উঠিল—ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত বাহু ও দণ্ডের অরণ্য। তাঁহারা দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। জনতা চীৎকার করিতে লাগিল।

"খুন কর সন্ন্যাসীকে—"

"আগুনে ঠেলে ফেলে দাও। জীবন্তে পোড়াও ব্যাটাকে—"

সাবর্ণি নিরঞ্জনাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাহার পর জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মূঢ় পাষণ্ডের দল, তোমরা কি নিজেদের শঙ্করের চেয়েও শক্তিমান ভেবেছ? যে নারী স্বেচ্ছায় শঙ্করের চরণে আত্মসমর্পণ করেছে, তাকে তোমরা ছিনিয়ে নিতে চাও? ছিনিয়ে

নিতে পারবে? এত শক্তি কি আছে তোমাদের? এ হাস্যকর ব্যাপারে না মেতে তোমরা বরং নিরঞ্জনাকেই অনুসরণ কর। যদি করতে পার তোমাদের মধ্যে যা কর্দমের মতো মলিন হয়ে আছে তা স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তখন প্রকৃত স্বাধীনতার আস্বাদ পাবে। যে মিথ্যা বন্ধন তোমাদের ক্রীতদাসের মতো পরাধীন করে রেখেছে তা ছিন্ন কর, নিরঞ্জনা যেমন করছে। বিলম্ব করো না, শঙ্কর তোমাদের সকলের জন্যই অপেক্ষা করছেন, আর কতকাল তিনি অপেক্ষা করবেন? কালের করাল গহ্বরে পশুর মতো বিলীন হয়ে যাওয়ার আগে তাঁর শরণ নিয়ে মনুষ্যত্ব লাভ কর। তোমাদের উদ্ধারের এখন একমাত্র উপায় অনুতাপ করা। জীবনে যে সব পাপ করেছ অকপটে তা স্বীকার কর, কাঁদ, প্রার্থনা কর, শঙ্কর তোমাদেরও চরণে স্থান দেবেন, নিরঞ্জনাকে যেমন দিয়েছেন। তোমাদের পাপও ওর চেয়ে কিছু কম নয়। এখানে তোমাদের মধ্যে একজনও কি আছে যে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে, গণিকার চেয়ে যে কম পাপী? তোমরা প্রত্যেকেই তো মূর্তিমান কদর্যতা। শঙ্করের দয়াতেই কেবল তোমাদের নাক মুখ দিয়ে নর্দমার মতো ময়লা বেরোয় না—"

মহর্ষি সাবর্ণির দৃষ্টি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, তাঁহার বাক্যগুলিও যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো তাঁহার মুখ হইতে ঝরিয়া পড়িল। জনতা কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তাহা কয়েক মুহূর্তের জনাই। বণিক জনকদেব সাবর্ণির বক্তৃতায় কান দেন নাই, তিনি উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছিলেন। সেগুলি তিনি ভিক্ষুকদের হাতে হাতে দিয়া ছুঁড়িতে ইঙ্গিত করিলেন। মহর্ষি সাবর্ণির কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটি সুনিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড তাহার কপালে আসিয়া আঘাত কবিল, ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। বক্তধাবা তাঁহার গাল বাহিয়া টপ টপ করিয়া নিরঞ্জনার মাথার উপর ঝরিয়া পড়িল। মনে হইতে লাগিল, তপস্যাক্লিষ্ট সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ বুঝি শোণিতে পরিণত হইয়া তাহার মস্তকে বর্ষিত হইতেছে। সাবর্ণি নিরঞ্জনাকে দৃঢ়রূপে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহার কর্কশ বহির্বাসের ঘর্ষণে তাঁহার সুকোমল অঙ্গ পীড়িত হইতেছিল, রক্তপাত দেখিয়া তাহাব অন্তর আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।

এই সময় ভীড় ঠেলিয়া সিন্ধুপতি প্রবেশ করিলেন। তাঁহার স্বর্ণচম্পকশোভিত মূল্যবান শিরস্ত্রাণটি দেখিয়া সকলে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। শীলভদ্রের শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করিয়া তিনি বাড়ি ফিরিতেছিলেন। নিরঞ্জনার বাড়ির পাশ দিয়াই রাস্তা। হট্টগোল শুনিয়া তিনি দাঁড়াইয়া পড়িলেন, তাহার পর ভীড়ের ভিতরে প্রবেশ করিয়া শিলা-নিবাসের সমীপবর্তী হইলেন। নিকটে আসিয়া তাঁহাকে পুনরায় দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। তিনি যেন একটা অপ্রত্যাশিত আঘাত পাইলেন। নিরঞ্জনার ছিন্ন মলিন বেশ, বিরাট অগ্নিস্তূপ এবং রক্তাক্ত সাবর্ণিকে দেখিবেন—এ প্রত্যাশা তিনি করেন নাই। কয়েক মুহূর্ত তিনি থমকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু খুব বেশী বিস্মিত বা বিচলিত হইলেন না, কোন কিছুতেই বেশী বিস্মিত বা বিচলিত তিনি হইতেন না। কিন্তু যখন তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, তাঁহার বাল্যবন্ধুটি ক্ষিপ্ত জনতার কবলে পড়িয়াছে তখন আর অবিচলিত দর্শকরূপে দাঁড়াইয়া থাকাটা উচিত মনে হইল না। হাত তুলিয়া তিনি সকলকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস পাইলেন।

"থাম, থাম, এ কি করছ তোমরা? এই সন্ন্যাসী আমার বাল্যবন্ধু, নিজের লোক, পাগলের মতো তোমরা করছ কি?"

সিন্ধুপতির বাক্‌চাতুর্য দার্শনিক মহলে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত, কিন্তু মূর্খ জনতাকে শান্ত করিতে পারে এমন উগ্র বাগ্মিতা তাঁহার ছিল না। কেহ তাঁহার কথায় কর্ণপাত পর্যন্ত করিল না। সাবর্ণির মাথার উপর আর এক প্রস্থ শিলাবৃষ্টি হইয়া গেল। সাবর্ণি সর্বাঙ্গ দিয়া নিরঞ্জনাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং লোষ্ট্রের আঘাতকে শঙ্করের অনুগ্রহ ভাবিয়া তাঁহাকে মনে মনে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সিন্ধুপতি উচ্চতম গ্রামে চীৎকার করিয়াও যখন উন্মত্ত জনতাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না তখন যে পরমেশ্বরের অস্তিত্বে তাঁহার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না, তাঁহারই হস্তে সাবর্ণি ও নিরঞ্জনাকে সমর্পণ করিয়া তিনি রণে ভঙ্গ দিবেন কি না চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহাব মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। সাধারণ ইতর লোকের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কোন কালেই উচ্চ ছিল না। তাহাদের তিনি দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তু বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মনে হইল, একটা কৌশল করিলে ইহারা হয়তো নিবৃত্ত হইবে। তিনি ধনী এবং শৌখীন লোক ছিলেন, সঙ্গে সর্বদা কিছু অর্থ থাকিত। তখন তাঁহার সঙ্গে একটি থলিতে কিছু স্বর্ণ ও বৌপ্য মুদ্রা ছিল। তিনি থলিটি লইয়া লোষ্ট্রনিক্ষেপকারীদের মধ্যে ছুটিয়া গেলেন এবং তাহাদের কানের কাছে থলিটি নাড়িতে লাগিলেন। স্বর্ণ-রৌপ্যের মধুর নিক্কণও প্রথমে তেমন কার্যকরী হইল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হইল। যে সব ভিক্ষুক উন্মত্তবৎ ঢিল ছুঁড়িতেছিল তাহারা তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। সিন্ধুপতি তখনই থলি খুলিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাগুলি ছড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ফল হইল। সকলে টাকা ও মোহর কুড়াইতে লাগিল। কৌশল সফল হইয়াছে দেখিয়া সিন্ধুপতি চারিদিকে অনেক দূরে দূরে টাকা ছুঁড়িতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুক, ক্রীতদাস ও বণিকের দল মাটির উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল। শ্রীতিলককে ঘিরিয়া যে সব অভিজাতবংশীয় যুবক দাঁড়াইয়া ছিল, মজা দেখিয়া তাহারা অট্টহাস্য করিতে লাগিল। শ্রীতিলকের ক্রোধ প্রশমিত হইয়াছিল। নূতন মজা দেখিয়া তিনি এবং তাঁহার বন্ধুরা প্রলুব্ধ জনতাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন, শেষে তাঁহারা নিজেরাও পয়সা টাকা ছুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত প্রান্তরে আর মানুষের মাথা দেখা গেল না, চারিদিকেই কেবল ন্যুব্জপৃষ্ঠ। মনে হইতে লাগিল, যেন আকাশ হইতে স্বর্ণ-রৌপ্য বৃষ্টি হইতেছে এবং এক অদ্ভুত জন-সমুদ্রের তরঙ্গমালা আন্দোলিত হইতেছে। সাবর্ণির কথা সকলে ভুলিয়া গেল।

সিন্ধুপতি তখন তাঁহার নিকট ছুটিয়া গেলেন। নিজের গাত্রাবাস দিয়া তাঁহাকে এবং নিরঞ্জনাকে আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাদের পাশের একটা রাস্তায় টানিয়া লইয়া গেলেন। তাহার পর তিনজনেই কিছুক্ষণ নীরবে ছুটিতে লাগিলেন। জনতার নিকট হইতে দূরে গিয়া যখন তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, জনতা আর তাঁহাদের নাগাল পাইবে না তখন তাঁহাদের গতিবেগ মন্দীভূত হইল।

সিন্ধুপতি তখন নিরঞ্জনার দিকে ফিরিয়া ব্যঙ্গের সুরে বলিলেন, "সাধুর মনস্কামনা সিদ্ধ

হয়েছে তা হলে। রাবণ সীতাকে হরণ করেছিল বটে, কিন্তু তাকে অরণ্য থেকে স্বর্ণলঙ্কায় নিয়ে গিয়েছিল, সাবর্ণি ঠিক উল্টোটা করলেন। নগর থেকে তোমাকে অরণ্যে নিয়ে চলল।"

নিরঞ্জনা উত্তর দিল, "তার কারণ আপনাদের সঙ্গ আমার আর ভাল লাগছিল না। আপনাদেব ঐশ্বর্যের নানা আড়ম্বর, আপনাদের মেকি মুখোশ আর সহ্য করতে পারছিলাম না আমি। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। জীবনে আজ পর্যন্ত যা জেনেছি, যা ভোগ করেছি, তার সম্বন্ধে এতটুকু মোহ নেই আর। তাই অজানার সন্ধানে বেরিয়েছি। আমাব এতদিনকার অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু অন্তত বুঝেছি যে, যা আমরা আনন্দ বলে উপভোগ করি তা প্রকৃত আনন্দ নয়। মহর্ষি বলেছেন—দুঃখই প্রকৃত আনন্দের উৎস। তাঁর কথায় আমার বিশ্বাস হয়েছে, কারণ সারাজীবন উনি সত্যেরই সন্ধান করেছেন।"

সিন্ধুপতি হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু পেয়েছেন একটি মাত্র সত্য। আমি সারাজীবন সন্ধান করে অনেক সত্যের সন্ধান পেয়েছি। সে হিসেবে আমি ওঁর চেয়ে বড় সত্যদর্শী। কিন্তু সে জন্য আমি গর্ব অনুভব করি না, সে জন্য বেশী সুখীও হইনি।"

সাবর্ণি তাঁহাব দিকে রোষকষাযিত দৃষ্টিনিক্ষেপ কবিতেছেন দেখিয়া সিন্ধুপতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি যেন মনে কবো না যে, আমি তোমাকে ঠাট্টা করছি বা তোমার আচরণ অযৌক্তিক মনে কবেছি। তোমার জীবনেব সঙ্গে আমাব তুলনা করলে কোনটা বেশী ভাল তা নির্ণয করতে বেশী বুদ্ধির দবকাব হয় না। সুনন্দা আর সুছন্দা আমার স্নানের ব্যবস্থা কবে রেখেছে। আমি ফিরে গিয়ে এখন স্নান কবব, তারপর মধ্যপ্রদেশের অবণ্য থেকে আহবিত শূল্যপক্ক একটি তিত্তির পক্ষী আহাব করব। তারপব পড়ব কালিদাস বা ভবভূতি। অনেকবার পড়েছি, তবু পড়ব। তুমি তোমাব পর্ণকুটিরে ফিবে গিযে তোমার শিবলিঙ্গের সামনে উটের মতো হাঁটু গেড়ে বসবে, তারপর যে সব প্রাণহীন মন্ত্র সহস্রবার আউড়েছ সেগুলিই বোধ হয় আওড়াবে, তারপর কিছু শুষ্ক ফল-মূল খাব। যদিও আপাতদৃষ্টিতে আমাদের দুজনের জীবন দু রকম; কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে আমাদের দুজনেরই লক্ষ্য এক। সমস্ত মানবজাতিরই ওই এক লক্ষ্য—আনন্দ লাভ করা, যা করা অসম্ভব, যা পাওয়া যায় না, আলেয়ার মতো যা কেবল সকলকে ঘুরিয়ে নিযে বেড়াচ্ছে। সুতরাং তোমাকে উপহাস করে খেলো করবার অধিকার আমার নেই, যদিও আমি আমার নিজের জীবনযাত্রার ধরনটাকেই বেশী পছন্দ করি। নিরঞ্জনা, তোমাকেও বাধা দেবার চেষ্টা আমি করব না। তুমি ওর সঙ্গেই যাও। বিলাস, ঐশ্বর্য, সঙ্গীত, অভিনয়, খ্যাতি প্রভৃতির মধ্য থেকে এতদিন তুমি যা পেয়েছ, তার চেয়ে বেশী আনন্দ পাবার আশা যদি পেয়ে থাক, কৃচ্ছ্রসাধন করে এর চেয়ে বেশী সুখী হওয়া তোমার পক্ষে যদি সম্ভবপর হয়, তা হলে সে সুখ লাভ কর গিয়ে। সমস্ত দিক দিয়ে ভেবে দেখলে এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, তুমি অভাবনীয় একটা সুযোগও পেয়ে গেছ। আমাদের ওপর টেক্কা দিয়েছ। আমি এবং সাবর্ণি প্রত্যেকেই নিজের রুচি অনুসারে মাত্র একটি পথ বেছে নিয়েছি, সেই পথ অনুসরণ করেই সুখের সন্ধান করছি। তুমি একটা পথের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আর একটা পথে পা

বাড়াচ্ছ। এ সুযোগ সকলের হয় না, তোমাকে আমি ঈর্ষা কবি। আমি কিছুক্ষণেব জন্যও সাবর্ণির মতো সন্ন্যাসী হবাব সুযোগ পেলে খুশী হতাম। কিন্তু তা আমি পাব না, আমাব মনের গড়ন আর বদলাবে না। সুতবাং চলি এবাব। আমাব, বিদায় অভিনন্দন গ্রহণ কব তোমরা। নিবঞ্জনা, তোমার অদৃষ্ট, তোমার প্রকৃতি, তোমার অন্তবেব নিগূঢ় প্রেবণা যে পথে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে সেই পথেই যাও তা হলে। আমাব আন্তরিক শুভ কামনা বইল তোমার সঙ্গে। তোমার নূতন সন্ধান জয়যুক্ত হোক। সুখী হও, যদি পাব। বুঝতে পারছি কথাগুলো খুব বাজে শোনাচ্ছে। কিন্তু কি করব বল, যাওয়ার আগে দু-চার কথা বলতেই হবে। যে মোহিনী মায়ায় তুমি আমার জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলে, যাব স্মৃতি সুখস্বপ্নের মতো এখনও আমার জীবনের প্রত্যন্ত প্রদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার বেদনাময় বৃহৎ ব্যর্থতার কথা বর্ণনা করা এখন শোভা পায় না, তাই সে সব আর বলব না। তুমি আমাব শুভাকাঙ্ক্ষিণী ছিলে, কিন্তু তোমাকে হয়তো আমি ভাল করে বুঝতে পারিনি। স্বতঃস্ফূর্ত মহিমান্বিতা তুমি, অদ্ভুত বহস্যে রহস্যময়ী, অপূর্ব কিবণে উজ্জ্বল করেছিলে আমাব জীবনকে। এবার বিদায় নেবার সময় এসেছে, হাসিমুখে বিদায় দাও। জানি না কোন্ বিধাতা কি উদ্দেশ্যে তোমার মতো অপরূপাকে এই নির্মম পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন—"

সিন্ধুপতি যখন এই কথাগুলিকে বলিতেছিলেন, তখন মহর্ষি সাবর্ণির অন্তব ক্রোধে পুড়িয়া যাইতেছিল। সহসা তিনি উদ্দীপ্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দূব হয়ে যাও তুমি। তোমাকে আমি ঘৃণা করি—তুমি ঘৃণ্য নরকের কীট। দূর হয়ে যাও। যারা আমাদের এতক্ষণ গাল দিচ্ছিল, আমাদের দিকে ঢিল ছুঁড়ছিল তাদের চেয়ে সহস্রগুণ ভয়ঙ্কর তুমি। তাঁরা অজ্ঞ, কি করছে তারা তা জানে না। ওদের মাথায় শঙ্করের আশীর্বাদ একদিন হয়তো বর্ষিত হবে, আমি ওদের জন্যে মনে মনে প্রার্থনাও করেছি, ওদের অন্ধকার জীবন শিবের মহিমা-কিবণে একদিন আলোকিত হবে। কিন্তু তুমি, সিন্ধুপতি, তুমি মূর্তিমান গরল ছাড়া আর কিছু নও, তোমার নিশ্বাসে প্রশ্বাসে বিষ। তুমি যেখানে যাবে মৃত্যুর বীজ ছড়াতে ছড়াতে যাবে। সহস্রমুখ পিশাচের চেয়েও ভয়ঙ্কর তুমি, তোমার হাসি আরও ভয়ানক। পিশাচেরা এক শতাব্দী চেষ্টা করে যে সর্বনাশ করতে পারবে না, তোমার হাসি এক নিমেষে তা পারবে। তুমি দূর হও—"

সিন্ধুপতি স্নেহভরে তাঁহার দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "বেশ, চললাম তা হলে। তোমার ধর্মবিশ্বাস তোমাকে মাত্র দুটি জিনিস দিয়েছে দেখছি—প্রেম আর ঘৃণা। আমরণ সেই দুটিকেই আঁকড়ে থাক। নিরঞ্জনা, চলি তা হলে, আর হয়তো দেখা হবে না। আমাকে ভুলতে চেষ্টা করো না, পারবে না। আমিও পারব না।"

সিন্ধুপতি চলিয়া গেলেন। আঁকাবাঁকা বহু গলি পার হইয়া তিনি অবশেষে শ্মশানের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটি দোকানে শবদাহের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সজ্জিত ছিল। স্তূপীকৃত চন্দনকাষ্ঠগুলির দিকে চাহিয়া তিনি ভাবিলেন, এইগুলিই তাঁহার জীবন-পথের শেষ সঙ্গী হইবে। ইহাদের ভস্মের সহিত তাঁহার ভস্মও মিশিয়া যাইবে। সহসা তাঁহার মনে হইল, মদনও ভস্মীভূত হইয়াছিল। বুকের কাছটা কেমন যেন ব্যথা করিয়া উঠিল। সান্ত্বনা বহন

করিয়া দার্শনিক চিন্তাও উদিত হইল। ভাবিলেন, সময় বা আয়ু কিছু আছে কি? এসব তো মনের ভ্রম মাত্র। আয়ু কিছু নাই, সুতরাং তাহা শেষ হইবে কিরূপে? চিরকাল কি বাঁচিয়া থাকিব? না। বাঁচিবার কোনও প্রশ্নই উঠে না। চিরকাল মৃত্যুর মধ্যেই ছিলাম, আছি এবং থাকিব। ইহাই সত্য। যাহা আমাকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে তাহার আগমন-আশঙ্কায় নূতন কবিযা ম্রিয়মাণ হওয়া মূঢ়তারই নামান্তব। ইহা যেন পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠার মতো। পুস্তকটি পড়িতেছি কিন্তু এখনও শেষ হয় নাই। পুস্তকটি মৃত্যু— এই চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া তিনি পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন, কিন্তু হৃদয়ের ভার লঘু হইল না। ভারাক্রান্ত হৃদয়েই তিনি নিজের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছন্দা-নন্দার হাস্যকলরব তাঁহাকে অনেকটা আশ্বস্ত করিল। তাহার ভিতরে লুকোচুরি খেলিতেছিল।

মহর্ষি সাবর্ণি নিরঞ্জনাকে লইয়া পাটলিপুত্র ত্যাগ করিলেন। গঙ্গার তীর ধরিয়া তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। মহর্ষি সাবর্ণির ক্রোধ তখনও প্রশমিত হয় নাই। তিনি নিরঞ্জনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ''এতকাল যে সব পাপ তুমি করেছ গঙ্গার সমস্ত জল দিয়েও তা ধুয়ে পরিষ্কার করা যাবে না। তোমার যে দেহ ভগবান নিজের মন্দিরের মতো করে সৃষ্টি করেছিলেন সেই দেহ তুমি শূকরীর মতো, কুক্কুরীর মতো বিক্রি করেছ ওই সব অধার্মিক লম্পটদের কাছে। তোমার পাপের সীমা নেই। দুরপনেয় পাপ দুর্গন্ধ বিষ্ঠার মতো লিপ্ত হয়ে আছে তোমাব সর্বাঙ্গে।''

নিরঞ্জনা কোন উত্তর দিল না—প্রখর রৌদ্রে, কঙ্করাকীর্ণ পথে নীরবে তাঁহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। অনেক দূর চলিবাব পর ক্লান্তিতে তাহার দেহ অবসন্ন হইল, পা দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তৃষ্ণায় রসনা শুষ্ক হইল, কিন্তু মহর্ষি সাবর্ণি সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। সাধারণ মানুষের হয়তো দয়া হইত, কিন্তু তাঁহার হইল না। নিরঞ্জনার কলঙ্কিত দেহটা নির্যাতিত হইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে এই ভাবিয়া তিনি বরং আনন্দিতই হইলেন। এই পবিত্র ভাব তাঁহাকে এমন পাইয়া বসিল যে, অতীত পাপের সাক্ষ্য বহন করিয়া যে দেহটা এখনও রূপে রসে টলমল করিতেছে, সেই দেহটাকে বেত্রাঘাত করিয়া বিক্ষত রক্তাক্ত করিয়া দিবার বাসনাও তাঁহার হইল। একটু চিন্তা করিয়া এ বাসনার সমর্থনও তিনি নিজের অন্তর হইতে পাইলেন, বিশেষ করিয়া যখন তাঁহার মনে পড়িল যে নিরঞ্জনা সিন্ধুপতির সহিত একই শয্যায় শয়ন করিয়াছে। এই পাপের বীভৎসতায় তিনি এমন অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল, নিশ্বাস অবরুদ্ধ হইয়া গেল— মনে হইতে লাগিল এখনই বুঝি বুকটা ফাটিয়া যাইবে। যে অভিশাপ তিনি উচ্চারণ করিতে গেলেন কণ্ঠ দিয়া তাহা বাহির হইল না, দন্তে দন্তে ঘর্ষিত হইয়া একটা অস্ফুট শব্দ বাহির হইয়া কেবল। সহসা এক লম্ফে তিনি নিরঞ্জনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, চোখের দৃষ্টিতে ধক ধক করিয়া আগুন জ্বলিতেছিল মনে হইতেছিল। স্বয়ং রুদ্রই বুঝি ভয়ঙ্কর মূর্তিতে তাঁহার সর্বাঙ্গ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি নিরঞ্জনার নিগূঢ় আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই সম্ভবত এক দৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর সহসা তাহার মুখের উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলেন।

নিরঞ্জনা কিছু বলিল না, তাহার গতিও শ্লথ হইল না, সে নীরবে নিষ্ঠীবন মুছিয়া ফেলিল।

ইহার পর সাবর্ণিই তাহার পিছু পিছু চলিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, নিরঞ্জনা যেন মানুষ নয়, একটা অতলস্পর্শী গহ্বর। তিনি একটু ভীত হইলেন। সামান্য একটা স্ত্রীলোককে দেখিয়া ভীত হইয়াছেন বলিয়া আত্মধিক্কারেও তাঁহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তাহার পব তিনি পথের ধূলার উপর রক্তবিন্দু দেখিতে পাইলেন। নিরঞ্জনার পা হইতে রক্ত পড়িতেছে। তাঁহার মনে হইল, স্বয়ং মহাকালই দণ্ডবিধান করিয়াছেন, তাঁহার আর কিছু করিবার প্রয়োজন নাই। এ কথা মনে হইবামাত্র এক অদ্ভুত আনন্দে তাঁহার প্রাণমন ভরিয়া গেল। পর-মুহূর্তেই চোখ হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি নিরঞ্জনার পিছু পিছু ছুটিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, নিরঞ্জনার রক্তাক্ত চবণ চুম্বন করিয়া তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন। অস্ফুট কণ্ঠে তিনি বারম্বার বলিতে লাগিলেন, "আমার ভগিনী, আমার মা, পুণ্যবতী মা—"

মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"হে দেবদূতগণ, তোমরা এ রক্ত বিন্দুগুলি ভগবান আশুতোষের কাছে নিয়ে যাও। যিনি ব্যাধকে বরদান করেছিলেন, তিনি নিরঞ্জনাকেও ক্ষমা করবেন। তাঁর ইচ্ছা হলে যেখানে যেখানে রক্ত পড়েছে সেখানে সেখানে ফুল ফুটে উঠবে হয়তো। রক্তাক্ত বালুভূমি পুষ্পাকীর্ণ হয়ে ভবিষ্যতে পাপীদের হৃদয়ে সান্ত্বনা বহন করে আনবে। নিরঞ্জনা পবিত্রা, পুণ্যশীলা—"

ঠিক এই সময়ে একটি বালক একটি গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মহর্ষি সাবর্ণিকে দেখিয়া সে ভয় পাইয়া গেল। মহর্ষি তাহাকে নামিতে বলিলেন। সে নামিতেই তিনি নিরঞ্জনাকে গর্দভটির পৃষ্ঠে বসাইয়া নিজেই তাহার লাগাম ধরিয়া টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন।

...সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশ ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। ঘনপত্রসমন্বিত বিটপীসমাচ্ছন্ন এক যেন স্রোতস্বিনীর তীরে তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গর্দভটিকে একটি বৃক্ষশাখায় বাঁধিয়া সাবর্ণি একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিলেন। সঙ্গে তিনি কিছু খাবার আনিয়াছিলেন। নিরঞ্জনার সহিত তাহা আহার করিয়া অঞ্জলি ভরিয়া নদীর জল পান করিলেন। তাহার পর কথাবার্তা শুরু হইল।

নিরঞ্জনা বলিল, "এমন পরিষ্কার জল আমি আর কখনও পান করিনি। এমন নির্মল বাতাসও এর আগে আমার গায়ে লেগেছে বলে মনে পড়ে না। মৃদু সমীরণের স্পর্শকে মনে হচ্ছে যেন ভগবানের স্পর্শ—"

সাবর্ণি বলিলেন. "ভগ্নি, সন্ধ্যা আসন্ন। দূরের পাহাড়গুলি রাত্রির ঘননীল ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। আর একটু পরেই তুমি তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ তীর্থে গিয়ে পৌঁছবে। অনন্ত প্রভাতের উষালোক কিছুক্ষণ পরে তোমার নয়নরঞ্জন করবে—"

তিনি আর বিশ্রাম করলেন না। নিরঞ্জনাকে লইয়া আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র গভীর নিশীথে নদীর অসংখ্য তরঙ্গশীর্ষে জ্যোৎস্না মাখাইতে লাগিল, আর সাবর্ণি শিবস্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে নদীর তীরে তীরে চলিতে লাগিলেন।

প্রভাত হইল। দেখা গেল তাঁহারা এক বিরাট রুক্ষ প্রান্তরের সম্মুখীন হইয়াছেন। প্রান্তরের পরপারে কয়েকটি আকাশ-চুম্বী তালগাছ এবং কতকগুলি কুটির দেখা যাইতেছিল।

"মহর্ষি, ওই কি সেই তীর্থ যেখানে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন?"

'ঠিকই ধরেছ মা, ওইখানেই তোমার আশ্রয়, নিজের হাতে ওইখানেই তোমাকে আমি সমর্পণ করে যাব।'

আরও কিছুক্ষণ হাঁটিবার পর তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, কুটিরগুলির আশেপাশে অনেকগুলি নারীমূর্তি সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। নিরঞ্জনার মনে হইল মধু চক্রের পাশে যেন মৌমাছিরা উড়িতেছে।

আরও নিকটবর্তী হইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, সকলেই কোন না কোন কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন। কেহ রুটি সেঁকিতেছেন, কেহ তরকারি কুটিতেছেন, কেহ বা চরকা কাটিতেছেন। সকলেরই মুখ প্রসন্ন, যেন এক দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত। নিকটে একটি বিল্ববৃক্ষ ছিল, তাহার নীচে বসিয়া কয়েকজন পূজাও করিতেছিলেন। মনে হইতেছিল, সকলেই যেন উমা, সকলেই যেন শিবের ধ্যানে তন্ময়, শিব চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা কাহারও মনে ছায়াপাত করিতেছে না। বস্তুত, আশ্রমেও তাহারা উমা নামেই অভিহিত, তাহাদের আর অন্য নাম নাই। প্রত্যেকেই বল্কলবাসা কিশোরী। যাহারা যুবতী তাহাদের নাম পার্বতী, তাঁহারা হৈমবতী। তাহাদের অঙ্গে কাষায় বসন। ভৈরবী নামে অভিহিতা কয়েকজন সন্ন্যাসিনীও ছিলেন, তাঁহারা শৈলবর্ণিনী গৈরিকবাসা। তাঁহারা প্রৌঢ়া, কেহ বৃদ্ধা। একজন অতি বৃদ্ধা ভৈরবী লাঠির উপর ভর দিয়া সমস্ত তদারক করিয়া বেড়াইতেছিলেন। মহর্ষি সাবর্ণি সসম্ভ্রমে তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

বলিলেন, "জয় শঙ্কর। আশা করি ভগবানের কৃপায় সকলেই কুশলে আছেন। আপনি যে মধুচক্রের রাণী, সেই মধুচক্রে আমি আজ একটি মধুপ এনেছি। বেচারী ঊষর পুষ্পহীন প্রান্তরে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। তাকে আমি অতি সন্তর্পণে নিজের অঞ্জলির মধ্যে পুরে নিয়ে এসেছি। আপনি অনুগ্রহ করে তাকে আশ্রয় দিন।"

তিনি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া নতজানু নিরঞ্জনাকে দেখাইলেন। নিরঞ্জনা ভৈরবীর পদপ্রান্তে প্রণতা হইয়াছিল।

শিবানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার নিরঞ্জনার দিকে চাহিয়া তাহাকে উঠিতে বলিলেন। তাহার পর তাহার ললাট চুম্বন করত সাবর্ণির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বেশ, একে উমার দলে ভর্তি করে নেব।"

সাবর্ণি তখন সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিলেন কি ভাবে তিনি নিরঞ্জনাকে উদ্ধার করিয়াছেন। বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিলেন, "এখন কিছুদিন ওকে একা একটি নির্জন ঘরে বদ্ধ করে রাখা প্রয়োজন। নির্জনে কিছুকাল নিজেকে নিয়ে থাকলে ওর আত্মোপলব্ধি হবে। অনুতাপের আগুনে কিছুকাল পুড়ে শুদ্ধ না হলে ওকে আর কারও সঙ্গে মিশতে দেওয়াও নিরাপদ নয়।"

ভৈরবী ইহাতে সম্মত হইলেন। কিছুদিন পূর্বে আশ্রমের একজন সন্ন্যাসিনী দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কুটিরটি শূন্য ছিল। নিরঞ্জনার সেই ঘরেই থাকার ব্যবস্থা হইল।

ঘরের ভিতর একটি সাধারণ শয্যা, একটি মৃণ্ময় কলস এবং একটি কুশাসন ছাড়া আব কিছু ছিল না। ঘরের মধ্যে পদার্পণ করিয়া নিরঞ্জনার সমস্ত অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

মহর্ষি সাবর্ণি বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, ওর ঘরটা আমি নিজে হাতে তালা বন্ধ করে যাব। ও যখন সত্যিই উমা হবে, স্বয়ং উমানাথ এসে ওর ঘরের চাবি খুলে দেবেন।"

ভৈরবী ইহাতেও আপত্তি করিলেন না।

দ্বারে একটি ক্ষুদ্র ফাটল ছিল। মহর্ষি সাবর্ণি কূপের নিকট হইতে খানিকটা কাদা লইয়া এবং কাদার ভিতর নিজের মাথার একটি চুল পুরিয়া সেটি ফাটলের উপর লাগাইযা দিলেন।

ঘরের ছোট জানালাটির নিকট নিরঞ্জনা শান্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। জানালার নিকট আসিয়া মহর্ষি সাবর্ণি জানু পাতিয়া বসিলেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনান্তে তিনবার 'জয় শঙ্কর' উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, "জীবনেব সত্য পথে এসে ওকে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে! কি সুন্দর ওর পা দুখানি! কি অপূর্ব দ্যুতি ওর মুখে!"

তাহার পর তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিজের ছিন্ন বেশ সম্বৃত কবিয়া চলিয়া গেলেন।

অতিবৃদ্ধা ভৈরবী শিবানী তখন একজন কুমারীকে ডাকিযা আদেশ কবিলেন, "উমা, নিরঞ্জনার ঘরে রুটি, জল আর একটি ছোট বাঁশী দিয়ে এস।"

মহর্ষি সাবর্ণি তাঁহার আরণ্য-আশ্রমে ফিরিতেছিলেন। এবার তিনি পদব্রজে যাইতেছিলেন না, একটি বড় নৌকাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। নৌকাটি হরিদ্বার অভিমুখে মাল লইয়া যাইতেছিল। নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে অবশ্য কিছুদূর হাঁটিতে হইল। আশ্রমের নিকটবর্তী হইতেই তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাদের আগ্রহ ও আনন্দের অভিব্যক্তি নানা ভাবে প্রকট হইল। কেহ আকাশে হস্ত উত্তোলন করিয়া গদগদ হইলেন, কেহ ভূম্যলুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, কেহ কেহ পাদুকা চুম্বনও করিলেন। তিনি পাটলিপুত্রে কি অসাধ্য সাধন যে করিয়া আসিয়াছেন—এ খবর তাঁহার আসিবার পূর্বেই আশ্রমে পৌঁছিয়া গিয়াছিল। সেকালে সমস্ত উল্লেখযোগ্য সংবাদই মুখে মুখে স্থান হইতে স্থানান্তরে অতি দ্রুতবেগে নীত হইত।

মহর্ষি সাবর্ণি নিজের কুটিরে উপনীত হইবার পূর্বেই শিষ্যপরিবৃত হইয়া পড়িলেন। শিষ্যদের মধ্যে প্রবীণতম ছিলেন পণ্ডিত হরানন্দ। তিনি এত হৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, সাবর্ণিকে দেখিবামাত্র তারস্বরে একটি শিবস্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা সাবর্ণির কুটিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন তখন সকলে নতজানু হইয়া নতমস্তকে উপবেশন করত বলিলেন, "পিতা, আমাদের আশীর্বাদ করুন, আর অনুমতি দিন আপনার প্রত্যাগমন উপলক্ষে একটু ভাল খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করি।"

শিষ্যদের মধ্যে বালক বাপ্পাই কেবল নতজানু হইল না। সে সোজা দাঁড়াইয়া রহিল। সে

মহর্ষি সাবর্ণিকে চিনিতেই পারিল না। প্রশ্ন করিল, "ইনি কে?" কিন্তু কেহ তাহাকে বিশেষ আমল দিল না। এই হাস্যকব উক্তিতে দুই-একজন মৃদু হাসিল মাত্র। সকলেই জানিত, বালকস্বভাব বাঞ্ছাবামেব অন্তঃকরণ যদিও পবিত্র, কিন্তু বুদ্ধি বড় কম।

নিজের কুটিরে প্রবেশ করিয়া মহর্ষি সাবর্ণির মনে হইল—"এতদিন পরে আমার আশ্রমে, আমার সাধনার পীঠস্থানে ফিবে এলাম। কিন্তু আমার পর্ণকুটির তো আমাকে তেমন অভ্যর্থনা জানাচ্ছে না! কুটিরেব মধ্যে জিনিসপত্র সব ঠিকই আছে। শিবলিঙ্গটি, শিবপুরাণগুলি যেখানে রেখে গিয়েছিলাম, সেইখানেই রয়েছে। কোথাও কোনও পরিবর্তন চোখে পড়ছে না। তবু মনে হচ্ছে, কি যেন একটা নেই। আমার ঘরের প্রত্যেক জিনিসটিতে যে সহজ সৌন্দর্য ছিল তা যেন অন্তর্হিত হয়েছে। মনে হচ্ছে এ সব জিনিস যেন আর কারও। বহু বৎসর আগে যে শয্যা যে আসন আমি স্বহস্তে প্রস্তুত কবেছি, পুবাণের যে সব ভগবৎকথা নিজের হাতে কষ্ট করে টুকেছি, মনে হচ্ছে তা যেন আমাব নয়, কোনও মৃত ব্যক্তির। যে সব জিনিস আমার অতি পরিচিত, একটা অপরিচয়ের আববণ যেন তাদের ঘিরে রয়েছে। অথচ বাইরের আকাবে প্রকাবে এবা যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে। এরা যখন বদলায়নি, তখন আমিই নিশ্চয় বদলেছি। আমি তা হলে অন্য লোক। যে মারা গেছে, সেও আমি ছিলাম। এই জন্মেই আমার যেন জন্মান্তর হয়েছে। হে শঙ্কর, এ কি হল? যে তোমার ভক্ত ছিল, সে কিসে রূপান্তরিত হল? সে এখান থেকে কি নিয়ে গেল, কি রেখে গেল? আমিই বা কে?"

যে কুটিরে এতকাল তাঁহাব স্থানাভাব হয় নাই, সেই কুটিবই এখন বড় সঙ্কীর্ণ মনে হইতে লাগিল। তিনি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে নিজেই তিনি বিস্মিতও হইলেন। যে কুটিরে বসিয়া তিনি শঙ্করের অনন্ত মহিমা উপলব্ধি কবিযাছেন তাহা তাঁতার চক্ষে সুবৃহৎ মনে হওয়া উচিত ছিল।

মাটিতে কপাল ঠেকাইয়া অনেকক্ষণ তিনি প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে অশান্তি কতকটা কমিল। প্রার্থনার মধ্যেই কিন্তু নিরঞ্জনার মূর্তি তাহার মানসপটে বার বার ফুটিয়া উঠিতেছিল। ইহার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি শঙ্করকে আবার মনে মনে প্রণাম করিলেন।

বলিলেন, "দেবাদিদেব, আমি জানি তুমিই নিরঞ্জনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছ। তুমি করুণাময়, তুমিই তাকে বার বার মূর্ত করেছ আমার মনে। কারণ তুমি জান, যাকে তোমার পায়ে আমি সমর্পণ করে এসেছি তাকে দেখলে আমি সুখী হব, নিশ্চিন্ত হব। সেই জন্যই তুমি তার মুখখানি বার বার আমার মনে ফুটিয়ে তুলছ। যাকে আমি অতি কষ্টে কলঙ্কমুক্ত করেছি, তার সরল হাসি, সহজ শ্রী, অপূর্ব সৌন্দর্য আমাকে আনন্দ দেবার জন্যই। তাই তুমি তাকে তোমার প্রার্থনার মধ্যেও নিয়ে এসেছ। তোমাকে উপহার দেব বলেই নিরঞ্জনাকে আমি পাপের পঙ্ক থেকে তুলে এনে চোখের জলে বিশুদ্ধ করেছি, এতে তুমি যে প্রসন্ন হয়েছ তাও অন্তর দিয়ে আমি অনুভব করছি। উপহার পেয়ে বন্ধু যেমন বন্ধুকে স্মিতহাস্যে অভিনন্দিত করে, নিরঞ্জনাকে পেয়ে তুমিও তাই করছ। তা না হলে নিরঞ্জনাকে আমার চোখের সামনে বারম্বার মূর্ত করছ কেন? এর অন্য কোনও অর্থ তো আমার মাথায় আসছে না। তুমিই নিরঞ্জনাকে দেখাচ্ছ, তাই তাকে দেখে আনন্দ হচ্ছে। তুমি যেন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ

যে, আমিই ওকে তোমার চরণে সমর্পণ করেছি। ওকে তোমার পায়েই ঠাঁই দাও প্রভু, ওর রূপের অর্ঘ্য তোমার চরণেই নিঃশেষ হোক, আর কেউ যেন তা ভোগ না করে।''

সমস্ত রাত্রি তিনি ঘুমাইতে পারিলেন না, সমস্ত রাত্রি নিরঞ্জনা নানারূপে তাঁহার বিনিদ্র নয়নের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শিলা-নিবাসে তাহাকে তিনি যেমন দেখিয়াছিলেন, তদপেক্ষা স্পষ্টতররূপে যেন তাহাকে দেখিতে পাইলেন। আর মনে মনে ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, ''শঙ্করের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমি যা করেছি তা তাঁর জন্যই করেছি।''

কিন্তু তবু আশ্চর্যের বিষয়, এ কথা বার বার আবৃত্তি করিয়াও তাঁহার মানসিক অশান্তি ঘুচিল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিজেকে সম্বোধন করিয়া তখন তিনি বলিলেন, ''কেন তুমি অশান্তি ভোগ করছ? কেন তুমি এমন বিমর্ষ—''

কিছুতেই কিন্তু মানসিক শান্তি আর ফিরিয়া আসিল না। ত্রিশ দিন ত্রিশ রাত্রি ঘোর অশান্তির মধ্যে কাটিল। তপস্বীর পক্ষে ইহা ভয়ঙ্কর শাস্তি। নিরঞ্জনার মূর্তি দিনে বা রাত্রে ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে সরিল না। তিনি সরাইবার চেষ্টাও করিলেন না; কারণ তিনি নিজেকে বুঝাইয়াছিলেন যে, শঙ্করই তাঁহাকে এ মূর্তি দেখাইতেছেন এবং নিরঞ্জনা আর কলঙ্কিতা বারনারী নাই, সে এখন তপস্বিনী। একদিন ভোরে নিরঞ্জনা স্বপ্নে তাঁহাকে যে মূর্তিতে দেখা দিল তাহা বেশ চাঞ্চল্যজনক। তাহার কবরীতে ফুলের মালা, বাহুতে অধরে যৌবনের প্রলেপ। আতঙ্কে সাবর্ণির ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলেন, ঘামে তাঁহার সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে। তখনও তাঁহার চোখ হইতে ভাল করিয়া ঘুম ছাড়ে নাই, তাঁহার মনে হইল কাহার উত্তপ্ত নিশ্বাসও যেন তাঁহার মুখে লাগিতেছে। পরমুহূর্তেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হইল। একটা শৃগাল ঘরে ঢুকিয়াছিল এবং তাঁহার মাথার শিয়রের দিকে দুইটি পা তুলিয়া দিয়া তাঁহার মুখ শুঁকিতেছিল। তাহার গায়ের দুর্গন্ধে ঘর পরিপূর্ণ। তিনি উঠিয়া বসিতেই শৃগালটা পলায়ন করিল। মনে হইল, সে খুক খুক করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

এই ঘটনায় সাবর্ণি বড় দমিয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যে উচ্চ মিনারের উপর তিনি এতকাল দাঁড়াইয়া ছিলেন তাহা ক্রমশ যেন মাটিতে বসিয়া যাইতেছে। সত্যই, তাঁহার আত্মবিশ্বাসের দৃঢ় স্তম্ভটার ভিত্তি নড়িয়া গিয়াছিল। কিছুকাল তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন, তাঁহার চিন্তা করিবার শক্তিও যেন লোপ পাইল। কয়েক দিন পরে আত্মস্থ হইয়া তিনি অবশ্য চিন্তা করিতে সক্ষম হইলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মানসিক অশান্তি কমিল না, বরং বাড়িল।

উপরোক্ত স্বপ্নটি বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার মানসপটে নিরঞ্জনার আবির্ভাবের দুইটি কারণ হইতে পারে। প্রার্থনা করিবার সময় নিরঞ্জনার চেহারা যখন বার বার তাঁহার মনে জাগিতেছিল তখন তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, শঙ্করের ইচ্ছা অনুসারেই তাহা হইতেছে। ইহা সত্য হইলে এই স্বপ্নটাও শঙ্করের সৃষ্টি। তাঁহার কলুষিত মনই পবিত্র স্বপ্নকে অপবিত্র করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার মনে হইল, অপরিষ্কার পাত্রে রাখিলে উৎকৃষ্ট সুরাও যেমন পচিয়া যায় তেমনি আমার দোষেই সুন্দর অসুন্দরে পরিণত হইয়াছে এবং আমার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া আমার পশুপ্রকৃতিও শৃগালরূপে দেখা দিয়াছে। আর তাহা যদি না

হয়, অর্থাৎ এ স্বপ্নের সহিত শঙ্করের যদি কোনও সম্পর্ক না থাকে তাহা হইলে ইহা দানব চক্রান্ত, কামরূপী কোন পিশাচ তাঁহাকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। নিরঞ্জনার প্রথম আবির্ভাবও তাহা হইলে এই পিশাচের কীর্তি শঙ্করের নয়। ইহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলেন তাঁহাব হিতাহিতবুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, যোগীজনসুলভ বিবেকের স্বচ্ছ দৃষ্টি তিনি হারাইয়াছেন। দেবতার লীলা ও দানবের চক্রান্তের পার্থক্য তিনি ধরিতে পারিতেছেন না।

এবম্প্রকার বিশ্লেষণ করিবার পর তিনি সকাতরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—

"হে করুণাময় শম্ভো, বল, কি উদ্দেশ্যে তুমি আমাকে এমন সংশয়ের মধ্যে ফেলেছ? আমার মনোলোকে নিরঞ্জনার মতো তপস্বিনীর আবির্ভাবও যদি বিপজ্জনক হয়, তা হলে আমার উপায় কি! কি কবব আমি! কোনও একটা সঙ্কেত করে তুমি আমাকে জানিয়ে দাও—এ তোমাব লীলা, না, দানবের চক্রান্ত?"

শঙ্কবের মহিমা দুর্বোধ্য। ভক্তের হৃদয়ে কোনরূপ আলোকপাত করা তিনি সমীচীন মনে কবিলেন না। সন্দেহ-সাগরে নিমজ্জমান সাবর্ণি তখন প্রতিজ্ঞা করিলেন, নিরঞ্জনাব চিন্তাকে আর তিনি মনে স্থান দিবেন না। কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। নিবঞ্জনা নানারূপে বাবম্বার তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল। অধ্যযনের সময়, ধ্যানেব সময়, প্রার্থনাকালে, চিন্তারত অবস্থায় সে আসিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিত। মনে হইত, সে যেন সশবীবে আসিযাছে। আসিবাব ঠিক পূর্বে সামান্য খসখস শব্দ হইত—শাড়ি পরিযা চলিলে যেমন শব্দ হয অনেকটা তেমনি শব্দ। তাহার আসিবাব সময়ও একেবারে সুনির্দিষ্ট ছিল, একচুল এদিক ওদিক হইত না। যাহা বাস্তব তাহা স্থূল বলিযাই তাহাব প্রকাশ অসম্বন্ধ এবং অস্থির। যাহা অবাস্তব তাহা সূক্ষ্ম বলিযাই স্থির, অপরিবর্তনীয়।

নিরঞ্জনা নানা মূর্তিতে আসিয়া দেখা দিত। কখনও বিষণ্ণ—মাথায় রত্নখচিত মুকুট, জীমূতবাহনেব বাড়িতে যে পোশাক পরিয়া গিয়াছিল অঙ্গে সেই পোশাক, ঈষৎ গোলাপী শাড়িতে উজ্জ্বল রূপার জরি; কখনও বা সে দেখা দিত কামোদ্দীপ্তা বারনারীর বেশে—অঙ্গে বাতাসের মতো স্বচ্ছ বসন, শিলা-নিবাসের আলোছায়ার মায়ায় মোহিনী কুহকিনী; কখনও আবার দেখা দিত ভৈরবীর মূর্তিতে—গৈরিকধারিণী সন্ন্যাসিনীর বেশে; কখনও ভয়াবহ করুণ মূর্তিতে—নয়নের দৃষ্টি মৃত্যুভয়ে আচ্ছন্ন, নগ্নবক্ষ রক্তাপ্লুত, যেন তাহাব ভগ্নহৃদয়েব রক্তধারা পীবর স্তনদ্বয়কে রঞ্জিত করিয়াছে। সাবর্ণি ভীত হইয়া পড়িতেন।

মহর্ষি সাবর্ণি সর্বাপেক্ষা বিপন্ন বোধ করিতেন যখন নিরঞ্জনার দগ্ধ বসনভূষণগুলি পুনরায় তাঁহার সম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিত। যে সব অলঙ্কার, যে সব শাড়ি, যে সব ওড়না তিনি স্বহস্তে অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহারা যখন তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে জীবন্তবৎ রূপায়িত হইত তখন তিনি আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। ভাবিতেন, নির্জীব বস্তুরও কি আত্মা আছে, তাহারাও কি প্রেতরূপে দেখা দিতে পারে? মাঝে মাঝে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিতেন—"মরে নি, মরে নি, কিছু মরে নি। নিরঞ্জনার অসংখ্য পাপের অসংখ্য নিদর্শন আবার বেঁচে উঠেছে আমার কাছে ফিরে আসছে তারা—"

তিনি যখন ঘাড় ফিরাইতেন মনে হইল নিরঞ্জনা ঠিক তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। ইহাতে তিনি আরও অশান্ত হইয়া পড়িতেন। ক্রমশ তিনি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু একটা আশা তাঁহার ছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এই সব প্রলোভন সত্ত্বেও তাঁহার দেহ এবং আত্মা অকলঙ্কিত আছে। তিনি শঙ্করকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেন, "শঙ্কর, তোমার জন্যই আমি এত কষ্ট করে নিরঞ্জনাকে খুঁজে আনবার জন্য পাপ পাটলিপুত্র নগরে গিয়েছিলাম। তোমার জন্যই—নিজের জন্য নয়। তোমার জন্য এত করলাম, তবু আমাকে কষ্ট দিচ্ছ তুমি? এটা কি ন্যায় বিচার হচ্ছে? যা করেছি তোমার জন্যই করেছি। এজন্য আমাকে বিপন্ন করো না করুণাময়, রক্ষা কর। সশরীরী নিরঞ্জনা যা পারে নি, অশরীরী নিরঞ্জনাকে দিয়ে তা করিও না। নিরঞ্জনার দৈহিক ঘনিষ্ঠতা আমাকে বিচলিত করতে পারেনি, তার কাছে আমি পরাভূত হইনি। তার ছায়া যেন আমাকে অভিভূত না করে, দেখো। একটা ঘোর বিপদ যে ঘনিয়ে আসছে তা আমি বুঝতে পারছি। বাস্তবের চেয়ে স্বপ্ন যে বেশী শক্তিশালী তা আমি জানি। স্বপ্ন তো বাস্তবেরই সূক্ষ্ম রূপ, আত্মার স্বরূপও আমরা স্বপ্নের মধ্যে যে প্রত্যক্ষ করি। বড় বড় ঋষিরাও স্বপ্নের শক্তির কথা স্বীকার করেছেন। পাটলিপুত্রে যে ধনীর পাষণ্ডদের ভোজন-উৎসবে তুমি আমার সঙ্গে গিয়েছিলে, সেখানে যারা তর্ক করেছিল তারা দুশ্চরিত্র হলেও মূর্খ নয়। তারা বলেছিল—যা আমবা ধ্যানে নির্জনে চিন্তায় বা সমাধিতে প্রত্যক্ষ করি তা অলীক নয়, তা সত্য। শাস্ত্রেও স্বপ্নের মহিমা বহু স্থানে কীর্তিত হয়েছে। স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে যে সব আবির্ভাব আমরা প্রত্যক্ষ করি তা বাস্তবেরই মতো সত্য, তা তোমারই লীলা। অবশ্য দানবের ষড়যন্ত্রও হতে পারে, কারণ দানবরাও শক্তিশালী, দানবরাও মায়াবী —"

মহর্ষি সাবর্ণির মধ্যে একটি নূতন ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হইয়াছিল সন্দেহ নাই, তাহা না হইলে তিনি শঙ্করের সহিত এ প্রকাব ঘরোয়া আলোচনা করিতে পারিতেন না। আলোচনা সত্ত্বেও শঙ্কর কিন্তু তাঁহার প্রতি সদয় হইলেন না। তাঁহার রাত্রিগুলি ক্রমশ স্বপ্নময় হইয়া উঠিতে লাগিল এবং আরও কিছুদিন পরে দিবারাত্রির প্রভেদও আর রহিল না। একদিন অতি প্রত্যূষে আতঙ্কিত হইয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন, ঘন ঘন উষ্ণ নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। মনে হইল, বুকের ভিতরটা কে যেন মুচড়াইয়া দিতেছে।....রাত্রে নিরঞ্জনা রক্তাক্তচরণে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়াছিল। তাহার রক্তাক্তচরণ দেখিয়া তিনি যখন অশ্রু বিসর্জন করিতেছিলেন, তখন প্রথমে সে তাঁহার শয্যার উপর বসিল, তাহার পর তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিল। তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না যে, নিরঞ্জনার এই স্বপ্ন অভিসার তাঁহার কলুষিত আত্মারই বিকার মাত্র। তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন যে, অপবিত্রতায় তাঁহার দেহ মন পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। শয্যাও আর পবিত্র নাই।

সক্ষোভে সেই অপবিত্র শয্যা হইতে উঠিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া তিনি মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার দৃষ্টি হইতে দিবালোক অবলুপ্ত হইল। বহুক্ষণ তিনি মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার লজ্জার উপশম হইল না। চতুর্দিকে নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। সেই নিঃশব্দ কুটিরে বসিয়া সাবর্ণি অনুভব করিলেন, তিনি এখন সম্পূর্ণ একাকী, সকলে

তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। নিরঞ্জনার ছায়ামূর্তিও কাছে নাই। ইহাতে তিনি ভীত হইয়া পড়িলেন, স্বপ্নের স্মৃতিটাকে ভুলাইয়া দিবার জন্য কিছু একটা কাছে থাকা দরকার। নিরঞ্জনার ছায়ামূর্তিও হয়তো তাহা পারিবে। কিন্তু হায়, হায়, কেহ নাই। তিনি একান্তই একা।

নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "কেন আমি তাকে ঠেলে ফেলে দিলাম না? কেন তার হিমশীতল বাহু আর উত্তপ্ত জানু থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম না?"...

ওই অপবিত্র শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শঙ্করের নাম উচ্চারণ করিবার সাহস তাঁহার আর হইল না। মনে হইল, সমস্ত কুটিরটাই অপবিত্র হইয়া গিয়াছে। এ কুটিরে শঙ্করের কৃপার আশা আর নাই, ইহা এইবার দানব আর পিশাচদের লীলাভূমি হইয়া উঠিবে। তাহারা এইবার যখন খুশী যতবার খুশী আসিবে, তাহাদের আর রোধ করা যাইবে না। তাঁহার আশঙ্কাই যেন মূর্ত হইয়া উঠিল যখন তিনি দেখিলেন যে, সাতটি ক্ষুদ্র শৃগাল একে একে প্রবেশ করিল এবং তাঁহার বিছানার নীচে ঢুকিয়া গেল।... সন্ধ্যার সময় আর একটি আসিল। এটির গায়ের গন্ধ বিকট। পরদিন নবম শৃগাল দেখা দিল। তাহার পর আর একটি। সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।.... ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট. ...আশীটি শৃগাল আসিয়া সমবেত হইল। তাহারা সংখ্যায় যেমন বাড়িতে লাগিল, আকারে তেমনি ছোট হইতে লাগিল। অবশেষে সাবর্ণির মনে হইল, ওগুলি শৃগাল নয়, ইঁদুর। অসংখ্য ইঁদুব তাঁহাব কুটিবেব মেঝেতে, শয্যার নীচে, শয্যার উপরে চতুর্দিকে কিলবিল করিতেছে। একটি ইঁদুর তাঁহাব শিবলিঙ্গের মাথার উপরও আরোহণ করিল, আরোহণ করিয়া স্পর্ধাভরে তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিল। সে দৃষ্টি, যেন অগ্নিদৃষ্টি। মহর্ষি সাবর্ণি অস্থির হইয়া পড়িলেন।

তিনি অবশেষে স্থির করিলেন, এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। এই অপবিত্র কুটির ত্যাগ করিয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করা ছাড়া আর উপায় নাই। আত্মনির্যাতন ও প্রায়শ্চিত্ত না করিলে এ পাপের প্রভাব হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে না। স্থির করিলেন, দুরূহ তপস্যায় পুনরায় নিজেকে নিযুক্ত করিবেন। আত্মনির্যাতনের বিস্ময়কর শক্তির উপর তাঁহার আস্থা ছিল। তাঁহার আশা হইল, পাপের আশ্রয়ভূমি দেহটাকে বিধ্বস্ত করিলেই তিনি পাপমুক্ত হইবেন। এই কল্পনাকে কার্যে পরিণত করিবার পূর্বে তিনি প্রবীণ মহর্ষি শুভঙ্করের সহিত একদিন সাক্ষাৎ করিলেন।

মহর্ষি তাঁহার শাকক্ষেতে জলসেচন করিতেছিলেন। সূর্য অস্ত গিয়াছিল। আকাশের ঘননীলে অস্তমান সূর্যের বর্ণচ্ছটা প্রতিফলিত হইয়া যে অপরূপ পটভূমিকা সৃজন করিয়াছিল তাহা পবিত্রচেতা শুভঙ্করের সঞ্চরমাণ চিত্রেরই যোগ্য। মহর্ষি শুভঙ্কর অতি সন্তর্পণে চলাফেরা করিতেছিলেন, কারণ তাঁহার কাঁধের উপর একটি বন্যকপোত বসিয়া ছিল। সাবর্ণিকে দেখিতে পাইয়া তিনি সহাস্যে সম্বর্ধনা করিলেন—

"আরে, সাবর্ণি নাকি। এস, এস। শঙ্করের কৃপায় আশা করি কুশলে আছ। পশুপতির কাণ্ড দেখ, আমার কাছে তিনি পশুপাখীর রূপ ধরেই আসেন বোধ হয়। আমার কাঁধের

উপব দেখতে পাচ্ছ তো আব কেউ নয, স্বযং তিনিই। আমাব তো অন্তত তাই মনে হয। তা না হলে বনেব পশু আকাশেব পাখী আমাব কাছে আসবে কেন? এই পাখীটিকে দেখ ভাল কবে ওব ঘাড়েব কাছেব পালকগুলিব বঙ দেখেছ, ঠিক যেন সন্ধ্যাব আকাশ। সামান্য একটা পাখীব পালকে কি মেঘেব বিচিত্রবর্ণ দেখা যায? ভাল কবে ভেবে দেখ ব্যাপাবটা। অদ্ভুত, নয? প্রকৃতিব প্রতিটি সৃষ্টিতে তিনিই আত্মপ্রকাশ কবেছেন, তাই সব সুন্দব, সবই অদ্ভুত। গাছেব পাতা ফুল ফল পক্ষী তুচ্ছ কববাব কোনটা বল? সবই চমৎকাব। তিনি নিজেই সব। কিন্তু মনে হচ্ছে, তুমি কোন সদালাপ কববে বলে এসেছ। আমাব আবোল তাবোল শুনে হযতো ঘাবড়ে যাচ্ছ কিছু বলবে না কি? ও, থাম তা হলে কলসীটা বেখে আসি—"

মহর্ষি সাবর্ণি তাঁহাব পাটলিপুত্র গমন, পাটলিপুত্র হইতে প্রত্যাবর্তন, নিবঞ্জনা উদ্ধাব, তাহাব পব দিবাবাত্রি স্বপ্নে জাগবণে নিবঞ্জনাব নিববচ্ছিন্ন আবির্ভাব, এমনি জঘন্য কাম ক্লিন্ন স্বপ্নটিব কথাও অকপটে শুভঙ্কবেব নিকট বর্ণনা কবিযা অসংখ্য শৃগালেব আক্রমণেব কথাও তাহাকে বলিলেন। কিছুই গোপন কবিলেন না।

"মহর্ষি, এখন কি কবি বলুন তো? কঠোব প্রাযশ্চিত্ত কবাই কি এব একমাত্র প্রতিষেধক নয? তাই আমি স্থিব কবেছি গভীবতব অবণ্যে প্রবেশ কবে অশেষ কৃচ্ছ্রসাধনা কবব তা হলে হযতো দানবদেব মাযাজাল ছিন্ন কবতে পাবব। আমাব মাথায তো আব কিছু আসছে না"

মহর্ষি শুভঙ্কব উত্তব দিলেন—"দেখ ভাই, আমিও স্বল্পবুদ্ধি লোক। সাবাজীবন বনে বনেই কাটিযেছি। বনেব পশুপাখীদেব আমি চিনি, খবগোশ হবিণ ঘুঘু হবিযাল এবা আমাব পবিচিত। কিন্তু মানুষেব সম্বন্ধে আমাব জ্ঞান খুব কম। তবু আমাব মনে হচ্ছে, দ্রুত স্থান পবিবর্তনেব জন্যই তোমাব চিত্ত বোধ হয আন্দোলিত হযেছে, আব সেই জন্যই ওই সব দেখছ। নগবেব কোলাহল থেকে চট কবে অবণ্যেব নীববতায ফিবে এসেছ বলেই সম্ভবত এখানে নিজেকে খাপ খাওযাতে পাবছ না। তোমাব আত্মা সেই জন্য ক্লিষ্ট হযেছেন। হঠাৎ গবম থেকে ঠাণ্ডায এসে শবীব খাবাপ হযে যেমন সর্দি কাশি হযে যায, তোমাব মনেবও তাই হযেছে। তাই আমাব মতে গভীবতব জঙ্গলে না ঢুকে তুমি ববং লোকালযে যাও, অবশ্য ভদ্র লোকালযে, তোমাব মতো সাধুসন্ত যেখানে আছেন। কাছেপিঠে তো অনেক আশ্রম আছে শুনি। যা শুনি তাতে দু-একটি তো খুব ভাল ব'লেই মনে হয। নাম-শ্লোকপন্থী ধূর্জটি আশ্রমে শুনেছি প্রায দেড় হাজাব সাধু থাকেন। সাধকশ্রেষ্ঠ উপলর্চাবিত সেখানকাব আশ্রমপতি। সেখানে সাধুবা প্রত্যেকে শিল্প বিষযক এক-একটি শ্লোককে অবলম্বন কবে থাকেন শুনেছি। কেউ কেউ আবাব শিবেব একটি নামকেই সম্বল কবে নিজেব সাধনাকে সিদ্ধিব পথে এগিযে নিযে যাচ্ছেন। নানা ধবনেব সন্ন্যাসী আছেন সেখানে। এই আশ্রমটি তুমি দেখে এস একবাব। একটু অন্যমনস্কও হবে, শেখবাব জিনিসও অনেক কিছু পাবে। গঙ্গাব ধাব দিযে যদি যাও অনেক মঠ, অনেক আশ্রম, অনেক তপোবন চোখে পড়বে। বেড়িযে বেড়িযে দেখে এস না সব। তোমাব মতো বিদ্বান লোকেব পক্ষে এ সব কবা কর্তব্যও বটে। মহাতান্ত্রিক মহর্ষি বনস্পতি শৈব সাধুদেব কর্তব্য বিষযে বিবাট একখানা বই লিখেছেন

শুনেছি। তুমি তো লিখতে জান, তুমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে বইখানা নকল করে ফেল। মস্ত কাজ হবে একটা। আমি লিখতে জানলে নিশ্চয় এটা করে ফেলতাম, কিন্তু আমি কোদাল ধরতে পারি, কলম ধরতে পারি না। তুমি লেখাপড়া-জানা বিদ্বান লোক, তোমার কাজের অভাব কি। লেখাপড়ায় মন দিলে কি কোনও মন্দ চিন্তা ঘেঁষতে পারে? এই আশ্রমে মহর্ষি কারণ্ডর ছিলেন, তিনি তো এখন শৈব জগতের সম্রাট, কৈলাসে চলে যাবার আগে তিনিও বিরাট গ্রন্থ লিখেছিলেন একটা- কারণ্ডরসংহিতা। সেইটেই টুকে ফেল না তুমি। তুমি কলম ধরতে পার, তোমার ভাবনা কি। ঘুরে বেড়াও লেখাপড়ায় মন দাও তা হলেই তোমার মনের শান্তি আবার ফিরে আসবে। তখন বনের নির্জনতাই আবার ভাল লাগবে। তখন তপস্যা করো। শহরে গিয়েই তোমার মনটা চঞ্চল হয়েছে। মহর্ষি কারণ্ডর বলতেন শুনেছি বেশী উপবাস করা ভাল নয়। বেশী উপবাস মানুষকে দুর্বল করে, বেশী দুর্বলতা মানুষকে অকর্মণ্য করে ফেলে। অনেকে লম্বা লম্বা উপবাস করে অনর্থক নিজেদের দেহটাকে ক্ষীণ করে ফেলে। এ তো নিজের বুকে ছোরা মেরে দানবদের হাতে আত্মসমর্পণ করা' মহর্ষি কারণ্ডর এই সব কথা বলতেন। আমি মূর্খ মানুষ, আমি আর তোমাকে কি বলতে পারি। মহর্ষি কারণ্ডর এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা তিনি আমাদের পিতার মতো। তাঁর কথাগুলো মনে ছিল তাই তোমাকে বললুম ''

সাবর্ণি মহর্ষি শুভঙ্করকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, তাহার উপদেশগুলি তিনি প্রণিধান করিয়া দেখিবেন মহর্ষি শুভঙ্করের নল খাগড়া বিনির্মিত বাগানের বেড়া পার হইয়া তিনি পিছু ফিরিয়া দেখিলেন, শুভঙ্কর শান্তভাবে পুনরায় শাকের ক্ষেতে জল সেচন করিতেছেন। বনকপোতটি তাঁহার কাঁধের উপর ঠিক বসিয়া আছে। সাবর্ণির চোখে জল আসিয়া পড়িল। তাহার ইচ্ছা হইল, কাঁদিয়া হৃদয়ভার লঘু করেন।

নিজের কুটিরে ফিরিয়া তিনি হতভম্ব হইয়া গেলেন। আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হইল অসংখ্য বালুকণায় তাহার কটিরের অভ্যন্তর ভরিয়া গিয়াছে, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, এ সব বালুকণা নয়, অসংখ্য কীটাকৃতি শৃগাল, দানবদের অনুচর। সেই রাত্রে তিনি একটি অদ্ভুত স্বপ্নও দেখিলেন। দেখিলেন, যেন একটি সু-উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভের উপর একটি মনুষ্যমূর্তি দাঁড়াইয়া আছে। যেন বলিতেছে —তুমিও এই স্তম্ভের উপর আরোহণ কর।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি নিজেকে বুঝাইলেন, এ স্বপ্ন, ঈশ্বর-প্রেরিত। নিজের শিষ্যগণকে সমবেত করিয়া তিনি তখন বলিলেন, "প্রিয় বৎসগণ, শঙ্করের আদেশে তোমাদের ছেড়ে আবার আমাকে বাইরে বেরুতে হচ্ছে। আমার অবর্তমানে পণ্ডিত হবানন্দকেই তোমরা গুরু বলে মান্য করো। সরলমতি বালক বাঞ্ছার প্রতিও একটু দৃষ্টি রেখো। তোমাদের আমি আশীর্বাদ করছি। সাবধানে থেকো। চললাম আমি —"

তিনি যখন চলিয়া গেলেন তখন তাঁহার শিষ্যবৃন্দ ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণত ছিল, যখন উঠিল দেখিতে পাইল মহর্ষি সাবর্ণি দূর দিগন্তে কৃষ্ণমূর্তিবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন।

মহর্ষি সাবর্ণি দিবারাত্রি হাঁটিতে লাগিলেন। হাঁটিতে হাঁটিতে অবশেষে তিনি সেই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, পাটলিপুত্রের পথে যাইতে যাইতে যেখানে

তিনি রাত্রিবাস করিয়াছিলেন। মন্দিরগাত্রে বহুবিধ চিত্র উৎকীর্ণ ছিল। ত্রিশটি বিরাট বিরাট স্তম্ভ তখনও মন্দিরটিকে বহন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মন্দিরের শেষে ছিল কেবল একটি একক স্তম্ভ। মন্দিরের সহিত তাহার কোন সংস্রব ছিল না। সুদূর অতীতে মন্দিরের সহিত কোনও কারণে তাহার যোগ ছিন্ন হইয়াছিল। স্তম্ভটির শীর্ষদেশে ছিল একটি রমণীর স্মিতানন। তাহার ললাটে শশিকলা, গণ্ড দুইটি পুষ্ট, নয়নযুগল আনত। মনে হইতেছিল, দৃষ্টি হইতে একটা চাপা হাসি যেন উপচাইয়া পড়িতেছে।

স্তম্ভটি দেখিয়া সাবর্ণির মনে পড়িল, এই স্তম্ভটিই শঙ্কর তাঁহাকে স্বপ্নে দেখাইয়াছিলেন। স্তম্ভটি প্রদক্ষিণ করিয়া আন্দাজ করিলেন, স্তম্ভটি উচ্চতায় প্রায় বত্রিশ হাত হইবে। মই না পাইলে উপরে উঠা যাইবে না। নিকটবর্তী এক গ্রামে গিয়া তিনি বড় একটি মই প্রস্তুত করাইলেন এবং মইয়ের সাহায্যে স্তম্ভশীর্ষে অবশেষে আরোহণ করিলেন। তাহার পর জানু পাতিয়া বসিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"হে শঙ্কর, তোমারই নির্দেশে আমি এখানে এসেছি। তোমার কৃপা লাভ করবার জন্য যে কোন কৃচ্ছ্রসাধন করিতে আমি প্রস্তুত। আমাকে কৃপা কর প্রভু—"

তাঁহাব সঙ্গে কোনও খাবার ছিল না। বিশ্বাস ছিল, শঙ্করই তাঁহার আহাবেব ব্যবস্থা করিবেন। গ্রামবাসীদের ভক্তিব উপরও তাঁহাব আস্থা ছিল। দেখা গেল, তাঁহাব আস্থা ভিত্তিহীন নহে। প্রভাতে প্রার্থনার পর গ্রামের নারীবা ও শিশুরা আসিযা উপস্থিত হইল। তাহাবা তাঁহার জন্য কিছু ফলমূল ও জল আনিয়াছিল। একটি বালক মইয়ের উপব চড়িযা সে সব তাঁহাকে দিয়া আসিল।

এই ভাবে কযেকদিন কাটিল। আহাব জুটিতে লাগিল, কিন্তু স্তম্ভের উপব হাত পা ছাড়াইয়া শুইবার মতো স্থান ছিল না।

মহর্ষি সাবর্ণি পা মুড়িয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া বসিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা কবিলেন। কিণ্ত এরূপ শ্রমসাধ্য নিদ্রায় শ্রান্তি তো দূর হয়ই না, বরং আরও বাড়িযা যায় প্রত্যূষে পাখীদেব ডানার ঝাপটে তিনি সভয়ে চমকাইয়া জাগিয়া উঠিতেন।

যে ছুতার মিস্ত্রি তাঁহাকে মইটি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, সে ধর্মভীরু লোক।

সাধু সন্ন্যাসীদের সে চিরকাল খাতির যত্ন করিয়া আসিয়াছে। মহর্ষি সাবর্ণির এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, এই সাধু রৌদ্রে বৃষ্টিতে তো কষ্ট পাইবেনই, ঘুমের ঘোবে পড়িযাও যাইতে পারেন। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্তম্ভের উপর কাঠের ছাতা এবং কাঠের বেড়া প্রস্তুত করিয়া দিল।

বলা বাহুল্য, এরূপ অদ্ভুত সাধুর অপূর্ব কৃচ্ছ্রসাধনের কথা বেশীদিন চাপা রহিল না। অল্পদিনের মধ্যেই গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে তাহা ছড়াইয়া পড়িল, দলে দলে আবাল বৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিল। স্তম্ভের পাদদেশে তাহারা সবিস্ময়ে উন্মুখ হইয়া সাবর্ণির দিকে চাহিয়া থাকিত।

ক্রমশ এ খবর সাবর্ণির শিষ্যগণেরও কর্ণগোচর হইল। তাহারা শুনিল, তাহাদের গুরুদেব এক অসাধারণ সাধন আরম্ভ করিয়াছেন। তাহারাও সমবেতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং

ওই স্তম্ভের পাদদেশে কুটির নির্মাণ করিয়া থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। সাবর্ণি অনুমতি দিলেন। প্রত্যহ প্রভাতে বৃত্তাকারে স্তম্ভের চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া শিষ্যগণ গুরুর উপদেশ শুনিতে লাগিল।

মহর্ষি সাবর্ণি প্রায়ই তাঁহাদের বলিতেন—"তোমরা শিশুর মতো হবার চেষ্টা কর। স্বয়ং ভোলানাথ শিশুপ্রকৃতির। তোমরাও যদি শিশুর মতো হতে পার, ভোলানাথ প্রসন্ন হবেন, তোমাদের মুক্তির পথ সরল হবে। দেহজ পাপই সকল পাপের মূল। পিতা যেমন সন্তানের জন্মদাতা, দেহজ পাপ তেমনি সর্বপ্রকার পাপের জন্মদাতা। অহঙ্কার, লোভ, আলস্য, ক্রোধ, ঈর্ষা—এ সবই ওই দেহজ পাপের প্রিয় সন্তান। পাটলিপুত্রে দেখে এলাম, ধনীরা বিলাসের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, সে স্রোত কর্দমাক্ত নদীর স্রোতের মতো। অনন্ত পঙ্কসমুদ্রের দিকে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—"

মহর্ষি সাবর্ণির কথা ক্রমশ আরও দূরে প্রচারিত হইল। সাধকশ্রেষ্ঠ উপলচরিত এবং মহর্ষি বনস্পতির কানেও কথাটা গেল। তাঁহারা প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু প্রবল জনশ্রুতিকে শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করিবেন স্থির করিলেন। মহর্ষি সাবর্ণি স্তম্ভশীর্ষ হইতে গঙ্গাবক্ষে তাঁহাদের নৌকার পাল দেখিয়া ভাবিলেন, শঙ্কর বোধ হয় অন্য তপস্বীগণের নিকট তাঁহাকে আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাই এই বৃদ্ধ তপস্বীযুগলকেও তাঁহার নিকট পাঠাইতেছেন। তপস্বীযুগল কিন্তু সাবর্ণির কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। দুইজনেই কিছুক্ষণ পরামর্শ করিলেন, তাহার পরে দুইজনেই এরূপ উদ্ভট কৃচ্ছ্র সাধনের নিন্দা করিয়া সাবর্ণিকে স্তম্ভের উপর হইতে নামিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"এভাবে তপস্যা করবার বিধি কোনও শাস্ত্রে নেই, সাধারণ বুদ্ধিও এর অনুমোদন করে না। অদ্ভুত কাণ্ড করেছ তুমি নেমে পড়—"

মহর্ষি সাবর্ণি কিন্তু তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

উত্তরে কেবল বলিলেন—"সন্ন্যাসীর জীবনই তো অদ্ভুত জীবন। তার আবার বাঁধাধরা কোনও নিয়ম আছে না কি? সন্ন্যাসীর আচরণ অসাধারণ হবেই। শঙ্করের ইঙ্গিতেই এই স্তম্ভে আরোহণ করেছি। তিনি যতক্ষণ না নামবার ইঙ্গিত করছেন, ততক্ষণ নামব না।"

সাধকশ্রেষ্ঠ উপলচরিত এবং মহর্ষি বনস্পতি মৃদু হাস্য করিয়া স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন। সাবর্ণির জনপ্রিয়তা কিন্তু বাড়িতে লাগিল। প্রতিদিন দলে দলে নূতন সন্ন্যাসীরা আসিয়া সাবর্ণির শিষ্যবর্গের সহিত যোগদান করিলেন। স্তম্ভের নিকট আরও অনেক কুটির নির্মিত হইল, অনেকে শূন্যেও কুটির নির্মাণ করাইলেন। সাবর্ণির অনুকরণে কোন কোন সাধু মন্দিরের অন্যান্য উচ্চ স্তম্ভগুলির উপরও বসবাস আরম্ভ করিতে উদ্যত হইলে বাকী সাধুরা তাহাদের ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। সেই জন্যও বটে এবং স্তম্ভের উপর বাস করা ক্লেশকর বলিয়াও অবশেষে তাঁহারা সে মতলব ত্যাগ করিলেন।

মহর্ষি সাবর্ণির খ্যাতি কিন্তু ক্রমশ বিস্তৃত হইতেছিল। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য প্রচুর তীর্থযাত্রীর সমাগম হইতে লাগিল। বহু যাত্রী বহু দূর হইতে পদব্রজে আসিয়া ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িতেন। জনৈকা বিধবা রমণী ইহার সুযোগ লইল। সে ছোটখাটো একটি

ফলের দোকান আরম্ভ করিয়া দিল। জলও রাখিত। স্তম্ভের কাছে একটি রঙীন চাঁদোয়া খাটাইয়া, ফলের ঝুড়ি, জলের কলসী এবং মাটির খুরি প্রভৃতি সাজাইয়া স্তম্ভের গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া সে যাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করিত —'টাটকা ফল, টাটকা জল-- ।" দোকান বেশ চলিতে লাগিল। তাহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া একজন ব্রাহ্মণ ভাত রুটি তরকারি প্রস্তুত করিবার আয়োজনও করিয়া ফেলিল। স্তম্ভের নিকটে দেখিতে দেখিতে একটি পাকশালা ও ভোজনশালা প্রস্তুত হইয়া গেল। জনসমাগমের বিরাম ছিল না, সুতরাং খরিদ্দারের অভাব হইল না। ইহার পর বড় বড় শহর হইতে ধনীরাও আসিতে আরম্ভ করিলেন। ধনীদের জন্য মহার্ঘতর ব্যবস্থাও হইতে লাগিল। শহর হইতে বড় বড় ব্যবসায়ীরা আসিয়া বড় বড় পান্থশালা নির্মাণ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের উষ্ট্র, অশ্ব, অশ্বতর প্রভৃতির জন্যও মন্দুরা প্রভৃতি নির্মিত হইল। স্তম্ভটিকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমশ বেশ বড় একটি বাজার গড়িয়া উঠিল, মাছ-মাংস-তবকারি-বিক্রেতারা আসিয়া জুটিলেন এবং দোকান খুলিয়া খরিদ্দারদের ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিলেন। একটি চটুল-ভাষী ক্ষৌরকারও আসিয়া নিজের ব্যবসা ফাঁদিয়া ফেলিল। সে মাঠে বসিয়াই সকলের দাড়ি ছাঁটিত, চুল নখ কাটিত এবং বসালাপ করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিত। যে ভগ্নমন্দির এতকাল নীরব নিস্তব্ধ শান্তিপূর্ণ ছিল, হাস্যে কলরবে তর্কে গুজবে মুখরিত হইয়া উঠিল। মন্দিরের নিম্নভাগে যে অন্ধকাব কক্ষগুলি ছিল ব্যবসায়ীরা সেগুলি অধিকার করিয়া বিপণিতে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিল। বিপণির উপর বিপণির বিশেষত্বও বিজ্ঞাপিত হইল। অধিকাংশ বিপণি-শীর্ষে এই ধবনেব বিজ্ঞাপন দেখা যাইতে লাগিল ঃ উপবে মহর্ষি সার্বর্ণির একটি ধ্যানমগ্ন চিত্র, আব তাহার নীচে লেখা বহিযাছে, 'এখানে ভাল দ্রাক্ষাসব পাওয়া যায়—উৎকৃষ্ট মাধ্বী, গৌড়ী এবং পৈষ্ঠী সুরাও মিলিবে।' স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ মনোহারিণী তরুণীগুলির উপর পেঁয়াজ, বসুন, শুঁটকি মাছ এবং পাঁঠার রাং দুলিতে লাগিল। মন্দিরের পুরাতন বাসিন্দা ইন্দুরেরা দলবদ্ধ হইয়া অন্যত্র পলায়ন কবিল। ঘুঘু, বক, কপোত, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি যে সব পক্ষী মাঝে মাঝে আসিয়া মন্দিরে বসিত অথবা নীড় নির্মাণ করিত তাহারাও রান্নাঘরের ধূমে, মাতালদের চীৎকারে এবং ভৃত্যদের কলরবে ভীত হইয়া মন্দিরের সংস্রব ত্যাগ করিয়া অন্যত্র উড়িয়া গেল। বন্য নির্জনতা আর রহিল না।

জনসমাগম ক্রমশ এত অধিক হইতে লাগিল যে, সকলে নাগরিক শৃঙ্খলার প্রয়োজন অনুভব করিলেন। স্থপতিবিদগণকে আহ্বান করা হইল। তাঁহারা স্তম্ভের চতুর্দিকে পাকা রাস্তা নির্মাণ করিতে লাগিলেন। পাকা বাড়ি এবং পাকা মন্দির প্রস্তুত করিবার জন্য রাজমিস্ত্রিরাও নিযুক্ত হইল। ছয় মাসের মধ্যে রীতিমত একটা শহর গড়িয়া উঠিল, শহরের সমস্ত সাজসজ্জা উপকরণ উপচার সংগৃহীত হইল। সৈন্যসামন্ত, বিচারালয়, কারাগার, চিকিৎসালয়, পাঠশালা কিছুই আর বাকি রহিল না।

অসংখ্য তীর্থযাত্রী আসিতে লাগিল। ধর্মজগতেই একটা সাড়া পড়িয়া গেল যেন। কেবল তীর্থযাত্রী নয়, বড় বড় শৈব পুরোহিত ও পণ্ডিতেরাও ভক্তিতে গদগদ হইয়া সমবেত হইতে লাগিলেন। উত্তর প্রদেশের একজন প্রতাপশালী নৃপতি তাঁহার ধর্মযাজকদের লইয়া উপস্থিত

হইলেন এবং মহর্ষি সাবর্ণির দুরূহ তপশ্চর্যায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার অনুচরবর্গকেও মুগ্ধ হইতে হইল। সাধক-শ্রেষ্ঠ উপলচরিত এবং মহর্ষি বনস্পতি উক্ত নৃপতির শাসনাধীনে বাস করিতেন। নৃপতি মুগ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহাদের একটু অস্বস্তি হইল। অবশেষে তাঁহাব পুনরায় আসিয়া তাঁহাদেব পূর্বোক্ত আচরণ ও উক্তির জন্য সাবর্ণির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

মহর্ষি সাবর্ণি তাঁহাদের বলিলেন—"ভাই, তোমবা বিশ্বাস কর, যে প্রচণ্ড প্রলোভন আমাকে সর্বদা আক্রমণ করছে তাব তুলনায় আমার এ প্রায়শ্চিত্ত কিছু নয়। মানুষকে বাইরে থেকে বা দূব থেকে দেখলে খুব ছোট দেখায়। শঙ্কর আমাকে যে স্তম্ভের উপর স্থাপন কবেছেন সেখান থেকে মানুষদেব ইঁদুরের মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু সত্যিই তো তারা ইঁদুর নয়। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মানুষকে বিচার করতে হয়, তখন বোঝা যায় মানুষ কত বড়, কত বড় তার সমস্যা। মানুষ পৃথিবীব মতোই বড়, কারণ সেই তো তার চেতনা দিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে ধবে রেখেছে। এখান থেকে আমি কত কি দেখতে পাচ্ছি! কত নূতন মানুষ, নূতন মন্দির, নূতন গৃহ, গাছপালা, নদী, নৌকা, বিরাট সৈকত, পর্বত, শস্যক্ষেত্র, দূরের গ্রামগুলি। কিন্তু আমাব অন্তবেব মধ্যে যা আছে তার তুলনায এ সমস্তই তুচ্ছ। আমাব মধ্যে অসংখ্য নগরও আছে, অনন্ত মরুভূমিও আছে। আর তাদের আবৃত করে, বেখেছে পাপ আর মৃত্যু, বাত্রি যেমন পৃথিবীকে আবৃত করে, ঠিক তেমনিভাবে। আমি শুধু জগৎ নই, কলুষিত জগৎ। তাই প্রাযশ্চিত্ত কবছি—"

তিনি এ কথা বলিলেন, কারণ রিবংসা তাঁহার চিত্তকে পীড়িত করিতেছিল।

এই ভাবে ছয় মাস কাটিল। সপ্তম মাসে পাটলিপুত্র হইতে সুমতি এবং শারিকা নাম্নী দুইটি বন্ধ্যা প্রৌঢ়া রমণী সন্তানলাভেব আশায় সাবর্ণির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। জনশ্রুতি শুনিয়া তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, উক্ত স্তম্ভের স্পর্শ বিশেষ গুণসম্পন্ন, স্তম্ভের গুণে এবং মহর্ষি সাবর্ণির কৃপায় তাহারা নিশ্চযই জননীত্ব লাভ করিবে। তাহাবা প্রায উলঙ্গ হইয়া স্তম্ভের পাষাণে সর্বাঙ্গ ঘর্ষণ কবিতে লাগিল। ইহাব পর হইতে ভীড় আরও বাড়িয়া গেল। নানা উদ্দেশ্য লইয়া নানারকম নরনারী ক্রমশ জুটিতে লাগিলেন। সাবর্ণি দেখিলেন, যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর কেবল মানুষ আর মানুষ। অবিচ্ছিন্ন জনস্রোত। কেহ রথে, কেহ শিবিকায়, কেহ অশ্বে, কেহ বা পদব্রজে স্তম্ভ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। আর তাহাদের ভিতর রহিয়াছে ভয়াবহ কুৎসিত দর্শন রোগীর দল। জননীরা অসুস্থ শিশুদের লইয়া আসিল—কাহাবও হাত পা বাঁকা, চক্ষু অন্ধ, মুখে সফেন লালা, কণ্ঠের স্বর কর্কশ। সাবর্ণি তাহাদের গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। দুই হাত উর্ধ্বে তুলিয়া অন্ধের দল আসিল, মুখ উঁচু করিয়া সাবর্ণিকে তাহাদের রক্তাক্ত অক্ষি গহ্বর দেখাইল। অনড় অসাড় পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীরা আসিল, সাবর্ণি তাহাদের শুষ্ক শীর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিলেন। খঞ্জেরা তাহাদের ওই বিকৃত পদ তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। কর্কটরোগাক্রান্ত নারীরা তাহাদের ক্ষতবিধ্বস্ত স্তন উন্মুক্ত করিয়া দেখাইল এবং আর্তস্বরে নিবেদন করিল রোগ-শকুনি কিভাবে জীবন্ত অবস্থায় তাহাদের

ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে। শোক রোগাক্রান্ত স্ফীতকায় রোগীরাও স্তম্ভের পাদদেশে আসিয়া তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিল। যাহারা কুষ্ঠব্যধিগ্রস্ত, ভাল করিয়া চলিতে পারে না, তাহারাও লাঠির উপর ভর করিয়া ধীরে ধীরে স্তম্ভের সমীপবর্তী হইল এবং তাহাদের সিংহবৎ মুখ তুলিয়া সাশ্রুনয়নে দাঁড়াইয়া রহিল। সাবর্ণি সব দেখিলেন, সব শুনিলেন এবং সকলেব মঙ্গ লের জন্য শঙ্করের নিকট প্রার্থনা করিলেন। অনেকে আরোগ্য লাভ কবিল। উজ্জয়িনী হইতে একটি তরুণীকে তাহার আত্মীয়স্বজনেরা শিবিকায বহন কবিযা লইয়া আসিয়াছিলেন। তরুণীটি ক্রমাগত রক্তবমন করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। তাহাব দেহ রক্তহীন, মুখ বিবর্ণ, চক্ষু মুদিত; আত্মীয়স্বজনেরা ভাবিয়াছিলেন, সে বোধহয় মাবাই গিয়াছে। সাবর্ণি তাহাব জন্য প্রার্থনা করিতেই সে মাথা তুলিল, চক্ষু খুলিল।

এই ধবনের আশ্চর্যজনক সংবাদ দ্রুতবেগে দূরদূরান্তরে প্রচারিত হইয়া পড়িল। ফলে, রোগীর ভীড় আরও বাড়িতে লাগিল। মৃগীরোগগ্রস্ত লোকেবা, এমন কি বিকৃতমস্তিষ্ক লোকেরাও—চিকিৎসকেবা যাহাদেব বহু পূর্বেই জবাব দিযাছেন—তাহাবাও আসিযা হাজিব হইল। সাবর্ণি স্তম্ভশীর্ষে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন, স্তম্ভটি দেখিবামাত্র কোন কোন মৃগীবোগীব সমস্ত দেহ আক্ষিপ্ত হইতেছে। কেহ কেহ যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, কাহাবও বা ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহ নানাভাবে কুঞ্চিত প্রসারিত হইতেছে, মৃগীরোগীদের দেখিযা সাবর্ণিব শিষ্যগণও বিচলিত হইলেন, অনেকে এত বিচলিত হইলেন যে মৃগীরোগীদের দেখিয়া তাঁহাদের দেহেও আক্ষেপ জাগিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল যে তাঁহারাও উন্মত্তবৎ ওই সব বোগীদেব নকল কবিতেছেন! ক্রমে মৃগীবোগীদের নকল করাটাই যেন মহর্ষি সাবর্ণিব আশীর্বাদ আকর্ষণেব উপায় হইয়া দাঁড়াইল। ফলে, কিছুদিনের মধ্যেই সাধু তীর্থযাত্রী, বোগী নিরোগ, স্ত্রী পুরুষ সকলেই নিজেদের দেহকে নানাভাবে বাঁকাইয়া, ধুলায় লুটাইয়া, এমন কি মুঠা মুঠা ধুলা ভক্ষণ করিয়া স্তম্ভের চতুর্দিকে চীৎকার করিয়া সাবর্ণির করুণাকণা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সমস্ত পরিবেশটাই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। মহর্ষি সাবর্ণি স্তম্ভের শীর্ষদেশ হইতে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহে একটা বিদ্যুৎশিহরণ বহিয়া গেল। তিনি আকুলচিত্তে শঙ্করকে স্মরণ করিয়া বলিলেন—" প্রভু, ওরা নিজেদের পাপের জন্য আমাকে দায়ী করছে। পাপমোচন করতে করতে আমি নিজে যে পাপে পরিপূর্ণ হয়ে গেলাম। আমাকে রক্ষা কর—"

কোনও রোগী রোগমুক্তি হইলেই চতুর্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া যাইত। তাঁহার শিষ্যগণ চীৎকার করিয়া লম্ফঝম্ফ করিতেন আর বলিতেন—"স্বয়ং বিশ্বেশ্বর অবতীর্ণ হয়েছেন। এ স্তম্ভ সাধারণ স্তম্ভ নয়, এ শিবলিঙ্গ "

স্তম্ভগাত্রেও নানাবিধ বিচিত্র বস্তুর সমাবেশ ঘটিল। খঞ্জেরা যে যষ্টি বগলে লাগাইয়া চলাফেরা করে সেরূপ বহু যষ্টি স্তম্ভগাত্রে দুলিতে লাগিল, নারীরা নিজেদের অলঙ্কার এবং মালা তাহাতে টাঙাইয়া দিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ শিববিষয়ক বহু শ্লোক স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ করিলেন, বহু ব্যক্তি নিজেদের নামও খোদিত করাইলেন। সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই

স্তম্ভটি সংস্কৃত, ব্রাহ্মী, শৌরসেনী, পালি, প্রাকৃত মাগধী, মৈথিলী প্রভৃতি বিবিধ ভাষা ও বর্ণমালার সঙ্গমস্থল হইয়া উঠিল।

শিবরাত্রির সময় সেই অত্যাশ্চর্য স্তম্ভকে ঘিরিয়া এত ভীড় হইল যে, প্রাচীন বৃদ্ধগণ বলিতে লাগিলেন—সত্যযুগ ফিরিয়া আসিয়াছে। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র, সমতটবাসী জনতার সহিত কোশল, পাঞ্চাল, গান্ধার, উজ্জয়িনী, এমন কি চেল্লা প্রদেশবাসী জনতার মিলন ঘটিল। তাহাদের প্রত্যেকের ভাষা, আচার-ব্যবহার এবং পোশাকের বৈশিষ্ট্য সেই বিরাট সম্মিলনকে এক অদ্ভুত বৈচিত্র্যে মণ্ডিত করিল। অবগুণ্ঠিতা ও অনবগুণ্ঠিতা, সুশ্রী, যুবতী ও বৃদ্ধারা বিবিধ বিচিত্রবেশে সজ্জিত হইয়া কেহ পদব্রজে কেহ শিবিকারোহণে কেহ বা গর্দভের পৃষ্ঠে চড়িয়া স্তম্ভটিকে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। জনতার চিত্তবিনোদন করিবার জন্য নর্তক-নর্তকীরা আসিল, বহু পালোয়ানও ভূমিতে বড় বড় কার্পেট পাতিয়া তাহার উপর কুস্তি শুরু করিয়া দিল, জনতা বৃত্তাকারে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে লাগিল। কোথাও সাপুড়েরা খেলা দেখাইয়া অর্থোপার্জনের প্রয়াস পাইল। বিরাট জনতা বিরাটরূপে মূর্ত হইল। অর্থ এবং শস্ত্রের ঝনৎকার, বিবিধ ভাষার কলহ, বিবিধ প্রকার বেশের বৈচিত্র্য, ধূলিধূম সঙ্গীত ও চীৎকারের সংমিশ্রণ যে অপূর্বতার সৃষ্টি করিল তাহাতে সকলে চমৎকৃত হইয়া গেলেন। শব্দরূপী ব্রহ্ম সেখানে যেন বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। উষ্ট্র এবং অশ্ব পরিচারকদের গালাগালি, দোকানদারদের বাঙ্‌ময় বিজ্ঞাপন, দৈব ঔষধ ও মাদুলী বিক্রেতার উচ্চ কণ্ঠস্বর, সন্ন্যাসীদের উদাত্ত মন্ত্রোচ্চারণ, বিফলমনোরথ নারীদের করুণ আর্তনাদ, ভিক্ষুকদের কলরব, ছাগল ভেড়া গাধাদের কর্কশ চীৎকার মিলিয়া এমন এক বিপুল শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল যে মদ্রদেশবাসী তক্রবিক্রেতাদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠও মাঝে মাঝে তাহাতে নিমজ্জিত হইয়া গেল।

এই বিপুল জনতার মাথার উপর ছিল নির্মেঘ রৌদ্রকরোজ্জ্বল আকাশ, আর সে আকাশে ভাসিতেছিল বহু প্রকার গন্ধ। নারীদের প্রসাধনজনিত গন্ধ, অসুস্থ ও অসভ্যদের গায়ের দুর্গন্ধ, পাকশালার গন্ধ। সাবর্ণির জন্য বহু স্থান হইতে বহু লোক বহু প্রকার ধূপ ধূনা চন্দন ও গুগগুল আনিয়াছিলেন এবং অহোরাত্র সেগুলি পোড়াইতেছিলেন।

রাত্রির দৃশ্য আরও অদ্ভুত। মশাল ও নানারূপ দীপালোকে সমস্ত স্থানটা রক্তাভ হইয়া উঠিত। জনতার লোকগুলিকে মনে হইত কৃষ্ণকায় ছায়ামূর্তি। সেই রক্তাভ অন্ধকারে কোথাও বা দেখা যাইত একদল লোক গুঁড়ি মারিয়া নিবিষ্টচিত্তে গল্প শুনিতেছে। তাহাদের সম্মুখে এক ঋজুদেহ বৃদ্ধ বসিয়া অঙ্গভঙ্গী সহকারে এক উদ্ভট গল্প ফাঁদিয়াছেন—কি করিয়া এক ডাইনী একবার তাঁহার হৃদয় চুরি করিয়া আমগাছের ভিতর পুরিয়া দিয়া অবশেষে তাঁহাকে এক হৃদয়হীন বাবলাগাছে পরিণত করিয়াছিল। তাঁহার অঙ্গভঙ্গীর দীর্ঘ ছায়া শ্রোতৃবৃন্দকে বিস্মিত ও আতঙ্কিত করিয়া তুলিতেছিল। কোথাও মাতালেরা কোলাহল করিতেছিল, কোথাও নর্তকীরা রঙ মাখিয়া উলঙ্গ হইয়া লম্পটদের লইয়া নাচগানে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক যুবক পাশাখেলায় মাতিয়াছিল। অনেক বৃদ্ধ রূপজীবাদের পিছু পিছু ঘুরিতেছিল। এই বৈচিত্র্য পূর্ণ ছায়া গুলোকের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া ছিল সেই বিরাট স্তম্ভ। স্তম্ভশীর্ষে উৎকীর্ণা স্মিতাননা

সেই নাবীটি যেন হাসিমুখেই সব দেখিতেছিল। আব স্তম্ভেব উপবিভাগে বসিযা ছিলেন মহর্ষি সাবর্ণি, স্বর্গমর্ত্যেব সন্ধিস্থলে।

অনেক বাত্রে সহসা আকাশ উদ্ভাসিত কবিযা চন্দ্রোদয হইল। দিগন্তনিবদ্ধ ঈষৎ বত্র জাহ্নবীধাবাকে রূপসী বমণীব বাহুব মতো দেখাইতে লাগিল। তীববর্তী নীল পর্বতমালাকে জ্যোৎস্নালোকে অপরূপ মনে হইতেছিল। মনে হইতেছিল, যেন মখমলেব কোমলতা ও নীলাব দ্যুতিব অপূর্ব সমন্বয ঘটিযাছে। সাবর্ণি জাহ্নবীধাবাব দিকে নির্নিমেষ চাহিয়া ছিলেন তাঁহাব মনে হইল, নিবঞ্জনাব লীলাযিত বাহুটিই যেন বাত্রিব লীলাঞ্চলেব দেখা যাইতেছে।

দিনেব পব দিন কাটিতে লাগিল। সাবর্ণি স্তম্ভেব উপবই বসিযা বহিলেন। বর্ষাকাল আসিল। সামান্য দারুনির্মিত আববণ বর্ষাব মুষলধাবা বোধ কবিতে পাবিল না, তাঁহাব সর্বাঙ্গ প্লাবিত হইতে লাগিল। গ্রীষ্মেব প্রখব বৌদ্রে তাঁহাব চর্ম ইতিপূর্বেই শুষ্ক হইযা ফাটিযা গিযাছিল, বর্ষাব জল পডিযা সেগুলি বড বড ক্ষতে পবিণত হইল। শীতে এবং ঠাণ্ডাতেও তিনি যৎপবোনাস্তি দুঃখ ভোগ কবিলেন, তাঁহাব হস্তপদ অসাড অবশ হইযা আসিল। কিন্তু নিবঞ্জনাকে তিনি এক মুহূর্তেব জন্যও ভুলিতে পাবিলেন না। কামনাকীট তাহাব হৃদয কুবিযা কুবিযা খাইতে লাগিল।

তিনি কাতবহৃদযে কেবল প্রার্থনা কবিতেন—"হে শঙ্কব, এখনও কি আমাব যথেষ্ট শাস্তি হযনি? আব কত প্রলোভন, কত কুৎসিত চিন্তা, কত ভীষণ কামনা আমাব মনে জাগবে প্রভু? শাস্তি যদি যথেষ্ট না হযে থাকে তা হলে ঘৃণ্যতম কামনাব কর্দমে আমাব মনকে আবও ডুবিযে দাও, আমাব প্রাযশ্চিত্ত সম্পূর্ণ হোক। অনেকে বলেন, কামুক ছাগ কামনাব মত প্রতীক বলেই বলিব পশুরূপে নির্বাচিত হয। আবাব অনেকে বলেন, সে সকলেব কামনাব বোঝা বহন কবে যূপকাষ্ঠে আত্ম বলিদান দেয। সে ঘৃণ্য পশু নয, নমস্য। আগে এ সব কথা আমি বিশ্বাস কবতাম না। কিন্তু এখন মনে হয, কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয। নিজেব অন্তবেই এব সত্যতা অনুভব কবছি। বিবাট গহ্ববে নিক্ষিপ্ত আবর্জনাব মতো ইতব সাধাবণেব সংখ্যা পাপ সন্ন্যাসীদেব অন্তবে নিক্ষিপ্ত হযে তাব আত্মাকে কলুষিত কবে তোলে। এত লোকেব পাপ, এত কামনা, এত বিবংসা তাদেব অন্তবে এসে পুঞ্জীভূত হয যে, তাদেব মাথাব ঠিক থাকে না। আমাব তাই হযেছে। প্রভু, তোমাব বিধানেই যদি আমাব এমন হযে থাকে, তবে তাই হোক, আমাকে নবককুণ্ডে পবিণত কব—"

জনতাব মধ্যে হঠাৎ এক গুজব উঠিল, পাটলিপুত্রেব বণতবী অধ্যক্ষ জীমূতবাহন সাবর্ণি সন্দর্শনে আসিতেছেন। এ কথা সাবর্ণিব কর্ণগোচব হইল। ইহাও শোনা গেল যে, তিনি বেশীদূবে নাই, তাঁহাব মযূবপঙ্খীব পাল গঙ্গাবক্ষে দেখা যাইতেছে।

সংবাদটি মিথ্যা নয। বৃদ্ধ জীমূতবাহন বাজকীয কর্তব্যেব অনুবোধে গঙ্গানদী ও গঙ্গানদীব খালসমূহ পবিদর্শন কবিযা বেড়াইতেছিলেন। একদিন সাবর্ণিব অলৌকিক কাহিনী তাঁহাব কর্ণগোচব হইল। কথাটা প্রথমে তিনি বিশ্বাসই কবিতে পাবিলেন না। তাহাব পব আব এক স্থানে গিযা কথাটা আবাব শুনিলেন। এবাব শুনিলেন, স্তম্ভকে ঘিবিযা সাবর্ণিপুব নামে একটা নগবই নাকি গড়িয়া উঠিযাছে। তাঁহাব কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল। তিনি স্থিব কবিলেন, সাবর্ণিকে

ঘিবিযা যে নগব গড়িযা উঠিযাছে তাহা দেখিযা আসিবেন। নৌবহব সজ্জিত হইল একদা প্রভাতে তিনি সাবর্ণিপুব অভিমুখে যাত্রা কবিলেন। গঙ্গাব তীব সাবর্ণিপুব একটু দূবে অবস্থিত। তবণী হইতে অবতবণ কবিযা তিনি তাঁহাব সহকাবী লেখক শিখবনাথ এবং চিকিৎসক সুবসেনকে সঙ্গে লইযা সাবর্ণি সন্দর্শনে চলিলেন। তাহাব পিছনে তাঁহাব দেহবক্ষীগণ সাবিবদ্ধ হইযা আসিতে লাগিল। তাহাদেব পোশাকেব ও অস্ত্রশস্ত্রেব আড়ম্ববে সকলে চমকিত হইযা গেল।

স্তম্ভেব নিকটে আসিযা জীমূতবাহন ঊর্ধ্বমুখে খানিকক্ষণ দাঁড়াইযা বহিলেন। ব্যাপাবটা তাহাব নিকট বড়ই অদ্ভুত ঠেকিল। জীমূতবাহন কেবলমাত্র যোদ্ধাই ছিলেন না, গ্রন্থকাবও ছিলেন। জলযুদ্ধ বিষযক গ্রন্থ ছাড়াও আবও নানা বকম গ্রন্থ লিখিযাছিলেন। তাঁহাব অনেক বকম অভিজ্ঞতাও ছিল। জীবনে কত প্রকাব অদ্ভুত জিনিস দেখিযাছেন তাহা বর্ণনা কবিযা একটি গ্রন্থ বচনা কবিবাব বাসনা তাঁহাব অনেক দিন হইতেই ছিল। সাবর্ণিকে দেখিযা তাঁহাব কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল।

মাহ ব ছ [illegible] দিযা তিনি বলিলেন, "হ্যা এই সেই। কি আশ্চর্য! ভদ্রলোক আমাবই বাড়িতে একদিন বাত্রে এসে আতিথ্য গ্রহণ কবেছিলেন প্রায এক বছব আগে। তাব পবদিন শোনা গেল, [illegible] ভিনেত্রীকে নিযে সবে পড়েছেন পাটলিপুত্র থেকে।"

লেখক শিখবনাথেব দিকে ফিবিযা তিনি বলিলেন, "ওহে, এ কথাটা লিখে নাও তুমি আব এই থামটাব মাপজোকও সব টুকে নাও। থামেব মাথায যে হাস্যবদনা নাবীমূর্তিটি আছে সেটিব কথাও লিখতে ভুলো না। কি আশ্চর্য!"

পুনবায কপালেব ঘাম মুছিযা বলিলেন, "সবাই বলছে ভদ্রলোক এক বৎসব ধ'বে এই থামেব উপব চ'ড়ে ব'সে আছেন। একবাবও নামেন নি। সুবসেন, এ কথা বিশ্বাস কব তুমি? এ কি সম্ভব?"

সুবসেন বলিলেন, "নির্বোধ অথবা অসুস্থ লোকেব পক্ষে সম্ভব। কিন্তু দেহ মন যা'ব সুস্থ সে এ ভাবে বসে থাকতে পাববে না। এ ধবনেব অসুস্থ লোকেবা, মানে পাগলেবা, এক বকম অসাধাবণ শক্তিবও অধিকাবী হয। সাধাবণ সুস্থ মানুষদেব সে বকম শক্তি থাকে না তবে কি জানেন, কে সুস্থ কে অসুস্থ তা ঠিক কবা শক্ত। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন বকম প্রত্যেকেব মনেব গঠন, দেহেব গঠন আলাদা আলাদা। চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ে আব বহুবকম লোক দেখে আমাব ধাবণা হযেছে যে, প্রতিটি লোক স্বতন্ত্র একটা জগৎ যেন এমন কতকগুলো বোগও আছে যে মনে হয, ভাল কবিতাব মতো তাবাও ছন্দেব নিযম মেনে চলে। সবিবাম জ্বেব কথাই ধরুন না, ঠিক সমযে ছেড়ে যায। আবাব কোন কোন বোগ মানুষেব চবিত্রই বদলে দেয। কাবও চিত্তবৃত্তি তীক্ষ্ণতব হয, কাবও বা ভোঁতা হযে যায কাঞ্চনকে চেনেন তো? বাল্যকালে অত্যন্ত বোকা ছিল সে। একদিন সিঁড়ি থেকে পড়ে গিযে মাথায চোট লাগল, আব অমনি তাব বুদ্ধিও খুলে গেল, চবিত্রও বদলে গেল। সে এখন বিখ্যাত আইন-ব্যবসাযী একজন। এই সন্ন্যাসীবও তেমন কিছু হযেছে বোধ হয। ভদ্রলোক কোথাও কোন চোট খেযেছেন—হয শবীবে, না হয মনে। তা ছাড়া ওই থামেব উপব বসে

থাকাটা আপনি অসম্ভবই বা মনে কবছেন কেন? অনেক সন্ন্যাসীই তো স্থাণু হয়ে থাকতে পাবেন। বাল্মীকিব গল্পটা মনে করুন না।"

জীমূতবাহন বলিলেন, "কিন্তু এ যে বিদঘুটে কাণ্ড হে! থামেব উপব চড়ে বসে আছে! কি আশ্চর্য! নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকাটাই তো আমি অস্বাভাবিক মনে কবি। সুস্থ মানুষ খাটবে খাটাবে, দৌড়ঝাঁপ কববে, হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে কেন! এতে নিজেব ক্ষতি, সমাজেব ক্ষতি। ধর্মবিশ্বাসেব ফলে এ বকম হয়েছে বলছ? ওই স্তম্ভটা কি শিবলিঙ্গেব প্রতীক? তা ই যদি হয়, এ বকম কাণ্ড আব কোন শৈবকে তো কবতে দেখি না। শিবমন্দিরে ধ্যানস্থ হয়ে অনেককে বসে থাকতে দেখেছি শিবেব সঙ্গে অনেকে কথা বলেন এও শুনেছি। কিন্তু ঠিক এ বকমটা কখনও দেখিওনি, শুনিওনি। আশ্চর্য ব্যাপাব! বাজপুরুষ হিসাবে কাবও ধর্মে হস্তক্ষেপ কবা উচিত নয়, প্রত্যেকে যাতে নির্বিঘ্নে স্ব স্ব ধর্ম পালন কবতে পাবে, তাই ববং আমাদেব দেখা কর্তব্য। ধর্ম কি, তা নিয়ে মাথা ঘামাবাবও দবকাব নেই আমাদেব। লোকে যেটাকে ধর্ম বলে মেনে নিয়েছে, তা ভাল মন্দ যাই হোক, সেটাকে বক্ষণাবেক্ষণ কবে জনসাধাবণকে তুষ্ট বাখাই উচিত জনসাধাবণকে চটিয়েও লাভ নেই, ঘাঁটিয়েও লাভ নেই। ওদেব কুসংস্কাবগুলোক এড়াবাব একমাত্র উপাযই হচ্ছে ওদেব না ঘাঁটানো। এ ক্ষেত্রেও তাই কবা যাক উনি থামেব উপব বসে স্বর্গেব স্বপ্ন দেখুন আব কাক বক শালিক তাড়াতে থাকুন, ও নিয়ে আমব মাথা ই ঘামাব না এ সম্বন্ধে যেটুকু খবব জানা গেছে, সেইটুকু লিখে বাখব কেবল "

একবাব কাশিয়া এবং আব একবাব কপালেব ঘাম মুছিয়া তিনি শিখবনাথকে বলিলেন, "লেখ, কোন কোন শৈব সাধু অভিনেত্রীকে নিয়ে সবে পড়াটাকে সাধনাব অঙ্গ বলে গণ্য কবেন সম্ভবত অভিনেত্রীবা উত্তবসাধিকাকপে ব্যবহৃত হন। কিন্তু ব্যাপাবটা ওঁকে জিজ্ঞাসা কবই তো ভুক "

তিনি মুখ উঁচু কবিয়া সাবর্ণিব দিকে চাহিলেন এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বাবা সূর্যেব তীব্র কিবণ হইতে নিজেব চক্ষু আড়াল কবিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "মহর্ষি সাবর্ণি, আপনি একদিন আমাব আতিথ্য স্বীকাব কবেছিলেন—এ ঘটনা যদি আপনাব স্মবণ থাকে তা হলে দযা কবে আমাব কয়েকটি প্রশ্নেব জবাব দিন। আপনি এখানে কি কবছেন? থামের উপর চড়লেন কেন, কেনই বা ওখানে বসে আছেন? শিবলিঙ্গের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে কি?"

সাবর্ণি জানিতেন, জীমূতবাহন বৌদ্ধ। তাই তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। কিন্তু তাঁহার প্রধান শিষ্য পণ্ডিত হবানন্দ অগ্রসব হইয়া আসিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন, "আমি যতটুকু জানি তা বলবাব যদি অনুমতি দেন—"

"আপনি কে?"

"আমি ওঁব শিষ্য একজন।"

"বেশ কি জানেন বলুন?"

"আমাদেব গুরুদেব পৃথিবীর দুঃখের ভার নিজের মাথায় তুলে নিয়ে তাকে ব্যাধিমুক্ত

করছেন। ওঁর কৃপায় বহু দুরারোগ্য ব্যাধি সেরেছে, অনেক পাগল, অনেক মৃগীরোগী ওঁর দর্শনমাত্রেই সুস্থ হয়েছে—"

জীমূতবাহন চিকিৎসক সুরসেনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "শুনছ সুরসেন, উনি সাধারণ সাধু নন। চিকিৎসাও করেন তোমার মতো। এ রকম উচ্চপ্রতিষ্ঠিত সহকর্মীর সম্বন্ধে তোমার কি বলবার আছে?"

সুরসেন মৃদু হাসিয়া ধীরে ধীরে মস্তক সঞ্চালন করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "কোনও কোনও রোগ উনি সারাতে পারেন। এ আর বিচিত্র কি। যেমন মৃগী বা অপস্মার ব্যাধি যাকে লোকে দেব ব্যাধি বলে, তা উনি সারিয়েছেন হয়তো। সব ব্যাধিই অবশ্য দৈব কারণ দেবতারাই ব্যাধির সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু এই বিশেষ ব্যাধিটির উদ্ভব মানুষের মনোলোকে। এই সন্ন্যাসী নারীমণ্ডশোভিত স্তম্ভশীর্ষে বসে অপস্মার রোগীর মনকে যতটা প্রভাবিত করতে পারবেন, আমি তা পারব না। আমার বিদ্যা [illegible] গোড়ায় নিবদ্ধ। যুক্তি আর বিজ্ঞানের [illegible] শান্তি পৃথিবী [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] জিনিস আমি খুব কমই দেখেছি। আশা করি, কোন [illegible] ঐতিহাসিক সার্বর্ণিপুর প্রতিষ্ঠার সত্য ইতিহাস রচনা করবেন। আমার কিন্তু সময় নেই। [illegible] বাকি এখনও, এ নিয়ে আমি আর সময় নষ্ট করতে পারি না। এখন আমাকে [illegible] গুলি পরিদর্শন করতে হবে। [illegible] অদ্ভুতই হোক না কেন এখানে আর সময় নষ্ট করা চলবে না। চল, ফেরা যাক এবার। মহর্ষি সার্বর্ণি নমস্কার চললাম আমি। আপনি যদি কোনদিন থামের উপর থেকে নামেন আর পাটলিপুত্রে যান তাহলে আমার বাড়িতে নিশ্চয় যাবেন। নিমন্ত্রণ করে গেলাম।"

সার্বর্ণির শিষ্যগণ উপরোক্ত কথাগুলি শুনিলেন এবং বিশ্বাসী ভক্তদের মুখে মুখে সেগুলি চতুর্দিকে প্রচার করিয়া দিলেন। সার্বর্ণির মহিমা ইহাতে আরও যেন বাড়িয়া গেল। জীমূতবাহনের কথাগুলি এমন অতিরঞ্জিত হইয়া, এমন রূপকে অলঙ্কৃত হইয়া ছড়াইয়া পড়িল যে, দেশে তিনি অবতাররূপে কীর্তিত হইতে লাগিলেন। জীমূতবাহন সার্বর্ণিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন—এই সাধারণ ব্যাপারটি ভক্তদের মুখে ব্যাখ্যাত হইয়া অসাধারণ হইয়া উঠিল। তাহারা বলিলেন, রাজসিকতা আধ্যাত্মিকতার দিকে যে অনিবার্য আকর্ষণ অনুভব করে ইহা তাহারই নিদর্শন। রাজসিকতার শিখরে আরোহণ করিয়া বৃদ্ধ জীমূতবাহন তাই মহর্ষি সার্বর্ণির সান্নিধ্য কামনা করিতেছেন। সত্য ঘটনার উপর নানারকম রঙও চড়িল। যাঁহাদের উর্বর মস্তিষ্কে রঙ চড়াইলেন, তাঁহারা নিজেরাই তাহা আবার বিশ্বাসও করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ এ কথাও বলিলেন যে, জীমূতবাহন যখন ঘর্মাক্ত কলেবরে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া সার্বর্ণির কৃপা প্রার্থনা করিতেছিলেন তখন স্বর্গ হইতে একটি অপ্সরী নামিয়া আসিয়া নাকি

তাহাব কপালেব ঘর্ম মুছাইয়া দিতেছিল। এই অদ্ভুত ব্যাপাব দর্শন কবিয়া তাঁহাব সহকাবী লেখক শিখবনাথ এবং চিকিৎসক সুবসেনও সাবর্ণিব নিকট দীক্ষা লইবাব জন্য উৎসুক হইয়া পড়িয়াছেন। দুই-একজন শিবপুবাণকাব ঘটনাটিকে সত্য মনে কবিয়া নিজেদেব পুথিতে ঢুকিয়া লইলেন ইহাব পব হইতে সমস্ত ভাবতবর্ষে মহর্ষি সাবর্ণিব নাম তো ছড়াইয়া পড়িলই, এশিয়াব অন্যান্য অংশ এবং ইয়োবোপেব লোকেবাও শুনিল যে ভাবতবর্ষে গঙ্গাতীববর্তী এক স্তম্ভেব উপব ভগবানেব নূতন অবতাব আবির্ভূত হইয়াছেন। তাহাবা সবিস্ময়ে কথাটা বিশ্বাস কবিল পৃথিবীব ধর্মজগতে একটা আলোড়ন পড়িয়া গেল। বিভিন্ন দেশেব ধর্মযাজকেবা, যেমন দলে দলে তেমনি মহাসমাবোহে সাবর্ণিপব সমাগত হইলেন এবং মহর্ষি সাবর্ণিকে বিভিন্ন দেশে নব প্রতিষ্ঠাপন কবিয়া গেলেন।

একদিন বাত্রে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। স্তম্ভেব চতুর্দিকে মুক্ত আকাশতলে সমস্ত নগবী যখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন তখন সাবর্ণিব কানে কানে কে যেন বলিল —"সাবর্ণি তুমি তো এখন জগদ্বিখ্যাত বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ হয়েছ শঙ্কব নিজেব মহিমা প্রচাব কববাব জন্যে তোমাকে অসাধাবণ শক্তি দান কবেছেন তুমি এখন অসাধ্য সাধন কবছ। ইচ্ছে কবলে তুমি আবও অনেক কিছু কবতে পাব আবও অনেক দুবাবোগ্য বোগী সাবাতে পাব ইচ্ছে কবলে সমস্ত পৃথিবীকেই শৈবধর্মে দীক্ষিত কবতে পাব। তোমাব ক্ষমতা অসীম।"

"শঙ্কব আমাকে যা কবাচ্ছেন তাই কবছি। যা কবাবেন তাই কবব।"

উত্তব শুনিলেন "তুমি ওঠ। পাটলিপুত্রেব প্রাসাদে গিয়ে বাজাকে বল হিন্দু সন্তান হয়ে তুমি বৌদ্ধধর্ম আঁকড়ে আছ কেন? দেবাদিদেব মহাদেবেব পূজা না কবে সাধাবণ মানুষ বুদ্ধেব পূজা কবছ কোন বুদ্ধিতে? তুমি যাও। তুমি গেলেই বাজপ্রাসাদেব সিংহদ্বাব আপনি খুলে যাবে তোমাব খড়মেব শব্দে বাজাব স্বর্ণাসন কম্পিত হয়ে উঠবে, বাজা নতমস্তকে তোমাব কাছে এসে দীক্ষা গ্রহণ কববেন। তুমিই তখন প্রকৃতপক্ষেব মগধেব বাজা হবে। তাবপব ক্রমশ কোশল, ইন্দ্রপ্রস্থ, কাঞ্চী, মধ্যপ্রদেশ, পৌণ্ড, কলিঙ্গ, গান্ধাব, চোল, চেদি সকলেই একে একে তোমাব শিষ্যত্ব গ্রহণ কববেন। সমস্ত ভাবতেবই একচ্ছত্র সম্রাট হবে তুমি তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাজাবা তোমাবই অধীন হয়ে থাকবেন। তুমি তখন ভাবতেব সকল ক্ষুধিতকে অন্ন দেবে, সকল অসুস্থকে সুস্থ কববে। ওই জীমূতবাহন তখন তোমাব পদ প্রক্ষালন কবতে পেলে নিজেকে সম্মানিত মনে কববেন। তোমাব মৃত্যুব পব তোমাব বসন পাদুকা ভস্ম অস্থি প্রভৃতিকে কেন্দ্র কবে বড় বড় মন্দিব নির্মিত হবে। বড় বড় পুবোহিত, বড় বড় পণ্ডিত, বড় বড় তপস্বীবা তোমাব প্রদর্শিত পথে চলে ক্রমশ তোমাব মহিমাকে যুগ থেকে যুগান্তবে প্রসাবিত কবে দেবেন। তুমি ওঠ, যাও—"

সাবর্ণি উত্তব দিলেন, "শঙ্কব আমাকে যা কবাবেন তাই কবব।"

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নামিবাব চেষ্টা কবিলেন।

সেই বহস্যময় কণ্ঠস্বব বলিয়া উঠিল, "সামান্য লোকেব মতো তুমি মই বেয়ে নামবাব চেষ্টা কবছ কেন? তুমি তো অসামান্য শক্তিধব। দেবদূতেব মতো তুমি শূন্য দিয়ে উড়ে যাও।

তুমি উড়ে যেতে পারবে। লাফিয়ে পড়। শঙ্কর আছেন তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন, তিনি এই চান—"

সার্বর্ণি উত্তর দিলেন, "শঙ্করের যদি তাই ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে তাই হোক।"

সার্বর্ণি তাহার শীর্ণ হস্ত দুইটি প্রসারিত করিয়া দিলেন মনে হইতে লাগিল এক বিরাটকায় শীর্ণ পক্ষী যেন ডানা মেলিয়াছে। তিনি লাফাইতে যাইবেন এমন সময় একটা চাপা খিলখিল হাসি শুনিতে পাইলেন।

"ও রকম হাসছে কে?"

"আমি" – সেই রহস্যময় কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গ ধ্বনিত হইল, "তোমার সঙ্গ এখনও ছাড়িনি বন্ধু আশা করে আছি আরও ঘনিষ্ঠতা হবে আমাদের। আমিই তো তোমাকে চালাচ্ছি – আমিই তোমাকে থামের উপর চড়িয়েছি, আমার নির্দেশ বর্ণে বর্ণে পালন করে আমাকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছ তুমি। সত্যি, সার্বর্ণি খুব খুশী করেছ আমাকে।"

সার্বর্ণি এবার বুঝিতে পারিলেন।

সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দূর হও –দূর হও। তোমাকে চিনেছি আমি। তুমি মার, তুমি মায়া, তমি শয়তান। শিবের তপোভঙ্গ করবার জন্য তুমিই মদনকে প্ররোচিত করেছিলে।"

সার্বর্ণি হতাশ হৃদয়ে পাষাণময় স্তম্ভশীর্ষে পুনরায় বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর চিন্তা করিতে লাগিলেন

আমি একে আগে চিনতে পারি নি কেন। যে সব অন্ধ বধির পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোক আমার কৃপার আশায় এসে এখানে রোজ ভীড় করে, তাদেরই মতো আমি অন্ধ বধির পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছি না কি। দেখছি আমার হিতাহিতজ্ঞান লোপ পেয়েছে সূক্ষ্মভাব আর আমি ধরতে পারছি না, দেবতা দানবের পার্থক্য বোঝবার শক্তিও আমার লোপ পেয়েছে। পাগলেরও অধম হয়ে গেছি আমি। নরকের কোলাহল আর স্বর্গের সঙ্গীত আমার কানে একই রকম শোনাচ্ছে। সদ্যোজাত শিশুকে মাতৃস্তন থেকে সরিয়ে নিলে কেঁদে ওঠে, সামান্য কুকুরও সহজবুদ্ধিবলে তার প্রভুকে অনুসরণ করে, ক্ষুদ্রতম উদ্ভিদও সহজাত প্রেরণায় আলোর দিকে শাখা বাড়ায়। আমি এখন পাপের হাতে ক্রীড়নক মাত্র পাপের প্ররোচনাতেই এই থামের উপর উঠেছিলাম, আর আমার সঙ্গে বিলাস এবং অহমিকাও উঠে এসে আমার দু পাশে বসে ছিল। প্রলোভনকে আমার ভয় নেই, ইতিপূর্বে অনেক তপস্বী এর চেয়ে বেশী প্রলোভনের কবলে পড়েছেন। আমি বরং কামনা করি শঙ্করের সামনে প্রলোভনের খড়্গ আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলুক কৃচ্ছ্র সাধন করতে করতে আমার মৃত্যু হোক আপত্তি নেই, ওতে আমি আনন্দ পাব। কিন্তু শঙ্কর কই? তাঁর যে কোনও সাড়া পাচ্ছি না কোনও চিহ্নই দেখতে পাচ্ছি না। তিনি কি তা হলে আমাকে ত্যাগ করে গেলেন? তিনিই যে আমার একমাত্র ভরসা, একমাত্র গতি। কিন্তু মনে হচ্ছে, তিনি আমার কাছে নেই ভয়ঙ্কর প্রলোভনের মধ্যে আমাকে নিক্ষেপ করে তিনি দূরে চলে গেছেন। কিন্তু আমি তাঁকে ছেড়ে

তো থাকতে পারব না। আমি তাঁর পিছু পিছু ছুটব। এই স্তম্ভের উপর বসে থাকা চলবে না। অসহ্য মনে হচ্ছে। এর স্পর্শে আমার অঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে। আর এখানে থাকব না। শঙ্করের কাছে যাব, তাঁকে আবার ধরব—"

তৎক্ষণাৎ তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মই দিয়া নামিতে শুরু করিলেন। এক ধাপ নামিয়াই তাঁহাকে পাষাণে খোদিত সেই স্মিতাননা নারীমুণ্ডটির সহিত মুখামুখি হইতে হইল। তাঁহাকে দেখিয়া সে যেন আর একটু হাসিল। ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না যে তিনি এতদিন তপস্যার ছলে কামনার আসনে বসিয়া নিদারুণ কষ্টভোগ করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত কীর্তির মধ্যে কিছুমাত্র মহত্ত্ব নাই [illegible] দানবীয় মত্ততা মাত্র। তিনি তাড়াতাড়ি নামিতে লাগিলেন [illegible] দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, বহুকাল তাঁহারা মৃত্তিকা স্পর্শ [illegible] তিনি লক্ষ্য করিলেন যে অভিশপ্ত স্তম্ভটির ছায়া তাঁহার উপর পড়িয়াছে, [illegible] করিয়া ছুটিতে লাগিলেন। সাবর্ণিপুরের অধিবাসীরা তখন সকলেই নিদ্রামগ্ন [illegible] দেখিতে পাইল না। তিনি পান্থশালা, পণ্যশালা, বিপণিমালা পরিবেষ্টিত বিরাট [illegible] সাবর্ণিপুর অতিক্রম করিয়া গঙ্গাতীরবর্তী পর্বতশ্রেণী লক্ষ্য করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। কেবল একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া কিছুক্ষণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল কিন্তু তিনি যখন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন সেও নিরস্ত হইল। শ্বাপদসরীসৃপপূর্ণ দস্যুতস্কর অধ্যুষিত অরণ্যের মধ্য দিয়া তিনি পর্বতমালা লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। ক্রমাগত চলিতেই লাগিলেন। পরদিন এবং তাহারও পরদিন থামিলেন না।

ক্ষুৎপিপাসায় ও ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া তিনি অবশেষে এক অদ্ভুত নগরীতে প্রবেশ করিলেন। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, কোথাও কোনও জনমানব নাই। তাহার মনে হইল এইবার কি আমি শঙ্করের কাছাকাছি আসিলাম? কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। নগরটি সত্যই অদ্ভুত। একেবারে নীরব, অথচ নিতান্ত ছোটও নয়, বামে দক্ষিণে যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল বাড়ি। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি কিন্তু সবগুলিই ধ্বংসোন্মুখ, একটি বাড়িরও তোরণ নাই। মনে হইল, তিনি হয়তো শঙ্করের অনুচর প্রেতদের পুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন। সহসা দেখিতে পাইলেন কোন কোন বাড়ির মধ্যে বন্য পশুও রহিয়াছে। তরক্ষু হায়েনা প্রভৃতি শ্বাপদ জন্তুরা শাবকদের স্তন পান করাইতেছে। কোথাও বা শবদেহ ছিন্নভিন্ন হইয়া আছে। সাবর্ণি হাঁটিতে হাঁটিতে অবশেষে একটি ভগ্নগৃহের সম্মুখে আসিয়া বড়ই অবসন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। সেখানে বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া বসিয়া লক্ষ্য করিলেন, এই বাড়িটি অন্য বাড়িগুলি হইতে একটু স্বতন্ত্র। প্রথমত শহরের বাহিরে, দ্বিতীয়ত যদিও ধ্বংসোন্মুখ তবু দেখিয়া মনে হয় এককালে ইহা কোনও ধনীর আবাস ছিল, বিধ্বস্ত প্রাকারগুলিতেও অতীত ঐশ্বর্যের স্বাক্ষর রহিয়াছে, তৃতীয়ত কাছেই একটি ঝরনা এবং কয়েকটি খেজুরগাছ আছে। বাহির হইতে একটি ঘরের অভ্যন্তর ভাগ দেখা যাইতেছিল। দেখিয়া সাবর্ণি শিহরিয়া উঠিলেন। ঘরের ভিতর অনেক সাপ কুণ্ডলী পাকাইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু পর মুহূর্তেই তাঁহার মনে হইল, তাড়া

দিলেই সাপ পলায়ন করিবে। তিনি অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। চিন্তা করিতে লাগিলেন—কি করিবেন কোথায় থাকিবেন।

তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, "ওই আমার স্থান। ওই ঘরে বসেই আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"

তিনি হামাগুড়ি দিয়া ঘরটির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পদশব্দ পাইয়াই সাপগুলি বাহির হইয়া গেল। তখন ঘরের মেঝের উপর তিনি লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং বহুক্ষণ একভাবেই শুইয়া রহিলেন। চতুর্দিকের শান্ত নিঃশব্দ পরিবেশ তাঁহার ক্লান্তি অপনোদন করিল। প্রায় চার পাঁচ প্রহর অতীত হইবার পর তিনি উঠিয়া ঝরনার কাছে গেলেন এবং অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিলেন। ক্ষুধারও উদ্রেক হইয়াছিল। দেখিলেন, খেজুর ছাড়া আর কোনরূপ খাদ্য পাওয়া সম্ভব নয়। কয়েকটি খেজুরের সাহায্যেই তিনি ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিলেন। ঠিক ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল না, কিন্তু তিনি ইহাতে ক্ষুব্ধ হইলেন না। ভাবিলেন তাহার পক্ষে এখন কৃচ্ছ্র সাধনই প্রশস্ত

তিনি সমস্ত দিন ঘরের মেঝেতে মাথা ঠেকাইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া থাকিতেন সন্ধ্যা পর্যন্ত একবারও মাথা তুলিতেন না

একদিন যখন এইভাবে শুইয়া আছেন তখন কে যেন বলিল, "মাথা তোল, দেওয়ালের উপর কি আঁকা আছে দেখ অনেক কিছু শিখতে পারবে।"

সাবর্ণি মাথা তুলিয়া দেখিলেন দেওয়াল জুড়িয়া সত্যই নানারকম ছবি আঁকা আছে। চিত্রের বিষয়বস্তুতে কোনও অসাধারণত্ব নাই কিন্তু দেখিলেই বোঝা যায় চিত্রগুলি প্রাচীন এবং সুনিপুণ শিল্পীর সৃষ্টি অধিকাংশই গৃহস্থালীর চিত্র কোন চিত্রে কেহ গাল ফুলাইয়া উনানে ফুঁ দিতেছে কেহ হাঁস তাড়াইতেছে, কোথাও বা রান্না হইতেছে। কিছুদূরে একটি চিত্রে এক শিকারী স্কন্ধে তীরবিদ্ধ একটি মৃগ লইয়া চলিয়াছে কোন চিত্রে কৃষকেরা জমিতে লাঙল দিতেছে কোথাও বা বীজ বুনিতেছে অন্যত্র আবার এক দল নৃত্যপরা যুবতী বিবিধ নৃত্যভঙ্গিমায় যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাদকেরাও আছে। কেহ বাঁশী, কেহ বেহালা কেহ বা মৃদঙ্গ বাজাইতেছে।

একটু তফাতে একটি মোহিনী যুবতীর ছবি রহিয়াছে, তাহার হাতে বীণা শ্লথ কবরীতে পদ্মকলি। অপরূপ ছবি। স্বচ্ছ বসনের ভিতর দিয়া তাহার প্রস্ফুটিত যৌবনের মহিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার ফুল্ল অধর, পীবর স্তন যেন কুসুমের মহিমায় মহিমান্বিত। বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গি সহকারে সে যেন সাবর্ণির দিকেই চাহিয়া রহিয়াছে। সাবর্ণি চক্ষু নত করিলেন।

তাহার পর বলিলেন, "কে আপনি, এ সব ছবি দেখতে আমাকে কেনই বা আদেশ করলেন? অসাধারণ কিছুই তো দেখলাম না। সবই তো নশ্বর জীবনের লীলাখেলা। যে ভোগী পুরুষের বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য এ সব আঁকা হয়েছিল, তার দেহ নিশ্চয় শ্মশানভস্মে পরিণত হয়েছে। ছবিগুলি সুন্দর সন্দেহ নেই, কিন্তু এগুলি দেখে সেই মৃত

মানুষটির কথাই আমার মনে হচ্ছে। এ সবই তার ক্ষণস্থায়ী অহঙ্কারের চিহ্নমাত্র। সে কোথা?'

উত্তর হইল— 'সে মারা গেছে। কিন্তু সে যে একদিন মহাসমারোহে সগৌরবে বেঁচে ছিল তাতেও সন্দেহ নেই। তুমিই কি চিরকাল বেঁচে থাকবে? তুমিও একদিন মরবে। কিন্তু ভেবে দেখ, ওর মতো সগৌরবে তুমি বাঁচতে পেরেছ কি? সারাজীবন কি করলে?''

সেই দিন হইতে সাবর্ণি আর এক মুহূর্ত সুস্থির থাকিতে পারিতেন না। সেই অজানা কণ্ঠস্বর তাহার কানে মন্ত্রণা দিতে লাগিল। চিত্রার্পিতা বীণাবাদিনীও ঢলঢল নয়ন মেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমশ তাহার মুখে ভাষাও ফুটিল।

''দেখ, আমার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখ। আমি সামান্য রমণী নই। আমি রহস্যময়ী আমি সুন্দরী। আমাকে উপেক্ষা করো না, ভালবাস। যে কামনার তাড়নায় তুমি ছটফট করছ, আমার বাহুপাশে ধরা দিয়ে তা নিঃশেষ করে দাও। কিসের ভয় তোমার? আমি কি ভয়ঙ্করী? ভাল করে চেয়ে দেখ। আমাকে এড়িয়েও কি তুমি যেতে পারবে? পারবে না। আমি চিরন্তনী নারীর প্রতীক। আমি সৌন্দর্যলক্ষ্মী। আমাকে ফেলে কোথায় পালাচ্ছ তুমি পাগলের মতো? পালানো যে সম্ভব নয়। কুসুমের বিকাশে, বনানীর চিরতারুণ্যে, বিহঙ্গীর গতিতে, হরিণীর চাঞ্চল্যে, তরঙ্গিণীর ধারায়, জ্যোৎস্নার আবেশে, রৌদ্রের ঔজ্জ্বল্যে সর্বত্রই যে আমি নানা ভঙ্গীতে ওতপ্রোত হয়ে আছি। আমিই প্রকৃতি। যদি চোখ বুজেও থাক, তা হলেও আমাকে নিজের বুকের মধ্যে দেখতে পাবে। যার দেহ শ্মশানভস্মে পরিণত হয়েছে বলে তুমি তোমার আচরণের স্বপক্ষে যুক্তি আহরণ করছিলে, তার কথা শোন। সহস্র বৎসর পূর্বে সে রাজার মতো বেঁচে ছিল। আমি ছিলাম তার চক্ষের আলো, বক্ষের মণি। সহস্র বৎসর পূর্বে আমার অধর থেকেই সে তার শেষ চুম্বন নিয়ে গেছে, সে চুম্বনের সুরভিতে এখনও তার শ্মশানভস্ম আমোদিত। সাবর্ণি, তুমি তো আমাকে ভাল করেই জান। চিনতে পারনি এখনও? নিরঞ্জনা যে অসংখ্য রূপে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেছে। আমি তারই একটা রূপ। তুমি শিক্ষিত সন্ন্যাসী, তোমার জ্ঞানের পরিধি অনেক বড়। তুমি অনেক ভ্রমণ করেছ, ভ্রমণ করলে জ্ঞান আরও বাড়ে। ঘরে বসে দশ বছরেও যা পাওয়া যায় না, ভ্রমণ করতে করতে তা একদিনেই পাওয়া যায় অনেক সময়। বই পড়ে দেশভ্রমণ করে অনেক জ্ঞান তুমি লাভ করেছ। তোমার অন্তত জানা উচিত যে সমুদ্রমন্থনের সময় অকূল পাথার থেকে নিরঞ্জনাই উঠেছিল রম্ভার রূপ ধরে। সবাইকে মুগ্ধ করেছিল সে। ঋষি বিশ্বামিত্রকেও, রাক্ষস রাবণকেও। কালিদাসেও বিক্রমোর্বশী নাটকে নিরঞ্জনারই প্রেম-কাহিনী কীর্তিত হয়েছে। পুরুরবা বিক্রমই চিরন্তন পুরুষ আর উর্বশী চিরন্তনী নারী। এসব তুমি কি পড় নি? সহস্র বৎসর পূর্বে যখন আমি বেঁচে ছিলাম তখন অনেককে ভুলিয়েছি। এখন যদিও ছায়ামাত্র, কিন্তু এখনও তোমাকে ভোলাতে পারি, তোমার কামনাসঙ্গিনীও হতে পারি। তোমাকে আমি ভালবেসেছি সন্ন্যাসী। বিস্মিত হচ্ছ? এটা কিন্তু নিঃসন্দেহে জেনো, যেখানেই তুমি যাও, নিরঞ্জনা তোমার সঙ্গে থাকবে—''

এ কথা শুনিয়া সাবর্ণি পাথরে মাথা ঠুকিতেন আর আর্তনাদ করিতেন। প্রতিরাত্রে

বীণাবাদিনী দেওযাল হইতে নামিযা অসিযা স্পষ্ট ভাষায কথা বলিত। তাহাব হিমশীতল নিশ্বাসও যেন তাঁহাব গাযে লাগিত। সাবর্ণিব কঠোব সংযমে যে বিচলিত হইত না, ববং বলিত "অমন কবছ কেন, বন্ধু, এস, আলিঙ্গন কব আমাকে। যতক্ষণ ধবা না দেবে ততক্ষণ ছাড়ব না তোমাকে আমি। প্রেতিনীব অধ্যবসায কত দৃঢ, তা বোধ হয জান না তুমি। আমি কেবল প্রেতিনী নই, আমি যাদুকবীও। আমি তোমাব দেহ থেকে তোমাব প্রাণ বাব কবে নিযে আব একটা প্রাণ পুবে দিতে পাবি তাব ভিতব। তোমাব সেই নবসঞ্জীবিত দেহ তখন আমাকে আলিঙ্গন কবতে আপত্তি কববে না। তখন কি অবস্থা হবে ভেবে দেখ একবাব। তোমাব মুক্ত প্রাণ, আত্মাও বলতে পাব, স্বর্গেও যদি যায সেখান থেকে দেখতে পাবে যে, তোমাব দেহটা আমাব সঙ্গে সানন্দে পাপকর্মে লিপ্ত হযেছে। তোমাব ভগবানও এতে বিপন্ন বোধ কববেন। যাদুকবীব মোহে যাব দেহ লালসাব পঙ্কে লুটোপুটি খাচ্ছে তাকে তিনি স্বর্গে স্থান দেবেন কি কবে? এ সম্ভাবনাব কথা তুমি বোধ হয চিন্তা কবনি। তোমাব শঙ্কবও কবেন নি বোধ হয। গোপনে তোমাকে একটা কথা বলছি শোন, তোমাব শঙ্কবেব তেমন সূক্ষ্মবুদ্ধি নেই। সামান্য যাদুকবীও তাকে ঠকিযে দিতে পাবে। যুগে যুগে ঠকিযেওছে। ওঁব তৃতীয নযনেব বোষবহ্নি আব নন্দীভৃঙ্গীবা যদি না থাকত, তা হলে ছোট ছোট ছেলেমেযেবাও ওব জটা আব দাড়ি ধবে টানাটানি কবিত। ওঁব চেযে ওঁব শত্রুপক্ষেব লোকেবা যাদেব তোমবা দানব পিশাচ প্রভৃতি আখ্যা দিযেছে, ঢেব বেশী বুদ্ধিমান। তাবা শিল্পীও অদ্ভুত আমাব এই যে রূপ, এই যে ছলা কলা, এ তো তাদেবই সৃষ্টি। তাদেবই প্রেবণায আমি এমন কবে বেণী দোলাতে শিখেছি, সাজাতে শিখেছি নিজেকে নানাভাবে তুমি কিন্তু ওদেব কখনও আমল দাও নি, কখনও শ্রদ্ধা কবনি, ওদেব প্রতি নিষ্ঠুব ব্যবহাব কবতে কখনও ইতস্তত কবনি। এই ঘবে যখন তুমি ঢুকলে তখন সাপগুলোকে তাড়িযে দিলে, তাদেব ডিমগুলোকে ভেঙে চুবমাব কবে ফেললে একটুও দযা হল না তোমাব। একবাবও মনে হল না যে, ওবা দানবদেব আত্মীয। অপমানিত দানববা তোমাকে ছাড়বে কেন? আমাব মনে হয, তোমাব সমূহ বিপদ ঘনিযে আসছে। গুণীদেব অপমান কবে কেউ কখনও নিস্তাব পায না। তুমি কি জান না, ওবা কত বড বসিক, কত বড প্রেমিক? তুমি চিবকাল ওদেব ঘৃণা কবেছ। যা কিছু সুন্দব, যা কিছু মনোহব তাব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কবেছ তুমি। তাঁবা তোমায সাহায্য কববেন কেন? তাঁদেব যিনি বাজা, যাঁব সামান্য ভ্রূভঙ্গীতে ত্রিভুবন কেঁপে উঠতে পাবে। বিদেশীবা যাঁকে শযতান উপাধি দিযাছে, তিনি আমাব প্রণযী। জান, সাবর্ণি, তিনি আমাকে চুম্বন কবেন—"

যাদুবিদ্যাব ক্ষমতা কত তাহা সাবর্ণিব অজ্ঞাত ছিল না। তিনি ভীত হইলেন। ভাবিলেন, যাদুবিদ্যা প্রভাবে হযতো এখনই কোন দানববাজ মূর্তি পবিগ্রহ কবিযা তাঁহাব সম্মুখেই ওই বীণাবাদিনীকে আলিঙ্গন কবিবে। মাঝে মাঝে চুম্বনেব মৃদু শব্দও যেন তিনি শুনিতে পাইলেন।

এইরূপ জটিল পবিস্থিতিতে পড়িযা তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন, শঙ্কব তাঁহাকে ত্যাগ কবিযাছেন। চক্ষু খুলিতে, এমন কি চিন্তা কবিতেও তাঁহাব ভয কবিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যায তাঁহাব অভ্যাসমতো তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতেব ভঙ্গীতে শুইযা ছিলেন। এক অপবিচিত কণ্ঠস্বব তাঁহাকে সম্বোধন কবিযা বলিল --

''পৃথিবীতে কত প্রকাব জীব আছে জান? জান না। আমি যা দেখেছি তা যদি তোমাকে বলি, তা হলে হযতো ভযে তুমি মূর্ছা যাবে। একচক্ষু মানুষ আছে, তাব চক্ষুটি কপালেব ঠিক মাঝখানে থাকে। একপা-ওলা মানুষ আছে, তাবা হেঁটে চলে না, লাফিযে চলে। এমন লোক আছে যাবা ইচ্ছামতো নিজেদেব স্ত্রী বা পুরুষে রূপান্তবিত কবতে পাবে। বৃক্ষরূপী মানুষও আছে জমিব নীচে অনেক দূব পর্যন্ত শিকড চালিযে তাবা বসে থাকে। মুণ্ডহীন মানুষও দেখেছি, তাদেব চোখ নাক মুখ দাঁত সব বুকেব উপবে, কবন্ধেব মতো চেহাবা। তোমাব শঙ্কব কি এদেব সবাইকে ত্রাণ কববেন? তোমাব কি বিশ্বাস?''

আব একদিন এক অদ্ভুত দৃশ্য তাঁহাব চোখেব সম্মুখে ফুটিযা উঠিল। তিনি দেখিলেন উজ্জ্বল আলোকে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইযা উঠিযাছে। একটি বিস্তৃত মাঠ, নদী এবং বাগান দেখা যাইতেছে। মাঠে চারুদত্ত ও শুভদত্ত অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিযা চলিযাছেন, গতিবেগেব উন্মাদনা তাঁহাদেব চোখে মুখে পবিস্ফুট। একটি তোবণেব নীচে দাঁডাইযা কবি চিন্ময় বসিয়া আবৃত্তি কবিতেছেন পবিতৃপ্ত অহঙ্কাব তাঁহাব কণ্ঠস্ববে ঝঙ্কৃত হইতেছে নযনেব দৃষ্টি আবেশময়। বাগানেব ভিতব নভোনীল এবং মহাস্থবিবকেও দেখা যাইতেছে। নভোনীল সোনাব ফুল তুলিতেছেন, এবং আদব কবিতেছেন একটি বহুবর্ণ বিচিত্র সর্পিণীকে তাঁহাবও চোখেব দৃষ্টি স্বপ্নাচ্ছন্ন। পীতবসনাবৃত মহাস্থবিব একটি আম্রবৃক্ষেব দিকে চাহিযা গভীব চিন্তায় মগ্ন বহিযাছেন। আম্রবৃক্ষেব শাখায ফল দুলিতেছে না, দুলিতেছে নানা জাতীয় স্ত্রী পুরুষেব মুণ্ড — মানুষেব, দেবদেবীব, অবতাবদেব পশুপক্ষীবও। কোন কোন শাখায় চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রও দুলিতেছে কিছু দূবে সিন্ধুপতিকেও দেখা যাইতেছে তিনি একটি ফোযাবাব সম্মুখে দাঁডাইযা একটি গোলক হাতে লইযা তাহাতে জ্যোতিষ্কদেব ভ্রমণপথ পর্যবেক্ষণ কবিতেছেন।

একটি অবগুণ্ঠনবতী বমণী তাহাব পব সাবর্ণিব নিকট আগাইযা আসিলেন তাঁহাব হাতে সপুষ্প একটি অশোক পল্লব। তিনি সাবর্ণিকে বলিলেন, ''দেখ অনেকে অনন্ত সৌন্দর্যেব সন্ধানে তাদেব ক্ষণস্থাযী জীবনেব পবিধিতেই অনন্তকে টেনে আনে। অনেকে আবাব ওসব কথা ভাবেই না। তাবা তাদেব স্বভাবেব নির্দেশ মেনে চলে, আব তাতেই সুখী হয তাব মধ্যেই সৌন্দর্যেব সন্ধান পায। শুধু তাই নয সহজ জীবন যাপন কবে তাবা সেবা শিল্পী। ভগবানেব মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত কবে পৃথিবীতে। মানুষই তো ভগবানেব সেবা কাব্য, সে কাব্যেব মহত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে ফুটে ওঠে তাদেব সহজ স্বাভাবিক জীবনে। তাবা সুখেব জাতিবিচাব কবে না, তাবা সুখ মাত্রকেই নির্মল কবে, জীবনকে ভোগ কবেই তাদেব আনন্দ। তাদেব আচবণ কি নিন্দনীয। যদি তা না হয, তা হলে ভেবে দেখুন, মহর্ষি আপনি সাবাজীবন কি কবলেন—''

দৃশ্য মিলাইযা গেল।

মহর্ষি সাবর্ণি অহোবাত্র প্রলুব্ধ হইতে লাগিলেন। শযতান দেহে বা মনে তাঁহাকে এক মুহূর্তও স্বস্তিতে থাকিতে দিল না। ক্রমশ ওই নির্জন কক্ষটি বাজধানীব চৌমাথা অপেক্ষাও

বেশি জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি দানবদেব অট্টহাস্য শুনিতে লাগিলেন। অসংখ্য জীব জন্তু-কীট পতঙ্গেব জৈব লীলা তাঁহাব চোখেব সম্মুখেই ঘটিতে লাগিল। যখন ঝবনায তিনি জলপান কবিতে যাইতেন তখন অপ্সবীবা সেখানে আসিযা ভীড কবিত, গান গাহিত নাচিত এবং তাহাকেও দলে টানিবাব চেষ্টা কবিত। সাবর্ণি আত্মহাবা হইয়া পডিতেন। তাহাদেব অশ্লীল ইঙ্গিত, অকথ্য ভাষণ অভব্য ব্যঙ্গ ও নৃত্য তাঁহাকে অস্থিব কবিযা তুলিত। মাঝে মাঝে তাহাবা তাঁহাব অঙ্গস্পর্শও কবিতে লাগিল একদিন এক ক্ষুদ্রকায কিন্নব একটু বাডাবাডি কবিযা বসিল। যে দডি দিযা তাঁহাব কৌপীনটি কোমবে বাধা ছিল সেই দডিটি সে কাডিযা লইযা গেল।

সার্বর্ণি শিহবিযা মনে মনে বলিলেন "চিন্তা আমাকে কোথায তুমি নিযে এসেছ।"

চিন্তাব হাত থেকে পবিত্রাণ পাইবাব জন্য তিনি স্থিব কবলেন, হাতেব কাজ কবিবেন। ঝবনাব নিকটে অনেক কলাগাছও ছিল। তিনি কিছু কলাপাতা সংগ্রহ কবিলেন, এব পাতাগুলি ফেলিযা দিযা ডাঁটাগুলি পাথব দিযা ছেচিযা দডিব আকাবে পাকাইতে লাগিলেন। মনস্থ কবিলেন কৌপীনেব দডিটা সর্বাগ্রে পাকাইযা ফেলা দবকাব। ইহাতে মাযাবী দানবেবা একটু যেন জব্দ হইল। আব তাহাবা শব্দ কবিত না। বীণাবাদিনী কুহকিনীও পুনবায চিত্রবূপ পবিগ্রহ কবিযা প্রাচীব আশ্রয কবিল, যাদুকবীব বেশে আব সহসা তাহাকে বিচলিত কবিবাব প্রযাস পাইল না। কলাব ডাটা ছেঁচিতে ছেঁচিতে তাহাব সাহস এবং আত্মপ্রত্যয ক্রমশ যেন ফিবিযা আসিতে লাগিল। তিনি আশা কবিতে লাগিলেন, শঙ্কব যদি দযা কবেন তাহা হইলে কামকে তিনি পবাস্ত কবিতে পাবিবেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আমাব আত্মপ্রত্যয এখনও নষ্ট হযনি। মাযাবী দানবেবা বা ওই বীণাবাদিনী যাদুকবী আমাকে নাস্তিক কবে তুলতে পাববে না। তাবা যদি আসে তাদেব বলব—প্রথমে শব্দ ছাডা আব কিছু ছিল না, শব্দই ব্রহ্ম, শব্দই শঙ্কব ওবা যদি এ কথা হেসে উডিযে দিতে চায, যদি বলে—এ আমাব আজগুবি কল্পনা তবু আমি বলব -ওই আজগুবি কল্পনাই আমি বিশ্বাস কবি। দৃঢভাবে বিশ্বাস কবি। বিশ্বাস কবি মানেই তো তাই। সাধাবণ বুদ্ধিতে যা অসম্ভব, একমাত্র বিশ্বাসেব জোবেই তা সম্ভব হয ভক্তেব মনে। সাধাবণ সম্ভবপব ব্যাপাব তো ইন্দ্রিযগ্রাহ্য, জ্ঞানেব সীমাব পবেই। শঙ্কব যদি সাধাবণ মানুষ হতেন তাঁকে জানতাম, বিশ্বাসেব প্রযোজনই হত না তা হলে। কিন্তু মোক্ষেব পথে জ্ঞান আমাদেব কতদূব নিযে যেতে পাবে। সে পথে বিশ্বাসই এক মাত্র সম্বল।

তিনি প্রতিদিন কলাব সূতাগুলি বৌদ্রে ও শিশিবে বাখিযা সযত্নে সেগুলিকে আবাব ঘবেব ভিতবে লইযা আসিতেন। নির্মল আনন্দে ক্রমশ তাঁহাব হৃদয পূর্ণ হইযা উঠিতে লাগিল। কৌপীনবজ্জুটি প্রস্তুত কবিবাব পব তিনি ঘাস উপডাইযা মাদুব ও ঝুডি নির্মাণে মন দিলেন। ক্রমশ ঘবটা ঝুডি ও মাদুবেব কাবখানা হইযা উঠিল। কাজ কবিতে কবিতে তিনি ভগবানেব নিকট প্রার্থনা কবিতেন। কিন্তু, হায, শঙ্কব তাঁহাকে কৃপা কবিলেন না। আবাব একদিন বাত্রে কাহাব অপবিচিত কণ্ঠে তাঁহাব ঘুম ভাঙিযা গেল। ভযে তিনি আডষ্ট হইযা বহিলেন।

কে একজন চুপি চুপি মৃদু কণ্ঠে কাহাকে ডাকিতেছিল, "অঞ্জনা, অঞ্জনা, চল, আমরা স্নান করে আসি। শিগগির এসো দেরি করো না—"

ইহার উত্তরে যে নারীটি কথা কহিল, সাবর্ণি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, তাহার মুখটা তাঁহার শিয়রের দিকে রহিয়াছে।

সে উত্তর দিল, "আমি যাই কি করে! একজন লোক যে আমার উপর শুয়ে আছে!"

সহসা সাবর্ণির সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। তিনি দেখিলেন, একটি যুবতীর স্তনের উপর তিনি গাল রাখিয়া শুইয়া আছেন। বীণাবাদিনীকে তিনি মুহূর্তের মধ্যে চিনিতে পারিলেন। সে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল, ইহাতে তাহার স্তানদ্বয় আরও জীবন্ত আরও পীবর হইয়া উঠিল। সাবর্ণি আর নিজেকে ঠিক রাখিতে পারিলেন না, সেই কলঙ্কিতা মাংসপিণ্ডকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, " যেয়ো না, চলে যেয়ো না, তুমিই স্বর্গ "

সে কিন্তু রহিল না, উঠিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল। হাসি নয় যেন জ্যোৎস্নার ঝলক। হাসিতে হাসিতে সে বলিল "আমার থাকবার দরকার নেই তো! তোমার মতো কল্পনাকুশল প্রণয়ী তো ছায়ার ছায়াতেই সন্তুষ্ট। তা ছাড়া যা করবার তা তো তুমি করেইছ আর কি চাও?"

হাসিতে হাসিতে অন্তর্ধান করিল।

মহর্ষি সাবর্ণি সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ক্রন্দন করিলেন। যখন ঊষালোক দেখা গেল তখন তিনি শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া করুণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"শঙ্কর, শঙ্কর, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করছ? কি দোষ করেছি আমি? আমাকে এমন করে ছেড়ে যেয়ো না! তুমি ছাড়া আমার যে কেউ নেই, তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছু জানি না, নির্গুণ পরমব্রহ্মের ধারণা আমার নেই, তুমিই আমার একমাত্র সম্বল। মানুষের রূপেই তোমাকে আমি পুজো করেছি—মানুষের যত ক্ষমতা, যত ঐশ্বর্য, যত রূপ, যত বিভূতি কল্পনা করা সম্ভব, তা আমি তোমার মধ্যেই কল্পনা করেছি—তোমার মধ্যেই আমি নিজেকে বিলিয়ে দিতে চেয়েছি তুমি আমার পরমাত্মীয়, একমাত্র আত্মীয়, আমার পূজা কোন অলৌকিক মহিমার উদ্দেশে নয়, নির্গুণ নিরাকার ঈশ্বরের উদ্দেশেও নয়, তোমার উদ্দেশে—যাকে আমি মানুষরূপে কল্পনা করেছি। যে মদন একদিন তোমার তপোভঙ্গ করেছিল, সেই মদন আমাকেও বিব্রত করেছে। তুমি তাকে ভস্ম করে ফেলেছিলে, কিন্তু আমার সে শক্তি কই? আমার বিপদ কি বুঝতে পারছ না? দুর্বল বলেই আমাকে ত্যাগ করবে? মানুষ যে কত অসহায় তা তো তোমার অবিদিত নেই প্রভু, নিজেই কতবার তুমি নরদেহ ধারণ করেছ, দেহের ক্ষুধা যে কি তুমি জান না? সেই ক্ষুধার তাড়নাতে কাতর হয়েছি বলে তুমি আমাকে ত্যাগ করে যাবে?"

সাবর্ণি যখন স্তম্ভের উপরে ছিলেন তখন তিনি যে দানবের কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলেন, তাহাই আবার শুনিতে পাইলেন।

"তোমার শঙ্করকে শেষকালে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নামিয়ে আনলে! বৌদ্ধদের মতো এবং সহজিয়া পন্থা ধরবে নাকি! হা হা হা হা—"

অট্টহাস্যে সমস্ত ঘর প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। সার্বর্ণির মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

যখন তাঁহার জ্ঞান হইল তখন তিনি দেখিলেন, তাঁহাকে ঘিরিয়া গৈরিকবসনপরিহিত বহু সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছেন কেহ তাঁহার মাথায় জল ঢালিতেছেন, কেহ বা হাওয়া করিতেছেন।

একজন সন্ন্যাসী বলিলেন, "এই পথ দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম, হঠাৎ এই ঘরের মধ্যে দারুণ চীৎকার শুনলাম, এসে দেখি আপনি মৃতবৎ পড়ে আছেন। মনে হল, সম্ভবত আপনি কোনও দানবের কবলে পড়ে ছিলেন, আমাদের দেখে দানবটা সরে পড়েছে—"

সার্বর্ণি মাথা তুলিয়া ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "ভাই, তোমরা কে? এত লোক কেন? তোমরা কি আমার শব দাহ করতে এসেছ?"

তাহারা বলিল, "আপনি তো বেঁচে আছেন। আপনার বেশ দেখে মনে হয় আপনি সন্ন্যাসী। আপনি কি শোনেন নি যে, মহাবৃদ্ধ পরমশৈব মহর্ষি কারণ্ডর একশ পাঁচ বৎসর বয়সে হিমালয় থেকে নেমে এসেছেন সবাইকে আশীর্বাদ করতে? তাঁর কাছেই যাচ্ছি আমরা এতবড় সংবাদটা আপনি শোনেন নি? এখানে কি একজন লোকও নেই—"

সার্বর্ণি উত্তর দিলেন 'এ সংবাদ শোনবার যোগ্যতাই আমার নেই বোধ হয়। এ নগর শয়তান আর দানবদের লীলাভূমি কোনও মানুষ এখানে আসে না। আপনারা আমার জন্যে প্রার্থনা করুন। আমি সার্বর্ণি হিমালয়ের অরণ্যে বহুকাল শঙ্করের ধ্যানে কাটিয়েছি, কিন্তু হায়, তবু শঙ্করের কৃপা আজও পাই নি। তাঁর অযোগ্যতম সেবক আমি। বড় কষ্ট পাচ্ছি— "

সার্বর্ণির নাম শুনিবামাত্র সকলে করজোড়ে প্রণত হইলেন। যিনি কথা বলিতেছিলেন তিনি বলিলেন, "আপনিই কি সেই বিখ্যাত মহর্ষি সার্বর্ণি, যাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, যাঁর অসাধারণ তপস্যা বিদগ্ধ সমাজে প্রবাদবাক্যের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে, অনেকে মনে করেন মহর্ষি কারণ্ডর ছাড়া যাঁর সমতুল্য তপস্বী আর নেই—আপনিই কি তিনি? আমাদের কি সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন পেলাম। আপনার কথা কে না জানে? আপনার সব কথা শুনেছি। পাটলিপুত্রের নটী নিরঞ্জনাকে আপানিই তো ধর্মপথে ফিরিয়ে এনেছেন, স্তম্ভ শীর্ষে আরোহণ করে কঠোর তপস্যাপ্রভাবে আপনি শত শত রোগীকে আরোগ্য করেছেন, সেই স্তম্ভকে কেন্দ্র করে বহু দেশের তীর্থিকদের নিয়ে বিরাট সার্বর্ণিপুর নগর গড়ে উঠেছে, এ কথা সবাই জানে। স্তম্ভশীর্ষ থেকে আপনার বিস্ময়কর অন্তর্ধান—শুধু বিস্ময়কর নহে, মহিমময় বললেও অত্যুক্তি হবে না—এত অলৌকিক যে, স্বল্পবুদ্ধি লোকেরা তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারে নি। যারা স্তম্ভের পাদমূলে দাঁড়িয়ে স্বচক্ষে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল তাঁদের কাছে শুনেছি, স্বর্গের দেবদূতেরা এসে আপনাকে শুভ্রমেঘে আবৃত করে নিয়ে গিয়েছিল, কেবল দেখা যাচ্ছিল, আপনার প্রসারিত দক্ষিণ হস্তটি, আপনি যেন সকলের শিরে আশীর্বাদ বর্ষণ করতে করতে আকাশপথে বিলীন হয়ে গেছেন। পরদিন সকালে আপনাকে স্তম্ভশীর্ষে দেখতে না পেয়ে সার্বর্ণিপুর হাহাকারে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আপনার অন্তর্ধানের বিস্ময়কর হেতু জনসমাজে যখন প্রচার করলেন, তখন সকলে একটু শান্ত হল। তিনিই

এখন আপনার শিষ্যসম্প্রদায়েব কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেছেন। আপনার রহস্যময় অন্তর্ধান সম্বন্ধে কারও মনে বিন্দু মাত্র সন্দেহ এখন আর নেই। অবশ্য একটি লোক ছাড়া—সেও আপনার শিষ্য, তার নাম বালক বাঙ্গা, সে বোধ হয় একটু পাগল গোছের। তার ধারণা, আপনাকে দেবদূতেরা নিয়ে যায়নি, দানবেরা নিয়ে গেছে। তার এ কথায় ঘোর আলোড়ন হয়েছিল, জনতা হয়তো ঢিল ছুঁড়ে তাকে মেরেই ফেলত। অনেক কষ্টে বক্ষা পেয়েছে সে। আমাব নাম মনভ্রমব—যারা আপনাকে প্রণাম করছে, তারা আমারই শিষ্য। আমিও আপনার কাছে নতজানু হয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। দেবদূতেবা আপনাকে স্তম্ভশীর্ষ থেকে নিয়ে গিয়েছিল, শঙ্করের আশ্চর্য মহিমা আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন, শঙ্করেরই নিগূঢ় অভিপ্রায়ে হয়তো আপনি আবার এখানে অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনি আগে আমাদেব আশীর্বাদ করুন, তাবপর সব বলুন, আমরা শুনে ধন্য হই—"

সাবর্ণি উত্তর দিলেন, "হায় হায়, তোমরা যা মনে করছ তার কিছুই হয় নি। শঙ্করেব একবিন্দু কৃপাও আমি পাইনি। তিনি কেবল ভয়ঙ্কর প্রলোভনেব মধ্যে আমাকে ফেলেছেন। কোনও দেবদূত আমাকে আকাশপথে উড়িয়ে নিয়ে যাযনি। বিবাট এক ছায়ামূর্তিকে অনুসরণ করে আমি এতদিন ঘুরে বেড়িয়েছি। বাস কবেছি মিথ্যা স্বপ্নলোকে। শঙ্কব ছাড়া সবই মিথ্যা, তাঁকে আমি পাই নি। যখন আমি পাটলিপুত্রে যাচ্ছিলাম, তখন পথে নানা লোকেব মুখে নানা রকম কথা শুনেছি। তারা সকলেই আমাকে ভুল পথে চালাবাব চেষ্টা কবেছিল, আমাব মনে হযেছিল মোহ নানারূপে এসে আমাকে বিপথে নিয়ে যাবাব চেষ্টা করছে। মোহ এখনও আমাকে ছাড়েনি, এখনও আমাকে অনুসরণ কবছে, এখনও আমি অভিভূত, মনে হচ্ছে অহোরাত্র যেন জ্বলন্ত অঙ্গারেব উপব বসে আছি— "

মনভ্রমর উত্তর দিলেন, "প্রভু, আমবা শুনেছি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদেব জীবনে বহু প্রলোভন আসে। আপনি বলছেন—কোনও দেবদূত এসে আপনাকে নিয়ে যায়নি, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা যখন দেখেছে তখন মনে হয শঙ্কর আপনার প্রতিমূর্তি বা প্রতিচ্ছবিকেই বোধ হয় সে সম্মান দান করেছেন। কারণ পণ্ডিত হরানন্দ এবং আরও অনেক সন্ন্যাসী স্বচক্ষে দেখেছেন যে, আপনি বা আপনাব মতো কেউ যেন দেবদূতবাহিত হয়ে আকাশপথে বিলীন হয়ে গেলেন।"

মহর্ষি সাবর্ণি কোনও উত্তর দিলেন না।

কিছুক্ষণ চিন্তাব পর তিনি স্থির করিলেন, তিনিও ইহাদের সহিত গিযা মহর্ষি কারণ্ডবেব আশীর্বাদ ভিক্ষা করিবেন।

"ভাই মনভ্রমর, আমাকেও তোমাদের একটা ত্রিশূল দাও। তোমাদের সঙ্গে, চল, আমিও গিয়ে মহর্ষি কারণ্ডবের পদপ্রান্তে প্রণত হই। তোমাদের অসুবিধা হবে না তো?"

"কিছুমাত্র না, কিছুমাত্র না। এ তো আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমাদের আবার সুবিধা-অসুবিধা কি, আমরা তো সৈনিক। জীবন-যুদ্ধে সন্ন্যাসীদের চেয়ে বড় সৈনিক আর কে আছে বলুন? আপনি আব আমি ত্রিশূল নিয়ে আগে আগে যাব। আর বাকি সকলে স্তোত্রগান করতে করতে আমাদের পিছু পিছু আসুক। সেনাবাহিনীর মতো আমরা অগ্রসর হই, চলুন।"

তাঁহাদের যাত্রা শুরু হইল।

মনভ্রমর সার্বর্ণিকে বলিলেন, "মহর্ষি, ভগবানের বিষয় আমাদের কিছু শোনান।"

সার্বর্ণি বলিতে লাগিলেন, "সবসত্যের সমন্বয়ই ভগবান, কারণ তিনি সত্য ছাড়া আর কিছু নন। আর সত্য এক এবং অদ্বিতীয়। পৃথিবীর যে বৈচিত্র্য আমরা দেখি তা মায়াময়, মনে ভ্রান্তির সঞ্চার করে কেবল। তাই প্রকৃতির বিচিত্র বিকাশ, আপাতদৃষ্টিতে যতই মনোহর হোক না কেন সত্যলাভের পথে তা অন্তরায়। ওর থেকে আমাদের আত্মরক্ষা করতে হবে। প্রকৃতি মনোহারিণী, তাই সে ভয়ঙ্করী। তাই যখনই দেখি কোনও গাছ মুঞ্জরিত হয়েছে, কোন লতা কোনও গাছকে বেষ্টন করেছে আমার প্রাণ আতঙ্কে কেঁপে ওঠে, আমি চোখ ফিরিয়ে নিই, বিষণ্ণ বোধ করি। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু আমরা অনুভব করি তা সবই ভয়ঙ্কর জেনো। তুচ্ছ একটি বালুকণাও বিপদ ডেকে আনতে পারে। প্রকৃতির প্রতিটি জিনিস আমাদের লোভ দেখায়। নারী তো মূর্তিমতী প্রলোভন। জলে স্থলে আকাশে যত রকম প্রলোভন আছে সমস্ত পুঞ্জীভূত হয়েছে নারীর দেহে। যার ইন্দ্রিয়ের দ্বার সম্পূর্ণ রুদ্ধ সেই যোগী, সেই সুখী। যে মূক বধির অন্ধ হতে জানে, প্রকৃতির মায়া যাকে স্পর্শ করতে পারে না, সেই ভগবানের কাছে পৌঁছতে পারে—"

মনভ্রমর কথাগুলি প্রণিধান করিলেন।

তাহার পর বললেন, 'প্রভু, আপনি যখন আমার কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করলেন, তখন উচিত করি আমার জীবনের সমস্ত বৃত্তান্তও অকপটে আপনাকে বলি। সন্ন্যাসীদের মধ্যে এ রীতি বহুকাল থেকে প্রচলিত, সুতরাং এটা কর্তব্যও বটে। আমার কথা শুনুন। সন্ন্যাসী হওয়ার পরে আমি অতি জঘন্য জীবন যাপন করেছিলাম। মাদুরা নামক শহরে উৎসন্নে গিয়েছিলাম আমি। মানে, মেয়েদের নিয়ে মেতেছিলাম। সে যে কত রঙের কত ঢঙের মেয়ে তা বর্ণনা করব না, মানে সবাই বারাঙ্গনা। একদল মেয়ে নিয়ে সারাদিন নাচ গান আর হুল্লোড় করতাম। তার মধ্যে যেটাকে পছন্দ হত সেইটেকে নিয়ে রাত কাটাতাম। আপনার মতো জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসীর পক্ষে কল্পনা করাও শক্ত কি জঘন্য জীবন যাপন করেছিলেন আমি তখন। কিশোরী যুবতী প্রৌঢ় গৃহস্থ, দেবদাসী কাউকে বাদ দিইনি। অন্ধকারের মধ্যেও একটু আলো ছিল, ভগবানে বিশ্বাস হারাই নি, এসব ব্যাপারে যা হয় তাই হল শেষে। টাকাপয়সা যা ছিল সব নিঃশেষ হয়ে গেল। তারপর আর একটি ঘটনা ঘটল। আমার সঙ্গীদের মধ্যে যে লোকটা ছিল সব চেয়ে বলিষ্ঠ, এক ভীষণ ব্যাধির কবলে পড়ে গেল সে। দেখতে দেখতে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। শেষকালে এমন হল যে, দাঁড়াতে পর্যন্ত পারে না, পা থরথর করে কাঁপে, কিছু ধরতে পারে না, চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ হয়ে এল, গলা দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ ছাড়া আর কোন কথা বেরোয় না। তার মনটা আরও অপটু হয়ে পড়ল, সর্বদাই কেমন যেন অসাড় আচ্ছন্ন ভাব। যে পশুর জীবন যাপন করেছিল, ভগবান তাকে পশুই করে দিলেন শেষে। টাকাকড়ি নিঃশেষ হওয়াতে আমি বিপন্ন হয়ে পড়েছিলাম, এর অবস্থা দেখে আমার চৈতন্য হল। আমি আর কালবিলম্ব না করে অরণ্যবাসী হলাম। তারপর থেকে কুড়ি বছর আমি পরম শান্তিতে কাটিয়েছি। আমি আর আমার শিষ্যেরা দৈহিক পরিশ্রম করে জীবন যাপন করি। আমাদের মধ্যে কেউ তাঁতি, কেউ ঘরামি, কেউ চাষী, কেউ কেউ আবার

লেখকও। আমি লেখাব চেয়ে হাতেব কাজই বেশী পছন্দ কবি। এখন আমাব সমস্ত দিন আনন্দে কাটে, বাত্রে গভীব নিদ্রা হয। মনে হয শঙ্কব আমাব উপব প্রসন্ন হয়েছেন, কাবণ ভযঙ্কব পাপেও যখন আমি লিপ্ত ছিলাম তখনও আমি বিশ্বাস হাবাই নি, আশা ছাড়ি নি —"

এ কথা শুনিয়া সাবর্ণি আকাশেব দিকে চোখ তুলিয়া মনে মনে বলিলেন, "যে লোক এত পাপ করেছে তাকে তুমি দযা কবেছ। কিন্তু আমি সাবাজীবন তোমাব নির্দেশ বর্ণে বর্ণে পালন কবেও তোমাব কৃপাকণা পর্যন্ত পেলাম না। তোমাব লীলা বোঝা শক্ত—"

মনভ্রমব হঠাৎ বলিযা উঠিলেন, " প্রভু, দেখুন দেখুন। চক্রবালবেখাব দিকে চেযে দেখুন। মনে হচ্ছে না পঙ্গপাল আসছে? কিন্তু পঙ্গপাল নয, সন্ন্যাসীব দল। মহর্ষি কাবগুবেব সঙ্গে দেখা কবতে আসছেন।"

যে প্রান্তবে মহর্ষি কাবগুবেব আসিবাব কথা সেই প্রান্তবে উপস্থিত হইযা তাঁহাবা এক বিবাট জনতা দেখিতে পাইলেন। সকলেই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীবা অধবৃত্তাকাবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইযা দাড়াইযা ছিলেন। প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন অতি প্রাচীন পর্বতবাসী সন্ন্যাসীগণ। তাঁহাদেব প্রত্যেকেই শ্মশ্রু আজানুলম্বিত, জটা ভূমিস্পর্শী হস্তে বিল্বশাখা। দ্বিতীয শ্রেণীতে ছিলেন মহর্ষি বনস্পতি এবং তাঁহাদেব দলভুক্ত শিষ্যগণ। মহর্ষি সাবর্ণিব শিষ্যেবা এব পবিচিত সন্ন্যাসীবাও এই শ্রেণীতে ছিলেন। তৃতীয শ্রেণীতে ছিলেন নানা দেশেব নানা বর্ণেব সন্ন্যাসীবৃন্দ। অধিকাংশই কৃষ্ণকায এবং শীর্ণকান্তি। কাহাবও অঙ্গে ছিন্নকন্থা, কেহ বা বল্কলধাবী কেহ কেহ সম্পূর্ণ উলঙ্গ। যাহাবা উলঙ্গ, মেঘেব মতো লোমশ কবিযা ভগবান তাহাদেব আববণেব অভাব মোচন কবিযাছেন। প্রত্যেকেবই হস্তে প্রচুব বিল্বপত্র টাটকা সবুজ বিল্বপত্র। মনে হইতেছিল, সেই বিবাট প্রান্তবে একটি সবুজ ইন্দ্রধনু উঠিযাছে।

শ্রেণী তিনটি সুবিন্যস্ত ছিল বলিযা সাবর্ণি অনাযাসেই তাঁহাব শিষ্যগণকে দেখিতে পাইলেন। তিনিও তাহাদেব নিকটে গিযা দাঁড়াইলেন, কিন্তু পাছে তাহাবা তাঁহাকে চিনিতে পাবে এজন্য চাদবে মুখ ঢাকিয়া লইলেন। তাঁহাব আশঙ্কা হইল, তাঁহাকে চিনিতে পাবিলে হযতো শান্তিভঙ্গ হইবে। অনেকেব মানসিক সাম্যভাবও হযতো বিচলিত হইবে।

সহসা তুমুল জযধ্বনি হইল।

"মহর্ষি কাবগুব আসছেন। জয শঙ্কব, জয মহাদেব, জয কৈলাসপতি। ওই আসছেন। উমানাথেব প্রিযতম শিষ্য, মৃত্যু পর্যন্ত যাঁকে স্পর্শ কবতে পাবে নি—আসছেন, আসছেন, ওই আসছেন—"

ইহাব পব চতুর্দিকে নীববতা ঘনাইযা আসিল, সকলে ভূমিতে মাথা ঠেকাইযা প্রণাম কবিলেন।

বিবাট প্রান্তবেব উত্তব দিকে যে নাতিবৃহৎ পর্বতটি ছিল তাহাব উপব হইতেই মহর্ষি কাবগুব অবতবণ কবিতেছিলেন। তাঁহাব প্রিয শিষ্যদ্বয হংসপক্ষ এবং কঙ্কধীমান তাঁহাব দুই পার্শ্বে তাঁহাকে ধবিযাছিলেন, পাছে তিনি পড়িয়া যান। তিনি খুব সাবধানে ধীবে ধীবে

নামিতেছিলেন। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল এত বয়সেও তিনি ন্যুব্জ হইয়া পড়েন নাই, বেশ সোজা হইয়াই হাঁটিতেছেন. দেহসৌষ্ঠবে নির্মল স্বাস্থ্যের দীপ্তি। শুভ্র শ্মশ্রুতে তাঁহার বিশাল বক্ষ আবৃত, কেশহীন মসৃণ মস্তক হইতে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হওয়াতে মনে হইতেছে তাঁহারই তপস্যার দ্যুতি বুঝি বিচ্ছুরিত হইতেছে। অদ্ভুত তাহার চক্ষুর দৃষ্টি— তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল এবং মর্মভেদী। অধরে শিশুসুলভ সরল হাসি। শতাধিক বৎসর বয়স তাঁহার, কিন্তু জরার অবসন্নতা নাই। বলিষ্ঠ দুই হস্ত তুলিয়া তিনি সকলকে আশীর্বাদ করিলেন এবং স্নেহভরে বলিলেন, "কি চমৎকার! ভগবান, তোমার সৃষ্টি কি সুন্দর!"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিশাল জনতা চীৎকার করিয়া উঠিল—"জয়, জয় ভক্তের জয়—"

বজ্রগর্জনবৎ সেই গম্ভীর নিনাদ দিগদিগন্তকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি কঙ্কধীমান ও হংসপক্ষের সহিত সন্ন্যাসীশ্রেণীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি কারণ্ডব অসাধারণ তপস্বী ছিলেন। লোকে বলিত, তিনি স্বর্গ নবক দুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ধর্মবিশ্বাসের জন্য অনেক বৌদ্ধ শাসনকর্তার হস্তে তিনি নির্যাতিত হইয়াছেন; কিন্তু ধর্মবিশ্বাস হইতে বিচলিত হন নাই ।। বহু জিজ্ঞাসু নাস্তিক তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া ভগবৎ কৃপা লাভ করিয়াছেন। বস্তুত সর্বপ্রকার সম্প্রদায়ই তাঁহার মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার তপস্যা, চরিত্র এবং ভাগবতী শক্তির কাহিনী ধার্মিক সমাজে প্রবাদের মতো প্রচলিত হইযা গিয়াছিল। হিমালয়শীর্ষে অবস্থানকরত প্রকৃতপক্ষে ইনি একাই সমগ্র সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়েব উপব আধিপত্য কবিতেন।

.. মহর্ষি কারণ্ডব সকলের সহিত সস্নেহে সুমিষ্ট আলাপ করিতে লাগিলেন। তাহার পর সকলের নিকটই বিদায় প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন, এইবার তাঁহাকে দেহরক্ষা করিতে হইবে, শঙ্কর তাঁহাকে চরণে স্থান দিয়াছেন।

মহর্ষি উপলচরিত এবং বনস্পতিকে দেখিয়া তিনি প্রীত হইলেন। বলিলেন, "তোমাদের দুইজনেরই বহু শিষ্য। কৌশলী যোদ্ধার মতো তোমরা দুজনে ধর্মের বিজয়পতাকাকে আকাশে সমুড্ডীন করে বেখেছে। স্বর্গেও আশা করি দেবসেনাপতি কার্তিকেয় তোমাদের স্বর্ণবর্মে ভূষিত করে দৈত্যদলনে সেনানায়কে করে পাঠাবেন। তোমরা প্রকৃতই বীর।"

মহর্ষি শুভঙ্করকে দেখিতে পাইয়া তিনি সাগ্রহে আগাইয়া গেলেন এবং তাঁহার শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন, "আমার এই শিষ্যটি সব চেয়ে ভাল, সব চেয়ে সুন্দর, সব চেয়ে সহজ। গাছপালা নিয়েই ওর সারাজীবন কেটেছে, তাই গাছপালার মতোই সবুজ ওর মন। শুধু বিশুদ্ধ নয়—সুন্দর, সুরভিত।"

মনভ্রমরকে দেখিয়া তিনি হাসিলেন।

বলিলেন, " তুমি আশাবাদী লোক। নানা বিপদে পড়েও হাল ছাড় নি, তাই তোমার মনে শান্তি আছে। দুষ্কৃতির আবর্জনার সারে তুমি সুকৃতির ফুল ফুটিয়েছ। তোমার বাহাদুরি আছে—"

যে যেমন তাহার সহিত তিনি তেমনি ভাবেই আলাপ করিলেন এবং যাহা বলিলেন তাহা মধুর অর্থপূর্ণ ।

বৃদ্ধদের বলিলেন, "ঈশ্বরের সিংহাসনকে ঘিরে বৃদ্ধেরাই বসে আছেন।"

যুবকদেব বলিলেন, "তোমরা আনন্দ কর। যারা সংসারে আছে, দুঃখটা তাদের। তোমাদেব খালি আনন্দ।"

সন্ন্যাসীদেব মধ্যে চলিতে চলিতে এই ভাবে তিনি নানা কথা বলিতে লাগিলেন। সাবর্ণির কাছে আসিতেই সাবর্ণি আশা আকাঙ্ক্ষা-বিহ্বল চিত্তে নতজানু হইয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "পিতা , পিতা, আমি মরছি, আমাকে বাঁচান, আমাকে সাহায্য করুন। নিবঞ্জনাকে আমি শঙ্করের চবণে সমর্পণ করেছি, এক .স্তম্ভশীর্ষে বসে বহুকাল কৃচ্ছ্র সাধন করেছি, তাবপর এক প্রেতপুরীতে গিয়ে এতদিন ধরে প্রায়শ্চিত্ত করেছি। দেখুন প্রভু, মাটিতে মাথা ঠুকে ঠুকে আমার কপাল বলদের কাঁধের মতো হয়েছে, কিন্তু তবু শঙ্কর আমাকে ত্যাগ করে গেছেন। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন পিতা, আপনার আশীর্বাদ পেলে আমি বেঁচে যাব, আমার সব পাপ ধুয়ে যাবে। আমাকে আশীর্বাদ করুন—"

মহর্ষি কারণ্ডব কোনও উত্তর না দিয়া সাবর্ণিব দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিলেন মাত্র। তাহার পব তিনি বালক বাঞ্ছাকে দেখিতে পাইলেন কিছুক্ষণ তাহাব দিকে চাহিয়া থাকিযা ইঙ্গিতে তাহাকে কাছে ডাকিলেন। স্বল্পবুদ্ধি বাঞ্ছাকে নিকটে ডাকিতে দেখিযা সকলে অবাক হইযা গেল। এই পাগলটা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে ইহা কেহ প্রত্যাশা করে নাই।

মহর্ষি কাবণ্ডব বলিলেন, "শঙ্কব আমাকে যা দেননি তা একে দিয়েছেন। এব দৃষ্টি দিব্যদৃষ্টি। এ অনেক দূরেব জিনিস দেখতে পায়। বাঞ্ছা, আকাশেব দিকে চেয়ে দেখ তো, কিছু দেখতে পাচ্ছ কি?"

বাঞ্ছা আকাশেব দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহাব চোখ মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

বলিল, "হ্যাঁ, পাচ্ছি। আকাশে আমি একটা চমৎকার পালঙ্ক দেখতে পাচ্ছি। পালঙ্কের চারিদিকে সোনার ঝালর আর ফুলের মালা দুলছে—অনেক ফুল। পালঙ্কের তিন দিকে তিনজন দেবী দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হচ্ছে পাহারা দিচ্ছেন, যার জন্য ওই শয্যা প্রস্তুত হয়েছে সে ছাড়া আর যেন কেউ কাছে আসতে না পারে—"

মহর্ষি সাবর্ণির মনে হইল, তাঁহার সুদীর্ঘ সাধনা রসিদ্ধি বুঝি আসন্ন। এই পালঙ্ক বুঝি তাঁহারই জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি শঙ্করকে ধন্যবাদ দিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মহর্ষি কারণ্ডব ইঙ্গিতে তাঁহাকে কথা বলিতে নিষেধ করিয়া বালক বাঞ্ছা যাহা বলিতেছে তাহাই শুনিতে বলিলেন।

বালক বাঞ্ছা ভাব-সম্মোহিত হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। সে বলিতে লাগিল, "দেবী তিনজন আমার সঙ্গে কথা বলছেন ঃ বলছেন যে, অচিরে একজন দেবী মর্ত্ত্য থেকে স্বর্গে আসবেন। পাটলিপুত্রের নটী নিরঞ্জনার মৃত্যু আসন্ন, সে আর নটী নেই, সে এখন দেবী। তার জন্যেই আমব' এই দিব্য শয্যা প্রস্তুত করে রেখেছি। আমরা তার ধর্মসহচরী। আমাদের বিশ্বাস, ভয় আর ভালবাসা—"

মহর্ষি কাবণ্ডব প্রশ্ন কবিলেন, "আব কিছু দেখছ কি? চাবিদিকে চেয়ে দেখ।"

বালক বাঞ্ছা পূর্বে পশ্চিমে উত্তবে দক্ষিণে উর্ধ্বে নিম্নে দৃষ্টিপাত কবিতে লাগিল কিন্তু প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহাব পব সহসা সার্বর্ণিকে দেখিযা তাহাব মুখ বিবর্ণ হইযা গেল, চক্ষুব দৃষ্টি জ্বলিযা উঠিল।

"পাচ্ছি পাচ্ছি। তিনটে ভযঙ্কব বাক্ষস এই লোকটাকে ধববাব জন্যে এগিযে আসছে। একজনেব চেহাবা থামেব মতো দ্বিতীযটি নাবীমূর্তি, তৃতীযটি যাদুকব। ওদেব নামও দাগা বযেছে ওদেব গাযে প্রথমটিব কপালে, দ্বিতীযটিব পেটে, তৃতীযটিব বুকে। প্রথমটিব নাম অহঙ্কাব, দ্বিতীযটি বাসনা, তৃতীযটি সন্দেহ। আব কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

বালক বাঞ্ছাব সম্মোহিত ভাব কাটিযা গিযা স্বাভাবিক সবল মুখভাব ফিবিযা আসিল। সার্বর্ণি কাতবভাবে কাবণ্ডবেব দিকে চাহিলেন।

কাবণ্ডব বলিলেন, "শঙ্কবেব অমোঘ বিধান আমবা শুনলাম। এ বিধান নতশিবে মেনে নেওযা ছাডা কোন গত্যন্তব নেই।"

তিনি সকলকে আশীর্বাদ কবিতে কবিতে আগাইযা গেলেন। সূর্য অস্ত যাইতেছিল। অস্তমান সূর্যেব বক্তিম স্বর্ণাভায পশ্চিম দিগন্ত মহিমান্বিত হইযা উঠিযাছিল। মহর্ষি কাবণ্ডব পশ্চিম মুখে চলিযাছিলেন। পিছনে তাহাব দীর্ঘ ছাযা দীর্ঘতব হইতেছিল—মনে হইতেছিল একটি কোমল কালো মখমল যেন তাহাকে অনুসবণ কবিতেছে, সুধীসমাজেব হৃদযে যে প্রগাঢ সম্ভ্রম তিনি সুদীর্ঘকাল সঞ্জীবিত বাখিবেন ওই সুদীর্ঘ ছাযা যেন তাহাবই প্রতীক।

সার্বর্ণি বজ্রাহতবৎ দাঁডাইযা বহিলেন। তিনি আব কিছু দেখিতে বা শুনিতে পাইলেন না। একটি বাক্যই কেবল তাঁহাব কানে বাজিতে লাগিল—"নিবঞ্জনাব মৃত্যু আসন্ন।" এ কথা তো তিনি কোনদিন ভাবেন নাই। মৃত্যুব স্বরূপ তাহাব অজ্ঞাত ছিল না বহুদিন পূর্বে নবকপাল লইযা তিনি সাধনাও কবিযাছিলেন, কিন্তু মৃত্যু নিবঞ্জনাব নযনেব দীপ্তিও নিবাইতে দিবে।—এ কথা তিনি ভাবেন নাই। রূঢ সত্যটা তাঁহাকে নিদাৰুণ আঘাত কবিল। তিনি বিহ্বল হইযা পডিলেন।

"নিবঞ্জনাব মৃত্যু আসন্ন? কি ভযানক কথা। নিবঞ্জনা বাঁচবে না? সূর্য চন্দ্র গ্রহ তাবা ফুল ফল নদী নির্ঝবিণী—এসব তো অর্থহীন।"

কে যেন চাবুক মাবিযা তাঁহাকে দাঁড কবাইযা দিল।

"দেখা কব, দেখা কব, অবিলম্বে দেখা কব তাব সঙ্গে—"

তিনি ছুটিতে লাগিলেন। পথ জানা ছিল না, ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে তিনি গঙ্গাতীবে উপনীত হইলেন। ঘাটে অনেক নৌকা ছিল একটি নৌকা পাল তুলিযা পূর্বমুখে পাডি জমাইবাব উপক্রম কবিতেছিল। সার্বর্ণিব চীৎকাবে মাঝি তীবে নৌকা ভিডাইল, সার্বর্ণি লাফাইযা তাহাতে উঠিযা পডিলেন। সেকালে সন্ন্যাসীদেব বিবাগভাজন হইবাব সাহস খুব কম লোকেবই ছিল। মাঝিবা কিছু বলিল না, সার্বর্ণি নৌকাব গলুযেব উপব বসিযা হাঁপাইতে লাগিলেন। নৌকা ভাসিযা চলিল।

সাবর্ণি স্তব্ধ হইয়া দূর দিগন্তে চাহিয়া বসিয়া ছিলেন। তাঁহার অন্তর কিন্তু স্তব্ধ ছিল না। তিনি মনে মনে আক্ষেপ করিতেছিলেন—

"মূর্খ, মূর্খ মূর্খ! যখন সময় ছিল, সুযোগ ছিল তখন কিছু করিনি, হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে নিরঞ্জনাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। তখন বুঝিনি যে নিরঞ্জনাই সব, নিরঞ্জনা ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু নেই, নিরঞ্জনাহীন পৃথিবী মরুভূমি। শঙ্কর শঙ্কর করে পাগলের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি কেবল, পবিত্রতা রক্ষা করবার জন্যে শুচিবায়ুগ্রস্তের মতো সারাটা জীবন কাটিয়েছি। কিন্তু নিরঞ্জনাকে দেখবার পর ওসবের কিছুমাত্র কি প্রয়োজন ছিল? কেন আমি বুঝলাম না যে, নিরঞ্জনার একটি মাত্র চুম্বনই অনন্ত সুখের আকর, নিরঞ্জনাই আনন্দ, নিরঞ্জনাহীন জীবন অর্থহীন। আমি মূর্খ, তাই নিরঞ্জনাকে দেখবার পরও আর একটা স্বর্গের কল্পনা করেছিলাম, শঙ্কর শঙ্কর করে মিথ্যা আলেয়ার পিছনে ছুটেছিলাম। নিরঞ্জনা যা তোকে দিতে পারত, শঙ্কর কি তার শতাংশের একাংশও দিয়েছে তোকে! স্বর্গ! কোথায় আছে শঙ্করের স্বর্গ! নিরঞ্জনার অধরেই তো স্বর্গসুখ ছিল, কত লোক সে সুখ ভোগও করেছে। তুই কি কবছিলি মূর্খ! কে তোর বুদ্ধিভ্রংশ করেছিল, কে তোকে অন্ধ করেছিল যে, এত বড় সত্যটা তুই দেখতে পেলি না! কলঙ্ক? নরক? ওরে মূর্খ, তার ক্ষণিকের সঙ্গলাভের জন্য যদি অনন্তকাল নরকে বাস করতে হত তাও যে শ্রেয় ছিল—এ কথা তোর মাথায় ঢোকেনি কেন। সে দু হাত বাড়িয়ে তোকে আহ্বানও করেছিল, তুই তার আলিঙ্গনে ধরা দিয়ে মরলি না কেন? সংসম! সংযম! যে তোকে সংযম করতে শিখিয়েছিল সে তোকে ঠকিয়েছে, প্রতারণা করেছে। ভুল পথ ধরে সারাজীবন কোথায় চলেছি আমি! হায়! হায়! কি করেছি! নিরঞ্জনাকে পেয়েও পেলাম না, সে দু হাত বাড়িয়ে ডাকল তবু গেলাম না, ওই পরম মুহূর্তটির স্মৃতি যে অক্ষয় হয়ে থাকত আমার জীবনে, নরকে গিয়েও বিধাতাকে আমি বলতে পারতাম—আমাকে পোড়াও, আমার অস্থি চূর্ণ কর, আমাকে নিয়ে যা খুশী কর, কিন্তু যে স্মৃতি আমি বহন করে এনেছি তা আমার সমস্ত সত্তাকে অনন্ত কাল আনন্দিত করে রাখবে, অনন্তকাল উদ্বুদ্ধ করবে। নিরঞ্জনার মৃত্যু আসন্ন? শঙ্কর, তুমি শঙ্কর, না সং! আমাকে নরকের ভয় দেখাচ্ছ? নরকের ভয় আমার নেই। আমার ভয় নিরঞ্জনাকে আর দেখতে পাবনা। নিরঞ্জনা মারা যাচ্ছে, আর সে থাকবে না, আর কখনও তাকে দেখতে পাব না—ওহো-হো-হো—"

তিনি উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং চুপি চুপি একই কথা বলিতে লাগিলেন—"কখনও না, কখনও না, কখনও না।"

হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, নিরঞ্জনাকে তিনি ভোগ করিতে পারেন নাই; কিন্তু অনেকে করিয়াছে। তাহার প্রেমধারায় অবগাহন করিয়া বহু লোক তৃপ্ত হইয়াছে, বঞ্চিত হইয়াছেন কেবল তিনি। কথাটা মনে হইবামাত্র তিনি উত্তেজনা ভরে দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং ক্ষিপ্ত পশুর মতো গর্জন করিতে করিতে নখর দিয়া বক্ষস্থল আঁচড়াইয়া হাত কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলিলেন। মাঝিরা অবাক এবং ভীত হইল। সাবর্ণি মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"যারা ওকে ভোগ করেছে তাদের সবাইকে যদি খুন করতে পারতাম!"

হত্যার কথা মনে হওয়াতে তাঁহার একটা অদ্ভুত উন্মাদনা হইল। পাশবিক উন্মাদনা। তিনি কল্পনা করিতে লাগিলেন, তিনি যেন সিন্ধুপতিকে ধীরে ধীরে চর্বণ করিতেছেন। চর্বণ করিতে করিতে একদৃষ্টে তাহার চোখের দিকে চাহিয়া আছেন।

এ উন্মাদনা কিন্তু বেশীক্ষণ রহিল না। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দুর্বল হইয়া গেলেন, তাহার পর চুপ করিলেন। অস্থির চিত্ত যেন শান্ত হইল। ক্রমশ একটা অপূর্ব স্নেহরসে তাঁহার মন কোমল হইয়া আসিতে লাগিল। ইচ্ছা করিতে লাগিল বাল্যবন্ধু সিন্ধুপতির গলা জড়াইয়া বলেন— "ভাই সিন্ধু, তুমি নিরঞ্জনাকে ভালবেসেছিলে, আমিও তাই তোমাকে ভালবাসতে এসেছি। তার কথা বল আমাকে। তোমাকে সে যা যা বলত, তা আমাকে সব বল—"

কিন্তু এ চিন্তাও বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতেছিল না। যখনই মনে পড়িতেছিল নিরঞ্জনার মৃত্যু আসন্ন, একটা তপ্ত লৌহশলাকা যেন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিতেছিল।

তিনি আবার মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"দিবসের আলো, রাত্রির জ্যোৎস্না, বনের জীবজন্তুরা যা যেখানে আছ, তোমরা কি বুঝতে পারছ নিরঞ্জনার মৃত্যু আসন্ন? নিরঞ্জনা যদি না থাকে তোমাদের থাকবার কি প্রয়োজন? তোমবাও লুপ্ত হয়ে যাও। নিরঞ্জনার মৃত্যু আসন্ন, তার মানে পৃথিবীর মৃত্যু আসন্ন, নিরঞ্জনাই তো পৃথিবীর আলো, প্রাণ, রূপ। তাব কাছে যে গেছে সেই এ কথা অনুভব করে ধন্য হয়েছে। সেদিন রাত্রে জীমূতবাহনের বাড়িতে নিরঞ্জনার কাছে কত জ্ঞানী, কত গুণী এসে বসেছিল। তাদের মুখে হাসি ফুটেছিল, আলাপে সুর লেগেছিল, চিন্তা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল, কারণ নিরঞ্জনা কাছে ছিল যে। তার স্পর্শে সবই মধুময় হয়ে উঠেছিল সেদিন। লালসা-কামনার মধ্যেও সত্য শিব সুন্দর মূর্ত হয়েছিলেন। এখন সবই স্বপ্ন। নিরঞ্জনার মৃত্যু আসন্ন। আহা, আমারও যদি এখন মৃত্যু হত! কিন্তু ওরে নপুংসক, জীবনকে তুই কি ভোগ করেছিস যে, মৃত্যুর স্বাদ পাবি! শঙ্কর, তুমি কি আছ? যদি থাক, আমার কথা শোন। আমি তোমাকে ঘৃণা করি, তোমার মুখের উপব নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেছি আমি, আমাকে অভিশাপ দাও। আমাকে অনন্ত নরকে নিক্ষেপ কর। যে নিষ্ফল আক্রোশে আমার সারা বুক জ্বলে যাচ্ছে, অনন্ত নরকে বসে অনন্তকাল সেই আগুনে পুড়তে চাই আমি—"

অত প্রত্যূষে শিবানী-আশ্রমে ভৈরবী শুভ্রধারা মহর্ষি সাবর্ণিকে অভ্যর্থনা করিলেন।

"আসুন মহর্ষি আমাদের আশ্রম আপনার পাদস্পর্শে পূত হোক। যে সাধ্বীকে আপনি আমাদের হাতে সমর্পণ করে গিয়েছিলেন, মনে হচ্ছে তাকে আশীর্বাদ করতেই আপনি এসেছেন। ঠিক সময়েই এসেছেন, কারণ তার আর সময় নেই, করুণাময় ভগবানের ডাক এসেছে। যে সংবাদ দেবদূতেরা দেশ-দেশান্তরে অরণ্যে পর্বতে ঘোষণা করেছে, সে সংবাদ আপনিও যে শুনেছেন তাতে আর আশ্চর্য কি! নিরঞ্জনার মুক্তির আর বিলম্ব নেই। তার তপস্যা শেষ হয়েছে। এখানে সে কি ভাবে ছিল তার বিবরণ আপনাকে সংক্ষেপে বলছি, শুনুন। আপনি যখন তাকে ঘরে তালাবদ্ধ করে রেখে গেলেন, তখন আমি ওর ঘরে রুটি জল আর একটি বাঁশীও পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। নটীরা সাধারণত যে ধরণের বাঁশী বাজায়

তেমনি বাঁশী একটি বাঁশী দিয়েছিলাম যাতে ও বিমর্ষ হয়ে না পড়ে। মানব সমাজে একদিন ওর প্রকাশ সুন্দর ছিল, শঙ্করের কাছেও ওর প্রকাশ সুন্দর হোক—এই ভেবেই দিয়েছিলাম। দিয়ে খারাপ করিনি। ওই ছোট বাঁশীতে কি সুন্দর সুরই ও যে বাজাত, মনে হত সুরের ভিতর দিয়েই ও শঙ্করকে ডাকছে। শঙ্কর সে ডাকে সাড়াও দিলেন। পুরো ছ মাস যখন কেটে গেল, তখন একদিন আমরা সবিস্ময়ে দেখলাম, যে তালা আপনি স্বহস্তে বন্ধ করে চাবি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন, সে তালা আপনি খুলে গেছে। আমরা কেউ সে তালা স্পর্শও করিনি। আপনি তাকে বলে গিয়েছিলেন—শঙ্কর যেদিন তোমাকে ক্ষমা করবেন সেদিন তিনি নিজে এসে তোমার ঘরের তালা খুলে দেবেন। তালা খোলা দেখে আমাদের বিশ্বাস হল, শঙ্কর ওকে ক্ষমা করেছেন, ওর প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ওকে তখন বাইরে নিয়ে এলাম। অন্য আশ্রমবাসিনীদের সঙ্গে ও কাজ করত, প্রার্থনা করত, পুজো করত, ওর মধুর নম্র কথাবার্তায় আমরা মুগ্ধ হয়ে যেতাম। ওকে দেখে মনে হত, যেন ও লজ্জা আর সঙ্কোচের প্রতিমূর্তি। সর্বদাই ভয়ে ভয়ে সসঙ্কোচে থাকত। ওর পূর্বজীবনের স্মৃতিই বোধ হয় এর কারণ। ক্রমশ আমি বুঝতে পারলাম—ওর বিশ্বাস, আশা আর ভালাবাসার জোরে ও ভগবানকে নিজের কাছে টেনে এনেছে। ওর বিপথে যাবার আশঙ্কা আর নেই। তখন আমি নির্ভয়ে অনবদ্য রূপকে, ওর অভিনব প্রতিভাকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করলাম। সীতা, সাবিত্রী, উমা প্রভৃতির ভূমিকায় কি সুন্দর অভিনয় যে ও করত তা বলে বোঝাতে পারব না, সত্যিই তা অবর্ণনীয়। মনে হত—অভিনয় নয়, যেন সত্যি সীতা সাবিত্রী উমা এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে। মহর্ষি, আমি বুঝতে পারছি, অভিনয়ের কথা শুনে আপনি ভয় পাচ্ছেন। কিন্তু ওর অভিনয় আপনি যদি স্বচক্ষে দেখতেন তা হলে আপনার হৃদয় গলে যেত, চোখে জল আসত। অভিনয় করতে করতে ওর চোখ দিয়েও জল পড়ত। নানা বয়সের নানা রকমের মেয়ে আসার আশ্রয়ে থাকে। আমি কখন কারও স্বাভাবিক প্রতিভার প্রতিকূলতা করিনি। সব বীজ থেকে এক রকম গাছ হয় না, সব গাছ এক রকম ফুল বা ফল দেয় না। সকলের মুক্তিও তেমনি এক পথে হয় না। নিরঞ্জনার রূপ যৌবন অম্লান ছিল, তবু সে সব ত্যাগ করে ভগবানে আত্মসমর্পণ করেছিল। এ রকম বড় একটা দেখা যায় না। তিন মাস অহরহ জ্বরভোগ করেও ওর সৌন্দর্য এখনও অম্লান আছে। এই জ্বরই ওর মৃত্যুর কারণ হয়েছে। অসুখের সময় ও কেবল আকাশ দেখতে চাইত, তাই আমরা রোজ সকালে ওকে আমাদের উঠানে আমগাছের ছায়ায় নিয়ে আসি। ওই আমগাছতলাতেই আমাদের উপাসনাও হয়। ও এখন সেখানেই আছে। আপনি সেখানেই চলুন। বেশী বিলম্ব করবেন না, তার সময় হয়ে এসেছে, শঙ্কর তাকে ডাকছেন। তার যে রূপ একদিন সকলকে মাতিয়েছিল, সে রূপ এখন দেবতার পূজায় উৎসর্গীকৃত হয়েছে, সে রূপ এইবার তার দেহকে ছেড়ে যাচ্ছে। চলুন—"

প্রভাতের আলোকে চতুর্দিক হাসিতেছিল। মহর্ষি সাবর্ণি শুভ্রধারার পিছু পিছু আসিয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। শিবমন্দিরশীর্ষে একদল বন্য কপোত বসিয়া ছিল, মনে হইতেছিল

মন্দিরের গাত্রে যেন রত্নের মালা বিলম্বিত করিয়া দিয়াছে। গাছের ছায়ায় একটি শুভ্র শয্যার উপর নিরঞ্জনা চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল। তাহার পাণ্ডুর মুখ রক্তলেশহীন। আশ্রমের সেবিকারা তাহাকে ঘিরিয়া প্রার্থনা করিতেছিল। নিরঞ্জনার মনের কথা যেন তাহাদের প্রার্থনায় ভাষা পাইতেছিল।

"শঙ্কর, আমাকে ক্ষমা কর। তোমার করুণা দিয়ে আমার পাপ মোচন কর।"

মহর্ষি সাবর্ণি ডাকিলেন, "নিরঞ্জনা—"

নিরঞ্জনা চোখ খুলিয়া চাহিল এবং ধীরে ধীরে—অতি ধীরে ধীরে সাবর্ণির দিকে চোখের দৃষ্টি ফিরাইবার চেষ্টা করিল। শুভ্রধারা ইঙ্গিতে সেবিকাদের দূরে সরিয়া যাইতে বলিলেন।

"নিবঞ্জনা—"

উপাধান হইতে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া নিরঞ্জনা অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "প্রভু, আপনি? পথে আসতে আসতে আমরা সেই যে ছোট্ট নদীটির জল খেয়েছিলাম আপনার মনে আছে কি? সেই দিনই আমার নবজন্ম হয়েছিল—"

আর বেশী কিছু বলিতে পারিল না, তাহার মাথা উপাধানের উপর লুটাইয়া পড়িল। মৃত্যুব ছায়া তাহার মুখেব উপর নামিতে লাগিল, ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। নীববতা ভঙ্গ করিয়া সহসা একটা বন্য কপোতের কুজন ভাসিয়া আসিল।

সেবিকাদেব অন্তিম প্রার্থনা স্তোত্র প্রতিধ্বনিত হইল—'শঙ্কর, তোমার করুণাধারায় আমার সমস্ত পাপ ধুয়ে দাও, সমস্ত তাপ মোচন কর। আমার পাপের কথা আমি কিছুতে ভুলতে পারছি না—"

সহসা নিবঞ্জনা বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। তাহার নীল নয়ন বিস্ফারিত হইয়া গেল, দূর আকাশের দিকে দুই হাত বাড়াইতে সে বলিয়া উঠিল, "ওই যে! অনন্ত প্রভাতের ঊষালোক আমি দেখতে পাচ্ছি।"

তাহাব দৃষ্টি উজ্জ্বল, মুখ উদ্ভাসিত। মনে হইল, মানবী নয়, সত্যই দেবী মহর্ষি সাবর্ণি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। শয্যাপার্শ্বে নত জানু হইয়া নিরঞ্জনাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন –

"নিরঞ্জনা, তুমি যেয়ো না, তুমি থাক, আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি থাক, তুমি থাক। নিরঞ্জনা, শোন, শোন, শুনে যাও—আমি তোমাকে ঠকিয়েছি. আমি মূর্খ, ভণ্ড, তাই তোমাকে ভুল পথে নিয়ে এসেছি। শঙ্কর, স্বর্গ—সব ভুল. সব মিথ্যে। জীবনেব চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই. মানুষের চেয়ে বড় আর কিছু নেই. মানুষের ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ ভালবাসা। আমি তোমাকে ভালবাসি নিরঞ্জনা, আমাকে ফেলে তুমি চলে যেয়ো না। তুমি মরে যাচ্ছ—এ কথা আমি ভাবতেও পারছি না। তুমি মরবে কেন? চল তুমি আমার সঙ্গে, তোমাকে বুকে করে নিয়ে আমি কোনও দূর দেশে পালিয়ে যাই। এসো, পরস্পরকে ভালবেসে নূতন স্বর্গ সৃষ্টি করি আমরা। নিরঞ্জনা, নিরঞ্জনা, শোন আমার কথার উত্তর দাও, বল—আমি বাঁচব, বাঁচতে চাই। নিরঞ্জনা. ওঠ, ওঠ—"

নিবঞ্জনা তাঁহাব কথা শুনিতে পাইল না। তাহাব দৃষ্টি অনন্তেব সন্ধান কবিতেছিল।

অস্ফুট কণ্ঠে সে বলিতেছিল—"স্বর্গেব দ্বাব খুলে যাচ্ছে। দেব দেবীদেব দেখতে পাচ্ছি আমি। ওই যে কিঙ্কবও দাঁড়িযে আছে, কিঙ্কবেব হাতে ফুল, কিঙ্কব হাসছে, আমাকে ডাকছে। দুটি দেবদূত যে এগিযে আসছে। কি সুন্দব ওদেব চেহাবা। ওকে—ওযে শঙ্কব—শঙ্কব—"

নিবঞ্জনাব মুখে আনন্দ ঝলমল কবিতে লাগিল। পবমুহূর্তেই সে শয্যায লুটাইযা পডিল। তাহাব মৃত্যু হইল।

মহর্ষি সাবর্ণি পাগলেব মতো আবাব তাহাকে আলিঙ্গন কবিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু শুভ্রধাবা তাহাকে বাধা দিলেন।

"যান, যান, সবে যান আপনি। এ সব কি কবছেন? আশ্চর্য।"

সাবর্ণি সভযে সবিযা গেলেন, তাঁহাব সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। মনে হইল, তাঁহাব দুই চক্ষু দিযা বুঝি অগ্নিশিখা বাহিব হইতেছে, পৃথিবী দ্বিধা হইযা এখনই বুঝি তাঁহাকে গ্রাস কবিবে।

সেবিকাবা প্রার্থনা কবিতে লাগিলেন, "জয জয শঙ্কব—জয নীলকণ্ঠ—"

সহসা তাহাদেব বাকবোধ হইযা গেল। সাবর্ণিকে দেখিযা তাহাবা আতঙ্কে চীৎকাব কবিযা উঠিল—"নববাক্ষস, নববাক্ষস।"

সত্যই তাহাব মুখমণ্ডল বাক্ষসেব মতো বীভৎস হইযা গিযাছিল। মুখেব উপব হাত বুলাইযা নিজেই তিনি তাহা বুঝিতে পাবিলেন।

ভুবন সোম

।। এক ।।

অনিল অনেক আগে থেকে এসেই জাহাজঘাটে পৌঁছেছিল। সোজা মাঠ থেকে এসেছিল সে মাঠামাঠি হেঁটে। তাব কাপড়ে, অসংখ্য চোব-কাঁটা, পা দুটি ধূলিধূসবিত। সে এসে দেখলে, ঘাট গাড়ি তখনও আসেনি, স্টিমাবও বেশ 'লেট' আসছে। গঙ্গাব ধাবে গিয়ে পূর্বদিগন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ কবে সে দাঁড়িয়ে বইল কয়েক মুহূর্ত। না, জাহাজেব কোন চিহ্নই নেই, ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না। তবু সে দাঁড়িয়ে বইল, কাবণ উড়ন্ত হাঁসেব সাবি দেখতে পেয়েছিল সে। বাজহাঁসেব সাবি, ইংবেজিতে যাব নাম 'বাব হেডেড গুজ', এ দেশেব শিকাবীবা যাকে বলে 'গীজ'। লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বইল অনিল।

মনে পড়ল গত বছব একসঙ্গে গোটা তিনেক বাজহাঁস মেবেছিল সে। হঠাৎ ফড়িংবে মনে পড়ল। সে ও সঙ্গে ছিল। বোগা-বোগা চেহাবা, লাল-ডোবা-কাটা কামিজ গায়ে, বড বড হলদে দাঁত কটা চুল, কটা চোখ। অর্ধেকেব উপব মাংস সে একাই খেয়েছিল। খুব খেতে পাবত। অনিল তাকে আবাব আসতে বলেছিল, কিন্তু সে আব আসেনি, আসবেও না। মোটব অ্যাক্সিডেন্টে মাবা গেছে বেচাবা মাত্র মাস ছয়েক আগে। বেশ মনখোলা লোক ছিল ফড়িং, কোন কথা গোপন বাখতে পাবত না। এমনকি সে-যে একবাব চুবি কবেছিল সে গল্পও কবেছিল তাব কাছে। ফড়িঙেব কথা মনে পড়াতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল অনিল।

'অনিলবাবু যে, কি খবব, কতক্ষণ এসেছেন?'

বেলেব টিকিট কালেক্টাব সখীচাঁদ এসে কখন পিছনে দাঁড়িয়েছিল অনিল তা টেব পায়নি।

'এইমাত্র এসেছি। ভুবনকাকা এই স্টিমাবে আসছেন। তাঁকে নিতে এসেছি। স্টীমাব তো খুব 'লেট' দেখছি আজ—'

'হ্যাঁ, খুব লেট। আপনাব কাকা আছেন না কি? জানতাম না তো। কোথা থেকে আসছেন তিনি?'

'সাহেবগঞ্জ থেকে। ভুবন সোম, আমাব আপন কাকা নন— কিন্তু ওঁব সঙ্গে আমাদেব ঘনিষ্ঠতা বহুকালেব। নিজেব কাকাব চেয়েও বেশী আপন উনি।'

'ভুবন সোম মানে? এ টি এস ভুবন সোম?'

'হ্যাঁ।'

এ শুনে সখীচাঁদেব চোখ-মুখ-নাক-ভুরু-থুতনী সব কুঁচকে গেল একসঙ্গে, এবং তা গেল বলে একটু অপ্রস্তুতও হয়ে পড়ল সে। অনিলবাবুব কাছে এ ভাবটা প্রকাশ না হলেই যেন ভাল হত। কিন্তু সামলে নিলে সে পব মুহূর্তে।

'মিস্টাব সোম যে আপনাব কাকা, তা জানতুম না।'

অনিল হেসে বললে, খুব কড়া অফিসার, নয়?'

'খুব। বাপের কুপুত্তুর যাকে বলে। নিজের ছেলের চাকরিটিই খেয়ে দিয়েছে। জানেন নিশ্চয়ই।'

মৃদু হেসে অনিল মাথা নাড়ল—'জানি।'

'এখানে আসছেন কেন?'

'পাখী শিকার করতে।'

'খুব ভাল শিকারী বুঝি।'

'শখ আছে খুব। তবে প্রায়ই মারতে পারেন না।'

'পাখীরা তো আর রেলের চাকর নয়!'

একটা তিক্ত হাসি হেসে এগিয়ে গেল সখীচাঁদ। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বললে, 'গঙ্গার ধারে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন, তার চেয়ে চলুন আমার বাসায়। স্টীমারের এখনও অনেক দেরী। ততক্ষণ ববং একদান দাবায় বসা যাক, চলুন।'

'তাই চলুন। বউ এসেছে?'

'আরে না মশাই। আমাদেব সমাজে 'গওনা'র অনেক ঝন্‌ঝট।'

খাঁটি বাঙালী হলে ঝঞ্ঝাট বলত। সখীচাঁদ যদিও চমৎকার বাংলা বলতে পারে, কিন্তু জাতে সে বিহারী গোয়ালা। সেই জন্যেই 'দ্বিরাগমন' না বলে 'গওনা' বললে। সম্প্রতি 'যাদব' উপাধি ধারণ করে ওদের জাতভাইরা অনেকে আত্মমর্যাদা বাড়াবাব চেষ্টা করছে, লেখাপড়াও শিখছে অনেকে। সখীচাঁদের কথাবার্তা শুনে ওকে বিহারী বলে মনেই হয় না। ঘাট থেকে মাত্র সাত-আট মাইল দূরে এক গ্রামে ওর শ্বশুরবাড়ী। ভেবেছিল, এখানে যখন বদলি হয়ে এসেছে তখন এইখানেই বউকে নিয়ে আসবে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীর মুরুব্বীবা 'ঝনঝট' লাগিয়েছেন, তিন মাসের মধ্যে নাকি শুভদিন নেই। তার উপর ওই ভুবন সোম তার নামে রিপোর্ট করেছে। দোষ তার ছিল অবশ্য, কিন্তু আজকাল ঘুষ কে না নিচ্ছে! উপরি-পাওনা পেলে কে ছাড়ে! ওই যে মোটা কালো মালবাবুটি, ঘুষ নিয়ে নিয়ে লাল হয়ে গেল। সে তো মাত্র দু-চার টাকা কামিয়েছিল। সাহেব অফিসার হলে একটু ধমক দিয়ে ছেড়ে দিত। কিন্তু সোম সাহেব (বাঙালী সাহেব কিনা) লম্বা রিপোর্ট করেছেন নাকি। সখীচাঁদ আপিসে খবর নিয়েছিল, আপিসে এখনও রিপোর্ট পৌঁছয়নি, হয়তো পাঠায়নি এখনও, কিন্তু পাঠাবে ঠিক। লোকটা 'নমরি' বদমাশ। বাঙালীরা যাকে 'একের নম্বর বদমাইশ' বলে, বিহারীরা তাকে বলে 'নমরি বদমাশ'। ভুবন সোমের সঙ্গে অনিলবাবুর আত্মীয়তা আছে শুনে সখীচাঁদের একটু আশা হল, যদি—

'আচ্ছা, মাসখানেক আগে যখন সোম সাহেব এখানে এসেছিলেন তখন তো আপনার কাছে যাননি?'

'না। তখন ছুটি ছিল না বোধ হয়। এখন ছুটি নিয়ে আসছেন শিকার করবার জন্যে।'

'আপনাদের বাড়িতেই থাকবেন?'

'আর কোথা যাবে এখানে! সহজে অবশ্য উনি কারও বাড়িতে উঠতে চান না। কিন্তু আমাদের সঙ্গে ওর আলাদা সম্পর্ক। বাবাকে দাদা বলতেন, আর ঠিক দাদার মতই শ্রদ্ধা করতেন। আমাকেও নিজের ছেলের মতই ভালবাসেন।'

সখীচাঁদের আশা-প্রদীপের শিখা আর একটু উজ্জ্বল হল। একটু ইতস্তত করে সে বললে, 'বড্ড কড়া অফিসার কিন্তু উনি, এটা বদনাম সুনাম যা-ই বলুন। দেখুন না সামান্য একটা কারণে আমার নামে রিপোর্ট করেছে শুনলাম। পট করে চাকরিটা যদি চলে যায়, মহা মুশকিলে পড়ে যাব এ বাজারে। বাজারটা কি রকম দেখছেন, আমার এই পোস্টের জন্যে বি.এ.এম.এ. পর্যন্ত দরখাস্ত করেছিল। আচ্ছা, আপনি যদি একটু—'

ইতস্তত করে থেমে গেল সখীচাঁদ। কিন্তু অনিলের বুঝতে অসুবিধা হল না।

'ও বাবা. সে আমি পারব না। আর তাতে উলটো ফল হবার সম্ভাবনা। সুপারিশ করলে উনি ভয়ানক চটে যান।'

'ও, তাই নাকি?'

সখীচাঁদ মনে মনে কিন্তু বললে, 'খচ্চড়!'

নীরবে কিছুক্ষণ হেঁটে অবশেষে সখীচাঁদের কোয়ার্টারে পৌছল তারা। খড়ের ছাউনি, দবমাব ঘব। ছোট একটু বাবান্দা আছে। তাতে বোদও এসে পড়েছিল একফালি।

'রোদেই বসা যাক, কি বলেন! কাল থেকে বেশ শীত পড়েছে।'

'হ্যাঁ, বোদেই ভাল।'

বারান্দার একধারে হালকা ছোট একটা কাঠের টেবিল ছিল। সেইটেকে টেনে সখীচাঁদ রোদে নিয়ে এল, তারপর ঘরে ঢুকে বার করলে দুটো টিনের চেয়ার। তারপর আবার ঘরে ঢুকে গেল। খট খট করে শব্দ হতে লাগল একটা।

'অনিলবাবু, একবার ভিতরে আসুন তো।'

অনিল ভিতরে ঢুকে দেখল সখীচাঁদ একটা টেবিলের ড্রয়ার ধরে টানটানি করছে। 'জাম হয়ে গেছে ড্রয়ারটা, দেখুন তো খুলতে পারেন কি না! আপনার গায়ে তো খুব জোর শুনেছি। সর্বন্ বড়ইকে দিয়ে বানিয়েছিলাম, কড়া মজুরি নিয়েছে, বললে—আস্লি টিক, কিন্তু কাণ্ড দেখুন। এ ড্রয়ার কি আমার ওয়াইফ খুলতে পারবে?

'ড্রয়ার খুলে কি হবে এখন? চলুন দাবায় বসা যাক।'

'আরে মশাই, ড্রয়ারের ভিতরেই যে দাবার গুটিগুলো রয়েছে।'

'ও!'

অনিল একবার টেনে দেখলে, সত্যিই বেশ আঁট।

'বেশ এঁটে গেছে। কাঁচা আমকাঠ দিয়েছে। আচ্ছা, এক কাজ করুন, আপনি টেবিলটাকে খুব শক্ত করে ধরে থাকুন, আমি খুব জোরে টানব, টেবিলটা যেন সরে না আসে।'

'দাঁড়ান, তা হলে টেবিলটাকে সরিয়ে নিই একটু। দেওয়ালে ঠেস দিলে একটু সাপোর্ট পাব।'

তাই কবা হল। অনিল বলিষ্ঠ ব্যক্তি। একটানে খুলে ফেললে ড্রয়ারটা। কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। দেওয়ালেব উপর টেবিলের ঠিক সামনেই বাঁধানো ফটো টাঙানো ছিল একটা। সখীচাঁদেব মাথা লেগে মেঝেয় পড়ে চুরমার হয়ে গেল তার কাঁচখানা।

'ও-হো-হো-হো, এ কি করলাম?'

আর্তনাদ করে উঠল বেচারা।

'মাথায় লাগল না কি?'

অনিল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

'না, মাথায লাগে নি।'— তারপব মুচকি হেসে বললে,'বুকে লেগেছে। কার ছবি জানেন এটা? দেখুন।'

অনিলের হাতে ছবিটা দিলে সে। একটি হাস্যমুখী কিশোরীর ফটো। নীচে নামও লেখা আছে, ইংরেজিতে কিন্তু—মিসেস বৈদেহী যাদব।

মুচকি হেসে সখীচাঁদ বললে, ' আমার বউ। মাইনব স্কুলে পবে।'

'আপনাব মতো বাংলা বলতে পারে'

'আমার চেয়েও ভাল। ওদেব মামার বাড়ি যে পাকুড়, সবাই বাংলা বলে সেখানে।'

'ফোটো তুললে কে?'

সখীচাঁদ মুচকি হেসে উত্তর দিলে, ' আমাব শালা। তার শ্বশুব তাকে খুব দামী ক্যামেবা দিয়েছে একটা। খুব ছবি তুলে বেড়াচ্ছে, আমারও ছবি একখানা তুলে নিয়ে গেছে। দিন ওটা, আজই সাহেবগঞ্জে পাঠাতে হবে ঘোষালেব হাতে, বাঁধিয়ে আনবে আবাব। আনতেই হবে।'

সখীচাঁদ ছবিখানি খবরেব কাগজে পবিপাটি কবে মুড়ে একটি সরু দড়ি দিয়ে ভাল কবে বাঁধলে, তাবপব ট্রাঙ্কেব ভিতর বেখে দিলে সেটি।

'আসুন এইবার, বসা যাক একদান।'

দুজনে বাইরে গিয়ে টেবিলে দাবার ছক পেতে বসল।

।। দুই ।।

কারও সঙ্গে যদি আত্মীযতা থাকে তা হলে তো কথাই নেই। ভুবন সোমের এসব সুবিধা ছিল না, তাই চাকরির মেয়াদ যে বাড়বে না তা তিনি জানতেন। এও তিনি জানতেন যে, পূর্বজন্মে সম্ভবত কোনো গুরুতর পাপ করেছিলেন। তাই এ দেশে জন্মগ্রহণ করে এত শাস্তি ভোগ করে গেলেন। তাঁব মাঝে মাঝে মনে হত, এর চেয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে জন্মালে বোধ হয় বেশী সুখী হতাম। শুধু চাকবি জীবনেই নয়, সামাজিক জীবনেও তিনি ক্রমাগত মার খেয়েছেন। কেউ তাঁর মুখের দিকে চায় নি। নিজের বাবা মা ভাই বোন ছেলে মেয়ে আত্মীয় বন্ধু— কেউ না। তাঁর বয়স যখন ষোল তখনই তাঁর ঘাড়ে প্রকাণ্ড সংসার এবং প্রচুর ঋণের বোঝা চাপিয়ে তাঁর বাবা সজ্ঞানে হরিনাম করতে করতে মারা গেলেন, সম্ভবত স্বর্গেই

গেলেন। সেসব দিনের কথা মনে করলে এখনও ভয় হয় ভুবন সোমের। বাড়িতে একটি পয়সা নেই, বাজারে কেউ ধার দিতে চায় না। সত্যিই চোখে অন্ধকার দেখেছিলেন সেদিন। সূর্য ওঠে কি না, উঠলেও তার থেকে আলো বেরোয় কি না— এ খবর রাখবারও সময় পাননি তখন। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দু হাত তুলে নমস্কার করলেন ভুবন সোম। নমস্কারটা পিতৃবন্ধু যোগেন হাজরার উদ্দেশ্যে। যখনই তাঁর কথা মনে পড়ে নমস্কার করেন। লোকটি তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করেছিলেন বটে, কিন্তু সাঁচ্চা লোক ছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর ওই লোকটিই এসে খোঁজ খবর নিয়েছিলেন নিঃস্বার্থভাবে। ডি.টি. এস. আপিসে চাকরি করতেন, স্বয়ং ডি.টি. এস-এর নেকনজর ছিল তাঁর উপর। তিনিই বলে কয়ে ভুবন সোমের চাকরিটি করে দেন। তাঁর নিজের ছেলে তখন এন্ট্রান্স পাস করেছে, কিন্তু তিনি তাকে না ঢুকিয়ে ভুবন সোমকেই ঢুকিয়ে দিলেন চাকরিতে। আজকাল হলে অবশ্য পাবতেন না।

পরিধানে সাহেবী পোশাক, মুখে পাইপ ভুবন সোম জাহাজের প্রথম শ্রেণীতে একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আত্মনিমগ্ন হয়ে নিজের কথাই চিন্তা করছিলেন। যখনই তিনি একা থাকেন তখনই তিনি আর বর্তমানে থাকতে পারেন না, অতীতে ফিবে যান। অতীত জীবনেরই পর্যালোচনা করছিলেন তিনি মনে মনে।

সোম সাহেবেব আসল বয়স ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু শরীর তত অপটু হয়নি। মাথার সামনের দিকেব চুল ঈষৎ পাতলা হয়ে এসেছে, জুলফির চুলেও পাক ধরেছে দু-একটায়, চোয়ালের দাঁতও দু-একটা তুলিয়েছেন, কিন্তু শরীর বেশ মজবুত আছে। আপিসের খাতায় তাঁর বয়স চুয়ান্ন। তাঁকে তার চেয়েও কম দেখায়। বছর খানেক পরেই রিটায়ার করতে হবে তাঁকে। রিটায়ার করবার পরও অনেকে চাকরিতে 'একসটেনশন' পেয়েছেন, কিংবা নূতন চাকরিতে বহাল হয়েছেন, কিন্তু তাঁর অদৃষ্টে সে সবের আশা নেই। তাঁব সার্ভিস রেকর্ড খুব ভাল, তবু আশা নেই। কারণ তিনি খোশামোদ কবতে পারেন না, আজকালকার উপবওয়ালারা কেউ তাঁর উপর সন্তুষ্ট নন। সারাটা জীবন তিনি যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, কিন্তু অন্যায়ভাবে কারও কাছে মাথা নোয়াননি কখনও। সাহেবেরা তাঁর কদর করত, তাই সামান্য কেরানীর পদ থেকে আজ তিনি এ. টি. এস. হতে পেরেছেন। এদের আমল হলে পারতেন না। এরা প্রথমেই খোঁজ করত লোকটার কি জাত, হরিজন কি না, তারপর খোঁজ করত সত্যাগ্রহ করে জেল হয়েছিল কি না! যোগ্যতার প্রশ্ন সবশেষে। প্রথম তিনটে ভালভাবে মিললে যোগ্যতা না থাকলেও চলে। মিনিস্টারদের জন্য আজকাল ভদ্রসন্তানদের কিছু হবার উপায় নেই, মুচি মেথর হাড়ি-ডোম হলে তো কথাই নেই, নিদেন পক্ষে নাপিত বা গোয়ালাও হতে হবে। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের ছেলে হওয়াটা আজকাল অপরাধের মধ্যে গণ্য। স্বাধীনতা পেয়ে কি চতুর্ভুজই হয়েছি আমরা! চারিদিক চোরে ভরে গেছে। দু-চারজন ছাড়া আজকাল ট্রেনে টিকিট কিনে চড়ে না কেউ। টিকিট-কলেক্টর আর গার্ডে মিলে সড় করে দু-চার পয়সা করে নিয়ে দলকে দল প্যাসেঞ্জার পার করে দিচ্ছে। বড় বড় গাঁটও চলে যাচ্ছে ব্রেকভ্যানে বিনা পয়সায়। হাতে-নাতে ধরে উপরে রিপোর্ট করলেও

ফল হয় না, মিনিস্টারের আত্মীয়ের আত্মীয় তস্য আত্মীয় হলেও ছাড়াপেয়ে যায়। স্বাধীনতা মানে ছোটলোকদের স্বাধীনতা, ভদ্রলোকদের বিপদ।....

ভুবন সোম পাইপটাতে টান দিলেন। ধোঁয়াটাকে মুখের ভিতর পুরে বসে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর আস্তে আস্তে ছাড়লেন সেটা। আবার অতীত-জীবনের হিসাব-নিকাশে মন দিলেন পা দোলাতে দোলাতে। সারা জীবনটাই লড়াই করতে করতে কেটেছে তাঁর। মা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন তাঁর কেবল একটি বিষয়েই একাগ্র লক্ষ ছিল পান থেকে চুন খসছে কি না। ভুবন সোম যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন যাতে না খসে, তবু তাঁকে খুশী করতে পারেন নি। তাঁর বদ্ধ মূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল, কর্তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সব সাধ আহ্লাদ শেষ হয়ে গেছে, এখন বেঁচে থাকা মানে দিনগত পাপক্ষয় করা। তাঁর সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল মেয়েদের ভাল করে বিয়ে দিতে পারেননি। কর্তা থাকলে নাকি ওই পেঁচামুখী হাড় হারামজাদা মেয়ে দুটি রাজাব বাড়িতে পড়ত। চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি ভুবন সোম। দুটি বোনেব বিয়ে দিতে পাঁচটি হাজার টাকা ধার করতে হয়েছিল তাঁকে। তা ছাড়া মায়েব সব গযনাও দিতে হযেছিল। কিন্তু তবু ওই বিরিঞ্চিলাল আর জগন্নাথ ছাড়া অন্য কোন পাত্র জুটল না, জোটাতে পারা গেল না। এ দেশে বিরিঞ্চিলাল আর জগন্নাথেব চেয়েও খারাপ পাত্র ঢেব আছে, তারাও বিয়ে থা করে ঘরসংসার পেতে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই বাস কবছে। কিন্তু তাঁব গুণবতী বোন দুটি তা পারলে না। শ্বশুরবাড়ি গেলই না, বললেন—পাড়াগাঁয়ে গিযে থাকতে পাবব না। মা-ও তাদের কথায় সায় দিলেন। পাড়াগাঁয়ে ম্যালেবিযা, পচা পুকুব, সাপ — কত কি আছে, সেখানে কি থাকা যায়! কিছুতেই গেল না। ফলে, ভগ্নীপতি দুটি কিছুদিন পবে ঘাড়ে এসে চড়ল। আর চড়েই বইল। ভাগ্নে-ভাগ্নীদের ভাব ভুবন সোমকেই নিতে হয়েছে। বহু জায়গায় বলে কয়ে বিরিঞ্চি আর জগন্নাথের চাকরিও তিনি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তারা আলাদা বাসা করে নি, মা-ই করতে দেন নি। যখন চাকরি হল তখনও তারা ভুবন সোমকে একটি পয়সাও সাহায্য করত না। অথচ গোপনে গোপনে এসেন্স কিনে আনত, রাবড়ি কিনে এনে লুকিয়ে লুকিয়ে খেত। ভাবটা, ভুবন সোম যেন তাদের পালন করতে বাধ্য। বংশবৃদ্ধিও মন্দ করে নি। দুই ভগ্নীর চোদ্দটি ছেলে মেয়ে হয়েছিল। এবা ভুবন সোমের সংসারকে তছনছ করেছে। শখ করে বাগান করেছিলেন। একটি ফুল গাছে থাকতে দেয় নি, বাড়িতে সুস্থির হয়ে ঘুমুতে পর্যন্ত দেয় নি, দিনরাত চেঁচামেচি কান্নাকাটি। শেষটা চুরি করতে আরম্ভ করল। পকেট থেকে পয়সা চুরি অনেক আগে থেকেই করত, একদিন বড় বউয়ের গয়না পর্যন্ত চুরি গেল। কিন্তু তাদের ভাল করে শাসন করবার উপায় ছিল না মায়ের জন্যে। মা তাদের আগলে আগলে বেড়াতেন, তাদের জন্যে অনর্গল মিথ্যে কথা বলতেন। ওই বাবণের গুষ্টিকে খাওয়াতে হত বলে ভুবন সোম নিজে কখনও ভাল জিনিস খান নি। চুনো মাছও সব দিন জোটেনি। সাধারণ ডাল ভাত তরকারি খেয়েই জীবনটা কেটেছে। ভাল ডালও জোটেনি। দিনের পব দিন লম্বা কলাইয়ের ডাল, মাঝে মাঝে ফ্যান মিশিযে। এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে, অন্য ডাল আর ভালই লাগে না। হজমও হয় না। সেদিন একটা পার্টিতে নেমন্তন্ন হয়েছিল—চপ কাটলেট দোলমা ডেভিল কত রকম কি

ছিল তাঁর ভালই লাগল না। উচ্ছেভাজা, বেগুনভাজা, পটলভাজা থাকলে খেতেন হয়তো। দুধ পর্যন্ত খেতে পাননি প্রথম জীবনে। বাড়িতে গাই ছিল একটা, সের দুই দুধ হত; কিন্তু তাঁব ভাগ্যে এক ফোঁটা জোটেনি। মা আফিং খেতেন, তাঁর জন্য ঘন করে জাল দেওয়া হত খানিকটা, আর বাকিটা জল মিশিয়ে ছোট ছেলেগুলো খেত। তিন চারটে ছোট ছেলে সর্বদাই থাকত সংসারে। তাদের বঞ্চিত করে দুধ খাওয়ার কথা ভাবতেও পারেন নি তিনি। তিনি ভাবতে পারেন নি, কিন্তু শরীর সহ্য করবে কেন? একদিন আফিস থেকে ফেরবার সময় মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। চন্দব ডাক্তার এলেন। বললেন ব্লাড প্রেসার খুব কম, পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া দরকার। মাছ মাংস ডিম দুধের লম্বা ফর্দ দিয়ে গেলেন একটা। মা অবশ্য বলেছিলেন, শরীরের জন্যে যখন দরকার তখন ধার করেও ওসব খেতে হবে। কিন্তু ভুবন সোম জানতেন, মা ধার শোধ করবেন না, করতে হবে তাঁকেই। এমনিই তো জিভ বেরিয়ে পড়েছে। দিন দুই পরে ভুবন সোম ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করে বললেন ডাক্তারবাবু ওসব স্পেশাল খাবার আমি একা সকলেব সামনে বসে খেতে পারব না। সবাইকে খাওয়াবার সামর্থ্যও নেই, আপনি ববং আমাকে কোনও পেটেন্ট টনিক দিন। চন্দর ডাক্তাব সাধারণত বোগীব মন জুগিয়ে চলতেন। কেউ যদি বলত—ডাক্তারবাবু, অম্বল খাব? খেও। ডায়াবিটিস-বোগী পেড়াপেড়ি কবলে চিনি খাবার অনুমতিও পেত তাঁর কাছে। একটি বিষয়ে খুব কড়া ছিলেন কিন্তু। মিথ্যে সার্টিফিকেটটি কখনও লিখতেন না। পাকা গোঁফ পাকা-ভুরু সদাপ্রসন্ন মুখ চন্দব ডাক্তারের চেহারাটা ভেসে উঠল ভুবন সোমের মনে। তিনি কি একটা বিলিতি পেটেন্ট টনিক লিখে দিয়েছিলেন তাঁকে, নাম মনে নেই এখন। শিশিতে পোরা চিকেনস একস্ট্র্যাক্ট, পুরনো পোর্ট আর কডলিভার অয়েলও ব্যবস্থা করেছিলেন। কিনতে গিয়ে জিভ বেবিয়ে পড়েছিল ভুবন সোমের। দ্বিতীয় বার আর কেনেন নি

...উঠে পড়লেন ইজিচেয়ার থেকে। হু-হু করে কনকনে হাওয়া দিচ্ছে একটা। হাত-ব্যাগ থেকে মংকি-ক্যাপটা বার করে পরলেন। বেশ শীত পড়েছে। মংকি-ক্যাপটা পরে আরাম পেলেন। তাঁর বড় পুত্রবধূ এইটি বুনে পাঠিয়েছে তাঁকে সম্প্রতি। মেয়েটি এসব শৌখিন কাজে খুব দড়। কিন্তু বড়ি দিতে পারে না, আচার করতে পারে না, ওসব কিনে খায়। রাঁধা ডাল-ভাতও বাজার থেকে কিনে খেতে পারলে বাঁচে ওরা। কলকাতায় নাকি পাইস হোটেল হয়েছে। 'উঃ, উচ্ছন্নের পথে কি রকম সাঁ-সাঁ করে এগিয়ে যাচ্ছে দেশটা, কি ছিল আর দেখতে দেখতে কি হয়ে গেল!'—আপন মনেই কথা কয়ে উঠলেন ভুবন সোম। তারপর চাইলেন গঙ্গার চরের দিকে। দু পাশেই গঙ্গার চর। অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। কই, পাখী তো দেখা যাচ্ছে না একটাও! অথচ অনিল লিখেছে, ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস এসেছে। কই?

'চেয়ারটা একটু সরিয়ে দেব সার্ ওদিকে? এখানটায় বড্ড হাওয়া।'

ঘাড়ের পাশেই কথা শুনে চমকে উঠলেন ভুবন সোম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, জাহাজের টি. টি সি. কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'দরকার হলে আমি নিজেই সরিয়ে নেব। তোমাকে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি নিজের কাজ কর গে যাও!'

ছোকরাটি অপ্রস্তুত হয়ে চলে যাচ্ছিল।

'শোন।'

ফিরে এল আবার।

'কি নাম তোমার?'

'বিকাশেন্দু গুপ্ত।'

'একটা ভুল ধারণা নিশ্চিহ্ন করে মন থেকে মুছে ফেল তোমরা। খোশামোদ করে আমাকে কখনও খুশী করতে পারবে না। নেভার। আমি ওল্ড স্কুলের লোক, ডিউটি ফার্স্ট সেলফ লাস্ট—এই হচ্ছে আমার মোটো। ভালভাবে ডিউটি কর, খুশী থাকব, কাজে ফাঁকি দিলে কিছুতেই রেহাই পাবে না, সেলাম করে করে ঘাড় বেঁকিয়ে ফেললেও পাবে না। বুঝলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, যাও।'

ছোকরা ঘাড় হেঁট করে চলে গেল। তার দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ ভুবন সোম। হঠাৎ ভাল লেগে গেল ছেলেটিকে, বদ্যির ছেলেগুলো প্রায় ডেঁপো হয়, এ সেরকম নয়। পকেট থেকে নোটবুক বার করে নামটা লিখে নিলেন। যদি সুযোগ পান তুলে দেবেন ছোকরাকে। পাইপে আবার তামাক ভরতে লাগলেন। নিবিষ্ট চিত্তে পাইপটি মনোমত করে ভরে চুপ করে বসে রইলেন মিনিটখানেক। একটা মাছরাঙা পাখী জলের উপর উড়ে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সেটা, পাখা দুটো কাঁপতে লাগল খালি, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, ছোট একটা মাছ মুখে করে উড়ে গেল পরমুহূর্তে! দৃশ্যটা ভারি ভাল লাগল তাঁর। পাইপে টান দিলেন, টান দিয়েই মনে পড়ল, ধরানো হয়নি এখনও। দু-তিনবার চেষ্টা করেও ধরানো গেল না, বড্ড জোর হাওয়া। উঠে কেবিনের ভিতর গেলেন, সেখানে নিপুণভাবে পাইপটি ধরিয়ে ফিরে এলেন আবার। আবার ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। মাছরাঙা পাখীটাকে আর দেখতে পেলেন না। পাইপে টান দিতে দিতে আবার নিজের অতীত জীবনে ফিরে গেলেন তিনি।

.....শুধু বোনদের নিয়ে নয়, ভাই দুটিকে নিয়েও কম ভুগতে হয়নি তাঁকে। দুটির মধ্যে একটিরও পড়াশোনা হয়নি। পড়াশোনা করলেই না। প্রতিটি ক্লাসে এক-আধবার নয়, তিন-চারবার করে ফেল মারতে লাগল দুজনেই। ফোর্থ ক্লাসেই গোঁফ উঠে গেল। ভুবন সোম তবু হাল ছাড়েন নি। কিন্তু স্কুলের হেড মাস্টার মহাদেববাবু ছিলেন কড়া লোক, তিনি দুটোরই নাম কেটে দূর করে দিলেন। ভুবন সোমকে বললেন, ওদের স্কুলে রাখা চলবে না, ছোট ছোট ছেলেদের সিগারেট খাওয়া শেখাচ্ছে। লেখাপড়ার ওইখানেই ইতি হয়ে গেল। মা বলেছিলেন ওদের কলকাতায় বোর্ডিংয়ে রেখে পড়াতে। ভুবন সোমের সামর্থ্যে কুলোয় নি। এ নিয়ে মা কিছুদিন ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান করলেন, তারপর থেমে গেলেন। ভাই দুটি লেখাপড়ায় সুবিধা করতে পারেনি যদিও, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে নাম করেছিল। বিপনে গোঁফ কামিয়ে এমন 'ফিমেল' পার্ট করতে লাগল যে, ধন্য ধন্য পড়ে গেল চারিদিকে। আর খোকনা নাম করেছিল

ফুটবল খেলায়। দিগ্বিজয়ী সেন্টার ফরোয়ার্ড হয়েছিল সে। এক হিসেবে ভালই হয়েছিল বলতে হবে, বি. এ., এম. এ. পাস করে আর কটা ল্যাজ গজাত, গজালেও সেই ল্যাজ গুটিয়ে চাকরিই তো করতে হত শেষ পর্যন্ত। বিপনে খোকনাও চাকরি পেয়েছে, ভাল চাকরি। থিয়েটারের জোরেই ইঞ্জিনিয়ারিং আপিসে চাকরি হয়ে গেল বিপিনের। ওর 'সীতা'র পার্ট দেখে ইঞ্জিনিয়ারিং আপিসের বড়বাবু একেবারে কেঁদে কাদা হয়ে গেলেন। তার পরদিনই ডেকে চাকবি দিলেন ওকে। খোকনারও তাই। খেলার জোর চাকরি। মোহনবাগানের খেলা ছিল একটা বাজে টিমের সঙ্গে। সবাই জানত গোহারান হারবে বাজে টিমটা। কিন্তু জিতে গেল খোকনা থাকাতে। খোকনা তাদের হয়ে সেন্টার ফরোয়ার্ড খেলেছিল। দর্শকদের মধ্যে ছিলেন মেকেঞ্জি লায়ালের বড় সাহেব। খোকনা তাঁর নজরে পড়ে গেল, ফলে চাকরিও হল। ভুবন সোম পাইপ টানতে টানতে ভাবতে লাগলেন, মনে হচ্ছে এই সেদিনের কথা। অথচ....

হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন তিনি। একটা চরে অজস্র চখাচখী বসে রয়েছে। ঝাঁকে ঝাঁকে। লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। এখানে নৌকা করে আসা যায় না? অনিল কি ব্যবসা ক'ছে কে জানে। যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ চখাগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

শিকাব করাটাই এখন তাঁব একমাত্র শখ। শুধু শখ নয়, মুক্তির উপায়। সংসারের ঝামেলা থেকে কিছুক্ষণের জন্যে পালিয়ে আসবার নানা ক্ষেত্র তিনি খুঁজেছেন সারা জীবন। পান নি। ছবি এঁকেছিলেন দিন কতক। এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান গার্ড তাঁকে ওয়াটার-কলারে দীক্ষা দিয়েছিল। খাসা লোক ছিল মিস্টার ব্রাউন। মাঝে মাঝে মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে যেত বটে, কিন্তু মানুষ হিসাবে চমৎকার লোক ছিল। ওর পাল্লায় পড়ে ভুবন সোম দু-এক চুমুক মদও খেয়েছেন মাঝে মাঝে। আপত্তি করলে বলতেন, জলে আর মদে কোন তফাত নেই, কেবল দৃষ্টিভঙ্গীর তফাত। তারপর হা-হা করে হেসে বলতেন, সেই জন্যে দামেরও তফাত, একটার দাম কিছু নয়, আর একটা টেন রুপিজ পার বটল! সেকালে দশ টাকায় এক বোতল ভাল স্কচ হুইস্কি পাওয়া যেত। ব্রাউন তাঁকে ছবি আঁকতে শিখিয়েছিল। ছবি এঁকেছিলেন দিন কতক, এঁকেছিলেন—মানে, আঁকবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হয় নি কিছুই। নিশ্চিন্ত মনে বসতেই দেয় নি কেউ তাঁকে। ছুটি তো মাত্র একটি দিন—রবিবার। আর সেই দিনই যত রাজ্যের ফরমাশ। চাল আনো, ডাল আনো, ধোপা আসছে না—খবর নাও, ছেলেদের জামা করাতে হবে—দরজী ডাকো। বাড়িতে অতগুলো হুমদো ছোঁড়া দু বেলা ভাত মারছে, কেউ কুটোটি নেড়ে সাহায্য করবে না, তারা করতে চাইলেও গিন্নী করতে দেবে না। ওরা নাকি ভাল পারে না। সব ভুবন সোমকে একা করতে হবে। কাজকর্ম সেরে দুপুরের দিকে যেই ছবি আঁকতে বসতেন, অমনি একপাল ছেলেমেয়ে এসে ঘিরে দাঁড়াত, বর্ষাকালে আলো জ্বাললে যেমন গাঁধি-পোকা আসে ঠিক তেমনি। কেউ এটা টানছে, কেউ ওটা ঘাঁটছে, কেউ খুনসুটি করছে, কেউ জলের বাটিটাই উলটে দিলে, একবার রঙের বাক্সটাই ফেলে দিলে তাঁর ভাগ্নেটা। কাউকে কিছু বলবার জো নেই, বললেই তাদের মায়েদের মুখ ভার। একদিন আপিস থেকে ফিরে দেখলেন অর্ধ-সমাপ্ত তাঁর একটা ছবিতে কাদা মাখিয়ে রেখেছে কে। গিন্নী নির্বিকারভাবে বললেন, 'হয় বিলু না হয় নিপুর কাণ্ড। তোমার মত ওদেরও হয়তো ছবি

আঁকবার শখ হয়েছে, বাপকে যা করতে দেখবে তাই তো করবে ওরা, ওদের আর দোষ কি? বিলুটা কাল তোমার মত প্যাঁকাটি ধরিয়ে সিগারেট খাচ্ছিল।' ছেলে দুটোর পা ধরে শানে আছাড় মারবার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর, কিন্তু অনেক ইচ্ছার মত সে ইচ্ছাও দমন করেছিলেন সেদিন, কয়েকদিন পরে বড় তুলিটাই গায়েব হয়ে গেল। গিন্নী বললেন, 'ইঁদুরে নিয়ে গেছে বোধ হয়। তোমাকে কতদিন থেকে বলছি ইঁদুরের একটা ব্যবস্থা কর, তা তুমি কিছুতেই করবে না, তোমার তুলি তো তুচ্ছ, লক্ষ্মীর আসনই কেটে নিয়ে গেছে।' একটা জাঁতিকল কিনে আনলেন, ইঁদুর ধরা পড়ল না, একটা ভাগ্নের আঙুল কেটে গেল। সে নিয়ে তুমুল হৈ-চৈ বাড়িতে। ডাক্তার ওষুধ ইনজেকশন—নগদ পনেরোটি টাকা বেরিয়ে গেল।

এই চলছে সারাটা জীবন। আর একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করেছেন—যাতে তাঁর আনন্দ, বাড়ির মেয়েদের ঠিক তার উপরই আক্রোশ। সোজাসুজি বাধা দিতে পারে না, কারণ বাধা দেবার শক্তি নেই কিন্তু মনে মনে গজরাতে থাকে। তাঁর স্ত্রীর জ্বালাতেই ছবি আঁকা ছাড়তে হল তাঁকে। কারণ ছবি আঁকতে গেলে বাড়িতে এমন একটা পরিবেশ হওয়া দরকার যা ছবি আঁকার পক্ষে অনুকূল। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর জ্বালায় তাঁর বাড়িতে তা হল না, হওয়া যে অসম্ভব ছিল তা নয়, হত না, হতে দিত না। মা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন তাঁর জন্য নানা ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়েছিল ভুবন সোমকে। কিন্তু একটি উপকার করেছিলেন তিনি, ওই দজ্জাল বাঘিনী বউটাকে দাবিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন টুঁ শব্দটি করতে পারে নি। তিনি মারা যাবার পর থেকেই ঘুড়ি লাফ খেতে লাগল।

পাইপ টানতে টানতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন ভুবন সোম। তারপর উঠে পায়চারি করলেন একটু। আবার বসলেন।

হ্যাঁ, ছবি আঁকার শখ বিসর্জন দিতে হয়েছিল তাঁকে। ব্রাউন সাহেব মারা যাওয়াতে উৎসাহের উৎস শুকিয়ে গেল আরও। অদ্ভুত এবং শোচনীয় মৃত্যু হয়েছিল লোকটার। রিটায়ার করবার পর সে মাঝে মাঝে কোথায় বেরিয়ে যেত। পরে জানা গেল, মাঠে বা জঙ্গলে বসে ছবি আঁকে। রেল-লাইনের ধারে বসে ছবি আঁকছিল একদিন। লাইনটা বেঁকে গিয়েছিল সেখানে। এক ছুটন্ত ইঞ্জিন এসে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেল তাকে। ড্রাইভারের দোষ ছিল না, সে দেখতেই পায় নি তাকে যখন পেল তখন আর অত স্পীডে থামবার উপায় ছিল না, তখন ব্রেক কষলে ইঞ্জিনই উলটে যেত। ব্রাউন সূর্যাস্তের ছবি আঁকছিল, তার নিজের রক্তেই ক্যানভাসটা লালে লাল হয়ে গেল।

হ্যাঁ, ছবি আঁকা ছাড়তে হয়েছিল ভুবন সোমকে। কিছুদিন কিছুই করেন নি। কিন্তু ছুটির দিনে কিছু একটা নিয়ে না থাকলে প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে।

অতঃপর তিনি অবসর বিনোদনের যে উপায়টি অবলম্বন করেছিলেন সেটিও শেষ পর্যন্ত ফলপ্রদ হয় নি, কারণ গোড়াতেই গলদ হয়েছিল তাঁর। অবসর বিনোদন মানে অবসর-বিনোদন, ওর সঙ্গে আর কিছু জড়াতে গেলেই সব মাটি হয়ে যায়। অবসর বিনোদনও হবে আর তার সঙ্গে সংসারের উপকারও হবে—এ রকম গোঁজামিলন শেষ পর্যন্ত সুখকর হয় না, টেঁকেও না। ইংরেজিতে লেখা একটা বই একবার হাতে এসে পড়ল তাঁর, তাতে নানা রকম

আচার মোরব্বা জ্যাম জেলি করবার ফরম্যুলা ছিল। হঠাৎ তাই নিয়ে মেতে উঠলেন তিনি। গাঁটের পয়সা খরচ করে এর জন্যে ইংরেজি বাংলা বই কিনলেন, তৈজসপত্র কিনলেন, এমন কি নতুন রকম উনুনও একটা তৈরি করালেন যাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করতে পারেন। ঘুপচি রান্নাঘরে উনুনের কাছে উবু হয়ে বসে রান্না করবার চেয়ে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করা কম কষ্টকর। মেয়েদের জন্যেও তিনি ওই রকম উঁচু উনুন করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ওরা রাজী হয় নি, ঠাট্টা করেছিল তাঁকে। আশ্চর্য এই মেয়ে জাত! যাই হোক, নিজের জন্যে বারান্দায় বেশ চমৎকার একটি উনুন করিয়েছিলেন তিনি। পয়সা থাকলে বিলিতি লোহার 'ওভেন ' কিনতেন, কিন্তু তত পয়সা ছিল না তাঁর। এতেই ধার করতে হয়েছিল। তোড়জোড় করে নূতন পথে পা দিলেন একদিন। আশা করেছিলেন, এক ঢিলে দুটো পাখী মারতে পারবেন—অবসর বিনোদন করে আনন্দলাভও হবে সংসারের উপকারও হবে। তাঁর সহধর্মিণী জীবনে কখনও কোন বিষয়ে সহযোগিতা করেন নি তাঁর সঙ্গে। এ বিষয়েও করলেন না। একটি মন্তব্য করেছিলেন শুধু, কথাগুলো ছোরার মত তাঁর মনে বিঁধে আছে এখনও। তিনি যেদিন পেয়ারার জেলি করবার জন্যে পাকা পেয়ারা কিনে আনলেন, গিন্নী পেয়ারাগুলোর দিকে একনজর চেয়ে বলেছিলেন—'সব কর্মে হয়েছ যশী, বাকি আছে শুধু ভীম একাদশী। ফরসা কাপড় পরা মেছুনী সব। কে যেন বলেছিল, 'যত সব এঁটো-কলাপাতা শিবের মাথায় উড়ে এসে পড়েছে।' ঠিক বলেছিল। গিন্নীর কথায় অবশ্য দমেন নি ভুবন সোম, অধিকতর উৎসাহে লেগে পড়েছিলেন।

প্রতি রবিবারে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই নিয়েই মেতে থাকতেন। বাড়ির ছেলেমেয়েগুলো এই সময় তাঁর সহায়তা করেছিল খুব। তাঁর চেয়েও বেশি মেতে উঠেছিল তারা। এসব কাজে ফাই ফরমাশ খাটবার লোক না থাকলে কাজ এগোয় না। বাড়ির ছেলেমেয়েগুলো হামে-হাল হয়ে থাকত। কাউকে কিছু একটা বললেই হল, অমনি ছুটে চলে যাচ্ছে। কি উৎসাহ তাদের! সে কদিন সত্যিই তারা খুব খেটেছিল। ওরা অমন করে না খাটলে কাজ এগোত না। বাড়ির মেয়েরা তো সাহায্য করতই না, উলটে বাগড়া লাগাবার চেষ্টা করত। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা নিয়ে গিন্নী কোনদিন মাথা ঘামান নি, কে কোন ক্লাশে পড়ে তাও বোধ হয় জানতেন না । তিনি হঠাৎ একদিন বলে বসলেন, 'রবিবারে ছেলেমেয়েগুলো কোথায় পুবনো পড়া পড়বে, হাতের লেখা লিখবে— তা নয়, চরকির মত ঘোরাচ্ছ ওদের! এটা আন, ওটা আন, এটা ধর, ওটা ধর! সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠেছিল ভুবন সোমের, কিন্তু কোন উচ্চবাচ্য করেন নি তিনি। দিনকতক পরে গিন্নীর কথায় আর অঙ্গও জ্বলত না। গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল—আব বা আঁচিলের মত, গ্রাহ্যই করতেন না। কিন্তু সবচেয়ে মুশকিলে পড়লেন তিনি, যখন ওগুলো তৈরী হল। শিশি শিশি জ্যাম জেলি মোরব্বা আচার, টিন টিন বিস্কুট—এত সব খাবে কে? বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো খেলে দিন কতক। বড়গুলো ছুঁলে না। ডেকে জোর করে দিলে খেত অবশ্য, কিন্তু মাথা নীচু করে মুচকি মুচকি হাসত, যেন রসিকতা করা হচ্ছে তাদের সঙ্গে। গিন্নী একদিন বললেন, 'কেন ওই সব অখাদ্যগুলো জোর করে খাওয়াচ্ছ ওদের? অসুখ করবে যে! ভোনাটার পেট

খারাপ হতেই হৈ হৈ পড়ে গেল বাড়িতে, যেন ইতিপূর্বে তার আর কখনও পেট খারাপ হয় নি! জন্মে থেকেই যে ও পেট-রোগা, এটা ভুলে গেল সবাই। খোঁড়া কুণ্ডু ডাক্তারটা তারস্বরে চেঁচাতে লাগল—'ফুড' পয়জনিংয়ের সব সিমটম মিলে যাচ্ছে।' হাড় হারামজাদা ছিল ব্যাটা। বাড়ির সামনে সাইনবোর্ড লাগিয়েছিল—ঘনশ্যাম কুণ্ডু এম. ডি, এফ ডি. এস,। এফ, ডি এস, মানে—ফিমেল ডিজিজ স্পেশালিস্ট! পাছে লোকে বুঝতে না পারে তাই বাংলা হরফেও লিখে দিয়েছিল 'স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ'। গরিব ঘরের জোয়ান জোয়ান মেয়েদের ব্যাটা ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়ে রাখত সামনে, আর বিদুঘুটে বিদঘুটে প্রশ্ন করত তাদের। মুদির দোকান ছিল আদি কুণ্ডুর, তার ছেলে ঘনা, চক্রবর্তীর বাগানে দেওয়াল টপকে পেয়ারা চুরি করতে গিয়ে পড়ে পা-টি ভাঙে। তাতেও চৈতন্য হয় নি। নেংচে নেংচে সারা শহরময় ঘুরে বেড়াত, হেন দুষ্কার্য নেই যা করে নি। সেই ঘনা একদিন সাইনবোর্ড টাঙিয়ে হয়ে গেল ডাক্তার কুণ্ডু, দামামা পিটিয়ে প্র্যাকটিস করতে লাগল তাঁর বাড়িব সামনেই, প্রবীণ চন্দন ডাক্তারকে ঠাট্টা করত আড়ালে। অথচ ওই চন্দন ডাক্তার না থাকলে ও বাঁচতই না। উঃ, এ দেশে কী না হয়! সবই সম্ভব। ভোনাটার জন্যে ভাল ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল তাঁকে। তিনি এসে বললেন, 'না, ফুড পয়জনিং নয়, তবে ওসব আর খেতে দেবেন না ছেলেদের।' ব্যাস, আর যাবে কোথা? যে আলমারিতে ওই জ্যাম-জেলি-আচার-মোবব্বার শিশিগুলো ছিল গিন্নী তাতে তালা মেরে দিলেন একটা, যাতে কেউ সেগুলো দেখতে পর্যন্ত না পায়। তাঁর এক দূর সম্পর্কের বিধবা পিসি ছিলেন, তিনিই কেবল বললেন 'খাসা হয়েছে তোর আমের আচার। ওরা কেউ না খায় আমিই খাব।' কিন্তু আমের আচার মাত্র চার শিশি ছিল, পিসিমাকে দিয়ে দিলেন সেগুলো, কিন্তু বাকি জিনিসগুলো নিয়ে কি করা যায়? শেষটা কেষ্টার শরণাপন্ন হলেন একদিন। তাঁর বন্ধু বিষ্টু মিত্তিরের ছেলে কেষ্টা মণিহারির দোকান করেছিল একটা। তাকে গিয়ে একদিন বললেন, সে যদি ওগুলোর কোনও গতি করে দিতে পারে। কেষ্ট ছেলে ভাল সে বললে, 'জ্যেঠামশাই, আমি জিনিসগুলো দোকানে রেখে দিতে পারি, কিন্তু কেউ নেবে না। ফুডপয়জনিংয়ের একটা গুজব রটে গেছে কিনা।' কোনও একটা দরকারী জিনিসের খবর নিতে যাও কারও কাছে, বলবে—জানি না, কিন্তু ফুডপয়জনিংয়ের খবরটা সবাই জানে। 'আশ্চর্য দেশ! জঘন্য—জঘন্য!'—কথা কয়ে উঠলেন, ভুবন সোম, তারপর পাইপে একটা টান দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পাইপ নিবে গিয়েছিল।

অন্যমনস্ক হয়ে আবার কেবিনের দিকে যাচ্ছিলেন পাইপ ধরাতে, কেবিনের দ্বার পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলেন। মনে হল, এত জোর হাওয়ায় পাইপ ধরাবার চেষ্টা বৃথা, বার বার নিবে যাবে, তামাকই উড়ে যাচ্ছে, তার চেয়ে সিগার ধরাবার চেষ্টা করা যাক। ফিরে এসে ব্যাগ থেকে সিগার বার করলেন। সেটি নিপুণভাবে দাঁত দিয়ে কেটে আবার গেলেন কেবিনের দিকে। সিগার প্রসঙ্গে একটা মজার কথা মনে পড়ল তাঁর। অনেক দিন আগেকার ঘটনা। কথা অবশ্য মজার নয়—দুঃখের, কিন্তু মজাই লেগেছিল তাঁর। সিগার কিনে আনবার জন্যে একবার তিনি তাঁর ভাগ্নে হনুকে একখানা দশ টাকার নোট দিয়েছিলেন। ভাগ্নেটি কিছুক্ষণ

পরে ঘুরে এসে বললে, বাজারে ভিড়ের মধ্যে নোটটা পকেট থেকে কে তুলে নিয়েছে সে বুঝতে পারে নি, তাই ধারে সিগার এনেছে কেষ্টর দোকান থেকে। আজকাল বাজারে পিক পকেটের অভাব নেই, তাই কথাটা খুব বেশি অবিশ্বাস করেন নি ভুবন সোম। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, ওরই পকেট থেকে ওরই ছোট ভাই জাম্বু বার করে ফেললে নোটটা। জামাটি খুলে হনু স্নান করতে গিয়েছিল, সেই অবসরে জাম্বু ওর পকেট সার্চ করে ফেলেছে। সেই সময় ভাগ্যে গিন্নী এসে পড়েছিল তাই বামালসুদ্ধ ধরা পড়ল, তা না হলে নোটটি সম্ভবত ও-ই গাপ করত। জাম্বুর বয়স তখন মাত্র আট, সেই বয়সেই সুযোগ পেলে ও সকলেব পকেট হাঁটকাত। দৌহিত্র দুটি সার্থক নামকরণ করেছিলেন মা—হনুমান আর জাম্বুবান।

ভুবন সোম সিগারটি ধরিয়ে আবার বাগিয়ে বসলেন ইজিচেয়ারে। বিগত জীবনের আচার-মোবব্বার শিশিগুলি আবার ভেসে উঠল তাঁর মানসপটে। বিলিয়ে দিতে হয়েছিল সেগুলোকে। তাও কি কেউ নিতে চায়? বাড়ির কাছাকাছি কেউ নিলে না, তিনি দেনও নি। ও সব খেয়ে যদি কাবও সামান্য কিছু অসুখ হত তা হলে ওই খোঁড়া শালা রটাত যে ফুড পয়জনিং হয়েছে। পাড়ার কাউকে দেন নি, দূরের লোকদের দিয়েছিলেন। তাও খোসামোদ করে দিতে হয়েছিল। যখন টুরে বেরুতেন সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। সঙ্কুচিত মুখে বলতেন, 'নিজে হাতে করেছি, খেয়ে দেখবেন কেমন হয়েছে।' কোনও বাঙালীর মুখ দিয়ে 'ধন্যবাদ' কথাটা বেরোয় নি, প্রশংসাও না। দোষই বরং ধরেছিলেন, কেউ কেউ। মৃগেন ভাদুড়ীকে ভিনিগাবে ভেজানো ম্যাংগো স্লাইস দিয়েছিলেন। তিনি পরে একদিন বললেন, 'খেতে পারলুম না মশাই, পচা আমানির গন্ধ!' সম্ভবত জীবনে ও জিনিস প্রথম খেলেন। গুপ্ত বললে, 'পেয়ারার জেলিটা বড্ড বেশি টক হয়ে গেছে।' চরণ মুকুজ্যে বললে, 'এ কি বিস্কুট মশাই, ঠিক খাপড়ার মত।' জ্যাম খেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল কিন্তু ফোরম্যান মিস্টার স্মিথ। সাহেব কিনা! সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ তো দিয়েইছিল, তারপর লম্বা চিঠিও লিখেছিল একখানা, জ্যাম তৈরী করবার নূতন একটা রেসিপিও পাঠিয়ে দিয়েছিল। আলাদা জাত ওরা, গুণীর সমঝদার, ভদ্রতাজ্ঞান আছে, কোথায় কি করতে হয় জানে, তাই দাবড়ে দুনিয়াটা শাসন করে বেড়াচ্ছে। ওদের সঙ্গে এঁরা গেছেন টক্কর দিতে! কেমন এক চালে মাত করে পাকিস্তানটি ঘাড়ে চড়িয়ে দিয়ে গেল! শুধু পাকিস্তান কেন, হিন্দুস্থানেও কি শান্তি আছে? প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের ঝগড়া। এখন ভোগ কর স্বাধীনতা। মাউন্টব্যাটেন মহাত্মা গান্ধিকে বলেছিল 'মিস্টার গান্ধি, ইওর কংগ্রেস ইজ নাউ উইথ মি।' এ কথার অর্থ যেই একটু ক্ষমতার গন্ধ পেয়েছে অমনি হামলে পড়েছে তোমার ভক্তের দল। গান্ধিকে মেরেই ফেললে। এক হিসেবে অবশ্য ভালই হয়েছে, ইদানীং ওর যে রকম মতিগতি হচ্ছিল তাতে নিদেন পক্ষে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রত্যেকটি লোককে উনি মসজিদে নিয়ে গিয়ে কলমা পড়িয়ে তবে ছাড়তেন। কথাটা ভেবে নিজেরই খারাপ লাগল তাঁর। মনে মনে গান্ধিজিকে ভক্তিই করতেন তিনি। লোকটা যে অসাধারণ রকম অদ্ভুত ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

বহুকাল আগের একটা ঘটনা মনে পড়ল। তখন মিস্টার এম. কে. গান্ধি—মহাত্মা গান্ধি হন নি, ভুবন সোমও এ. টি. এস. হন নি। ভুবন সোম তখন সামান্য কেরানী, থার্ড ক্লাসের পাস পান। বারহারোয়া স্টেশনে একটা থার্ড ক্লাস গাড়িতে চলেছেন, গাড়িতে অসম্ভব ভিড়, তবু নজরে পড়ল প্রকাণ্ড পাগড়ি পরা রোগা একটি লোক এক কোণে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। তাঁর পাশে বসে আছে দাঁড়িওলা এক বুড়ো। কে তো কে, কত রকম চেহারাই তো ট্রেনে দেখা যায়! প্রথমটা গ্রাহ্য করেন নি ভুবন সোম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত করতে হল। বুড়োটা একটু পরে কাশতে কাশতে ঘড় ঘড় করে খানিকটা কফ তুললে এবং সেটা বাইরে না ফেলে হড়াৎ করে ফেললে গাড়িব মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে পাগড়ি পরা লোকটি খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে হিন্দিতে বললেন, এটা অন্যায় করলেন আপনি, মেঝের উপর থুতু ফেলছেন কেন? বাইরে ফেলুন, অতিশয় সঙ্গত প্রতিবাদ। দাড়িওলা বুড়োটি কিন্তু হাড় হারামজাদা। কথার জবাবই দিলে না প্রথমটা। হাঁপাতে লাগল। হাঁপানির ধাক্কাটা সামলে স্বরূপটি প্রকাশ করলে তারপর। চোখ পাকিয়ে বললে, ঠাণ্ডা লেগে তার বুকে সর্দি বসেছে, জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালে আরও ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে, সুতরাং সে গাড়ির মেঝেতেই থুতু ফেলবে। এতে যদি কেউ অসুবিধা বোধ করেন তিনি অন্যত্র যেতে পারেন। গাড়ি কারও বাপের সম্পত্তি নয়। ভুবন সোমের রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। অকারণে পরের ব্যাপারে মাথা গলাতে গেলে মহা মুশকিলে পড়তে হয়—অনেক ধাক্কা খেয়ে এটা পূর্বেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। চুপ করেই রইলেন তিনি। ওই রোগা পাগড়ি-পবা লোকটি কিন্তু যা করলেন তা অদ্ভুত। তিনি খানিকটা খবরের কাগজ ছিঁড়ে নিজের হাতে মেঝে থেকে কফটা তুলে বাইরে ফেলে দিলেন। দাড়িওলা বুড়ো চোখ পাকিয়ে চেয়ে দেখল, কিছু বলল না। তারপর আবার কাশির ধমক এল তার, আবার সে হোয়াক করে মেঝেতেই গয়ের ফেললে। পাগড়ি পরা লোকটি আবার সেটি কাগজে পুঁছে বাইরে ফেলে দিলেন। গাড়িসুদ্ধ লোক বসে বসে নিখরচায় মজা দেখছিল। দূর থেকে মজা দেখাটাই আমাদের জাতীয় স্বভাব—পথে কোথাও সামান্য একটু কিছু হলেই হল, অমনি ভিড় জমে যায়। বুড়োটা তৃতীয় বার কফ ফেললে গাড়ির মেঝেতে। পাগড়ি পরা লোকটি তৃতীয় বার সেটা কাগজে তুলে বাইরে ফেলে দিলেন। বুড়ো এবার চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল পাগড়ি পরা লোকটার দিকে, তারপর হিন্দিতে বললে, 'এ আপনি কি করছেন!' পাগড়ি পরা লোকটি কিছু না বলে মৃদু হাসলেন শুধু—অপূর্ব মিষ্টি হাসিটি —ভুবন সোম অমন মিষ্টি হাসি আর কখনও দেখেন নি। গাড়ির সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল বুড়োর কাশির ধমক আবার কখন আসবে। ঠিক যেন একটা ফুটবল ম্যাচ দেখছিল সবাই। একটু পরেই কাশির চতুর্থ ধমক এল, কিন্তু এবাব বুড়ো আর কফটা গাড়ির মেঝেতে ফেললে না, মুখ বাড়িয়ে বাইরেই ফেললে। হো-হো করে হেসে উঠল গাড়িসুদ্ধ লোক। এর পরই ট্রেন একটা স্টেশনে এসে থামল। দেখা গেল, কয়েকজন ভদ্রলোক ফুলের মালা হাতে নিয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন। পাগড়ি-পড়া পরা লোকটি নামতেই তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া হল। তখন ব্যাপারটা

জানা গেল। ওই পাগড়ি বোগা লোকটি আফ্রিকা ফেরত ব্যারিস্টার, দিগ্বিজয়ী মিস্টাব এম কে, গান্ধি।

....ভুবন সোম সিগারে টান দিতে দিতে চরের দিকে চেয়ে পা নাচাতে লাগলেন।

কত জিনিসই দেখলেন জীবনে, আর জীবনটাও দেখতে দেখতে কেমন কেটে গেল—সকাল সন্ধ্যা রাত্রি কতবার এল আর গেল! মনে হচ্ছে, এই তো সেদিন চাকরিতে ঢুকেছি—। ওটা কি? মাছরাঙা? উঠে দাঁড়ালেন তিনি। না, মাছরাঙা নয়। এ পাখী আগে অনেকবার দেখেছেন, নামটা জানা নেই। হাঁস কি কোন রকম? না, হাঁসের চেহারা নয় ঠিক। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, একটি ভদ্রলোক বাইনাকুলার দিয়ে পাখীটিকে দেখেছেন। এগিয়ে গেলেন সেদিকে ভুবন সোম। ভদ্রলোক চোখ থেকে বাইনাকুলার নাবাতেই চোখাচোখি হল তাঁর সঙ্গে।

'কি পাখী ওটা বলুন তো, নাম জানেন?'

'ইংরেজী নাম টার্ন (tern), ল্যাটিন নাম Sterna aurantia gray, বাংলা নাম ঠিক জানি না। কেউ কেউ গাংচিল বলেন, কিন্তু আমাব মনে হয় ওটা ভুল।'

'ও।'

ভুবন সোম অবিলম্বে সরে এলেন তাঁব কাছ থেকে, এসে আবার চেয়ারে বসলেন। মনে মনে বললেন, একটি বত্ন দেখছি। এখানে এসে আবার বিদ্যে ফলাতে না শুরু করে। আজকাল এই এক নতুন ধবনেব ফড়ে হয়েছে! ও পাখীর ল্যাটিন নাম বলবাব কি দরকার ছিল তোব। কেবল নিজের বিদ্যে জাহির করবার চেষ্টা, আর কিছু নয়।

নানাভাবে ঘা খেয়ে খেয়ে মানুষের সঙ্গই আর ভাল লাগে না তাঁর। আচার মোরব্বা ছেড়ে যখন শিকারে যেতে আবম্ভ করলেন তখন সঙ্গে একজন না একজন বন্ধুকে নিয়ে আসতেন। আজকাল আব আনেন না। তাদের কচকচিব জ্বালায় অস্থিব হয়ে উঠতে হত। যে মুক্তির আশায় ঝামেলা থেকে পালিয়ে আসা, সেইটেই পাওয়া যেত না।

ভূতনাথ নিজের কেরদানিব গল্প করত খালি, ও ছাড়া আর অন্য কথা কইতে জানে না সে। কি করে সে সাহেবকে থ করে দিয়েছিল, বড় সাহেবের মেম কেন তাকে বার বার ডেকে পাঠায়, তাব স্ত্রীর হাতের লেখা মুক্তোর মত বলে তার ছেলেটার হাতের লেখাও ঠিক ছাপার অক্ষরের মত, হেড মাস্টারটা তাকে পার্শিয়ালিটি করে প্রমোশন দেয় নি, কিন্তু তার হাতের লেখা দেখামাত্রই গডসন সাহেব নিজের অফিসে লুফে নিয়ে নিলে তাকে তার জামাই এত বড়লোক যে ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভ না করে কোথাও যায় না—ক্রমাগত এই সব গল্প। থামতে জানে না, বলে চলেছে তো বলেই চলেছে।

ভূতনাথকে বাদ দিয়ে দ্বিজেনকে নিয়ে এলেন একবার। ও যে অমন একটা নরক, তা ধারণা ছিল না তাঁর। আপিসে আড়ালে আবড়ালে এক-আধটা অশ্লীল কথা বলত, কিন্তু মাঠের মাঝখানে ফাঁকায় এসে একেবারে লাগাম ছেড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। এমন কাঁচা খিস্তি ভুবন সোম ইতিপূর্বে শোনেন নি। তাক লেগে গেল তাঁর। ডিপার্টমেন্টাল এগজামিনে তিনবার ফেল করেছে, কিন্তু হ্যাভেলক এলিস, অনঙ্গ রঙ্গ, কামসূত্র সব মুখস্ত। ক্রমাগত

আওড়াতে লাগল সেই সব। এক একটা গল্প বলে, চোখ নাচায় আর হা-হা করে হাসে। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায় নিজেরই, তখন একটু বেঁকে দু হাত দিয়ে পেটটা চেপে ধরে আর বলে 'মাইরি বলছি, এরাই মেরে ফেলবে আমাকে।' একবার হা হা করে এমন হেসে উঠল যে, ঝিলের পাখীগুলো সব ভড়কেই গেল, রেঞ্জের মধ্যে এলই না আর। সুতরাং দ্বিজেনকে বাদ দিতে হল। ও রকম লোককে নিয়ে নির্জন ফাঁকা মাঠে আসা যায় না। অথচ ও মনে করে যে, ও যা বলছে তা উচ্চাঙ্গের গল্প সব।

দ্বিজেনের পর এসে জুটল ছট্টু সেন। সে আবার আর এক চীজ। শিকারের সব বাহাদুরিটা একাই নিতে চায়। পাখী দেখবামাত্র আগে দৌড়ে গিয়ে দড়াম দড়াম করে ফায়ার করতে শুরু করবে, পাখী যদি পড়ে নিজেই গ্রাস করবে সেটা। যদি দুটো পড়ে দুটোই নিজে নেবে, তোমাকে একটাও দেবে না। দাঁত বার করে বলবে, এ দুটিতে আমার কি হবে ভাই! রাবণের গুষ্টি, এক টুকরো করেও কুলুবে না। চল, দেখা যাক আরও যদি পাওয়া যায় কয়েকটা!' কিন্তু আর কি পাওয়া যায় দু-দুবার ফায়ারিংয়ের পর! দুবার ছট্টু সেনকে এনেছিলেন। দুবারই এই কাণ্ড। আর তাকে আনেন নি।

বার কয়েক কার্তিক মুখুজ্জেকে সঙ্গে এনেছিলেন। কিন্তু লোকটা ঘোর অপয়া। যতবার নিয়ে এসেছেন পাখী তো দূরস্থান—পাখীর একটি পালক পর্যন্ত আনতে পারেন নি। একবাব একটা লালশরের পায়ে ছররা লাগল, কিছুদূর গিয়ে পড়ল সেটা, ধরাও গেল। কিন্তু ফিরে এসে যেই অনিলের হাতে দিতে যাবেন অমনি হাত ফসকে সেটাও উড়ে গেল। এ ঘটনার পর থেকে কার্তিককেও আর আনেন না।

কাউকেই আর আনেন না, এমন কি অনিলকেও নয়। অনিল ছেলে ভাল, কোনরকম বদচাল নেই, কিন্তু তার সামনে শিকার করতে ভয় পান ভুবন সোম। মিস্ করলে ভয়ানক চটে যায় ছোকরা। ওর নিজের লক্ষ্য একেবারে অব্যর্থ। ওর বয়স পঁচিশ, আর ভুবন সোমের প্রায় ষাটের কাছাকাছি। কিন্তু ও সেটা বুঝবে না। মিস্ করলেই এমন ভুরু কোঁচকাবে যে, তার মুখের দিকে ঘন্টাখানেক চাওয়া যাবে না। মুখ ফুটে একটি কথা অবশ্য বলবে না, কিন্তু মুখ গোঁজ করে থাকবে। সে আরও অস্বস্তিকর। তাই আজকার একাই যান ভুবন সোম, কাউকে সঙ্গে নেন না। অনিল অবশ্য সব যোগাড় যন্ত্র করে দেয়।

একা একা যাওয়ার বিশেষ আনন্দ আছে একটা। সম্পূর্ণ স্বাধীনতার আনন্দ, যা খুশী যতক্ষণ খুশী করবার আনন্দ। কেউ বাধা দিচ্ছে না, উপদেশ দিচ্ছে না, কানের কাছে বকবক করছে না। আপিসের দায়িত্ব থেকে, পাড়াপড়শীর উৎপাত থেকে, দেঁতো হাসি আর ছেঁদো কথার একঘেয়ে ভণ্ডামি থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি। মাথার উপর আকাশ, পায়ের নীচে মাটি, চতুর্দিকে গাছপালা, বনজঙ্গল, নদীনালা, খালবিল আর পাখী—এদের মধ্যে তুমি যা খুশী কর, যতক্ষণ খুশী থাক, যতবার ইচ্ছে ফায়ার কর। যতগুলো ইচ্ছে পাখী মার, মারতে পার বা না পার কেউ হাসবে না, কেউ ভ্রূকুটি করবে না। পাখী শিকার করতেই তিনি যান বটে, পাখী মারবার চেষ্টাও করেন, কিন্তু পাখী মারাটাই তাঁর উদ্দেশ্য নয়। এখন বয়স হয়েছে, মাংস আর তত ভালও লাগে না। যদিও কখনও কদাচিৎ এক আধটা পাখী মারতে পারেন, অনিলকেই দিয়ে দেন সেটা। কারণ, তাঁর নিজের বাড়িতে খাবার লোক কেউ নেই।

কেউ নেই! সত্যটা রূঢ়ভাবে হঠাৎ এসে আঘাত করল তাঁকে। গিন্নী অনেক দিন আগেই মারা গেছেন। সাবিত্রীব্রতটি উদযাপন করবার বছর খানেক পরেই মারা গেলেন। বাহাদুরি বলতে হবে এটা, কারণ সাবিত্রীব্রত উদযাপন করে সধবা অবস্থায় মারা যেতে বড় একটা দেখা যায় না কাউকে। ভাইরা যে যার জায়গায় চাকরি করছে—একজন কলকাতায়, আর একজন এলাহাবাদে। বিরিঞ্চি জগন্নাথ দুজনেই মারা গেছে। বিরিঞ্চিটা রাক্ষসের মত খেত মাপা আধ সের চালের ভাত, তদুপযুক্ত ডাল এবং তরকারি। ডায়বিটিস হল, অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, শেষে। জগন্নাথ মারা গেল টাইফয়েডে, নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে ইনফেকশনটি নিয়ে এল রামপুরহাট থেকে। ওটাও কম পেটুক ছিল না। বিধবা বোন ছবি এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু সে আছে এখন ছেলেদের কাছে—একজন লিলুয়ায় থাকে আর একজন জামালপুরে। তাঁর খাতিরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বড় সাহেব দুজনকেই রেলে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি অনুরোধ করেন নি। কারও জন্যে কখনও করেন নি, মাথা নোয়ান নি কারও কাছে কখনও। সাহেবরা সেইজন্যেই বেশি খাতির করত। তাঁর বড় ছেলে বিলু এখন বিলেত-ফেরত মস্ত সায়েব, শ্বশুরের খরচে বিলেতে গিয়েছিল। দিল্লীতে থাকে। সাহেব মানে ঘোর স্বার্থপর। আপনি আর কোপনি, নিজের মাগছেলে নিয়েই ব্যস্ত। ছোট ছেলে নিপুটাই কেবল এতদিন তাঁর কাছে ছিল সে কমপিটিটিভ পরীক্ষায় পাস করে রেলে ঢুকেছিল, বেশ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওটাও দাগী হয়ে গেল। প্রথমটা বুঝতে পারেন নি তিনি। একবার এইরকম শিকার থেকে ফিরে গিয়ে ব্যাপারটা জানতে পারলেন। সেবার এক ফায়ারে অনেকগুলো 'টিল' পড়েছিল। প্রায় বিশ-পঁচিশটা। অনেক বিতরণ করেও গোটা পাঁচ ছয় থেকে গেল। বাড়ি নিয়ে এলেন, ভাবলেন নিপুটা রাঁধবে। তাঁর দূর-সম্পর্কের এক বিধবা পিসিমা নিরাশ্রয় হয়ে তাঁর কাছে আছেন, তিনিই আজকাল রাঁধেন-বাড়েন, কিন্তু তিনি মাংস ছুঁতে চান না। ভুবন সোমও জোর করেন না। মাংস হলে নিপুই রাধে। টিলগুলো দেখে পিসিমা বললেন, 'মহা মুশকিল হল দেখছি। নিপুও বোধ হয় ওসব ছোঁবে না আর। সব যোগাড় করে দিচ্ছি, তুমিই না হয় আলাদা স্টোভে চড়িয়ে দাও।' শুনে রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন তিনি, নিপু মাংস ছোঁবে না মানে? হঠাৎ হল কি? পিসিমা বললেন, ' ও জটাবাবার কাছে মন্ত্র নিয়েছে যে। নিরামিষ খাচ্ছে কদিন থেকে। ভোরে উঠে নাক টিপে প্রাণায়াম করে।'

নিপু তখন বাড়িতে ছিল না। নিজেকেই রাঁধতে হল। নিপু বাড়ি এলে জিগ্যেস করলেন তাকে, 'তুমি নিরামিষ খাচ্ছ শুনলাম ব্যাপার কি!' নিপু বললে, 'আমি মন্তর নিয়েছি, গুরুদেব বৃথা মাংস খেতে বারণ করেছেন।' ভুবন সোম তখুনি ছোঁড়া চাকরটাকে বেলপাতা পেড়ে আনতে বললেন। বাড়ির ঠিক পাশেই হেলেপড়া বেলগাছ আছে একটা। তৎক্ষণাৎ বেলপাতা এসে গেল। ভুবন সোম তখন নিপুকে বললেন, 'এই বেলপাতায় মন্তরটি লিখে এখুনি গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে এস। এসে মাংসের ঝোল মেখে ভাত খাও। ও সব বুজরুকি এ বাড়িতে চলবে না।'

নিপু মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর বেরিয়ে গেল। কিছুতেই মাংস ধরাতে পারলেন না তাকে। তারপর বলা নেই কওয়া নেই সরে পড়ল একদিন। খবর

পেলেন আপিসেও যায় নি, আপিস থেকে ছুটিও নেয় নি। পরে জানা গেল, গুরুদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে কাশিতে গেছে। সুতরাং চাকরিটি গেল। নিজের ছেলে বলে এতবড় অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন না তিনি, ছেলে বলে আরও বেশি করেন না। সে নাকি তার গুরুর আশ্রমে গিয়ে বাস করছে আজকাল, সেখানকার ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে মাস্টারি করে। যে তিনবার চেষ্টার পর থার্ড ডিভিশনে আই. এ. পাশ করেছে, সে মাস্টারি করে! ভাগ্যে বিয়ে দেন নি, দিলে বউটার হাড়ির হাল হত।

হঠাৎ আবার মনে হল, এখন বাড়িতে তিনি একা। তিনি আর ওই অথর্ব পিসিমা। যে বাড়ি করবার জন্যে কত হাঙ্গামা, কত মেহনত, কত লোকের কাছে ছুটোছুটি, কত জায়গায় চড়া সুদে টাকা ধার কবা, সেই বাড়ি এখন খাঁ-খাঁ করছে, চামচিকে আর চড়ুই পাখীর আড্ডা হয়েছে। আপন জন কেউ নেই। তিনি চোখ বুজলে মেরামতের অভাবে ইঁটের স্তূপ হয়ে যাবে দুদিন পরে।....

সিগারে মৃদু টান দিতে দিতে পায়ের পাতা নাচাতে লাগলেন ভুবন সোম। না, পাখীর প্রতি লোভ নেই তাঁর। পাখী শিকার করবার জন্যে আসেন না তিনি। ভিড় থেকে হাঁফ ছাড়বার জন্যে পালিয়ে আসেন, বাইরের খোলা-মেলা জায়গায় অন্যমনস্ক হয়ে নিজেকে ভুলে থাকাব জন্যে চলে আসেন মাঝে মাঝে। এবার কিন্তু পাখী মারতে হবে। ওই অনিল আর ছট্টু সেনকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, তিনিও ইচ্ছে করলে পাখী মারতে পারেন। প্রায়ই মারতে পারেন না তা সত্যি, হাত কেঁপে যায় তাও সত্যি, কিন্তু ইচ্ছে করলে নিশ্চয়ই তিনি মারতে পারেন। এবার প্রমাণ করে দিতে হবে সেটা। অনিলটা অবশ্য সঙ্গে যেতে চাইবে, কিন্তু তিনি কাউকে সঙ্গে নেবেন না। যে ভদ্রলোকটি বাইনাকুলার নিয়ে পাখী দেখছিলেন, তিনি মাঝে মাঝে ভুবন সোমের দিকেও চেয়ে দেখছিলেন।

আশ্চর্য লোকটি, নিজের সঙ্গেই কথা কইছেন?!

।। তিন ।।

জাহাজ অবশেষে জেটিতে এসে ভিড়ল। ঘাটে ট্রেন আগেই এসেছিল। যে ঘাট একটু আগে প্রায় জনশূন্য ছিল তা জনাকীর্ণ হয়ে পড়েছে। সমস্ত ভারতবর্ষের লোকই যেন ভিড় করেছে এসে। কত রকমের চেহারা কত রকমের মোট-ঘাট, কত রকমের পোশাক-পরিচ্ছদ, কত রকমের বেয়াদপি, কত রকমের ভদ্রতা! যাত্রীদের চিৎকার, কুলিদের হাঁকাহাঁকি, ফেরিওলাদের বিচিত্র ডাক, ভিখারীদের 'মিলে বাবা এক পয়সা' 'পুলিসের হুমকি'— সরগরম হয়ে উঠেছে জায়গাটা। ঘাটগাড়ির যাত্রীরা আগেই এসেছিল, এবার জাহাজের যাত্রীরা নামতে লাগল! মনে হল, দুটো নদী যেন মিশল দু দিক থেকে এসে । অনিল একটু ফাঁকায় একটা উঁচু জায়গার উপর দাঁড়িয়ে ছিল। জাহাজ থেকে যে জনস্রোত নামছিল তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল সে। ভুবন সোমের সোলার টুপিটা প্রথমে তার নজরে পড়ল, তারপর মুখের সিগারটা। এগিয়ে গেল। সামনাসামনি হতেই ঝুঁকে প্রণাম করল।

'থাক, থাক —'

ভুবন সোম মুখে ও কথা বললেন বটে, কিন্তু মনে মনে খুশী হলেন। আজকালকার অনেক ছেলেমেয়েই হেঁট হয়ে গুরুজনদের প্রণাম করে না। অনেকে 'কুড়ুলে পেন্নাম' করে। কেউ কেউ বিহারীদের নকল করে 'নমস্তে' বলতে শিখেছে, কেউ কেউ আবার 'জয় হিন্দ'। 'রাম রাম' শোনেন নি এখনও কারও মুখে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করাটা অপমানজনক মনে করেন ওঁরা। বন্ধুর ছেলে বিজয়া-দশমীর দিন বাড়িতে এল, মিষ্টিগুলি গপ গপ করে খেলে, কিন্তু প্রণাম করলে না, এও দেখেছেন ভুবন সোম। আনিল ও-দলের নয়। ভাল বংশ যে। বংশের মহিমা যাবে কোথা?

'হাতে ওটা কি?'

অনিলের হাতে একটা কাগজের ঠোঙায় কি যেন ছিল।

'কলাইয়ের ডাল। আপনার জন্যে কিনলুম। এখানে হরবনসের দোকানের ডালটা খুব ভাল।'

'হিং আছে বাড়িতে?'

'আছে।'

'হিংয়ের ফোড়ন দিতে বলিস। বউমা ভাল আছে তো?'

'ভাল আছে। তবে ওরা এখানে কেউ নেই, বাপের বাড়ি গেছে।'

'ও। রান্নবান্না করছে কে?'

'ঠাকুর আছে।'

'মৈথিলি? তবেই সেরেছে! রাঁধে কেমন?'

'ভালই রাঁধে।'

'চল ওঠা যাক। কুলিটা কোথায় গেল—এই, ইধার লে আও—'

ট্রেনের অভিমুখে অগ্রসর হলেন তিনি। অনিল পিছু পিছু চলল। একটি সেকেন্ড ক্লাস কামরা খালি ছিল, তাতেই গিয়ে চড়লেন। জানালার ধারে একটি সীটে বাগিয়ে বসে সিগারটি ধরালেন। তারপর অনিলের দিকে চেয়ে বললেন, 'এবার ভাল বিলিতি টোটা এনেছি।' তারপর হেসে বললেন, 'গেল বারের কথা মনে আছে তোর? ছি ছি কি দুর্বুদ্ধিই হয়েছিল? ও-সব কি আমাদের কম্মো! ছাগল দিয়ে যব মাড়ানো গেলে কেউ আর গরু কিনত না। মাঝ থেকে কিছু পয়সা জলে দিয়েছিলাম কেবল।'

অনিলের মুখও হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। গত বছর ভুবন সোম নিজেই বাড়িতে টোটা তৈরি করেছিলেন। বাইরে থেকে দেখতে মন্দ হয় নি। ফায়ার করবার পর আওয়াজও হয়েছিল, কিন্তু ছররাগুলো বেশিদূর গেল না। কয়েক হাত গিয়েই মাটিতে ঝর ঝর করে পড়ে গেল। একটি ছররা কোন পাখীকে স্পর্শ পর্যন্ত করে নি, শব্দ শুনে পালিয়ে গেল তারা। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে পাখীর খুব কাছে যাবার চেষ্টাও করেছিলেন, তবু লাগল না। একটি পাখীও মারতে পারেন নি গেল বার।

'এবার কি ব্যবস্থা হয়েছে? পাখী এসেছে?'

'গঙ্গার চরে খুব এসেছে।'

'সেখানে যাব কি করে?'

'একটা মোষের গাড়ি ব্যবস্থা করেছি। আমারই গাড়ি। সেই গাড়ি করে ভোরে কিষণপুর যেতে হবে। সেখানে থেকে হাঁটাপথে যেতে হবে আরও কিছুদূর, তারপর গঙ্গার চর পাওয়া যাবে। সেই চরে অনেক পাখী বসছে আজকাল। চখা, গীজ, টিল, পিনটেল, সব রকম আছে। আমি গিয়েছিলাম একদিন। বলেন তো আপনার সঙ্গেও যেতে পারি।'

'না, আমি একলাই যাব।'

অনিল এইটেই প্রত্যাশা করছিল। এ প্রসঙ্গে হয়তো আর একটু আলোচনা হত, কিন্তু সখীচাঁদ যাদব একটা নূতন গড়গড়া নিয়ে হাজির হওয়াতে তা আর হল না। সখীচাঁদ ভুবন সোমকে ঝুঁকে একটা নমস্কার করে অনিলকে বললে, 'এখানে হুঁকো পাওয়া গেল না। আমাদের রাধানাথ বাবু এই গড়গড়াটি কাল আনিয়েছেন, এখনও ব্যবহার করা হয় নি। এইটেই নিয়ে যান।'

'বেশ।'

গড়গড়াটি গাড়িব কোণে রেখে ভুবন সোমকে আর একবার ঝুঁকে নমস্কার করে ভিজে বেড়ালের মত মুখ করে সখীচাঁদ গাড়ি থেকে নেবে গেল। যাবার আগে একটা আধুলিও দিয়ে গেল অনিলের হাতে। হুঁকো কেনবার জন্যে এটা সে সখীচাঁদকে দিয়েছিল একটু আগে। সখীচাঁদকে দেখে ভুবন সোমের মনে পড়ল, তার নামে যে রিপোর্ট করেছিলেন সেটা এখনও পাঠানো হয় নি। ফিরে গিয়েই পাঠাতে হবে। যত বয়স হচ্ছে স্মৃতিশক্তি ততই কমে আসছে।

গড়গড়াটার দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলেন, 'গড়গড়া কার জন্যে?'

'আপনার জন্যে। আপনার জন্যে কাটিহার থেকে যে হুঁকোটি আনিয়েছিলাম সেটা ভেঙে গেছে। এখানে সখীচাঁদবাবুকে একট হুঁকো কেনবার জন্যে পয়সা দিয়েছিলাম, কিন্তু এখানেও পাওয়া গেল না।'

' ও গড়গড়া তুমি ফেরত দিয়ে এস। ওতে আমি তামাক খাব না।'

'খাওয়াদাওয়ার পর তামাক না খেলে আপনার কষ্ট হবে না? ভাল তামাক আনিয়ে রেখেছি।'

'কিছু কষ্ট হবে না। ও-গড়গড়া তুমি ফেরত দিয়ে এস।'

অগত্যা গড়গড়া নিয়ে অনিলকে আবার নাবতে হল।

প্রায় ঘন্টাখানেক পরে ভুবন সোম অনিলের বাড়িতে এসে পৌঁছলেন। স্নানাহার সারতে দুপুর গড়িয়ে গেল। মৈথিল ঠাকুরের রান্না খেয়ে খুব খুশী হলেন তিনি। বললেন, ' এ যে মেয়েদেরও কান কেটেছে রে! এ রকমটা তো প্রায় দেখা যায় না। যত্ন করিস ব্যাটাকে।' ভুবন সোম যার উপর খুশী হতেন তাকে 'ব্যাটা' বলতেন, আর যার উপর চটতেন তাকে বলতেন 'বেটাচ্ছেলে'।

অনিল তামাকের সব ব্যবস্থাই করে রেখেছিল। ভাল অম্বুরী তামাক, টিকে, কলকে—সব। হুঁকোটাই ছিল না শুধু।

ভুবন সোম বললেন, 'এক কাজ কর। তোদের তো অনেক কলাগাছ রয়েছে। মোটা দেখে ডাঁটা কেটে আন। আমি হুঁকো বানিয়ে নিচ্ছি।'

তাই হল। পশ্চিমের বারান্দায় বসে তামাক খেতে খেতে ভুবন সোম আপন মনেই বলে উঠলেন, 'এমন দিনও গেছে, যখন দু হাত দিয়ে কলকে ধরে তামাক খেয়েছি উনি আবার আমাকে গড়গড়া দেখাতে এসেছেন!' অনিল ঘরের ভিতর তাঁর শোবার জন্য বিছানা করছিল, শুনে মুচকি হাসলে একটু। একা একা আপন মনে কথা কওয়া ভুবন সোমের অনেক দিনের অভ্যাস। ঠিক মনে হয়, যেন কারও সঙ্গে কথা কইছেন।

অনিল বেরিয়ে এসে বললে, 'কাকাবাবু, বিছানা হয়ে গেছে। এবার আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন।'

'ঘুম হবে না। দিনে ঘুমনো অভ্যাস নেই, আপিস করতে হয়, আর ছুটির দিনে হয় শিকার না হয় মাছ ধরা। তবু একটু শোব।'

একটি ইংরেজি উপন্যাস নিয়ে শুলেন ভুবন সোম। শোওয়ার সময় উপন্যাস পড়া বহুকালের নেশা। আসবার সময় উপন্যাসটি হুইলার থেকে কিনে এনেছিলেন। প্রথম পাতাটি পড়েই ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন তিনি। প্রথম পাতাতেই দু-দুটো খুন। মেয়ে আর তার মাসী, দুজনকেই গুলি করেছে। রিভলভারও একটি নয়, তিনটি। তিনটি রিভলভারই ঘরের মধ্যে পাওয়া গেছে। জমজমাট ব্যাপার। ভ্রূ কুঞ্চিত করেই পাতা কয়েক পড়ে গেলেন তিনি, তারপর সশব্দে বইটা বন্ধ করে দিলেন। অতি বাজে গল্প। ঘুমও হল না। সামনের দেওয়ালে অনিলের বাবাব ছবি টাঙানো ছিল একটা। ছবিটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, 'মরে বেঁচেছ দাদা। বেঁচে থাকলে অনেক দুর্গতি হত। পুণ্যবান লোক তাই ড্যাংডেঙিয়ে চলে গেছ, আমাদের অদৃষ্টে কি আছে ভগবানই জানেন।'

উঠে পড়লেন তিনি। বিছানা থেকে নেবে কপাটটা খুলে পাশের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলেন। অনিলকে দেখা গেল না। কিন্তু সিগারেটের গন্ধ পাওয়া গেল। ভুবন সোমের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল একটা। ছোকরা সিগারেট ধরেছে তাহলে! আড়ালে খাচ্ছে, তবু ভাল। খুশী হলেন তিনি। ছেলেটা সত্যিই ভাল, অমন বাপের ছেলে ভাল হবেই তো, আজকালকার হতভাগা ছোঁড়া হলে নাকের উপরই ধোঁয়া ছেড়ে দিত। ভুবন সোম জুতোটি পরে কামিজটি গায়ে দিয়ে সন্তর্পণে নেবে গেলেন। গেলেন সেই জমিটা দেখবার জন্য। অনিলদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে যে জমিটা আছে, সেখানে ভুবন সোম একদিন বাড়ি করবেন ঠিক করেছিলেন। তাঁর পৈতৃক বাড়িটা যখন ধারে বিক্রি হয়ে গেল তখন তাঁকে সপরিবারে পথে দাঁড়াতে হত যদি অনিলের বাবা তাঁদের আশ্রয় না দিতেন। সদাশয় লোক ছিলেন অনিলের বাবা। তিনিই যোগাড়যন্ত্র করে ওই জমিটা নামমাত্র খাজনা আর সেলামিতে বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন জমিদারের কাছ থেকে। বলেছিলেন, 'এইখানেই আপাতত ঘর বাঁধ তোমরা, পরে পয়সা হলে শহরে জমি কিনো। ঘরের ভিত পর্যন্ত খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মায়ের জেদাজেদিতে

শেষ পর্যন্ত বাড়ি আর হয় নি এখানে। চড়া সুদে টাকা ধার করে ওই শহরেই জমি কিনে বাড়ি করতে হয়েছিল ভুবন সোমকে। এই জমিটা কিন্তু এখনও আকর্ষণ করে থাকে। অতীতের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওর সঙ্গে। তখন বুচকুন চাকরটা বেঁচেছিল, দুলাল বেঁচেছিল, টুনি ছিল, টগর ছিল.... তাই যখনই এখানে আসেন জমিটাকে একবার দেখে যান। এবার কিন্তু জমির ভিতর ঢুকতে পারলেন না তিনি। জমিটাকে ঘিরে রাংচিতার বেড়া দেওয়া রয়েছে। কেউ কিনেছে বোধ হয়! গত বছর পর্যন্ত এমনি পড়েই ছিল। বেড়ার ধারেই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন ভুবন সোম। দেখলেন, জমির মাঝখানে যেখানে তিনি বৈঠকখানা করবেন ভেবেছিলেন—একটা খড়ের আটচালা রয়েছে। তার ভিতর ঢেঁকিতে সুরকি কুটছে দুজন মজুরনী। ভুবন সোমকে দেখে মাথার কাপড় টেনে দিলে একজন, আর একজন মুচকি হাসল। ' আ মোলো।'—বলে ভুবন সোম সেখান থেকে সরে গেলেন। ফিরে এসেই দেখা হল অনিলের সঙ্গে।

'কোথা গিয়েছিলেন আপনি কাকাবাবু? কফি তৈরী।'

'কফি? কফি খাচ্ছ নাকি আজকাল?'

'না, আপনার জন্যে আনিয়েছি। কাটিহার থেকে আনিয়েছি। এখানে ভাল চা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। আমি জানি আপনি বিকেলে কফি খান।'

ভুবন সোম স্থিরদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন অনিলের মুখের দিকে। তারপর বললেন, 'আনিয়েছ যখন খাব কফি। কিন্তু কাজটি অন্যায় করেছ।'

'অন্যায় কেন?'

'আমাকে পর করে দিয়েছ। আমি তোমাদের ঘরের লোক, ঘরে যা থাকবে তাই খেয়ে আনন্দ করব। আমার জন্যে আলাদা কিছু বন্দোবস্ত করেছ মানেই আমাকে পর মনে করছ।'

'না, না, এ কথা বলছেন কেন? বাবার জন্যেও তো কত কিছু আনাতে হত। দিনাজপুর থেকে কাটারিভোগ চাল, কলকাতা থেকে গাওয়া ঘি, ভাজা মুগের ডাল, গয়ার তামাক—আপনি নিজেই এনে দিয়েছেন কতবার—'

'আমার কথাটা ঠিক ধরতে পারলে না তুমি। যাক, চল, কতক্ষণ কফি ভিজিয়েছ?'

'মিনিট দুই তিন হবে।'

'আর একটু ভিজুক।'

দুজনে ভিতরে গেলেন।

কফিপর্ব শেষ হল যথাকালে। একটু পরেই মৈথিল ঠাকুরটি একটি বড় 'টাইমপিস' ঘড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকল।

অনিল সেটি তার হাত থেকে নিয়ে বললে, 'ঠিক আছে তো? সেবার খারাপ করে দিয়েছিল!'

'বললেন তো ঠিক চলছে।'

ভুবন সোম জিগ্যেস করলেন, 'ব্যাপার কি, কার ঘড়ি?'

ঘড়ি আমারই। পোস্টমাস্টারবাবুর ছেলেটির সামনে পরীক্ষা, তাই চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল। রোজ এলার্ম দিয়ে ভোরবেলা উঠে পড়ে। আজ আমাদেরই উঠতে হবে তাই আনিয়ে রাখলাম।'

ভুবন সোম মন্তব্য করলেন, 'চাওয়ার জ্বালায় অস্থির। ভাগ্যে আমাদের চোখ-কান হাত পাগুলো শরীর থেকে খোলা যায় না, গেলে তাও চেয়ে নিয়ে যেত। চেয়ে চেয়ে আমার গ্রামোফোনটার দফা তো নিকেশ করে দিয়েছে। রেকর্ডগুলো তো একটিও গোটা নেই, সেদিন দেখি স্প্রিংটাও ভেঙে দিয়েছে, আর ঘুরছে না। আপদ গেল, নিশ্চিন্ত হয়েছি। তুমি ঘড়িটা বাজিয়ে দেখে নাও। কিচ্ছু বলা যায় না, হয়তো কার্যকালে বাজবে না। কটার সময় উঠতে হবে?'

'দুটোর সময়। চা টা খেয়ে বেরুতে তিনটে বাজবে। সেখানে ভোরের আগে পৌঁছনো দরকার। গাড়ির গাড়োয়ানকেও আজ রাত্রে এখানে শুতে বলেছি।'

ভাল করেছ। গাড়ি এখানে আছে তো?'

'গাড়ি তো আমার নিজেরই। মোষ দুটো এবার নতুন কিনেছি।'

'আগে তো তোমাদের গরুর গাড়ি ছিল, মোষ কিনতে গেলে কেন? মোষ জানোয়ারটা সুবিধের নয়। যমের বাহন—'

'বর্ষাকালে মোষের গাড়ি ছাড়া চলে না। এখানকার রাস্তা যা খারাপ, বর্ষাকালে গরুতে টানতে পারে না। এখানকার রাস্তাঘাট ভাল হয়ে যাবে শুনছি,— মোটরেবল রোড হবে নাকি— সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টাকা দিচ্ছে— '

'আমি শুনেছি। কিন্তু বিশ্বাস করি না যে হবে। এদের জনকয়েক হচ্ছে ভাল অভিনেতা স্টেজে ভাল বক্তৃতা দেয়, মনে হয় যেন আকাশের চাঁদ পেড়ে কিষাণদের পিলসুজটিতে বসিয়ে দেবে, আর বাকিগুলো চোর—ছিঁচকে চোর। টাকা হয়তো খরচ হবে, কিন্তু সেটা পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খেয়ে ফেলবে। ভাল রাস্তা হবে না। সে আশা করো না।'

ভুবন সোম ইজিচেয়ারটাতে অঙ্গ প্রসারিত করলেন, তারপর সিগার ধরালেন। কয়েক মুহূর্ত নীরবে ধূমপান করে বললেন, 'রাত্রে সকাল সকাল খেয়ে শোব। লাইট খাবারের ব্যবস্থা করো।'

'আপনার জন্যে সরু চাকলির ব্যবস্থা করেছি। তাই তো আপনি খান?'

'মৈথিল ঠাকুর সরু চাকলি করতে পারবে?'

'ও সব পারে। আপনার সঙ্গেও কিছু খাবার দিয়ে দেব।'

'দিও। ওই চরে খিদে পেলে বিপদে পড়ে যাব। ওখানে তো বালি ছাড়া আর কিছু নেই।'

'একটু দূরে গ্রাম আছে। দুধ পাবেন—'

'রাম বল। দুধ খাবে কে। দুধ হজমই হয় না— '

।। চার ।।

দুর্গানাম স্মরণ করে ঠিক ভোর তিনটের সময় মহিষ বাহিত শকটে আরোহণ করলেন ভুবন সোম। গাড়িতে মোটা করে বিছানা করা ছিল, কম্বল তো ছিলই, লেপও দিয়ে দিয়েছিল অনিল।

'আপনি লেপ ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ুন কাকাবাবু। সকাল হতে হতে পৌঁছে যাবেন। বলেন তো আমিও যাই সঙ্গে। জায়গাটা আপনার অচেনা তো, এর আগে কখনও যান নি।'

'না না, তোমাকে যেতে হবে না। তুমি আর ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থেকো না, শুয়ে পড়গে যাও।'

গাড়ি চলতে শুরু করল। কিছুদূর যাবার পর ভুবন সোম অনুভব করলেন, মহিষ দুটি যদি এই রকম বেগে দৌড়য় তা হলে ঘুম তো হবেই না, শরীরের হাড়গুলি আস্ত থাকবে কি না সন্দেহ।

'তোমার নাম কি বাবা?'

'ভুট্টা।'

'একটু আস্তে চালাও।'

'জী হুজুর।'

গাড়ি কিছুক্ষণ আস্তে চলল। লেপটি মুড়ি দিয়ে ভাল করে শুলেন ভুবন সোম।

ছপপর দেওয়া গাড়ি, বিছানাটিও বেশ মোটা আর নরম, আরামেই চোখ বুজলেন তিনি। সামান্য একটু তন্দ্রাও এসেছিল, কিন্তু ভেঙে গেল। মোষ দুটো আবার ছুটছে। তিনি কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে উঠে বাইরে মুখ বাড়ালেন। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে এক ফালি। সেই ম্লান জ্যোৎস্নায় যা তিনি দেখলেন তাতে শিউরে উঠলেন। ভুট্টা যা করছে তাতে মোষ কেন হাতীও ছুটবে। সে মোষ দুটির পিছনের পায়ের ফাঁক দিয়ে নিজের পা ঢুকিয়ে দিয়ে কাতুকুতু দিচ্ছে মোষ দুটোকে। কি সর্বনাশ, এ তো মেরে ফেলবে দেখছি। এই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিঙওলা মোষকে কাতুকুতু দিলে ক্ষেপে গিয়ে ওরা কি না করতে পারে।

'বাবা ভুট্টা।'

'জী হুজুর।'

'তুমি চাপটালি খেয়ে বস। পা ঝুলিও না।'

ভুট্টা একটু অবাক হয়ে ফিরে চাইল তাঁর দিকে। ঠিক বুঝতে পারল না, বাবু কি করতে বলছেন।

' কি হুজুর? কি কৈলে কহিছ?'

ভুবন সোম তার মুখের বিস্ময় ভাবটা দেখতে পেলেন না। তখনও বেশ অন্ধকার ছিল, কিন্তু এটা তিনি বুঝলেন যে চাপটালি কথাটি ওর বোধগম্য হয় নি। ও কথার হিন্দি প্রতিশব্দ তাঁরও জানা ছিল না। তিনি হিন্দি ভাল জানেন না, জানবার চেষ্টাও করেনি কখনও। বিহারীদের সঙ্গে তিনি হয় বাংলায় না হয় ইংরিজিতে কথা বলেন। যারা বাংলা ইংরেজি কিছুই বোঝে না, তাদের কাছে ভাঙা ভুল হিন্দি বলেই কাজ চালিয়ে নেন। চাপটালির হিন্দি প্রতিশব্দ না জানার দরুন যে এমন বিপদে পড়বেন তা ভাবেন নি ইতিপূর্বে। মোষ দুটো আবার খুব জোরে ছুটতে লাগল ছপপ্পরে তাঁর মাথা ঠুকে গেল। এ কি এক উন্মাদ লোকের হাতে ছেড়ে দিলে তাকে অনিল! মোষ দুটোকে ক্রমাগত কাতুকুতু দিয়ে যাচ্ছে! এই অন্ধকারে খানায় খন্দে না ফেলে দেয়। বুড়োবয়সে হাড় ভাঙলে আর জুড়বে না। চাটুজ্যে বুড়োবয়সে পায়ের হাড় ভেঙেই মল। গ্যাংগ্রিন হল শেষটা। তিনি হিন্দিতেই অবশেষে বললেন, ভুট্টু, পয়ের ঝুলায়কে নেই বৈঠো।

'তব হাঁকবে কৈসে বাবু?'

'মহিষ কো কাতুকুতু নেই দেও।'

'কুতু? কতু কোন চিজ ছে?'

কাতুকুতুর হিন্দিও ভুবন সোমের জানা নেই মহা মুশকিল।

'এতনা জোর সে নেই হাঁকাও।'

বহুৎ দূর যাইলে পড়তে যে। বাবু কহি দেলকে, আঁধার রহতে রহতে পৌঁছা দে।'

'না বাবা, তুমি আস্তে চল।'

'তব কিরিণ উগি যাইতে, চিড়িয়া নেহি মিলতে।'

ভাবার্থটা বুঝতে পারলেন ভুবন সোম- সূর্য উঠে যাবে, পাখী পাওয়া যাবে না।

'না মিলুক, তুমি আস্তেই চল একটু।'

ভুট্টা কিন্তু কর্ণপাতই করলে না তাঁর কথায়। পর মুহূর্তেই একটা মোষের পিঠে দমাস করে এক ঘা লাঠি বসিয়ে বলে উঠল 'বাবু হেনো বুলৈছে, শালা বোচা।'

এর প্রত্যেকটি কথা বুঝতে পারলেন ভুবন সোম। বাবুর মতে হাঁটছেন, শালা কুমীর। একটু কৌতুক অনুভব করলেন তিনি। যে আইন অনুসারে মানুষকে বাঁদর বললে গালাগালি দেওয়া হয়, ভুট্টা সেই আইনই অনুসরণ করেছে, বেআইনী কিছু করে নি। কিন্তু এরকম গালাগালি এই প্রথম শুনলেন তিনি।

একটু আস্তে আস্তে চালা বাবা। বেঘোরে প্রাণটা না যায়।'

'তো শুতি রহনি বেজাই ওড়িকে। কুছ ডর নেহি ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে একটি মোষের ল্যাজ মুচড়ে তালু ও জিহ্বার সহযোগে টক টক শব্দ করতে লাগল সে। ভুবন সোম অনুভব করলেন, মানা করে একে নিরস্ত করা যাবে না প্রথমত ভাষায় কুলুচ্ছে না, দ্বিতীয়ত অনিলের আদেশ--তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিতে হবে। সে আদেশ ও অমান্য করবে না। কিন্তু এই ভাবে গাড়ি চললে তো তাঁর শরীরের সব কব্জাগুলোই ঢিলে হয়ে যাবে, বন্দুকই ধরতে পারবেন না। তখনও তিনি এক কৌশল অবলম্বন করবেন ভাবলেন। গল্প করে ওকে যদি একটু অন্যমনস্ক করে দেওয়া যায় তা হলে হয়তো ফল হতে পারে। মহিষ দুটোর দিকে ও যদি একাগ্র হয়ে থাকে তা হলে আজ আর নিস্তার নেই। কিন্তু কি গল্প করবেন ওর সঙ্গে। ও পলিটিক্স বোঝে না, পরচর্চাও করা যাবে না ওর সঙ্গে , রেলওয়ে অ্যাডমিনস্ট্রেশন বা বিলিতি নভেলের মর্মও ওর অজ্ঞাত। চাষবাস সম্বন্ধে কিছু বললে হয়তো ও আলাপ করতে পারে, কিন্তু সে সম্বন্ধে নিজেই তিনি কিছু জানেন না। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ শুরু করলেন তাই।

'ভুট্টা, তোমার নামটি তো চমৎকার। কে রেখেছিল এ নাম?'

'মৌসি।'

'মাসী? বাঃ।'

তখন ভুট্টা নিজের জন্মকাহিনী বলতে লাগল। শুনে ভুবন সোমের মনে হল, এ তো দ্বিতীয় বুদ্ধদেব দেখছি। ভুট্টার জন্ম নাকি ভুট্টাক্ষেতেই হয়েছিল ওর আসন্নপ্রসবা মা তখন

ভুট্টা কাটছিল। ভুট্টাকে প্রসব করেই সেই ক্ষেতেই মৃত্যু হয় ওর মায়ের। ওর মাসী তখন ওকে 'গোদ' নেয়, অর্থাৎ পোষ্যপুত্র হিসাবে মানুষ করতে থাকে। তারপর ওর 'মৌসা' অর্থাৎ মেসো যখন মারা গেল তখন ভুট্টার বাবা তার বিধবা শালীকেই বিয়ে করে ফেলল। ভুট্টাক্ষেত অবশ্য লুম্বিনী উদ্যান নয়, কিন্তু মিল আছে অনেক। ভুবন সোম যা আশা করেছিলেন তা হল, গল্প করতে করতে ভুট্টা মহিষ দুটির প্রতি আর মন দিতে পারল না তত। গাড়ির গতি বেশ মন্থর হয়ে এল। কিন্তু গল্প শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে দ্বিগুণ উৎসাহে ঠেঙাতে শুরু করলে মোষ দুটোকে আর নাক দিয়ে এক রকম 'খাঁ' খাঁ শব্দ করতে লাগল। ল্যাজও মোচড়াতে লাগল, আবার মোষের পেটের তলায় পাও চলে গেল ফের। অন্যমনস্কতা-জনিত গাফিলতিটা সে যেন সুদসুদ্ধ সংশোধন করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়ল। মরি-বাঁচি করে ছুটতে লাগল মোষ দুটো।

'আস্তে—আস্তে—একটু আস্তে বাবা।'

ভুট্টা হাসিমুখে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলে তাঁর দিকে, ভীত শিশুর দিকে বয়স্করা যেমন ভাবে চায়. একটু একটু আলো ফুটছিল। তার মুখটা তিনি দেখতে পেলেন এবাব। ব্যাটা হাসছে! বাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল তাঁর। কিন্তু এখন ক্রোধ প্রকাশ করলে চলবে না, কৌশল অবলম্বন কবতে হবে।

আবার প্রশ্ন কবলেন তাকে, ' কি খেতে ভালবাস তুমি ভুট্টু?'

'জী?'

'কোন খানা তুমরা পসিন হ্যায়।'

'বুটরো সাততু।'

'বুটের ছাতু? হামার ভি পসিন হ্যায়।'

ভুট্টা ঘাড় ফিবিয়ে হাসল।

'গুড় দেকে না, তেল মিরচাইন দেকে?'

'যো কুছ হোয় সবহি আচ্ছা।'

'ভাত ভালবাসতা হ্যায়, না, রোটি?'

'রোটি।'

'আর তরকাবি?'

'করেলা।'

উচ্ছে দিয়ে রুটি খেতে কেমন লাগে! আশ্চর্য রুচি তো।

'আলু পরবল?'

'হ্যাঁ, উসব ভি কুছ কুছ। মগর করেলারো ছোকা পেঁয়াজরো সাথ, বড়ি আচ্ছা ছে।

গাড়ির গতি বেশ মন্থর হয়ে এল। ভুবন সোম স্থির করলেন, খাদ্য প্রসঙ্গই, এখন চালিয়ে যেতে হবে কিছুক্ষণ। একটু ভাবতে চেষ্টা করলেন পেঁয়াজের সঙ্গে উচ্ছে ভেজে রুটি দিয়ে খেতে কেমন লাগবে! তাঁর তো বমি হয়ে যাবে। অথচ ওই হল ওর প্রিয় খাদ্য। ভূত কি আর গাছে ফলে! কিন্তু ঠিক এইসময়ে যা ঘটল তাতে খাদ্য-প্রসঙ্গ হারিয়ে গেল। একসঙ্গে

সমস্ত পাখীগুলো ডেকে উঠল। ভুবন সোম হকচকিয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত কোন কথাই বললেন না, বলতে পারলেন না। ভোরে পাখীরা ডাকে, চিরকাল ডেকেছে, এই অতি প্রত্যাশিত ব্যাপারটাই এত অপরূপ মনে হল তাঁর কাছে যে, তিনি নির্বাক হয়ে গেলেন। উঠে বসলেন এবং স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে।

মহিষগুলোও আর ছুটছিল না, ভাল বাস্তা পেয়ে স্বাভাবিক গতিতেই চলছিল, মনে হচ্ছিল তারাও যেন উপভোগ কবছে ব্যাপারটা। ভুবন সোম দেখলেন, পূর্বাকাশ অরুণরাগরঞ্জিত হয়েছে। শহুরে-মানুষ ভুবনে সোমের কি ভালই যে লাগছিল! ভুট্টা কিন্তু বিশেষ বিচলিত হয় নি, মাছের কাছে জলের অভিনবত্ব নেই, এ সব সে রোজই দেখছে। মিলের চোঙা দেখলে সে বরং বিস্মিত হত। সে কেবল ব্যস্ত হচ্ছিল কি করে বাবুকে সে ঠিক সময়ে পৌঁছে দিতে পাববে। মহিষদুটিকে পুনরায় উত্তেজিত করতে শুরু করেছিল সে, ভুবন সোম আর মানা কবলেন না। বেশ লাগছিল। একটু পরে বেশ আলো ফুটল। ভুবন সোম আর মহিষেব বিষয় চিন্তাই করছিলেন না। বাস্তার দু পাশে সবুজ ক্ষেতের সারি দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। মুগ্ধনেত্রে তাই দেখছিলেন। কি গাছ ওগুলো? ধান? না, ধান তো এ অঞ্চলে হয় না। ভুট্টাকে প্রশ্ন কবলেন। ভুট্টা একটা গোল গোছেব উত্তর দিল।

গহুম, যব আর বুট ছে।'

গম, যব আব ছোলা? কোনটা গম, কোনটা যব আব কোনটাই বা ছোলা! হঠাৎ একটু লজ্জিত হলেন ভুবন সোম। কিছুই জানেন না। সারাজীবন বাজে খবর সংগ্রহ করে বেড়িয়েছেন খালি। পূর্বাকাশ আরও লাল হয়ে উঠল।

হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়াতে বেশ একটু কৌতূহলী হলেন তিনি। ক্ষেতেব মাঝখান থেকে ফুব্‌র্‌ কবে একটা ছোট্ট পাখী আকাশের দিকে সোজা উড়ে গেল, তারপর সেই শূন্য থেকেই গান গাইতে লাগল, ঝুপ কবে নেবে পড়ল আবার ক্ষেতের ভিতর। আর একটা উড়ল, আর একটা, আব একটা গানে গানে আকাশ ভরে যাচ্ছে।

'ভুট্টা, কি পাখী ওগুলো?'

'ভরথা— '

নির্বিকারভাবে উত্তব দিল ভুট্টা। পাখীর গান যেন তার কানেই ঢোকে নি।

'ভরথা! সে আবার কি পাখী?'

'গহুমাকা খেতো পর খোতা বানাই করিকে আনডা পারৈছে।'

কিছু বুঝলেন না ভুবন সোম। লার্ক বললে বুঝতেন, কিন্তু 'ভরথা' বলাতে বুঝলেন না। ভরদ্বাজ বললেও বুঝতেন না, 'ভরথা' ভরদ্বাজেরই অপভ্রংশ। গমের ক্ষেতে খোতা মানে বাসা বানিয়ে ওরা ডিম পাড়ে—এ খবর ভুট্টা জানে, অথচ তিনি জানেন না। বেশ লজ্জিত হলেন ভুবন সোম। কিন্তু তিনি এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে, লজ্জার ভাবটা মনে বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না।

গাড়ি চলতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ চলল। চেনা অচেনা আরও অনেক রকম পাখী নজরে পড়তে লাগল। দেখলেন, ভুট্টাও অধিকাংশ পাখী চেনে না। যেগুলোকে চেনে না সেগুলোকে

বলছে 'জংলি চিড়িয়া'। যে দু-একটাব নাম বলল সেগুলো সম্ভবত ভুল। ভুবন সোমই ধবে ফেললেন দু-একটা। একটা ফিঙেকে বললে, 'নীলকন্ঠা' (নীলকণ্ঠ)। ভুবন সোম নীলকণ্ঠ চেনেন, ফিঙেও চেনেন। ভুট্টাকে বললেন, ' না, ওটা নীলকণ্ঠ নয়।'

ভুট্টা একটুও অপ্রতিভ হল না। আকর্ণ হেসে বললে, 'তব দুসরা কুছু হোতৈ।'

অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত একটা কাণ্ড ঘটল।

'হো হো হো হো—'

তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল ভুট্টা। একটা মোষ জোয়াল ফেলে দিয়েছে, কাৎ হয়ে গেছে গাড়িটা। ভুট্টা কিন্তু মোষটাকে বাগাতে পারলে না। মোষটা উল্টো দিকে ঘুরে চোঁ-চোঁ দৌড় মারল। ভুবন সোম বেকায়দায় পড়ে গেলেন একটু। তিনি একটা সিগার ধরাবার চেষ্টায় ছিলেন। নিবস্ত হলেন। দ্বিতীয় মোষটাও পালাবার চেষ্টা করছে। কি আপদ! হঠাৎ ভুট্টা আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'আই রে বাপ, বিহনিয়া—'

'বিহনিযা কি বে?'

'বিহনিয়া ভৈঁস। উতরি যা বাবু জলদি, সে উতরি যা—'

তাড়াতাড়ি গাড়ির পিছন দিক থেকে লাফিয়ে নেবে পড়লেন ভুবন সোম, কি ব্যাপাব কিছুই বুঝতে পারছিলেন না তিনি। গাড়ি থেকে নেবেই কিন্তু বুঝতে পারলেন। একটু দূবে ক্ষেতের মাঝখানে আর একটি মহিষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। শিঙে কাদা মাখা, কুচকুচে কালো গা। মৃদু কিন্তু গম্ভীব মেঃ মেঃ শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। মাথা ক্রমশই বেঁকছে। ভাব ভঙ্গি মোটেই ভাল নয়।

কাছেই একটা শিমুলগাছ ছিল। ভুট্টা আদেশের ভঙ্গিতে তাঁকে গাছটায চড়তে বলল।

'জলদি—জলদি—জলদি চঢ়ি যা বাবু, ই শলা বড়ি বদমাস ছে।'

সে নিজেই ছুটে এসে ভুবন সোমকে পাজা কোলা কবে গাছতলায় নিয়ে এল, তাবপর কাঁধে তুলে নিয়ে বললে, ওহি ডালটো পকড়ি লে! জলদি— জলদি —'

নাগালের মধ্যে একটা ডাল ছিল সেইটে ধবে ঝুলে পড়লেন তিনি, তারপর ভুট্টার সাহায্যে কোনক্রমে উঠলেন গাছের উপরে। গাছে উঠে দেখলেন সংঘর্ষ বেধে গেছে। আগন্তুক মহিযটা গাড়ির মহিষটাকে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করেছে, আর ভুট্টা এক জোড়া দড়ি বাঁধা বাঁশ নিয়ে ঠেঙিয়ে চলেছে আততায়ী মোষটাকে। ভুট্টার বিক্রম দেখে তাক লেগে গেল ভুবন সোমের। ও বাঁশই বা পেলে কোথায়? তিনি জানতেন না যে, গাড়িকে দাঁড় করাবার জন্য ওই রকম দড়ি বাঁধা বাঁশ প্রত্যেক গাড়ির সঙ্গে থাকে এক জোড়া। 'সিপাহা' ওর নাম। বীববিক্রমে লড়তে লাগল ভুট্টা। গাড়ির প্রথম মোষটা তো আগেই পালিয়েছিল। দ্বিতীয়টাও পালাল। দ্বিতীয় মোষটা যখন রণে ভঙ্গ দিয়ে ছুট দিল তখন আগন্তুক মোষটা আর সেখানে দাঁড়ানো প্রয়োজন মনে করল না, সেও ছুটে চলে গেল। সে এসেছিল তার এলাকা রক্ষা করতে। এর পুরো তাৎপর্যটা পরে তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। ভুট্টাই তাকে বলেছিল। বিহনিয়া মোষ হচ্ছে—ব্রিডিং বাফেলো, নিজের এলাকায় সে দ্বিতীয় পুরুষ

মহিষকে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। যদি কোনও পুরুষ মহিষ ঢুকে পড়ে আর সে তা টের পায়, তা হলে তৎক্ষণাৎ 'যুদ্ধং দেহি' বলে এগিয়ে আসবে। মহিষের ওই মেঃ মেঃ শব্দটারই অনুবাদ হচ্ছে—যুদ্ধং দেহি। যুদ্ধ করতে করতে হয় সে নিজে মরবে, না হয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে মেরে তাড়াবে। যে বিহনিযার পাল্লায় ভুবন সোম পড়েছিলেন সেটার নাকি দোর্দণ্ড প্রতাপ। এ অঞ্চলেব কোনও মোষ তাকে হাবাতে পারে নি। ডাক্তারবাবুর একটা মোষকে সে মেরেই ফেলেছে।

ভুবন সোম গাছের উপর থেকে সব দেখছিলেন। তিনটে মোষই যখন রণক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলে তখন সহসা আর একটা শত্রুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সম্বন্ধে সচেতন হতে হল তাঁকে। গাছটায অসংখ্য লাল পিঁপড়ে রয়েছে। কি করবেন ভাবছিলেন, এমন সময় ভুট্টা বলল, 'অব উতবিয়ে হুজুব।'

ভুট্টা খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। তাব মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সেটা। অপ্রত্যাশিতভাবে বিহনিযাব আবির্ভাব হওয়াটা যেন তারই দোষ। এই শীতেও ঘেমে উঠেছিল বেচাবা। ডান হাতের একটা আঙুলও জখম হয়েছিল একটু। কিন্তু এসব দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না তাব। বাবুর 'মেহমান' (অতিথি) যে এই বিপদে পড়ে গেলেন এর জন্যেই সে লজ্জিত। যে বাঁশজোড়া দিয়ে বিহনিযাকে পিটেছিল তারই সাহায্যে সে গাড়িটাকে তুলে দাঁড় করালে। তারপব কুণ্ঠিতদৃষ্টি তুলে ভুবন সোমকে বললে, 'অব উতর যাইয়ে হুজুব।'

নাববাব তাড়া ভুবন সোমেবও কম ছিল না, পিঁপড়ে দেখে তিনি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। প্যান্টেব ভিতব যদি ঢুকে পড়ে তা হলে খুবই কাবু করে ফেলবে। ভুট্টার সাহায্য না নিয়ে এক লাফে নেবে পড়লেন তিনি। নেবেই মনে হল নাবলাম তো, কিন্তু অতঃপর? গাড়িব মোষ দুটো তো পালিযেছে। পায়ে হেঁটে অগ্রসর হওয়া কি সমীচীন? বিহনিযাটা মার খেয়ে ছুটে পালাল বটে, কিন্তু আবার যদি ফিরে আসে আসা অসম্ভব নয়, কাছেপিঠেই গা-ঢাকা দিয়ে আছে। বেশী দূবে যায় নি। বড় বড় কি গাছ ওগুলো? ভুট্টা বললে— রাহার, মানে অড়র গাছ। ওই অড়বক্ষেতেই ঢুকেছে বিহনিয়া, গাছেব উপর থেকে দেখেছেন তিনি।

ভুট্টা বললে, 'না, সে আর আসবে না এখন।' কি কবা যায় তা হলে? ভুট্টা প্রস্তাব করলে, 'এখান থেকে মহেন্দর সিংয়েব 'ডোটা'য় যাওয়া যাক, বেশী দূর নয়, কাছে।' 'ডোটা' কি? মাঠের মাঝখানে সম্পন্ন গৃহস্থ চাষীরা যে আস্তানা করে তাকে এ দেশে 'ডোটা' বলে। ভুট্টা বললে, সে তাঁকে তাঁর মালপত্রসমেত মহেন্দব সিংয়ের ডোটায় পৌঁছে দিতে চায়। সেখানে আব একটা গাড়ি পাওয়াও অসম্ভব নয়। মহেন্দর সিংয়ের নিজেরই গাড়ি আছে। গতবার বৃত্তরেব মেলায় একজোড়া ভাল বলদও কিনেছেন তিনি। অনিলবাবুকে খুব খাতির করেন মহেন্দর সিং। তাঁর মেহমানকেও করবেন। আব মহেন্দব সিংয়ের ডোটা থেকে গঙ্গার চরও খুব বেশী নয়। বাবু ইচ্ছে করেন তো হেঁটেও যেতে পারবেন। হেঁটে গেলেই বরং তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারবেন। গাড়িতে গেলে ঘুরপথে যেতে হবে, দেরি হবে। ভুট্টা তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এসে গাড়ির মোষ দুটোর সন্ধান করবে।

ভুবন সোম দেখলেন, প্রস্তাব অসঙ্গত নয়, মন্দও নয়। এ ছাড়া গত্যন্তরও তো নেই। রাজী হলেন। ভাগ্যে বিহনিয়াটা এসে গাড়িটাতে ধাক্কা মারে নি, তা হলে তাঁর বন্দুক টোটা সব নয় ছয় হয়ে যেত। সাহেবী পোশাক পরে এসেছিলেন তিনি। চেস্টারফিলডটি খুলে শুয়েছিলেন। এবারে সেটি গায়ে দিলেন। তারপর বন্দুকটি কাঁধে করে টোটাগুলি পকেটে পুরে হ্যাটটি মাথায় দিয়ে ভুট্টার পিছু পিছু চলতে লাগলেন।

অনিল একটা টিফিন কেরিয়ারে খাবার দিয়েছিল সেইটে ভুট্টা হাতে করে ঝুলিয়ে নিলে। তাঁর কাঁধে মিলিটারি ফ্লাস্কে জল ছিল। আর কোনও আসবাব ছিল না তাঁর। দরকারও ছিল না।

.......মহেন্দর সিংয়ের ডোটাতে পৌঁছে দেখা গেল, সেখানে কেউ নেই। একটি খোড়ো ঘর আছে শুধু। মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। চারদিকে মাটির উঁচু বারান্দা। পুবদিকের বারান্দায় বেশ মজবুত গোছের একটি তক্তাপোশও রয়েছে। আর সামনের উঠোনে রয়েছে একটা কুয়া। আর কিছু নেই। অনেক দূর মাঠে একটা ছোঁড়া বসে ঘাস কাটছে। ভুট্টা টিফিন-কেরিয়ারটি নাবিয়ে গেল তার কাছে। ভুবন সোম চৌকিটির উপর বসে পাইপটি ধরালেন। তাঁর মনে হল, বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া না দিলে এ সঙ্কট থেকে ত্রাণ পাওয়া শক্ত।

ভুট্টা ফিরে বললে, মহেন্দর সিং এখানে নেই। নিজের গরুর গাড়িতে চেপে তিনি বারো ক্রোশ দূরবর্তী এক গ্রামে বিবাহের ভোজ খেতে গেছেন। কবে ফিরবেন তা অনিশ্চিত। তাঁর কাম্‌তিও (চাকরের সর্দার) এখানে নেই। কিছুদিন পূর্বে গোয়ালাদের সঙ্গে ভুঁইহারদের যে খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে তাতে আসামী হয়ে হাজতবাস করছে সে। অন্যান্য চাকরবাকরও সেই কারণে পলাতক, কারণ পুলিস দেখলেই গ্রেফ্‌তার করবে। ভুট্টা বললে, ভোজ খাবার ছুতোয় মহেন্দর সিংও সম্ভবত এই কারণেই সরেছেন। যে ঘাস কাটছে তার নাম ভাগিয়া। সে যদিও মহেন্দর সিংহের চাকর নয়, তবু সে-ই এখন এখানকার রক্ষক, কারণ তার ফুফাই (পিসে) মহেন্দর সিংয়ের কামতি। ভুট্টাকে সে আশ্বাস দিয়েছে যে, বাবুর যদি কিছু দরকার হয় এবং তা যদি তার সাধ্যাতীত না হয় তা হলে সে তা নিশ্চয়ই করে দেবে। ভাগিয়ার কাছ থেকে আর একটি সাংঘাতিক খবরও ভুট্টা নিয়ে এল। আর একদল শিকারী নাকি খুব ভোরে নৌকো করে এসেছে। খবরটি শুনে দমে গেলেন ভুবন সোম। মনে মনে বললেন, তা হলে মা গঙ্গাকে প্রণাম করে এখান থেকে ফিরে যাওয়াই উচিত। কিন্তু ফিরবারও উপায় নেই, মোষ দুটি পালিয়েছে।

'তোর মোষ দুটোকে ধরে আনতে কত সময় লাগবে?'

'ওকরো কি কুছ ঠিক ছে! কাঁহা পর ভাগলোছে, খোজৈলো পড়তে।'

'দেখ্, যত শিগগির পারিস খুঁজে আন। আমি একটু ঘুরে ফিরে দেখি ততক্ষণ পাই যদি কিছু।'

ভুবন সোম দেখলেন, ভুট্টা চাকরটি সত্যিই ভাল লোক। যাওয়ার আগে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কুয়া থেকে এক কলসী জল তুলে দিয়ে গেল। জল তোলবার জন্যে কুয়ার ধারেই বাঁশের তৈরী লাট ছিল এবং তাতে বাঁধা ছিল একটা লোহার কলসী। যাওয়ার আগে বলে

গেল যে, মোষ দুটোকে খুঁজে সে ওই শিমূলগাছের পশ্চিম দিকে ভগণ্ড মোড়লের যে বাড়ি আছে সেখানেই থাকবে। ভগণ্ড মোড়লের গোয়ালে মোষ দুটোকে বেঁধে রেখে তারপর এখানে আসবে। কারণ বিহনিয়ার এলাকায় ওদের আর নিয়ে আসা নিরাপদ নয়। মনে হচ্ছে ওই শিমূলগাছটাই সম্ভবত ওর এলাকার খুঁটি অর্থাৎ সীমাচিহ্ন। এই প্রসঙ্গে সে একটি কৌতুকজনক খবর দিলে। বললে, প্রথম মোষটা যে জোয়াল ফেলে পালিয়েছিল তার কারণ সে বুঝতে পেরেছিল যে সে অন্য একটা বিহনিয়ার এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করেছে। বিহনিয়ারা গোবর দিয়ে নিজের এলাকা চিহ্নিত করে রাখে। সেই গোবর দেখে কিংবা সেই গোবরের গন্ধ পেয়ে অন্য মোষেরা বুঝতে পারে যে, তারা শত্রুর এলাকায় পদার্পণ করেছে আর বেশী দূর অগ্রসর হলে যুদ্ধ অনিবার্য। ভুবন সোমের আবার মনে হল, কত জিনিসই যে জানি না। ভুট্টা চলে যাওয়ার আগে খেয়েও নিলেন তিনি। টিফিন-কেরিয়ার খুলে কিন্তু চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল তাঁর। এ-হে-হে-হে, এ কি করেছে অনিল, ডিমের ওমলেট আব আমের আচার দিয়েছে! দুটো জিনিসই যে অযাত্রা তাই এই সব কাণ্ড হচ্ছে। খেলেন তবু। কয়েকখানা লুচি আর গোটা চারেক সন্দেশও ছিল। তাঁর ক্ষিদে পায়নি তেমন, তবু কাজটা মিটিয়ে ফেললেন। তা ছাড়া আব একটা কথাও তাঁব মনে হল, এই টিফিন কেরিয়ার নিয়ে কত ঘুববেন তিনি। এখানে বেখে যাওযাও নিবাপদ হয়। ওই ভাগিয়া বিশ্বাসযোগ্য কি না কে জানে। খুব সম্ভবত নয। ভুট্টা টিফিন-কেরিয়ারটা ধুয়ে পরিষ্কাব করে তাঁর জলেব ফ্লাস্কে জল ভবে দিযে চলে যাচ্ছিল। ভুবন সোমেব মনে হল, এই ফ্লাস্কটাকে কাঁধে করে বেড়ানোও এক ঝঞ্ঝাট। শীতকালে জলতেষ্টা পাবে না। যদি পায় পাশেই তো গঙ্গা। ফ্লাস্কটাও দিয়ে দিলেন তাকে।

....ভুট্টা চলে গেল, ভুবন সোম পাইপটি ধরালেন। সামনের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, 'বা বা বা বা।' পূর্বদিগন্তে রঙেব খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। একবাশ মেঘ জমেছিল সেখানে, খেলাটা আরও জমে উঠেছিল তাই । সূর্য চক্রবালরেখা ছাড়িয়ে উঠি উঠি কবছেন, উঠেছেন হয়তো, কিন্তু মেঘের ভিড় ঠেলে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন নি এখনও। তবে সূর্যকে রুখবে কে। ভুবন সোম পাইপে মৃদু মৃদু টান দিতে দিতে উপভোগ করছিলেন দৃশ্যটা। দিগন্তবিস্তৃত সবুজ যেখানে গিয়ে আকাশে মিশেছে ঠিক সেইখান থেকে শুরু হয়েছে লাল রঙের খেলা। চক্রবালরেখার গাছগুলো মনে হচ্ছে যেন কালি দিয়ে আঁকা। তারপরে লাল। একরকম লাল নয়, নানারকম লাল। লালের সীমা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে নীল—উজ্জ্বল নীল।

ভুবন সোম এককালে ছবি আঁকতেন রঙের এই খেলা খুবই ভাল লাগছিল তাঁর। একটা রঙ আব একটা রঙের সঙ্গে কেমন বেমালুম মিশে গেছে, একটু গরমিল নেই, এতটুকু ছন্দপতন নেই।

আবার মনে পড়ল গার্ড মিস্টার ব্রাউনের কথা। মাঝে মাঝে মদ খেয়ে খুব উঁচুদরের কথা বলত সে। তাঁর মুখের সামনে হাত নেড়ে একদিন বলেছিল, 'বাবু, যদি রঙের খেলায় ভালভাবে মেতে যেতে পার, তা হলে ভগবানকে পাবে। চার্চেও যেতে হবে না, মন্দিরেও

যেতে হবে না। কলার ইজ গড—বর্ণই ব্রহ্ম।' তিনি হিন্দুর ছেলে 'শব্দব্রহ্ম' কথাটা তিনি শুনেছিলেন। কিন্তু বর্ণও যে ব্রহ্ম এ কথা মিস্টার ব্রাউনই বলেছিল তাঁকে। ব্রাউন সাহেবের চেহারাটা আবার ভেসে উঠল মনে. খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল। বড় বড় নীলচে চোখদুটো সর্বদাই জলভারাক্রান্ত হয়ে থাকত। চোখের নীচের দিকটা ছিল ফোলা-ফোলা। মাথায় অবিন্যস্ত রেশমের মত চুল। টুকটুকে গালদুটিতে জরার চিহ্ন, খুব সরু সরু শিরাও দেখা যেত গালে। ড্যাবডেবে চোখদুটো বিস্ফারিত করে যেদিকে চেয়ে থাকত, চেয়েই থাকত—চোখের পলক পড়ত না। চোখের নীচের পাতার কোলে টলটল করত জল। হাত নেড়ে কথা কইত. হাতের আঙুলগুলো কাঁপত. ডান হাতের তর্জনী আর মধ্যমার পাবদুটোতে বাদামী রঙের ছোপ ধরে গিয়েছিল ক্রমাগত সিগারেট খাওয়ার জন্য। ব্রাউন বলেছিল, বর্ণই ব্রহ্ম।

হঠাৎ মনে পড়ল নাতনী রেবাকে। সে তাঁকে রবি ঠাকুরের একটা গান শুনিয়েছিল একবার—' সবার রঙে রঙে মেশাতে হবে। ওগো আমার প্রিয়. তোমার রঙিন উত্তরীয়. পর পর তবে'। 'ওটা বাজে কথা, সবার রঙে রঙ মেশানো যায় না'—হঠাৎ বলে উঠলেন ভুবন সোম। নাতনী রেবার কথাটা কিন্তু মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল। অনেক দিন তাদের খবর পান নি। একটা চিঠি পর্যন্ত লেখে না। লিখবে কেন, দরকার তো আর নেই। মনে পড়ল রেবার একটা চোখ বসন্ত হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। ওই কানা মেয়ের আর বিয়ে হবে না। তাই ওর বাপ মা গান বাজনা শেখাচ্ছে ওকে, ভাবছে কিছু একটা অবলম্বন হবে তবু। কিন্তু ভুবন সোম জানেন, হবে না। স্ত্রীলোকের অবলম্বন পুরুষ, পুরুষের অবলম্বন স্ত্রীলোক, এ ছাড়া অন্যরকম কিছু হয় না, হতে পারে না। হলেই গড়বড়। বিদ্যাসাগরের মতো লোক, তাই বিধবাদেরও বিয়ে দেবার জন্যে ঝুঁকেছিলেন।

হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়ালেন ভুবন সোম। দুম দুম করে বন্দুকের আওয়াজ হল যেন কোথায়।

'এঃ পাখীগুলো সব উড়িয়ে দেবে দেখছি—'

বন্দুকটা কাঁধে তুলে এগিয়ে গেলেন। যেখানে ভাগিয়া বলে ছোঁড়াটা ঘাস কাটছিল, সেখানে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, গঙ্গার চরে যাওয়ার রাস্তা কোন দিকে? ছোঁড়া কোনও জবাবই দিলে না। কালা নাকি! প্রথমে বাংলায় বলেছিলেন, এবার হিন্দিতে বললেন।

'গঙ্গাকে কিনারমে যানে কা রাস্তা কিধার?'

ভাগিয়া নীরব।

আপন মনে ঘাসই কেটে যাচ্ছে তাঁর উপস্থিতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে।

'আ মোলো। বাতে কাহে নেই বোলতা হ্যায়?'

ভাগিয়া ঘাড় তুলে তাঁর দিকে একবার চাইল কেবল, কোন জবাব দিল না।

'আরে গঙ্গা কিনারমে যানে কা রাস্তা কিধার বোল দেও না একটু।'

'রাস্তা নেই ছে।'

বলে কি! রাস্তা নেই! পুনরায় প্রশ্ন করলেন। আবার ভাগিয়া চুপ। আশ্চর্য ত্যাঁদড় ছোঁড়া! কিন্তু ভুবন সোমও নাছোড়। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন তিনি।

শেষে ছোঁড়া নিজস্ব ভাষায় যে জবাব দিলে তার সারমর্ম হচ্ছে, এখান থেকে গঙ্গার চরে যাবার কোনও রাস্তা নেই। যদি কেউ যেতে চায় তা হলে ওই অড়হরক্ষেতের ভিতর দিয়ে দিয়ে যেতে হবে। অড়হরক্ষেত পার হয়েও রাস্তা নেই, আছে গম আর যবের ক্ষেত। তাব সরু আল দিয়ে দিয়ে কিছুদূর গিয়ে আব একটা অড়হবক্ষেত, সেটা পাব হয়ে তবে গঙ্গার চর। গম আর যবের ক্ষেত সরু আলের উপর দিয়েই পার হতে হবে, কাবণ ফসলে পা দিলে ক্ষেতের মালিক ভিখন গোপ লাঠিহাতে তেড়ে আসবে। সে ক্ষেতের এক প্রান্তে একটা ঝোপড়ির মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছে। আর বাবু যদি রাস্তা দিয়ে যেতে চান তা হলে যে শিমূলগাছটার কাছে বিহনিয়া তাঁদের আক্রমণ করেছিল সেইখানে ফিরে যেতে হবে। সেখান থেকে যে রাস্তা পুবদিকে চলে গেছে সেই রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ হাঁটবার পর একটি আমগাছ দেখা যাবে ডান দিকে, অনেক মুকুল হয়েছে তাতে। সেই আমগাছের পাশ দিয়ে গঙ্গাব চবে যাওয়াব বাস্তা।

ভুবন সোম স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

ভুট্টা তাকে এইরকম একটা গোলকর্ধাধার মধ্যে ফেলে দিয়ে সরে পড়ল। 'উফ্!'—বলে চুপ কবে গেলেন তিনি। পবমুহূর্তেই তাঁব মনে হল, তিনি ভদ্রলোক, সুতবাং অসহায। এদেবই আজকাল বাড় বাড়ন্ত, এবা যা খুশী কবে যাবে, মুখটি বুজে সহ্য করতে হবে। এতদূব যখন এসে পড়া গেছে তখন গঙ্গাব চরে পৌঁছতেই হবে। এই ছোঁড়াটাকেই একটু তোযাজ কবা যাক। কিন্তু কি করলে যে এই ঘেঁচিমার্কা বিচ্ছু খুশী হবে তাও জানা নেই। একটু ভাবলেন। তারপব কলিকালে যে মন্ত্র পাঠ করলে সব দেবতাই তুষ্ট হন সেই মন্ত্রটিই ঝাড়লেন শেষে।

সরল বাংলা ভাষায বললেন, 'আমাকে গঙ্গার ধারে পৌঁছে দে বাবা, তোকে বকশিশ দেব। আচ্ছা, আগামই না হয নে কিছু।'

মনি ব্যাগটি বার করে একটি দোযানি দিলেন তাকে। ভাগিয়া দোয়ানিটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে কানের পাতায় আটকে বেখে দিলে। চৌকো দোয়ানিটি তার কানে ঠিক ফিট করেও গেল।। ভুবন সোম দেখলেন কানে একটা বিড়িও গোঁজা রয়েছে। ছোঁড়া কিন্তু ওঠবাব কোন লক্ষণই প্রকাশ করলে না। যেমন ঘাস কাটছিল তেমন কাটতে লাগল।

'কি রে, দু আনা পছন্দ হল না বুঝি? আচ্ছা, আরও দু আনা নে। ওঠ্ এইবার, আমাকে পৌঁছে দে বাবা।'

মনি-ব্যাগ বার করে খুঁজে পেতে আর একটি চৌকো দোয়ানি দিলেন তাকে। নিমেষের মধ্যে সেটাও সে আর একটা কানে ফিট করে নির্বিকা 'ভাবে ঘাস কাটতে লাগল। রাগে সমস্ত শরীর রি-রি করে উঠল ভুবন সোমেব। কিন্তু তখনই মনে হল, রেগে বেসামাল হয়ে গেলে সব মাটি হয়ে যাবে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন মিনিটখানেক।

নীরবতায় ফল হল। ভাগিয়া ঘাসের বোঝাটা বেঁধে ফেললে, তারপর তার উপরে চড়ে দমক দিলে দু-চারবার। আবার মনোমত করে বাঁধলে, তারপর কাস্তেটা তাতে গুজে দিলে। এর পর সে যা করলে তা একেবারে নাটকীয়। একটি পাঁচ টাকার নোট সে বাড়িয়ে দিলে

ভুবন সোমের দিকে। নিজস্ব ভাষায় বললেন, বাবু যখন ব্যাগ খুলে দোয়ানি বার করছিলেন তখনই নোটটা ঘাসের উপর পড়ে গিয়েছিল, সে এতক্ষণ ঘাস চাপা দিয়ে ছিপিয়ে (লুকিয়ে) রেখে মজা দেখছিল। চোখের পাতা দুটো মিটমিট করতে লাগল তার। একটু হাসল না কিন্তু। নীরবে এবং অবলীলাক্রমে প্রকাণ্ড ঘাসের বোঝাটা মাথায় তুলে ডোটার দিকে চলতে লাগল।

ছোঁড়ার কাণ্ড দেখে ভুবন সোম থ হয়ে গিয়েছিলেন। অনুসরণ করতে লাগলেন তিনি তাঁকে।

ডোটায় পৌঁছে ঘাসের ঝোপটা একটা ঘরে রেখে, ঘরের শিকলটা তুলে দিয়ে সে বলালে, 'অব চলিয়ে বাবু।'

ভুবন সোম চমৎকৃত হয়ে গেলেন। হাতের কাজটি সেরে তবে অন্যদিকে মন দিলে। পয়সা দিয়েও ওকে বিচলিত করা গেল না। পয়সার প্রতি ওর লোভই নেই সম্ভবত, থাকলে, পাঁচ টাকার নোটটা ফেরত দেয়! এ রকম দেখেন নি তিনি কখনও। তাঁর ভাগ্নে হনুর কথা মনে পড়ল।

ভাগিয়া যেখানে বসে ঘাস কাটছিল সেইখানেই এক ছুটে চলে গেল আবার। একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে তাঁর দিকে তারপর অড়রক্ষেতে ঢুকে পড়ল। ভুবন সোমের পক্ষে ওর মত ছুটে যাওয়া সম্ভব ছিল না তবু যতটা সম্ভব দ্রুতবেগে গিয়ে হাজির হলেন তিনি অড়রক্ষেতের ধারে। অড়রক্ষেতের ভিতর প্রবেশ করা কিন্তু কঠিন হল তাঁর পক্ষে। বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে তো ঢুকতেই পারলেন না, হাতে ঝুলিয়ে নিলেন সেটা, তারপর অতিকষ্টে ঢুকলেন। ঢুকে ভাগিয়াকে দেখতে পেলেন না। কোথায় গেল ছোঁড়া।

'ভাগিয়া কোথা গেলি?'

'আবো নি ইধর।'

তার কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে এগুলেন খানিকটা। সোলার হ্যাটটা মাথা থেকে বার বার পড়ে যেতে লাগল, আর বন্দুকটাও আটকে আটকে যেতে লাগল অড়রের গাছে। হ্যাটটা শেষে বগলদাবা করলেন।

'ভাগিয়া—'

'হ্যাঁ, ইধর ছি—ইধর ছি'

অড়রক্ষেতের মাঝে একটা ফাঁকা জায়গায় ভাগিয়া দাঁড়িয়ে আছে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি। অড়রগাছের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটা উঠোন যেন। নিতান্ত ছোটও তো নয়। একটা কুঁড়েঘরও রয়েছে এক ধারে। ভাগিয়ার দিকে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চাইতে ভাগিয়া বললেন, এটা তার নিজের ক্ষেত, ওই কুঁড়েঘরে থেকে ক্ষেত পাহারা দেয় সে। রাত্তিরেও শোয়। ভুবন সোম দেখলেন, ভাগিয়ার শখও আছে। একটি ছোট খাঁচায় একটি বুনো খরগোশের বাচ্চাও পুষেছে সে। ক্ষেতের ধার থেকে কিছু দূর্বাঘাস ছিঁড়ে খরগোশের খাঁচার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে ভুবন সোমের দিকে চেয়ে সে বললে, 'অব চলিয়ে—'

'খরগোশ কোথা পেলি?'

ভাগিয়া সগর্বে জানালে, খরগোশটা সে ধরেছে, ছুটে ধরেছে।

'খালি ঘাস খায়?'

'দুধ ভি খাইছে। বুট ভি—'

বাক্যালাপ করে বেশী সময় নষ্ট করতে চাইল না সে। আবার ঢুকে পড়ল অড়রক্ষেতে। তর তর করে চলতে লাগল অড়রক্ষেতের ভিতর দিয়ে, যেন তার ঘর বাড়ি এ সব। ভুবন সোম নিজের বাড়ির পাকা দালানেও এত স্বচ্ছন্দে চলতে পারেন না। ওটাও মানুষ নয়, যেন খরগোশ। ছুটে চলেছে ব্যাটা। ভুবন সোমকেও বাধ্য হয়ে গতিবেগ বাড়াতে হল। যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন তাব সঙ্গে পাল্লা দিতে। পাল্লা দেওয়া কি সোজা এই অড়রবনের মাঝখানে।

মিনিট পাঁচেক এ দুর্ভোগ ভুগতে হল। অড়বক্ষেত পার হয়ে যব আর গমের ক্ষেতে এসে পড়লেন। বেশ বড় ক্ষেত এটা। এরও এক প্রান্তে ছোট একটি কুড়েঘর রয়েছে, আব সেই কুঁড়েব ভিতর বসে আছে ক্ষেতের মালিক ভিখন গোপ—এর কথা একটু আগেই ভাগিযা বলেছিল। চেহারাটা ভীষণই সত্যি। কুচকুচে কালো, এক মাথা ঝাঁকড়া চুল সমস্ত মুখটি গোঁফে-দাড়িতে ঢাকা, প্রায় চোখ পর্যন্ত ঢাকা, নাকের ছিদ্র পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না—আব সে কি সাধাবণ দাড়ি, জটিল দাড়ি। ভুবন সোম ভাগিয়ার নির্দেশমত আলের উপর দিয়েই সন্তর্পণে এগুচ্ছিলেন এমন সময় অপ্রত্যাশিত এক কাণ্ড ঘটল। ভিখন গোপ কুঁড়ে থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে খুব ঝুঁকে সেলাম কবলে তাঁকে, তাবপর সঙ্কুচিত ভাবে একটু হাসলে। ভুবন সোম দেখলেন, লোকটি শৌখিন, সামনের দুটি দাঁতের মাঝখানে সোনাব ছোট ছোট বিন্দু।

ভিখন যদি আসে মারমুখী হয়ে আসবে, এইটেই প্রত্যাশা করেছিলেন ভুবন সোম। এই অতিবিনীত বশম্বদ ভিখনেব মুখের দিকে চেয়ে একটু কৌতুকবোধ করলেন তিনি। সম্ভবত তার সাহেবী পোশাকের দরুনই এটা ঘটল। ভিখন গোপকে নরম হতে দেখে ভাগিয়া একটু পুলকিত হল যেন। সাহেব যে এখানে এসেছেন এটা যেন তারই কৃতিত্ব। নিজেদের ছিকা-ছেনি ভাষায় তারপর সে ভিখন গোপকে বললে, সাহেব কেন এসেছেন। শুনে ভিখন গোপ যেন কৃতার্থ হয়ে গেল, বললে, ঘাটে একটা নৌকো লাগানো আছে, তার নিজের নৌকো, সাহেব যদি সেটা ব্যবহার করেন সে নিজেকে ধন্য মনে করবে।

'মাঝি টাঝি আছে?'

'ভাগিয়া লে যৈতে।'

'ভাগিয়া নৌকো বাইতে পারবে?'

ভাগিয়া ঘাড়টা খুব বেশীরকম কাৎ করে জানালে, খুব পারবে।

সরু আলের উপর পা ফেলে ফেলে চলতে ভুবন সোমের কষ্ট হচ্ছিল। এ দেখে ভিখন গোপ কখনও যা করে না তাই করলে। বললে, আপনি ক্ষেতের উপর দিয়ে ফসল মাড়িয়েই যান, দু-চারটে গাছ মরলে কি আর এমন ক্ষতি হবে!

ভাগিয়া অবাক হল। এ রকমটা সে দেখে নি আগে, ভাবতেও পারে নি।

যব গমের ক্ষেত পার হয়ে আর একটি অড়রক্ষেত, তবে এটি ছোট। পার হতে বেশী বেগ পেতে হল না। অড়বক্ষেত থেকে বেরিয়েই জল দেখা গেল। গঙ্গার ধারা নয়, খানিকটা বানের জল দু পাশের উঁচু বালিয়াড়ির মধ্যে আটকে পড়েছিল বর্ষাকালে, এখনও শুকিয়ে যায় নি। তার ধারে পৌঁছুতেই এক ঝাঁক খঞ্জন উড়ে গেল। উড়ে গিয়ে একটু দূরে বসে ল্যাজ দোলাতে লাগল। তার মধ্যে কতকগুলো হলদে খঞ্জন দেখে অবাক হলেন ভুবন সোম। আগে দেখেন নি। খানিকক্ষণ চেয়ে বইলেন তাদের দিকে। অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল।

'উ সব ধোবিন ছে।

'ধোবিন? না খঞ্জন।

'নেই, ধোবিন।'

ভুবন সোম বুঝলেন, খঞ্জনকে এরা ধোবিন বলে।

'নাও কাঁহা?'

'আবোনি।'

কিছুদূব বালির চড়া ভেঙে আসল গঙ্গাব তীবে যখন তাঁবা পৌঁছলেন তখন সূর্য উঠে গেছে।

আবাব বন্দুকেব আওয়াজ শোনা গেল। হাঁসের ডাকও শুনতে পেলেন। দেখতেও পেলেন অনেক দূবে একদল হাঁস উড়ছে।

'ফটফটিয়া নাও পর সাহেবলোগে আইলোছে—'

'ফটফটিয়া নাও' মানে মোটর-বোট। মোটর বোটে করে কে এল আবার? ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা মিনিষ্টারদের কেউ বোধ হয়। এঁরা আবার মহাত্মা গান্ধীকে রাষ্ট্রপিতা বানিয়েছেন।

খানিক চেয়ে বইলেন তিনি উড়ন্ত হাঁসগুলোর দিকে। মারতে পারবেন তো সাড়ে বাইশ, মাঝ থেকে পাখীগুলোকে ভড়কে দিয়ে গেলেন।

দেখা গেল, মোটর বোটটা ওপার ঘেঁষে চলে যাচ্ছে।

'সাহেবলোগ অব ইধর নেহি আইতে—'

ভিখন গোপেব নৌকোটা একটু দূরে বাঁধা ছিল। তাতে উঠবেন কি না প্রথমটা ইতস্তত করতে লাগলেন ভুবন সোম। এই ছোঁড়াটার ভরসায় ওঠাটা কি উচিত হবে? ভাগিয়া তাঁব মুখের দিকে চেয়ে সম্ভবত তাঁর মনেব কথাটা টের পেয়ে গেল। বললে, লগি ঠেলে ঠেলে সে ধারে ধারে নিয়ে যাবে, ভয়ের কোনও কারণ নেই। কিছুদূর গেলেই হাঁসও পাওয়া যাবে।

দুর্গা বলে উঠলেন শেষে। ও বাবা, এ যে দুলছে খুব! নৌকো করে তিনি পাখী শিকার করেন নি কখনও, পায়ে হেঁটেই করেছেন বরাবর। নৌকোয় দাঁড়িয়ে, 'এম' (aim) ঠিক হবে কি না কে জানে! স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ— কথাটা মনে পড়ল।

তারপর মনে পড়ল টুনটুনি পাদরিকে।

সেই প্রথমে বলেছিল কথাটা।

—ভাগিয়া লগি ঠেলে নিয়ে চলেছে। ভুবন সোম অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। টুনটুনি পাদরির কথাই ভাবতে লাগলেন।

প্রভাতের সূর্যকিরণে গঙ্গার প্রতিটি তরঙ্গশীর্ষে সোনা চকমক করছিল। সেদিকে চেয়ে চেয়ে আবার টুনটুনি পাদরির চেহারাটা মনে ফুটে উঠল।

....সিগার ধরালেন। টুনটুনি পাদরির চেহারা কুৎসিত ছিল। কালো, বেঁটে, মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি, মাথায় পাদরিব টুপি, পরনে পাদরির আলখাল্লা। লোকটা খুব উপকার করেছিল তাঁর। সে-ই যোগাড় যন্ত্র করে রেভারেন্ড ফার্গুসনকে দিয়ে এজেন্টের কাছে চিঠি লিখিয়েছিল একটা। আর তারপর থেকেই তাঁর ডবল প্রমোশন হয়ে গেল। এজেন্টের নেকনজর থাকলে কার সাধ্য আটকায? ওরাই সে যুগে দেবতা ছিল, অনুগ্রহ করলে পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন কবতে পারত।....টুনটুনি পার্দাবর কাছে সত্যিই খুব কৃতজ্ঞ তিনি। অথচ দেখা হয়েছিল হঠাৎ, আলাপও যৎসামান্য। প্রথম আলাপ ওয়েটিং-রুমে। তারপর একদিন টুনটুনি পাদরি তাঁর বাসায এসে হাজিব বললেন, কোন একটা গ্রামে একজন রোগীর খবব নিতে গিয়েছিলেন। ট্রেনের এখনও অনেক দেরি আছে দেখে তাঁর খববটাও নিতে এসেছেন। সেদিন রবিবার, কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল তিনি খান নি কিছু, কাছে-পিঠে কোনও হোটেল আছে কি না জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন, 'কেলনারে খেতে অনেক খরচ, শস্তা হোটেল পেলে সেইখানেই যেতাম।' ভুবন সোমের তখনও খাওয়া হয় নি, তিনি তাঁকে তাঁর সঙ্গেই খাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন। প্রথমে রাজী হন নি তিনি, অনেক অনুরোধ করার পব শেষে রাজী হলেন। বললেন, 'আচ্ছা, তা হলে এই বারান্দায় একটা কলাপাতায় ওর সামান্য কিছু এনে দিন। হিন্দুর বাড়িতে খ্রিস্টানকে খাওয়ানো এক ল্যাটা তো।' ভুবন সোম বললেন, 'সে কি কথা! আমরা দুজনে একসঙ্গে পাশাপাশি বসে খাব। ওসব গোঁড়ামি আমাদের নেই। আমাদের কাছে অতিথি দেবতা।' এতেই কৃতার্থ হয়ে গেলেন টুনটুনি পাদরি। তিনি খুব যে হৈ-হৈ খাতির করেছিলেন তাও নয়, খাওয়াদাওয়া অতি সাধারণ ছিল—সেদিন মাছ পর্যন্ত কেনা হয় নি। খাওয়া-দাওয়ার পর টুনটুনি পাদরি খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন বারান্দার চেয়ারটায়। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কত কথাই মনে পড়ছে!' ভুবন সোম জিগ্যেস করলেন, 'কি কথা?' টুনটুনি পাদরী বললেন, 'নিজের অতীত জীবনের কথা। আমি এককালে নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে ছিলাম, বিশ্বাস হয় এখন? আমাদের প্রসাদ পাবার জন্যে, পাদোদক নেবার জন্যে বাড়িতে ভিড় করে লোক আসত।' কথাটা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ভুবন সোম। তাঁর ধারণা ছিল, সাধারণত নীচ জাতের লোকেরাই খ্রীস্টান হয় চাকরির লোভে। ব্রাহ্মণের ছেলে হতে গেল কেন? প্রেমে-ট্রেমে পড়েছিল নাকি? কথাটা জিগ্যেস করেছিলেন তিনি টুনটুনি পাদরিকে। উত্তরে টুনটুনি পাদরি যা বলেছিলেন তা আরও আশ্চর্যজনক। ভাল করে লিখলে একখানা উপন্যাস হয়। গল্পটা আগাগোড়া এখনও মনে আছে তাঁর।

বলেছিলেন, তিনি একবার পাড়ার একটি ছেলের বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে যাচ্ছিলেন। গরুর গাড়ি করে যাচ্ছিলেন তাঁরা। চার পাচটা গরুর গাড়ি সার বেঁধে চলছিল। তখন ঘোর গ্রীষ্মকাল, জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি। কিছুদুর যাবার পর গরমের জন্যই হোক বা যে জন্যই হোক, গা গুলিয়ে উঠল তাঁর, তিনি বমি করে ফেললেন। কিছুদুর যাবার পর আবাব বমি হল, এবং তারপরই পেট ভাঙল। জলের মত পায়খানা হল বারকয়েক! কারও বুঝতে বাকি রইল না যে, কলেরা হয়েছে। কলেরা রোগীকে নিয়ে বিয়ে বাড়িতে যাওয়া চলে না। তাই তাঁকে তাঁরা একটা গাছতলায় নামিয়ে রেখে চলে গেল। দু একজন থাকলে পারত কিন্তু কেউ রইল না। একজনও যদি থাকত, তা হলে তাঁর জীবনের কাহিনী অন্যরকম হত আজ। কিন্তু কেউ রইল না। সেই জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে সেই জনহীন মাঠে একা গাছতলায় পড়ে তিনি রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, কিন্তু জল দেবে কে! খানিকক্ষণ পরে অজ্ঞান হয়ে গেলেন তিনি। কতক্ষণ এভাবে পড়েছিলেন তা তিনি জানেন না। খানিকক্ষণ পরে অনুভব করলেন, কে যেন তাঁকে কাঁধে করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর সর্বাঙ্গ বমি আর বিষ্ঠায় মাখামাখি। কে তাকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে! যমদূত না কি ' খানিকক্ষণ পরে বুঝতে পারলেন যমদূত নয়, দেবদূত। দীর্ঘকান্তি বলিষ্ঠ ঋজুদেহ সাহেব একজন, ক্রিশ্চান মিশনারি। তিনি তাঁকে একটা হাসপাতালে নিয়ে এলেন, তাঁর সেবা শুশ্রূষা করলেন, বীতিমত চিকিৎসাব ব্যবস্থা কবলেন, এককথায় তাঁর পুনর্জন্ম দিলেন। ভাল হয়ে আর তিনি বাড়ি ফিরে যান নি। খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে খ্রীস্টধর্ম প্রচার কববার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। গত বিশ বৎসব ধরে এই কাজ করছেন তিনি। পায়ে হেঁটে বহু গ্রামে গ্রামে পর্যটন করে বহু নরনারীকে খ্রীষ্টান করবার চেষ্টা কবেছেন তিনি। সফলও হয়েছেন।

নিজের কাহিনী শেষ করে আকাশের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন টুনটুনি পাদরি। আস্তে আস্তে পা দোলাচ্ছিলেন। তারপর হঠাৎ ভুবন সোমেব মনের রঙই বদলে গেল। কারণ ভুবন সোম মুখে যদিও ভদ্রতার চূড়ান্ত করেছিলেন, কিন্তু মনে মনে নাক কুঁচকে বসেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বা স্বামী বিবেকানন্দ যাই বলুন, ইণ্ডিয়ান খ্রীষ্টানের উপব শ্রদ্ধা ছিল না তাঁর। কিন্তু টুনটুনি পাদরি এবার যা বললেন তাতে চমকে উঠতে হল তাঁকে।

বললেন 'আচ্ছা মশাই, এখন যদি আমি শুদ্ধি করে আবার হিন্দু হই, আপনারা আমাকে আবার ফিরে নেবেন?'

ভুবন সোম জিগ্যেস করলেন, 'ও কথা বলছেন কেন?'

টুনটুনি পাদরি আবার চুপ করে গেলেন, দাড়ির ভিতর আঙুল চালাতে লাগলেন। তারপরে বললেন, 'বলছি, কারণ এখন আমি আমার ভুলটা বুঝতে পেরেছি! যারা আমাকে গাছতলায় ফেলে পালিয়েছিল, তারা ভীরু, অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কিন্তু নীচ নয়। তাদের এই অধঃপতনের জন্যে তারা দায়ীও নয়, দায়ী সুদীর্ঘ পরাধীনতা। ইংরেজরা আমাদের শুধু কেরানী করতে চেয়েছিল, সত্যিকার মানুষ করতে চায় নি। বরং যাতে আমরা অমানুষ হয়ে চিরকাল ওদের গোলামি করতে থাকি সেই চেষ্টাই করেছিল ওরা। নিজে যখন খ্রীষ্টান হলাম, ওদের সঙ্গে ভাল করে মেশবার সুযোগ পেলাম। তখন বুঝলাম, আমাদের ওরা কি চোখে

দেখে! সাম্য ওদের মুখের বুলি, আমাদের ওরা উপকাব করে খ্রীষ্টধর্ম আর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা প্রচার করবে বলে, কিন্তু মনে মনে ওরা আমাদের মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না। ওদের নীচতা দেখে অবাক হয়ে গেছি। মরে গেলেও ওদের সঙ্গে এক কবরখানায় স্থান হয় না আমাদের। আপনি যত কাজের লোকই হোন, যত বড় বিদ্বানই হোন, সাহেবদের নীচে আপনার স্থান। আমি ওদের জন্যে যত কাজ করেছি তাতে আমি এতদিন বিশপ হয়ে যেতাম, হই নি কারণ আমার চামড়ার রঙ কালো। দু-একটা ব্যতিক্রম অবশ্য আছে, কিন্তু সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। এ দেশেব লোক অধঃপতিত, তার কাবণ এবা বহুকাল ধরে পরাধীন, বহুকাল ধরে অশিক্ষিত। কিন্তু এরা সভ্যতা অভিমানী হয়েও আমাদের সম্পর্কে কতটা যে নীচ তা আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। আমি ভাবি, খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করবার জন্যে যে পরিশ্রমটা কবেছি, এ দেশের অজ্ঞতা দূব করবাব জন্যে তার সিকির সিকিও যদি করতাম তাহলে খুব বড় কাজ হত। এখন এ সব করবার সুবিধা নেই অবশ্য। এখন স্বদেশহিতৈষী ভাল লোককে ওবা জেলে পুরে রাখে, দ্বীপান্তরে পাঠায়, ফাঁসি দেয। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবে. হবেই একদিন, তাই ভাবছি এইবার যদি—'

এই পর্যন্ত বলে থেমে গেলেন টুনটুনি পাদরি। ভুবন সোম দেখলেন তাঁব চোখের কোণে জল টলমল কবছে। সাহেবদেব হয়ে একটা উত্তব দিতে পারতেন তিনি, কিন্তু চোখেব কোণে জল দেখে আর কিছু বললেন না। টুনটুনি পাদরি চলে যাওয়ার মাস খানেক পবেই অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রমোশন হয়ে গেল তাঁর। খবর নিয়ে জানলেন স্বয়ং এজেন্টের কনফিডেনশাল অর্ডারে এটা হয়েছে। এজেন্ট হঠাৎ তাঁর প্রতি সদয় হতে গেলেন কেন, বুঝতে পাবেন নি তিনি। মাসকযেক পরে একদিন একটি সাঁওতাল ক্রিশ্চান এক টুকরি আম আব একটি চিঠি নিয়ে এল। চিঠি লিখেছেন বেভারেন্ড ফার্গুসন। লিখেছেন যে পাদবি এনটনিও ঘোষালের প্রতি আপনি যে সদয ব্যবহার করেছিলেন তার জন্য আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। পাদরি এনটনিও ঘোষালের ইচ্ছা ছিল আপনাকে এক টুকরি আম পাঠাবেন। তিনি বেঁচে থাকলে নিজেই যেতেন, কিন্তু হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে কিছুদিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর সে বাসনা অপূর্ণ রয়ে গেল। তাঁর এ ইচ্ছার কথা আমি জানতাম, তাই জন কচ্ছপেব মারফত আমগুলি আপনাকে পাঠাচ্ছি। গ্রহণ কবলে কৃতার্থ হব। আমগুলি অবশ্য খুব ভাল ছিল না, টোকো আঁটিসর্বস্ব পাহাড়ে আম। তবু কিন্তু টুনটুনি পাদরির ব্যবহারে চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলেন ভুবন সোম। পরে তিনি খবর পান যে, রেভারেণ্ড ফার্গুসনের সঙ্গে তখনকার এজেন্টের খুব দহরম-মহরম ছিল। তখন তিনি বুঝতে পারলেন, হঠাৎ তাঁর প্রমোশন হয়েছিল কেন। টুনটুনি পাদরিই কলকাঠিটি নেড়ে গিয়েছিলেন। টুনটুনি পাদরির কথা কিন্তু আর বেশী ক্ষণ ভাবতে পারলেন না তিনি।

ভাগিয়া আচমকা চিৎকার করে উঠল।

'চিড়িয়া ছে বাবু, বড়কা চিড়িয়া—'

এই বলে সে ঝপাং করে লাফিয়ে পড়ল জলে। ভুবন সোম দেখলেন একটা মরা রাজহাঁস ভেসে যাচ্ছে। ভাগিয়া সেটাকে ধরবে বলে সাঁতরাতে লাগল। ভুবন সোম প্রথমে

একটু অবাক হলেন, তারপর বুঝতে পারলেন, যারা মোটর-বোটে চড়ে শিকার করতে এসেছিল তাদের গুলিতে রাজহাঁসটা মরেছে; কিন্তু জলে পড়েছে, ওরা হয় দেখতে পায় নি কিংবা ধরতে পারে নি। ভাগিয়া প্রাণপণে সাঁতরাচ্ছিল, ভুবন সোমও উত্তেজনাভরে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু এদিকে আর এক কাণ্ড হচ্ছিল সেটা প্রথমে খেয়াল করেননি তিনি। নৌকোটা স্রোতে পড়েছিল আর দ্রুতবেগে সরে যাচ্ছিল ভাগিয়ার কাছ থেকে। কি করা যায় এখন! ভুবন সোম চেষ্টা করলেন লগিটার সাহায্যে নিজেই যদি নৌকোটাকে তীরের কাছে নিয়ে যেতে পারেন। পারলেন না। টাল সামলাতে পারলেন না, আর একটু হলে জলে পড়ে যেতেন।

'ওরে ভাগিয়া, নাও ভাস যাতা হ্যায়।'

ভাগিয়া শুনতে পেলে কি না বুঝতে পারলেন না। এরা অনেক সময় শুনেও কালা সেজে থাকে। এদিকে মোটেই ফিরে চাইছে না উন্মুখ হয়ে, সাঁতরে চলেছে হাঁসটাব দিকে। নৌকা প্রায় মাঝ-গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে, হাওয়ার বেগটাও বাড়ছে ক্রমশ।

'ওরে ভাগিয়া—এই ভাগিয়া—'

ফিরেও চাইলে না ভাগিয়া । সোজা সাঁতরে চলেছে। নৌকোটাও ক্রমশঃ মাঝগঙ্গার দিকে এগিয়ে চলল। বেশ ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। এ কি প্যাঁচে পড়লেন নৌকো চড়ে! বেঘোরে প্রাণটা যাবে নাকি' হঠাৎ নজরে পড়ল, আরে, সর্বনাশ! নৌকোর তলা দিয়ে জল উঠছে যে। জল ছেঁচবাব জন্যে একটা পাত্রও রয়েছে দেখতে পেলেন। ভুবন সোম আর কালবিলম্ব না করে জল ছেঁচতে আরম্ভ করে দিলেন। রবিন্সন ক্রুশোর গল্পটা মনে পড়ে গেল। ঘাড় ফিবিয়ে একবার দেখলেন, ভাগিয়াটা করছে কি! না, ফেববাব কোন লক্ষণ নেই। নৌকো তরতব করে এগিয়ে চলল।

'ওবে ভাগিয়া—'

ডাক শুনতে পেয়েছে কি না এবারও বোঝা গেল না। হাঁসেব দিকেই সাঁতরে চলেছে। যাক, হাঁসটাকে ধরেছে এবার। ফিরছে, হাঁসসুদ্ধ হাতটা তুলে তাঁকে দেখাল একবাব। নৌকা কিন্তু দ্রুতবেগে ভেসে যাচ্ছে। কোথায় গিয়ে ঠেকবে ভগবানই জানেন। জলছেঁচা ছাড়া আর কিছু করবাব নেই। তাই করতে লাগলেন ভুবন সোম। দামী গরম প্যান্টটা কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল। নগদ পাঁচটি টাকা নেবে সুলেমান এটি পেট্রল দিয়ে কেচে পরিষ্কার করে দিতে। ব্যাটা বার বার সেলাম করে, কিন্তু একটি পয়সা কমাতে চায় না।

হঠাৎ ভাগিয়া সাঁতার কাটতে কাটতে চিৎকার করে উঠল—'নাও ভাসলো যাইছে হো, দৌগো, দৌগো,' আর ক্রমাগত চেঁচাতেই লাগল। মনে হল কাকে যেন ডাকছে। এ তেপান্তর চরে কাছাকাছি কেউ আছে কি? দেখা গেল আছে। তেপান্তর চরেই তিন-চারজন ষণ্ডা গোছের লোক আবির্ভূত হল। ছুটতে ছুটতে আসছে। সম্ভবত ওই অড়রক্ষেতের ভিতর কাজ করছিল ওরা। তাদের দেখে ভাগিয়া আরও চেঁচাতে লাগল। চারটে লোকই ঝপাং ঝপাং করে লাফিয়ে পড়ল গঙ্গায়। নৌকো তখন অনেক দূর ভেসে গেছে। প্রায় মিনিট পনেরো সাঁতরে তারা নৌকোটাকে ধরলে এসে । হাঁসসুদ্ধ ভাগিয়াও এসে চড়ল।

ভুবন সোম দেখলেন, বেশ বড় 'পিনটেল' একটা। তিনি চটেছিলেন খুব। ভাগিয়াকে জিগ্যেস করলেন, 'তুই আমার ডাক শুনতে পাস নি?'

ভাগিযা ঘাড কাৎ কবে জানালে, পেযেছিল।

'তবে ফিবে এলি না কেন?'

এ শুনে ভাগিযা একটু বিস্মিত হল। বললে, হাঁসটাকে ধববে বলে সে জলে লাফিয়ে পড়েছিল, সেটাকে না নিয়ে ফিববে কি কবে।

তাবপব বললে, 'তোবে বাস্তেই তো।' মুখেব ভাবটা এমন কবলে যেন যাব জন্যে চুবি কবি সেই বলে চোব।

ভুবন সোম বললেন, ও হাঁস আমি চাই না। আমি নিজে শিকাব কবব। ও হাঁস তুই নিগে যা।'

ভাগিযাব মুখখানা এতটুকু হয়ে গেল। আশা কবেছিল, বাবু বাহবা দেবে ।

একজন বললেন, 'চল ঝবকাইকে খাইবো।'

ভাগিযা হাঁসটা নৌকোব গলুইযেব উপব বেখে দিলে।

'আবে খোকনা লেকে ভাগতো বে, নীচে বাখি দে।

ভাগিযা বিমর্ষ মুখে লগি ঠেলতে লাগল। হাসটাব প্রতি আব দৃকপাতও কবলে না ভুবন সোমেব ব্যবহাবে মর্মাহত হযেছিল বেচাবা।

ভুবন সোম জিগ্যেস কবলেন, 'খোকনা কি?'

তাবা বললে যে, খোকনা এক বকম বাজেব মত বড পাখী, মবা পাখী দেখলে ছোঁ মেবে তুলে নিয়ে যায়। এই জন্যেই শিকাবীদেব পিছু পিছু ঘোবে তাবা অনেক সময়। একটা লোক হাসটাকে তুলে নৌকোব খোলেব ভিতব বেখে দিলে। নৌকোতে দাড ছিল। দাঁড বাইতে লাগল ওবা।

'কিধব যাইবো বাবু?'

ভুবন সোম বললেন, নৌকোয আব যাবেন না তিনি। একবাব চডেই যথেষ্ট শিক্ষা হযেছে।

একটু পবে বালিব চবায ওঁকে নামিযে দিয়ে নৌকো বাইতে বাইতে চলে গেল ওবা।

ভুবন সোম হাটতে লাগলেন।

।। পাঁচ ।।

ভুবন সোম কতক্ষণ যে হেটেছিলেন তা তাঁব খেযাল ছিল না। তিনদিকে ধু-ধু কবছে বালিব চব, আব একদিকে গঙ্গা। বালিব চব কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কোথাও বা সমতল। কোথাও কোথাও এত উঁচু যে মনে হয, ছোটখাটো পাহাড এক একটা, ওপাবে কি আছে দেখা যায না। কিছুক্ষণ হেঁটে ভুবন সোম বেশ চনমনে হযে উঠলেন, তাঁব যৌবন ফিবে এল যেন, সোৎসাহে তিনি বালিব উঁচু টিলাগুলোব উপবও উঠতে লাগলেন। উঠে চাবিদিকে চেযে চেযে দেখতে লাগলেন পাখী কোথাও আছে কি না। যতদূব দেখা গেল, পাখীব চিহ্ন নেই, ডাকও শুনতে পেলেন না। ওই ফটফটিযা নৌকোই সর্বনাশ কবে গেছে। এক-একটা টিলায ওঠেন, আবাব টিলা থেকে নেবে হাঁটতে থাকেন।

এইভাবে কিছুক্ষণ কাটল। চবে শুধু বালি নেই, মাঝে মাঝে গাছও আছে, বেশীব ভাগই

ঝাউগাছ। ঝাউগাছে বাদামী রঙের অচেনা ছোট ছোট পাখী, চড়ুই পাখীর মত, কিন্তু ল্যাজটা খুব লম্বা—যেন সামলাতে পারছে না। ডাকটা খুব মিষ্টি। আর ক্রমাগত ডাকছে, একদণ্ড সুস্থির হয়ে বসছে না কোথাও। এক ঝাউগাছ থেকে আর এক ঝাউগাছে উড়ে উড়ে বসছে, বসেই আবাব উড়ছে । এ পাখী চেনেন না ভুবন সোম, প্রথমে ভেবেছিলেন 'বগেরি' বুঝি: কিন্তু দেখলেন তা নয়, এ অন্য পাখী। সেই বাইনাকুলারওলা ছোকরা থাকলে ল্যাটিন নাম বলতে পারত সম্ভবত। হাঁটতে হাঁটতে আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করলেন ভুবন সোম। এই জনমানবহীন বালিব চবেও কাক শালিক নীলকণ্ঠ আর ফিঙে প্রচুর রয়েছে। একটু দূরে গোদাচিলও ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা। দু-তিন বকম মাছরাঙা পাখীও চোখে পড়ল। একটা ছোট্ট মাছবাঙা অদ্ভুত, ঠিক যেন রঙিন প্রজাপতির মত। বাটানও দেখতে পেলেন কয়েক জোড়া। এদের চেনেন তিনি। মনে পড়ল একবার বাটান মেরেছিলেন কিন্তু কেউ খেতে পারলে না, আঁশটে গন্ধ। পাখীগুলি কিন্তু বেশ। খুর খুর করে হাঁটে, কেউ আসছে দেখলে ঘাড় ফিরিযে ফিরিয়ে চেয়ে দেখে, তারপর কোঁক করে একটা শব্দ করে উড়ে যায়। আবার আর একটু দূরে গিয়ে বসে। ভুবন সোমের হঠাৎ মনে হল, কিন্তু আসল পাখী কই, হাঁস তো একটিও দেখা যাচ্ছে না! শুধু হাতে ফিরতে হবে নাকি শেষটা! কিন্তু না, পাখী নিয়ে ফিবতেই হবে তাঁকে, তা না হলে অনিলের কাছে মুখ দেখানো যাবে না। আর একটু দূবে গেলে সন্ধান পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। আজ যদি না পাওয়া যায় এইখানেই থেকে যাবেন তিনি, কোথাও কাছে-পিঠে গ্রাম নিশ্চয়ই আছে। অনিল তো বলেছিল, আছে। হাতঘড়িটা দেখলেন, প্রায় আটটা বাজে। এত বেলায় পাখী পাওয়া শক্ত। ওই ব্যাটারাই আগে থাকতে এসে সব উড়িয়ে দিয়ে গেছে। তবে কতক্ষণ আর উড়বে ওরা, বসতে হবেই কোথাও না কোথাও। ঘাড় হেঁট করে দৃঢ়পদবিক্ষেপে হাঁটতে লাগলেন তিনি। বালিগুলো চিকমিক করছে রোদ পড়ে।.....

কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল, জলের ধারে একটা ছেঁড়া খাটিয়া আর দু তিনটে ভাঙা কলসী পড়ে আছে। আরও কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন কয়লাও রয়েছে। কেউ মড়া পুড়িয়ে গেছে।

হঠাৎ বাবার মৃত্যুটা মনে পড়ল। তারপর মায়ের, তারপর স্ত্রীর, দুটো ভাগ্নের, বিরিঞ্চিলালের, জগন্নাথের। সক্কলকে এই গঙ্গার জলে নিজে হাতে বিসর্জন দিয়ে গেছেন তিনি। প্রত্যেকের শেষকৃত্য নিখুঁতভাবে করেছেন। তাঁর নিজের সময়ও তো আসন্ন। তাঁর মৃত্যু হলে কে তাঁকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে আসবে? বাড়িতে তো কেউ নেই। পাড়ার সৎকার-সমিতির ছোঁড়াগুলোই আনবে হয়তো। পেটরোগা নিমাই, রগচটা শ্রীদাম, মোটা ভোম্বল, গাঁজাখোর হরেন, মাতাল ফটিক—এদের সকলের মুখগুলো ভেসে উঠল মনে। এদের কাঁধে চড়েই শেষগতি হবে তাঁর! বিলেত-ফেরত বিলু আর সন্ন্যাসী নিপু আসবে কি? 'আসবে না, আসবে না, আমার দিকে কেউ কখনও তাকায় নি, তাকাবে না। বেটার লাক নেক্‌স্ট্‌ টাইম, মানে পরজন্মে।' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপন মনে বিড়বিড় করে বললেন ভুবন সোম। তারপর আবার হাঁটতে লাগলেন।

একটা কথা মনে হল হঠাৎ। বিরিঞ্চিটা মরবার দিনকতক আগে রসগোল্লা খেতে চেয়েছিল। রসগোল্লার বদলে তিনি ধমক দিয়েছিলেন। এখন হঠাৎ মনে হল, অন্যায়

করেছিলেন। দিলে কি আর এমন হত—শেষ পর্যন্ত মরেই তো গেল। চন্দন ডাক্তার দিতে বলেছিল, তিনিই দেন নি।

অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে লাগলেন। গতিবেগ মন্দ হয়ে এল, কিন্তু বেশ খানিকক্ষণ হাঁটলেন। চমকে উঠলেন হঠাৎ পাখীর ডাক শুনে। চোখ তুলে চেয়ে দেখলেন, এক ঝাঁক টিয়া ডাকতে ডাকতে এক পাক খেয়ে উড়ে গেল আবার—যেন রসিকতা করে গেল! ভুবন সোমের মনে হল, ওরা বোধ হয় গঙ্গার হাওয়া খেতে এসেছিল। গঙ্গার ধারের পাখী ওরা নয়।

চলতে চলতে একবার দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। এ ভাবে কতক্ষণ হাঁটবেন? কিন্তু গত্যন্তরই বা কি আছে, হাঁটতেই হবে—পাখী না নিয়ে আজ ফেরা চলবে না। পাখীগুলো ভড়কেছে খুবই, কিন্তু কোথাও না কোথাও বসবে তো—সেইখানেই যাবেন তিনি। যেতেই হবে।

ফের হাঁটতে শুরু কবলেন, পা দুটো ব্যথা কবছিল, তবু থামলেন না। সামনে আবার একটা বালির টিলা, ওপারে কি আছে দেখা যাচ্ছে না। কষ্ট করে উঠলেন টিলাটার উপর। উঠে দেখতে পেলেন, একটি লোক একটু দূরে ছিপ ফেলে বসে আছে।

টিলা থেকে নেবে গেলেন তার কাছে। দেখলেন, লোকটা দুই হাঁটুর মাঝখানে মুণ্ডুটা ঢুকিয়ে বসে আছে। এ রকম লম্বা জঙ্ঘা তিনি আর দেখেন নি কখনও। ঠিক যেন মনে হচ্ছে, হাড়কাটে মুণ্ডু গলিয়ে দিয়েছে।

ভাঙা হিন্দিতে প্রশ্ন কবলেন, 'ইধার চিড়িয়া কাঁহা বৈঠতা হ্যায় মালুম হ্যায় কি?' শুনতেই পেল না কি! একটু চেঁচিয়ে বললেন। যখন হাড়াকাট থেকে মুণ্ডুটি বের করে তাঁব দিকে চাইলে তখন চাউনি দেখে মনে হল, লোকটি ভাল মানুষ। একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। বিস্মিত হলেন যখন সে পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দিলে।

'আর একটু এগিয়ে যান, কিছুদূর গিয়ে ছোট একটা গ্রাম পাবেন, গ্রামটা পেরিয়ে দেখবেন গঙ্গা একটু বেঁকে গেছে, সেই বাঁকের মুখে অনেকগুলো পাখী আছে, একটু আগেই দেখে এসেছি।'

'আপনি বাঙালী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের আগেকার বাস ছিল হুগলী জেলার শেয়াখালা গ্রামে। আমাব ঠাকুরদা সেখান থেকে বাস উঠিযে চলে আসেন বীরভূম জেলায়। এখন সেইখানেই বাড়ি। দুবরাজপুরের কাছেই।'

ভুবন সোম বুঝলেন, লোকটি বাক্যবাগীশ।

'এখানে কি করেন?'

'এখান থেকে ক্রোশ দুই দূরে একটা মাইনর স্কুল আছে সেখানেই মাস্টারি করি। চাকরি ভাল নয়, কিন্তু জল-হাওয়া ভাল। সেই লোভেই থাকা। ডিসপেপসিয়ার রোগী কিনা—'

'আমি সোজা চলে যাব?'

'হ্যাঁ, সোজা চলে যান। একটু গেলেই গ্রামটা দেখতে পাবেন। ওরা লোকও ভালো—'

ভুবন সোম আর দাঁড়ালেন না, হাঁটতে শুরু করে দিলেন। পাখী আছে শুনে তাঁর দেহমনে

আবার উৎসাহের সঞ্চার হল। কিছুদূর হেঁটে সত্যিই গ্রাম দেখতে পেলেন একটা। গ্রাম মানে, দু-চারটে ছোট কুঁড়েঘর, ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। আর একটু এগিয়ে চোখে পড়ল, একটা মেয়ে গোবর কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আর একটু গিয়েই কিন্তু থেমে গেলেন। ও বাবা, এখানেই যে মোষ রয়েছে কয়েকটা! একটু দাঁড়িয়ে মোষগুলোর সঙ্গে বেশ একটু দূরত্ব রক্ষা করে আবার চলতে লাগলেন।

তাঁর ইচ্ছে ছিল, গ্রামে গিয়ে একটু জিরিয়ে তারপর পাখীর খোঁজে বেরুবেন। একটু ক্লান্ত বোধ করছিলেন। কিন্তু তাঁব অদৃষ্টে সেদিন দুঃখ লেখা ছিল। গ্রামের কাছাকাছি এসেছেন, এমন সময কে একজন চিৎকাব করে উঠল, 'ভাগিয়ে বাবু, ভাগিয়ে—জলদি ভাগিয়ে।' ভুবন সোম ঘাড় ফিবিয়ে দেখলেন, একটা মোষ তাঁকে লক্ষ্য কবে ছুটে আসছে। সেই বিহনিয়াটা! কি সর্বনাশ! প্রাণপণে ছুটতে লাগলেন, কিন্তু মোষের সঙ্গে ছুটে পারবেন কেন? আব একটু হলেই মোষের গুঁতোয় প্রাণটা বেবিয়ে যেত তাঁর। কিন্তু যে মেয়েটা গোবর কুড়োচ্ছিল সে চিৎকার করে উঠল, 'এই সুবোধ, খাড়া র।' মন্ত্রের মত কাজ হল, মোষটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

ভুবন সোম একটু দূবে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিলেন। দেখলেন, মেয়েটি এগিয়ে আসছে। এসে মোষটাব কান মলে দিয়ে বললে, 'ফেব বদমাশি! এই একটু আগে অত মাব খেয়েছিস তবু লজ্জা নেই!'

মোষটা ঘাড় নিচু কবে বকুনিটি শুনলে, তাবপব ঘাড় তুলে ভুবন সোমের দিকে আবাব চাইলে। তাব ক্রোধ তখনও প্রশমিত হয় নি। ভুবন সোম এতক্ষণ নজর করেন নি, এবাব দেখলেন মোষেব মাথায় শিঙের নীচেই একটা ন্যাকড়া জড়ানো বয়েছে। ভাবলেন, আব কাউকে গুঁতিয়ে খুন কবে এসেছে বোধ হয়, তারই কাপড়েব টুকরো শিঙে লেগে আছে।

তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন মেয়েটাব মুখে বাংলা কথা শুনে। ওই মাস্টাবেব মেয়ে নাকি! এইভাবে মাঠে মাঠে গোবব কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে!

মোষটা আবাব তাঁব দিকে অগ্রসব হচ্ছিল। মেয়েটা আবার ধমক দিলে, 'এই সুবোধ ফের।'

মোষটা আবার দাঁড়িয়ে গেল, ল্যাজটা ঘন ঘন নাড়তে লাগল খালি।

'চল, তোকে বেঁধে রেখে আসি, মহা পাজি হয়েছিস তুই—'

মেয়েটা সড়াৎ করে চড়ে পড়ল মোষটার পিঠে। কোন সুদক্ষ ঘোড়সোয়ার অত তাড়াতাড়ি ঘোড়াব পিঠে চড়তে পারত না।

ভুবন সোম অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন। ওই দুর্দান্ত যমদূতের নাম সুবোধ! আশ্চর্য মেয়ে তো! মহিষমর্দিনীর কথা চণ্ডীতে পড়েছিলেন, আজ স্বচক্ষে দেখলেন।

ও বাবা, এ কি কাণ্ড! দেখলেন, মেয়েটা মোষের পিঠে শুয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরেছে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ভুবন সোম! মোষটা হেলতে দুলতে তাকে গ্রামের মধ্যে নিয়ে চলে গেল।

অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করতে লাগলেন তিনি। দেখলেন, একটু দূরে একটা উঁচুমত জায়গা রয়েছে। তারই উপর গিয়ে বসলেন। মনে হল, কি কুক্ষণেই বেরিয়েছিলেন আজ! ডিম জিনিসটা সত্যই অপয়া, অত্যন্ত অপয়া। আর একবার ডিম সঙ্গে নিয়ে গিয়ে এই কাণ্ড

হয়েছিল বাজমহলে। আগে জানলে অনিলকে বাবণ কবতেন তিনি। আজকালকাব ছোকবাবা এ সব জানেও না, মানেও না। এখনও পেটে ওমলেট গজগজ কবছে। ওটি হজম না হওযা পর্যন্ত আজ আব নিস্তাব নেই।

গঙ্গাব দিকে চেয়ে বসে বইলেন তিনি। একটা মাছবাঙা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। বহমান স্রোতেব দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে শান্তি পেলেন একটু। ক্লান্তিও ঘুচল খানিকটা।

'খাটিয়া পব বৈঠি হুজুব—

ঘাড ফিবিযে দেখলেন শালপ্রাংশু মহাভুজ একটি প্রৌঢ তাঁকে সসম্ভ্রমে আহ্বান কবছেন। মুখটা অনেকটা মাইকেল মধুসূদন দত্তেব মত —অন্তত দাড়িটা সেইবকম। খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত কাপড, গলায একটা মযলা পৈতে ঝুলছে। মাঠেব উপব কখন সে যে ছোট একটি দড়িব খাটিয়া পেতে তাব উপব বঙিন চাদব বিছিয়ে দিযেছে তা তিনি টেব পান নি।

আবাব সে হাতজোড় কবে ডাকলে, 'খাটিয়া পব বৈঠি, বৌযা।'

বৌযা' মানে আপনি'। লোকটিব ভাব ভদ্র বলে মনে হল, উঁচু জাযগাটা থেকে নেমে এলেন ভুবন সোম। লোকটি ঝুঁকে নমস্কাব কবল। ভুবন সোম প্রতি নমস্কাব কবে জিগ্যেস কবলেন কি নাম তোমাব?'

'চতুর্ভুজ গোপ।'

গযলা অথচ গলায পৈতে। সবাই পৈতে নিচ্ছে আজকাল, বামুনেব ছেলেবা তাই বোধ হয পৈতে ফেলে দিচ্ছে। কতবকমই যে দেখতে হবে।

খাটিযায বসলেন।

তাবপব বললেন, বাংলাতেই বললেন, 'শিকাব কবতে এসেছি। এখানে হাস বসে শুনেছি -'

'চিড়িযা তো বহুত বা– '

'কাঁহা?'

নওলকিশোব কা ক্ষেত ববাবব। সিধা পূবব- '

হাত তুলে সে দেখিয়ে দিলে কোথায পাখী আছে।

ভুবন সোম উঠে পড়লেন খাটিয়া থেকে। অনেকক্ষণ দেবি হয়ে গেছে। ভাবলেন আব দেবি কবা ঠিক হবে না। সন্ধান যখন পাওযাই গেল, তখন এগিযে দেখাই যাক। সমস্ত ক্লান্তি যেন অপনোদিত হযে গেল এ সংবাদে। চতুর্ভুজ গোপ বালিযা জেলাব ভাষায তাঁকে বললেন যে, খাটিযাব উপব আবাম কবে নিযে তাবপব গেলেও চলবে। পাখীবা সমস্ত দিনই ওখানে থাকে। ভুবন সোম কিন্তু এ অনুবোধ বাখলেন না, একটি সিগাব ধবিযে বন্দুকটি কাধে তুলে বেবিযে পড়লেন।

গ্রামেব ভিতব দিযেই সরু পথ। সেইটে ধবেই চললেন। দেখতে পেলেন বিহনিযাকে একটা শক্ত খুঁটোয লোহাব শিকল দিযে বেঁধে বেখেছে। বিহনিযা বসেছিল, তাঁকে দেখে বোষ কষাযিতলোচনে উঠে দাঁড়াল আবাব। দ্রুতপদে এগিযে গেলেন তিনি। গ্রামটা পাব হযে আবাব বালিব চব। বেশ ঢালু চব। নামতে কষ্ট হল না। নেমে একটু দূবে দেখতে পেলেন সবুজ ক্ষেত। ওইটেই বোধ হয নওলকিশোবেব ক্ষেত। ওবই কাছাকাছি হাঁস আছে বলেছে

চতুর্ভুজ গোপ। সোৎসাহে এগিয়ে চললেন। ক্ষেতের কাছাকাছি এসে দেখলেন, ক্ষেতের মাঝখানে বসে কয়েকজন ঘাস কাটছে, আর কয়েকজন কি যেন ওপড়াচ্ছে।

'ইধার চিড়িয়া হ্যায়?'

'হাঁ বাবু। আউর থোড়া আগে বঢ়িয়ে।'

একটু কৌতূহল হল ভুবন সোমের। কি ওপড়াচ্ছে ওরা?

জিগ্যেস করে জানলেন, ছোলার গাছ। ওপড়াচ্ছে কেন? বললেন বড্ড বেশী ঘন হয়ে গেছে তাই। যেগুলো তুলে ফেলেছে সেগুলোও নষ্ট হবে না। ছোলার শাকও বিক্রি হয়, মানুষেও খায়, গরু-মোষেও খায়। গাছসুদ্ধ কাঁচা ছোলা পুড়িয়ে 'ওঢ়া' হয়। খুব সুখাদ্য।

'সিধা যাঙ্গে?'

'হাঁ বাবু, মগব বিড়িঠো ফেক দিজিয়ে। মহক সে চিড়িয়া ভাগ যায় গা।'

ভুবন সোম সবে সিগারটি ধরিয়েছিলেন। প্রায় গোটাই ছিল, তবু ফেলে দিলেন সেটা।

ক্ষেতের মাঝখানে দিয়ে সরু পথ, সেই পথে কিছুদূর এগিয়ে নদীব বাঁকটা দেখতে পেলেন। হাঁসের ডাকও শোনা গেল। চখার ডাক। আর একটু এগিয়েই ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা হল তাঁর। সত্যিই এক ঝাঁক হাঁস বসে আছে। চখাও রয়েছে। ধীরে ধীরে খুব সন্তপর্ণে এগোতে লাগলেন ভুবন সোম। রেঞ্জের মধ্যে আনা চাই। হাঁসেব পালকগুলো যতক্ষণ না স্পষ্টভাবে দেখা যাবে ততক্ষণ 'ফায়ার' কবা ঠিক নয়। ডবল ব্যাবেল বন্দুক তাঁব। দুটো ব্যাবেলেই টোটা পুরে ফেললেন। তারপব একটু ঝুঁকে বন্দুকটা পিছন দিকে লুকিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। মনে হতে লাগল যেন একটা বিরাট ৯ (লি) হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। কিছুদূর এইভাবে গিয়ে এক জায়গায় গুঁড়ি মেরে বসলেন তিনি। তারপর দড়াম দড়াম করে দুবাব ফাযাব কবলেন। হাঁসগুলো কলরব করে উড়ল। ভুবন সোম দাঁড়িয়ে সোৎসুকদৃষ্টিতে চেযে বইলেন। একটাও পড়েনি। অত্যন্ত হতাশ হলেন। সঙ্গে সঙ্গে কলকণ্ঠে কে যেন হেসে উঠল পিছনে। ঘাড় ফিবিয়ে দেখেন, সেই মেয়েটা—যে মোষের পিঠে চড়েছিল। মুখে কাপড় দিযে খিল খিল করে হাসছে।

আচ্ছা অসভ্য তো! সবাই অসভ্য আজকাল। মনে পড়ল, একবার কলার খোলায় তাঁর পা পিছলে গিয়েছিল, তাই দেখে গবুটা হেসে উঠেছিল হি-হি করে। তার গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিয়েছিলেন তিনি, গবু নিজের ভাগ্নে বলেই মারা সম্ভব হয়েছিল। একে চড় মারা যাবে না। তাই তিনি হাসিটা যেন লক্ষ্য করেননি এমনি ভাব দেখিয়ে উড়ন্ত হাঁসগুলোর দিকেই চেয়ে রইলেন। আর একটু এগিয়ে গেলেন। ভাবলেন, এইখানেই কোথাও আত্মগোপন করে বসে থাকবেন খানিকক্ষণ। পাখীগুলো বসলে—বসবে নিশ্চয়ই—আবার চেষ্টা করবেন। আজ একটা পাখী অন্তত নিয়ে যেতেই হবে। তা না হলে মান থাকবে না।

'শুনুন।'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, সেই মেয়েটা তাঁর পিছু নিয়েছে।

'কি—'

মেয়েটা আর একটু এগিয়ে এল।

'আপনি নিরীহ পাখীদের উপর গুলি চালাচ্ছেন কেন? কি দোষ করেছে বেচারারা—'

সাংঘাতিক ডেঁপো মেয়ে তো! মুচকি মুচকি হাসছে আবার!

'তুমি মাংস খাও না বুঝি?'

'না।'

'তরিতরকারি খাও তো?'

'হ্যাঁ, তা খাই বইকি।'

'ওরাই বা কি দোষ করেছে। ওদের কেটে খাও কেন? ওদেরও প্রাণ আছে, কাটলে ওদেরও লাগে।'

'সত্যি? জানতাম না তো।'

মেয়েটি বাঁ হাতের তর্জনীতে কাপড়ের আঁচলটা জড়াতে লাগল।

'কিন্তু তরিতরকারি আব পাখী কি এক, কাটবার সময় ওদের রক্তও বেরোয় না, ওরা যন্ত্রণায় চিৎকাবও করে না। কিন্তু পাখীদের মারলে তাদের রক্ত বেরোয়, তারা চিৎকার কবে।'

নীচের ঠোঁট দিয়ে উপবেব ঠোঁটটায় একটু চাপ দিয়ে চোখ মুখের এমন একটা ভঙ্গী করল সে, যেন অকাট্য যুক্তি দেখিয়েছে সে এবাব।

'পেকে একেবারে ঝুনো হয়ে গেছে।' মনে মনে ভাবলেন ভুবন সোম।

মেয়েটিই আবার প্রশ্ন কবল।

'আপনি পাখীব মাংস খুব ভালবাসেন বুঝি?'

'এককালে বাসতুম, এখন আর খাই না।'

'তা হলে ওদেব মারতে এসেছেন কেন?'

এব কোনও সদুত্তর সহসা মাথায় এল না ভুবন সোমের। কিছু না বলে আবার এগোতে লাগলেন। কিন্তু মেয়েটা নাছোড়বান্দা, পিছু পিছু চলতে লাগল।

'পাখী যখন খান না, তবে কেন বেচারীদের মারছেন? ছেড়ে দিন।'

'আজ একটি পাখী অন্তত মারতেই হবে, তা না হলে বাজিতে হেরে যাব। মান থাকবে না।'

'ও, বাজি রেখেছেন বুঝি।'

এইবার যেন একটা সঙ্গত কারণ পেল সে। কিছুক্ষণ চিন্তিতমুখে চুপ করে বইল। তারপর বললে, কিন্তু আপনি যেভাবে শিকার করছেন তাতে একটি পাখীও মারতে পারবেন না, বাজিতে হেরে যাবেন।'

এ আশঙ্কা ভুবন সোমের নিজেরও হচ্ছিল।

'কি করা যায় বল তো?'

'আমি যা যা বলব তা করবেন?'

'বল কি করতে হবে!'

'আমার সঙ্গে আসুন তা হলে।'

যাবেন কি না প্রথমে ঠিক করতে পারলেন না ভুবন সোম। একটা ফাজিল মেয়ের ধাপ্পায় ভুলে সময় নষ্ট করা কি উচিত হবে? ও শিকারের কি জানে! শেষটা আবার কি বিপদে পড়ে যাবেন ঠিক নেই, ডিম এখনও হজম হয় নি।

'আসুন না।'

নাছোড়বান্দা মেয়ে, যেতেই হবে। দেখাই যাক। না হয় একটু দেবিই হবে।

মেয়েটা গ্রামের দিকে ফিরল। ভুবন সোম পিছু পিছু যেতে লাগলেন। ঢালু চড়াটা নামতে কোনও কষ্ট হয়নি। ওঠবাব সময় ঈষৎ শ্বাসকষ্ট হতে লাগল। মেয়েটার কিন্তু গ্রাহ্য নেই, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। আর মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে চাইছে, মুচকি মুচকি হাসছে, আব ঝাঁকড়া চুলগুলো মুখের উপর থেকে সরিয়ে নিচ্ছে। টগর অনেকটা এইরকম ছিল, মনে পড়ল ভুবন সোমের।

যেতে যেতে আলাপ হল। 'তুমি বুঝি ওই মাস্টাববাবুব মেয়ে?'

'কোন মাস্টাববাবুর—'

'যিনি ওইদিকে ছিপ ফেলে মাছ ধবছেন।'

'না। আমি তাঁর মেয়ে হতে যাব কেন? আমার বাবার নাম চতুর্ভুজ গোপ, যিনি আপনাকে খাটিয়া পেতে দিলেন।'

বলে কি। ওই চৌ-গোঁপপা চতুর্ভুজের মেয়ে এমন বাংলা বলতে পারে!

'তুমি বাংলা শিখলে কি কবে?'

'আমার মামাববাড়ি যে পাকুড়, সেইখানেই মানুষ হয়েছি আমি। এখানেও বাংলা পড়েছি কিছুদিন। যিনি মাছ ধবছেন তিনিই আমাকে বাংলা পড়িয়েছেন। খুব ভাল পড়ান, কিন্তু একটু কালা—'

তিনি অন্য প্রসঙ্গে উপনীত হলেন।

'তুমি না থাকলে ওই মোষটা আজ আমাকে মেরেই ফেলত। তোমার কথা খুব শোনে তো! সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল।'

'বাঃ শুনবে না! আমি যে ওকে বাচ্চাবেলা থেকে মানুষ করেছি। ছেলেবেলায় খুব শান্ত ছিল, খালি ঘুমোত, তাই ওর নাম বেখেছিলাম সুবোধ। কিন্তু যত বড় হচ্ছে ততই দুর্দান্ত হয়ে উঠছে। আজ ভোরে কোথায় গিয়ে মারামারি করে এসেছে। কপালটা কেটে গেছে। টিঞ্চাব লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ কবে দিয়েছি।'

ভুবন সোমেব বুঝতে বাকি বইল না যে, ভুট্টার লাঠির চোটেই সুবোধের কপাল কেটেছে। কিন্তু সে কথা চেপে গেলেন।

'টিঞ্চার দিলেই সেরে যাবে নয়?'

'হ্যাঁ, তা যাবে।'

'আপনি কি বাঙালী?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে সাহেবী পোশাক পরেছেন কেন?'

'আচ্ছা ফক্কোড় মেয়ে তো'—মনে মনে বললেন ভুবন সোম। মুখে বললেন, 'সাহেবী পোশাক পরলে চলা ফেবাব সুবিধা হয়।'

'আমার বাবার সঙ্গে আপনি চলতে পারবেন? রোজ ভোর তিনটেয় উঠে উনি হাঁসবর যান, আবার দুপুরে এখানে এসে খান। খেয়ে আবার যান, ফিরে আসেন রাত দশটায়। হাঁসবর এখান থেকে আড়াই ক্রোশ।'

'সেখানে যান কেন?'

'সেখানে আমাদের জমি আছে।'

'কিন্তু আজ তো যাননি দেখলাম।'

'না, আজ এখানেই কাজ ছিল।'

এমন সময় দূর থেকে ডাক শোনা গেল—'এ বিদিয়া, বিদিয়া গে-এএ— '

'বাবা ডাকছেন। বাবাই আমাকে আপনার খোঁজে পাঠিয়েছিলেন। আপনি যেন গিয়ে আমার নামে নালিশ করবেন না। বরং বলবেন, আপনার মেয়ে বিদিয়া লছমী। কেমন?'

উত্তরের অপেক্ষা না রেখে বিদিয়া ছুটল।

ভুবন সোম আর একবার ফিরে আকাশের দিকে চাইলেন। হাঁসগুলোকে আর দেখতে পেলেন না। কোথাও বসেছে নিশ্চয়। চোখে পড়ল একটা ছোট্ট সাদা মেঘ ঠিক হাঁসের মত ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে। আকাশটা যেন নীল সরোবর। খানিকক্ষণ সেটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ক্ষেতে যে মজুরগুলো কাজ করছিল তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল—

'ঘন্টাভর বাদ আইহো বাবু। অভি থোড়া দের দম মারিকে বৈঠি যা।'

ভুবন সোমের মনে হল ফপরদালাল সর্বত্র। তিনি কি জানেন না, যে এখন অপেক্ষা করতে হবে। বিদিয়ার গ্রামের দিকে চলতে লাগলেন। একটু দূরে গিয়ে দেখলেন, বিদিয়া আবার আসছে।

'আপনি অত আস্তে আস্তে হাঁটছেন কেন, তাড়াতাড়ি আসুন। আপনার জন্যে বাবার কাছে মিছিমিছি বকুনি খেলুম। বাবা বললেন—তুই দৌড়ে চলে এলি কেন, ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আয়। চলুন— '

ভুবন সোম গতিবেগ আর একটু বাড়ালেন। চতুর্ভুজ গোপের বাড়ির কাছাকাছি হতেই চতুর্ভুজ গোপ বেরিয়ে এল আবার। দুটি হাত জোড় করে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করে আবার খাটিয়ায় বসাল তাঁকে। তারপর বালিয়া জেলার ভাষাতে যা বললে তার ভাবানুবাদ করলে দাঁড়ায়—বন্দুকের আওয়াজ সে শুনেছে। ও-রকম এলোপাতাড়ি আওয়াজ করলে পাখী পাওয়া যাবে না। এই চরে পাখী শিকারের 'ভাঁজ' ও-রকম নয়। এখন অন্যরকম কৌশল করতে হবে। বৌঁয়া এখানে খেয়েদেয়ে চারপাইয়ের উপর একটু আরাম করুন। তারপর বিদিয়া সব ব্যবস্থা করে দেবে ও সব জানে। ওর বয়স একটু কম হলে কি হবে, ও খুব চালাক মেয়ে, তবে বড় বদমাশ। কিছুদিন পরেই ওর 'গওনা' হবে, কিন্তু এখনও ওর কোন বিষয়ে লুর (হুঁশ) নেই। কার সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে বলতে হয় জানে না, কি করে হাঁটতে হয় তাও জানে না। কচি লেরুর (বাছুরের) মত সারাদিন লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিদিয়া বাপের পিছন থেকে ইশারা করলে।

ভুবন সোম ভাঙা হিন্দিতে বললেন, 'আপকা লেড়কি তো লছমী হ্যায়।' এ রকম নির্জলা মিথ্যেকথা জীবনে তিনি খুব কম বলেছেন।

এ কথা শুনে চতুর্ভুজের সিংহতুল্য বদনটি খুশিতে ভরে উঠল, চোখ দুটি বুঁজে এল। ক্ষণকাল অভিভূত হয়ে থেকে সে বললে, 'আপলোগকা আশিরবাদ—'

তারপর বিদিয়ার দিকে ফিরে বললে, 'দহি-চূড়া লাও বেটি, বাবুকো খিলাও।'

ভুবন সোম শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। বললেন, তিনি একটু আগেই খেয়েছেন, এখন ক্ষিদে

নেই। বিদিয়া পিছন থেকে ধমক দিয়ে উঠল, 'তবু খেতে হবে। বাবার মান রাখবার জন্যে সামান্য একটু খান। বাড়ি থেকে অতিথি যদি না খেয়ে যায় ওঁর অত্যন্ত কষ্ট হয়।'

ভুবন সোম চতুর্ভুজের দিকে ফিরে দেখলেন, সে হাতজোড় করে আছে। মুখে কিছু বলছে না, কিন্তু মুখভাবে যা প্রকাশিত হচ্ছে তা বলার বাড়া। ভুবন সোম আর আপত্তি করতে পারলেন না।

বিদিয়া একটি চকচকে পরিষ্কার কানা উঁচু কাঁসার থালায় মোটা মোটা লাল চিঁড়ে নিয়ে এল।

'ও বাবা, এ যে স্বয়ং মা লক্ষ্মী দেখছি!'—মনে মনে বললেন ভুবন সোম।

তারপর বিদিয়া নিয়ে এল মাটির ভাঁড়ে খানিকটা দই, আর কিছু ঢেলা গুড়। আর এক ছড়া মর্তমান কলা।

চতুর্ভুজ হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইল।

ভুবন সোম জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কাছে-পিঠে কোনও দোকান আছে?'

' না, এ সবই আমাদের ঘরের।'

'তাই না কি? বাঃ! তোমার বাবাকেও দাও না, এক সঙ্গে খাওয়া যাক।'

'আপনার খাওয়া না হলে উনি খাবেন না।'

চতুর্ভুজ হাসিমুখে মাথা নেড়ে জানালে যে, বিদিয়া যা বলছে ঠিক। সে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। তার ওইটুকু মেয়ে বিদিয়া একটা প্রবীণ বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে অনর্গল বাংলায় আলাপ করে যাচ্ছে এতে সে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে চড়ে বসেছিল; মুখ দিয়ে তার কথা সরছিল না।

ভুবন সোম যতটা পারলেন খেলেন। তাঁর খাওয়া শেষ হয়ে গেলে চতুর্ভুজ গোপ খেতে বসল। তাঁর সামনেই বসল। তার খাওয়ার বহর দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি। আধ সের চিঁড়ে তো হবেই, তার সঙ্গে প্রায় সেরখানেক দই পোয়াটাক গুড়, আর গোটা ছয়েক কলা, দেখতে দেখতে নিঃশেষ করে ফেললে চতুর্ভুজ। তারপর আলগোছে এক ঘটি জল খেয়ে সুদীর্ঘ ঢেঁকুর তুললে একটি।

মুখ ধুয়ে এসে চতুর্ভুজ গামছায় হাত মুখ মুছতে মুছতে বললে, রৌঁয়া তা হলে খাটিয়ার উপর আরাম করুন, সে এখন মাঠে যাচ্ছে। বিদিয়া একটু পরে ওঁকে শিকারের 'ভাঁজ' সব ঠিক করে দেবে।

বিস্ময়ে ভুবন সোমের মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। এই গুরুভোজনের পরও লোকটা আড়াই ক্রোশ পথ হেঁটে যাবে!

একটু পরেই মহিষের চামড়ার তৈরি নাগরা জুতো পরে— বাইরে চালের বাতায় গোঁজা ছিল সে দুটি—আর প্রকাণ্ড একটি তৈলপক্ক পাঁশের লাঠি ঘাড়ে করে চতুর্ভুজ গোপ বেরিয়ে গেল।। যাবার আগে বার বার আশ্বাস দিয়ে গেল যে সব ঠিক হয়ে যাবে, তিনি একটু আরাম করে নিন আগে!

বিদিয়া বললে, 'আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি একটু আসছি বাইরে থেকে '

'তুমি খেলে না?'

'আমি দশটার সময় খেয়ে নিয়েছি। আমি স্কুল যেতাম তো, সেই আগেকার অভ্যাস থেকে গেছে।'

বিদিয়া একটা ছোট পাত্রে খানিকটা ছাতু মাখতে লাগল।

'ও আবার কার জন্যে?'

'সারির জন্যে। এ আমার এক জ্বালা হয়েছে, আমি শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে কে যে ওকে খেতে দেবে জানি না।'

'সারি কে আবার? তোমার বোন নাকি?'

'বোন কেন হতে যাবে! পোষা শালিক পাখী।'

'কই, কোথায়?'

'এখন চবতে গেছে। একটু পরে আসবে। এসে খাবার না দেখলে হাল্লা করবে।'

বিদিয়া একটা খালি খাঁচা বার করলেন। তার ভিতর ছোট একটা বাটিতে মাখা ছাতুটা রেখে, বারান্দায় টাঙিয়ে দিয়ে এল খাঁচাটা।

তারপর বললে, ওই যে তালগাছটা দেখছেন, আর একটু সরে আসুন— তা হলেই দেখতে পাবেন, ওই তালগাছে ওর জন্ম হয়েছিল গত বৈশাখে। একদিন দেখি, গাছের উপর থেকে পড়ে গেছে। ভাগ্যে আমি ওইখান দিয়ে যাচ্ছিলাম তাই দেখতে পেলাম। তারপর তুলে এনে এই খাঁচাটায় রেখে মানুষ করলাম। ওর মা এসে ওকে ফড়িং খাইয়ে যেত। আমি ছাতু খাওয়াতাম। তারপর যখন পালক টালক গজাল একদিন এসে দেখি, খাঁচা থেকে উড়ে গিয়ে নিজেই চরে বেড়াচ্ছে। মনে হল, বাঁচলাম, রোজ রোজ কে ওর সেবা করবে! ওমা, তার পরদিন দেখি ঠিক খাঁচায় এসে বসে আছে।

আর রোঁয়া ফুলিয়ে আমার দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলছে—রেডিও, রেডিও, রেডিও, কিক কিক কিক রেডিও! তার মানে ছাতু দাও। দিলাম ছাতু মেখে। তারপর থেকে রোজ আসে—'

ভুবন সোম মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন। 'কখন আসে?'

'কোনও ঠিক নেই। আমি কি ওর জন্যে বসে থাকি নাকি? খানিকটা ছাতু মেখে রেখে দিয়ে নিজের কাজে চলে যাই। এসে দেখি, ঠিক খেয়ে গেছে। আপনাকে দেখলে হয়তো আসবে না, আপনি শুয়ে পড়ুন। আমার দাদা এসেছিল ক্যামেরা নিয়ে, ওর একটা ফোটো তুলতে চাইল, কিছুতে বসল না, আপনি শুয়ে পড়ুন, আমি সুবোধের মাথায় আর একটু টিঞ্চার দিয়ে আসি। খাটটা ঘরের ভিতর নিয়ে যাই চলুন। চোখে আলো লাগলে আপনার ঘুম হবে না। সারিটাও আসবে না। ধরুন তো খাটটা, আমি একলা নিয়ে যেতে পাবব না—'

ঘরের ভিতর ঢোকবার ইচ্ছা ছিল না ভুবন সোমের। কিন্তু দেখলেন বিদিয়ার আদেশ অমান্য করা যাবে না। ঠিক টগরের মত, তার মত জেদীও।

ধরাধরি করে খাটটা ভিতরে আনা হল।

'আপনি এইখানে ঘন্টাখানেক শুয়ে থাকুন।'

'আমার দিনে ঘুমোনো অভ্যাস নেই।'

'চোখ বুজে শুয়ে থাকুন তবু খানিকক্ষণ। আমি আসছি—'

টিঞ্চার আয়োডিনের ছোট শিশিটা হাতে করে বেরিয়ে গেল। দেখলেন, ঘরে টুকিটাকি

অনেক ওষুধপত্র আছে একটা শেলফে। ভুবন সোম কি আর করবেন, শুলেন। শুয়েই কিন্তু উঠে পড়তে হল তাঁকে। ও ফোটোটা কার? মুখটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। উঠে ফোটোটাব কাছে গেলেন। আবে, এ যে সখীচাঁদ যাদবের ফোটো! ও হারামজাদার ফোটো এখানে এল কি করে?

'আপনি এখনও শোন নি?'

বিদিয়া ফিরে এল।

'সুবোধের কপালটা অনেকখানি কেটে গেছে সত্যি। রক্ত গড়াচ্ছে দেখলাম। টিঞ্চাবে কমবে তো? বৈবিয়ার বিভূতিবাবু ডাক্তারকে খবর পাঠিয়েছিলেন, তিনি টিঞ্চার পাঠিযে দিয়েছেন। এতেই ঠিক কমে যাবে, কি বলেন?'

'যাবে। কিন্তু খুব বেশী দিও না। রোজ একবারের বেশী দিলে ঘা বেড়েও যায় শুনেছি। আচ্ছা, এ ফোটো কার?'

বিদিয়া মুখ ফিরিয়ে লজ্জা গোপন করলেন। তারপব মৃদুকণ্ঠে বললে, 'কারুব নয়।'

'কারুর নিশ্চয়ই। এ কে হয় তোমার?'

'আমার পতি।' বলেই এক ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

বিদিয়ার পতি সখীচাঁদ যাদব! এ কি অদ্ভুত যোগযোগ! খাটিয়াব উপর বসে পড়লেন ভুবন সোম। প্রায় মিনিট দশেক বিদিয়ার দেখা নেই। একটু পরেই বারান্দায় শোনা গেল— রেডিও রেডিও, কিক কিক—

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পিছনের একটা দরজা দিয়ে বিদিয়া এসে ফিস ফিস কবে বললে, 'সারি এসেছে, দেখুন।'

ভুবন সোম বারান্দায় যেই বেরিয়েছেন অমনি পিড়িং করে উড়ে গেল শালিকটা।

'আপনাকে দেখে ভয় পেয়েছে।'

ভুবন সোম আবার ঘরের ভিতরে এলেন। বিদিয়াও এল।

'তোমার পতি সখীচাঁদ যাদবকে আমি চিনি।'

'চেনেন?'

'হ্যাঁ। খুব দুষ্টু সে।'

'ঠিক বলেছেন। আমাকে লেখে কি জানেন? রোজ চিঠি লিখতে। রঙিন চিঠির কাগজ খাম আর ফাউন্টেন পেন পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি রোজ চিঠি লিখি কি কবে বলুন তো। এখান থেকে পোস্টাফিস দু ক্রোশ। রোজ কে চিঠি পোস্ট করতে যাবে? মক্‌খুকে অনেক খোশামোদ করে একদিন পাঠিয়েছিলাম। রোজ রোজ সে যাবে কি করে—'

'তা তো বটেই। মক্‌খু লোকটি কে?

'আমাদেব চরাবাহা, মানে আমাদের গরু-মোষ চরায়।'

'ও।'

'আপনি ওকে চিনলেন কি করে? কোথায় আলাপ হল?'

'আমিও যে রেলে চাকরি করি।'

'ও, তাই না কি! আচ্ছা, সোম সাহেব বলে আপনাদের এক উপরওয়ালা সাহেব আছেন

শুনেছি। তিনি কেবল সকলের নামে রিপোর্ট করে বেড়ান। উনি লিখেছেন, ওঁর নামে রিপোর্ট হয়েছে। আপনার নামেও রিপোর্ট করেছে নাকি?'

'না।'

ভুবন সোমের অবস্থা অবর্ণনীয়।

'উনি লিখেছেন, সোম সাহেব লোকটা খুব পাজী। নিজের ছেলের চাকরিটি পর্যন্ত খেয়ে দিয়েছেন। ঠিক আমার বিহনিয়ার মত, সকলকে গুঁতিয়ে বেড়াচ্ছে—'

বলেই হেসে ফেললে বিদিয়া।

ভুবন সোম বললেন,' হ্যাঁ, খুব কড়া লোক। সখীচাঁদ ঘুষ নিয়েছিল—'

বাঘিনীর মত গর্জন করে উঠল বিদিয়া।

'ঘুষ বলছেন কেন, 'উপরি' বলুন। প্যাসেঞ্জারদের উনি সুবিধা করে দেন, তারা, ভালবেসে ওঁকে দু-চার পয়সা দেয়। এতে দোষ কি আছে! আসলে লোকটা হিংসুট পাজী, অপরে দু পয়সা পাচ্ছে তা সহ্য করতে পারে না, তাই রিপোর্ট করেছে।'

ভুবন সোম চুপ করে থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করলেন।

'ভুবন সোমের সঙ্গে আলাপ আছে আপনার?'

'আছে।'

'তাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন তো! যদি ওঁর চাকরিটি চলে যায়, তা হলে আমার আর শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হবে না।'

'আচ্ছা, বলব।'

ভুবন সোম বেশ একটু বিপন্ন বোধ করছিলেন। কিন্তু কি করবেন তা তিনি জানতেন। রিপোর্ট তাঁকে করতেই হবে, কোনও কারণেই কর্তব্যে তিনি অবহেলা করবেন না। কালই তিনি স্টীমারে সেই ছোকরাকে জোর গলায় বলে এসেছেন—আমরা ওল্ড্ স্কুলের লোক, আমাদের মটো হচ্ছে ডিউটি ফার্স্ট, সেলফ লাস্ট।

'আপনি ঘুমুবেন না'

'দিনে আমাব ঘুম আসে না।'

'তবে চলুন, শিকারের ব্যবস্থাই করা যাক।'

বিদিয়া একটু পরে দুটো ময়লা শতচ্ছিন্ন কাপড় নিয়ে ফিরে এল।

'আপনার কাপড়চোপড় ছেড়ে ফেলুন, এইগুলো পরুন।'

'এইগুলো পরব? তার মানে?'

'ফরসা কাপড়চোপড় পরা ভদ্রলোক দেখলেই হাঁসগুলো পালাবে! কিন্তু এই কাপড় পরে যদি আপনি ওদের খুব কাছেও যান, তা হলেও ওরা উড়বে না। মনে করবে—আপনি বুঝি মজুর একজন। আমি কি ঠিক করেছি, শুনুন বলছি। আপনার বন্দুকটায় টোটা ভরে দিন, আমি সেটা নিয়ে ক্ষেতের ভিতর দিয়ে দিয়ে লুকিয়ে চলে যাই। আমাকে এমনি দেখলে ওরা উড়ত না, কিন্তু বন্দুক থাকাতে উড়তে পারে। তাই আমি লুকিয়ে লুকিয়ে যাব। ওদের খুব কাছে গিয়ে আমি আপনাকে ইশারা করব। আপনি তখন এই কাপড় পরে আর এই গামছার পাগড়ি বেঁধে এক বোঝা বুটের শাক মাথায় নিয়ে আমার কাছে চলে আসবেন। ওরা

দেখবেন উড়বে না। আপনাকে মজুর মনে করবে। আপনি তখন ফায়ার করতে পারবেন, বাজিও জিতে যাবেন। ক টাকা বাজি রেখেছেন, বাজি জিতলে আমাকেও দেবেন তো কিছু?'

মুচকি মুচকি হাসতে লাগল বিদিয়া।

'টাকার বাজি রাখি নি, মানের বাজি। ওদের ধারণা, আমি পাখী মারতে পারি না। আজ ওদের দেখিয়ে দিতে চাই যে, আমিও পারি।'

'এখানে আর কখনও আপনি এসেছিলেন?'

'না, দিলারপুর, বাঘাড়বিল, কাটাহা, ফসিয়াতল—এসব জায়গায় গেছি। কিন্তু এখানে এইবার প্রথম এলাম। মনে হচ্ছে, না এলেই হত।'

ছোট ছেলেকে মা যে সুরে ভোলায়, বিদিয়ার কণ্ঠে সেই সুর ফুটল।

'এখানেও তো অনেক পাখী আছে। এবারে আপনি ঠিক মারতে পারবেন। সাহেবী পোশাক ছেড়ে এইগুলো পরে ফেলুন। আর টোটা পুরে বন্দুকটা আমাকে দিয়ে দিন, আমি চলে যাই।'

'চল না, আমিও তোমার সঙ্গে যাই। কাপড় বদলাবার দরকার কি, তুমি যদি লুকিয়ে লুকিয়ে যেতে পার আমিও পারব।'

'পারবেন না, আপনি যে বড্ড লম্বা। যা বলছি শুনুন।'

কাপড়গুলো যে বড্ড ময়লা!'

'ময়লা কাপড়ই তো দরকার। ময়লা-কাপড়-পরা লোকদের ওরা ভয় পায় না। ভয় পায় আপনাদের মত ফরসা কাপড় পরা লোকদের। আর এক কাজও করতে পারেন। গাছ সেজে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কিন্তু—'

'সে আবার কি রকম?'

'আমি কতকগুলো ঝাউগাছের ডাল কেটে আপনার গায়ে মাথায় পিঠে বেঁধে দেব। আপনাকে ঠিক ঝাউগাছের মত দেখাবে দূর থেকে। ওরই ভিতর বন্দুকটাও লুকিয়ে নিতে হবে। তারপর আপনি খুব আস্তে আস্তে এগুবেন। একটু এগুবেন, আবার খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন। তারপর আস্তে আবার একটু এগুবেন—,'

বিদিয়া দেখিয়ে দিলে কি ভাবে অগ্রসর হতে হবে।

'এইরকম করতে করতে ওদের খুব কাছাকাছি যখন এসে পড়বেন, তখন বন্দুক চালাবেন। আপনি যদি খুব আস্তে আস্তে ওদের কাছে যেতে পারেন, তা হলে ওরা উড়বে না—আপনাকে ঝাউগাছ মনে করবে। দেখুন, কোনটা আপনার পছন্দ সেই রকমই ব্যবস্থা করি।'

'এ ছাড়া অন্য উপায় নেই?'

'না। তবে সকালবেলা ওরা যেমন করেছিল, তেমনি করলে হতে পারত। কিন্তু আপনার তো মোটর বোট নেই। ওরা এসে সব পাখীগুলোকে উড়িয়ে দিলে, তারপর সেই উড়ন্ত অবস্থাতেই দমাদ্দম গুলি চালাতে লাগল তিন-চারজন মিলে। তাতে কয়েকটা জলে পড়ল। কিন্তু আপনি তা করবেন কি করে? আপনার বোট নেই, তা ছাড়া আপনি একা। আমি যা বলছি তাই করুন। ঠিক মারতে পারবেন। নবাবগঞ্জের জমিদারের ছেলে ছবিলালবাবু

এইরকম শিকার করেন। তাঁর কাছ থেকেই শিখেছি আমি। তিনি একবার মজুর সেজেছিলেন, একবার ঝাউগাছও হয়েছিলেন। অনেকগুলো পাখী মেরেছিলেন তিনি।'

ভুবন সোম কি করবেন ঠিক করতে পারলেন না সহসা। এক একবার ভাবছিলেন, পাখী আর মারব না, ফিরে যাই। কিন্তু ছট্টু সেন, কার্তিক আর অনিলের—বিশেষ করে অনিলের মুখটা মন পড়াতে মত বদলাতে হল তাঁকে। অন্তত একটা নিয়ে যেতে পারলেও মানরক্ষা হবে।

'আপনি মজুর সেজেই চলুন প্রথমে। তাতে যদি না হয় ঝাউগাছ হবেন। বন্দুকটা আমাকে দিন টোটা পুরে।

মনস্থির করে ফেললেন ভুবন সোম। দেখাই যাক না, কি হয়! টোটা পুরে বন্দুকটা দিয়ে দিলেন তাকে। লক করে দিলেন। মেয়েটা যে রকম ছটফটে আর ফাজিল, অ্যাকসিডেন্ট না করে বসে।

'আপনি তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে আসুন। আমি অড়রক্ষেতের ভিতর দিয়ে লুকিয়ে যাচ্ছি। নওলকিশোরের ক্ষেতেব মজুরগুলোকে বলে যাচ্ছি, তাবা আপনাকে এক বোঝা বুটের শাক দিয়ে দেবে। আপনি প্রথমে যে জায়গায় বন্দুক ছুঁড়েছিলেন আমি তারই কাছাকাছি বসে থাকব কোথাও। যেখানে হাঁস দেখবে সেইখানেই বসে পড়ব। আমি ইশারা করলে. তবে আপনি যাবেন। কেমন?'

বন্দুকটি নিয়ে বেরিয়ে গেল বিদিয়া। ভুবন সোম প্যান্ট ছেড়ে মক্‌খুর কাপড় পরতে লাগলেন। উঃ, কি দুর্গন্ধ! কখনও কাচে না বোধ হয়। চুলুহার কথা মনে পড়ল। বহুকাল পূর্বে চুলুহা বলে তাঁর এক চাকর ছিল। দৈত্যের মতে চেহারা। কিন্তু শখ ছিল 'টাইট' গেঞ্জি পরবার। বেছে বেছে গলাবন্ধ ছোট মাপের গেঞ্জি কিনত। দু-তিনজনে মিলে তাকে পবাত সেই গেঞ্জিটা। গেঞ্জি এত টাইট হত যে, পবার পর খানিকক্ষণ হাত ঝোলাতে পারত না সে। সেই যে একবার গেঞ্জিটা পরত— বাস্। আর খুলত না সে। সেই গ থেকেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ে যেত। এরা পারতপক্ষে কেউ কাপড় জামা কাচে না।

...হাঁটু পর্যন্ত ময়লা কাপড় পরে মাথায় ময়লা গামছার পাগড়ি বেঁধে, খালি গায়ে যখন বের হলেন ভুবন সোম তখন একটা দেখবার মত দৃশ্য হল। তাঁর বুকে, পিঠে, পেটে প্রচুর লোম ছিল। বহুদিন তারা এমন মুক্ত বাতাস এবং আলোর স্পর্শ পায় নি। গঙ্গার চরের হাওয়া-আলো লেগে তাদের মধ্যেই শিহরণ জাগল প্রথম। সত্যিই ভুবন সোমের রোমাঞ্চ হল। যদিও বেলা প্রায় বারোটা বেজে গিয়েছিল, রোদও উঠেছিল বেশ. তবু একটু একটু জোরে পা চালিয়ে চলতে লাগলেন। নওলকিশোরের ক্ষেত বেশীদূর নয়। যতটা খারাপ লাগবে ভেবেছিলেন ততটা খারাপ কিন্তু লাগছিল না; বরং মনে হচ্ছিল যেন নবজন্ম লাভ করেছেন। হঠাৎ শৈশবসুলভ চাপল্য ফিরে এল যেন। বেশ দ্রুতপদে, প্রায় দৌড়ে, তিনি নওলকিশোরের ক্ষেতে গিয়ে পৌঁছলেন।

মজুরগুলো তখনও কাজ করছিল সেখানে, তাঁকে দেখে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

একটা ছোঁড়া-গোছের মজুর দাঁত বের করে বললে, 'চিড়িয়াকো লালচসে বাবু মজদুর বনি গেলছে।' অর্থাৎ পাখীর লোভে বাবু মজুরে রূপান্তরিত হয়েছেন।

অন্য সময় হলে ভুবন সোম চটে উঠতেন। এখন কিন্তু চটলেন না, উপভোগ করলেন

রসিকতাটা। তাদের পাশে বসে বললেন, 'লালচসে নেহি, জিদসে। চিড়িয়া আজ মারনেই হোগা একঠো। বিদিয়া কাঁহা গিয়া?'

একজন মজুর ক্ষেত থেকে বেরিয়ে গেল। ভুবন সোমও গেলেন তার পিছু পিছু। গিয়ে দেখলেন, যেখানে দাঁড়িয়ে একটু আগে তিনি ফায়ার করেছিলেন তার কাছে পিঠে কোনও পাখী নেই, বিদিয়াও নেই।

'হে গে বিদিয়া গে —'

তারস্বরে চিৎকার করে উঠল মজুরটা কানে হাত দিয়ে।

'ওতনা জোর সে মৎ চিল্লাও পাখী ভড়ক যায় গা।'

লোকটা হেসে বললে, তাদের ডাকে পাখী ভড়কাবে না। তারা ক্রমাগতই এ রকম হাঁকাহাকি করে পাখীরা ঠিক বসে থাকে। আর'র ঠিক তেমনি ভাবে কানে হাত দিয়ে আর একবার চেঁচালে, কিন্তু বিদিয়ার কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

ভুবন সোম তখন মজুরটাকে এক বোঝা বুটের শাক নিয়ে আসতে বললেন। ভাবলেন, সেইটে মাথায় নিয়ে নদীর ধারে ধারে যাওয়া যাক। কিছুদূর গিয়ে বিদিয়ার দেখা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

লোকটা ঘাসের বোঝা এনে দিয়ে দাঁত বার করে বললে, 'একঠো মোটা বিড়ি মিলতিয়ে হুজুর।'

সিগার চাইছে।

'হামর' সাথ তো নেই হ্যায়। পিছে দে গা, বিদিয়াকা ঘরমে রাখকে আয়া।'

মাথায় শাকের বোঝা নিয়ে হাঁটছিলেন তিনি। কোথায় পাখী। একটিও তো দেখা যাচ্ছে না। কেবল সেই টার্ন আর মাছরাঙা আর ঝাউগাছে চড়ুই পাখীর মত সেই পাখীগুলো। অনেক দূর হাটবার পর হাঁসের ডাক শুনতে পেলেন। তারপর বিদিয়াকে দেখতে পেলেন। আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বিদিয়া গাছ কোমর করে কাপড় পরেছে, বন্দুকটা পিঠের উপর বেঁধেছে, সাপের মত বুকে হেঁটে একটা টিলার উপর উঠছে। টিলার উপর উঠে সন্তর্পণে সে মুখ বাড়িয়ে নীচের দিকে চাইলে। নীচেই গঙ্গা। মেয়েটার সাহস আছে বলতে হবে। ওই অপলকা বালির টিলা যদি ধসে পড়ে তা হলেই মৃত্যু, অত উঁচু থেকে একেবারে জলে পড়বে।

ভুবন সোম রুদ্ধশ্বাসে দেখতে লাগলেন। কিছু হল না। টিলা থেকে নেবে এল বিদিয়া। হেঁটে নাবল না, বন্দুকটা পিঠ থেকে খুলে নিয়ে দু হাত ধরে ঢালু টিলা বেয়ে সর সর করে নেবে এল। শহরের পার্কে ছেলেমেয়েরা যেমন 'স্লিপ' খায় অনেকটা তেমনই করে। টিলার নীচে নেবে এদিক ওদিক চাইতে লাগল সে। তারপর দেখতে পেলে ভুবন সোমকে। ঘন ঘন হাতছানি দিয়ে ইশারা করলে ভুবন সোম চলতে লাগলেন। হাঁসের ডাক তিনি আগেই শুনতে পেয়েছিলেন, কাছাকাছি আসাতে আরও স্পষ্ট শুনতে পেলেন। তারপর দেখতে পেলেন। তাদের খুব কাছ দিয়ে যেতে লাগলেন, তবু তারা পালাল না। বিদিয়া কুঁজো হয়ে হেঁট দেখিয়ে দিলে—কুঁজো হয়ে হাঁটুন। কুঁজো হয়েই হাঁটতে লাগলেন ভুবন সোম। বিদিয়ার কাছাকাছি আসতেই বিদিয়া বন্দুকটা তাঁর হাতে দিয়ে ফিসফিস করে বললে, 'অনেক বড় বড় হাঁস

আছে। ঠিক টিলাটাব নীচেই বেশী আছে। আপনি টিলাটাব উপবে গিয়ে শুয়ে মাকুন ওপব থেকে। ঠিক নীচেই আছে হাঁসগুলো। দিন, বন্দুকটা আমি ধবছি। আপনি বুকে ভব দিয়ে ওপবে উঠুন আগে, তাবপব আপনাকে বন্দুকটা দেব।'

ভুবন সোম তাই কবলেন। বিদিয়া যেমন কবে টিলাব উপব উঠেছিল তিনিও তেমনিভাবে উঠতে লাগলেন। বিদিয়াও বন্দুকটা নিয়ে তাঁব পিছু পিছু ঠিক তেমনি ভাবে উঠতে লাগল। টিলায় উঠে তিনিও সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে দেখলেন অনেক হাঁস বয়েছে—গীজ, টিল অনেক। পঞ্চাশ গজেব মধ্যেই

বিদিয়া বন্দুকটা এগিয়ে দিলে আস্তে আস্তে।

অনেকক্ষণ ধবে লক্ষ্য কবে দডাম দডাম্ কবে দুবাব ফাযাব কবলেন তিনি। চিৎকাব কবে হাঁসগুলো উডল। বিদিয়া ছুটে নীচে নেবে গেল।

তিনিও গেলেন। একটাও পডে নি।

।। ছয় ।।

প্রায় ঘন্টাখানেক কেটে গেছে গঙ্গাব চবে একা বসে আছেন ভুবন সোম। অদ্ভুত চেহাবা হয়েছে তাঁব পবনে হাঁটু পর্যন্ত ময়লা কাপড, মাথায ময়লা পাগডি। বুকে পিঠে গোঁফে ভুরুতে মাথায বালি লেগেছে প্রচুব। বিদিয়া ঝাউগাছেব ডাল কেটে আনতে গেছে। আশ্বাস দিয়ে গেছে, ঝাউগাছ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে এইখানেই আবাব হাঁস পাবেন তিনি। ঠিক পাবেন সেই আশায় বসে আছেন ভুবন সোম। তাঁব অন্তবেব অন্তস্তল থেকে কে যেন বলছে, ওব কথা মিথ্যে হবে না। হাঁসেবা ঠিক ঘুবে আসবে আবাব। আব একটা কথাও তিনি অবাক হয়ে ভাবছিলেন। তিনি হঠাৎ কেঁদে ফেললেন কেন। তিনি জীবনে কখনও কাঁদেন নি, মা বাবা স্ত্রী টগব —কাবও মৃত্যুতে তিনি কাঁদেন নি। ঋণেব দাযে গাঁটা যখন বিষুণদাস মাবোযাডী নিয়ে নিলে, তাঁদেব পথে দাঁডাতে হল, তখনও এক ফোঁটা জল তাঁব চোখ দিয়ে বেবোয নি। কিন্তু আজ এ কি হল। হাঁস মাবতে পাবেন নি তো কি হয়েছে। বুডো হয়েছেন, হাত কেঁপে যাচ্ছে, এতে কাদবাব কি আছে? এই ই তো স্বাভাবিক। ছি- ছি, ঝব ঝব কবে কেঁদে ফেললেন মেয়েটাব সামনে। যদিও ওকে বললেন যে, চোখে বালি পডেছে বলে জল বেরুচ্ছে, কিন্তু ওব মুখ দেখে উনি তখনই বুঝলেন যে, মিথ্যে কথায ও ভোলে নি। ও ঠিক বুঝতে পেবেছে, কোন কথা বলে নি কিন্তু। অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল কবে চেয়েছিল কেবল তাঁব মুখেব দিকে। অতবড মুখবা মেয়ে, একটি কথা বলে নি তাবপব থেকে। যাবাব আগে কেবল বলে গেল, 'আপনি বসুন এখানে, আমি ডাল উডাল নিয়ে আসি। হাঁসেবা আবাব এখুনি আসবে। এবাব ঠিক মাবতে পাববেন।'

মাবতেই হবে। হাঁস না নিয়ে তিনি যাবেন না এখান থেকে। সমস্ত বাত যদি এই চবে বসে থাকতে হয, তাও থাকবেন।

চবেব দিকে চেয়ে চুপ কবে বসে বইলেন তিনি। হঠাৎ তাঁব মনে হল, তাঁব জীবনও ঠিক এই চবেব মত খাঁ-খাঁ কবছে। কেউ নেই, কিছু নেই। গঙ্গাব চবে তবু পাখী আসে, নৌকো ভেডে, চাষীবা কাজ কবে, বিদিয়াবা ঘব বাঁধে; তাঁব জীবনেব চবে ধূ-ধূ বালি কেবল। চব

নয়—মরুভূমি, তাতে মরীচিকাও নেই, ওয়েশিসও নেই। 'নেভার মাইণ্ড, বেটার লাক্ নেকস্ট (next) টাইম, মানে পরজন্মে আর যেন এ দেশে না জন্মাতে হয়।' বলেই থেমে গেলেন তিনি। মনে হল, না, এ দেশের দোষ কি! আজ সকাল থেকে যতগুলো লোকেব সঙ্গে দেখা হল—ভুট্টা, ভাগিয়া, ভিখন, চতুর্ভুজ, বিদিয়া—এরা কি খারাপ লোক? অন্য দেশে কি এদেব চেয়ে ভাল লোক আছে? না, দেশের দোষ নয়, দোষ তাঁর কপালের।.....

এক বোঝা ঝাউয়ের ডাল টানতে টানতে বিদিয়া এসে হাজির হল। দড়িও এনেছে খানিকটা। হাঁপাচ্ছে।

'আসুন, তাড়াতাড়ি বেঁধে দিই। ওই দিকে দেখলাম, দুটো চখা উড়ছে। এখনও বসে নি। কিন্তু এইখানেই বসবে কোথাও। আসুন—'

ভুবন সোমেব পেটে, পিঠে, মাথায় সে ঝাউয়ের ডালগুলো বাঁধতে লাগল।

'সামনেব ওই ডালগুলো ভিতর বন্দুকটা আড়াল কবে বাখুন। টোটা পুরেছেন?'

'পুরেছি।'

'এইখানেই বসবে চখা দুটো। আপনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন। একটুও নড়বেন না যেন, আমি ওই অড়রক্ষেতে বসছি গিয়ে।'

সর্বাঙ্গে ঝাউডাল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন ভুবন সোম। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনের মিনিট কাটল। হাতঘড়িটা হাতেই বাঁধা ছিল তাঁর, মাঝে মাঝে আড়চোখে সেটার দিকে চেয়ে দেখছিলেন। আবও পাঁচ মিনিট কাটল। নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি! ঠিক আসবে, বিদিয়া যখন বলছে তখন ঠিক আসবে।

'কাঁ-আ—'

ওই আসছে। সর্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎ-শিহরণ বয়ে গেল তাঁর। কিন্তু একবার ডেকেই থেমে গেল কেন? আব তো ডাকছে না? কোথা গেল? ঘাড় ফিবিয়ে দেখতে ইচ্ছে কবছিল, কিন্তু সাহস হল না, বিদিয়া মানা করেছে। অড়রক্ষেতে বসে সে তাঁর প্রতিটি আচরণ লক্ষ্য কবছে। চুপ কবে দাঁড়িয়ে বইলেন তিনি।

'কাঁ-আ, কাঁ-আ—'

কটা? অনেকগুলো মনে হচ্ছে। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'কাঁ-আ, কাঁ-আ—'

ঠিক তাঁর সামনে এসে বসল এক জোড়া চখা। খুব কাছে একটু স্থির হয়ে বসুক, এখুনি ফায়ার কবব না, ভাবলেন ভুবন সোম। মিনিট খানেক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ফায়ার করলেন।

দুটোই উড়ে গেল।

বজ্রাহতবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন ভুবন সোম।

'পড়েছে পড়েছে, একটা পড়েছে—'

চিৎকার করে বিদ্যুৎবেগে ছুটল বিদিয়া।

পড়েছে? কোথায়? তিনি তো দেখলেন, দুটোই উড়ে গেল। তাড়াতাড়ি ঝাউয়ের

ডালগুলো খুলে ফেললেন তিনি। চারদিকে চেয়ে বিদিয়াকে দেখতে পেলেন না। কোথা গেল ছুটে? তারপর দেখতে পেলেন, একটা জ্যান্ত চখা নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে।

'এই নিন। পায়ে খুব সামান্য লেগেছে। ভয়েই পড়ে গিয়েছিল। জ্যান্তই নিয়ে যান। ভালই হয়েছে, মরে নি। আপনার বাজি জেতাও হল, এটাও মল না। ইচ্ছে করলে একে পুষতেও পারেন। পোষ মানবে কি?'

ভুবন সোমের মুখ দিয়ে কথা সরছিল না।

মজুরগুলো ছুটে এল মাঠ থেকে। দড়ি দিয়ে চখার পা দুটো আর ডানা দুটো বেশ ভাল করে বেঁধে দিলে তারা। হাত ফসকে আর পালাতে পারবে না। হাতে ঝুলিয়ে নেবার জন্য আর একটা ফাঁসও করে দিলে। চমৎকার বড় চখাটা। গলার কালো কণ্ঠিটা দেখিয়ে একজন বললে, এটা নর, অর্থাৎ পুরুষ চখা।

চখাটা হাতে ঝুলিয়ে চতুর্ভুজ গোপের আস্তানায় এলেন ভুবন সোম।

বিদিয়াও পিছু পিছু এল।

'এখুনি চলে যাবেন?'

'হ্যাঁ, এখুনি যেতে হবে, প্রায় দুটো বাজে।'

'আর কিছু খাবেন না?'

'না।'

মকখুর কাপড়গুলো ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিজের জামা-কাপড় পরলেন ভুবন সোম। সর্বাঙ্গে বালি কিচকিচ করছে। তারপর একটু ইতস্তত করে মনিব্যাগ থেকে পাঁচ টাকার নোটটা বার করলেন। সেই নোটটা, যেটা ভাগিয়া কুড়িয়ে দিয়েছিল।

'এই নাও, তোমরা মিষ্টি খেও—'

'আপনার কাছ থেকে টাকা নেব? কি বলছেন আপনি।'

'তোমাদের জনমজুরদের বকশিশ দিও।'

'না, কাউকে কিছু দিতে হবে না। অতিথির কাছ থেকে আমরা পয়সা নিই না।'

এর পর আর কি বলবেন ভুবন সোম। একটু দাঁড়িয়ে ইতস্তত করলেন, তারপর বন্দুকটা কাঁধে তুলে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, তা হলে চলি। হ্যাঁ, এই সিগার কটা ওই মজুরদের দিয়ে দিও, ওরা চাইছিল। আচ্ছা চললুম তা হলে।'

চখাটাও হাতে ঝুলিয়ে নিলেন।

'আসুন।'

হঠাৎ হেঁট হয়ে বিদিয়া প্রণাম করল তাঁকে।

'আচ্ছা।'

ভুবন সোম এগিয়ে গেলেন কিছু দূর।

'শুনুন—'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, বিদিয়া ছুটে আসছে।

'সোম সাহেবের সঙ্গে যদি দেখা হয় ওঁর জন্যে বলবেন একটু। চাকরিটা যেন না যায়—'

'আচ্ছা, বলব। কিন্তু ঘুষ নেওয়া যদি প্রমাণ হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে সোম সাহেব কিছু করতে পারবেন না। তাঁকেও তো চাকরি করতে হয়—'

'তবু বলবেন একটু।'

বিদিয়া চলে গেল।

ভুবন সোম হাঁটছিলেন। কাঁধে বন্দুক, আর হাতে চখাটা। কোথায় যাচ্ছেন খেয়াল ছিল না তাঁর। গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে সোজা চলেছিলেন খুব, কিন্তু সে দিকেও আর খেয়াল ছিল না। যন্ত্রচালিতবৎ হাঁটছিলেন।

এইবার দেখতে পেলেন, আর একটা চখা তাঁর মাথাব উপব উড়ছে। এরই সঙ্গীটা নাকি।

আরও কিছুদূর এগিয়ে গেলেন।

'কাঁ-আ, কাঁ-আ, কাঁ-আ—'

সমানে মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলেছে।

'এটাকেও শেষ করে দেওয়া যাক।'

বাঁধা চখাটা মাটিতে নাবিয়ে রেখে বন্দুকে টোটা পুরলেন। ঠিক মাথার উপরে উড়ছে, একটু যেন নেমে এল। ফায়ার কবলেন। লাগল না। চখাটা চক্রাকাবে উড়তে লাগল। খানিকক্ষণ সেটার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন। পালাচ্ছে না তো? আবার ফায়াব কবলেন। এবাবও লাগল না।

'মরুক গে—'

চখাটা তুলে নিয়ে আবার হাঁটতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে আবার শুনতে পেলেন—'কাঁ আ' 'কাঁ-আ'। হাতের চখাটা ছটফট কবতে লাগল। ভুবন সোম দ্রুতবেগে এগিয়ে যেতে লাগলেন। প্রায় দৌড়তে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে হাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। বসলেন এক জায়গায়।

'কাঁ-আ, কাঁ-আ, কাঁ-আ—'

সমানে উড়ে আসছে চখাটা সঙ্গে সঙ্গে। তিনি বসতে তাঁব মাথার উপর চক্রাকারে ঘুবতে লাগল। ভুবন সোম পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন, আরও গোটা দুই টোটা আছে! কিন্তু আব ফায়ার করতে ইচ্ছে হল না তাঁর। কিন্তু চখাটা কাঁ-আ কাঁ-আ শব্দ করে ক্রমাগত চক্রাকারে উড়তে লাগল মাথার উপর। একটু দূরে ভিখন গোপের নৌকোটা বাঁধা আছে দেখলেন। কিন্তু কাছে পিঠে আর কাউকে দেখতে পেলেন না। মহেন্দর সিংয়ের ডোটায় আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হল না। ভাবলেন, সোজা হাঁটতে হাঁটতে ঘাটেই চলে যাই।

আবার উঠে হাঁটতে লাগলেন।

'কাঁ-আ, কাঁ-আ—'

এইভাবে আধ ঘন্টাটাক কাটল। তারপর আশ্চর্য ঘটনা ঘটল একটা। তিনি কবি নন, তবু তাঁর মনে একটা আজগুবি রূপক মূর্ত হতে লাগল ক্রমশ। তাঁর মনে হতে লাগল, যে পুরুষ চখাটাকে তিনি জখম করে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছেন সে যেন সখীচাঁদ, আর যেটা উড়ে উড়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসছে সে বিদিয়া। 'কাঁ-আ, কাঁ-আ, কাঁ আ' এই ডাকের মধ্যে তিনি শুনছিলেন, 'দয়া করুন, ওকে ছেড়ে দিন। ওর চাকরিটা যেন না যায়, তা হলে আমার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হবে না।'

বন্দী পাখীটা ছটফট করছে তাঁর কবলে।

সূর্য পশ্চিম গগনে হেলে পড়েছে। বালির চর ভেঙে হেঁটে চলেছেন ভুবন সোম মাথার উপর করুণ কণ্ঠে ডাকতে ডাকতে উড়ে চলেছে চখীটা। দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে আছেন তিনি চখাটাকে। কিছুদূর গিয়ে একটা সবুজ ক্ষেত চোখে পড়ল। চোখ জুড়িয়ে গেল। যেন মুগ্ধনেত্রে সেটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সবুজ গালিচা বিছিয়ে দিয়েছে কে যেন। ক্ষেতের মাঝখানে একটা লোক ঘাস কাটছিল। সেই দিকে এগিয়ে গেলেন ভুবন সোম। লোকটাকে ডাকতেই এগিয়ে এল সে।

'এই চিড়িয়াকো বন্ধন কাট দেও।'

লোকটার হাতে কাস্তে ছিল, পায়ের ডানার বাঁধন অনায়াসে কেটে ফেললে সে। ভুবন সোম ছেড়ে দিলেন পাখীটাকে। নিমেষের মধ্যে সঙ্গিনীর কাছে ফিরে গেল সে। তারপর একসঙ্গে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল।

যতক্ষণ দেখা গেল ভুবন সোম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন।

।। সাত ।।

সেদিনও সন্ধ্যার স্টিমারটা খুব 'লেট' আসছিল।

সখীচাঁদ যাদব নিজের কোয়ার্টারে বসে 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়ছিল তন্ময় হয়ে। সে ঠিক করতে পারছিল না বৈদেহীর সঙ্গে কার বেশী মিল তিলোত্তমার, না আয়েষার। হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে পয়েন্টসম্যান বাসদেওয়ের কণ্ঠস্বর শুনে সে চমকে উঠল।

'সখীচাঁদ বাবুসাহেব আয়ে হে।'

সাহেব। সাহেব কে এল আবার। লণ্ঠনটি নিয়ে বেরিয়ে দেখে—ও বাবা, স্বয়ং ভুবন সোম।

ভুবন সোম বাসদেওয়ের দিকে ফিরে বললেন, 'আব তুম যাও।'

বাসদেও চলে গেল

ভুবন সোম সখীচাঁদকে অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন একটা।

'তুলসীগাছ আছে তোমার বাড়িতে?'

তুলসীগাছ। আজ্ঞে না।

'কয়েকটা তুলসীপাতা চাই।'

'বোসবাবুর বাড়িতে আছে। আনব?'

'আন।'

সখীচাঁদ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। ভুবন সোম চেয়ারে বসে বসে পা দোলাতে লাগলেন। মিনিট দশেক পরে সখীচাঁদ ফিরল একমুঠো তুলসীপাতা নিয়ে।

'কাগজে মুড়ে দেব?'

'না। তোমার ওই কলসীতে কিসের জল?'

'গঙ্গাজল, সাব।'

'একটা বাটিতে ঢাল।'

সখীচাঁদ উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিল। কিন্তু কোন প্রশ্ন করবার সাহস ছিল না তার। একটা বাটিতে গঙ্গাজল ঢাললে সে খানিকটা।

'তুলসীপাতাগুলো ওর মধ্যে ফেলে দাও। আর এই পয়সাটা দাও।'

মনিব্যাগ থেকে একটি পয়সা বার করে দিলেন তাকে।

'এইবার তামা তুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ করে দিব্যি কর যে, আর কখনও ঘুষ নেবে না। হাঁ করে দেখছ কি? ওইগুলো হাতে নিয়ে তিনবার জোরে জোরে বল—আর আমি কখনও ঘুষ নেব না। জোবে জোরে বল।'

সখীচাঁদকে বলতে হল।

'এবার তোমাকে ছেড়ে দিলুম। ভবিষ্যতে এই প্রতিজ্ঞার কথা যেন মনে থাকে আর এক কাজ করো। অনিলকে খবর দিয়ে দিও যে, এই স্টিমারেই আমি চলে যাচ্ছি। আজ রাত্রেই খবরটা দিতে পারবে?'

'আমিই না হয় চলে যাব সার, ডিউটি ওভার হলে।'

'তাকে বলে দিও যে, আমি একটা চখা পেয়েছিলাম।'

'আচ্ছা, সার।'

ভুবন সোম উঠে ঘরে থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সখীচাঁদ লণ্ঠনটা নিয়ে এগিয়ে আসতেই বললেন, 'না, আলো দেখাতে হবে না।'

গটগট করে এগিয়ে গেলেন জেটির দিকে।

পনর দিন পরে ঝক্সু পিওন শ্রীমতী বৈদেহী যাদবের নামে গোলাপী খামে যে চিঠিটা দিয়ে গেল তাতে সখীচাঁদ সবিস্তারে যা লিখেছিল তা প্রকাশ কবা সম্ভব নয়। ছ পাতা চিঠি। এ কাহিনীর পক্ষে যেটুকু প্রাসঙ্গিক সেইটুকু শুধু উদ্ধৃত করছি।

পুনশ্চ দিয়ে সখীচাঁদ লিখেছিল, 'দেবী একটা সুসংবাদ আছে। ভুবন সোম আমার নামে রিপোর্ট করেনি। শুনলাম, সাহেবগঞ্জে আমাকে বদলি করেছে। ওটা খুব ভাল স্টেশন। অনেক উপরি—'

মহারাণী

।। এক ।।

মহারাণী ডেকে পাঠিয়েছেন শুনে শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থ একটু বিব্রত বোধ করলেন। যদিও তিনি জমিদার বাড়ির বেতনভুক ভৃত্য নন তবু তাঁকে যেতে হবে। বেতনভুক ভৃত্যেরা মাঝে মাঝে মনিবের আদেশ অমান্য করে, কিন্তু কাব্যতীর্থের তা করবার উপায় নেই, তাকে যেতেই হবে, কারণ তিনি মনে মনে জানেন যে মহারাণীর কেনা গোলাম তিনি। দাসখৎটা তিনি করে লিখে দিয়েছিলেন, কেন লিখে দিয়েছিলেন, কি শর্তে বা কি মূল্যের পরিবর্তে লিখে দিয়েছিলেন তা কেবল তিনিই জানেন। অনেকদিন আগে যে সব ঘটনা ঘটেছিল, যার কথা বাইরের লোক ঘুণাক্ষরেও জানে না, যা উপেক্ষা করলে কোনও ক্ষতি নেই, তা শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থকে আজও দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। মহারাণী ডাকলে তাঁকে যেতেই হবে, তিনি না গিয়ে পারেন না।

নটবর চাকর ডাকতে এসেছিল। তাকে তিনি বললেন, "তুমি যাও, আমি আসছি একটু পরে

নটবর চলে যাবার পর দুটি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আর একটু বিব্রত হলেন তিনি। প্রথম, এই ঠাণ্ডায় স্নান করতে হবে মহারাণীর কাছে অপরিচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া যায় না। অনেকদিন আগে একবার স্নান না করে মহারাণীর কাছে তিনি গিয়েছিলেন। মহারাণী তাঁর দিকে একনজর চেয়ে মৃদু হেসে বলেছিলেন, "তোমার অভ্যন্তরটা খুব শুচি তা আমি জানি কিন্তু বাইরেটা তা বলে অপরিষ্কার থাকাটা ভালো? ব্রাহ্মণের তো বাহ্যোভ্যন্তর শুচি হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় শুনেছি।" এর পর থেকে অস্নাত অবস্থায় মহারাণীর সম্মুখীন হতে সাহস করেননি তিনি কখনও সুতরাং যদিও তার বাতের ব্যথাটা বেড়েছে তবু ওই ঠাণ্ডা পুকুরের জলেই অন্তত একটা ডুব দিয়ে নিতে হবে তাঁকে। দ্বিতীয় সমস্যা, গৃহিণী। তিনি যেই শুনবেন মহারাণীর দরবারে ডাক পড়েছে অমনি তাঁর মুখে মেঘ ঘনিয়ে আসবে। অথচ আসা উচিত নয়। ওই মহারাণীর দৌলতেই যে তাঁদের সংসার স্বচ্ছন্দে চলছে একথা কে না জানে। অবশ্য, তিনি যে ব্রহ্মত্র ভোগ করছেন তা গালুটির জমিদারবাবুরা দিয়েছেন, কিন্তু মহারাণীর ইঙ্গিতেই যে দিয়েছেন একথা মহারাণী গোপন রাখতে চাইলেও গোপন থাকেনি, অন্তত তার কাছে থাকেনি। গালুটি স্টেটের ম্যানেজার কথাটা ফাঁস করে দিয়েছিলেন তাঁর কাছে। তার গৃহিণী সর্বমঙ্গলাও কথাটা জানেন। সর্বমঙ্গলাকে কত উপহার দিয়েছে মহারাণী। সর্বদা উপকার করবার জন্য ব্যস্ত। আইনত সর্বমঙ্গলার কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। কিন্তু মহারাণীর নাম শুনলেই তাঁর মুখ ভার হয়ে ওঠে। শ্রীহর্ষ মাঝে মাঝে ভেবেছেন মহারাণী নিজেই অনায়াসে তাঁকে একশ বিঘে জমি দিতে পারত, গালুটির বাবুদের জমিদারির তিনগুণ জমিদারি তার, কিন্তু সে তা দেয়নি। কেন দেয়নি? তার সঙ্গে সম্পর্কটা যাতে অনুগ্রহের ছোঁয়াচ লেগে মলিন না হয়ে যায় সেইজন্য? কিন্তু অনুগ্রহই তো করেছেন, সেটা না হয় বর্ষিত হয়েছে গালুটির বড়বাবু

মহেন্দ্রনাথের হাত দিয়ে। এভাবে ঘুরিয়ে নাক দেখাবার কি দরকার ছিল মাঝে মাঝে একথা ভাবেন শ্রীহর্ষ। মহেন্দ্রনাথও ভেবেছিল একথা। কিন্তু বহুকাল পূর্বের কথা এসব, বিস্মৃতির তলায় চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু এব মধ্যেই নিহিত আছে মহারাণী-চরিত্রের রহস্য। সে রহস্য আজও অনেকেরই কাছে রহস্যই থেকে গেছে, হয়তো আপনাদের কাছেও থাকবে। কিন্তু তার আভাস পেতে হলেও আগের ঘটনা পরম্পরা জানা চাই। সেইগুলোই আগে বলি। শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থ ততক্ষণ স্নান করে তৈরি হোন।

।। দুই ।।

একটা কথা প্রথমেই বলা দরকার, গল্পটি একালের নয়, সেকালের। সিপাহী-বিদ্রোহ সবে শেষ হয়েছে, কিন্তু তার জের তখনও সম্পূর্ণরূপে কাটেনি। জনসাধারণের মতামত এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদলের মতে সিপাহীরা বীর, ওরা ইংরেজদের উচ্ছেদ করে দেশের স্বাধীনতা আনতে চায়। আর একদলের ধারণা স্বাধীনতাব ব্যাপারটা ছুতো, হয়তো দু'একজনের এ উচ্চ আদর্শ থাকতে পারে, অধিকাংশই ডাকাত। দেশকে বিশৃঙ্খল করে দিয়ে লুটতরাজ করাই ওদের উদ্দেশ্য, মাৎস্যন্যায়ের যুগে একবার যেমন হয়েছিল। মহারাণীর বাবা সমুদ্রবিলাস চৌধুরী ছিলেন দ্বিতীয় দলের লোক। তাঁব দৃঢ় ধাবণা ছিল দেশী লোকেব হাতে আবার যদি শাসনভার ফিরে আসে তাহলে ভদ্রলোকদেব দুর্গতিব আর অন্ত থাকবে না। তাই এই ব্যাপারে তিনি ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন। শুধু তাই নয়, যারা ইংরেজদের সাহায্য করেনি তাদের যথাসাধ্য শাসনও করেছিলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে শোনা যায় বিশ্বদেব শর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ পলাতক বিদ্রোহী সিপাহীদের আশ্রয় দিয়েছিল বলে তাকে সপরিবারে নিজের জমিদারি থেকে উৎখাত করেছিলেন তিনি। সাহেবদের ফৌজ লেলিয়ে দিয়েছিলেন তার পিছনে। গোরার গুলিতে বিশ্বদেবের বড় ছেলে সূর্যদেব মারা যায়। তার স্ত্রীকেও নাকি গোরারা ধর্ষণ করেছিল। বিশ্বদেব ছোট ছেলে শঙ্করদেবকে নিয়ে দেশ ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। কথিত আছে সেই ব্রাহ্মণের অভিশাপে সমুদ্রবিলাসের নাকি পুত্রসন্তান হয়নি। বিশ্বদেব অভিশাপ দিয়েছিল চৌধুরীবংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না। মহারাণীর জন্মের পরেই মহারাণীর মা মারা গেলেন। সমুদ্রবিলাস আরও দুবার বিয়ে করেছিলেন কিন্তু আর কোনও সন্তান হয়নি। সেকালের এক সাহেব ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন সন্তানের জন্য আপনি আর বিয়ে করবেন না, কারণ আপনার আর সন্তান হবে না। তিনি এর কারণ নির্ণয় করেছিলেন গনোরিয়া! তাঁর ছোট ভাই পারুবাবু (পুরো নাম, পর্বতবিলাস) বিয়েই করেননি। সাহেব ডাক্তারের কথায় বিশ্বাস করেননি তিনি, তিনি বিশ্বাস করেছিলেন ব্রহ্মশাপে। তিনি বলতেন, গনোরিয়া কার নেই, ভদ্রলোক মাত্রেরই আছে, সেটা বংশলোপের কারণ হলে এদেশে কারও বংশ থাকত না। ওটা কারণ নয়, উপলক্ষ্য। এই বলে তিনি একটি সংস্কৃত শ্লোক বলতেন—

সুখান্তে শুষ্কিতা গাভী, দুঃখান্তে পুত্র পণ্ডিত
যশান্তে চপলা ভার্য্যা, কুলান্তে বৈরী ব্রাহ্মণঃ।

সুখের দিন যখন শেষ হয় তখন গাইয়ের দুধ শুকিয়ে যায়, দুঃখের অন্ত হয় পুত্র পণ্ডিত হলে। ভার্যা চপলা হলে মানুষের সুনাম নষ্ট হয়, আর কুল নষ্ট হয় ব্রহ্মশাপে। আমাদের ব্রহ্মশাপ লেগেছে। সুতরাং বিয়ে করে আর ভদ্রকন্যাদের বিপন্ন করার দরকার কি। আমাদের এখন একমাত্র কর্তব্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা। আমরণ কুমার থেকে তাই করেছিলেন তিনি। জপ তপ নিয়েই থাকতেন। এক তান্ত্রিক গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। লোকে বলত তিনি শব-সাধনাও করেছেন। আব একটা কাজও করতেন তিনি, বছরের মধ্যে প্রায় ছ'মাস পাহাড়ে পাহাড়ে কাটাতেন? পর্বতবিলাস নামের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যেই তাঁব এ ঝোঁক হয়েছিল, না, পর্বতেব নির্জনতায জপ তপ করবার সুবিধে হবে বলেই তিনি পাহাড়ে ঘুরতেন, তা কেউ জানে না।

সমুদ্রবিলাস যখন মাবা গেলেন তখন মহাবাণীর বয়স ষোলো। সেকালের নিযম অনুসারে ন'বছব বযস থেকেই মহাবাণীকে কোনও সৎপাত্রেব হাতে সম্প্রদান করবাব জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু কযেকটি কারণে তাঁব চেষ্টা সফল হয়নি। প্রথমত, পাত্র নির্বাচন ব্যাপারে অনেকদিন মনঃস্থিব কবতে পাবেননি তিনি। শেষ পর্যন্ত দুটি পাত্রকে তিনি নির্বাচন করেন। প্রথম পাত্রটি গ্রামেরই। তাঁব বাল্যবন্ধু ভবভূতি ভট্টাচার্যেব একমাত্র পুত্র শ্রীহর্ষ। ভাল বংশ, স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে নিখুঁত, লেখাপড়ায তীক্ষ্ণধী, আচার ব্যবহাবে বিনয়ী, জামাই কববার মতো ছেলে। মহাবাণীব ছেলেবেলাব সঙ্গীও। বাল্যবন্ধুব ছেলে বলে বাড়িতে তাব অবাধ গতি-বিধি ছিল। সুতবাং তাঁর এটা ভাবা অন্যায হয়নি যে শ্রীহর্ষেব সঙ্গে বিয়ে হলে মহাবাণীব আনন্দই হবে। তাছাড়া মনে মনে সমুদ্রবিলাসের আর একটা মতলব ছিল—শ্রীহর্ষকে শেষ পর্যন্ত ঘরজামাই করা। ভবভূতি ভট্টাচার্যের সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, এত বড় জমিদারেব একমাত্র মেয়েকে পুত্রবধূ করে নিয়ে গিযে উপযুক্ত মর্যাদায় রাখবাব সামর্থ্য যে তাঁব নেই, একথা সমুদ্রবিলাস জানতেন। কিন্তু তাঁর ওই মতলবটি ছিল বলে এ নিয়ে বেশী মাথা ঘামাননি। ভবভূতিব কাছে এ প্রস্তাব কবতে তিনি খোলাখুলিভাবে যা বললেন তাতে একটু দমে গেলেন সমুদ্রবিলাস। কথাটা শুনে ভবভূতি কয়েক মুহূর্ত চুপ কবে বইলেন, তারপর হেসে বললেন, "দেখ ভাই, আমি হেলে সাপ, বড় জোর একটা ব্যাঙ গিলতে পারি, কিন্তু হাতী গিলবার সামর্থ্য আমার নেই। তুমি বাল্যবন্ধু, তোমার সঙ্গে কুটুম্বিতা হলে আমি সুখীই হতাম,—কিন্তু—"

এই কিন্তুর জটটা খুলে দেবার চেষ্টা করেছিলেন সমুদ্রবিলাস। কিন্তু খোলেনি। অতি সাবধানে ইঙ্গিতটা দেবার চেষ্টা করলেন তিনি হেসে বললেন, "আমার মেয়ে জামাইই তো বিষয়ের মালিক হবে শেষ পর্যন্ত। অভাব তোমাদের থাকবে না।"

ভবভূতিও হেসে উত্তর দিয়েছিলেন।

"সেটা তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমার নিজের একটা সাধ আহ্লাদ আছে তো। আমিও তো পুত্রবধূ নিয়ে ঘর করতে চাই। তোমার মহারাণী পুকুর থেকে জলও আনতে পারবে না,

আমাকে দু'মুঠো রান্না করেও দিতে পারবে না, গরুর জাবও দিতে পারবে না। শ্রীহর্ষের মা সারাজীবন ওই কাজ করেছে, এখনও করছে। আমার ইচ্ছে শ্রীহর্ষের বউ এসে এবার ওর হাত থেকে সংসারের ভার নিক। তোমার মহারাণী হয়তো সে ভার নিতে চাইবে, অন্তত চেষ্টা করবে ও মেয়ে খুব ভালো, কিন্তু ও পারবে না। ও ময়ূরকে নাচাতে পারবে কিন্তু বাসন মাজতে পারবে না। আমি ওকে দেখছি তো। আমাদের ঘরে ওসব মেয়ে বেমানান। তুমি বরং গালুটির বড়বাবুর বড় ছেলেটির সঙ্গে সম্বন্ধ করে দেখ না। মহেন্দ্র ছেলে ভাল ' 'সে কথাও আমি ভেবেছি। কিন্তু তোমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে মেয়ে আমার ঘরেই থাকত। তাছাড়া শ্রীহর্ষকে আমার বেশী পছন্দ। তুমি তোমার যে সাধ আহ্লাদের কথা বললে তার ব্যবস্থা করাও অসম্ভব হবে না। তোমার বা তোমার স্ত্রীর যদি আপত্তি না থাকে রাধুনী, ঝি চাকর রেখে দিতে পারি। পঁচার মা তো সঙ্গে যাবেই। মহারাণীকে ও মানুষ করেছে, ওকে ছেড়ে ও থাকতে পারবে না "

ভবভূতি ভট্টাচার্য মাথা হেঁট করে নিজের প্রশস্ত টাকে বার কয়েক হাত বুলিয়ে শেষে বললেন, "আমি সাধ আহ্লাদ বলতে যা বুঝি, তা তোমার ঝি চাকর দিয়ে মিটতে পারে না কখনও কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে আমার— '

আবার টাকে হাতে বুলোলেন তিনি।

"কি কথা?"

এটা ঠিক যে তোমার মেয়েকে বিয়ে করলে তার ভবিষ্যতের ভাবনা আর থাকবে না। নিজের সাধ আহ্লাদের জন্য তার এমন উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে নষ্ট করাটা ঘোর স্বার্থপরতা হবে বোধহয়। হঠাৎ মনে হল কথাটা। ভেবে দেখি। আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর, শ্রীহর্ষকেই জিগ্যেস কর। যে যদি আপত্তি না করে আমি আর আপত্তি করব না।"

'বিয়ের ব্যাপারে ছেলের মত নেওয়াটা —"

সমুদ্রবিলাস বাক্যটি শেষ করলেন না, কিন্তু তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে অসুবিধা হল না ভবভূতির। তিনি মুখ তুলে চেয়ে দেখলেন সমুদ্রবিলাস ভ্রূকুঞ্চিত করে তার মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

ভবভূতি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "ক্ষতি কি—"

বলেই উঠে গেলেন তিনি।

সমুদ্রবিলাস নিজে কিন্তু কথাটা বলতে পারেননি শ্রীহর্ষকে। তিনি অনুরোধ করলেন প্রিয় বয়স্য রসরাজকে, তিনি যেন কথাটা পাড়েন তার কাছে। সেকালে বড় বড় জমিদারদের দরবারে 'বয়স্য' নামধেয় যে সব পার্শ্বচরেরা থাকতেন তাঁরা সবাই নিছক চাটুকারই ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে অনেকে নির্ভরযোগ্য বন্ধু ছিলেন, সুরসিকও হতেন অনেকে। তারা জমিদারদের অনুগৃহীত ছিলেন বটে কিন্তু তাঁরাই একমাত্র লোক ছিলেন যাঁরা জমিদারদের মুখের উপর স্পষ্ট কথা শোনাতে পারতেন।

অনুরোধটি শুনে রসরাজ বললেন, "দেখুন হুজুর, আমি পাচন খেলে যদি আপনার হজম

শক্তি বাড়ত তাহলে তা আমি খেতাম, তেতো হলেও খেতাম। কিন্তু ভব পুকুতেব ছেলেব কাছে এ প্রস্তাবটি কবলে আপনাব মান বাড়বে না, আমাবও মাথা হেঁট হয়ে যাবে। তবে আপনাব যখন হুকুম, তখন খববটা আমি জোগাড় কবে দেব।"

তিনি ভাব দিলেন হীরু নাপিতকে । সমাজেব সর্বস্তবে হীরু নাপিতেব যাতাযাত। কিন্তু মনোমত ফল ফলল না। হীরু নাপিত যে ভাষায়, যে ভঙ্গীতে এবং যে পবিবেশে সংবাদটা শ্রীহর্ষকে বলল তা একটু অন্যবকম হলে কি হত বলা যায় না।

একদিন হাটেব মাঝখানে একমুখ হেসে শ্রীহর্ষকে সম্বোধন কবে হীরু বলে বসল – "দাদাঠাকুব, শোন, শোন, তোমাব ববাত যে ফিবে গেল গো –"

শ্রীহর্ষেব বয়স তখন বছব কুড়ি। আসন্ন যৌবনেব ঈষৎ উদ্ধত দীপ্ত শ্রী চোখে মুখে। ভালে মেধাবী ছাত্র বলে তাব খাতিব ছিল এবং তাব জ্ঞাতি ভ্রাতা নিবঞ্জনেব ঈর্ষাও ছিল তাব উপব সেই জন্য। শুধু সেই জন্য নয় সমুদ্রবিলাসদেব সঙ্গে তাদেব ঘনিষ্ঠতাও ইন্ধন জুগিয়েছিল সে ঈর্ষাব আগুনে।

শ্রীহর্ষ সবিস্ময়ে প্রশ্ন কবলেন, 'ববাত ফিবে গেল? কি বকম?

'বাজাবাহাদুব তোমাকে ঘবজামাই কবতে চাইছেন যে গো। ভাবী মনে ধবেছে তোমাকে । তখন যেন এই গবীব হীরুকে ভুলে যেওনি।"

নিবঞ্জন পাশেই দাড়িয়েছিল। হো হো কবে হাততালি দিয়ে হেসে উঠল সে।

'এ আব নতুন কথা কি শোনালে হিরু। এ তো আমবা জানতামই যে মধুসূদন শেষকালে 'মোধো' হবে। আসল খববটাই তো তোমবা বললে না, মনে ধবেছে কাব বাজাবাহাদুবেব, না আব কাবও " শ্রীহর্ষেব মুখখানা লাল হয়ে উঠল, ওষ্ঠপব চোখ দিয়ে ছুটে বেরুল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। স্থিবকণ্ঠে কিন্তু উত্তব দিলেন তিনি।

"কাবো ঘবজামাই আমি হব না" – বলেই সেখান থেকে চলে গেলেন। কিছুদূব গিয়েই কিন্তু থেমে যেতে হল তাঁকে। ব্যাপাবটাব অন্য দিকটা চোখে পড়ল। ঘবজামাই না হলে যে মহাবাণী চিবকালেব মতো অপবেব হয়ে যাবে। তখন একবাব দেখাও যে হবে না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি দাড়িয়ে বইলেন কিছুক্ষণ। তাবপব সোজা মহাবাণীব কাছে গেলেন। দেউড়ি পেবিয়ে বৈঠকখানা মহল, সেখানে ঘোব ববে পাশ খেলা চলছিল বৈঠকখানা মহল পাব হয়ে বিশাল প্রাঙ্গণ, তাব একদিকে নাটমন্দিব আব একদিকে সাবি সাবি তিনটি মন্দিব – কালীব, সিংহবাহিনীব এবং দুর্গাব, পশ্চিম প্রান্তে বিবাট অতিথিশালা। তাবপব ফুলেব বাগান। ফুলেব বাগান পেবিয়ে তবে অন্দবমহল। সে-ও বিবাট। আগেই বলেছি অন্দবমহলে শ্রীহর্ষেব অবাধ গতি ছিল, যদিও সেটা অনেকে সুদৃষ্টিতে দেখত না। বিশেষ কবে মেয়েবা, মেয়েবও অভাব ছিল না। আত্মীয় স্বজনদেব বহু পবিবাব আশ্রয় পেয়েছিল সমুদ্রবিলাসেব অন্দবমহলে। একপাল পায়বাব মতো দিনবাত বক্‌বকম্ কবত তাবা।

তাঁদেবই একজন, শান্ত পিসি, শ্রীহর্ষেব দিকে তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "আজ এমন অসময়ে যে?"

"মহাবাণীব সঙ্গে দবকাব আছে একটু। সে কোথা?"

"সে খিড়কির বাগানে আছে বোধহয় কোথাও। অনেকক্ষণ দেখিনি—"

খিড়কির বাগানের দিকে শ্রীহর্ষ যখন চলে গেলেন তখন শান্ত পিসি তাঁর দেখন-হাসির দিকে চেয়ে মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'মরণ আর কি! বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার চেষ্টা করছে ছোঁড়া—"

শান্ত পিসির দেখন-হাসি শুকী (শুকতারা) সমুদ্রবিলাসের অনুগৃহীতা ছিলেন। কোন আইন অনুসারে তিনি সমুদ্রবিলাসকে ঠাকুরপো বলতেন তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি কেউ। তাঁব রূপ ছিল এবং সেইটেই সম্ভবত ছিল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দাবী।

তিনি মুচকি হেসে বললেন, "আসল খবরটি তুমি জান না দেখছি, তাই উল্টো উপমা দিয়ে বসলে। শ্রীহর্ষই চাঁদ, আমাদের দুলালী হয়তো সে চাঁদের রোহিণী হবে। ঠাকুরপো শুনছি বিয়ের কথা পেড়েছেন—"

সমুদ্রবিলাসের তৃতীয় গৃহিণীব দূর সম্পর্কের মাসী, থলথলে মোটা আর কুচকুচে কালো, কাত্যায়নী বসে ছিলেন কাছে! এ সংবাদ শুনে গালে হাত দিয়ে ঘাড়টি কাৎ কবে বললেন, "তাই এত বাড় বেড়েছে আজকাল।" অনেকেই কিছু একটা সন্দেহ কবছিল অনেক দিন থেকে। দেখন হাসির মুখে এ সংবাদ শুনে ঘসা কাচটা স্বচ্ছ হয়ে গেল হঠাৎ যেন।

খিড়কির বাগান ছোটখাটো বাগান নয়! প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বিঘা জমির উপব তা বিস্তৃত। ফুলের গাছ তো আছেই, ছোটখাটো পুকুরও আছে একটা। সেই পুকুর ধারে গন্ধরাজেব ঝোপের আড়ালে মহারাণীকে দেখতে পেলেন শ্রীহর্ষ। শ্রীহর্ষকে দেখেই ছুটে এল সে, আনন্দে তার মুখ উদ্ভাসিত।

"কার্তিককে বঘু পিঠে চড়তে দিয়েছে, দেখবে এস। শিগগিব এস, এখুনি নেবে পালাবে।"

কার্তিক মহারাণীর পোষা বাঁদর, আর রঘু পোষা ময়ূর।

শ্রীহর্ষ গিয়ে দেখলেন সত্যিই কার্তিককে পিঠে নিয়ে রঘু ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। "কম বেগ পেতে হয়েছে এজন্যে আমাকে—"

এইটেই মহারাণীর বৈশিষ্ট্য। সাধারণত যা সম্ভব হয় না, সাধারণত যা কেউ করে না তাই করবার দিকেই ওব ঝোঁক বেশী। ও উচ্ছের পায়েস বানিয়েছে, বট গাছকে ছোট মাটিব টবে বাঁচিয়ে রেখেছে, বাঘের বাচ্ছা আর গরুর বাচ্ছাকে জল খাইয়েছে একঘাটে, অবশ্য দুটোই পোষা। যে বেদের কাছ থেকে মহারাণী বাঁদরটা কিনেছিল সেই ওর নাম রেখেছিল কার্তিক। নাম শুনেই মহারাণীর খেয়াল হল ময়ূরের পিঠে ওকে চড়াতে হবে। কাজটা দুঃসাধ্য। কার্তিক রঘু দুজনেই এতে নারাজ। কিন্তু মহারাণীর জেদও কম নয়, কলা-কৌশলও নানারকম। অনুরোধ উপরোধ যখন ব্যর্থ হল তখন শুরু হল জবরদস্তি। রঘুর পা ডানা বেঁধে কার্তিককে জোর করে চড়িয়ে দেওয়া হত তার পিঠে, কার্তিকেরও হাত পা বাঁধা। পিঠের সঙ্গে বেঁধেই দেওয়া হত তাকে। কিছুদিন এই ভাবে চলবার পর রঘু আর কার্তিক দুজনেই বুঝল যে তাদের আপত্তি আর টিকবে না। মনিবটি বড্ড বেশী রকম জেদী। কার্তিক এও অনুভব করল

রঘুর পিঠে চড়তে খুব খারাপও লাগে না, বরং গাছের ডালের চেয়ে ওর পিঠ বেশী মোলায়েম। রঘুও দেখলে খারাপ একটু লাগছে বটে কিন্তু যত খারাপ লাগবে আশঙ্কা হয়েছিল তত খারাপ নয়, তাছাড়া মনিবের যখন অত ইচ্ছে,—শেষ পর্যন্ত কার্তিককে পিঠে চড়তে দিয়েছিল সে। রঘু দুর্দমনীয় পুরুষ ময়ূর। বাগানের সমস্ত সাপ ধ্বংস করেছিল বিশ্বম্ভর ষাঁড়টা পর্যন্ত তার ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকত। একদিন তার পিঠে চড়ে মাথার ঠিক মাঝখানটিতে এমন ঠোকর দিয়েছিল যে চোখে অন্ধকার দেখতে হয়েছিল তাকে। মহাবাণী ওর রঘু নাম রেখেছিল শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাবশত নয়, রঘু ডাকাতকে স্মরণ করে। এই রঘুর পিঠে কার্তিককে চড়ানো কম কৃতিত্বের কথা নয়। শ্রীহর্ষ সপ্রশংস দৃষ্টিতে ময়ূরবাহন কার্তিকের দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। মহাবাণী ছাড়া এ আর কেউ পারত না, মনে হল তার।

'অসাধ্য সাধন করেছ সত্যি'' তারপর একটু থেমে একটু ইতস্তত করে নিজের কথাটা পাড়লেন।

''কিন্তু আমি যে একটা মুশকিলে পড়ে গেছি, সেটার কিছু করতে পার— ?''

কিসের মুশকিল?''

শ্রীহর্ষ সব খুলে বললেন। শুনে মহাবাণীর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল ক্ষণকালের জন্য, কিন্তু পরমুহূর্তেই হেসে ফেললে সে।

হাসছ যে?'

'এতে আর মুশকিলটা কি। ঘরজামাই হতে না চাও, হয়ো না''

''কিন্তু —''

ইতস্তত করে থেমে গেলেন শ্রীহর্ষ। বলতে পারলেন না যে যদিও তিনি ঘরজামাই হতে রাজি নন কিন্তু অন্য জায়গায় বিয়ে হলে মহাবাণী যে চিরকালের মতো অপরের হয়ে যাবে এই নিদারুণ সত্যের সঙ্গেও আপোষ করতে রাজি নন তিনি। কিন্তু এই কথা তাঁর মুখ দিয়ে সেদিন বেরুল না। দু'জনের ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে কেটেছে, কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারবে না এ কথা কারও অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু কেতাবী ভাষায় যাকে প্রেমালাপ বলে তা কোনওদিন হয়নি তাদের মধ্যে।

মহাবাণী হাসিমুখে চেয়ে ছিল তাঁর মুখের দিকে।

''কিন্তু কি?''

যে কথাটা স্পষ্টভাবে অকপটে বললে সমস্যাটার জট খুলে যেত, কথাটা কিন্তু শ্রীহর্ষ বললেন না, বলতে পারলেন না। সমস্যাটার অপর দিকটা উদঘাটন করবার প্রয়াস পেলেন বরং।

''আজ প্রস্তাবটা ঈরু নাপিতের মারফত এসেছে, কিন্তু কাল যদি তোমার বাবা নিজেই এ কথা আমাকে বলেন তখন কি করে আমি তাঁর মুখের উপর 'না' বলব?''

''বোলো না, চুপ করে থেকো—''

এর বেশী আর কথাটা এগোয়নি সেদিন। মহাবাণীর অন্যমনস্কতার সুযোগে কার্তিক রঘুর

পিঠ থেকে নেবে পালিযেছিল আব বঘু পেখম মেলে নাচছিল তাব নবাগতা প্রেযসী মযূবটিব সামনে। মহাবাণী তাব নাম বেখেছিল নবমী, কাবণ এব আগে আবও আটজন এসেছিল।

"নবমীকে দেখলেই বঘু নাচে আজকাল। ওদেব দিকে ফিবেও তাকায না।"

এবপবই পোকা-ওলা জিতু এসে পড়ল পাখীদেব খাওযাবাব জন্য। মহাবাণীব পশু-পাখী পোষবাব খুব শখ। পাখী তো নানাবকম ছিলই, পশুও ছিল অনেক বকম, সিংহ, বাঘ, শেযাল এমন কি উদ্‌বেবাল, সজাৰু পর্যন্ত। পোকা-ওলা জিতু ওস্তাদ ছিল এসব বিষযে। এব জন্য নিষ্কব জমি ভোগ কবত সে অনেকখানি। জিতু এসে পড়াতে কথাটা আব এগোল না। সমস্যাব সমাধান হল না। একটু পবে চলে আসতে হল শ্রীহর্ষকে।

সমুদ্রবিলাস পবদিনই খবব পেলেন বসবাজেব কাছ থেকে।

বসবাজ বসিকতা কবে বললেন, "হুজুব, শৃগালটি মলত্যাগ কববাব জন্য পর্বতশৃঙ্গে আবোহণ কবেছেন। হীৰু নাপিতকে দিযে পেড়েছিলাম কথাটা, হীৰু বললে তিনি শৃঙ্গ থেকে নামবেন না। হল তো?"

কথাটা শুনে হঠাৎ বোখ চড়ে গিযেছিল সমুদ্রবিলাসেব। ওইটুকু ছেলেব এত বড় স্পর্ধা। ডেকে পাঠালেন তাঁকে। সমুদ্রবিলাসেব সম্মুখীন হযে শ্রীহর্ষ কিন্তু নিজেব মেৰুদণ্ড সোজা বাখতে পাবলেন না। বাল্যকাল থেকে যাঁকে সম্ভ্রম কবে এসেছেন, যিনি পিতৃবন্ধু, যিনি মহাবাণীব বাবা তাঁব মুখেব উপব তিনি বলতে পাবলেন না যে আমি মহাবাণীকে বিযে কবে আপনাব ঘব-জামাই হতে পাবব না। মহাবাণীকে পাওযাব জন্যে তাব সমস্ত সত্তা বহুদিন থেকে উন্মুখ হযেই ছিল, হাটেব মাঝখানে, বিশেষত জ্ঞাতি শত্রু নিবঞ্জনেব সামনে হীৰু কথাটা অমন বিশ্রীভাবে পেড়েছিল বলেই তাঁব আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল, তা না হলে মহাবাণীকে বিযে না কববাব কল্পনাও কবতে পাবতেন না তিনি। সমুদ্রবিলাসকে সম্মতি জানিযে যখন বাড়ি ফিবে যাচ্ছিলেন তিনি, তখন তাঁব মনে হচ্ছিল তিনি হেঁটে যাচ্ছেন না, উড়ে যাচ্ছেন, যেন তাঁব দু'খানা পাখা গজিযেছে, এখনই হযতো আকাশে উড়ে ইন্দ্রধনুলোকেব ইন্দ্রত্ব পদে সমাসীন হবেন।

সব যখন ঠিক, তখন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল একটা। মহাবাণী সমুদ্রবিলাসকে জানিযে দিলে সে শ্রীহর্ষকে বিযে করবে না।

"কেন?"

"ওকে পছন্দ নয আমাব।"

মেযেব মুখে এবকম স্বাধীন মতামত শুনবেন প্রত্যাশা কবেননি সমুদ্রবিলাস। বীতিমত অবাক হযে গেলেন। তাঁব উল্টো ধাবণাই ছিল ববাবব। তিনি ভেবেছিলেন মহাবাণী শ্রীহর্ষকে ভালোবাসে বিযে হলে দুজনেই সুখী হবে, তিনিও নিশ্চিন্ত হবেন। কিন্তু এ কি বলছে মহাবাণী!

একটু হেসে জিগ্যেস করলেন, "ঝগড়া হয়েছে নাকি।"

"ঝগডা কেন হতে যাবে। সাত চডে কথা কয না, ওবকম লোকেব সঙ্গে ঝগডা হতে পাবে নাকি কাবও?"

"তোদেব দুজনেব ছেলেবেলা থেকে এত ভাব, বিযে কবতে আপত্তি কবছিস কেন। খুব ভাল ছেলে শ্রীহর্ষ।"

ঘাড বেঁকিযে মহাবাণী বললে, " না, ওকে আমাব পছন্দ নয।"

অপবেব পছন্দ অপছন্দেব তোযাক্কা বাখতেন না সেকালেব জমিদাবেবা, তাঁদেব পছন্দ অনুসাবেই চলতে হত সকলকে। কিন্তু একমাত্র মেযেব অপছন্দকে তুচ্ছ কবতে সাহস কবলেন না সমুদ্রবিলাস।

"এমন সুপাত্রটিকে নাকচ কবে দিচ্ছিস, কি নিযে থাকবি সাবাজীবন?"

এব উত্তব না দিযে মুচকি হেসে মহাবাণী চলে গেল অন্দবমহলে।

তাবপব দেখা গেল সে তাব নতুন কেনা পাহাডী ঘোডা পবনেব পিঠে চডে বেবিযেছে হাওযা খেতে, আব সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে আবও দুটো পাহাডী ঘোডায দুজন হাবসি ঘোডসোযাব। অশ্বচালনায পাবদর্শী তাবা মহাবাণীকে ঘোডায চডা শিখিযেছে। মহাবাণী যখন বেবোয তখন বক্ষক হিসাবে সঙ্গেও চলে তাবা। ঝান্সীব বাণী লক্ষ্মীবাঈযেব আদর্শটা সেকালেব অভিজাত বংশীয মেযেদেব মধ্যে চলতি হযেছিল কিছুদিন। সমুদ্রবিলাস এটা তেমন পছন্দ কবতেন না, কিন্তু মেযেব আবদাব বক্ষা কবতে হযেছিল। মেযে যখন ঘোডায চডে বেবিযে গেল তখন তাব দিকে চেযে একটু হাসলেন তিনি, তাবপব গম্ভীবভাবে মাথা নাডলেন।

দিন কযেক আগে পর্বতবিলাস আবু পাহাড থেকে ফিবেছিলেন। পবামর্শ কববাব জন্য তাকে ডেকে পাঠালেন তিনি। সব কথা খুলে বললেন তাঁকে। সব শুনে পর্বতবিলাস বললেন "ওব বিযে দেবাব চেষ্টা কবো না দাদা। ববং ও যাতে আব পাঁচ বকম ব্যাপাবে মেতে থাকতে পাবে তাবই ব্যবস্থা কব। চিডিযাখানা আব বাগান নিযে ওব খানিকটা সময কাটছে বটে, ঘোডায চডতেও বেশ শিখেছে, কিন্তু আমাব মনে হয ওসব বেশীদিন ভাল লাগবে না ওব। নওলকিশোব বা জীমন বাইজিব কাছে গান শিখতে শুরু করুক। গানে যদি মেতে যেতে পাবে তাহলে আব ভাবনা নেই, ওই নিযেই সাবাজীবন মশগুল হযে থাকতে পাববে। আব গান যদি না ভালো লাগে তাহলে মন্তব নিক। আমাদেব ভব-দাই দিতে পাবেন একজন উঁচু দবেব সাধক উনি, যদিও বাইবে কোনও প্রকাশ নেই।"

বক্তাম্বব পবিহিত ত্রিপুণ্ড্রক লাঞ্ছিত-ললাট পর্বতেব দিকে চেযে বইলেন সমুদ্রবিলাস ভ্রূকুঞ্চিত কবে। তাবপব বললেন, "এসব উদ্ভট খেযাল তোমাব মাথায আসছে কেন? মেযেকে সৎপাত্রে সম্প্রদান কবাই প্রত্যেক পিতাব কর্তব্য। শ্রীহর্ষেব সঙ্গে বিযে হলে ভাল হত, ওকে ঘব জামাই কবতে পাবতাম। কিন্তু মহাবাণীব ওকে পছন্দ নয মুশকিলে পডেছি তাই। ওব বযস চোদ্দ পেবিযে গেল, গৌবীদান তো হলই না, এখন পূর্বপুরুষবা নবকস্থ হচ্ছেন। কিন্তু কবি কি, আমি অনেকদিন থেকেই চেষ্টা কবছি, কিন্তু মনোমত পাত্র জুটছে না। ভাল ঘবেব কোন ছেলেই ঘবজামাই হতে চায না। বহডাব কুলেশ বাঁডুয্যে, বেদগ্রামেব

ভরত গাঙ্গুলী, সনজার নৃপতিমোহন, প্রত্যেকেরই ভাল ছেলে আছে, বিষয়ের লোভে প্রত্যেকেই বিয়ে দিতে রাজিও আছে, কিন্তু ঘরজামাই হতে চাচ্ছে না কেউ, অথচ মহারাণী আমার একমাত্র মেয়ে ওকে আমি দূরে পাঠাতে পারব না।"

"সবই বুঝলাম"—ঈষৎ হেসে উত্তর দিলে পর্বতবিলাস— "কিন্তু একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ দাদা—"

"কি কথা ?"

"বিশ্বদেব শর্মার অভিশাপটা। তিনি খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর অভিশাপ ফলবে। তাই আমার মনে হয় মহারাণী যদি প্রাণে বেঁচে থাকে তা হলেই সেটা যথেষ্ট সৌভাগ্য বলে মেনে নেওয়া উচিত আমাদের। বিয়েব পরই ও যদি বিধবা হয়, কিম্বা মৃতবৎসা হয় তাহলে সেটা আরও দুঃখের হবে—"

"তুমি ব্রহ্মশাপে বিশ্বাস কর?"

"করি। বিন্ধ্যাচলে বিশ্বদেবের সঙ্গে আর একবার দেখা হয়েছিল আমাব তখন তিনি মৃত্যু শয্যায়। আমাকে দেখে তিনি আবার অভিশাপ দিলেন। আমবা মৃত্যুব ছাযাব মধ্যে বাস করছি। এব মধ্যে বাইবের লোককে টেনে আনা অনুচিত মনে করি আমি।"

"তোমার মত শুনলুম, কিন্তু মহারাণীর আমি বিয়ে দেব। গালুটিব বড় তবফেব ভালো ছেলে আছে একটি। যদিও সে-ও ঘরজামাই হতে চাইবে না, কিন্তু ওবা পাশেব গ্রামেই থাকে, ওখানেই কথাটা পাড়তে চাই। ছেলেটির নাম মহেন্দ্রনাথ। আমার ইচ্ছে তুমিই গিযে কথাটা পাড়।"

"আমার মত আপনাকে বললাম। কিন্তু আপনার আদেশ পালন কবব। পরশু যাব।"

"পরশু কেন, কালই যাও না।"

"পরশু সর্ব-সিদ্ধা ত্রয়োদশী, কাল দিনটা ভাল নয়।"

পর্বতবিলাস চলে যাবার পর সমুদ্রবিলাস নিরুপায় ক্ষোভে অর্ধস্বগতোক্তি কবলেন—"মত, মত, মত, সবাই মত্‌-বাজ হয়ে উঠেছে আজকাল, এমন কি ওই একরত্তি মেয়েটা পর্যন্ত—এই হো-—"

কাউকে ডাকতে হলে "এই হো —" বলে চীৎকার করে উঠতেন তিনি।

দেউড়ির সিপাহী ছুটে এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

"নাচঘর ঠিক কর—"

জীমন বাইজি আজকাল বুড়ো হয়ে গেছে। তার মেয়ে দীনাই আজকাল মনোরঞ্জন করে সমুদ্রবিলাসের। সে অবাক হল একটু। দুপুর বেলা গানের আসর বসবে কি! কিন্তু রাজাসাহেবের যখন হুকুম তখন বসল। দীনা হাতের বাজুর দোলক দুলিয়ে লীলাভরে হাত তুলে তান ধরল মেঘমল্লারে। গান শেষ হয়ে গেলে সিরাজীর পাত্রটা নামিয়ে রেখে সমুদ্রবিলাস জিগ্যেস করলেন, "এ সময় মেঘমল্লার গাইলে কেন দীনা? দুপুরে সারং শোনাতো ভালো।"

দীনা মুচকি হেসে অপাঙ্গে চেয়ে উত্তর দিল, "যা গরম, মেঘেরই দরকার এখন- "

সমুদ্রবিলাস বুঝলেন এটা দীনা বাইজির বিদ্রূপ দুপুরে আসর বসানো হয়েছে বলে। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল তাঁর, তার থেকে উপচে পড়তে লাগল হাসি।

"ও, গরম লাগছে না কি! এই হো-- ।"

দ্বারপ্রান্তে চাকর এসে দাড়াতেই তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন পানীয় চাই। বিলিতি মদ আর সরবৎ এল। আসতে একটু দেরী হল, কারণ সেকালে বরফের তত চলন হয়নি, ঠাণ্ডা করবার জন্যে মদের বোতল পাঁকে পুঁতে রাখতে হত। চাকর পাশের ঘরে সব সরঞ্জাম রেখে এল দীনা বাইজি সেইখানেই উঠে গেল।

সমুদ্রবিলাসের বাবরি ছিল, চাপ চাপ দাড়ি আর গোঁপও ছিল। কিছুক্ষণ পরে মদ খেয়ে তিনি যখন স্তিমিত লোচনে বসে রইলেন মনে হতে লাগল একটা সিংহ ঢুলছে।

সর্বসিদ্ধা এয়োদশীর দিন সকালে তুরুক সোয়ার ইয়াকুব আলি অশ্বারোহণে সদর নায়েবের একটি চিঠি নিয়ে গালটির বড় তরফের হুজুরকে সেলাম করতে গেল। পত্রে লেখা ছিল ছোটবাবু বিকেলবেলা দেখা করতে যাবেন পর্বতবিলাস বিকেলে গেলেন সুসজ্জিত হাতীতে চড়ে। গালটির বড় তরফ রাজেন্দ্রনাথ প্রত্যুদগমন করে সমচিত অভ্যর্থনা করলেন তাঁর। তাকে নিজের খাস বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন। সাধারণ কুশল প্রশ্নাদির পর পর্বতবিলাস প্রস্তাবটি পাড়লেন অবশেষে, রাজেন্দ্রনাথ ঘাড় কাৎ করে শুনলেন সেটি। কিছুক্ষণ ঘাড় কাৎ করেই রইলেন তারপর বললেন "এ তো খুব আনন্দের কথা। আমাদের স্টেট পাশাপাশি বন্ধুত্বও আছে, সেটা যদি আত্মীয়তায় পরিণত হয় তাহলে তার চেয়ে সুখের আর কি হতে পারে। কিন্তু একটি শর্ত আছে, ও মেয়েকে ঘোড়ায় চড়া ছাড়াতে হবে। ঝাঁসীর রাণীকে পুত্রবধূ করা নিরাপদও নয় সুখেরও নয়।'

পর্বতবিলাসের মুখভাব যেমন সম্ভ্রমপূর্ণ ছিল তেমনই রইল। মুখের একটি পেশীও বিচলিত হল না কিন্তু, সম্ভবত তাঁর অজ্ঞাতসারেই চোখের দৃষ্টিতে খেলে গেল এক ঝলক বিদ্যুৎ। তিনি যখন কথা কইলেন, তখন বেশ শান্তকণ্ঠে সবিনয়েই বললেন, 'আচ্ছা, আপনি যা বললেন তা দাদাকে বলব।"

বৈঠকখানা মহল পেরিয়ে যখন পর্বতবিলাস হাতীতে চড়তে যাচ্ছেন তখন আর একটি ঘটনা ঘটল। পাশেই ছিল ফুলের বাগান, অনেকগুলি ছোট ছোট কুঞ্জ ছিল সেখানে, নানারকম শৌখীন লতা দিয়ে ঘেরা, ফুলে ফুলে ভরা। মাধবী কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এল দরবারের গায়িকার কন্যা বেদানা। তন্বী ষোড়শী, নীল শাড়ি নীল ওড়না, চোখে সুর্মার সূক্ষ্ম টান, মুখে সলজ্জ মৃদু হাসি। সে এগিয়ে এসে সেলাম করে বললেন-- " বড়কুমার সাহেবের বিয়ের সম্বন্ধ এনেছেন হুজুর?"

"হ্যা—"

একটু ইতস্তত করে কি বলতে গিয়ে থেমে গেল সে। তারপর সেলাম করে মৃদুগতিতে চলে গেল। পর্বতবিলাস বুঝলেন, এ-ও একটি প্রচ্ছন্ন শর্ত। তিনি ফিরে এসে দাদাকে যথাযথ

বললেন সব। গুম হয়ে রইলেন সমুদ্রবিলাস। কয়েকদিন গুম হয়েই রইলেন। তারপর তিনি যা করলেন তা সম্ভবত তিনি কখনও করেননি জীবনে। মহারাণীকে একদিন আড়ালে ডেকে বললেন,

"আমাব একটা অনুরোধ বাখবি?"

"কি?"

"ঘোড়ায় চড়াটা ছেড়ে দে তুই—"

"হঠাৎ একথা বলছ কেন?"

"লোকে নিন্দে করছে। তাছাড়া তোর আমি বিয়ে দিতে চাই,"

"ঘোড়সোয়ার মেয়েকে কে বউ কবে নিয়ে যাবে বল্।"

"আবার কার সঙ্গে সম্বন্ধ করলে?"

"গালুটিব বড়কুমার মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে।"

"সম্বন্ধ আগে পাকা হোক তারপর দেখা যাবে।"

"ঘোড়ায় চড়া না ছাড়লে সম্বন্ধ পাকা হবে না।"

"ও, তাই বুঝি। আচ্ছা—"

"শুনলাম তুই ছাতে বাগান করছিস?"

"হ্যাঁ। কিশোবীকাকা যে মেয়েটিকে এনেছেন তাকে একটা কাজ দিতে হবে তো—"

"ওই বাগান টাগান নিয়েই থাক। ঘোড়ায় চড়া ছেড়ে দে—"

"আচ্ছা।"

"আচ্ছার" অর্থ সমুদ্রবিলাস বুঝলেন সম্মতি, কিন্তু মহারাণীব মনে ছিল অন্য অর্থ। সে মুখে বলেছিল 'আচ্ছা', কিন্তু মনে মনে বলেছিলে, 'আচ্ছা দেখে নেব।'

মহাবাণীব বিয়ে নিয়ে পর্বতবিলাস আর মাথা ঘামালেন না। কিছুদিন আগে মন্দাব পাহাড়ের এক সাধুর খবর পেয়েছিলেন, সেইখানেই চলে গেলেন তিনি। রাজেন্দ্রনাথকে এবাব পত্র লিখলেন সমুদ্রবিলাস স্বয়ং। ম্যানেজার কিশোরীমোহন নিয়ে গেলেন সেটি।

চিঠিতে ভদ্র ভনিতার পর তিনি লিখিলেন—"শ্রীমান পারুর মুখে সমস্ত অবগত হইয়াছি। আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই সঙ্গত। অশ্বারোহণ ব্যাপারে তাহাকে নিরুৎসাহিত করিযাছি, সে-ও রাজি হইয়াছে। এইবার শ্রীমান শ্রীমতীর যোটক বিচারের ব্যবস্থা করিলে ভালো হয়। এ বিষয়ে একটু ত্বরা করিতে চাহি, কারণ শরীর অসমর্থ হইয়াছে, কখন কি হয় বলা যায় না। বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে মেয়েটিকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করিয়া গেলে নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতে পারি। আশা করি আপনি বিবেচনা করত যাহাতে আমি ত্ববায় দায়মুক্ত হইতে পারি সে ব্যবস্থা করিবেন।"

বেদানাব কথাও পর্বতবিলাস বলেছিলেন অগ্রজকে, কিন্তু সেটার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন না সমুদ্রবিলাস। তাঁর মনে হল ওটা পৌরুষেরই লক্ষণ। যৌবনকালে অমন দু'একটা লীলাসঙ্গিনী থাকতই সব বড়লোকদের, তার জন্য বিয়ে আটকাত না কারও। নিজের জীবনের মাপকাঠিতেই সমুদ্রবিলাস বিচার করতেন অপরকে। রাজেন্দ্রনাথ পত্র পেয়ে খুশী

হলেন। ত্বরা করতেও ক্রটি করলেন না, কাবণ তিনি জানতেন বিয়েটা হয়ে গেলেই অতবড় সম্পত্তিটা তাঁরই ছেলের হবে শেষ পর্যন্ত। তাঁর পুরোহিত মশায় এলেন একদিন ঘটা করে, নাকের ডগায় চশমা লাগিয়ে বিচার করলেন কোষ্ঠিটি এবং বায় দিলেন রাজ-যোটক হয়েছে। এ বিয়ে হবেই, হওয়া উচিতও।

কিন্তু হল না। না হওয়ার কারণটা কি তা কেউ জানে না। পুরাতন ভৃত্য শম্ভু যা বলত তা খুব রহস্যময়! সে বলত, হুমব্রো, হুমব্রো করে সবুজ কিংখাবের বোরখা ঢাকা এক পালকি এল একদিন সন্ধেবেলা। সঙ্গে ববকন্দাজ এসেছিল। সে বললে, গালুটিব বাবুদেব বাড়ি থেকে 'জেনানা' এসেছে মহারাণীর সঙ্গে আলাপ করবেন বলে। সমুদ্রবিলাস হুকুম দিলেন. পালকি অন্দরমহলে নিয়ে যাও। অন্দরমহলে পালকি থেকে যিনি নাবলেন, শম্ভুব মতে, তিনি মানুষ নন পরী, কেবল ডানা দুটি ছিল না। শম্ভু বলে সেই পরীর কলা-কৌশলেই নাকি বিয়ে হল না শেষ পর্যন্ত। কারণ সে আসাব পব থেকেই একটা না একটা বাগড়া লাগতে লাগল। প্রথম বাগড়া লাগল, আর একজন জ্যোতিষী এসে বললেন যোটক বিচাব ঠিক হয়নি। সমুদ্রবিলাস আমল দিলেন না তাকে! তাবপব বাগড়া লাগল আশীর্বাদের দিন নিয়ে। কিন্তু আশীর্বাদেব দিন-স্থির হল যখন, তখন আসল বাগড়াটি লাগল। এব কাবণ যে কি, মূল যে কোথায় তা জানা যায়নি। আশীর্বাদের ঠিক আগে গালুটির বড়কুমাব মহেন্দ্রনাথ কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েছিলেন, আর ফিরলেন না। কোথায় গেলেন, কেন গেলেন তা নির্ণীত হল না অনেকদিন পর্যন্ত। খোঁজাখুজির ক্রটি হল না অবশ্য, কিন্তু তখনকাব দিনে পথঘাট সুগম ছিল না, তার বেতাব সংবাদপত্রেরও প্রাচুর্য ছিলনা এত। লোক পাঠিয়ে পাঠিয়ে চিঠি লিখে লিখে খোঁজখবব কবতে হত। রাজেন্দ্রনাথ অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ছমাসেব আগে কুমাবের কোন খবব পাওয়া গেল না। ছ'মাস পরে মহেন্দ্রনাথ নিজেই ফিবে এলেন, কিন্তু বিয়ে হল না, কারণ সমুদ্রবিলাস এর মধ্যে মারা গিয়েছিলেন। মহেন্দ্রনাথ নিজেব অন্তর্ধানের যে কারণ সবাইকে বলেছিলেন তা অদ্ভুত শোনাবে আজকাল। তিনি বললেন, ঘোড়ায় চড়ে তিনি শিকাব কবতে গিয়েছিলেন, জঙ্গলে ডাকাতেব হাতে পড়েন, তারা তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে এক দুর্গম অরণ্যে বন্দী করে বাখে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে এইভাবে কিছুদিন আটকে রেখে পরে ক্রমশ তাদের দলভুক্ত করে নেওয়া। তাঁর মতো লোককে নিজেদেব দলে টানতে পারলে সব দিক থেকে সুবিধা হত না কি তাদেব। এ কল্পনা উদ্ভটও ছিল না সেকালে। অনেক জমিদারের ছেলে আগে ডাকাতি করত, মহেন্দ্রনাথ বললেন অনেক রকম ফন্দি ফিকির করে তবে পালিয়ে আসতে পেরেছেন তিনি। এজন্য একজন ডাকাতকে তাঁর বহুমূল্য কমল-হীরের আংটিটা নাকি ঘুস দিতে হয়েছে। একথা কেউ অবিশ্বাস করেনি, কারণ এটা অবিশ্বাস্য ছিল না সেকালে। কিন্তু সমুদ্রবিলাসের মৃত্যুজনিত কালাশৌচ কেটে যাবার পরও মহেন্দ্রনাথ আর বিয়ে করতে চাইলেন না কেন তার ঠিক হদিসটা পাওয়া যায়নি। তিনি অজুহাত দেখালেন ডাকাতদের নজর তাঁর উপর একবার যখন পড়েছে তখন সহজে তারা তাঁকে নিস্তার দেবে না। এ অবস্থায় এক ভদ্রকন্যাকে বিয়ে ক'ব বিপন্ন করার কোনও মানে হয় না। এ যুগেব পক্ষে এবকম আচরণ অপ্রত্যাশিত, কারণ

ভদ্রকন্যাদের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা সেকালে বিশেষ কেউ করত না, পটাপট বিয়ে করাটাই রেওয়াজ ছিল সে যুগে। মহেন্দ্রনাথ কিন্তু বিয়ে করতে চাইলেন না। তাঁর মত পরিবর্তনের চেষ্টাও অনেক হয়েছিল। রাজেন্দ্রনাথ তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করবারও ভয় দেখিয়েছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। রাজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দেখা গেল বেদানার সঙ্গে তাঁর প্রণয়টা বেশ দানা বেঁধে উঠেছে, প্রকাশ্যভাবে 'বেদানা মহল' তৈরি করে সানন্দে বাস করছেন। ডাকাতদের দলও তাঁকে দলভুক্ত করতে চেষ্টা করেছে একথাও আর শোনা যায়নি।

এ বিষয়ে একটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণও প্রচলিত আছে। প্রত্যক্ষ-দর্শীটির নাম পলটু। মহারাণীর ঘোড়ার সহিস। সে মহেন্দ্রনাথের অন্তর্ধানের যে কারণ বলত তা বেশ রহস্যঘন। সে বলত অবশ্য চুপি চুপি চাকরবাকর মহলে। কথাটা সমুদ্রবিলাসের মৃত্যুর আগে প্রকাশও পায়নি, পলটুই প্রকাশ করেনি। পলটু বলত যেদিন গোলুটি থেকে কিংখাব-ঢাকা পালকি এল তার চারিদিন পরেই ছিল পূর্ণিমা। সেই পূর্ণিমার দিন গভীর রাত্রে মহারাণী নাকি একা ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েছিল। পলটুও জানতে পাবত না, কিন্তু ঘোড়ার জিন লাগাম ছিল সাজ ঘরে আর তার চাবি থাকত পলটুর কাছে। তাই তাকে জাগাতে হয়েছিল। মহারাণীর সাজ-সজ্জা দেখে পলটু তো অবাক। মেয়েছেলে বলে চেনবার জো নেই, ঠিক যেন রাজপুত্র। বেরিয়ে যাবার আগে মহারাণী তর্জনী আস্ফালন করে পলটুকে বলে গেল, বাবা যেন ঘুণাক্ষরে না জানতে পারেন যে আমি এমনভাবে বেরিয়ে গেছি। সমুদ্রবিলাস যতদিন বেঁচে ছিলেন পলটু কথাটা কাউকে বলেনি। কিন্তু আর একটা কাজ করেছিল সে। মহারাণীর অনুসরণ করেছিল আর একটা ঘোড়ায় চড়ে। শুধু কৌতূহল নয়, আশঙ্কা মিশ্রিত বাৎসল্য এ কার্যে প্রণোদিত করেছিল তাকে। মহারাণীকে জন্মাতে দেখেছিল সে, কোলে পিঠে করে মানুষও করেছিল। অবাক হয়ে ভেবেছিল সে—এত রাত্রে মেয়েটা কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছে একলা এমন করে। মানা করলে তো শুনবে না, পিছু পিছু যাওয়াই ভাল। গ্রামের দক্ষিণ দিকের খোলা মাঠটাতেই মহারাণী প্রায় যেত ঘোড়াটাকে নিয়ে। পলটু সেইদিকেই গেল। আর একটু দেরি হলে মহারাণীকে আর সে দেখতে পেত না। কারণ, সে যখন মাঠের কাছাকাছি পৌঁছেছে তখনই দেখতে পেল মহারাণীর ঘোড়া মাঠ পেরিয়ে প্রকাণ্ড আমবাগানটার ঢুকছে! আমবাগানের ওপারে দিগন্তবিস্তৃত আর একটা মাঠ আছে। আমবাগানের কাছাকাছি এসেই পলটু নামল ঘোড়া থেকে। তার সন্দেহ হল এই বাগানের ভিতর ব্যাপার আছে কিছু। ঘোড়াটা একটা গাছে বেঁধে পদব্রজে অগ্রসর হল সে, গাছের ছায়ায় কিছুদূর গিয়ে সে বুঝতে পারল তার অনুমান মিথ্যে নয়, আর একজন অশ্বারোহী রয়েছেন, গালুটির বড়কুমার মহেন্দ্রনাথ। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে এগিয়ে খুব কাছাকাছি এসে আড়ি পেতে রইল পলটু। যা শুনল তাতে চমৎকৃত হয়ে গেল সে। চাকর বাকর মহলে এই চমকপ্রদ ব্যাপারের যা বর্ণনা করত সে তা গুছিয়ে লিখলে এইরকম দাঁড়ায়।

মহারাণী মহেন্দ্রনাথের কাছে আত্মপরিচয় দেয়নি। কথাবার্তা থেকে পলটুর মনে হয়েছিল সে নিজেকে মহারাণীর দূর সম্পর্কের ভাই বলে পরিচয় দিয়েছে।

মহেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ''বেদানা যে মহারাণীর সঙ্গে দেখা করেছে তা আমি জানি। বেদানাকে অবশ্য আমি ত্যাগ করব না, কিন্তু তা বলে আপনার বোনকে বিয়ে করবার লোভও তো আমি ত্যাগ করতে পারছি না''

''কেন?''

''কেন তা কি সব সময় খুলে বলা যায়?''

''মহারাণী একটা কথা বিশেষ করে আপনাকে বলতে বলে দিয়েছে। বলেছে বিষয়ের জন্য আপনি যদি তাকে বিয়ে করতে উৎসুক হয়ে থাকেন তাহলে বিয়ে না করলেও চলবে। বিষয়ের প্রতি মহারাণীর বিন্দুমাত্র লোভ নেই। সে যখন বিষয়ের মালিক হবে তখন নিজের ভরণ পোষণের মতো সামান্য কিছু রেখে বাকিটা আপনাকেই দান করে দেবে।''

মহেন্দ্রনাথ হেসে বাম গুম্ফপ্রান্তে চাড়া দিলেন একবার। তারপর বললেন, ''আমি তার দান নেব কেন। তাকে বলে দেবেন আমি বিষয়ের লোভে তাকে বিয়ে করতে চাইছি না। আমি লোকমুখে তার অনেক গুণের কথা শুনেছি। সাধারণত বাঙালী মেয়েদের মধ্যে এমন রূপগুণের সমন্বয় নাকি দেখা যায় না। তিনি লেখাপড়া জানেন, গান বাজনা জানেন, শুনেছি তিনি সাহসী এবং সুরাসকা। এমন রূপসী গুণবতী যদি আমার সহধর্মিনী হন তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।''

''কিন্তু তিনি বেদানাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—''

''কিন্তু ওসব প্রতিশ্রুতির কি কোনও মূল্য থাকা উচিত? বেদানা সামান্য একজন বাইজির মেয়ে, তার জন্যে আমি কি ''

''মহারাণীর মতে বাইজির মেয়ে হলেও সে মানুষ। সে আপনাকে ভালবাসে, তার সুখের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করবার ইচ্ছে মহারাণীর নেই। তাই মহারাণীর অনুরোধ আপনি এ বিয়েটা ভেঙে দিন। মহারাণী নিজেই ভেঙে দিতে পারত কিন্তু কিছুদিন আগে সে একটা সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছে, বারবার বাবার মুখের উপর না বলতে তার সঙ্কোচ হচ্ছে।''

''আমিই বা আমার বাবার মুখের উপর 'না' বলি কি করে। তাছাড়া আমি তাঁকে মত দিয়ে দিয়েছি।''

''আপনি যদি ভেঙে দিতে ইচ্ছে করেন অনায়াসে তা পারেন। মহারাণী বলেছে পুরুষ মানুষে না পারে এমন কাজ নেই। সে একটা সহজ উপায়ও বলে দিয়েছে।''

''কি উপায়?''

''আপনি কিছুদিনের জন্য দেশ-ভ্রমণ করে আসুন না, কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ুন বাড়ি থেকে। আপনি অন্তর্ধান করলে আপনাকে খোঁজবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বে সবাই, বিয়ের কথাটা চাপা পড়ে যাবে।''

''কিন্তু আমি তা করব না। কারণ মহারাণীকে আমি চাই।''

''জোর করে তাকে বিয়ে করবার চেষ্টা যদি করেন তাহলে কিছুতেই তাকে পাবেন না। সে হয়তো আত্মহত্যা করে বসবে, কিন্তু তার এ অনুরোধটা যদি রাখেন তাহলে বরং পেতে পারবেন তাকে। মনে মনে চিরকাল ও আপনারই থাকবে। আর আপনি যদি কিছুতে ওর

অনুরোধ না বাখতে চান তাহলে আর একটা কথা ও বলেছে, জানিনা এতে আপনি সম্মত হবেন কি না।''

''কি কথা?''

''সে বলেছে ঘোড় দৌড়ে আপনি যদি আমাকে হারাতে পারেন তাহলে সে আপনাকে বিয়ে করবে যদি বেদানা অনুমতি দেয়।''

''আপনাকে হারাতে হবে? মহারাণী নিজেই শুনেছি ভাল ঘোড়সোয়ার। বাজিটা তাব সঙ্গে হলে আবও খুশি হতাম।''

''কিন্তু সে আমাকেই পাঠিয়েছে।''

''বেশ চলুন, দেখা যাক ভাগ্যে কি আছে।''

বাগানেব ওপারে যে মাঠটা আছে সেইটেতে তখন শুরু হল ঘোড়দৌড়। পলটু বলে, একবার নয়, তিন তিনবাব তাকে হারিয়ে দিলে মহারাণী। তারপর পিরাণেব পকেট থেকে একছড়া হীরেব হার বার করে মহারাণী মহেন্দ্রনাথকে বললে—''মহারাণী আমাকে এই হারটা দিয়ে বলেছিল যদি হেরে যাও তাহলে এটা দিয়ে এস মহেন্দ্রনাথকে, আর যদি জেত তাহলে তাঁকে অনুবোধ কোবো প্রতিশ্রুতির চিহ্ন স্বরূপ তিনি যেন কিছু একটা দিয়ে দেন।''

মহেন্দ্রনাথ চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপব হাত থেকে নিজের আংটিটা খুলে দিলেন তাকে। বললেন, ''মহাবাণীর আদেশ আমি পালন করব। তাঁর ইচ্ছাব বিরুদ্ধে তাঁকে বিযে করবার চেষ্টা আর আমি করব না। কিন্তু আমারও একটা অনুরোধ আছে তাঁকে বোলো—''

'' বলুন, নিশ্চয বলব।''

''আমি তার সঙ্গে একবাব দেখা কবতে চাই।''

''দেখা করে কি হবে?''

''তাঁকে মুখোমুখি দেখবাব একটা কৌতূহল আছে।''

''সে কৌতূহল মিটলে তবে বিয়েটা ভেঙে দেবেন?''

''হ্যাঁ''

মাটিতে দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল এতক্ষণ।

হঠাৎ মহারাণী পবনের পিঠে লাফিয়ে চড়ল এবং মহেন্দ্রনাথের দিকে ফিবে বলল, ''কৌতূহলটা তাহলে মিটিয়ে ফেলুন। আমিই মহারাণী।''

পরমুহূর্তেই লাগামের ইশারায় পবনের মুখ ঘুরল, বিদ্যুদ্বেগে বেরিয়ে গেল সে। মহেন্দ্রনাথ কিছুদূর পর্যন্ত তার অনুসরণ করেছিলেন কিন্তু নাগাল পাননি।

পলটুর এই গল্প কতদূর বিশ্বাসযোগ্য জানিনা। কিন্তু গল্পটা চালু হয়েছিল খুব। পলটু যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন সে হলপ করে বলত যে সে একবর্ণ অতিরঞ্জিত করে বলেনি। গল্পটা মহারাণীর কানেও গিয়েছিল, শুনে একটু মুচকি হেসেছিল শুধু সে, পলটুকে ভর্ৎসনা করেনি।

সমুদ্রবিলাসের মৃত্যুর পর বিয়ের কথাটা চাপাই পড়ে গেল কিছুদিন। কিন্তু বছর দুই পরে তৃতীয় প্রস্তাবও এসেছিল একটা, এবং আশ্চর্যের বিষয় এবার প্রস্তাবটা এনেছিলেন পর্বতবিলাস স্বয়ং। পর্বতবিলাস ছিলেন তখন সুলতানগঞ্জের গৈবীনাথ পাহাড়ে। তিনি একটি পত্রে প্রস্তাবটি পাঠিয়েছিলেন মহারাণীকে। পত্রটি বহন করে আনেন এক সৌম্যদর্শন দীর্ঘকায় যুবক। তিনি অবশ্য সোজা আসেননি, কিম্বা নগণ্য পত্রবাহকরূপেও আসেননি, বেশ সমারোহ সহকারে এসেছিলেন তিনি, সঙ্গে লোকজন ছিল অনেক, পাশের গ্রামে এসেছিলেন প্রথমে। তিনি পর্বতবিলাসের যে পত্রটি এনেছিলেন সেটি আধুনিক সাধু ভাষায় রূপান্তরিত করলে এইরূপ দাঁড়ায়।

শ্রীশ্রী দক্ষিণা কালিকা সহায়

মোকাম সুলতানগঞ্জ
বিহার

অসংখ্য আশীর্বাদান্তে নিবেদনমেতৎ,

মা, মহারাণী, মা কালীর অনুগ্রহে আশা করি তোমরা মঙ্গলমত আছ। একটি বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে তোমাকে এই পত্রটি লিখিতেছি। তাগিদটি আমার বিবেক-প্রসূত বলিযাই আমার নিকট ইহা উপেক্ষণীয় নহে, তাই এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। তুমি বিশেষ চিন্তা করিয়া তবে যথাকর্তব্য স্থির করিবে! ব্যাপারটি তোমার বিবাহ-বিষয়ক। দাদা যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন একাধিকবার তিনি তোমার বিবাহের জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তখন আমিই তাঁহাকে জানাইযাছিলাম বিবাহ না দেওয়াই উচিত, কারণ তুমি বোধ হয় জান আমরা ব্রহ্মশাপ-গ্রস্ত, তাই তখন আমার মনে হইযাছিল, বিবাহ দিলে তুমি শান্তি পাইবে না, হয়তো অমঙ্গলই হইবে। ঘটনাচক্রে দাদার জীবদ্দশায বিবাহ হয়ও নাই। ওই ব্রহ্মশাপের জন্যই আমি কৌমার্যব্রত পালন করিতেছি। কিন্তু একটি আইনের কথা আমার মনে ছিল না। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট পূর্বে একটি আইন করিয়াছিলেন যে অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে রাজামহারাজাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। এখন শুনিতেছি আইন নাকি জমিদারদের সম্বন্ধেও বলবৎ হইবে। ইহাও শুনিতেছি এই অপুত্রক জমিদারদের সম্পত্তি সরকার তাঁহার অনুগৃহীত লোকদের দিবেন। আমাদের বংশের ঘোর শত্রু ছাগলা পাড়ার জমিদার রটাইয়া বেড়াইতেছে যে আমাদের জমিদারি সেই নাকি শেষ পর্যন্ত ভোগ করিবে, কালেকটার সাহেব তাঁহাকে নাকি একথা বলিয়াছেন। ইহার পর সে আমাদের কালীমন্দির হইতে দক্ষিণাকালীর বিগ্রহ সরাইয়া সেই স্থানেই নাকি লাড়ু গোপাল বিগ্রহ স্থাপন করিবে, সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রীর মন্দিরে থাকিবে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। আমাদের সম্পত্তি পাইলে সে কি কি করিবে তাহা ইতিমধ্যেই স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। কালনেমির লঙ্কা ভাগের গল্প মনে পড়ে। হয়তো ইহা গুজব মাত্র। কিন্তু এ কথাটা আমার এখন মনে হইতেছে আমাদের বংশরক্ষার চেষ্টাটা অন্তত করা উচিত, চেষ্টা করিয়া যদি কৃতকার্য না হওয়া যায় তাহা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। ইন্দ্রজিৎ রায়ের বংশধরেরা আমাদের পূর্বপুরুষের ভিটায় বসবাস করিয়া মা

কালীর মন্দিরে নাড়ু গোপাল স্থাপন করিয়াছে এ চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য। সুতরাং বংশরক্ষার চেষ্টা করিতেই হইবে, ফলাফল অবশ্য মায়ের হাতে। আমার নিজের আর বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই, আমার বয়সও হইয়াছে, তাছাড়া মায়ের সেবায় আমি বহুদিন পূর্বেই আত্মসমর্পণ করিয়াছি। সুতরাং তোমাকেই বিবাহ করিতে হইবে। দাদা বাঁচিয়া থাকিলে কোথাও না কোথাও তোমার বিবাহ দিতেনই। নানা দিক হইতে ভাবিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে অভিভাবক হিসাবে যদি তোমার বিবাহের জন্য চেষ্টিত না হই, দাদার পরলোকগত আত্মা শান্তি পাইবেন না, আমারও কর্তব্যচ্যুতি ঘটিবে। তাই আমি তোমার জন্য একটি সৎপাত্রের সন্ধান করিতেছিলাম, মায়ের কৃপায় একটি সৎপাত্র পাইয়াছি। তান্ত্রিক ষোড়শীনাথ একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী। কথা প্রসঙ্গে তাঁহার নিকট একদিন শুনিলাম কিছুদিন পূর্বে তিনি একটি ব্রাহ্মণ যুবকের কর-কোষ্ঠি বিচার করিয়াছিলেন তাহার কর কোষ্ঠিতে নাকি শত পুত্র হইবার চিহ্ন আছে। কথাটা শুনিয়াই আমার মনে হয় এই পাত্রের সহিত যদি তোমার বিবাহ দিতে পারিতাম তাহা হইলে ইহার ভাগ্য প্রভাবে হয়তো আমাদের বংশরক্ষা হইতে পারিত, হয়তো ব্রহ্মশাপও কাটিয়া যাইত তখন কিন্তু যুবকটির সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই ষোড়শীনাথও তাহার সঠিক সংবাদ আমাকে আর দিতে পারেন নাই। জনৈক কন্যার পিতার অনুরোধে যোটক বিচারের জন্য ইহার কর কোষ্ঠি দেখিয়াছিলেন পাত্রটির অপঘাত মৃত্যু যোগ থাকায় কন্যার পিতা বিবাহ দিতে অসম্মত হইয়াছেন ইহার বেশী আর কোন সংবাদ তিনি জানেন না। কিন্তু মহামায়ার এমনই বিচিত্র যোগাযোগ পাত্রটির পুনরায় নাগাল পাইলাম শুধু তাহাই নহে, সে নিজেই আসিয়া বিবাহের প্রস্তাবও করিল। গত সূর্যগ্রহণের সময় তুমি বোধহয় গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলে, তখন গঙ্গার ঘাটে সে তোমাকে দেখিয়াছিল। তাহার পর স তোমার খোঁজ লইয়া অবশেষে আমার কাছে আসিয়া হাজির হইয়াছে। তাহার একান্ত ইচ্ছা তোমাকে বিবাহ করে। তাহার পিতামাতা কেহ জীবিত নাই, সে নিজেই নিজের অভিভাবক। জাতিতে ব্রাহ্মণ, আমাদের পালটি ঘর। এ সব সংবাদ অবশ্য তাহারই মুখে শুনিয়াছি, সবিশেষ খোঁজ করি নাই। বিহার প্রদেশের ডিহি দরিয়াপুর গ্রামে ইহার নিবাস। জমিদারি আছে। তাহাকে তান্ত্রিক ষোড়শীনাথের নিকট লইয়া গিয়াছিলাম, তিনিই আমাকে গোপনে বলিলেন, এই সেই যুবক যাহার শতপুত্রের পিতা হওয়ার যোগ আছে। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম, অনুভব করিলাম হয়তো ইহা মহামায়ারই ইঙ্গিত।

কিন্তু ইহার সহিত বিবাহ বিষয়ে শেষ কথা বলিবার পূর্বে তোমার অভিমত লওয়া প্রয়োজন। তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ, প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছ, দাদার নিকট শুনিয়াছিলাম পছন্দ অপছন্দ বিষয়ে তোমার একটা নিজস্ব মতামত আছে। আমি তাহা অগ্রাহ্য করিতে চাহি না। এই সব বিবেচনা করিয়া স্বয়ং পাত্রকেই তোমার নিকট প্রেরণ করিতেছি। এই পত্র তাঁহার হাতেই পাঠাইলাম। ইনি শুনিয়াছি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। ইঁহাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিও।

তুমি অন্তরাল হইতে ইঁহাকে দেখিয়া এবং প্রয়োজন হইলে আলাপ করিয়া আমাকে জানাইও ইঁহাকে তোমার পছন্দ হইল কি না। এই ব্যক্তি শতপুত্রের পিতা হইবে তান্ত্রিক

ষোড়শীনাথের এই ভবিষ্যদ্বাণী আমাকে অত্যন্ত আশান্বিত করিয়াছে। বংশরক্ষা ছাড়াও তোমাকে আর একটা কথা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। আমাদের ওই প্রকাণ্ড বাড়িতে তুমি দাস-দাসী লইয়া একা থাক, তোমার পুরুষ অভিভাবক কেহ নাই, ইহা বড়ই দৃষ্টিকটু। মিথ্যা করিয়াও কেহ যদি তোমার নামে কলঙ্ক রটায় তাহা আমাদের বংশের মান লাঘব করিবে। যাঁহাকে তোমার নিকট পাঠাইতেছি তিনি সুস্থ, সমর্থ, বলিষ্ঠ পুরুষ। আপাতদৃষ্টিতে তোমার যোগ্য পাত্র বলিয়াই মনে হয়। তোমার সহিত বিবাহ হইলে ইনি ডিহি দরিয়াপুরের বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তোমার নিকটেই থাকিবেন এ প্রতিশ্রুতিও আমাকে দিয়াছেন। সব দিক বিবেচনা করিয়া তুমি আমাকে উত্তর দিও। তোমার সম্মতি পাইবার পর আমি ইঁহার বংশ প্রভৃতির সবিশেষ সন্ধান লইব। আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্বাদক শ্রীপর্বতবিলাস চৌধুরী।

মহারাণীব পাণিপ্রার্থী যুবক উদয়প্রতাপ সরাসরি মহারাণীর বাড়িতে আসেননি, একথা আগেই বলেছি। তিনি তাঁর কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে প্রথমে উঠেছিলেন দাউদপুরের সরাইখানায়। তিনি এসেছিলেন সুসজ্জিত পালকিতে, সঙ্গীরা অশ্বারোহণে। প্রায় সপ্তাহ খানেক পবে এল কয়েকখানা গরুর গাড়ি তাঁবু আর তৈজসপত্র বোঝাই করে। গরুর গাড়ির সঙ্গে এল আসাসোটাধাবী বরকন্দাজেব দল। দাউদপুরের মাঠেই সারি সারি তাঁবু পড়ল কয়েকখানা। বেশ সমারোহ সহকারে ডিহি দরিয়াপুরের জমিদার উদয়প্রতাপ রায় নিজেকে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত কবলেন মহাবাণীর বাড়ির কাছে। রটে গেল তিনি শিকার করবার জন্যে এসেছেন। একটা নেকড়ে বাঘও মারা পড়ল তাঁর গুলিতে। দেখতে দেখতে চারিদিকে বেশ নাম-ডাক হয়ে গেল তাঁর। এ অঞ্চলে নিজেকে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত করবার পর তবে তিনি পর্বতবিলাসেব চিঠিখানি পাঠালেন মহারাণীকে। চিঠিখানি এল একটি সুদৃশ্য পালকিতে চড়ে এক রূপসী বাঁদীব মারফতে। পালকির পিছনে এল নানারকম উপঢৌকন ফুল-ফলের ডালি, মালা কত রকমেব, তাছাড়া অনেক রকম মিষ্টান্ন।

মহারাণী তখন নিজেব বাগানে সিংহটার সঙ্গে খেলা করছিল। এই সিংহটির একটু পরিচয় দেওয়া দরকার, কারণ মহারাণীব জীবনে এটিও একটি প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। অতি শিশু বয়স থেকে মহারাণী পুষেছে একে, বেশ পোষও মেনেছে। একসঙ্গে দুজনে শোয় পর্যন্ত এক বিছানায়। এক আর্মানি সাহেবের কাছ থেকে অনেক দাম দিয়ে সে কিনেছিল একে। আর্মানি সাহেব বলেছিল, এটি হচ্ছে আসল আফ্রিকান সিংহের বাচ্ছা। যদি ঠিক মতো পালন করতে পারেন তাহলে বুঝতে পারবেন সত্যিই ও পশুরাজ। সিংহটার সঙ্গে আর্মানি সাহেব একটি কাফ্রি মেয়েকেও বিক্রি করে গিয়েছিল মহারাণীর কাছে। সেকালে লুকিয়ে চুবিয়ে, অনেক সময় প্রকাশ্য ভাবেও, তখন মানুষ বিক্রি হত; মেয়েটার সম্বন্ধে যে কাহিনী আর্মানি সাহেব বলেছিল তা রূপকথার মতো বিস্ময়কর। ওর বাবা আফ্রিকার জঙ্গল থেকে নানারকম পশুধবে বিক্রি করত। সিংহিনীর কাছ থেকে তার বাচ্ছা কেড়ে আনাই তার বিশেষত্ব ছিল একটা। কারণও ছিল এর। ওর একমাত্র ছেলেকে এক সিংহ মেরে ফেলেছিল! তারই প্রতিশোধ নেবার জন্য এই দুঃসাধ্য ব্রত গ্রহণ করেছিল সে। প্রথম প্রথম সিংহের

বাচ্ছা ধরে পাথরে আছাড় দিয়ে সে মেরেই ফেলত সেগুলোকে। তারপর তার দেখা হয় এই আর্মানি বণিকের সঙ্গে। সে বাচ্ছাগুলোকে মারতে দিত না, কিনে নিত ভাল দাম দিয়ে। এই বাচ্ছাটা কেনার কিছুদিন পরেই লোকটা মারা যায়। তাকেও সিংহের হাতেই প্রাণ দিতে হয়েছিল। তখনকার লোকেবা এ বিষয়ে যে গল্পটা বলে তা অদ্ভুত। সিংহেবা না কি এক চাঁদনী রাতে মরুভূমির মধ্যে সভা করে জেহাদ ঘোষণা করেছিল লোকটার বিরুদ্ধে। তাদের গর্জনে আকাশ, বাতাস এমন কি চন্দ্র তারা পর্যন্ত কম্পমান হয়ে উঠেছিল। তাবপর দিন দিবা দ্বিপ্রহরে তারা যা করল তা অভূতপূর্ব। দল বেঁধে গ্রামের ভিতরে এসে লোকটাব ঘবে ঢুকে তুলে নিয়ে গেল তাকে। গ্রামসুদ্ধ লোক মার মার শব্দে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল, পারেনি। এই মা মরা মেয়েটাও সেই ঘবে ছিল, কিন্তু ওকে কিছু বলেনি সিংহরা। আর্মানি সাহেব তার জ্ঞাতিদের কাছ থেকে মেয়েটাকেও কিনে নেন। তাঁর সঙ্গেই মেয়েটি আছে বরাবর, ও-ই সিংহ-শিশুটির পবিচর্যা কবে, এ বিষয়ে ওর বিশেষ দক্ষতা আছে। মহারাণী সিংহের বাচ্ছাব সঙ্গে তার পরিচারিকা মটেসাকেও কিনে নিয়েছিল। আর্মানি সাহেব সিংহেব বাচ্ছার নাম বেখেছিলেন আলেকজাণ্ডাব আব ওই জুলু মেয়েটার ইবনি। মহাবাণী নাম বদলে দিয়েছিল। সিংহের বাচ্ছাব নাম হল মহাবাজ আর ইবনিব নাম হল কষ্টি। কষ্টি বাংলা শিখেছিল, বুঝতে পারত, কিন্তু বলতে পাবত না।

কষ্টিই উদযপ্রতাপেব বাঁদীকে নিয়ে এল মহারাণীব কাছে। বাঁদী আভূমি প্রণত হয়ে পর্বতবিলাসের চিঠিখানি মহাবাণীকে দিল এবং ভীতি-বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে বইল সিংহটার দিকে। সিংহটাও ঘাড় উঁচু করে নির্নিমেষে দেখছিল এই আগন্তুককে, তার গলার ভিতর থেকে গরগর গবগর আওয়াজ বেরুচ্ছিল একটা।

"ছিঃ, ও কি অসভ্যতা—"

মহাবাণী ছোট একটি চাপড় মেরে তারপর গলা জড়িয়ে চুমু খেলে তার গালে।

মহারাজ প্রশমিত হল। খুশীও হল। মহারাণীর কোলের উপর দুই থাবা তুলে দিয়ে মাথাটা ঘসতে লাগল তার বুকে। মহারাণী তখন ভাল করে চেয়ে দেখলেন বাঁদীব দিকে।

"কার চিঠি?"

"আপনার কাকার। আমার মনিব নিয়ে এসেছেন।"

"কে তোর মনিব।"

"উদয়প্রতাপ রায়।"

"ও, দাউদপুবের মাঠে যাঁর তাঁবু পড়েছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

ভ্রূকুঞ্চিত করে মহারাণী চিঠিখানি পড়ল আগাগোড়া। তারপর বলল, "আচ্ছা, তোমার মনিবকে আসতে বোলো এখানে। পরদার আড়াল থেকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করব আমি।"

তাব পরদিনই এসেছিলেন উদয়প্রতাপ। অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি করেনি মহারাণী। স্বর্ণখচিত আসনে বসতে দিয়েছিল তাঁকে, ভোজ্য এবং পানীয় পরিবেশিত হয়েছিল সোনার বাসনে। যে ঘরে তাঁকে বসতে দেওয়া হয়েছিল তার নিকষ-কৃষ্ণ মেজের উপর আলপনার

যে ছবিটি চিত্রিত ছিল তা দেখে একটু চমক লেগেছিল উদয়প্রতাপের, হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছিল এটা কি মহারাণীর কোন নিগূঢ় ইঙ্গিত? সারা মেজে জুড়ে একটা বিরাট সাপের সঙ্গে এক বিরাট ময়ূরের যুদ্ধের ছবি আঁকার মানে কি! ছবির অঙ্কন কুশলতায় কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আতর এবং গোলাপজলের গন্ধ আমোদিত করে রেখেছিল সারা ঘরটাকে। অলিন্দে, বাতায়নে, দেওয়ালে দুলছিল নানা বর্ণের অসংখ্য ফুলের মালা। ঘরের দুধারে দুটো দাঁড়ে বসে গা দোলাচ্ছিল দুটো অপরূপ কাকাতুয়া।

আহারাদি শেষ হবার পর রত্নালঙ্কৃত একটি পানের বাটা হাতে করে ঢুকল মহারাণীর খাস পরিচারিকা শৌরসেনী। নম্র নমস্কার করে পানের বাটাটি উদয়প্রতাপের সামনে নামিয়ে বলল, "ওই পরদার আড়ালে মা এসে বসেছেন। আপনি যা বলবেন বলুন—"

এই বলে আবার নমস্কার করে সে চলে গেল। সুসজ্জিত আরও দুটি পরিচারিকা, রঞ্জাবতী আর মোহিনী, আগে থেকেই পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল চামর হাতে নিয়ে।

উদয়প্রতাপ তাদের দিকে ফিরে বললেন," তোমরাও যাও, আমি যা বলব তা গোপনীয়।"

তারাও বাইরে চলে গেল। দ্বারে বিলম্বিত উজ্জ্বল চিক্কন রেশমের পরদার ওপারে শোনা গেল অলঙ্কারের নিক্কণ। উদয়প্রতাপ প্রত্যাশা ভরে চাইলেন সেদিকে। অলঙ্কারের নিক্কণ আর একবার শোনা গেল, কিন্তু আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

উদয়প্রতাপ তখন নিজেই কথা শুরু করলেন।

"আপনার কাকা বলেছিলেন চিঠির উত্তর নিয়ে যেতে।

উত্তর কখন পাব?"

"উত্তর আমি পাঠিয়ে দেব তাঁর কাছে।"

"আমি কি কিছুই জানতে পাবব না?"

"কি জানতে চান বলুন।"

"কি জানতে চাই তা কি আপনার অজানা আছে। যে আশা করে এতদূর এসেছি তা কি পূর্ণ হবে না?"

পরদার ওপার থেকে কয়েক মুহূর্ত কোন উত্তর এল না। পরদাটা দুলে উঠল শুধু একবার। তারপর মহারাণীর মৃদুকণ্ঠ শোনা গেল।

"আমি ঠিক করেছি, বিয়ে করব না।"

"সে কি! এমন অস্বাভাবিক সঙ্কল্প কেন?"

"আমি তো ঠিক স্বাভাবিক নই। সকলে সাধারণত যা করে আমি তা করতে ভালবাসি না।"

"কি রকম?"

"এই ধরুন, সাধারণ নিয়ম অনুসারে যদি চলতুম তাহলে আমাকে গঙ্গার ঘাটে দেখতেই পেতেন না আপনি। জমিদারের বাড়ির বৌ-ঝিরা সাধারণত বোরখা-ঢাকা পালকি চড়ে গঙ্গাস্নানে যায়, গঙ্গায় নামবার আগে গঙ্গার ঘাট থেকে জল পর্যন্ত দুধারে কানাত পড়ে। আমি সেদিন খোলাখুলি ভাবেই গিয়েছিলাম—"

"সেই জন্যেই তো মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। আপনাকে দেখেই বুঝেছিলাম আপনি অসাধারণ। নিজের মুখে বলা শোভা পায় না, আমিও ঠিক সাধারণ লোক নই, তাই– "

"আপনার সব পরিচয় আমি জানি। আপনাদের গাঁয়ের একটি মেয়ে আমার অন্দরমহলে আছে, তার কাছ থেকে সব শুনলাম।"

"কে বলুন তো?"

"সে নিজেকে গোপন রাখতে চায়।"

কথাটা শুনে চুপ করে গেলেন উদয়প্রতাপ। ভ্রূকুঞ্চিত করে নীরব হয়েই রইলেন খানিকক্ষণ।

"আমার বাসনা চরিতার্থ হবার কোন আশা নেই তাহলে?"

"আমাকে ক্ষমা করুন বিবাহ করবার ইচ্ছে আমার নেই।"

উদয়প্রতাপের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। চোখের কোণে এক ঝলক বহ্নিও চকমক করে উঠল। জীবনে অনেক দুঃসাধ্য সাধন করেছেন তিনি, অনেক দুর্ধর্ষ শত্রুর মাথা লুটিয়ে পড়েছে তাঁর পায়ের কাছে, সামান্য একটা মেয়ের কাছে হেরে যাবেন না কি! কিন্তু এটাও তিনি অনুভব করলেন, শক্তির হুঙ্কার বা বীরত্বের আস্ফালন বেমানান হবে এখন। মৃদু হেসে তাই তিনি যা করলেন, তা ঠিক অভিনয় নয়, মহারাণীর জন্য সত্যই উতলা হয়ে উঠেছিল তার হৃদয়, কোমল গদগদ কণ্ঠে বললেন, "আমি মিনতি করছি।"

পরদার ওপার থেকে উত্তর এল, "আমিও মিনতি করছি, ক্ষমা করুন আমাকে।"

হঠাৎ একটা কথা মনে হল উদয়প্রতাপের। নেপথ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে নাকি? কোন প্রণয়ী? কিন্তু তখনই তাঁর মনে হল এখন এ প্রশ্ন করে লাভ নেই এখানে। খোঁজ করতে হবে। নীরবতা ঘনিয়ে এল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর সহসা পরদার দিকে চেয়ে উদয়প্রতাপ বললেন,"হতাশ হয়েই ফিরতে হবে তাহলে?"

"আবার বলছি ক্ষমা করুন আমাকে।"

এবার আর আত্ম সম্বরণ করতে পারলেন না উদয়প্রতাপ।

বললেন, "ভিক্ষে করে যা আজ পেলাম না, আশা রইল দাবীর জোরে তা একদিন নিয়ে যাব। চললুম "

উঠে গেলেন তিনি। কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হল ক্ষণকালের জন্য। পরদার ওপারে যেন বজ্রপাত হল। গর্জন করে উঠল মহারাজ। কিন্তু আর কোন প্রশ্ন না করে চলে গেলেন উদয়প্রতাপ।

এরপর আর বিবাহের প্রস্তাব আসেনি। তার সম্ভাবনাটুকুও রহিত হয়ে গেল। খবর এল পর্বতবিলাস কামাখ্যা পাহাড়ে মারা গেছেন। শোচনীয় সে মৃত্যু। কি এক তান্ত্রিক সাধনা করছিলেন সেখানে, হঠাৎ উন্মাদ হয়ে যান। উন্মাদ অবস্থায় লাফিয়ে পড়েছিলেন পাহাড় থেকে।

মহারাণী যথাকালে বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হল। এরপর মহারাণী-চরিত্রে যে

বৈশিষ্ট্য দেখা গেল, তাতে অনেকে বিস্মিত হল, অনেকে আবার সাধুবাদও করতে লাগল। অন্দরমহলের পুরাতন পুরুষ ভৃত্যেরা যতদিন জীবিত ছিল ততদিন কোন পরিবর্তন বোঝা যায়নি, কিন্তু তারা যখন একে একে মারা যেতে লাগল তখন তাদের বদলে আর কোনও পুরুষ নিযুক্ত হল না, নিযুক্ত হল নারী। বাইরের মহলে অবশ্য পুরুষ চাকর না থাকলে চলে না। বরকন্দাজ, বেয়ারা, সহিসের কাজ মেয়েদের দ্বারা হয় না। তারা রইল। কিন্তু রইল বাইরের মহলে। হাতীর বুড়ো মাহুত রহিমের মৃত্যুর পর একজন মাদ্রাজী মেয়ে মাহুতও জুটে গেল মহারাণীর। রহিমের জায়গায় সে-ই বহাল হল। অর্থাৎ অন্দরমহলে বিনা অনুমতিতে কোন পুরুষের আর প্রবেশাধিকার রইল না। অবশ্য দুটি পুরুষ ছাড়া। একজন শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থ, আর একজন গালুটির বড়বাবু মহেন্দ্রনাথ। মহারাণীর আমন্ত্রণে এঁরা প্রায় আসতেন অন্দরমহলে। অন্দরমহলের খিড়কি বাগানে কিন্তু প্রবর্তিত হল বিপরীত নিয়ম, সেখান থেকে স্ত্রীপশুগুলি অপসারিত হতে লাগল একে একে। ময়ূরী আর একটাও রইল না। বাঘ সিংহ একটা করেই ছিল এবং দুটোই ছিল পুরুষ। শেয়াল সজারু উদ্‌বিড়াল মরে যাবার পর আর কেনা হল না। পাখী খরগোস রইল অবশ্য। পুরুষ পাখী পুরুষ খরগোস। কিন্তু বাঘ সিংহ আর ময়ূর এই তিনটে জানোয়ারই বেশী প্রিয় হয়ে উঠল মহারাণীর। কার্তিক আব রঘু মারা গিয়েছিল কিছুদিন আগে। নূতন বাঁদর আর কেনা হয়নি, নূতন ময়ূর কিন্তু এসেছিল, পুরুষ ময়ূব। বাঘ সিংহ আর ময়ূরের জন্য আলাদা আলাদা মহলও করিয়ে দিল মহারাণী। এদের মহলে আব কেউ যেতে পেত না। কষ্টি শুধু যেত পরিষ্কার করবার জন্য, এদের বাকী সেবা যত্ন মহারাণী নিজেই করত— খেতে দিত, খেলা করত, এমন কি গল্পও করত এদের সঙ্গে। মহারাণীর অধিকাংশ সময়ই কাটত এদের নিয়ে। শৌরসেনী মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে যেত, এদের কাছে যাবার আগে বিশেষ রকম প্রসাধনও করত মহারাণী। এক একটা মহলে একদিন, কখনও বা উপর্যুপরি দু'তিন দিন যেত সে। গিয়ে অনেকক্ষণ থাকত। আর সে সময় হত এক অদ্ভুত কাণ্ড। অন্য মহল দুটোতে শুরু হত গর্জন আর চীৎকার। মনে হত যেন ঈর্ষা আর ক্ষোভের জ্বালায় ছটফট করছে ওরা। সিংহটা কম চেঁচাত, তার উপেক্ষার ভাব ছিল একটু, কিন্তু ময়ূর আর বাঘ ক্ষেপে উঠত যেন। প্রত্যেক মহল থেকে প্রত্যেক মহলের ভিতর পর্যন্ত দেখা যেত। এই সব চীৎকার চেঁচামেচি নিবারণের জন্য পরদার ব্যবস্থা করেছিল মহারাণী। যে মহলে মহারাণী ঢুকত সে মহলের চারিদিকে পরদা ফেলে দেওয়া হত। এতেও কিন্তু মনোমত ফল হয়নি। একটা মহলে লুকিয়ে ঢুকলেও অন্য মহলের অধিবাসীরা টের পেয়ে যেত, আর প্রতিবাদও জানাত তার-স্বরে। ফলে খিড়কি-বাগানের বায়ু-মণ্ডল ময়ূরের কেকায়, বাঘের গর্জনে এবং সিংহের মন্দ্র নিনাদে স্পন্দিত হত প্রায় প্রতিদিন। বাইরের আশেপাশের লোকেরা ভয় পেত, অবাক হত। নানারকম গুজব রটেছিল এই নিয়ে। কিন্তু ঠিক খবরটি কেউ জানত না, কারণ জানবার উপায় ছিল না। বাইরে থেকে অন্দরমহলে আসতে পেত না কেউ, অন্দরমহলবাসিনীরাও বাইরে যেত না, খিড়কির বাগানে যাবারও অনুমতি ছিল না তাদের। সুতরাং তারাও ঠিক খবরটি জানত না। খবরটি জানত শুধু কৃষ্ণাঙ্গিনী কষ্টি। কিন্তু সে বাংলা বুঝত, কিন্তু বলতে পারত না। তাছাড়া সে ভাল করে

মিশতেও পারত না কারো সঙ্গে। বাগানের একপ্রান্তে যেখানে হেলে-পড়া আমাগাছটাকে কেন্দ্র করে ঝোপ জঙ্গল গজিয়েছিল সেইখানে একটা ছোট ঘর বানিয়ে একা একা থাকত সে, তার একমাত্র কাজ ছিল মহারাণীর সামনে দাঁড়িয়ে ময়ূর, বাঘ আর সিংহের ঘরগুলো পরিষ্কার করা আর মহারাণীর খেয়াল-খুশী মতো সং সাজা। মহারাণী কখনও তাকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে রাখত, কখনও বলত চোখ বুজে জিব বার করে বসে থাকতে, কখনও দুহাত তুলিয়ে বসিয়ে রাখত। মাঝে মাঝে জুলু ভাষায় কঙ্গো দেশের গান গাইত সে একা গাছের উপর বসে। কারও সঙ্গে মিশত না, তাই যা সে জানত তা বাইরে প্রচার করবার সুযোগ ছিল না।.....আর একটি কাজও করেছিল মহারাণী। শিব-প্রতিষ্ঠা করিয়েছিল। ওই খিড়কির বাগানের একধারেই হয়েছিল মন্দিরটি। সুদূর রাজপুতানা থেকে এসেছিল শ্বেতপাথরের প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গটি। মিস্ত্রি মজুরও এসেছিল রাজপুতানা থেকে। এর জন্যে কোনও পুরোহিত বহাল হয়নি। মহারাণী নিজেই পুজো করত, এমন কি মন্দিরও পরিষ্কার করত সে নিজেই। চন্দন-গোলা জল দিয়ে মুছত ঘরের মেজে। স্বহস্তে ঘি মাখন চন্দন মাখাত শিব-লিঙ্গে, তারপর দুধে স্নান করাত তাকে। এই নিয়েও অনেকক্ষণ সময় কাটত তার। যারা বাইরে থেকে পশুদের চীৎকার শুনত তাদের মধ্যে যারা কল্পনা কুশল তাদের ধারণা হয়েছিল এই চীৎকারের কারণ ওই শিবলিঙ্গ। তারা কল্পনা করত মহারাণীর সঙ্গে ওই পশুরাও বন্দনা করছে পশুপতিকে নিজ নিজ ভাষায়। সেইজন্য পশুদের চীৎকার উঠলেই দেখা যেত বাইরে অনেকে নমস্কার করছে।

পশুরা কেন চীৎকার করে তা কষ্টি অবশ্য জানত। কিন্তু সে এর অর্থ করেছিল নিজের সংস্কার অনুসারে। সে মহারাণীকে সাধারণ মানবী বলে মনেই করত না। আফ্রিকার আদিবাসিনী সে, তার সংস্কার তাকে বলে দিয়েছিল এই তপ্তকাঞ্চনসন্নিভা তন্বীটি সেই জাতের মেয়ে যে জাতের ছিল এলোকেশী টকুমা। টকুমাকে সে ভোলেনি। গভীর অরণ্যবাসিনী টকুমা থাকত সম্পূর্ণ উলঙ্গিনী হয়ে, বেবুন শিম্পাঞ্জীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দোল খেত বনস্পতির ডালে ডালে। তার কুঞ্চিত আলুলায়িত কৃষ্ণ চিকুরে সাধারণ তেল পড়ত না কখনও, তবু কিন্তু রুক্ষ ছিল না তা, চুলে সাপের চর্বি মাখাত সে। সে যখন দোল খেত তার চুলের গোছা দেখে মনে হত একগোছা সর্পশিশু যেন ফণা তুলে দুলছে তার পিঠের উপর। তার কাছে ভবিষ্যৎ জানবার জন্যে যেত অনেকে। তার বাবা একবার গিয়েছিল, কষ্টিও সঙ্গে ছিল। তার কাছে যেতে হলে একটা নেউল নিয়ে যেতে হত। সেই নেউলটির গলা কেটে সে টাঙিয়ে দিত অগ্নিকুণ্ডের উপর। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ত অগ্নিকুণ্ডে, ছোঁক ছোঁক করে শব্দ হত, ধোঁয়া উঠত কুণ্ডলী পাকিয়ে। সেই ধোঁয়ার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে টকুমা। কখনও হাসত হি হি করে, ফুঁপিয়ে কাঁদত কখনও, কখনও আবার দুহাত তুলে নাচত। আচ্ছন্নের মতো হয়ে যেত খানিকক্ষণ, সেই অবস্থায় ভবিষ্যদ্বাণী করত সে। যা বলত তা ফলে যেত। সে বলে দিয়েছিল তার বাবা প্রাণ হারাবে সিংহের কবলে, বলে দিয়েছিল তার জীবন কাটবে সমুদ্রপারে এক বিদেশিনী শক্তিময়ী নারীর অধীনে। সব ফলে গেছে। কষ্টির দৃঢ় বিশ্বাস মহারাণীও টকুমার মতো শক্তিশালিনী। সে স্বচক্ষে দেখেছে টকুমার মতো মহারাণীও সম্পূর্ণ

আত্মহারা হয়ে থাকে, বিশেষ করে যখন সে পশুদের কাছে যায়। ওই পশুদের সে বশ করেছে যে শক্তি বলে তা সাধারণ স্ত্রীলোকের থাকতে পারে না। ময়ূর বাঘ আর সিংহকে নিয়ে এমন সব কাণ্ড কবে মহারাণী যা অদ্ভুত। অনেক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছে কষ্টি। মহারাণীর সামনে ময়ূরটা যখন পেখম তুলে নৃত্য করে তখন মনে হয় মহারাণী যেন মানবী নয় ময়ূরী! আবার বাঘের ঘরে তাকে মনে হয় বাঘিনী। প্রকাণ্ড বাঘটা তার কাঁধের উপর সামনের দুই থাবা রেখে তাকে যেন আদর করতে চায়। মহারাণীর ঘাড়ে মাথা রেখে যে ঃ স্ফুট শব্দ সে করতে থাকে তা ঠিক যেন প্রেমালাপের মতো শোনায়। সিংহটাকে অবশ্য অত চাপল্য প্রকাশ করতে দেখেনি কষ্টি, কিন্তু মহারাণী যখন সিংহের পিঠের উপর চড়ে তার গলা জড়িয়ে ধবে তখন মনে হয় তার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগে, কেশরগুলো ফুলে ওঠে, জ্বল জ্বল করতে থাকে চোখের দৃষ্টি, পুচ্ছের আন্দোলন দেখে মনে হয়, এই বুঝি আত্মসংযম হারাল সে। কিন্তু হাবায় না। গম্ভীর হয়ে সহ্য করে সে মহারাণীর উচ্ছ্বসিত সোহাগ অত্যাচার। মাঝে মাঝে কেবল মৃদু গর্জন করে, মনে হয় মেঘ ডাকছে বহু-দূরে। পশুরাজ নিজের শালীনতা হারাযনি, অসংযত হয়নি কখনও। বাঘের মতো পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে আলিঙ্গন কববাব চেষ্টা করেনি মহারাণীকে, কোন অশোভন প্রগলভতা প্রকাশ পায়নি তাঁর আচরণে। কিন্তু সিংহেব এই উপেক্ষা মহাবাণীর যেন পছন্দ হত না। মহারাণী চাইত ময়ূর আর বাঘের মতো সে-ও উতলা হয়ে উঠুক। কিন্তু সে হত না। কেশব ফুলিয়ে বসে থাকত চুপ করে। কষ্টিব বিশ্বাস এজন্য অভিমান হত মহারাণীর। রাগ করে উপর্যুপরি দু'তিন দিন সে যেত না সিংহের মহলে। তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে আদর কবত ময়ূরকে, চুমু খেত বাঘের গালে। সিংহ ঘাড় ফিরিয়ে দেখত সব, মাঝে মাঝে গর্জন করেও উঠত। কিন্তু মহারাণী ফিবে এলে আবার গম্ভীর হয়ে বসে থাকত একধারে। কেশর ফুলিয়ে ল্যাজ নাড়ত খালি। প্রগলভ হয়ে উঠত না কখনও। মহারাণীর আর একটা আচরণে বিস্মিত হয়েছিল কষ্টি। প্রতি অমাবস্যায় মহারাণী বাইরের কালীমন্দিরে পুজো দিতে যেত। একদিন কষ্টিও গিয়েছিল। কালী প্রতিমা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। করালবদনা ভীষণা মুণ্ডমালা-বিভূষিতা প্রতিমার সামনে মহারাণীকে প্রণতা দেখে তাব মনে হয়েছিল এই দেবতাই বোধহয় মহারাণীর শক্তির উৎস। এই দেবতাকে সে-ও মনে মনে ভক্তি করতে শুরু করেছিল। একদিন মহারাণী দেখে অবাক হয়ে গেল একটা ঝোপের আড়ালে কষ্টি মা কালীর মতো উলঙ্গিনী হয়ে হাত তুলে জিব বার করে দাঁড়িয়ে আছে। মা কালীর কথা ভাবতে ভাবতে নিজের অজ্ঞাতসারেই সে ওরকম করেছিল সম্ভবত।

এইভাবেই দিন কাটছিল মহারাণীর। তার বাবার জমিদারির মালিক হয়নি সে কোনদিন, সে হয়েছিল নিজেব সৃষ্ট জগতের অধিশ্বরী। জমিদারির ভার নিয়েছিলেন মহেন্দ্রনাথ, তিনি যা করতেন তাই হত। আইনত মহারাণী সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন তাঁর হাতে। বিষয়ের ঝামেলা ভালই লাগত না তাব। সে নিমগ্ন থাকত নিজেকে নিয়ে খিড়কির বাগানে, হয় পশুদের মহলে, না হয় শিবমন্দিরে। মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ত অশ্বারোহণে বা হাতীর পিঠে চড়ে। মাদ্রাজিনী মাহুত হাতী হাঁকাত।

অন্দরমহলে আত্মীয়স্বজন যারা ছিল, অনেক ছিল, তাদের সঙ্গে বিশেষ যোগ ছিল না তার। শান্ত পিসি মারা গিয়েছিলেন। সমুদ্রবিলাসের মৃত্যুর পর তাঁর দেখন-হাসি শুকতারাও চলে গিয়েছিলেন তাঁর আর এক ঠাকুরপোর কাছে। কাত্যায়ণী বেঁচে ছিলেন, কিন্তু তিনি স্থবির হয়ে পড়েছিলেন. চোখেও দেখতে পেতেন না ভালো। সমুদ্রবিলাসের তৃতীয় পক্ষের বন্ধ্যা বিধবা কুসুম সেবা করত তাঁর। সমুদ্রবিলাসেব দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সিন্ধুবালাও বেঁচে ছিলেন। কিন্তু মহেন্দ্রনাথের ব্যবস্থা অনুসারে তাঁকে বৃন্দাবন-বাস করতে হচ্ছিল। মহেন্দ্রনাথ তাঁকে যেতে বাধ্য করেছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। এর সঙ্গত কারণও ছিল সমুদ্রবিলাসের মৃত্যুর বছর তিনেক পরে তিনি একটি সন্তান প্রসব করলেন এবং প্রমাণ কবতে চেষ্টা করলেন সমুদ্রবিলাসের জীবদ্দশাতেই তাঁর গর্ভ-লক্ষণ প্রকট হয়েছিল, সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হতে কেন যে এত দেরি করল তা তিনি জানেন না। তবে এ বিষয়ে তিনি একটি সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করতেন। তিনি বলতেন কোনও তান্ত্রিকের সহায়তায তাঁর শত্রুপক্ষেবা (মানে, মহারাণী এবং ছোটবউ কুসুম) তাঁর গর্ভস্থ ভ্রূণকে নাকি হত্যা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁর সতীত্বের জোরে ওদের চক্রান্ত সফল হয়নি। সেই ভ্রূণ তাঁর গর্ভে এতকাল বাল্মিকীর মতো তপস্যা করছিল, তপস্যা শেষ করে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সমুদ্রবিলাসের বিষয়ের সেই ন্যায্য উত্তরাধিকারী। একথা কেউ যদি না মানে তাহলে দরকাব হলে তিনি মকদ্দমা করবেন।। তাঁর দলে লোকও জুটে গিয়েছিল বিস্তর। মহেন্দ্রনাথ একদিন এসে তাঁকে বুঝিয়ে বললেন যে তিনি যা বলেছেন তা হয়তো ঠিক, কত অসম্ভব জিনিসই তো সম্ভব হয় পৃথিবীতে, কিন্তু ব্যাপারটা এতই আজগুবি যে ইংবেজের আদালতে ওসব বিশ্বাস করবে না। তিনি মকদ্দমা করলে হেরে যাবেন এবং হেরে যাবার পর তাঁর অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে পড়বে, কাবণ তখন তিনি আত্মীয়-স্বজনদের সহানুভূতিও হারাবেন। তার চেয়ে মোটারকম মাসোহারা নিয়ে তীর্থ-বাস করাই ভালো। সমুদ্রবিলাসের পত্নী যাতে সেখানে উপযুক্ত মর্যাদায় থাকতে পারেন স্টেট থেকে সে ব্যবস্থা করা হবে। অনেক ভেবে চিন্তে সিন্ধুবালা শেষে তাতেই রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে বৃন্দাবন থেকে এমন এক একটি চিঠি লিখতেন যাতে গোপনে গোপনে সাড়া পড়ে যেত অন্দরমহলে। আর সে মহল নিতান্ত ছোট ছিল না। রক্তেব সম্পর্কে, গ্রাম সম্পর্কে, জ্ঞাতিত্বের দাবীতে, বন্ধুত্বের সুবাদে, নানা বয়সের বহু নারী পুরবাসিনী হয়ে থাকত মহারাণীর অন্তঃপুরে। তাদের নিজেদের মধ্যে দলাদলিও ছিল, স্বাভাবিক অস্বাভাবিক নানা উপায়ে তারা চিত্তবিনোদনের উপকরণ সংগ্রহ করত। ঝগড়া করত, ভাব করত, ঘৃণা করত, ভালবাসত। সমুদ্রবিলাসের পিতৃপুরুষদের স্থাপিত মন্দিরগুলিতে পুজো দিত। আলাদা একটা সমাজই গড়ে উঠেছিল অন্দরমহলে। এদের মধ্যে একটা দল ছিল সিন্ধুবালার পক্ষে। তার সামনে যদিও মহারাণীর মন জুগিয়ে চলবার চেষ্টা করত কিন্তু মনে মনে আশা করে থাকত (কামনাও করত), যে সিন্ধুবালা একদা সহসা বৃন্দাবন থেকে তার বয়স্ক পুত্রকে নিয়ে এসে হাজির হবেন এবং মহারাণীর দর্প চূর্ণ করে দেবেন। এদের দলের নেত্রী ছিল মোনার মা। রোগা, ফরসা, বিধবা, খুব মুখ-মিষ্টি, খুব

নিষ্ঠাবতী, পুরুষের ছায়ামাত্র দেখলে লম্বা ঘোমটা টেনে দিত, সিংহবাহিনীর সমস্ত মন্দিরের চত্বরটা নিজে হাতে পুঁছত রোজ, কিন্তু মহারাণীর ঘোর শত্রু ছিল সে। তার দলে ছিল, জিরেগাঁয়ের উলকি (সম্পর্কে মহারাণীর মাসী) গৌর পিসি আর গোবরার মা। এদেরও বিপক্ষ দল ছিল একটা। সে দলের নেতৃত্ব করতেন সমুদ্রবিলাসের তৃতীয় পত্নী কুসুমকুমারী। তাঁর দলে ছিল ওই জিরেগাঁয়েবই মুকুজ্যে গিন্নি (এও সম্পর্কে মহারাণীর মাসী), সাবিত্রী খুড়ি, যমুনাব মা আব সাতু। সবাই আত্মীয়। কুসুম মহারাণীর চেয়ে বছর দুয়েকের বড়, রূপসী এবং যৌবন সমৃদ্ধা। ইনি মহারাণীকে সুনজবে দেখতেন না। কুঞ্জনাথ রায় নামে তাঁব এক ঘাড়ে-গর্দানে কাকা মাঝে মাঝে আসতেন এবং এদিক ওদিক চাইতে চাইতে তাঁর ঘরে বসে নিম্নস্বরে কি সব ফুসফুস গুজগুজ করতেন। শোনা যেত তিনি নাকি সমুদ্রবিলাসের বিষয়ের এক তৃতীয়াংশ কুসুমের জন্য দাবী করে সদরে আর্জি পেশ করেছেন। শীঘ্রই সরেজমিনে তদন্ত করবার জন্যে লোক আসবে। এই বকম নানা ধরণেব ষড়যন্ত্রকে অবলম্বন কবে অন্দরমহলেব বিভিন্ন দল জীবনের আস্বাদ পাবার চেষ্টা করত। আব একটা অবলম্বন ছিল, কুৎসা আব কেলেঙ্কারী। মহারাণী যদিও অন্দরমহলে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ করে দিয়েছিল, কিন্তু তবু নাকি পুরুষ আসত, বাতের অন্ধকারে পাঁচিল ডিঙিযে. । একবার একটা সুড়ঙ্গও নাকি আবিষ্কৃত হয়েছিল। এইব নিয়েও নানা রঙের ঘটনা, গুজব, উত্তেজনা, আশঙ্কা আলো ছায়া বিস্তাব করত মহারাণীর অন্দরমহলে। মহারাণীও তাদের আলোচনা থেকে বাদ পড়ত না। নানাবকম অদ্ভুত আলোচনা হত তার সম্বন্ধে। এমন কথাও কেউ কেউ বলত যে মহাবাণী যে শিবলিঙ্গটি স্থাপন করেছে এবং যার পরিচর্যাব ভাব সে আর কাবও হাতে দিতে চায না, সে শিবলিঙ্গটি নাকি ফাঁপা, তার উপরের অংশটি খোলা যায় এবং তার সঙ্গে একটি সুড়ঙ্গেরও নাকি যোগ আছে। প্রত্যক্ষ দর্শনের সুযোগ কাবও ছিল না, মহারাণীর সঙ্গে আলাপ সূত্রে কিছু বাব কবে নেবাব সুযোগও ছিল না। মহারাণী একেবারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে বাস করত নিজেব মহলে। তার মহলের দাসী চাকরাণীরা পর্যন্ত অন্দরমহলের আর কারও সঙ্গে মিশত না। সম্ভবত মহাবাণীব কোন ইঙ্গিত ছিল এতে। ফলে এই দাঁড়িয়েছিল যে যদিও তারা মহারাণীর অর্থেই প্রতিপালিত হত কিন্তু মহারাণীকে ভালবাসত না কেউ। মহারাণী নিজের চারদিকে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যার মধ্যে কারও প্রবেশাধিকাব ছিল না। নানা লোকে নানা কথা ভাবত। কষ্টি মনে কবত মহারাণী অতি-মানবী. পাঁচার মা ভাবত সময়ে বিয়ে হল না বলেই ও অমন মন-মরা হয়ে একা একা থাকে, আর বাকী সকলেব ধারণা ছিল ও অহঙ্কাবী। এত বড় বিষয়ের অধিশ্বরী হয়ে ও ধরাকে সরা জ্ঞান করছে, সাধারণ মানুষকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না, কারও সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না।

মহারাণীব এই রহস্যময় জীবনযাত্রার আসল হেতুটা বোধ হয় জানতেন শ্রীহর্ষ। সবটা জানতেন না, আভাসে কিছুটা জানতেন। তিনি মনে করতেন তাঁর সঙ্গে মহারাণীর যে সামাজিক বন্ধনটা হব-হব করেও শেষ পর্যন্ত হল না, অথচ যা হয়নি বলেই নিবিড়তর হয়ে

উঠেছে, সেইটেই বোধহয় আসল কারণ। অথচ কি-ই বা করতে পারতেন তিনি এর চেয়ে বেশী। চেষ্টার ত্রুটি তিনি করেন নি।

শ্রীহর্ষ যখন টোলের পাঠ সমাপ্ত করে সসম্মানে কাব্যতীর্থ হলেন তখন ভবভূতি ভট্টাচার্য ছেলের বিয়ের আয়োজন করতে লাগলেন। ভাল বংশ, ভাল ছেলে, নানা জায়গা থেকে সম্বন্ধ আসতে লাগল। সর্বমঙ্গলাকে তিনি পছন্দ করে এলেন। আশীর্বাদ করে পাকা কথা দেওয়ার আগে তাঁর মনে হল ছেলে সাবালক হয়েছে তার মতটা নেওয়া উচিত।

মত নিতে গিয়ে কিন্তু বিপদে পড়ে গেলেন তিনি।

শ্রীহর্ষ বললেন, "আমি বিয়ে করব না।"

"বিয়ে করবে না! আমার একমাত্র ছেলে তুমি, বিয়ে করবে না মানে?"

এ প্রশ্নে একটু হকচকিয়ে গেলেন শ্রীহর্ষ। তারপর আমতা আমতা করে বললেন। "এ বিষয়ে আমি এখনও মন-স্থিব করতে পারিনি। আমাকে মন-স্থির করবার জন্যে কিছু সময় দিন। মনে হচ্ছে এখন বিয়ে করলে আমি অসুখী হব।"

ভবভূতি ছেলের মুখেব দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তার চোখে মুখে একটা উদভ্রান্ত ভাব লক্ষ্য করে প্রথমে বিস্মিত হলেন, তারপর মনে হল ও কিছু একটা লুকোতে চেষ্টা করছে, কিসের জন্য অমন করে আছে ও! তারপর সহসা বুঝতে পারলেন।

"বিশেষ কোন মেয়েকে পছন্দ হয়েছে না কি তোমার?"

আনত নয়নে চুপ করে রইলেন শ্রীহর্ষ কয়েক মুহূর্ত।

তারপর মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলেন তির্যকভাবে।

"মহারাণী ছাড়া আর কোনও মেয়ের সঙ্গে তো ঘনিষ্ঠতা হয়নি আমার।"

"মহারাণীকে বিয়ে করতে চাও?"

শ্রীহর্ষ চুপ কবে বইলেন।

ভবভূতি বললেন, "আমার আপত্তি নেই। সমুদ্র যখন এ প্রস্তাব করেছিল আমি আপত্তি করিনি। তুমিই আপত্তি কবেছিলে, তারপব শুনেছি মহারাণীও আপত্তি করেছিল। এখন তোমাদের দুজনের মত যদি বদলে থাকে আমি দাঁড়িয়ে বিয়ে দেব, নিজেব স্বার্থের জন্য তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতির অন্তরায় হব না। কিন্তু একথাটাও আমি বলে দিচ্ছি পিতৃ-পিতামহের ভিটে ছেড়ে আমি কিম্বা তোমার মা পুত্রবধূর বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারব না।"

"তা থাকবেন কেন, এ প্রশ্ন উঠছে কি করে?"

"তোমাকে কিন্তু থাকতে হবে। দাসখৎ লিখে দিতে হবে একেবারে। মহারাণী আমাদের বাড়িতে আসবে না। এলেও মানাবে না।"

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন শ্রীহর্ষ।

ভবভূতি বললেন, "মহারাণীর সঙ্গে এ বিষয়ে তুমি কথা বলে দেখতে পার, তোমার অমতে কিছু করতে চাই না।"

বিবাহের প্রস্তাব ভেঙে যাবার পর কিছুদিন পর্যন্ত শ্রীহর্ষ মহারাণীর কাছে যাননি। সমুদ্রবিলাস যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন যাওয়া সম্ভবও ছিল না। কিন্তু মহারাণীর কথা এক

মুহূর্ত ভুলতে পারেননি তিনি। আদর্শনটা যেন আরও নিবিড় করে তুলেছিল তাঁর অনুভূতিকে। তিনি বুঝতে পারেননি মহারাণী কেন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। বাল্যকাল থেকে মহারাণীর সঙ্গে মিশে যে ধারণাটা তাঁর মনে গড়ে উঠেছিল, যার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল অনেক জ্যোৎস্না রাতের স্মৃতি, অনেক ফুলের গন্ধ, অনেক মান-অভিমান, অনেক আবদারের মাধুর্য। কত ছোট-খাটো-খুঁটি-নাটি-খেয়াল-খুশীর-রত্ন-কণিকা, যে ধারণার মধ্যে বিরহের কোন সম্ভাবনাও ছায়াপাত করেনি কোনদিন, সেই স্বপ্নময় ধারণাটা প্রত্যাখ্যানের রূঢ় আঘাতে হঠাৎ যখন বদলে গেল, তখন কষ্ট পেয়েছিলেন শ্রীহর্ষ, কিন্তু একেবারে হতাশ হননি। ভেবেছিলেন ওটা মহারাণীর ক্ষণিকের খেয়াল হয়তো। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু যখন শুনলেন গালুটির বড়কুমার মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে মহারাণীর সম্বন্ধ হচ্ছে, নিজের চোখে যখন দেখলেন স্বয়ং পর্বতবিলাস সুসজ্জিত হাতীর পিঠে চড়ে গালুটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন এই জন্য, তখন মনে মনে এতদিন যেটাকে সোনা বলে ভেবেছিলেন সেটা পিতলে পরিণত হয়ে গেল হঠাৎ। গালুটির বড় তরফ যে এ বিবাহ দিতে উৎসুক সে খবরও পেয়েছিলেন শ্রীহর্ষ। মহেন্দ্রনাথের আকস্মিক অন্তর্ধানের জন্য বিবাহটা কিন্তু স্থগিত হয়ে গেল। শ্রীহর্ষ ভাবলেন মহেন্দ্রনাথ যেদিন ফিরে আসবেন সেইদিনই বিবাহটা হবে। স্বপ্নের আকাশচুম্বী প্রাসাদটা সম্পূর্ণরূপে চুরমার হয়ে যাবে সেদিন। ইতিমধ্যে সমুদ্রবিলাস মারা গেলেন। তার কিছুদিন পরে মহেন্দ্রনাথও ফিরে এলেন, কালাশৌচ কেটে গেল, শ্রীহর্ষ প্রতিদিনই আশা করতে লাগলেন এইবার বিয়েব বাজনা বেজে উঠবে, কিন্তু বাজল না। তারপর অসম্ভবই যেন সম্ভব হল। একদিন, যে সোনাটা পিতল হয়ে গিয়েছিল তাতেই আবার সোনালি বং ধরল। মহারাণীব এক দাসী এসে একটি চিঠি দিয়ে গেল তাঁকে। ছোট চিঠি।

"অনেকদিন তোমাকে দেখিনি। একেবারে ভুলে গেলে নাকি। কাব্যচর্চা করার ফাঁকে যদি ইচ্ছে হয়, এস একদিন।"

তখনও শ্রীহর্ষ উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি। তার পরদিনই অনধ্যায় ছিল। দাসীকে বলে দিলেন, বলে দিও, কাল দুপুরে যাব। তখন বর্ষাকাল। দুপুরেও রাত্রির মায়া নেমেছে, আকাশে থমথম করছে মেঘ, স্নিগ্ধ কোমল হয়ে এসেছে সূর্যালোক, অঞ্জন পরেছে আকাশ বাতাস।....মহারাণী ছিল নিজের মহলে দ্বিতলের অলিন্দে। দাসী সেইখানে নিয়ে গেল শ্রীহর্ষকে। শ্রীহর্ষেব মনে হল তিনি যেন কুবেরের অলকাপুরীতে এসেছেন। প্রতি বাতায়নে দুলছে কদম্ব মালিকা, প্রতি বাতায়নের নীচে সুদৃশ্য ধুপাধার থেকে বিকিরিত হচ্ছে চন্দন-গুগগুলেব সুরভি, অলিন্দের মাঝখানে এক বিরাট শ্বেতমর্মরের পুষ্পাধারে রয়েছে কেয়ার গুচ্ছ, অবগুণ্ঠিত পিঞ্জরের ভিতরে থেকে শিস দিচ্ছে শ্যামা। সুদীর্ঘ অলিন্দের একপ্রান্তে নীল মখমলের চুমকি-খচিত আসনে বসে শৌরসেনী মালা গাঁথছে, আর এক প্রান্তে মহারাণী ধীরে ধীরে দোল খাচ্ছে একটা ফুলের দোলনায়, বিরাট একটা আয়নার সামনে। আয়নার কাচটা নীল, নীল অথচ স্বচ্ছ, মনে হচ্ছে নীল মেঘের উপর দুলছে যেন মহারাণী, শ্রীহর্ষ অবাক হয়ে গেলেন, একটু অসহায়ও বোধ করলেন। যে মহারাণীকে তিনি জানতেন এ তো সে নয়, এ সত্যিই মহারাণী, সম্রাজ্ঞী! এর নাগাল কি পাবেন তিনি?

শ্রীহর্ষকে দেখেই দোলনা থেকে মহারাণী নেমে এল।

"কি আশ্চর্য, কত বদলে গেছ তুমি, এত ঘন দাড়ি হয়েছে তোমার, এমন বাবরি। ভীড়ের মধ্যে দেখলে চিনতে পারতাম না। মহারাজের মতো অনেকটা দেখতে হয়েছে তোমাকে।"

"মহারাজ কে?"

"আমার পোষা সিংহটা। বস, বস, কোথায় বসাই তোমাকে—" ব্যস্ত হয়ে উঠল মহারাণী। শৌরসেনী ঘরেব ভেতর থেকে মীনা কাজ করা রুপোব চৌকি এনে দিলে একটা। এনে দিয়ে আবার যেমন মালা গাঁথছিল, তেমনি গাঁথতে লাগল।

শ্রীহর্ষ বললেন, "তুমি বসবে না?"

" এই যে বসছি।"

দোলনায় গিয়ে উঠল মহারাণী, শ্রীহর্ষ সসঙ্কোচে বসলেন রুপোর চৌকিতে।

"আমাকে ডেকেছিলে কেন, কোন দরকার আছে?"

"দরকার আর কি, অনেকদিন দেখিনি তাই।"

মহারাণী দুলতে লাগল ধীরে ধীরে। আয়নাব প্রতিবিম্বটাও দুলতে লাগল। শ্রীহর্ষ এতক্ষণ মহারাণীর দিকে চেয়ে দেখতে পারেননি ভালো কবে। এইবার চাইলেন। দেখলেন মহাবাণী তার দিকেই নির্নিমেষে চেয়ে আছে, জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো, যেন দুটো মণি জ্বলছে। চোখাচোখি হতেই মহারাণী বলল, "মনে আছে ছেলেবেলার সেই দোলনাটাকে? শিবিষ গাছটা মরে গেছে, কিন্তু দোলনাটা আছে এখনও। এইটেই সেই দোলনাটা, সেইটেকেই ফুল দিয়ে সাজিযেছি। দুলব একটু?"

'দোল"

সাঁ কবে দোলনাটা সামনে দিয়ে চলে গেল অলিন্দেব আব এক প্রান্তে। মহাবাণীব ওড়নাব সুরভিত প্রান্তটুকু শ্রীহর্ষেব ললাট স্পর্শ করে গেল। অপর প্রান্তে গিয়ে মহারাণী শৌরসেনীকে বলল, শরবৎ নিয়ে আয়—"

কয়েকবার দোলনাটা আনাগোনা করল শ্রী হর্ষের চোখের সামনে দিয়ে প্রতিবারই ওড়নার স্পর্শ লাগল। শ্রীহর্ষ নিজের হাস্যকর পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছিলেন, তবু তাঁর ভালো লাগছিল, তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে দোলনা থামিয়ে নেমে এল মহারাণী।

"জান, আমি যখন দোলনায় দুলি তখন সবাই দেখতে পায় সেটা। যখন-দোলনায় থাকি না, তখনও আমার দোলনা থামে না, সেটা কিন্তু দেখতে পায় না কেউ।"

"সেটা কি রকম?"

"মনে মনে দুলি। অনবরত দুলছি। তুমিও এককালে দুলতে। এখন বোধ হয় থেমে গেছ জানি না ঠিক।"

"থামা যায় কি? সারা বিশ্বটাই যে দুলছে।"

শৌরসেনী আরও দুজন দাসীর সঙ্গে এল, ফল মিষ্টান্ন আর শরবৎ নিয়ে।

এরপর অতি সাধারণ সুরেই চলতে লাগল কথাবার্তা।

হঠাৎ কিন্তু বেসুরো হয়ে গেল শেষকালে।

যাওয়ার সময় মহারাণী বলল, ''আবার এস, যখন খুশি এস—''

''যখনই ডাকবে তখনই সাড়া পাবে।''

''ডাকতে হবে?''

এর উত্তরে শ্রীহর্ষ কিছু বললেন না, স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন শুধু।

মহারাণী অন্য প্রসঙ্গে উপনীত হল সহসা।

''আচ্ছা, তুমি তো অনেক ভাল ভাল কাব্য পড়েছ, না?''

''পড়েছি কিছু কিছু।''

''আমাকে পড়ে শোনাবে? শুধু শোনালেই হবে না, মানেও বলে দিতে হবে। সংস্কৃত ভুলে গেছি, সেই কবে পড়েছিলাম।''

'' বেশ। বর্ষাকালে মেঘদূত জমবে ভাল।''

''কাল থেকেই শুরু কর তাহলে।''

''কাল থেকেই?''

''হ্যাঁ কাল থেকেই।''

চুপ করে রইলেন শ্রীহর্ষ।

''চুপ করে আছ কেন, বল কাল থেকেই আসব।''

আদেশের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল মহারাণীর কণ্ঠে।

''কাল থেকে পারব না। জরুরি কাজ আছে কয়েকটা। আসব কয়েকদিন পরে।''

মহারাণীর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। নীচের ঠোঁটটা থর থর করে কেঁপে উঠল।

''আসতে হবে না তোমাকে।''

হঠাৎ ঘরের ভিতর চলে গেল মহারাণী।

দ্বার বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে।

বিস্মিত শ্রীহর্ষ দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর হেসে চলে গেলেন। এই কথাটিই ভাবতে ভাবতে গেলেন, ''কতদিন পরে মহারাণীকে আজ প্রথম দেখলাম। বাইরেটা বদলেছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে এখনও ঠিক তেমনি অভিমানী আছে দেখছি। একটুও বদলায়নি---''সমস্ত মনটা মাধুর্যে ভরে গেল তাঁর।

দিন কয়েক পরে এক মেঘ-স্নিগ্ধ প্রভাতে মেঘদূত নিয়ে আবার যেতে হয়েছিল শ্রীহর্ষকে। মহারাণীর চিঠি নিয়ে আবার দাসী গিয়েছিল তাঁর কাছে। শ্রীহর্ষ অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন চিঠিখানার দিকে। ''কই, মেঘদূত নিয়ে তুমি তো এলে না। বর্ষা শেষ হয়ে যাচ্ছে।'' শ্রীহর্ষ গিয়ে দেখলেন মহারাণী খিড়কির বাগানের পশ্চিম প্রান্তে এক দূর্বা-শ্যামল প্রাঙ্গণে অনেক শাদা খরগোস পরিবৃত হয়ে বসে আছে। শৌরসেনীও রয়েছে সেখানে। খরগোসেরা লাফিয়ে লাফিয়ে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে।

''এইখানে বসে শুনবে?''

''কেন, এখানে হবে না?''

"তুমি তো ব্যস্ত আছ দেখছি খরগোস নিয়ে, মেঘদূতে মন দিতে পারবে।"

"খুব। পড়তেই আরম্ভ কর না। তুমি পড়বে আর আমি তোমার মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকব সেটা কি ভালো দেখাবে, তা আমি পারবও না।"

শৌরসেনী একটি আসন পেতে দিল ঘাসের উপর। আরম্ভ হল মেঘদূতপাঠ। শ্রীহর্ষের মনে হতে লাগল মহারাণী শুনছে না মন দিয়ে। শ্রীহর্ষ যখন পড়ছিল তখন সে কখনও একটা খরগোসকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করছিল, কখনও বা আর একটার মুখে গ্যাস তুলে দিচ্ছিল, কখনও বা উঠে গিয়ে ধরে আনছিল আর একটাকে। শ্রীহর্ষ বিরক্ত হচ্ছিলেন মনে মনে, কিন্তু পড়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অচিরেই তিনি প্রমাণ পেলেন মহারাণী শুনছে। পূর্ব-মেঘের চতুর্থ শ্লোকেব ব্যাখ্যা করছিলেন তিনি—"তুমি পবন পথে আরূঢ় হলে পথিক বধূগণ আশ্বস্ত হবে, কপাল থেকে অলকদাম সরিয়ে তোমাকে বিশ্বাস ভরে নিরীক্ষণ করবে। তাদের আশা হবে এইবার তাদের স্বামীদের প্রত্যাবর্তনের সময় হয়েছে, বর্ষাকালে তারা আর দেশ পর্যটন করতে পারবে না। আমার মতো যে পরাধীন নয়, সে কি তোমাকে আকাশে সমুদিত দেখে বিরহ বিধুরা জায়াকে উপেক্ষা কবতে পারে?"

" পদবী মানে কি পথ?"

"হ্যাঁ।"

একটা খবগোসকে বুকে চেপে ধবে মহাবাণী বলল, "তোমাব কখনও হয়েছে ও রকম?"

"কি বকম?"

"মেঘ দেখে বিবহ-বিধুবা প্রিয়াকে মনে পড়েছে?"

"কালিদাস তো প্রিয়াব কথা লেখেননি। লিখেছেন বিবহ-বিধুবা জায়াং। আমাব তো জায়া হয়নি এখনও।"

"ও, জায়া আব প্রিয়া বুঝি এক নয়? আমারই ভুল হয়েছিল, পড়।"

শ্রীহর্ষ পড়তে লাগলেন, মহারাণী অধর দংশন করে অন্যদিকে মুখ ফিবিয়ে শুনতে লাগল। এই ঘটনাটা শ্রীহর্ষেব মনে আঁকা হয়ে আছে এখনও। উপর্যুপরি কয়েকদিনই চলেছিল মেঘদূত পাঠ।

উত্তব মেঘ পড়াব সময় মুচকি হেসে মহাবাণী আবার জিজ্ঞাসা করেছিল—"আচ্ছা, কালিদাস যাঁর বিরহের ছবি এঁকেছেন তিনি কি কখনও বিয়ে করা গেবস্থ ঘরের বউ হতে পারেন? ময়লা কাপড় পরে, রুক্ষ চুলে, কোলে বীণা নিয়ে যিনি নির্বাসিত যক্ষের নাম-গান করছেন, চোখের জলে বীণার তাঁর পিছল হয়ে যাচ্ছে তবু যিনি তাতে মূর্ছনা তোলবার প্রয়াস পাচ্ছেন যিনি দুঃখে শীর্ণা হয়ে এক-কাতে শুয়ে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন, যিনি এত কাণ্ড করছেন তাঁকে কি গৃহস্থর বউ বলে মনে হয়? আমার বিশ্বাস উনি যক্ষ-প্রিয়া , যক্ষ জায়া নন—"

"তা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন?"

মহারাণীর চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কোন জবাব না দিয়ে হাসিমুখে চেয়ে রইল সে।

এ ছবিটাও ভোলেননি শ্রীহর্ষ। আরও অনেক ছবি আঁকা আছে তাঁর মনে। মেঘদূত-পর্বের পর আরও অনেকবার মহারাণী আমন্ত্রণ করেছে তাঁকে। অনেক স্বর্ণোজ্জ্বল দ্বিপ্রহর, অনেক বর্ণ বিচিত্র সন্ধ্যা কাটিয়েছেন তিনি মহারাণীর সঙ্গে; একটা কথা বারবার মনে হয়েছে যদিও—মহারাণী একেবারে একা দেখা করে না কেন, কাছে পিঠে হয় শৌরসেনী, না হয় আর কেউ থাকে কেন—? তাই বিবাহ প্রসঙ্গ আর কোনদিন ওঠেনি, মহারাণী নিজে তোলেনি, তিনিও তুলতে সাহস পাননি। তিনি ভাবতেন বাধাটা আপনি একদিন সরে যাবে, কিন্তু সরেনি। তবু এই সব দিনের স্মৃতিগুলি দুর্লভ সম্পদের মতো সঞ্চিত হয়ে আছে তাঁর মনে। মনে আছে বিয়ের কথাটা বলব বলব করেও তিনি বলতে পারেননি। তাঁর সমস্ত অন্তর কানায় কানায় ভরে উঠেছিল বার বার, উপচেও পড়েছিল তাঁর চোখের দৃষ্টিতে, গদগদ ভাষায়, ছোটখাটো নানা অসম্বৃত অসংলগ্নতায়, কিন্তু মুখ ফুটে তিনি বলতে পারেননি কিছু। মহারাণীর ভাব-ভঙ্গীতেও প্রশ্রয়ের কোন ইশারা ছিল না। তাই তাঁর বাবা যখন তাঁকে এ বিষয়ে মহারাণীর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে বললেন তখন শ্রীহর্ষ বিপন্ন হলেন একটু। কি বলবেন গিয়ে? কি ভাবে পাড়বেন কথাটা?

.. নির্জন নদীতীরে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলেন চুপ করে। পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যার বর্ণ-সমারোহ ম্লান হয়ে এল ক্রমশঃ, শুক্লা পঞ্চমীর শশীকলা স্পষ্টতর হল, টিট্টিভের কল-কাকলীতে মুখরিত হয়ে উঠল ওপারেব চব। শ্রীহর্ষ উঠে পড়লেন। মন-স্থির করে ফেলেছিলেন তিনি। সোজা চলে গেলেন মহারাণীর কাছে। সোজা কিন্তু পৌঁছতে পারলেন না।

মহলে নূতন যে নৈশ -প্রহরীটা বহাল হয়েছিল সে শ্রীহর্ষকে চিনত না, সে পথ-রোধ করে দাঁড়াল। বললে, "অন্দরমহলে যেতে মানা আছে। আপনার যদি প্রয়োজন থাকে খবর পাঠিয়ে দিতে পারি।" একটা অদৃশ্য হস্ত যেন সজোরে চপেটাঘাত করল শ্রীহর্ষেব গণ্ডদেশে। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, কিন্তু ফিরে আসতে পারলেন না। আর একটা অদৃশ্য হস্ত প্রবলতর আকর্ষণে টানছিল তাঁকে অন্দরমহলের দিকে। প্রহরীকে বললেন, "ভিতরে খবর পাঠাও, শ্রীহর্ষ এসেছে।" খবব পাবার সঙ্গে সঙ্গে একজন দাসী এসে নিয়ে গেল তাঁকে ভিতরে। অন্দরমহলের এলাকায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ঘটনা ঘটল—সিংহটার গর্জন শোনা গেল। শ্রীহর্ষের মনে হল কে যেন বজ্রকণ্ঠে বলে উঠল—খবরদার। দাসী তাঁকে মহারাণীর মহলে নিয়ে গিয়ে নীচের একটা ঘরে বসিয়ে বলল, "আপনি এখানে বসুন, রাণীমা খিড়কির বাগানে আছেন। আমি খবর দিচ্ছি।"

একটু পরেই মহারাণী এল।"

বিনা নিমন্ত্রণেই যে আজ ব্রাহ্মণ এসে হাজিব। ব্যাপার কি?"

"একটু কথা ছিল তোমার সঙ্গে।"

"ছাতে চল তাহলে। এখানে বড় গরম।"

মহারাণীর দ্বিতলের ছাদটি মনোরম। এখান থেকে নব প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দিরটি, এমন কি, শ্বেত পাথরের শিব-লিঙ্গটি পর্যন্ত দেখা যায়। সমস্ত ছাদ জুড়ে প্রকাণ্ড বাগান, নানারকম গামলায় নানারকম ফুলের গাছ। এ বাগানের মালিনী রঞ্জাবতীও এ বাগানের শোভা।

ছিপছিপে দোহারা গড়ন, ধপধপে ফরসা রং, পিঠে দোদুল্যমান ভুজঙ্গ-নিন্দিত বেণী, বেণীতে জড়ানো বেলফুলের মালা। বঙ্কিম গ্রীবা, বঙ্কিম চাহনি, চাহনিতে মাদকতা মাখানো। একে কেন্দ্র করেও নানা গুজব মহারাণীর অন্দরমহলে। মোনার মা বলেন, রঞ্জাবতী রোজ রাতে দারোয়ানের সঙ্গে ষড় করে বাইরে যায়, ওর নাগর না কি পালকি পাঠায় ওর জন্যে, পালকিটি রোজ রাত্রে নাকি অপেক্ষা করে গ্রামের বাইরে দত্তদের আমবাগানের অন্ধকারে। সিন্ধুবালার দলের লোকরা আবার অন্য কথা বলে। সব গুজব ভিত্তিহীনও নয়। অনেকের মতে আবার রঞ্জাবতী নাকি মহারাণীর দূতী, মহারাণীর খবর নিয়ে যায় মহেন্দ্রনাথের কাছে।

...রঞ্জাবতী ছাদে গোলাপ জল ছিটোচ্ছিল।

মহারাণীর আদেশে দুটি বসবার আসন এনে দিয়ে আবার গোলাপজল ছিটোতে লাগল। চন্দনকাঠের হালকা আসন দুটি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন শ্রীহর্ষ। ওর উপর বসতে সঙ্কোচ হতে লাগল।

"দাঁড়িয়ে আছ কেন, বস।"

বসতে হল।

"কিছু খাবে?"

"না।"

রঞ্জাবতীর দিকে চেয়ে শ্রীহর্ষ ইতস্তত করে মৃদুকণ্ঠে বললেন, "যা বলতে এসেছি তা একা তোমাকেই বলতে চাই। ওকে যেতে বল—"

"রঞ্জা তুই নীচে যা—"

যাওয়ার আগে রঞ্জাবতী শ্রীহর্ষের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গেল একটা। কিন্তু নীচে গেল না। সিঁড়িতে কান পেতে রইল।

"কী গোপনীয় কথা তোমার?"

"বাবা আমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছেন।"

"তা তো করবেনই, অমন ঘন দাড়ি হয়েছে তোমার, আর বিয়ে না দিলে চলে? এই তোমার গোপনীয় কথা!"

মহারাণীর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। শ্রীহর্ষ এটা প্রত্যাশা করেননি, তিনি ভেবেছিলেন খবরটা শুনে মহারাণীর মুখ ম্লান হয়ে যাবে। হাসি দেখে বিব্রতমুখে চুপ করে রইলেন।

"মেয়েটি কেমন?"

"জানি না। নন্দীগ্রামের বিধুভূষণ ন্যায়রত্নের মেয়ে।"

"কোনটি। তাঁর তো অনেকগুলি মেয়ে!"

"মেজ মেয়ে।"

"সর্বমঙ্গলা? চমৎকার মেয়ে। তাকে আমি দেখেছি। চিন্তার কোনও কারণ নেই তোমার।"

"তুমি কোথায় দেখলে?"

"বাবার শ্রাদ্ধের সময় ন্যায়রত্নমশায়ের বাড়ির সবাই এসেছিলেন যে। অনেক মেয়ে এসেছিল তো, তার মধ্যে ওই মেয়েটিই সবার চোখে পড়েছিল। ও যদি তোমার জায়া হয়, তাহলে তুমিও ভবিষ্যতে মেঘদূতের মতো কাব্য লিখে ফেলতে পারবে একটা—"

শ্রীহর্ষ নীরব হয়ে রইলেন।

"অমন মুখ গোমড়া করে আছ কেন?"

"বাবাকে বলেছি এখন বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই।"

"সে কি! অনিচ্ছের কারণ?"

মুচকি হেসে শ্রীহর্ষ বললেন, " একজনের জন্য অপেক্ষা করে আছি।"

"কে সে সৌভাগ্যবতী?"

"তা কি তুমি জানো না?"

"যার কথা আমি জানি সে তোমাকে বিয়ে করবে না।"

শ্রীহর্ষের মুখটা পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। মহারাণীর দিকে চেয়ে রইলেন কিছুকাল, তারপর বললেন, "লুকোচুরি থাক, আমাকে তুমি চাও না?"

মহারাণীব চোখের দৃষ্টিতে মাণিক্যদ্যুতি ঝলমল করে উঠল যেন। "তোমাকে পেলে আমি বর্তে যাব। কিন্তু আমি জানি তোমাকে আমি পাব না। তুমি আমার নাগালের বাইরে।"

"বুঝতে পারছি না ঠিক।"

"তোমার আব আমার মাঝখানে অনেক দুস্তর বাধা। তোমার আত্মসম্মান, তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার বংশমর্যাদা, তোমার বাবা, তোমার মা এসব ডিঙিয়ে তুমিও আমার কাছে আসতে পারবে না, আমিও তোমার কাছে যেতে পারব না।"

"এর কোনটাই তো বাধা বলে মনে হচ্ছে না আমার।"

"কিন্তু আমি জানি ওগুলো বাধা। আমি তোমাকে পুরোপুরি পেতে চাই। তুমি আমাকে ভালবাসনি শ্রীহর্ষ। ভালবাসলে আমার কথার মানে বুঝতে অসুবিধা হত না তোমার । হীরুর মুখে প্রথম যখন বিয়ের প্রস্তাব শুনেছিলে তখনই সেই মুহূর্তে হাটের মাঝখানে আত্মহারা হয়ে পড়নি তুমি। ঘরজামাই হলে লোকে কি বলবে এ কথাই সব চেয়ে আগে মনে হয়েছিল তোমার। যদি ভালবাসতে তোমার মনে হত আমি কৃতার্থ হলাম। কিন্তু তা তোমার হয়নি।"

"কিন্তু সেইদিনই তো তোমার কাছে এসেছিলাম আমি।"

"এসেছিলে, কিন্তু তোমার হাব-ভাবে সেই সুরটি ঠিক বাজেনি। বরং মনে হয়েছিল বিপদে পড়ে আমার কাছে তুমি এসেছ যদি আমি তোমাকে ঘরজামাই হওয়ার বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারি। আমি তোমাকে উদ্ধার করেওছিলাম। ঘরজামাই হওয়ার কলঙ্ক তোমার মহিমাকে স্পর্শ করেনি।"

"কিন্তু আমি তো তোমার বাবার অনুরোধে তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলাম।"

"ঘাড়ে দশটা মাথা না থাকলে সমুদ্রবিলাসের অনুরোধ উপেক্ষা করা যেত না। তোমার মাত্র একটি মাথা ছিল। তুমি রাজি হয়েছিলে ভয়ে কিম্বা চক্ষুলজ্জায়। দেখ, শ্রীহর্ষ আমাকে

তুমি যত বোকা মনে কর, তত বোকা আমি নই। আমাকে হয়তো একটু আধটু ভালবাস তুমি। কিন্তু এতটা বাস না যে আমার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন করতে পার।"

"সর্বস্ব বিসর্জন দিতে হবে কেন?"

"হবে। আমার ভালবাসা সর্বগ্রাসী। আমার যে স্বামী হবে আমাব বাইরে তার কোন অস্তিত্ব থাকবে না। আমিও যার স্ত্রী হব, আমি চাইব সে-ও আমাকে গ্রাস করুক। তাব মধ্যে আমি নিজেকে একেবারে হাবিয়ে ফেলব।"

মহারাণীব মুখে-চোখে প্রলুব্ধ ভাব ফুটে উঠল একটা। নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হল অধব কাঁপতে লাগল। নির্নিমেষে শ্রীহর্ষেব দিকে চেয়ে রইল সে। মনে হল কোন শ্বাপদ যেন লোলুপ দৃষ্টিতে শিকাবেব দিকে চেয়ে আছে।

"তোমাব কথা বুঝতে পাবছি না ঠিক।"

"পারছ না, কারণ আমি যেমনভাবে তোমাকে ভালবেসেছি তুমি আমাকে সেবকম ভাবে বাসনি। সে যে কি জিনিস তা কল্পনা করাও শক্ত তোমাব পক্ষে।"

এইবাব শ্রীহর্ষ যেন ধববাব ছোঁবাব মতো কিছু পেলেন।

"সত্যি আমাকে ভালবেসেছ? তাহলে আমাকে নাও। আমি নিজেকে দেবাব জন্যেই তো এসেছি তোমাব কাছে। এতদিন বিবহেব চিত্রকূটে ছিলাম..."

"ওটা টোলে-পড়া কাব্যতীর্থের কথা হল। তোমার চোখ-মুখ সে কথা বলছে না। তাছাড়া আমার দিক থেকে আর একটা কথাও বলবার আছে। তোমাব আত্ম-অভিমানকে, তোমাব চরিত্রকে, তোমাব বাবা মাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তোমাব মতো ছেলেকে নষ্ট কবতে আমাব বিবেকে বাধছে।"

"তোমাকে বিয়ে কবলে আমি নষ্ট হয়ে যাব!"

"একেবারে তোমাব ব্যক্তিত্ব বলে কিছু থাকবে না। আমার হাতেব পুতুল হয়ে যেতে হবে।"

"ধর, তাতেই যদি আমি রাজি হই।"

মহাবাণীব দৃষ্টি থেকে হাসি পিছলে পড়তে লাগল।

"হিমালয় যদি আমাব মুঠোব মধ্যে ধরা দিতে বাজি হয় আমি কি তা বিশ্বাস করব, না তাকে মুঠোয ধরতে পাবব? না, শ্রীহর্ষ, তা হয না। তোমাকে পেলে আমি বর্তে যেতাম কিন্তু তোমাকে আমি পাব না। তুমি অনেক বড়, অনেক উঁচু—"

এই বলে মহারাণী অদ্ভুত কাণ্ড কবলে একটা। হঠাৎ প্রণাম করল শ্রীহর্ষকে। প্রণাম করেই চলে গেল। শ্রীহর্ষ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে রইলেন কিন্তু মহারাণী আর এল না। মহারাণী নিজের ঘবে খিল বন্ধ কবে কাঁদছিল। সে কান্না কেউ দেখেনি।

এর কিছুদিন পরেই সর্বমঙ্গলার সঙ্গে শ্রীহর্ষেব বিয়ে হয়ে গেল। মহারাণীর জেদে এবং খবচে বিয়েতে জাঁকজমক হয়েছিল খুব। বোশন-চৌকি, গোরার বাজনা, আলো আর বাজির প্রাচুর্যে সচকিত হয়ে উঠেছিল ও অঞ্চল। যারা জানত না তারা ভেবেছিল মহারাণীরই বিয়ে

হচ্ছে বুঝি। ভবভূতি ভট্টাচার্য মহারাণীকে বাধা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। বাল্যবন্ধুর মেয়ে, খুব জেদি। তাছাড়া এটাও তিনি অনুভব করেছিলেন যে শ্রীহর্ষকে মহারাণীই ফিরিয়ে দিয়েছে। সে যদি ইচ্ছে করত শ্রীহর্ষকে বেঁধে রাখতে পারত তার প্রাসাদে। মহারাণী সর্বমঙ্গলাকে বহুমূল্য কাপড় অলঙ্কারের সঙ্গে নিজের একটি ছবিও উপহার দিয়েছিল। বিয়ের পরে গালুটির বড় তরফের মালিক তার বাবার নামে একটি টোল স্থাপন করতে ইচ্ছুক হলেন এবং শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থকে নির্বাচন করলেন সে টোলের অধ্যাপক রূপে। শ্রীহর্ষ এ ভার নিতে যখন সম্মত হলেন তখন তাঁকে একশত বিঘা নিষ্কর জমিও দান করলেন তিনি।

মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে মহারাণীর সম্পর্কটাও বিচিত্ররকম জটিল অথচ মধুর হয়ে উঠেছিল। যা হতে পারত, সবাই যা ধরে নিয়েছিল হয়ে গেছে, তা কিন্তু হয়নি। শিবলিঙ্গটি ফাঁপা ছিল না, রঞ্জাবতীর অনুমান এবং রঞ্জাবতী-কর্তৃক প্রচারিত গুজবেরও ভিত্তি ছিল না কোনও। মহেন্দ্রনাথকে বিয়ে করবে বলে শ্রীহর্ষকে প্রত্যাখ্যান করেনি মহারাণী। সেদিক দিয়ে মহেন্দ্রনাথকে মহারাণী কোনও প্রশ্রয়ই দেয় নি। কিন্তু এই প্রশ্রয় না দেওয়ার কোন প্রমাণ বাইরের লোক পায়নি। বাইরের লোকের চোখে নিজেকে নিষ্কলঙ্ক প্রমাণিত করবার কোন আগ্রহও ছিল না মহারাণীর। বরং মনে হত বাইরের লোকের এই ভুল-ভাবাটাকে সে যেন উপভোগই করছে হারুণ-অল-রশিদী কায়দায়। সে সত্যি যা নয় সবাই যে তাকে তাই ভাবছে এতে অদ্ভুত ধরণের একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করত সে। এই ভেবে সে আনন্দ পেত যে একা একা সে এমন একটা জগতে আছে যেখানে কল্পনার সাহায্যেও প্রবেশ করতে পারছে না কেউ; তার নাগাল পেতে গিয়ে বারবার ভুল রাস্তায় গিয়ে মিথ্যা গুজবের গোলক-ধাঁধায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বোকার মতো।

মহেন্দ্রনাথ প্রায়ই আসতেন, প্রকাশ্যভাবেই আসতেন, কখনও অশ্বারোহণে কখনও হস্তী-পৃষ্ঠে। মহারাণীর খাস গোল-বৈঠকে বসতেন তিনি। একাই বসতেন। কাছে বা দূরে শৌরসেনী-রঞ্জাবতীরা থাকত না। মহারাণীর সঙ্গে আলাপও হত, কিন্তু মহারাণী কখনও মহেন্দ্রনাথের সামনে বেরয়নি। বৃহৎ বৃত্তাকার বসবার ঘরটিতে কুড়িটি দরজা ছিল, আর প্রত্যেক দরজার সামনে ছিল বড় বড় ভারী পরদা। ঠিক বাইরে বৃত্তাকার দালানও ছিল একটি। সেখানেও বসবার জায়গা ছিল। মহেন্দ্রনাথ যখন ঘরে বসতেন মহারাণী তখন থাকত দালানে। দুজনের কথাবার্তার মাঝখানে দুলত কুড়িটা পরদা। মহারাণী কখন যে কোন পরদার অন্তরালে দাঁড়িয়ে কথা বলছে তা অনেক সময় বুঝতে পারতেন না মহেন্দ্রনাথ। অনেক সময় ধাঁধা লাগত। কখনও মনে হত মহারাণী তাঁর পিছনে রয়েছে, কখনও মনে হত সামনে, কখনও দক্ষিণে, কখনও বামে। হয়তো মহারাণী ইচ্ছে করেই এই ধাঁধা সৃষ্টি করে মজা দেখত, কিম্বা হয়তো মহেন্দ্রনাথেরই মনের ভুল এটা। আলাপের এই অভিনব পদ্ধতি প্রচলিত হওয়ার আগে দুজনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছিল অবশ্য। তার মানে, এর আর একটা প্রাক পর্বও ছিল।

মহেন্দ্রনাথ যখন নিজের বিষয়ের মালিক হয়ে বসলেন তখন দিন-কতক মশগুল হয়ে রইলেন বেদানাকে নিয়ে। বিদেশ থেকে কারিকর শিল্পীরা এসে নির্মাণ করতে লাগল বেদানা-

মহল। তাঁর ময়ূরপংখীগুলি নানা সাজে সেজে ভেসে বেড়াতে লাগল কামিনী নদীর জ্যোৎস্নাকুল স্বচ্ছ ধারায় তরঙ্গ-শিহরণ তুলে তুলে। বেদানার কিংখাবে-ঢাকা পালকি মাঝে মাঝে ঢুকত এসে মহারাণীর অন্দরমহলে। গোল বৈঠকে গানের আসর বসত। দীনা বাইজি তখনও বেঁচে ছিল। সে যা পেন্‌সন পেত তাতে অন্যত্র গিয়েও সে সুখে বাস করতে পারত। কিন্তু মালিকের দরবার ছেড়ে সে যেতে চায়নি। নিজের মহলে একবেলা স্বপাক নিরামিষ আহার করে হিন্দু বিধবার মতো জীবন যাপন করত সে। সঙ্গীত চর্চাও ছাড়েনি। প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায়, কখনও বা দ্বিপ্রহরে তার সুর-লহরী ভেসে বেড়াত আকাশে বাতাসে, মনে হত দীনা বাইজি অতীতের দিনগুলি স্মরণ করে যেন কাঁদছে। সমুদ্রবিলাসের স্মৃতি মন্দিরে দীনা বাইজিই রোজ সুরের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখত। বেদানার পালকি এলে দীনা বাইজির ডাক পড়ত গোল-বৈঠকে। গানের আসর জমে উঠত সেখানে। সুর উপচে পড়ত যেন চারিদিকে। ময়ূরেরাও বাগানে পেখম তুলে নাচত, চঞ্চল হয়ে উঠত বুলবুলির দল। গিটকিরি দিয়ে দিয়ে সঙ্গত করত তারা, পাহাড়ি ময়নার কণ্ঠে সুর ফুটত। বেদানা নাচত, তবলার সঙ্গত করত মোহিনী, সেতার বাজাত রঞ্জাবতী, দীনা বাইজি একধারে বসে স্তিমিতলোচনে তানপুরায় ঝঙ্কার দিতে দিতে স্বপ্ন দেখত সেই সব দিনের যা আর ফিরবে না।

.... এই ভাবেই চলছিল, এমন সময় নূতন ধরণের ঘটনা ঘটল একটা। মহারাণীর ভালো জাতের নানা রকম পায়রা ছিল। শখ মিটে গিয়েছিল বলে কিছুদিন আগে সেগুলো দিয়ে দিয়েছিল সে এক পাখী-ওলাকে। তারই একটা পায়রা একদিন উড়ে এসে বসল মহারাণীর অলিন্দের আলিসায়। দুধের মতো ধপধপে শাদা রং, টুকটুকে লাল চোখ দুটি চুনীর মতো। মনে হল পুরনো মনিব মহারাণীকে চিনেছে সে, ঘাড় বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে দেখল খানিকক্ষণ, তারপর সপ্রতিভভাবে এগিয়ে এল একটু। মহারাণী হাত বাড়াতেই সে একেবারে উড়ে এসে কাঁধে বসল। তারপরই মহারাণী দেখতে পেল আসল জিনিসটি। পায়রাটির পায়ের গোছে রঙীন কাগজ বাঁধা রয়েছে একটি। মহারাণী চেয়ে দেখল চারদিকে, চেয়ে দেখল কেউ আছে কিনা। কেউ ছিল না। পায়রাটাকে নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল সে। তারপর তার পা থেকে খুলে নিল কাগজটা। দেখল শুধু রঙীন নয়, সুগন্ধীও, আতরের গন্ধ ভুর ভুর করছে। মহেন্দ্রনাথের চিঠি। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন—"কিছুতেই ভুলতে পারছি না। গেলে দেখা হবে কি? এক পাখী-ওলা এসেছিল বাড়িতে, তার কাছে শুনলাম এ পায়রাটি আপনারই ছিল একদিন। তার কাছে থেকে কিনে নিয়ে আপনার কাছেই ফেরত পাঠালাম আবার। আশা আছে এ পুরাতন মনিবের কাছে ফিরে যাবে। উত্তর যদি দেন, লোক মারফত পাঠাবেন। উত্তরের আশায় রইলাম।"

উত্তর গিয়েছিল হাতীর পিঠে মাদ্রাজিনী মাহুতের হাতে।

মহারাণী লিখেছিল, "এলে খুব আনন্দিত হব। আমাদের ম্যানেজারকে খবর দিয়ে আসবেন। এলে কথাবার্তা হবে।"

দিন সাতেক পরে যথারীতি খবর পাঠিয়ে আইন কানুন বাঁচিয়ে মহেন্দ্রনাথ এলেন একদিন। শৌরসেনী এসে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল তাঁকে অন্দরমহলের

গোলবৈঠকে। সেকালের নিয়ম অনুসারে পানের বাটা, আতর দান, গোলাপ পাশ সামনে সাজিয়ে দিয়ে শৌরসেনী মৃদু কণ্ঠে বলে গেল—"মা পরদার ওপারে এসেছেন। আপনি আলাপ করুন।"

মহারাণীই প্রথমে কথা কইল।

"নমস্কার। বেদানার মুখে আপনার প্রায়ই খবর পাই। আজ কষ্ট করে এসেছেন, এ আমার পরম ভাগ্য।"

"আমার কাছেও বেদানা আপনার কথা রোজ বলে। আমাদের দুজনের মধ্যে বেদানাই তো সেতু। কিন্তু সে সেতুর উপর দিয়ে অশরীরী আমরা যাতায়াত করেছি এতদিন ধরে। আজ আশা করে এসেছিলাম সশরীরে সাক্ষাৎ হবে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মহারাণী।

তারপর বলল "সম্ভব হলে হত, কিন্তু তা যে সম্ভব নয় তো আপনিও জানেন।"

"নয় কেন? পরদাটা সরিয়ে দিলেই তো হয়"

"যেদিন সম্ভব হবে সেদিন পরদা আপনি সরে যাবে।"

"বাধাটা কি?"

"ওই সেতুই বাধা।"

"কিন্তু বেদনাকে আমি জিগ্যেস করেছি, তার আপত্তি নেই।"

"সেকথা আমাকেও সে বলেছে, কিন্তু আমি তার মনের কথা জানি।"

নীরবতা ঘনিয়ে এল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

তারপর হঠাৎ মহেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে উঠলেন।

"আপনার দাসীরা আশেপাশে আছে না কি কেউ। এসব আলোচনা বাইরে জানাজানি হবে না তো?"

"না, দাসীরা কেউ নেই আশেপাশে। সবাইকে নীচে পাঠিয়ে দিয়েছি"

"কিন্তু খসখস কি একটা আওয়াজ পাচ্ছি যেন?"

"আমার পোষা সিংহটা বসে আছে আমার পাশে।"

"সিংহ? কি সর্বনাশ, কিছু বলবে না তো। ছাড়া আছে, না বাঁধা আছে।— "

"ছাড়াই আছে। ও বুঝতে পারে কে শত্রু কে বন্ধু। আপনাকে কিছু বলবে না।"

মহেন্দ্র আবার বসে পড়লেন। তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল পরদাটা সরিয়ে দিতে।

"সিংহকে পাশে নিয়ে বসে আছেন। অদ্ভুত আপনার শখ তো। "আপনার সাহসকেও বলিহারি যাই।"

"মহারাজ জবাব দাও।"

মৃদু গর্জন শোনা গেল পরদার ওপারে। মনে হল সিংহ যেন গম্ভীর কণ্ঠে হাসল একটু। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন মহেন্দ্রনাথ। ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন পরদাটার দিকে

মহারাণী সহসা অন্য প্রসঙ্গে উপনীত হল।

"ওসব কথা থাক। অন্য আর একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য ভিক্ষা করছি আমি।

আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে. সামনা-সামনিই বলি যদি অনুমতি দেন। ভাবছিলাম চিঠি লিখব।"

"কি বলুন। আপনাকে অদেয় আমাব কিছু নেই। সাধ্যাতীত না হলে নিশ্চযই আপনাব আদেশ আমি পালন কবব।"

"আমাব বিষযেব ভাবটা তাহলে আপনি নিন। ও গুরুভাব বহন কববাব শক্তি আমাব নেই '

"ওটা আপনি বিনয কবে বলছেন। যিনি সিংহকে স্বচ্ছন্দে পাশে বসিযে বাখতে পাবেন তাঁব শক্তিতে সন্দেহ কবি কি কবে।"

"ওই সিংহেব জন্যই আমাব সমস্ত শক্তি আব সময খবচ হযে যায।

বিষযেব খোঁজ খবব নেবাব মতো উদ্বৃত্ত আব কিছু থাকে না।

কিশোবীকাকা মাঝে মাঝে এসে কাগজপত্রে সই কবিযে নিযে যান, আমি না দেখেই সই কবে দি "

' দেখলেই পাবেন।"

"একবাব দেখেছিলাম, বুঝতে পাবিনি।"

মহেন্দ্র চুপ কবে বইলেন।

"বিষযেব ভাব আমি নিতে পাবি। কিন্তু আইনত সে অধিকাব দিতে হবে আমাকে।"

"দেব।"

"বিশেষ কবে আমাকে এ ভাব নিতে বলছেন কেন? আমাব চেযে বিচক্ষণ লোক ঢেব আছেন। আপনাদেব ম্যানেজাব কিশোবীবাবুও বেশ পাকা লোক।"

'আপনি জানেন না বোধ হয, আমাব দুই সৎ মা এখনও জীবিতা আছেন। তাদেব দলও আছে। খবব পেযেছি কিশোবীকাকা একটা দলে যোগ দিযেছেন।"

"এ জানবাব পবও আপনি না দেখে কাগজে সই কবেছেন?"

"না, জানবাব পব আব কবিনি। কিন্তু কি কবব তা ও ঠিক কবতে পাবছিলাম না, এমন সময আপনাব কথা মনে হল।"

"তা মনে হল কেন।"

কিছুক্ষণ চুপ কবে বইল মহাবাণী। মহেন্দ্রনাথেব মনে হল হাসিব, মৃদু গিটগিবি যেন শোনা গেল একটা।

"আপনাব সঙ্গে বিযে হলে আপনিই তো সব দেখা-শোনা কবতেন। তাই বোধ হয মনে হযেছে কথাটা।"

"পবেব কাজটা আগেই কবিযে নিতে চান বুঝি। আমাব তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু এতকাল ধবে যে আশা আমি কবে আছি তাব সম্ভাবনা কি লুপ্ত হযে গেল একেবারে?"

"ভবিষ্যতেব কথা কি কেউ বলতে পাবে। তবে আমি জানি আপনি মহৎ লোক, স্বার্থ সিদ্ধিব আশা না থাকলেও আপনি আমাব এ উপকাবটি কববেন।"

"নিশ্চয কবব, আব স্বার্থেব খাতিবেই কবব। আব কিছু না হোক এই উপলক্ষে আপনাব

দরবারে বারবার এসে আমার আর্জি পেশ করবার সুযোগ তো পাব। আচ্ছা, সামানসামনি কি কোনদিনই দেখা হবে না?"

সংক্ষিপ্ত উত্তর এল, "না—"

"লোকনিন্দাকে ভয় করেন?"

এই ছোট প্রশ্নের উত্তরে মহারাণী যে এমনভাবে এত কথা বলবে তা মহেন্দ্রনাথ আশা করেননি। মহাবাণীর কণ্ঠস্বরে বেশ একটু আবেগও লক্ষ্য করলেন তিনি।

মহারাণী বলল, "না। ভয় নিজেকে। বেদানাকে আমি ভালবাসি। তাকে আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি নিজের অসংযমের জন্য যদি তা ভাঙতে হয় তাহলে সেটা মর্মান্তিক হবে আমার পক্ষে। এত মর্মান্তিক হবে যে তারপর আমি আর বাঁচব না। আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, কিন্তু সত্যিই আমার কাছে প্রাণের চেয়ে মান বড়। তাই আমি সাবধানে থাকতে চাই।"

কথাগুলো বানানো মেকি কথা মনে হল না মহেন্দ্রনাথের। কিন্তু তিনি সবিস্ময়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন এই আত্মগোপনেব আসল হেতুটা কি? তাঁর রক্ষিতা বেদানার কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতিটাই কি সত্যি এত বড় হয়ে উঠেছে ওর কাছে?

ঈষৎ হেসে তিনি বললেন, "বেদানাকে আমিও ভালবাসি। তাকে ত্যাগ করবার বাসনাও আমার নেই। কিন্তু এ কথাও ঠিক একটা রক্ষিতাকে নিয়ে জীবন কাটানো যাবে না. বিয়ে আমাকে কবতেই হবে। বেদানাই আমাকে রোজ অনুরোধ কবছে বিয়ে করতে।"

"করুন তাহলে আপনাব পাত্রীব অভাব হবে না।"

"ছোট তরফ মানে আমার কাকা, রোজই একটি করে সম্বন্ধ আনছেন। আর আমি রোজই তাদেব ফিবিয়ে দিচ্ছি।"

"বিয়ে যখন কবরেনই ঠিক করেছেন তখন ওদের ভিতর থেকে একজনকে বেছে নিচ্ছেন না কেন?"

"এর উত্তর তো আপনার অজানা নেই।"

"তা নেই। কিন্তু আমার বক্তব্যটা আমি আশা করি আপনাকে বোঝাতে পেরেছি।"

"বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি। আপনি 'হাঁ' বলছেন কি 'না' বলছেন তা ঠিক বুঝতে পারিনি। আর যতটুকু পেরেছি তা-ও আমি স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নই। আমাব কি মনে হচ্ছে বলব?"

"বলুন --"

"আমার মনে হচ্ছে ওটা আপনার নারী-সুলভ ছলনা, আমার আগ্রহের গভীরতা হয়তো মাপছেন। তাতে আমার আপত্তি নেই, আমার বিশ্বাস আছে পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হব। আমি অপেক্ষা করতে রাজি আছি।"

"আপনি বুদ্ধিমান লোক, আপনাকে উপদেশ দিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। কিন্তু তবু আপনাকে একটা কথা বলছি। আমার সম্বন্ধে আপনার বর্তমান মনোভাব বরাবর অক্ষুণ্ণ থাকুক এটা কি আপনি চান না?"

"চাই বইকি। নিশ্চয় চাই।"

"তাহলে আমাকে বিয়ে করতে চাইছেন কেন। আমাদের দুজনের মাঝখানে এই পরদার আড়ালটুকু যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণই তো তা অটুট থাকবে। দিন দিন আরও মধুর, আরও রঙীন হবে হয়তো। সেইটেই কি বেশী বাঞ্ছনীয় নয়? বিয়ে করে সব চুকিয়ে দেওয়া কি ভালো?"

"আপনি যা বললেন তা খুব উঁচুদরের সূক্ষ্ম কাব্য। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা একটু স্থূল রসের চর্চা না করলে তৃপ্তি পাই কি?"

"সে তৃপ্তি পাওয়ার জন্যে অনেক উপকরণ জুটবে আপনার। জুটেওছে হয়তো। আমার রুচি একটু অন্যরকম। আমি ওই শস্তা উপকরণের দলে গিয়ে ভীড় বাড়াতে চাই না। আপনার মনের কোণে একটু ঠাঁই যদি থাকে তাহলেই আমি কৃতার্থ হব।"

"চিরকালই তাহলে ওই পরদা দুলতে থাকবে?"

"তেমন ঝড় যদি আসে, পরদা কেন, আমি সুদ্ধ উড়ে যাব। কিন্তু সে অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভর করে তো কোন হিসাব করা চলে না। আপাতত আমার উপর আপনার অনুগ্রহ দৃষ্টি থাকলেই যথেষ্ট মনে করব আমি।"

মহেন্দ্রনাথের ভ্রূযুগল কপালের উপর উঠে গেল।

"ঝড়টা কি রকম ঝড় হবে? আধ্যাত্মিক?"

"তা ঠিক বলতে পারব না। তবে মানসিক নিশ্চয়ই।"

"আমার মনে ঝড় তো অনেকদিন থেকেই উঠেছে।"

"আমার মনে ওঠেনি।"

"আপনার মনে ঝড় তোলবার জন্যে কি করতে হবে?"

একটু থেমে মহারাণী বললে, "এ প্রসঙ্গ এখন থাক। আমার পক্ষে যেটা বেশী দরকারী সেই কথাই বলুন। আবার বিষয়ের ভার নেবেন তো?"

"নেব। কাল আমার ম্যানেজার একটা কাগজ নিয়ে আসবে তাতে সই করে দেবেন। সেটা আদালতে পাঠাতে হবে। হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়ল একটা। নানাসাহেবের নাম শুনেছেন?"

"শুনেছি বইকি। ইংরেজরা তো তাঁকে ধরতে পারেনি, শুনেছি তিনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।"

"ঠিক শুনেছেন। আমাদের কালেকটার সাহেব তাঁর চেহারার বর্ণনা দিয়ে একটা নোটিস পাঠিয়েছেন লিখেছেন কেউ যদি নানাসাহেবকে ধরিয়ে দিতে পারে গভর্নমেন্ট তাঁকে পুরস্কৃত করবেন, রাজ সরকারে আরও নানারকম সুবিধা করে দেবেন। আপনার দফতরেও হয়তো নোটিসটা এসেছে। নি-খরচায় সরকারের সুনজরে পড়বার মস্ত সুযোগ এটা। আর সরকারের সুনজরে থাকলে বিষয়ের সম্বন্ধে কোন ভাবনাই থাকবে না।"

কথাটা শুনে মুহূর্তকাল চুপ করে রইল মহারাণী। তারপর বলল,

"একটা গোপন কথা কি নির্ভয়ে আপনাকে বলতে পারি?

"নিশ্চয় বলতে পারেন।"

"নানাসাহেব যদি আমার বাড়িতে এসে আশ্রয় নেন আমি ককখনো তাকে ধরিয়ে দেব না। ঝান্সির রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের মৃত্যু সংবাদ যেদিন এখানে পৌঁছল সে দিন আমি সারারাত্রি ঘুমতে পারিনি।"

"আপনার বাবা কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহ সমর্থন করতেন না।"

"তা জানি। অনেক বিষয়েই বাবার সঙ্গে আমার মতের মিল ছিল না। এ বিষয়েও ছিল না যদিও মুখ ফুটে তাঁকে সে কথা বলবার সাহস হয়নি। অত্যন্ত রাশভারী লোক ছিলেন তা। আপনি যদি নানাসাহেবকে মুঠোর মধ্যে পান ধরিয়ে দেবেন নাকি?"

'একথা শোনাবার পর আমিও নির্ভয়ে বলতে পারি ককখনো দেব না। কিন্তু দেখাবেন বাইরে যেন কিছুতেই না প্রকাশ পায় একথা। তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতির সামান্য প্রমাণ পেলেও গর্ভনমেন্ট নির্দয়ভাবে শাস্তি দিচ্ছে দুজন জমিদারের ফাঁসি হয়েছে। অনেকের বিষয় বাজেয়াপ্ত হয়েছে।"

'আমার বিষয়ের ভার তো আপনিই নিলেন। রাখতে পারেন থাকবে, না রাখতে পারেন থাকবে না।'

"এ কথাটা কিন্তু গোপন থাকে যেন।'

থাকবে।'

"বেশ আজ তাহলে উঠলুম। উঠতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু দরকার আছে। আজ অনেকগুলি প্রজা আসবে। আবার কবে আসব?"

' যখন খুশি।'

সেদিন মহেন্দ্রনাথ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজকে নিয়ে মহারাণীও খিড়কির বাগানে চলে গেল আর এমন সব কাণ্ড করতে লাগল যে কষ্টিরও তাক লেগে গল সে সব দেখে। মহারাণী মহারাজের মহলে গিয়ে প্রথমে তাকে খুব আদর করল খানিকক্ষণ। মহারাজ প্রথমটা খুশী হয়েছিল, কিন্তু বেশী ঘাঁটাঘাঁটি পছন্দ করত না সে। মহারাণী তার পিঠে বসে গলা জড়িয়ে যখন বারবার আদর করত লাগল তখন আপত্তি করল সে— ঘাড় ফিরিয়ে ঘাঁউ করে উঠল। এতে মহারাণী ক্ষেপে গেল যেন। সমস্ত মুখখানা লাল হয়ে গেল, নাসার অগ্রভাগে কম্পন জাগল।

'কি, এতবড় আস্পর্ধা, আপত্তি জানানো হচ্ছে। মজা দেখাচ্ছি -" চাবুকটা বার করে সপাসপ বসিয়ে দিলে ঘা কতক তার পিঠে। অমন প্রবল পরাক্রান্ত পশুরাজ কিন্তু এই চাবুকটাকে তার বড় ভয়। চাবুক খেয়ে একেবারে কাঁচমাচু হয়ে পড়ল,— যেন সিংহ নয়, কুকুর।

"আমার পায়ের উপর মাথা রাখ্ —"

এ আদেশ কিন্তু পালন করল না মহারাজ।

"রাখ্, রাখ্ বলছি—"

আবার পড়ল কয়েক ঘা। মহারাজের কেশর ফুলে উঠল, ল্যাজ আছড়াতে লাগল সে মাটির উপর, কিন্তু পায়ের উপর মাথা সে রাখলে না।

"শ্রীহর্ষের মতন আত্মসম্মানী হয়েছেন! রাখ আমার পায়ে মাথা। রাখতেই হবে তোকে—"

জোর করে তার মাথাটা টেনে পায়ের উপর গুঁজড়ে ধরে রইল মহারাণী। মহারাজ কোন আপত্তি করল না এতে। কিন্তু মহারাণী যেই মাথাটা ছেড়ে দিলে অমনি মাথা তুলে ঘাঁউ ঘাঁউ করে গর্জন করলে দুবার।

যেন বলল, "কি করছ তুমি এসব, —ভাল লাগছে না।"

"হাত জোর করে থাক।"

মহাবাণী তার সামনের থাবা দুটো জোড় করে ধরে রইল। কিন্তু ছেড়ে দেওয়া মাত্রই মহারাজেব যুক্ত থাবা বিযুক্ত হয়ে গেল আবার।

"যা তোব কাছে থাকব না আমি, ওর কাছে যাচ্ছি।"

মহারাণী ছুটে চলে গেল বাঘের মহলে। বাঘটা আগে থেকেই গজরাচ্ছিল, ময়ূবটাও নাচছিল পেখম মেলে তীক্ষ্ণ কেকারব তুলে। বাঘের মহলে যেতেই এক লাফে এগিয়ে এল বাঘটা। তারপর যেমন তার অভ্যাস সামনের থাবা দুটো তুলে দিল মহাবাণীর কাঁধে। মহারাণী দুহাত দিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরল তার। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাত হল, একটা নয, অনেকগুলো।

মহারাজ দাঁড়িয়ে উঠে গর্জন করছে।

মহারাণী কিন্তু এমন ভাব করলে যেন শুনতে পায়নি, ভ্রূক্ষেপও করলে না। বাঘকে খানিকক্ষণ আদর কবে গেল সে ময়ূরের ঘরে। ময়ূরের সঙ্গে নাচল খানিকক্ষণ। আবাব গর্জন কবল মহারাজ, শেষকালে লাফিয়ে পড়ল লোহার গবাদেব উপব, মনে হল এখুনি বুঝি সব ভেঙে চুরে বেরিয়ে আসবে। মহারাণীব তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। অনেকক্ষণ ওদেব ঘরে কাটিয়ে তারপর মহারাণী আবার এসে ঢুকল মহারাজেব মহলে। মহারাজ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সম্ভবত, একধারে বসেছিল সামনের থাবা দুটোর উপর মুখ রেখে। মহারাণী যখন ঢুকল, তখন আড়চোখে সে চেয়ে দেখল একবার, উঠে এল না, মনে হল অভিমান করে বসে আছে। মহাবাজের মহলে কাঠের একটা বড় গুঁড়ি ছিল। মহারাণী তার উপব উঠে বসল পা দুলিযে। টুকটুকে আলতা-রাঙা পা দুটিতে রোদ পড়ে ঝকমক করে উঠল রুপোর গুজরি-পঞ্চম।

"আয়, উঠে আয! ইস্, মান করে বসে আছেন ঢং"

জিব বার করে, নাক কুঁচকে, ঠোঁট উল্টে ভেংচি কাটল মহারাণী।

"আয় উঠে আয়—"

মহারাজ উঠে এল।

"পায়ের উপর মাথা রাখ্, রাখ্ বলছি।"

গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মহারাজ। মাথা তার নত হল না।

মহারাণী তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে যা করল তা অপ্রত্যাশিত এবং অদ্ভুত। কেঁদে ফেলল!

উঠে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল—"তুইও এমন করছিস? তুইও শ্রীহর্ষ হয়ে যাবি?—"

মহারাজের গলা থেকে গর গর করে একটা শব্দ হতে লাগল। মনে হল এর উত্তরে সে গদগদ কণ্ঠে কি যেন বলছে। কিন্তু সে শব্দ ডুবে গেল ময়ূরের কেকায় আর বাঘের গগন বিদারী গর্জনে। মনে হল মহারাণীর অন্তরের আলোড়নই যেন বাঙ্‌ময় হয়ে উঠছে ওদের কণ্ঠে। মহারাণীর হঠাৎ আবার দুহাত দিয়ে চেপে ধরল মহারাজের মুণ্ডটা বুকের উপর। পশুমহলের পূর্বদিকে সারি সারি নাগলিঙ্গম গাছ ছিল কয়েকটা। সেই গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কষ্টি দেখছিল সব। সে তাড়াতাড়ি গাছের একটা কচি ডাল ভেঙে তিনবার কামড়ে সেটা মাটিতে ফেলে দিলে তারপর তিনবার থুতু ফেললে তার উপর। তারপর মহারাণীর দিকে চেয়ে তিনবার মাথা নাড়লে ধীরে ধীরে। এটা ওর একটা তুক, মহারাণীর মঙ্গলের জন্য। সিংহের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা ওর ভাল লাগছিল না। কঙ্গো দেশের মেয়ে সে। যে সব সিংহের কেশর কালো তাদের প্রকৃতি ভাল করেই জানা আছে তার। মহারাণীর জন্য তার ভয় হল হঠাৎ।

সেদিন আর একটা ঘটনাও ঘটেছিল যার খবর কেউ রাখেনি।

মহারাণী যদিও সেদিন মহেন্দ্রনাথকে বললে যে দাসীদের সে নীচে পাঠিয়ে দিয়েছে তাঁর কথাবার্তা বাইরে প্রকাশ হবার আশঙ্কা নেই, কিন্তু মহারাণী জানত না যে রঞ্জাবতী নীচে যায় নি, ছাতে চলে গিয়েছিল, তারপর নেবে এসেছিল চুপি-সাড়ে। সব শুনেছিল সে। মহারাণীর কাছে যখনই বাইরের কোন পুরুষ আসত তখনই সজাগ হয়ে উঠত রঞ্জাবতীর সমস্ত কৌতূহল। এর কারণ ছিল। দরিদ্রের মেয়ে রঞ্জাবতী, তার ডাক নাম ছিল কুড়োনী। তাকে এক মেলায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন কিশোরীমোহন, তিনি কুড়োনী নাম দিয়েছিলেন তার। অপরূপ সুন্দরী ছিল কিন্তু। একদিন তাকে দেখে মহারাণীর পছন্দ হল খুব, কিশোরীকাকার কাছে থেকে চেয়ে নিলে তাকে। রূপের জোরে কুড়োনী আশ্রয় পেলে অন্দরে, তারপর মহারাণীর ছাতবাগানের মালিনী হল সে রঞ্জাবতী নামকরণ মহারাণীরই। সমবয়সী ছিল বলে সখীর মতোই ব্যবহার করত তার সঙ্গে মহারাণী। রঞ্জাবতী যখন যৌবনে উত্তীর্ণ হল তখন তার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল অন্দর মহলের সবাই। ক্রমে ক্রমে এই ধারণাটা তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল যে সে-ও কিছু কম নয়। তেমন সুযোগ যদি এসে পড়ে, মানে, তেমন বড়লোকের নজরে সে যদি পড়ে যায় তাহলে রূপের তরী ভাসিয়ে ঐশ্বর্যের সাগরে পাড়ি জমানো অসম্ভব হবে না তার পক্ষে। কিন্তু মহারাণীর আইন অনুসারে বাইরের কোন পুরুষের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল না অন্তঃপুরে। তাই যখনই মহারাণীর আমন্ত্রণে কোনও গণ্যমান্য পুরুষের অভ্যাগম হত, রঞ্জাবতী কোন না কোন উপায়ে আড়াল থেকে লক্ষ্য করত তাদের হাব-ভাব, শুনত তাদের আলোচনা নানা ছুতোয় চেষ্টা করতে তাদের সামনে যেতে। এতে তির্যকভাবে একটু যেন তৃপ্তি হত তার। সাধারণ মেয়ে হলে এসব কথা অন্দরমহলের আর পাঁচজনের কাছে গল্প করে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করত। কিন্তু রঞ্জাবতী সে ধরণের মেয়ে ছিল না। যা শুনত, যা দেখত নিজের মনের পেটিকায় চাবি বন্ধ করে রেখে দিত সব। চিন্তা করত, সুযোগ খুঁজত, কখন কোন্ সংবাদটি তার কাজে লাগবে। একটিমাত্র লোক ছিল যার কাছে মন খুলত সে, ম্যানেজার কিশোরীমোহন।

মহারাণীর অনুমতি নিয়ে অন্দরমহলের পালকিটায় চড়ে সে মাঝে মাঝে কিশোরীমোহনের বাড়িতে যেত দেখা করতে। কিশোরীমোহনই রঞ্জাবতীকে এনে দিয়েছিলেন, রঞ্জাবতী কিশোরীমোহনকে দাদু বলত, তাই মহারাণী এতে আপত্তির কিছু দেখেনি। রঞ্জাবতী পালকি করে বেরিয়ে যেত মাঝে মাঝে। আর এই কারণেই তাকে কেন্দ্র করে নানা গুজব গুঞ্জিত হত অন্দর মহলে।

সেদিন মহেন্দ্রনাথ চলে যাবার একটু পরেই রঞ্জাবতী মহারাণীর কামরায় এল কিশোরী দাদুর বাড়িতে যাবার জন্য অনুমতি নিতে। এসে দেখল মহারাণী ঘরে নেই। শৌরসেনী ছিল, সে বলল, "মা সিংহের মহলে আছেন, শব্দ শুনছিস না?"

ও মহলে কারও যাবার হুকুম নেই, সুতরাং রঞ্জাবতীকে অপেক্ষা করতে হল। কিছুক্ষণ পরে মহারাণী যখন নিজের কামরায় ফিরল তখন তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল রঞ্জাবতী। চোখ-দুটো লাল, বুকের কাপড় খানিকটা ছিঁড়ে গেছে, খোঁপা এলিয়ে পড়েছে, ঘন ঘন নিশ্বাস বইছে।

রঞ্জাবতীকে দেখে মহারাণী একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

"কিছু বলবি না কি, এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে?"

"অনেকদিন দাদুর কাছে যাইনি. যদি বলেন, একটু ঘুরে আসি।"

"যা।"

রঞ্জাবতী চলে গেল।

একটু পরে কিশোরীমোহন দুটি সাংঘাতিক খবর জানতে পারলেন সেদিন। প্রথম, সমস্ত বিষয়ের ভার মহেন্দ্রনাথ নেবেন। দ্বিতীয়, পলাতক নানা সাহেবের উপর এদের দুজনেরই গভীর সহানুভূতি আছে। প্রথম খবরটি শুনে তিনি হতাশ হলেন, কিন্তু দ্বিতীয় খবরটি তাঁর আহত-আশা-তরুতে জল-সিঞ্চন করল। মহেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত ভয় করতেন কিশোরীমোহন। মহেন্দ্রনাথ যদি স্টেটের ভার নেন তাহলে সেখানে যে কোন রকম ডালই গলবে না এ তিনি সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলেন। সমুদ্রবিলাসের তৃতীয়-পক্ষ কুসুমের একটা কাকা খাড়া করে বিষয়টা ভাগাভাগি করবার যে মতলব তিনি ফেঁদেছিলেন তা বুদ্বুদের মতো ফেটে গেল সহসা।

কিশোরীমোহনের এ মনোভাবের মূল সন্ধান করতে হলে তাঁর অতীত জীবনের পরিচয় নিতে হয়। কিশোরীমোহন সমুদ্রবিলাসের স্টেটের অতি পুরাতন কর্মচারী। এই রোগা কালো খর্বাকৃতি নাকসর্বস্ব লোকটি সামান্য গোমস্তা থেকে ম্যানেজারের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। সমুদ্রবিলাসের অনুগ্রহেই এটা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এজন্য তিনি সমুদ্রবিলাসের প্রতি কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা অনুভব করেননি কখনও। সমুদ্রবিলাসের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না তাঁর। এর কারণ ছিল। সামান্য গোমস্তা থেকে ম্যানেজার হওয়ার জন্য যে মূল্য তিনি দিয়েছিলেন তার বিনিময়ে সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বরও যদি তিনি হতেন তাহলেও তাঁর মনে হত দাম উশুল হয়নি। বহুকাল আগেকার সে সব কথা এখনও মনে জ্বল জ্বল করছে তাঁর, কখনও ভুলবেন না।....

সমুদ্রবিলাস তখন যুবক সবে জমিদারীর মালিক হয়েছেন। কিশোরীমোহনের যে গ্রামে বাস তার পাশেই বিল আছে একটা। সেই বিলে সদ্য কেনা বন্দুকটা নিয়ে পাখী শিকার করতে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু শিকার করে বসলেন অন্য জিনিস। হঠাৎ মেঘ ঘনিয়ে এল, ঝড় উঠল, তারপর নামল শিলা বৃষ্টি। সমুদ্রবিলাস ছুটতে ছুটতে এসে সামনেই যে বাড়িটা পেলেন, তাতেই ঢুকে পড়লেন। সেটা যে কিশোরীমোহনের বাড়ি সেটা তিনি পরে জানতে পেরেছিলেন। কিশোরীমোহনের যুবতী স্ত্রী ছাড়া বাড়িতে তখন আর কেউ ছিল না। তার পরদিন কিশোরীমোহনকে নিজের খাশ কামরায় ডেকে সমুদ্রবিলাস বললেন, "দেখ কিশোরী, কাল শিলাবৃষ্টিতে বড় নাকাল হয়েছিলাম। তুমি বোধহয় জান না, তোমার বাড়িতে গিয়েই আশ্রয় নিলাম শেষটা। সেখানে একটি সুন্দরী বউ দেখলাম। সে কে?"

"আমার বউ।"

"ও। তুমি তাহলে আর একটা বিয়ে কর। ওকে আমারই চাই—"

বজ্রাহতবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন কিশোরীমোহন তখন তিনি অতি দরিদ্র। সমুদ্রবিলাসের স্টেটে দু'টাকা মাইনের মুহুরি ভাঙা পর্ণকুটিরে বাস করেন। সমুদ্রবিলাসের এ দাবীর বিরুদ্ধে কিছু বলবার সাহস হল না তাঁর। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সমুদ্রবিলাস তার মুখের দিকে একনজর চেয়ে বললেন, "ইচ্ছে করলে জোর করে আমি কেড়ে নিতে পারি। কিন্তু তা আমি করব না। তুমি যদি রাজি না হও, জবরদস্তি করব না আমি। আর যদি রাজি হও এর বদলে যা চাও তাই দেব। তোমার কুঁড়ে ঘর আর থাকবে না, পাকা বাড়ি করিয়ে দেব। জোত জমি দেব, স্টেটের চাকরিতে উন্নতি করে ভবিষ্যতে তোমাকে ম্যানেজার পর্যন্ত করব "

কিশোরী নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন

"আচ্ছা, এখন যাও, ভেবে কাল উত্তর দিও।"

তার পরদিন কিশোরীমোহনের সম্মতি পেয়ে সমুদ্রবিলাস সন্ধ্যার সময় অশ্বারোহণে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। কামুকের বাসনা কিন্তু চরিতার্থ হয়নি। সুভাষিনী কোথায় যে ছুটে বেরিয়ে গেল তা বোঝা গেল না অন্ধকারে। ফিরে আসতে হল সমুদ্রবিলাসকে। দু'দিন পরে চণ্ডীতলার পাতকুয়া থেকে পাওয়া গেল সুভাষিনীর মৃতদেহটা।

সমুদ্রবিলাস তাঁর প্রতিশ্রুতি কিন্তু পালন করেছিলেন অক্ষরে অক্ষরে। কিশোরীমোহনকে পাকা বাড়ি করিয়ে দিয়েছিলেন, প্রচুর জোত-জমি দিয়েছিলেন। পুরাতন নায়েব ধর্মরাজ সেন মারা যাবার পর তাকে নায়েব করে দিয়েছিলেন। পিতা অম্বরবিলাসের আমলের ম্যানেজার শশীকান্ত রায় যখন পেন্সন নিয়ে বারাণসী বাস করতে গেলেন তখন কিশোরীমোহনকেই ম্যানেজার পদে বাহাল করলেন সমুদ্রবিলাস। কিশোরীমোহন কিন্তু সমুদ্রবিলাসকে কখনও ক্ষমা করতে পারেননি। সারাজীবন তীব্র ঘৃণা পোষণ করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে। সমুদ্রবিলাস যদি বলাৎকার করতেন তাহলে বোধ হয় এত ঘৃণা করতেন না তাঁকে তিনি। কিন্তু তিনি যে মূল্য দিয়ে তাঁর সম্মতি আদায় করতে পেরেছিলেন এইটেই কাঁটার মতো বিঁধে ছিল তাঁর বুকে। কিন্তু সমুদ্রবিলাসের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেননি তিনি, ইশারায় ইঙ্গিতেও কিছু করবার

সাহস হয়নি তাঁর। তিনি এটা নিঃসংশয়ে জানতেন বিশ্বাসঘাতকতার সামান্যতম আভাস পেলেও আর রক্ষা থাকবে না। একেবারে গুলি করে বসবেন সমুদ্রবিলাস। তাই মনের মধ্যে ঘৃণার তুষানল জ্বেলে বাইরে ভিজে বেড়ালের মতো কালযাপন করেছেন তিনি সমুদ্রবিলাসের জীবদ্দশায়। মহারাণীর উপরও তাই বিন্দুমাত্র স্নেহ ছিল না তাঁর। ওর নানা রকমের বেয়াড়াপনায় মনে মনে রেগে খুন হয়ে যেতেন কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারতেন না, বলবার সাহস হত না , হেসে হেসে সায় দিয়ে যেতে হত। কারণ তিনি জানতেন ছোট হলে কি হবে, ও জাত-সাপের বাচ্চা, সমুদ্রবিলাসেরই মেয়ে, নিজের জেদ বজায় রাখবার জন্যে হেন কাজ নেই যা ও করতে পারে না। এক কথায় তাঁকে তাড়িয়েও দিতে পারে। কিন্তু মনে মনে প্রতিশোধ নেবার জন্য ক্ষুধিত হয়েছিলেন তিনি। বস্তুত, সেই সুযোগের জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিলেন। কুসুমবালার দাবীটার জন্যে একটা জাল উইল করবারও মতলব ছিল তাঁর। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ যদি বিষয়ের ভার নেন তাহলেই তো সব আশা নির্মূল হল। তাঁর চোখে ধুলো দেওয়া শক্ত হবে, খুব বুদ্ধিমান চৌকষ ছেলে।

কিশোরীমোহন আর বিয়ে করেননি। সাহস হয়নি। ভেবেছিলেন ওই কুড়োনো মেয়েটাকেই মানুষ করবেন, নাতনী সম্পর্ক পাতালেন তার সঙ্গে। কিন্তু তাতেও বাদ সাধল ওই মহারাণী, ওর রূপ দেখে চেয়ে বসল ওকে। তিনি 'না' বলতে পারলেন না। তবে এই ব্যাপারটাকে কাজে লাগিয়েছিলেন তিনি। রঞ্জাবতী শুধু মহারাণীর বাগানের মালিনীই নয়, মহারাণীর অন্দরমহলে সে কিশোরীমোহনের চরও। মাঝে মাঝে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে অন্দরমহলের সব খবর সে তাঁকে দিয়ে যেত।

খবর দুটি শুনে কিশোরীমোহন নীরব হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, বাঁ হাতের তর্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে নাকের বড় বড় চুলগুলি টানতে লাগলেন। এটি তাঁর মুদ্রা-দোষ। তিনি বুঝলেন কুসুমকুমারীর দাবী নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর লাভ নেই। মহেন্দ্রনাথ যদি বিষয়ের ভার নেন তাহলে ওদিক দিয়ে মহারাণীর কেশাগ্র পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারবেন না তিনি। কিন্তু নানাসাহেবের খবরটা ক্ষুরধার তরবারির মতো। ওই তরবারিটি যদি ভালো করে শান দিয়ে কালেকটার সাহেবের হাতে তুলে দেওয়া যায় তাহলে তার এক কোপে মহারাণী মহেন্দ্রনাথ দুজনেই কাটা পড়বে। কিন্তু ওর মধ্যেও একটা কথা আছে। সায়েবরা সাধারণত কান-পাতলা হয় না, প্রমাণ দিতে না পারলে একথা বিশ্বাস করবে কি না সন্দেহ। সিপাহী-বিদ্রোহের ব্যাপারে সমুদ্রবিলাস যে ইংরেজদের বন্ধু ছিলেন একথা সবাই জানে, ইংরেজদের দফতরেও লেখা আছে সে কথা, তাছাড়া নিমগাঁয়ের বিশ্বদেব শর্মাকে উৎখাত করতে তিনিই গিয়েছিলেন লোকজন নিয়ে, নিজে তার ঘরে আগুন লাগিয়ে গ্রামছাড়া করেছিলেন তাকে, তারপর পুলিশের দারোগাকে খবর দিয়েছিলেন। সবাই জানে একথা। সেই সমুদ্রবিলাসের মেয়ে নানাসাহেবকে শ্রদ্ধা করে, একথা কালেকটার চট করে বিশ্বাস করবে কি!

রঞ্জাবতীকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "ইদানীং বাইরের কোন অচেনা লোক কি অন্দরমহলে ঢুকেছিল?"

"ইদানীং ঢোকেনি । অনেকদিন আগে পারুবাবুর চিঠি নিয়ে কে একজন উদয়প্রতাপ রায় এসেছিল, তুমিও তো জান। দাউদপুরের মাঠে তাঁবু পড়েছিল তার—"

"হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তবে লোকটাকে আমি দেখিনি। সদরে যেতে হয়েছিল সেদিন। কি রকম দেখতে বল তো?"

"বেশ সুপুরুষ। গোঁফ আছে। একটু কাটখোট্টা গোছের।"

"কি জন্যে এসেছিল?"

ফিক করে হেসে ফেললে রঞ্জাবতী।

"মহারাণীকে বিয়ে করতে। কিন্তু মহারাণী রাজি হয়নি।"

"তারপর কি হল।"

"কি আর হবে, চলে গেল। তবে বলে গেছে আবার আসবে—"

"হুঁ।"

নাকের চুল টানতে লাগলেন কিশোরীমোহন। নাকের চুল টানতে টানতে রঞ্জাবতীর দিকেই চেয়েছিলেন তিনি। অন্যমনস্কভাবেই চেয়েছিলেন। হঠাৎ ভুরুটা কুঁচকে গেল তাঁর, রঞ্জাবতীকে যেন নূতন দৃষ্টিতে দেখলেন। একটু আগে নানাসাহেবের খবরটা শুনে তলোয়ারের কথা মনে হয়েছিল, এখন রঞ্জাবতীকে দেখে আর একটা উপমা মনে হল। শিখা। মনে হল সীতার জন্য স্বর্ণলঙ্কা ছারখার হয়েছিল, দ্রৌপদীর জন্য কুরুবংশ। তাঁর জীবনটাও পুড়ে গেছে সুভাষিনীর রূপের জন্য। এই মেয়েটাকে কাজে লাগালে এও একটা অগ্নিকাণ্ড যে না করতে পারে তা নয়। পারে, খুব পারে।

হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, মহেন্দ্রনাথের সামনে বেরিয়েছিলি কখনও?"

"না। মহারাণী তাঁর ত্রিসীমানায় কাউকে থাকতে দেয়নি। আমি লুকিয়ে আড়ি পেতে শুনেছি এসব"

"হুঁ"

আবার নাকের চুল টানতে লাগলেন কিশোরীমোহন।

নেপথ্যে যে এমন একটা বজ্রগর্ভ মেঘ ঘনিয়ে উঠেছিল তা মহারাণী টের পায়নি। এসব দিকে তার মনও ছিল না, সে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল অন্তর্দ্বন্দ্বে। তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা রাহুর মতো যে সূর্যকে গিলতে চেয়েছিল সে সূর্য তার আকাশ থেকে অনেক আগে সরে গেছে, সে নিজেই জোর করে সরিয়ে দিয়েছে। দূর থেকে এখন সে-সূর্যের মহিমা দেখছে সে অন্য আকাশে। ভাবছে, যে আকাশেই থাকুক, সূর্যকে উপেক্ষা করা যায় না।

বিয়ে হবার পর দেড় বৎসর কেটে গেল, শ্রীহর্ষ একবারও আসেনি। সে-ও আর নিমন্ত্রণ করেনি তাকে । সে কি নিজে মনে করে আসতে পারত না একবার? যে লোক মুখে অত প্রেম জানাত, বিয়ে হবার সঙ্গে সঙ্গে এতটা বদলে গেল সে! মিছে কথা বলত, বানিয়ে বানিয়ে কাব্যকথা আওড়াতো কেবল। ভালোবাসেনি। ভালোবাসলে নিজেকে বিলিয়ে দিত, লুটিয়ে দিত, ভাসিয়ে দিত, দেওয়াল টপকে সুড়ঙ্গ কেটে আসত, কুলমান জলাঞ্জলি দিত, কলঙ্ককে অলঙ্কার মনে করত, আমার পায় লুটিয়ে পড়ে কৃতার্থ হত নিদারুণ ক্ষোভে, অপমানে আক্রোশে পুড়ছিল মহারাণীর অন্তরটা। তাকে এমন করে তুচ্ছ করবে শ্রীহর্ষ? ইস সামান্য একটা টোলের পণ্ডিত, তার ভারী তো আত্মসম্মান। প্রেমের তুলনায় আত্মসম্মানের কি মূল্য আছে? প্রেম যদি সোনা হয় আত্মসম্মান পিতল, প্রেম যদি সাগর হয় আত্মসম্মান

ডোবা! যেদিন হাট থেকে শ্রীহর্ষ প্রথম ছুটে এসেছিল তার কাছে সেদিনের কথা মনে পড়ে মহারাণীর। পাছে, ঘরজামাই হতে হয়, সেই ভয়েই অস্থির। না, ওর আর মুখ-দর্শন করবে না সে। কিছুতেই না।

এ প্রতিজ্ঞা কিন্তু টিকল না।

দুদিন পরেই শৌরসেনী গেল নিমন্ত্রণ লিপি নিয়ে।

"অনেকদিন দেখিনি। একবারও কি মনে পড়ে না। এস বিকেলে।"

শ্রীহর্ষ কিন্তু নূতন জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন একটা--আবিষ্কার করেছিলেন মহারাণী তাঁকে যে মুক্তি দিয়েছে তার মূল্য কত। মহারাণী সম্বন্ধে তাঁর মোহ যে সম্পূর্ণ অপনোদিত হয়েছিল তা নয়, কিন্তু এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মহারাণীকে বিয়ে করলে তাঁকে দাসখৎই লিখে দিতে হত। তাঁর ছোট মাটির ঘরে সর্বমঙ্গলাকে নিয়ে তিনি যে সুখস্বর্গ গড়ে তুলছিলেন সমুদ্রবিলাসের প্রাসাদে তা তিনি পারতেন না। বিয়ের বছর খানেক পরে বাবা মা দুজনেই মারা যান। এক সঙ্গে একদিনে মারা গেলেন উভয়েই। এরকম আশ্চর্য কাণ্ড সচরাচর ঘটে না। তাঁর মা আগেই বলেছিলেন বৈধব্য-যন্ত্রণা তিনি সহ্য করতে পারবেন না, স্বামী আগে মারা গেলে সহমৃতা হবেন। সে মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখতে হয়নি তাঁকে। একবছর পুত্রবধূর সেবা-যত্ন ভোগ করে তাঁর সংসারটি ভাল করে গুছিয়ে দিয়ে তবে তাঁরা চলে গেলেন। সংসারে অভাব-অনটন অনেক ছিল। ভবভূতি ভট্টাচার্য প্রকৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে বৈষয়িক উন্নতি করতে পারেন নি তেমন, তবু শ্রীহর্ষকে যে সংসারে তিনি প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন তা সুখের সংসার ছিল। শ্রীহর্ষ এ-ও বুঝেছিলেন যে মহারাণী জোর করে ফাঁদটা সরিয়ে না নিলে তিনিও এতদিন তার বাঘ-সিংহের মতো একটা খাঁচায় বন্দী হয়ে থাকতেন। এই সত্যটা আবিষ্কার করার পর থেকে মহারাণীর সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা তিনি পোষণ করতে লাগলেন তা অবর্ণনীয়। এর পর থেকেই সম্ভবত তিনি মনে মনে মহারাণীর কেনা গোলাম হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই মনোভাবের ষোল-আনাই যে অকৃতজ্ঞতা তা মনে করলেও ভুল হবে, তিনি এটাকে কৃতজ্ঞতা বলেই ধরে নিয়েছিলেন, সর্বমঙ্গলা কিন্তু ভুল করেনি। শ্রীহর্ষের কথা-বার্তা থেকে সে টের পেয়েছিল যে শ্রীহর্ষের ছেলেবেলার সঙ্গিনী মহারাণীর রাজত্ব শুধু তার জমিদারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

...অনেকদিন পরে চিঠি পেয়ে একটু অবাক হয়ে গেলেন শ্রীহর্ষ। অবাক হয়ে গেলেন নিজের মনের দিকে চেয়ে, অন্তরের গহনলোকে কে যেন এই আমন্ত্রণটুকুর জন্য পথ চেয়ে বসে ছিল। ছোট্ট চিঠিটা পেয়ে তার হৃদয়ের স্পন্দন-বেগ এমন বেড়ে গেল কেন! যেটাকে ভস্মস্তূপ মনে হচ্ছিল, একটা দমকা হাওয়া যেন সেটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল, বেরিয়ে পড়ল প্রচ্ছন্ন আগুনটা।

স্তব্ধ হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর সহসা স্থির করলেন, লুকিয়ে যাবেন না, সর্বমঙ্গলাকে বলেই যাবেন।

সর্বমঙ্গলা মেয়েটি রূপসী তো বটেই, বুদ্ধিমতীও। একটু চাপা স্বভাবের, কথা কম বলে, কিন্তু যেটুকু বলে বেশ বাগিয়ে বলে। খবরটা শুনে সে চুপ করে রইল, তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে মুচকি হাসল একটু।

হাসছ যে—। যাব না?''

''যাবে বই কি। ছেলে বেলার সই ডেকেছে, না গেলে কি চলে।''

''তবে অমন করে হাসলে যে।''

''হাসলাম মনের দুঃখে, নিজের কপালের কথা ভেবে। তোমার সঙ্গে আমাকেও যদি নেমন্তন্ন করত, রাজবাড়িতে দুটো ভালোমন্দ জিনিস খেয়ে আসতাম''

''বেশ তো চল না। তুমি গেলে মহারাণী খুব খুশী হবে।''

''হবে না। হলে নেমন্তন্ন করত। তাছাড়া আমার কেমন যেন ভয় ভয় করে ওকে। শুনেছি ও নাকি আজকাল সিংহটার পিঠে চড়ে বেড়ায়।''

''তাই নাকি। শুনিনি তো।''

সর্বমঙ্গলা আর কিছু বলল না, মুচকি হেসে চলে গেল।

শ্রীহর্ষ গিয়ে দেখলেন অন্দরমহলের দরজার কাছে শৌরসেনী দাঁড়িয়ে আছে। তাঁকে দেখে বলল, ''আপনার জন্যই দাঁড়িয়ে রয়েছি। মা খিড়কির বাগানে আছেন, আপনি সেইখানেই যান। রাস্তাটা চেনেন তো, আমাদের ওখানে যাবার হুকুম নেই।''

''রাস্তা চিনি''

খিড়কির বাগানে গিয়ে শ্রীহর্ষ যা দেখলেন তাতে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। সর্বমঙ্গলা ঠিকই বলেছে তো, মহারাণী সত্যিই সিংহটার পিঠে চড়ে বেড়াচ্ছে। আশ্চর্য হলেন, কিন্তু মুগ্ধও হয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। মনে হল অপরূপ। জগদ্ধাত্রী যেন জীবন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শ্রীহর্ষ একটু দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন নির্বাক হয়ে। অনেকদিন মহারাণীকে দেখেননি তিনি, এমন অপ্রত্যাশিত মহিমময়ী মূর্তিতে দেখতে পাবেন তা তাঁর কল্পনার অতীত ছিল। মুগ্ধ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। দেখলেন মহারাণী শুধু সিংহটার পিঠে চড়েই বেড়াচ্ছে না ঝুঁকে ঝুঁকে আদরও করছে তাকে। পাশের পশুমহল থেকে শোনা যাচ্ছে ময়ূরের ডাক আর বাঘের গর্জন। হঠাৎ মহারাণী দেখতে পেলেন শ্রীহর্ষকে।

''আরে, কতক্ষণ এসেছ তুমি। ডাকনি কেন। দাঁড়াও মহারাজকে রেখে আসি এক্ষুনি আসছি। কষ্টি, কোথা গেলি তুই-—''

সিংহের পিঠে চড়েই মহারাণী পশু মহলের দিকে চলে গেল। একটু পরেই শোনা গেল সিংহের গর্জন। তারপর প্রায় ছুটতে ছুটতে ফিরে এল সে।

''চল ছাতে যাই—''

''তোমাকে দেখে সত্যি আশ্চর্য হয়ে গেছি আজ। সিংহের পিঠে চড়ে বেড়াচ্ছ। একি কাণ্ড।''

''কোন মানুষ তো আমাকে আমলে দিলে না, তাই ওদের নিয়েই আছি। মহারাজ আমাকে ভালবাসে খুব। তোমার চেয়ে বেশী ভালবাসে। যা বলি তাই করে --''

মহারাণী একথা বললে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে মনে মনে সন্দেহ ছিল তার। সে জানত মহারাজ তাকে সহ্য করে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেনি। কিন্তু সে কথা শ্রীহর্ষকে বলবে কেন, নিজের কাছেও স্বীকার করতে চাইত না।

ছাতে বঞ্জাবতী দাড়িযে ছিল সেজেগুজে।

"শ্রীহর্ষেব জন্যে কিছু খাবাব ব্যবস্থা কব। আব ফুলেব তোড়া তৈবি কবে দে কযেকটা ভাল কবে। সর্বমঙ্গলাকে পাঠাব।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বঞ্জাবতী নেবে গেল।

শ্রীহর্ষ হেসে বললেন, "গবীবেব কুঁড়ে ঘবে ফুলেব তোড়া বৃথা পাঠাবে। আমাব সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটে গ্রাসাচ্ছাদনেব চেষ্টায আব সর্মমঙ্গলাব কাটে বান্নাঘবে আব সুতো কেটে। যে পবিবেশে ফুলেব তোড়া মানায সে পবিবেশ আমাব বাড়িতে নেই।"

মহাবাণীব মুখে একটা ছাযা নামল, কিন্তু সেটা ঢাকবাব জন্যে মুখ ফিবিযে নিলে সে। তাবপব সোজা চলে গেল একটা পুষ্পিত জুঁই ঝাড়েব দিকে। শ্রীহর্ষেব জীবনেব একটা দিক সহসা উদঘাটিত হযে গেল তাব কাছে। তাব মনে হল শ্রীহর্ষ যদি তাকে বিযে কবত তাহলে তাব দাবিদ্র্য ঘুচে যেত। শ্রীহর্ষ তো বিযে কবতে চেযেছিল, সেই কবেনি। মহাবাণীব মনে হল ওব এ দাবিদ্র্যেব জন্য আমিই দাযী। জুঁই ফুল তুলতে তুলতে এই কথাটাই মনে হতে লাগল তাব ঘুবে ফিবে।

একমুঠো জুঁই ফুল তুলে এনে বললে, "নাও"

দু'হাত পেতে ফুলগুলি নিলেন শ্রীহর্ষ।

"তোমাকে আজ কেন ডেকেছি জান?"

"না। আমিও সেকথা জিগ্যেস কবব ভাবছিলুম। কেন বল তো - "

"নিজেব মানেব দাযে"

সম্পূর্ণ কাল্পনিক একটা গল্প বানিযে তুলেছিল মহাবাণী জুঁই ফুল তুলতে তুলতে।

'মানেব দাযে? কি বকম।"

"মহেন্দ্রনাথ এসেছিলেন কযেকদিন আগে। তাঁব খুব ইচ্ছে তাঁব বাবাব নামে এখানে একটা ভাল টোল হোক আব তুমি সে টোলেব ভাব নাও। আমি তাঁকে কথা দিযেছি তোমাকে বাজি কবাব। বাজি হবে তো—"

"আমাব চেযে যোগ্যতব লোক বযেছেন নীলকণ্ঠ বাচস্পতি মশায। তিনি ভাব নিলে টোলেব গৌবব অনেক বেশী হবে।"

"কিন্তু মহেন্দ্রনাথেব ঝোঁক তোমাব উপব। আব আমি তাঁকে কথা দিযেছি। বাজি হবে তো—"

উৎসুক দৃষ্টি মেলে চেযে বইল মহাবাণা।

"ভেবে দেখি—"

"না, ভাবতে দেব না আমি, —এখুনি 'হাঁ' বলতে হবে। আচ্ছা, আমাব কথাব কি কোন মূল্য নেই তোমাব কাছে। মহেন্দ্রনাথ উপকাবী বন্ধু একজন, সমস্ত বিষযেব ভাব নিযেছেন, সমস্ত ঝক্কি পোযাচ্ছেন। তাঁব এ সামান্য শখটুকু মেটাতে দেবে না তুমি? আব আমি তাকে কথা দিযেছি"

মহারাণীর কণ্ঠস্বরে উত্তাপের আভাস পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন শ্রীহর্ষ। তারপর হেসে বললেন, "বেশ, তোমার যখন অত জেদ, তাই হবে"

এরপর মহারাণী যা করল তা-ও অদ্ভুত। হঠাৎ পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, "জুঁই ফুলগুলো আমার খোঁপায় গুঁজে দাও।"

শ্রীহর্ষের সর্বাঙ্গে শিহরণ খেলে গেল একটা। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। ছেলেবেলায় এমনি করে অনেকবার ফুল পরিয়ে দিয়েছেন তার খোঁপায়; কিন্তু তখন তো সর্বমঙ্গলা ছিল না। ফুল-পরানো শেষ করেই তিনি উঠে পড়লেন, বিবেক দংশন করতে লাগল।

"আমি এবার যাই-- "

"এত তাড়াতাড়ি যাবে? কিছু তো খেলে না"

"না, খাবার ইচ্ছে নেই এখন"

"সর্বমঙ্গলার জন্য ফুল নিয়ে যাও। তোড়া বাঁধতে বললাম যে—"

"পাঠিয়ে দিও"

যেন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গেলেন শ্রীহর্ষ। ভাবতে ভাবতে গেলেন খোঁপায় ফুল গোঁজার কথাটা সর্বমঙ্গলাকে বলবেন কি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলেননি।

মহারাণী প্রস্তর মূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর প্রস্থান পথের দিকে চেয়ে। বঞ্জাবতী খাবার আনতে সম্বিৎ ফিরে পেল সে। ধমকে উঠল তাকে।

"এত দেরি কেন? শ্রীহর্ষ তো চলে গেল—"

দাঁড়িয়ে রইল বঞ্জাবতী ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায়।

"দে আমাকে "

থালাটা তার হাত থেকে নিয়ে মহারাণী চলে যাচ্ছিল খিড়কির বাগানের দিকে।

"ফুলের তোড়া তৈরী করব?"

"না, আর করতে হবে না। মালা গাঁথা আছে?"

"আছে- -"

"তাই দে তাহলে"

মালা আর খাবারের থালা নিয়ে মহারাণী সোজা চলে গেল সিংহের মহলে। কষ্টি সবিস্ময়ে দেখল মহারাণী সিংহের গলায় মালা পরিয়ে জোর করে তাকে সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়াচ্ছে। মহারাজ কিছুতেই খাবে না, মহারাণীও না-ছোড়।

কষ্টি আবার ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল তিনবার।

এসব তার ভাল মনে হচ্ছিল না মোটেই।

সেইদিনই একটু পরে চিঠি নিয়ে লোক গেল মহেন্দ্রনাথের কাছে। মহারাণী কখনও বড় চিঠি লেখে না। চিঠিতে ভনিতাও থাকে না কোন। মুক্তোর মতো অক্ষরে সোজা মনের ভাব ব্যক্ত করাই তার স্বভাব। চিঠি গেল—"বৈষয়িক প্রয়োজনে একবার দেখা করতে চাই। দয়া করে যদি আসেন বাধিত হব।"

মহেন্দ্রনাথ চিঠিখানির দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। মহারাণীর বিষয়ের সব খবরই তো তাঁর নখ-দর্পণে, কোনরকম গোলমালের কথা তো কানে যায়নি, তবে হঠাৎ কি এমন বৈষয়িক প্রয়োজন ঘটল? চিঠিখানির আর একটি বৈশিষ্ট্য স্মরণ করে তিনি তৎক্ষণাৎ হাতী কসতে বললেন। নিজের প্রয়োজনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মহারাণী তাঁকে এই প্রথম চিঠি লিখছে। চিঠি লিখে এমন ভাবে আর কখনও যেতে বলেনি তাঁকে। তিনিই বারবার গিয়ে বসেছেন গোল বৈঠকে, কখন সত্যকার বৈষয়িক প্রয়োজনে, কখনও বা সেই অজুহাতে। আজ মহারাণীর এ ডাক কেন? গোল বৈঠকের পরদা আজ সরে যাবে না কি! একটু সাজ সজ্জা করেই গেলেন তিনি সেদিন।

মহারাণীর খাস চাকরাণী শৌরসেনী যথাস্থানে অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্যে। সে তাঁকে গোল বৈঠকে নিয়ে গিয়ে যথারীতি খাতির করে বসালো। একটু পরেই পরদার ওপারে শোনা গেল অলঙ্কারের শিঞ্জিনী।

"নমস্কার। প্রথমেই ক্ষমা চাইছি, আপনাকে কষ্ট দিলুম বলে।"

"এরকম কষ্ট পাবার জন্যেই তো উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকি রোজ। প্রয়োজনের কথাটা আগে বলুন শুনি। আমি যতদূর জানি, আপনার সম্পত্তি ঠিক আছে—"

"আমার সম্পত্তি ঠিক থাক বা না থাক সেজন্য আমার বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। আমি আপনাকে ডেকেছি অন্য একটা প্রয়োজনে।"

মহেন্দ্রনাথের বুকটা দুক দুক করে উঠল। কিন্তু চুপ করে রইলেন তিনি।

"আপনার কাছে একটা ভিক্ষা আছে।"

"কি বলুন: আগেই তো বলেছি আপনাকে আমার অদেয় কিছুই নেই।"

"আপনি আমাদের গ্রামের শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থকে চেনেন কি?"

"খুব। মস্ত পণ্ডিত লোক তিনি।"

"আপনি জানেন কি না জানিনা ওঁর সঙ্গে আমার একবার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু আমি বিয়ে করতে রাজি হইনি। আমার সঙ্গে বিয়ে হলে আজ উনিই বিষয়ের মালিক হতেন। এখন শুনছি দারিদ্র্যের চাপে বড় কষ্টে আছেন তিনি। তাই আমার ইচ্ছে তাঁকে একটা টোল করে দেওয়া আর সেই সঙ্গে একশ'বিঘা নিষ্কর জমি ব্রহ্মত্র স্বরূপ দান করা।"

"উত্তম প্রস্তাব। এ তো অতি সহজেই হতে পারে।"

"যত সহজ ভাবছেন তত সহজে নয়। শ্রীহর্ষ যদি শোনে যে আমি তার দারিদ্র্য ঘোচাবার জন্য তাকে দয়া করে এই সব দিচ্ছি তাহলে সে কিচ্ছু নেবে না। দানটা করবেন আপনি, জমিও আপনার জমিদারী থেকেই দিতে হবে, এর জন্যে যা মূল্য লাগে তা আমি দেব।"

"এই তো আমার প্রতি অবিচার করে বসলেন। আমি কি এতই অধম যে একজন সদ্‌ব্রাহ্মণকে এই সামান্য দানটুকু করে পুণ্যার্জন করবার অধিকার আমার নেই? এর জন্যে দাম নিতে হবে!"

"কিন্তু আপনার আর্থিক ক্ষতি করবার কি অধিকার আছে আমার বলুন। এমনিই আপনি আমার জন্যে যা করেছেন তার তুলনা নেই।"

"আপনার যে কি অধিকার আছে তা আপনি জানেন তো। আপনার এ আদেশ পালন করে কৃতার্থ হব আমি।"

সেদিন সন্ধ্যার পর যখন মহেন্দ্রনাথ অন্দর থেকে বেরুচ্ছিলেন তখন ক্ষণেকের জন্য দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। পাশের একটা দরজা দিয়ে ত্রস্তপদে বেরিয়ে গেল কে যেন দেখতে পেলেন শুধু বেল-ফুলের মালা জড়ানো দোদুল্যমান বেণীটি, গৌরবর্ণ নিটোল মুখের পাশটুকু, আর নীলাম্বরী শাড়ির জরি ঝলমল উড়ন্ত আঁচলখানা। মহাবাণী কি? মহাবাণীকে আবছা ভাবে দেখেছিলেন তিনি অনেকদিন আগে, এখন সামনাসামনি দেখলেও চিনতে পারবেন না বোধহয়। শৌরসেনী আলো ধরে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। মহেন্দ্রনাথ যখন দাঁড়িয়ে পড়লেন তখন সে ও দাড়াল। মহেন্দ্রনাথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন তার দিকে একবার, দেখলেন তার মুখ ভাব লেশ হীন, আনত নেত্রে দাঁড়িয়ে আছে নীরবে। শৌরসেনীর স্বভাবই এই। তাকে কোন প্রশ্ন করা সমীচীন মনে করলেন না। তিনি কিন্তু তার মানস পটে এই সংস্থা সহসা অন্তর্হিতা তরুণীর ছবিটি আঁকা হয়ে গেল চোখের সামনে দুলতে লাগল বেণীটি সে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ফুলের যে গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল সে গন্ধ তার বুকের ভিতর বাসা বাঁধল। মহেন্দ্রনাথের চিত্ত নূতন নারী সঙ্গ লাভের জন্য উতলা হয়ে উঠেছে অনেকদিন থেকে। তৃতীয় সন্তান হবার পর থেকে বেদানার শরীর ভেঙে পড়েছে যৌবনে একদা যে রঙের নেশা চোখে লেগেছিল তা ফিকে হয়ে গেছে অনেকদিন আগে কর্তব্যবোধেই বেদানাকে ত্যাগ করেননি। তার নামে বিষয় লিখে দিয়েছেন তার ও তার সন্তানদের ঐহিক সুখ সুবিধার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, কিন্তু ভালবাসার সে জাদু আর নেই এখন ক্বচিৎ তিনি বেদানা মহলে যান। তিনি ইচ্ছে করলে অনায়াসে বিয়ে করতে পারতেন, নতুন প্রণয়িনী জোটাতে পারতেন, কিন্তু তিনি কিছুই করেননি কারণ তিনি আশা করে আছেন মহাবাণীকে পাবেন ওই দুর্জয়িনীকে জয় করতেই হবে যেমন করে হক এই তার পণ। তাই নিজের চরিত্র মহিমাকে যতদূর সম্ভব শুভ্র, সমুজ্জ্বল এবং সমুন্নত করে রেখেছেন। সেদিক দিয়ে মহাবাণী যেন কোন খুঁত ধরতে না পারে, আপনিই যেন সে আকৃষ্ট হয় তার দিকে। সেদিন যেতে যেতে বারবার তাঁর মনে হতে লাগল, কে ওই রূপসী মেয়েটি ওই কি মহাবাণী? কিন্তু না, মেয়েটি মহাবাণী নয়, বঞ্জাবতী। কিশোরীমোহনের ইঙ্গিতে বঞ্জাবতী মহেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল ভেবেছিল একাই বুঝি বেরুবেন তিনি অন্দরমহলের পথ দিয়ে। সঙ্গে শৌরসেনী থাকবে তা তার খেয়াল ছিল না। মহেন্দ্রনাথ চলে যাবার পর মহাবাণী খানিকক্ষণ ছাদে একা বসে রইল। পূর্ণিমার চাঁদ প্রায় মধ্য গগনে চারিদিক জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। চাদের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে বসে রইল সে হঠাৎ এক আশ্চর্য কাণ্ড হল, চাঁদের যেন ঘন কুঞ্চিত দাড়ি গজাল, তারপর বাবরি, তারপর চোখ নাক মুখ—চাঁদ? না, শ্রীহর্ষ।

সেদিকে চেয়ে মহাবাণী মনে মনে বলছিল, সত্যিই কি সুন্দর তুমি।

কিন্তু কত দূরে আছ, কিছুতেই তোমার নাগাল পাচ্ছি না।

মাসখানেকের মধ্যেই মহা-সমারোহে টোল প্রতিষ্ঠিত হল।

ও অঞ্চলের মান্যগণ্য পণ্ডিতেরা আমন্ত্রিত হয়ে সভা করলেন, জয়—কামনা করলেন অধ্যাপক শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থের, সাধুবাদ করলেন, জমিদার মহেন্দ্রনাথের বদান্যতার। উৎসব যখন শেষ হয়ে গেল, পণ্ডিতের দল যখন বিদায় নিলেন একে একে, মহাবাণীর জন্য অনেকক্ষণ বৃথা অপেক্ষা করে মহেন্দ্রনাথও যখন হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করে চলে গেলেন, তখন রাত্রি অনেক হয়েছে। মহেন্দ্রনাথ আশা করে এসেছিলেন এই উপলক্ষে মহাবাণীর সঙ্গে হয়তো আলাপ হবে। কিন্তু মহাবাণী এল না। ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেলেন মহেন্দ্রনাথ।

সেদিনও পূর্ণিমা, জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। হঠাৎ হুমব্রো হুম্‌ব্রো শব্দে সচকিত হয়ে উঠল শ্রীহর্ষের নব নির্মিত চতুষ্পাঠীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তারপর মনে হল খানিকটা জমাট জ্যোৎস্না যেন এসে থামল সেখানে। মহাবাণীর বিয়ের জন্য সমুদ্রবিলাস একদা আগাগোড়া রুপোর পাত দিয়ে মুড়ে যে পালকিটি করিয়েছিলেন, যা এতদিন অনাদৃত হয়ে একটা ঘরে বন্ধ হয়ে পড়েছিল সেই পালকিটি সর্বাঙ্গে জ্যোৎস্না বিকিরণ করতে করতে এসে দাড়াল শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থের দ্বারে

শ্রীহর্ষ বাড়ির ভিতরে ছিলেন, শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। তিনিও মনে মনে প্রতীক্ষা করছিলেন মহাবাণীর। বরকন্দাজ সেলাম করে নিবেদন করল বাণীমা এসেছেন ”

মহাবাণী বেরিয়ে এলেন পালকির ভিতর থেকে।

অন্দরের দিকে মুখ ফিরিয়ে শ্রীহর্ষ ডাকলেন “ওগো, এদিকে এস। দেখ কে এসেছে শুনছ - ”

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন শ্রীহর্ষ।

“ ‘ওগো’কে বাইরে আর নাই ডাকলে। চল, আমরাই ভিতরে যাই।”

তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে চলতে লাগলেন শ্রীহর্ষ।

সর্বমঙ্গলাও এসে দাড়িয়েছিল দ্বার প্রান্তে।

পালকির সর্বাঙ্গ থেকে জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হচ্ছিল। তার চোখ ধেঁধে গেল

মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল—“ওটা কি।”

মহাবাণী হেসে উত্তর দিলে “রুপোর পালকি। লক্ষ্মৌ থেকে কারিগর আনিয়ে বাবা শখ করে করেছিলেন ওটা। বিয়ের পর প্রথম ওইটেতে চড়ে শ্বশুর বাড়ি যাব বলে। কিন্তু বিয়ে তো অদৃষ্টে নেই, এতদিন ওটা বোরখা ঢাকা পড়ে ছিল একটা ঘরে। আজ ইচ্ছে হল ওইটে চড়েই তোমাদের কাছে যাই ”

“আসুন, কি ভাগ্যি আমাদের”

“সত্যই তুমি ভাগ্যবতী”

তারপর ফিরে দাড়িয়ে মহাবাণী একজন বরকন্দাজকে আদেশ করল “পালকির ভিতর যে বাক্সটা আছে, ভিতরে দিয়ে যাও সেটা।”

আবলুশ কাঠের উপর সোনার কাজ করা একটা বড় বাক্স দিয়ে গেল জাফর।

"ওটা কি?"

শ্রীহর্ষ জিগ্যেস করলেন সভয়ে।

"বলছি, ঘরের ভিতরে চল শোবার ঘর কোনটা তোমাদের?"

"এই যে—"

শ্রীহর্ষ আর সর্বমঙ্গলাকে নিয়ে সে ওদের শয়নকক্ষেই ঢুকল। অনাড়ম্বর কিন্তু পরিচ্ছন্ন দুটি বিছানা ছিল ঘরের দধারে।

সর্বমঙ্গলা আর মহাবাণী একটা খাটে বসল। শ্রী হর্ষ সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে রইল

"তুমিও বস ওই খাটটাতে"

শ্রীহর্ষ বসতেই মহাবাণী বলল, "এইবার আমার দরখাস্তটি পেশ করি অধ্যাপক মশায়ের কাছে। তোমার নতুন টোলে আমিও ভরতি হতে এসেছি। তোমার কাছে কাব্য পড়ব

শ্রীহর্ষ একটু বিস্মিত এবং বিব্রত হলেন।

মুখে অবশ্য বললেন 'বেশ তো"

সর্বমঙ্গলা মুচকি হাসতে লাগলেন, কিন্তু এটা বেশ বোঝা গেল যে তার মুখে কিসের যেন একটা ছায়া পড়ল হঠাৎ শ্রীহর্ষও লক্ষ্য করলেন সেটা। হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল মহাবাণী

"কি বোকা তোমরা দুজনেই সত্যি বিশ্বাস করলে যে আমি এখানে এসে কুশাসনে বসে কাব্য পড়ব ছেলেবেলায় মাধব পণ্ডিতের কাছে অনেক পড়েছি, আর পড়বার সাধ নেই। আমি এসেছি অন্য কাজে সর্বমঙ্গলার কাছে"

"আমার কাছে? কি বলুন।"

"বল, আমায় হতাশ করবে না।"

"সে সাধ্য কি আছে আমার।

"ওই যে বাক্সটা এনেছি ওতে কিছু গয়না আছে। আমার বিয়ের জন্য বাবা তৈরি করিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ে তো হল না। যে লোক আমার গায়ে গয়না দেখে খুশী হত সে তো নাগালের বাইরে চলে গেল। তাই ভাবছি গয়নাগুলো আজ তোমাকেই পরিয়ে দেব। শ্রীহর্ষ দেখে খুশী হবে, আর শ্রীহর্ষ যদি খুশী হয় তাহলে আর বাকি রইল কি—"

মহাবাণীর চোখ থেকে হাসি উপছে পড়তে লাগল।

সর্বমঙ্গলা বসে রইল নত নেত্রে।

শ্রীহর্ষ বললেন, "এমনই তো তোমার কাছে অনেক ঋণে ঋণী আছি। আবার বাড়াচ্ছ কেন?

"আমার বোঝা তোমার মাথায় তুলে দিচ্ছি। আর কাকে দেব বল। বাধা দিও না তুমি।"

মহাবাণীর চোখ দুটো তখনও হাসছিল, কিন্তু গলার স্বরে বাজল মিনতির সুর।

"আমি এত সব দামী জিনিষ রাখব কোথায়?

"সে ব্যবস্থাও হবে।"

সর্বমঙ্গলাকে গয়নাগুলি পরিয়ে সেদিন মহাবাণী যখন ফিরল তখন রাত্রির তৃতীয় যাম

প্রায় শেষ হচ্ছে। পূর্ণচন্দ্র হেলে পড়েছে পশ্চিম গগনে। একটা ফিঙে পাখীর তীব্র মধুর সুরে জ্যোৎস্না কাঁপছে।

দু'দিন পরে একটা ঘটনা ঘটল । অবাক হয়ে গেল কষ্টি, কারণ সে-ই ছিল এ দৃশ্যের একমাত্র দর্শক। একটা তেঁতুল গাছে উঠে সে তেঁতুল পাতা চিবুচ্ছিল বসে বসে। তার বন্য স্বভাব ঘোচেনি। প্রায়ই গাছের উপর উঠে বসে থাকত সে। আব তেঁতুল পাতা ছিল তার প্রিয় খাদ্য। হঠাৎ দেখতে পেলে মহারাণী সিংহের মহলে ঢুকছে। সিংহটা গম্ভীর হয়ে বসেছিল, মহারাণীকে দেখে সে ল্যাজটি মাটিতে আছড়াল দু'একবার, আর কিছু করল না।

"এগিয়ে আয় এদিকে।"

সিংহ এগিয়ে এল কিন্তু অনিচ্ছাসহকারে।

"পায়ে মাথা রাখ।"

মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রইল মহারাজ। মাথা সে কিছুতেই নত করবে না।

"হাত জোড় কর।"

তা ও করল না সে।

মহারাণী তখন অধীরভাবে চড়ল তার পিঠের উপর, জড়িয়ে ধরল তার গলা। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা গর্জন করতে শুরু করল পাশের মহলে, ময়ূরের তীক্ষ্ণ কেকাও চিরে দিতে লাগল আকাশকে। রোজ যেমন হয়, সেদিনও তাই হতে লাগল। মহারাজ কিন্তু একটুও বিচলিত হল না। তার গাম্ভীর্য রোজ যেমন অটুট থাকে সেদিনও তেমনি রইল।

"শুনছিস, দেখছিস ওরা কি করছে। ওদের কাছে শেখ, আয় দেখবি। দেখ ওরা কেমন করে আমাকে আদর করে।"

তারপর যা করল মহারাণী তাতে শিউরে উঠল কষ্টি।

সিংহটাকে টানতে টানতে সে তাকে নিয়ে গেল বাঘের ঘরে। তারপর সেখানে নিয়ে এল ময়ূরটাকেও। তারপর মহারাণী উন্মাদের মতো নাচতে লাগল তাদের সামনে। কষ্টির মনে পড়ল টাকুমাকে, সে-ও অমনি করে নাচত। ময়ূরটাও নাচতে লাগল। বাঘটা মহারাণীর কাঁধে থাবা তুলে দেবার চেষ্টা করতে লাগল বারবার।

মহারাজ একপাশে দাঁড়িয়ে, দেখতে লাগল গম্ভীর হয়ে।

"দেখ, দেখ্, দেখ্ তুই—"

পাগলের মতো চীৎকার করতে লাগল মহারাণী। মনে হল যেন আর্তনাদ করছে। ঠিক এর পরেই বজ্রপাত হল। মহারাজের বজ্রনির্ঘোষে কেঁপে উঠল চতুর্দিক। সঙ্গে সঙ্গে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল ময়ূরটার উপর এবং নিমেষে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল তাকে। তারপর লাফিয়ে পড়ল বাঘটার উপর। মহারাণী চীৎকার করে সরে গেল একধারে। বাঘ আর সিংহের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তুমুল যুদ্ধ। গর্জনে সমস্ত খিড়কির বাগানটা কাঁপতে লাগল মুহুর্মুহু। বাঘটাও কম শক্তিশালী ছিল না, প্রতিদ্বন্দ্বীকে নাগালের মধ্যে পেয়ে সেও প্রাণপণে যুঝতে লাগল। কিন্তু প্রাণটা গেল তার শেষ পর্যন্ত। মহারাজই জিতল। থাবা দিয়ে বাঘের গলা আর বুক চিরে ফেললে সে। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঢুকল নিজের ঘরে। গম্ভীর হয়ে বসে রইল।

"আমাকেও মেরে ফেল তুই, আমাকেও খেয়ে ফেল।"

মহারাণী তার পিছু পিছু ছুটে এসে শুয়ে পড়ল তাকে জড়িয়ে। মহারাজ কিছু বললে না। ধীরে ধীরে ল্যাজ নাড়তে লাগল শুধু, তার গলা থেকে বেরুতে লাগল গরগর গরগর শব্দ।

কষ্টি তেঁতুলগাছের উপরে বসেই আবার মাথা নাড়লে তিনবার।

আব এক কাণ্ড হল।

মহারাণী যখন সিংহের মহলে তখন মহেন্দ্রনাথের পালকি এসে ঢুকল বাইরের সিংহদরজায়। মহেন্দ্রনাথ আসবার পূর্বে সাধাবণত খবর দিয়ে আসতেন। কিন্তু সেদিন আব খবর পাঠাবার সময় হয়নি, সম্ভবত পাঠানো দরকারও মনে করেননি তিনি। তিনি সোজা গিয়ে ঢুকলেন ম্যানেজার কিশোরীমোহনের ঘরে। যদিও তিনি মহারাণীর বিষয়ের ভার নিয়েছিলেন, কিন্তু কিশোরীমোহনকে ম্যানেজারি পদ থেকে অপসারিত করেননি। আপাতদৃষ্টিতে সব বিষয়ের ভারই কিশোরীমোহনের উপর ছিল, কিন্তু কিশোরীমোহন জানতেন চাবিকাঠি মহেন্দ্রনাথের হাতে আছে। এতে তিনি মনে মনে জ্বলছিলেন কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু করবার উপায ছিল না, সাহসও ছিল না। যখন একা থাকতেন তখন নাকেব চুল টানতে টানতে চিন্তা করতেন কি করে এর প্রতিকার করা যায়' কিন্তু কোন উপাযই মাথায় আসত না।

মহেন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

"বসুন বসুন। আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম। কালেকটার সাহেব খবর পাঠিয়েছেন নানাসাহেব নাকি এই অঞ্চলেই লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমরা যেন অচেনা লোক দেখলেই তাকে ধরে থানায পাঠিয়ে দিই। আপনি আপনার স্টেটের মহলে মহলে খবরটা জারি করে দিন। নানাসাহেবকে ধরে দিতে পারলে সবকারে আমাদের প্রতিপত্তি খুব বেড়ে যাবে। মহারাণীকেও খবরটা বলে যাব, ভিতরে একবার খবর পাঠান।"

"যে আজ্ঞে"

কিশোরী নিজেই উঠে বাইরে গেলেন। অন্দরমহলে খবর পাঠাবার বিশেষ পদ্ধতি ছিল। বাহির মহল যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানে একটা ঘরের ভিতর দড়ি টাঙানো থাকত। সেই দড়ি টানলেই অন্দরমহলে ঘন্টা বেজে উঠত। তখন একজন দাসী এসে অন্দরমহলের কপাট খুলে খবর নিত কি চাই। তার মারফতই খবর পাঠাতে হত।

....দাসী গিয়ে যখন মহারাণীর মহলে খবর দিলে তখনও মহারাণী সিংহের মহল থেকে ফেরেনি। সে মহলে কারও যাবার হুকুম ছিল না। তাই শৌরসেনী বলল ,"ওকে পাঠিয়ে দাও, উনি এসে বসুন। রাণীমা খিড়কির বাগানে আছেন, এখুনি আসবেন।" মহেন্দ্রনাথকে শৌরসেনী যথারীতি অভ্যর্থনা করে পরদা-ঘেরা গোল বৈঠকে নিয়ে গিয়ে বসাল। তারপর গেল পশু-মহলের দিকে, যদি কষ্টির দেখা পায়, খবরটা পাঠাতে পারবে। কষ্টি কিন্তু তখন তেঁতুল গাছের পত্রপল্লবান্তরে আত্মগোপন করে বসেছিল। তাকে দেখতে না পেয়ে পশু-মহলের কাছাকাছি অপেক্ষা করতে লাগল শৌরসেনী, আর ভাবতে লাগল ওখানে কি তুমুল কাণ্ড হচ্ছে আজ। এদিকে গোল-বৈঠকে আর এক নাটকের অভিনয় হয়ে গেল। মহেন্দ্রনাথ যখন অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলেন তখন রঞ্জাবতী ধীরে ধীরে পরদা সরিয়ে ভিতরে

সন্তর্পণে উঁকি দিল একবার। চোখাচোখি হয়ে গেল মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে। মহেন্দ্রনাথও উঠে দাঁড়ালেন সঙ্গে সঙ্গে। ওই নীলাম্বরী, ওই ফুলের-মালা জড়ানো সর্পিল বেণী তো তিনি দেখেছেন আর একদিন।

"শুনুন—"

ক্ষণকাল আনত-নেত্রে দাঁড়িয়ে রইল রঞ্জাবতী, তারপর সরমশঙ্কিত ধীর পদক্ষেপে ভিতরে এসে ঢুকল। মহেন্দ্রনাথের সন্দেহমাত্র হল না এই রূপসী মহারাণী ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে।

সাগ্রহে তার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

"আজ যে এ সৌভাগ্য হবে তা আসবার সময় কল্পনাও করতে পারিনি।"

রঞ্জাবতীর মাথা আর একটু নত হল।

আর একটু এগিয়ে গেলেন মহেন্দ্রনাথ।

"দুটি খুব গুরুতর প্রয়োজনে হঠাৎ আসতে হল আজ। খবর দেবার সময় পাইনি। কালেকটার সাহেব খবর পাঠিয়েছেন যে তাদের চর নাকি সন্ধান এনেছে নানাসাহেব এই অঞ্চলেই কোথাও আত্মগোপন করে আছে, আমরা যেন তাকে ধরবার সমুচিত চেষ্টা করি। আমি বাইরে দামামা পিটিয়ে আমাদের জমিদারীতে একথা ঘোষণা করে দিয়েছি, কিশোরীবাবুকেও বলে গেলাম তাই করতে। এসব করতেই হবে লোক-দেখানো। কিন্তু সত্যই আমরা চাই না যে নানা সাহেবের মতো বীর ইংরেজের হাতে ধরা পড়ুক। খবর পেয়েছি নানাসাহেব দু'এক জায়গায় নাকি অন্দরমহলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাই আপনাকে বলতে এলাম যদি আপনার অন্দরে এসে পড়েন—"

রঞ্জাবতী মৃদুকণ্ঠে বললে, "আমাকে আপনি বলে আর লজ্জা দেবেন না।"

অভিভূত হয়ে পড়লে মহেন্দ্রনাথ।

তারপর মৃদু হেসে বললেন, "এই কথা শোনবার প্রত্যাশাতেই তো এতকাল কাটিয়েছি। বেশ, তাই হোক তাহলে। তোমাকে বলে যাচ্ছি নানাসাহেব হঠাৎ যদি তোমার অন্দরে এসে পড়েন, তাঁকে লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থাটা কোরো। আমার সাহায্যের যদি প্রয়োজন হয়, খবর পাঠিও।"

রঞ্জাবতী চুপ করে রইল।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে মহেন্দ্রনাথ বললেন, "আমার দ্বিতীয় খবরটি খুব মর্মান্তিক। বেদানা কাল রাত্রে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। এই চিঠিখানা লিখে রেখে গেছে। পড়ছি শোন।"

মহেন্দ্রনাথ পড়তে লাগলেন।

মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় প্রবল প্রতাপেষু—

অসংখ্য প্রণামান্তে দাসীর বিনীত নিবেদন, পাখী অনেকদিন পূর্বেই উড়িয়া গিয়াছে

জানিতাম, কিন্তু তবু আশা করিয়াছিলাম হয়তো সে আবার আসিয়া, তাহার সোনার খাঁচাটিতে ঢুকিবে। সেই আশাতেই অনেক দিন কাটিয়া গেল। কিন্তু সে আর আসিল না। ইহাও বুঝিয়াছি আর আসিবে না। তাই স্থির করিলাম আপনার সুখের পথে কণ্টক হইয়া আর আমি থাকিব না। ফুলের পাপড়ি অনেকদিন আগেই ঝরিয়া গিয়াছে, এখন যাহা আছে তাহা কেবল কাঁটা। আমি আপনার নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি তাহা অমূল্য সম্পদ, তাহাতেই আমি কৃতার্থ, তাহা লইয়াই বাকি জীবনটা আমার কাটিয়ে যাইবে। আপনার কৃপায় আমার আর্থিক অভাবও নাই। তাই আমি আমার ছেলেমেয়েদের লইয়া চলিলাম। যদি উহাদের মানুষ করিতে পারি, উহাদের পিতৃত্ব আপনি যদি ভবিষ্যতে স্বীকার করেন, উহারা আপনার কাছে ফিরিয়া আসিবে। আমি চলিলাম। শেষ অনুরোধ, আমাকে আর খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবেন না। অমার অসংখ্য প্রণাম লউন। ইতি বেদানা।

চিঠি পড়া শেষ করে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন মহেন্দ্রনাথ।

"চিঠিটা তোমার কাছেই রেখে দাও। বিশ্বাস কর এ চিঠি সে নিজেই লিখেছে, আমি তাকে দিয়ে লেখাইনি।"

চিঠি হাতে করে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে রইল রঙ্গাবতী।

আর একটু অপেক্ষা করে মহেন্দ্রনাথ বললেন, "বেদানাই আমাদের মিলনের বাধা ছিল। সে যখন স্বেচ্ছায় সরে গেল তখন আমি আশা করতে পারি কি—"

রঙ্গাবতী মাথা নত করল আবার।

মহেন্দ্রনাথ আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না, আবেগভরে তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলেন।

মহেন্দ্রনাথ গোলঘর থেকে যখন বেরিয়ে গেলেন তখন বাইরের দালানে আর কাউকে দেখতে পেলেন না। নীচে নেমে দেখলেন শৌরসেনী তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির কাছে। তার সঙ্গে তিনি বেরিয়ে গেলেন। তিনি জানতেও পারলেন না, যে মহাবাণী পরদার আড়াল থেকে সব দেখেছিল সব শুনেছিল। শুধু যে সেই দিনই জানতে পারলেন না তা নয়, অনেকদিন পর্যন্ত জানতে পারেননি।

তার পরদিনই মহাবাণী তাঁকে যে চিঠি পাঠিয়েছিল তা পড়ে তাঁর সামান্য একটু খটকা লেগেছিল অবশ্য। চিঠিতে সাক্ষাতের উল্লেখমাত্র ছিল না। মহাবাণী যা লিখেছিল তা-ও একটু অদ্ভুত ঠেকল তাঁর কাছে। মহাবাণী লিখেছিল, "একটি ভাল ছুতোর মিস্ত্রি চাই। আমাদের অনেকগুলো পালকি বে-মেরামত হয়ে পড়ে আছে। সেগুলোকে নিজের সামনে নিজের পছন্দ অনুসারে মেরামত করাব। মিস্ত্রিটি বিশ্বাসী হওয়া চাই, বোবা হলে আরও ভালো হয়।" বোবা মিস্ত্রী অবশ্য পাওয়া যায়নি, তবে একটি বিশ্বাসী লোককেই পাঠিয়েছিলেন মহেন্দ্রনাথ। যথাসময়ে খিড়কি বাগানের পশ্চিম-প্রান্তের খালি জায়গাটায় সারি সারি কুড়িটি পালকি জমা হল এবং মহাবাণীর তত্ত্বাবধানে সুবল মিস্ত্রী সেগুলি মেরামত করতে লাগল। ওই নিয়েই মেতে রইল মহারাণী কিছুদিন।

মুশকিলে পড়ে গেল রঞ্জাবতী। সেদিন মহেন্দ্রনাথ চলে যাবার পরই মহারাণীর ঘরে ডাক পড়ল তার।

ঘরে ঢুকতেই মহারাণী তাকে বললে, "তুমি ছিলে কুড়োনী, হয়েছ রঞ্জাবতী। আরও কিছু হবার ইচ্ছে আছে না কি? যদি থাকে আমি আপত্তি করব না, বেদানা মহল খালি হয়ে গেছে, স্বচ্ছন্দে তুমি সেখানে গিয়ে থাকতে পার। বড় কুমারকে খবর দিলেই তিনি পালকি পাঠিয়ে দিবেন—"

রঞ্জাবতী নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল মহারাণীর দিকে। তার চোখ দুটো বাঘিনীব চোখের মতো জ্বল জ্বল কবতে লাগল। কিন্তু রঞ্জাবতী বুদ্ধিমতী মেয়ে, তার চোখের ভাষা যাই হোক মুখেব ভাষায় বেরুল তা উত্তাপহীন। বরং অশ্রুর আভাসই যেন পাওয়া গেল তাতে।

"আমার দোষ হয়েছে, আমাকে মাপ করুন। আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না" - তারপর একটু থেমে বললে, "বিশ্বাস করুন, বড় কুমার নিজেই আমাকে ডেকেছিলেন। তাই—"

তার কথা শেষ করতে দিলে না মহারাণী।

"পুরুষ জাতটাই ওইরকম। ওদের পাগলামি থেকে বাঁচতে হলে ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে হয় এ বুদ্ধি যে তোমার নেই তা বিশ্বাস হয় না, যাই হোক আমাব কাছে যদি থাকতে চাও তাহলে ছাত থেকে নাবতে পাবে না। ওই ছাতেব ঘরেই তোমাব সব ব্যবস্থা করে নাও। ছাতের বাগান নিয়েই তুমি থাকো। নীচে আর তোমাকে যেন না দেখি—"

পরদিন থেকে রঞ্জাবতী প্রায় বন্দিনী হয়েই রইল ছাতেব ঘরে। তার জন্য আলাদা একটি দাসীও নিযুক্ত হল, আপাতদৃষ্টিতে রঞ্জাবতীব ফাই-ফবমাস খাটাবার জন্য, কিন্তু তার আসল কাজ হল রঞ্জাবতীর উপর কড়া নজর রাখা।

মহেন্দ্রনাথ এদিকে ক্রমশ বিস্মিত এবং অধীর হয়ে উঠছিলেন। রোজই প্রত্যাশা করছিলেন মহারাণীর ডাক আসবে। কিন্তু এক পক্ষ কেটে গেল কোন খবর পর্যন্ত এল না। বিনা নিমন্ত্রণে আবার যাওয়াটা শোভন হবে কি না, গেলেও কি অজুহাতে যাবেন এস সবই চিন্তা করছিলেন তিনি, এমন সময় কালেক্টাব সাহেবের কাছ থেকে জরুরি এক তলব এল, ছুটতে হল সদরে।

কালেক্টার আরও কয়েকজন জমিদারকেও ডেকেছিলেন। সাহেব বললেন, তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছেন যে নানাসাহেব এই অঞ্চলেই কোথাও আত্মগোপন করে আছেন। তাকে ধরতেই হবে যেমন করে হোক। এর জন্যে তিনি ফৌজ আনিয়ে রেখেছেন, খবর পাঠালেই যে কোন জমিদার সে ফৌজের সাহায্য পেতে পারবেন। আর যিনি তাকে ধরে দিতে পারবেন তিনি রাজাবাহাদুব খেতাব তো পাবেনই, রাজোচিত সম্মানও পাবেন গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে। মহাবাণীর প্রতিভূ হিসেবে কিশোরীমোহনও ছিলেন সেখানে। বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল খবরটা তিনি যেন নির্বিকার ভাবেই শুনছেন। কিন্তু মনে মনে তিনি মোটেই নির্বিকার ছিলেন না। তিনি ভাবছিলেন রঞ্জাবতী তাঁকে যে খবরটা দিয়েছে এই সুযোগে সেটা

কালেক্টাব সাহেবেব কর্ণগোচব কবলে কেমন হয। সাহেব এখন এই নিযে যে বকম ক্ষেপেছে হযতো টোপটা গিলতেও পাবে। অনেক ভেবে-চিন্তে কথাটা বলাই সাব্যস্ত কবলেন তিনি. শেষ পর্যন্ত একটু কৌশল কবতে হল। সব জমিদাববা যখন একে একে বিদায নিলেন, তখন তাঁদেব দেখিযে তাদেব সঙ্গে গেলেন তিনি কিছুদূব। তাবপব একটা গ্রামে নিজেদেব একটা কাছাবিতে ঢুকে পডলেন। সেখানে বিশ্রাম কবলেন একটু। তাবপব সন্ধ্যাব দিকে অন্ধকাবে আত্মগোপন কবে ফিবে গেলেন কালেকটাব সাহেবেব বাংলোয। বাংলোয পৌঁছতে বাতই হযে গেল একটু। চাপবাশিকে বখশিস দিতে হল খববটা দেবাব জন্য। বলে পাঠালেন মহাবাণী চৌধুবাণীব ম্যানেজাব জৰুবি দবকাবে একবাব দেখা কবতে চাইছেন। দেখা হল। কিন্তু কিশোবীমোহনেব হিসাবে একটু ভুল হযেছিল। অত কথা গুছিযে বলবাব মতো ইংবেজি জ্ঞান তাঁব ছিল না। তাই কথাটা তিনি সবাসবি কালেকটাব সাহেবেব কর্ণগোচব কবতে পাবলেন না। সাহেব একজন দো ভাষীকে ডাকলেন এ সম্ভাবনাটাব কথা আগে মনে হযনি তাব দো ভাষী বাঘব সিংহেব জবানীতেই অবশেষে বক্তব্যটা নিবেদন কবতে হল তাঁকে। কালেকটাব সাহেব খববটা শুনে ভ্রূকুঞ্চিত করে বইলেন খানিকক্ষণ। তাবপব ধন্যবাদ দিযে বললেন খববটা বিশ্বাস কবতে ইচ্ছা হয না, তবে এদেশে সবই সম্ভব। যাই হোক কিশোবীমোহন তাব সংবাদেব যাথার্থ্য প্রমাণ কববাব জন্যে যদি গর্ভনমেণ্টেব সাহায্য চান সবপ্রকাব সাহায্য পাবেন। ফৌজ চাইলে ফৌজও পাবেন। কিশোবীমোহন সেলাম কবে চলে এলেন

বাত অনেক হযেছিল একা পালকিব মধ্যে বসে ভাবতে ভাবতে চলেছিলেন তিনি। হঠাৎ ধাবমান অশ্বেব পদশব্দে চমকে উঠলেন। মুখ বাডিযে দেখলেন একজন অশ্বাবোহী দ্রুতবেগে মাঠ ভেঙে ছুটে চলেছে প্রকাণ্ড পাগডী, এছাডা তিনি আব কিছু দেখতে পেলেন না।

অশ্বাবোহীব নাম বাঘব সিংহ

পালকি সাবানো ব্যাপাব নিযে মহাবাণী মেতেছিল , তাব অন্য কাবণ যাই থাক একটা কাবণ সে নিজেকে ভুলে থাকতে চাইছিল। মহেন্দ্রনাথেব বলিষ্ঠ বাহুপাশে সেদিন বঞ্জাবতীকে দেখবাব সঙ্গে সঙ্গে তাব সমস্ত মন বিকল হযে গিযেছিল যেন। অহেতুকভাবে তাব কেবলি মনে হচ্ছিল মহেন্দ্রনাথ তাব সঙ্গে প্রতাবণা কবেছেন। এটা সে সুনিশ্চিত ভাবেই জানত যে মহেন্দ্রনাথকে সে কখনও বিযে কববে না, লম্পটেব লালসাব খোবাক হবাব প্রবৃত্তি নেই তাব কোনকালে। কিন্তু তবু মনে মনে সে মহেন্দ্রনাথকে নিজেব সম্পত্তি বলে গণ্য কবে বেখেছিল। মহেন্দ্রনাথ যে তাবই কৃপাকণা আহবণ কববাব জন্যে ভিক্ষুকেব মতো দিনেব পব দিন হাত পেতে বসে আছে এই ধাবণাটাকে সে মনে মনে এতদিন প্রশ্রয দিযেছিল. উপভোগও কবছিল। শ্রীহর্ষকেই সে ভালোবেসেছিল, কিন্তু পাযনি তাকে, সে দুর্লভ বলে তাকে পাবাব চেষ্টাও কবেনি, নাগালেব মধ্যে পেযেও তাকে ছেড়ে দিযেছিল কাবণ সে

বুঝেছিল যে যেমন করে তাকে পেতে চায় তেমন করে তাকে পাওয়া যাবে না, তার অহঙ্কৃত কামনার অনলে সে নিজের সমগ্র সত্তাকে ইন্ধনরূপে সমর্পণ করতে পারবে না, কারণ সে আত্মসম্মানী, সে প্রকৃত ব্রাহ্মণ। দুদিনের জন্যে উতলা হয়েছিল বটে, কিন্তু দুদিনেই মোহ কেটে যেত তার। আর তারপর লাঞ্ছিত অর্ধ-দগ্ধ মহত্ত্বের আর্তনাদে বিষময় হয়ে উঠত সব। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ ওর মতো দুর্লভ নন, বরং ঠিক উলটো। মহেন্দ্রনাথ ভোগী, কামনার খর স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়তে তাঁর বিন্দু-মাত্র আপত্তি নেই, এতটুকু দ্বিধা নেই, পড়েছেনও একাধিকবার আবার পড়বার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছেন। মহারাণী তাঁকে প্রশ্রয় দেবে না কিন্তু তবু তিনি যে তাকে ত্যাগ করে আর একজনের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন এ ও সহ্য করতে পারছিল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল আমি সারাজীবন বঞ্চিতই থেকে গেলাম যেমন করে চেয়েছিলাম তেমন করে কাউকেই পেলাম না। শ্রীহর্ষ অতি-পবিত্র, মহেন্দ্রনাথ উচ্ছিষ্ট, সম্পূর্ণরূপে আমার কেউ হল না। একটা মৌন হাহাকারে ভরে উঠেছিল তার বুক। একমাত্র সান্ত্বনা ছিল মহারাজ। তার কাছেই যাচ্ছিল বারবার। তার পিঠে চড়েই ঘুরে বেড়াচ্ছিল একা একা, তাকে অজস্র আদর করে, সম্পূর্ণরূপে পদানত করে তার বলিষ্ঠ সিংহ মহিমাকে পরিণত করবার চেষ্টা করছিল মেষ সুলভ বশ্যতায়। সে চেষ্টাও সফল হচ্ছিল না সব সময়।

হঠাৎ সে সর্বমঙ্গলার কাছে গেল আবার। কেন গেল তা বলা শক্ত। যাওয়ার কোন দরকার ছিল না। সর্মমঙ্গলা কত সুখে আছে তাই দেখবার জন্য হয়তো গেল। যে ক্ষুধিত সে অপরকে খেতে দেখলে তির্যকভাবে যে তৃপ্তিলাভ করে সেই তৃপ্তি লাভ করবার জন্যেই গেল হয়তো। কিম্বা হয়তো এই প্রশ্নের উত্তর আহরণ করবার জন্য গেল—আমি যাকে আয়ত্তাতীত মনে করেছিলাম সর্বমঙ্গলা কি তাকে আয়ত্তের মধ্যে পেয়েছে? হিমালয় কি হস্তামলক হয়েছে তার?

মাদ্রাজিনী মাহুত চালিত হস্তী শ্রীহর্ষের বাড়ির সামনে গিয়ে যখন থামল তখন সর্বমঙ্গলা রান্নাঘরে ছিল। হাতীর ঘন্টার শব্দে সে তাড়াতাড়ি জানলা খুলে দেখতে গেল কে এসেছে। জানলাটা কিন্তু এত এটে গিয়েছিল, খুলতে পারলে না সে। সামান্য একটু ফাক হল, তাই দিয়ে যা সে দেখতে পেলে তাতে শিউরে উঠল। তার মনে হল যেন প্রকাণ্ড একটা কালো সাপ ফণা তুলে রয়েছে। হাতীর বাঁকানো শুঁড়টাই শুধু চোখে পড়েছিল তার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বরকন্দাজের সাড়া পাওয়া গেল বাইরের দরজায়।

"রাণীমা এসেছেন—"

সর্বমঙ্গলা তাড়াতাড়ি একটা গামছা দিয়ে হাতটা মুছতে লাগল। হাতে মশলা লেগেছিল। মহারাণীর গলার স্বর শোনা গেল তারপর।

"কি গো, তোমাদের সব খবর কি?"

সর্বমঙ্গলা হাসিমুখে বললে, "আসুন। উনি কিন্তু বাড়ি নেই।"

"আমি তোমার কাছেই এসেছি। তোমার খবর নিতেই এলুম। আমার কথা তো ভুলেও মনে কর না একবারও"

কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে রইলে সর্বমঙ্গলা।

"খবর সব ভালো তো?"

"ভালোই"

"কি করছিলে?"

"রান্নাঘরে ছিলাম"

"রান্নায় বাধা দিলাম না কি। তাহলে তো ব্রাহ্মণের খাওয়া হবে না"

"রান্না হয়ে গেছে। পোস্তটা চড়িয়ে এসেছি, হয়ে গেছে, নাবিয়ে আসি—"

"চল দেখি কি কি রান্না করেছ।"

অকৃত্রিম কৌতূহল ভরে সর্বমঙ্গলার পিছু পিছু গেল মহারাণী। সমস্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে সে।

পরিচ্ছন্ন রান্নাঘরটি। অনেক তরকারি করেছে সর্বমঙ্গলা। শাকভাজা, উচ্ছে ভাজা সুক্তো, মোচার ঘন্ট, পোস্ত, ডাল। তাছাড়া বাসী মাছের টকও আছে।

"ভাত রান্না করনি?"

"উনি এলে চড়িয়ে দেব। ঠাণ্ডা ভাত ভালবাসেন না উনি। কখন যে ফিরবেন, ফিরবেন কিনা তারও তো ঠিক নেই।"

কোথা গেছে শ্রীহর্ষ?'

"রহিমগঞ্জে"

"সেখানে কেন?"

"আমার দূর সম্পর্কের এক ননদ মারা গেছে"

"তাই না কি। কি হয়েছিল?"

"গলায় দড়ি দিয়েছে"

"সে কি কেন?"

"স্বামী আবার বিয়ে করেছে বলে"

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনিয়ে এল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

সর্বমঙ্গলা পোস্তটা নাবিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখলে। তারপর হাত ধুয়ে বললে, " চলুন, ওঘরে যাই —"

এই শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদটা ছায়া ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়াতে লাগল মহারাণীর মনে। এর আগে অনেক মৃত্যুর সংবাদ শুনেছে সে। মৃত্যুর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ও হয়েছে তার। বাবার মৃত্যুই স্বচক্ষে দেখেছে সে। সেই কথাই মনে পড়ল আবার। মৃত্যুর দিন কয়েক আগে সমুদ্রবিলাসের চোখ দুটো লাল হয়ে গিয়েছিল, চোখের মণি যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল, মরবার আগে সর্বগ্রাসী দৃষ্টি দিয়ে তিনি যেন পৃথিবীকে শেষ দেখা দেখে নিচ্ছিলেন। কোন ওষুধ খাননি, গঙ্গাজলও না, কেবল মদ, মদ আর মদ। বিশেষ কোনও কথাও বলতেন না, নির্নিমেষে চেয়ে থাকতেন কেবল। মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে একবার "এই হো—" বলে

চীৎকার করে উঠেছিলেন, চাকর, বাকররা ছুটে এসেছিল, কিন্তু তাদের কোনো হুকুম দেননি আর। দীনা বাইজি কাছে বসেছিল, তাকে চোখের ইঙ্গিতে বললেন গান গাইতে। দীনা বাইজি বেহাগ আলাপ করতে লাগল, বেহাগ শুনতে শুনতেই মৃত্যু হল তাঁর।.. শান্ত পিসির মৃত্যুও দেখেছিল মহারাণী। শান্ত পিসী কেমন যেন আস্তে আস্তে ফুরিয়ে গেলেন। জীবনের শিখা একটু একটু করে কমতে কমতে ধীরে ধীরে নিবে গেল।... আজকের এই মৃত্যু সংবাদটা একটা বিশেষ রূপে যেন অভিভূত করল তাকে। শোক নয়, দুঃখ নয়, শ্রীহর্ষের দূর-সম্পর্কের যে বোন ছিল তা সে জানতও না, কিন্তু স্বামী আবার বিয়ে করেছে বলে যে অভাগিনী গলায় দড়ি দিয়ে প্রতিবাদ করে গেল, তার অশরীরী অদেখা চেহারাটা যেন ছায়া ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়াতে লাগল তার মনে।

শোবার ঘরে এসে তাই সর্বমঙ্গলাকে যা সে বলল তাতে সর্বমঙ্গলা অবাক হয়ে গেল একটু।

"নমস্য লোক তোমার ওই ননদ"

"আপনি চিনতেন না কি তাঁকে?"

"না। অমানুষ স্বামীর সঙ্গ এমনভাবে ত্যাগ করতে পেরেছে বলেই নমস্য বলছি তাকে। মরবে তো সবাই একদিন, কিন্তু নিজের মান বাঁচাবার জন্যে যে মরতে পারে সেই তো নমস্য। পদ্মিনীর কথা শুনেছ?"

"শুনেছি"

"ওরা সব একজাতের। আহা, আমিও যদি অমন ভাবে মরবার সুযোগ পাই—"

কথাটা শুনে অবাক হল সর্বমঙ্গলা। মহারাণীর সম্বন্ধে তার যে ধারণা এতদিন ছিল সেটা হঠাৎ যেন বদলে গেল।

মহারাণী আবার বলল, "কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই সব জিনিস হয় না। ভাগ্য থাকা চাই।"

সর্বমঙ্গলা উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মহারাণীর দিকে। তার চোখে যে দীপ্তি ফুটে উঠেছিল সেই মুহূর্তে তা বোধ হয় সে নিজে জানতে পারেনি। মহারাণী কিন্তু লক্ষ্য করেছিল, সে উজ্জ্বল দৃষ্টির দীপ্তি অনেকদিন আলোকিত করে রেখেছিল তার মনকে।

এ প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল অন্য কথায়।

মহারাণী জিগ্যেস করল, "তোমাদের পাতাল-ঘর কেমন হল?"

"ভালই চলুন না দেখবেন"

"চল"

যেদিন মহারাণী রুপোর পালকিতে চড়ে সর্বমঙ্গলাকে গয়না পরাতে এসেছিল সেইদিনই সূচনা হয়েছিল এই পাতাল ঘরের। শ্রীহর্ষ বলেছিল, "তুমি ক্রমাগত এত দামী দামী গয়না কাপড় দিয়ে যাচ্ছ, কিন্তু আমি এসব রাখব কোথা। আমাদের তো ওই দুটি প্যাঁটরা মাত্র সম্বল। চোর ডাকাতে নিয়ে যাবে যে—" মহারাণী বলেছিল, "সে ব্যবস্থাও হবে" তার পরদিনই মিস্ত্রি এসেছিল মাটির নীচে মজবুত পাকা পাতাল-ঘর নির্মাণ করবার জন্য। একটা

ঘবেব মেজে খুঁড়ে ভূগর্ভে নির্মিত হয়েছিল ঘবটি। অথচ বাইবেব থেকে বোঝবাব উপায ছিল না, মেজেব নীচে অতবড একটা ঘব বযেছে। পাতাল ঘবে নেবে মহাবাণী চাবদিকে চেয়ে চেয়ে দেখল।

'বেশ হয়েছে ঘবটি। পছন্দ হয়েছে তো?''

''আপনি যখন কবিয়ে দিয়েছেন তখন অপছন্দ হবাব কি আছে?''

ঘব ভালই হয়েছে তবে

থেমে গেল সর্বমঙ্গলা।

''তবে আবাব কি?''

''এই ঘবটায নাবলেই কেমন যেন গা ছমছম কবে আমাব। মনে হয কোন বিপদ লুকিয়ে আছে এব ভিতবে।

তাব মানে ভীতুব শিবোমণি তুমি। চল ওপবে যাই

সেদিন অনেকক্ষণ ছিল মহাবাণী সর্বমঙ্গলাব কাছে। উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল তাব যা স জানতে গিয়েছিল তা জেনেই ফিবেছিল। শ্রীহর্ষকে পেয়ে সর্বমঙ্গলা সুখী হযনি। শ্রীহর্ষকে বুঝতে পাবেনি সে ঠিক। কাছে পেয়েও যেন পাযনি, সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে, অথচ ভয়েব কাবণটা যে কি তা ও জানে না। এমন দিনও না কি গেছে যে শ্রীহর্ষ সমস্ত দিন একটি কথাও বলেনি তাব সঙ্গে, পুঁথি নিয়ে ছাত্রদেব নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। প্রয়োজন ছাড়া কথাই বলে না। বাত্রে কখন যে শুতে আসে সর্বমঙ্গলা টেব পায না সব সময়ে। আলাদা বিছানায় শোয শ্রীহর্ষ বলে একসঙ্গে শুলে তাব না কি ঘুম হয না। খাওযাব সমযও অন্যমনস্ক হয়ে থাকে সামনে যা দেওযা যায তাই খেয়ে নেয। বান্না ভালো হলে প্রশংসাও কবে না, খাবাপ হলে বকাবকিও কবে না। ফেববাব সময হাওদাব উপব মখমলেব তাকিযায ঠেস দিয়ে আকাশেব মেঘ স্তূপেব দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মহাবাণী ভাবছিল - শ্রীহর্ষকে পাওযা অত সোজা নয। আমি ওকে চিনেছিলাম বলেই ছেড়ে দিয়েছি। ও মহাদেব, অনেক তপস্যা কবলে তবে ওকে পাওযা যায। অত তপস্যা আমাব পোষাবে না বলেই ছেড়ে দিয়েছি ওকে। আমাব স্বামী আমাকে পাবাব জন্যেই তপস্যা কববে। আমি তপস্যা কবব কেন। কিন্তু কোথায সে? কোথাও সে আছে কি? আকাশেব পটে শ্রীহর্ষেব মুখখানাই ফুটে উঠল ধীবে ধীবে। তাবপব তাব সমস্ত মন আনন্দে ভবে উঠল—সর্বমঙ্গলা তাহলে পাযনি। মন্দিব প্রদক্ষিণই কবছে কেবল, মন্দিবে ঢোকবাব দ্বাব খুঁজে পাযনি এখনও। হঠাৎ তাব মনে হল, আমিও কি পেয়েছি? কখনও কি পাব? ও মন্দিবেব কোন দ্বাব আছে কি?

মহেন্দ্রনাথ শেষে বিনা নিমন্ত্রণেই এলেন একদিন। তাঁব ধৈর্য সীমা অতিক্রম কবেছিল। নানাসাহেবেব অজুহাত নিয়েই এলেন। অজুহাতটা অবশ্য সম্পূর্ণ কাল্পনিকও ছিল না। প্রায বিশ ক্রোশ দূবে বৃটিশ ফৌজ বহড়া গ্রাম ঘেবাও কবেছিল নানাসাহেব সে গ্রামে আছেন এই সন্দেহ কবে। একজন শৈব সন্ন্যাসীকে ধবেও নিয়ে গিয়েছিল তাবা, তাব উপব অত্যাচাবও

করেছে যথেষ্ট। রহড়ার জমিদার কুলেশ বাঁড়ুয়্যে নিজে জামিন হয়ে শেষে তাকে উদ্ধার করেছেন। এসব খবর মহারাণীকে বলবার মতো বইকি। শৌরসেনী যথারীতি মহেন্দ্রনাথকে গোল বৈঠকে নিয়ে গেল। পানের ডিবে, আতরদান প্রভৃতি সামনে সাজিয়ে দিয়ে নম্র মৃদু কণ্ঠে বলল, "রাণীমা এসেছেন, আপনি কথা বলুন—"

বলা বাহুল্য, এবার ঠিক এ ধরণের অভ্যর্থনা প্রত্যাশা করেননি মহেন্দ্রনাথ। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইলেন ক্ষণকাল, তারপর এক খিলি পান বার করলেন ডিবে থেকে, শূন্যে সেটা ধরে রইলেন ক্ষণকাল, তারপর কি ভেবে আবার রেখে দিলেন সেটা। গোঁফে তা দিলেন একবার, তারপর একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে বললেন, "নানাসাহেব যে এ অঞ্চলে এসেছেন তাতে সন্দেহ নেই। রহড়ায় গভর্নমেন্টের ফৌজ গিয়েছিল। তোমাকে তাই সাবধান করে দেওয়া কর্তব্য মনে করলাম"

মহেন্দ্রনাথ এতদিন 'আপনি' বলে এসেছেন, কিন্তু সেদিনের ঘটনা স্মরণ করে 'তুমি' বলাই সমীচীন মনে করলেন।

পরদার ওপার থেকে উত্তর এল, "আপনিই তো আমার একমাত্র ভরসা। যেমন বলবেন, তেমনি করব।"

"তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি না। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না। সেদিন পরদা সরে গিয়েছিল আজ আবার পরদা কেন?"

মহারাণীর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল পরদার ওপারে।

"তবে সেদিন জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখলাম না কি?"

"না। আমার ছাত বাগানের মালিনী রঞ্জাবতীকে দেখেছিলেন। সে আপনার অনুগ্রহ লাভ করে কৃতার্থ হয়ে গেছে —" তারপর একটু থেমে বলল, "তাকে ডেকে পাঠাব কি?"

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মহেন্দ্রনাথ। ক্ষণকাল নির্বাক হয়ে রইলেন। তারপর ক্রোধে আপাদ মস্তক জ্বলে উঠল তাঁর। দেখতে দেখতে সমস্ত মুখখানা লাল হয়ে গেল, অগ্নিবর্ষী হয়ে উঠল চোখের দৃষ্টি। মহারাণীর যেমন মনে হয়েছিল তাঁরও তেমনি মনে হল, তিনি প্রতারিত হয়েছেন।

গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "আমার সঙ্গে এরকম চাতুরী করবার অর্থ কি বুঝতে পারছি না।"

"ভগবান সাক্ষী, আমি কোনও চাতুরী করিনি। রঞ্জাবতী পরদা সরিয়ে উঁকি দিয়েছিল, তারপর আপনি না কি তাকে ডেকেছিলেন। আপনার আদেশ অমান্য করা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে, কারণ আপনি আমার সম্মানিত অতিথি আর সে পরিচারিকা মাত্র। আমি তখন এখানে ছিলামও না, ছিলাম খিড়কি বাগানে। এসে দেখলাম আপনি ওর সঙ্গে আলাপ করছেন। তখন আপনাকে বাধা দেওয়া রুচিবিরুদ্ধ মনে হয়েছিল আমার—"

মহেন্দ্রনাথ কোনও উত্তর দিলেন না।

মহারাণী বলল, "আপনি যদি আদেশ করেন, রঞ্জাবতীকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। মনে হয় সে-ও আপনার সঙ্গ লাভ করবার জন্যে উৎসুক"

নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়ে গেল মহেন্দ্রনাথের। আরও কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন তিনি। তারপর সহসা তাঁর চোখের কোণে হাসির দীপ্তি ফুটে উঠল, সুস্থ রস বোধ জাগ্রত হল মনে। ক্রোধের মেঘ হঠাৎ কেটে গেল। মৃদু হেসে উপমার সাহায্যে উত্তর দিলেন তিনি।

"মণিভ্রমে কাচে হাত দিতে গিয়েছিলাম। ভুলটা যখন ভেঙে গেল তখন হাত গুটিয়ে নিচ্ছি। আসল হীরাকেই শিরোভূষণ করব, যদি অবশ্য পাই। দেবীর জন্যেই পূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে রেখেছি। তোমাকেই চাই আমি।"

"আমাকে যদি দেবীর মর্যাদাই দিলেন তাহলে উচ্ছিষ্ট ভোগ নিবেদন করছেন কেন?। আমি দেবী নই, সামান্য মানবী, আমারও উচ্ছিষ্টে রুচি নেই।"

আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন মহেন্দ্রনাথ। আবার তাঁর চোখের দৃষ্টিতে ধক ধক করে আগুন জ্বলে উঠল

"একটা কথা তোমাকে স্মরণ রাখতে অনুরোধ করছি মহারাণী। আমি যদি এই মুহূর্তে উঠে পরদা সরিয়ে জোর করে তোমাকে দখল করি কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না।"

"মহারাজ জবাব দাও এ কথার -"

বজ্রগর্জনে সমস্ত গোল বৈঠকটা থর থর করে কেঁপে উঠল। মহেন্দ্রনাথের হৃদস্পন্দন থেমে গেল মুহূর্তের জন্য। কিন্তু নিজের অভব্য উক্তির জন্য পরমুহূর্তেই লজ্জিত হয়ে পড়লেন তিনি।

বললেন, "সিংহকে ভয় করি না। কিন্তু নিজের এই আত্মবিস্মৃতির জন্য লজ্জিত হয়েছি। ক্ষমা চাইছি "

পরদার ওপার থেকে কোন জবাব এল না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে মহেন্দ্রনাথ উঠে গেলেন। সিঁড়ির নীচে সম্বৃতবাসা শৌরসেনী নত নেত্রে দাঁড়িয়েছিল, তাঁকে অন্দরমহলের সীমানা পার করে দিয়ে ফিরে এল।

সেদিন এ ঘটনাটা যদি না ঘটত তাহলে পরবর্তী ঘটনাগুলোর চেহারা বদলে যেত হয়তো হয়তো মহারাণী মহেন্দ্রনাথের সাহায্য চাইত, হয়তো মহেন্দ্রনাথের লাঠি সড়কি বন্দুকধারী বরকন্দাজের দল রৈ রৈ করে ছুটে আসত তাকে রক্ষা করতে। কিন্তু এ ঘটনার পর তা আর সম্ভবপর হল না।

এর পরদিনই যে ঘটনাটি ঘটল তা আপাতদৃষ্টিতে খুবই সাধারণ ঘটনা। কিন্তু তার ফল যা হল তাতে ওলট-পালট হয়ে গেল সব। পরদিন বাইরের মহলে বহুরূপী এল একজন, ফুলের গয়না পরে, সুন্দর একটি ফুলের সাজি নিয়ে, মালিনী সেজে। নেচে গেয়ে এমন জমিয়ে ফেললে সে যে ভীড় জমে গেল। সেরেস্তার বুড়ো কর্মচারীরাও কানে কলম গোঁজা অবস্থায় বেরিয়ে এসে তার নাচ দেখতে লাগল। নাচ যখন শেষ হয়ে গেল তখন মালিনী নায়েব মশায়ের কাছে নিবেদন জানাল সে অন্দরে গিয়ে রাণীমাকেও নাচ দেখাতে চায়।

নায়েব মশাই গোঁফ চুলকে বললেন, "সেদিন আর নেই হে যে হুট বলতেই অন্দরে ঢুকে পড়বে। আজকাল পুরুষ চাকর পর্যন্ত বিনা হুকুমে অন্দরে ঢুকতে পায় না। খুব কড়াক্কড়ি আজকাল।"

"হুজুর চেষ্টা করলে হুকুম নিশ্চয় পাব। হুজুরের কথায় কি 'না' বলবেন রাণীমা—"

তোষামোদে তুষ্ট হয়ে নায়েব মশাই হুকুম করলেন, "তেওয়ারি, অন্দরের ঘণ্টার দড়িটা টেনে দাও তো। কেউ এলে বলে দাও একজন বহুরূপী রাণীমাকে নাচ-গান দেখাতে চায়—"। ঘন্টার শব্দে শৌরসেনীই বেরিয়ে এসেছিল কপাট খুলে। বহুরূপীর কথা শুনে সে-ও উৎসাহিত হল খুব। একটু পরেই খবর এল মহারাণী বহুরূপীকে অন্দরে যেতে হুকুম দিয়েছেন। অন্দরেও বহুরূপী জমিয়ে ফেললে খুব। গানের গলাও তার যেমন মধুর, নাচও তেমনি সুন্দর। তার বিদ্যাসুন্দরের গান আর পদাবলী কীর্তন শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল মহারাণী দ্বিতলের অলিন্দে চিকের আড়ালে বসে ছিল। তারও খুব ভাল লাগল, বিশেষ করে পদাবলী কীর্তনগুলি। গান শেষ হয়ে গেলে শৌরসেনীর হাতে দুটি মোহর দিয়ে সে বলল, "চমৎকার গেয়েছে। দিয়ে আয় ওকে—"

শৌরসেনী নেবে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে যা বলল তা প্রত্যাশা করেনি মহারাণী।

"বহুরূপী আপনাকে প্রণাম করতে চাইছে। নিয়ে আসব এখানে?"

"নিয়ে আয়।"

বহুরূপী এসে ভক্তিভরে প্রণাম করল মহারাণীকে। তারপর সসঙ্কোচে বলল, "এই ফুলগুলি আমি তৈরী করে এনেছি আপনার চরণে উপহার দেব বলে।"

সাজিটি মহারাণীর পায়ের কাছে রেখে হাত জোড় করে বসে রইল সে।

সাজিতে শোলার তৈরি নানান রকম সুদৃশ্য ফুল ছিল, একটি পদ্ম কলিও ছিল।

"তুমি তৈরী করেছ? বাঃ চমৎকার তো, ভারী খুশী হলাম তোমাকে দেখে। বাড়ি কোথা তোমার?"

"ডিহি দরিয়াপুর—"

ভ্রূকুঞ্চিত হল মহারাণীর। নামটা যেন শোনা মনে হচ্ছে। কিন্তু ঠিক মনে পড়ল না তখন।

বহুরূপী প্রণাম করে চলে গেল। ফুলের সাজিটা দালানের এককোণেই পড়ে রইল অনেকক্ষণ। মহারাণী শিব-মন্দিরের কাজ সেরে যখন ফিরে এল তখন শৌরসেনী বলল, "ফুলগুলো কি আপনার ঘরে দিয়ে আসব, না গোল বৈঠকে সাজিয়ে দেব।"

"আমার ঘরেই দিয়ে আয়। পুতুলের আলমারিতে রেখে দেব। বেশ করেছে ফুলগুলি— "

মহারাণীর পুতুলের আলমারিতে হাত দেবার হুকুম ছিল না কারও। ছেলেবেলার অনেক স্মৃতি সাজানো ছিল ওই আলমারিটির মধ্যে। মহারাণী নিজেই খুলত সেটি মাঝে মাঝে। শৌরসেনী মহারাণীর ঘরে সাজিটি রেখে এল। খানিকক্ষণ পরে মহারাণী সাজিটি আলমারিতে রাখতে গিয়ে দেখল সাজিটি আলমারির তাকে আঁটছে না, ফুলগুলি আলাদা আলাদা করে রাখতে হবে। তাই করতে গিয়ে ফুলের তলা থেকে বেরিয়ে পড়ল সাপ। ফুলের তলায় পানের ডিবের মতো রুপোর কৌটো ছিল একটি। তার ভিতর ছিল এই চিঠিখানি।

"মহারাণী, আশা করি আমার কথা মনে আছে। আমি বলে এসেছিলাম আমার দাবী নিয়ে আবার আমি আসব। এবার হতাশ হয়ে ফেরবার ইচ্ছে নেই, সঙ্গে চতুর্দোলা, পুরোহিত

নিয়েই যাব। শতাধিক, সশস্ত্র লোকও থাকবে সঙ্গে। আগামী অমাবস্যা রাত্রে আপনার আতিথ্য গ্রহণ করব। সাক্ষাতে সব কথা হবে। ইতি—উদয়প্রতাপ"

অন্য মেয়ে হলে হৈ চৈ করে উঠত। কিন্তু মহারাণী নীরব হয়ে গেল! ভাবতে লাগল কি করা উচিত। মহেন্দ্রনাথের যে আচরণ কাল প্রকট হয়ে পড়েছে তারপর আর তাঁর কাছে সাহায্য ভিক্ষা করা যায় না। তার নিজের বাইরের মহলে যে কটি বরকন্দাজ আছে তারা শতাধিক সশস্ত্র লোককে রুখতে পারবে না, যদি চেষ্টা করে তাহলে তারা, অনর্থক রক্তারক্তি হবে, লাভ হবে না কোনও। শেষ পর্যন্ত ওদের হারিয়ে দিয়ে প্রতাপ জোর করে অন্দরমহলে ঢুকবে, বলাৎকার করতেও দ্বিধা করবে না। ডিহি-দরিয়াপুরের যে দাসীটি তখন অন্দরমহলে চুল বাঁধুনী হয়েছিল সে নিম্নকণ্ঠে উদয়প্রতাপের যে পরিচয় দিয়েছিল তা ভয়ানক। তার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে নিজের কার্যসিদ্ধি করবার জন্যে উদয়প্রতাপ হীনতম উপায় অবলম্বন করতেও কুণ্ঠিত হবে না, জোর করেই তাকে চতুর্দোলায় টেনে তুলবে। ডিহি দরিয়াপুরের চাকরানীটি বলেছিল ও ডাকাতের সর্দার একজন। ডাকাতি করেই অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছে, ওর দলের লোক সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে, যখন যেখানে খুশী ডাকাতি করে বেড়ায়। নিজের কার্য সিদ্ধির জন্য কোনও কিছুতেই পশ্চাৎপদ হবে না সে। কিছুদিন আগে চাকরানীটি ছুটি নিয়ে দেশে গেছে, এখনও ফেরেনি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মহারাণী ভাবতে লাগল কি করলে সব দিক রক্ষা হয়। অনেক ভেবে অবশেষে সে ঠিক করলে গভর্নমেণ্টের সাহায্য নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিশোরীকাকা যদি নিজে গিয়ে খবরটা কালেকটার সাহেবকে বলে আসেন তাহলে তিনি কি মহারাণীর মান-সম্ভ্রম রক্ষা করবার জন্য ব্যবস্থা করবেন না?

আর চারদিন পরে অমাবস্যা। হাতে বেশী সময় নেই।....মহারাণী ভ্রূকুঞ্চিত করে রইল খানিকক্ষণ, তারপর কিশোরীকাকার খোঁজে পাঠাল শৌরসেনীকে।

শৌরসেনী ফিরে এসে বলল, তিনি খাজনা আদায় করবার জন্যে মহালে মহালে ঘুরছেন। কবে ফিরবেন ঠিক নেই।

কিন্তু সেইদিন রাত্রেই এমন আর একটি ঘটনা ঘটল যে কালেকটার সাহেবকে খবর দেওয়ার কল্পনা বিসর্জন দিতে হল।

সেদিন কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদ উঠল অনেক রাত্রে।

মহারাণী বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিল, কিছুতে ঘুম আসছিল না। ঠিক ভয়ে নয়, অস্বস্তিতে। আর একটা অদ্ভুত জিনিসও হচ্ছিল তার, শ্রীহর্ষকে মনে পড়ছিল। সর্বক্ষণ সমস্ত মন জুড়ে বসেছিল সে। খবরটা পাওয়ার পর থেকে তার মন শ্রীহর্ষকে যেন আঁকড়ে ধরছিল। অথচ শ্রীহর্ষ এ ব্যাপারে কি-ই বা করতে পারে? এ খবর তাকে দেওয়াও বৃথা। দিলে হয়তো ব্যস্ত হয়ে উঠবে। (সত্যি হবে কি, মহারাণীর একবার মনে হল), হয়তো বলবে তুমি আমার বাড়িতে এসে থাক, হয়তো গ্রামের লোকদের এনে জড়ো করবে, হয়তো নিজেই চলে যাবে কালেকটার সাহেবের কাছে। খবরটা পেয়ে শ্রীহর্ষ যে কত কি করবে এই কল্পনাই

তার মনে প্রসারিত হচ্ছিল মেঘের মতো। এমন সময় খিড়কির বাগানে মহারাজের গর্জন শোনা গেল। একবার নয়, দুবার। তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসল মহারাণী। মহারাজ এ সময়ে ডাকছে কেন? অযৌক্তিকভাবে একটা অদ্ভুত কথা মনে হল তার। মহারাজ কি টের পেয়েছে আমি শ্রীহর্ষের কথা ভাবছি? হিংসে হল না কি ওর? আর একবার গর্জন শোনা গেল।

মহারাণী নেমে পড়ল বিছানা থেকে। তারপর কপাট খুলে বেরিয়ে গেল। দালানের অপরপ্রান্তে শৌরসেনীর ঘর। তার ঘরের বন্ধদ্বারের দিকে চেয়ে সে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। ওর ঘুম ভেঙ্গেছে কি? তার কোন লক্ষণ না দেখে একাই সন্তর্পণে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে, চলে গেল খিড়কির বাগানে। খিড়কির বাগানে ঢুকে কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে। এ কোথায় এল সে। এই কি তার খিড়কির বাগান? এসে মনে হচ্ছে অচেনা এক নূতন জগৎ। এ খিড়কির বাগান সে কোনদিন দেখেনি তো। গভীর রাত্রি থমথম করছে চতুর্দিকে, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে শিবমন্দিরের পিছনে, মন্দিরটাই মনে হচ্ছে যেন ধ্যানমগ্ন শিব। শিবের তন্ময়তার সুযোগ নিয়ে চাঁদ যেন ললাট ছেড়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে আকাশে। নাগলিঙ্গম গাছগুলো প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে, ফুলের ঝোপগুলো মনে হচ্ছে যেন পুঞ্জীভূত গোপন কথা, জ্যোৎস্নার কাছ থেকে কি যেন লুকিয়ে রাখতে চাইছে, জ্যোৎস্না কিন্তু লক্ষ্যও করছে না এসব, আকাশের ধ্যানেই সে নিমগ্ন, তার অজ্ঞাতসারেই তার মহিমা যেন ছড়িয়ে পড়েছে মাটিতে, সে এখনও আসেনি।

মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মহারাণী। এ কি নূতন সাজে সেজেছে তার খিড়কির বাগান। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল সে মহারাজের মহলের দিকে। গিয়ে দেখল মহারাজের দৃষ্টি শিব মন্দিরে নিবদ্ধ। একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সেদিকে।

"মহারাজ, কি হয়েছে?"

মহারাজ একলম্ফে চলে এলো মহারাণীর কাছে। মহারাণী যে এমন সময়ে আসবে তা প্রত্যাশাই করেনি সে। মহারাণী তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই তার স্বাভাবিক রীতিতে গরগর শব্দ করে সে আনন্দ প্রকাশ করল। তারপর সামনের পা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে মাথা হেঁট করে পিঠ পেতে দিল—ভাবটা উঠবে পিঠে? ওঠ না। মৃদু হেসে মহারাণী পিঠে চড়ল। তার মনে হল আজকের রাত্রির এই অদ্ভুত মায়া মহারাজাকেও যেন বদলে দিয়েছে। একটু যেন বেশী ভদ্র হয়েছে ও আজ। মহারাজের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কিছুক্ষণের জন্য সে উদয়প্রতাপের সাংঘাতিক চিঠির কথাও ভুলে গেল। তার কল্পনাও যেন পাখা মেলে উড়তে লাগল। মনে হল শ্রীহর্ষের অশরীরী প্রেম যেন আজ ভর করেছে মহারাজের উপর। মহারাজের মাধ্যমেই শ্রীহর্ষ যেন সানন্দে বহন করছে তাকে। কল্পনা করতে লাগল শ্রীহর্ষ ঘুমুচ্ছে, সর্বমঙ্গলার কাছে নয়, আলাদা খাটে। স্বপ্ন দেখছে কি? হঠাৎ মহারাণী দেখতে পেল কষ্টি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কষ্টিও জেগে আছে না কি এত রাত্রে? কি বলছে ও। মহারাজের পিঠ থেকে নেমে মহারাণী পশুমহল থেকে বেরিয়ে এল। কষ্টি আসছে না কেন? আবার হাতছানি দিয়ে ডাকল সে। মহারাণী এগিয়ে গেল, গিয়ে দেখল কষ্টি কাঁপছে।

"কি বলছিস?"

কষ্টি কিছু বললে না, আঙুল দিয়ে শিবমন্দিরটা দেখিয়ে দিলে কেবল।

"কি হয়েছে ওখানে?"

কষ্টির চোখ দুটো ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে গেল, মনে হল যেন জীবন্ত চোখ নয়, মনে হল শাদা পাথরের উপর থেকে কালো পরদা সরে যাচ্ছে যেন। আবার সে আঙুল দিয়ে শিবমন্দিরটা দেখাল।

কি হয়েছে মন্দিরে? মন্দিরের দিকেই এগিয়ে গেল মহারাণী। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠল কিছু দেখতে পেল না। আর একটু এগিয়ে যেতেই নজরে পড়ল কপাটের শিকলটা খোলা রয়েছে! নিজের হাতে রোজ সে শিকল তুলে দিয়ে যায়, আজ কি ভুলে গেছে? এরকম ভুল তো আর কোনদিন হয়না। কপাট খুলে ভিতরে ঢুকেও প্রথমে সে কিছু দেখতে পায়নি। আবছা জ্যোৎস্নায় শিবলিঙ্গটা দেখা গেল প্রথমে। তারপরই চমকে উঠল সে। শিবলিঙ্গের পিছনে এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"কে?"

গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর এল, "নানাসাহেব---"

নানাসাহেব! স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মহারাণী। পরমুহূর্তেই তার মনে হল সে যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রত্যাশা করছিল নানাসাহেব আসবেন। এ সম্ভাবনার ইঙ্গিত মহেন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন তাকে। যদি আসেন তাহলে সে কি করবে তা-ও ভেবে রেখেছিল সে তাই সুবল মিস্ত্রীকে দিয়ে পালকিগুলো মেরামত করিয়ে রেখেছে।

ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে নানাসাহেব যা বললেন তার সারমর্ম হচ্ছে, বৃটিশ পুলিশের তাড়ায় তিনি স্থান থেকে স্থানান্তরে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন শিকারীর তাড়ায় বন্য ব্যাঘ্র যেমন পালিয়ে বেড়ায় বন থেকে বনান্তরে। আজ নিরুপায় হয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন এই শিবমন্দিরে। তাঁর এক সঙ্গী তাঁকে বলে গেছে আগামী অমাবস্যা রাত্রে কামিনী নদীতে সে একটি নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করবে তাঁর জন্যে। নৌকোতে চড়তে পারলে মাঝির ছদ্মবেশে তিনি সহজে পালিয়ে যেতে পারবেন। সেই নৌকোটির জন্য অমাবস্যার রাত্রি পর্যন্ত তাঁকে আত্মগোপন করে থাকতে হবে এই অঞ্চলে। মা কি তাঁর সন্তানকে আশ্রয় দেবেন? যদি না দেন তাহলে এখনি তাঁকে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। কয়েকদিন আগে একজনের অন্দরমহলেই তিনি আশ্রয় পেয়েছিলেন। তাই সাহস করে এখানে ঢুকেছেন। তাঁর বিশ্বাস এ বিষয়ে পুরুষদের চেয়ে নারীরাই বেশী নির্ভরযোগ্য। মায়েরাই তো চিরকাল সন্তানদের রক্ষা করে এসেছেন, তাঁর ক্ষেত্রে যে এর ব্যতিক্রম হবে এ আশঙ্কা তাঁর নেই। এক মা যদি অসুবিধা বোধ করেন, আর এক মা দেবেন।

মহারাণী নির্বাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নানাসাহেবও চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

"আমি কি আশ্রয় পাব না? যদি আপনার অসুবিধা হয় আমি এখনই চলে যাচ্ছি—"

"না, আপনি থাকুন। যদি প্রয়োজন হয় প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব আপনাকে।"

নানাসাহেব হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন এবং তারপর প্রণাম কবলেন মহাবাণীকে। তাবপর উদ্ভাসিত মুখে বললেন, "এমন আশ্বাস মা ছাড়া আব কে দিতে পাবে। কপাটের ফাঁক দিযে আপনাকে অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছি আমি। আপনাকে দেখে প্রথমেই আমার কি মনে হযেছিল জানেন? মনে হয়েছিল আপনি বুঝি লছমীবাই, তার যে মৃত্যু সংবাদটা শুনেছি সেটা মিথ্যে। তাবপর যখন আপনি কাছাকাছি এলেন, যখন আপনাকে সিংহের পিঠে চড়ে বেড়াতে দেখলাম তখন আমার ভুল ভাঙল। বুঝলাম আপনি লছমীবাই নন, আপনি আরও অনেক বড়, আপনি স্বয়ং জগদ্ধাত্রী। মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি নির্ভয় হযে গেলাম। মনে হল যে মন্দিবে আজ আশ্রয় পেয়েছি সে মন্দিবেব শঙ্কব নিষ্প্রাণ পাথব নন, জাগ্রত দেবতা, তাই তাঁব শক্তি জগদ্ধাত্রীকে আজ জীবন্ত দেখলাম। আমাব আব কোন ভয় নেই—"

এই নাটকীয ব্যাপারে মহারাণী অপ্রস্তুত হযে পড়ল একটু।

সসঙ্কোচে বলল, "আপনি যা ভাবছেন তা আমি নই। সামান্য মেয়ে আমি, আপনাবই দেশেব মেয়ে, এর চেয়ে বড় পবিচয আমার আর কিছু নেই। আপনি এই মন্দিরে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন। আমার যথাসাধ্য আমি করব।"

তারপর মহাবাণী যা কবল তা সে জীবনে কখনও কবেনি। নানাসাহেবেব জন্য নিজেই সে বিছানা বয়ে নিয়ে এল, জলও নিযে এল একটা রূপোব ভৃঙ্গারে। নানাসাহেবেব কথা কাউকে সে জানতে দেবে না, নিজেই তাব সেবা করবে। মন্দিব সংলগ্ন ছোট যে ঘবটি ছিল তাতেই তাঁর থাকবাব জন্য ব্যবস্থা করে দিল সে। এমন কি কাপড় চোপড়ও দিযে গেল কিছু।

"আপনি এবার নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে বিশ্রাম করুন। এখানে আমি ছাড়া আব কেউ আসবে না।"

কষ্টি দূর থেকে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছিল সব। মহাবাণী জানত দেখলেও বাইবে তা প্রকাশ কববার ক্ষমতা ওর নেই। বাইরে ও যাযও না। তবু মহাবাণী তাকে বলে গেল "ওদিকে যাসনি। উনি আমার আপনার লোক—"

কিছুক্ষণ পরে নানাসাহেবের সমস্ত করে দিয়ে মহারাণী যখন নিজের ঘরে ফিরল তখনও নানাসাহেবেব এই কথাগুলো তার কানে বাজছিল—" যে মন্দিরে আজ আশ্রয় পেয়েছি সে মন্দিরের শঙ্কর নিষ্প্রাণ পাথর নন জাগ্রত দেবতা। তাই তাঁর শক্তি জগদ্ধাত্রীকেও আজ জীবন্ত দেখলাম।" সত্যিই কি তাকে জগদ্ধাত্রীর মতো দেখাচ্ছিল? আশ্চর্য তো। এই কথাটাই মনের মধ্যে সঞ্চরণ করে বেড়াতে লাগল নানা ভাবে। তারপর মনে হল উদয়প্রতাপেব কথা। নানাসাহেব যখন এসেছেন তখন তো কালেকটার সাহেবকে আর খবর দেওয়া যায় না। ডাকাতের সর্দারের হাতে আত্মসমর্পণ করতে হবে না কি শেষ পর্যন্ত?

না তা অসম্ভব।

উপায় একটা বার করাতেই হবে।

তার পরদিন সদর নায়েবের ডাক পড়ল মহারাণীর দরবারে।

কি বলছেন মা?"

"কিশোরীকাক ফিরেছেন কি?"

'না তবে আজই ফেরার কথা।'

'তাহলে আপনিই ব্যবস্থা করুন। আগামী অমাবস্যা রাত্রে বাইরে থেকে কিছু গণ্যমান্য অতিথি আসার কথা আছে। তাদের ভালো করে অভ্যর্থনা করতে হবে। আমাদের বাগান বাড়িটাও পরিষ্কার করিয়ে রাখুন। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা খুব ভালো হওয়া চাই।"

"যে আজ্ঞে। ক জন অতিথি আসবেন?"

তা একশ'র কম নয়। বেশীও হতে পারে। আপনি দু'শ লোকের জন্য ব্যবস্থা করুন।"

নায়েবের চোখ দুটো কপালে উঠে গেল।

"তাহলে তো পুকুরে জাল ফেলাতে হয়।"

"ফেলান। দুধ দই ক্ষীর আনবার জন্যে মহালে মহালে লোক পাঠিয়ে দিন। কয়েকজন ভালো রাঁধুনী চাই। ময়রাদেরও খবর দিন, বাড়ীতে ভিয়ান বসবে। নহবতখানাটাও সাজিয়ে ফেলতে বলুন—"

'নবত বসবে না কি?"

'হ্যাঁ।'

"তাহলে তো জমিরুদ্দিনকে খবর দিতে হয়।"

"অমাবস্যার দিন সকাল থেকেই সে আসুক তার লোকজন নিয়ে। হ্যাঁ আর একটা কাজ করতে হবে। সেদিন খুব ধুমধাম করে কালীপূজোও করব। সমস্ত বাড়িটা আলো দিয়ে সাজাতে হবে। কামার বাড়ি থেকে হাজার দুই প্রদীপও আনিয়ে নিন। আমাদের ঝাড়-লণ্ঠনগুলোও পরিষ্কার করিয়ে রাখুন।"

নায়েবমশাই উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিলেন। ঝঞ্ঝাটের কথা ভেবে বিব্রতও হচ্ছিলেন। একটু চেষ্টা করলেন যাতে ঝঞ্ঝাটটা কমে।

"অকালে দীপাবলী করবেন? কাল তো কালীপূজো নয়। শেষকালে কোন অমঙ্গল হবে না তো?"

"অকালবোধন করে শ্রীরামচন্দ্রের তো মঙ্গলই হয়েছিল। আপনি ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমি মানত করেছিলাম, সেই মানত শোধ করছি। অমঙ্গল হবে কেন তাতে? আপনি সব ব্যবস্থা করে ফেলুন। হ্যাঁ, আর একটা কথা। আমাদের পালকির বেয়ারা ক'জন আছে?"

"তা জন কুড়ি হবে।"

"আরও ষাট সত্তর জন বেয়ারা দরকার হবে যে সেদিন। আমাদের সব কটা পালকিই বেরুবে সেদিন। মেয়েরা সবাই নদীতে স্নান করতে যাবে সন্ধ্যাবেলা, তারপর সবাই অঞ্জলি দেবে। আর বেয়ারা পাওয়া যাবে না।"

"চেষ্টা করলে পাওয়া যাবে না কেন। তবে বেশী মজুরি চাইবে হয়তো— "

'বেশী মজুরিই দেবেন। অন্তত আশী পঁচাশী জন বেহারা সেদিন সন্ধ্যাবেলা হাজির থাকা চাই। কিশোরীকাকা যদি ফিরে আসেন বলবেন তাঁকে, আর তিনি যদি না ও এসে পৌঁছন আপনিই ব্যবস্থা করে ফেলবেন। আমার নামে খরচ লিখে আপনি শ'পাঁচেক টাকা এখুনি খাজাঞ্চিখানা থেকে নিয়ে নিন। আমি হুকুমনামা পাঠিয়ে দিচ্ছি যদি আরও দরকার হয় তা ও দেব। কিন্তু যা বললাম তা যেন সব ঠিক মতো হয়।"

টাকার অঙ্কটা শুনে নায়েব মশায় একটু আর্দ্র হলেন। কারণ তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন এই ধরণের খামখেয়ালী ব্যাপারে যে সব টাকা জলের মতো খরচ হয় তার পাই-পয়সা হিসেব কেউ চায় না, দেয়ও না। সমুদ্রবিলাসের আমলে এসব হামেসাই ঘটত। সেই বাপেরই বেটি তো, এ-ও শুরু করেছে এইবার। মনে মনে খুব খুশী হলেন তিনি।

মুখে বললেন, "তা হবে বইকি মা। আপনি যখন ইচ্ছা করছেন, সব হবে। আমি এখনই সব ব্যবস্থা করছি—"

সুদক্ষ সেনাপতিরা যেমন যুদ্ধের পরিকল্পনাটা আগে থাকতে নিখুঁত ভাবে করে রাখেন, মহারাণীও তেমনি সমস্ত রাত জেগে পরিকল্পনা করে ফেলেছিল একটা। নানাসাহেবের সঙ্গে দেখা হবার পর আর ঘুমোয়নি সে। সে ঠিক করেছিল উদয়প্রতাপের সঙ্গে ভদ্রতার চূড়ান্ত করবে। এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে তার ধারণা হয় যে বিবাহের আয়োজনই বুঝি করা হয়েছে। তারপর উদয়প্রতাপকে বলতে হবে যে বাড়ির মেয়েরা জল সইতে যাবে পালকি করে। এতে সম্ভবত সে আপত্তি করবে না। কুড়িটা পালকি যখন একে একে বেরিয়ে যাবে তখন একটা পালকিতে সে নানাসাহেবকে অনায়াসে বাড়ির বার করে দিতে পারবে। নানাসাহেব নির্বিঘ্নে বেরিয়ে গেলে তখন বোঝা পড়া করা যাবে উদয়প্রতাপের সঙ্গে। বুদ্ধির যুদ্ধে জিতবে কিনা সেটা নির্ভর করবে অবশ্য শ্রীহর্ষের অভিনয় দক্ষতার উপর।

মহারাণীর পরিকল্পনায় কিন্তু একটু খুঁত ছিল। ছাত বাগানে বন্দিনী বঞ্জাবতীর সম্ভাব্য প্রতিশোধের কথাটা কল্পনায় আসেনি তার। একথাও তার মনে ছিল না যে ছাতের যে ঘরে বঞ্জাবতী আছে সে ঘর থেকে শিব-মন্দিরের ভিতর পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। শিবমন্দিরে যে একজন অচেনা লোক এসে ঢুকেছে এটা বঞ্জাবতীও দেখতে পেয়েছিল রাত্রে।

মহারাজের গর্জনে তারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাতে এসে সে ও দাঁড়িয়েছিল তার কৌতূহল আরও বৃদ্ধি হল যখন যে দেখতে পেলে মহারাণীও খিড়কি বাগানে নেমে এসেছে। আড়িপাতা তার স্বভাব, নিজেকে আড়াল করে আলসের ফাঁক দিয়ে সব দেখেছিল সে। মহারাণী এত রাত্রে সিংহের মহলে এল কেন? তারপর সে দেখতে পেল কষ্টির হাতছানি। দেখল মহারাণী মন্দিরে গেল, মহারাণীর সঙ্গে মন্দির থেকে কে একজন বেরিয়ে এসে পাশের ঘরে ঢুকল। দেখল মহারাণী নিজে তার জন্যে বিছানা, খাবার, এমন কি জল পর্যন্ত বয়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ গোপনতা কাকে কেন্দ্র করে? নানাসাহেবের কথা সে আগেই শুনেছিল। ঘোর সন্দেহ হল তার।

মহারাণী অবার দোলনায় দুলছিল মনে মনে। সে দোলনা কখনও নিয়ে যাচ্ছিল তাকে

আকাশে, আবার পরমুহূর্তে নামিয়ে আনছিল মর্তে। শ্রীহর্ষ কি রাজী হবে না? হতেই হবে তাকে। এখন আসছে না কেন?

শৌরসেনীকে আবার ডাকল মহারাণী।

"শ্রীহর্ষকে কে ডাকতে গেছে?"

"নটবরকে পাঠিয়েছিলাম বাইরে থেকে।"

"এখনও আসছে না কেন? আবার লোক পাঠা। তুই না হয় নিজেই যা পালকিটা নিয়ে। আমি একটা চিঠিও দিচ্ছি।"

চিঠিতে একটি ছত্র শুধু লিখলে সে।

"অবিলম্বে চলে এস। জীবন মরণ সমস্যা।"

চিঠিখানা খামে পুরে বললে, "তার হাতেই দিবি এটা। অন্য কারো হাতে যেন না পড়ে।"

চিঠি নিয়ে গেল শৌরসেনী।

তারপরই বঞ্জাবতীর দাসী ললিতা এল।

"বঞ্জাদিদি একবার তাঁর কিশোরী দাদুর কাছে যেতে চাইছেন। বলছেন অনেকদিন খবর পাননি, মন কেমন করছে। যাবেন কি?"

'কিশোরীকাকা তো এখানে নেই।"

"খবর নিলাম একটু আগেই ফিরেছেন।"

"বেশ যাক। কিশোরীকাকাকে আমারও দরকার একবার। রঞ্জা যেন তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। দরকারটা জরুরী।"

একটু পরেই বঞ্জাবতীর পালকি বেরিয়ে গেল হুমব্রো হুমব্রো করে।

মহারাণী আবার দুলতে লাগল দোলনায়।

।। তিন ।।

স্নানান্তে বেশ পরিচ্ছন্ন হয়ে শ্রীহর্ষ এলেন।

মহারাণী নিজের শোবার ঘরে পালঙ্কের উপর বসে অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল।

"কি ব্যাপার, এত জরুরী তলব কেন? উপর্য্যুপরি দুবার লোক গেল।"

"জরুরী বলেই দু'বার গেল। বস বলছি সব। এখানেই বস না।"

"এই যে বসছি—"

একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসলেন শ্রীহর্ষ।

"কেন, আমার পাশে বসলে চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যেত বুঝি।"

শ্রীহর্ষ মৃদু হেসে বললেন, "পাশে বসতেই তো চেয়েছিলাম একদিন। তখন তো রাজি হওনি। এখন লগ্ন বয়ে গেছে। তোমার জরুরী দরকারটা কি বল—"

শ্রীহর্ষের মুখের দিকে খানিকক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে রইল মহারাণী। তার পর বলল, "শুনে হয়ত সুখী হবে আবার মৃত্যু আসন্ন।"

"কি রকম।"

"স্বয়ং যম এবার বর-বেশে আসছে।"

"হেঁয়ালিটা ভেঙে বল।"

মহারাণী উদয়প্রতাপ-সম্পর্কিত ঘটনাগুলো একে একে বলে গেল। শ্রীহর্ষের মনে হল তিনি যেন একটা উপন্যাসের কাহিনী শুনছেন।

"কাল আসবে উদয়প্রতাপ?"

"চিঠি তো দেখলে।"

"আমার মনে হয় অবিলম্বে মহেন্দ্রনাথকে খবর দেওয়া উচিত।"

"না, তা দেব না।"

"কেন?"

"আমার খুশী"—তারপর একটু থেমে মুচকি হেসে বললে, "মেয়েমানুষ হলেও আমার আত্মসম্মান আছে।"

"তাহলে পুলিশে খবর দাও।"

"তা ও দেওয়া যাবে না কারণ নানাসাহেব আমার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন বাড়িতে পুলিশ ডেকে তাঁকে বিপন্ন করতে পারব না।"

"নানাসাহেব।"

আকাশ থেকে পড়লেন শ্রীহর্ষ।

"নানাসাহেব তোমার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন? কোথা আছেন?"

"খিড়কি বাগানে, শিবমন্দিরে।"

"কি করবে তাহলে এখন।"

"সেইজন্যেই তোমাকে ডেকেছি।"

"আমি কি করতে পারি বল।"

"বলছি"

নিজের পরিকল্পনাটা তখন বললে সে। শুনে চমৎকৃত হয়ে গেলেন শ্রীহর্ষ মহারাণী বুদ্ধিমতী তা তিনি জানতেন, কিন্তু এতটা প্রত্যাশা তিনি করেননি। বললেন, পরিকল্পনা তোমার চমৎকার হয়েছে আমি এসে কালীপুজো করে দেব, নানাসাহেব যদি পালকি করে আমার বাড়িতে পৌঁছে যান তাহলে তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য পাতালঘরে লুকিয়ে রাখা অসম্ভব হবে না সর্বমঙ্গলাকে বলে এলে আমি না ফেরা পর্যন্ত সে কাউকে বাড়িতেও ঢুকতে দেবে না কিন্তু তুমি যে মিথ্যে কথাগুলো আমাকে দিয়ে বলাতে চাইছ ওটা আমি পারব না। ওটা আর কাউকে দিয়ে করাও তুমি—"

"আমার মান প্রাণ রক্ষার জন্যে সামান্য দু'একটা মিছে কথা বলতে পারবে না তুমি! আশ্চর্য!"

"নিজের মান প্রাণ রক্ষার জন্যেও পারব না। মিছে কথা কখনও বলিনে যে। আর কেউ বলুক না।"

"একথা আমি আর কাউকে বলিনি, বলবও না। তুমি যদি সত্যকে আঁকড়ে আমাকে ডাকাতের হাতে তুলে দিতে চাও, দিও"

বিপন্ন মুখে চুপ করে গেলেন শ্রীহর্ষ।

মহারাণী নির্নিমেষে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। হঠাৎ তার নিচের ঠোঁটটা কেঁপে উঠল। শ্রীহর্ষ দেখলেন তার চোখে জল টলমল করছে।

"ও কি! আচ্ছা তাই হবে। যা বলছ তাই করব। মিছে কথা বলিনি কিনা—"

মহারাণী স্থির কণ্ঠেই উত্তর দিত, কিন্তু গলা কেঁপে গেল তার।

"বলতে হবে না। চলে যাও তুমি, আমার অদৃষ্টে যা আছে হবে।" বিছানার উপর উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল সে

শ্রীহর্ষ আরও বিব্রত হলেন। তারপর ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

শ্রীহর্ষ চলে গেলেন একটু পরে। মহারাণী উঠে বসল। বসেই রইল খানিকক্ষণ। অর মুখখানি ম্লান হয়ে গিয়েছিল। সে আবার নূতন করে যেন অনুভব করল শ্রীহর্ষ তাকে ভালবাসে না শেষ পর্যন্ত সে রাজি হল বটে কিন্তু সেটা ভদ্রতার খাতিরে, ভালবাসে বলে নয়। খোলা জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল সে আকাশের দিকে।

চমক ভাঙল মহারাজের ডাক শুনে। নিমেষের মধ্যে মনে পড়ল এখনও অনেক কাজ বাকী। নানাসাহেবকে খেতে দিতে হবে, কষ্টিকেও বুঝিয়ে বলতে হবে ব্যাপারটা তাকে এখনও কিছু বলাই হয়নি।

মহারাণী নেমে গেল খিড়কির বাগানে প্রথমেই গেল মহারাজের ঘরে। অনেকক্ষণ ধরে আদর করল তাকে তার পিঠে চড়ে বেড়াল খানিকক্ষণ তারপর তার গলা জড়িয়ে ধরে কানে কানে বললে, "তুই আমাকে বাঁচাতে পারবি তো? পারবি? উত্তর দিচ্ছিস না কেন?"

মহারাজের গলা থেকে গরগর গরগর শব্দ বেরুতে লাগল। তারপর গেল সে কষ্টির ঘরে। কষ্টিকে বুঝিয়ে বললে সব। চোখ বড় বড় করে কষ্টি শুনতে লাগল।

"ঠিক পারবি তো?"

কষ্টি ঘাড় নেড়ে জানালে, পারবে

তারপর সে গেল নানাসাহেবের খাবারের ব্যবস্থা করতে।

সাজিতে ফল, মিষ্টান্ন এবং বাটিতে দুধ নিয়ে নানাসাহেবের কাছে গিয়ে দেখল পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো তিনি পরিক্রমণ করে বেড়াচ্ছেন সারা ঘরটা। ঘরের কোণে সে যেমন ভাবে বিছানা পেতে দিয়ে গিয়েছিল তা ঠিক তেমনি ভাবেই পাতা রয়েছে। দেখে মনে হল না যে তিনি তাতে শুয়েছিলেন। খাবারও স্পর্শ করেননি।

"আপনি কিছু খাননি দেখছি।"

"না। খেতে ইচ্ছে করে না।"

ভাঙা ভাঙা হিন্দিতেই উত্তর দিলেন।

"ঘুমোননি?"

"না। ঘুম আসে না।"

"আপনাকে তো বলে গেলাম আমি, চিন্তার কোন কারণ নেই, আপনি বিশ্রাম করুন।"

"চিন্তার কারণ বাইরে নেই, এইখানে আছে।"

এই বলে প্রথমে তিনি বুকে তারপর মাথায় হাত দিলেন।

তারপর হঠাৎ ঝুঁকে মহারাণীর কানের কাছে মুখ এনে বললেন, "একটা কথা জানেন না বোধহয়। আমি পাপী, মহাপাপী বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম।"

"বিশ্বাসঘাতকতা? করে—"

"শুনবেন সব কথা?"

তাঁর কণ্ঠস্বরে যেন একটা আকুল আগ্রহ ফুটে উঠল। কথাটা বলে যেন মনের ভার লাঘব করতে চান।

"বলুন।"

"শুনুন। কানপুরে অনেক ইংরেজ পরিবারকে ঘেরাও করেছিলাম শহরের দক্ষিণপূর্ব কোণের একটা বাড়িতে। হুইলার সাহেব তাদের বাঁচাবার জন্যে লড়েছিলেন, খুব লড়েছিলেন তিনি। আমাদের অনেক সিপাহী জখম হচ্ছিল। ৮ই জুন থেকে ২৬ শে জুন পর্যন্ত লড়েছিল তারা। শেষকালে আমি তাদের একটা প্রস্তাব পাঠালাম যে তারা যদি অবিলম্বে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে তাহলে নৌকো করে তাদের এলাহাবাদে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেব। আমার কথায় বিশ্বাস করে তারা আত্মসমর্পণ করল। কিন্তু যখন তারা নৌকোয় চড়ল নৌকো যখন মাঝ দরিয়ায়, তখন সামলাতে পারলাম না আমি, শর্তের কথা ভুলে গেলাম, তাঁতিয়া তোপীও আমাকে বললে এতগুলো দুষমনকে এত সহজে ধ্বংস করবার সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। হুকুম দিলাম, গুলি চালাও নৌকোর উপর। চার পাঁচজন সাঁতরে পালিয়েছিল কেবল, বাকী সব মারা যায়। তাদের মধ্যে অনেক আওরাৎ ছিল, অনেক বাচ্চা ছিল। অনেক বুড়ো ছিল, রোগী ছিল।"

পিছনে দুহাত নিবদ্ধ করে নানাসাহেব আবার পরিক্রমণ করতে লাগলেন। তারপর মহারাণীর সামনে হঠাৎ থেমে একটু ঝুঁকে আবার বললেন, "বিবিগড়ে যে সব ইংরেজ বন্দী হয়েছিল তাদেরও হত্যা করেছিলাম। তাদের মধ্যেও অনেক আওরৎ ছিল, বাচ্চা ছিল। আমি সেখানে ছিলাম না, কিন্তু তাদের আর্তনাদ আমি সর্বদা শুনতে পাই। ঘুম হয় না—"

আবার পরিক্রমণ শুরু করলেন।

আবার থেমে বললেন, "আমার মনে হয় এই পাপেই লছমীবাই মারা গেছে, তাঁতিয়া তোপীর ফাঁসি হয়েছে, এই রাগেই হডসন গুলি করে মেরেছে বাহাদুর শাহর পুত্র পৌত্রদের, লোপ করে দিয়েছে মোগল বংশ। এইবার আমার পালা—"

আবার পরিক্রমণ শুরু করলেন।

"ওসব ভেবে অনর্থক মন খারাপ করবেন না। যুদ্ধের সময় শত্রুর প্রতি দয়া করলে চলে না। ওরাও কি আপনাদের উপর দয়া করেছে? করে নি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা আপানাকে রক্ষা করব। আমার কাছ থেকে অন্তত পুলিশ আপনাকে নিয়ে যেতে পারবে না—"

"কি ব্যবস্থা করেছ শুনি।"

"আপনি নদীতীরে কখন যেতে চান?"

"রাত দুপুরে। সপ্তর্ষি অস্ত যাবার পর ওরা ছিপ নিয়ে আসবে বলেছে। নদীতীরে একটা অশ্বত্থ গাছ আছে, তার ওপর আমাকে থাকতে বলেছে।"

"তাহলে শুনুন আমি কি ব্যবস্থা করেছি। আমার এক বন্ধুর বাড়ি আছে ওই নদীর কাছেই। তার বাড়িতে মাটির নীচে পাতাল ঘর আছে একটা। অমাবস্যার দিন সন্ধ্যার পর একটা পালকি করে সেখানে আপনি যাবেন গিয়ে সেই পাতাল ঘরে লুকিয়ে থাকবেন। তারপর রাত দুপুরে খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে নদীর দিকে। ওদের বাড়ি থেকে নদী প্রায় আধ ক্রোশ দূরে। ওদের খিড়কি দরজা থেকে বেরিয়েই রাস্তা দিয়ে সোজা উত্তরে চলে যাবেন "

পালকি করে যাবার সময় কেউ দেখতে পায় যদি "

পাবে না। আমার একটা দোতলা পালকি আছে। তার ছাতটা বাক্সের মতো খোলা যায়। একজন অনায়াসে শুয়ে থাকতে পারে তাতে। আপনি তার ভিতরই যাবেন, নীচে থাকবে আমার একজন বিশ্বস্ত দাসী। পালকি আগা গোড়া রেরখা ঢাকা থাকবে— "

চুপ করে রইলেন নানাসাহেব।

মহারাণী বলল, "কিন্তু আমার একটি অনুরোধ আছে। কিছু খেয়ে বিশ্রাম করুন।"

ম্লান হাসি হেসে নানাসাহেব ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানালেন। দুজনের এতক্ষণ আলাপ হল ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়ে তাতে অসুবিধা হল না কারও। মনের একটা ভাষা আছে যা সার্বজনীন, যার প্রকাশ চোখমুখের ভাব ভঙ্গীতে, শব্দের উপর যা নির্ভরশীল নয়।

নানাসাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মহারাণী কক্তির কাছে গেল। বঞ্জাবতী কিন্তু দোতলার ঘরে চুপ বসেছিল, জানলার ফাঁকে চোখ দিয়ে সব লক্ষ্য করছিল।

পরিকল্পনাটি বলার সময়েই মহারাণী শ্রীহর্ষকে বলেছিল নানাসাহেবের খবরটা তিনি যেন সর্বমঙ্গলাকে এমনভাবে বলেন, যাতে নানাসাহেবের খবরটা সে জানতে না পারে। সর্বমঙ্গলাকে গোপন করে নানাসাহেবকে পাতাল ঘরে আশ্রয় দেওয়া যাবে না, সে সময়ে শ্রীহর্ষও বাড়িতে থাকবেন না তাকে কালীপুজো নিয়ে থাকতে হবে। সর্বমঙ্গলার কাছেই নানাসাহেবকে পাঠাতে হবে। কিন্তু মহারাণীর মতে আশ্রিত ব্যক্তিটি যে নানাসাহেব একথা সর্বমঙ্গলার না জানাই ভালো হয়তো ভয় পাবে, যদি গল্পচ্ছলে কখনও কাউকে বলে ফেলে তাহলেও বিপদের সম্ভাবনা।

শ্রীহর্ষ ফিরবার সময় ভাবতে ভাবতে আসছিলেন কি বলবেন সর্বমঙ্গলাকে। বাড়ি পৌঁছবামাত্র সর্বমঙ্গলা জিগোস করলো,

"রাণীর দরবারে ডাক পড়েছিল কেন?"

"কাল অমাবস্যা। কালীপুজো করতে হবে।"

"ওদের তো বাধা পুরুত আছেন?"

"কাল একটু ধুমধাম করতে চায়, বলছে মানত ছিল, তাই আমাকে অনুরোধ করেছে। আলো-টালো জ্বলবে খুব—"

সর্বমঙ্গলা চুপ করে রইল।

"কাল আর এক ঝঞ্ঝাট হবে, আর সেটা পোয়াতে হবে তোমাকে।"

'সেটা আবার কি?"

"একজন ফেরারী আসামী পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সে মহারাণীর নিজের লোক। কাল সন্ধ্যার পর সে পালকি করে এখানে আসবে। মহারাণীর অনুরোধ, তাকে খানিকক্ষণের জন্য পাতাল-ঘরে লুকিয়ে রাখতে হবে। রাত দুপুরের পর সে খিড়কি দিয়ে নদীর ধারে চলে যাবে।"

"আমাদের পাতাল ঘরে?"

"হ্যাঁ। আমি তখন থাকব না, তোমাকেই সব ব্যবস্থা করতে হবে।"

সর্বমঙ্গলা আমার চুপ করে গেল।

"উত্তর দিচ্ছ না যে?"

"উত্তর আর কি দেব। বলছ যখন, করব। কিন্তু মনে কর খবর পেয়ে পুলিশ যদি এসে খানাতল্লাসী করতে চায়?"

"পুলিশ খুব সম্ভবত আসবে না। আর যদি এসেই পড়ে, ভয় কি, বাধা দেবে। বলবে আমার স্বামী না আসা পর্যন্ত খানাতল্লাসী হবে না তিনি আসুন, তারপর যা হয় কোরো। পারবে না বলতে?"

"পারব।"

।। চার ।।

অমাবস্যার দিন সকাল থেকেই ধুম পড়ে গেল মহারাণীর বাড়িতে। জমিরুদ্দিনের দল খুব ভোরে এসেই শুরু করলে ভেরোঁ। একদল চাকর গেল বাগান বাড়িটা পরিষ্কার করবার জন্যে, আর একদল বাইরের মহলটা সাজাতে লাগল। অতিথিশালার ঘরে ঘরে বিছানো হতে লাগল, দামী দামী কারপেট, ভারী ভারী তাকিয়াগুলোতে পরানো হতে লাগল ফরসা ওয়াড়, ফরসী-গড়গড়া-হুঁকো-সটকা তামাক খাওয়ার যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল হুঁকো-বরদার পিয়ারী। সিন্দুক থেকে বাসন বার করা হল রাশি রাশি, পিতলের কাঁসার রুপোর পাথরের, সেগুলো পরিষ্কার করতে লাগল একদল ঝি। কুটনো কোটার ভার নিলে অন্দরের মেয়েরা, লাউ কুমড়ো আলু বেগুনের স্তূপ নিয়ে বসে গেল সবাই। দশজন রাঁধুনী দক্ষিণ দিকের প্রকাণ্ড চালাটায় বড় বড় উনুন কেটে বড় বড় চেলাকাঠের সাহায্যে আঁচ দিয়ে দিলে ভোর থেকেই, ডাল আর অম্বলটা তারা আগে রেঁধে ফেলবে। তারপর মহাল থেকে জিনিসপত্র আনা শুরু হল। ভারে ভারে দুধ দই ছানা মাখন ঘি তেল। বড় বড় রুই কাতলাও এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, সদ্য-ধরা জ্যান্ত মাছ সব, খাবি খাচ্ছে তখনও। উত্তর দিকের উঠোনে স্তূপীকৃত হল মাছগুলো, জেলেরা সঙ্গে বড় বড় বঁটিও এনেছিল, হৈ হৈ করে মাছ কুটতে লেগে গেল সবাই। পালকি বইবার জন্য আশী জন বেয়ারাও জোগাড় করে ফেলেছিলেন নায়েব মশাই, তারাও একে একে আসতে লাগল আর তাদেরও নানা কাজে লাগিয়ে দিলেন তিনি। কতকগুলোকে নিযুক্ত করলেন প্রকাণ্ড একখানা সামিয়ানা খাটাতে, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে ফাঁকা জায়গাটা ছিল সেইখানেই সামিয়ানা খাটানো সাব্যস্ত করলেন তিনি, অতিথিশালায় যদি স্থানাভাব ঘটে এইখানে বসানো হবে কিছু লোককে। দীপাবলীর জন্য যে প্রদীপগুলো এসেছিল সেগুলোকে ভিজিয়ে শুকিয়ে, তেল-সলতে দিয়ে সাজিয়ে রাখতে

আদেশ দিলেন কয়েকজনকে, ছাতটা পরিষ্কার করতে লাগল জনকয়েক, ফুল আর দেবদারু পাতা সংগ্রহ করতে গেল কয়েকজন, কলা গাছের জন্যও জনকয়েক গেল। অন্দরমহলের প্রশস্ত বারান্দায় শিল পড়ে গেল কুড়ি-পঁচিশটা, নানা বয়সের ঝিয়ের দল মশলা বাটতে লাগল গাছ কোমর বেঁধে। তাদের মুখে মুখে পান দোক্তা দিয়ে বেড়াতে লাগল একজন। বারোটি কুচকুচে কালো নধর পাঠা নিয়ে বাইরের মহলে প্রবেশ করল খাঁড়া হাতে বলিষ্ঠ জগু কামার মা কালীর নিত্য পূজারী অবিনাশ ঠাকুর সেগুলিকে মন্ত্রঃপূত করে মায়ের কাছে উৎসর্গ করে দিলেন সেগুলিকে মায়ের সামনে বলিদান দেওয়া হবে জগুই কাটবে সেকালে হিন্দুঘরে বৃথা মাংস ভোজন প্রচলিত ছিল না মাংস খেতে হলে আগে সেটা মায়ের প্রসাদী করে নিতে হত। অবিনাশ ঠাকুর প্রস্তুত হয়েই ছিলেন তিনি বললেন, 'একটা পাঠা রেখে দাও। রাত বারোটার সময় শ্রীহর্ষ ঠাকুর যে পুজোটা করবেন তাতে দরকার হবে' বাকী পাঠাগুলো তিনি একে একে উৎসর্গ করতে লাগলেন আর জগু হাড় কাঠে ফেলে কাটতে লাগল। মা কালীর মন্দিরের সামনে হাড় কাঠ পোঁতাই ছিল একটা বলিদান শেষ করে জগুই পাঁঠাগুলোকে নিয়ে গেল পিছন দিকের আর একটা আটচালায়, জন কয়েক বাগদী সাহায্যকারীও সঙ্গে গেল তার। পাঁঠাগুলোকে ছড়ে কেটে তৈরী করে তবে তার ছুটি মাংস পোলাও রান্না করবার জন্যে আলাদা রাঁধুনি এসেছিল জনকয়েক। মাংস পোলাওয়ের জন্য বিশেষ মশলা আর বাসন তারা আলাদা করে রাখতে লাগল। সিধু মুহুরী একটা ঢাকা ঝাঁকা নিয়ে প্রবেশ করলেন। এবং নায়েব মশায়ের কানে কানে রহস্যময় ভাবে কি বললেন নায়েব মশাই আদেশ দিলেন, "ওই কোণের ঘরে সাবধানে রাখ ওগুলো।" কয়েক বোতল মদ কিছু গাঁজা এবং গাঁজার কলকে নিয়ে এসেছিলেন সিধু মুহুরী। যারা মেহনত করছে তাদের মধ্যে অনেকে গাঁজা খায় মাঝে মাঝে গাঁজায় দম না দিলে কাজে উৎসাহ পাবে না তারা আর কারণ তো কালী পূজোর অঙ্গ, অতিথিদের মধ্যে কেউ কেউ চাইতে পারেন

কিশোরীমোহন কিন্তু এখনও এলেন না। তাঁর জন্যে অবশ্য অটকাল না কিছু মুহুরি আমলারা তদ্বির তদারক করছিল আর বৃদ্ধ নায়েব মশাই চর্কির মতো ঘুরছিলেন চারদিকে

নহবতে বাজাতে লাগল ভোরের পর ভৈরবী, তারপর আশাবরী এইভাবে সমস্ত দিন চলল

সন্ধেবেলা যে কি হবে, অতিথিরা কখন আসবে, তা ঘুণাক্ষরে কাউকে বলল না মহারাণী কেউ তাকে জিগ্যেস করতেও সাহস করলে না। অন্দরমহলে সিন্ধুবালা আর কুসুমের দল নিজেদের বিভিন্ন অনুমানকে ধ্রুব সত্য মনে করে সোৎসাহে কাজ করে যাচ্ছিল উঁকি মারার মাকে এসে ফিস ফিস করে বললে, "মহারাণীর মুখটি শুকিয়ে এতটুকুন হয়ে গেছে।" গোবরার মা চোখ মটকে বললেন, 'এতেও যদি মুখ না শুকোয় কিসে তার শুকুবে বল। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে শয্যা নিত ' কুসুমের দলের মতো নিঃ কিন্তু মহারাণীর অন্য রূপ প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি কুসুমের কানে কানে বললেন, "ধন্যি মেয়ে বটে। মাথার উপরে অত বড় একটা খাঁড়া ঝুলছে, কিন্তু গেরাজ্যি নেই। চান করে এসে ধূপের ধোঁয়ায় চুল শুকুচ্ছে শুনলাম।" নায়েব মশাইও নিজের কল্পনা অনুসারে এর অর্থ করেছিলেন একটা। তিনি ভেবেছিলেন কিশোরীমোহন কিম্বা মহেন্দ্রনাথের চেষ্টায় মহারাণীর বিয়েরই সম্বন্ধ হচ্ছে কোনহয় কোথাও, পাত্রপক্ষ আজ দেখতে আসছে। কিন্তু কিশোরীমোহন

বা মহেন্দ্রনাথ কাউকে দেখতে না পেয়ে মাঝে মাঝে খটকাও লাগছিল তাঁর। মহারাণী নিজের বিয়ের আয়োজন নিজেই হামরাই হয়ে করছে এটা তাঁর ভাল লাগছিল না। তিনি আশা করছিলেন বিকেল নাগাদ কেউ হয়তো এসে পড়বেন।

বিকেলের দিকে (জমিরুদ্দিন তখন পূরবী ধরেছে) অন্দর থেকে মহারাণীর হুকুম এল, শ্রীহর্ষের বাড়িতে দুটি খালি পালকি যাবে। চিঠিও যাবে একটি। চিঠিতে মহারাণী শ্রীহর্ষকে লিখল, "একটি পালকিতে তুমি চলে এস। দ্বিতীয় পালকিটি তোমার ওখানেই থাকবে। কেন থাকবে তা পরে শুনো।"

সন্ধ্যাবেলা আলোকমালায় সজ্জিত হয়ে ঝলমল করতে লাগল বাড়িটা সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত সকলে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। অতিথিরা কখন আসবে। সকলের সাগ্রহ প্রতীক্ষা একটা অদৃশ্য উৎসুক পরিবেশ সৃষ্টি করছে চতুর্দিকে. সমস্ত বাড়িটাই যেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। প্রদীপের শিখাগুলো পর্যন্ত নিষ্কম্প। জমিরুদ্দিন ইমনে তান ধরেছে। মহারাণী অপেক্ষা করছিল শ্রীহর্ষের জন্য। পাতালঘরের বন্দোবস্ত সব ঠিক আছে নিশ্চিতরূপে এ খবর পাবার পর তবে সে নানাসাহেবকে পাঠাবে। খিড়কি বাগানে মন্দিরের কাছে দোতলা পালকিটি সে সন্ধের পর থেকেই দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এমন ব্যবস্থা করেছে যে শৌরসেনী পালকির নীচের তলায় বসে নানাসাহেবের সঙ্গে যাবে, কিন্তু সে ও জানতে পারবে না যে দোতলায় তার মাথার উপর নানাসাহেব শুয়ে আছেন। মহারাণী বিকেলেই শৌরসেনীকে বলে রেখেছে, "সর্বমঙ্গলার জন্যে পালকি পাঠাতে হবে। তুই পালকি নিয়ে যাবি তোর হাতে চিঠিও দেব একটা। তুই চিঠিটা দিয়ে পালকিটা রেখে চলে আসিস। সেখানে আর একটা পালকি আছে। সর্বমঙ্গলা কিছু জিনিসপত্র আনবে, তার জন্যে বড় পালকিটা রেখে আসিস।" অন্ধকার হতেই নানাসাহেব একটা ছোট সিঁড়ির সাহায্যে পালকির দোতলায় উঠে লম্বা হয়ে শুয়ে রইলেন। তিনি ভাবলেন, তাঁকে কেউ দেখতে পায়নি। কিন্তু রঞ্জাবতী দেখেছিল। মন্দির থেকে তার দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্য সরেনি।

একটু পরেই শ্রীহর্ষ তাঁর পুঁথিপত্র নিয়ে এসে পড়লেন। মহারাণীকে বললেন, "ওদিকে সব ঠিক আছে, পালকি পাঠাতে পার।"

শৌরসেনী গিয়ে পালকিতে উঠল, পালকি অন্দর থেকে বেরুতে যাবে, এমন সময় দুম দুম বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল কয়েকটা, তারপরই ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। মনে হল একদল অশ্বারোহী বাড়ির সামনে এসে থামল। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল অন্দরমহলের ঘন্টা। একজন দাসী ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে— "নায়েব মশাই বললেন, একজন সাহেব এসেছে পুলিশ ফৌজ নিয়ে। তার সঙ্গে কালেকটারের পরওয়ানা আছে, সে এখুনি বাড়ি খানাতল্লাসী করবে। পুলিশে বাড়ি ঘিরে ফেলেছে।"

মহারাণী নিস্তব্ধ হয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর শ্রীহর্ষের দিকে ফিরে বলল, "তুমি সাহেবের সঙ্গে গিয়ে দেখা কর। দেখা করে বল একজন সম্ভ্রান্ত জমিদারের বাড়ি এমন ভাবে খানাতল্লাসী করা খুবই অপমানজনক। আমার বাবা গভর্নমেন্টের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, আমিও সে বন্ধুত্ব অটুট রেখেছি। তবু এ অপমান তাঁরা যদি করতেই চান তাহলে অন্দরের মেয়েদের অন্যত্র সরিয়ে দেবার অনুমতি তাঁরা আশা করি দেবেন। মেয়েরা ঢাকা পালকিতে আগে একে

একে আমাব বাগানবাড়িতে চলে যাক, তাবপব তাঁবা অন্দবে ঢুকুন। তাঁদেব যদি সন্দেহ হয় পালকি সিংহদবজা থেকে বেরুবাব সময় তাবা দেখে নিতে পাবেন পালকিতে মেয়ে-সোওয়াবি ছাড়া আব কেউ নেই। আমি অবশ্য বাড়িতেই থাকব।''

শ্রীহর্ষ বাইবে চলে গেলেন।

পুলিশ এসে বাড়ি ঘেবাও কবেছে এ খবব বঞ্জাবতীব কাছেও পৌঁছেছিল। উত্তেজিত হয়ে নেবে এসেছিল সে। মহাবাণী তাকে দেখে বলল, ''পুলিশ বাড়ি খানাতল্লাসী কববে, তৈবি হয়ে নে তোদেব সব বাগান বাড়িতে পাঠিয়ে দেব।''

'আমি আপনাকে ছেড়ে যাব না কোথাও।''

' তাহলে আব সবাইকে খবব দে।''

শ্রীহর্ষ ফিবে এলেন।

বললেন, ''ক্যাপ্টেন সাহেব বলছেন খানাতল্লাসী তাকে কবতেই হবে, কালেকটাব সাহেবেব কড়া হুকুম। তবে মেয়েদেব অন্যত্র সবিয়ে দিতে পাবেন, কিন্তু বেবিয়ে যাবাব আগে প্রত্যেক পালকিটি তাঁবা দেখে তবে যেতে দেবেন।''

অন্দবমহলে একটা সাড়া পড়ে গেল। কুসুম ভাবলেন, পুলিশ বোধহয় তাঁব সেই কাকাই পাঠিয়েছেন সোনাব মা মনে কবলেন, বৃন্দাবন থেকে সিন্ধুবালা কলকাঠি নাড়ছেন দুজনেই মা মঙ্গলচণ্ডীকে প্রণাম কবলেন। বাকী সকলেব মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে। কাঁদতে লাগল কেউ কেউ

মহাবাণী আশ্বাস দিল সকলকে, ''ভয় কি। এখুনি আবাব ফিবে আসবে সবাই।'

সে নিজে দাঁড়িয়ে পালকিতে চড়াতে লাগল সকলকে। বঞ্জাবতীও আছে দাঁড়িয়ে সাহায্য কবতে লাগল। যেমন ঠিক ছিল শৌবসেনী নানাসাহেবেব পালকিতে উঠল।

মহাবাণী তাকে আবাব বলল, ''এ পালকিটা শ্রীহর্ষেব বাড়ি যাবে। সর্বমঙ্গলাব জন্যে এ পালকিটা থাকবে সেখানে। পুজোব সময় সর্বমঙ্গলা আসবে। তুই চিঠিটা সর্বমঙ্গলাকে দিয়ে বাগান বাড়িতেই চলে যাস। ওখানে তোব ফেববাব জন্য একটা পালকি আছে— ''

সর্বমঙ্গলাকে চিঠি লিখেই বেখেছিল সে।

''বাত দুপুবে তুমি এস সব কাজ চুকিয়ে। সেই সময়ই পুজো হবে। সব জিনিস নিয়ে এস। পালকি তোমাব জন্যে অপেক্ষা কববে।''

বঞ্জাবতী কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সব শুনলে সে। তাব মুখেব একটি পেশীও বিচলিত হল না।

পালকি বেরুতে লাগল একে একে।

ক্যাপটেন সাহেব সিংহদবজাব সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রত্যেক পালকি বেরুবাব আগে তিনি ঢাকা তুলে তুলে দেখতে লাগলেন। নানাসাহেবেব পালকিটা শেষেব দিকে ছিল। সেটাব ঢাকা তুলেও দেখলেন তিনি। রূপসী শৌবসেনী নত নেত্রে বসে ছিল জড়সড় হয়ে। তাকে দেখে এত মুগ্ধ হয়ে গেলেন সাহেব যে পালকিটা যে অন্যান্য পালকিব চেয়ে বড় তা লক্ষ্য কববাবই অবসব পেলেন না।

''পাস ''

নানাসাহেবেব পালকি বেবিয়ে গেল।

তারপর পুলিশ ঢুকল অন্দরমহলে। সমস্ত ঘর খোলাই ছিল। প্রত্যেক ঘরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজল তারা। তারপর গেল খিড়কির বাগানে। মশাল জ্বেলে জ্বেলে প্রত্যেক গাছের তলায় তলায় ঘুরে বেড়াতে লাগল, বড় গাছগুলোর উপরেও চড়ল। মহারাজের মহলের কাছে আসতেই গগনবিদারী গর্জন করে মহারাজ সম্বর্ধনা করল তাদের। শ্রীহর্ষও ওদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিলেন। তিনি বললেন, 'মহারাণীর পোষা সিংহ।'' ক্যাপ্টেনসাহেব, অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখলেন সিংহটাকে, তারপর বললেন, ''বেআর আফ্রিকান ভ্যারাইটি''

কষ্টি চোখ বড় বড় করে বসে ছিল নিজের ঘরে।

শ্রীহর্ষ বললেন, 'এও কঙ্গো দেশের মেয়ে। ওই সিংহের সেবা করে''

ক্যাপ্টেন সাহেব মুখ ছুঁচলো করে ছোট্ট শিস দিলেন একটা।

বাগান খোঁজা শেষ করে তারপর তারা ঢুকলেন মহারাণীর মহলে।

মহারাণী দোলনায় দুলছিল, সাহেব যখন এল তখন ভ্রূক্ষেপও করল না, যেমন দুলছিল তেমনি দুলতে লাগল।

শ্রীহর্ষ পরিচয় দিলেন, 'ইনিই স্টেটের মালিক, মহারাণী চৌধুরাণী ''

সাহেব বা হাত দিয়ে মাথার হ্যাটটা তুললেন একবার।

মহারাণী চেয়েও দেখলো না সেদিকে, যেমন দুলছিল, দুলতে লাগল।

সাহেব বললেন ' আমি প্রতি ঘরে ঘরে ঢুকে দেখতে চাই।'

শ্রীহর্ষ উত্তর দিলেন, ''আসুন, আমি দেখাচ্ছি— ''

ঘরে ঢোকবার আগে সাহেব তার সহকারীকে বললেন, ''তুমি ছাতটা দেখে এস সহকারী একাই উঠে গেলেন ছাতবাগানে একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে। সহকারীটি এদেশী লোক সম্ভবত গুর্খা। ছাতে গিয়েই তাঁর দেখা হল বঞ্জাবতীর সঙ্গে। বঞ্জাবতী এই সুযোগই খুঁজছিল। সে যা জানত তা বলে দিলে তাকে। কিন্তু হিন্দি ভালো জানা ছিল না তাই ভাল করে সব বুঝিয়ে বলতে পারলে না। তবে সহকারী ক্যাপ্টেন এইটুকু বুঝলেন যে নানাসাহেব একটু আগে এখানে ছিল, পালকি করে এখন শ্রীহর্ষ পণ্ডিতের বাড়িতে গেছে। সেখানে ফৌজ নিয়ে গেলে তাকে ধরা যাবে। তিনি তর তর করে নেমে এলেন ছাত থেকে। এসে দেখলেন শ্রীহর্ষ দাঁড়িয়ে আছে সাহেব নীচে চলে গেছেন। তিনিও নীচে নেমে গেলেন গিয়ে ক্যাপ্টেনের কানে কানে বললেন খবরটা।

'ইমপসিবল''—চেঁচিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন ''প্রত্যেক পালকি আমি নিজে দেখেছি।'

তার অস্মা অভিমানে যেন ঘা লাগল। খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন

'শ্রীঅরসা প্যাণ্ডিৎ?''

'ওই তো বললে মেয়েটি—''

''তার বাড়ি খুঁজে বার করতে পারবে?''

'সেটা অসম্ভব হবে না। কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই দেখিয়ে দেবে ''

শ্রীহর্ষই যে এতক্ষণ তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন সে কথা জানতেই পারলেন না তারা। কারণ মাত্র কয়েকদিন আগে তাঁরা পাঞ্জাব থেকে এসেছিলেন। এ অঞ্চলের কাউকেই চিনতেন না।

কিছুক্ষণ ভেবে ক্যাপ্টেন বললেন, "বেশ, চল, চেষ্টা করেই দেখা যাক"

ক্যাপ্টেনের হুকুম পেয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল অশ্বারোহী ফৌজের দল।

শ্রীহর্ষ নীচে নামেন নি। মহারাণীর কাছাকাছি থাকাই সমীচীন মনে করেছিলেন তিনি। সবাই যখন চলে গেল তখন মহারাণীও নেমে পড়ল দোলনা থেকে। দুলতে দুলতে একটি কথাই ভাবছিল, সেই কথাটাই বললে।

"নানাসাহেব যে এখানে এসেছিলেন এ খবর ওরা পেল কি করে?"

"সরকারের চর চারিদিকে ঘুরছে। উনি যখন দেওয়াল বেয়ে উঠলেন তখনই হয়তো দেখে ফেলেছিল কেউ— "

রঞ্জাবতীর কথা কারও মনেই হ'ল না।

"উদয়প্রতাপ আজ আর আসবে কি? এদিকে যখন ফৌজ এসেছে—"

"রাত তো খুব বেশী হয়নি। আমার মনে হয় সে ঠিক আসবে। তুমি পুজোর ব্যবস্থা কর গিয়ে। আমি কষ্টির খবরটা নি -- "

মহারাণী নেমে গেল খিড়কির বাগানে।

শ্রীহর্ষ বাইরে পুজোর ব্যবস্থা করতে গেলেন।

।। পাঁচ ।।

কালীপুজো শেষ হয়ে গেছে।

মন্দিরের মধ্যে বসে শ্রীহর্ষ সুললিত কণ্ঠে স্তোত্র পাঠ করছেন।

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্।
সদ্যশ্ছিন্ন শিরঃ-খড়গ বামাধোর্ধ-করাম্বুজাম
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধ-পাণিকাম্।
মহামেঘ-প্রভাং শ্যামাং তথাচৈব দিগম্বরীম
কণ্ঠাবসক্ত মুণ্ডালী-গলদ্রুধির চর্চ্চিতাম্

থমথম করছে অমাবস্যার রাত্রি। সে রাত্রি যেন সহস্র উজ্জ্বল চক্ষু মেলে নির্নিমেষে চেয়ে আছে। প্রদীপগুলোতে পুনরায় তেল দিয়ে উস্কে দেওয়া হয়েছে। নিষ্কম্প শিখায় জ্বলছে তারা। পুলিশ আসার সঙ্গে সঙ্গে নায়েব মশাই সরে পড়েছেন, গোমস্তা আমলারাও কেউ নেই। চাকর রাঁধুনি পালায়নি, তারা নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে একটা আটচালায়। জমিরুদ্দিন নহবৎখানায় বসে আছে, কিন্তু বাজাচ্ছে না। পুজোর সময় বাজাতে মানা করেছিলেন শ্রীহর্ষ। অতিথিদের দেখা গেলে তবে সে আবার বাজাবে। ... মহল খালি। দীনা বাইজির মহলেও কেউ নেই, মহারাণী তাকেও পাঠিয়ে দিয়েছে বাগান বাড়িতে। সেই অতি নিবিড় অতি-নীরব অমাবস্যা রাত্রি মথিত করে উঠছে কেবল শ্রীহর্ষের আকুল কণ্ঠস্বর।

কর্ণাবতংসতানীত শবযুগ্ম ভয়ানকাম্
ঘোর-দংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত পয়োধরাম্।
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্
সৃক্কদ্বয় গলদ্রক্ত-ধারা বিস্ফুরিতাননাম।
ঘোব-বাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং
বালার্ক মণ্ডলাকার লোচন ত্রিতয়ান্বিতাম্।

হঠাৎ নহবৎ বেজে উঠল, শুরু হয়ে গেল দরবারি কানাড়া।

নহবৎখানা থেকে জমিরুদ্দিন দেখতে পেয়েছিল সুসজ্জিত একটা চতুর্দোলা আসছে, আর তার সামনে-পিছনে আসছে একদল মশালধারী লোক। তাদের পিছনে বয়েছে ঘোড়-সোয়ার। অনেক ঘোড়-সোয়াব।

.....সিংহদবজা খোলাই ছিল। বিনা বাধায় সদলবলে প্রবেশ করলেন উদয়প্রতাপ। শ্রীহর্ষ বেরিয়ে এলেন মন্দিব থেকে। তাঁর গলায় জবাফুলের মালা, পরিধানে বক্তাম্বব, কপালেব মাঝখানে প্রকাণ্ড সিঁদুরের টিপ। মূর্তিমান অগ্নিব মতো দেখাচ্ছিল তাঁকে। চতুর্দোলা থেকে উদয়প্রতাপ নাবলেন। তাঁর বর-বেশ।

শ্রীহর্ষই সম্বর্ধনা করলেন এগিয়ে।

"আসুন, আসুন। আপনাদেব জন্যই অপেক্ষা কবছি আমবা।"

উদয়প্রতাপ সবিস্ময়ে প্রশ্ন কবলেন, "আপনি কে?"

"আমি পুরোহিত।"

"ও, নমস্কাব। আমার সঙ্গেও পুরোহিত আছেন একজন। মহারাণী কোথা?"

"অন্দরমহলে আছেন তিনি। আপনারা বসুন। খবব পাঠাচ্ছি তাঁকে। আসুন এই দিকে –"

মন্দিরের সামনেই অতিথিশালা। তারই সুপ্রশস্ত দালানে শতাধিক লোকেব বসবার জায়গা নায়েব মশাই ঠিক করে রেখেছিলেন। দামী কার্পেটের উপর সাজানো ছিল শাদা ওযাড় পরানো তাকিয়ার সারি। মাঝখানের তাকিয়াটির বৈশিষ্ট্য ছিল কেবল। সেটিতে ছিল দামী জরি-বসানো মখমলের ওয়াড়। তার সামনেও দামী মখমল পাতা ছিল একটি। দেখলেই মনে হয বরাসন। উদয়প্রতাপ এরকম সম্বর্ধনা প্রত্যাশা করেননি, বরং ভেবেছিলেন বাধা পাবেন। প্রস্তুতও হয়ে এসেছিলেন সেজন্য। শ্রীহর্ষের আহ্বানে সকলে গিয়ে দালানে আসন গ্রহণ করবার পর উদয়প্রতাপের চতুর্দোলা থেকে প্রকাণ্ড একটি মুখ-বাঁধা পিতলেব হাঁড়ি নামিয়ে আনল একজন। উদয়প্রতাপ সেটি তাঁর পাশেই রাখতে বললেন।

"মহারাণীর সঙ্গে দেখা হবে কখন?" —প্রশ্ন করলেন তিনি শ্রীহর্ষকে।

"আমি খবর নিচ্ছি"

শ্রীহর্ষ ভিতরে চলে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসে বললেন, "মহারাণী আপনার সঙ্গে এখনি আলাপ করবেন। কিন্তু একা আপনার সঙ্গেই আলাপ করতে চান তিনি।

"আমিও তাই চাই। কিছু করবার আগে গোটাকতক কথা বলবার আছে তাঁকে।"

"বেশ। আসুন তাহলে সর্বাগ্রে মা-কে প্রণাম করে নিন।"

শ্রীহর্ষ কালীমন্দিরের দরজাটি খুলে দিলেন ভাল করে। কষ্টিপাথরের কালীমূর্তি, আকারে

খুব ছোট, কিন্তু ভীষণ-দর্শনা। উদয়প্রতাপ সদলবলে উঠে এসে প্রণত হলেন সেই মূর্তির সামনে। যে পুরোহিতটি ওঁদের সঙ্গে এসেছিলেন তিনি বললেন, "এরকম কালীপ্রতিমা আমি আর দেখিনি কখনও। অদ্ভুত মূর্তি— !"

শ্রীহর্ষ এই ধবণেবই সুযোগ খুঁজছিলেন একটা।

বললেন, "এরকম জাগ্রত কালীও এ অঞ্চলে আর নেই। উনি শুধু প্রস্তর-প্রতিমা নন, প্রয়োজন হলে জীবন্তও হতে পাবেন। একবার একজন লোভী পুরোহিত ওঁর মুকুটেব নীলাটি নেবাব জন্যে হাত বাড়িয়েছিল, উনি খড়্গাঘাতে স্বহস্তে তাকে বধ করেন—"

"বলেন কি।"

"এ সত্যি কথা সকলেই জানে।"

প্রণাম পর্ব শেষ হবাব পব শ্রীহর্ষ উদযপ্রতাপকে বললেন, "আপনি আসুন তাহলে—"

আবাব সেই ঘবে সেই পরদার সম্মুখে গিয়ে বসলেন উদয়প্রতাপ। দেখলেন মেজের উপব সেই আলপনাটিই আঁকা বয়েছে--‌-বিরাট একটা সাপের সঙ্গে বিরাট একা ময়ূয়েব যুদ্ধ হচ্ছে।

মহাবাণীই প্রথমে কথা কইল।

"নমস্কাব। আশা কবি পথে কোন কষ্ট হয়নি। আপনাব চিঠি পাঠাবার অভিনব পদ্ধতিটি খুব ভালো লেগেছে আমাব। সত্যিই আপনি অসাধারণ লোক।"

"শুনে সুখী হলাম। আপনি তো জানেন এই দিনটিব জন্য কতকাল থেকে প্রতীক্ষা করে আছি।"

"আমিও আজ প্রতীক্ষা কবছি অনেকক্ষণ থেকে। আশা করেছিলাম সন্ধেবেলাই আপনারা এসে পড়বেন। খাওয়া দাওযাব আয়োজনও সেই ভেবেই কবেছি, হয়তো সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

"আসতে কেন দেবী হয়েছে তা শুনলে আপনি হয়তো ক্ষমা করবেন। একটু ঘুবে আসতে হয়েছে। আপনার একটি মহাশত্রু নিপাত করে এসেছি।"

"আমাব মহাশত্রু! কে সে?"

"আপনাদেব ম্যানেজার কিশোরী। তিনি কালেক্টার সাহেবকে গিয়ে খবর দিয়েছিলেন যে আপনার নাকি নানাসাহেবের উপর গভীর সহানুভূতি। আপনি এবং গালুটির জমিদার মহেন্দ্রনাথ না কি তাঁকে লুকিয়ে রেখেছেন। হয়তো এজন্য পুলিশ ফৌজ আপনাদের বাড়িতে হানা দেবে।"

'আমাদের ম্যানেজার যে কালেক্টার সাহেবকে একথা বলেছেন তা আপনি টের পেলেন কি. ক'রে?"

"রাঘব সিংহ কালেক্টার সাহেবের দো-ভাষী। তারই জবানীতে খবরটা কালেক্টার সাহেব শুনেছেন। ওই রাঘব সিংহই খবরটা আমাকে দিয়েছিল।"

"তিনি খবরটা আপনাকে দিতে গেলেন কেন?"

"কাবণ আমরা সবাই নানাসাহেবের দলের লোক। নানাসাহেব এই অঞ্চলেই এসেছেন তা সত্যি, ঠিক কোথা আছেন সে খবর অবশ্য এখনও পাইনি, তবে আমাদের দলের লোকেরা চেষ্টা করছে যাতে তিনি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নেপাল অঞ্চলে পালিয়ে যেতে পারেন।"

পরদার ওপারে মহারাণীর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল ক্ষণকালের জন্য। নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ক্ষণকালের জন্যে সে ভাবলে নানাসাহেবের খবরটা একে বলা সমীচীন হবে কি? শেষে না বলাটাই ঠিক করল।

"আমাদের ম্যানেজারকে মেরে ফেলেছেন!"

"তার মুণ্ডটা একটা পিতলের হাঁড়িতে পুরে এনেছি আপনাকে উপহার দেব বলে। বাইরে আছে সেটা—"

স্তম্ভিত হয়ে গেল মহারাণী। তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ল ছাতবাগানের ঘর থেকে শিব-মন্দিরটা স্পষ্ট দেখা যায়। সহসা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল সব। কালভুজঙ্গিনীটা এখনও তো ছাতের উপর রয়েছে। আবার সব পণ্ড করে দেবে নাকি! এখনই একবার দেখা দরকার সে কি করছে।

"আমি একবার ভিতরে যাচ্ছি। এখুনি আসব আবার। বসুন আপনি—" উদয়প্রতাপের উত্তরের অপেক্ষা না করে মহারাণী দ্রুতপদে চলে গেল ছাত-বাগানে। গিয়ে দেখল বঞ্জাবতী নেই সেখানে। ফৌজ চলে যাবার পর সে-ও লুকিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে, আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে, কেউ টের পায়নি। হেঁটেই চলে গিয়েছিল সে বাগানবাড়িতে, সেখান থেকে একটা পালকি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছিল কিশোরীমোহনের বাড়ির উদ্দেশে, তাঁকে সুখবরটা দেবার জন্য। বঞ্জাবতীকে দেখতে না পেয়ে মহারাণী বিস্মিত হ'ল, কিন্তু তখন আর খোঁজাখুঁজি করবার সময় ছিল না। আবার ফিরে এল সে।

বলল, "আপনারা পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছেন। আপনাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করব কি?"

"তার আগে আপনার উত্তর চাই, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হল কিনা।"

"আমি আপনাকে আগে যা বলেছি, এখনও তাই বলছি। আমার বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই। কিন্তু এ ও আমি জানি শক্তিমানের প্রবল জেদ প্রবল জল-প্রপাতের মতো। তার সামনে দুর্বলের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সামান্য খড়-কুটোর মতো ভেসে যায়।"

অট্টহাস্য করে উঠলেন উদয়প্রতাপ।

"শক্তিমান সমুদ্রবিলাসের প্রবল জেদের সামনে যেমন একদিন ভেসে গিয়েছিলেন বিশ্বদেব শর্মা, মারা গিয়েছিলেন তাঁর বড় ছেলে সূর্যদেব—"

"বিশ্বদেব, সূর্যদেব কে?"

"ইতিহাসটা শুনুন তাহলে। বহুকাল আগে আপনার বাবার জমিদারিতে নির্মগাঁয়ে বিশ্বদেব শর্মা নামে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করতেন। আপনার তখন জন্ম হয়নি বোধহয়। বিশ্বদেব স্বদেশ হিতৈষী লোক ছিলেন তাই সিপাহীদের বিদ্রোহ সমর্থন করতেন তিনি। কিন্তু আপনার বাবা সমুদ্রবিলাসের মতি-গতি ছিল ঠিক উলটো। তিনি ছিলেন গভর্নমেণ্টের খয়ের খাঁ। তিনি হুকুম জারি করলেন আমার কোনও প্রজা যদি বিদ্রোহীদের সাহায্য করে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে তাকে। বিশ্বদেব স্বাধীন-চেতা লোক ছিলেন, সে হুকুম অগ্রাহ্য করলেন। কতকগুলি বিদ্রোহী সিপাহীকে আশ্রয় দিলেন তিনি নিজের বাড়িতে। ফল কি হল জানেন? সমুদ্রবিলাস তাড়িয়ে দিলেন তাঁকে নিজের জমিদারি থেকে। আপনাদের ওই ম্যানেজার—

যাঁর মুণ্ডটা আমি কেটে এনেছি- –নিজে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন তার বাড়িতে। শুধু তাই নয় পুলিশ লেলিয়ে দিলেন তাঁর পিছনে। ফৌজের গুলিতে তাঁর স্ত্রী আর বড় ছেলে ধড়ফড় করে মরে গেল তাঁর চোখের সামনে। নিজেদের কাজ হাসিল করবার জন্যে সাহেবরা স্ত্রীলোকদের উপরও গুলি চালাতে ইতস্তত করে না। ছোট ছেলে শঙ্করদেবকে নিয়ে বিশ্বদেব ঘুরে বেড়াতে লাগলেন দেশ থেকে দেশান্তরে ছন্নছাড়া ভিখারীর মতো। যেখানেই যান পুলিশ তাড়া করে। অবশেষে বিন্ধ্যাচলের এক সরাইখানায় শোচনীয় মৃত্যু হল তাঁর। ভিখারীর মতো মারা গেলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুশয্যায় আপনার কাকা পর্বতবিলাস উপস্থিত ছিলেন, তিনি সব জানতেন। বিশ্বদেব মারা গেলেন, কিন্তু বেঁচে রইল তাঁর ছোট ছেলে শঙ্করদেব

উদয়প্রতাপ চুপ করলেন।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে মহাবাণী বলল, "আমার বাবা সত্যিই দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক ছিলেন। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি তাঁর এ আচরণ সমর্থন করেন না অথচ আপনিও তো ঠিক তাই করতে যাচ্ছেন, এতে আশ্চর্য লাগছে একটু ও ঘটনার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি?"

'সম্পর্ক আছে বইকি। আমিই বিশ্বদেবের সেই ছোট ছেলে শঙ্করদেব উদয়প্রতাপ আমার ছদ্ম নাম।'

' বলেন কি।"

হঠাৎ বাড়ির ছাতটা মাথায় ভেঙে পড়লেও এত চমকে উঠত না মহাবাণী। উদয়প্রতাপ বলতে লাগলেন, 'বাবা মারা যাবার পর আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল এর প্রতিশোধ নওয়া, যে জমিদারি থেকে তিনি বিতাড়িত হয়েছিলেন সেই জমিদারির মালিক হওয়া, যে জমিদার তাঁকে বিতাড়িত করেছিলেন তাঁর আদরিনী কন্যাকে আমার দাসী করা। এই লক্ষ্য স্থির রেখে আমি জীবন নিয়ন্ত্রিত করেছি। অতি সতর্কভাবে আপনাদের প্রত্যেকটি খবর রেখেছি আমি। শক্তি সংগ্রহ করেছি। তারপর হঠাৎ গঙ্গার ঘাটে দেখতে পেলাম আপনাকে একদিন। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তারপর গেলাম আপনার কাকার কাছে। যদি ভদ্রভাবে বিয়েটা হয়ে যায়। আপনার কাকা আমাকে চিনতে পারেননি, আমিও নিজের আসল পরিচয় দিলাম না তাঁকে। উদয়প্রতাপের পরিচয়েই বিবাহের প্রস্তাব করলাম। তিনি রাজি হয়েছিলেন কিন্তু আপনি হলেন না। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার লোক আমি নই। দেখলাম শক্তিই প্রয়োগ করতে হবে। আজ ঠিক করে এসেছি, আপনাকে না নিয়ে আমি ফিরব না- "

"একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে। আপনার শক্তির উৎস কি?"

"এখন আর বলতে আপত্তি নেই। আমি ডাকাতি করি। এতে আমার ধনবল জনবল দুইই হয়েছে। আর তা হয়েছে বলেই আজ আমি লক্ষ্যে পৌঁছেছি।"

মহাবাণী চুপ করে রইল।

উদয়প্রতাপ বলতে লাগলেন "সেবার ভিক্ষা করতে এসেছিলাম, আপনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এবার দাবী নিয়ে এসেছি, আশা করি এবার আপনি আর বিমুখ হবে না। আমি চতুর্দোলা, পুরোহিত, বিয়ের সব আয়োজন নিয়ে এসেছি। ভোরের দিকে বিয়ের লগ্নও আছে

একটা। আপনি রাজি হলে ভদ্রভাবে বিয়ে হয়ে যাবে। আপনি আলো আর নহবতের ব্যবস্থা করেছেন দেখে আশা হচ্ছে আপনার মত হয়তো বদলেছে। আপনাদের পুরোহিত মশায় যদি সম্প্রদান করেন তাহলে প্রচলিত প্রথাতেই বিয়ে হবে। আর আপনি যদি তাতে রাজি না হন বাধ্য হয়ে আসুর মত অবলম্বন করতে হবে আমাকে। এখন কি করবেন আপনিই ঠিক করুন।"

"আমার একটি অনুরোধ আছে কেবল।"

"বলুন, অসম্ভব না হলে নিশ্চয়ই রাখব সে অনুরোধ।"

"আমাদের পূর্বপুরুষের স্থাপিত মা কালী জাগ্রত দেবতা। বিয়ের আগে তার অনুমতি নিয়ে আসুন।"

"অনুমতি! পাথরের প্রতিমা অনুমতি দেবেন কি করে?"

"আপনি তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে মাথা রেখে মনে মনে তাঁর অনুমতি চাইবেন। মা যদি অনুমতি দেন তাহলে তাঁর হাতের জবাফুলটি আপনার মাথার উপর পড়বে।"

"বেশ তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ফুল যদি না পড়ে--"

"তাহলে বুঝতে হবে এ বিয়েতে মায়ের সম্মতি নেই। তা সত্ত্বেও আপনি যদি বিয়ে করতে চান, করবেন। ঠাকুর দেবতার উপর আপনার বিশ্বাস আছে আশা করি "

"খুব আছে। আমরা ডাকাতি করি। কালীই তো আমাদের উপাস্য দেবতা। এসেই প্রথমে আপনার মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করে এসেছি। তাহলে আর দেরি করবেন না, ব্যবস্থা করে ফেলুন, এখনি গিয়ে মায়ের অনুমতি নিয়ে আসি—"

"আগে আপনার সঙ্গীদের খেয়ে নিতে বলুন। তারপর মন্দিরে ঢুকবেন।"

"আমি কিন্তু খাব না।"

" ওঁরা খেয়ে নিন।"

উদয়প্রতাপ হেসে বললেন, "বরযাত্রীরা আগে খেয়ে নিতে পারে, তাতে দোষ নেই। আচ্ছা, তাহলে সে-ই ব্যবস্থাই করুন। আমি বলে দিচ্ছি ওদের।"

উদয়প্রতাপ বেরিয়ে গেলেন।

জমিরুদ্দিন নহবতে বাগেশ্রী আলাপ করছিল।

উদয়প্রতাপের সঙ্গীরা ভূরি ভোজনান্তে তাকিয়া ঠেস দিয়ে কেউ পান চিবুচ্ছেন কেউ তামাক খাচ্ছেন। মদ গাঁজারও ব্যবস্থা ছিল, তা-ও সেবন করছেন অনেকে। উদয়প্রতাপও রয়েছেন তাদের মধ্যে। বিবাহ হবে না এ সন্দেহ আর কারও মনে নেই। বিনা রক্তপাতে যে এতবড় সম্পত্তিটা উদয়প্রতাপের করতলগত হল এতেই সবাই বেশী খুশী।

সঙ্গীদের মধ্যে একজন আর একজনকে বলছিলেন, "আর বউটা তো ফাও। সর্দারের ওরকম বউ প্রতি গ্রামে গ্রামে একটা দুটো করে আছে। তা সবসুদ্ধ পঞ্চাশটা হবে। শুনেছি এর মধ্যেই শতখানেক কাচ্চাবাচ্চাও হয়েছে—"

শ্রীহর্ষ এসে প্রবেশ কবলেন।

"এবাব চলুন তাহলে, অনুমতিটা নিয়ে নিন। আমি সঙ্কল্প কবে মাযেব হাতে জবাফুল দিয়ে এসেছি।"

"চলুন।"

শ্রীহর্ষেব পিছনে পিছনে উদযপ্রতাপ মন্দিবে গিয়ে ঢুকলেন । একটু ভয হল তাঁব, মন্দিবেব ভিতব সূচীভেদ্য অন্ধকাব।

"ভিতবে এত অন্ধকাব কেন?"

"অন্ধকাবেই অনুমতি নেওযা নিযম। মা কালী যে অন্ধকাবেবই দেবতা—"

উদযপ্রতাপকে মন্দিবে ঢুকিয়ে দিয়ে কপাটটি বন্ধ কবে দিলেন শ্রীহর্ষ, তাবপব দাঁডিয়ে বইলেন বন্ধদ্বাবেব সামনে।

এব একটু পবেই আর্তনাদটা শোনা গেল। কিন্তু একবাব মাত্র। শ্রীহর্ষ কপাট খুলে আলো জ্বেলে দিলেন। তাবপবই চিৎকাব কবে উঠলেন, "সর্বনাশ হযে গেছে যা আশঙ্কা কবেছিলাম। এই মবেছে—"

উদযপ্রতাপেব সঙ্গীবা দাডিয়ে উঠল অনেকে। তাবা সবিস্মযে দেখল কালীব প্রস্তব প্রতিমা অন্তর্হিত হযেছে, তাব স্থানে দাঁডিয়ে আছে জীবন্ত কালীমূর্তি, উত্থিত দক্ষিণ হস্তে বক্তাক্ত খড্গ, উদযপ্রতাপেব ছিন্নমুণ্ড বাম হাতে তুলে ধবে অট্টহাস্য কবছে।

চমৎকাব অভিনয কবছিল কষ্টি।

শ্রীহর্ষ দুহাত তুলে তাবস্বরে চিৎকাব কবতে লাগলেন, "আপনাবা যদি বাঁচতে চান পালান মা আজ বণবঙ্গিণী মূর্তি ধবেছেন, পালান, পালান আপনাবা এ স্থান ত্যাগ কবুন অবিলম্বে"

এব পবই সিংহেব গর্জন শোনা গেল।

পবমুহূর্তেই সিংহবাহিনীব মন্দিব থেকে মহাবাজেব পিঠে চডে বেরুল মহাবাণী, মাথায মুকুট, হাতে বল্লম।

আবাব চিৎকাব কবে উঠলেন শ্রীহর্ষ, "এ কি, মা জগদ্ধাত্রীও যে জীবন্ত হযেছেন দেখছি আজ, আব কাবো বক্ষা নেই, সবাই মববে আজ।"

উদযপ্রতাপেব সঙ্গীবা সবাই উঠে দাঁডিয়েছিল। ভয়ে ঠক ঠক কবে কাঁপছিল অনেকে। তাদেব দিকে বোষকষাযিত দৃষ্টিতে চেয়ে আব একবাব গর্জন কবে উঠল মহাবাজ। তাবপব একলম্ফে সিংহ দবজা দিয়ে বেবিয়ে গেল।

প্রায সঙ্গে সঙ্গে পালাতে লাগল উদযপ্রতাপেব সঙ্গীবা। কিছুক্ষণেব মধ্যেই অতিথিশালা খালি হযে গেল।

স্মিতমুখে দাঁডিয়ে বইলেন শ্রীহর্ষ।

কষ্টি আগেই পিছনেব দবজা দিয়ে ভিতবে চলে গিয়েছিল। শ্রী হর্ষ পিছনেব বাবান্দা থেকে প্রস্তব প্রতিমাটি এনে আবাব স্বস্থানে স্থাপন কবলেন।

।। ছয় ।।

শ্রীহর্ষ যখন বাড়ি ফিরলেন তখন প্রায় ভোর, কিন্তু অন্ধকার তখনও কাটেনি। টোলেব ছুটি ছিল, ছাত্রেরা বাড়ি চলে গিয়েছিল আগেব দিনই। যে চাকরটার বাইরে শোবার কথা দেখলেন সে নেই। তার সাড়া পেলেন না।

"সর্বমঙ্গলা—"

একটা কাল-পেঁচা বিকট চিৎকার করতে কবতে উড়ে গেল।

"সর্বমঙ্গলা—"

কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

শ্রীহর্ষের মনে হল ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। হঠাৎ নজরে পড়ল পালকিটা বাইরে পড়ে আছে, বেয়ারাগুলো নেই।

"সর্বমঙ্গলা—"

বারন্দায় উঠে সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে যাবেন এমন সময় কিসে যেন হোঁচট খেলেন। দবজার সামনে শুয়েছে কেন? অন্ধকারে বুঝতে পারলেন না কিছু?

"কে এখানে শুয়ে—"

কোন সাড়া নেই। তখন ভয় হল। নানাসাহেবেব কিছু হযনি তো। সর্বমঙ্গলা কোথা। হাতড়ে দেশলাই খুঁজে আলো জ্বাললেন একটা। জ্বেলে যা দেখলেন তাতে চক্ষুস্থিব হযে গেল তাঁর।

কপাটের সামনে সর্বমঙ্গলার রক্তাক্ত মৃতদেহটা পড়ে আছে।

পুলিশেব গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল তার। প্রাণ থাকতে সে পুলিশকে ভিতবে ঢুকতে দেযনি। পুলিশ ভিতবে ঢুকেছিল কিন্তু নানাসাহেবকে ধরতে পারেনি তাবা। পাতাল-ঘরটাই আবিষ্কাব কবতে পাবেনি। নানাসাহেব যথাসময়ে খিড়কিব দবজা দিযে বেরিযে নদীতীবেব বটবৃক্ষে আশ্রয় নিযেছিলেন।

শ্রীহর্ষ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হঠাৎ তাঁর মনে হল, এতক্ষণ দেবতাকে নিয়ে যে মিথ্যা অভিনয় কবলাম, হাতে হাতে তারই শাস্তি দিলেন ভগবান।

।। সাত ।।

মহারাজ মহাবাণীকে পিঠে নিয়ে ছুটতে লাগল।

মহাবাণীব ইচ্ছে ছিল তাকে নিয়ে সোজা শ্রীহর্ষের বাড়ির দিকে চলে যাবেন। মহাবাজ কিন্তু কিছুতেই সে রাস্তায় গেল না। স্বাধীনতা পেয়ে সে দুর্বার হয়ে উঠেছিল, বন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পাগলের মতো ছুটতে লাগল। মহারাণীর হাত থেকে বল্লমটা পড়ে গেল, সেটা আর মহারাণী কুড়িয়ে নিতে পাবল না, এত জোরে ছুটছিল মহারাজ। গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠে পড়ল সে, মাঠে বেরিয়ে তার গতিবেগ এত বেড়ে গেল যে তার পিঠে বসে থাকাই অসম্ভব হয়ে উঠল মহারাণীর পক্ষে। তবু সে বসে রইল। দুহাতে মহারাজের গলা ধরে তাব কেশরে

মুখ গুঁজে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে রইল তাকে। তার মনে হতে লাগল এখন মহারাজই তার জীবনের একমাত্র সম্বল, তাকে সে কিছুতেই ছাড়বে না। চোখ বুজে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রইল তাকে। লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে লাগল মহারাজ। মহারাণীর মাথার মুকুটটাও খুলে পড়ে গেল। মহারাণীর খেয়াল নেই। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ ঢুকে পড়ল একটা অড়রেব ক্ষেতে। তার ভিতরেও ছুটতে লাগল সে। মহারাণীর গা ছড়ে গেল, কাপড় ছিঁড়ে গেল।

"থাম একটু—কি করছিস—"

মহারাজ কিন্তু থামল না। ছাড়া পেয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল সে। অড়র ক্ষেত পাব হয়েই ছিল একটা নালা। মহারাজ একলাফে পার হয়ে গেল নালাটা, মহারাণী পড়ে গেল তার পিঠ থেকে। নালাতে জল খুব বেশী ছিল না, কাদাই ছিল বেশী। কাদায় জলে মাখামাখি হয়ে গেল মহারাণীর সর্বাঙ্গ। তবু নালা পেরিয়ে মহারাণী ওপারে গিয়ে উঠল, দেখল সামনের বিস্তৃত মাঠ ভেঙ্গে মহারাজ ছুটছে।

"ফিরে আয়, মহারাজ, ফিরে আয় বলছি—"

মহারাজ কিন্তু ফিরল না, দেখতে দেখতে মাঠটা পার হয়ে গেল সে। মাঠের ওপারে একটা জঙ্গল ছিল, তার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল মহারাণী, "মহারাজ, তুইও আমাকে ছেড়ে চলে গেলি—"

কান্নাব আবেগে তাব সমস্ত শবীরটা কাঁপতে লাগল।

মহারাজ কিন্তু তাকে ফেলে পালায়নি। ছাড়া পেয়ে মনের আনন্দে সে ছুটছিল, লাফাচ্ছিল, কিন্তু মহারাণীকে ফেলে পালাবার কথা মনেও হয়নি তার। বনের ভিতর ঢুকে মহাবাণীর জন্য সে অপেক্ষা করতে লাগল, প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাশা করতে লাগল মহারাণী আসবে ছুটতে ছুটতে এসে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে তার পিঠে। অনেকক্ষণ আশা করে বসে বইল সে, কিন্তু মহারাণী আর ফিরল না। বাগান থেকে তখন সন্তপর্ণে বেরুল মহারাজ। মাঠে বেরিয়ে মহাবাণী যেখানে পড়ে গিয়েছিল সেই দিকে চেয়ে বইল খানিকক্ষণ, তারপর ডাকল একবাব। মহাবাণী এল না। তবু বসে রইল সে। ...একটু দূরে বনের ভিতর থেকে বেবিয়ে এল দুজন অশ্বারোহী সাহেব। তারা খরগোশ শিকার করতে বেরিয়েছিল। হঠাৎ সিংহেব সম্মুখীন হতে হবে ভাবেনি। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। পরমুহূর্তেই গর্জন করে উঠল তাদের বন্দুক। রক্তাক্ত দেহে মহারাজ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

মহারাণীব সঙ্গে আর তার দেখা হল না।

রাত্রির অন্ধকার নেমেছে চারিদিকে।

সর্বমঙ্গলার শেষকৃত্য সমাপন করে শ্রীহর্ষ একা বসে আছেন বারান্দায়। অবিশ্রান্ত ঝিল্লীধ্বনিতে স্পন্দিত হচ্ছে অন্ধকার। শ্রীহর্ষ ভাবছেন দ্রুত লয়ে কি অদ্ভুত ঘটনা-পরম্পরা ঘটে গেল একদিনের মধ্যে। সমস্ত জীবনটাই যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। আবার যেন সব নূতন করে আরম্ভ করতে হবে। কিন্তু আরম্ভ করা যাবে কি? মহারাণী বাল্যকাল থেকে তাঁর জীবন নিয়ন্ত্রিত করছে। সে-ও কোথা চলে গেল। বাকী জীবনটা একাই কাটাতে হবে? ছাত্র আর টোল নিয়ে? কত কথা মনে হচ্ছিল তাঁর।

মহেন্দ্রনাথও নেই। সকালে তাঁকে খবব দিতে গিয়েছিলেন। গিয়ে শুনলেন তিনি নিরুদ্দিষ্টা বেদানাব খোঁজে বেবিয়েছেন, কবে ফিববেন ঠিক নেই। তাঁব ম্যানেজাব এসে সব ব্যবস্থা কবেছেন। তিনি এসে প্রথমেই পুলিশে খবব দিলেন। দাবোগা এসে বিপোর্টে লিখলেন— ‘‘মহাবাণী চৌধুবাণীব বাড়িতে কাল বাত্রে ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতদেব সঙ্গে মহাবাণীব ববকন্দাজেব সংঘর্ষেব ফলে ডাকাতেব সর্দাব উদযপ্রতাপ মাবা গেছে। উদযপ্রতাপ সঙ্গে কবে একটা পিতলেব হাঁড়ি নিয়ে এসেছিল। তাব ভিতব ম্যানেজাব কিশোবীমোহনেব ছিন্ন মুণ্ড পাওযা গেছে। কিশোবীমোহনকে আগেই খুন কবেছিল তাবা তাব বাড়িতে গিয়ে, মুণ্ডটা নিয়ে এসেছিল সম্ভবত মহাবাণীকে ভয দেখাবাব জন্য। কিশোবীমোহনেব বাড়িতে তাঁব ধড়টা পাওযা গেছে।’’ বিপোর্টে দাবোগা সাহেব এ সন্দেহও প্রকাশ কবলেন যে মহাবাণীকে যখন পাওযা যাচ্ছে না তখন সম্ভবত ডাকাতবাই তাকে ধবে নিয়ে গেছে। তাব খোঁজে চাবিদিকে লোক পাঠানো হয়েছে।

এদিকে আব এক কাণ্ড হযেছিল। শ্রীহর্ষেব বাড়িতে নানাসাহেবকে না পেয়ে ক্রুদ্ধ ক্যাপটেন ভাবলেন কিশোবীমোহন লোকটি ধূর্ত এবং পাজি। তাঁব সন্দেহ হযেছিল মিথ্যা সংবাদ সববববাহ কবে কিশোবীমোহন ইচ্ছে কবে পুলিশবাহিনীকে বিপথে চালিত কবেছে এবং অন্যদিক দিয়ে হযতো নানাসাহেবকে পালাতে সাহায্য কবেছে। শ্রীহর্ষেব বাড়ি থেকে তাই তাঁবা সোজা হানা দিয়েছিলেন কিশোবীমোহনেব বাড়িতে। সেখানে কিশোবীমোহনকে তাবা পাননি। বঞ্জাবতীকে পেয়েছিলেন, তাকেই ধবে নিয়ে গেছেন। মুণ্ডহীন লাশেব কাছে বঞ্জাবতীকে দেখে তাদেব আবও সন্দেহ হযেছিল যে মেয়েটি শযতানী।

শ্রীহর্ষ ভাবছিলেন। মহাবাণীব খোঁজে যাবা বেবিয়েছে তাদেব মধ্যে একজনও ফেবেনি এখনও

হঠাৎ শ্রীহর্ষ চমকে উঠলেন।

উঠোনেব অন্ধকাবে আবছা-মূর্তি দেখা যাচ্ছে কাব।

‘‘কে?’’

আলোটা কমানো ছিল একধাবে, সেটাকে বাড়িয়ে দিলেন।

‘‘এ কি মহাবাণী! এ কি চেহাবা তোমাব— ’’

মহাবাণীকে ভিখাবিনীব মতো দেখাচ্ছিল।

‘‘ কোথা ছিলে সমস্ত দিন —’’

মহাবাণী কোন কথা না বলে এগিয়ে এল ধীবে ধীবে, তাবপব শ্রীহর্ষেব পাযেব উপব মাথা বেখে পা দুটো জড়িয়ে ধবল তাব।

অগ্নীশ্বর

।। এক ।।

ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায় সার্থকনামা ব্যক্তি। জানিনা এখন তাঁহার চেহারা কেমন আছে, কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্বে তিনি দেখিতে মূর্তিমান অগ্নিশিখার মতোই ছিলেন, যেমন উজ্জ্বল তেমনি প্রখর। কিন্তু অগ্নির সহিত তাঁহার সাদৃশ্য ওইখানেই শেষ হইয়াছে। তাঁহার বাহিরের খোলসটার অন্তরালে, তাঁহার মর্মভেদী ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ তীব্রতার নেপথ্যে যে স্নেহাতুর আদর্শবাদী ন্যায়পরায়ণ পরার্থপর সত্তাটি ছিল লেলিহান অগ্নিশিখার তাহা থাকে না। তাঁহার এই সত্তাটি কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই নয়নগোচর হইত না। তিনি যখন কাহারও হৃদয় বা মস্তক লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিতেন, তখন সে বেচারীর মনে রাগ ছাড়া অন্য কোন ভাবোদ্রেক হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত না। তিনি অন্য ভাবোদ্রেক করিতে চাহিতেনও না। লোকে যেমন মশা, ছারপোকা, সাপ, ব্যাঙকে ঘর হইতে তাড়ায়, তিনি তেমনি অধিকাংশ লোককে নিজের সান্নিধ্য হইতে বিতাড়িত করিতেন। কোন প্রকার বোকামি, গোঁড়ামি, ভণ্ডামি, ন্যাকামি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রায়ই বলিতেন—বাইবেলে পড়েছি মানুষের মুখে একটা ডিভাইন লুক (Divine look) আছে, কিন্তু আমি তো বোভাইন লুক (Bovine look) ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাই না। তার সঙ্গে পেজোমিরও মিশেল আছে। সব বোকা বদমাইসের দল।

এঁর সঙ্গে আমার প্রথম সংস্পর্শ ছাত্র-জীবনে। ইনি তখন ছিলেন রেলের মেডিকেল অফিসার। সে যুগে গভর্ণমেণ্ট অফিসারই রেলের মেডিকেল অফিসাররূপে কাজ করিতেন।

অগ্নিশ্বর মুখোপাধ্যায় কাছে যোগদান করিয়াই এমন একটা কাণ্ড করিলেন যে রেলের বাবুদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। তিনি আসিয়াই শুনিলেন যে, তাঁহার পূর্ববর্তী মেডিকেল অফিসার অন্নদা ঘোষালের সহিত রেলের বাবুরা নাকি বড়ই দুর্ব্যবহার করিয়াছেন। ডাক্তার ঘোষাল ভালো-মানুষ লোক ছিলেন, সকলকে বিনাপয়সায় দেখিতেন, বিনাপয়সায় সার্টিফিকেটও দিতেন। যে যখন ডাকিত তখনই ছুটিতেন। কিন্তু সাধারণত যাহা হয় তাহাই হইল। সকলকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত তিনি সকলকেই অসন্তুষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার নামে ওপরওলার কাছে দরখাস্ত গেল, তিনি যে মিথ্যা সার্টিফিকেট দেন তাহাও প্রমাণিত হইল। ডাক্তার ঘোষাল হতমান হইয়া বদলি হইয়া গেলেন। তাঁহার সার্ভিস-রেকর্ডে কলঙ্কের ছাপ পড়িল। অগ্নীশ্বর যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র, ডাক্তার ঘোষাল তখন সেখানে হাউস-সার্জন ছিলেন। তাই তাঁহাকে তিনি মাস্টার মশাই বলিয়া ডাকিতেন এবং তাঁহার উদার স্বভাবের জন্য ভক্তিও করিতেন। চার্জ লইবার সময় ডাক্তার ঘোষালের মুখে অগ্নীশ্বর সমস্ত শুনিলেন এবং তাহার চোখে জল দেখিয়া বিচলিতও হইলেন। ঘোষাল ধরা-গলায় বলিয়া গেলেন, "বিশ্বাস কর, ওদের ভালর জন্যেই এসব করেছিলাম আমি। ওরা শেষটা যে আমাকে এমন দাগা দেবে, তা আমি ভাবতে পারিনি।"

পরদিন সকালে অগ্নীশ্বর আফিসে গিয়া দেখিলেন যে, একটি স্থূলকায়, বেঁটে, কালো লোক একটি চেয়ারে গদিয়ান হইয়া বসিয়া আছে।

"নমস্কার, আপনিই নতুন ডাক্তারবাবু নাকি—"

"হ্যাঁ। আপনি কে—"

"আমার নাম সর্বেশ্বর সান্যাল। আমি এখানকার ডি-টি-এস আফিসের বড়বাবু—"

"আমার সঙ্গে কি দরকার আপনার—"

"আজ তিনদিন থেকে আমার ছোট্ট মেয়েটার হুপিং কাশি হয়েছে—"

"আপনি এখানে কেন। বাইরে বারান্দায় ওই কাঠের রেলিংটার ওপারে গিয়ে দাঁড়ান। তারপর ডাক্তার লতিফ আপনার মেয়ের কথা শুনে ওষুধের ব্যবস্থা করে দেবেন। এখানে রোগীদের বসবার জায়গা নয়, বাইরে যান—"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে এমন একটা দৃঢ়তা ধ্বনিত হইল যে সর্বেশ্বরবাবু উঠিয়া পড়িলেন।

"আমরা এখানেই তো বরাবর বসে এসেছি।"

"আর বসতে পাবেন না।"

"কারণটা জানতে পারি কি—"

"কারণ আপনি চেরিটেব্ল হাসপাতালে ওষুধ ভিক্ষে করতে এসেছেন। ভিকিরিদের কেউ চেয়ারে বসতে দেয় না। বসতে দেবার নিয়ম নেই। ওই দেখুন, লেবেল লটকানো রয়েছে—ফর আউটডোর পেশেণ্টস—ওইখানে যান।"

"আপনি কোন প্রেসক্রিপশন দেবেন না?"

"এখন দেব না। ডাক্তার লতিফের ওষুধে যদি না সারে আর তিনি যদি আমাকে দেখতে বলেন তখন দেখব, তার আগে নয়।"

অগ্নীশ্বর টং করিয়া টেবিলের ঘণ্টা বাজাইলেন। চাপরাশি প্রবেশ করিল।

"বাবুকে আউটডোরে নিয়ে যাও। আমার বিনা হুকুমে এখানে কাউকে ঢুকতে দেবে না। যদি দাও, চাকরি যাবে।"

চাকরির প্রথম দিনেই তিনি যে চাবুক হাঁকড়াইলেন, তাহা সেখানকার রেলওয়ে কলোনীর সকলের পিঠে জ্বালা ধরাইয়া দিল। কিন্তু তিনি চাবুক সম্বরণ করিলেন না, সপাসপ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটিল সেইদিনই সন্ধ্যায়।

"ডাক্তারবাবু, আমার ছেলেটার সাতদিন থেকে জ্বর ছাড়ছে না, যদি—"

"আজ তো হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গেছে। কাল সকাল আটটায় ডাক্তার লতিফের কাছে যাবেন—"

"আমি আপনাকে 'কল' দিতে এসেছি।"

"আমি ষোল টাকার কম ফি নিই না, সেটা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। আর টাকাটা অগ্রিম জমা করতে হবে।"

ভদ্রলোক বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে অগ্নীশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অগ্নীশ্বর অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমি অন্নদা ঘোষাল নই, আমি অগ্নীশ্বর মুকুজ্যে। আমার নিয়মকানুন অন্য রকম—"

ভদ্রলোকটি সহসা বলিয়া ফেলিলেন, "আপনি ডাক্তার, না পিশাচ—"

"পিশাচ।"

"বেশ, এই নিন ষোল টাকা। চলুন—"

অগ্নীশ্বর তাহার বাসায় গেলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া ছেলেটিকে পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর একটি প্রেসক্রিপশন লিখিয়া চলিয়া আসিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে সেই ভদ্রলোকটি ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "আপনি রুগীর বিছানায় আপনার ফি'টা ফেলে এসেছেন সার।"

"না, আমি ফেলে আসিনি। ও আর কেউ ফেলে গেছে বোধহয়—"

ভদ্রলোক বিস্মিত হইয়া চলিয়া গেলেন। যে জ্বর সাতদিনে ছাড়ে নাই তাহা তাহার পরদিনই ছাড়িয়া গেল।

তৃতীয় চাবুকটি পড়িল বীরু মিত্তিরের পিঠে। তিনিও অগ্নীশ্বরকে কল দিয়াছিলেন স্ত্রীর জ্বরের জন্য। অগ্নীশ্বর তাঁহাকে একটি প্রেসক্রিপশন লিখিয়া দিলেন, কুইনিন মিকশ্চার। ছয় দাগ। তিন দাগ খাইয়াই জ্বর ছাড়িয়া গেল। হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাসী বীরু মিত্তির আবার অগ্নীশ্বরের কাছে গেলেন।

"সার, তিন দাগ খেয়েই জ্বরটা ছেড়ে গেছে। বাকী তিন দাগ খাওয়াব কি? শুনেছি কুইনিন ওষুধটা একটু তীব্র—"

অগ্নীশ্বর একটা বই পড়িতেছিলেন। বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "আপনার গালে যদি ঠাস ঠাস করে ছ'টা চড় মারা দরকার হয় তিন চড়ে শানাবে কি? ছ'টা চড়ই মারতে হবে। তিন দাগ ওষুধে হলে আমি ছ'দাগ দিয়েছি কেন—"

অগ্নীশ্বর চোখ পাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, বীরু মিত্তির অবিলম্বে সরিয়া পড়িলেন।

চতুর্থ যে ঘটনাটি পল্লবিত হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল সেটি ঘটিয়াছিল প্রায় মাসখানেক পরে।

স্থানীয় রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার যোগেশ রক্ষিত রেলওয়ে কোম্পানীতে একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি। গোঁফ-জোড়া বেশ পুষ্ট, বুকের ছাতি বেশ চওড়া, হাত-পায়ের পেশীগুলি বেশ সমৃদ্ধ। চোখ দুটি বেশ বড় বড় এবং লাল। দেহের বর্ণ মসীনিন্দিত। তাঁহার গর্ব যে তিনি যার-তার সহিত মেশেন না। আলাপ করিবার মতো লোকই নাই শহরে, এই তাঁহার ধারণা। মাঝে মাঝে ফিরিঙ্গি ডি টি-এস মিস্টার স্কটের বাড়িতেই যান, যখন সময় পান। ডাক্তার অন্নদা ঘোষালকে তিনি মানুষের মধ্যেই গণ্য করিতেন না। বলিতেন, উনি হচ্ছেন কাদার গোঁজ। যে দিকে টান সেই দিকেই হেলিয়া থাকিবে। যদিও অগ্নীশ্বরের কড়া ব্যবহারে সকলে প্রথমটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু অগ্নীশ্বর নিজের ব্যক্তিত্ব, চিকিৎসা-নৈপুণ্য এবং চরিত্রের জোরে সকলের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, মাখনের তালের ভিতর ছুরির মতো। তাঁহাকে অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। তিনি কড়া লোক সন্দেহ নাই, কিন্তু ডাক্তারও

অসম্ভব রকম ভাল। তাছাড়া, কিছুদিনের মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িল তিনি লেখকও। ছবিও আঁকিতে পারেন। ছদ্মনামে সে-সব লেখা আর ছবি ছাপাও হয়। কিছুদিনের মধ্যেই আশঙ্কা-সম্মান-কৌতূহল-মিশ্রিত একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন তিনি নিজের চারিদিকে। তিনি কখনও কাহারও বাড়িতে যাইতেন না। অবসর সময়ে নিজের ড্রইংরুমের ইজিচেয়ারে বসিয়া থাকিতেন, আর পা দোলাইতেন, মুখে চুরুট, হাতে বই।

ইঞ্জিনিয়ার যোগেশ রক্ষিত একদিন স্থির করিলেন, তিনি অগ্নীশ্বর ডাক্তারের উপর অনুগ্রহ করিবেন, অর্থাৎ তাঁহার বাড়ি গিয়া তাঁহার সহিত গল্প করিয়া আপ্যায়িত করিবেন তাঁহাকে। গেলেন একদিন। অগ্নীশ্বরের সহিত তাঁহার সাধারণভাবে আলাপ ছিল, একজন অফিসারের সঙ্গে আর একজন অফিসারের যেমন থাকে।

"গুড মর্নিং ডাক্তারবাবু, কেমন আছেন—"

"প্রবলভাবে ভাল আছি। 'ঘরে-বাইরে' পড়ে শেষ করলুম একটু আগে—"

"ঘরে-বাইরে? সেটা আবার কি!"

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেছেন?"

"হ্যাঁ, ওই যিনি বোলপুরে শান্তিনিকেতন করেছেন তিনিই তো—"

"হ্যাঁ, তিনি বইও লেখেন।"

"ও।"

ইহার পর রক্ষিত মহাশয় যে-সব গল্প ফাঁদিলেন তাহা ইঞ্জিনিয়ারিং গল্প এবং সমস্ত গল্পগুলির মধ্যে তাঁহার 'আমিত্ব' কলকল-নিনাদে আত্মজাহির করিতে লাগিল। তিনি কোথায় কোথায় ব্রিজ ডিজাইন করিয়াছেন, কোন-কোন বিলাতী-ডিগ্রীধারী ইঞ্জিনিয়ারকে 'থ' করিয়া দিয়াছেন, তিনি না থাকিলে রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট কিভাবে অচল হইয়া যাইত—এইসব গল্প।

হঠাৎ অগ্নীশ্বর বলিলেন, "দেখুন দেখুন, কেমন একটা অদ্ভুত পাখী। ল্যাজটা ঠিক সাপের মতো—"

"কই—"

"ওই যে তেঁতুলগাছের ডালটায় বসে আছে।"

রক্ষিত মহাশয় ভালো করিয়া দেখিবার জন্য জানলার ধারে গেলেন এবং ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিলেন।

"কই মশায়, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।"

"পাবেন না, চলে আসুন।"

"পাব না কেন। দেখি দাঁড়ান, কোন ডালটায়—"

"ওরকম পাখী নেই ওখানে। চলে আসুন। আমি আপনার বাক্যস্রোতে 'ড্যাম' দিয়ে দিলুম একটা। কথার তোড়ে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আসুন, চা খান—"

বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম আনিয়াছিল। অগ্নীশ্বর নিজেই চা ঢালিয়া দিতে লাগিলেন।

গল্প আর জমিল না।

"আজ উঠি। টেবিলের উপর ও বইটা কি?"

"ঘরে-বাইরে।"

"ও, সেই যেটার কথা বলছিলেন। নিয়ে যেতে পারি কি?"

"যান।"

"আপনার নানারকম বইটই কেনার বাতিক আছে, না?"

"তা আছে। আপনাদের মতো লোকের সঙ্গ তো জোটে না বড় একটা। বইটই নিয়েই থাকি।"

রক্ষিত মহাশয় দুই দিন পরেই 'ঘরে-বাইরে' খানি হাতে লইয়া আবার দেখা দিলেন।

"কি একটা বাজে বই দিয়েছেন মশাই। যাকে বলে ইম্মরাল, এ একেবারে তাই। আমাদের ঝক্‌সু সর্দার কিছুদিন আগে একটা কুলির বউকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিল, এ যে দেখছি সেই গল্পই। আরে ছি ছি ছি। একটা ভালো বই দিন এবার।"

"ভালো বই? ভেবে দেখি দাঁড়ান, ভালো বই কি আছে আমার? ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে একখানা—"

অগ্নীশ্বর ভিতরে ঢুকিয়া গেলেন এবং একটা মোটা পাঁজি বাহির করিয়া আনিলেন।

"এইটে নিয়ে যান, অনেক ভালো ভালো কথা আছে এতে, ভালো লাগবে আপনার—"

যোগেশ রক্ষিতের চক্ষুস্থির হইয়া গেল।

"আমাকে ঠাট্টা করছেন?"

"পাগল! অতটা বেরসিক আমি নই। হিজড়ের সঙ্গে প্রেম করা যায় নাকি!"

অগ্নীশ্বর আর বাক্যব্যয় না করিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। সেইদিন হইতে যোগেশ রক্ষিতও তাহার শত্রু হইয়া গেল। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইত তাঁহাকে। বাড়িতে আসন্নপ্রসবা কন্যা, স্ত্রীর হাঁপানি, নিজেরও হাই ব্লাডপ্রেসার, অগ্নীশ্বরকে তিনি পুরাপুরি বয়কট করিতে পারিলেন না। আর যাই হোক, লোকটা ডাক্তার ভালো। তাঁহার কচি মেয়েটা কাসিয়া কাসিয়া সারা হইতেছিল, শহরের কত ডাক্তারের কত ওষুধই খাওয়ানো হইল, কিছুতেই কিছু হয় নাই। অগ্নীশ্বরকে ডাকা হইল, তিনি বলিলেন, "নাকে একটু করে তেল বা লিক্যুইড প্যারাফিন দিন তাহলেই সেরে যাবে। কোন ওষুধ খাওয়াতে হবে না।"

তাই করা হইল এবং মেয়েটা সারিয়া গেল। সুতরাং অগ্নীশ্বরের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে ঝগড়া তিনি করিতে পারিলেন না। কিন্তু হৃদ্যতাটা আর রহিল না। অগ্নীশ্বর কাহারও সহিত হৃদ্যতা করিতে চাহিতেনও না।

পঞ্চম যে ঘটনাটি ঘটিল তাহা আরও চাঞ্চল্যজনক! সাহেবমহল পর্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল।

ডি-টি-এস মিস্টার স্কটের স্ত্রী আসন্নপ্রসবা। অগ্নীশ্বর একদিন গিয়া তাঁহাকে যথাবিধি পরীক্ষা করিয়া উপদেশ প্রভৃতি দিয়া আসিয়াছিলেন।

দিন দুই পরে এক বেয়ারা সাহেবের এক চিঠি লইয়া আসিল।

Doctor, come immediately. My wife is not feeling well.

একটা প্লীজ পর্যন্ত লেখে নাই লোকটা।

অগ্নীশ্বর গেলেন না। তাঁহার অধীনে আবদুল লতিফ নামে যে সাব এসিস্টেন্ট সার্জন ছিলেন তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি গিয়ে দেখে আসুন ব্যাপারটা কী। যদি দরকার হয় আমি যাব। যে অ্যাপেন্‌ডিসাইটিস কেসটা রেডি করতে বলেছিলাম সেটা রেডি হয়েছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"ওটা এখুনি অপারেশন করব। সব ঠিক করতে বলুন। আর আপনি গিয়ে চট করে দেখে আসুন মিসেস স্কটের কি হয়েছে—"

ডাক্তার আবদুল লতিফ প্রবীণ ব্যক্তি, সেকেলে মুসলমান। লম্বা দাড়ি, চুস্ত পাজামা-আচকান-পরা, মাথায় লাল রঙের টিকিওলা মুসলমানী টুপি। পান জরদা খান, দাঁতগুলি কালো। অতিশয় সজ্জন।

তিনি অগ্নীশ্বরের আদেশ শুনিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "হুজুর, আমাকে উনি ডাকেননি, আপনাকে ডেকেছেন। সাহেবটা একটু বাঘা গোছের। আমি গেলে কিছু বলবে না তো—"

"যদি বলে তখন ব্যবস্থা করা যাবে। আপনি গিয়ে বলুন, আমি একটা অপারেশন করছি, এখন যাবার উপায় নেই। তেমন সিরিয়াস যদি কিছু হয়ে থাকে, যাব—"

আধঘণ্টা পরে আবদুল লতিফ ফিরিয়া আসিলেন। মুখ থমথম করিতেছে।

"আমাকে যাচ্ছেতাই অপমান করে তাড়িয়ে দিলে হুজুর। এমন অপমানিত আমি জীবনে হইনি। আমি আগেই আপনাকে বলেছিলাম—"

আবদুল লতিফের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।

"I am extremely sorry, Dr. Lafif. লোকটা যে এরকম বর্বর তা আন্দাজ কবতে পারিনি। আমাকে ক্ষমা করুন।"

ডাক্তার লতিফের দুই হাত ধরিয়া তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

একটু পরেই মিস্টার স্কটের নিকট হইতে আর একটি পত্র আসিল। চিঠির সুরটি একটু গরম। চিঠির বাংলা মর্ম এই—

"আমি চাই তুমি আসিয়া আমার স্ত্রীকে দেখ। ওই জরদ্‌গব লতিফকে দেখাইবার ইচ্ছা নাই। তুমি অবিলম্বে চলিয়া এস।"

অগ্নীশ্বর উত্তর দিলেন।

"সরি, আমার এখন যাইবার উপায় নাই। একটি অপারেশন লইয়া ব্যস্ত আছি। যদি আমার দেখা নিতান্তই প্রয়োজন মনে করেন, মিসেস স্কটকে এখানেই পাঠাইয়া দিবেন। আমি একটি নার্স, চারটি বেয়ারা এবং একটি স্ট্রেচার পাঠাইয়া দিতেছি।"

বলা বাহুল্য, মিসেস স্কট স্ট্রেচারবাহিত হইয়া আসিলেন না। তাঁহার পেটের একধারটা সামান্য কুন্ কুন্ কবিতেছিল মাত্র। স্ট্রেচার যখন গেল তখন তাহাও কমিয়া গিয়াছিল।

ডি-টি-এস কিন্তু চটিয়া আগুন হইয়া রহিলেন। একটা নেটিভ ডাক্তার, তা হউন না তিনি মেডিকেল অফিসার, তাঁহার এতবড় স্পর্ধা! হাসপাতাল কমিটির তিনি একজন সদস্য ছিলেন। একটি মিটিংয়ে তিনি অগ্নীশ্বরকে বলিলেন, "দেখ ডাক্তার, তোমার বিরুদ্ধে অনেক

নালিশ শুনিতেছি। এমন কি, আমাব সহিতও তুমি যে ব্যবহাব কবিযাছ তাহা ভদ্রজনোচিত নহে, তুমি যদি—''

অগ্নীশ্বব তাঁহাকে থামাইযা দিযা বলিলেন. ''আপনাবা সুসভ্য জাতিব প্রতিভূ। আপনাদেব ব্যবহাব, পোশাক. ভাষা সব আমবা নকল কবি। সেদিন আপনি আপনাব পিতাব বযসী ডাক্তাব লতিফেব সহিত যে ব্যবহাব কবিযাছিলেন তাহা কি ভদ্রজনোচিত?''

বলিযাই অগ্নীশ্বব উঠিযা যাইতেছিলেন, সাহেব বলিলেন, ''দেখ ডাক্তাব মুখার্জি, আমিই এই বেলওযে কোম্পানীব দণ্ড-মুণ্ডেব কর্তা, আমি যদি ইচ্ছা কবি, তোমাকে খুব বিপদে ফেলিতে পাবি, একথাটাও ভুলিও না।''

''না, ভুলিব ন , আমাব স্মৃতিশক্তি খুব খাবাপ নয।''

সাতদিন পবেই এক বিপর্যয কাণ্ড ঘটিল। ওই জংশনটি হইতে প্রত্যহ কুডিটি গাডি ছাডিত। একদিন দেখা গেল, একটি গাডিও ছাডিবাব আশা নাই। অগ্নীশ্বব সমস্ত ড্রাইভাবগুলিকে সিক্ সার্টিফিকেট দিযাছেন। একটিও বাডতি ড্রাইভাব নাই। ডি টি এস আপিসেও এত অধিকসংখ্যক কেবানী সহসা অসুস্থ হইযা পডিযাছে যে আপিস বন্ধ হইবাব উপক্রম।

মিস্টাব স্কট অগ্নীশ্বব মুকুজ্যেব নিকট ছুটিযা আসিলেন।

এ কি কাণ্ড ডাক্তাব মুখার্জি। এতগুলি লোক একসঙ্গে 'সিক' হইল কি কবিযা?''

'চট কবিযা' তো ইহাব জবাব দিতে পাবি না, বইটই ঘাটিযা দেখিতে হইবে তবে এদেশে ম্যালেবিযা ইনফ্লুযেঞ্জা এইরূপ ঝাকে ঝাঁকেই হয। গোটা দুই অ্যাপেনডিকস, গোটা ছযেক হেপাটাইটিস কযেকটা প্লুবিসিও আছে– ''

''উহাবা কি কাজ কবিতে অক্ষম– ''

আমাদেব শাস্ত্রানুসাবে উহাদেব শুইযা থাকা উচিত। কিন্তু আপনি দণ্ডমুণ্ডেব কর্তা, আপনি হুকুম কবিলে হযতো উহাবা কাজে যোগ দিবে। তবে যদি কেহ মবিযা যায তাহাব দাযিত্ব আপনাব. আমাব নয। কাবণ, আমাব মতে উহাদেব এখন শুইযা থাকা উচিত. আমি এখন উহাদেব একজনকেও ফিট্ সার্টিফিকেট দিব না।''

মিস্টাব স্কট অনন্যোপায হইযা অগ্নীশ্ববেব চাকবিব যিনি হর্তা কর্তা বিধাতা সেই আই-জি'কে টেলিগ্রাম কবিলেন। আই জি আসিযা অগ্নীশ্ববকে দেখিযা বলিযা উঠিলেন. ''হ্যালো. আগ্নী, তুমি এখানে। হোযাটস দি বাউ অ্যাবাউট?''

অগ্নীশ্বব যখন মেডিক্যাল কলেজেব ছাত্র ছিলেন, তখন এই আই-জি ছিলেন সেখানকাব অধ্যাপক। প্রায সব বিষযে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত অগ্নীশ্ববকে সেকালেব কোন অধ্যাপকই ভোলেন নাই। এই আই জি তো তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ কবিতেন।

তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন কবিলেন, ''ব্যাপাব কি।''

''ব্যাপাব কিছুই নয। আমি যাদেব সিক্ মনে কবেছি, তাদেব চিকিৎসাব ব্যবস্থা কবে হাসপাতালে ভর্তি কবেছি। এব জন্যেই আমি মাইনে পাই। বেলগাডি চলবে কি না, ডি টি এস আপিস চলবে কি না, দ্যাট ইজ্ নট্ মাই কনসার্ন, ও নিযে মাথা ঘামাবাব কথা নয আমাব--।''

আই জি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শুনিতেছিলেন, তাঁহার দৃষ্টি হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতে লাগিল অগ্নীশ্বরকে তিনি চিনিতেন।

"এ সব তো শুনেছি, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি—"

অগ্নীশ্বর এবার হাসিয়া ফেলিলেন, "সেটা তো সাব কথায় বলা যাবে না। এই রেলওয়ে কলোনীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তার ভদ্রতা-জ্ঞানের সমালোচনা আমার মুখে মানাবেও না।"

"কি হয়েছে বল না। স্পীক দি ট্রুথ —"

তখন অগ্নীশ্বর তাঁহাকে আগাগোড়া সব বলিলেন। সেকালে সাহেবদের মধ্যেও ভাল লোক অনেক ছিল। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'ঠিক করেছ তুমি।'

লিখিয়া গেলেন ইনফ্লুয়েঞ্জা আর ম্যালেরিয়া এপিডেমিকের জন্যই এতগুলি লোক একসঙ্গে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। রেলের কাজ চালাইবার জন্য বাহির হইতে লোক আনানো হউক যাইবার পূর্বে তিনি ডি-টি-এস মিস্টার স্কটকে আড়ালে বলিয়া গেলেন "অগ্নি খাঁটি ইস্পাতের তৈরি শাণিত তরবারি। উহাকে যদি ঠিক মতো ব্যবহার করিতে পার অনেক উপকার পাইবে। বোকার মতো নাড়াচাড়া করিলে কিন্তু রক্তারক্তি হইবার সম্ভাবনা'

এই ব্যাপারে অগ্নীশ্বরের খাতির আরও বাড়িয়া গেল। অমন দুঁদে স্কটকে নাজেহাল করিয়াছে, একি সোজা লোক!

যে স্টেশনে অগ্নীশ্বর মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন তাহার দুই স্টেশন পরে এক গাঁয়ে আমি থাকিতাম। আমি তখন স্কুলে পড়ি কিন্তু অগ্নীশ্বরের কীর্তিকলাপ আমার অবিদিত ছিল না। তাঁহার চতুর্দিকে যে মহিমা দ্যুতি বিকিরিত হইতেছিল, তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল অনেক দূর পর্যন্ত। তাঁহার সম্বন্ধে প্রতিটি গল্প পল্লবিত হইয়া আমাদের চিত্তকে রঞ্জিত করিয়া দিত

এই লোকটিকে প্রত্যক্ষ দেখিবার সুযোগ একদিন আমার ঘটিয়া গেল। আমাদের বাড়িতে আমাদের দূর সম্পর্কীয়া একটি ভগ্নী আসিয়াছিলেন, তিনি সাংঘাতিক নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইলেন। স্থানীয় ডাক্তার কুলদাবাবুর চিকিৎসাসত্ত্বেও রোগ বাড়িতে লাগিল শেষে স্থির হইল ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়কে ডাকা হোক। আমার উপর ভার পড়িল তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার। আমার বয়স তখন ষোল বছর, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া বাড়িতে বেকার বসিয়া আছি কুলদাবাবুর পত্র লইয়া গেলাম তাঁহার কাছে। তাঁহার চেহারা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম সত্যিই এ যে জ্বলন্ত অগ্নি।

পত্র পড়িয়া বলিলেন, "আচ্ছা, যাব চারটের ট্রেনে। তুমি খেয়ে এসেছ?"

"জলখাবার খেয়ে এসেছি। খেয়ে নেব এখানে কোথাও হোটেলে"

"হোটেলে কেন। আমার এখানে খেতে আপত্তি আছে তোমার? ও, আমি মুরগি খাই, সেটা টের পেয়ে গেছ বুঝি—"

কি বলিব, কুণ্ঠিত মুখে চুপ করিয়া রহিলাম।

"মুরগি খেয়েছ এর আগে?"

"না।"

"খেতে আপত্তি আছে?"

"আছে।"

"বিপদে ফেললে দেখছি। মাছ খাও তো?"

"খাই।"

"বেশ, মাছের ঝোল ভাতেরই ব্যবস্থা হবে।"

খাইতে বসিয়া অনুভব করিলাম, আমার জন্য মৈথীল পাচক দিয়া আলাদা রান্না করানো হইয়াছে। তিনি নিজে খান বাবুর্চির হাতে, সাহেবী খানা। তখনও বিবাহ করেন নাই, বাড়িতে স্ত্রীলোক নাই বাবুর্চি আর খানসামার সংসার। উদ্যানের একধারে দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড খাঁচায় কতকগুলো মুরগি।

আমি সমস্ত দিন ছিলাম, কিন্তু তাঁহার সহিত কথাবার্তা বিশেষ হয় নাই তিনি হাসপাতালেই প্রায় সর্বক্ষণ ছিলেন পড়িবার জন্য আমাকে খানকয়েক বই দিয়া গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' খানাও ছিল সেটা আগে পড়ি নাই, পড়িয়া ফেলিলাম। ট্রেন ছাড়িবার কিছুক্ষণ পূর্বে আসিয়া হাজির হইলেন তিনি। স্নান করিলেন তাহার পর বলিলেন, "চল এইবার ট্রেনের আর বেশি সময় নেই বইগুলো পড়েছ?"

"ঘরে বাইরেটা পড়েছি—"

"কেমন লাগল?"

"ভাল লেগেছে। কিন্তু সন্দীপ আর একটু বেপরোয়া হ'লে আরও ভাল লাগত "

"বাঃ ছোকরা, তোমার তো বেশ বুদ্ধি আছে দেখছি। খুব খুশী হলুম "

আয়নার সামনে দাড়াইয়া টাই বাঁধিতে বাঁধিতে বলিলেন, "আরও খুশী হয়েছি তুমি মুরগি খাওনি দেখে। আমার গোড়ে গোড় মিলিয়ে তুমি যদি মুরগি খেতে আই উড হ্যাভ হেটেড ইউ।"

কি বলিব, চুপ করিয়া রহিলাম।

আমার বোনকে ভাল করিয়া দেখিয়া তিনি গম্ভীর হইয়া গেলেন। তাহার পর বাহিরে আসিয়া আমাদের বলিলেন, "এর তো বাচবার আশা নেই। এখানকার ডাক্তারবাবু কি কি ওষুধ দিয়েছেন দেখি "

প্রেসক্রিপশন বাহির করিয়া দিলাম। কুলদাবাবু ডাক্তারও নিকটে দাড়াইয়া ছিলেন।

"আপনি বসুন "

প্রেসক্রিপশনের উপর চোখ বুলাইয়া বলিলেন, "কোন ওষুধই তো বাদ রাখেননি দেখছি এ ওষুধগুলো কেন দিয়েছেন।"

তিনি প্রেসক্রিপশনের কয়েকটা ঔষধ আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন। কুলদাবাবু কোন উত্তর না দিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন কেবল। ভাবটা যেন, কেন দিয়াছি তাহা তোমার মতো অর্বাচীনকে বলিয়া লাভ কি।

অগ্নীশ্বর কিন্তু না ছোড়।

"কেন দিয়েছেন এগুলো?"

সহসা কুলদাবাবুর জবা-কুঞ্চিত মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"দিলে ক্ষতি তো নেই—"

"ও, আপনার চিন্তাধারা নতুন রকম দেখছি। কিন্তু রোগী যে খাটে শুয়ে আছে, তার নৈঋত কোণের পায়াটায় একজন বসে যদি দিনরাত হাওয়া করে যায়, তাতেও রোগীর কোন ক্ষতি নেই সেটা তো আপনার প্রেসক্রিপশনে দেখছি না।"

কুলদাবাবুর ছোট ছোট চক্ষু দুইটি অন্ধকারে বিড়ালের চোখের মতো জ্বলিতে লাগিল, মুখের কালো রঙে বেগুনির ছোপ পড়িল।

"আপনার বয়স কি সত্তর পেরিয়েছে?"

"বাহাত্তর চলছে।"

"আর কেন, এইবার কাশীবাস করুন গিয়ে। ভাল কথা, আপনি কি এখানকার হাসপাতালে চাকরি করেন? এত বয়স পর্যন্ত তো চাকরি থাকবার কথা নয়।"

"না। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করি। এখানকার ডাক্তারবাবু ছুটিতে গেছেন, তাই তার হয়ে হাসপাতালে কাজ করছি।"

"ও আচ্ছা, উঠি।"

ফি কত দিতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "পঞ্চাশ টাকা —"

টাকা আনিবার জন্য বাড়ির ভিতর ছুটিলাম। টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম অগ্নীশ্বর ভুটুনের সহিত আলাপ করিতেছেন। ভুটুনের বয়স ছয় বৎসর আমার ভাগিনা ইহারই মায়ের নিউমোনিয়া হইয়াছে। কানে গেল—'তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে কে'

আমার ছোট মাসী।"

"কোথা থাকেন"

"পাটনায়"

"পুরো নাম কি?"

ভুটুন বলিতে পারিল না।

আমিই বলিলাম, "কমলা বসু"।

টাকা লইয়া অগ্নীশ্বর চলিয়া গেলেন। দিন সাতেক পরে একটি মনি অর্ডার আসিল ভুটুনের নামে তাহার ছোট মাসী তাহাকে পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়াছে। আমরা অবাক হইয়া গেলাম। সে তো ইতিপূর্বে কখনও টাকাকড়ি পাঠায় নাই। টাকাটা পাইয়া অবশ্য সুবিধাই হইয়া গেল। ভুটুনের মায়ের শ্রাদ্ধের খরচটা কুলাইয়া গেল। শ্রাদ্ধে কুলদাবাবু ভুরি ভোজন করিলেন তাঁহার খাওয়াটা সত্যই দেখিবার মতো হইয়াছিল। আরও কয়েকদিন পরে কমলার চিঠি আসিল। সে লিখিয়াছে, সে তো টাকা পাঠায় নাই

অগ্নীশ্বরের ওই এক ধরন ছিল, তিনি যখন কাহারও উপকার করিতেন তখন কাহাকেও সেটা জানিতে দিতেন না। এমন কি উপকৃতকে পর্যন্ত নয়। তাহার প্রিয় শিষ্য সুনির্মল তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল তিনি কেন এমন করেন

অগ্নীশ্বর উত্তর দিয়াছিলেন "ওরে বাপরে, এরকম না করলে রক্ষে ছিল আমার। বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়নি? যদি কারও উপকারটি করেছ, অমনি সে শত্রু হয়ে গেছে তোমার। মেরেই ফেললে ও লোকটাকে শেষ পর্যন্ত। এমনিই তো দু'বেলা খাচ্ছি পরছি, মোটামুটি সুখে আছি, এতেই তো অগণিত শত্রুসৃষ্টি হয়েছে, তার উপর তাদের পিঠে যদি উপকারের চাবুক পড়ে তাহলে তো ক্ষেপে যাবে তারা, দেশছাড়া করবে আমাকে। অথচ উপকার না করেও পারি না, ওটা একটা রোগ বিশেষ a sort of exhibitionism যখন চাগাড় দেয়, তখন বে এক্তার হয়ে পড়তে হয়। তাই যথাসাধ্য লুকিয়ে করি।"

দুই ।।

ছাত্রজীবনে অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নাই। দ্বিতীয়বার দেখা হইয়াছিল আরও কয়েক বছর পরে একেবারে বিভিন্ন পরিবেশে এবং পরিস্থিতিতে। তবু তাঁহার সব খবর আমি পাইতাম সুবিমলের কাছে। সে আমার সহপাঠী ছিল, দুইজনে একসঙ্গে আই. এস. সি পড়িয়াছি। সে আই. এস. সি পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে গেল, আমি বি. এস. সি ক্লাশে ভর্তি হইলাম। সুবিমল যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র সেই সময় অগ্নীশ্বর সেখানে ছিলেন। সুবিমল ছাত্রজীবনেই কবিতা গল্প লিখিয়া সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। অগ্নীশ্বর তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তিনি যখন মেডিকেল কলেজ হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন এবং সুবিমল যখন বারকয়েক ডাক্তারি ফেল করিয়া শেষ পর্যন্ত সাহিত্যকেই পেশারূপে গ্রহণ করিল, তখনও তাঁহার এই আকর্ষণ সমানভাবে প্রবল ছিল।

সুবিমলকে লেখা তাঁহার চিঠিপত্র হইতে বোঝা যায়, তিনি তাহাকে কত ভালোবাসিতেন এবং কিভাবে ভালোবাসিতেন। তাহার সর্বদা ভয় হইত, ওই যাঃ, পঞ্চজনে মিলিয়া এমন একটা প্রতিভাকে বুঝি নষ্ট করিয়া ফেলিল। মেডিকেল কলেজে যতদিন ছিলেন ততদিন যাচ্ছেতাই করিয়া গালাগালি দিতেন তাহাকে। বলিতেন, "দেখ, আর পাঁচজনের মতো গালে ঠোঁটে রং মেখে, রাংতার গয়না পরে, ফিনফিনে রঙীন শাড়ির বাহার দিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়াতে যেও না। সত্যিকার রসিকের জন্য লেখ, তারই আশাপথ চেয়ে থাক, তপস্যা কর মতঙ্গমুনির আশ্রমে শবরী যেমন প্রতীক্ষা করেছিল রামচন্দ্রের জন্য, তোমার প্রতীক্ষাও তেমনি হবে।"

সুবিমলকে লেখা কয়েকটা চিঠি আমি পাইয়াছি। পরে বিভিন্ন স্থান হইতে চিঠিগুলি তিনি তাহাকে লিখিয়াছিলেন। এই চিঠিগুলির মধ্যে তাঁহার মনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, সে পরিচয় বাহিরের লোক কখনও পায় নাই। কারণ, সে পরিচয় তিনি কখনও কাহাকেও দেন নাই, দিতে চাহেন নাই।

একটা চিঠিতে লিখিয়াছেন "আমার লেখা সম্বন্ধে আমি unconcerned থাকতে চাই কর্ণের সঙ্গে কুন্তীর যে সম্বন্ধ, আমার লেখার সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেকটা সেইরকম। ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের goggle eyes এবং সিনেমা screen এ দুয়ের মাঝখানে আমার ও

ভাগ্যহত অপত্যকে দাঁড় করাবার মতো বুকের পাটা আমার নেই। তুমি লিখেছ, আমার লেখা তোমার ভাল লাগে। আরও দু'একজনের লেগেছে। আমার ছবির একজন সমজদার আছে জানি। আমার ডাক্তারিও একটা আর্ট এবং তাকে আর্ট বলে কেউ কেউ হয়তো চিনতে পেরেছে। কিন্তু এদের কেউ পপুলার হবে না। যদি হয় তো নিজেদের বাধাপুত্র বলে পরিচিত করে তবে হবে। আমার লেখা আর একজনের হাত দিয়ে বেরুলে এত অপাংক্তেয় হবে না। আমার ছবি একদিন আর একজনের নামে ছাপা হবে এবং নাম করবে। আমার ডাক্তারী কোন ছাত্রের মারফৎ হয়তো তাক লাগাবে। কিন্তু আমার নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এদের কোন কল্যাণ নেই। বার্ধক্যের ব্রেন সফনিংয়ের (brain softening) সঙ্গে সঙ্গে এইরকম একটা বিশ্বাস আমার দাঁড়িয়েছে। তোমার লেখা আমাকে পাঠাতে পার সমালোচনা করব from my point of view সমালোচনা মানেই তাই, আমার কেমন লাগল সেইটে স্পষ্ট করে বলা, ম্যাথু আর্নল্ড বা রবীন্দ্রনাথের কথার চর্বিতচর্বণ করা নয়। প্রত্যেক সাহিত্যিকের জীবনেই কিছু না কিছু tragedy আছে। তোমারও নিশ্চয় আছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারব না অভিজ্ঞতা কম বলে। তাছাড়া তোমার নিজের চোখের দেখা জিনিসই তোমার আঁকায় ফুটবে ভালো আমার impression হয়তো তোমার কাজে লাগবে না আমার red হয়তো তোমার green। এ সব শোনবার পরও যদি লেখা পাঠাতে ইচ্ছা হয় পাঠিও ''

চিঠিপত্র হইতে মনে হয় সুবিমল তাঁহাকে লেখা পাঠাইত। একটা চিঠিতে দেখিতেছি

"তোমার ওই ভুতুড়ে বইটার সম্বন্ধে আমার অনেক কিছু বলবার আছে কিন্তু চিঠিতে বলা যাবে না। এ রকম লেখায় তুমি অদ্বিতীয়। যেখানে তুমি অদ্বিতীয় সেখানে আমি কোন ত্রুটি সহ্য করব না। তুমি লিখেছ খুব ভালো, কিন্তু সবটা এক sittingএ লিখেছ একটু বসে বসে যদি লিখতে তো five hundred times better হত বই যত ভালো লাগে তত অস্বস্তি হতে থাকে। A beautiful bust, blinding love an opportune moment and a ruptured perinium' মনের ভিতর হায় হায় করতে থাকে, কেবল মনে হয়, আহা যদি দুটো stitch লাগানো হত।

চিঠিতে আর সমালোচনা করব না। চিঠি এক sittingএ লিখে ডাকে ফেলে দিই। তারপর মনে পড়তে থাকে, ঐ যাঃ, এখানটায় তো মনের ভাব পরিষ্কার করা হয়নি। ওখানটায় আর এক রকম করে লিখলে হত, ওখানটায় দুটো লাইন কম পড়েছে - ইত্যাদি। তারপর বুক চাপড়ানো আর রাত্রে অনিদ্রা, এ আর সহ্য হবে না।"

তবু চিঠিতে সমালোচনা করিতে তিনি ছাড়েন নাই।

আর একটা চিঠিতে দেখিতেছি—"তোমার লেখার অনেক লাইন বদলাতে ইচ্ছে করে, অনেক Para rewrite করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু বাছবার সময় আর সাহস হল না। এরকম বাছা একজনের কাজ নয়। তোমার চাল ডাল মশলাপাতি খুবই ভালো। কেবল কাঁকর বাছা হয়নি। কাঁকর বাছবার সময় তোমার নেই। আমারও নেই। আশা আছে বাংলা দেশের কেবলা দাঁতে কাঁকরগুলো অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে ।"

আর একটা চিঠি

তোমার সঙ্গে সুরে মিললে মনে করব স্নেহ প্রকাশ করছি, সুরে না মিললে মনে করব রাগ করেছি। এ তো মহা মুশকিল দেখছি। সুর মেলা না-মেলার সঙ্গে স্নেহ বা রাগের কি সম্পর্ক?

আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার ও আমার রুচি বিভিন্ন। তোমার সঙ্গে আমার সুর মিলবে না। যৌবনের ঐশ্বর্যে তুমি অজস্র অসংযত বোল ফুটিয়ে চলেছ। আর আমি বৃদ্ধ কানে কলম আর হাতে হিসাবের খাতা নিয়ে তোমার পিছনে পিছনে ধাওয়া করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম "হায়, হায়, এত অপচয় কেন? সমস্ত energyটা একাগ্র হয়ে একটা বোলে নিয়োজিত হলে যে বিশ মণ আম ফলানো যেত।" তোমার সৃজন তাণ্ডবে আমার হিতোপদেশ শতধা হয়ে দিকবিদিকে ছড়িয়ে পড়ল দেখে আমি থমকে দাঁড়ালুম। ভেবে দেখলাম, এইটেই ঠিক হয়েছে। তোমার genius তোমাকে যে পথে নিয়ে যাবে সেইটেই তোমার পথ। সে পথে আমার interference হয় নিজে ব্যর্থ হবে নয় তোমাকে ব্যর্থ করবে। তাই ভেবে চিন্তে বার্ধক্যের মুখরতা সংযত করলুম, with a jerk. এর মধ্যে রাগ কোথায়? মাইকেল, বঙ্কিমকে আমি genius মনে করি কিন্তু তাঁদের প্রতিভা আমার [illegible] সিগারেটের সহচরী হয়নি। তা বলে কি তাঁদের উচিত ছিল আমার পছন্দমতো লেখা? বরং মনে করেছিলাম তুমি ধীরভাবে বসে চিন্তা করলে হয়তো ভালো ছবি ফোটাতে পারবে। কিন্তু দেখছি ধীরভাবে বসে ভাবা তোমার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং আমি তোমার আশা ছেড়ে দিলুম। তোমার উপর নিজের রুচির জোয়াল চাপাবার স্পর্ধাও ছাড়লুম। এ থেকে কি বোঝায় আমি রাগ করেছি? বুঝালেও উপায় নেই।"

এরপর আর একটা চিঠি

"সমালোচনার শেষকথা বলেছি বলে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখছি প্রতিজ্ঞা রাখতে পারছি না। কারণ একটা কুকর্ম করে ফেলেছি। চিঠিটা বড় কড়া হয়ে গেছে। অতটা কড়া করবার ইচ্ছা ছিল না। হয়ে গেল শুধু উপমার খাতিরে। ওই আকারান্তের মন জোগাতে দু'একটা খুনখারাপি করা বিচিত্র নয়। তাছাড়া লোককে খোঁচা দিয়ে কথা বলা আমার মজ্জাগত স্বভাব। তোমরা সব কলা গাছ কিংবা পেঁপে গাছ, প্রশস্ত চওড়া-চওড়া পাতা, সুমিষ্ট ফল ফলাও। আর আমি হচ্ছি খেজুর, প্রত্যেক পাতার ডগায় ছুঁচ আছে, ফল যদি বা কখনও ফলে তো প্রায়ই কষা আর আঁটিসর্বস্ব। আমাকে চেঁচে যে সুমিষ্ট রস বার করতে পারবে, সেরকম পাশী তো দেখতে পাই না। কড়তার জন্য ক্ষমা চাইছি—"

এইসব চিঠি পড়িয়া কাহারও যদি ধারণা হয় যে, সুবিমলের লেখা তিনি ভালবাসিতেন না, তাহা হইলে ধারণাটা ভুল হইবে। কারণ আমি তাঁহার একজন বন্ধুর নিকট ঠিক উল্টা কথা শুনিয়াছি। কথায় কথায় সুবিমলের কথা উঠিল। ভদ্রলোক বলিলেন, "কাল অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের কাছে গিয়েছিলাম। সুবিমলের লেখার কথা উঠতে তাকে বললাম, সুবিমলের evolutionটা দেখছো?"

অগ্নীশ্বব বললে—"হ্যাঁ, দেখবাব মতো। আমি মাঝে মাঝে তাব নিন্দে কবেছি। লম্বা লম্বা উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখি।" আমি বললাম "কিছু দবকাব হবে না, পুবাতন পর্ণপুট দীর্ণ বিদীর্ণ কবি —he is bound to come out"

অগ্নীশ্বব শুনে লাফিয়ে উঠল বলল, আমি Add কবছি yes resplendent ruthless and irresistible—এই আমাব বিশ্বাস। কাকুব কাছে সমালোচনাব কাঙাল হবাব তাব দবকাব নেই। He has grown beyond it and above it"

তাহাব পব হাসিযা বলিলেন, 'অগ্নি এখনও ঠিক তেমনি আছে। আমাব সামনে এক প্রবীণ ডেপুটিকে যেভাবে অপমানটা কবলে তা আব কহতব্য নয। এই জন্যে ওব কিছু হল না। তা না হলে অত ভালো ডাক্তাব, অমন বিদ্বান লোক, ওব কি টাকাব ভাবনা হবাব কথা? ওব নিজেব অবশ্য ভাবনা নেই, কিন্তু দেখে মনে হয ওব চেয়ে অনেক বেশি নিকৃষ্ট ওব সহপাঠীবা যতটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ কবে ও ততটা পাবে না। মাইনেটিই ওব সম্বল। ওই আগুনেব কাছে কে যাবে বল ছ্যাকা খাবাব জন্যে। প্রবীণ ডেপুটিকে দেখে কষ্ট হল আমাব'

প্রশ্ন কবিলাম "কি হয়েছিল কি—"

"যা সাধাবণত হয তাই, human weakness কিন্তু human weaknessকে ক্ষমা কবাব লোক তো অগ্নীশ্বব নয। ভদ্রলোকেব হাটুতে ব্যথা হয়েছিল। বোধহয অনেকদিন আগেই হয়েছিল। তিনি বললেন "অগ্নিবাবু এ হাটু তো সাবল না কত আব নেচে নেচে বেড়াই বলুন আপনাব প্রেসক্রিপশনটাই দিন, ট্রাই কবে দেখি ওটা

'আপনাকে তো প্রেসক্রিপশন দিয়েছিলাম একটা মাস তিনেক আগে খাননি সে ওষুধ?"

অগ্নীশ্ববেব প্রশ্ন শুনেই বুঝলাম গতিক ভালো নয।

ডেপুটি বললেন, "না, সেটা আব খাওযা হযনি। আমাব বেযাই বললেন বিধানবাবুকে দেখাতে। তিনি ব্লাড কেমিস্ট্রি কবালেন, পাইখানা পেচ্ছাবও পবীক্ষা কবালেন। তাবপব এমন এক ওষুধ লিখে দিলেন যে, ওষুধ জোগাড কবতেই মাসখানেক লেগে গেল, এখানে পাওযা গেল না, বম্বে থেকে আনাতে হল, একটি গাদা দাম লাগল, কিন্তু কিচ্ছু হল না। তাবপব গেলাম ব্রাউন সাহেবেব কাছে, তিনি মালিশ দিলেন, ইনজেকশন দিলেন, ওষুধও খাওযালেন চাব-পাঁচবকম —"

অগ্নীশ্বব জিগ্যেস কবলেন, "আমাব প্রেসক্রিপশনটা ব্যবহাবই কবেননি?"

"না, সেটা আব ব্যবহাবই কবা হযনি। হাবিয়েও ফেলেছি সেটা। দিন আব একবাব লিখে দিন, ট্রাই কবে দেখি এবাব ওটা—"

"আব তো লিখব না। সেবাবই একটা অন্যায কবে ফেলেছিলুম ফি নিইনি—"

ডেপুটিবাবু একটু থতমত খেয়ে গেলেন। তাবপব কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন "বেশ, এবাব ফি দেব। কত ফি নেন আপনি—?"

"লক্ষ টাকা দিলেও আব লিখব না" গর্জন কবে উঠল অগ্নীশ্বব। তাবপব একটু থেমে

বলল — "একটি শর্তে লিখতে পারি, যদি ওই ফোল' হাঁটু গেড়ে করজোড়ে প্রার্থনা করেন— 'দয়া করে সেই প্রেসক্রিপশনটা আবার লিখে দিন।' তবেই দেব, তা না হলে নয়।"

ভদ্রলোক গুম হয়ে বসে রইলেন মিনিট খানেক। তারপর উঠে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন "আপনি যে এত অভদ্র, তা জানা ছিল না আমার।"

অগ্নীশ্বর বসে বসে পা দোলাতে দোলাতে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। এ লোকের কখনও প্র্যাকটিস হয়?

সত্যই অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের প্র্যাকটিস হয় নাই। মাঝে মাঝে দুই এক জায়গায় তাহার নাম হইয়াছে, হৈ হৈ করিয়া প্র্যাকটিসও হইয়াছে কিন্তু তাহা অল্পদিন মাত্র। বদলির চাকরি, এক জায়গায় বেশিদিন তিনি থাকিতে পান নাই।

।। তিন ।।

ইংরেজের কবল হইতে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিবার জন্য যে সব বাঙালী ছেলেমেয়ে একদিন জীবনপণ করিয়াছিল, যাহারা দলে দলে জেল ভরতি করিয়াছিল, ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়াছিল, দ্বীপান্তরে গিয়াছিল, পুলিশের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়াছিল, যাহাদের ঘরে বাহিরে কোথাও শান্তি ছিল না, মা বাপ আত্মীয় বন্ধুরাও যাহাদের আপনার লোক বলিয়া স্বীকার করিতে ভয় পাইতেন, একটা বিরাট আদর্শের প্রেরণায় যাহারা নিজেদের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়াছিল কিন্তু সর্বহারার গান গাহিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায় নাই বরং যাহারা নিজেদের সযত্নভাবে লুকাইয়া রাখিয়াই লোকচক্ষুর আড়ালে বিলীন হইয়া গিয়াছে, আমার মতো লোকও যে একদিন তাহাদের সঙ্গে ছিল একথা ভাবিলে আজও বিস্ময় এবং লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়ি। লজ্জার কারণ আমি এখন নামজাদা পুলিশ অফিসার বলিয়া জনসমাজে পরিচিত। ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সহিত আমার প্রথম যখন আলাপ হয় তখন আমার যে নাম ছিল সে নাম এখন আমার নাই, সে নামের ব্যক্তিটি বহুপূর্বে মারা গিয়াছে।

আজ জীবনের অপরাহ্নে বসিয়া অতীত দিনের সেই ঘটনাগুলি ভাবিতে গিয়া একটি কথাই কেবল মনে হইতেছে, এ সবের মধ্যে আমার কি কোন হাত ছিল? অজানা কোন উৎস হইতে অপ্রত্যাশিত ঘটনার ধারা প্রবলবেগে আসিয়া বারবার আমার জীবনের সবকিছু ওলট পালট করিয়া দিয়াছে, পুরাতন পরিবেশ ব্যবস্থার বিপর্যস্ত হইয়া নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে, পরিচিত লোক অপরিচিতের পর্যায়ে পড়িয়াছে, অপরিচিত লোক অত্যন্ত পরিচিত হইয়াছে। কখনও গৃহকে শ্মশান করিয়াছে, কখনও শ্মশানই গৃহ হইয়াছে, ছবির পর ছবি বদলাইয়াছে, একদিন যাহাকে সুখ শান্তির আদর্শ বলিয়া ভাবিয়াছি, দুইদিন পরে তাহাই অসুখ ও অশান্তির আকর হইয়াছে। আমার এই সদাপরিবর্তনশীল জীবনে একটিমাত্র ছবির কেবল পরিবর্তন দেখি নাই। সে ছবি অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের। আমার জীবনে কয়েকবারই তিনি

অপ্রত্যাশিতরূপে আসিয়াছেন ও চলিয়া গিয়াছেন, প্রতিবারই তাঁহাকে একরকম দেখিয়াছি। তরবারির মতো তীক্ষ্ণ, অগ্নির মতো উজ্জ্বল, অন্তরের অন্তস্থলে কিন্তু স্নেহ করুণার ফল্গু বহমান। বজ্রের মতো কঠোর অথচ কুসুমের মতো মৃদু এক তাঁহাকেই দেখিয়াছি।

আজ তাঁহার জীবন কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি নিজের দায়ে। কারণ ঋণশোধ করিবার অন্য উপায় নাই।

মনে হইতেছে আমার মতো তিনিও সারাজীবন একটা আলেয়ার পিছনে পিছনে ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন। সে আলেয়াটা কখনও ডাক্তারি, কখনও সাহিত্য, কখনও নাস্তিকতা, কখনও শাস্ত্রবিচার, কখনও দেশভক্তি, কখনও স্বদেশবাসীর প্রতি নিদারুণ ঘৃণা — নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পথে বিপথে লইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে ভাবিয়াছি, এই আলেয়ার মধ্যে তিনি কি পাইতে চাহিয়াছিলেন? সত্য? আনন্দ? জনপ্রিয়তা? অর্থ? আমার মনে হয়, ইহার একটাও তিনি চাহেন নাই। জনপ্রিয়তা তো তাঁহার দু'চক্ষের বিষ ছিল। তিনি যখন সিনেমা দেখিতে যাইতেন, খোঁজ লইতেন কোন সিনেমাটায় সবচেয়ে কম ভীড়। যখন কোনও হোটেলে যাইতেন, মেনুর কোন খাদ্যটা লোকে সবচেয়ে কম খায় সেইটা খোঁজ করিয়া তাহাই আনিতে বলিতেন। তাঁহার সহপাঠী এক ডাক্তারের মুখে একরূপ নানা গল্প শুনিয়াছি। তাঁহার ধারণা ছিল পেটের দায়ে বা পপুলারিটির লোভে কোনও প্রথম শ্রেণীর গুণী কখনও নিজেদের সব নামাইয়া আনেন না। সুবিমলকে একবার লিখিয়াছিলেন — 'তোমার গল্পের সাহিত্যিক নায়ক পেটের দায়ে পয়সার জন্যে অপরের নামে গল্প কবিতা লিখতে লাগল, এটা আমার তত ভালো লাগেনি। কি জাতের সাহিত্যিক লোকটা? আমি তো ভাবতেই পারি না যে রবীন্দ্রনাথ বা গোপেশ্বর বাঁড়ুয্যে পেটের দায়ে গান গেয়ে গেয়ে চানাচুর ফেরি করে বেড়াচ্ছেন! তুমি ওকে যদি সত্যিকার ভালো সাহিত্যিক করতে চাও, ও ছবি মুছে ফেল।'

সত্য অনুসন্ধান প্রবৃত্তি এবং সত্যনিষ্ঠা তাঁহার ছিল নিশ্চয়, না থাকিলে তিনি অত বড় ডাক্তার হইতে পারিতেন না। কিন্তু সত্যকেই তিনি আকুল হৃদয়ে সারা জীবন সন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছেন, তাহা তো মনে হয় না। আমার নিকট আজ যে তিনি নমস্য তাহা তাঁহার মিথ্যা আচরণের জন্যই। তিনি সুন্দরকে ভালবাসিতেন, সত্যকে নয়। তাঁহার সত্যের আদর্শ তাঁহার নিজের কাছে ছিল, তাহা আর পাঁচজনের সত্য নয়, আইনের সত্য নয়, ধর্মের সত্য নয়, শাস্ত্রের সত্য নয়, তাহা তাঁহার নিজের সত্য এবং সে সত্যের প্রধান গুণ, (সম্ভবত একমাত্র গুণ) তাহা সুন্দর।

আমি যতদূর খবর জানি জীবন তাঁহার নিরানন্দ ছিল। তাঁহার এই জীবনী লিখিবার জন্য আমি তাঁহার আত্মীয় স্বজনদের সহিত দেখা করিয়া যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি তাহা হইতে মনে হয় পারিবারিক জীবন তাঁহার সুখের ছিল না। পারিবারিক জীবনের মেরুদণ্ড যে স্ত্রী, তাঁহার সহিত তাঁহার জাতে মেলে নাই। শতকরা নিরানব্বুই জনেরই মেলে না। বিবাহের সুসজ্জিত মণ্ডপে শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনির মধ্যে যে সব শুভমিলন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদের অধিকাংশই অসবর্ণ বিবাহ, কঠিনের সহিত কোমলের, কবির সহিত অকবির, সরলতার

সহিত প্রতাবণাব লম্পটেব সহিত সতীব অসতীব সহিত সাধুব, কতবকম গবমিলই যে হয তাহাব আব ইযত্তা নাই অধিকাংশ লোকই দুর্ভাগ্যটাকে আব আঁচলেব মতো মানিযা লইযা ভবিতব্যেব দোহাই দিযা সান্ত্বনা পাইবাব চেষ্টা কবেন অগ্নীশ্ববেব প্রকৃতি ছিল ঠিক উলটা ধবনেব কোন কিছু নির্বিচাবে মানিযা লওযা তাহাব ধাতে ছিল না। বিশেষত তিনি যখন উপলব্ধি কবিতেন যে, যে ফাঁদে তিনি পডিযাছেন তাহা হইতে উদ্ধাবেব আব উপায নাই তখন তিনি যেন ক্ষেপিযা যাইতেন তাঁহাব বিবাহ ব্যাপাবটা অনেকটা ঐ ধবনেব মতোই হইযাছিল নিজে বিবাহ কবিবাব পূর্বে তিনি তাহাব বিধবা বোনেব আবাব বিবাহ দিযাছিলেন। সেজন্য কিছুকাল তাহাকে গোঁড়া সমাজে একঘবে হইযা থাকিতে হইযাছিল বলা বাহুল্য পাত্র হিসাবে তিনি প্রথম শ্রেণীব পাত্র ছিলেন, দুই একটি ভালো ঘব হইতে তাহাব সম্বন্ধও আসিযাছিল, কিন্তু যেই তাহাবা খবব পাইল যে ইনি বিধবা বোনেব আবাব বিবাহ দিযাছেন অমনি সবিযা পডিল অগ্নীশ্বব তাহাদেব একজনকে নাকি বলিযাছিলেন ... তাকে খাবাব যদি ইচ্ছে হয নিজেব ঘবে ... কবাব পযসা আমাব আছে তাব ... আপনাদেব ওই ভ্যাঁচড়া চচ্চড়ি বাদে ... মাখামাখি পঙক্তি ভোজনে বসবাব প্রবৃত্তি আমাব কোনকালে নেই আমাব বক্তব্যটা ডি এল বায নামক লেখক আবও ভালো কবে বলেছেন তাঁব একঘবে প্রবন্ধে পড়ে দেখবেন — ও ... ইংবেজি পাড়েন যা আপনাব পক্ষে অসম্ভব তাই কবতে বলছি আপনি ব্রাহ্মণ যে, পড়াশোনা তো আপনাব ধাতে সইবে না।''

... এসময়ে ... কবিল

হ্যাঁ আমি ... কি বলুন ও দলকে দল ধবা পড়েছে? বাঃ, সুখবব খুব এখন একসাথে ... দিন সবাইকে। জামিন যাতে না পায সে চেষ্টাও কবতে হবে ওবা ছাড়া পেলে ওদেব ... কবতে পাববেন না। আচ্ছা ... নাইট। থ্যাঙ্ক ইউ

... সহসা সাবিযা গেল। একটা ... দলীব দল বর্ধমান হইতে জ্বালাইতেছিল।

হ্যাঁ কি বলিতেছিলাম, অগ্নীশ্ববেব পাবিবাবিক জীবনেব কথা শেষ পযন্ত একটা পবিবাব তাহাব ভাগ্যে জুটিযা ছিল। একটু ভণ্ডামী কবিলেই যে অগ্নীশ্ববেব মতো সৎপাত্র পাওযা যায এ বুদ্ধি অন্তত একটি ভদ্রলোকেব মাথায খেলিযাছিল। তিনি একদিন বিবাহেব প্রস্তাব লইযা অগ্নীশ্ববেব কাছে গেলেন। অগ্নীশ্ববেব পিতা মাতা তখন কেহই বাঁচিযা নাই অগ্নীশ্বব নিজেই তখন নিজেব বিবাহেব কর্তা শুনিযাছি, কন্যাব পিতা যখন অগ্নীশ্ববেব কাছে বিবাহেব প্রস্তাব কবেন তখন নাকি বলিযাছিলেন, ''আমাব একটি সুলক্ষণা গৃহকর্মনিপুণা মেযে আছে, সেটিকে আপনাব হাতে সমর্পণ কবতে চাই।''

অগ্নীশ্বব উত্তব দিলেন, ''শাস্ত্রে সুলক্ষণা মেযেব যা বর্ণনা পড়েছি, তাতে মনে হযেছে সুলক্ষণা মেযে মানে কেষ্টনগবেব পুতুল একটা। পুতুল বিযে কববাব ইচ্ছে নেই। আব গৃহকর্মনিপুণা মানে যদি কমবাইণ্ড চাকবানি আব বাঁধুনি হয তাহলেও- ''

"না, না অতটা কিছু নয। গেবস্ত ঘবেব মেযেবা সাধাবণত যেমন হয, তেমনি আব কি। দেখুনই না একদিন—"

"পাঁচ মিনিটেব চোখেব দেখা দেখে কি হবে বলুন। তাব বক্তে সিফিলিস আব ফুসফুসে টি বি আছে কি না, টনসিল দুটো কেমন, এই সবই দেখতে হয। এসব দেখতে দেবেন?"

"বেশ, ইচ্ছে হযতো দেখুন। আমাব কোন আপত্তি নেই। তবে আমি গবীব লোক, ওসবেব জন্য বেশি পযসা খবচ কবা আমাব ক্ষমতায কুলোবে না— "

এই সবল উক্তিতে গলিযা গেলেন অগ্নীশ্বব। বলিলেন, "বেশ, দেখব না কিচ্ছু। কিন্তু আপনি একটা কথা জানেন কি? আমাব বিধবা বোনেব আমি বিযে দিযেছি।"

"জানি। তাতে আমাব আপত্তি নেই।"

"আমি মুর্গি, শুযাব, গরু সব খাই। জাত মানি না। আমাব বাঁধুনি মুসলমান বাবুর্চি আমাব যে চাকব জল তোলে সে মেথব। এসবে আপনাব আপত্তি নেই তো?"

"কিছুমাত্র না। এই সবই তো দবকাব আজকাল। সেকেলে গোঁড়ামি না থাকাই তো বাঞ্ছনীয।"

অগ্নীশ্বব ভ্রূকুঞ্চিত কবিযা ক্ষণকাল কি ভাবিলেন, তাহাব পব বলিলেন "বেশ দিন ঠিক করুন। আপনাব মেযেকেই আমি বিযে কবব।'

"কবে দিন ফেললে সুবিধে হবে—'

"কালই ফেলতে পাবেন কাল পবশু দু দিন ছুটি আছে। আমাকে অবশ্য কনে দেখতে বেবাতে হবে তবে অপিসেব ছুটি আছে। জগু আব কার্তিককেও পাওযা যাবে — অন্তবঙ্গ লোক অবসব পেলে ওদেব সঙ্গে বসেই পব চর্চা কবি। ওদেব দুজনেবই কাল ছুটি "

"অত তাডাতাডি আমি পাবব না। অন্তত মাসখানেক সময দিতে হবে আমাকে

"বেশ, তাই নিন।"

ওই পাত্রীব সহিতই অগ্নীশ্ববেব বিবাহ হইযা গেল। বিবাহেব পবদিন তিনি তাঁহাব বন্ধুদেব বলিলেন, ' তোমবা শুভদৃষ্টিব সময আমাব চশমাটা চোখ থেকে খুলে নিলে, বৌযেব মুখ দেখে কি মনে হল জান? মনে হল সাবা মুখময পকসেব (pox) গুটি বেবিযেছে আব প্রত্যেকটি গুটিব মুখে পুঁজ। পবে অবশ্য বুঝেছিলাম, ওগুলো চন্দনেব ফোঁটা।"

তাঁহাব স্ত্রীব সম্বন্ধে তাঁহাব আব এক উক্তি তাঁহাব এক বন্ধুব চিঠিতে পাইযাছি।

"আমাদেব কি বকম মিল হযেছে জান? একেবাবে বাজযোটক। আমি সজারু আব উনি তুলতুলে খবগোস। একটি ছোট্ট খাঁচায পাশাপাশি বাস কবছি। কাবও পালাবাব উপায নেই। যতদিন না একজনেব মৃত্যু হচ্ছে, ততদিন আলিঙ্গনবদ্ধ হযে থাকতে হবে। ঘৃণ্যতম খুনেবাও কি জেলে এত কষ্ট ভোগ কবে? ইচ্ছে কবলে ওকে খাঁচাটা থেকে দূব কবে দিতে পাবি, আমাদেব দেশে এ বকম পৌরুষেব অনেক নজীব আছে। কিন্তু ওব ভীরু ভীতু চোখ দুটোব দিকে চাইলে সব কেমন গুলিযে যায। অথচ ওব জ্বালায আমাকে বাবুর্চি তাডাতে হযেছে, ফাউল বোস্টেব বদলে সুক্তো খেতে হচ্ছে, দুঘণ্টা ধবে পূজো কবে, হঠাৎ আচমকা মাথায গায়ে গঙ্গাজল ছিটিযে দেয। বকলে বোকাব মতো চেযে থাকে ফ্যালফ্যাল কবে। এব চেযে বেশি দুর্গতি কল্পনা কবতে পাব? সেদিন একটা দূরেব কলে গেছি, রুগীব বাডিতে পকেট

থেকে স্টেথোসকোপ বার করতে গিয়ে কতকগুলো শুকনো ফুল আর বেলপাতা ঝরঝর করে মাটিতে পড়ে গেল। পাছে আমার অমঙ্গল হয়, এইজন্যে লুকিয়ে পূজোর ফুল দিয়ে দিয়েছে আমার প্যান্টের পকেটে। ভাবলুম বাড়ি গিয়ে খুব বকব। কিন্তু পারলুম না। দূর থেকেই দেখতে পেলুম, সে জানলার ধারে বসে আছে আমার আশাপথ চেয়ে। চোখে পড়ল ঢলঢলে মুখখানা, যৌবন উপচে পড়ছে সর্বাঙ্গ দিয়ে। বকতে পারলুম না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, ছি, ছি এ কি degradation, কি শোচনীয় অধঃপতন। খানিকটা মাংস-স্তূপের লালসায় আমার ভিতরকার পশুটা আমার মনুষ্যত্বের গলা টিপে ধরছে, আর আমি সেটা সহ্য করছি। যার সঙ্গে আমার মনের মিল নেই, বুদ্ধির সমতা নেই, চিন্তার যোগ নেই, তার সঙ্গে ক্রমাগত প্রেমের ভান করে যেতে হচ্ছে। আমার মনে হয়, এ শুধু আমার ট্রাজেডি নয়, বিশ্বব্যাপী ট্রাজেডি। কিন্তু এর থেকে তুমি যেন মনে করে বস না যে আমি সেক্স-বিরোধী। মোটেই তা নয়, এ বিষয়ে আমি সাবেক আর্যঋষিদের সঙ্গে একমত। আমিও তাঁদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে চাই, 'প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ।' মহাভারতের বীরবা মামাতো বোনদেরও বিয়ে করতেন, অর্জুন সুভদ্রাকে, শিশুপাল ভদ্রাকে, পরীক্ষিৎ ইরাবতীকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁরা কন্যারত্ন পেলেই আহরণ করতেন সেটি, ভীম রাক্ষসী হিড়িম্বাকে পর্যন্ত ছাড়েনি, অর্জুন মণিপুরী চিত্রাঙ্গদাকে, অনার্যা নাগকন্যা উলুপীকে পর্যন্ত বাগিয়েছিলেন। ধীবর কন্যা সত্যবতীর সঙ্গে পরাশর ঋষির কাণ্ডকারখানা তো জানই। জীবন্ত আর্যদের এইসব প্রাণোচ্ছল বীর্য গর্ভ কাহিনীর সঙ্গে পরবর্তী যুগের স্মৃতি শাসিত সাবধানী সমাজের তুলনা করলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। ওই, বিরাট-পক্ষ আকাশচারী মহাবিহঙ্গের দল কি করে কোন মন্ত্রে মুখস্ত বুলি আওড়ানো খাঁচার পাখী হয়ে গেল সব! না, আমাকে তুমি ওই নিনকমপুপদের দলে ফেল না। আমি ওই সতীত্ববিলাসী ফোঁটা তিলকধারী মতলববাজ ভণ্ডদের কাছ থেকে সহস্র হস্ত দূরে থাকতে চাই। বাজী শৃঙ্গীদের চেয়েও ভয়ানক ওরা। কিন্তু আমি যে কথাটা তোমাকে বোঝাতে চাচ্ছি সে কথাটা হচ্ছে এই যে, শুধু আমাদের দেহ নেই, মনও আছে। দেহের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বারবার সে মনটার টুঁটি টিপে ধরতে হচ্ছে এইটেই দুঃখ। প্রাচীন গ্রীক বা আর্যদের মতো ফলাও কারবার করবার সুযোগ তো আমাদের নেই, তাগদও নেই। ওই একটি পরিবার নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আমি যখন আইনস্টাইনের বই বা রুপার্ট ব্রুকের সনেট নিয়ে মত্ত, তখন আমার অর্ধাঙ্গিনী মত্ত সিনেমা-স্টারদের নিয়ে। আমার মন যখন নর্থ পোলে জ্যাক লন্ডনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার অর্ধাঙ্গিনীর মন তখন ব্যস্ত শাড়ির পাড়, ব্লাউসের ছিট, আর ধোপা-দর্জি নিয়ে। দু-জন দু-জগতে বাস করি। 'জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে। জীবন বীণা ঠিক সুরে তাই বাজে না রে'। মাঝে মাঝে এ সন্দেহও হয় বীণা বাজাচ্ছি, না, ক্যানেস্তারা পিটছি! কে জানে। অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করছি কিন্তু—যাই করি।"

সজারুর কাঁটার খোঁচায় রক্তাক্ত কলেবর হইয়া খরগোসটি কিছুদিন বাঁচিয়া ছিল, কিন্তু বেশী দিন নয়। শুনিয়াছি, স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি নাকি তাঁহার এক ভাইকে বলিয়াছিলেন, "আমার কাছ থেকে পালাও তোমরা। আমি খুনে। কথায়, ভঙ্গীতে, ব্যবহারে সারাজীবন

ছোরাছুরি চালিয়ে এসেছি, কিন্তু যে শত্রুর উদ্দেশ্যে চালিয়েছি, সে মরছে না, সে অমর, মরে যাচ্ছে আমার নিজের লোকেরা। তোমরা বাঁচতে চাও তো পালাও আমার কাছ থেকে—"

তাঁহার কয়েকটি ছেলেমেয়ে হইয়াছিল জানি। শুনিয়াছি ছেলেমেয়েদের তিনি অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন রূপে গুণে অমন ছেলেমেয়ে নাকি আর কাহারও হয় না। আমি জানি এটি অসুখী লোকের লক্ষণ যাঁহারা আত্মপ্রশংসার ঢাক বাজাইয়া অপরের কান বধির করিয়া তোলেন তাঁহারা আসলে নিজেদের অন্তরের হাহাকারটাকেই আত্মপ্রশংসার ঢক্কা নিনাদে স্তব্ধ করিয়া দিতে চান। আসল সত্যটা অন্তর্যামী মন ঠিক জানিতে পারে, কিন্তু সে সত্য যদি বেদনাদায়ক হয়, বাহিরে সেটা স্বীকার করিতে পারে না অনেকে, প্রশংসার মুখোশ পরাইয়া সেটা ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। অগ্নীশ্বরের মতো লোকও যে ইহা করিতেন তাহা বিশ্বাস হয় না। তাহার পরিবারিক জীবনের খুটিনাটি আমি [illegible] পারি নাই হয়তো যাহা শুনিয়াছি তাহা ভুল। একটি ঘটনা কিন্তু জানি যাহা ভুল নয় এবং যাহার তীব্র আলোকে অগ্নীশ্বর আজও আমার নিকট অদ্ভুত বিস্ময়ের মতো হইয়া আছেন। যখনই তাহাকে কল্পনা নেত্রে দেখি, মনে হয়, তিনি এমন একটা আলোকের পরিবেশের মধ্যে দাড়াইয়া আছেন যে, তাঁহার কাছাকাছি যাইবার সাধ্যও আমাদের নাই। তাঁহার ছেলে বিবাহ করিয়াছিল এক ভিন্ন জাতের মেয়েকে। ভিন্ন জাত বলিয়া অগ্নীশ্বরের আপত্তি ছিল না, কিন্তু যেই তিনি শুনিলেন কন্যার পিতা খুব বড় লোক, জামাইকে নগদ ত্রিশ হাজার টাকা, একটি মোটরকার এবং কলিকাতায় একখানা বাড়ি যৌতুক স্বরূপ দিবেন, অমনি তিনি সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি করিলেন। তখন তাঁহার নিজের অবস্থা খুব খারাপ, চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করাতে আয় অর্ধেকেরও কম হইয়া গিয়াছে, কোথাও প্র্যাকটিস জমে নাই। কলিকাতায় একটা সরু গলিতে স্যাঁতসেঁতে একতলা ঘরে বাস করেন।

ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, "এ বিয়েতে আমি মত দিতে পারলুম না।"

ছেলে বলিল, "কেন, আগে তো মত দিয়েছিলেন, এখন সব ঠিক হয়ে গেছে, এখন আবার অমত করছেন কেন—"

"আগে মত দিয়েছিলুম, আমার ধারণা হয়েছিল তুমি একটা আদর্শের জন্য বিয়ে করছ। ঝুটো ব্রাহ্মণত্বের মাথায় লাথি মেরে প্রেমকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে বসাচ্ছ। এখন দেখছি তা নয়, তুমি বিয়ে করছ টাকার লোভে।"

"কিন্তু বিয়ের দিন তো ঠিক হয়ে গেছে—"

"ও বিয়েতে আমি যাব না। আমাকে বাদ দিয়ে যদি তোমার বিয়ে করবার প্রবৃত্তি হয়, যাও গিয়ে করে এস —"

অগ্নীশ্বরের এক ছোট ভাই তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন "বিয়ের যখন সব ঠিক হয়ে গেছে তখন তোমার না যাওয়ার কোন মানে হয় না। তুমি না গেলেও বিয়ে হবে, তুমি গেলে দেখতে শুনতে একটু শোভন হত। তুমি যাচ্ছ না কেন-- "

"আমার ছেলেকে চাঁদির জুতো মারতে মারতে গলায় গামছা দিয়ে হিড় হিড় করে ছাঁদনাতলায় নিয়ে যাচ্ছে, এ দৃশ্য দেখা আমার পক্ষে শক্ত।"

"কেন, বড়লোক হওয়াটা কি অন্যায়? কোন ধনী যদি তার জামাইকে গাড়ি বাড়ি টাকা দেয় সেটা কি তার অপবাধ?"

"পায়ের অপরাধ কখনও থাকে না। যে পা চাটে অপরাধ তারই।"

"এটাকে পা-চাটা বলে মনে করছ কেন। সিধু সত্যিই ভালবেসেছে কমলাকে। এ কথাটা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন—"

"তোমার সিধু ওই রেবা নার্সের সঙ্গে যখন ঘোরাঘুরি করত তখনও লক্ষ্য করেছিলাম, তার মুখের ভাবটা রসে-ডোবানো মালপোর মতো হয়েছিল। আমি প্রত্যাশা করেছিলুম বিয়ের প্রস্তাব এল বুঝি। কিন্তু যেই তোমার সিধু কমলার সন্ধান পেলে অমনি সব বদলে গেল। রসে ডোবানো মালপো দেখতে দেখতে হয়ে গেল কেঠো লেড়ো বিস্কুট। রেবার বাবার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স যদি কমলার বাবাব ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের চেয়ে বেশী হত তাহলে তোমার সিধু ওই দিকেই ঝুঁকত—"

"এটা তুমি গায়ের জোরে বলছ। এ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কি যুক্তি আছে তোমার।"

"যুক্তি দিতে পারব না। কিন্তু একটা কথা মনে রেখ আমি ডাক্তার। এক নজরেই অনেক সময় ঠিক রোগটা ধরতে পারি। প্রমাণ পাওয়া যায় অনেক পরে। এ বিষয়ে আমার ভুল হয়নি।"

"দেখ, সিধুব মা নেই, বৌদি বেঁচে থাকলে কি তুমি—"

"তোমার বৌদি বেঁচে থাকলে এ বিয়ে হত না। সোনার বেনের মেয়েকে সে কিছুতেই পুত্রবধু করতে রাজি হত না। সিধু জোর করলে সে গলায় দড়ি দিত, তবু রাজী হত না।"

তাঁহার ভাই তবু ছাড়েন নাই।

"তুমি তো অত অবুঝ নও। তলিয়ে ভেবে দেখ না ব্যাপারটা, অনিবার্যকে নিবারণ করবার চেষ্টা করছ কেন। ছেলে বড় হয়েছে, ছেলেও খুব ভালো—তাছাড়া সমস্ত ব্যাপারটা যদি ভালো করে ভেবে দেখ, তাহলে—"

অগ্নীশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করিযা কিছুক্ষণ ভাবিলেন। তাহার পর বলিলেন, "না, আমি পারব না। যে দুধে কেরোসিন তেলের গন্ধ ছাড়ছে, সে দুধ আমি গিলতে পারব না। কিছুতেই পারব না।"

বিবাহ যথারীতি অনুষ্ঠিত হইযাছিল, কিন্তু অগ্নীশ্বর সে বিবাহে যোগদান করেন নাই। এই ঘটনার সমস্ত বিবরণ আমি তাঁহার ভাইয়ের নিকট হইতে শুনিয়াছি।

এ ঘটনা কিন্তু এখানেই শেষ হয় নাই। বিবাহের কিছুদিন পরে তাঁহার নববৈবাহিক তাঁহাকে একটি পত্রাঘাত করিয়াছিলেন। পত্রের মর্ম—"আমার কয়েকটি চায়ের বাগান এবং কোলিয়ারী আছে। তাছাড়া একটা কাপড়ের কলও আমাকে চালাইতে হয়। প্রত্যেক জায়গায় আমাকে ডাক্তার রাখিতে হইয়াছে। আমার ইচ্ছা, এইসব ডাক্তারদের ঠিকমত চালাইবার জন্য একজন চীফ মেডিকেল অফিসাব নিযুক্ত করা। আপনি একজন অভিজ্ঞ প্রবীণ চিকিৎসক। আপনি যদি এই ভারটি গ্রহণ করেন, আমি অনুগৃহীত হইব। এ সমস্ত সম্পত্তি তো আপনারই পুত্রের, আপনি ইহার তত্ত্বাবধানের ভার লইলে নিশ্চিন্ত হইতে পারি।"

অগ্নীশ্বর উত্তর দিলেন, "আপনার চিঠি পেলাম, কিন্তু আপনার প্রস্তাবে রাজী হতে পারলাম না। আমি একটু ক্ষ্যাপাটে গোছের লোক। রবি ঠাকুরের ক্ষ্যাপা পরশ পাথর খুঁজে বেড়াত, আমি সারাজীবন খুঁজে বেড়িয়েছি স্বাধীনতা, যা এদেশে পাওয়া অসম্ভব। যখন ডাক্তারী পাশ করে বেরুলাম, তখন মনে হয়েছিল এটা স্বাধীন ব্যবসা, এবার বোধ হয় স্বাধীনতার আস্বাদ কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই বুঝলুম, ও বাবা, এদেশে স্বাধীন ব্যবসা করা মানে সকলের মন রেখে চলা। পদি পিসি থেকে আরম্ভ করে গুরুঠাকুর, দালাল, দোকানদার সকলের পায়ে তেল দিতে হবে। খোশামোদ করতে হবে গাঁয়ের কোয়াক্‌দের, প্রতিযোগিতা করতে হবে কম্পাউণ্ডার, হোমিওপ্যাথ আর কবরেজদের সঙ্গে। মাদুলি কবচ, ওলাবিবি সকলের সঙ্গে আপস করে চলতে হবে। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে লোকে লাথাবে, অপমান করবে, তুমি টুঁ শব্দটি করতে পারে না। দেখলাম, এ রকম স্বাধীন ব্যবসা করা আমার পোষাবে না। সুট সুট করে গিয়ে চাকরি নিলুম। সারাজীবন চাকরিই করেছি। চাকরিতেও খানিকটা গ্লানি ছিল বটে, কিন্তু একটি মনিবকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে আর কোন ঝঞ্ঝাট ছিল না, আর সে মনিবটি সাধারণত শিক্ষিত সাহেব হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুণের কদর করত তারা। চাকরি করে খানিকটা স্বাধীনতা ভোগ করেছিলুম রামা শামা যদুর পায়ে তেল দিয়ে অন্নসংস্থান করতে হয়নি, কিম্বা উনুনে হাঁড়ি চড়িয়ে রুগী ধরতে বেরুতে হয়নি। আপনিও আমাকে চাকরি অফার করেছেন। কিন্তু আমি যাদের অধীনে এতকাল চাকরি করেছি তাদের রাজত্বে সূর্য অস্ত যেত না, তাদের সভ্যতা সাহিত্য, তাদের শৌর্য বীর্য, রাজনীতির দাপটে সমস্ত পৃথিবী অভিভূত, তাদের কলমের এক খোঁচায় অসম্ভব সম্ভব হত— সুতরাং আমারও মেজাজটা অনেকটা সেই রকম হয়ে গেছে আপনার অধীনে আপনার চা বাগানে বা কোলিয়ারিতে চাকরি করা আমার পোষাবে না। তাছাড়া আপনার চাকরিটি আসলে একটি টোপ, আমি যদি মাছ হতুম, গিলে ফেলতুম, কিন্তু আমি মাছ নই—মানুষ, তাই একটু মুচকি হেসে এড়িয়ে গেলুম। নমস্কার জানবেন "

চিঠিটা অগ্নীশ্বরের ভাই ই আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে—বোধহয় মাস তিনেক পরে—একদিন সকালে একটি ফুটফুটে সুন্দরী বধূ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। অগ্নীশ্বর তাহাকে পূর্বে কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া মনে পড়িল না।

"কে তুমি, তোমাকে চিনতে পারছি না।"

"আমি কমলা "

অগ্নীশ্বর নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন মেয়েটির দিকে। লক্ষ্য করিলেন, মেয়েটির চোখের কোণে জল টলমল করিতেছে তাঁহার চোখেও হঠাৎ জল আসিয়া পড়িল। কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না।

কমলা বলিল, "বাবা, আপনি এত কষ্ট করে এখানে আছেন, আমার কাছে চলুন, আপনাকে নিতে এসেছি।"

"সে তো অসম্ভব।"

"আমরা এখানে আসব?"

"আসতে পার। কিন্তু একটি শর্তে। যদি তোমার বাবার ওই ত্রিশ হাজার টাকা, মোটর গাড়ি আর বাড়ি ফেরত দাও।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মেয়েটি বলিল, "আমাদের তাহলে চলবে কি করে? উনি কোথাও চাকরি পাননি, পাবার আশাও তো কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না।"

"আমি যা পেনশন পাই তাইতে কুলিয়ে নিতে হবে। তোমার সঙ্গে বিয়ে না হলে সিধুকে এই পেনশনের উপরই নির্ভর করতে হত।"

মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আচ্ছা, বেশ আসব — '

সত্যসত্যই তাহারা টাকা গাড়ি বাড়ি ফেরত দিয়া অগ্নীশ্বরের স্যাঁতস্যাঁতে একতলা বাসায় আসিয়া উঠিল একদিন। বাড়িটিতে দুইখানি মাত্র ঘর ছিল, একটিতে অগ্নীশ্বর শয়ন করিতেন, অপরটি ছিল তাহার বাথরুম। নিজে তিনি বাথরুমে গিয়া খাটিয়া পাতিলেন ছেলে বউকে ছাড়িয়া দিলেন নিজের শুইবার ঘরটি। তাঁহার মেয়েদের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। সিদ্ধেশ্বরই তাহার একমাত্র পুত্র সুতরাং খুব বড় বাড়ির দরকারও ছিল না তাহার। কিন্তু কিছুদিন সে বাড়িতে বাস করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন কমলার খুব কষ্ট হইতেছে। কমলা তাঁহার সেবা করিবার জন্য সর্বদা ব্যস্ত। বাঁধিবার চাকরটি আসিয়াই সে ছাড়াইয়া দিল। নিজে হাতে সমস্ত করিত এমনকি অগ্নীশ্বরের 'পিসপট' পরিষ্কার করা পর্যন্ত। অগ্নীশ্বরের অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম হইত না তিনি শুইয়া শুইয়া বই পড়িতেন। ঠিক পাশের ঘরটিই কমলা আর সিদ্ধেশ্বরের অগ্নীশ্বর উৎকর্ণ হইয়া থাকিতেন, যদি তাহাদের হাসির গিটকিরি বা গল্পের টুকরা তাহার কানে ভাসিয়া আসে। কিন্তু কিছুই আসিত না, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত না। হঠাৎ একদিন তাহার মনে হইল 'ওটাতে বাবা শুয়ে আছে? নতুন বিয়ে করা বউ ছেলে, না দুটো মড়া। আমার ভয়ে ওইরকম করছে না কি— ।'

তাহার পরদিন হইতে তিনি সকাল সকাল আলো নিভাইয়া দিতেন। ঘুম আসিত না, বিনিদ্র নয়নে চুপ করিয়া জাগিয়া থাকিতেন। দিন দুই পরেই বুঝিতে পারিলেন তাঁহার 'ডায়াগনোসিস্' ঠিক। তাঁহার ভয়েই উহারা চুপ করিয়া থাকে। দুইটি ঘরের মাঝখানে যে পার্টিশন ছিল, তাহা ছাত পর্যন্ত ছিল না সেই ফাঁক দিয়া পুত্র পুত্রবধূর বিশ্রম্ভালাপ তিনি দিন কয়েক শুনিলেন, সম্ভবত উপভোগও করিলেন।

একদিন সকালে উঠিয়া কিন্তু দেখা গেল তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন। সিদ্ধেশ্বরকে তিনি যে পত্রটি লিখিয়া গিয়াছেন তাহা এই–

সিধু,

আমি তোমাদের মুক্তি দিয়ে গেলুম নিজেকেও মুক্ত করলুম। তোমাদের সঙ্গে বাস করতে হলে যে অনভ্যস্ত সংযমের কারাগারে বন্দী হয়ে থাকতে হবে সে কারাগারে বাস করা এ বয়সে আমার পক্ষে অসম্ভব। রাত্রে একটা দেড়টা পর্যন্ত বই না পড়লে আমার ঘুম হয় না, অথচ পাশের ঘরে আলো জ্বেলে বই পড়লে তোমাদের প্রেমালাপ জমে না। সামান্য চারটি আলো চালের ভাত, একটু মুগের ডাল, গাওয়া ঘি, দু'একটা ভাজাভুজি এই খেয়ে আমি তৃপ্তি

পাই। কিন্তু তোমার কমলা যখন সেবা করবার আতিশয্যে মশলা গরগরে তরকারি তৈরি করে আনে, তখন সোনামুখ করে সেটা খেতে হয়, খেয়ে বাহবাও দিতে হয়, না দিলে অভদ্রতা হয় সেটা। রান্না যে খারাপ হয় তাও নয়, কিন্তু ও ধরনের রান্না খেয়ে আমার তৃপ্তি হয় না। আমার নিজের রুচির কথা ওকে বলতে ভয় পাই, কারণ ও একা-হাতে আবাব সব করতে যাবে আমাকে খুশি করবার জন্য। তোমরা মশলা-গরগরে রান্না পছন্দ কর, হজমও করতে পার, আমিও এককালে পারতুম, এখন আর পারি না, ভালও লাগে না। তোমাব কমলা নাকি-সুরে যে আধুনিক গান গায়, তা একেবারে ভালো লাগে না আমার, আমার কান যে গান শুনতে অভ্যস্ত, তা ওস্তাদী গান, আধুনিক গান শুনলে মনে হয়, কতকগুলো উইচিংড়ে ফড়িং জাতীয় পোকা তাদের antics দেখাচ্ছে লাফালাফি কোরে। আমার এই ব্যক্তিগত অ্যাকোয়ার্ড রুচিকে বদলাতে পারি না, জোর করে তোমাদের উপর চাপাতেও পাবি না। কিন্তু রেডিওতে যখন ভালো কানাড়ার আলাপ হচ্ছে, তখন সেটা ক্যাঁক করে বন্ধ করে তোমরা যখন অমুকবালা বা তমুকনাথের সিনেমার গান শোন, তখন আমার সর্বাঙ্গ রিরি করতে থাকে, অথচ মুখের হাসিটি ফুটিয়ে রেখে পা দুলিয়ে দুলিয়ে তাল দিতে হয়। হিটলার না মুসোলিনী, কে যেন তাদের পলিটিকাল প্রিজনারদের শাস্তি দেবার জন্যে এই ধরনেব ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু এ আমার আর সহ্য হল না, তাই পালাচ্ছি। নিজেব ব্যক্তিত্বেব শূলে চড়িয়ে একটি নারীকে তো হত্যা করেছি, আর করবার ইচ্ছা নেই। কমলা ভালো মেয়ে, আশা করি ওকে নিয়ে তুমি সুখে ঘর-করনা করতে পারবে। নিজেব জন্যে পঞ্চাশ টাকা বেখে আমার পেনশনের বাকি টাকাটা তোমাকে প্রতিমাসে পাঠিয়ে দেব। আমি একটা নামজাদা দাতব্য চিকিৎসালয়ের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করছিলাম। কয়েকদিন আগে তাঁরা জানিয়েছেন যে, আমাকে তাঁরা 'অনাহারী' সার্জনের পদে বাহাল করতে রাজী আছেন। মাসে শতখানেক টাকা অ্যালাউন্স হিসেবে দেবেন, থাকবাব বাড়ী দেবেন, চাকবও দেবেন একটা। এব সঙ্গে পেনশনের পঞ্চাশ টাকা যোগ দিলে আমার ভালই চলে যাবে। সেখান থেকে আমাকে যেন আর টানাটানি করে আনবার চেষ্টা করো না। বাইরে থাকলেই আমি সুখে থাকব এবং আমার ভয়ঙ্কর ব্যক্তিত্বের আঁচটা সরে গেলে তোমরাও সুখে থাকবে আশা করি। ইতি—

যে আলেয়ার পিছনে তিনি সারাজীবন ছুটাছুটি করিয়াছেন, সে আলেয়া তাঁহাকে কিসের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহাই আমি বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। ধন মান ধর্ম মোক্ষ এসব কিছুই তিনি চাহেন নাই। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, তিনি সম্ভবত স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন— সেই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা, যাহা সামাজিক মানুষের পক্ষে দুর্লভ।

।। চার ।।

আপনাদের অনেকের মনে এ প্রশ্ন হয়তো জাগিতেছে যে, আমি একজন পুলিশ অফিসার, অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়কে লইয়া আমি এত মাথা ঘামাইতেছি কেন। ঘামাইতেছি, কারণ, আমার এই মাথাটা তিনিই একদিন রক্ষা করিয়াছিলেন।

সেই কথাটাই এবার বলিব। পূর্বে একটু আভাসমাত্র দিয়াছি, এইবার খুলিয়া বলিব। বোমার দলে কেন যোগ দিয়াছিলাম, কবে যোগ দিয়াছিলাম, তাহা এ কাহিনীর পক্ষে অবান্তর। সে যুগে যে উন্মাদনা বাংলার আকাশে বাতাসে সঞ্চরণ করিতেছিল, সে উন্মাদনার প্রভাব আমিও এড়াইতে পারি নাই। আমি যে-দলে ছিলাম, সে-দলের কাজ ছিল নানা স্থানে স্বদেশী ডাকাতি করা এবং সেই ডাকাতির টাকা দিয়া বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করা। বহুকাল পূর্বে অনুষ্ঠিত বাড়া ডাকাতিই ছিল আমাদের আদর্শ। ডাকাতি করার ফাঁকে ফাঁকে সাহেব অথবা গোয়েন্দা মারিবার চেষ্টা। ইহাই ছিল মোটামুটি আমাদের কার্যক্রম। কিন্তু হায়, একদিন ধরা পড়িলাম। আমাদেরই দলের একজন বিশ্বাসঘাতকতা করিল। বাঙালীদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমিক কম ছিল না, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকও অনেক ছিল। মানবসভ্যতা যেমন কৃষিসভ্যতা ও যাযাবর সভ্যতায় ভাগ হইয়া দুইটি বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি করিয়াছে, বাঙালী সমাজও যেন অনেকটা তাই। একদল চাকরিবিলাসী শান্তশিষ্ট সুবিধাবাদী কেরানীর দল। বড় সাহেবের মন রাখিয়া, গৃহিণীর গহনা গড়াইয়া, বংশ বৃদ্ধি, দোল-দুর্গোৎসব পুত্রকন্যার বিবাহ প্রভৃতি নিষ্পন্ন করিয়া জীবনের অপরাহ্নে পরচর্চা, পরলোক-চর্চা, দলাদলি, ঘোঁট প্রভৃতিতে মত্ত থাকিয়া হরিনাম করিতে করিতে শেষ নিশ্বাসটি ত্যাগ করা—ইহাই মোটামুটি তাঁহাদের জীবনের আদর্শ। কিন্তু এই বাঙালীর ঘরেই আবার এমন একদল ছেলে-মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, গৃহের বন্ধন, গৃহস্থালীর মায়া যাহাদের বাঁধিতে পারে নাই, আদর্শের স্বপ্নে বিভোর হইয়া যাহারা যুগে যুগে গৃহত্যাগ করিয়াছে। এই দলে চৈতন্য ছিলেন, ক্ষুদিরাম, কানাইলালেরাও এই দলের লোক। ইহাদের সহিত প্রথমোক্ত দলের ঘোর শত্রুতা। কারণ, ইহাদের নিঃস্বার্থ আত্মবিসর্জনের আগুন, ইহাদের ভূমাকাঙ্ক্ষী প্রাণের প্রচণ্ড ঝড়, গৃহস্থের সুখের সংসারকে বারবার শ্মশান করিয়া দিয়াছে। তাই যখনই এইরূপ ত্যাগী আদর্শ-পাগল লোক সমাজে দেখা দিয়াছে, তখনই তাহাদের বিরোধিতা করিবার লোকও দেখা দিয়াছে সংরক্ষণশীল সমাজ হইতে। সংখ্যায় বাঙালী বিপ্লবী এবং বাঙালী গোয়েন্দা প্রায় সমান।

দলের একজনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আমরা ধরা পড়িয়া একটি মফঃস্বলের জেলে বন্দী হইলাম। আমাদের বিরুদ্ধে চার্জ—সশস্ত্র ডাকাতি এবং হত্যার। কোনোটাই মিথ্যা নয়। ফাঁসি সুনিশ্চিত। মৃত্যুরই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। এমন সময় বিধাতা দয়া করিলেন। আমাদের দলের লোক জেলের চাকরদের হাত করিয়া আমাদের কাছে গোটা দুই লোডেড রিভলবার পৌঁছাইয়া দিল। যে পাত্রে করিয়া মেথররা প্রতি 'সেল' হইতে বিষ্ঠা পরিষ্কার করে, সেই পাত্রের মধ্যে বিষ্ঠার স্তূপে আত্মগোপন করিয়া আমাদের উদ্ধারকর্তারা আসিলেন। নরেন গোঁসাইকে খুন করিবার জন্য কানাইলালের নিকটও একদা তিনি আসিয়াছিলেন। আমরা আর কাল বিলম্ব করিলাম না, দুইজন ওয়ার্ডারকে হত্যা করিয়া পরদিনই জেল হইতে পলায়ন করিলাম। জেলেরই চাকররা আমাদের সহায়তা করিয়াছিল। তাহা না করিলে পারিতাম না। সেকালে জেলের অনেক চাকরেরা স্বদেশীদের মনে মনে ভক্তি করিত। অনেকে বাহির হইতে টাকাও পাইত প্রচুর।

পাগলা ঘণ্টা যখন বাজিয়া উঠিল, তখন আমরা জেলের বাহিরে। প্রাণপণে ছুটিতেছি। আমাদের তাড়া করিয়াছে রাইফেলধারী মিলিটারী পুলিশ। ঘোড়ায়, মোটরে, পদব্রজে। অধিকাংশই লালমুখ টমি। জেলের নিকটেই তাহাদের একটা ছাউনি ছিল।

কতক্ষণ ছুটিয়াছিলাম মনে নাই, হঠাৎ একটা গুলি খাইয়া পড়িয়া গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ধরাও পড়িলাম।

.....যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখি হাসপাতালের একটা বিছানায় শুইয়া আছি। ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায় আমার ক্ষতটা পরীক্ষা করিতেছেন। কাছেই একজন টমি দাঁড়াইয়া আছে। কথাবার্তায় মনে হইল, সেই ক্যাপ্টেন। অগ্নীশ্বর বলিলেন, "এর পেটে বুলেট ঢুকেছে। সেটা বার করে না দিলে বাঁচবার আশা নেই। তোমরা কি একে বাঁচাতে চাও?"

"নিশ্চয়—"

"তাহলে এখুনি অপারেশন করতে হবে। আমি কিন্তু আমার আপিসে তোমাদের ডিনারের ব্যবস্থা করেছি। দু বোতল হুইস্কিও পেয়েছি। তুমি আগে ডিনার খাবে, না, আমার সঙ্গে অপারেশন থিয়েটারে যাবে—"

"আমি অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে কি করব? ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে আমার, আমি খাই গিয়ে। আই হোপ, আই ক্যান ট্রাস্ট্ ইউ। ইউ আর মাই ওল্ড ফ্রেণ্ড।"

"অফ কোর্স—"

সাহেব ডিনার খাইতে চলিয়া গেলেন। অগ্নীশ্বর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেলেন অন্য একটা দরজা দিয়া। তিনি কি করিলেন জানি না, একটু পরে দুইটি বেয়ারা একটি স্ট্রেচার লইয়া আসিল। স্ট্রেচারে চড়িয়া আমি যে ঘরে উপস্থিত হইলাম, তাহা অপারেশন থিয়েটার নয়, মর্গ। অগ্নীশ্বর সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি মেথর দুইজনকে বলিলেন, "যে আনক্লেম্‌ড বডিটা এখানে রয়েছে, সেইটা তুলে নিয়ে যা অপারেশন থিয়েটারে। তুমি শিগ্‌গির নাব -"

স্ট্রেচার হইতে আমাকে নামাইয়া দিয়া আমার কানে কানে বলিলেন, "তোমাকে আমি চিনেছি। তুমি পালাও—"

স্ট্রেচারবাহিত হইয়া আন্‌ক্লেম্‌ড্ মৃতদেহটি অপারেশন থিয়েটারের দিকে চলিয়া গেল। আমি অজানার উদ্দেশ্যে আবার অন্ধকারে পা বাড়াইলাম। বুলেট আমার পেটে প্রবেশ করে নাই, পেটের চামড়া ঘেষিয়া চলিয়া গিযাছিল, খানিকটা চামড়া তুলিয়া লইয়াছিল, আর কিছু করিতে পারে নাই। কয়েকদিন পরে কাগজে দেখিলাম, হাসপাতালে আমার মৃত্যু হইয়াছে। পেটে বুলেট ঢুকিয়াছিল, তাহা বাহির করিবার জন্য আমার পেট কাটা হয়। সার্জন এ. মুখার্জি অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও বুলেটটি পান নাই। অপারেশনের ফলে আমার মৃত্যু হইয়াছে।

....কিছুদিন পরে দাড়ি, লুঙ্গী আর চাটগাঁয়ের ভাষার সাহায্যে ভোল বদলাইয়া ফেলিলাম। তখন মুসলমানদের উপর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট খুব প্রসন্ন ছিলেন, তাই মুসলমানের ছদ্মবেশ গ্রহণ করাই নিরাপদ মনে হইল। চট্টগ্রামের এক মুসলমানের বাড়িতেই চাকর হিসাবে বাহাল হইয়া গেলাম। পরিচয় দিবার সময় বলিলাম, কলিকাতায় আমার বাবা বাবুর্চির কাজ করিত,

হিন্দু-মোসলেম রায়টের সময় হিন্দুর ছুরিতে মারা গিয়াছে, মা কোথায় পলাইয়া গিয়াছে জানি না। ভাই বোন কেহ নাই।

হায়রে, আমার নিজের বাবা মা তখন হয়তো তাঁহাদের শহীদ পুত্রের মৃত্যুশোকে ভালো করিয়া কাঁদিতেও পারিতেছেন না, কারণ আমার আর একটি ভাই ছিল, সে যে আমার ভাই, একথা পুলিশের কানে গেলে তাহাকেও লইয়া পুলিশ টানাটানি করিবে, এই ভয়ে তাঁহাদের পুত্রশোকও হয়তো ভাষা পাইতেছে না, এই রকম একটা কল্পনা করিয়া আমি সুখ পাইতাম। কিন্তু সত্য যাহা ঘটিয়াছিল তাহা আরও নিদারুণ। আমার বাবা মা ভাই কেহই রক্ষা পায় নাই। আমার বাবা মা পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতেন, যে বিশ্বাসঘাতক আমাদের ধরাইয়া দিয়াছিল, আমার ভাই তাহাকে প্রকাশ্য রাজপথে কুকুরের মতো হত্যা করিয়া ফাঁসি গিয়াছে। পুলিশের লোকেরা আমার মা বাবাকেও রেহাই দেয় নাই। আমি যখন বিলাত হইতে ফিরিলাম তখন তাঁহাদের স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত। আমাদের ভিটায় ঘুঘু চরিতেছে না, রাজানুগৃহীত এক ব্যক্তি সেখানে বাড়ি করিয়াছেন, তাঁহার অ্যালশেসিয়ান কুকুরের দাপটে সেখানে কেহ ঘেঁষিতে পারে না। আমি বাবা মায়ের শ্রদ্ধা তর্পণও করিয়াছি লুকাইয়া। সহজে তাহা সম্ভব হয় নাই। বাংলা-বিহার উত্তর প্রদেশে আমি মুসলমান বলিয়া পরিচিত, প্রকাশ্যে হিন্দুমতে বাবা মার শ্রাদ্ধ করিব কি করিয়া? তবু করিয়াছিলাম। ধনুষ্কোটি যাইতে হইয়াছিল।

হ্যাঁ, আমি শেষ পর্যন্ত বিলাত গিয়াছিলাম। ব্যাপারটি সম্ভব হইয়াছিল বড় অদ্ভুত উপায়ে। আমি যে হাজি সাহেবের বাড়িতে চাকররূপে বাহাল হইয়াছিলাম তাঁহার বৃহৎ পরিবার তাঁহার নিজের চারটি বিবি। দুইটি বয়স্ক পুত্রও পিতৃ-পন্থা অনুসরণ করিয়া একাধিক বিবাহ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া একটি কন্যা এবং একটি ভাগ্নী সপরিবারে তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিতেন। বৃহৎ পরিবার। আমাকে বাসন মাজিতে হইত, বাহিরের ঘর ঝাড়ু দিতে হইত পুরুষদের কাপড় কাচিতে হইত ইহা ছাড়া ফাই ফরমাস তো ছিলই। বাজারও করিতে হইত। বাজার করিতে গিয়া লক্ষ্য করিতাম একটি ভিখারিণী প্রায় প্রতি দোকানেই গিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে। কেহ ভিক্ষা দিতেছে, কেহ দিতেছে না, কিন্তু সকলেরই দৃষ্টি প্রলুব্ধ। মেয়েটির বয়স আন্দাজ ত্রিশ বত্রিশ হইবে। যুবতী নয়, কিন্তু রূপসী। তাহার চোখের দৃষ্টি ঠিক পণ্য রমণীর দৃষ্টি নহে। কিন্তু অদ্ভুত সে দৃষ্টি। তাহার ভাষাও চট্টগ্রামের ভাষা নহে, পশ্চিমবঙ্গের ভাষা। মনে হইল মেদিনীপুরের। মেদিনীপুর বিপ্লবীদের চক্ষে তীর্থস্থান। মেয়েটির কথায় মেদিনীপুরের টান শুনিয়াই প্রথমে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তাহার পর একদিন সে আমার কাছেও ভিক্ষা চাহিল।

বলিলাম, "আমি তো নিজেই গরীব। তোমাকে আর কি দিতে পারি।"

"যা পার তাই দাও।"

আরও দিন দুই পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভিক্ষা কর কেন। রোজগার করতে পার না?"

মেয়েটি তাহার সেই অদ্ভুত দৃষ্টি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিল। তাহার পর বলিল, "আমার মতো মেয়ের পক্ষে রোজগারের একটি পথই খোলা আছে। অনেকেই আমাকে সে চাকরি দিতে চায়। কিন্তু আমার প্রবৃত্তি হয় না।"

তাহার চোখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মনে হইল, চোখের দুটি তারা যেন দুটি ছররা। সহসা সে বলিয়া উঠিল, "তুমি আমার ছেলে হবে? আমাকে মা বলে ডাকবে? আমাকে কেবল খেতে পরতে দিও, তোমার সব কাজ আমি করে দেব—"

"আমি যে মুসলমান মা, আমার ছোঁয়া খাবে তুমি?"

"তুমি যদি মা বলে আমাকে ডাক, তাহলে তো জাতের বিচার আর রইলো না। মায়ের চোখে সব ছেলেই এক জাত।"

"বেশ, তাই হবে। তোমার দেশ কোথা?"

"মেদিনীপুর জেলা, কন্টাই সাবডিভিসন।"

শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

"এখানে কি করে এলে।"

"ভাসতে ভাসতে। এক স্বদেশী আন্দোলনে সায়েবরা এসে পেট্রোল দিয়ে আমাদের ঘর-বাড়ী সব পুড়িয়ে দিলে। আমার স্বামীর মুখের উপর গুলি করলে একজন সাহেব। তার অপরাধটি কি জান? সে বলেছিল 'বন্দে মাতরম'। আমার ছেলেটাকেও মেরে ফেললে। মারলে না কেবল আমাকে।"

তাঁহার চোখের ছর্‌রা দুইটি প্রখর হইয়া উঠিল। মনে হইল, এখনই বুঝি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিবে।

"আমাকে তারা ফেলে চলে আসছিল। কিন্তু আমি সঙ্গ ছাড়িনি। খবর পেয়েছি, ওরা এখানে এসেছে। তাই আমিও এসেছি—"

"ওদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছ কেন—"

"এখনও বকশিস পাইনি যে।"

কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল সহসা।

"তুমি ছেলে বলেই তোমাকে সব কথা বললুম। বলা বোধহয় উচিত ছিল না, না? মাথার ঠিক নেই। তুমি আমাকে মা বলে ডাকবে তো? একবেলা দুটি খেতে দিও কেবল, কেমন? কোথা থাক তুমি।"

"হাজি সাহেবের বাড়িতে। সেখানে যেও না যেন। আমি তোমার খাবার এইখানেই নিয়ে আসব। তুমি কোথায় থাক?"

"কোথাও না। দিন-রাত ঘুরি। ফাঁক খুঁজি। শোবার বসবার কি জো আছে কোথাও, সঙ্গে সঙ্গে কেউ না কেউ দাঁড়াবে কাছে এসে। খালি ঘুরে বেড়াই। সকালবেলা বাজারে আসি। এইখানেই খাবার দিয়ে যেও, কেমন?"

অভিভূত হইয়া বাড়ি ফিরিলাম।

তাহার পরদিন হইতে রোজই আমার খাবারের খানিকটা অংশ তাহাকে দিয়া আসিতাম। ও অঞ্চলে সকলে তাহাকে পাগলী বলিত। প্রথম প্রথম অনেকে তাহাকে বিরক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, শেষে আর করিত না। সে একজনকে নাকি কামড়াইয়া দিয়াছিল।

এইভাবেই চলিতেছিল। ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল। একদিন নদীতে স্নান

করিতেছি, হঠাৎ সকলে হৈ হৈ করিয়া উঠিল। দেখিলাম একটি ছেলে ডুবিতেছে। ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। বাঁচিবার আশা প্রায় নাই। প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলাম এবং অনেক কষ্টে ছেলেটার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিতে টানিতে তাহাকে তীরে তুলিলাম। অনেক জল খাইয়াছিল, হাসপাতালে গিয়া কোনরকমে রক্ষা পাইয়া গেল। শুনিলাম একজন সারেং-এর ছেলে। সারেং একদিন আসিয়া আমার সহিত দেখা করিলেন এবং আমাকে কিছু পুরস্কার দিতে চাহিলেন। পুরস্কার লইলাম না। বলিলাম, ''আপনার ছেলের 'জান' বাঁচাতে পেরেছি এই তো আমার যথেষ্ট বকশিস। খোদাতালা ওকে বাঁচিয়ে রাখুন, এর জন্যে আমি টাকা নিতে পারব না। গোস্তাকি মাপ করবেন।''

দিনকতক পরেই কিন্তু বকশিসটা লইতে হইল অপ্রত্যাশিতরূপে এবং অন্য প্রকারে। একদিন বাজারে সেই পাগলীটা বলিল, ''তুই যে আমাকে মা বলিস, পেন্নাম করলি না তো একদিন। পেন্নাম কর আজ—''.

ভঙ্গীভরে শাড়িটা তুলিয়া পা বাড়াইয়া দিল। দেখিলাম, তাহার মুখে অদ্ভুত একটা হাসি, চোখের কোণে জল।

''পেন্নাম কর। মাকে পেন্নাম করবি তাতে আর লজ্জা কি—''

চারিদিকে লোক জড় হইয়া গিয়াছিল। আমি সত্যই একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলাম। শেষে তাহার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্যই তাহাকে একটা প্রণাম করিলাম। সে একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। সহসা তাঁহার চিবুক ও নিচের ঠোঁটটা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিল---''মানুষের মতো মানুষ হও। আমি আশীর্বাদ করছি তুমি হবে।''

মেয়েটির নাম ছিল বিশাখা। বাঁ হাতে উলকি দিয়া নামটি লেখা ছিল। সে আজ কত দিনের কথা। তাহার হাসি-কান্না মাখা মুখখানি আজও আমার মনে স্পষ্ট আঁকা আছে। এতটুকু ম্লান হয় নাই। মাঝে মাঝে মনে হয়, তাহার আশীর্বাদ কি আমার জীবনে ফলিয়াছে? সত্যই কি মানুষের মতো মানুষ হইতে পারিয়াছি?

প্রণাম করার পরদিনই ঘটনাটি ঘটিল। একজন মিলিটারি সাহেব বাজারে আসিয়াছিল, বিশাখা ছুটিয়া গিয়া একেবারে তাহার টুঁটি কামড়াইয়া ধরিল। সে কামড় সাংঘাতিক মরণ কামড়। বুলডগ যেমন একবার কামড়াইয়া ধরিলে সে কামড় আর খোলে না, এ কামড় তেমনি কামড়। অনেক টানাটানি ধস্তাধস্তি করিয়াও বিশাখাকে ছাড়ানো গেল না। তাহার পিঠের উপর লাঠি জুতা ঘুষি চড় বর্ষিত হইতে লাগিল, তবু সে ছাড়িল না। শেষে একজন সার্জেন্ট তাহার কাপড় খুলিয়া সর্বাঙ্গে শপাশপ হান্টার চালাইতে লাগিল। তবু কোন ফল হইল না। শেষে তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হইল। বিশাখা মরিল, কিন্তু তাহার মৃতদেহটা সাহেবের টুঁটি কামড়াইয়া ঝুলিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করিয়া তাহার রক্তাক্ত মুখটা সাহেবের গলা হইতে যখন ছাড়াইয়া লওয়া হইল, তখন দেখা গেল, সাহেবের টুঁটিটা সে একেবারে চিবাইয়া দিয়াছে. একাধিক বড় বড় শিরাও ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। আধঘণ্টা পরে সাহেবেরও মৃত্যু হইল।

বাংলার অগ্নিযুগের ইতিহাসে বিশাখার নাম লেখা নাই। আরও অনেকের নাই। ইচ্ছা করিয়া অনেকে নিজেদের পরিচয় মুছিয়া দিয়া গিয়াছে। কাজটাই তাহাদের কাছে বড় ছিল, নামটা নয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে আমাদের সেই পলাতক জীবনে যখন বন্যপশুর মতো আমরা একস্থান হইতে আর একস্থানে পালাইয়া বেড়াইতাম, যখন পথের বদলে বিপথ এবং গৃহের বদলে অরণ্যই আমাদের নিকট বেশি নিরাপদ মনে হইত, যখন ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, বিশ্রামের শয্যা দুর্লভ বিলাসের মতো ছিল, সেই সময় কত অপরিচিত গৃহে আশ্রয় পাইয়াছি, কত অচেনা মা-বোনেদের সেবা পাইয়াছি, তাহার ইতিহাসও কোথাও লেখা থাকিবে না। তাঁহারা জানিতেন আমরা বোমার দলের লোক, তাঁহারা জানিতেন আমাদের আশ্রয় দেওয়া নিরাপদ নয়, তবু আশ্রয় দিতেন, হয়তো একঘণ্টার জন্য, হয়তো এক রাত্রির জন্য, আজ কোথায় তাহারা, ইতিহাসে তাঁহাদের নাম নাই। বিশাখারও নাই। মাঝে মাঝে মনে হয়, জীবন আমার ধন্য হইয়া গিয়াছে। তাহাকে একবারও ঠিক প্রণাম করিয়াছি।

বিশাখা মরিয়া কিন্তু আমাকে বিপদে ফেলিয়া গেল। পুলিশের খবর পাইতে বিলম্ব হইল না যে আমি তাহাকে রোজ খাইতে দিতাম। বাজারে যাইতেই একজন আমাকে বলিল, "তুমি শিগগির এখান থেকে পালাও পুলিশ তোমাকে খুঁজছে-

বাজার না করিয়াই বাড়ি ফিরিয়া গেলাম। হাজি সাহেবকে খুলিয়া বলিলাম সব। তিনি বলিলেন, "পুলিশ তোমার খোঁজে এখানেও এসেছিল, আমি বলে দিয়েছি, তুমি এখানে নেই। তোমাকে আমি জবাব দিয়েছি। তুমি এদেশ ছেড়ে পালাও।"

"কোথা পালাব হুজুর। আমি গরীব মানুষ "

হাজি সাহেব গম্ভীরমুখে দাড়ির ভিতর আঙুল চালাইতে লাগিলেন।

"কিন্তু আমি তো বাপু তোমাকে আর আমার বাড়িতে থাকতে দিতে পারি না। তুমি তাহলে এক কাজ কর, সারেং সাহেবের কাছে যাও। তাঁর জাহাজ দু' একদিনের মধ্যেই ছাড়বে। তিনি যদি তোমাকে জাহাজে তুলে নিয়ে কোথাও পার করে দেন, তাহলে বেঁচে যাবে তুমি এ যাত্রা—"

"কোন সারেং - "

"আরে, যার ছেলেকে তুমি বাঁচিয়েছিলে—"

সারেং বলিল, "নিশ্চয়, তোমার জান বাঁচাব বইকি। তুমি আমার আলীকে বাঁচিয়েছ। আমার জাহাজ বিলেত যাবে। যেতে রাজী আছ তো? জাহাজের খোলের ভিতর লুকিয়ে থাকতে হবে কিন্তু।"

"আপনি যা করতে বলবেন, তাই করব। খোলের ভিতর কতদিন থাকতে হবে?"

"বেশিদিন হয়তো না-ও হতে পারে। কাপ্তেন সাহেবকে বলব, আমি একটা চাকর সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, তিনি হয়তো আপত্তি করবেন না।"

কাপ্তেন সাহেব আপত্তি করিলেন না। শুধু তাহাই নয়, দিনকয়েক পরে আমি কাপ্তেন সাহেবেরই প্রিয় ভৃত্য হইয়া পড়িলাম। তিনি মদটা একটু অধিক মাত্রায় খাইতেন এবং মত্ত

অবস্থায় আমাকে গালাগালি দিয়া সুখ পাইতেন। এটা বোধহয় তাঁহার চাটের কাজ করিত। দুই এক পেগ পেটে পড়িবামাত্র তিনি আমাকে সন অব এ বিচ বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং ধাপে ধাপে গালাগালি যে ভাষায় গিয়া শেষ পর্যন্ত পৌঁছিত তাহা লেখা যায় না। আমার কাজ ছিল সোডার বোতল খোলা, মদের বোতল খোলা, বরফ ভাঙা, গালাগালি শোনা এবং তিনি যখন বেএক্তার হইয়া পড়িতেন, তখন তাহাকে লইয়া গিয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দেওয়া। মাঝে মাঝে তিনি আমাকে লাথিও মারিতেন। সবই আমি নির্বিকারভাবে সহ্য করিতাম। অভিনয় ভালই করিতেছিলাম। যে কোনও অবস্থার সঙ্গে নিজেকে বেমালুম খাপ খাওয়াইয়া লইবার শিক্ষা বিপ্লবী জীবনেই লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু বিপ্লবী জীবনে বাহিরে যেভাবেই আত্মপ্রকাশ করি না কেন, ভিতরে ভিতরে স্বকার্যসাধনের লক্ষ্য ঠিক থাকিত। এক্ষেত্রে তাহা ছিল না। তাই মনে মনে একটা অস্বস্তিবোধ করিতেছিলাম নিজেদের দলের লোকই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাদের ধরাইয়া দিয়াছে এই গ্লানিতে বিপ্লবীজীবনের সম্বন্ধেই আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। তখনও জানিতাম না যে, আমার ভাই সেই বিশ্বাসঘাতকটাকে হত্যা করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইয়াছে। জানিলে হয়তো আবার বিপ্লবী জীবনেই ফিরিয়া যাইতাম। কিন্তু তখন জানিতাম না। বিশাখার মৃত্যু মনকে নাড়া দিয়াছিল, বিশাখার মৃত্যুর জন্যই এই জাহাজে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইয়াছে অদৃষ্ট যে কোন পথে আমাকে চালিত করিতেছে ইহার পর কোথায় কি করিব চিরকাল পলাতকের ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে হইবে কি না, এই সব অনিশ্চিত ভাবনায় মনটা সর্বদাই অবসন্ন হইয়া থাকিত এমন সময় হঠাৎ একটা পথের নির্দেশ মিলিয়া গেল। জীবনে হঠাৎই এইরূপ পথের নির্দেশ মেলে। জীবনে যাহা হইয়াছিল তাহা আকস্মিক যোগাযোগের ফলেই হইয়াছিল। পুরুষকার না থাকিলে অবশ্য কিছুই হয় না। কিন্তু পুরুষকার প্রকাশ করিবার ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় এইরূপ আকস্মিক যোগাযোগের ফলে কোথা হইতে কে আসিয়া একটা বিশেষ পথে কেন যে লইয়া যায় তাহা কে বলিবে

একদিন চোখে পড়িল ডেকে বসিয়া একটি যুবক নিবিষ্টচিত্তে একখানি বই পড়িতেছে। চেহারাটা ভারতীয় তো বটেই, বাঙালী বলিয়া সন্দেহ হইল। আস্তে আস্তে পিছন দিকে গিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম কি বই পড়িতেছে। দেখিয়া বিস্মিত এবং চমকিত হইলাম। বাংলা বই, কিন্তু ছাপা নয়, হাতে লেখা। লেখাটাও আমার চেনা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল, তাহার পর সহসা মনে পড়িল। এ যে অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের হস্তাক্ষর। সুবিমলকে লেখা তাঁহার অনেক চিঠি যে আমি পড়িয়াছি। এ ভদ্রলোক কেহ অগ্নীশ্বরের কোনও আত্মীয় না কি। তখন আর কিছু বলিলাম না। আস্তে আস্তে সরিয়া গেলাম। কিন্তু মনের মধ্যে একটা ঔৎসুক্য জাগিয়া রহিল। ভদ্রলোকটির পরিচয় সংগ্রহ করিতে হইবে। পরদিন ঝড়বৃষ্টি নামিল। ডেকে কেহই বাহির হইতে পারিল না। তাহার পরদিনও ভদ্রলোকটিকে পাইলাম না। তাহার পর চোখে পড়িল তিনি জাহাজের ডাক্তারবাবুটির ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছেন একটু পরেই তাঁহার সহিত দেখা হইল। তিনি ডাক্তারবাবুর ঘর হইতে বাহির হইতেছিলেন, আমি আগাইয়া গিয়া নমস্কার

করিলাম এবং বাংলায় বলিলাম, "নমস্কার, গায়ে পড়ে আলাপ করছি বলে ক্ষমা করবেন। আপনি বাঙালী, তাই আলাপ করবার লোভ সামলাতে পারলুম না।"

"আপনিও বাঙালী?"

তিনি আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। আমার পোশাকে এবং চেহারায় বাঙালীত্ব কিছু ছিল না। মুখময় দাড়ি, গোঁফ কামানো, পরনে আধময়লা পাজামা, গায়ে লম্বা নীল কোট একটা।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"মুসলমান?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"জাহাজে চাকরি করেন?"

"হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করবার ইচ্ছে আছে। হয়তো আত্মীয়তাও বেরিয়ে পড়তে পারে—"

"আমি হিন্দু। আপনি তো মুসলমান।"

হাসিয়া বলিলাম, "হিন্দুর সঙ্গেও মুসলমানের আত্মীয়তা হয় বই কি। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি কেবল জাত বা রক্তের সম্পর্ক দিয়েই ঠিক হয়?"

আমার মুখে এ ধরনের কথা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই।

বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "নিশ্চয় নয়। মানুষের সঙ্গে মনুষ্যত্বের সম্পর্কটাই সব চেয়ে বড়। বেশ, আসবেন, নম্বর আঠারো আমার কেবিন। যখন সুবিধে হবে আসবেন। আমি ঘরেই থাকি প্রায়।"

সেইদিনই একটু পরে অবসর মতো তাঁহার কেবিনে গিয়া দেখা করিলাম। তিনি তখনও অগ্নীশ্বরের লেখাটা পড়িতেছিলেন।

"আসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম। কোথা বাড়ি আপনার—"

হাসিয়া বলিলাম, "রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আছে 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া'—আমার অবস্থা অনেকটা তাই। কোথায় যে আমার বাড়ি তা জানি না। সর্বত্র সেইটেই খুঁজছি।"

সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন তিনি।

"আপনি তো গুণী লোক দেখছি মশাই। আমার সঙ্গে আপনার আত্মীয়তা আছে একথা তখন হঠাৎ মনে হল কেন—"

"আপনি যে বইটা পড়ছেন, তার হাতের লেখাটা আমার চেনা। সেদিন ডেকে বসে যখন পড়ছিলেন তখন চোখে পড়েছিল লেখাটা।"

"ও, কার লেখা বলে মনে হয়েছিল আপনার?"

"ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের।"

"ঠিক বলেছেন তো। তাঁরই লেখা। আপনার সঙ্গে এঁর আলাপ কি করে হয়েছিল—"

"ছাত্রজীবনে ওঁকে প্রথম দেখি আমি। তখনই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কোলকাতায় যখন কলেজে পড়তে গেলাম, তখন ওঁর আরও পরিচয় পেলাম। আমার এক সহপাঠী সুবিমল

সাহিত্যচর্চা কবত, এখনও করে বোধহয়, অগ্নীশ্বর মুকুজ্যে তার লেখার সমালোচনা করতেন। সুবিমল আমাকে দেখাতো সে সব তখনই তাঁর ধারালো মনের পরিচয় পেয়েছিলাম। খাপখোলা তলোয়ার যেন। যদিও তখন ওঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আমার হয়নি, কিন্তু মনে হয়, পরে আমি যে পথে পা বাড়িয়েছিলাম তা ওঁবই প্রভাবে।''

আবেগের মুখে এই পর্যন্ত বলিয়া সহসা থামিয়া গেলাম। ভয় হইল, এ কি করিতেছি! অপরিচিত একটা লোকেব কাছে এসব কথা বলা তো নিরাপদ নয়।

ভদ্রলোক বলিলেন, ''আমিও অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের ছাত্র। এফ-আর-সি-এস পড়ব বলে বিলেত যাচ্ছি। সত্যিই তিনি অসাধারণ লোক, অসাধারণ ডাক্তার, অসাধারণ মানুষ। বাংলা দেশে ও বকম লোক বেমানান। ওঁর কদর কববাব লোক নেই আমাদের দেশে। বিদেশে জন্মালে উনি ভলটেয়াব রুশো হতে পারতেন, এদেশে ওঁব নাম পর্যন্ত জানে না কেউ।''

''ওটা ওঁর কি লেখা পড়ছেন?''

''এটা একটা অদ্ভুত লেখা। লেখাটার নাম হচ্ছে 'আধুনিক পঞ্চকন্যা।' যখন কলেজে পড়তুম, ওঁর সঙ্গে পাযই আমার তর্ক হত আমাদের ধর্ম পুরাণ নিয়ে। উনি আর্যসভ্যতাব একজন গোঁড়া ভক্ত, গীতা বামায়ণ মহাভারতের অনুরাগী পাঠক এবং সমালোচক। আমি ওঁকে একটা চিঠিতে কিছুদিন আগে লিখেছিলাম যে, আমাদের দেশে যে পঞ্চকন্যাকে বোজ সকালে স্মবণ কবতে বলা হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকটিই তো একাধিক পুরুষের সঙ্গে ঘব করেছেন। এঁদেব স্মরণ করাব মানে কি? তার উত্তরে উনি ছোটোখাটো একটা বই লিখে পাঠিয়েছেন। এটা পেয়েছি অনেকদিন আগে, কিন্তু ভালো করে পড়া হয়নি তখন। তাই সঙ্গে কবে এনেছি ভালো করে পড়ব বলে। আপনি তো মুসলমান, পঞ্চকন্যার কথা জানেন না, নামই শোনেননি বোধহয়—''

হঠাৎ কেমন যেন আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। ইচ্ছা হইল বলিয়া ফেলি—গীতা আমার কণ্ঠস্থ, রামাযণ-মহাভাবত গুলিযা খাইয়াছি, পঞ্চকন্যা আমার নিকটও দুর্বোধ্য প্রহেলিকাব মতো বিস্ময়জনক। শুধু পঞ্চকন্যাই নয়, মহাভারত-রামায়ণের অনেক চরিত্রই। কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া ফেলিলাম। ভয় হইল, ভাবিলাম, 'না, এখন ধরা ছোঁয়া দেওয়া ঠিক নয়'।

বলিলাম, ''নাম শুনেছি বই কি। অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী এদের কথা বলছেন তো? খুবই শুনেছি। গোঁড়া হিন্দুরা হয়তো ওদের অসতী বলবেন, কিন্তু মুসলমানরা বলবে না। শের আফগানের বিবি মেহেরুন্নিসার জগদ্বিখ্যাত নূরজাহান হতে আটকায়নি—। লেখাটা আপনার পড়া হলে যদি দয়া করে দেন আমাকে, একটু পড়ে দেখব---''

''আপনার মনের চেহারার সঙ্গে বাইরের চেহাবার তো মিল নেই দেখছি। এ জাহাজে আপনি কতদিন চাকরি করছেন?''

''বেশি দিন নয। এ জাহাজ ছাড়বার সময়ই বাহাল হয়েছি—''

''কি কাজ করতে হয়।''

''ক্যাপ্টেন সাহেবের ফাই-ফরমাস খাটতে হয়। ওরই চাকর হয়ে যাচ্ছি—''

"আপনি এ কাজ নিয়েছেন কেন বুঝতে পারছি না। আপনার কথাবার্তা শুনে তো মনে হয় আপনি শিক্ষিত লোক। লেখাপড়া কতদূর করেছেন?"

"বি এস সি পাশ করেছি। দেশে কিছু জুটল না, তাই ভাগ্যঅন্বেষণ করতে বেরিয়ে পড়েছি। প্রথম এই চাকরিটাই জুটল, তাই করছি। তারপর দেখি অদৃষ্টে কি আছে —"

দুয়ারের কাছে কাহার যেন পদশব্দ পাওয়া গেল। পরমুহূর্তেই ঠকঠক করিয়া দুয়ারে টোকা পড়িল

"মে আই কাম ইন ডক?"

"ও ইয়েস।"

যিনি প্রবেশ করিলেন তাঁহাকে দেখিয়া আমার গায়ের রক্ত জল হইয়া গেল। ইনি সেই মিলিটারি ক্যাপ্টেন, যিনি আমাদের পিছনে তাড়া করিয়া আমাদের উপর গুলি চালাইয়া অবশেষে অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। ইঁহারই চোখে ধুলা দিয়া অগ্নীশ্বর আমাকে অপারেশন থিয়েটারে না লইয়া গিয়া মর্গে লইয়া যান এবং সেখান হইতে আমাকে ছাড়িয়া দেন। এ লোকটা এখানে আসিল কোথা হইতে। আমি ডাক্তারবাবুকে নমস্কার করিয়া অবিলম্বে বাহির হইয়া আসিলাম। বাহিরে আসিলাম বটে, কিন্তু চলিয়া গেলাম না দরজার বাহিরে আড়ি পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

বলা বাহুল্য, আলাপ ইংরেজিতেই হইতে লাগিল।

"ডাক্তার, আমার লিভারের ব্যথাটা আবার বেশ বেড়েছে। জাহাজের মেডিকেল অফিসার যে ওষুধটা দিয়েছে তাতে তো কিছু হচ্ছে না। তুমি কিছু বাতলাতে পার?"

"পারি। কিন্তু তাতে তুমি শুনবে না। মদটা ছাড়"

"সে তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছি কাল আধ বোতলের বেশি খাইনি তো—

ডাক্তারবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

"কিছু বলছ না যে কি পড়ছ তুমি ওটা। হাতের লেখা দেখছি। লাভ লেটার?"

"না—"

"পর্ণোগ্রাফি না কি। হাতে লেখা কেন?"

"ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখার্জি আমার শিক্ষক ছিলেন, তিনিই লিখে পাঠিয়েছেন খুব ভালো লেখেন।"

"ওয়েট, ওয়েট, অগ্নীশ্বর মুখার্জি? যিনি সিভিল সার্জন ছিলেন?"

"হ্যাঁ—"

"গ্রেট ম্যান ছিলেন তিনি। হি ওয়াজ এ নাট"

তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, "আমাকে খুব বাঁচিয়েছিলেন একবার। একবার একাই শিকারে গেছি এক মফঃস্বলে। আমার সঙ্গে একটা ইণ্ডিয়ান বয় আমার জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাকে একটা গাছতলায় বসিয়ে আমি তিতিরের সন্ধানে ঢুকলুম গিয়ে একটা জঙ্গলে। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেও কিছু সুবিধে হল না। ছিল অনেক তিতির,

একটাও মারতে পারলুম না। ফুর্‌র্ ফুর্‌র্ করে ঝোপঝাপে ঢুকে পড়ল সব। টেম্পার খারাপ হয়ে গেল খুব। তিন চার মাইল হাঁটতে হয়েছিল বনে বাদাড়ে, আবার হেঁটে হেঁটে ফিরলুম খুব ক্ষিধেও পেয়েছিল। তবে আশা ছিল, আমার কিটের ভিতর কিছু বিস্কুট আর খানিকটা পোর্ট আছে, তাই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যাবে। ফিরে গিয়ে কি দেখলুম জান? কিট ব্যাগ খোলা, বিস্কুটের টিন খালি। সেই ছোঁড়া সব বিস্কুটগুলি খেয়েছে। কিট ব্যাগটা ঘাঁটাঘাঁটি করতে পোর্টের বোতলের ছিপিটাও ঢিলে হয়ে গিয়েছিল। পোর্টও দেখলাম পড়ে গেছে অনেকটা। লুক অ্যাট দি চীক অব দি বয়। জিজ্ঞেস করলাম, বললে, আমি কিছু জানি না। আমার আর সহ্য হল না বুটসুদ্ধ এক লাথি ঝেড়ে দিলাম তার মাথায়। হল কি জান? ডিমের মতো মাথাটা ফেটে গেল। এটা প্রত্যাশা করিনি এক লাথিতে মরে যাবে এ কথা ভাবাই যায় না কিন্তু ছোঁড়া মরে গেল। গায়ে হাত দিয়ে দেখি স্টোন ডেড। কি করি, তখন এক ডুলি ভাড়া করে নিয়ে গেলাম তাকে হাসপাতালে। সেখানে তাকে ফেলে রেখে যেতে পারি না, দ্যাট উড হ্যাভ বিন ক্রিমিন্যাল। হাসপাতালে ছিল অগ্নীশ্বর দি গ্রেট। পুলিশে খবর দিতে হল অবশ্য। কিন্তু অগ্নীশ্বর এমন রিপোর্ট দিলে যে আমি বেচে গেলাম। হি ওয়াজ এ স্পোর্ট।"

একটু থামিয়া সাহেব আবার বলিলেন, "অবশ্য, আমারও পরে একটা সুযোগ এসেছিল অগ্নীশ্বরের এ ঋণ আমি শোধ করে দিয়েছি। উই আর কুইটস্।"

ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করিলেন, "কি হয়েছিল?"

এখন আমি রিটায়ার করে ফিরছি বলতে আর বাধা নেই। তবে কথাটা আর কাউকে বলো না আমি একবার একদল টেররিস্টকে তাড়া করেছিলাম জেলে দুটো ওয়াড করে খ· করে পালাচ্ছিল তারা গুলি খেয়ে পড়ে গেল কয়েকজন। তাদের ফার্স্ট এড দেবার জন্য নিয়ে গেলাম হাসপাতালে। কাছেপিঠে ও ছাড়া আর হাসপাতাল ছিল না। সেখানে গিয়ে দেখি সেখানকার ডাক্তার অগ্নীশ্বর। আগে আলাপ ছিল খুব খাতির করে বসালে আমাদের নিজের কোয়ার্টারসে নিয়ে গিয়ে। বললে, যদি আপত্তি না থাকে ডিনারের ব্যবস্থা করতে পারি। তখন রাত আটটা হবে ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। বললাম, কর। কিন্তু আগে চল, যাদের ধরে এনেছি, তাদের একটা ব্যবস্থা করে ফেলা যাক। অগ্নীশ্বর যখন ওদের পরীক্ষা করছিল, তখনই সন্দেহ হল, ওদের মধ্যে একটা ছোকরা যেন ওর চেনা। ওর চোখমুখের ভাবভঙ্গী থেকে বুঝলুম সেটা সে ছোকরার পেটের উপর দিয়ে একটা বুলেট চলে গিয়েছিল। অগ্নীশ্বর বললে, বোধহয় পেটে ঢুকেছে, পেট কাটতে হবে। আমাকে জিজ্ঞেস করলে, তুমি কি অপারেশন থিয়েটারে আমার সঙ্গে যাবে না, ডিনার খাবে গিয়ে। আই টুকদি হিন্ট্। বললাম, অল রাইট, তুমি অপারেশন কর গিয়ে, আমরা ডিনার খেতে যাচ্ছি। ফিরে এসে দেখলাম, সে ছোকরা পালিয়েছে, অগ্নীশ্বর একটা মড়ার পেট কেটে ঢাকা দিয়ে রেখেছে। সম্ভবত কোনও আনক্লেমড বডি ছিল মর্গে। আমি বুঝতে পারলুম সবই, বাট আই ওভারলুকড। আর জান? এই জন্যে তার উপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। হি ওয়াজ এ ম্যাট "

আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা নিরাপদ মনে হইল না। দূরে কাপ্তেন সাহেবের গলার আওয়াজ শোনা গেল। তাড়াতাড়ি সেই দিকেই চলিয়া গেলাম।

পরদিন আবার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করিলাম। কথাপ্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম, লণ্ডনে তাঁহার এক আত্মীয় স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ট্রেনিং লইতেছেন। ইনি তাঁহারই বাসায় গিয়া উঠিবেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি করবেন? ফিরে আসবেন না নিশ্চয়। আপনার পাসপোর্ট আছে তো?"

"না। আমি সারেং সায়েবের দয়ায় লুকিয়ে জাহাজে ঢুকেছি। আমাকে নাবতে দেবে না বোধহয়।"

"ডাক্তারবাবু খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "আপনি কি নাবতে চান?"

"চাই। কিন্তু কি করে সম্ভব হবে জানি না।"

"যে সারেং আপনাকে এনেছে, তিনিই কোন ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন হয়তো। বলেছেন তাঁকে কিছু?"

"না, এখনও বলিনি।"

"বলে দেখুন। আমার কাছে কাল আসবেন একবার। আপনার ফোটো তুলে নেব একখানা।"

ভয় পাইয়া গেলাম।

"ফোটো? কেন?"

"এমনি নেব। আপনাকে ভালো লেগেছে আমার। একজন বি এসসি পাশ ছেলে যে দরকার হলে চাকরের কাজও করতে পারে এটা—"

প্রশংসা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "অগ্নীশ্বরবাবুর লেখাটা কি আপনার পড়া হয়েছে?"

"একটু বাকি আছে।"

"পড়া হলে আমাকে দেবেন দয়া করে।"

"দেব।"

পরদিন আবার একফাঁকে তাহার কেবিনে গেলাম। তিনি অগ্নীশ্বরের লেখা খাতাটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "নিন্। পড়া হয়ে গেলে ফেরত দেবেন। হারায় না যেন।"

"আমার ইচ্ছে আমি এটা টুকে নি। এতে আপনার আপত্তি নেই আশা করি।"

"টুকে নিতে পারেন, আপত্তি নেই. কিন্তু আগেই অত কষ্ট করতে যাবেন কেন। পড়েই ফেলুন না আগে। ভালো লাগে টুকবেন।"

"আচ্ছা "

"আসুন, এবার আপনার একটা স্ন্যাপ তুলে নি। অদ্ভুত জিনিসের ফোটো সংগ্রহ করার বাতিক আছে আমার।"

"আমার মধ্যে কি এমন অদ্ভুত দেখলেন।"

"অদ্ভুত বই কি। বাঙালীর ছেলে হয়ে বি. এসসি. পাশ করে আপনি এই চাকরি করছেন, এরকম আমি অন্তত দেখিনি।"

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "আপনি হিন্দু হলে বোধহয় পারতেন না, মুসলমান বলেই পেরেছেন। হিন্দু বাঙালীর ছেলেরা বড় বিলাসী।"

"হিন্দু বাঙালী ছেলেদের সম্বন্ধে আপনার এ হীন ধারণা কেন?"

ক্যামেরাটা ঠিক করিতে করিতে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "অভিজ্ঞতা থেকে এই ধারণা হয়েছে। হিন্দু বাঙালীর ছেলেরা পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেরানি হবার জন্যে আপিসের দরজায় মাথা কুটে বেড়াবে, রকে বসে আড্ডা মারবে, সিনেমায় ভীড় করবে, রাজনীতি নিয়ে হুজুক করবে, কিন্তু গতর খাটিয়ে পরিশ্রম করে কিছু করবে না। ওদের স্বাধীন ব্যবসার দৌড় মণিহারী দোকান পর্যন্ত, সেখানে সকাল-সন্ধে একদল ছোঁড়া জুটিয়ে বেশ আড্ডা মারা যায়, ওদের স্বাধীন পেশার দৌড় বার-লাইব্রেরী পর্যন্ত, যেখানে পয়সা না থাক রাজা-উজির মারবার সুযোগ আছে, এম. এসসি. পাশ করেও উকিল হচ্ছে দলে দলে। আপনার মতো বেঠিক পথের পথিক হওয়া হিন্দু বাঙালীর ছেলের পক্ষে শক্ত। তাই আমার মনে হয়, বাংলা দেশে কার্নেগী, ফোর্ড যদি কোনও কালে জন্মায় তা জন্মাবে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে। ওরাই দুঃসাহসী, বেপরোয়া, ওরাই মরীয়া হয়ে জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, ওদের মধ্যে আরব বেদুঈনদের রক্ত আছে। আপনাকে দেখে তাই খুব ভালো লাগলো—"

আমি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না। বলিয়া ফেলিলাম, "আমি মুসলমান নই, আমি হিন্দু বাঙালী।"

"বলেন কি, তাহলে মুসলমান বলে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন কেন?"

"কারণ আছে—"

"কারণটা কি?"

"আমার জীবন-মরণ সমস্যা এর সঙ্গে জড়িত। আপনি যদি প্রতিশ্রুতি দেন একথা গোপন রাখবেন, তাহলে সব খুলে বলতে আমার আপত্তি নেই। প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি রাখেননি, এ রকম লোক অবশ্য আমি দেখেছি। আপনার প্রতিশ্রুতি পেলেও আমি হয়তো নির্ভয় হতে পারব না। কিন্তু আপনার মতো লোকের চক্ষে হিন্দু বাঙালীর ছেলে এতো হীন হয়ে আছে, এ আমি সহ্য করতে পারলাম না। তাই হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছি। যে হিন্দু-বাঙালীর ঘরে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘা যতীন, যতীন দাস, বিনয়, সুভাষ জন্মেছে, যাদের কীর্তি অমাবস্যার আকাশে নগণ্য নক্ষত্রের মতো ঝলমল করছে, তাদের আপনি ছোট বলবেন? বাঙালীর ছেলে রিক্‌শা-ওলা, মুটে-মজুর হতে পারছে না বলে আপনারা ক্ষুব্ধ হচ্ছেন, কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করছি, সোনা দিয়ে কখনও কোদাল হয়? ভালো ইস্পাত তাও কি হয়? যারা আজ সারা ভারতে কুলি, রিক্সা-ওলা, মুটে-মজুর হয়েছে, তারা শ্রমের মহিমা-মর্যাদায় মুগ্ধ হয়ে তা হয়েছে? তারা হয়েছে, তাদের অন্য কিছু হবার যোগ্যতা নেই বলে, তারা প্রচ্ছন্ন কার্নেগী বা ফোর্ড বলে নয়। এটা সত্যি কথা, হিন্দু বাঙালীর ছেলেদের শারীরিক পরিশ্রমে রুচি নেই, তার কারণ তারা অন্য ধাতুতে গড়া। পেটের জন্যে তারা শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে পারে না। করতে উৎসাহ পায় না। কিন্তু আদর্শের জন্যে পারে। স্বদেশীর সময় ওই হিন্দু বাঙালীর ছেলেরাই জেলে যে শারীরিক নির্যাতন সহ্য করেছে তার তুলনা আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর নেই। তাদের জেলে নিয়ে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাতে হাতকড়া দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, উঠ-বোস্ করিয়েছে, দাঁড় করিয়ে পা দুটো টেনে যতদূর সম্ভব ফাঁক করা যায় তার চেয়েও বেশি করেছে, হান্টার মেরে ক্ষতবিক্ষত

করেছে, ক্ষিধের সময় খেতে দেয়নি, তেষ্টার সময় জল দেয়নি, অসুখ হলে ওষুধ দেয়নি। গোঁফ ভুরু চুল টেনে টেনে উপড়ে ফেলেছে, তবু ওই হিন্দু-বাঙালীর ছেলেদের দমাতে পারেনি। শারীবিক কষ্টকে তুচ্ছ করেছিল তারা আদর্শের জন্যে। তারা আজ বাসন-মাজা চাকর, মুটে, রিক্‌শাওলা আর ফ্যাকটারির কুলি হচ্ছে না বলে তাদের আপনি অবজ্ঞা করবেন? এ আমি সহ্য করব না—"

"বড্ড উত্তেজিত হয়েছেন। বসুন। দাঁড়ান, আমি কপাটটাব খিল লাগিয়ে দি—"

সত্যিই আমি উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ডাক্তারবাবু কপাটটা ভালো করিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি যে হিন্দু বাঙালীদের কথা বললেন, তাঁরা নমস্য সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরা তো নিঃশেষ হয়ে গেছেন। হিন্দু-বাঙালীব ঘরে ওরকম ছেলে আর আছে কি এখন?"

"নিশ্চয়ই আছে। বাঘের বংশে বাঘই জন্মায়। কিন্তু আপনারা ব্যাঘ্রবংশধরদের নতুন বুলির কারাগারে বন্দী করে, অনাহারে জরাজীর্ণ করে শেষে বলছেন, তোমবা লাঙল টানো, ঘানি টানো, গাড়ি টানো। তা তারা পারবে কেন? তারা গরু হতে পারেনি বলে আপনাবা তাদেব গালাগালি দেবেন এ আমি সহ্য কবতে পারব না। তবে এইখানেই একটা কথা স্পষ্ট করে দিতে চাই। হিন্দু-বাঙালীদের সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে বলেই তাদের কথা বললাম। এর থেকে এটা যেন মনে করবেন না যে, অহিন্দু বা অবাঙালীদের প্রতি আমাব ঘৃণা আছে। তাঁদের কাছেও অনেক ঋণে ঋণী হয়ে আছি আমরা। সে ঋণ সাবা জীবন অকুণ্ঠিত-কণ্ঠে স্বীকাব কবব। মুসলমান হাজি সাহেব, মুসলমান সাবেং আমাকে যদি না সাহায্য কবতেন, আমি কোথায় থাকতাম আজ। তাঁদের অনেকের কাছে এত ভালোবাসা পেয়েছি, যা নিজেব লোকের কাছেও পাইনি। হিন্দু-বাঙালীর ছেলেব এ-ও একটা বৈশিষ্ট্য, তারা সবাইকে আপন করে নিতে পারে—"

"বসুন, বসুন, ভালো করে বসুন। সব কথা শুনি আপনার। ভয় নেই, আমাব কাছ থেকে কোনও কথা বেরুবে না।"

হাসিয়া বলিলাম, "ভয় আমার নেই। বেগতিক দেখি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব। সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়!"

তাঁহাকে আমার জীবন-কাহিনী শুনাইতে লাগিলাম।

কাহিনী শেষ হইলে উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পর ডাক্তারবাবু বলিলেন, "অদ্ভুত। আপনার কথাবার্তা শুনে প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু এতটা কল্পনা কবতে পারিনি। কিন্তু একটা খটকা আমার এখনও আছে। বলব?"

"বলুন।"

"আপনি বলছেন, বাঙালী বিদ্রোহীর জাত। বিদ্রোহের আগুন জ্বালাবার সুযোগ পেলেই তার প্রতিভার মশাল দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত করে জ্বলতে থাকে। এ সুযোগ না থাকলে স্তিমিত হয়ে পড়ে সে। কিন্তু এরকম অগ্নিকাণ্ড করে করে একটা জাত কতদিন বেঁচে থাকতে পারে?"

"পারে বইকি। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেই তো একটা জাত বেঁচে রয়েছে, যারা

চির-বিদ্রোহী। এরা বৈদিক সভ্যতা, বুদ্ধ সংস্কৃতি, গ্রীক আক্রমণ, মুসলমান আক্রমণ, তৈমুর, নাদিরশাহ সব হজম করে বসে আছে। ইংরেজের কাছেও মাথা নোয়ায় নি। আমান-উল্লা এদের আত্মার আধুনিক নমুনা। এখনও তারা অপমানের জবাব দেয় রাইফেলের গুলি চালিয়ে, আবেদন-নিবেদন করে নয়। ওরা মুসলমান, কিন্তু ওরা বাঙালীর স্বগোত্র, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ওদের কাছেই গিয়েছিলেন সেইজন্য—"

"কিন্তু এরকম করে কি একটা জাত বাঁচবে?"

"হয়তো বাঁচবে না। রানা প্রতাপ সিং বাঁচেনি, শিবাজী বাঁচেনি, লক্ষ্মীবাঈ বাঁচেনি, আমি যে সব বাঙালীকে বাঙালী জাতির গৌরব বলে মনে করি, তারাও বাঁচবে না। কিন্তু কালের কষ্টিপাথরে যে দাগটা তারা রেখে যাবে, সেটা সোনার দাগ।"

"কিন্তু কেউ যদি না বাঁচে, তাহলে শুধু সোনার দাগ নিয়ে কি হবে—"

"আপনাব ভয নেই, ওই বাঙালীরই মধ্যে এমন একদল লোক আছে, যারা চাকবি করে, সেলাম কবে, খোশামোদ করে, অপরের মন জুগিয়ে ঠিক বেঁচে থাকবে আর শুয়োরের পালেব মতো বংশ বৃদ্ধি করে যাবে। এদের কথাই কবিগুরু একটা কবিতাতে বলে গেছেন, 'ভদ্র মোবা শান্ত বড় পোষমানা এ প্রাণ, বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান। দেখা হলেই মিষ্টি অতি, মুখের ভাব শিষ্ট অতি, অলস দেহ ক্লিষ্টগতি, গৃহেব প্রতি টান!' এদের কেউ মাবতে পাববে না। এরা পোকামাকড়ের মতো অমর! এদেব মাববার মতো ডি ডি. টি. বেরোযনি এখনও।"

"কিন্তু এদের নিয়েই তো জাত। এদের কথা ভাবতে হবে বই কি।"

"এরা জৈবিক নিয়মে চলে। প্রকৃতিই এদের জন্যে ভাবছেন। আমাদের ভাবনা প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তানদের জন্যে, যারা প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলে না।"

ডাক্তারবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তাই আপনার অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের উপর এত ভক্তি। এ লেখাটা পড়ে সুখ পাবেন। এটা আপনার যদি খব ভালো লাগে, আপনাব কাছে রেখে দিতেও পারেন। আমি হয়তো কোথাও হারিয়ে ফেলব।"

"উনি কোথায় আছেন এখন—"

"কোথাও সিভিল সার্জন হয়ে আছেন। কিছুদিন আগে চব্বিশ পরগণায় ছিলেন, এখন কোথায় আছেন, ঠিক জানি না।"

"আমি এবার উঠি তাহলে আজ।'

"আচ্ছা, আপনি বিলেতে গিয়ে যদি পৌঁছতে পারেন, কি করবেন তা কি ঠিক করেছেন কিছু?"

"কিছু ঠিক করিনি। কিন্তু কাল রাত্রে একটা কথা মনে হচ্ছিল। যদি ওখানে সুযোগ পাই, পুলিশের লাইনে ট্রেনিং নেব।"

"পুলিশের লাইনে?"

"হ্যাঁ। পুলিশ হয়ে এদেশেই ফিরে এসে পুলিশের চাকরি করব। যে পুলিশ আমাদের এত লাঞ্ছনা করেছে, তাদেরই একজন হব।"

"উদ্দেশ্য কি?"

"বিপ্লবী এদেশে চিরকালই থাকবে। যতটা পারি তাদের বাঁচাব। এই আশা। অবশ্য দুরাশাই এটা।"

"আমার এক দূর সম্পর্কের দাদা ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের সুপারিশে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ট্রেনিং নিচ্ছেন। তিনি ভারতবর্ষে পুলিশেরই চাকরি করেন, বড় অফিসার, উপরওলার নেক-নজরে পড়ে বিলেতে যেতে পেরেছেন। আমি তো তাঁর বাসাতেই উঠব। আপনার কথাটা মনে রাখব। যদি অবশ্য বিলেতে নেবে আপনার নাগাল পাই।"

"নাগাল নিশ্চয়ই পাবেন। আমার নিজের গরজেই আমি আপনার পিছু নেব। কিন্তু আপনার যে দাদা ভারতবর্ষে পুলিশের চাকরি করে গভর্নমেণ্টের পেয়ারের লোক হয়েছেন, তিনি তো আমাকে হাতে পেলে সন্দেশের মতো মুখে ফেলে দেবেন টপ্ করে। হয়তো আমার ফোটো তাঁর অ্যালবামে আছে।"

"যদি থাকেও, কিছু এসে যাবে না। আপনার চেহারা তখন অন্যরকম ছিল নিশ্চয়। অতি বিচক্ষণ ডিটেকটিভও এখন আপনাকে দেখে হিন্দুর ছেলে বলে সন্দেহ করবে না।"

আমি উঠিতেছিলাম, এমন সময় ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি চাকরবাবুর্চির কাজ করেছেন। রান্নাবান্না কিছু শিখেছেন কি?"

"খুব। হিন্দুদের শুক্তো, চচ্চড়ি, ডালনা এসব তো জানাই ছিল, হাজী সাহেবের বাড়িতে মুসলমানী রান্নাও শিখেছি কিছু কিছু। শিককাবাব, সামিকাবাব, মুর্গ মুসল্লম, বিরিয়ানি—"

"তাহলে একটা রাস্তা পাওয়া গেলেও যেতে পারে।"

"কি রকম?"

"পরে বলব।"

।। পাঁচ ।।

ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের 'আধুনিক পঞ্চকন্যা' সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি।

কল্যাণবরেষু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। উত্তর দিতে দেরী হল। কারণ তোমার অজ্ঞতার পাহাড় ওড়াতে হলে যে ডিনামাইটের দরকার তা হাতের কাছে ছিল না। জোগাড় করতে দেরি হয়ে গেল। তুমি পঞ্চকন্যার মহিমা বুঝতে পারনি, তার কারণ যদিও তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, এম-বি পাশ করেছ, সাহেবী পোশাক পরে বেড়াও, হয়তো লুকিয়ে অখাদ্য কুখাদ্য খাও, পরের পয়সায় পেলে ভালো মদেও অরুচি নেই, কিন্তু আসলে তুমি একটি পদিপিসি। ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসে এই পদিপিসিরা যে কাণ্ড করেছে তার একমাত্র তুলনা মেলে বোধহয় বর্বরসমাজের ডাইনী আর উইচ্ ডক্টরদের কার্যকলাপে। সভ্যসমাজ এদের পুড়িয়ে মেরেছে, সেই খাণ্ডব-দাহনে জোয়ান অব আর্কের মতো দু-চারটে ভালো লোক পুড়ে মরেছে হয়তো, কিন্তু এতে ওদের সমাজ থেকে বন্যবর্বর আগাছাগুলো দূর হয়েছে। ওদের বাড়ির উঠোন এখন তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে, ওদের সবুজ লন আর ফুলের বাগান দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু আমাদের

দেশে ওই পদিপিসির দল এখনও সশরীরে প্রবল প্রতাপে বর্তমান। এই পদিপিসিরা অসামান্য লোক, অসামান্য তাদের শক্তি। এব প্রমাণ আর্যসংস্কৃতির বিরাট মহা-মাতঙ্গকে এরা হিন্দুধর্মের ঘোরো শূয়োরে পরিণত করেছে। আর্যসভ্যতার আকাশচুম্বী হর্ম্যের গা বেয়ে উঠেছে উইয়ের মতো। ধসিয়ে দিয়েছে সে হর্ম্যকে। সেই ধ্বংস-স্তূপের উপর গজিয়েছে ঘেঁটু, ফণীমনসা, বুনো ওল আর কুটকুটে কচুর বন। আর সেই বনের আড়ালে বাস করছে যেসব শামুক-ব্যাং, টিকটিকি-গিবগিটি, ইঁদুর-ছুঁচো, সাপ-তক্ষকের দল তারাই টিকি-তিলক গেরুয়া-গুরুর ভড়ং করে আলো করছে তোমাদের রক্ষণশীল সনাতন হিন্দুধর্মের চণ্ডীমণ্ডপগুলো। আগে এই চণ্ডীমণ্ডপগুলো গ্রামে গ্রামে থাকত। এখন তারা শহরেও এসেছে। ইউনিভার্সিটিতে, সাহিত্য-সভায়, রাজনীতির আসরে, খবরের কাগজের পাতায় পাতায় এদের খুব দবদবা আজকাল। তোমরা এদেব বক্তৃতা শুনে গদগদ। উচ্ছ্বাসের আবেগে এবং তর্ক করবার মুখে তোমবা মাঝে মাঝে নিজেদের আর্যবশধর বলে জাহির কর, কিন্তু আর্যরা, মানে বৈদিক যুগের আর্যবা, কি ছিল আর তোমরা কি হয়েছ, তা তুলনা করে দেখেছ কখনও? তারা গরু, শুয়োর, কচ্ছপ কিছু বাদ দিত না। তোমবা লাউ খাবে তা-ও পাঁজি দেখে, অলাবু ভক্ষণ নিষেধ আছে কিনা বিচার করে। তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল শত শরৎ বাঁচব, বীরের মতো বাঁচব, বেগবতী প্রস্তরাকীর্ণ নদী সামনে পড়লে সাঁতরে পার হব, পৃথিবীকে ভোগ করব, মৃত্যু এলে তাকে বীরেব মতো বরণ কবব। কিন্তু তোমরা দিন-রাত কাঁদুনি গাইছ 'লোহারি বাঁধনে বেঁধেছে সংসাব, দাসখৎ লিখে নিয়েছে হায়,' তোমবা গাইছ—'এ সংসার-কারাগারে আর কতদিন আমারে এমন কবে বেঁধে রাখবি মা তারা,' কিন্তু মা-তারা যেই সদয় হয়ে মুক্তির ব্যবস্থা করলেন অমনি বাবারে মারে বলে মুক্তকচ্ছ হয়ে দে দৌড়। সিন্নি মেনে, মাদুলি বেঁধে, ঠাকুরের দোর ধরে, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়ে বাঁচবার জন্যে হাস্যকর সে কী করুণ প্রয়াস। তোমরা ভালো কবে বাঁচতেও জান না, মরতেও জান না। তোমরা পেট ভরে খেয়েছ কখনও? প্রাণভবে কোনও মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছ? প্রাণভবে ভালোবাসতে পেরেছ কাউকে? প্রাণভবে ঘৃণা করতে পেবেছ? কিছুই পারনি। অপরে যখন ভোগ করে তখন তোমরা আড়নয়নে চেয়ে দেখ আর আড়ালে মুখ ঢোকাও। আর মুখে বল, 'হরি হে সবই মায়া'! নারী তো তোমাদের কাছে নরকের দ্বার। অনেক কষ্টে, অনেক খতিয়ে, অনেক অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা কবে, সপ্তমে বা অষ্টমে মঙ্গল বা শনি আছে কিনা দেখে, পণ নিয়ে মেয়ের বাবাকে সর্বস্বান্ত করে, তোমরা হাড় ডিগ্‌ডিগে একটি বালিকার পাণি-পীড়ন কর আর সেই নরকের দ্বারটির চৌকাটে বসে সারা জীবন হন্যে হ্যাংলার মতো বংশবৃদ্ধি করে যাও, আর ক্রমাগত খবরদারি করতে থাক ওই নরকেব দ্বারে এসে আর কেউ উঁকি দিচ্ছে না তো! উঁকি দিলেই সর্বনাশ। তাকে ঝেঁটিয়ে বাড়ি থেকে যতক্ষণ না বিদায় করতে পারছ ততক্ষণ তোমাদের শান্তি নেই। তোমাদের সমাজের গোলক চাটুজ্যেরা তা না হলে তোমাদের একঘরে করবে, তোমাদের ঊর্ধ্বতন অধস্তন চোদ্দ পুরুষরা স্বর্গের পথে যেতে যেতে হঠাৎ হোঁচট খাবে। তোমরা কি বলে নিজেদের আর্যবংশধর বল তা তো বুঝি না, তাদের সঙ্গে কোনখানটায় মিল তোমাদের? স্ত্রী দ্বিচারিণী হলে তাদের ব্যবস্থা ছিল—তাকে উপদেশ দিও, বোঝাবার চেষ্টা কোরো, তিরস্কার কোরো, দরকার হলে প্রহারও

কোরো। তাতেও যদি কোন ফল না হয় তাহলে তাকে বর্জন কোরো, কিন্তু অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করতে ভুলো না। তাকে গলাধাক্কা দিয়ে একেবারে বেশ্যা-পল্লীতে পাঠিয়ে দেবার নিয়ম তাঁদের সমাজে ছিল না।" সতীত্ব জিনিসটা তাঁরা যে অপছন্দ করতেন তা নয়, কিন্তু ও নিয়ে তোমাদের মতো ছুঁই-ছুঁই গেল-গেল ভাব ছিল না। এ বিষয়ে অত্যন্ত র‍্যাশনাল ছিলেন তাঁরা। ক্ষেত্রজ পুত্রে আপত্তি ছিল না তাঁদের। এমন কি দরকার হলে বিধবার গর্ভেও তাঁরা পরপুরুষকে দিয়ে পুত্র উৎপাদন করিয়ে নিতেন, তাতে যে বিধবার ব্রহ্মচর্য নষ্ট হতে পারে একথা তাঁরা মানতেন না। তোমরা এঁটো পাতে বসে মাছি তাড়িয়ে তাড়িয়ে ভাত খাও, অপরের ব্যবহার-করা পায়খানা বা গামছা-তোয়ালে ব্যবহার করতে তোমাদের আপত্তি নেই, সিফিলিস-গণোরিয়া-গ্রস্ত বেশ্যাদের সহবাসেও তোমরা আনন্দ পাও, কিন্তু স্ত্রীর যদি একবার পা ফস্‌কেছে অমনি সর্বনাশ। অমনি তোমাদের চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যায়, কুলে কালী পড়ে, পূর্ব-পুরুষরা নরকস্থ হন।

তোমাদের আর্যত্ব কোথায়? তাদের নকলে তোমাদের বিয়ে-পৈতেটা হয় বলছ? কিন্তু কী হাস্যকর কাণ্ডটা হয় তা ভেবে দেখেছ কখনও। আর্যদের ব্রহ্মচর্যাশ্রম জীবনের প্রথম আশ্রম, যে সময়ে ছাত্ররা গুরুগৃহে বাস করে নিজেদের চরিত্র গঠন করত। তোমরা সেটা সেরে দাও ন্যাড়ামাথা ছেলেটাকে একটা গুদোম ঘরে তিনদিন বন্ধ করে রেখে। তিনদিন সে শূদ্রের মুখ দেখবে না। তারপর বছরখানেক খেতে বসে বোবার অভিনয় করবে। গায়ত্রীর মানে সে বুঝবে না, কেবল আউড়ে যাবে। এই হল তোমাদের উপনয়ন। পৈতেতে পরে চাবি বাঁধা থাকবে। আর বিয়ের সময় তোমাদের স্ত্রী-আচারটা বড়, না বরযাত্রী-কন্যাযাত্রীর ভোজটা বড়, না একটা মূর্খ পুরুতের সামনে বসে নামতা-ঘোষার মতো কতকগুলো অশুদ্ধ উচ্চারণের মন্ত্র আওড়ানোটা বড় তা আজও বুঝিনি। দিনের বেলা কতকগুলো ভিজে-কাঠ জ্বেলে চতুর্দিকে একটা ধূম্রলোক সৃষ্টি করে তোমাদের কুশণ্ডিকা হয়। পুরোহিত যখন বলেন, ওই দেখ সপ্তর্ষি উঠেছে, ওই দেখ বশিষ্ঠের পাশে অরুন্ধতী, তখন তোমরা দেখ রঙীন কাপড় পরা কতকগুলো মেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে কিম্বা যদি ঘাড় তুলে আকাশের দিকে চাইতে যাও, দেখতে পাও ঘরের কোণে অরুন্ধতী নয়, একটি মাকড়শা জাল পেতে বসে আছে। তোমরা বিয়ের সময় শুধু যে পণ নাও তা নয়, প্রজাপতি আর ব্রহ্মার ছাপ-দেওয়া কতকগুলো নিমন্ত্রণপত্রও ছাপ আর চেনা অল্পচেনা অচেনা সবার নামে সেগুলো পাঠাও বুকপোষ্ট করে—উদ্দেশ্য যদি কিছু লৌকিকতা পাওয়া যায়। অনেকে যদিও নীচে ছেপে দেন, 'লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়', কিন্তু সত্যি সত্যি কেউ যদি সে প্রার্থনার মর্যাদা রেখে লৌকিকতা না পাঠিয়ে আশীর্বাদ জানায়, তাহলেই মনোমালিন্য হয়ে যায় তার সঙ্গে। এই তোমাদের বিয়ে। এর সঙ্গে আর্য-বিবাহের কোন মিল নেই।

আর্যদের সঙ্গে কোনখানটায় তোমাদের মিল নেই। হয়তো আর্য-সভ্যতা একদিন বাংলাদেশের আদিবাসী পক্ষীজাতি বা বগধজাতিকে জয় করে তাদের আর্যত্বের ছাঁচে ঢালবার চেষ্টা করেছিল, কিছুলোক হয়তো আর্য-ধর্ম আর্য-সভ্যতা বরণও করেছিল। এটাও একটা লক্ষ্য করবার মতো জিনিস, বাইরে থেকে নতুন কিছু একটা এলেই তাকে বরণ করে নেবার জন্যে একদল লোক বাংলাদেশে সর্বদা উদ্বাহু হয়ে থাকে। ওরা আর্য হয়েছে, বৌদ্ধ হয়েছে,

মুসলমান হয়েছে, বৈষ্ণব হয়েছে, ক্রিশ্চান হয়েছে, ব্রাহ্ম হয়েছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে বাঙালী সেই বাঙালীই থেকে গেছে। ওদের মধ্যে আদ্যিকেলে সেই পদিপিসি আছে যে। সে তার জাবক বসে সব্বাইকে মোরব্বা বানিয়ে ফেলেছে। ওই পদিপিসির সাংঘাতিক শক্তি। শঙ্করাচার্যের মতো বৈদান্তিকও ওর পাল্লায় পড়ে "প্রভুমীশ মনীষ" আউড়েছে, ছন্দের জল-তরঙ্গ বাজিয়ে গঙ্গার মহিমা-কীর্তন করেছে। ক্রীশ্চান অ্যানটনি কবিয়াল হয়েছে, মুসলমান রাধাকৃষ্ণের গান গেয়েছে, বৈষ্ণবের ধর্ম নেড়া-নেড়ীর ধর্ম হয়েছে, নিরাকারবাদী ব্রাহ্মদের বাড়ির অনেক মেয়েরা দুর্গাপূজার মণ্ডপে ভীড় করেছে শাড়ী গয়না খোঁপার বাহার দেখিয়ে, ঠাকুরকে প্রণাম করেছে, মানত করেছে, সিন্নি মেনেছে।

তবে এইখানেই তোমার একটা ভুল ভেঙ্গে দেওয়া উচিত। আমার এই লম্বা বক্তৃতা শুনে তুমি যেন ভেব না যে, আমি খুব একটা আর্যভক্ত। মোটেই তা নয়, আমি বাঙালী and I am proud of it তোমার চিঠিতে 'আর্য' শব্দটা অনেকবার ছিল বলে এই বক্তৃতাটা দিলুম আর্যদের চেয়ে আমাদের নিকটতর সম্পর্ক নিগ্রেট, অস্ট্রিক, আর দ্রাবিড়দের সঙ্গে আমি আর্যদের মহিমা প্রত্যক্ষ করেছি বই পড়ে, মুগ্ধ হয়েছি তাঁদের বলিষ্ঠ চরিত্র, তাদের মানবতার প্রবল প্রকাশে। তারা দেবতা নয়, তারা ভোগী বীর। তারা তাদের দেবতাদেরও নিজেদের ছাঁচে ফেলে তৈরি করেছিল। তাদের দেবতা 'অব্রণং অস্নাবিরং' ব্রহ্ম নয়, তাদের দেবতা তাদেরই মতো শক্তিমান, তাদেরই মতো খোশামোদে তুষ্ট, অপমানে রুষ্ট, তাদেরই মতো কামুক এবং ভোগী। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, সোম এদের কাহিনী কেচ্ছার মতো মনে হয় ভদ্রসমাজে কিন্তু এদের বলিষ্ঠতায় আমি মুগ্ধ। গ্রীকদের সঙ্গে অনেক মিল আছে এদের গ্রীক সভ্যতাও মুগ্ধ করেছে আমাকে। ইজিপ্টের অনেক জিনিসও খুব ভালো লেগেছে চীনেদেরও কিন্তু আমার যা ভালো লাগে তা আমি হতে পারি না অনেক সময় হতে চাই ও না যুগপৎ আর্য, গ্রীক মিশরী এবং চীনে হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোনান ডয়েলের শার্লক হোমসকেও খুব ভালো লেগেছে বলে কি শার্লক হোমস হতে পারি? পারি না, হতে চাই-ও না। আমি অতি বিশুদ্ধ জিনিস খুব পছন্দ করি না। তোমাদের মরাল কোডের অতি বিশুদ্ধতা থেকে শত হস্ত দূরে থাকতে চাই। একটা গল্প মনে পড়ল।

বিহারে যখন ছিলুম তখন এক ভোজপুরী ভদ্রলোকের ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলুম। জমিদার লোক তিনি। অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে করজোড়ে প্রত্যুদগমন করে আমাকে এনে বসালেন। ভদ্রলোকের শুধু গা, গলায় হলদে রঙের পৈতে, পায়ে খড়ম, কপালের মাঝখানে, দুই বাহুর উপর, চন্দনের ফোঁটা কাটা। আমি যতক্ষণ না বসলুম ততক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। এরকম নির্ভেজাল ভদ্রতা ভালো লাগা উচিত কিন্তু আমার কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল। এর চেয়ে আমাদের বাঙালী ভদ্রতা অনেক নীচু স্তরের, বাড়ির মালিক হয়তো মুচকি হেসে বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন, বড়জোর বললেন, 'আসুন'। কিম্বা কেউ যদি উচ্ছ্বসিত হন, বলবেন—'আরে আরে আসুন। আজকের কাগজটা দেখেছেন। চা বাগানে কি কাণ্ড।' এই ভালো লাগে কিন্তু। তারপর তাঁরা যখন খেতে দিলেন আমাকে, তখন তো আমার চক্ষুস্থির। ব্রাউন রঙের মোটা মোটা লুচি, তার সঙ্গে দাগড়া দাগড়া করে কাটা

কুমড়োর তরকারি, কাঁচকলার তরকারি, উচ্ছের তরকারি। প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা, এক তরকারির সঙ্গে আর এক তরকারি মেশায় না ওরা। তারপর দু'তিন রকমের আচার। তারপর ছালি-সমেত ধোঁয়াগন্ধ একনাদা দই, তার উপর লালচে রঙের দেশী চিনি। একটু পরে টেনিস বলের সাইজের হলদে রঙের লাড্ডুও এল আধ ডজন। এরা যেন আমার দিকে চেয়ে নীরবে চ্যালেঞ্জ করতে লাগল—চলে আয়, দেখি তোর মুরদ। খাওয়া ব্যাপারে আমার মুরদ চিরকালই কম। আমি টুকিটাকি খেয়ে থাকতেই ভালোবাসি। নিমন্ত্রণ বাড়িতে প্রায় বাঁ দিকটা খাই না, ডানদিকের তরকারিগুলো খাই। ভোজপুরী ভদ্রলোকের ভয়ানক আয়োজন দেখে 'থ' হয়ে বসে রইলুম। ভদ্রলোকের ভাইপো কলকাতার কলেজে পড়েন, বাংলাও বলেন। তিনি আমাকে বললেন, "আপনি খাচ্ছেন না কেন ডাক্তারবাবু। সবই ঘরের জিনিস, একেবারে বিশুদ্ধ। আমাদের জমিতে যে গম হয় তাই ঘরে জাঁতায় পিষিয়ে আমরা আটা করি, তরিতরকারি সবজি সব আমাদের বাগানের, ঘি দুধ দই সব ঘরের, পঁচিশটি মোষ আছে আমাদের, লাড্ডুও ঘরে বানিয়েছি আমরা। খেয়ে দেখুন।"

করুণকণ্ঠে বললুম "আমি পারব না।"

'পারবেন না! কেন?"—সত্যি সত্যি অবাক হয়ে গেল ছোকরা। তখন তাকে খুলে বলতে হল। বললাম, "আমি যে বাঙালী। বিশুদ্ধ জিনিস বরদাস্ত করতে পারি না। ভেজাল ঘিয়ে-ভাজা ভেজাল কলের ময়দার ধবধবে শাদা ফুরফুরে লুচি আমাদের পছন্দ, কলকাতার দোকানে দোকানে মাটির ভাঁড়ে করে যে দই বিক্রী হয় তাতে আসল মাল কিছু নেই, কিন্তু তাই খেয়েই আমরা মুগ্ধ। খাঁটি জিনিস আমাদের ধাতে সয় না, পেটেও সয় না।"

আর্য-সভ্যতার বিশুদ্ধ বলিষ্ঠতাও আমার সহ্য হয় না, বই পড়ে নকল আর্য হবার বাসনা আমাব নেই। ভীম-ভীষ্মকে বাহবা দিতে পারি, কিন্তু আমি একটা ভীম হয়ে দুঃশাসনের রক্তপান করছি বা ভীষ্ম হয়ে অম্বা-অম্বালিকা হরণ করছি একথা কল্পনা করলেও গায়ে জ্বর আসে। না, আমি খাঁটি বাঙালী, খাঁটি বাঙালীই থাকতে চাই। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, পরনে শান্তিপুরের ধুতি, পায়ে পাম্‌সু, এর চেয়ে জবরজং পোশাক পছন্দ করি না। কোন শিরস্ত্রাণও নয়, তা সে গান্ধি-ক্যাপই হোক, বা মাড়োয়ারি গোল টুপিই হোক। শিরোভূষণ নিয়ে বাঙালীরা অনেক experiment করেছে, রামমোহন বঙ্কিমের ছবিতেও টুপি দেখতে পাই, কিন্তু বাংলাদেশের সেরা মানুষ বিদ্যাসাগরের মাথায় টুপি নেই। শুনেছি অমৃতলাল বসু নাকি বলেছিলেন— "We do not want to load our head with anything but intelligence." কথাটা শুনতে ভালো। কিন্তু আমি বলি, আমরা আমাদের মাথা আর আকাশের মাঝখানে কোন পার্টিশন দিতে রাজি নই। খোলা হাওয়ায় আমাদের মাথা, আমাদের প্রতিভা, আমাদের মনের সবুজ শোভা সুস্থ থাকে। বদ্ধ হাওয়ায় মারা যাই আমরা। কোন রকম 'ইজ্‌মে'র খোঁয়াড়ে ঢুকলেই আমাদের মৃত্যু, তা সে ধর্মের 'ইজ্‌ম্'ই হোক বা রাজনীতির 'ইজ্‌ম্'ই হোক। অনেকবার এরকম মরেছি আমরা, আবার কি মন্ত্রবলে জানি না, বেঁচেও উঠেছি অনেকবার। সে মন্ত্রটা কি জানো? বিদ্রোহের মন্ত্র। কারও ভাঁওতায় পড়ে কিছুক্ষণ একটা আড়গড়ায় ঢুকে যখন আমরা হাঁপিয়ে উঠি, তখন আর দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে

না, সেখান থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চাই মরীয়া হয়ে, ফ্রাইং প্যান থেকে লাফিয়ে হয়তো 'ফায়ারে' পড়ে ভস্মীভূত হয়ে যাই অনেকে, তবু লাফাতে ছাড়ি না। ওরই মধ্যে দু'চারজন বেঁচেও যায় আর তারাই শেষে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয় সেই অচলায়তনকে। এইরকম করেই আমরা যুগে যুগে বেঁচেছি এবং বাঁচবও। আর এই মন্ত্রের সাধক বলেই আমি বাঙালী, এই অগ্নিকে সযত্নে লালন করি বলেই আমি সাগ্নিক! মাতৃজঠরে এই আগুন আমার মনে আমার অজ্ঞাতসাবে জ্বালিয়ে দিয়েছেন জানি না আমার কোন পূর্বপুরুষ, কিন্তু এটা জানি—চিতার অগ্নিশিখার সঙ্গে মিলে যাবার পূর্বে এর শিখা নিভবে না, নিভতে দেব না।

কিন্তু দেখ, কি কাণ্ড করছি। পঞ্চকন্যা নিয়ে আলোচনা করব বলে কলম ধরেছিলুম, কিন্তু নিজের কথাই সাতকাহন করে বলে যাচ্ছি। এটাও বাঙালীর একটা বৈশিষ্ট্য।

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরীস্তথা
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যম্ মহাপাতকনাশনম্।।

এই হচ্ছে শ্লোক। এর একটা অর্থ এ-ও হতে পারে যে, মহাপাতক থেকে যদি বাঁচতে চাও, তাহলে এই পাঁচটি পাজি মেয়ের কথা মনে রেখ। এরা দাগী। এটাকে ব্যাজস্তুতি মনে করলেই বা ক্ষতি কি?

কিন্তু আরও কয়েকটা ব্যাখ্যা আমি দিতে পারি। একাধিক পুরুষের সঙ্গে কোনও স্ত্রীলোকের সংস্রব থাকলে সেকালের আর্যরা তেমন কিছু মনে করতেন না। তাঁরা পাপপুণ্যের বিচার করতেন তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য থেকে। হত্যা করা মহাপাপ, কিন্তু মাংসলোলুপ অতিথির সেবার জন্যে কর্ণ যখন তাঁর ছেলেকে হত্যা করলেন, অমনি বাহবা বাহবা পড়ে গেল। মাংসলোলুপ অতিথি ভগবানে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন, বর দিলেন কর্ণকে। 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ''—এটা আর্যদেরই উক্তি, আবার দেখছি, আর্যদের মহাকাব্য রামায়ণে সূর্যবংশের উজ্জ্বলতম রত্ন, নর-রূপী নারায়ণ শ্রীরামচন্দ্র তাঁর সতী স্ত্রীকে নিরপরাধিনী জেনেও বনবাসে পাঠাচ্ছেন আর সেজন্য সবাই তাঁকে ধন্য ধন্য করছে। এর কারণ, দেশের যে আইন তখন প্রচলিত ছিল সেই আইন অনুসারে তিনি নিজেও চলেছিলেন, নিজের বেলায় আইনের অপলাপ করেন নি, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, তাই সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন বলেই তাঁর কদর আরও বেড়ে গেল। মাতৃহত্যা মহাপাপ। কিন্তু আর্য-সভ্যতায় মাতার চেয়ে পিতার স্থান বেশি উঁচুতে। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমন্তপ। সেই পিতার আদেশে পরশুরাম মাতৃহত্যা করেছিলেন। বংশরক্ষা করা আর্যদের একটা অবশ্য কর্তব্য পুণ্যকর্ম, কিন্তু পিতার সুখের জন্যে ভীষ্মের মতো অত বড় একটা তাগড়া পুরুষ চিরকুমার রয়ে গেল, এজন্য তার নিন্দা করেনি কেউ, সাধুবাদই করেছিল। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ খুঁজলে এরকম অনেক উদাহরণ মিলবে। আর্যরা পাপ-পুণ্যের বিচার করতেন শুধু ঘটনাটি দেখে নয়, ঘটনার পিছনের প্রেরণা দেখে। শুধু আর্যরা কেন, সব সভ্যদেশেই বোধহয় এই আইনে পাপ-পুণ্যের বিচার হয়, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল তাই আমাদের চোখে খুনী নয়, শহীদ। এখন এই পটভূমিকায় ওই পঞ্চকন্যার বিচার করা যায়। এ সম্বন্ধে আর একটা কথাও

মনে রাখা উচিত— বৈদিক আর্যদের কাছে দেবতা এবং রূপবতী নারীর সাত খুন মাফ ছিল। অহল্যা ছিলেন পরম রূপবতী এবং অহল্যাকে নষ্ট করেছিলেন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। আজকাল যেমন ভোটের জোরে কেষ্ট-বিষ্টু হওয়া যায়, তখন তেমনি তপোবলে ইন্দ্রত্ব লাভ করা যেতো। তাই কোন মানুষ তপোবলে বলীয়ান হয়ে উঠেছে এ খবর পেলে, দেবকুল, বিশেষ করে ইন্দ্র, একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন। ক্রমাগত চেষ্টা করতেন, কিসে লোকটার তপোবল কমিয়ে দেওয়া যায়। সাধারণত স্বর্গের অপ্সরাদের তাঁরা কাজে লাগাতেন। অপ্সরা দেখলেই বেসামাল হয়ে পড়তেন তপস্বীরা, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের তপোবল কমে যেত, ইন্দ্র নিশ্চিত হতেন। অহল্যার স্বামী মহর্ষি গৌতমকে কিন্তু অপ্সরা পাঠিয়ে কাবু করা সম্ভব ছিল না, কারণ তাঁর স্ত্রী অহল্যা ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। অহল্যাকে দেখে ইন্দ্র নিজেই কামার্ত হয়ে পড়লেন। অবশেষে একদিন গৌতমের ছদ্মবেশে গেলেন তিনি অহল্যার কাছে গৌতমের অনুপস্থিতিতে। তিনি যে আসল গৌতম নন তা অহল্যা বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু তবু প্রত্যাখ্যান করেনি। এইখানেই তার পাপ। কাজ সেরে নকল গৌতম যখন ফিরে যাচ্ছেন, তখন আসল গৌতমের সঙ্গে তার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল তপোবনের প্রান্তে। আসল গৌতম তপোবলে নিমেষে বুঝতে পারলেন কি ঘটেছে। তৎক্ষণাৎ রেগে অভিশাপ দিয়ে তিনি ইন্দ্রকে করে দিলেন নপুংসক আর অহল্যাকে করে দিলেন ভস্মীভূত, কোনও কোনও পুরাণে আছে পাষাণ। ইন্দ্র একটু বেকায়দায় পড়লেন বটে, কিন্তু তির্যকভাবে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেল। রাগলে তপোবল কমে যায়। গৌতম রেগেছিলেন, তাঁর তপোবল কমে গেল। ইন্দ্র ফিরে গিয়ে অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদের বললেন, আমি মহর্ষি গৌতমের ক্রোধ সমুৎপাদন করে তাঁর তপস্যার বিঘ্ন সৃষ্টি করেছি। এতে দেবকার্য সাধিত হয়েছে। রেগে অভিশাপ দেওয়াতে মহর্ষির দীর্ঘকালীন তপোবল অপহৃত হয়েছে। কিন্তু এজন্য আমার ও অহল্যার যে দুর্গতি হলো তার ব্যবস্থা করুন আপনারা। দেবকার্য যখন সাধিত হয়েছে তখন আর কথা কি। ইন্দ্রের নপুংসকত্ব মোচনের ব্যবস্থাও তাঁরা করলেন, আর রামচন্দ্রকে নিয়ে গিয়ে অহল্যাকেও পরে উদ্ধার করলেন। যে নারী দেবকার্য সাধনের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করেছে, তাকে কি তাঁরা উপেক্ষা করতে পারেন? সুতরাং সে যে প্রাতঃস্মরণীয়দের পুরোভাগে স্থান পাবে এতে আশ্চর্য হবার কি আছে! এ যুগেও তো এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটছে। আজকাল দেবতাদের আমরা বরখাস্ত করেছি। তার জায়গায় বসিয়েছি দেশকে, রাজনীতিকে, সাহিত্যকে, আর্টকে, বিজ্ঞানকে। এইসব দেবকার্য সাধনের জন্যে যেসব নারীরা কৃচ্ছ্র-সাধন করেছেন, তাঁদের কি তোমরা সম্মানের আসনে বসিয়ে রাখনি? তাঁদের কি প্রচলিত সতীত্বের মাপ-কাঠি দিয়ে মাপতে গেছ? অহল্যার বেলাতেই তোমাদের এই শুচি-বাই কেন।

মহাভারতের দ্রৌপদী-চরিত্র অপূর্ব! অসাধারণ। ওই একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন বলে মহাকবি বেদব্যাস নমস্য হয়ে আছেন আমার কাছে। তিনি তাকে আর্যকন্যা করেননি। দ্রৌপদী যাজ্ঞসেনী, যজ্ঞের অগ্নিশিখা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল সে। অগ্নিশিখার মতোই তার মহিমা উদ্ভাসিত করে রেখেছে মহাভারত কাব্যকে। তার তুলনা নেই। ওই কৃষ্ণাঙ্গিনী রূপসী সমস্ত

ভারতবর্ষের পুরুষ জাতকে মাতিয়ে তুলেছিল। স্বয়ম্বর সভায় ভারতবর্ষের সমস্ত ক্ষত্রিয় বীরের লোলুপদৃষ্টি পড়েছিল ওই একটি মেয়ের উপর। অর্জুনকে সে বরণ করেছিল, সম্ভবত ভালোও বেসেছিল, কিন্তু অর্জুনের আর চারটি ভাই যে তার সম্বন্ধে নির্বিকার ছিল তা মনে করবার কোন কারণ নেই। মনে রেখ, পঞ্চ পাণ্ডবরা তখন বিপন্ন। অজ্ঞাতবাস করছেন। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তাঁরা গিয়েছিলেন স্বয়ম্বর সভায়। এ অবস্থায় একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে যদি পাঁচ ভায়ের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি লেগে যেতো তাহলে যে কাণ্ডটা হতো ইংরেজী ভাষায় তার নাম disaster of the first magnitude. বাংলায় বললে বলতে হয় সর্বনাশ। তাই সম্ভবত কুন্তী বলেছিল, তোমরা পাঁচজনেই ওকে ভোগ কর। অর্জুনকেই দ্রৌপদী ভালোবাসত, এর প্রমাণ সুভদ্রাকে দেখে তার ঈর্ষা হয়েছিল। কিন্তু অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের খুব বেশি উদাহরণ মহাভারতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্যাপারটা ভেবে দেখ। সে ভালোবাসে একজনকে, কিন্তু মুখটি বুজে সমানভাবে ঘর করতে হয় তাকে আর চারজনের সঙ্গেও। প্রণয়ের অভিনয় করতে হয়, একজনের সঙ্গে নয়, চারজনের সঙ্গে! আর এটা করতে হচ্ছে কেন? তার নিজের দায়ে নয়, পারিবারিক অশান্তি নিবারণের জন্যে। যে চওড়া রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, তাকে বাহবা দেবার দরকার নেই, কিন্তু যে দু-হাতে দুটো ছাতা নিয়ে সরু তারের উপর দিয়ে সোজা হেঁটে যাচ্ছে একবারও না পড়ে—তাকে তুমি বাহবা দেবে না?

কৌরবসভায় দুর্যোধন দুঃশাসনরা যখন তাকে উলঙ্গিনী করবার চেষ্টা করছিল, তখন প্রতিভক্ত স্বামীদের প্রতি তার উক্তি, আলুলায়িত কুন্তলা থেকে দুঃশাসন বধে ভীমকে উত্তেজিত করা, কৃষ্ণ কুরু পাণ্ডবদের মধ্যে যখন সন্ধির প্রস্তাব করছিলেন, তখন তার তেজোদৃপ্ত প্রত্যাখ্যান—এসব বাদ দিয়েও সে প্রাতঃস্মরণীয়া, কারণ একা মেয়েমানুষ হয়ে পাঁচটা বড় বড় ওয়েলার হর্স জুতে সে বগী হাঁকিয়ে গেছে সবেগে এবং সগৌরবে, একটাও accident না করে। একে তুমি বাহাদুরি দেবে না? স্মরণ করবে না?

কুন্তীর সবচেয়ে বড় বাহাদুরি, সে দুর্বাসার মতো দুর্ধর্ষ শঙ্খচূড়কে বশ করতে পেরেছিল। গল্পটা আশা করি জান। কুন্তীর বাবার নাম শূরসেন। তিনি তাঁর প্রথম সন্তান কুন্তীকে (তখন তার নাম ছিল পৃথা) তাঁর পিসতুতো ভাই কুন্তীভোজকে দিয়ে দিয়েছিলেন পূর্ব-প্রতিজ্ঞা অনুসারে। কুন্তীভোজের বাড়িতে মানুষ হয়েছিল বলেই ওর নাম কুন্তী। এই কুন্তীভোজের বাড়িতে মহর্ষি দুর্বাসা একদিন এসে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কুন্তী তখন তাঁর সেবা করেছিল। যে মহর্ষি শকুন্তলার জীবনকে মরুভূমি করে দিয়েছেন, যাঁর রগচটা স্বভাবের কাহিনী ত্রিভুবন-বিদিত, যাঁর পান থেকে সামান্য চুন খসলেই সর্বনাশ, সেই লাইভ ইলেকট্রিক ওয়্যার (live electric wire) মহর্ষিটিকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিল ওই কিশোরী কুন্তী। এইটেই তো আমার মনে হয় ওর প্রধান কৃতিত্ব আর এরই জোরে ও ওর জীবনের পরবর্তী সমস্যাগুলো (ইংরেজীতে যাকে বলে crisis) সমাধান করতে পেরেছে। সন্তুষ্ট হয়ে মহর্ষি ওকে বর দিলেন। "বৎস, আমি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে এক মহামন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি। এই মন্ত্র পাঠ করে তুমি যে দেবতাকে আহ্বান করবে, তিনিই তৎক্ষণাৎ এসে হাজির হবেন এবং তোমার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করবেন।"

মহাভারতকার লিখেছেন, কুন্তী প্রথমে ব্যাপারটা ভালো বুঝতে পারেনি। কিন্তু কৌতূহলের বশে মন্ত্রপাঠ করে সূর্যকে আহ্বান করতেই সূর্যদেব সশরীরে এসে হাজির হলেন। সূর্যকে দেখে ভীত হয়ে পড়ল কুন্তী। হাতজোড় করে বলল—''আমাকে ক্ষমা করুন। মহর্ষি দুর্বাসা আমাকে বর দিয়ে এই মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছেন, মন্ত্র সফল হয় কিনা জানবার জন্যে আমি আপনাকে আহ্বান করেছি!'' এরপর সূর্য যা করেছিলেন তা তোমরা সবাই জানো। কর্ণের জন্ম হল। মহাভারতকার লিখেছেন, সূর্যের সঙ্গে মিলনের সঙ্গে সঙ্গে—তৎক্ষণাৎ কর্ণের জন্ম হল। ঘাবড়ে গিয়ে কুন্তী কর্ণকে ভাসিয়ে দিলে। ব্যাপারটা জানাজানি হল না। এ কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। রামায়ণ মহাভারতে এরকম অনেক আজগুবি কথা আছে। যাই হোক, কিছুদিন পরে স্বয়ম্বর সভায় কুন্তী পাণ্ডুকে বরণ করলেন। অনেকে সন্দেহ করেন পাণ্ডুর কুষ্ঠ ছিল, কিম্বা ধবল ছিল। সেইজন্যে কুন্তী তাঁর বাহুপাশে ধরা দেননি। দূর থেকে ভক্তি করতেন। কিন্তু বংশরক্ষা হয় কি করে? বংশরক্ষা করা আর্যদের এক মহাকর্তব্য। পাণ্ডুর রোগের কথা সম্ভবত কাছেপিঠে রটে গিয়েছিল, তাই পাণ্ডুর জন্যে হস্তিনাপুরের কাছাকাছি দ্বিতীয় কন্যা আর পাওয়া গেল না। ভীষ্ম হস্তিনাপুর থেকে ছুটলেন মদ্রদেশে। সেখান থেকে মদ্ররাজ শল্যের বোন মাদ্রীকে কিনে নিয়ে এলেন। মাদ্রীকে আনবার জন্যে রথ, গজ, তুরগ, বসন, ভূষণ, মণিমুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি শুল্কস্বরূপ দিতে হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের পর মাদ্রীও যখন দেখলেন পাণ্ডুর সাংঘাতিক রোগ আছে, তখন তিনিও পাণ্ডুকে আমল দিতে চাইলেন না। এ সম্বন্ধে মহাভারতে একটা গল্প লেখা আছে, পাণ্ডু মৈথুন-রত এক মৃগদম্পতীকে নাকি শরাঘাতে মেরে ফেলেছিলেন। সে মৃগদম্পতী কিন্তু আসলে ছিল ঋষি-দম্পতী। তাদেরই অভিশাপে পাণ্ডু নাকি স্ত্রী-সঙ্গ-বঞ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয়, এটা শুধু আজগুবি নয়, অসম্ভব। আসলে পাণ্ডু রোগগ্রস্তই ছিলেন। কারণ যাই হোক—সমস্যা দাঁড়াল বংশরক্ষা হবে কি করে! পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, পুত্র-পিণ্ড প্রয়োজনম্—দু'দুটো ভার্যা মজুত, অথচ পুত্র হবার সম্ভাবনা নেই! তখন ওই কুন্তীই সমস্যার সমাধান করে দিলে। স্বামীকে খুলে বললে সব কথা। পাণ্ডু রাজী হয়ে গেলেন। দুর্বাসা-দত্ত মন্ত্রের জোরে কুন্তী তখন একে একে ধর্মকে, বায়ুকে এবং ইন্দ্রকে আহ্বান করে যুধিষ্ঠির, ভীম আর অর্জুনকে সৃষ্টি করলেন। মাদ্রীকেও বঞ্চিত করেননি তিনি, তাঁর অনুরোধে অশ্বিনীকুমাররা এসে মাদ্রীব গর্ভেও নকুল-সহদেবের জন্মদান করে গেলেন। একটা মেয়ের পক্ষে এটা যে কত বড় কীর্তি (ইংরেজীতে যাকে বলে achievement), তা কি ভেবে দেখেছ কখনও? শুধু যে সে সমস্যার সমুদ্র পার হয়ে গেল তা নয়, একেবারে এরোপ্লেনে চড়ে বোঁ করে পার হয়ে গেল। বংশরক্ষার জন্যে ক্ষেত্রজপুত্রের ব্যবস্থা তো অনেকেই করে, কিন্তু তার জন্যে ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্রকে কাজে লাগাতে পারে ক'জন? আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা অমন সব হোমরাচোমরা দিব্যকান্তি দেবতাদের ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে এসেও তাঁদের প্রতি এতটুকু আসক্তি হয়নি কুন্তীর। তাঁদের ব্যবহার করেছে যন্ত্রের মতো। পাণ্ডুর প্রতি কর্তব্য থেকে একচুল সে নড়েনি। এ মেয়েকে প্রাতঃস্মরণীয়া বলবে না তো আর কাকে বলবে?

এইবার তারা-মন্দোদরীর কথায় আসা যাক। পুরাণে নামজাদা তারা দু'জন আছে। একটি

হলো বালীর স্ত্রী, আর একটি হলো বৃহস্পতির স্ত্রী। বালী অনার্য, বড়জোর কনভারটেড (converted) আর্য, আর বৃহস্পতি হলেন দেবগুরু। দু'টি তারাই মহীয়সী মহিলা। এযুগে ওঁরা বেঁচে থাকলে নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর সিনেমা তারাও হতেন।

প্রথমে বালীর স্ত্রীর কথাই বলি। রামচন্দ্র যখন স্বকার্যসাধনের জন্যে সুগ্রীবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে গুপ্তভাবে বালীকে মেরে ফেললেন, তখন তারা সুগ্রীবের প্রেয়সী হয়ে পড়ল। তাকে বিয়ে করেছিল কিনা রামায়ণে লেখা নেই। বালীর তুলনায় সুগ্রীব, ঠিক যেমন হিমালয়ের তুলনায় উই-ঢিবি। বালী অনেক আগেই ওকে পিঁপড়ের মতো মেবে ফেলতে পারতো, কেবল ভাই বলেই দয়া করে মাবেনি। লোকটা এত অপদার্থ ছিল যে, নিজের স্ত্রী রুমাকে পর্যন্ত বালীর কবল থেকে বক্ষা করতে পাবেনি। বালী ছিল অমিতবিক্রম বীর বানর একটি। অবশ্য মানুষই ছিল সে. বানর ছিল ওদের টোটেম। বাঙালীদের টোটেম ছিল বোধহয় পক্ষী। আর্য-অনার্যদেব যখন ভাব হয়ে যায় তখন এই টোটেমগুলো হিন্দু দেব-দেবীদের বাহন হয়ে পড়ে। তাই মহাদেব ষাঁড়ে চড়েছেন, কার্তিক ময়ূরে, লক্ষ্মী পেচকে, সরস্বতী হাঁসে, গণেশ ইঁদুরে। ওই দেখ, আবার আর একটা বক্তৃতার তোড় এসেছে মনে! এটাকে আর প্রশ্রয় দেব না।

হ্যাঁ, কি বলছিলুম. বালী অমিতবিক্রম বীর ছিল। আধুনিক ভাষায় যাকে হি-ম্যান বলে। দাবড়ে দুনিযাটা ভোগ কবে বেড়াতো। মরালিটির কোন বালাই ছিল না। হি-ম্যানরাই সাধাবণত যুবতী স্ত্রীলোকদের হৃদয়-বল্লভ হয়। বালীও তারার হৃদয়-বল্লভ ছিল, বালীর অসংখ্য কুকীর্তি অগ্রাহ্য করে তারা তাকে যে ভালোবেসেছিল এর অনেক বর্ণনা রামায়ণে আছে।

বালী যখন রেগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায়, তখন তার আকুলি-বিকুলি বারণ থেকে, মৃত্যুশয্যায় শায়িত বালীর বুকের উপর পড়ে তার আকুল কান্না থেকে, হনুমানের সঙ্গে যেভাবে সে বালীর বিষয়ে আলোচনা করেছিল তাব থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সত্যিই সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত বালীকে। বালীর মৃতদেহকে আঁকড়ে সে শেষ পর্যন্ত পড়েছিল। রামকে বারবার বলছিল—"যে শর দিয়ে আপনি আমার স্বামীকে বধ করেছেন, সেই শব দিয়ে আমাকেও বধ করুন। আপনি যেমন সীতার বিরহে কষ্ট পাচ্ছেন, আমার স্বামীও তেমনি স্বর্গে গিয়ে আমার বিরহে কষ্ট পাবেন। স্বর্গের অপ্সরীরাও তাঁর এ বিরহ লাঘব করতে পারবে না। আমাকে বধ করলে স্ত্রীবধজনিত পাপও আপনার হবে না। কারণ, বাইরেই আমি স্ত্রীলোক, আসলে আমি বালীর আত্মা, বালীর কাছেই আমি ফিরে যেতে চাই, আপনি দয়া করে আমাকে বধ করুন। আমি কাঞ্চনমালী, ধীমান, মাতঙ্গগামী বানরশ্রেষ্ঠ বালীকে ছেড়ে থাকতে পারব না, পারব না।"

এব পরই রামায়ণে তারাব যে খবর পাই, তা এই—সুগ্রীব স্বীয় পত্নী রুমা ও স্পৃহনীয়া তারাকে নিয়ে দেবেন্দ্রের ন্যায় দিবারাত্রি বিহার করছেন। অর্থাৎ বালীকে পুড়িয়ে এসে তারা সোজা গিয়ে সুগ্রীবের কোলে উঠে বসেছিল। পরে আরও প্রমাণ পাচ্ছি সুগ্রীবের অন্তঃপুরে তারাই সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে। সুগ্রীবের কাছে কোনও দরবার করতে হলে আগে তারার

চরণ-চন্দনা করতে হয়। রাজ্যলাভ করে সুগ্রীব মদ আর মেয়েমানুষে এত মত্ত হয়ে পড়েছিল যে, সে রামকে সীতা-উদ্ধারের জন্যে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা তার আর মনে ছিল না। বর্ষা পেরিয়ে শরৎ এসে গেল, তখনও সুগ্রীবের কোনও সাড়া নেই দেখে খুবই দমে গেলেন রামচন্দ্র। বর্ষায় সীতার বিরহে খুবই কাবু হয়ে পড়েছিলেন তিনি। হনুমান তাঁর অবস্থা দেখে ভদ্রভাবে সুগ্রীবকে তাগাদা দিলেন দু'একবার। কিন্তু তেমন কোনও ফল হলো না। তখন ক্ষেপে উঠলেন লক্ষ্মণ। ধনুর্বাণ হস্তে ধনুকের জ্যা-তে টঙ্কার দিতে দিতে তিনি গিয়ে হাজির হলেন একেবারে সুগ্রীবের অন্দরমহলের সামনে। ভদ্রতাবশতঃ তিনি অন্দরমহলে ঢুকলেন না, কিন্তু অন্দরমহলের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে সিংহনাদে আর্যভাষায় যা বললেন, তাতে সুগ্রীবের নেশা ছুটে গেল, পিলে চমকে উঠল। অন্তঃপুরের দ্বারদেশে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের সঙ্গে কে দেখা করলো জান? সুগ্রীব নয়, তারা। সন্নতাঙ্গী, স্খলিতগমনা, মদপান-বিহ্বল নয়না, সুলক্ষণ-সমন্বিতা তারা স্বীয় কাঞ্চীদাম প্রলম্বিত করে লক্ষ্মণের সন্নিধানে উপস্থিত হলেন। আর্যযুবকরা, তা তিনি যত বড় হোঁৎকাই হোন, সুন্দরী যুবতী দেখলে বেশ ভদ্র হয়ে পড়তেন। 'শিভাল্‌রি' জিনিসটা এখনকার চেয়ে তখন বেশি ছিল। তারাকে দেখে লক্ষ্মণ মোলায়েম হয়ে গেলেন। তারার যুক্তিও মেনে নিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তারারই প্ররোচনায় সুগ্রীবও উৎসাহিত হয়ে মন দিলেন বানর-সৈন্য সংগ্রহে। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, সীতা-উদ্ধার-রূপ দেবকার্যসাধনে তারা কত সাহায্য করেছিল। অতএব দেবভাষায় রচিত সংস্কৃত শ্লোকে তারা প্রাতঃস্মরণীয়া হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি। আর একটা কথাও আমার মনে হয়। যে কবি এই শ্লোকটি রচনা করেছিলেন, তিনি জানতেন যে, রামচন্দ্র মুখে যতই লম্বা বক্তৃতা দিতে থাকুন, আসলে বালীবধ কাজটি অন্যায় হয়েছিল তাঁর। তারা যে বালীকে কত ভালোবাসত তা-ও তিনি অনুভব করেছিলেন। তাই মৃত সোলজারের বিধবাকে যেমন বকশিশ দেওয়া হয়, তেমনি তারার নামটাও দ্রৌপদী কুন্তীর সঙ্গে ঢুকিয়ে দিয়ে তার কিছু ক্ষতিপূরণ (compensation) করবার চেষ্টা হয়তো তিনি করেছিলেন। আর একটা কথাও মনে হয়। আর্য-অনার্যদের ঝগড়া যখন মিটে গেল, তখন আর্যদের পংক্তিতে অনার্যদের বসাবার একটা রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল সম্ভবতঃ, এখন যেমন আমরা শিডিউল্‌ড্ কাস্ট বা হরিজনদের জন্যে বা কোন কোন জায়গায় মুসলমানদের জন্যে সীট রিজার্ভ করে রাখি—ওঁরাও অনার্যদের জন্যে তেমনি রাখতেন। একটা শ্লোকে প্রাতঃস্মরণীয়া পাঁচটি কন্যার নাম দিতে হবে? আচ্ছা, গোটা দুই অনার্যকন্যার নামও থাক।

কিন্তু তারার এই ব্যবহারের কারণ কি! যে বালীর মতো বীরকে সত্যি সত্যি ভালোবেসেছিল সে সুগ্রীবের মতো নপুংসকের মন ভোলাতে গেল কেন? তারার কথা যখন পড়েছিলুম তখন কার কথা মনে হয়েছিল জান? ক্লিওপেট্রার। বালী যখন মারা গেল, তখন তারার আর আপনার লোক কেউ রইল না, তার ছেলে অঙ্গদ ছাড়া। ওই অঙ্গদকেই বড় করা, প্রতিষ্ঠিত করা তার জীবনের লক্ষ্য হয়েছিল তখন। কিন্তু সে লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে সুগ্রীবকে খুশি করতে হয়। ক্লিওপেট্রাও অ্যান্টনির কাছে গিয়েছিল ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে

Antioch শিবিরে, সেখানে অ্যান্টনিকে সে বিধিসঙ্গতভাবে বিয়েও করেছিল, কিন্তু কেন? আমার মনে হয়, সিজারের ঔরসজাত পুত্র সিজারিয়োঁর ভবিষ্যতের জন্যে। বিয়ের যৌতুক হিসেবে রোম সাম্রাজ্যের বেশ বড় একটা অংশও সে আদায় করে নিয়েছিল অ্যান্টনির কাছ থেকে। নূরজাহানও ওই রকম কি একটা যেন করেছিল তার প্রথম পক্ষের মেয়ের জন্যে। এরা যদি জগদ্বিখ্যাত হতে পারে, তারাই বা হবে না কেন?

দ্বিতীয় তারা যা করেছিলেন, তার সঙ্গে তুলনা দেওয়া যেতে পারে হেলেন-হরণের। বৃহস্পতির বউ ছিলেন এই তারা। সোম অর্থাৎ চন্দ্রের সঙ্গে ইলোপ্ (elope) করেছিলেন তিনি। এ নিয়ে তখনকার স্বর্গীয় সমাজে এমন চাঞ্চল্য হয়েছিল যে, প্রকাণ্ড যুদ্ধই বেধে গিয়েছিল একটা, ট্রয়ের যুদ্ধের মতো। স্বয়ং ব্রহ্মা এসে শেষটা মিটিয়ে দেন সব। তারা আবার বৃহস্পতির ঘরে ফিরে এলেন। বৃহস্পতি একটুও আপত্তি করলেন না, তোমাদের মতো ছুঁই ছুঁই বাতিক ছিল না দেবতাদের। তারা ফিরে এসে পুত্র প্রসব করলেন একটি। ছেলে কার তা নিয়ে গোলমাল বেধেছিল একটু। বৃহস্পতি বললেন, আমার ছেলে, চন্দ্র বললেন আমার। তারা যা বললেন তাই শেষে গ্রাহ্য হল। তারা বললেন, ছেলে চন্দ্রের। তার নামকরণ হলো বুধ।

আমার মনে হয়, এ তারা স্মরণীয়া পঞ্চ-কন্যাদের কেউ নন। কারণ, ইনি দেবতাদের বিপদে ফেলেছিলেন, কোনও উপকার করেননি। উপকার বা খোসামোদ না করলে অনার্স লিস্টে সেকালেও নাম উঠতো না।

রাবণের স্ত্রী এবং মেঘনাদের মা মন্দোদরীকেও স্মরণীয় পঞ্চকন্যাদের মধ্যে ধরা হয়েছে। আমার সন্দেহ হয় ওটা কনসোলেশন্ প্রাইজ। আর একটা সন্দেহও হয়। মন্দোদরী বোধহয় বিভীষণকে ভালোবাসত। কারণ, রাবণের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে মন্দোদরী যে লম্বা বক্তৃতা দিয়েছিল তাতে বিভীষণের সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো কথা অনেকবার আছে। সীতার সুখ্যাতিও আছে। রাম যে নররূপী ভগবান একথাও সে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিল তখন। তাছাড়া রাবণ যে-সব দুষ্কৃতি করেছিল, তারও একটা লম্বা লিস্ট দিয়েছিল সে। এইসব কারণেই সম্ভবত সে ওই অনার্স লিস্টে জায়গা পেয়ে গেল। তাছাড়া, বুড়ো বয়সে স্বামীর শত্রু ঘরভেদী বিভীষণকে বিয়ে করে সে আর্য-আধিপত্যকেই মেনে নিলে। এটাও একটা মস্ত কথা।

কিন্তু একটা কথা, বৎস, সর্বদা মনে রেখ। এরকম পঞ্চকন্যা এযুগেও আছে। মোটে পঞ্চ কেন, হয়তো পঞ্চ সহস্র আছে। সব যুগেই ওরা থাকে। আমি আমার ডাক্তারি জীবনে এরকম পাঁচটি কন্যাকে দেখেছি। এই আধুনিক পঞ্চকন্যার পরিচয়ও তোমাকে দিচ্ছি, অবশ্য তাদের নামধাম গোপন করে। আর্যরা যেমন motive থেকে পাপপুণ্যের বিচার করতেন, এদের সম্বন্ধেও তাই যদি কর, তাহলে দেখতে পাবে এরাও কম নয়।

বহুকাল আগে, তখন আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে অগ্নিযুগ চলছে, একটি পরিবারের সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। পরিবারটি ছিল একটু ব্রাহ্ম-ঘেঁষা, তাই অভিভাবকরা বাড়ির প্রত্যেকটি মেয়েদের নামের সঙ্গে একটি করে 'সু' জুড়ে দিয়েছিল। সুমতি, সুনন্দা,

সুষমা, সুছন্দা—এই চারটি মেয়ে ছিল ভদ্রলোকের। পাড়ার দুষ্টু ছেলেরা আড়ালে এদের নামকরণ করেছিল—গল-গল, টল-মল, ঢল-ঢল আর জ্বল-জ্বল। সব কটি মেয়েই সুন্দরী, চলনে বলনে হাবভাবে মোহিনীও। প্রথম তিনটি মেয়ের টপটপ করে বিয়ে হয়ে গেল, সব লভ ম্যারেজ। হলো না কেবল সুছন্দার, যার ডাকনাম ছেলেরা দিয়েছিল জ্বল-জ্বল। সেই সবচেয়ে বেশি সুন্দরী ছিল। ছিপছিপে গড়ন, ধপধপে ফরসা রং, চোখের তারা মিশ কালো, মনে হতো দু'টুকরো কালো ভেলভেট যেন কেউ বসিয়ে দিয়েছে চোখের ভিতরে। কখনও কারও দিকে চোখ তুলে চাইতো না। যখনই তাকে দেখেছি, ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে বই পড়ছে। ভাবতাম, নভেল নাটক পড়ে বুঝি। একদিন তার জ্বর হল, দেখতে গেলুম। গিয়ে দেখি শুয়ে শুয়ে পড়ছে। জিগ্যেস করলুম, কি বই পড়ছো ওটা। মুচকি হেসে বইটা পাশে রেখে দিলে। উলটে দেখলুম, গ্যারিবল্‌ডির জীবন-চরিত। একটু আশ্চর্য হয়ে গেলুম। ওই তপ্ত-কাঞ্চন-সন্নিভা নবোদ্ভিন্নযৌবনা তন্বীর এ কি মতিচ্ছন্ন! মেয়েটি কলেজে পড়তো। জিগ্যেস করলুম—ইংরেজি পোয়েট্রি কি কি বই পড়া হয় তোমাদের। বললে—শেলী, কীট্‌স আর মিলটন। বললাম, "তাই পড় ভালো করে। ওসব ছেড়ে এই কাঠখোট্টা বই পড়ছ কেন?" মেয়েটি যা উত্তর দিলে তাতে ঘাবড়ে গেলুম। বললে—'এদের জীবনী না পড়লে ওসব কবিতার মানে স্পষ্ট হয় না।' মনে হলো মেয়েটি একেবারে খরে' গেছে। সেকালে নিরামিষ খেয়ে টিকি রেখে একদল কলেজের ছোকরা ধর্ম-ধ্বজী হবার চেষ্টা করতো। কুসংস্কারগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিত। টিকি ইলেক্‌ট্রিসিটির কণ্ডাক্টার, পাটের কাপড় পরলে মন্দ লোকের দুষ্ট দৃষ্টির ইলেক্‌ট্রিসিটি সাধনায় ব্যাঘাত জন্মাতে পারে না, সূর্যগ্রহণের সময় ভাতের হাঁড়িতে ব্যাক্‌টিরিয়া জন্মায়, এই রকম অনেক কিছু বলতো তারা। এই ধরনের ভুয়ো স্বদেশী ছেলে-মেয়েও হয়েছিল একদল। তারা বাইরে 'পোজ' করতো যেন তারা অনুশীলন সমিতির সভ্য। আমি মনে করলুম, এই মেয়েটি শেষোক্ত দলের। আড়ালে তার বাপ-মাকে বললুম, মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিন। তাঁরা বললেন, আমরা চেষ্টার ত্রুটি করছি না, কিন্তু মেয়ে যে পছন্দ করছে না কাউকে। সত্যিই দেখলুম তাদের বৈঠকখানায় হরেক রকমের চিড়িয়া আমদানি হচ্ছে, কিছুদিন করে থাকছে, আবার চলে যাচ্ছে। ঢিলে-পাজামা-পরা মোটা কালো এক ভদ্রলোক ছিনেজোঁকের মতো লেগেছিলেন অনেক দিন। তাঁর অগাধ পয়সা, কোলকাতায় বাড়ি, বড় পদস্থ চাকরে একজন—কিন্তু তার দিকে ফিরেও চাইলে না সুছন্দা। তিনি সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিত এসে ধরনা দিতেন। সুছন্দা তাঁর দিকে ফিরেও চাইত না। ঈষৎ ভুরু কুঁচকে বই পড়ে যেত খালি। মাঝে মাঝে বাঁ হাত দিয়ে কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিত। একটি কথা বলত না, একবার চোখ তুলে চাইত না। ভদ্রলোক হাল ছেড়ে দিলেন শেষে। তারপর এলেন প্যাশনে চশমা-পরা বাবরি-ওলা এক কবি। তারপরে এলো এক গ্যাট্টাগোট্টা ফুটবল খেলোয়াড়। আধুনিক স্বয়ম্বর সভা বসতে লাগল তাদের বৈঠকখানায় এইভাবে। মেয়েটা পালাল শেষটায় একদিন। খোঁজাখুঁজি হলো, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো, যথাবিধি যা যা হওয়া উচিত সবই হলো। কিন্তু সুছন্দা আর ফিরল না। আমিও দিনকতক পরে বদলি হয়ে গেলাম কোলকাতা থেকে।

প্রায় বছর দুই পবে সন্ধ্যার পর একদিন নিজের কোয়ার্টারে বসে আছি, এমন সময় হাসপাতাল থেকে খবব এল, একটি স্ত্রীলোক আমার সঙ্গে দেখা কববে বলে বসে আছে। অনুমতি পেলে সে আমার কোয়ার্টারেই আসবে। অনুমতি দিলুম। কে এল জান? সেই জ্বল-জ্বল। প্রথমটা চিনতে পাবিনি। বেশ মোটা হয়েছে, চোখেব কোলে কালী। পবনেব কাপড়খানা বঙীন যদিও, কিন্তু বেশ ময়লা। আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলুম তার দিকে খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ চিনতে পারলুম।

"আরে, এ কি সুছন্দা যে—।"

সাধারণ মেয়ে হলে চোখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিযে কাঁদত এব পর। কিন্তু সে সন্নত দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে বইলো চুপ কবে। তাবপর স্থিব মৃদুকণ্ঠে বললে—"খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি কোথা আছেন তা খুঁজে বার কবতেই কিছু সময় গেছে আমার। আপনি কি আমাকে সাহায্য কববেন?"

"বিপদটা কি শুনি আগে—"

"আমি সন্তান-সম্ভবা।"

"সে কি।"

তখন তাব দিকে ভালো করে চেযে দেখলুম। পেটেব কাছটা একটু উঁচু বলেই মনে হলো।

বললুম, "চল, পরীক্ষা কবে দেখি—"

দেখলাম নদগদে পোযাতি। মাসখানেকের মধ্যেই ছেলে হবে।

"কি ব্যাপাব! কবে বিয়ে হলো তোমাব—"

"বিয়ে হয়নি।"

"তবে?"

চোখ নীচু কবে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে বইলো সুছন্দা। তাবপর বললো, "ধবে নিন ভ্রষ্টা হয়েছি।"

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, "তাই আপনার কাছে এসেছি।"

রোমাঞ্চিত হযে দাঁড়িয়ে রইলুম তার মুখের দিকে চেয়ে। আনন্দে নয়, ভয়ে। বৈঠকখনার সোফায বসে বলা চলে—'সিংহকে আমি থোড়াই কেযাব করি'। কিন্তু সত্যি সত্যি সিংহেব সম্মুখীন হলে প্রত্যেকের যা অবস্থা হয আমারও তাই হল।

একটু চুপ কবে থেকে জিগ্যেস কবলুম, "আমাকে কি করতে হবে? ছেলেটা প্রসব করিয়ে দেওয়া?"

"তা যদি দিতে পারেন তাহলে ভালোই হয়। কিন্তু আমি সেজন্য আসিনি। আমি অন্য একটি অনুরোধ নিয়ে এসেছি।"

"কি বল—।"

"আমার যদি জ্যান্ত ছেলে হয়, তাহলে সে ছেলের ভার আপনাকে নিতে হবে। আপনার জানাশোনা অনেক অনাথালয় নিশ্চয় আছে। সেইখানে কোথাও দিয়ে দেবেন—।"

"তুমি নিজের ছেলের ভার নেবে না কেন।"

"নেবার উপায় নেই বলে।"

"একথাটা কি আগে ভাবা উচিত ছিল না?"

"ভেবেছিলাম, সাবধানতাও অবলম্বন করেছিলুম। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিপদে পড়ে গেছি।"

কি বলব, চুপ করে রইলাম খানিকক্ষণ।

তারপর বললুম—"এত লোক থাকতে তুমি আমার কাছে এলে কেন?"

"কারণ আমি আপনাকে চিনি।"

এই বলে চোখ নীচু করে মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল। কি করি, মহামুশকিল! জিগ্যেস করলাম—"তোমার বাবার খবর কি—"

"কাগজে দেখেছি তিনি রায়বাহাদুর হয়েছেন। আর কোন খবর জানি না।"

চোখ নীচু করে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু হাসবার চেষ্টা করে বললুম—"তুমি আমাকে যে ভার দিতে চাইছ তা যদি না নিতে পারি?"

"আমি জানি আপনি নেবেন। আর নিতান্তই যদি তাড়িয়ে দেন, চলে যাচ্ছি। অন্য কোন হাসপাতালে গিয়ে ভরতি হব। তারপর ছেলে হলে ছেলেটাকে ফেলে পালিয়ে যাব। তাঁরা যা হয় ব্যবস্থা করবেন। ছেলের ভার নেবার আমার উপায় নেই।"

"তাহলে ওকে রক্ষা করবার চেষ্টাই বা করছ কেন?"

সুছন্দা হঠাৎ চোখ তুলে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল মুহূর্তকাল। তারপর স্থিরকণ্ঠে বললে, "কে জানে, ও কর্ণও তো হতে পারে—"

আমি মুখে যদিও বললুম, "কেন, সূর্যের সঙ্গে দেখা হয়েছিল না কি" কিন্তু মনে মনে আশ্চর্য হয়ে গেলুম ওর সাহস দেখে।

"তা ঠিক জানি না। হতেও পারে—"

"সব খুলে বল দিকি—"

"আমি কিচ্ছু বলতে পারব না। বানিয়ে মিছে কথা বলতে পারি। কিন্তু আপনার কাছে তা বলব না। আর এমনিতেই মিছে কথা আমি বড় একটা বলি না—"

অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম তার মুখের দিকে।

"আমার অনুরোধটা রাখবেন না?"—আবার বললে সে।

এরপর আমি আর 'না' বলতে পারলুম না। ভরতি করে নিলাম হাসপাতালে। বেশি ভুগতে হয়নি। দিন কয়েক পরে একটা মরা ছেলে প্রসব করল সে। তারপর হঠাৎ একদিন চলে গেল কাউকে কিছু না বলে।

অনেকদিন ওর আর কোনও খবর পাইনি। বোধহয় বছর দুই হবে। তখনও আমি সেই হাসপাতালেই আছি। হঠাৎ একদিন দুপুরে রেড-ক্রসের মোটরকার দাঁড়াল এসে হাসপাতালে। তার থেকে নাবল একটি স্ট্রেচার। স্ট্রেচারে চাদর-ঢাকা-দেওয়া রোগী একটি। আমার এ্যাসিস্টেন্ট সার্জনই দেখেছিল তাকে প্রথমে। সে এসে আমাকে বললে—রোগীটি

স্ত্রীলোক, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। গিয়ে দেখি সুছন্দা। দুটো পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত, সর্বাঙ্গে ঘা, চোখ দুটো টকটকে লাল। সিফিলিসের ভয়াবহ পরিণাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, "সুছন্দা, এ কি কাণ্ড— ?"

"আপনার কাছে মরবার জন্যে এসেছি। আমার আর বাঁচবার দরকারও নেই। আমি আমার জীবন দিয়ে যতটুকু করবার তা করেছি। আপনার কাছে এসেছি আর একটা অনুরোধ নিয়ে। আমার সঙ্গে ছোট একটা স্যুটকেশ আছে। সেটা আপনি আপনার কাছে রেখে দিন। খগেন নামে আমার এক বন্ধু ওটি নিতে আসবে। এলে তাকে দিয়ে দেবেন তার ডান গালে একটা কালো জড়ুল আছে। "

যদিও তার অবস্থা দেখে মনে মনে আমি খুব দমে গিয়েছিলুম, কিন্তু সব ডাক্তারের যা করা উচিত আমিও তাই করলুম। মুখে তাকে আশ্বাস দিলুম।

"ঘাবড়াচ্ছ কেন, ভালো হয়ে যাবে তুমি।"

তার দৃষ্টিতে যেন একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল। পরে বুঝলাম, ওই স্যুটকেশটা আমার হাতে দেবার জন্যেই সে এসেছিল, চিকিৎসা করাবার জন্যে নয়। চিকিৎসা করবার সুযোগই সে দেয়নি আমাকে। সেই রাত্রেই সায়ানাইড খেয়ে মারা গিয়েছিল।

স্যুটকেশটা অনেকদিন পড়েছিল আমার কাছে। সেটা খুলেও দেখেছিলাম আমি। আশা করেছিলুম রঙীন কাগজে-লেখা এক বাণ্ডিল প্রেমপত্র পাব। কি পেলুম জান? দুটো রিভলভার। মাস ছয়েক পরে গালে-জড়ুল-ওলা সেই ছোকরা এল। তাকে জিগ্যেস করলুম —

"আপনার নাম কি?"

"খগেন।"

"সুছন্দার স্যুটকেশটা নিতে এসেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ -"

"কী আছে ওতে জানেন?"

"বোধহয় ওর জামা-কাপড় কিছু। ওর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে বলেছিল –"

"স্যুটকেশের ভিতর দুটো রিভলভার আছে। সব কথা যদি খুলে না বলেন, তাহলে আপনাকে পুলিশে দেব।"

যুবকটি বললে, "ভয় দেখিয়ে আমার কাছে কিছু আদায় করতে পারবেন না, কারণ আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি। পুলিশের লোক এসে পৌঁছবার আগেই আমার মৃতদেহটা আপনার মর্গে পৌঁছে যাবে।"

"বেশ, তাহলে ভয় দেখাব না। সুছন্দাকে আমি শ্রদ্ধা করতুম। তাই, ব্যাপারটা কি জানবার খুব কৌতূহল হচ্ছে। তার সম্বন্ধে মনে মনে যে ছবি এঁকে রেখেছিলুম, এ ঘটনাগুলোতে সেটা কেমন যেন বিশ্রী হয়ে গেল। তাই জানতে চাইছি—"

"আপনাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না, আপনি একজন গভর্নমেণ্ট অফিসার! সুছন্দা যখন প্রথমে আপনার কাছে এসেছিল, তখন সে নিশ্চয় কিছু বলেনি।"

"না। কিন্তু তার সম্বন্ধে যে কুৎসিৎ ধারণাটা হয়েছে, সেটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারলে খুশী হতুম। কিন্তু আপনি যদি না বলেন তাহলে আর উপায় কি। আমি যে গভর্নমেন্ট অফিসার সে কথাও অস্বীকার করব কি করে। তবে একটা কথা মনে রাখবেন—all that glitters is not gold—আমি আপনাদের মতোই সাধারণ লোক। রাজহংসদের মধ্যে আছি বটে, কিন্তু আমি বক ছাড়া কিছু নই। একটু দাঁড়ান, এনে দিচ্ছি আপনাকে স্যুটকেশটা। চা খাবেন?"

আমার কথাবার্তা শুনে ছেলেটি যেন একটু নরম হল।

চা খেতে খেতে সে জিজ্ঞেস করল, "সুছন্দার সম্বন্ধে কি ধারণা হয়েছে আপনার?"

"যে ধারণা অনিবার্য তাই হয়েছে। খুব ভদ্রভাষায় বললেও বলতে হয়, মনে হয়েছিল সে অসংযত জীবন যাপন করত— "

"সে দেহ-বিক্রি করে টাকা রোজগার করত। সংযম অসংযমের কোন প্রশ্নই ছিল না। সেই টাকা সে নিজের জন্যে খরচ করত না কখনও, সে টাকা জমিয়ে রিভলভার কিনত চোরাবাজার থেকে। আমি সে রিভলভার নিয়ে তৃতীয় ব্যক্তিকে দিয়ে আসতাম। তিনি আবাব অন্য উপায়ে সেগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দিতেন। ওর কেনা রিভলভারের গুলিতে অনেক নামজাদা সাহেব মারা গেছে। কিন্তু সে কথা কেউ জানে না। জানবেও না। নিজেকে ও সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করে রাখত। আমি ছাড়া আর কেউ জানে না এ কথা। ওর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলুম, ওর এ পরিচয় কারো কাছে বলব না। আজ প্রথম আপনার কাছে বললুম --"

"আপনার সঙ্গে ওর পরিচয় কি সূত্রে হয়েছিল? জানতে পারি কি?"

"আমরা সহপাঠী ছিলাম। ও পড়ত বেথুনে, আমি স্কটিশে। ওর রূপ দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, যেচে গিয়ে আলাপ করেছিলাম। তারপর ক্রমশ ওর আসল পরিচয় পেলাম।"

হঠাৎ ছেলেটির চোখ থেকে টপ টপ করে জল ঝরে পড়ল কয়েক ফোঁটা। তার পরই টপ করে উঠে পড়ল সে। স্যুটকেশটা নিয়ে চলে গেল। আমি নির্বাক হয়ে বসে রইলাম।

আমি তো এ মেয়েকে দ্রৌপদী কুন্তীর চেয়ে ঢের বেশী উচ্চাসনে বসিয়ে রেখেছি।

দ্বিতীয় যে কন্যাটির কথা মনে পড়ছে, সেটি একটি বাগ্‌দির মেয়ে। আমরা ভদ্রলোকরা যাদের ছোটলোক বলি তাদের মেয়েদের যৌবনোদ্‌গম লক্ষ্য করেছ কখনও? দেখবার মতো জিনিস একটা। ওরা ধুলোয়-কাদায় রোদে-জলে মোটা খাবার খেয়ে প্রকৃতির কোলে মানুষ হয়, তাই ওদের রূপও প্রকৃতিদত্ত। সতেজ, সবুজ, প্রাণরসে টল-মল, কিশোরী লতার মতো, বন্য-হরিণীর মতো। ওরা রুজ পাউডার মেখে ওদের রূপের গালিচায় তালি দেবার চেষ্টা করে না। সে দরকারই হয় না ওদের, মত্ত মাতঙ্গদের যেমন দরকার হয় না শুঁড়ির দোকান থেকে মদ কেনবার। এদের দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন সেকালের তন্ত্রকারেরা। এই অপরাজিতাদের তাঁরা সাধন-সঙ্গিনী করবারও উপদেশ দিয়েছেন। নীচু-কুলোদ্ভবা বলে ঘৃণা করেননি। কবি বাণভট্ট তাঁর কাদম্বরী কাব্যে চণ্ডালকন্যার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার থেকে মনে হয়, এই অনার্যকন্যারা (যাদের আমরা ছোটলোক বলি) সেকালে আর্যদের সভাতেও মোটেই অপাংক্তেয় ছিল না। বাণভট্ট লিখেছেন—সেই চণ্ডালকন্যার কেশদাম বর্ষার জলভরা মেঘের

মতো, চোখ দুটি যেন শরতকালের বিকশিত পুণ্ডরীক, অনঙ্গদেবের মতো তার কটিদেশ মুঠোর মধ্যে ধরা যায়। তাকে দেখে মনে হয়, নীলপদ্মবনে সন্ধ্যার রক্তরাগ যেন ছড়িয়ে পড়েছে। আমি যে বাগদির মেয়ে পদ্মাবতীর কথা বলছি, আমার বিশ্বাস, বাণভট্ট তাকে দেখলেও মুগ্ধ হতেন এবং যে ভাষায় তার বর্ণনা করতেন তার উপমা অলঙ্কার-বিশেষণের জৌলুসও বিদগ্ধ রসিকদের চিত্ত হরণ করত।

পদ্মাবতী আমার কাছে যখন এল তখন তার গণোরিয়া হয়েছে। একথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, আউটডোরে রোগীর ভীড়ে তার দিকে আমার নজর গিয়েছিল সে অসামান্যা রূপসী বলে। কালো মেয়ের অত রূপ এর আগে চোখে পড়েনি। মহাভারতের কৃষ্ণাকে কল্পনায় দেখেছিলাম। পদ্মাবতীকে দেখে মনে হল, সেই কৃষ্ণাই সশরীরে এসে হাজির হল নাকি?

ওরকম একটা নারীরত্ন দাগী হয়ে গেছে দেখে কষ্ট হল খুব। সে যুগে গণোরিয়ার সুচিকিৎসা আমার যতটা জানা ছিল তা করলাম। ফলে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল একটু। অর্থাৎ আমি ক্রমশ সেই পর্যায়ে গিয়ে পড়লুম যে পর্যায়ে গেলে মুরুব্বীর মতো উপদেশ দেওয়া চলে।

তাকে একদিন জিগ্যেস করলুম, "এ বিশ্রী বোগ তোমাব হল কি করে? তোমার স্বামী কি দুশ্চরিত্র লোক?"

"খুব। দিনবাত তাড়ি খেয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু এ রোগটি ওর কাছ থেকে হয় নি—মিথ্যে কথা বলব না আপনার কাছে ডাক্তারবাবু—"

একটু অবাক হয়ে গেলুম। এমন একটা দুশ্চরিত্র স্বামীর ঘাড়ে দোষটা চাপাবার সুযোগ ও অনায়াসে ত্যাগ করল! আশ্চর্য তো!

"কী করে হল তাহলে—"

ঘাড় নীচু করে মুচকি হেসে বলল, "ওই যে আমাদের জমিদারবাবুর বড়ছেলে শুকদেববাবু, চেনেন না তাঁকে, ওই যে বড় ফিটনে চড়ে রোজ মাছ ধরতে যায়, আপনাদের হাসপাতালের সামনে দিয়েই তো যায়—"

শুধু যে সরলভাবে কথাটা স্বীকার করলে তা-ই নয়, এটা যে খুব একটা গুরুতর অন্যায় কাজ করেছে সে-বোধও যেন নেই—এইটে আমার মনে হল ওর বলবার ধরন থেকে। ও যেন লুকিয়ে কারো গাছ থেকে পেয়ারা চুরি করে খেয়েছে কিম্বা কাবো ভাঁড়ার থেকে আচার চুরি করে খেয়েছে—ভাবটা অনেকটা এই রকম। আমি বাঙালী, সুতরাং আমার মধ্যে সেই আদ্যিকেলে পদিপিসি আছে। পিসি উপদেশ দেবার জন্যে ে নাতে লাগল আমাকে।

বললাম, "কাজটা খুব খারাপ করেছ। এ কাজ কেন করতে গেলে? টাকার জন্যে?"

"ছি ছি, ওকি বলছেন? আমি বাজারের মেয়েমানুষ নাকি? একটি পয়সা নিই নি ওর কাছে—"

"তাহলে এ পাপ কাজ করতে গেলে কেন। অভাবে পড়ে করলে তবু একটা মানে বোঝা যেতো—"

মেয়েটা ঘাড় হেঁট করে বসেছিল। ঘাড় হেঁট করেই রইল। আর কিছু বলল না।

কিন্তু আমার অন্তরনিবাসিনী পদিপিসি তখন এর হাঁড়ির খবরটি জানবার জন্যে খুব উৎসুক হয়ে পড়েছেন। সুতরাং আমাকে থামতে দিলেন না। আমি একজন পদস্থ ডাক্তার, আর ও একটা সামান্য বাগ্‌দির মেয়ে একথা ভুলিয়ে দিলেন আমাকে।

জিগ্যেস করলুম, "ওকে ভালোবাস নাকি—"

পদ্মাবতী মাথা নেড়ে জানাল বাসে না।

"তবে?"

হঠাৎ সে মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে বললে, "আপনারা কি ভিখিরিকে ভিক্ষে দেন না কখনও?"

এইবার চুপ করে যেতে হল আমাকে। এ উত্তর প্রত্যাশা করিনি।

যতদিন ওখানে ছিলুম, খোঁজ রাখতুম মেয়েটার। যিনি ফিটন হাঁকিয়ে রোজ মাছ ধরতে যেতেন, সেই শুকদেববাবুর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল পরে, তাঁর গণোরিয়া এবং সিফিলিস চিকিৎসা করবার জন্যে। অনেক টাকা কামিয়েছিলুম তাঁর কাছ থেকে। ভাগ্যে এই অকালকুষ্মাণ্ড ছেলেগুলো আছে তাই আমরা ডাক্তাররা, দুপয়সা করে খাচ্ছি। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর আর দাদের চিকিৎসা করে ক'পয়সা পেতুম। টি-বি হয় খুব গরীবদের। এ দুবারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা তারা করাতে পারে না। বড়লোকরা স্যানাটোরিয়মে চলে যায়। সিফিলিস গণোরিয়াই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। শুকদেবের সঙ্গে যখন অন্তরঙ্গতা হল, তখন তাকে পদ্মাবতীর কথা জিগ্যেস করেছিলুম। বলা বাহুল্য, পদিপিসির ওস্‌কানিতে।

শুকদেব বললেন, "জীবনে ওই একটি মেয়ের কাছেই হাতজোড় করেছিলুম, এখনও হাতজোড় করেই আছি। একবার সে দয়া করেছিল, দ্বিতীয়বার আর করেনি। মনে হয়, আর করবেও না। আমার ধারণা কি জানেন?"

"কি?"

"ও গরীবের ঘরে জন্মালে কি হবে, মেয়েটি সত্যিই অসাধারণ। যে স্বামী দুবেলা ঠেঙিয়ে ওর গতর চূর্ণ করে দিচ্ছে, সেই স্বামীর পা আঁকড়ে পড়ে আছে মশাই। শুধু আমি নয়, অনেকেই ওকে রাজরাণী করে রেখে দিতে প্রস্তুত, ও কিন্তু রাজী হয় না। আমার ধারণা, হয় ও কোনও শাপভ্রষ্টা অপ্সরা, কিম্বা খুব গভীর জলের মাছ, আমাদের মতো লোকের জাল সেখানে পৌঁছয় না।"

আর একবার পদ্মাবতীর চূর্ণ-গতর মেরামত করবার সুযোগ পেয়েছিলাম কিছুদিন পরে। তাকে দেখে মনে হয়েছিল, যেন একটা উন্মত্ত ষাঁড়ে তাকে গুঁতিয়েছে। তার স্বামী বিশু বাগ্‌দিকেও দেখবার সুযোগ হয়েছিল সেই সূত্রে, কারণ পদ্মাবতী তার হাতে কামড়ে দিয়েছিল। কামড়ে না দিলে বিশু বাগ্‌দি সম্ভবত খুনই করে ফেলতো তাকে। কারণ, সে ছিল মনুষ্যরূপী একটি মহিষাসুর। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া, তেমনি জোয়ান, ইয়া গোঁফ, ইয়া জুলফি।

এরপর আমি বদলি হয়ে গেলাম সেখান থেকে। নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে অবশেষে একটা কুষ্ঠ হাসপাতালে গিয়ে ঠেকলুম প্রায় বছর দশেক পরে। ওপরওলার সঙ্গে

মনোমালিন্য হয়েছিল একটু. তিনি আমাকে ওই ভাগাড়ে পাঠিয়ে দিলেন। বছরখানেক সেখানে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। একটি পরম লাভ হয়েছিল কিন্তু। পদ্মাবতীর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল সেখানে। একদিন আউটডোরে এসে দেখি. একটা একচোখ কানা বুড়ি বসে আছে। পদ্মাবতীকে আমি চিনতে পারিনি প্রথমে। সে উঠে এসে যখন ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে, তখন জিগ্যেস করলাম, "কে তুমি —"

"চিনতে পারছেন না ডাক্তারবাবু, আমি পদ্ম --"

অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম তার দিকে। তার যে চোখ দেখে বাণভট্টের সৃষ্টি পুণ্ডরীকনয়নের কথা মনে পড়েছিল. সেই চোখের একটি নেই। যেটা আছে সেটাও বীভৎস হয়ে উঠেছে সংকীর্ণ হয়ে। বাঁ গালের উপর, কানা চোখটার নীচেই 'স্কার' একটা, গালের মাংসটাকে কুঁচকে দিয়েছে। মনে হচ্ছে যেন মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। সেই ঢলঢলে মুখের শোভা একটুও নেই

"একি, এরকম চেহারা কি করে হল তোমার? চোখটা গেল কি করে?"

"ওই ওকে জিগ্যেস করুন। মদের ঝোঁকে আমার মুখের উপর আগুনের নুড়ো চেপে ধরেছিল।"

"কিন্তু এখন যা হয়েছে. তা তো চিকিৎসার বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে যদি আসতে "

"আমি এর জন্যে আসিনি। আমার পায়ের হাঁটু দুটোর যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি. সে জন্যেও আসিনি, আমি ওর জন্যেই এসেছি। আপনি ওকেই দেখুন ভালো করে, ওর একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিন। আপনি পুরোনো চেনা লোক. এখানে আছেন ভালোই হয়েছে ওকে দেখুন একবার —"

বিশু বাগ্দি এককোণে গায়ে কাপড়চোপড় ঢাকা দিয়ে বসেছিল. তখনও ভালো করে দেখিনি তাকে।

"এদিকে এস, দেখি কি হয়েছে—"

তাকে দেখেও চমকে উঠলুম। বন্যমহিষ যেন মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা গাড়ি টানা মহিষে পরিণত হয়েছে। তার মুখের দিকে এক নজর চেয়েই বুঝলাম কি হয়েছে তার। কুষ্ঠ ওই ফোলা-নাক, ফোলা কানের পাতা. ওই সিংহবদন আর কোন রোগে হয় না।

পদ্মাবতী বললে. "আমার গয়নাগাঁটি সব বিক্রি করে চল্লিশটি টাকা জোগাড় করে এনেছি ডাক্তারবাবু। দরকার হলে বাজার থেকেও ওষুধ কিনতে পারব আমি - "

. বিস্ময়ের ঘোরটা কাটতে মিনিটখানেক লাগল। তারপর ব্যবস্থা করে দিলুম বেহুলা সাবিত্রী রূপবান চরিত্রবান স্বামীদের যমের কবল থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন বলে তাঁদের আমরা বাহবা দিই। কিন্তু পদ্মাবতীর এই কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত শয়তান পাষণ্ড স্বামীকে বাঁচাবার আকুল আগ্রহ কি ওদের আগ্রহের সঙ্গে তুলনীয়? তোমার ক্ল্যাসিক্যাল পঞ্চকন্যাদের চেয়ে এ কি কোনও অংশে কম?

এইবার তৃতীয় যে কন্যাটির কথা বলব. তাকে তোমরা সবাই দেখছ, কিন্তু চিনতে পারনি। এ কন্যা মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে ঘরে আছে। এরা অনাহারে বা অর্ধাহারে থেকে, বছরের পর

বছর তোমাদের খেয়াল অনুসারে মন যুগিয়ে দিনের পর দিন শরীর পাত করছে, কিন্তু এদের তোমরা চেনও না, শ্রদ্ধাও কর না। মাঝে মাঝে কেউ কেউ হয়তো সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে হাততালির লোভে ওদের সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছ, কিন্তু ওদের সত্যিকার মর্যাদা তোমরা দাওনি, দেবার সামর্থ্যও তোমাদের নেই। ওই সতী-লক্ষ্মীরা তোমাদের বাড়িতে কুমারী অবস্থাতেও চাকরাণী-রাঁধুনী, সধবা অবস্থাতেও তাই, আর বিধবা হলে তো কথাই নেই। তখন তার খাবারের এক-আধটুক্‌রো মাছ আর তার কাপড়ের পাড়ের সামান্য রংটুকুও তোমরা মুছে নিয়ে তাকে একবেলা খাইয়ে উপদেশ দাও—'এখন কেবল পতিদেবতার চরণ ধ্যান কর, নির্বিকার হয়ে আমার সংসারের বাসন মাজ, কাপড় কাচ আর বান্না করে যাও। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছেঁটে ফেল। রূপে, রঙে, গানে, কবিতায় খবরদার মুগ্ধ হয়ো না। অবসর পেলে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ শুনতে পার। ওসবেও নানা রকম অশ্লীল গল্প আছে বটে, কিন্তু ধর্মরসে জারিত হয়ে নির্দোষ হয়ে গেছে সে সব। ফর্মালিনে-ডোবানো মরা-গোখরো কামড়ায় না। কাঁচা তেঁতুল খেলেই অসুখ হবার সম্ভাবনা, কিন্তু পুরানো পোকাধরা তেঁতুল ঔষুধ পথ্য দুই-ই। সুতরাং সংসারের কাজকর্ম সেরে বিনা পয়সায় কোথাও রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ শোনবার সুযোগ পেলে শুনো।' তাই করছে তারা।

এই স্লেভ ট্রেড (slave trade) তোমরা চালিয়ে যাচ্ছ অনাদি কাল থেকে। কোনও আইন তোমাদের রুখতে পারেনি। কারণ ওই স্লেভরাই স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তোমাদের চাবুকের তলায় পিঠ পেতে দিচ্ছে। দিচ্ছে, কারণ ওই দেওয়াটাকেই ওরা পুণ্য মনে করছে, বহুকালের সংস্কারের জগদ্দল পাথরের তলায় চাপা পড়ে নিষ্পিষ্ট হয়ে গেছে ওদের স্বাধীন সত্তা, ক্রীতদাসী হয়েই কৃতার্থ ওরা। মানছি, ওদের মধ্যে অনেক খাণ্ডারণী আছে। এ-ও মানছি ওদের ভয়ে অনেক স্বামীও সন্ত্রস্ত। ইতিহাসে এ নজীরও আছে যে ইংরেজরা প্রথম যখন এদেশে আসে, তখন এদের মধ্যে থেকেই একদল তাদের কাছে আবেদন জানিয়েছিল যার সারমর্ম হচ্ছে—আমাদের বাঁচাও।

তোমরা শুনেছি সভ্য দেশের লোক, এই পিশাচ পাষণ্ডদের হাত থেকে বাঁচাও আমাদের। সংসারের চাপে নিষ্পিষ্ট হলেও সকলের স্বাধীন সত্তা একেবারে মরে যায় না, নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে তা। কিন্তু এ-ও ঠিক যে, এখনও ওই মধ্যবিত্ত সংসারেই লক্ষ লক্ষ নারী 'মূঢ় ম্লান মূক মুখে' তোমাদের দাসীবৃত্তি করে চলেছে। আত্মবিলোপ করেই ওদের তৃপ্তি।

আমি একটি মেয়ের কথা জানি। একটা বুড়ো কেরানীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। অপূর্বচন্দ্র আমারই আপিসের কেরানী ছিল। বেগুনপোড়ার মতো মুখটা, তার উপর একজোড়া সাদা ঝোলা গোঁফ। চোখ দুটো ফোলা-ফোলা, ঠোঁটের উপর ধবলের আভাস।

একদিন লক্ষ্য করলুম, লোকটা উপর্যুপরি আপিসে লেট করে আসছে। জবাবদিহি তলব করলুম। সে হাত কচলাতে কচলাতে বললে, "বড় বিপদে পড়েছি সার। নিজে রান্না করে খেয়ে ছেলেমেয়েগুলোকে খাইয়ে স্কুলে পাঠিয়ে তবে আসি। আমার পরিবারটি অসুখে পড়েছে—"

"কি হয়েছে—"

"বলে তো জ্বর হয়। আমি ঠিক বুঝতে পারি না। বলে বুকে ব্যথা, পিঠে ব্যথা, মাথায় ব্যথা। ওই নিয়েই কাজ করছিল এতদিন, ক'দিন থেকে শয্যা নিয়েছে। আমাকেই রাঁধতে হচ্ছে। একটা রাঁধুনীর চেষ্টায় আছি—আর লেট হবে না—"

"ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন কিছু?"

হরেন সাণ্ডেলকে খবর দিয়েছি। তিনি আসবেন বলেছেন—"

"এ ব্যক্তিটি কে?"

"হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার একজন। খুব হাতযশ—"

তারপর আরও বার দুই হাত কচলে বললে, "আপনাকে বলতে তো ভরসা পাই না। গরীব মানুষ আমি—"

"আচ্ছা, আমি যাব আপনার স্ত্রীকে দেখতে।"

গেলাম। গিয়ে দেখলাম, মানুষ নয়, একটি কঙ্কাল শতছিন্ন একখানা গোলাপী র‍্যাপার গায়ে দিয়ে বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে আছে। মুখের মধ্যে আছে শুধু ভাসা-ভাসা চোখ দুটি, আর সে চোখে কি উৎসুক করুণ দৃষ্টি। বুঝতে দেরি হল না যে.কালরোগে ধরেছে—যক্ষ্মা।

বললাম, "ওষুধের চেয়ে এর খাওয়ার দরকার বেশি। ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করে রেখেছেন কেন, খুলে দিন। ভালো খাওয়া আব ভালো হাওয়া—এই চাই এ৺ . । জানালা বন্ধ করছেন কেন—"

"মথুর কবরেজ বললেন, কফেব অসুখ কিনা, হাওয়া লাগলে বেড়ে যাবে—"

"খুলে দিন।"

লোকটার মুখ দেখে মনে হল খোলবার ওর ইচ্ছা নেই, কিন্তু আমি ওব মনিব, ত্রস্ত হয়ে খুলতে লাগল। ছিট্‌কিনি টানাব কর্কশ আওয়াজ থেকে অনুমান করলাম, এ জানালা জন্মে কখনও খোলা হয় না।

"কি খাচ্ছে ও—"

"জল বার্লি—"

"দুধ টুধ দেন না?"

"আজ্ঞে না। দুধে শুনেছি কফটা বাড়ে—"

ধমকে উঠলুম।

"আপনি তো মহাপণ্ডিত লোক দেখছি! দুধ দেবেন ওকে রোজ সেরখানেক করে। ডিমও দেবেন—"

"হাঁসের ডিম বলছেন? কিন্তু ওর বাঁ হাঁটুটাতে বাতের ব্যথা আছে।"

"বেশ, মুরগীর ডিম দিন তাহলে। একটা করে শুরু করুন প্রথমে—"

"মুরগীর ডিম তো চলবে না সার। গোঁড়া ব্রাহ্মণের বংশ আমাদের—"

"ও। তাহলে ফলটল দিন। কলা, পেঁপে—"

তারপর হঠাৎ আমার মনে পড়ল, ফরমাস তো করে চলেছি লম্বা লম্বা কিন্তু লোকটার মাইনে যে মাত্র পঁচাত্তর টাকা।

"দুধ কতটা করে নেন আপনারা—ওকে দুধই একটু বেশি দিতে হবে।"

মুখ কাচুমাচু করে অপূর্বচন্দ্র বললেন, "দুধ নিতে পারি না সার। যা দাম—"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এর চিকিৎসা তাহলে কি করে হবে! জল বার্লি খাইয়ে যক্ষ্মারুগী বাঁচানো যায় না। রোক চড়ে গেল, বাঁচাতেই হবে ওকে।

বললুম, "হাসপাতালে যে লোকটা দুধ দেয় তাকে বলবেন, আপনার বাড়িতে যেন রোজ একসের করে দুধ দিয়ে যায়। আর দুধের বিলটা যেন আমার কাছে পাঠিয়ে দেয। আর এর ওষুধপত্র যা লাগবে তা হাসপাতাল থেকেই পাবেন, আমি বলে দেব ডাক্তার ঘোষকে—"

"যে আজ্ঞে।"

হাসপাতাল থেকে দামী ওষুধ সাধারণ রোগীদের দেওয়াব নিয়ম ছিল না। তবে স্পেশ্যাল কেস হলে দেওয়া যেতো। ওর নামটা হাসপাতালের খাতায় লিখে সেই বন্দোবস্তই করে দিলাম।

অপূর্বচন্দ্র এসে খবর দিতে লাগল রুগী বেশ ভালোই আছে। পরে বুঝেছিলাম মিথ্যে খবর দিয়েছে।

মাসখানেক পরে একদিন ওদের বাড়ির কাছেই আর একটা রুগী দেখতে গিয়েছিলুম। মনে হল অপূর্বচন্দ্রের স্ত্রী কেমন আছেন একবার দেখে যাই। গিয়ে দেখলুম, যাকে পই-পই করে বিছানায় শুয়ে থাকতে বলেছিলুম, সে বারান্দায় বসে একটা তোলা উনুনে ক্ষীব করছে। পাশে একটা বাসনে খানিকটা ছানাও কাটানো রয়েছে।

আমি যে এমনভাবে সে সময়ে গিয়ে পড়তে পারি এ কথা ভাবতেই পারে নি সে। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে উঠে দাঁড়াল।

"কি খবর, কেমন আছ। এ কি, ছানা, ক্ষীর কার জন্যে? শুধু দুধ খেতে ভালো লাগছে না বুঝি—"

মেয়েটি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

"ক্ষীর হজম হবে তোমার? ছানাটা অবশ্য চলতে পারে—"

আমি তখন কল্পনাও করতে পারিনি যে ও ক্ষীর করছে ওর আফিং-খোর স্বামিটীর জন্যে, আর ছানা কাটিয়ে রেখেছে ওর ছেলেমেয়েদের সন্দেশ করে দেবে বলে। নিজে এক ফোঁটা দুধ একদিনও খায়নি।

জেরা করতেই সব বেরিয়ে পড়ল।

বলল, "উনি বুড়োমানুষ সমস্ত দিন খেটেখুটে আসেন, সন্ধেবেলা আফিং খান, একটু ক্ষীর হলে ওঁর শরীরটা ভালো থাকে। আর ছেলেমেয়েগুলো ইস্কুল থেকে এসে রোজই মুড়ি চিবোয়, সন্দেশের উপর ওদের কি যে লোভ, ময়রাটার খোঞ্চা থেকে একদিন ফটিক সন্দেশ চুরি করে কি মারটাই যে খেয়েছিল, তাই ওদের জন্যে দু'চারটে সন্দেশ করে রাখি—"

তখন জানতুম না যে ছেলেমেয়েগুলো ওর একটাও নয়, সব সতীনের।

বললাম, "কিন্তু তুমি রুগী, দুধ তো তোমারই খাওয়া আগে দরকার। তোমার জন্যেই দুধ হাসপাতাল থেকে ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আর তুমি ক্ষীর ছানা করে ওদের খাওয়াচ্ছ!"

মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে রইল।

"হাত দেখি তোমার—"

কঙ্কালসার হাতটা বার করে দিলে। রক্তহীন শির-বার-করা হাত। পাল্‌স্‌ রেট একশ কুড়ি।

'না, এরকম উপোস করে থাকলে তোমার চিকিৎসা করতে পারব না। হাসপাতাল থেকে দুধ যদি আর একসের করে বাড়িয়ে দিই তাহলে তুমি খাবে?"

ঘাড় নেড়ে জানাল খাবে।

ফিরে গিয়ে আপিসে তার স্বামীকে ডেকে যাচ্ছেতাই বকলুম।

"আপনার অসুস্থ স্ত্রীর জন্যে হাসপাতাল থেকে দুধের ব্যবস্থা করে দিয়েছি, আর আপনি তাই মেরে ক্ষীর করে খাচ্ছেন, লজ্জা করে না আপনার?"

হাত কচলাতে কচলাতে অপূর্বচন্দ্র বললে, "খুবই করে সার। কিন্তু কি করব, ও যে কিছুতেই খাবে না। বলে দুধ খেলে ওর পেট ভুট্‌ভাট্‌ করে। দুধ ওর সহ্য হয় না।"

"যাতে হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে।"

"তাহলে ওকে হাসপাতালে এনেই রাখুন সার। আমি একটা রাঁধুনীর সন্ধান পেয়েছি।"

হাসপাতালে একটা কেবিন খালি ছিল। পয়সা দিতে হবে বলে সেখানে সাধারণতঃ কোন রুগী জুটত না। মফস্বলের হাসপাতালে সকলেরই ইচ্ছে সম্পূর্ণ চিকিৎসাটা বিনা পয়সায় হোক। সেই কেবিনে এনে ভরতি করলুম সরমাকে। মেয়েটির নাম ছিল সরমা। হাসপাতালে এনে দেখলুম দুধ ওর বেশ হজম হয়। প্রায় সের দেড়েক দুধ অনায়াসে হজম করতে লাগল। দিন সাতেক পরে মেয়েটি একদিন সকাতরে আমাকে বললে, "দুধ আমার মুখে রুচছে না ডাক্তারবাবু। ওরা সবাই বাড়িতে শাকচচ্চড়ি আর ফ্যান-মেশানো কলাইয়ের ডাল খেয়ে দিন কাটাচ্ছে, আর আমি একলা ভালো ভালো খাবার খাচ্ছি—এ আমার একটুও ভালো লাগছে না। আমি যদি মরেই যাই তাতেই বা ক্ষতি কি। আমার চেয়ে ওঁর বাঁচাটা বেশি দরকার। অতগুলো ছেলেমেয়ের বাবা উনি। সমস্তদিন কলম পিষে ক্লান্ত হয়ে পড়েন—উনি একটু দুধ খেতে পান না—আর আপনি আমাকে দুধ খাওয়াচ্ছেন।"

আমি বললুম, "তোমার পতি-ভক্তির প্রশংসা করছি। কিন্তু তুমি রুগী, আমি ডাক্তার। তোমার রোগ যাতে সারবে আমাকে সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। তোমার স্বামী বা ছেলেমেয়েরা কি খাচ্ছে, তা নিয়ে মাথা ঘামালে তো চলবে না। তুমি আগে সেরে ওঠ, তারপর ওসব ভাবা যাবে। অপূর্ববাবু এতদিন যা খেয়ে কাটিয়েছেন, বাকী জীবনটাও তাই খেয়ে বেশ কাটিয়ে দিতে পারবেন। ও নিয়ে চিন্তা কোরো না। তোমার যা ব্যবস্থা করেছি সেই মত চলতে হবে তোমাকে—"

এর দিন কয়েক পরে শুনতে পেলুম কেবিনের সামনে হল্লা উঠেছে একটা। সুহাসিনী নামে ঘোড়ামুখী একটা নার্স ছিল, সে খুব চেঁচামেচি করছে। গেলুম এগিয়ে।

"কি হয়েছে—"

"সরমাকে রোজ যা খেতে দি, তার আদ্ধেকের উপর ও সরিয়ে রেখে দেয়। রুটি, মাখন, ছানা, সব। আর আমরা যখন দুপুরে খেতে চলে যাই, ওই ছেলেটো এসে নিয়ে যায় রোজ—"

দেখলাম, আট-দশ বছরের ফটিক দাঁড়িয়ে আছে একটা ঝোলা হাতে করে। বমাল সুদ্ধ ধরা পড়েছে। কি আর বলব, ছেড়ে দিলাম। সুহাসিনী গজগজ করতে করতে চলে গেল।

সরমাকে বললাম, "তোমার উদ্দেশ্যটা কি বলতো? এরকম করলে তো তোমাকে হাসপাতালে রাখা যাবে না—"

সরমা ঘাড় হেঁট করে বসে রইল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, "সেই ভালো, আমি বাড়িই চলে যাই। ওসব একলা আমি খেতে পারব না।"

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম মিনিটখানেক। তারপর বললাম, "আচ্ছা, সুহাসিনীকে বলে দিচ্ছি তোমাকে বেশি বেশি করে দেবে। তুমি পেট ভরে খেয়ে বাকীটা বাড়িতে পাঠিয়ে দিও—"

এরকম সাধারণতঃ হয় না, এরকম করা নিয়মও নয়, কিন্তু আমার রোক চড়ে গিয়েছিল।

দিন পনেরো পরে আর একটা ঘটনা ঘটল। একদিন শুনলাম, ফিটফাট একটি সুদর্শন যুবক ফল-টল নিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

সুহাসিনী বলল, "সরমা কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা করলে না। ফল-টল ছুঁলেও না। অদ্ভুত মেয়ে বাবা।"

আমি রাউণ্ড দেবার সময় যখন ওর কেবিনে গেলাম, তখন দেখি বসে বসে কাঁদছে।

"কি হল, কে এসেছিল আজ তোমার সঙ্গে দেখা করতে— "

ঘাড় হেঁট করে বসে রইল খানিকক্ষণ, তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, "কেউ না—"

"অচেনা লোক কখনও ফল-টল নিয়ে দেখা করতে আসে? ভালো ভালো ফল এনেছিল শুনলাম, ফলগুলো ফেরত দিলে কেন?"

উত্তর দিলে না, চুপ করে বসে রইল।

আমার এ্যাসিস্‌টেন্ট সার্জন ডাক্তার ঘোষ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়তে ভালোবাসতেন। তাঁর স্বভাবের মধ্যেও একটু ডিটেক্‌টিভ-ভাব ছিল। তিনিই একদিন ব্যাপারটার রহস্যোদ্ভেদ করলেন। বললেন, "ওই ছেলেটি খুব বড়লোকের ছেলে। সরমার বাপের বাড়ির লোক। সরমাকে খুব ভালো লেগেছিল, বিয়েও করতে চেয়েছিল কিন্তু বিয়ে হয়নি।"

"কেন, জাতে আটকালো?"

"না। পালটা ঘরই ছিল। আটকালো কুষ্ঠিতে।"

"বল কি। এত খবর তুমি জোগাড় করলে কি করে?"

"ভদ্রলোক আজ আমার আপিসে এসেছিলেন। হাসপাতাল ফাণ্ডে দুশো টাকা দান করে গেছেন, আর আমাকে অনুরোধ করে গেছেন, সরমার চিকিৎসার কোন ত্রুটি যেন না হয়। আমি বললুম, কোন ত্রুটি হচ্ছে না। ওর জন্যে আপনাকে টাকা দিতে হবে না। তিনি বললেন, না, আমি টাকা দিচ্ছি নিজের তৃপ্তির জন্যে। তারপর গল্প করতে করতে সব কথা

বেরিয়ে পড়ল।"

সরমার চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয়নি। তবু তাকে বাঁচাতে পারিনি। পরে প্রকাশ পেল সে অন্তঃসত্ত্বা। মাস পাঁচ-ছয় পরে একটা মরা ছেলে প্রসব করে সে-ও মারা গেল। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত সে খোঁজ নিয়েছে তার স্বামী আর সতীনের ছেলেমেয়েরা তার খাবারের ভাগ পাচ্ছে কি না।

সেই বড়লোকের ছেলেটি মাঝে মাঝে এসে সরমার খোঁজ নিতেন, কিন্তু সরমার ঘরে ঢুকতে সাহস পেতেন না।

সরমার সেই ভাসাভাসা চোখ দুটো আর কঙ্কালসার চেহারাটা এখনও মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে আমার মনে। রাত্রে একদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম তাকে। আমাকে যেন বলছে, "আচ্ছা ডাক্তারবাবু, শুনেছি জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ যখন যেখানে হবার তাই হয়। জন্মাবার সময় আমরা কুষ্ঠি দেখে জন্মাই না, মরবার সময়ও আমরা কুষ্ঠি দেখে মরি না, বিয়ের বেলাতেই কুষ্ঠির এত বাড়াবাড়ি করি কেন বলুন তো—"

স্বপ্নের সরমা একথা বলেছিল, কিন্তু বাস্তবের সরমা বোধহয় একথা ভাবতেও পারত না। তবু ওই অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জেদী মেয়েটা আজও আমার কাছে প্রণম্য হয়ে আছে।

চতুর্থ যে কন্যাটির কথা মনে পড়ছে, তার কথা বলব কি না ভাবছি। কারণ তোমরা বাল্যকাল থেকে মনে মনে যে ছক এঁকে রেখেছ, তার সঙ্গে এটা মিলবে না। কারণ মেয়েটি মুসলমানী, তার উপরে বাঈজি। হিন্দুদের ধারণা যা কিছু হিন্দু তাই ভালো, মুসলমানদের ধারণা যা কিছু মুস্‌লিম তাই ভালো। এমনি করে তোমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা খোপ-খোপ করে ভাগ করে ফেলেছ তোমরা। আমার নিজেরও যে এই ধরনের কুসংস্কার নেই তা নয়। ডাক্তারি করতে করতে, আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ দোষ খানিকটা কমেছে অবশ্য, এটা বুঝতে পেরেছি যে, শিশির গায়ের লেবেল দেখেই সব সময় ওষুধের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না, যাচাই করে দেখতে হয়। এই সূত্রে একটা গল্প মনে পড়ল। সমর দে নামে আমার এক বন্ধু ছিল। তার বাড়িতে একদিন সন্ধেবেলা বেড়াতে গেছি। ছুরি দিয়ে নখ কাটতে কাটতে হঠাৎ একটা আঙুলে রক্তারক্তি হয়ে গেল। সামনেই একটা সেলফ্ ছিল। তাতে দেখলাম টিঞ্চার আইয়োডিন লেবেল দেওয়া একটা শিশি রয়েছে। উঠে গিয়ে সেটা নিয়ে ছিপি খুলতে যাচ্ছি, সমর বললে, "ওটা নিও না। ওতে আইয়োডিন নেই।" তার পাশেই আর একটা শিশি রয়েছে দেখলাম—গায়ে লেবেল ডেটল্। বললাম, "তাহলে এইটে নি। একটু জল আনাও।" সমর বললে, "ওটা ডেটল্ নয়।" পাশে আর একটা শিশির গায়ে লেখা দেখলাম টিনচার বেনজোইন। সমর বললে, "ওটাও বেনজোইন নয়।" অবাক হয়ে গেলাম। শেলফে আরও নানারকম শিশি ছিল সারি সারি। কোনটাতে লেবেল—সিরাপ হিমোগ্লোবিন, কোনটায় জোয়ানের আরক, কোনটা চিরেতার জল। সমর বললে, 'লেবেলে যা লেখা দেখছ, তা একটা শিশিতেও নেই।" জিগ্যেস করলুম, "এতগুলো খালি শিশি রেখেছ কেন?" সমর বললে, "একটিও খালি নয়, প্রত্যেকটিতে ব্র্যাণ্ডি আছে। বাবা মা সর্বদাই এ

ঘরে ঢোকেন কি না, প্রকাশ্যে কি করে রাখি বল। তা ছাড়া চণ্ডেটাও আসে প্রায়। ও যদি ব্র্যাণ্ডির বোতলের সন্ধান পায় তাহলে কি আর রক্ষে আছে! তাই এই ফন্দী করেছি।"

সুতরাং লেবেল সব সময় বিশ্বাসযোগ্য নয়। মুসলমান বাঈজি শুনে আমারও নাকটা কুঁচকে গিয়েছিল প্রথমে। সে বহুদূর থেকে আমার কাছে চিকিৎসার জন্যে এসেছে, অনেক টাকা ফি দিয়ে অ্যাপেনডিক্স অপারেশন করাবে—এসব জানা সত্ত্বেও নাকটা কুঁচকেই ছিল। গঙ্গার ধারে শ্মশানের কাছাকাছি প্রকাণ্ড একটা কম্পাউণ্ড-ওলা বাড়ি ছিল, সেইটে ভাড়া নিয়েছিল সে। বেশ জমজমাট ব্যাপার। আট দশটা চাকর, আট দশটা চাকরাণী, আয়া বাবুর্চি মোটরকার শফার।

প্রথম যেদিন তাকে দেখতে গেলুম সেদিন নজরে পড়ল একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে বসে আছে তার বিছানায়। বয়স বছর দশেক আন্দাজ হবে। আমি ঘরে ঢুকতেই বাঈজি ছেলেটিকে বললে, "ডাক্তার সাহেবকে প্রণাম কর—"

ছেলেটি এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। প্রত্যাশা করেছিলুম, মুসলমান যখন, আদাব করবে। তারপর মনে হল বাঈজিদের কোন জাত থাকে না বোধহয়, হিন্দুকে হিন্দুর মতো অভ্যর্থনা করে, মুসলমানকে মুসলমানের মতো। কিন্তু আমার এ থিয়োরি খাটল না, আমি যখন উঠে আসছি তখন সে নিজে আমাকে মুসলমানী কায়দাতেই আদাব করল।

রোজই দেখতে যেতুম তাকে দুবেলা। অপারেশন করবার তেমন তাড়া-হুড়ো ছিল না। পেটে ছুরি বসাবার আগে দেখছিলুম, এমনি চিকিৎসা করে ব্যথাটা যদি কমে যায়, তাহলে পরে ধীরে সুস্থে অপারেশন করে দেব।

একদিন আমার যেতে একটু রাত হয়েছে, দেখি সে গঙ্গার দিকের প্রশস্ত ছাতে বসে সেতারে কি একটা সুর আলাপ করছে। মনে হল কানাড়া। আমাকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হল। কারণ আমি তাকে শুয়ে থাকতে বলেছিলাম।

"আজ অনেক ভালো আছি। ব্যথা একেবারেই নেই। তাই সেতারটা নিয়ে বসেছি। আপনার জন্যে চা আনতে বলি?"

সাধারণতঃ রুগীর বাড়িতে আমি খাই না, কিন্তু সেদিন আর আপত্তি করলাম না, অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম।

চা-পর্ব শেষ হয়ে যাবার পর সে আমাকে বললে, "ডাক্তারবাবু, এতদিন তো আপনাকে কেবল রোগের কথাই বলেছি, আজ একটা অন্য কথা বলতে চাই। যদি আপনি এ বিষয়েও আমাকে একটু সাহায্য করেন, তাহলে বড়ই উপকার হয় আমার। শুনবেন কথাটা? এই সময়েই বলা ভালো, কারণ ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে—"

"কি বলুন—"

"আমি ছেলেটার পৈতে দিতে চাই। এখানে কি সে ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?"

"পৈতে? আমার ধারণা ছিল আপনি মুসলমান।"

"আমি মুসলমান। কিন্তু ছেলেটি ব্রাহ্মণের ছেলে। শুধু ব্রাহ্মণ নয়—খুব উঁচুদরের

ব্রাহ্মণের ছেলে—"

আমার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম শুধু। দৃষ্টির প্রশ্ন যখন রসনায় বাঙ্ময় হল, তখন সেটা ঠিক ভব্যতাসূচক হল না। কোন লেডির কাছে এরকম প্রশ্ন করা কায়দা-দস্তুর নয়।

মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, "বাপের খবর পেলুম। কিন্তু মা-টি কে?"

"আমিই ওর মা।"

"তাহলে ও ছেলে কি আর ব্রাহ্মণ আছে?"

"জবালার গর্ভজাত পুত্রকে ঋষি গৌতম তো অব্রাহ্মণ বলেননি।"

তারপর একটু হেসে বললে, "আমি মুসলমান, কিন্তু আমি রামায়ণ মহাভারত পুরাণ কিছু কিছু পড়েছি। পড়েছি বলেই জানি হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণ বলতে কি বোঝায়। ওর বাবা খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন, আমার ইচ্ছে ছেলেও খাঁটি ব্রাহ্মণ হোক। তাই প্রথমে ওর পৈতেটা দিতে চাই। আমি যেখানে থাকি সেখানে দেওয়া সম্ভব হয়নি, কারণ কোনও ভালো ব্রাহ্মণই আমার বাড়িতে এসে পৌরোহিত্য করতে রাজি হননি। আমার এখানে আসার এ-ও একটা কারণ। ওর পৈতের একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন? ভালো ব্রাহ্মণ পুরোহিত চাই একটি। যজন-যাজন করেন এরকম ব্রাহ্মণ পাওয়া যাবে তো? সে রকম পেলেই যথেষ্ট। একটিমাত্র আদর্শ ব্রাহ্মণই দেখেছিলাম জীবনে—"

"কে তিনি?"

"ওই ছেলের বাবা।"

আমার মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে পড়েছিল, 'ব্রাহ্মণটি তোমার খপ্পরে পড়লেন কি করে.'— কিন্তু সামলে নিলুম।

ভদ্রভাষায় বললুম, "আপনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় কি করে হয়েছিল? এতে যদি অবশ্য বাধা থাকে, শুনতে চাই না—"

মেয়েটি একটু চুপ করে থেকে বলল, "বলতে আর বাধা কি। তবে একটা ভয় শুধু হয়, পাছে তাঁকে ভুল বোঝেন। সেইজন্যে গোড়াতেই বলছি দোষটা সম্পূর্ণ আমার।"

তারপর একটু হেসে বললে, "রামায়ণ মহাভারত তো পড়েছেন, স্বর্গের অপ্সরীরা এসে বড় বড় মুনি-ঋষিদের তপোভঙ্গ করত। আমার কৃতিত্ব শুধু এইটুকু যে, আমি মর্ত্যের সামান্য মানবী হয়েও তাঁর মতো লোককে ভুলিয়ে রাখতে পেরেছিলাম কিছুদিনের জন্য—"

আমি হেসে বললুম, "আমার তো মনে হয় পোড়-খাওয়া সংসারী লোকদেরই ভোলানো শক্ত। মুনি-ঋষি-জাতীয় লোকরা এত বেশি সরল আর এত বেশি ভাব-প্রবণ যে একটুতেই তাঁরা গলে যান।"

মেয়েটি বলল, "ঠিক বলেছেন, ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির সঙ্গেই ওঁর উপমা দেওয়া চলে। আমি ওঁকে অবশ্য সন্দেশ দিয়ে ভোলাইনি, রূপ দিয়েই ভুলিয়েছিলাম। রূপ দেখে মুগ্ধ হওয়াটা পাপ নয় নিশ্চয়, কারণ দেবতার কাছে আপনারা যে প্রার্থনা করেন তার প্রথমেই আছে রূপং দেহি—"

মেয়েটির কথাবার্তা শুনে ক্রমশই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল না যে আমি একজন মুসলমানী বাঈজির সঙ্গে আলাপ করছি। বরং মনে হচ্ছিল, যেন একজন শিক্ষিত বিদগ্ধ অধ্যাপকের কাছে বসে আছি। কথা কইতে কইতে একবার মনে হয়েছিল গ্রীস দেশের গল্পে যে স্যাফোর কথা পড়েছি সে কি এই রকম ছিল? মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলুম।

হঠাৎ কানে গেল মেয়েটি বলছে, "রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন বলে উনিও ক্ষুব্ধ হননি। রূপের মন্দিরে উনি সরল বিশ্বাসে দেবতাকেই সন্ধান করছিলেন, কিন্তু উনি যখন জানতে পারলেন আমি ওঁকে প্রতারণা করেছি, তখনই ফুরিয়ে গেল সব। সেই মুহূর্তে উনি আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন।"

"প্রতারণাব ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না ঠিক—"

"ওঁকে দেখে আমিই প্রথমে মুগ্ধ হয়েছিলাম। দশাশ্বমেধ ঘাটে একগলা জলে দাঁড়িয়ে উনি সূর্য-অর্ঘ দিচ্ছিলেন। সেই প্রথম ওঁকে দেখি। তারপর ওঁকে দেখবার জন্যে রোজই গিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম। উনি চেয়ে থাকতেন সূর্যের দিকে আব আমি চেয়ে থাকতাম ওঁব দিকে। প্রায় দশ পনব দিন আমি ওঁর চোখেই পড়িনি। উনি যখন স্নান করে উঠে যেতেন, আমি ওঁর পিছু পিছু যেতাম। তারপর একদিন হঠাৎ উনি আমাকে দেখতে পেলেন। তখন আমার কিছু রূপ ছিল। ক্রমশঃ এটাও উনি লক্ষ্য করলেন যে, আমি রোজ ঘাটে আসি, রোজ ওঁর পিছু পিছু যাই। একদিন উনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। জিজ্ঞাসা কবলেন, আমি কে, কেন ওঁর পিছু পিছু আসি। তখন আমি ওঁকে বলতে পারলাম না আমার সত্য পরিচয় কি। বানিয়ে মিথ্যে একটা গল্প বললাম। বললাম আমি অনাথিনী, গরীব ব্রাহ্মণের কুমারী মেয়ে। বিয়ে দেবার জন্যে বাবা-মা আমাকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁরা দুজনেই হঠাৎ মারা গেছেন! আমি এখন এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে আছি। আমাব লেখাপড়া শেখবারও খুব ইচ্ছে। একজন আমাকে বলেছিল, আপনি যদি দয়া করেন, তাহলে আমার লেখাপড়া শেখবার ব্যবস্থা সহজেই হতে পারে। সংস্কৃত শেখবার খুব ইচ্ছে আমার। তিনি একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা, এস আমার সঙ্গে—।' গেলাম তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। বুঝতে দেবি হল না যে, আমাকে তাঁর ভালো লেগেছে। একথা বুঝতে দেরি হয় না মেয়েদের, বিশেষত আমাদের মতো মেয়েদের, যারা রূপ নিয়ে ব্যবসা করে। তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখলাম, তিনি একটি গলিতে ছোট্ট একটি বাড়ি নিয়ে একাই থাকেন। আমাকে বললেন, এই আমার বাড়ি, তোমার দূর সম্পর্কের যে আত্মীয় আছেন বলছ, তাঁকে নিয়ে এখানে এস, তাঁর সঙ্গে কথা কইব। এক নকল পিসেমশাই খাড়া করা অসম্ভব হল না। কিছু অর্থের বিনিময়ে তিনি বানিয়ে যা বললেন, তা শুনে আমিই অবাক হয়ে গেলাম। ওঁর বাড়িতে আমি আশ্রয় পেলাম এবং ক্রমশঃ বাড়ির কর্ত্রীই হয়ে উঠলাম। পুরুষরা, বিশেষত প্রতিভাবান পুরুষরা, শিশুর মতো অসহায়। সেবা করে মা যেমন শিশুর হৃদয় অধিকার করে, সেবা করে তেমনি বয়স্ক লোকের হৃদয়ও অধিকার করা খুব সহজ। বস্তুত, ও-ই বোধহয় হৃদয় জয় করবার একমাত্র উপায়। কিছুদিন পরে তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি খুব মেধাবিনী, তোমাকে আমি

পড়াব। কিন্তু তার আগে তোমাকে আমি ধর্ম-পত্নী-রূপে গ্রহণ করতে চাই। তা না হ'লে নানা রকম বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। তোমার পিসেমশাইকে বোলো, তিনি যেন এসে তোমাকে আমার হাতে সম্প্রদান করেন শাস্ত্রবিধি অনুসারে। তোমার আপত্তি নেই তো?' আমার আপত্তি! আমি হাতে স্বর্গ পেলাম। নকল পিসেমশাই আরও কিছু টাকা খেয়ে নকল বিয়ের সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। ওঁর পক্ষের পুরোহিত উনি নিজেই হলেন। বিয়ে হয়ে গেল। সংস্কৃত পড়তে শুরু করলাম ওঁর কাছে। মাস ছয়েক কাটল। তারপর একদিন সত্যটা প্রকাশ হয়ে পড়ল ওঁর কাছে। আমারই এক পুরাতন প্রণয়ী কথাটা ফাঁস করে দিল এসে। লোকটি অনেকদিন থেকেই আমাকে চাইছিল, কিন্তু আমি রাজি হইনি। তারপর আমি যখন ওঁর গৃহিণী হয়ে পড়লাম, তখন আর রাস্তায় বেরুতাম না। খোঁজ নিয়ে অবশেষে সে একদিন হাজির হল এসে। কথাটা শুনে উনি আমাকে জিগ্যেস করলেন, কথাটা সত্যি কি না। আমি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর সত্যি কথাটাই বললাম। তাঁর এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আর মিথ্যে কথা বলতে পারলাম না। আমার কথা শুনে তিনি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বেরিয়ে চলে গেলেন। আর ফিরলেন না। আর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তার পরদিন আমিও কাশী ছেড়ে চলে গেলাম। অনেক জায়গায় খুঁজেছি তাঁকে। কিন্তু আর তাঁর নাগাল পাই নি। শুনেছিলাম পুষ্করতীর্থে গিয়ে তিনি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। পুষ্করেও গিয়েছিলাম আমি, কিন্তু আমি যখন গেলাম, তখন তিনি চলে গেছেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথাটা নাকি সত্যি। খোঁজ নিতে ওরা বললে, 'একটি সাধু নিজের চারিদিকে আগুন জ্বেলে অনাহারে কি একটা কঠোর ব্রত করেছিলেন।' সাধুর চেহারার বর্ণনা থেকে মনে হল, উনিই সেই সাধু—"

মেয়েটি একটু চুপ করে থেকে বলল, "এখন ওঁর ছেলেকে ওঁর মতো করে মানুষ করাই আমার জীবনের ব্রত হয়েছে—"

"ছেলে কিছু জানে না?"

"না। সে জানে আমি তার মায়ের বন্ধু। মা-বাবা দুজনেই প্লেগে মারা গেছে, আত্মীয়স্বজনও কেউ নেই, আমি ওকে মানুষ করছি। এও জানে যে ও ব্রাহ্মণের ছেলে, আর আমি মুসলমান।"

"আপনার সঙ্গে থাকতে আপত্তি করেনি কখনও?"

"ও তো আমার সঙ্গে থাকে না। ও কাশীতে থাকে আলাদা বাসায়। ওর জন্যে হিন্দু চাকর-চাকরাণী, রাঁধুনী সব রেখে দিয়েছি আমি। আমার নিজের দুধও খাওয়াইনি ওকে। ব্রাহ্মণের মেয়ে ওয়েট নার্স ওকে মানুষ করেছে। ওকে আমি আমার ছোঁয়াচ থেকে যতদূর সম্ভব বাঁচাবার চেষ্টা করেছি। এখন ওর ছুটি, আর আমার অসুখের খবর পেয়েছে, তাই এসেছে। ওর চাকর-রাঁধুনীও সব সঙ্গে এসেছে। এই যে এতগুলো চাকর দেখছেন, এর অর্ধেক ওর বাসার। আমি ওঁকে একদিনও খাওয়াইনি, খাওয়াতে সাহস হয়নি—"

হঠাৎ তার গলার স্বরটা একটু কেঁপে গেল। আমি চুপ করেই ছিলুম, প্রশ্ন করে গল্পের রসভঙ্গ করিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা কথা জিজ্ঞাসা না করে পারলুম না।

"আপনার এত খরচ চলে কি করে? আপনি কি—"

"আমার জাত ব্যবসা আমি বন্ধ করিনি। তিন চারটে বড় বড় স্টেটের বাঁধা গাইয়ে আমি। বাঁধা মাইনে আছে। তাছাড়া উপরি রোজগারও হয়। আপনাদের লাইনে যেমন, আমাদের লাইনেও তেমনি. একবার নাম হয়ে গেলে টাকার অভাব হয় না।"

"কিন্তু -"

আমাকে কথা শেষ করতে দিলে না সে। বললে, "আপনি যা জিগ্যেস করবেন তা বুঝতে পেরেছি। আপনার মনে হচ্ছে, যার জীবনে অত বড় একটা লোকের আবির্ভাব ঘটেছিল, সে আবার কি করে এই জঘন্য ব্যবসা করতে পারে। যদি নিষ্ঠাবতী বিধবার মতো থাকতুম, তাহলে ওঁর ছেলেকে ওঁর মতো করে আমার ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে মানুষ করতে পারতুম না। এর জন্যে টাকা চাই। দ্বিতীয় কথা, মনের দিক থেকে আমার আর পতন হবার ভয় নেই। স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা সোনা হয়ে গেছে, তাতে আর মরচে লাগবে না।

সেদিন রাত্রে দুজনেই আমরা অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। মাথার উপর অসংখ্য তারা জ্বলছিল, রাত্রির অন্ধকার মুখরিত হয়ে উঠছিল ঝিল্লী রবে। মনে হচ্ছিল অব্যক্ত যেন ব্যক্তের সীমায় ধরা দেব দেব করছে।

তার ছেলের পৈতের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলুম। মহাসমারোহ হয়েছিল। সীতারাম স্মৃতিতীর্থ, যিনি পাঁজি দেখে ট্রেনে চড়েন, হাঁচি টিকটিকি কাক-খঞ্জন দেখে দিনটা কেমন যাবে ঠিক করেন একবার মুখে রজক দেখলে থেমে যান, সেই ভদ্রলোক এক বাইজির ছেলের উপনয়নে পৌরোহিত্য করতে ইতস্ততঃ করলেন না, যেই শুনলেন দক্ষিণার পরিমাণ হাজার টাকার কম হবে না। শহরসুদ্ধ লোক খেয়েছিল। ধনী দরিদ্র আপামর ভদ্র সবাই।

আমি তার অ্যাপেনডিকসও কেটে দিয়েছিলাম। বেশ মোটা ফি দিয়েছিল। তারপর যাবার আগে সে আমাকে আরও পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক দিয়ে কি বললে জান?

"ছাত থেকে দাঁড়িয়ে রোজই দেখি, শ্মশানে মড়া নিয়ে যেতে বড় কষ্ট হয় সকলের। রাস্তাটা খুব খারাপ। বর্ষাকালে নাকি আরও খারাপ হয়ে যায়। ওটা পাকা করিয়ে দিন যদি আরও টাকা লাগে জানালেই আমি পাঠিয়ে দেব।"

তার নাম ছিল বেগম রৌশন আরা। তার রূপের বর্ণনা আমি করিনি, করবও না এইটুকু শুধু বলব, ওই মেয়েটি আমার ডাক্তারি জীবনের পরম অভিজ্ঞতা একটি। একথাও মাঝে মাঝে মনে হয়েছে ভাগ্যে ডাক্তার হয়েছিলুম, তাই তো ওর পরিচয় পেয়ে ধন্য হয়েছি।

আমার একটা কথা কি মনে হয় জান? মেয়েদের আমরা যুগে যুগে নানা রকম করে দাবাতে চেষ্টা করেছি. কিন্তু পারিনি, ওদের কাছে হেরে গেছি। আমাদের অত্যাচারের হিমালয় ঠেলে যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছে অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তীরা, দেখা দিয়েছে সরমা রৌশন আরারা, শুধু দেখা দেয়নি, তাক লাগিয়ে দিয়েছে। মুখে যাই বলি, মনে মনে স্বীকার করতে হয়েছে, ওই অবস্থায় পড়লে আমরা ঠিক ওরকমটি করতে পারতুম না। সেইজন্যেই শাস্ত্রে ওদের শক্তি বলে পুজো করেছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা ওদের এই বিশেষ শক্তিটাকে কাজে লাগাতে পারলুম না। হয় সারাজীবন রাঁধুনী-চাকরাণী করে রাখলুম সতীত্বের ছোঁয়াচ

বাঁচিযে, না হয পবীক্ষাব পডা মুখস্ত কবিযে শ্রমিক কববাব চেষ্টা কবলুম সংসাবেব সুবিধে হবে বলে। আমাদেব নিজেদেব সংসাবেব কিসে সুবিধে হবে এই নিয়েই আমবা ব্যস্ত, ওদেব বিশেষ শক্তিকে ফুটিযে তোলবাব কোনও চেষ্টা আমাদেব নেই, ওদেব যে আব কোন শক্তি আছে এ দেখবাব চোখও অনেকেব নেই, বুদ্ধিও নেই। অর্থনৈতিক সমস্যা? হ্যাঁ জানি, ওইটেই তো তোমাদেব বাঁধা বুলি। ওই সমস্যা মেটাবাব জন্যে তোমবা বউকে বাঁধুনি কবেছ, কেবানী কবেছ, ওই সমস্যাব সমাধান কববাব জন্যে কাপড ছেডে হাফপ্যাণ্ট পবেছ, মিছে কথা বলেছ, অন্যায অত্যাচাবেব বিরুদ্ধে সাহস কবে প্রতিবাদ কবনি, এত কবেও তবু তোমাদেব আর্থিক সমস্যাব আব সমাধান হল না। খাবাব সময সেই শাকচচ্চডি ডাল ভাত, আব যেখানে সেখানে এব ওব তাব ঘাডে দোষ চাপিযে নাকিকান্না, এ আব তোমাদেব ঘুচল না। ঘুচবেও না। মানুষকে বাসন কাপড চেযাব টেবিলেব মতো ব্যবহাব কবলে দুর্দশা বেডেই চলে, কখনও কমে না। কিন্তু ওই বৌশন আবা সবমাবা তোমাদেব নিযমকানুনেব মুখে লাথি মেবে নিজেদেব পথে নিজেদেব মতো বেঁচে কিম্বা মবে প্রমাণ কবে দিযেছে যে পৃথিবীতে আইনেব চেয়ে মানুষ বড। সেই বৃহত্বে পৌঁছবাব জন্যে আইন ভাঙাটাই মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব

আমাব ভয হচ্ছে, তুমি বোধহয এতক্ষণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছ। মধুব বসেব আশায সম্ভবত পঞ্চকন্যাব গবেষণায প্রবৃত্ত হয়েছিলে (পর্ণোগ্রাফিই যে তোমাদেব প্রিয জিনিস, তা পপুলাব কতকগুলো বই আব ফিলম থেকেই বোঝা যায), কিন্তু যে বস্তু আমি তোমাকে গিলিযে যাচ্ছি, তা শুগাব কোটেড কুইনিনেব বডি, মাঝে মাঝে চিনিব পলেস্তাবাটাও হযতো উঠে গেছে কোথাও কোথাও।

কিন্তু এখন তো আমাব পক্ষে থামা শক্ত। চাবটে বডিই যখন গিলেছ তখন পঞ্চমটাও দর্গা বলে গিলে ফেল হযতো আখেবে উপকাবই হবে।

তখন আমি বিহাবেব একটা বড শহবে আছি। কাব পবামর্শে এখন ঠিক মনে নেই একটা পুবোনো মোটবকাব কিনে অশেষ দুর্গতি ভোগ কবছি। মোটবটা মোটব না হয়ে যদি মানব হতো তাহলে ওব খামখেযালী ব্যবহাবে হযতো আনন্দ পেতাম। যখন খুশী থামতো, যখন খুশী চলতো। হর্ন যখন বজাবে না, তখন কিছুতেই বাজবে না, আবাব বাজতে আবম্ভ কবলে থামানো শক্ত এই মোটবে চডে একদিন দুপুববেলা এক পতিতা পল্লীব ভিতব দিযে আসছি, হঠাৎ মোটবটা থেমে গেল। দু'চাব জন লোক ডেকে ঠেলবাব চেষ্টা কবছি, এমন সময হঠাৎ কানে গেল "ওগো মা গো, কোথায তুমি গো, আমায বাঁচাও গো, এবা যে আমায মেবে ফেলছে।" বিহাবেব এই পাডায এবকম বাংলা কান্না শুনে একটু অবাক হয়ে গেলুম। ঘাড ফিবিযে চেযে দেখলুম – একটা ঘবেব সামনে একটা ষণ্ডা কাবুলী আব একটা খাণ্ডাবনী মেযে দাঁডিযে বযেছে। মেযেটা হিন্দী ভাষায অশ্রাব্য গালাগালি দিচ্ছে, তর্জন গর্জন কবছে আব শাসাচ্ছে যে, কপাট না খুললে কপাট ভেঙে তাবা ঘবে ঢুকবে। কপাটটা ভিতব থেকে বন্ধ।

আমাব মাঝে মাঝে মতিচ্ছন্ন হয। ঠেলাঠেলি কবে মোটবটা স্টার্ট নিযেছিল, আমি সটান চলে গেলেই পাবতুম, কিন্তু যেতে পাবলুম না। ওই বন্ধ দবজাব ওপাবে বাংলা ভাষায এমন

বুকফাটা হাহাকার কে করছে, তা জানবার কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠল। একটা পুলিশ কনেস্টবল, একটু দূরে নির্বিকার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি তখন সেখানে সিভিল সার্জন। সুতরাং আমাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। তার দিকে চাইতেই সে পায়ে পা ঠুকে মিলিটারি কায়দায় সেলাম করলে। তাকে ডাকলাম। বললাম, "দেখ তো এখানে হল্লা কিসের, ঘরের ভিতর অমন করে কাঁদছে কে।" আমি গিয়ে মোটরে বসলাম। মিনিট দশেক পরে সে এসে বললে, "ওই জবরদস্ত আওরৎটি হচ্ছে বাড়ি-উলী। আর ওই আগা সাহেব হচ্ছে ওর খদ্দের। বাড়ি-উলী আগা সাহেবের কাছ থেকে অগ্রিম একশ টাকা নিয়েছে। এক 'বাঙালীন্' খবসুরৎ লেড়কি বাড়ি-উলীর কাছে এসেছে দিন কয়েক আগে। আগা সাহেবের 'খাইশ' (ইচ্ছে) হয়েছে ওই মেয়েটিকে রাখেন। কিন্তু 'বাঙালীন্' লেড়কিটি কিছুতে রাজী হচ্ছে না। এখন হুজুর আমাকে যা করতে বলেন তাই করব।" বললাম, "তুমি ওই আগা সাহেবকে ভাগিয়ে দাও। বল যে তার টাকা মার যাবে না, আমি তার জিম্মাদারি রইলাম আর বাড়ি-উলীকে ডেকে নিয়ে এস আমার কাছে।"

আগা সাহেব চলে গেল। তার সুখ স্বপ্নের মাঝখানে একটা বুড়ো সিভিল সার্জন ভাঙা ঝরঝরে মোটরে চড়ে এসে হাজির হবে এটা সে ভাবতেই পারেনি। কিন্তু ওরা প্র্যাকটিক্যাল লোক, খামাখা বড়লোক বা 'অফসর'দের সঙ্গে ঝগড়া করতে চায় না। সে আমাকে একটা সেলাম করে চলে গেল এবং একটু দূরে গিয়ে আর একটা খোলার ঘরে ঢুকে পড়ল। বাড়ি-উলীটি কনেস্টবলের সঙ্গে এসে যখন হাজির হল, তখন তার মুখের চেহারা-ভাবভঙ্গি সব বদলে গেছে। একেবারে অন্য লোক যেন। চোখমুখের সে কী সম্ভ্রমাত্মক ভাব, পানের ছোপ লাগা ঠোঁটের ফাঁকে মিসি-মাখানো দাঁতে সে কি হাসির ঝলক। খদ্দের হিসেবে আগা সাহেবের চেয়ে যে আমি ঢের বেশী বাঞ্ছনীয়, একথা সে কিছু না বলেই যেন আমাকে বুঝিয়ে দিলে। বললে, "হুজুর, ফরমাইয়ে, অব্ ক্যা করু" অর্থাৎ ফরমাস করুন এবার কি করব। বললাম, "ওই মেয়েটিকে কপাট খুলতে বল। বল, এখানকার বাঙালী ডাক্তার সাহেব তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, আগা সাহেব চলে গেছে।" বাড়ি উলী গিয়ে কপাটের সামনে দাঁড়িয়ে একথা বলা সত্ত্বেও কপাট খুলল না খানিকক্ষণ। মেয়েটার সম্ভবত সন্দেহ হল যে, একটা মিথ্যে ছুতো করে বাড়ি-উলী কপাট খোলাচ্ছে, কপাট খুললেই ওই কাবুলীওলা ঢুকে পড়বে। তখন আমি নিজেই নামলুম। বন্ধ দ্বারে আঘাত করে চেঁচিয়ে বললুম, "কপাট খোল। তোমার কোন ভয় নেই। কাঁবুলীওলা চলে গেছে।"

ভাষার যাদু যে কি অদ্ভুত, ভাষা যে আমাদের কি নিবিড় বন্ধনে বেঁধে রাখে, তা বিদেশে গেলে বোঝা যায়। কারও মুখে বাংলা ভাষা শুনলেই মনে হয়, সে যেন আমার আপনার লোক। আমার কথা শুনে ওই মেয়েটিরও বোধহয় তাই মনে হল। বন্ধ কপাট খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ঘরে ঢুকে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। এমনটা যে দেখব, তা কল্পনা করিনি। মনে হল অজন্তার ছবি এমন জীবন্ত হয়ে কি করে অবতীর্ণ হল এখানে। ঠিক সেই মুখ, সেই নাক, সেই চোখ, সেই চাহনি,—আমি ঘরে ঢুকতেই মেয়েটি আমার পা দুটো ধরে বললে, "আপনি আমার বাবা, আমাকে বাঁচান আপনি। এরা আমাকে মেরে ফেলছে। মাত্র সাত দিন এখানে

এসেছি—চল্লিশ পঞ্চাশটা নানা জাতের নানা বয়সের লোক এনে ঘরে ঢুকিয়েছে বাড়ি-উলী আজ একটা কাবলেকে এনেছে আমাকে রক্ষা করুন আপনি, আমি আর পারছি না।"

আমার পা জড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। বেশ একটু বেকায়দায় পড়ে গেলুম। ঘড়ি দেখলুম দেড়টা বেজেছে। মনে পড়ল, আমার সতীলক্ষ্মী স্ত্রী আমার অপেক্ষায় অনাহারে বসে আছেন এখনও, আর বেশি দেরি করলে অনর্থকাণ্ড হবার সম্ভাবনা। জঠরাগ্নির উত্তাপের সঙ্গে সতীত্বের তেজ মিলে যে অগ্নিকাণ্ড হবে, তা নেবাবার ক্ষমতা কোন দমকলেরই নেই। সুতরাং শর্টকাট ব্যবস্থা করলুম একটা। সেদিন অনেকগুলো 'কল' পেয়েছিলুম। পকেটে কিছু টাকা ছিল মেয়েটিকে পঁচিশ টাকা আর বাড়ি উলীকে পঁচিশ টাকা দিয়ে বললাম, "এখন তোমরা এই টাকা রাখ। আমি সন্ধের পর আবার আসব। এসে সব শুনে একটা ব্যবস্থা করে দেবো। কিন্তু এর ঘরে এখন আর কোনও লোক যেন না ঢোকে।"

সেই কনেস্টবলকে ডেকে বললুম "তুমি দেখো এর উপর কেউ যেন বলাৎকার না করে। আমি এস পি কেও খবর পাঠাচ্ছি।"

তখন এস পি ছিলেন একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্যক্তি। মনুষ্যরূপী বাঘ একটি যাকে ছুঁতেন তাকে শুধু আঠারো ঘা নয় অনেক বেশি ঘা দিতেন। এস পি'র নাম শুনে কনেস্টবল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। পায়ে পা ঠুকে আমাকে আর একবার সেলাম করে বলল, "আমি ওর দরোওয়াজায় খাড়া পাহারা থাকব। এক তিতলিকো ভী ঘসনে নেহি দেউঙ্গা। তিতলি মানে আমি তখন বুঝেছিলাম পিঁপড়ে, কিন্তু পরে জেনেছি প্রজাপতি। সেদিন ওই ভোজপুরী কনেস্টবল আর আফগানী আগা দুজনেই রস বোধের পরিচয় দিয়েছিল।

সন্ধের পর খুব জরুরী 'কল' না থাকলে আমি কোথাও বেরুতাম না সাধারণত সন্ধের পর বড় বড় অফিসাররা ক্লাবে যেতেন। সেকালে সাহেবদেরই প্রাধান্য ছিল। সাহেবরাই ডিস্ট্রিক্ট অফিসারের পদ অলঙ্কৃত করতেন। আমাদের মতো 'নেটিভ' থাকতো দু'-একজন। এদের মধ্যে কেউ কেউ ক্লাবেও যেতো সাহেবদের খোশামোদ করবার জন্য, আবার কেউ কেউ যেতো মদ খাবার লোভে। বাড়িতে বসে মদ খাবার তাগদ অনেকেরই ছিল না সেকালে। একালেও নেই। এই জন্যেই হোটেল আর ক্লাবগুলো টিকে আছে সম্ভবত আমি ক্লাবে যেতাম না। মাঝে মাঝে দু'এক চুমুক ব্র্যাণ্ডি খাবার ইচ্ছে হলে ঘরে বসেই খেতুম। সন্ধ্যাবেলা আমার একমাত্র কাজ ছিল স্নান করে ভাল এক কাপ চা খেয়ে একটি ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বই পড়া। সেদিন তা না করে গেলুম ওই মেয়েটির কাছে। ফিরে এসেই এস পি'কে ফোন করেছিলাম, ফোনেই সব কথা খুলে বলেছিলাম তাকে। সে আমাকে বললে, "আমি সেখানে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

সেখানে গিয়ে দেখলুম, শুধু সে কড়া পাহারারই বন্দোবস্ত করেনি, বাড়ি উলীকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। কপাটে কয়েকবার ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি করবার পর সে কপাট খুলে দিলে। অগাধে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল।

"কি খবর, ঘুমুচ্ছিলে? বেশ। কেউ বিরক্ত করেনি তো।"

তার মুখেই শুনলুম বাড়ী-উলীকে থানার দারোগা এসে ধরে নিয়ে গেছে।

"এইবার তোমার ব্যাপারটা কি। বলতো শুনি—"

মেয়েটি অনেকক্ষণ ধরে থেমে থেমে যে কাহিনীটি বললে তা যেমন করুণ, তেমনি নিষ্ঠুর।

হুগলী জেলার এক গ্রামে ওর বাড়ী, জাতে কৈবর্ত। বিধবা মা ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। গ্রামে মেয়েদেব একটা স্কুল ছিল, সেই স্কুলে সে পড়তে যেত, অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য মেয়েও পড়ত সে স্কুলে। পড়াশুনা ওর তত ভালো লাগত না। ওর কেবলি মনে হত কবে আমার বিয়ে হবে। কবে আমি মায়ের দুঃখ ঘোচাতে পারব। ছেলে হয়নি বলে তার মায়ের মনে একটা দুঃখ ছিল। প্রায়ই সে এ কথা বলতো। বলতো, 'যদি পেটের একটা ছেলে থাকত তা হলে তার বিয়ে দিতুম, নাতি নাতনিতে ঘর ভরে যেত। আর মেয়ে তো পবের জন্যেই মানুষ করা। কাকের বাসায় কোকিলের ছানার মতো। বড় হলেই পর হয়ে যাবে। ওর ছেলে-মেয়ে ওর কাছে থাকবে, সে কি আমার ঘর আলো করতে আসবে।' সে তখন তার মাকে আশ্বাস দিয়েছিল, 'আমার প্রথম সন্তান, তা সে ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, তোমাকেই দেবো আমি। ঠিক দেবো, দেখো—'

তার সহপাঠিনীদের একে একে বিয়ে হয়ে যেতে লাগল। কি চমৎকার বর তাদের। কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল, কেউ মাস্টার। আর কি সব চেহারা! দেখে চোখ ফেরানো যায় না।

তার কিন্তু আর বিয়ে হয় না। ভাল ছেলেই কোথাও পাওযা গেল না। একটি ভালো ছেলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু তারা এত টাকা চেয়ে বসল যে সাধ্যে কুলাল না তার মায়ের। বয়স বাড়তে লাগল। চৌদ্দ, পনের, ষোল, তবু তার বিয়ে হল না। স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিল সে। বাস্তায় বেরুতে লজ্জা করতো। পাড়াব বখাটে ছেলেগুলো জ্বালাতন কবতো রাস্তায় বেরুলে। ছড়া কাট্‌ত, শিস দিত। বাড়ীতেই দিনরাত থাকতে লাগল সে। বাড়ীতে বসে ওই একটি চিন্তাই সে দিনরাত করতো, কবে তার বিয়ে হবে, কবে তার নিজের ঘর হবে, ছেলে হবে, কবে সে মাকে তার একটি ছেলে দিতে পারবে। এইভাবেই দিন কাটছিল, এমন সময় সর্বনাশ হয়ে গেল। তাদের ঘরে সিঁদ কেটে চোরে নিয়ে গেল তাদের যথাসর্বস্ব। তার মায়ের যা দু'-একখানা গয়না ছিল, ভালো কাপড় ছিল, যার উপর নির্ভর করে মা ভেবেছিল তার বিয়ে দেবে, তা সমস্ত চুরি হয়ে গেল। বিয়ের আশা নির্মূল হয়ে গেল একেবারে। বিনা পয়সায় এদেশে মেয়ের বিয়ে হয় কি কখনও? পাশের গাঁয়ে থানা, সেখান থেকে দারোগাবাবু এলেন চুরির তদন্ত করতে। আমাকেই বেশি করে জেরা কবতে লাগলেন। আমি কোথায় শুয়েছিলাম, রাত্রে কোন শব্দ শুনেছিলাম কিনা, বাড়ীর আশেপাশে কোন লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি কি না, আমাদের বাড়ীতে কারা আসে—এইসব। তাবপর থেকে দারোগাবাবু রোজই আসতে লাগলেন, আর আমাকে ডেকে সামনে বসিয়ে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। দিনকতক পবে তাঁর আসল মতলবটি বোঝা গেল। তিনি মাকে একদিন বললেন, আমি আপনার স্বজাতি। চুরির কোন কিনারা কবতে পারলুম না, তবে আপনার একটি উপকার আমি করতে পারি। আপনার মেয়ের এখনও বিয়ে হয়নি, আমারও বিয়ে হয়নি, আপনার মেয়েটিকে আমার পছন্দ হয়েছে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, ওকে আমি বিয়ে করতে পারি। আপত্তি? মা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। শুধু মা নয়, আমিও। কি সুন্দর সুপুরুষ, তার উপর দারোগা! দারোগাবাবু কিন্তু বললেন যে এখনই তিনি বিয়ে করতে পারবেন না, কারণ তাঁর এক কাকা মারা গেছেন, কালাশৌচ চলছে, সেটা শেষ হয়ে গেলে

তবে বিয়ে হবে। খুবই সঙ্গত কথা। বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে রইল। দারোগাবাবু প্রায়ই আসতে লাগলেন এবং আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কবতে লাগলেন যেন আমি তাঁব বউ হয়ে গেছি। বোজই জিনিষ-পত্র পাঠিয়ে দিতেন, মাছ, দই, দুধ, তরিতরকাবি।

মাকে টাকাও দিতেন মাঝে মাঝে। আমরা যা কখনও কল্পনাও করিনি তাই ঘটতে লাগল। এইভাবেই চলছিল, কিন্তু মাসখানেক পরে দারোগাবাবু আরো বেশি দাবী করলেন আমার উপব। একদিন একটা পালকি পাঠিয়ে দিলেন। একটা চাকব চিঠিও নিয়ে সঙ্গে এসেছিল। মাযেব নামে চিঠি। মা তো পড়তে জানে না, আমিই পড়লাম। লিখছেন, 'আমি কদিন থেকে জ্বরে পড়ে আছি। ওকে যদি পাঠিয়ে দেন ভালো হয়। পালকি পাঠালাম।' মা একটু বিপদে পড়ে গেলেন। যাওযাটা ভালো দেখায় না। অথচ এতবড় একটা হিতৈষী বন্ধুব এ অনুরোধ অগ্রাহ্য করাও শক্ত, বিশেষতঃ সে যখন হবু জামাই। আমাদেব সৌভাগ্যে পাড়াব লোকেবা হিংসেতে ফেটে পড়ছিল। সুতবাং তাদের সঙ্গে কোন পবামর্শ করতে যাওয়া বৃথা মনে হল।

মা খানিকক্ষণ ভাবলেন, শেষে বললেন "চল, আমিও তোর সঙ্গে যাই। যদিও সে আমাকে যেতে বলেনি, কিন্তু তোকে একা পাঠাই কি কবে?" আমাব সঙ্গে মাও গেলেন। আমবা গিয়ে দেখলাম সত্যিই তাঁর একটু জ্বব হয়েছে। কিন্তু এমন বাড়াবাড়ি কিছু নয়। দাবোগাবাবু মাযেব দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি কেন এলেন কষ্ট কবে? তা এসেছেন বেশ কবেছেন, থাকুন।"

মা আর আমি দুজনেই তাঁব বাসায থাকতে লাগলুম। আমার কিন্তু বড় অস্বস্তি লাগতো, কারণ আমাকে আড়ালে পেলেই দাবোগাবাবু এমন সব অসভ্য ইঙ্গিত করতেন যে আমার লজ্জাও কবতো, খাবাপও লাগতো। কিন্তু কি কবব, আমরা সঙীন ফাঁদে পা দিয়েছিলুম। পালাবাব উপায ছিল না। শেষকালে দারোগাবাবু মাকে বুঝিয়ে দিলেন যে আমি যদি তাঁব কাছে স্ত্রীব মতো থাকি তা হলেই বা ক্ষতি কি। কিছুদিন পরে শাস্ত্রমতে বিয়ে তো হবেই। মা মত দিযে দিলেন এতে। না দিয়ে উপায ছিল না। গরীব পাড়াগেঁয়ে মুখ বিধবা, দারোগার বিষদৃষ্টিতে পড়বে কোন্ সাহসে। একদিন মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তিনি বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। কিছু টাকাও নাকি দিয়েছিলেন। টাকা বড় অদ্ভুত জিনিষ ডাক্তারবাবু। টাকার লোভে মাও নিজের সন্তানকে বিক্রি করে দেয়। মা টাকা পেয়ে চলে গেলেন।

আমি বললুম, "টাকার লোভে তুমিও তো এই নরকে এসেছ।"

"না, আমি টাকার লোভে আসিনি। আমি ঘর বাঁধার আশায় এসেছিলাম। মাকে আমি দোয দিচ্ছি না, তাঁর মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। আমাদের সমাজই এমনি, সমাজই আমাকে তুলে দিলে ওই দারোগাটার হাতে। আমবা তো বেশি কিছু চাইনি, ছোট একটি সংসার পাততে চেয়েছিলাম, ছোট একটু বাসা, আর কিছু নয়—"

হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েকটা লাইন মনে পড়ে গেল—'ধন নয়, মান নয়, এতটুকু বাসা, করেছিনু আশা।' কিন্তু সে কথা আর তাকে বললুম না। যদিও বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, যা তুমি চেয়েছিলে তা দুর্লভ এদেশে। ববীন্দ্রনাথের মতো লোক যা জোগাড় করতে পারেননি, তা তুমি পাববে কি কবে। ছোট বাসা ছোট নয়, অনেক বড়। শান্তিপূর্ণ ছোট একটু বাসা জোগাড় করা অসম্ভব এদেশে। তার চেয়ে তাজমহল হোটেলে ফ্ল্যাট ভাড়া করা সহজ।

"তারপর?"

"তারপর যা ঘটবার তাই ঘটল। কিছুদিন পরেই বুঝতে পারলুম পেটে ছেলে এসেছে। তখনও বিয়ে হয়নি।"

"শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়েছিল কি?"

"না, পরে শুনলুম, উনি বিবাহিত। জাতেও কৈবর্ত নন, উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ। তিন চারটি ছেলেমেয়ে আছে ওঁর।"

"কি করে খবরটা পেলে?"

"থানার এক হাবিলদার ছিলেন রমজান আলী। দারোগাসাহেব একদিন টুরে বেরিয়েছিলেন। সেদিন তিনি আমাকে ডেকে সব কথা খুলে বললেন, রমজান আলী অবশ্য নিঃস্বার্থভাবে আমার উপকার করবার জন্যে একাজ করেননি। তাঁরও লোভ ছিল আমার উপর। তিনি দারোগাবাবুর স্ত্রীর ঠিকানাও এনে দিলেন আমাকে। বললেন, 'আমার কথা বিশ্বাস না হয় তাঁকে চিঠি লিখলেই সব জানতে পারবেন। তিনি অসুস্থ, ধরমপুর স্যানাটোরিয়মে থাকেন।' এ শুনে আমার মনের যে কি অবস্থা হল তা বুঝতেই পারছেন। স্যানাটোরিয়মের ঠিকানায় চিঠি লিখলাম একটা। সব কথা খুলেই লিখলাম। রমজান আলী ঠিকানা লিখে চিঠিখানা পোস্ট করে দিয়ে এলেন।

চিঠির উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আমি দারোগাবাবুকে আর কিছু বললাম না। ভাবলাম, ঠিক খবর আগে জানা দরকার। আমার মনে ক্ষীণ একটা আশা ছিল খবরটা মিথ্যে হবে। কিন্তু হল না, দারোগাবাবুর স্ত্রী তাঁর তিনটি মেয়ে আর একটি ছেলে নিয়ে সশরীরে এসে পড়লেন একদিন। এসেই তিনি কি করলেন জানেন? আমাকে ঝাঁটাপেটা করে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। পেটে এমন লাথি মারলেন যে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

ওই রমজান আলীই শেষে আশ্রয় দিলে আমাকে, হাসপাতালে নিয়ে গেল, অনেক সেবা-শুশ্রূষাও করলে। পেটের ছেলেটা কিন্তু বাঁচল না। মাও খবর পেয়ে হাসপাতালে এল। রোজ আসত। এসে কাঁদত খালি। কোন কথা বলত না, খালি কাঁদত। রমজান আলী আমার জন্য অনেক টাকা খরচ করেছিল। শেষকালে সে এক কাণ্ড করে বসল। মাকে হাত করে সে এক মোকর্দ্দমা রুজু করিয়ে দিলে দারোগার নামে। উপরওলার কাছে এক দরখাস্ত করে দিলে মায়ের নাম দিয়ে! উপর থেকে সায়েব এলেন, আমার সাক্ষী নিলেন, মায়ের সাক্ষী নিলেন। হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর সাক্ষী নিলেন। ফলে দারোগাবাবুর শুধু চাকরীই গেল না, দু'বছর জেল হয়ে গেল। দারোগাবাবু জেলে যাবার পর আমি পড়লাম রমজান আলীর পাল্লায়। রমজান আলী মাকে বললেন, "দেখ, তোমার মেয়ের চিকিৎসার জন্যে, মোকর্দ্দমার জন্যে আমার দুহাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। আমার যা কিছু পুঁজি ছিল সব নিঃশেষ করেছি ওর জন্যে। তোমার মেয়েটি আমাকে দাও। ও এমনিই আমার কাছে থাকতে পারে, কিম্বা যদি বল ওকে বিয়েও করতে পারি। অবশ্য আমার আরও দুটো বিবি আছে, কিন্তু আমাদের সমাজে বহু বিবাহে দোষ নেই। আর এতে যদি তোমরা রাজি না থাক, তোমার মেয়ের জন্যে যে টাকা আমি খরচ করেছি সেটা আমাকে ফেরত দাও।"

মা আমাকে আড়ালে ডেকে জিগ্যেস করলেন, "কি করবি?"

বললাম, "আমি ওর কাছে থাকব না, বিয়েও করব না, চল বাড়ী ফিরে যাই।"

মা বললেন, "কিন্তু সেখানে কি আর মুখ দেখাবার উপায় আছে? ঢিঢিক্কার পড়ে গেছে চতুর্দিকে।"

"তাহলে চল অন্য কোথাও যাই। আমি তোমাকে ভিক্ষে করে খাওয়াব। কিন্তু মুসলমান হতে পারব না।"

'মুসলমান হলেই বা ক্ষতি কি। হিন্দুরাই কি তোমাকে মাথায় করে রেখেছে? না রাখবে? দপায়ে তো খালি থ্যাঁৎলাচ্ছে। হিন্দু থেকেই তোমার বিয়ের চেষ্টা করলুম এতদিন, কিন্তু পেলুম কি একটাও ভালো ছেলে? তোমাকে শেষকালে যে নষ্ট করলে সে ও হিন্দু, ঝ্যাঁটা মারি এমন হিন্দু সমাজের মুখে—'

আমি কিন্তু তবু রাজি হ'তে পারলাম না। মা শেষে রেগে মেগে চলে গেল। রমজান আলীকে বলে গেল বটে যে আমি তোমার টাকার জোগাড় করতে যাচ্ছি। কিন্তু সেটা স্তোকবাক্য।

রমজান আলী আমাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল, আমি কিন্তু কিছুতেই রাজী হলাম না। মাকে যদিও বলেছিলাম যে ও মুসলমান বলে আমার আপত্তি কিন্তু আমার আপত্তি ছিল অন্য জায়গায়। আমি এটা ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম যে ঘর আমি বাধতে চাইছি, যা আমার জীবনের স্বপ্ন, তা ওকে বিয়ে করলে আমি পাব না। রমজান আলী বললে, আমাকে বিয়ে যদি না কর আমার টাকা ফেরত দাও। তোমার মা তো পালিয়েছে, আর এও জানি তার কাছে একটি কানা কড়িও নেই।'

বললুম, "আমি রোজগার করে তোমার টাকা শোধ করে দেব। তুমি কোথাও আমার চাকরির ব্যবস্থা করে দাও। তুমি যখন আমার জন্যে এতই করেছ—এটা" করে দাও দয়া করে।'

সে বললে, "এখানে চাকরি হবে না তোমার। এখানে কে তোমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেবে। আমার সঙ্গে বিদেশে যদি যাও সেখানে কিছু ব্যবস্থা হতে পারে।"

আমি রাজি হয়ে গেলাম এতে। দিন সাতেক পরে রমজান আলী বললে, "আমি ছুটি নিয়েছি। চল, তোমাকে পশ্চিমের একটা শহরে নিয়ে যাই। সেখানে আমার এক চেনা-শোনা আত্মীয়া আছে, তার কাছে তোমাকে রেখে দেব, সে তোমার রোজগারের ব্যবস্থা করে দেবে।"

সাতদিন আগে রমজান আলী আমাকে এই বাড়িউলীর হাতে সপে দিয়ে চলে গেছে। তারপর থেকে আমার উপর যা নির্যাতন হচ্ছে তা তো আপনি সব শুনেছেন—

জিগ্যেস করলুম, "রমজান আলীও কি তোমার উপর অত্যাচার করেছিল?

"করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। আমি চেচামেচি করে উঠতেই ছেড়ে দিয়েছিল। তারপরই এখানে নিয়ে এল—"

বুঝলাম বদমাইস ঘোড়াকে 'ব্রেক' করবার জন্য ঘোড়ার ব্যবসাদাররা যে কৌশল অবলম্বন করে, রমজান আলী তাই করেছে।

জিগ্যেস করলাম, "আমার কাছে তুমি কি চাও? যদি সাধ্যের মধ্যে হয় নিশ্চয়ই করব—"

"আমি একটি ছোট্ট ঘর বাঁধতে চাই ডাক্তারবাবু। আপনি দয়া করে সেই ব্যবস্থা করে দিন। জাতের বিচার আমার আর নেই। যে কোনও লোক ভদ্রভাবে স্ত্রীর মতো যদি আমাকে রাখে আমি তার কাছেই থাকব। সে যদি বিয়ে করে ভালোই, না-ও যদি করে তাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু তার বাড়ীতে আমি ভদ্রভাবে থাকতে চাই। আছে এরকম কোনও লোক আপনার জানা? আপনারা তো কত জায়গায় ঘোরেন, এরকম লোক চোখে পড়েনি আপনার? আমাদের দেশে একটাও ভদ্রলোক নেই এ কি হতে পারে? দয়া করে দেখুন না একটু চেষ্টা করে—"

তার মিনতিটা যেন কান্নার মতো শোনাতে লাগল। কিন্তু আমি তখন মহাসমস্যায় পড়লুম। এই বিরাট কসাইখানায় জীবন্ত একটি নধর পাঁঠা পাই কোথায়! একটাও তো বেঁচে নেই।

"আচ্ছা, চেষ্টা করব"—বলে সেদিন চলে এলাম। পুলিশ পাহাবা ছিল, সুতরাং অন্য কোন ভয়ের কারণ ছিল না। তা ছাড়া বাড়িউলী ছিল হাজতে।

তার পরদিনই আমার কাছে সোহনলাল এল। কাক-তালীয়ই বল, আর যাই বল, এই বকম আকস্মিক অপ্রত্যাশিত যোগাযোগই পৃথিবীর ইতিহাসে যুগান্তর এনেছে। টেলিফোন, এক্স্-রে প্রভৃতি এর উদাহবণ। সোহনলালকে দেখেই আমার মনে হল, বিধাতা বোধহয় ওই মেয়েটার এইবার একটা গতি করে দিলেন।

সোহনলালের পরিচয়টা শোন আগে। সোহনলালকে দেখলেই মনে হয় সে একজন 'রইস' অর্থাৎ অভিজাত বংশের ছেলে। পরনে ভালো কাপড়, ভালো জুতো, ভালো পাঞ্জাবী। সিল্কের বা আদ্দির পাঞ্জাবী ছাড়া অন্য কোন পাঞ্জাবী তাকে পরতে দেখিনি কখনও। মাথায় ফুলদার বিহারী-টুপি, একটু বাঁকা করে পরা, গোঁফটি চমৎকার, সুপালিত, সুলালিত। শুধু কালো নয়, চক্‌চকে কালো, ডগা দুটি ফণার মতো। দোহারা গড়ন, বেশ লম্বা চওড়া। কানে আতরসিক্ত তুলো থাকত সর্বদা। পানও খেত সুগন্ধী জরদা দিয়ে। মাথাব সামনের দিকে ঈষৎ টাক ছিল। চোখ ছোট ছোট ছিল, কিন্তু সর্বদা হাসিতে চিকমিক করতো বলে খারাপ দেখাত না।

সে জমিদার বা জমিদারের ছেলে ছিল না। ছিল স্থানীয় মহাবীর প্রেসের হেড মেশিন ম্যান। ছেলেবেলায় বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছিল বিলেত যাবে বলে। কিন্তু বিলেত পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। আট্‌কে গিয়েছিল বম্বেতে। সেইখানে এক বিলিতি প্রেসের সাহেব ম্যানেজারের সুনজরে পড়ে প্রেসে ঢুকে মেশিনের কাজ শেখে। নিখুঁতভাবে শিখেছিল কাজটি। মহাবীর প্রেসের সেই ছিল আসল পরিচালক। প্রেসের মালিক মহাবীর ঝুন্-ঝুন্-ওয়ালা মাসে আড়াই শো টাকা মাইনে দিয়ে ওর কাছে হাত জোড় করে থাকত, কাবণ সোহনলাল না থাকলে প্রেস অচল।

সোহনলাল বাস করত চামার পাড়ায়, তাদের সঙ্গেই ওর আত্মীয়তা ছিল বেশী। চামার রোগীদের নিয়ে আমার কাছে আসত বলেই আমার সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল।

ওর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল কয়েকটি। ঘুড়ি ওড়াতো। ঘুড়ি তৈরি করতো, ঘুড়ি আনাতোও

নানা জায়গা থেকে নানা রঙের, নানা মাপের। ওর লাটাইটি ছিল দেখবার মতো, চমৎকার কারুকার্যে অলঙ্কৃত। ভালো সুতো, সুতোর মান্‌জা, এই সবের ব্যবস্থা করতো চামারের ছেলেমেয়েগুলো, ওদেরও প্রত্যেককে ঘুড়ি লাটাই কিনে দিয়েছিল সে। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রোজ ঘুড়ি ওড়াতো। ওর আর একদল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল শাহসাহেবের ছেলেরা, তারা লক্ষ্ণৌ কায়দায় ঘুড়ি ওড়াতো।

ওর দ্বিতীয় শখ ছিল পাখী আব পায়রা পোযাব। প্রতি বছব হরিহর ছত্রের মেলায় গিয়ে পাখী কিনে আনতো। কাকাতুয়া. টিয়া, ময়না, হরেক রকমেব। পায়রাও নানা জাতের।

প্রেস থেকে ফিরে এই সব নিয়েই মশগুল হয়ে থাকত সোহনলাল। আর ওব সঙ্গী সহচব ছিল ওই চামারগুলো। সন্ধে হলেই মদ নিয়ে বসতো। যতক্ষণ না অজ্ঞান হয়ে যেতো ততক্ষণ মদ খেতো বসে। এই ছিল ওর দিবা-রাত্রির কার্যক্রম।

বিয়ে কবেছিল। একবার নয়, দু'বাব। কিন্তু দুটো বউই পালিয়েছিল। বউরা সাধাবণত চায় স্বামীবা স্বপনে জাগরণে সব সময়ে তাদেব কথাই ভাবুক, কিন্তু এরকম অখণ্ড মনোযোগ দেওযা সোহনলালেব পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঘুড়ি, পায়রা, কাকাতুয়া, টিযা, ময়না, মদ, আব চামারদেব ছেলেমেয়েরা তাব মনেব অনেকখানি দখল কবে রেখেছিল অনেক আগে থেকেই। ওব বউদের এটা ভালো লাগেনি সম্ভবত। বউদের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারে এমন লোকেবও অভাব ঘটেনি. তারা তাদের সঙ্গেই ভেগেছিল। এতে কিন্তু আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল সোহনলালেব। আব মনে হয়েছিল, লোকে তাকে হয়তো নপুংসক মনে করছে। তার নিজেবও একটু সন্দেহ হয়েছিল বোধহয়। কারণ সে আমার কাছে এসে নিজেকে ভালো করে পরীক্ষা কবিয়েছিল যে তার পারুষ্যে কোন বকম দুর্বলতা আছে কিনা। আমি পবীক্ষা কবে দেখেছিলাম. নেই। সুযোগ পেলে সে অনায়াসে শতপুত্রেব পিতা হতে পাবে।

সেদিনও সোহনলাল এসেছিল একটি চামাব ছোকরাকে নিযে। ছোকরা তাড়ি খেযে মারামারি কবে হাত ভেঙ্গেছে। তার হাতেব ব্যবস্থা করে দিযে সোহনলালকে বললুম, "তুমি একটু বস. তোমাব সঙ্গে কথা আছে একটু।"

সব খুলে বললুম তাকে।

সে বললে, "হুজুব. আমি মেশিন বুঝি, ঘুড়ি বুঝি, চিড়িয়া বুঝি, এই সব চামারদেবও বুঝি. কিন্তু আওবৎকে বুঝি না। দু'বাব বোঝবার চেষ্টা করেছি পারিনি। ওরা আজব ধরনের মেশিন। আমাকে মাফ করুন ডাক্তার সাহেব।"

আমি বললুম. "কিন্তু আমার মনে হয় একে তুমি বুঝতে পারবে. কারণ ও নিজেকে বোঝাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। তুমি যদি ওকে ভদ্রভাবে ঘরে স্থান দাও, ও তোমাব কেনা গোলাম হয়ে থাকবে। জীবনে ও কেবল অভদ্র লোকেদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে। তোমার মতো ভদ্র 'রইস্' যদি ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে তাহলে বর্তে যাবে ও—"

সোহনলাল দোনো মোনো হয়ে চুপ করে রইলো।

"ও পতিতা বলে আপত্তি করছো?"

"না। জাতের বিচার আমার নেই। আমি জানি ময়লা বাসন ধুয়ে নিলেই পরিষ্কার হয়ে যায়। আমার মেশিনে তো রোজই ময়লা জমে, রোজই সাফ করতে হয়, তবে ভয় হয়, কোন খারাপ অসুখ টসুখ নেইতো--"

"সে আমি দেখে দেবো। অসুখ থাকলেও তা সারিয়ে নেওয়া অসম্ভব নয়—"

"হ্যাঁ, মেশিনও ভেঙ্গে যায়, সারাতে হয়।"

সোহনলাল মেশিনের উপমা দিয়েই কথাবার্তা চালাতে লাগল।

বললাম, "তুমি আগে তাকে দেখ একবার, যদি পছন্দ হয় ঘরে নিয়ে যেও। ওর কোন অসুখ টসুখ আছে কিনা তা আমি দেখে দেবো।"

"বহুত খুব।"

সেলাম করে চলে গেল সোহনলাল।

সেই দিনই সন্ধের সময় নিয়ে গেলাম তাকে সরস্বতীর কাছে। মেয়েটির নাম ছিল সরস্বতী। তাকে দেখে সোহনলাল আর "না" বলতে পারল না। সত্যই মেয়েটি অপরূপ লাবণ্যময়ী ছিল, বিশেষত যৌবনের অমন প্রবল প্রকাশ ক্বচিৎ চোখে পড়ে।

সেই দিনই সোহনলাল সরস্বতীকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। প্রতিশ্রুতি মতো সরস্বতীকে পরীক্ষা করে দেখেছিলাম, কোন অসুখের চিহ্ন দেখতে পাই নি। রক্তও পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছিলুম কোন দোষ পাওয়া যায়নি।

সোহনলালের সঙ্গে সরস্বতীর বিয়েও হয়েছিল একটু নতুন ধরনের। পুরুত টুরুত ডাকা হয়নি। মন্ত্রও পড়া হয়নি। সোহনলালের বাড়ীর কাছে একটা শিব-মন্দির ছিল। সেই শিব মন্দিরে গিয়ে শিবের মাথায় হাত রেখে তারা শপথ করেছিল যে, তারা আমরণ পরস্পরের সুখ-দুঃখের অংশী হবে। কেউ কাউকে প্রতারণা করবে না।

এ শপথ রক্ষা করেছিল তারা। শুধু তাই নয়, সোহনলালকেও বদলে দিয়েছিল সরস্বতী। কিছুদিন পরে শুনলাম সোহনলাল মদ ছেড়ে দিয়েছে। বিয়ের মাসখানেক পরে একদিন তাদের বাড়ি গিয়ে দেখলুম, সোহনলাল পুজো করছে।

সরস্বতী হেসে বললে, "উনি আমাকে ঘুড়ি ওড়াতে শিখিয়েছেন, আমি ওঁকে পুজো করতে শিখিয়েছি। আমরা দুজনেই এখন ঘুড়ি ওড়াই, দুজনেই পুজো করি।"

দেখলুম ঘরের শ্রী ও ফিরিয়ে ফেলেছে সে। উঠোনে একটি তুলসী গাছ। পাখীর খাঁচাগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কাঁসার বাসনগুলি ঝক্‌ঝক্ তকতক করছে। পরিষ্কার কাপড়গুলি পাট করে আলনায় রাখা। প্রকাণ্ড উঠোনটা আগে শ্রীহীন হয়ে পড়ে থাকতো, এখন গোবর দিয়ে নিকিয়ে তার চেহারাই বদলে দিয়েছে সরস্বতী। উঠোনের একধারে কয়েকটা ফুলের গাছও দেখলাম। গাঁদা, সন্ধ্যামণি, রজনীগন্ধা। মনে হল—যাক্, সরস্বতী, এবার তার মনের মতো ছোট একটা বাসা পেয়েছে তাহলে।

সোহনলাল একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। দেখলাম সে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে বাস করছে। জিগ্যেস করলাম, "মদ ছেড়ে তোমার কষ্ট হচ্ছে না?"

সে বললে, "দু'চার দিন হয়েছিল। কিন্তু কষ্ট হলই বা। সরস্বতীর জন্যে একটু কষ্ট সইতে যদি না পারলাম, তবে আর কি পারলাম। আমার ওই মেশিনের জন্যে কষ্ট করতে হয় না? এমন দিনও গেছে যখন সমস্ত দিন না খেয়েও সেবা করেছি। যাকে ভালোবাসি তার জন্যে কষ্ট করতে হয় বই কি। কিন্তু আমি যে জন্যে আপনার কাছে এসেছি সেইটে আগে বলি। সরস্বতীর খুব ইচ্ছে কোনও একটা পুজো করে। দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী—আপনি যা বলবেন। সরস্বতী আপনাকেই জিগ্যেস করতে বলেছে।"

বললাম, "দুর্গা কালীব দবকাব কি, ওব নাম সবস্বতী, সবস্বতী পুজোই করুক—"

"ঠিক বলেছেন।"

মহাসমাবোহে সবস্বতী পুজো হল। শুধু আমি নয়, শহব-সুদ্ধ লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিল। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, চামাব সব।

আবও মাস দুই পবে শুভ সংবাদটি জানতে পাবলাম। সবস্বতী অন্তঃস্বত্তা।

যথাসময়ে সুন্দব একটি ছেলে হল। আবাব একচোট সবাইকে খাওয়ালে সোহনলাল।

মাস কয়েক পবে বদলি হয়ে গেলাম আমি সেখান থেকে। ওদেব সঙ্গে একটা আত্মীয়তাব মতো হয়ে গিয়েছিল। ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়েছিল বেশ। যাবাব সময় বলে গেলুম, মাঝে মাঝে তোমাদেব খবব দিও।

বছব খানেক পবে হঠাৎ সোহনলাল নিজেই সশবীবে এসে হাজিব হল একদিন।

বললে "সবস্বতীও ভেগেছে।"

"বল কি!"

"হ্যাঁ হুজুব। আমি আগেই আপনাকে বলেছিলুম, মেয়েমানুষ এক আজব মেশিন।"

"কোথায় গেছে তা জান?"

"কিছু বলে যায়নি কাউকে। ছেলেটাকেও নিয়ে গেছে।"

"তোমাব সঙ্গে ঝগড়া টগড়া হয়েছিল?"

"কিচ্ছু না।"

একটু চুপ করে থেকে বললে "আপনি কি ওব দেশেব ঠিকানা জানেন?"

ঠিকানা সংগ্রহ কববাব আমাব বাতিক নেই।

বললাম "না ঠিকানা তো জানি না।"

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল প্রাচীন শাস্ত্রকাবগণ এইজন্যই বোধহয় অজ্ঞাত কুলশীলদেব সম্বন্ধে আমাদেব সাবধান কবে গেছেন। কিন্তু সবস্বতী যে এমন দাগা দেবে তা ভাবতে পাবিনি।

খানিকক্ষণ বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে থেকে সোহনলাল চলে গেল।

মাস তিনেক পবে সবস্বতীব চিঠি পেলাম একখানা। বানান-ভুলে পবিপূর্ণ বাংলায় লেখা চিঠি। চিঠিতে যা লিখেছিল তা শুদ্ধ কবে লিখলে এই দাঁড়ায়।

শ্রীচবণেষু,

না জানি আপনি আমাব সম্বন্ধে কি ভাবছেন। কিন্তু কি হয়েছিল শুনুন। আপনাব মনে হয়তো আছে, আমি আপনাকে বলেছিলাম যে আমি মায়েব কাছে প্রতিজ্ঞা কবেছি যে আমাব প্রথম সন্তান মাকে দিয়ে দেবো। আমাব ছেলে যখন বড় হতে লাগল তখন বাব বাব এই প্রতিজ্ঞাব কথাটা আমাব মনে হত। মায়েব জন্যে মন কেমন কবতো খুব, তবে মনকে স্তোক দিতম যে মা বোধ হয় বেঁচে নেই। কিন্তু স্তোক দেওয়া আব চলল না। হঠাৎ বাস্তায় আমাদেব গাঁয়েব নবীন স্যাকবাব সঙ্গে দেখা হল একদিন। সে এক বিয়েতে ববযাত্রী এসেছিল। সে বললে, মা বেঁচে আছে, আব আমাব জন্যে বোজই নাকি কান্নাকাটি কবে।

ওঁকে পাকে প্রকাবে একদিন জিগ্যেস কবলুম, আচ্ছা, খোকনকে যদি আমি আমাব মায়েব কাছে দিয়ে দি তাহলে তুমি কি আপত্তি কববে? উনি বাঘেব মতো গর্জন করে উঠলেন। আমাব এও মনে হতে লাগল, আমাব ছেলে যদি এখানে মানুষ হয় তাহলে ওব সঙ্গী হবে

ওই চামারের ছেলেমেয়েগুলো। এই সব ভাবছি এমন সময় আবার একদিন নবীন স্যাকরার সঙ্গে দেখা হল। সে বললে, মা-ই তাকে এবার পাঠিয়েছে। আমি যেন ওঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আসি মায়ের সঙ্গে। উনি তখন বাড়ি ছিলেন না, প্রেসে গিয়েছিলেন। আমি ভাবলুম, উনি ফিরলে ওঁকে জিগ্যেস করে তবে যাব। কিন্তু আবার ভয় হল উনি যদি যেতে না দেন। নবীন স্যাকরা বললে, 'যাবে তো চল, তিনটের সময় গাড়ি। আমি তোমার মায়ের কাকুতি মিনতিতে একটি দিনের জন্যে এসেছি। যদি না যাও আমি আজই চলে যাব। অনেক কাজ পড়ে আছে আমার।' শেষে চলেই গেলুম ওর সঙ্গে। কাজটা খুবই অন্যায় হয়েছিল বুঝতে পারছি। কিন্তু যখন কুমারী ছিলাম, তখন মাকে যে কথা দিয়েছিলাম, সেটা যদি না রাখি তাহলে কি সত্যভঙ্গ হয় না? তাছাড়া যে ছেলেকে আমি দশমাস পেটে ধরেছি, বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করেছি, তার উপরে আমার কি কোন অধিকার নেই? সব অধিকার ওঁর? পাকে-প্রকারে একদিনই কথাটা পেড়ে বুঝেছিলাম ওঁর কি মনোভাব। তাই বাড়িতে এসেও তাঁকে ভয়ে আর খবর দিতে পারিনি। যদি এসে হৈ হল্লা করেন, তাহলে গাঁয়ের ভেতর সে এক বিশ্রী কাণ্ড হবে। একে আমাকে নিয়ে আগে নানা কাণ্ড হয়েছে। আমি আর একটা কথাও ভেবেছিলুম, মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমার কাছেই নিয়ে যাব। তাহলে দু-কূলই বজায় থাকবে। কিন্তু তাও হল না। মা বাস্তু ভিটে ছেড়ে আসতে রাজি হল না। কিছুতেই। আর আমার ছেলেটির সঙ্গে ইতিমধ্যেই মা বেশ ভাব করে ফেলেছিল, সে রাত্রে তাঁর কাছে শুতো। মাস-খানেকের মধ্যে খুব ন্যাওটা হয়ে পড়ল। তখন আমি ভাবলুম, এইবার ফিরে যাই। উনি হয়তো একটু রাগ টাগ করবেন, কিন্তু পায়ে ধরলে আমার মনের কথাটা বুঝবেন হয়তো। মায়ের কাছে ছেলেকে রেখে একাই ফিরে গেলুম। গিয়ে দেখি আমাদের বাড়িতে আর একজন লোক রয়েছে। চামারেরা বললে, আমি চলে যাওয়ার দিন পনেরো পরেই উনি প্রেসের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সব জিনিসপত্র জলের দামে বিক্রী করে চলে গেছেন। কোথায় গেছেন কেউ জানে না। মহা অতান্তরে পড়লুম। কেউ কেউ বললে কলকাতা গেছেন, কেউ বললে বোম্বাই। একবার ভাবলুম বাড়িতে ফিরে যাই আবার। কিন্তু মাসখানেক মায়ের কাছে থেকেই পাড়ার ছোঁড়াগুলোর, বিশেষত জমিদারের নায়েব মশায়ের চোখে যে দৃষ্টি দেখেছিলুম, তাতে মনে হল ওখানে যদি ফিরে যাই তাহলে মাকে আবার নতুন করে বিপদে ফেলা হবে। ইতিমধ্যে পাড়ার চেনা একটি লোকের সঙ্গে দেখা হল, সে যা খবর দিলে তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সে কয়েকদিন আগেই কলকাতা গিয়েছিল, বললে, সোহনলাল অপঘাতে মারা গেছে। মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে রাস্তার ধারে পড়েছিল, একটা মোটরলরি এসে তার মাথাটা চুরমার করে দিয়ে চলে গেছে।–শুনে যেন পাথর হয়ে গেলুম। চিরকালের মতো যদি পাথর হয়ে যেতুম তা হলেই ভালো হতো। কিন্তু তা হল না। কপালে তখনও অনেক দুর্গতি লেখা ছিল। কি করি, কোথা যাই, মহা দুশ্চিন্তায় পড়লুম। আমাদের বাড়িতে যিনি নতুন ভাড়াটে এসেছিলেন, তাঁর স্ত্রী আমার দিকে একনজর চেয়ে তাঁর বাড়ীর বারান্দাতেও খানিকক্ষণের জন্যে বসতে দিলেন না, অথচ ওই বারান্দা একদিন আমারই ছিল। ওই বারান্দা কতবার ধুয়েছি, পুঁছেছি, নিকিয়েছি। এখন ওখানে আর আমার বসবার অধিকারও নেই। চামাররা অবশ্য খুব ভদ্র ব্যবহার করেছিল। বলেছিল, মাইজি তুমি যতদিন খুশী আমাদের

কাছে থাকো। কিন্তু চামাবদের সঙ্গে থাকতে আমাব প্রবৃত্তি হল না। বাস্তায় বাস্তায় ঘুবতে লাগলাম, কোথাও যদি চাকবাণী হয়ে বাহাল হতে পাবি এই আশায়। এমন সময় সেই বাড়িউলীব সঙ্গে আবাব দেখা। সে খুব ভদ্র ব্যবহাব কবলে আমাব সঙ্গে। তাব কাছেই শুনলাম, বমজান আলীও নাকি মাবা গেছে। যে দাবোগাকে ও ষড়যন্ত্র কবে জেল দিয়েছিল, তাবই পেযাবেব কোন গুণ্ডা নাকি ওকে খুন করেছে। সোহনলালেব কথা শুনে ঝবঝব কবে কাঁদতে লাগল। বললে, ও বকম দিলদবিয়া লোক দেখা যায় না। আমি ওকে না বলে চলে গিয়েছিলুম বলেই আমাকে বকতে লাগল খুব। তাবপব বললে, 'তুমি যদি আমাব কাছে থাকতে চাও, তোমাকে বাখতে পাবি। যদিও তোমাকে বেখে একবাব খুবই হাঙ্গামায় পড়তে হয়েছিল আমাকে।' আমি বললুম, 'আমাকে যদি ভদ্রভাবে বাখ, আমাব উপব যদি জোব জুলুম, জবরদস্তি না কব, তাহলে আমি থাকতে পাবি।' বাড়িউলী জিব কেটে বলল, 'ছি, ছি, যা হয়ে গেছে তা আব কখনও হবে না। তাছাড়া অত বড় বড় 'অপসব' তোমাব সহায়, আমি কি তোমাব উপব আব জবরদস্তি কবতে সাহস কবি?' আমি ওই বাড়িউলীব কাছে থাকে গেলুম, দেখলুম এ ছাড়া আমাব আব পথ নেই।

আপনি বাগ কববেন জানি। তবু আপনাকে বাবা বলে ডেকেছি, আপনাব দয়াতেই কিছুদিনেব জন্যেও সুখেব সংসাব পাততে পেবেছিলুম, একথা আমি কোন দিনই ভুলব না। তাই আবাব আপনাব সাহায্য ভিক্ষে কবছি।

যা কবছি তা আমাব একটুও ভালো লাগে না। কিন্তু কি কবব, বাধ্য হয়েই কবছি। যদি আপনি দয়া কবে আমাকে অন্য কোথাও একটা কাজ জুটিয়ে দেন এখুনি চলে যাব। আপনাদেব হাসপাতালে শুনেছি, দাই নার্স এসব কাজ পাওয়া যায়। জুটিয়ে দিতে পাবেন আমাকে একটা? কম মাইনে হলেও যাব। আমাব নিজেব সাদাসিধে খাওয়া পবাব খবচটা চলে গেলেই হল। আপনাব কাছে সাহায্য চাইবাব আমাব আব মুখ নেই তা জানি। তবু চাইছি, কাবণ সত্যিই আমি নিরুপায়। আব কি দয়া পাব আপনাব? আমাব শত কোটি প্রণাম জানবেন। ইতি

আপনাব মেয়ে সবস্বতী

চিঠিখানা পড়ে পণ্ডিতেবা যাকে "জুগুপ্সা" বলেন তাই জেগে উঠল আমাব মনে। ঠিক কবলুম, ওই কালভুজঙ্গিনীব সঙ্গে আব কোন সংস্রব বাখব না। হাসপাতালেব অ্যাপ্রেনটিস নার্স কবে ওকে বাহাল কবে নিতে পাবতুম কিন্তু ক্রোধান্ধ হয়েছিলুম, তাই ওব চিঠিব উত্তব পর্যন্ত দিলাম না।

চিঠি পাওযাব প্রায বছব চাবেক পবে আব একবাব সবস্বতীব দেখা পেযেছিলুম। তখন আমি আব এক জাযগায বদলি হয়ে গেছি। দুপুব বেলা, একটা গাঁয়ে গেছি বোগী দেখতে। যাওযাব সময নজবে পড়েনি। ফেববাব সময দেখলুম, গাঁযেব বাইবে একটা ফাঁকা মাঠেব মাঝখানে একটা গেবযা ধ্বজা উড়ছে। ধ্বজায লাল অক্ষব দিয়ে লেখা— 'সোহনলাল আশ্রম'। গাড়ী থামালুম। তাবপব দেখতে পেলুম, অনেকগুলো ছেলে কাছেই ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। একটু দূবে ছোট্ট একটি মাটিব ঘব, বেশ পবিষ্কাব পবিচ্ছন্ন, বাঁশেব বেড়া দিয়ে ঘেবা ঘবেব পিছনে অনেক উঁচুতে কযেকটা পাযবাব টং। নানা জাতেব পাযবাও চবে বেড়াচ্ছে। নেবে

এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, মাটির ঘরের দাওয়ায় পাখীর খাঁচাও ঝুলছে কয়েকটা। একটা ময়না বলে উঠল, 'সোহনলাল, সোহনলাল কী জয়'। যে ছোঁড়াগুলো ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল তাদের একজনকে ডেকে জিগ্যেস করলুম, এখানে কে থাকে। সে বললে, ভৈরবী মাইজি। এমন সময় সরস্বতী বেরিয়ে এল ঘর থেকে। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, পরনে গেরুয়া। যৌবনের সে উদগ্র-ভাব নেই, তার বদলে একটা শুদ্ধ শান্ত শ্রী বিকীর্ণ হচ্ছে তার সর্বাঙ্গ থেকে। আমাকে এখানে দেখতে পাবে তা সে প্রত্যাশা করেনি। অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলো। তারপর চিনতে পেরে একমুখ হেসে এগিয়ে এল আমার দিকে, প্রণামও করলো।

"বাবা! আপনি এখানে কি করে এলেন?"

"কিছুদিন আগে বদলি হয়ে এসেছি। আমার তো জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়ানোই চাকরী। তুমি কি করে এখানে এলে তাই বল--"

"আমি বাড়ি-উলীর কাছে কিছুদিন ছিলাম। যখন হাতে কিছু টাকা জমল তখন মনে হল আর পাপের ভোগ করি কেন। একজনের কাছে খবর পেলুম, এখানে বেশ শস্তায় জমি পাওয়া যায়। খানিকটা জমি কিনে ছোট একটা ঘর বানিয়ে নিয়েছি এইখানেই।"

"কি কর এখানে?"

"তিনি যা ভালোবাসতেন তাই করি। ছেলেদের ঘুড়ি কিনে দি, পায়রা আর পাখীর সেবা করি।"

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কয়েক সেকেণ্ড।

তারপর জিগ্যেস করলুম, "তোমার ছেলে কোথায়?"

"সে তো মায়ের কাছে। এখন আর নেই।"

"এখন কোথা?"

"মারা গেছে ম্যালেরিয়ায় ভুগে।"

যে ছেলেগুলো ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল, তারা এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল আমাদের। তাদের দেখিয়ে সরস্বতী বললে, "এখন এরাই আমার ছেলে—"

হঠাৎ ইচ্ছে হল ওকে একটা প্রণাম করি। কিন্তু ঝুঁকতে পারলুম না, টাইট প্যান্ট পরা ছিল। নিজের প্যান্ট নয়, ঝুটো আত্মসম্মানের প্যান্ট।

দেখ বৎস, তোমাকে যে এত বড় লম্বা চিঠি লিখলাম, তা তোমাকে গল্প শোনাবার জন্যে নয়। চিঠিটা লিখতে প্রায় পনেরো দিন লেগেছে। রাত জেগে জেগে লিখেছি। লিখেছি, কারণ তুমি আমার ছাত্র, শুধু তাই নয়, তুমি ডাক্তার হয়েছ অর্থাৎ তুমি সেই সম্প্রদায়ের একজন হয়েছ যারা বিদ্রোহী সভ্য মানবদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিদ্রোহী। প্রকৃতির নিয়ম অমান্য করেই মানুষ সভ্য হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতির যেটা সবচেয়ে কড়া নিয়ম, যা অনিবার্য, যা অমোঘ, ডাক্তাররা অস্ত্রধারণ করেছে তারই বিরুদ্ধে। তাদের লড়াই মৃত্যুর সঙ্গে, এই লড়াই করতে করতে ওরা নিজেরাও দলে দলে মরছে, কিন্তু তার পিছনে আসছে আবার একদল। বহুকাল থেকে এই চলছে, তুমিও এবার সেই দলে যোগ দিয়েছ। ডাক্তারদের বাজার দর আজকাল ক্রমশঃ কমছে, কিন্তু তাদের আসল দর কখনও কমবে না, যদি তারা অমানুষ না হয়। মানুষ

অসুখে পড়বেই এবং সে আর্ত হয়ে তোমার কাছে আসবেই, তখন তুমি যদি তাদের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার কর তাহলে তুমি শুধু যে তাদের রোগ চিনতে পারবে, তা নয়, তাদেরও চিনতে পারবে। ডাক্তারবাই দেশের লোকদের স্বরূপ চিনতে পারে, আর্ত হলেই মানুষ তার স্বরূপ উদঘাটন করে ফেলে। কাউকে যখন বাঘে ধরে তখন সে তার বগলের নীচে লুকানো দাদটাকে ঢাকবার চেষ্টা করে না, যে তাকে বাঘের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে তার কাছে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হতেও তার আপত্তি নেই। সে যখন উলঙ্গ হয়ে তোমার কাছে আসবে তখন তার কদর্যতা দেখে নাক সিঁটকো না, তাকে মরাল লেকচার দিতে যেও না, শুধু একটি কথা মনে রেখ সে বিপন্ন মানুষ। ডারবিন আমাদের জীবনটাকে যুদ্ধ বলেছেন সত্যিই আমরা জন্ম মুহূর্ত থেকে মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রেই ঘোরাফেরা করি সবাই। এই যুদ্ধক্ষেত্রে চব্বিশ ঘণ্টাই গোলাগুলি চলছে, শুধু অসুখের জীবাণু নয়, কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ, মদ মাৎসর্য এই ছ'টা শত্রুর কারখানায় তৈরি নানা জাতের নানা আকারের গোলাগুলিও। ইন্দীবর নয়নের সলজ্জ কটাক্ষও আমাদের কম ঘায়েল করে না আর একটি কথাও মনে রেখো, এই যুদ্ধক্ষেত্রে মাত্র দুই শ্রেণীর লোক দেখতে পাওয়া যায়, তাদের তোমরা ভাল মন্দ, ধার্মিক অধার্মিক, হিন্দু অহিন্দু, বাঙালী অবাঙালী এই কায়দায় ভাগ করতে অভ্যস্ত হয়েছো। কিন্তু তাদের ভাগ করা উচিত এইভাবে, (ক) যারা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়েছে, (খ) যারা এখনও হয়নি। এই সত্যদৃষ্টি দিয়ে যদি মানুষকে দেখতে অভ্যস্ত হও তাহলে তাদের ঠিক স্বরূপটি দেখতে পাবে। আর তা না করে, যদি ঠিক করতে যাও ইনি মনুর বিধান মেনে চলেন কিনা, এর টিকি আছে কি নেই, মুরগী খান, না কুমড়ো খান, কার কাছে মন্ত্র নিয়েছেন কংগ্রেসী না মুসলিম লীগী, আর সেই অনুসারে তোমার মানস থার্মোমিটার সহানুভূতির পারা যদি ওঠা নামা করতে থাকে তাহলেই তোমার পতন হলো। তাহলেই তুমি আর বিজ্ঞানী ডাক্তার থাকলে না, চণ্ডীমণ্ডপের দা ঠাকুর হয়ে গেলে।

তুমি পঞ্চকন্যার প্রসঙ্গ অবতারণা করেছিলে সেই সুযোগে আমিও তোমাকে আমার দেখা পাঁচটি কন্যার কথা বললুম। আমার বক্তব্যটা আশা করি স্পষ্ট হয়েছে তোমার মনে আমি বলতে চেয়েছি, ওদের তোমরা যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছ, ওরা ঠিক তাই নয় ওদের যদি শুধু অ্যানাটমি বা ফিজিওলজির ফরম্যুলায় ফেল তোমার ক্ষুধা মেটাবার বা বংশবৃদ্ধি করবার যন্ত্র মাত্র মনে কর, তাহলে ওদের আসল পরিচয়ই পাবে না কখনও। ওরা যন্ত্ররূপেই ধরা দেবে তোমাদের কাছে, যেমন রোজ দিচ্ছে। কিন্তু ওদের সেই শক্তিকে তোমরা কখনও কাজে লাগাতে পারবে না যে শক্তি ওদের বৈশিষ্ট্য, আর যা কাজে লাগাতে পারলে দিগ্বিজয় করা যায়। ওদের সে শক্তিকে প্রত্যক্ষ করবার চোখ নেই তোমাদের। আমি জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে তোমার সেই চোখ ফুটিয়ে দিতে চাই। তোমাদের একটা মহদ্দোষ কি জান? শুধু দোষ নয়, নির্বুদ্ধিতা। তোমরা ওদের প্রতি অনুকম্পা কর। মনে কর, আহা ওরা অতি দুর্বল, ওদের ব্রেনের ওজন কম, গায়ের জোর কম, তোমাদের কৃপাকণা না পেলে ওরা বাঁচবে না। তাই ওরা তোমাদের দাসী হয়ে আছে আর তোমরা দয়া করে ওদের প্রভু হয়েছ। কিন্তু, ইউ ফুল্স্, তোমরা এটা বোঝ না যে প্রতি সংসারে ওরাই আসল কর্ত্রী। মা-রূপে, কন্যারূপে, বধূরূপে, প্রণয়িনীরূপে, নানা রূপে ওরা তোমাদের মতো হাঁদাদের নাকে দড়ি

পরিয়ে নাচাচ্ছে? তোমরা যখন হাম্বা-রব করে গর্জন ছাড় "আমরা প্রভু", তখন ওরা মনে মনে হাসে, কারণ ওরা জানে যে আসলে ওরাই শক্তির আধার। তাই চুপ করে থাকে, পূর্ণকুম্ভের মতো। ইচ্ছে করলে ওরা সতী-সাবিত্রীও হতে পারে, আবার ক্লিওপেট্রা ক্যাথারিনও হতে পারে। ঘর বাঁধতেও জানে, ঘর ভাঙতেও জানে। ঘোমটা টেনে রান্নাঘরের কোণে বসে তোমাদের সুক্তো বেগুন ভাজা খাইয়েও মুগ্ধ করতে পারে। আবার স্টেজে উঠে ওড়না উড়িয়ে, কোমর দুলিয়ে তোমার মুণ্ডুও ঘুরিয়ে দিতে পারে। সব পারে ওরা। চণ্ডী পড়েছ কখনও? যদি না পড়ে থাক পোড়ো। দেখবে, সেখানে কবি নারীকে কি মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁরা জানতেন যে ইচ্ছে করলে ওই নারীশক্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বরকেও মোহগ্রস্ত করতে পারে।

যযা ত্বযা জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।

সোঽপি নিদ্রা বশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ।

এই তামসী দেবীকে তাঁরা আরাধনা করেছিলেন, মধু ও কৈটভকে মোহগ্রস্ত করবার জন্যে। ওদের মোহগ্রস্ত না করতে পারলে বধ করা যেত না। চণ্ডীতে আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করবার মতো আছে। ওঁরা মহিষাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভর মতো জাঁদরেল দৈত্যদের মারবার জন্যে কোনও হোমরা-চোমরা পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করেননি। করেছেন নারীকে। অম্বিকা শুম্ভ-নিশুম্ভকেও মোহগ্রস্ত করেছিল। শুম্ভ-নিশুম্ভের দূত যখন তাকে এসে বললে - আপনি স্ত্রী-রত্ন, শুম্ভ-নিশুম্ভও ত্রিলোকজয়ী বীর, আপনি তাঁদেরই ভজনা করুন। এর উত্তরে অম্বিকা শাড়ি গয়না চাননি, বলেছিলেন—

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যাপোহতি

যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি।

যিনি আমাকে যুদ্ধে হারিয়ে দিতে পারবেন, যিনি আমার দর্পচূর্ণ করবেন, যিনি জগতে আমার তুল্য বলশালী, তাঁকেই আমি পতিত্বে বরণ করব। যে দেশে নারীর এই রূপ কল্পনা করেছেন কবিরা, সেই দেশে তোমরা তাদের অবলা দুর্বলা বলে অনুকম্পা কর? তোমাদের স্পর্ধা তো কম নয়। আই বেগ ইওর পার্ডন, এটা স্পর্ধা নয়, বোকামি। তোমরা ওদের চেন না, জান না, জানবার চেষ্টাও কর না। চণ্ডী যদি পড় তাহলে আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করবে। যে বীর্যবতী মহিয়সী সিংহবাহিনী মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন, তাঁর জন্মকাহিনীটাও ভালো করে পড়ে দেখো। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের তেজ এবং সমস্ত দেবকুলের তেজ একত্রিত হয়ে যে তেজোময়ী নারী সম্ভব হলেন, তাঁকে আরও প্রদীপ্ত করলেন সূর্য-চন্দ্র, দক্ষ প্রজাপতিরা, সমুজ্জ্বল করলেন সন্ধ্যা-দেবীগণ। বরুণ তাঁকে শঙ্খ দিলেন, অগ্নি শক্তি দিলেন, পবন দিলেন ধনুর্বাণ। ইন্দ্র নিজের বজ্র থেকে আর একটা বজ্র তৈরি করে দিলেন, ঐরাবত দিলেন ঘণ্টা, যম দিলেন কালদণ্ড। ক্ষীরোদ সমুদ্র তাঁকে সাজিয়ে দিলেন নানা অলঙ্কারে। তাঁর গলায় দুলিয়ে দিলেন উজ্জ্বল মুক্তাহার, কানে দিব্য কুণ্ডল, মাথায় পরিয়ে দিলেন চূড়ামণি, হস্তে বলয়, বাহুতে অঙ্গদ, পায়ের নূপুর, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়। সমুদ্র দিলেন তাঁকে অম্লান পদ্মের মালা বিশ্বকর্মা তৈরি করে দিলেন কুঠার—হিমালয় দিলেন সিংহ, বাসুকী দিলেন নাগহার। অর্থাৎ ত্রিভুবনের সমস্ত পুরুষ-শক্তি একাগ্র হয়ে পুঞ্জীভূত হল ওই তেজোসম্ভবা

নারী-শক্তির মধ্যে। তাই তিনি আনন্দে অট্টহাস্য করে উঠলেন। 'সম্মানিতা, ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ। তাই তাঁর গর্জনে ত্রিভুবন কেঁপে উঠল। 'চুক্ষুভাঃ সকলা লোকাঃ, সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে। চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ।' সপ্ত সমুদ্র কেঁপে উঠল, পাহাড় বিচলিত হল। পুরুষদের তেজ, পুরুষদের আগ্রহ, পুরুষদের প্রতিভা—নারীশক্তির সঙ্গে মিললে তবেই মহিষাসুরকে বধ করা যায়। কোনও পুরুষ বীর মহিষাসুরের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি. কিন্তু যেই তাদের প্রতিভা, প্রেরণা, আগ্রহ নারীশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করল অমনি তা সম্ভব হয়ে গেল। এখনও আমাদের দেশে বহু মহিষাসুর, শুম্ভ নিশুম্ভ জন্মাচ্ছে, যুগে যুগে জন্মাবে, তাদের মারবার একমাত্র উপায় ওই চণ্ডীতে লেখা আছে। নারী-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে. বিইনফোস করতে হবে, সেই নারী-শক্তির উৎস কোথায় সন্ধান করতে হবে, তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে. তবেই দুর্দান্ত মহিষাসুরদের বধ করা সম্ভব হবে। অন্য উপায় নৈব নৈব চ।

তুমি ডাক্তার। এই নারী-শক্তির নানা রূপ দেখবার সুযোগ তুমি পাবে। কখনও দেখবে বালব. কখনও দেখবে মোটর, কখনও বা সক তার শুধু। কিন্তু বিদ্যুতের কথাটা ভুলে যেও না। এটা সর্বদা মনে রেখ, কারেন্ট পেলেই ওরা সক্রিয় হয়ে ওঠে. এটম বম তৈরী করাও অসম্ভব নয় ওদের শক্তিতে। আর এটাও মনে রেখ মহিষাসুর বধ করতে হবে, আর তা তোমরা একা পারবে না, মেয়েদের শক্তির সাহায্য নিতে হবে।

মনের ভিতর অনেকদিন থেকে অনেক রকম গ্যাস জমেছিল এই চিঠির সেফটি ভালভ দিয়ে তার অনেকখানি বেরিয়ে গেল। আরাম বোধ করছি। শেষবার আগে আবার বলছি মনে রেখ মহিষাসুর বধ করতে হবে।

আশীর্বাদ জেনো. বিলেত যাচ্ছ নাকি? দেখো. বিলিতি বাঁদর হয়ে এসো না যেন। ইতি-শুভার্থী অগ্নীশ্বর।

।। ছয় ।।

পাসপোর্ট না থাকা সত্ত্বেও কি করিয়া আমি লণ্ডনে পৌঁছিলাম. কি করিয়াই বা আমি সেখানকার পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করিলাম এ সবের বিশদ বিবরণ এ কাহিনীর পক্ষে অবান্তর অবশ্য ইহা কল্পিত কাহিনী নহে, আমার জীবনেরই কাহিনী, কিন্তু কাহিনীর এই অংশটুকু আমার প্রাণদাতা ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি তর্পণ। তাঁহার নিকট আমি যে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ, অক্ষম লেখনীতে তাহার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া সে ঋণ ই শোধ করা সম্ভব নয় তাহা আমি জানি. এ প্রয়াসও যে হাস্যকর সে বোধও আমার আছে কিন্তু আমার দিক হইতে ইহার কৈফিয়ত ইহা লিখিয়া আমি তৃপ্তি পাইতেছি।

পাসপোর্ট না থাকা সত্ত্বেও আমি লণ্ডনে পদার্পণ করিতে পারিয়াছিলাম। সেই সাহেব এর সহায়তায়। আর সেই ডাক্তারবাবুটি যিনি এফ. আর. সি. এস পড়িতে যাইতেছিলেন, তাহার নিকটও আমি অসীম ঋণে ঋণী। তিনি আমাকে তাহার দাদার বাসায় লইয়া যান এবং বলেন, আমি দেশ হইতে এই গরীবের ছেলেটিকে লইয়া আসিয়াছি. ভালো রান্না করিতে পারে। যদি

কোন সুযোগ পায় এখানে লেখাপড়া বা কোনও কাজকর্ম শিখিবে। আগেই বলিয়াছি তাঁহার দাদা একজন বড় পুলিশ অফিসার ছিলেন, বিখ্যাত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ট্রেনিং লইতেছিলেন। খাদ্যরসিক ব্যক্তি ছিলেন তিনি। আমি তাঁহাকে নানারকম দেশী তরকারি রাঁধিয়া খাওয়াইতে লাগিলাম। সুক্তো, শাকের ঘণ্ট, তিতার ডাল, মোচার ঘণ্ট প্রভৃতি লণ্ডনে দুষ্প্রাপ্য তরকারিগুলি খাইয়া তিনি খুবই খুশী হইয়া উঠিলেন। বস্তুত, উদর-পথে প্রবেশ করিয়াই আমি তাঁহার হৃদয়ে স্থান লাভ করিলাম। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন সে স্থান হইতে আমি চ্যুত হই নাই। কিছুদিন থাকিবার পর তাঁহার নিকট আমি আমার মনোভাবটি প্রকাশ করিলাম। তিনি কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, আচ্ছা ব্যবস্থা করিয়া দিব। বিলাতে অনেক প্রাইভেট ডিটেকটিভ প্রতিষ্ঠান আছে। এই রকম একটি প্রতিষ্ঠানের কর্তার সহিত তাঁহার হৃদ্যতা ছিল। সেইখানেই তিনি আমাকে ঢুকাইয়া দিলেন। সেই প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতে করিতেই আমি আমেরিকা যাইবার সুযোগ পাই। এই প্রতিষ্ঠানের কর্তারও আমি প্রিয়পাত্র হইয়াছিলাম, তাঁহার সুপারিশে সেখানে একটি বৃহত্তর পুলিশ বিভাগে আমার একটি চাকরি জুটিয়া গেল। কিছুদিন চাকরি করিবার পর বাধিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। তখন যুদ্ধেই আমি গোয়েন্দা বিভাগে কাজ পাইয়া গেলাম। পৃথিবীর নানাস্থানে ঘুরিবার সুযোগ পাইলাম। কার্যে শুধু যে দক্ষতা অর্জন করিলাম তাহা নহে, বেশ সুনামও হইল। জঙ্গী বিভাগের বড় বড় অফিসাররা আমার কাজের প্রশংসা করিয়া সার্টিফিকেট দিলেন। এই যুদ্ধের সময়ই ভারতীয় বিপ্লবীদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য আমাকে ভারতবর্ষে বড় চাকরি দিয়া বদলি করা হইল। আমেরিকান সরকারের সুপারিশেই বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আমাকে এই চাকরিটি দিলেন। আমি আসিয়া বিপ্লবীদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। সে সময় আমি কি করিয়াছিলাম তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিব না।

বাংলাদেশে ফিরিয়াই আমি ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের খোঁজ করিয়াছিলাম। খোঁজ করিয়া যতটুকু খবর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম তাহা পূর্বেই লিখিয়াছি। তাঁহার শেষ খবর পাইয়াছিলাম তিনি পুত্র-পুত্রবধূকে সংসারের সম্পূর্ণ ভার দিয়া কোনও হাসপাতালের ডাক্তার হইয়া গিয়াছেন। সেইখানেই নাকি আধুনিক পদ্ধতিতে বাণপ্রস্থ জীবনযাপন করিবেন। সেইখানেই গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিব ঠিক করিয়াছিলাম। কিন্তু ছুটি পাইতেছিলাম না বলিয়া হইয়া ওঠে নাই।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়া গেল।

আমরা অখণ্ড স্বাধীনতা চাহিয়াছিলাম, পাইলাম খণ্ডিত স্বাধীনতা। ঠিক তাহার পূর্বেই ডাইরেক্ট অ্যাকশনের উন্মত্ত তাণ্ডবে দেশের মাটি দেশের লোকের রক্তেই রঞ্জিত ও সিক্ত হইল। আমার পরিচয় ছিল মুসলমান, সুতরাং আমি পূর্ব-পাকিস্তানে নীত হইলাম। ইহাতে আমার দুঃখ হয় নাই। কারণ পূর্ব-পাকিস্তানকে আমি এখনও বাংলা দেশ বলিয়াই মনে করি। আমার প্রথম যৌবনের লীলা-ক্ষেত্র ওই পূর্ব-বঙ্গ, স্বাধীনতা মন্ত্রে ওইখানেই আমি দীক্ষা লইয়াছিলাম। অশ্বিনী দত্ত, পুলিন দাস, শান্তি দাস, প্রীতি ওয়াদ্দেদার, সূর্য সেন এবং আরো অসংখ্য বিখ্যাত-অখ্যাত আত্মত্যাগী বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গনাদের জন্মভূমি যে দেশ, সে দেশকে রাজনৈতিকরা যে নামেই অভিহিত করুন, আমার কাছে তাহা বাংলা দেশ। র‍্যাডক্লিফ দেশের

মাটির উপর একটি লাইন টানিয়া দিলেই কি দেশের আত্মা বিভক্ত হইয়া যাইতে পারে? পারে না। পাকিস্তানে গিয়া আমার মনে হইয়াছিল মায়ের কোলেই ফিরিয়া আসিলাম।

কিন্তু ডাক্তার অগ্নীশ্বরের নিকট হইতে আমাকে অনেক দূরে চলিয়া যাইতে হইল। তাঁহার হাসপাতালের যে ঠিকানা পাইয়াছিলাম তাহা উত্তর প্রদেশের শেষ সীমান্তে হিমালয়ের কাছাকাছি।

স্বাধীনতা পাইবার অনেকদিন পরে তাঁহার সন্ধানে বাহির হইবার সুযোগ হইল। সেখানে পৌঁছিয়া কিন্তু হতাশ হইলাম। শুনিলাম বছর খানেক পূর্বে তিনি কাজে ইস্তফা দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। চলিয়া আসিবার কারণ যাহা শুনিলাম তাহাতে মনে হইল, অগ্নীশ্বরের উপযুক্ত কাজই হইয়াছে। একমাত্র অগ্নীশ্বরই ইহা পারেন।

হাসপাতালটি আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের নামের সহিত যুক্ত। নামটা আমি আর করিব না। সেখানে অগ্নীশ্বর সুখেই ছিলেন। কিন্তু একদিন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

তিনি একটি গরীব রোগীর অপারেশন করিবেন বলিয়া আগের দিন হইতে তাহাকে ঔষধ এনিমা প্রভৃতি দিয়া একটি আলাদা খালি ঘরে রাখিয়াছিলেন। পরদিন গিয়া দেখেন রোগী সেখানে নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোথা গেল।" হাসপাতালের ছোট ডাক্তারবাবু বলিলেন, "মহারাজের আদেশে তাহাকে জেনারেল ওয়ার্ডে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।"

'কেন?'

"হাসপাতালের একজন বড় পেট্রন আসবেন। টেলিগ্রাম করেছেন, তাঁর জন্যে যেন একটা ঘর খালি রাখা হয়। অন্য ঘর ছিল না, তাই ওই রুগীটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

অগ্নীশ্বর মহারাজের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যাপারটা সত্য কিনা। হাসপাতালের যিনি অধ্যক্ষ তাঁহাকে সকলে মহারাজ বলিয়া ডাকিত। মহারাজ বলিলেন, "কি করব বলুন, উনি অতবড় লোক, তায় আমাদের একজন পেট্রন। তাঁর অনুরোধ এড়ানো শক্ত। যেখানে আপনার রুগীকে দিয়েছি সে বেডটাও ভালো, বেশ ফাঁকা—"

"ভালো কি মন্দ সেটা আমি ঠিক করব। যাক, আমার এখান থেকেও চাকরিটা গেল তাহলে। এতবড় মহাপুরুষের নামে হাসপাতাল, এখানেও ধনী দরিদ্রের ভেদ! এখানে আমার থাকা পোষাবে না। কালই আমি চলে যাব।"

মহারাজ তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'দেখুন, অপরের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে আমাদের চলতে হয়, যারা দাক্ষিণ্য দেখান তাঁরা কিছু সুবিধাও প্রত্যাশা করেন। সুতরাং আমরা নিরুপায়।"

অগ্নীশ্বর উত্তর দিয়াছিলেন, "তা বুঝতে পারছি। ওদেশে কিন্তু ওরা এমন নিরুপায় হয় না। আমেরিকার মেয়ো ব্রাদার্সের ক্লিনিকের ইতিহাস পড়ে দেখবেন। সেখানে আমেরিকার প্রেসিডেন্টও যদি যান, তাঁর জন্যেও কোন পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয় না। তিনি চানও না।"

অগ্নীশ্বর সেখান হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু কোথায় যে গিয়াছেন তাহা কেহ বলিতে পারিল না। নিকটেই একটা শহরে একটা হোটেলে কিছুদিন ছিলেন শুনিলাম। সেখানে গিয়াও তাঁহাকে পাই নাই। অবশেষে তাঁহার ছেলের নিকট গিয়া হাজির হইলাম একদিন। ছেলে যাহা বলিল তাহা আরও বিস্ময়কর।

সে বলিল, "বছর চারেক বাবার কোনও খবর জানি না। তিনি তাঁর পেন্‌সন্ অর্ধেকটা অগ্রিম নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যে চিঠিটা সেই সঙ্গে লিখেছিলেন সেটা দেখাতে পারি আপনাকে, যদি দেখতে চান।

চিঠিতে লেখা ছিল—

কল্যাণবরেষু,

আমি আর তোমাদের কাছে ফিরব না। চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখলুম, তথাকথিত ভদ্রসমাজে কোথাও আমাব স্থান নেই। কোথাও নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলুম না। হতচ্ছাড়া দেশকে গালাগালি দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আবার হঠাৎ আবিষ্কার করেছি, এই দেশকেই ভালোবাসি এর শত দোষ সত্ত্বেও। এ দেশ ছেড়ে কোথা যাব। তাই ঠিক করেছি, তোমরা যাদের অপাংক্তেয় করে রেখেছ তাদের মধ্যে গিয়েই এবার থাকব। বিদ্যাসাগর মশাই শেষ জীবনে সাঁওতালদের মধ্যে এসে বাস করেছিলেন। তিনি নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন তোমাদের ভালো করতে গিয়ে, আমি নাস্তানাবুদ হয়েছি কিছু না করেই। তাই ঠিক করেছি, যে কটা দিন বাঁচি ভদ্রসমাজের আওতা থেকে দূরে থাকব। জানি না তুমি কোনও কালোবাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছ কিনা, যদি না হয়ে থাকো আশ্চর্য হব। কালোবাজারের আলকাতরা তো সকলের গায়েই লেগেছে। কালোবাজারের আঁস্তাকুড়ে যাদের কিলবিল করতে দেখি, তারা তো সবাই সাহেবী পোশাক-পরা ভদ্রসন্তান। তাদেব তোমরা বয়কট্ কর না, বরং সেলাম কর, কাবণ তারা ধনী। গুণীদেব নয়, ধনীদের পূজো করাই ভদ্রসমাজেব রেওযাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি দূর থেকে প্রণাম করে সে সমাজ থেকে সরে পড়েছি।

আমাকে খোঁজবার চেষ্টা কোরো না। যে মহাসমুদ্রে এবার গা ভাসিয়ে দিতে চললুম, তার চেয়ে বড় সমুদ্র ভূগোলে নেই। এ সমুদ্রের ঢেউ দীন হীন আর্ত অসহায়েরা। এদেব ত্রাণ করবার জন্যেই ভগবান নাকি মাঝে মাঝে মর্ত্যে অবতীর্ণ হন, তাঁরও খোঁজ করবার ইচ্ছে আছে।

আমার পেন্‌সনের অর্ধেকটা 'কমিউট্' করে দিয়ে গেলাম তোমাকে। আশীর্বাদ জেনো সকলে। ইতি—

শুভার্থী অগ্নীশ্বর

ইহার বেশী আর কিছুই জানিতে পারি নাই। আসিবার সময় তাঁহার ছেলের নিকট হইতে তাঁহার একটি ফোটো জোগাড় করিয়া আনিয়াছিলাম। সেইটেই আমার শুইবার ঘরের একমাত্র ছবি। সকালে উঠিয়া ছবি দেখি, আবার রাত্রেও সেই ছবি দেখিয়া শুইয়া পড়ি।

অগ্নীশ্বরের কাহিনী শেষ হইল। কিন্তু তিনি আমার কাছে আজও অশেষ। ঋগ্বেদের ঋষি বলিয়াছেন—অগ্নি পরমাত্মার সঙ্কেত, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা সে অগ্নির আহুতি। অগ্নি নিজে বলিয়াছেন, 'আমি দেব, যেখানে দেব-ভাব নাই সেখানে আমি থাকি না, যে যজ্ঞস্থল অপবিত্র সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমি শুষ্ক অরণীর মধ্যে আত্মগোপন করি। যে আমাকে প্রার্থনা করে, সেই আমাকে দেখিতে পায়। তাঁহার নিকটই আমি অমৃতরূপে প্রকাশিত হই। আমি শুধু পৃথিবীতেই নিবদ্ধ থাকি না, দ্যুলোকেও আমি নিয়ত গমন করি। সেখানে সূর্যই আমার সঙ্গী,

তাঁহারই সহিত আমি পৃথিবীকে রূপ হইতে রূপান্তরে লইয়া যাই নানা ঋতুতে। আমি পবিত্র করি, অলঙ্কৃত করি এবং ধ্বংসও করি। যাহা নশ্বর তাহাকে দগ্ধ করিয়াই আমি বিকীর্ণ করি অবিনশ্বর জ্যোতি, যাহা অম্লান, নিষ্কলুষ, চিরদীপ্ত।'

ছবিটির দিকে চাহিয়া আমি অগ্নির এই ভাষা যেন শুনিতে পাই। যেন দেখিতে পাই, তিনি এক জ্যোতির্ময় অনন্ত পথে ঋজুপদবিক্ষেপে চলিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখে নিবদ্ধ, তাঁহার মস্তক আকাশ স্পর্শ কবিযাছে, তাঁহার রূপে দিঙমণ্ডল উদ্ভাসিত।

আমি নির্বাক হইয়া চাহিয়া থাকি আর মনে মনে বলি,—

"হে অগ্নীশ্বর, তোমার নাম সার্থক, তোমার কর্ম সার্থক, তোমার জীবন সার্থক। তোমাকে আমি প্রণাম করি।"

সত্য সত্যই তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া আছে, কিন্তু কোথায় তিনি? অনেক খুঁজিয়াছি, কিন্তু কোন সন্ধানই তো পাইলাম না। তিনি মারা গিয়াছেন একথা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। অতবড় একটা আগ্নেয়গিরি সে কি লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্ষুদ্র প্রদীপের মতো নিবিয়া যাইতে পারে? বিশ্বাস হয় না।

কিন্তু কোথায় তিনি?

একটা কথা বলিতে ভুলিযাছি, পাকিস্তানে কিছুদিন থাকিবার পর আমি হিন্দুস্থানে চলিয়া আসিয়াছিলাম। এ কাহিনী বিহারে বসিয়া লিখিতেছি।

যে বেদের দল ধরা পড়িয়াছিল, জামিনে তাহাদের মুক্তি দেওয়া হয় নাই। যে দারোগা সাহেব তাহাদের ধরিয়াছিলেন, তিনি একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বলিলেন, "ওরা তো কিছুই কবুল করতে চাইছে না। সনাতন উপায় অবলম্বন করব কি?"

"কি উপায়—"

"মারধোর—"

"ওদেব বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পেয়েছ কি?"

"না। হাতেনাতে তো ধরা যায়নি। সন্দেহের উপর ধরা হয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা, সম্প্রতি যে ক'টা খুন হয়েছে তা ওরাই করেছে।"

"এ ধারণা হল কেন তোমার—"

"ওরা যেখানেই গেছে সেখানেই খুন হয়েছে। লালারাম, বিশ্বেশ্বর ঘোষ, রাঘব দালাল, জাফর আলী এদের প্রত্যেকের বাগান বাড়িতে ওই মেয়ে তিনটে নাচগানও করেছে—"

"ক'টা মেয়ে আছে?"

"তিনটে। মানে, তিনটেকে আমরা ধরেছি। কিন্তু শুনছি নাকি ওদের দল সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। অদ্ভুত ওদের মোহিনী শক্তি, সার। জেলের ওয়ার্ডারগুলোকে সব বশ করে ফেলেছে। আমার মনে হয় বেশীদিন ওদের আটকে রাখা যাবে না, জেল থেকে ঠিক ওরা পালাবে। ওই ওয়ার্ডাররাই ওদের ছেড়ে দেবে। আজ সকালে দেখি সেলের ভিতর একটা মেয়ে গান গাইছে, আর ওয়ার্ডারগুলো বাইরে বসে তাল দিচ্ছে। আমার মনে হয় সনাতন উপায় অবলম্বন না করলে ওদের কাছ থেকে কিছুই বার করা যাবে না—"

সনাতন উপায়ের নিদারুণ অভিজ্ঞতা আমার নিজেরই ছিল, সুতরাং আমি কোন কারণেই কোন কয়েদীর উপর শারীরিক অত্যাচার করিতে দিতাম না।

"না, মারধোর কোরো না। সেটা আইন নয়।"

"কিন্তু এমনিতে ওরা কিছু বলতে চায় না। মেয়ে তিনটি খালি মুচকি মুচকি হাসে, আর ওদের দলপতি খা-খা বাবা বলেন, আমি কিছু বলব না। আমার মনে হয় ওই লোকটাই সমস্ত অর্গানিজেশনের ব্রেন। মেয়ে তিনটে প্রায়ই যেতো ওঁর কাছে।"

"খা-খা বাবা থাকেন কোথায়? মুঙ্গেরেই?"

"না, মুঙ্গেরে আমরা ওকে ধরেছি, কিন্তু উনি মাত্র সাতদিন আগে সেখানে এসেছেন। মেয়ে তিনটেও ওঁর বাড়িতেই ছিল। তারা বলে, উনি নাকি ওষুধ দেন। যাই হোক, আমরা সবাইকে ধরে এনেছি। প্রমাণ কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু আমার বিশ্বাস এই চারটে খুনের মূলেই ওরা আছে।"

"আচ্ছা, ওদের সঙ্গে আমিই কথা কইব। এইখানেই নিয়ে এস।"

একটু পরেই দারোগা আসিয়া খবর দিলেন, "ওদের এনেছি। পাশের ঘরে বসাব?"

"বসাও।"

আমি বিবাহ করি নাই, প্রকাণ্ড কোয়ার্টারে একাই থাকিতাম। ঘরের অভাব ছিল না। আমার অফিসও আমার কোয়ার্টারেরই একধারে ছিল।

একটা রিভলভার পকেটে পুরিয়া পাশের ঘরে গেলাম। গিয়া কিন্তু চমকাইয়া উঠিলাম। খা-খা বাবা? এ যে ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়। মেয়ে তিনটিও অপরূপ, যেন তিনটি অপ্সরা। নির্নিমেষে খা-খা বাবার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। না, আমার ভুল হয় নাই। এ ছবি যে রোজ দেখি।

দারোগা সাহেবকে বলিলাম, "আমি একে একে এদের সঙ্গে কথা বলব। মেয়ে তিনজনকে অন্য ঘরে বসাও। তুমিও ওদের কাছেই থাক গিয়ে, এখানে কাউকে থাকতে হবে না।"

সকলে চলিয়া গেলে প্রশ্ন করিলাম, "আমাকে চিনতে পারছেন?"

খা-খা বাবা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "কই না, আপনাকে কখনও দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"আমি কিন্তু আপনাকে চিনেছি। আপনি খা-খা বাবা নন, আপনি ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়।"

তাঁহার মুখে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, "না, আপনার ভুল হয়েছে। চেহারার সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব নয়। আমি অগ্নীশ্বর নই, আমি খা-খা বাবা।"

"এ রকম অদ্ভুত নাম নিয়েছেন কেন?"

"যে নাম নিয়েছি, সে নামের উপযুক্ত আমি নই। কিন্তু আপনারা রোগা ভীতু ছেলের নামও তো বীরেন্দ্র বা রুস্তম রাখেন। এইটেই রেওয়াজ এদেশে। যার অন্তরে বাইরে ময়লা ঠাসা তার নাম নির্মল, বিমল বা অমল। দিগ্বিজয়ী বীর চেংগীস্ খাঁর নাম ছিল খা-খা খাঁ। আমার বাবা বোধহয় ভেবেছিলেন, আমি দিগ্বিজয়ী বীর হব তাই ও নাম রেখেছিলেন।"

"আপনারা কি মুসলমান?"

"না, আমি ব্রাহ্মণ। ও খাঁ শুনে মুসলমান ভাবছেন বুঝি? চেংগীস খাঁও মুসলমান ছিলেন না। সেকালে যাযাবর নোম্যাডদের যারা দলপতি হতেন তাদের উপাধি হতো খাঁ। কিম্বা খান। চেংগীস খাঁ নামটাও আসলে নাকি ঘেংগিংস খা—"

কথা শুনিয়া আমার আর সন্দেহ রহিল না। এ রকম কথা অগ্নীশ্বর ছাড়া আর কেহ বলিতে পারেন না।

বলিলাম, "চেহারার সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব নয়, তা জানি। কিন্তু অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়কে চিনতে পারব না, এতবড় ভুল আমার হতে পারে না।"

"আপনার এতবড় আত্মপ্রত্যয়ের হেতুটা কি?"

"তিনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর ছবি আমার শোবার ঘরে টাঙানো আছে।"

"প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন? কি রকম?"

"সব বলছি। আপনি অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায় এ বিশ্বাস যদি আমার দৃঢ় না হতো তাহলে যা বলতে যাচ্ছি তা আপনাকে বলতুম না। কারণ এ কথা [illegible] আমার চাকরি যেতে পারে। দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে, তবু যেতে পারে। কারণ আমি যা করেছি তা প্রতারণা।"

অগ্নীশ্বর চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে একটা কৌতূহল ফুটিয়া উঠিল। আমি তখন তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সব খুলিয়া বলিলাম। শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে তাঁহার চোখের পাতায় কম্পন জাগিল, মুখে মৃদু হাসিও ফুটিল, কিন্তু সব শুনিবার পরও তিনি বলিলেন, "আপনি যার কথা বলছেন আমি সে লোক নই।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তখন তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, "তাহলে আপনার আসল পরিচয় তাহলে জানাতে পারি কি? আপনি কি করেন, কোথায় থাকেন, এই দলকে কি করে পেলেন? পুলিশ আপনার বিরুদ্ধে যে সব চার্জ এনেছে সে সম্বন্ধে আপনার কিছু বলবার আছে কি না?"

"আমি আমার সম্বন্ধে কিছুই বলব না। সত্য আপনিই বেরিয়ে পড়বে। এইটুকু বলতে পারি, যে মেয়ে তিনটিকে ধরে এনেছেন তারা আমার কন্যাস্থানীয়।"

"ওদের নিয়ে আপনি বেদের দল গড়েছেন?"

"ধরুন গড়েছি। তাতেই বা ক্ষতি কি?"

"আপনার মতো লোক বেদের দল গড়েছেন এ কথা বিশ্বাস [illegible] হচ্ছে না।"

"কেন, বেদেরা কি হেয়? ওরাই তো সবচেয়ে বেশী স্বাধীন। ওদের কোনো বন্ধন নাই। বন্ধনের যে দু'টো প্রধান শিকল, কর্তব্য আর সম্পত্তি, সে দু'টো কথাই নেই ওদের অভিধানে। ওদের সঙ্গে যদি যোগ দিয়ে থাকি অন্যায়টা কি হয়েছে তাতে?"

"আপনাদের চলে কি করে?"

"ওই মেয়ে তিনটি নেচে গেয়ে অনেক টাকা রোজগার করে। ওদের গান শুনবেন?"

"না। কিন্তু আপনি যা বলেছেন তা মেনে নিচ্ছি না। আপনি সে ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুকুজ্যে এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আপনি যদি বেদের দল গড়েও থাকেন তাহলে তার পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। হয়তো সেটা ন্যায়সঙ্গত নয়। আপনি আমাকেও অন্যায়ভাবেই

ছেড়ে দিয়েছিলেন. কিন্তু তার পিছনে একটা দেশভক্তির প্রেরণা ছিল। এর পিছনেও নিশ্চয়ই কিছু আছে একটা। সেইটে কি আমি জানতে চাই। বিশ্বাস করুন, আমার দ্বারা আপনার কোন অনিষ্ট হবে না। কিন্তু সত্যকথাটা আমি শুনতে চাই। যে অগ্নীশ্বরকে আমি মনের মন্দিরে দেবতার মতো সাজিয়ে রেখেছি তাকে এমনভাবে বিসর্জন দিতে পারব না।''

অগ্নীশ্বরেব ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত হইল।

''দেবতার মতো সাজিয়ে রেখেছেন? সত্যি?''

''সত্যি। আপনার সত্য পরিচয়টা দিন।''

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া অগ্নীশ্বর বলিলেন, ''একটা জিনিস যদি লক্ষ্য করে দেখেন, তাহলে হয়তো সত্যের কিছু আভাস পেতে পারবেন। যে চারটে লোক খুন হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই দেশের শত্রু, প্রত্যেকেই ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার। লক্ষ লক্ষ গরীব লোককে বঞ্চিত করে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছে ওরা—''

''তাহলে কি—''

''হ্যাঁ, মনে করুন না তাই। আমি বাঙালী, বিদ্রোহ আমার মজ্জাগত। মনে করুন, দেশের শত্রু নিপাতের আমি অভিনব পন্থা বার করেছি। ধরুন আমাব মনে হয়েছে স্বাধীনতা অর্জনেব জন্য যে বাঙালী একদিন ইংরেজের সঙ্গে লড়েছিল এইবার তার দুর্নীতির সঙ্গে লড়া উচিত। যদি দরকার হয় তার জন্য প্রাণ দিক—''

তাহার পর কিছুক্ষণ থামিয়া বলিলেন, ''আমি আমার শেষ জীবনে দেশকে শত্রুমুক্ত করবার এই উপায় অবলম্বন করেছি এই ভেবে যদি আপনি তৃপ্তি পান, তাহলে তাই ভাবুন—''

''আমরাও তো আইনের সাহায্যে ওই কাজই করছি। দুর্নীতি দমন আমাদের একটা প্রধান কাজ—''

''তা জানি। কিন্তু এটাও তো মিছে কথা নয় যে, সবাই আপনাদেব জালে ধরা পড়ছে না। শুম্ভ-নিশুম্ভ, মহিষাসুর এরাও সাধারণ আইনের জালে ধরা পড়েনি। তাদের ধ্বংস করবার জন্যে অম্বিকা চণ্ডীর দরকার হয়েছিল। মনে করুন, আধুনিক উপায়ে আমি তাই করছি। ওই বেদের মেয়েদের মধ্যেই অম্বিকা আর চণ্ডীর রূপ প্রত্যক্ষ করেছি আমি—''

''কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণ, এই সব নৃশংস ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া কি আপনার সাজে?''

''ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে আপনার পুরো ধারণা নেই তাহলে। নৃশংসতার ভয়ে ব্রাহ্মণেরা কোন কালে অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে পিছপা হয়নি। পরশুরামকে কুঠার ধারণ করতে হয়েছিল, চাণক্যকে ষড়যন্ত্র করতে হয়েছিল নন্দবংশ ধ্বংস করবার জন্যে। এদেশে ব্রাহ্মণদের অধঃপতন হয়েছে বলেই এত দুর্দশা চতুর্দিকে। মনু পতিত ব্রাহ্মণদের অপাংক্তেয় করেছিলেন কিন্তু এরাই আজ আসর জাঁকিয়ে বসেছে সব জায়গায়। ধরুন, যদি আমি ভেবে থাকি যে আমাদের স্বাধীনতাকে অম্লান অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে এদের সরাতে হবে, তা করতে গিয়ে যদি দু'একটা ভালো লোকও মারা পড়ে তাতেও ক্ষতি নেই, ফ্রেঞ্চ রিভল্যুশনের সময় ওরা রোব্‌সপেয়ার ড্যানটনের মতো লোককেও বলি দিয়েছিল।''

হঠাৎ অগ্নীশ্বর চুপ করিয়া গেলেন।

বলিলাম, "বলুন, শুনতে খুব ভালো লাগছে। বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে ছেড়ে দেব—"

"দেখুন, জীবনে কখনও কারো কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিনি। আপনার কাছেও করছি না। আমাকে জেলে পুরে রাখলে বা ফাঁসি দিলে যদি আপনার চাকরির সুবিধা হয় তাহলে তাই করুন। ওই বেদের মেয়েদের সঙ্গে আমি নরকে যেতেও রাজি আছি। ওরা নরককেও স্বর্গ করে তুলবে। জিপ্‌সিদের ইতিহাস পড়েছেন? অনেকে বলেন, ওদের আদি নিবাস ছিল ভারতবর্ষ। আমার মনে হয়, ওরাই রামায়ণ মহাভারতের গন্ধর্ব। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট ওদের নিয়ে গিয়েছিলেন গ্রীসে। সেখান থেকে ওরা সারা ইয়োরোপে আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতি দেশে ওদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার হয়েছে তা অবর্ণনীয়। কিন্তু তবু ওরা প্রত্যেক দেশেই টিকে আছে এখনও। শুধু টিকে নেই, নেচে গেয়ে মাত করে রেখেছে প্রত্যেক দেশকে। ওদের রঙ ওদের রূপ ওদের শিল্প, ওদের সঙ্গীতনৈপুণ্য আজও অলঙ্কার হয়ে আছে প্রত্যেক দেশের। এই অবহেলিত অবজ্ঞাত কিন্তু দুর্জয়-প্রাণরসে-ভরপুর শিল্পীর দলে যদি ভিড়েই থাকি তাহলে ক্ষতি কি—"

আমার মনে হইল, আসল অগ্নীশ্বরকে এইবার যেন প্রত্যক্ষ করিলাম। দেখিলাম তাঁহার চোখের দৃষ্টি হাসিতে ঝলমল করিতেছে। অনেক দিন হইতেই তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিবার ইচ্ছা ছিল। উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "আমার ভুল ভেঙেছে। আপনার কথায় অবিশ্বাস করেছিলাম বলে আমাকে ক্ষমা করুন।"

সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন তিনি।

"একটা বক্তৃতার ধাক্কায় সব বদলে গেল! হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল অতবড় যুক্তির ইমারত? সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস হয়ে গেল, আমি ওই বেদে মেয়েগুলোর সাহায্যে লোক খুন করে বেড়াচ্ছি? উঃ, বক্তৃতার উপর কি ভক্তি, কি ভক্তি। একেবারে গদগদ হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে ফেললেন! হা হা হা হা—"

তাঁহার অট্টহাস্যে সমস্ত বাড়িটা যেন কাঁপিতে লাগিল। দারোগা সাহেব পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিলেন। আমি তাঁহাকে ইঙ্গিতে চলিয়া যাইতে বলিলাম। সত্যই আমি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বলিলাম, "আপনার কথায় অবিশ্বাস করিবার শক্তি আমার নেই। আপনার সত্য পরিচয়টা দিন—"

"কি হবে সত্য পরিচয় জেনে? পৃথিবীতে ক'টা জিনিসের সত্য পরিচয় জানেন?"

"না, তবু বলুন।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কিছুতেই যখন ছাড়বেন না, তখন শুনুন। আমি মশাই ডাক্তার। মানুষকে বাঁচানোই আমার কাজ, মারা নয়। দুরাত্মা, মহাত্মা সতী-অসতী যে কেউ আমার কাছে অসুস্থ হয়ে আসবে তাকেই আমি সুস্থ করতে চেষ্টা করব। নেপোলিয়নের সেই গল্পটা মনে আছে? একবার এক যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ন খুব বিব্রত হয়েছিলেন কতকগুলি মুমূর্ষু সৈন্য নিয়ে। তাদের খেতে দিতে হচ্ছে, অথচ তারা কোন কাজে লাগছে না। তখন তিনি আর্মি ডাক্তারকে ডেকে বললেন—'ওদের তুমি মেরে ফেল। কি লাভ ওদের বাঁচিয়ে রেখে।' ডাক্তার উত্তর দিয়েছিলেন—'আমার কাজ বাঁচানো, মারা নয়। আপনার হাতে

অস্ত্র আছে, নিধন করাই আপনার কাজ, আপনিই মেরে ফেলুন না ওদের। আমি পারব না।' আমি সেই ডাক্তারের সগোত্র। এই হতভাগা দেশের রুগ্ন, খিটখিটে, বদমাইস, বেকারগুলোকে বাঁচিয়ে লাভ নেই জানি, কিন্তু তবু ওদের বাঁচাবারই চেষ্টা করি। ও ছাড়া আর কিছু পারি না, জানি না। ওই জিপ্‌সি মেয়েগুলো আমার রুগী। আমার খগেশ্বর নাম ওদের মুখ দিয়ে বেরোয় না বলে ওরা আমাকে খাগা-বাবা বলতো। সেটা ক্রমশ খা-খা-বাবা হয়ে গেছে। নামটার একটা ঐতিহাসিক মহিমা আছে বলে ও নাম আমি ত্যাগ করিনি। আমি এক জায়গায় থাকি না, নানা শহরে ঘুরে বেড়াই। ওই জিপসিগুলো কিন্তু আমার সঙ্গ ছাড়ে না। যেখানেই যাই খুঁজে বার করে আমাকে। ওদের নিজের চিকিৎসা ওরা নিজেরাই প্রায় করে নিজেদের ওষুধ দিয়ে। হালে পানি না পেলে আমার কাছে যাওয়া আসা করে বলে আপনার বুদ্ধিমান অফিসারটি আমাকেও ওদের সঙ্গে জড়িয়েছেন। ভক্তিটা হঠাৎ কমে গেল, নয়? চললুম গুড্ বাই।"

পরে সত্যই প্রমাণিত হইয়াছিল যে, খগেশ্বর মুখোপাধ্যায় ডাক্তারিই করেন। গরীবের ডাক্তার তিনি। দীন দরিদ্র অসহায় যাহারা, তাহাদেরই তিনি চিকিৎসা করেন। যে যাহা দেয় তাহাই গ্রহণ করেন। মহত্ত্ব আস্ফালন করিয়া কাহারও কিছু ফেরৎ দেন না, জোর করিয়া কাহারও নিকট হইতে কিছু আদায়ও করেন না। সত্যই এক শহরে বেশী দিন থাকেন না। এক মাসের বেশী কোথাও না। সারা দেশময় তিনি ঘুরিয়া বেড়ান একবেলা খান, পরনে সাদা থান, গ ক্লথের পাঞ্জাবি, পায়ে চটি।

যে ভদ্রসমাজ হইতে তিনি চলিয়া গিয়াছেন, সেই ভদ্রসমাজ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই সম্ভবত তিনি খগেশ্বর নামের আড়ালে অজ্ঞাতবাস করিতেছেন।

এ অজ্ঞাতবাস হইতে তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করি নাই, কারণ বুঝিয়াছি ইহাতে তিনি কষ্ট পাইবেন।

কিন্তু আমি নিঃসংশয়ে জানি তিনি খগেশ্বর নহেন, অগ্নীশ্বর। তিনি যেখানে যে নামেই থাকুন না কেন, তিনি পাবক তিনি পবিত্র তিনি উজ্জ্বল।

তাঁহাকে বারম্বার প্রণাম করি।

মানসপুর

।। এক ।।

একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বিশ্বদীপ। সাধারণতঃ একা একাই তিনি ঘুরে বেড়ান যদিও এখানে অপরিচিত কেউ নেই, কিন্তু অতি পরিচয়ের সংকীর্ণ বেড়ার মধ্যেও ধরা দেয় না কেউ। মনে হয় সকলেরই সব কথা জানেন তিনি অথচ এ ও আবার মনে হয়, কিচ্ছুই জানা হয় নি। জানার আঙিনায় দাঁড়িয়ে অজানার আকাশকে অসীম বলে মনে হয়। কিন্তু ওই অসীমকে সীমার পরিধিতে টেনে আনবার চেষ্টাই তাঁর মনে মনে। মাঝে মাঝে ভাবেন সে চেষ্টা সফল হয়েছে বুঝি, কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারেন থই পাওয়া যাচ্ছে না। মুরুব্বী তার মস্ত বড় সহায় এখানে। তার সাহায্যে তাঁর জ্ঞানের পরিধি অদ্ভুত রকম বেড়ে গেছে। সমস্ত প্রকৃতির রহস্য অবগুণ্ঠন ধীরে ধীরে যেন খুলে যাচ্ছে। অনেক জিনিস জানতে পারছেন যা আগে জানতেন না। গাছপালা, আকাশ মেঘ, এমন কি কীটপতঙ্গও তাঁর মনের অনেক কাছে এসেছে। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে, তাদের কথা বুঝতে পারেন তিনি আজকাল। তাদের সঙ্গে গল্পও করেন মাঝে মাঝে। আগে এসব অসম্ভব বলে মনে হত। কিন্তু এখন সম্ভব হয়েছে। মনে হচ্ছে এখানে, এই মানসপুরে, সবই সম্ভব। আর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে সেদিন। অপ্সরীদের দেখা পেয়েছেন একদিন বধূসরা নদীর জলে। পদ্মের মতো ভাসছিল তারা বিশ্বদীপ বিস্ময় বোধ করছিলেন, নদীর জলে শ্বেতপদ্ম এল কোথা থেকে। অপূর্ব একটা হাওয়া বইছিল তখন, শিস দিচ্ছিল শ্যামা, নদীর বাঁকে ঘনিয়ে এসেছিল আশ্চর্য একটা নিরালা প্রহর। তার মনের কুয়াশাটা, মনের বিস্ময়টা, হঠাৎ যেন কেটে গেল আরও উজ্জ্বল বিস্ময়ের আলোকপাতে। পাঁচটি শ্বেতপদ্ম হয়ে গেল পাঁচটি অপ্সরী—তুফানী, তুহিনা, তরলা হাওয়া আর হিল্লোলা। তাকে দেখে তারা কিন্তু বিস্মিত হয়নি মোটেই। বলেছিল তুমি তো বিশ্বদীপ। তোমাকে তো আমরা চিনি। তুমি আমাদের চিনতে পারছিলে না দেখে মজা লাগছিল। বিশ্বদীপ বলেছিলেন, আমি ভেবেছিলাম তোমরা বুঝি পদ্ম। এই শুনে তারা কলকণ্ঠে যে ভাবে হেসে উঠেছিল তাতে মনে হয়েছিল যেন বিদুলার চম্পক-অঙ্গুলিগুলি বুঝি পিয়ানোর ঘাটে ঘাটে লঘু ছন্দে নেচে গেল। বিদুলার, হ্যাঁ বিদুলারই। অদ্ভুত ভালো পিয়ানো বাজাতে পারে সে। আশ্চর্য, এখানে, এই মানসপুরে, বিদুলা হারিয়ে যায়। থাকে কিন্তু প্রত্যক্ষলোকে নয়, পরোক্ষলোকের সীমা স্বর্গে। বিদুলা বিদুলার থাকে, যে দেশে থাকে সে দেশে শ্বেতপদ্মরা অপ্সরী হয়ে যেতে পারে না। তুফানী, তুহিনা তরলা, হাওয়া, হিল্লোলা পাঁচ জনে পাঁচ রকম। পাঁচ জনই সুন্দরী, কিন্তু প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য আছে। তুফানীকে দেখলেই মনে হয়, সত্যিই সে যেন একটা উদ্দাম ঝড়, কিন্তু ঝড়কে সে সংযত করে রেখেছে তার সর্বাঙ্গে। তার চোখে বিদ্যুৎ, হাসিতে বিদ্যুৎ, তার কৃষ্ণকুন্তল মেঘমালা যেন। মনে হয় এই বুঝি তুফান উঠল, কিন্তু ওঠে না। তুহিনার নামও সার্থক। তুহিনের মতোই সে। অসংখ্য অনুভূতির দৌরাত্ম্যকে সে জমিয়ে ফেলেছে যেন নিজের মধ্যে, রূপান্তরিত করেছে শীতল প্রসন্নতায়।

মৃদু প্রসন্ন হাসি চিকমিক করছে চোখ দুটিতে। চূর্ণকুন্তলে সূক্ষ্ম কম্পন আছে কিন্তু প্রগল্‌ভতা নেই। তরলা কিন্তু তরলা নয়। মনে হয় কঠিনা নামটা বেশী মানাত ওকে। চোখ মুখ দেখে মনে হয়েছিল বিশ্বদীপের, অপরূপ অপ্রত্যাশিত একটা তীক্ষ্ণতা যেন ঝকমক করছে, পৃথিবীর সমস্ত স্থূলতাকে বিদীর্ণ করে দিতে পারে যেন এক নিমেষে। তাকে দেখে একটা অবান্তর কথা মনে হয়েছিল বিশ্বদীপের। ও কি কেরানীর বউ হতে পারবে? তাঁর মনের কথা টের পেয়েছিল সে অদ্ভুতভাবে। বলেছিল, পারব। আমি সব পারি। আমার নাম তরলা ঠিকই দিয়েছ। যে কোনও পাত্রের আকার ধারণ করতে পারি অনায়াসে। হাওয়া সত্যিই হাওয়া। ছটফটে, দুরন্ত, দুষ্ট, কোথাও যেন থামবে না। সর্বাঙ্গে তার চঞ্চলতা, মূর্তিমতী পলাতকা যেন। ওর চঞ্চলতা শুধু যেন চঞ্চলতাই। কোন ছন্দ নেই। হিল্লোলাও চঞ্চলা, কিন্তু সে ছন্দোময়ী। তার হাসিতে, ভঙ্গীতে এমন কি চোখের পলকেও ছন্দ আছে। সর্বদাই সে হেলছে, দুলছে লীলাভরে---একবারও ছন্দ পতন হচ্ছে না। মাঝে মাঝে হিল্লোলা স্থির হয়ে যায়, আর আশ্চর্য, তখনও মনে হয় সে যেন তালে তালে দুলছে, নিস্পন্দও যেন স্পন্দিত হচ্ছে। বিশ্বদীপই এদের নামকরণ করেছেন, ভেবেছেন ওদের বিশিষ্টতাই বুঝি রূপায়িত হয়েছে নামগুলোতে। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে, না পারি নি। ওদের নামকে ছাপিয়ে যা উপচে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে তা ভাষা দিয়ে ধরা যায় না। ওরা মাঝে মাঝে ধরা দেয় বটে, কিন্তু আসলে ওরা অধরা।

একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বিশ্বদীপ। মনে মনে সঙ্গী খুঁজছিলেন। জানতেন খুঁজলে একজন-না-একজনকে পাওয়া যাবেই। মানসপুরে এইটেই সুবিধা। হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে এসে হাজির হলেন। মানসপুরে সব আছে, নদী, পাহাড়, প্রান্তর, ঝরনা, আরও অনেক কিছু যা এখনও আবিষ্কৃত হয় নি, কিন্তু যা যে-কোনও মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। পাহাড়ের সারি অনেক দিন দেখতে পাননি তিনি। হঠাৎ একদিন দেখলেন সবুজ প্রান্তরের ওপারে স্তব্ধ ঘননীল মেঘের মতো দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের শ্রেণী। স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে আছে যেন তাঁর দিকে। কিছুদিন পরে ওই পাহাড় থেকেই নেমে এসেছিল তিন জন পাহাড়ী। একজন খুব বলিষ্ঠ, শালপ্রাংশু মহাভুজ ব্যক্তি, মুখময় কালো গোঁফ দাড়ি, চোখ দুটি বড় বড় লাল লাল। কথা খুব কম বলেন, মাঝে মাঝে নিচের ঠোঁটটা নাড়ান আর ঠোঁটের নিচের দাড়িগুলো নড়তে থাকে। মুরুব্বী বলেছিল, খুব সংযমী লোক উনি। বছরে একবার একটি গণ্ডার খান। সারা বছর আর কিছু খান না। কথাটা অবশ্য অবিশ্বাস্য। পরে জানা গেল মুরুব্বী রূপক করেছে। উনি প্রতি বছর নাকি বিরাট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন একটা। একটার বেশী পারেন না। মানসিক আহারের কথা বলেছিল মুরুব্বী, আত্মার আহারের কথা। এঁরও নামকরণ করেছেন বিশ্বদীপ। সংস্কৃত ঘেঁষা ভারী নাম---অসাধ্যসাধন শর্মা। একজনের নাম সংস্কৃত-ঘেঁষা হওয়াতে ওজন মিলিয়ে বাকী দুজনের নামও ওইরকম রাখতে হল। শোনা গেল দ্বিতীয় পাহাড়ীটি নাকি সদাগর। নানারকম জিনিস-পত্র নিয়ে বাণিজ্য করেন দেশবিদেশে। ওই পাহাড়ের ওপারে নাকি মহাসাগর আছে। সেই সাগরে পাড়ি দেন তিনি। ছিপ-ছিপে ফরসা লোকটি। এঁরও দাড়ি আছে, নীল চোখ, অনেকটা যিশুখৃষ্টের মতো দেখতে। অথচ ইহুদী নয়। এ সত্ত্বেও বিশ্বদীপ ভেবেছিলেন এঁর নাম যিশু রাখবেন। কিন্তু সব দিক ভেবে ওজনদার

নামই রাখতে হল—শ্রীমন্ত-প্রতিম। তৃতীয় পাহাড়ীটি অদ্ভুত খেয়ালী গোছের। তিনি দ্বিতীয় পাহাড়ীর সঙ্গী, দুজনে সর্বদা একসঙ্গে থাকেন। যখন বিশ্বদীপ বললেন, উনি সদাগর, সাগরে পাড়ি দেন, তাই ওঁর নাম দিলাম শ্রীমন্ত-প্রতিম, তখন তৃতীয় পাহাড়ী তিনটি তুড়ি মেরে বললেন, খাসা নাম হয়েছে। খাসা, খাসা, খাসা। আলো ঝলমল করে উঠল তাঁর কালো চোখের তারায়, ভুরুর চুলে দখিন হাওয়া শিহরন তুলে নাচতে লাগল। তারপর একটু যেন প্রত্যাশাভরে বললেন, আমারও নাম করে দিন একটা। আমার কিন্তু কোনও গুণ নেই। কিন্তু একটা জিনিস আছে আমার, জানেন? অনেক নদী আছে আমার মনের ভিতর। কুলকুল করছে দিনরাত। যখনই আপনার শ্রীমন্তর সঙ্গে সাগরে পাড়ি দিই অমনি একটা না-একটা নদী বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাগরে। আর সেই সাগর-সঙ্গমে কি দেখতে পাই জানেন? কমলে কামিনী। আপনার শ্রীমন্ত দেখতে পায় না, ও খালি বাণিজ্যের কথা ভাবে। আমি পাই। আমার মনটাকে একটু একটু করে সাগরে বিলীন করে দিচ্ছি। এইটেই শুধু পারি। মনে হচ্ছে আমার সমস্ত সত্তাটা যেন মিশে যাবে শেষে সাগরের সঙ্গে। আমার কি নাম দেবেন? বিশ্বদীপ বললেন, সাগর-সঙ্গম থাক না। এই শুনে একটা পা তুলে বাউলের মতো নাচতে লাগল সে। আর বলতে লাগল, এটাই বা কি কম, রম্ ঝম ঝম্ ঝম্। তার ডান হাতটাও উঠে গেল শূন্যে। বিশ্বদীপের মনে হয়েছিল একটা একতারাও যেন ধীরে ধীরে মূর্ত হচ্ছে অদৃশ্য লোকের জাদুমন্ত্রে। অনেকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে ছিলেন বিশ্বদীপ। তারপর জিগ্যেস করেছিলেন, আপনাদের নিজেদের কোনও নাম নেই? সাগর-সঙ্গম অনেকক্ষণ ধরে হেসেছিল এ শুনে। তারপর বলেছিল, আমরা পাহাড়ের উপর থাকি যে, আকাশের কাছাকাছি, নামের আমাদের দরকার কি। আমরা পরস্পরকে ইশারায় ডাকি। তাতেই কাজ হয়। যখন হয় না, তখন বলি এই এই। ব্যস্, ওই যথেষ্ট। তুমি যে নামগুলো দিলে ওগুলো তোমার কাজে লাগবে। মাঝে মাঝে আমরা আসব। আসব, আসব, আসব। সাগর-সঙ্গম এক কথা তিনবার বলে জোর দেবার জন্য। সত্যিই মাঝে মাঝে আসে তারা। তখন বিশ্বদীপ মানসপুরের আর এক রূপ দেখতে পান।

.....নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন বিশ্বদীপ। পাহাড়গুলোর দিকে চাইলেন। বড় বেশী গম্ভীর, নির্বাক নিষেধের মতো। না, পাহাড়ীরা আজ কেউ আসবে না। নদীর তীরে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে মনে মনে একজন সঙ্গী খুঁজতে লাগলেন। মানসপুরে এমন তো কখনও হয় না। আতিথেয়তায় সে চিরবদান্য। দেহের খিদে পেলে খাবার এসে যায়, মনের খিদে পেলে সঙ্গী।.....

"নমস্কার—"

বিশ্বদীপ ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন একটি রূপসী নারী বধূসরা নদীর জলে আবক্ষ নিমগ্ন হয়ে রয়েছে। বিশ্বদীপের মনে হল মূর্তিমতী পবিত্রতা যেন।

"নমস্কার। আপনাকে চিনতে পারছি না তো। এর আগে দেখেছি কি?"

"দেখেছেন। কিন্তু অন্য রূপে। আমি বধূসরা। অনেকক্ষণ থেকে আমি বুঝতে পারছিলাম আপনি মনে মনে একজন সঙ্গী খুঁজছেন। আগেই আসতাম, কিন্তু আকাশের মেঘ প্রতিবিম্বিত হয়েছিল আমার জলে। তার সঙ্গেই কথা কইছিলাম।"

এতে বিশ্বদীপ অবাক হলেন না। তিনি জানেন মানসপুরে এ সবই স্বাভাবিক। তবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আকাশের সম্বন্ধে কথা নাকি।"

"না। আকাশেব খবর পাই নক্ষত্রদের কাছ থেকে। ভরণী রেবতী আর চিত্রার সঙ্গে খুব ভাব আমার। তারাই প্রায় আকাশের খবর বলে। মেঘ আজ একটা সুসংবাদ এনেছে। খুব চিন্তিত ছিলাম ক'দিন।"

ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট হল না বিশ্বদীপের কাছে।

বললেন, "ও, তাই নাকি। ব্যাপারটা কি?"

বধূসরা হেসে বলল, "দেনা-পাওনার ব্যাপার। সূর্যদেব রোজ হু হু করে আমার জল টেনে নিচ্ছেন। মেঘ হয়ে সে সব জল ঘুরে বেড়াচ্ছে ইন্দ্রদেবের এলাকায়। কিছু মেঘ যদি জল হয়ে ফিরে না আসে, তাহলে আমি বাঁচব কি করে? তাই মনে মনে ইন্দ্রদেবকে আবেদন জানিয়েছিলাম একটা। ওই মেঘটি এসে আজ খবর দিয়ে গেল, ইন্দ্রদেব আমাব আবেদন মঞ্জুর করেছেন। আদেশ দিয়েছেন সূর্য আর্দ্রা নক্ষত্রে প্রবেশ কবলে বর্ষা নামবে। মেঘেবা জল হয়ে ফিরে আসবে আমার কাছে। ওই দেখুন, আপনার সঙ্গী এসে গেছে একজন। আমি এখন চলি তাহলে। মাছেদের একটা সভা আছে এখন। সেখানে যেতে হবে আমাকে।"

"কই সঙ্গী?"

"ওই যে কলমীপাতার উপরে।"

বিশ্বদীপ দেখলেন কলমীপাতার উপর পোকা বসে আছে একটি। ছোট্ট কালো পোকা। মুরুব্বী আলাপ করিয়ে দিয়েছিল একদিন এর সঙ্গে। ওব ডানার উপর লাল লাল ফুটকি আছে বলে ওব নামকরণও করেছিল সে লাল-ফুটকি। লাল-ফুটকি হঠাৎ উড়ে এসে বসল তাঁর বুকের উপর। তারপর ভীতকণ্ঠে বলল, "তুমি এখান থেকে সরে চল একটু। ওই পাখীটার হাবভাব ভালো লাগছে না। অনেকক্ষণ থেকে ওর চোখ এড়িয়ে এড়িযে বেড়াচ্ছি। দেখতে পেলেই টপ করে খেয়ে ফেলবে আমাকে। আমি এতক্ষণ কলমীপাতার আড়ালে লুকিয়ে বসেছিলাম ওর ভয়ে। তোমাকে দেখে সাহস ক'রে বেরিয়ে এলাম কলমীপাতার তলা থেকে। চল এখান থেকে যাই—"

বিশ্বদীপ দেখলেন একটা টুনটুনি পাখী উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। 'ওর সঙ্গেও আলাপ করতে হবে একদিন ভাবলেন বিশ্বদীপ। "চল, চল, এখান থেকে চল"—পিঁ পিঁ পিঁ করে বলতে লাগল লাল-ফুটকি। অনবরত বলতে লাগল, বিশ্বদীপের মনে হল একটা ছোট্ট শানাই যেন পোঁ ধরেছে। লাল-ফুটকি ভারী ভীতু, ভয়টাই যেন ওর জীবনের মূলমন্ত্র, মনে হল বিশ্বদীপের। সবারই তাই নয় কি? এ কথাও মনে হল। উত্তরটাও পেয়ে গেলেন, সবার, মানে সব জানোয়ারদের। ইচ্ছে হল টুনটুনির সঙ্গে আলাপ হলে লাল-ফুটকিদের কথা নিয়ে আলোচনা করবেন। কিন্তু মুরুব্বীর সাহায্য না পেলে তো টুনটুনির সঙ্গে আলাপই হবে না। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল—রামু, টিটা, বিলুয়া, কয়লা, কানু, কুত্তা, কেশর আর ধাকড়ের কথা; মনে পড়ে গেল কেশিয়া, খুদরি, কাবা, সনঝা, শুকরি, শামা, শামার মা, বুলিয়া, খুদরির মা, চিকনি, চন্দা, মিশরী, মহুয়া আর বিবির কথা—তাঁর ফ্যাকটারির মজুর আর মজুরনী এরা। এরাও একদিন দাবি করেছিল আমাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, সুবিচার চাই। সুবিচার? সুবিচারের অর্থ কি! মনে পড়ল নীট্শের কথা, শক্তির বিচারই সুবিচার। শক্তি তার রূপ বদলাতে পারে, আধার বদলাতে পারে, কিন্তু তার বিচারই সুবিচার, কোন্টা সু কোন্টা কু এ

ঠিক কববাব অধিকাব একমাত্র শক্তিমানেবই আছে। ফ্যাকটাবিব কথা মনে পডতেই সব যেন আবছা হয়ে গেল, মনে হল মবীচিকাব মতো মানসপুব মিলিয়ে যাচ্ছে।

"আমাকে নিয়ে চল, নিয়ে চল নিয়ে চল এখান থেকে— ।" পিঁ পিঁ কবে অনবরত বলে চলেছে লাল ফুটকি।

আবাব মানসপুবে ফিবে এলেন বিশ্বদীপ। চলতে লাগলেন মাঠেব দিকে। দিগন্তবিস্তৃত বিবাট মাঠ। সবুজ ফসলে ঢেউ তুলে তুলে ছুটোছুটি কবছে পাগলা হাওযা। মাঠেব ওপাবে কাজ কবছে সিংহ। দুপুবেব কাঠফাটা বোদে কোদাল কুপিয়ে চলেছে, ক্রমাগত কুপিয়ে চলেছে, বোদ পডে মাঝে মাঝে চকচক কবে উঠছে কোদালেব শাণিত অংশটুকু। ক্রোধ, না দীপ্তি? অন্যমনস্ক ভাবে ঢুকে পডলেন তিনি মাঠেব মাঝখানে। একদল সবুজ ধানগাছ তাব হাঁটু ঘিবে দাঁডাল যেন উৎসুক হয়ে। লাল ফুটকিব পিঁ পিঁ ডাকটা থেমে গেল হঠাৎ। সে পট্ কবে কখন যে বিশ্বদীপেব বুক থেকে ধানক্ষেতেব বুকে লাফিয়ে পডেছে তা বুঝতে পাবেননি বিশ্বদীপ। চাবদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন আব দেখতে পেলেন না। আত্মগোপন কবেছে। দূবে সিংহ মাটি কোপাচ্ছে। তাব দিকেই অগ্রসব হলেন বিশ্বদীপ। অদ্ভুত লোক এই সিংহ। ওব আসল নাম কেউ জানে না, ওব মুখটা সিংহেব মতো বলে সবাই ওকে সিংহ বলে ডাকে। কুষ্ঠ হযেছে ওব। সমাজে কোথাও সম্মানেব আসন পায নি। বউ ছেলে মেয়ে আত্মীযস্বজনবা ওকে ত্যাগ কবেছে, না ওই তাদেব ত্যাগ কবে চলে এসেছে তা জানেন না বিশ্বদীপ। জানবাব উপায নেই কাবণ সিংহ এ বিষয়ে নীবব থাকতেই ভালোবাসে, নিজেব কথা কাবো কাছে বলতে চায না। রুদলবাবু ওকে আশ্রয দিয়েছেন, রুদলবাবু বলেন সিংহ তাব জীবনে একটা পবম প্রাপ্তি। রুদলবাবুব ভালো নাম রুদ্রেন্দ্রনাবাযণ। লোকে আদব কবে তাঁকে রুদলবাবু বলে ডাকে। বিহাবী ব্রাহ্মণ। মানসপুবেব লোক। মানসপুবে তাঁব অনেক জমি, বাগানও আছে একটা প্রকাণ্ড বড। যদিও বিহাবী কিন্তু বাংলা বলেন চমৎকাব। বিশ্বদীপেব সঙ্গে খুব ভাব। প্রাযই বলেন, 'আমাব ঘব আপনাব ঘব, আমাব জমি, আপনাব জমি, আমাব বাগান আপনাব বাগান। যখন খুশি আসবেন, যত দিন খুশি থাকবেন।' বিশ্বদীপ অনুভব কবেছেন তাঁব এ উক্তিব মধ্যে লোক দেখানো ভণ্ডামি বা লৌকিকতা নেই। রুদলবাবুব মুখেই তিনি সিংহেব আগমন বার্তা শুনেছিলেন। একবাব প্রচণ্ড বর্ষা হয়ে তাব গোলাপবাগান ডুবে গিয়েছিল। আশঙ্কা কবছিলেন অবিলম্বে জল বাব কবে দিতে না পাবলে গোলাপগাছগুলো মবে যাবে। চাকবও কেউ আসে নি সেদিন। মানসপুবে কেউ কাবও চাকব নয় খুশিমতো আসে, খুশিমতো কাজ কবে। প্রকৃতিব ইঙ্গিত-ইশাবা মেনে চলে তাবা। তাবা মনে কবে প্রবল বর্ষায প্রকৃতিই চায না যে তাবা কাজ করুক। প্রচণ্ড বোদে বা ভীষণ ঝডেও এই ইঙ্গিত পায তাবা। যেদিন চাবদিকে ফুল ফোটে সেদিনও। তবু কাজ হয়ে যায, কিছু বাকি পডে থাকে না। সেদিন কিন্তু রুদলবাবু ব্যস্ত হয়ে পডলেন। তাঁব মনে হল গোলাপগাছগুলো বাঁচবে না। নিজেই কোদাল হাতে কবে বেরুবেন ভাবছিলেন এমন সময দেখলেন কে একজন কোদাল দিয়ে কুপিয়ে বাগান থেকে জল বাব কবে দিচ্ছে। অবাক হয়ে গেলেন রুদলবাবু। এগিয়ে গিয়ে দেখলেন সিংহ একমনে কোদাল কুপিয়ে যাচ্ছে।

"কে তুমি?"

সিংহ কিছু না বলে একবার শুধু মুখ তুলে চাইলে তাঁর দিকে। শুধু চাইল। আর কিছু বলল না। কিন্তু তার থেকেই রুদলবাবু ওর সব কথা বুঝে গেলেন। বুঝে গেলেন মানবসভ্যতার সমস্ত গ্লানি, সমস্ত লজ্জা, সমস্ত ভণ্ডামি, সমস্ত স্বার্থপরতার মূর্ত প্রতীক ওই সিংহবদন লোকটা। বুঝে গেলেন বুদ্ধ, যিশু, চৈতন্য হেরে গেছেন, জিতেছে শুধু বারো-আনা-পশু সেই মানুষের দল যারা তাদের চার আনা মহত্ত্ব নিয়ে আস্ফালন করে শুধু, আর কিছু করে না, করতে পারে না, করতে চায় না। সিংহের মতো লোক তাদের সঙ্গে থাকতে পারেনি। তথাকথিত সভ্য মানুষদের ঘৃণা, লজ্জা, অনুকম্পা, ভয় বার করে দিয়েছে তাকে সমাজ থেকে। তার দলে আছে কালো কুৎসিত দরিদ্র মেয়েরা যাদের বিয়ে হয়নি, আছে সেই সব হতভাগ্য অসমর্থ যুবকেরা যারা মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে পারেনি বলেই রোজগার করতে পারে না, যারা মনুষ্যত্বের উপাসক বলেই বর্তমান সভ্যতার পঙ্‌ক্তি-ভোজনে স্থান পায়নি—এরা সবাই কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত। কারো কুষ্ঠ গায়ে ফুটে বেরিয়েছে, কাবো মনে, কারো জীবনে। এর জন্য ওরা কেউ দায়ী নয়, অথচ সবাই দায়ী করেছে ওদের। ওরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, লুকিয়ে লুকিয়ে। রুদলবাবু সিংহের সেই নীরব চাহনি থেকেই সব বুঝে গেলেন। বিশ্বদীপকে তিনি বলেছিলেন, "ওর ওই একটি চাহনি থেকেই সব বুঝে গেলাম আমি। কিন্তু একটা জিনিস তখন বুঝতে পারিনি। তখন বুঝতে পারিনি যে কুষ্ঠ কেবল ওর দেহেই নিবদ্ধ, আশ্চর্যরকম সুস্থ ওর মন, আশ্চর্যরকম সুন্দর ওর চরিত্র। যা কয়লার খনি বলে মনে হয়েছিল তার মধ্যে যে কয়লা নেই হীরে আছে, এটা আবিষ্কার করতে একটু সময় লেগেছিল।" সেদিন—আলাপেব সেই প্রথম দিন—অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন রুদলবাবু। কি যে বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। কয়েক মিনিট কাটবার পর আর একটা প্রশ্ন জাগল তাঁর মনে। মনে হল এটা জিগ্যেস করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"কোদালটা কোথায় পেলে?"

"আমারই কোদাল", সিংহ উত্তর দিয়েছিল একটু হেসে। তারপর বলেছিল, "আমার সমস্ত সংসার আমি কাঁধে করে নিয়ে বেড়াই। ওই যে—"

রুদলবাবু দেখলেন যে অশ্বত্থগাছটায় দোলনা টাঙানো আছে তারই তলায় সিংহের জিনিসপত্র রয়েছে। প্রকাণ্ড দুটো ঝোলা, আর লম্বা একটা লাঠি। লাঠির দুধারে ঝোলা দুটো ঝুলিয়ে সিংহ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায়। লাঠিটা বাঁকের মতো ব্যবহার করে। সিংহ এক জায়গায় থাকতে চায় না। মানসপুরে অনেক দিন আছে। কিন্তু এক জায়গায় থাকে না। কখনও এ গাছতলায় কখনও ও গাছতলায়, কখনও নদীর ধারে, কখনও ঝোপের পাশে। সিংহ বলল—এক জায়গায় একদিনের বেশী থাকলে মায়া বসে যায়। আর তাহলেই কষ্ট। অনেকদিন পরে রুদলবাবু সিংহের মুখে এই উক্তিটি শুনেছিলেন।

সেদিন—আলাপের সেই প্রথম দিনে—সিংহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আর একটি উক্তিও করেছিল। বলেছিল, "গোলাপগাছগুলো জলে ডুবে যাচ্ছে দেখে কষ্ট হল, তাই জলটা বার করে দিচ্ছি। আমার ছোঁয়া লেগে আপনার বাগানটার কুষ্ঠ হবে এ ভয় আশাকরি আপনার নেই।"

রুদ্দলবাবু ভালো লোক, তাই নির্ভীক। সিংহের মুখে একথা শুনে মনে মনে একটু অপমানিত বোধ করলেন। বললেন, "আমার ভয়ের কথা বলছ?"

"হ্যাঁ। মানুষরাই তো কুষ্ঠরোগীদের ভয় পায়। আর তো কেউ পায় না। আমি যে সব গাছতলায় বসেছি, তারা ছায়া দিয়েছে, ফলও দিয়েছে, ভয় পায় নি, ঘৃণাও করেনি। যে মাটিতে বসেছি সে কখনও বলেনি সরে বস। যাদের তোমরা পশু বল তারাও আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে বরাবর। একটা মহিষের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বই হয়ে গিয়েছিল। এ সব বিশ্বাস হচ্ছে না বোধ হয় আপনার—"

রুদ্দলবাবু এ ধরনের কথা শুনবেন প্রত্যাশা করেননি। কিন্তু শুনেই বুঝলেন তাঁর কল্পনা সীমাবদ্ধ, এতো সীমাবদ্ধ যে তাতে অপ্রত্যাশিতের স্থান আছে এখনও। চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। একটু ইতস্তত করে শেষে বলেছিলেন, "মানসপুরে তুমি থাক। আজ থেকে আমি তোমার বন্ধু হলাম।"

সেই থেকে সিংহ মানসপুরে আছে। কিন্তু থেকেও সে থাকে না অনেক সময়, খুঁজে পাওয়া যায় না তাকে। আজ এ গাছতলায়, কাল ও গাছতলায়। বিরাট মানসপুরে গাছও অনেক। প্রায়ই দেখা যায় সিংহ একটা গাছতলা থেকে আর একটা গাছতলায় যাচ্ছে কাঁধে তাব সংসার বয়ে। দারুণ দুপুরে ধু-ধু মাঠের ভিতর দিয়ে একা চলেছে, গায়ে মোটা আলখাল্লা। নানারংয়ের তালি দেওয়া অদ্ভুত আলখাল্লাটা। সিংহ যখনই কোন ন্যাকড়া রাস্তায় কুড়িয়ে পায় তখনই সেটা সেলাই করে নেয় তার আলখাল্লার উপর। তাই বেখাপ্পারকম জোড়াতালি-লাগানো চেহারা ওটার। যখনই স্থান পরিবর্তন করে তখনই গায়ে দেয় ওটাকে। অন্য সময় খালি গায়ে থাকে সে। শীতের সময়ও। এ বিষয়ে বিশ্বদীপের সঙ্গে আলোচনাও হয়েছিল তাব একদিন। বিশ্বদীপ জানতে চেয়েছিলেন শীতকালেও সে তার জামা গায়ে দেয় না কেন। এ কথা শুনে সিংহবদনে যে হাসি ফুটে উঠেছিল তা শুধু বীভৎস নয়, তা ভয়ংকরও। বিশ্বদীপের মনে হয়েছিল একটা ভয়ংকর আর্তনাদ যেন হাসিতে রূপান্তরিত হতে চাইছে। খানিকক্ষণ বিশ্বদীপের মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে বলেছিল, "শীতকালে স্বয়ং ভগবান সোনালী শাল পাঠিয়ে দেন। সেইটে গায়ে দিয়ে বসে থাকি। জামা গায়ে দিয়ে অসুখ ঢাকবার চেষ্টা আর করি না। সে চেষ্টা সফল হয় না। জামাটা পরি খালি 'জার্নি'র সময়, আমি যে মানুষ ছিলাম এই কথাটা ভুলতে পারি না। তাই জামা গায়ে দিই।"

'জার্নি' কথাটা খুব ভালো লেগেছিল বিশ্বদীপের। একটা গাছের তলা থেকে আর একটা গাছের তলায় যাওয়াটা সিংহের কাছে 'জার্নি' কিছু কিছু ইংরেজিও জানে তাহলে সিংহ!

"কেবল ওই জন্যেই জামা গায়ে দাও?"

"মানুষ ছাড়া আর কে জামা গায়ে দেয় বলুন। মানুষই কেবল খোদার উপর খোদকারি করেছে। পশুপাখী গাছপালা সবাই ভগবানের দেওয়া পোশাক পরে থাকে। মাঝে মাঝে ভগবানই তাদের পোশাকের খোলস ছাড়িয়ে দেন। কিন্তু মানুষের কাছে ভগবান হার মেনেছেন। ক'টা খোলস ছাড়াবেন, মানুষের যে অসংখ্য খোলস। নিজেরাই খোলস তৈরি করছে আর পরছে—"

সিংহ যখন কথা বলে তখন অনেক কথা বলে। আবার যখন বলে না, তখন একেবারেই বলে না।

বিশ্বদীপ যখন দেখতে পান সিংহ মাঠের মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলেছে এক গাছতলা থেকে আর এক গাছতলায় —তখন আর একটা কথা মনে হয় তাঁব। ও কি নিজেব কাছ থেকে পালাচ্ছে? সত্যি কি পালানো যায়?

আব একটা অদ্ভুত কাণ্ড কবে সিংহ। যখন বৃষ্টি পড়ে তখন বধূসরা নদীব জলে গা ডুবিয়ে বসে থাকে সে। বলে, "ভগবানের যখন ইচ্ছে আমাকে ভিজিয়ে দেবেন তখন ভালো করেই ভেজা যাক।"

তাব জিনিসগুলো মাঠে পড়ে ভেজে। তারপরে মাঠে পড়ে পড়েই শুকিয়ে যায় আবার রোদ উঠলে। সিংহ নির্বিকার। রুদলবাবু সিংহকে খেতে দিতে চান, রোজ কিছু খাবাব পাঠিয়ে দেন তাকে। কিন্তু সিংহ রোজ সে খাবার খায় না। সে যেদিন রুদলবাবুব কাজ কবে সেই দিনই তাঁর দেওযা খাবার খায়। স্বপাকে খেতে ভালোবাসে। ওর ওই ঝোলাব মধ্যে বাসনপত্র, লোহার উনুন সব আছে। রুদলবাবু তাই ওকে কাঁচা সিধে দেন রোজ। এই সব কথা ভাবতে ভাবতেই বিশ্বদীপ অগ্রসর হচ্ছিলেন সিংহের দিকে, ধানখেতেব ভিতর দিয়ে।

"আমাদের মাড়িয়ে দিচ্ছেন যে। আলের উপব দিয়ে যান না।"

অনেকগুলো ধানগাছ কলরব করে উঠল। বিশ্বদীপ আলের উপর উঠে পড়লেন তাড়াতাড়ি। কিন্তু সিংহের কাছে পৌঁছতে পারলেন না তিনি। ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ করে ফোনটা বেজে উঠল। ঘড়াং ঘড়াং ঘড়াং করে ভাঙা লরিটাতে স্টার্ট দিতে লাগল আফজল খাঁ ড্রাইভার। তীক্ষ্ণ আর্তকণ্ঠে কে যেন চীৎকার কবে উঠল—ও হো হো হো হো। তারপবই, রোক্কে, বোক্কে, রোক্ কে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল কলকাতা।

মানসপুর মিলিয়ে গেল।

।। দুই ।।

নিখুঁত সাহেবী পোশাক পরে বিশ্বদীপ তাঁর আপিস-ঘরে বসে ছিলেন ফোনের রিসিভাবটা তুলে।

"হ্যাঁ, আমি বিশ্বদীপ কথা বলছি। ধাকড়ের সঙ্গে কথা বলেছিলে? ও, আচ্ছা, তুমি চলে এস এখানে. হ্যাঁ আমি আপিসেই থাকব। একটা ট্যাক্সি নিয়েই চলে এস এখানে।"

পাইপটা কামড়ে বসে রইলেন বিশ্বদীপ।

"আসতে পারি?"

"আসুন। ও আপনি! ছবি হ'ল?"

"এঁকে এনেছি, দেখুন আপনার পছন্দ হয় কি না"

আর্টিস্ট নবনীবাবু তাঁর ব্যাগ থেকে ছবি বার করলেন একটি। স্নানরতা দুটি যুবতী মেয়েব ছবি। একজন উরুতে সাবান ঘষছে আর একজন বগলে। ভিজে কাপড়ের ভিতর দিয়ে তাদের যৌবনমহিমা প্রকটিত। আর তাদের চোখেমুখে যা প্রকাশ পাচ্ছে তা লজ্জা নয়, আমন্ত্রণ। একধারে 'পরিষ্কার' সাবানের ছবিটাও রয়েছে। ছবিটা দেখে বিশ্বদীপের ভদ্র মন একটু সংকুচিত হয়ে পড়ল, কিন্তু তাঁর ব্যবসায়ী মন ভাবতে লাগল এ ছবি বাজারে ছাড়লে

'পরিষ্কার'-এর বিক্রি বাড়বে কি না। বিক্রি বাড়াবার জন্যেই ছবি। ঘোষাল নবনীকে পাঠিয়েছেন।

"এ ছবি লোকে নেবে তো—"

"লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য। আমার বিশ্বাস এ ছবি দিলে সে উদ্দেশ্য সফল হবে।"

নবনী পকেট থেকে একটা ডগমগে রঙের রুমাল বার করে ঘাড় মুছতে লাগলেন চোখ বুজে। কালো মুশকো লোকটা। বেশ তাগড়া জোয়ান। মোটেই পেলবমার্কা নয়। ডাক্তার শ্রীকান্ত ঘোষালের বিশেষ বন্ধু। বিশ্বদীপ ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবলেন একটু। ঘোষাল আমার অসুখের কথা বলেছে কি ওকে? না বলাই তো উচিত। তবু নবীনকে অসন্তুষ্ট করবার সাহস হল না তাঁর। দুজনেই চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। নবীন ঘাড়ই মুছতে লাগলেন।

"আপনার ছবিটা আমি কিনব"—একটু ইতস্ততঃ করে বললেন শেষে তিনি—"কিন্তু আর একটা ছবিও এঁকে দিন আমাকে। 'পবিষ্কার' সাবানের একটা বড় ছবি নানারকম ফুলের ব্যাকগ্রাউণ্ডে!"

নবনীবাবু ঘাড় মোছা শেষ করে বললেন, "দেব। পবশু দিয়ে যাব।"

নবনীর মুখটা যেন কাঠের মুখ। ভাবলেশহীন। তিনি যখন চাইলেন বিশ্বদীপের দিকে বিশ্বদীপ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। আবার অনুভব কবলেন ওঁর মনের কোনও আভাস ওঁর মুখে পাওয়া যাবে না। কোনও অবান্তর বাড়তি কথাও উনি বলবেন না। এরকম কাষ্ঠ-মুখ লোকের সঙ্গে ডাক্তার ঘোষালের অন্তরঙ্গতা কেন হয়েছে তা বিশ্বদীপের মাথায় আসে না। ডাক্তার ঘোষাল পরিহাস-প্রিয় প্রাণবন্ত লোক, সারাজীবন যেন একঘেয়েমির দেওয়ালকে দু'হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে চলেছেন। প্র্যাকটিসটাকেও যথাসম্ভব সরস করে নেবার চেষ্টা করেন, তা-ও যখন বিরস হয়ে আসে তখন দৌড় মারেন বিদেশে। কেবল গঙ্গোত্রী কেদারবদরী নয়, নায়গ্রা, গোবি, নাগাসাকিতে গেছেন। শেখভের Steppe পড়ে রাশিয়ায় যাবারও ইচ্ছে হয়েছে। এরকম লোকের সঙ্গে নবনীর অন্তরঙ্গতা হল কি করে। ওঁর নবনী নামই বা দিলে কে। অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিলেন বিশ্বদীপ।

নবনী আর একবার রুমাল বার করে ঘাড়টা মুছলেন। আর একবার চাইলেন বিশ্বদীপের দিকে। বিশ্বদীপের মনে হল টাকার কথাটা পাড়তে পারছেন না বোধ হয়।

"টাকাটা কি দিয়ে দেব এখনি?"

"দিন।"

চেক বই বার করলেন বিশ্বদীপ। ভাবলেন কত দেবেন। নবনীকে সাহস করে জিগ্যেস করতে পারলেন না। শেষে এক হাজার টাকার একটা 'চেক' লিখে একটু সসংকোচে এগিয়ে দিলেন সেটা। মনে হল যেন 'ঘুষ' দিচ্ছেন। নবনী চেকটার দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, "আমি ছবি পিছু একশ' টাকা নিই। এত টাকা দিচ্ছেন কেন?"

বিশ্বদীপের মনে হল তাঁর ওই কাষ্ঠ-মুখেও যেন বিস্ময়ের আভাস ফুটেছে একটা। সন্দেহ হল হাসছেন একটু একটু।

"কিছু টাকা আগাম দেওয়া থাক। অনেক ছবি আঁকতে হবে ভবিষ্যতে—"

''যখন আঁকব তখন দেবেন। এখন একশ' টাকাই দিন''

বিশ্বদীপের মনে হল একটা দুর্ভেদ্য দেওয়ালের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন তিনি যেন।......পাশের একটা গলি থেকে টং টং টং টং শব্দ উঠতে লাগলো। তীক্ষ্ণ করুণ কঠোর দুঃসহ একটা শব্দ। প্রতিবাদের সঙ্গে কান্না মিশে যেন মিনতি করছে নিষ্ঠুরতাকে। লোহার উপর হাতুড়ি চালাচ্ছে কে যেন। তার সঙ্গে মিশছে—ঘড়াং ঘড়াং ঘড়াং—লরিটাকে চালাবার চেষ্টা করছে আফজল খাঁ। একশ' টাকার চেকই একখানা লিখে দিলেন বিশ্বদীপ। এ চেকখানা হাতে করেও নবনী ইতস্তত করতে লাগলেন।

''আমার মনে হচ্ছে ছবিখানা আপনার পছন্দ হয়নি। তা' যদি না হয়ে থাকে তাহলে—''

''ছবি আমার পছন্দ হয়েছে। তবে ওটা বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হবে কি না সেটা ঠিক করবেন পাঠকজি, আমার ম্যানেজার। তিনিই এ সব করেন—''

''যে পাঠকজি ভালো জ্যোতিষী?''

''হ্যাঁ। তিনি জ্যোতিষ চর্চাও করেন—''

এ খবরটা পেয়ে বিশ্বদীপ আবার একবার আড়চোখে চাইলেন নবনীর মুখের দিকে। তাঁর আশা হল নবনীকে যদি জ্যোতিষের দিকে আকৃষ্ট করা সম্ভব হয় তাহলে নবনী হয়তো শেষ পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবেন তাঁর। কিন্তু নবনীর মুখে কোনও ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। তা দেখে বিশ্বদীপ একটু হতাশও যেমন হলেন তেমনি আবার নিশ্চিন্তও হলেন যেন। ভাগ্যের রহস্য নিকেতনে জ্যোতিষের সিঁধকাটি নিয়ে যাঁরা সত্য রত্ন-সন্ধানে প্রবেশ করেন তাঁদের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গতা হয় বটে, কিন্তু এর একটা বিপদও আছে। নিজের জীবনের সব সত্য কথা সকলকে বলা চলে কি? নবনী যদি তাঁর জীবনের নিগূঢ় খবরটি জেনে ফেলে তাহলে তিনি কি সুখী হবেন, না, শান্তি পাবেন? এই জন্যে পাঠকজিকে তিনি জ্যোতিষচর্চায় উৎসাহিত করেননি নিজের বিষয়ে। জ্যোতিষের দৌলতেই অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাঁর। পাঠকজির জন্যেই অনেকে তাঁর কাছে এসেছে। শ্যামল সোম পাঠকজির কাছে হাত দেখাতেই এসেছিলেন প্রথমে। তার পরে অন্যভাবে জড়িয়ে পড়লেন বিশ্বদীপের সঙ্গে, বিশ্বদীপ পরিচয় পেলেন তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার। রঙ্গমঞ্চ থেকে গ্রীনরুম, তারপর একেবারে অন্তঃপুর পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। শুনলেন তাঁর কাব্য, মনে গেঁথে গেল এই লাইনটা—ব্যথার প্রদীপে তেল নেই আছে জমাট রুধির, শিখা নেই, আছে উগ্র তপ্ত শাণিত তীরের ফলা। অদ্ভুত কবি শ্যামল সোম। শ্যামল সোমের বন্ধু দুটিও অদ্ভুত। একজন রুটি-ওলা অনন্ত রায় আর একজন বই-ওলা অনঙ্গ সেন। বিশ্বদীপ ভেবেছিলেন এইভাবে নবনীর সঙ্গেও হয়তো ঘনিষ্ঠতা হয়ে যাবে। তাঁর মেলায় আর একটা লোক বাড়বে। আর একটু হয়তো অন্যমনস্ক করে দেবে তাঁকে। অন্যমনস্কই থাকতে চান তিনি। নবনী জ্যোতিষের কথা জানতে চাইলে কেন? ওরও এ বিষয়ে জ্ঞান আছে নাকি! পরিচয় হলে হাত দেখতে চাইবে কি? বিশ্বদীপের কুষ্ঠি নেই। পাঠকজি বলেছিলেন হাত দেখে কুষ্ঠির ছক বানিয়ে দেবেন। পাঠকজিকে হাত দেখাননি তিনি। নবনীকেও দেখাবেন না যদি দেখতে চায়।

''না, দেখাব না—''

উচ্চকণ্ঠে কথা ক'টি বলেই লজ্জিত হয়ে পড়লেন বিশ্বদীপ। তারপর বুঝলেন লজ্জার কারণ নেই। নবনী চলে গেছে। কখন চলে গেছে তা তিনি বুঝতে পারেননি।

টং টং টং টং টং—লোহার উপর আঘাত করে চলেছে হাতুড়ি। ঘড়াং ঘড়াং ঘড়াং, আফজল না-ছোড়, লরিটাকে চালাবেই। তুমূল গর্জন করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল এরোপ্লেন। বড় রাস্তা থেকে ট্রাম গাড়ির শব্দটা স্পষ্টতব হয়ে উঠল। নিচে রাস্তায় তারস্বরে চীৎকার করছে একদল ছেলে একটা ন্যাকড়ার ফুটবল নিয়ে। মনে হচ্ছে জীবন মরণ সমস্যায় মেতেছে যেন। তারপর চীৎকার করে উঠল খবরের কাগজটা। চতুর্দিকে হত্যা, অগ্নিকাণ্ড, নারীধর্ষণ। নেতাদের বক্তৃতা। বক্তৃতার চতুর্দিকে ফেনা। ফেনা, ফেনা, ফেনা। ওছাড়া উপায়ই বা কি আছে আর? সাইপ্রাস, ভুটান, চীন, আফ্রিকা। খবরের কাগজটা যেন পাগল হয়ে উঠেছে। র‍্যাঁদা চালাচ্ছে বিক্ষত মর্মে!

"আসব?"

প্রথমে শুনতে পেলেন না বিশ্বদীপ। তিনি জানালা দিয়ে একটা নারকেলগাছের দিকে চেয়ে ছিলেন। কয়েকটা কচি ডাব ভয়ে আঁকড়ে আছে যেন গাছটাকে। সবুজ চিক্কণ পাতা দিয়ে রোদ পিছলে পড়ছে। যেন পালাতে চাচ্ছে। ভযে সিটিয়ে আছে গাছটা। গুণ্ডাপবিবৃত অসহায় যুবতীব মতো। চারদিকে বাড়ি, পাকা বাড়ি। নানা মাপের, নানা আকারের, নানা ছাঁদেব। প্রত্যেকটি ভয়ংকর। ইঁট, সিমেন্ট, কংক্রিট, লোহা, মাটি নেই...।

"আসতে পারি---"

"ও হ্যাঁ। ও, শ্রমিক-সামন্ত— "

'ট্যাক্সি পেতে দেরি হয়ে গেল"

"এস বস। উঃ খুব ঘামছ যে। বাড়িয়ে দাও ফ্যানটা। তারপব কি হল—"

বিদুলার ভাই টোটো। বিদুলাব যেমন টোটোবও তাই, মন-ভোলানো চেহারা। সস্তা কাচেব চুড়িব মতো সর্বদাই একটা সস্তা জলুসে চকমক করছে। প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু বিদুলাব ভাই বলেই তাকে রাখতে হযেছে ফ্যাকটাবিতে লেবার-অফিসার করে। বিশ্বদীপ নাম দিয়েছে শ্রমিক-সামন্ত।

"কি হল- -"

মুখে একটা চিকমিকে হাসি ফুটিয়ে টোটো বললে, "কিচ্ছু হয়নি। ধাকড় বলছে ওদের দাবি মানতে হবে--"

"দাবিটা কি? দ্বিগুণ মাইনে ছাড়াও আরও কিছু চাইছে?"

"চাইছে। বলছে আমাদের থাকবার ঘর চাই, পরবার কাপড় চাই। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা চাই। বলছে দ্বিগুণ মাইনে পেলে এই মাগ্‌গির বাজারে শাকভাত খেয়ে চলবে কোনরকমে। জিনিসপত্রের দাম যদি আরও বাড়ে মাইনে আরও বাড়াতে হবে। নমো নমো করে যেটুকু ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স দেওয়া হয় তাতে কুলুবে না। তাছাড়া ওরা বলছে আজকাল চিকিৎসার খরচ এত বেশী হয়েছে যে অসুখে পড়লে মহা মুশকিল। এরও প্রতিকার চায় ওরা। সিলি!"

টোটোর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন বিশ্বদীপ স্মিতমুখে। বুঝলেন টোটো তাঁকে খুশী করবার জন্যেই এসব কথা বলে চলেছে।

"ধাকড়ের সঙ্গে আমিই তাহলে কথা বলি, কি বল?"

"যা বলবার আমি তো বলেছি। আমি যা বলেছি, আপনি তার বেশী কি আর বলবেন।"

"বেশী হয়তো কিছু বলতে পারব না। আমি আমার দিকটা দেখাবার চেষ্টা করব কেবল।"

"তাতে কোনও লাভ হবে না। তাছাড়া আর একটা 'ফানি' ব্যাপার আছে ওদেব। ওরা নিজেদের মধ্যে যে ইউনিয়ন করেছে তাতে পুরুষের চেয়ে মেয়ে বেশী। ধাকড় অবশ্য ওদেব সর্দার। কিন্তু ধাকড়ের উপর সর্দারি করে শামার মা। আবার শামার মা শুনছি মহুয়ার কথায় উঠ-বোস করে।"

"সেই রঙীন কাপড়-পরা মেয়েটি?"

"হ্যাঁ। তাব ভযানক ইনফ্লুযেন্স। মেয়েটা কিছু লেখাপড়া জানে। মহা ফড়ফড় করে। আমি তো হকচকিয়ে যাই তার সামনে"

বিশ্বদীপ নীরব হয়ে বইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, "আমি ওদেব সকলেব সঙ্গেই দেখা করব। তুমি ওদের ফ্যাকটারিতে থাকতে বল, আমি যাচ্ছি একটু পরে।"

"আপনি যাবেন? ফট্ করে যদি কোন অপমান করে বসে।"

হাসলেন বিশ্বদীপ।

"কবলেই বা৷ আমি মস্ত একটা মানী লোক এই বোধটা মনে সর্বদা উদ্যত কবে বাখলেই অপমানিত হবাব ভয় থাকে। আমার সে ভয় নেই।"

"বেশ! দিদি কিন্তু পছন্দ কববে না এটা, তা বলে দিলুম।"

টোটো যেন একটু বাগতভাবেই উঠে গেল।

আবার বেজে উঠল ফোনটা।

"হ্যালো, কে, বিদুলা? আমার বাড়ি যেতে দেবি হবে একটু। হ্যাঁ। আটটার আগে ফিরতে পারব না। সে সময় আসতে পার। বাড়িতে কেউ থাকবে না। পিযানোব একটা গৎ শুনিযে যেতে পাব। ও, তাই নাকি! শ্যামল এসেছিলেন? একটা কবিতা রেখে গেছে? তাই নাকি৷ নিয়ে এসো, দেখব। এখনি শোনাবে? বেশ শোনাও।"

ফোনে বিদুলা পড়তে লাগল কবিতাটা। বিশ্বদীপের মনে হল, কি অদ্ভুত মিষ্টি গলা বিদুলাব। যেন একটা বাঁশী বাজছে দূব থেকে।

"....যা নাগালের মধ্যে নেই তাই যে সুন্দর এ কথা মানি না। কিন্তু যা সুন্দব তা নাগালের বাইরে থাকে চিরকাল। এই সত্যের সাগরে সাঁতার কাটছি। জানি ডুবে যাব, জানি স্বপ্নের ভেলা তলিয়ে যাবে, তবু উপেক্ষা করতে পারি না কুহকিনী সাইরেনের গানকে। পারি না, কারণ আমবা সুন্দরের উপাসক, আমরা জানি যা সুন্দর তা নাগালের বাইরে থাকবে বরাবর, আর এ-ও জানি তবু তাকে নাগালেব মধ্যে পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে; এই চেষ্টা, এই উন্মুখতা, এই আগ্রহই সেই স্বপ্নের উৎস, যে স্বপ্ন আত্মার অমৃত, যে স্বপ্ন চেতনার আশ্রয়, যে স্বপ্ন দৃষ্টির সীমানা বাড়িয়ে দেয়, যে স্বপ্ন কণ্ঠস্বরকে রূপান্তবিত করে সংগীতে। জানি তুমি নাগালের বাইরে, তুমি চিরকাল থাকবে অনায়ত্ত স্বর্গের ইন্দ্রাণী, তবু আমি থামব না, কারণ আমি থামতে পারি না। ফুলের গন্ধ সুদূর আকাশে পৌঁছবে না সত্য, কিন্তু এ কথাও সত্য যে ফুল তবু থামবে না। প্রতিমুহূর্তে সে গন্ধের ঢেউ পাঠিয়ে দেবে নির্বিকার মহাকাশের দিকে, যতক্ষণ মৃত্যু না এসে থামিয়ে দেয় তাকে....।"

কলকণ্ঠে হেসে উঠল বিদুলা।

"শুনলে? কেমন লাগল"

"চমৎকার! শ্যামল সত্যিকার কবি।"

"এ ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না তোমার?"

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন বিশ্বদীপ। তাঁর মুখে যে ছায়া ঘনিয়ে এল ক্ষণকালের জন্য তার আভাস কিন্তু ফুটল না তাঁর উত্তরে।

বললেন, "পাথরের বুকে তরঙ্গিণী ঝাঁপিয়ে পড়লেও সাগর বিচলিত হয় না। কারণ সে জানে তরঙ্গিণী শেষ পর্যন্ত তার কাছে আসবেই!"

"ইস্"—

হঠাৎ ফোনটা কেটে দিলে বিদুলা।

বিদুলার কথাই ভাবতে লাগলেন বিশ্বদীপ। বিদুলার সঙ্গে প্রথম দিনের সেই পরিচয়ের কথাটা মনে পড়ল। চোরাবাজারের একটা দোকানে দেখা হয়েছিল। প্রকাণ্ড একটা জাপানী পরদার পটভূমিকায়। নীল আকাশ, অনেক বড় নীল আকাশ, আর সে আকাশকে অলংকৃত করেছে সূর্য চন্দ্র গ্রহনক্ষত্র নয়, চেরীগাছের পুষ্পিত একটি পল্লব, অপরূপ লীলায়িত ভঙ্গীতে মৃত্তিকার মায়া কাটিয়ে লীলাভরে এবং একটু স্পর্ধাভরেই যেন প্রসারিত করেছে নিজেকে আকাশের বুকে। থমকে দাঁড়িয়ে আছে আকাশ. ..। জাপানী শিল্পীর এই কল্পনার পটভূমিকায় বিদুলাকে প্রথম দেখেছিলেন তিনি। হালকা সবুজ রঙের একটি পাতলা শাড়ি পরেছিল বিদুলা, মাথায় ঘোমটা ছিল না, পিঠে দুলছিল বেণী, সবুজ মখমলের চটি ছিল পায়ে, চোখে যে ভাষা ছিল তা যেন কোনও বিশেষ যুগের নয়, বিশেষ ধরনের নয়, তা অপরূপ, তা বিস্ময়কর, কিন্তু তা ক্ষণিক আধুনিকতার চটুলতা নয়, তা যেন চিরন্তন। বিশ্বদীপের মনে হয়েছিল ওই ভাষা শকুন্তলার চোখে ছিল, দময়ন্তীর চোখে ছিল, শ্রীরাধার চোখে ছিল, ক্লিওপেট্রার চোখেও ছিল হয়তো। জাপানী পরদাটার পাশে বড় আয়না ছিল একটা। সেই আয়নায় প্রতিফলিত হয়েছিল বিশ্বদীপের চেহারাটা আর সেই চেহারার দিকে নির্নিমেষে চেয়েছিল বিদুলা, হ্যাঁ, আয়নায় প্রতিফলিত তার চেহারাটাই প্রথমে দেখেছিল সে, তার অধর স্ফুরিত হয়েছিল, বিদ্যুৎকণা বিচ্ছুরিত হয়েছিল তার চোখের দৃষ্টি থেকে এবং তারপরেই সে এমন একটা অন্যমনস্কতার ভান করেছিল, (যেন দেখেও দেখছে না তাঁকে, বিশ্বদীপ যেন সেখানে নেই, তাঁর প্রবল অস্তিত্বটাকে অস্বীকার করতে পারলে যেন সে বাঁচে).. .হঠাৎ বিশ্বদীপ অনুভব করেছিলেন বিদুলা তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। রূপবান বলে খ্যাতি ছিল বিশ্বদীপের। অনেকেই তাঁকে দেখে মুগ্ধ হত। বাল্যকাল থেকেই রূপের অজস্র প্রশংসা শুনেছেন তিনি। কিন্তু বিদুলার চোখে সেদিন যা দেখলেন তা কৃতার্থ করে দিল তাঁর সমস্ত চেতনাকে, সমস্ত সত্তাকে। যে রূপ নিতান্তই বিধাতার দান, যার জন্যে তাঁর নিজের কোনও কৃতিত্ব নেই, যা নিতান্তই দুর্জ্ঞেয় রহস্য একটা, যেটাকে নিজে তিনি বিশেষ মূল্য দেননি কোনদিন, বিদুলার চোখে সেদিন সহসা সেই রূপের ভাষ্য যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাঁকে। তিনি গর্ব অনুভব করলেন, নিজেকে দিগ্বিজয়ী বীর বলে মনে হল। সেই আশ্চর্য অপূর্ব মনোহর জাপানী পরদার পটভূমিকায় আবার তিনি দেখলেন বিদুলাকে। মনে হল সেই জাপানী শিল্পী যা আঁকতে পারেননি, আঁকতে সাহস করেননি, তাঁর সেই অনঙ্কিত কল্পনা যেন

মূর্ত হল বিশ্বদীপেব বিস্মিত দৃষ্টির অভিনন্দনে অকস্মাৎ। বিশ্বদীপ অনুভব করলেন সে এসে গেছে। দু'দিন আগে তিনি দুটো বড় বড় ফুলদানী কিনে দোকানেই রেখে গিয়েছিলেন। সেই দুটো নেবার জন্যেই তিনি গিয়েছিলেন সেদিন।

দোকানী বিদুলার দিকে চেয়ে বলল, "এই যে উনিও এসে গেছেন। উনিই কিনে রেখে গিয়েছিলেন কাল ফুলদানী দুটো।"

তাবপর বিশ্বদীপের দিকে ফিরে সে বলল, "এই ভদ্রমহিলা ফুলদানী দুটো নিতে চাইছিলেন, আমি বললাম, বিক্রি হয়ে গেছে।"

এই বলে সে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বিশ্বদীপের দিকে, যার অর্থ বুঝতে দেরি হল না বিশ্বদীপের। অর্থাৎ দাঁও পেয়ে গেছেন, ছেড়ে দিন বেশী দামে।

বিশ্বদীপ তখন ফিরে সপ্রতিভভাবে যা বলেছিলেন তা কেন বলেছিলেন কি ভেবে বলেছিলেন। এব উত্তর তিনি নিজেও জানেন না আজও। শুধু এইটুকু জানেন যা বলেছিলেন তাতে ভণ্ডামি ছিল না। বরং এই কথাই মনে হয়েছিল যে জীবনে সেই বোধহয় প্রথম সত্য কথা সাহস কবে বলতে পারলেন। অপরিচিতাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করাব প্রয়োজনও অনুভব করেননি তিনি। বলেছিলেন, "ও তুমি! তোমার জন্যেই তো কিনেছি এ দুটো। তুমি এসে গেছ ভালই হয়েছে, এখানে যে তোমার দেখা পেয়ে যাব তা ভাবিনি।"

দোকানদাব অবাক হয়ে গিয়েছিল, আর বিদুলার চোখের দৃষ্টিতে যে ছদ্ম রোষ-বহ্নির দীপ্তি ফুটি ফুটি করেও ফুটতে পাবছিল না, যা ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তবিত হয়ে যাচ্ছিল অকপট আনন্দের অনাবিল প্রকাশে, তার দিকে চেয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে দাঁড়িযে ছিলেন বিশ্বদীপ। আশ্চর্য হয়ে গিযেছিলেন বিদুলা কোনও প্রতিবাদ করল না দেখে। দোকানদাব বুঝতে পাবেনি যে বিদুলাকে তিনি প্রথম দেখলেন। বিদুলা যা বলেছিল তাও অপ্রত্যাশিত, অথচ বিশ্বদীপেব মনে হয়েছিল মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়—এইটাই তো প্রত্যাশা কবছিলাম। বিদুলাও এক মুহূর্তে সমস্ত মিথ্যার মুখোশ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে, বেরিয়ে আসতে পারবে, এইটাই তো স্বাভাবিক।

বিদুলা বলেছিল, "তোমার জন্যেও একটা জিনিস রেখেছি আমি। কি করে দেব তোমায সেটা?"

"চল, তোমার কাছে যাচ্ছি এখনি।"

বিশ্বদীপ নিজের গাড়ি করেই সেদিন নিয়ে গিয়েছিলেন বিদুলাকে তাঁর বাড়িতে। এই কলকাতা শহরে যে এমন একটি নির্জন গলি থাকতে পারে তা বিশ্বদীপের কল্পনাতীত ছিল। বাড়ির ঠিক পাশেই পুষ্পিত একটা কদমগাছ। কলকাতা শহরে এমন কদমগাছ আগে তাঁর চোখে পড়েনি। মনে হল এ যেন প্রবাসী, বিদুলাকে দেখতে এসেছিল, দেখবার পর আর ফিরে যেতে পারেনি, রোমাঞ্চিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিদুলার বাড়ি, নিজের বাড়ি। সাতটি ঘর, সাতটি ঘরে সাত রকম রঙ। বাড়ির নাম ইন্দ্রধনু। বিদুলারই বাড়ি, বিদুলাই মালিক, বিদুলাই সব। বিদুলার বাবা সিঙ্গাপুরে ব্যবসা করে অনেক টাকা রোজগার করেছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি মারা যান, বিদুলা তখন বিলেতে পড়ছিল, মা অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন। বিদুলা যখন বিলেত থেকে ফিরে এল তখন বাবার ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী সে। টোটোকে সে অনেক পরে নিয়ে এসেছিল সিঙ্গাপুর থেকে। টোটো তার

ভাই বটে কিন্তু আপন ভাই নয়, বিদুলার বাবার একটি রক্ষিতা ছিল, তারই ছেলে টোটো। বিদুলাই মানুষ করেছে তাকে। এ সব খবর অনেক দিন ধরে একটু একটু করে সংগ্রহ করেছিলেন বিশ্বদীপ। কিন্তু সেদিন, সেই প্রথম দিন, যে খবরটা, যে চমকপ্রদ আশ্চর্য খবরটা বিস্ময়ের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাঁর সমস্ত সত্তাকে, সে খবরটা, বিদুলা এসে গেছে। কলকাতার মরুভূমিতে দেখা দিয়েছে মরূদ্যান আর সেখানে তাঁর জন্যে যে নারী অপেক্ষা করছে সে শুধু নারী নয়, সে সাকী।

গগনবিদারী ঘর্ঘর আওয়াজ হল একটা। আফজল লরিটাকে স্টার্ট করেছে। লোহার উপর হাতুড়ির নিষ্ঠুর প্রহারটা থেমে গেছে। ছাতের উপব নূতন ধরনের আর একটা শব্দ শুরু হয়েছে। মসলা পিযছে বোধ হয কেউ।

"বিশ্বদীপবাবু আছেন?"

"আছি, আসুন"

বেঁটে মোটা কালো কুচকুচে শশধর সরখেল প্রবেশ করলেন ঘর্মাক্ত কলেবরে। আপাদমস্তক খদ্দর ঢাকা এই মালটিকে বিশ্বদীপ অনেক দিন থেকে চেনেন। কংগ্রেস পার্টিব লোক। নানা ছুতোয় চাঁদা নেন। চাঁদা না দিলে জীবন দুর্বহ করে তোলেন। শশধরবাবুর চেষ্টাতেই অনেক সিমেণ্ট পেযে গেছেন তিনি ফ্যাকটারিব জন্য। এলেই কিন্তু চাঁদা দিতে হয। শশধরের দন্তগুলি সর্বদাই বিকশিত। হলদে রঙের এবড়োখেবড়ো দাঁত। ঢাকতে পারেন না, কিংবা চান না।

"আজ আবার কি—"

খাতাটা খুলে এগিয়ে দিলেন শশধব সেটা।

"এবার জাতীয় পতাকা উৎসব করব ভেবেছি। প্রত্যেক দেশের জাতীয় পতাকা ছাপিয়ে প্রত্যেকটির ইতিহাসও লিখে দেব। আমাদের জাতীয় পতাকাটা অবশ্য প্রত্যেক পাতায় থাকবে। হাজার পনরো খরচ হবে। আপনার কাছে আপাতত শ'পাঁচেক চাই। পরে দবকার হলে আবার দিতে হবে কিন্তু। জানি, আপনি দেবেন"

তারপর নিম্নকণ্ঠে বললেন, "সবাই দেয় না মশাই। ওই যে হাজরা, একটি পয়সা দেয়নি এখনও। খালি ঘোরাচ্ছে।"

বিশ্বদীপ বুঝলেন তর্ক করা বৃথা। দেরি করাও নিরর্থক। পাঁচশ' টাকার চেক লিখে দিলেন একটা। শশধর ঝুঁকে নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন। বিশ্বদীপ শুনেছেন ও একটা বাড়ি তুলছে নিউ আলিপুরে। অথচ কিছুই তো করে না। এত টাকা পাচ্ছে কোথা! জোর করে চিন্তাটাকে ঠেলে দিলেন মন থেকে। ভয় হল বেশী ভাবলে আলকাতরার টিনটা উলটে পড়বে এখুনি। মাখামাখি হয়ে যাবে সব। ত্রিবর্ণ পতাকার সব রং ঢাকা প'ড়ে যাবে।

আফজল খাঁ এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

"অমলবাবু বললেন গাড়িটা সারাতে আড়াইশ' টাকা আন্দাজ লাগবে। গারাজে নিয়ে যাচ্ছি ওটা। অনেক কষ্টে স্টার্ট করেছি। কিছু পেট্রোল আর মোবিলও কিনতে হবে। কেশিয়ারবাবুকে পনরো টাকার স্লিপ দিয়ে দিন একটা।"

স্লিপ দিয়ে দিলেন বিশ্বদীপ। আফজল খাঁ সেলাম করে চলে গেল। ফোন বেজে উঠল আবার।

"ও, মুরারিবাবু! সাবানের স্টক ফুরিয়েছে? লরিটা খারাপ হয়েছে বলে পাঠাতে পারিনি! আপনি একটু পরে পাঠকজিকে ফোন করবেন—হ্যাঁ দুটো নাগাদ—রিক্‌শা করে কিছু সাবান দিয়ে আসবে আপনার দোকানে। ভাল বিক্রি হচ্ছে? না, তা কি করে হবে? চালমুগরা তেল থেকে তৈরী, খুব ভালো গন্ধ তো হবে না। হ্যাঁ, সব রকম চর্মরোগেই উপকার হবে। চালমুগরাতে কুষ্ঠও ভালো হয়। ও, আচ্ছা আমাদের আর্টিস্টকে বলব। কিন্তু তাতে আবাব উলটো ফল হবে না তো। সাবান মেখে ওরকম ম্যাজিকাল এফেক্‌ট যদি না হয়, সম্ভবত হবে না, তাহলে.....আচ্ছা, আচ্ছা, ডাক্তার ঘোষালকে জিগ্যেস করি, তিনি যা বলবেন তাই করব। আচ্ছা নমস্কার—"

মুরারিবাবু বলছিলেন দুটো ছবি আঁকাতে। একটা ছবি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকের, তার নিচে লেখা থাকবে 'পরিষ্কার সাবান ব্যবহারের পূর্বে'। দ্বিতীয় ছবিটি হবে একটি কমনীয়কান্তি যুবকের, তার নিচে লেখা থাকবে 'পরিষ্কার সাবান ব্যবহারের পরে'। মুবাবি কুণ্ডু চতুব ব্যবসায়ী। তিনি বলছিলেন এই ছবি বাজারে ছাড়লে হু হু করে সাবান বিক্রি হবে। প্রত্যেকে যদি একবার করেও পরীক্ষা করে দেখে তাহলে অন্তত পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সাবান বিক্রি হয়ে যাবেই। কিন্তু....ওই কিন্তুই বিশ্বদীপের সর্বনাশ করেছে। ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন তিনি। তারপর অন্যমনস্কভাবে নিজের বাম উরুটায় চাপ দিয়ে দেখলেন একবাব। না, বিশেষ উন্নতি তো হয় নি। গুম হযে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। মাথাব শিরাটা দপদপ করতে লাগল। মনে হল ...ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং চতুর্দিক প্রকম্পিত করে ফায়ার ব্রিগেড ছুটেছে। কোথায় আগুন লাগল কে জানে। নিজের কথা ভুলে গেলেন কয়েক মুহূর্তের জন্য। আবার ফোন।

"ডাক্তার ঘোষাল? আশ্চর্য, আপনার কথা এখুনি ভাবছিলাম। সিমেণ্ট? কত? দুশো বোরা? তা দিতে পারি বোধ হয়। সম্প্রতি পেয়েছি কিছু, আমার ফ্যাকটারির একটা ঘর হচ্ছে। আচ্ছা, আপনিই নিন। ও, আপনার বেকার-ভবনের জন্য দরকার বুঝি। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেব। আমার উরুতের সেই বোদা ভাবটা এখনও আছে কিন্তু। না, না, ব্যস্ত হচ্ছি না. ধৈর্য ধবেই থাকব, কিন্তু, মানে—আছে, সব কথা খুলে বলব আপনাকে একদিন, আচ্ছা, আচ্ছা— "

হাউমাউ করে বারান্দায় কেঁদে উঠল কে যেন। তারপর দড়াম করে কপাটটা খুলে ঢুকে পড়ল ছকুলাল। আপিসের চাকর একটা। মুক্ত কচ্ছ!

"আমাকে শালা বীরেন মেরেছে হুজুর। আমার কাছা খুলে টাকা কেড়ে নিয়েছে— "

বীরেনও ছকুর পিছু পিছু এসেছিল। বীরেন আপিসের কেরানী। গ্রীষ্মকালে শুধু গায়ে বসে কাজ করে। আপিসে এসেই জামাটি খুলে ফেলে সে।

বীরেন বলল, "আমার পকেট থেকে রোজ একটি করে টাকা চুরি যাচ্ছিল স্যার। আজ এই ব্যাটাকে হাতেনাতে ধরেছি। নোটটি আমার পকেট থেকে সরিয়ে নিজেব কাছায় বেঁধে রেখেছিল নোটে আমার ইনিশিয়াল করা আছে, দেখুন আপনি—"

ছকু ব্রাহ্মণ-সন্তান। তার মা বিশ্বদীপের বাড়িতে রাঁধুনী ছিল। কিছুদিন আগে মারা গেছে। বেকার ছকুকে তিনি আপিসের বেয়ারা করে বহাল করেছিলেন। সে যে শেষকালে......কি

বলবেন ভেবে পেলেন না তিনি। শেষে বললেন, "তুমি বাড়ি যাও, এখানে কাজ করতে হবে না। আমার বাড়িতেই যেমন কাজ করছিলে তাই কর গিয়ে।"

ছকুলাল চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল। একটু আড়ালে গিয়ে কিন্তু তার মুখে দুষ্ট হাসি ফুটল একটা। বীরেনকে সে কলা দেখিয়ে এবং ভেংচি কেটে বেরিয়ে গেল।

বীরেনের চোখ দিয়ে আগুন ছুটে বেরুল আবার।

"কাণ্ড দেখলেন ব্যাটার! আমাকে ভেংচি কেটে কলা দেখিয়ে চলে গেল"

"তুমি তোমার টাকাটা পেয়েছ তো? আচ্ছা বল তো কেন ও টাকা চুরি করবে! আমি তো ওর সব খরচ দিই।"

"সিনেমা দেখে। সিগারেট খায়। আমরা বিড়ির খরচ জোটাতে পারি না, ও কাঁইচি ফোঁকে!"

বীরেন গজ্‌গজ্‌ করতে করতে চলে গেল।

তারপর এলেন হলধরবাবু একগাদা ফাইল বগলে করে। সই করতে হবে। বিশ্বদীপ যন্ত্রচালিতবৎ সই করে যেতে লাগলেন। সব খুঁটিয়ে দেখার সময় নেই। একটা চিঠিতে সই করতে যাচ্ছিলেন, হলধরবাবু বললেন, "চিঠিখানা আপনি পড়ে দেখুন একবার। পাঠকজি ডিক্‌টেট করেছিলেন ওটা। বলেছিলেন আপনাকে দেখিয়ে নিতে। বিশ্বদীপ পড়লেন চিঠিখানা। জনৈক বোম্বাই-ব্যবসায়ী তাঁর সাবানের ব্যবসায়ে অংশীদার হতে চান। এক লাখ টাকা দিয়ে বেশ মোটা রকম অংশ একটা কিনতে চান তিনি। পাঠকজি লিখেছেন যে মিস্টার শেরওয়ানী এ বিষয়ে সত্যিই যদি আগ্রহশীল হন তাহলে তাঁকে এখানে আসতে হবে। সামনাসামনি কথা হওয়াই ভালো। বিশ্বদীপ ভ্রূকুঞ্চিত করে একটু ভাবলেন, তারপর সই করে দিলেন। নানা কাগজে অনেকক্ষণ ধরে ক্রমাগত সই করতে হল।

টং টং টং টং আবার হাতুড়িটা পিটতে শুরু করেছে লোহাকে। তার সঙ্গে মিশছে একটা মোটর সাইকেলের দুর্দান্ত শব্দ.......আবার কে যেন আসছে।

"আসতে পারি?"

"আসুন। ও আদিত্যবাবু? কখন এলেন আপনি।"

"নটা ছত্রিশে হাওড়ায় পৌঁচেছি। হাঁটতে হাঁটতে আসছি সেখান থেকে—"

"হাঁটতে হাঁটতে কেন? ট্রামে বাসে খুব ভিড় জানি, ট্যাক্সি করে এলেই পারতেন। ট্যাক্সিও পাওয়া গেল না? রিক্‌শ—"

আদিত্যনারায়ণ এমন একটা মুখ করে বিশ্বদীপের দিকে চেয়ে রইলেন যা প্রায় অবর্ণনীয়। ভাবটা—তুমি যা বলবার বলে যাও, আমার কথাটি আমি শেষে বলব।

"রিক্‌শও পেলেন না?"

"ট্রেনে আমার বাক্স মনি-ব্যাগ সব চুরি গেছে।"

"তাই নাকি। স্টেশন থেকে ফোন করলেই পারতেন গাড়ি পাঠিয়ে দিতাম—"

"একটি পয়সা ছিল না কাছে। হরিশের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার কাছে দুটো টাকা চাইলাম। বললে, নেই। একটি বিড়ি ধরিয়ে সরে পড়ল। অথচ ওর কাছে আমাদের ছত্তিশ টাকা ন আনা খাজনা বাকী"

চোখ পাকিয়ে চেয়ে রইলেন বিশ্বদীপের দিকে, যেন বিশ্বদীপই হরিশ। আদিত্যনারায়ণ বর্তুলাকার খর্ব ব্যক্তি। বিশ্বদীপের দেশের বিষয়সম্পত্তির নায়েব। অর্থাৎ তিনিই সেখানকার হর্তা-কর্তা-বিধাতা। দুটো নদী পেরিয়ে এবং আট ক্রোশ গরুর গাড়িতে চড়ে সেখানে পৌঁছতে হয়। বিশ্বদীপ প্রায়ই পারেন না। আদুবাবু যা করেন তাই হয়। আদুবাবু নাটক করতে ভালবাসেন। তিনি যখনই আসেন তখনই একটা নাটকীয় পরিস্থিতি সঙ্গে করে আনেন এবং সে নাটক কখনও কমেডি বা প্রহসন বা লঘু কিছু হয় না, তা হয় ঘন-ঘোর ভয়ংকর ট্র্যাজিক ব্যাপার, মনে হয় এই বুঝি সব গেল, আর কোন কুলকিনারা নেই, হায়-হায়-কি-হবে-গোছ কাণ্ড, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আদুবাবু অসাধারণ কৌশলে সামলে দেন সব। শ্রোতাকে স্বীকার করতেই হয় আদুবাবু না থাকলে রক্ষা ছিল না। আদুবাবু হিরো।

"আপনি এলেন কেন হঠাৎ?"—বিশ্বদীপ প্রশ্ন করলেন।

চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইলেন আদুবাবু। ভাবটা যেন, আসবার আসল কারণটা খুলে বলব এতো বোকা পেয়েছেন নাকি আমাকে। একটা ধূর্ত চাপা হাসি চিকমিক করতে লাগল চোখের দৃষ্টিতে।

"শখ করে আসিনি। আসতে হয়েছে। না এলে জেল হয়ে যেত। নতুন দারোগাটা বাঘা। একটু আধটু রুধিরে তৃপ্তি হয় না ওর। একটা গোটা মোষ চাই। তাকে বলে এসেছি মোষের খোঁজে চললুম, দু'দিনের মধ্যেই এনে দেব। তবে ছাড়া পেয়েছি-- "

"হেঁয়ালি ভেঙে বলুন।"

আদিত্যনারায়ণের মুখে সলজ্জ হাসি ফুটল একটা এবার।

"হাজার পাঁচেক টাকা চাই। আমাদের লাউপুরের জমিতে বানের সময় যে লোকগুলো এসে ঘর বেঁধেছিল, তারা খাজনাপত্তর কিছু দিচ্ছে না, উকীলবাবু বললেন ওদের উঠিয়ে না দিলে ওদের একটা দখ্‌লিস্বত্ব হয়ে যাবে জমিতে। এমন সময় ভগবান দয়া করলেন-- আগুন লেগে গেল ওদের ঘরগুলোতে। দারোগার সন্দেহ আমিই আগুন দিয়েছি। বুঝুন! এ ছাড়া আর একটা ফৌজদারিও হয়েছে। ছাতনায়, জমির আল নিয়ে ঝগড়া। প্রকাশ্য দিবালোকে আমাদের বরকন্দাজ বাসকীনাথ টাঙি চালিয়ে দু'ফাঁক করে দিয়েছে একটা লোককে কবজির জোর আছে লোকটার। খুনটি করে সে দেশে পালিয়েছে। এখন আমাকে সাক্ষী-সাবুদদের ঘুষ খাইয়ে নিজেদের দলে আনতে হবে। প্রচুর ঝক্কি!"

হঠাৎ চুপ করে গেলেন আদিত্যনারায়ণ, আবার বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইলেন বিশ্বদীপের দিকে। সে দৃষ্টির অর্থ—'শুনলেন তো, টাকা ছাড়ুন এবার।'

বিশ্বদীপের দেশে অনেক জমিজমা বিষয়সম্পত্তি আছে। সেটা আইনত যদি জমিদারী হত তাহলে গভর্নমেণ্ট তা নিয়ে নিতেন। কিন্তু তা জমিদারি নামে চিহ্নিত নয়। বিশ্বদীপের পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি। আগে সব ছোট ছোট অংশে বিভক্ত ছিল, কিন্তু বংশে বিশ্বদীপ ছাড়া আর কোন বংশধর না থাকাতে বিশ্বদীপই উত্তরাধিকারসূত্রে সব পেয়েছেন। আদিত্যনারায়ণই সব দেখাশোনা করেন। বিশ্বদীপ মাপজোক করে দেখেননি কখনও কিন্তু জনশ্রুতি তাঁর একহাজার বিঘের উপর জমি আছে। তাছাড়া বাগান আছে, পুকুরও আছে। শিবমন্দির

আছে। প্রকৃত আয় কত হয়, কত হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করবার শক্তি বা সামর্থ্য বিশ্বদীপের নেই। তিনি আদুবাবুর উপর বিশ্বাস করেছেন তাই এবং আদুবাবুকে কেন্দ্র করে এমন একটা মহিমা সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছেন, যা কলিকালে দুর্লভ। বিশ্বদীপ রামচন্দ্র নন, আদুবাবুও মহাবীর হনুমান হতে পারেন না, কিন্তু বিশ্বদীপ ওই চিত্রটাকেই মনে মনে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করেন। বিশ্বদীপের যুক্তি আদুবাবু ইচ্ছে করলে তাঁকে একটি পয়সা না দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি গড়ে তাঁকে মাসে হাজার টাকা করে দিয়ে যাচ্ছেন, এ বাজারে এটা কম কথা নয়। তাঁর ধারণা আদুবাবু লোকটি সজ্জন, কিন্তু রহস্যময়। আদুবাবু বিশ্বদীপের বাবার আমলের কর্মচারী। বিশ্বদীপ বিলেত থেকে ফিরে এসে তাঁকে 'কাকা' ব'লে সম্বোধন করাতে আদুবাবু যা বলেছিলেন তা বিশ্বদীপ ভোলেননি। আদুবাবু বলেছিলেন, "দেখুন, আপনার বাবা আমার মনিব ছিলেন, আপনিও আমার মনিব, জাতে আপনি ব্রাহ্মণ, আমি আগুরি। আপনার নকল কাকা সেজে একটা ভুয়ো মাখামাখির ভাব যদি করতে চাই তাহলে সেটা মিথ্যে হবে। এ মিথ্যের মুকুট আমার মাথায় মানাবেও না। আমি আপনার বাবার নফর ছিলুম, আপনারও থাকব"—এই বলে তিনি হাত জোড় করে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে চোখ বুজে যে ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন তা অভিনয় হিসেবে এত নিখুঁত হয়েছিল যে অভিনয় বলে মনেই হয়নি

বিশ্বদীপ আদুবাবুর কথা শুনে হঠাৎ যেন একটু দুর্বল বোধ করতে লাগলেন। কারও প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেললে তিনি দুর্বল বোধ করেন।

"অত টাকা এক্ষুণি চাই?"

আদুবাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন না, কিন্তু চোখমুখের ভঙ্গীতে যা প্রকাশ করলেন তার ভাবটা যেন—আমি কি তাহলে এখানে ইয়ার্কি করতে এসেছি! কথা বললেন একটু পরে।

"টাকা না নিয়ে ওখানে ফেরা যাবে না।"

"আজ তো ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গেছে। কাল ব্যবস্থা করা যাবে। টমসন যদি যেতে চায় টম্‌সনকেও পাঠিয়ে দেব আপনার সঙ্গে। সে এককালে পুলিসে বড় চাকরি করত, তাকে দেখলে ওখানকার দারোগা হয়তো বেশী কিছু করতে সাহস পাবে না। তবে টমসন গেলে তার মেমসাহেবও যাবে তার সঙ্গে। ও একা কোথাও যায় না।"

"একেই তো হাঙ্গামের মধ্যে আছি। তার ওপর সাযেবসুবো নিয়ে কি সামলাতে পারব?"

"টমসন একেবারে বাঙালী হয়ে গেছে। চাপ্টালি খেয়ে বসে কলায়ের ডাল আর পোস্ত দিয়ে ভাত খেতেও আপত্তি হবে না তার। মেমসায়েবও ঠিক ওই রকম, শাড়ি সিঁদুর পরে—।"

"টমসন সায়েব কি এখনও পুলিসের চাকরি করেন?"

"না। আগে করত, এখন রিটায়ার করেছে। আমার বিশেষ বন্ধু। ছেলেপিলে নেই, এদেশেই থেকে গেছে। আমারই একটা বাড়িতে থাকে। আচ্ছা, কাল সব ব্যবস্থা হবে। আমি টমসনের সঙ্গে কথা বলে দেখি। আপনি তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।"

"আমি কিন্তু কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছি যে—।"

"ও আচ্ছা। দেখি কত আছে আমার কাছে—"

বিশ্বদীপ মনি-ব্যাগ বার করে একটা একশ' টাকার নোট দিলেন তাঁকে। আদিত্যনারায়ণ নমস্কাব কবে বেরিয়ে গেলেন।

আবাব ফোন বাজল।

"বিদুলা? হ্যাঁ আছি। এখনই আসছে? হ্যাঁ আছি, এস।"

বিদুলা এ সময হঠাৎ আসছে কেন?

টং—টং —টং—টং—টং.. ..নিদাকুণ শব্দটা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল।

"খুন করে ফেলব তোকে.."

"আব কবব না, বাবা গো তোমার পায়ে পড়ি, আর মেরো না, আর মেবো না।"

বিশ্বদীপ ঘাড় ফিবিয়ে দেখলেন, সামনেব বাড়িতে সেই ষণ্ডা লোকটা তাব প্রথমপক্ষেব মেযেকে আবার মাবতে শুরু করেছে। দ্বিতীয়পক্ষেব স্ত্রী দাঁড়িযে এই নির্যাতন দেখছে। মুখে তার মুচকি হাসি। লোকটা নাকি বেকার। কিছুতেই কোন কাজ জোটাতে পাবছে না। মেযেটা দুষ্টু, ধাব কবে তেলেভাজা কেনে, প্রাযই নিজেব কাপড় ছিঁড়ে ফেলে, বিশ্বদীপ লোকমুখে এসব খবব শুনেছেন। এর কি কোনও প্রতিকাব আছে? সমাজ কোথায? বাষ্ট্র কি কবছে? আমবাই বা কি কবতে পারছি? পব পব এই সব কথা মনে হল বিশ্বদীপেব, উপকাব কববাব ইচ্ছে থাকলেও উপকাব কবা যায না। বিশ্বদীপ পাঠকজিকে বলেছিলেন ওকে যদি কোন কাজ দিতে পারেন ফ্যাক্টারিতে। পাঠকজি রাজী হন নি। লোকটা নাকি চোর আব চবিত্রহীন। বউকে বাজারে বিক্রি করে পয়সা বোজগার করে। মেয়েটা তাতে প্রধান বাধা। সেইজন্যই ওব উপব এতো রাগ। বিশ্বদীপ উঠে সামনের জানালাটা বন্ধ করে দিলেন। বন্ধ জানলা ভেদ কবে তবু মেয়েটার আর্তনাদ ভেসে আসতে লাগল—"আর কক্‌খনো করব না, বাবা গো তোমাব পায়ে পড়ি ."

চোখ বুজে বসে বইলেন বিশ্বদীপ।

একটু পরেই বিদুলা এসে ঢুকল হুড়মুড় কবে।

"চোখ বুজে বসে আছে যে? শবীব খাবাপ না কি"

"না। হঠাৎ এলে যে এখন?"

"ওয়ালটেয়ারে যাবে? শ্যামল খুব ভালো-একটা বাড়ি পেয়েছে সেখানে। আমাকে যেতে বলছে। যাবে তুমি?"

"আমি তো এখন যেতে পারব না। ফ্যাক্টারিতে স্ট্রাইক হয়েছে, আদুবাবু এসেছেন, দেশেও নানা গোলমাল, এখন যাই কি করে। তুমি যেতে চাও তো যাও না..."

'শ্যামলের সঙ্গে আমার একা যেতে কেমন ভয় করে। বিশেষত ওই রকম কবিতা লেখার পর—"

"আমি সঙ্গে গেলেও সে ভয় থাকবে। সবটা নির্ভর করছে তোমার উপর। তুমি যদি ঠিক থাক—"

"আমি ঠিক আছি। সে বিষয়ে কিছু ভেবো না।"

"তাহলে চলে যাও।"

"তুমি রাগ করবে না তো? তোমাকে একা ফেলে কোথাও যাইনি। তাছাড়া শ্যামল কি যে করবে শেষ পর্যন্ত।"

"দারোয়ানটাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। রিভলভারটাও নিতে পার।"

"না, না, অতটা ভয় করি না শ্যামল অতটা সাহস করবে না।"

"তবে চলে যাও।"

"রাগ করবে না তো লক্ষ্মীটি।"

"আরে না, না - ।"

"বিদুলা চলে যাবার পর বিদুলার প্রথম দিনের সেই উপহারটার কথা মনে পড়ল বিশ্বদীপের। প্রথম যেদিন সে তাকে চীনে ফুলদানী দুটো কিনে দিয়েছিল, সেদিন বিদুলাও তাকে উপহার দিয়েছিল অদ্ভুত একটা চীনে খেলনা। সত্যিই অদ্ভুত জিনিসটা, কাঠের তৈরী, কাঠের উপর চমৎকার রং ফলিয়েছে চীনে শিল্পী। প্রকাণ্ড মাঠের উপর অনেক দূর দাঁড়িয়ে আছে বিরাট একটা বটগাছ। তার থেকে নেমেছে অসংখ্য ঝুরি গাছকে পৃথিবীর মাটিতে ধরবার একটা চিরস্থায়ী ষড়যন্ত্র যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে চারপাশে। কিন্তু সেই বটগাছের একপাশ থেকে বেরিয়েছে আর একটা ডাল, সবুজ, সতেজ, জীবন্ত সে, তার থেকে ঝুরি নামেনি, সে যেন মাটির সঙ্গে বাঁধা পড়তে চায় না, সে যেন ছুটে যেতে চাইছে আকাশের দিকে। তাতে ঝুরি নেই, কিন্তু দোলনা বাঁধা আছে একটা। নীল আকাশ আর সবুজ মাঠের পটভূমিকায় টুকটুকে লাল দোলনাটি আর সেই দোলনায় বসে আছে বিস্রস্তবাসা আলুলায়িতকুন্তলা সেই মেয়েটি যার কথা কবিরা অনাদি কাল থেকে বলেও শেষ করতে পারছে না, যার চারদিকে অসমাপ্ত কাব্য স্তূপীকৃত হচ্ছে কেবল যুগ যুগ ধরে। একটা চাবিতে দম দিয়ে দিলে দুলতে থাকে দোলনাটা আর বুড়ো বটগাছের অঙ্গে জাগে শিহরন, দূর থেকে বাজতে থাকে আকুল-করা বাঁশীর সুর একটা। বটগাছকে কেন্দ্র করে দু'একটা সবুজ রঙের পাখীও উড়তে থাকে, আকাশে ভেসে আসে মেঘের দল। মনে হয় স্বতঃস্ফূর্ত একটা স্বপ্ন মূর্ত হয়ে উঠল যেন। দোলনা দুলতে থাকে, একবার আকাশের দিকে যায়, আবার নেমে আসে মাটিতে। মনে হয় না ওটা কাঠের তৈরী, মনে হয় যেন জীবন্ত, মনে হয় ওই যেন বিদুলা। অনেকদিন পরে বিদুলা যে চিঠিটা লিখেছিল তার দু'একটা লাইনও মনে পড়ল হঠাৎ। 'কাব্যে কন্দর্পের কথা পড়েছিলাম, তাকে যে কলকাতার রাস্তায় দেখতে পাব একথা স্বপ্নেও কল্পনাও করিনি। আর একটা ভুলও ভাঙল। বুঝতে পারলাম যা অবিনশ্বর তাকে মহাদেবও ধ্বংস করতে পারেন না। মদনকে ভস্ম করার গল্পটা নিতান্তই গল্প।'

বিশ্বদীপ সত্যিই রূপবান। বিশ্বদীপ ভেবেছিলেন এ রূপ সার্থক হবে যদি তা বিদুলাকে ঘিরে জ্যোতির পরিমণ্ডল রচনা করতে পারে। কিন্তু ।

।। তিন ।।

মানসপুরের আকাশ আজ গাঢ় নীল। মনে হচ্ছে যেন ঘননীল মাণিক্যের দ্যুতি স্ফুরিত হচ্ছে ওব নীরব সুদূর গাম্ভীর্য থেকে। বিশ্বদীপ নূতন ধরনের একটা পরিবেশে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। চাবদিকের গাছগুলো চেনা নয়, পাতাগুলো ঝালরের মত আর প্রত্যেক পাতাকে ঘিরে অজস্র ফুল। ছোট ছোট ফুল, কিন্তু নূতন ধরনের দেখতে। চারদিক সাদা, সেই সাদার উপর সূক্ষ্ম গোলাপী রেখার একটি ঢেউ আর মাঝখানটায় কালো আর কালোর উপর সোনালী রেখাব কারুকার্য। মনে হয় ছোট্ট একটি খোঁপা যেন। সাবা গাছ এই ফুলে ভরতি। লক্ষ লক্ষ মেয়ে যেন পিছন ফিরে বসে আছে, কেউ যেন মুখ ফেবাবে না, তাদের খোঁপা থেকেই আন্দাজ করে নিতে হবে তাদেব মুখভাব আব মনোভাব। বিশ্বদীপেব মনে হচ্ছিল ওরা সবাই যেন তাব দিকে পিছন ফিরে বসে মুচকি মুচকি হাসছে। তাদেব মুখেব কৌতুকহাস্য যেন বলছে—তোমাব সঙ্গে আড়ি। বিশ্বদীপ ভাবছিলেন—কি কবে ওদের সঙ্গে ভাব কবা যায়। ভাবছিলেন, গান গাইবেন কি? কে যেন তাঁকে বলেছিল ফুলেবা গান ভালবাসে। দোয়েল শ্যামাব গান শুনে তারা নাকি মুখ ফেরায। বিশ্বদীপেরও গানেব খ্যাতি খুব। কিন্তু সে গান কি......এমন সময় দেখতে পেলেন মুরুব্বী আসছে। মুরুব্বী বহুরূপী লোক, নানা বেশে দেখা দেয়। কখনও কিশোব, কখনও যুবক, কখনও আবার বৃদ্ধ। পোশাকও নানা ধাঁচেব, নানা রঙের। কখনও বঙীন উত্তরীয়, কখনও গৈরিক, কখনও কৌপীনবস্ত, কখনও সাহেবী পোশাক, কখনও বা আর কিছু। তাকে চেনা যায-তার চোখেব দৃষ্টি থেকে। সে দৃষ্টি কখনও বদলায না। তা আলোব মতো, আকাশের মতো। মুরুব্বীর চোখের দিকে চেয়ে বিশ্বদীপ চিনতে পারলেন তাকে। আদ্দির পাঞ্জাবি আর ধুতিতে চমৎকার মানিয়েছে, বিশেষ করে মুখের হাসিটি খুব নূতন মনে হল। মনে হল একটা অনন্ত আশ্বাস যেন হাসি হয়ে ফুটেছে ওর মুখে। মুরুব্বী সবাইকে সমীহ করে কথাবার্তা বলে, যেন সে সকলেব চেয়ে ছোট, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র।

"আপনি গাছেব দিকে অমন করে চেয়ে বসে আছেন যে—"

বিশ্বদীপ বললেন, "ভাবছি ওরা কখন মুখ ফেরাবে।"

"ওরা মুখ ফেরালে কি সামলাতে পারবেন? ওদের খোঁপাগুলো সব একরকম। প্রত্যেকটি মুখ আলাদা, প্রত্যেকটি মন আরও আলাদা। প্রত্যেকটি হাই-পাওয়ার 'বাল্‌ব', টর্চও বলতে পারেন। নানা রঙের। সবগুলো যদি আপনার দিকে ফোকাস করে অন্ধ হয়ে যাবেন। খোঁপা দেখেই সন্তুষ্ট থাকুন—"

চুপ করে রইলেন বিশ্বদীপ। এর উত্তরে কি বলা উচিত তাই ভাবছিলেন। এমন সময় মুরুব্বী মুচকি হেসে বললে, "একটা কথা যদি বলি রাগ করবেন না তো?"

"না, রাগ করব কেন"

"আপনি বিদুলার খোঁপাটাই দেখছেন, মুখটা দেখতে পাননি এখনও"

বিশ্বদীপ অবাক হবার অবসর পেলেন না কারণ এর পরই মুরুব্বী যা করলে তা আরও

বিস্ময়কর। পাঞ্জাবির পকেট থেকে ছোট্ট একটা কাঁচের বাক্স বের করে বললে—"একে চেনেন? আলাপ করুন এর সঙ্গে। একে মানুষের ভাষা শিখিয়ে দিয়েছি। ওর ভাষা আর আপনাকে শিখতে হবে না।"

বিশ্বদীপ দেখলেন কাঁচের ছোট্ট বাক্সটার মধ্যে রঙীন প্রজাপতি বসে আছে একটা। প্রজাপতি বলেই মনে হল তাঁর।

"চমৎকার প্রজাপতি তো!"

"দিনের প্রজাপতি নয়, রাতের প্রজাপতি। ইংরেজরা বলে 'মথ'। আমি নাম দিয়েছি রংবাহারী। এরা রাত্রে বেরোয়। রাতের সব খবর রাখে এরা। দিনের খবর তত রাখে না। আমি এদের দিনের সঙ্গে পরিচয় করে দিতে চাই। আপনিও একটু আলাপ করুন না। আমি ততক্ষণ নওরঙ্গীকে খুঁজে আনি। নওরঙ্গী দিনের প্রজাপতি। তার সঙ্গে এর আলাপ করিয়ে দেব।"

"কোথায় আছে নওরঙ্গী—"

"ওই যে দূরে যেখানে শিয়ালকাঁটার জঙ্গলে অসংখ্য হলদে ফুল ফুটেছে সেখানেই আছে সম্ভবত। ওর বান্ধবী সোনাহলুদ ওই পাড়ারই মেয়ে—"

কাঁচের বাক্সটা বিশ্বদীপের হাতে দিয়ে মুরুব্বী চলে গেল। মিলিয়ে গেল যেন মরীচিকার মতো। মুরুব্বী রহস্যময়, কিন্তু সে বাস্তব, তাকে ছাড়া চলবার উপায় নেই মানসপুরে।

কাঁচের বাক্স থেকে বেরিয়ে এল রংবাহারী। বেরিয়ে চুপ করে রইল।

"এমন সুন্দর নীল তোমার রং...."

"আমার রং নীল নয় শুধু"—রংবাহারী বললে—"আমি দিনের আলোয় নীল, কিন্তু রুদলবাবুর ঘরে যে আলোটা জ্বলে সে আলোয় আমার রং সবুজ"

"রুদলবাবুর সঙ্গে আলাপ আছে নাকি?"

"আমি রোজ রাত্রে ওঁর ঘরে চুপিচুপি যাই, গিয়ে চুপটি করে বসে থাকি ওঁর দেয়ালগিরিটার পাশে। রুদলবাবু আমার দিকে চেয়ে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসেন, আর পা দোলান, তারপর হঠাৎ বলে ওঠেন ওয়াণ্ডারফুল। আমার মনে হয় দিনের আলোতেও যদি আমাকে দেখতেন, দুবার ওয়াণ্ডারফুল বলতেন। কিন্তু দিনের আলোয় আমি বেরুতে ভয় পাই। ফিঙে পাখীরা আমাদের দেখলেই খেয়ে ফেলে। ফিঙে পাখী কালো, রাত্রিও কালো, কিন্তু রাত্রি তো আমাদের কিছু বলে না, তার কালো তার অন্ধকার অপরূপ, সে আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে যায় রূপকথালোকে। দিনের বেলা ওই কালো কেন দেখা দেয় ফিঙে-রাক্ষস হয়ে। কেন হয় বলুন না—"

হঠাৎ বিশ্বদীপ অনুভব করলেন রংবাহারী সর্বাঙ্গ দিয়ে কথা কইছে যেন। এমনিতে মনে হচ্ছে চুপটি করে বসে আছে, কিন্তু আশ্চর্যরকম বাঙ্ময় ওর নীরবতা। নীরবতার ভিতর থেকে কথাগুলো বেরিয়ে আসছে অদৃশ্য বুদ্বুদের মতো।

বিশ্বদীপ বললেন, "কেন হয় তা তো জানি না। যা হয় তা দেখি আর মেনেনি। মাঝে মাঝে আর এক কাণ্ড হয়। যা হয়েছে তা হয়েছে কি না বুঝতে পারি না অনেক সময়। তাই মানতেও পারি না। সব গোলমাল হয়ে যায়"

"ঠিক বলেছেন। আমারও তাই হয়েছে। হঠাৎ একদিন অনুভব করলাম আমি আছি। ছোট্ট একটা চ্যাপটা ডিমের মধ্যে শিমুলগাছের গুঁড়ির ফাটলে। সে ডিম আপনি ফেটে গেল একদিন। তার থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমি নূতন রূপে। পোকার মতো। আশে-পাশে দেখলাম আমারই মতো আরও কয়েকটা পোকা কিলবিল করছে। আমারই ভাই বোন সম্ভবত। কিন্তু একদিনের মধ্যেই তারা কোথায় হারিয়ে গেল। তারপর বিশ্বগ্রাসী ক্ষিধে জাগল পেটে। পাতা খেয়ে বেড়াতে লাগলাম। সমস্ত দিন, সমস্ত রাত ওই এক কাজ। কেবল খাওয়া আর খাওয়া। কত পাতা যে খেয়েছি তার ঠিক নেই। তারপর এল এক অদ্ভুত অবস্থা। অদ্ভুত একটা আলস্য, অদ্ভুত একটা জড়তা। খেতে ভালো লাগে না, নড়তে ভালো লাগে না, কিছু করতে ভালো লাগে না। স্তব্ধ হয়ে গেলাম একেবারে। আমার শরীর শক্ত হয়ে গেল। মনে হল বন্দী হয়ে যাচ্ছি, বাইরের জগৎ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। লুপ্তই হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। তখনও কিন্তু মরলাম না। স্বপ্ন দেখতে লাগলাম, অদ্ভুত একটা নীল স্বপ্ন। আমার যেন নীল ডানা গজিয়েছে, আমি যেন অন্ধকারের সমুদ্রে নীল নৌকো বেয়ে চলেছি...তাবপর হঠাৎ ফেটে গেল শক্ত খোলাটা একদিন। আমি বেরিয়ে এলাম এই বেশে। রাত্রি বলছে আমার বুকে উড়ে বেড়াও, ফিঙে বলছে দেখতে পেলেই খেয়ে ফেলব। এরপর কি হব, কোথায় যাব, আলোয় না অন্ধকারে, আকাশে না গর্তে "

বিশ্বদীপের সব গুলিয়ে গেল। কথাগুলো তাঁর নিজের মনের ভিতর থেকে বেরুচ্ছে, না, রংবাহারী বলছে তা বুঝতে পারলেন না তিনি। দেখলেন রংবাহারীর নীল পাখা দুটো আর সামনের দিকের শুঁড়টা কাঁপছে শুধু।

"কি হচ্ছে, কি হচ্ছে, কি হচ্ছে—"

মাথা নেড়ে নেড়ে কথা বলতে বলতে এগিয়ে এল শারিকা। মানসপুরের শালিক পাখী। ভারী আড্ডাবাজ। দেখা হলে দু'চার কথা বলবেই।

বিশ্বদীপ বললেন, "হয় নি কিছুই। রংবাহারীর সঙ্গে আলাপ করছি। মুরুব্বী ওকে রেখে গেছে আমার কাছে।"

"গোবদাগাবদা বেশ দেখতে তো। মুরুব্বী হয়তো রাগ করবে তা না হলে একবার ঠুকরে দেখতুম। যাত্রা দেখেছ? রুদলবাবু একবার যাত্রা করিয়েছিলেন এখানে। আসরের একধারে আমাদের বসবার জায়গাও ছিল। ভারী মজার জিনিস। যুদ্ধ হল, নাচ হল, গান হল, বিয়ে হল, সব মিথ্যে কিন্তু! গঙ্গাফড়িং সেখানে যা কাণ্ড করেছিল তা আর বলবার নয়। সে হঠাৎ উড়ে গিয়ে বসল রানীর নাকে। রানী মূর্ছা গেল সঙ্গে সঙ্গে। রানীর মুকুটে ছোট ছোট সবুজ পুঁতি ছিল, গঙ্গাফড়িং ভেবেছে ওগুলো সবুজ পোকা বুঝি, ওরা সবুজ পোকা খায়, তাই লাফিয়ে চলে গেছে। সে কি কাণ্ড!"

"হঠাৎ যাত্রার কথা মনে পড়ল কেন তোমার—"

"তোমার এই রংবাহারীকে দেখে। যাত্রার দলে যে রাজা সেজেছিল তার ছিল এইরকম পোশাক। যাই, দেরি হচ্ছে বাবা! আমাকে বাসা বানাতে হবে। পিড়িং—"

উড়ে গেল শারিকা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল মুরুব্বী সাইকেল করে আসছে। তার সামনে দুটো প্রজাপতিও আসছে উড়তে উড়তে। নওরঙ্গী আর সোনা-হলুদ। নওরঙ্গীর ডানা

দুটো কমলা রঙের, তার চারদিকে মিশকালো রঙের খাঁজ-কাটা পাড়। নীচের পাখায় কমলা রঙের সঙ্গে এসে মিশেছে হলুদ রং। সে হলুদের ধারে ধারে আবার হালকা রঙের কালো। ওপরের ডানাতেও কমলা রঙের পাশে পাশে হলুদ আর কালোর হালকা রং ঠিক মুখের দু'পাশ থেকে বেরিয়ে ডানার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে। ওপরের ডানায় দু'টি কালো ফুটকি, নীচের ডানায় দু'টি লাল ফুটকি। কমলা-হলুদ-কালো-লালের স্বপ্ন যেন নওরঙ্গী। সোনাহলুদ আরও সুন্দর। খাঁটি সোনার রং আর হলুদের রং, আর ডানার ধারে ধারে সরু সরু কালো রেখা, আর কিচ্ছু নেই, মনে হচ্ছে আর কিছু থাকবার দরকারই বা কি। এতেই তো মাৎ করে দিয়েছে।

মুরুব্বী এসেই সাইকেলটা থেকে টপ করে নেমে সেটা শুইয়ে রেখে দিলে ঘাসের জঙ্গলে।

"ওরা আমাকে ধরা দিলে না, বললে উড়ে উড়ে যাব। তাই সাইকেল যোগাড় করতে হল একটা। ওদের সঙ্গে উড়তে তো পারি না! বাস্, এইবার আমাদের মীটিংটা করা যাক—"

নওরঙ্গী বসল ঘলঘসে ফুলের উপর। সোনাহলুদ বললে, "আমি বসব না, উড়ে উড়ে বেড়াব। বসলেই নওরঙ্গী এসে বিরক্ত করবে"—বলেই ছোট্ট মিষ্টি শব্দ করল একটা। বিশ্বদীপের মনে হল হাঁচি, কিন্তু আসলে ওটা হাসি। মুরুব্বী বললে, "নওরঙ্গী, রংবাহারীর সঙ্গে আলাপ কর।"

নওরঙ্গী। রুদলবাবু কিন্তু আমাদের পলিটিক্স করতে মানা করে দিয়েছে। তাই রাত্রের অন্ধকারে যে-সব ভয়ংকর কাণ্ড হয় সে সব কথা জিগ্যেস কবব না। আমি শুধু জানতে চাই, ভাই রংবাহাবী তুমি কি খাও?

রংবাহারী চুপ করে বসে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, "আমি ভাই মধু খাই। যে সব ফুলে মধু থাকে আমি সেই সব ফুলের ভিতর আমার এই লম্বা শুঁড়টা ঢুকিয়ে দিয়ে মধু চুষে খাই"

নওরঙ্গী। খাওয়া দাওয়ার পর কি কর?

রংবাহারী। যেখানে আলো দেখি সেইখানে যাই। রুদলবাবুর ঘরে অনেকবার গেছি। ভালো লেগেছে রুদলবাবুকে।

নওরঙ্গী। হাঁ রুদলবাবু ভালো লোক। দিনেও ভালো রাত্রেও ভালো। অনেক লোক দিনে ভালো থাকে, রাত্রে অন্যরকম হয়ে যায়, রুদলবাবু সেরকম নয়।

আর কোথা গেছ তুমি.....

রংবাহারী। নীল আলো জ্বলে সেই যে তোমাদের নবকিশোরের ঘরে—সেখানে। নতুন বিয়ে হয়েছে। বউকে নিয়ে কি কাণ্ড যে করে! তার ঘরে মাঝে মাঝে যাই। বউটি ভারী লক্ষ্মী। রজনীগন্ধার মতো। মনে হয় ওর মুখের ভিতর যদি আমার এই শুঁড়টা ঢুকিয়ে দিতে পারতাম তাহলে অনেক মধু পেতাম বোধ হয়। কিন্তু সাহস করিনি কোনদিন....

সোনাহলুদ রংবাহারীর মাথার উপর উড়ে উড়ে বলতে লাগল—"তোমাকে আমার খুব ভালো লাগছে। কি যে বলব ভেবে পাচ্ছি না।"

নওরঙ্গী। আর কোথায় গিয়েছিলে—

রংবাহারী। ওই যে তোমাদের সিংহ। গাছতলায় বসে থাকে। প্রায়ই আলো জ্বালে না।

কিন্তু জান, এক একদিন জ্বালেও। অনেক রাত্তিরে। মোমবাতির আলো জ্বেলে চিঠি পড়ে। আঁকাবাঁকা হাতের লেখা চিঠি। আমি সিংহের মাথায় চড়ে বসেছিলুম একদিন। ভারী ভালো, কিচ্ছু বলে না।

সোনাহলুদ আর একবার উড়ে উড়ে রংবাহারীকে বলে গেল—"তোমাকে ভালো লেগেছে, খুব ভালো লেগেছে—"

রংবাহারী। আমিও তো তোমাদের দিনের আলোয় আসতে চাই। তুমি কোথায় থাক? তুমি সুন্দর।

সোনাহলুদ। আমি শিয়ালকাঁটা বনে সকালবেলা থাকি, তারপর দুপুবে যাই বধূসরা নদীর ধারে ঘনসবুজ কচুপাতাগুলো যেখানে ঝুঁকে ঝুঁকে জলের আয়নায় মুখ দেখছে অনবরত, ঠিক তার পাশেই আছে ঘেঁটুবন, অজস্র ফুল তাতে, সেইখানে যাই দুপুবে। বেশীক্ষণ থাকতে পারি না অবশ্য, পাশেই বড় বকুলগাছে এক ঝাঁক টিয়া বাসা বেঁধেছে, ভারী চেঁচামেচি করে। বিকেলে যাই রুদলবাবুর গোলাপ বাগানে। আর রাত্রে ফণীমনসার ঝোপে। রাত্রে সেখানে যদি আস দেখা পাবে আমার। তোমাকে খুব ভালো লেগেছে আমার.....এসো, নিশ্চয় এসো....।

সোনাহলুদ ক্রমাগত চক্কোর দিয়ে উড়তে লাগল।

নওরঙ্গী। দেখ্ সোনাহলুদ বড় বাড়াবাড়ি করছিস। অচেনা রংবাহারীকে দেখে ক্রমাগত বলে যাচ্ছিস, তোমাকে খুব ভালো লেগেছে, তোমাকে খুব ভালো লেগেছে। ভেবেছিস এ শুনে আমার হিংসে হবে। কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি আমার কিচ্ছু হবে না। আমি তোর পরোযা করি না.....।

নওরঙ্গী ঘলঘসে ফুলের উপর থেকে উড়ে গিয়ে বাবলাগাছটার ডালে ডালে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

মুরুব্বী তখন বললে, "তোমাদের প্রাইভেট ঝগড়া মীটিংয়ে চলবে না। রংবাহারী দিনের বেলা যদি আসে তোমরা আপত্তি করবে কি না সেইটে আগে ঠিক কর।

নওরঙ্গী। আমাদের দিনের সীমান্ত রক্ষা করে উষা। রাগী মেয়ে। সুন্দরী বলে দেমাকও আছে। সে যদি আপত্তি না করে আমাদের আর আপত্তি কি?

মুরুব্বী। তার মানে শুকতারার খোশামোদ করতে হবে? বেশ তাই করা যাবে। ব্যস, তাহলে ওই কথা রইল। এইবার বিশ্বদীপবাবুকে সিংহের কথা শুনিয়ে দাও কিছু। সিংহের কথা শোনবার জন্যে উনি খুব উৎসুক।

নওরঙ্গী। সিংহ খুব ভালো লোক।

রংবাহারী। চমৎকার, চমৎকার।

সোনাহলুদ। মানসপুরে ওই তো দেবতা।

এমন সময় তড়াক করে লাফিয়ে এল প্রকাণ্ড সোনাব্যাং লম্ফ সিং। রাক্ষুসে চোখ দুটো বিস্ফারিত করে বললে, "এখানে কিসের আড্ডা জমিয়েছ তোমরা?"

মুরুব্বী। সিংহের কথা হচ্ছে।

লম্ফ সিং। সিংহ লোক খুব ভালো। কিন্তু ওর সম্বন্ধে একটা নতুন খবর কাল পেয়েছি, আগে জানতুম না—।

নওরঙ্গী। কি খবর?

সোনাহলুদ। ওর সব খবর আমরা দিয়েছি, ও ভালো লোক, চমৎকার লোক, ও মানুষ নয় দেবতা—এর চেয়ে বেশী আর কি খবর দেবে তুমি।

লম্ফ সিং চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর পটাৎ করে লম্বা জিবটা বার করে পোকা খেয়ে ফেললে একটা। তারপর চোখ দুটো আরও বড় করে বললে, "ওর বউ আছে। জান এ খবরটা?—"

রংবাহারীর ডানা দুটো আর শুঁড়টা কাঁপতে লাগল। সে বলল "জানি। অপরূপ সুন্দরী সে। জ্যোৎস্নার মতো দেখতে। আমি একদিন দেখেছিলাম তার পায়ের উপর উপুড় হয়ে কাঁদছিল বউটি। একটু পরে উঠে চলে গেল।"

লম্ফ সিং বলল, "আরে না, না। আমি যাকে দেখেছি সে মানুষ নয়, ঝুমকোলতা। ঝুমকোলতার ঝোপটার ভিতর ঢুকে আমি একদিন পোকা ধরছিলাম। হঠাৎ সিংহ এসে সেই লতাটার সঙ্গে কথা আরম্ভ করে দিলে। বললে, বউ তোর কাছে দু'দিন আসতে পারি নি। রাগ করেছিস নাকি? আজ তোর গোড়ায় দু'বালতি জল ঢেলে দেব—। আমি তো একথা শুনে অবাক। বেবিয়ে এসে জিগ্যেস করলুম এ তোমার বউ নাকি? সিংহ বললে, হ্যাঁ, এই আমার বউ। আমার যে মানুয-বউ ছিল তারও নাম ছিল ঝুমকো। কিন্তু আমার অসুখের জন্য সে তো রইল না আমার কাছে। এ চিরকাল থাকবে। জিগ্যেস করলুম, তোমার কি অসুখ হয়েছে? উত্তর দিলে না, শুধু হাসলে একটু। ওকে হাসতে দেখলে ভয় করে। ওরে বাবা, একি—"

লম্ফ সিং তড়াক করে একটা লাফ দিয়ে পালিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড ঢেমনা সাপ তীরবেগে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। মুরুব্বী বললে, "তাহলে এইবার সভাভঙ্গ করা যাক। আমি রংবাহারীর জন্যে শুকতারার কাছে খবর পাঠাব। রজনীগন্ধার সঙ্গে ওর খুব ভাব। শুকতারার আলো আর রজনীগন্ধার গন্ধ একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ। একদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে একা একা বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ আবিষ্কার করলাম এটা। আমি ছাড়া এ খবর আর কেউ জানে না, আজ এই তোমাদের প্রথম বললুম! আচ্ছা, তাহলে ওই ঠিক রইল—"

রংবাহারী বলল, "ওই কালো ফিঙে পাখীটার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হল? ও যদি আমাকে খেয়ে ফেলে—"

মুরুব্বী এতে চটে গেল একটু।

"দেখ বাপু, ভয় করলে মানসপুরে থাকা চলবে না। এখানে সাপও আছে, ব্যাঙও আছে, পোকাও আছে, পাখী প্রজাপতিরাও আছে। জন্মও আছে, মৃত্যুও আছে, ক্ষিধেও আছে, খাবারও আছে। কাউকে আমরা বাদ দিয়ে থাকতে পারব না। সবাই মিলেমিশে থাকতে হবে। এই থাকাটা একদিন যদি হঠাৎ না থাকা হয়ে যায় তাতেও আপত্তি করলে চলবে না। কারণ তাতেও আনন্দ আছে....ক্রমাগত নিজের কোলে ঝোল টানলে কি চলে?"

নওরঙ্গী আর সোনাহলুদ সমস্বরে বলে উঠল—"না, না, না। আমরা বাঁচব এবং মরব, থাকব এবং থাকব না। এই আমাদের গান, এই আমাদের ছন্দ....."

উড়ে উড়ে চলে গেল ওরা।

রংবাহারী তখন বলল, "আমি তাহলে এবার কি করব?"

"তুমি উড়ে উড়ে চলে যাও ওদেব সঙ্গে। তোমারও তো ডানা আছে। ফিঙে কিছু বলবে না এখন তোমাকে। সে চিল নিযে ব্যস্ত আছে......"

"তবে যাই—"

রংবাহারীও উড়ে গেল। বিশ্বদীপ দেখলেন তার নীল পাখার নীচে সোনালী রংও রয়েছে। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন সেদিকে। তারপর হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন মুরুব্বী নেই। তাব সাইকেলও নেই।

"এই যে আমি এখানে আছি—"

বিশ্বদ্বীপ দেখলেন ধানক্ষেতের মাঝখানে বসে আছে মুরুব্বী। ধানে শীষ ধবেছে। নুয়ে পড়েছে ধানগাছগুলো। মনে হচ্ছে সবাই যেন মুরুব্বীব দিকেই নুযে পড়েছে আব তাব কানে কানে চুপিচুপি কি যেন বলছে সব। বিশ্বদীপকে দেখে মুরুব্বী একটু অপ্রস্তুত হল। ধানক্ষেত থেকে উঠে এসে বললে, "ওবা এখন যুবতী হযেছে। নানাবকম গোপন কথা জমে ওঠে ওদের মনে। আমাব কাছে সে সব বলে ওরা মাঝে মাঝে। তাই ফাঁক পেলে ওদেব কাছে গিয়ে বসি। তাছাড়া আব একটা সত্যি কথা বলব, যুবতীদেব কাছে বসতে ভালো লাগে- "

"কি বলছিল ওরা—"

"বলছিল এবার তো আমাদের শীষ ধরেছে, এইবার তোমবা আমাদেব বকশিস দেবে। কেটে ফেলবে কচাকচ। রুদলবাবুকে বোলো তাঁর কাস্তেরা যেন ভোঁতা না হয়ে আসে।"

বিশ্বদীপ বুঝতে পারলেন না ঠিক। মুরুব্বী সঙ্গে সঙ্গে বুঝলে ব্যাপারটা। বুললে, "মাথায় ঢুকল না বুঝি। এখানে লোহারাম মিস্ত্রীর পাঁচ পুত্র—কাস্তে, কাটারি, কোদাল, কুড়ুল আব খন্তা। কাস্তের ছেলেরা সব কাস্তে, কাটারির ছেলেরা সব কাটারি, কোদালের ছেলেবা সব কোদাল, খন্তার ছেলেরা সব খন্তা, আর কুড়ুলের ছেলেরা সব কুড়ুল। সুতরাং এ পাঁচটা জিনিসের অভাব নেই রুদলবাবুর। লোহার অন্য জিনিসের দরকার হলে বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। অনেক খরচা পড়ে যায়। রুদলবাবু লোহারামকে বলেছিলেন, তুমি অন্তত কিছু খুরপি আর পেরেক আমাকে দাও। লোহারাম বললে, আর আমি পারব না। যে পাঁচটিকে জন্ম দিয়েছি তারাই পঞ্চপাণ্ডব। কুরুবংশ সৃষ্টি করবার ইচ্ছে নেই আমার। আসলে কি জানেন, লোকটা মহা কুঁড়ে। মধু ছুতোরের সঙ্গে বসে বসে খালি গুড়ুক খাবে আর গল্প করবে। কাস্তে, কাটারি, কুড়ুল, কোদাল, খন্তা এমনিতে বেশ কাজ করে, পাঁচ জনই খুব ভালো মানুষ, কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন যেন ভোঁতা হয়ে যায়। তখন রুদলবাবুকে আবার খরচ করে তাদের শহরে পাঠাতে হয়। বুদ্ধিতে শান দিয়ে আবার ফিরে আসে ওরা। তখন কাজকর্ম বেশ ভাল চলে। ধানগাছগুলো সেই কথাই বলছিল। আমি কথা দিয়েছি রুদলবাবুকে বলব। সেইখানেই যাই। আপনি যাবেন কি? রুদলবাবু এখন বোধহয় তানপুরা সাধছেন।

চড়ুইভাতিতে গান শোনাবেন একটা। ওহো আপনাকে এ কথাটা বলতে ভুলে গেছি। বধূসরা নদীর ধারে হবে। বধূসরাই হচ্ছেন নাটের গুরু। দিনরাত একটা-না-একটা হুজুক নিয়ে আছেন। সেদিন মাছের সভায় গুরুতর গোলযোগ হয়েছিল। আধমনী রুই মাছের প্রতিনিধি গামা বললে—চিংড়িরা মাছ নয়, পোকা। ওরা আমাদের দল থেকে বেরিয়ে যাক। এই বলে ল্যাজের এক ঝাপটায় দূর করে দিলে চিংড়িগুলোকে। বধূসরা না থাকলে সেদিন চিংড়িবাবুরা কলকে পেতেন না। বধূসরা একেবারে মহাত্মা গান্ধির দোহাই পেড়ে বললে, হরিজনরা আজকাল ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পঙ্‌ক্তিভোজনে বসছে। হে মৎস্যবংশাবতংস, তোমরা তো মানুষদের চেয়ে সভ্য, তোমরা পেছিয়ে থাকবে! গামা এই শুনে 'থ'। খানিকক্ষণ আস্তে আস্তে পাখনা নেড়ে বললে, আচ্ছা, আসুক তাহলে ওরা। কিন্তু আমাদের ঘাড়ে চড়তে পাবে না তা বলে দিচ্ছি। মিটমাট হয়ে গেল। আজ আবার বধূসরা চড়ুইভাতির হুজুক তুলেছে। পাহাড়ী তিনজন আসবে, আর আসবে অপ্সরীরা। বধূসরা নদীর জলে আসল রাজহংস এসেছে একজোড়া, পরশু থেকে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, একেবারে নীরব, একটি শব্দ করে না। তারা শুনছি বক্তৃতা করবে। আপনিও যাবেন তো---তাহলে চলুন—"

"আমি আগে সিংহের সঙ্গে দেখা করব---"

"সে আজ বাঁশবনে আড্ডা নিয়েছে, সেইখানে চলে যান তাহলে"

মুরুব্বী এমন হঠাৎ অন্তর্ধান করল যে অবাক হয়ে গেলেন বিশ্বদীপ। সন্দেহ হতে লাগল সে এতক্ষণ ছিল তো!

যেখানটা বাঁশবন আছে সেখানটা চমৎকার। একটি ছোট গ্রাম যেন। গোছা গোছা বাঁশ কিছুদূর অন্তর অন্তর জোট বেঁধে রয়েছে। যেন এক একটি পরিবার। সবুজ সতেজ পাতাগুলো কি সুন্দর! প্রত্যেক গাছটি ঈষৎ হেলে রয়েছে আর তাদের চারিপাশে রয়েছে ছোট ছোট চারার দল। সরু সরু কঞ্চিগুলো যেন সবুজের শিখা। একটু দূরে একটা নেউল ঘুরঘুর করছে। বাঁশঝোপের ভিতর আলাপ শোনা যাচ্ছে—বুলবুলিদের। একজোড়া গাংশালিক চরে বেড়াচ্ছে। শ্যামার শিস শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। আর সবার উপরে ঘননীল আকাশের ছায়াময় নীরবতা আচ্ছন্ন করে রেখেছে চারিদিক।

বিশ্বদীপ প্রথমে সিংহকে দেখতে পাননি। তারপর হঠাৎ দেখলেন একটা বাঁশঝোপের আড়ালে সে হাতজোড় করে চোখ বুজে বসে আছে। একটা ঢিপির উপর কয়েকটা কলা, আর কিছু ভিজে ছোলা রয়েছে। সিংহ তাদেরই পুজো করছে মনে হল। একটু পরে সত্যিই প্রণাম করলে তাদের। বিশ্বদীপ অবাক হলেন। কিন্তু আরও অবাক হলেন যখন সিংহ তাঁর দিকে না ফিরেই বলল, "এঁরা দেবতা, এঁরা আমার প্রাণদাতা, আমার ক্ষুধার আগুনে নিজেদের আহুতি দিয়ে এঁরা আমাকে বাঁচাচ্ছেন, কবে যে এঁদের ঋণ শোধ করতে পারব জানি না। আপনি কখন এলেন—"

বিশ্বদীপ অবাক হলেন, ওর পিঠেও দুটো চোখ আছে নাকি।

"এই একটু আগে এসেছি আমি। শুনলাম বধূসরা নদীর ঘাটে আজ একটা জলসা হবে---"

"হয়তো হবে। কিন্তু সেজন্য আপনি আসেন নি। আপনি এসেছেন আমার কাছে। কিন্তু

যে সান্ত্বনা আপনি আমার কাছে চাইছেন তা তো আপনাকে দিতে পারব না। তা দেওয়া যাবে না, আপনি দু'দিন পরেই বুঝতে পারবেন সান্ত্বনা বলে যা দিয়েছি তা মিথ্যা স্তোকবাক্য। আপনাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, সেইটেই বড় কথা, সেইটেই আসল কথা, সেইটেই একমাত্র কথা। যে বেগুনে পোকা ধরেছে, যে পাঁউরুটিতে ছেতো পড়েছে তা লোকে নেবে না, নেওয়াটা স্বাভাবিক নয়, এই কথাটা মেনে নিতে হবে আপনাকে। রুদলবাবুর মতো লোক বেশী নেই, আর নেই বলে দুঃখ করেও লাভ নেই। পৃথিবীতে একরকম লোক দুটো থাকে না। রুদলবাবু সত্যি সত্যি আছেন কি না তা-ও সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে—"

সামনের একটা কঞ্চির উপৎ একটা টুনটুনি এসে দোল খেয়ে নিল একবার। বিশ্বদীপ তাই দেখতে লাগলেন। প্রথম টুনটুনিটা উড়ে যাবার পর আর একটা টুনটুনি এল, সেও দোল খেল। তারপর বাঁশঝাড়ের ভিতর থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাক ভেসে এল—পিঁচ্ পিঁচ্ পিঁচ্। দ্বিতীয় টুনটুনিটা উড়ে গেল। সিংহকে কি বলতে এসেছিলেন তা ভুলে গেলেন বিশ্বদীপ। বিস্মৃতির একটা কুয়াশায় চারদিক ঢেকে গেল যেন। সেই কুয়াশার ভিতর দিয়ে দিয়ে হাঁটতে লাগলেন তিনি। অনেকক্ষণ হাঁটলেন। তারপর একটা কলকণ্ঠের হাসিতে কুয়াশা মিলিয়ে গেল। বিশ্বদীপ দেখলেন—বধূসরা নদীর সেই বাঁকটায় তিনি এসেছেন যেখানে ঘনসবুজ মাঠের উপর কৃষ্ণচূড়াগাছটি সর্বাঙ্গে লাল ফুল ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার তলায় বসেছে সভা। হিল্লোলা হাসছে। রুদলবাবু তানপুরা কোলে নিয়ে বসে আছেন, তাঁর মুখেও হাসি। হাসিটা মনে হচ্ছে পাতার-ফাঁকে-ঝরে-পড়া সূর্যালোকের মতো। তিনজন পাহাড়ীও বসে আছে একধারে। হিল্লোলা হাসছে অসাধ্যসাধনের বাম উরুর উপর বসে। দীর্ঘকায় অসাধ্যসাধনেব মুখে আশ্চর্য দীপ্তি ঝলমল করছে একটা। অসাধ্যসাধন বলছেন, "আমরা ব্রহ্মচারী, পাহাড়ে থাকি। এমন অপ্সরীর দেখা সেখানে ক্বচিৎ পাই। বধূসরা যে মাছভাজা আজ আমাদের খাইয়েছেন, তা-ও আমাদের অদৃষ্টে বড় একটা জোটে না। যা দুষ্প্রাপ্য তা পেলেই আনন্দ হয়। সুতরাং আজ বড়ই আনন্দিত হয়েছি। যা অপ্রত্যাশিত তা পেলেই বোঝা যায় যে অপ্রত্যাশিত বলে কিছু নেই, এবং এই বোধই আনন্দজনক।"

রুদলবাবু বললেন, "আপনার এই ভাবটি বড় সুন্দর। যদি অনুমতি করেন এটা আমার তানপুরায় বাজাই"

রুদলবাবু অদ্ভুত একটা সুর বাজাতে লাগলেন।

হিল্লোলা বলল, "আমরা নাচব"

পাঁচজন অপ্সরাই নাচতে লাগল। বিশ্বদীপের মনে হ'ল পাঁচটা রং যেন নেচে বেড়াচ্ছে। শুধু নাচ নয়, গানের কলিও ফুটে উঠছে একটা মাঝে মাঝে। তাতে কথা নেই কেবল সুর আছে। সেই ভাষাহীন সুর যেন বলছে—আমি এসেছি তোমাদের মনে। মনেই অপরূপ হয়ে থাকব। ভাষায় বাঁধা পড়লেই কেউ হব সবুজ, কেউ নীল, কেউ হলুদ, কেউ লাল, কেউ গোলাপী—কিন্তু তা আমরা হব না, ভাষার নাগালে ধরা পড়ব না কিছুতেই। মনে মনেই আমাকে দেখ, আমাকে শোন।

"বসুন"—চুপিচুপি কে যেন বললে।

বিশ্বদীপ তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন বধূসরা একটি মখমলের মোড়া এগিয়ে দিচ্ছেন তাঁর দিকে।

"বাঃ, এমন সুন্দর মখমল পেলেন কোথা থেকে—মনে হচ্ছে বিদেশী"

"না, একেবারে দেশী। আমার যেখানটায় স্রোত নেই, সেখানে শ্যাওলা এসে জমে। তারা বেশী দিন বাঁচে না। তাদের বাঁচিয়ে রাখি আমি স্নেহ দিয়ে, কল্পনা দিয়ে। তারা একদিন আমায় বলেছিল প্রতিদানে কি তোমাকে দেব। আমাদের নিয়ে যা খুশি কর তুমি। অতিথিদের বসবার জন্য কয়েকটা আসন বানিয়েছি তাই। বসুন—।"

খুব মৃদুকণ্ঠে এ কথা ক'টি বলে বধূসরা আবার নেবে গেল নদীর জলে। নদীটা এতক্ষণ যেন নির্জীব ছিল, এবার সজীব হয়ে উঠল। তার প্রতিটি তরঙ্গ যেন আরও হিল্লোলিত হল, প্রতিফলিত আলোকে জাগল নূতন ভাষা, নূতন হাসি। তারপর হঠাৎ গান থেমে গেল। থেমে গেল রুদলবাবুর বাজনা। সব বদলে গেল যেন হঠাৎ। বিশ্বদীপ দেখলেন পাঁচটি সাদা ভুইচাঁপা সবুজ মাটি ভেদ করে ফুটে উঠেছে। আর পাঁচটি একাগ্র হয়ে চেয়ে আছে অসাধ্যসাধনের দিকে। রুদলবাবু হাত জোড় করে আছেন। তাঁর তানপুরাটাও মানুষের মূর্তি ধরে তাঁর পাশে বসে হাতজোড় করে রয়েছে। সকলেরই দৃষ্টি অসাধ্যসাধনের দিকে।

অসাধ্যসাধন বললেন, "বুঝেছি, তোমরা আমার কাছে পুরাণের গল্প শুনতে চাইছ। বেণ রাজার গল্পটা শোন তাহলে। তোমরা আজকাল মনে কর যে আজকালই বুঝি দুর্ধর্ষ বদমাশ লোক জন্মাচ্ছে, আগে বুঝি সব ভালো ছিল। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। রাবণের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তোমাদের ধারণা রাবণ রাক্ষসবংশের লোক ছিল, সে তো দুরাত্মা হবেই। কিন্তু বেণ রাক্ষসবংশের ছিল না। অত্রি বংশে অঙ্গ নামে যে সর্বশক্তিমান প্রজাপতি ছিলেন তিনিই বেণের বাবা। অবশ্য মায়ের দিকে গোলমাল ছিল কিছু। বেণের মা ছিলেন মৃত্যুর কন্যা সুনীথা। বেণ প্রজাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ঘোর অত্যাচারী আর অধার্মিক হয়ে উঠলেন। বৈদিক ধর্ম উঠিয়ে দিলেন একেবারে। বেদের অধ্যয়ন পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। দেবতারা সোমরস পান করতে না পেয়ে চটে গেলেন। বেণ সবাইকে বলতে লাগলেন, 'আমাকেই পূজা কর, আমিই যজ্ঞ, আমিই যজ্ঞকর্তা। যত হোম আমার উদ্দেশ্যেই অর্পিত হোক।' মরীচি প্রভৃতি মুনিরা অনেক বোঝালেন তাঁকে। কিন্তু বেণ তাঁদের কথায় কর্ণপাত না করে ক্রূর হাসি হেসে বললেন, 'আমার চেয়ে বড় ধর্মের স্রষ্টা আর কে আছে? আমিই বীর্য, আমিই তপস্যা, আমিই সত্য। আমার থেকেই পৃথিবীর সমস্ত কিছু উৎপন্ন হয়েছে। তোমরা অতি মূঢ়, তাই একথা বুঝতে পারছ না। আমি ইচ্ছা করলে সমস্ত সৃষ্টি জ্বালিয়ে দিতে পারি, বন্যায় প্লাবিত করতে পারি, আমি সর্বশক্তিমান। যজ্ঞটজ্ঞ ছেড়ে দাও, আমাকেই তোমরা পূজা কর। আমিই একমাত্র পূজ্য।'

বেণের কথা শুনে মহর্ষিরা বুঝলেন শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। লোকটা অতি পাজি। তখন তাঁরা লড়ে গেলেন তাঁর সঙ্গে। তাঁকে পরাজিত করে তারপর তাঁরা যা করলেন তা বড় অদ্ভুত। হরিবংশে লেখা আছে—তাঁরা তাঁকে নিগ্রহ করে তাঁর বাম উরু মন্থন করতে লাগলেন। তাঁর মথ্যমান বাম উরু থেকে বেরুল অত্যন্ত বেঁটে আর অত্যন্ত কালো একটা

পুরুষ। মুনিদের দেখে হাতজোড় করে সে দাঁড়িয়ে রইল। মানে, অত্যন্ত ভয় পেয়েছিল। মুনিরা তাকে 'নিষীদ' এই বাক্য বলে বসতে বললেন। হরিবংশ বলছেন এর থেকেই তার 'নিষাদ' নাম হয়ে গেল এবং এই জন্যেই সে নিষাদবংশের জন্মদাতা হল। অর্থাৎ বেণের মধ্যে যেটুকু পাপ ছিল তা বেরিয়ে গিয়ে সৃষ্টি করল বর্বর জাতির। মুনিগণ তখন বেণের দক্ষিণ পাণি মন্থন করতে শুরু করলেন। সেই দক্ষিণ পাণি থেকে আবির্ভূত হলেন মহারাজ পৃথু, হাতে আজগব ধনু, অঙ্গে কবচ, হাতে দিব্য শরমালা। মূর্তিমান অগ্নির ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন তিনি। বেণ ইহলীলা সংবরণ করে স্বর্গবাসী হলেন। পৃথু তখন রাজ্যশাসনের ভার নিলেন। তিনি সমস্ত প্রজাগণের মনোরঞ্জন করতে লাগলেন বলে তাঁর রাজা নাম হল। মহাপ্রতাপশালী ছিলেন তিনি, যখন সমুদ্রের দিকে যেতেন তখন সমুদ্রের জল স্তব্ধ কঠিন হয়ে স্থল হয়ে যেত, পাহাড়ের দিকে গেলে পাহাড়রা সরে গিয়ে তাঁকে পথ করে দিত, গাছের ডাল ভাঙা যেত না তাঁর রাজত্বে, চাষ করে ফসল উৎপন্ন করতে হত না, চিন্তা কবলে ফসল আপনাআপনি গজিয়ে উঠত ভূমি ভেদ করে। সমস্ত গাভীবা কামধেনু হয়ে গেল, পত্রে পত্রে মধু সঞ্চার হতে লাগল। তখন পিতামহ যজ্ঞে সুত ও মাগধগণেব সৃষ্টি কবলেন। দেবর্ষিগণ সেই সুত ও মাগধগণকে বললেন, তোমরা পৃথুর স্তুতিগান কব। তাদেব কাছে পৃথুর সমস্ত গুণাবলীও বিবৃত করে বললেন তাঁরা। তা শুনে সুত ও মাগধগণ পৃথুব স্তবগান কবতে লাগলেন। স্তবগানে প্রীত হয়ে পৃথু রাজা পুরস্কৃত করলেন তাঁদেব। সুতদেব দিলেন অনূপদেশ আর মাগধদের দিলেন মগধ। তখন সমস্ত প্রজা আর মুনিগণ এসে বললেন, আমাদেরও বৃত্তি দাও। এ শুনে পৃথু ভাবলেন ধরিত্রী সমস্ত সম্পদেব অধিকাবিণী। তাঁর কাছ থেকেই সম্পদ আদায় করে প্রজাগণকে দিতে হবে। তখন তিনি ধনুর্বাণ নিয়ে ধরিত্রীকে পীড়ন করতে শুরু করলেন। বসুন্ধরা যেখানেই যান সেখানেই দেখেন পৃথু ধনুর্বাণ নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন কি ব্রহ্মলোকে গিয়েও তিনি নিস্তার পেলেন না। দেখলেন দেবতারা পর্যন্ত পৃথুর ভয়ে ত্রস্ত। তখন তিনি হাতজোড় করে পৃথুকে বললেন, আমি স্ত্রীলোক, আমাকে হত্যা করা বা পীড়ন করা তোমার উচিত নয়। আমিই জগৎকে ধারণ করে আছি। আমি বিনষ্ট হলে তোমার সমস্ত প্রজাই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমি স্ত্রীলোক, আমাকে বধ করে তোমার মতো পুণ্যাত্মা পাতকগ্রস্ত হবে একথা আমি ভাবতেও পারি না। তুমি কথাটা ভেবে দেখ। পৃথু বললেন—প্রাণহানি করলে পাতক হয় একথা আমি জানি। কিন্তু একজনকে নিধন কবলে বা পীড়ন করলে যদি বহুলোকের উপকার হয় তাহলে তাতে পাতক তো হয়ই না, অনেক সময় পুণ্যও হয়। প্রজাগণের জন্যেই আমি তোমাকে হনন করতে উদ্যত হয়েছি। প্রজাপালন করা আমার কর্তব্য। তুমি যদি আমার প্রজাদের সঞ্জীবিত রাখ, তাদের সমস্ত অভাব যদি মিটিয়ে দাও, তাহলে তুমি আমার দুহিতা হবে। তোমাকে দোহন করে আমি সকলকে প্রতিপালন করব। বসুন্ধরা বললেন, বেশ, আমার তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু আমাকে যদি দোহন করতে চাও, তাহলে আমার জন্য একটি বৎস অনুসন্ধান কর। সেই বৎস এমন হওয়া চাই যাকে দেখে আমার ক্ষীর আপনি ক্ষরিত হবে। আমি এখন অসম হয়ে আছি, আমার দেহের কোথাও উঁচু কোথাও নীচু। তুমি আমাকে সর্বত্র

সমান কর যাতে আমার ক্ষরিত ক্ষীর সর্বত্র সঞ্চারিত হতে পারে। এই শুনে বেণনন্দন পৃথু ধনুষ্কোটি দ্বারা সমস্ত পাহাড় পর্বত কেটে সমান করে ফেললেন। আগে পৃথিবী বিষম ছিল এখন সব সমান হয়ে গেল। তাতে অনেক সুবিধা হল। প্রজাদের বসতি বাড়ল। চাষ করবার মতো জমিও হল অনেক। পৃথু স্বয়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করে পৃথিবী থেকে শস্য দোহন করতে লাগলেন—"

এই সময় বাধা পড়ল। লম্ফ সিং হঠাৎ কোথা থেকে লাফিয়ে এসে পড়ল সকলের মাঝখানে। বলল, "আপনার এ গল্পের নীতি কি তা বুঝিয়ে দিন"

অসাধ্যসাধন বললো, "সব ভালো গল্পের যা নীতি এরও তাই। অর্থাৎ পৃথিবীতে নতুন কিছু হচ্ছে না। একই জিনিস বার বার হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। নাম বদলে রূপ বদলে একই ব্যাপার ঘটছে বার বার। এখনও মহাপাপী বেণেদের জন্ম হচ্ছে, এখনও মহর্ষিরা তাঁকে মন্থন করে তার ভিতর থেকে পৃথুর মতো শক্তিমান পুণ্যবান রাজাকে সৃষ্টি করছেন। প্রজার মঙ্গলের জন্য এখনও শক্তিমান রাজারা পৃথিবীকেই দোহন করছেন। নূতন আর কি হচ্ছে। এই রকমই চলবে।"

লম্ফ সিং চোখ পাকিয়ে বললে, "কেন?"

অসাধ্যসাধন বললেন, "তুমি তো লাফাতে পার। একলাফে আকাশে চলে যাও। আকাশকে জিগ্যেস কর—কেন। সে হয়তো উত্তর দিতে পারবে। আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ, আমি সব 'কেন'র উত্তর জানি না!"

"বেশ—"

লম্ফ সিং একলাফে আবার বেরিয়ে গেল।

অসাধ্যসাধন তখন শ্রীমন্ত-প্রতিমের দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি এবার তোমার গল্পটা শোনাও এঁদের।"

কিছুক্ষণ হাসিমুখে চেয়ে থেকে অবশেষে শ্রীমন্ত বললেন, "আমি যা বলব তা যদি আপনারা নিছক গল্প বলে মনে করেন অর্থাৎ মিথ্যা বানানো কাহিনী মনে করেন তাহলে খুব দুঃখিত হব আমি। তবে একথাটাও আমি গোড়াতেই আপনাদের বলে দিতে চাই যে এটা সত্য কি না তা-ও আমি হলপ করে বলতে পারব না। পাহাড়ের ওপারে মহাসমুদ্রে আমি যখন পাড়ি দিতে যাই, তখন সত্য-মিথ্যা সব একাকার হয়ে যায়। ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনাগুলো সূর্যের আলো লেগে যখন রামধনুরঙের হয়ে যায়, আকাশের মেঘ আর সমুদ্রের জল যখন লুকোচুরি খেলতে থাকে, কোন্‌টা মেঘ আর কোন্‌টা সমুদ্র যখন ঠিক করা মুশকিল হয়, তিমিমাছের দল যখন দূর সমুদ্রের জলে খেলা করে, আমার ময়ূরপংখীর সঙ্গে সমুদ্রের বড় বড় পাখীরা যখন বন্ধুত্ব করতে আসে, খাঁটি মুক্তোর মুকুট মাথায় পরে মৎস্যনারীরা যখন সাঁতার দিয়ে বেড়ায়, জীবন্ত শঙ্খদের আভাস যখন ফুটে ওঠে ফেনার ঘূর্ণাবর্তে, তখন সত্যের হালকে আঁকড়ে থাকতে ভুলে যাই, অথচ আবার মাঝে মাঝে আবিষ্কার করি যে সত্যের হালকেই তো আঁকড়ে আছি, পঞ্চইন্দ্রিয় প্রত্যহ যে সত্য পরিবেশন করছে চেতনার কাছে তাকে অস্বীকার করবার সামর্থ্য তো নেই, আবার সঙ্গে সঙ্গে দেখি সেই নীলাম্বরী সুন্দরীকে যে সোনার কলস আঁকড়ে ধরে দিগন্তরেখায় আবির্ভূত হয় অগাধ

সাগরজলে, প্রশ্ন জাগে—সাগরজলে সূর্য উঠছে, না ডুবছে? আবার তখন সত্য ও কল্পনা এক হয়ে যায়। সত্যের হালটা তখন যায় হারিয়ে, হাত বাড়িয়ে তাকে খুঁজতেও আর ইচ্ছে করে না। অন্তর্যামী কিন্তু বুঝতে পারেন যা দেখছি তা সত্য। মিথ্যা হলেও সত্য।

আমি এবার পাড়ি দিয়েছিলাম পরশপাথরেব খোঁজে। শুনেছিলাম সপ্তর্ষি নক্ষত্রমণ্ডলের ছায়া যেখানে সাগরজলে কাঁপে না, তার একটু কাছেই নাকি পবশপাথরের দ্বীপ আছে। সে দ্বীপে যত পাথর আছে সবই নাকি পরশপাথর। দেখতে সাধাবণ নুড়িব মতো, কিন্তু পরশপাথর। লোহারা সে অঞ্চল থেকে দূরে সরে গেছে পাছে তাদের জাত চলে যায়। তাবা একটু দূবে গিয়ে জমা হয়েছে সাগরজলে, সেখানকার জল শক্ত হয়ে গেছে তাই, তাই সেখানে সপ্তর্ষির ছায়া কাঁপে না। এই দ্বীপের খোঁজে বেবিয়েছিলাম এইবাব। কিন্তু ঘুবতে ঘুরতে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পড়লুম যেখানে সাতরকম ঝড় দাপাদাপি করছে কেবল। আমার ময়ূবপংখীটাকে নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলতে লাগল। আমি তখন বন্ধুটিকে বললাম—যাব নাম আপনাবা দিয়েছেন সাগর-সঙ্গম—তাকে ডেকে বললাম, ওহে ব্যবস্থা কর একটা। আমাব বন্ধুটি সারাক্ষণ চোখ বুজে থাকে, বলে আমি স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু আমাব সন্দেহ ও ঘুমায। অনেক ঠেলাঠেলির পর ও উঠে বাঁশী বাজাতে লাগল। আব সঙ্গে সঙ্গে ঝড় তুফান শান্ত হয়ে গেল সব। সাতটি মুগ্ধ দৈত্য তখন আমার ময়ূবপংখীতে উঠে এসে বললেন, বাঁশীর অপূর্ব সুর শুনে আমরা শান্ত হয়ে গেছি বটে, কিন্তু আমরা দাপাদাপি কবতে চাই। আমরা সাতটি ঋষির বিক্ষুব্ধ অন্তর। ঝড়েব মূর্তি ধারণ করে বাইবে এসেছি। ওই দেখুন, একটু দূরে ওঁরা নাকানি-চোবানি খাচ্ছেন। সত্যিই দেখলুম একটু দূরে সাতজন বিখ্যাত মহর্ষি হাবুডুবু খাচ্ছেন। তাঁদের দাড়ি আর জটা বেয়ে জল পড়ছে। ময়ূবপংখীটা নিয়ে গেলুম তাঁদের কাছে। অনেক মিনতি করার পর তাঁরা ময়ূরপংখীতে উঠে এলেন। জিজ্ঞাসা কবলাম, কি ব্যাপার। তাঁরা এমন কৃচ্ছ্রসাধন করছেন কেন। বশিষ্ঠ বললেন, এখানে আমরা একটা কুষ্ঠদ্বীপ স্থাপন করেছি। সে দ্বীপে নিয়ম করেছি যাদেব কুষ্ঠ হয়েছে তারা কুষ্ঠরোগীকে বিয়ে করতে পারবে না। সুস্থ একজনকে বিয়ে করতে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ রকম নিয়ম করার মানে? পুলহ বললেন, মানে অতি সোজা। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকেরা যে পাপী নয়, তাদের যে ঘৃণা করা উচিত নয়, এইটে প্রচলিত করবার জন্যে এ নিয়ম করেছি এখানে। আমি বিস্মিত হলাম। জিগ্যেস করলাম—এ রকম নিয়ম চলবে কি? এখানে কুষ্ঠরোগীই বা এল কোথা থেকে আর সুস্থ লোকই বা কে আছে? অত্রি বললেন—এই দ্বীপটি আমাদের শাসনাধীন। এখানে গন্ধর্ব আর গন্ধর্বীদের আবাস। তারা আমাদের হুকুম ছাড়া অন্য কোথাও যেতে পারে না। স্বর্গ-লোক থেকে স্বয়ং শচীদেবী ওদের খাবার পাঠান, স্বর্গলোকেব শিল্পী ওদের পরিচ্ছদের ভার নিয়েছেন। ওদের কোনও কষ্ট নেই। এই সমুদ্রের মাঝখানে সন্ধ্যা উষা ওদের রোজ প্রসাধন করে, জ্যোৎস্না আনে রূপের পসরা। ওরা মহাসুখে আছে, আব চিরকাল থাকবে যদি ওরা আমাদের শাসন মেনে চলে। মর্ত্যের পথে ঘাটে কুষ্ঠরোগীরা কিলবিল করছে, তাদের কোন দোষ নেই অথচ তাদের দুঃখ অন্তহীন। এ দেখে বন্ধু পুলস্তর হৃদয় বিগলিত হল। পুলস্ত তখন বলতে লাগলেন, এদের যদি আমরা ব্যবস্থা না করতে পারি, তাহলে আমাদের সমস্ত তপস্যা বৃথা। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনজনের কাছেই গেলুম

আমরা। তাঁরা বললেন, আপনারা মহাতপস্বী, আপনারা যা করবেন তাই হবে। তখন আমরা সমস্ত কুষ্ঠরোগীদের এনে আমাদের এই দ্বীপে জমা করলুম। অঙ্গিরা তখন বললেন, আর নিয়ম করলুম রূপবান রূপবতী গন্ধর্ব গন্ধর্বীরা কুষ্ঠকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। ওদের রূপ অক্ষয়, কুষ্ঠের সংস্পর্শে এলে সে রূপ নষ্ট হবে না। বরং ওদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলে কুষ্ঠ রোগীরা ভাল হয়ে যেতে পারে এ সম্ভাবনা আছে হয়তো ওদের সন্তান সন্ততিরাও সুস্থ হবে। এই সব ভেবে আমরা এই নিয়ম করেছিলাম। মর্ত্যলোকে কোন কুষ্ঠরোগী দেখলেই আমরা পবনদেবের সহায়তায় তাকে এখানে নিয়ে আসি। মর্ত্যের গ্লানিময় জীবনের ক্লেদ থেকে মুক্ত হয়ে তারা এখানে বেশ সুখে থাকে। অনেক গন্ধর্ব গন্ধর্বীদের সঙ্গে বিয়েও হয়েছে তাদের। কিন্তু । অঙ্গিরা থেমে গেলেন হঠাৎ। তাঁর চক্ষু দুটিতে বন্যাভা ফুটে উঠল। মরীচি তখন আর্তনাদ করে উঠলেন। বললেন কিন্তু সর্বনাশ হয়েছে গন্ধর্বীদের মধ্যে একজন প্রতিবাদ করেছে। সে বলেছে আমার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন কুষ্ঠরোগীকে বিবাহ করব না। সে গদ্যে বলে নি কবিতায় বলেনি গানে বলেছে ওরা বিখ্যাত গাইয়ে। গানই ওদের ধর্ম। সুতরাং ওর দলে বড় বড় মুগ্ধ গন্ধর্ব জুটে গেছে হাহা হুহু হংস, তুম্বুরু ওর পক্ষ নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছে। এ আন্দোলন আমরা থামাতে পাচ্ছি না। আমাদের শক্তির অহংকার চূর্ণ হয়েছে, আমাদের তপোবল ভূলুণ্ঠিত তাই ঠিক করেছিলাম সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করব। কিন্তু তপস্যার জোরে আমরা এককালে অমর হয়েছিলুম তাই আত্মহত্যা করতে পাচ্ছি না। সমুদ্রে ডুব জল পাওয়া যাচ্ছে না কি করব এখন বুঝতে পাচ্ছি না। ওই দেখ, ওই দেখ সেই মেয়েটা আবার গান ধরেছে গান দিয়েই ও পাগল করে দেবে সকলকে এর পর যা হল তা আরও আশ্চর্য। আমরা দেখলাম সত্যিই অপরূপ একটি রূপসী তীরে বসে গান গাইছে। সে গানও আশ্চর্য গান চোখের সামনে দেখলাম সে গানের শক্তিতে সাতজন ঋষি বিগলিত হয়ে সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিশে গেলেন। ঠিক যেন বরফের চাঙড় গলে গেল সূর্যালোকস্পর্শে। আমিও গলে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আপনাদের সাগর সঙ্গম একটা বেসুরো ধমক দিয়ে বললে, খবরদার। রূপসী অন্তর্হিত হল, গান থেমে গেল। বেসুরো ধমক হারিয়ে দিলে সুরকে। আমার মনে হয় ওই ঋষিরা যদি বেসুরো ধমক দিতে পারতেন তাহলে বোধহয় সব ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু ঋষিরা তো বেসুরো কিছু করতে পারেন না। ছন্দ, সুর, তাল তাঁদের মজ্জাগত হয়ে গেছে। তাই মুর্শাকিলে পড়েছেন—"

বিশ্বদীপ জিগ্যেস করলেন, "যে মেয়েটিকে দেখলেন সে ঠিক কি রকম দেখতে বলুন তো"

"সে রূপসী। এর বেশী আর কিছু বলতে পারব না। আমাদের ভাষার ওইখানেই অক্ষমতা। কারো ঠিক রূপ সে বর্ণনা করতে পারে না।"

বিশ্বদীপের মনে হল একটা সবুজ কুয়াশা যেন চারিদিক ছেয়ে ফেলছে। আর সেই সবুজ কুয়াশার মাঝে উড়ে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকির দল। নানারঙের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাদের গা থেকে। হঠাৎ কানের কাছে তিনি একটা সুড়সুড়ি অনুভব করলেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন মুরুব্বীর গোঁফের ডগাটা তাঁর কানে এসে ঠেকেছে। মুরুব্বী চুপিচুপি বলল, "ও জানে না, আমি জানি। মেয়েটি বিদুলার মতো দেখতে। সম্ভবত বিদুলাই—"

সবুজ কুয়াশাটা মিলিয়ে গেল। বিশ্বদীপ বুঝতে পারলেন স্বপ্ন নেমেছিল তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন কবে, আর তাঁব চিন্তাগুলো হয়ে গিয়েছিল জোনাকির দল। সব মিলিয়ে গেল। তারপর তাঁর মাথায় কে যেন হাতুড়ি মারল। কড় কড় করে নড়ে উঠল কড়াটা।

।। চার ।।

"আসতে পাবি?"

"আসুন"

পাঠকজি এসে প্রবেশ করলেন। পাঠকজিকে দেখে মনে হয় না যে তিনি ধূর্ত লোক। তাঁর মুখখানা একতাল মাখনের মতো। মনে হয় গালে আঙুল দিলেই বুঝি আঙুলটা ডুবে যাবে। খুব সামান্য কটা রঙের গোঁফ আছে। দাড়ি নেই। ভুরুও কটা। ছোট ছোট চোখ। চোখের তাবা ধূসব। থ্যাবড়াথোবড়া, বেঁটে, থলথলে গোছের লোকটি। মেরজাই গায়ে দেন। পাযে বিদ্যাসাগবী চটি। কপালের মাঝখানে একটি টিপ। সেটিও ধূসর রঙের। মাথায প্রকাণ্ড টাক। কপাল খুব প্রশস্ত নয়, কিন্তু বেশ উঁচু। মনে হয় যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তিনি যখন চুপ করে থাকেন তখনও তাঁব দুই গালের নীচের দিকটা এবং থুতনিব পিছন দিকটা থবথর করে কাঁপে। মনে হয় তাঁর কোন চিন্তা যেন বাইরে আত্মপ্রকাশ কবতে চাইছে কিন্তু তিনি আত্মপ্রকাশ করতে দিচ্ছেন না। সেইজন্যই এই কম্পন।

বিশ্বদীপ হেসে বললেন, "আসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম একটু আগে। ডাক্তার ঘোষাল যে আর্টিস্টকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন তিনি বিজ্ঞাপনের জন্য একটা ছবি দিয়ে গেছেন। এই দেখুন। এটা কি পছন্দ হবে আপনার?"

পাঠকজি তোতলা। সহজে কথা বলেন না। বক্তব্য প্রায়ই লিখে দেন। পকেট থেকে তিনি কাগজ কারবন পেপার আর পেন্সিলটি বার করলেন। তিনি সাধারণতঃ লিখে উত্তব দেন। যা লেখেন তাব কাববন কপি রেখে দেন নিজের কাছে। ছবিটি দেখে লিখলেন—"এ ছবি অতি বাজে হয়েছে। বিজ্ঞাপনে দিলে আমাদের সুনাম কলঙ্কিত হবে। ফেরত দাও, এ চলবে না"

বিশ্বদীপকে তখন বলতে হল, "আমি ছবিটি কিনে ফেলেছি"

পাঠকজি একবার নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন বিশ্বদীপের দিকে। তারপর লিখলেন—"তাহলে রেখে দাও। কিন্তু আমার পরামর্শ, ওটা আর বাঁধিয়ো না। বৈঠকখানাতেও টাঙিও না। কাঁটি ঠুকে বাথরুমে টাঙিয়ে রেখো। কত টাকা দিয়েছ ওকে— ?"

বিশ্বদীপকে একটু ইতস্ততঃ করে অবশেষে সত্যি কথাটাই বলতে হল—"একশ টাকা দিয়েছি।" পাঠকজি আর একবার নিষ্পলক হয়ে গেলেন। তারপর লিখলেন—"রথচাইল্ড্ শুনেছি নোট জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাতেন। তিনি শেষ পর্যন্ত ফতুর হয়েছিলেন কি না জানি না। তোমাকে শুধু এইটুকু বলতে পারি রথচাইল্ডের মতো টাকা তোমার নেই। দু'দিনে কাত হয়ে যাবে।"

বিশ্বদীপ তাকে সান্ত্বনা দেবার সুরে বললেন—তিনি আরও ছবি এঁকে দেবেন। ছবি-পিছু তিনি একশ' টাকার বেশী নেবেন না। নিজে মুখে তিনি একথা ব'লে গেলেন।"

পাঠকজি লিখলেন—"আমাদেব আব ছবিব দবকাব নেই। বিজ্ঞাপনেব জন্য খুব ভালো দুটি ছবি পেয়েছি। একটি হচ্ছে উদীযমান সিনেমা-তাবা নিখুঁতকুমাবীব। তিনি 'পবিষ্কাব সাবান হাতে কবে হাসছেন। নিজে হাতে লিখেও দিয়েছেন, 'পবিষ্কাব' সাবান মেখে আমি আনন্দ পেয়েছি। আমাব মাঝে মাঝে ব্রণ হত। এ সাবান মাখাব পব থেকে আব হয়নি। দ্বিতীয় ছবিটি দিয়েছেন স্বামী গহনানন্দ। উঠতি স্বামীদেব মধ্যে উনি প্রধান আজকাল তিনি 'পবিষ্কাব' সাবান সম্বন্ধে লিখেছেন —'পবিষ্কাব' সাবানে শুধু দেহ নয়, মনও নির্মল হয়। এ সাবান মাখাব পব হতে আমাব দুই শিষ্যেব মন ব্রহ্মমুখী হয়েছে। সাবানটি সত্যই উৎকৃষ্ট নিখুঁতকুমাবীকে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছি আব স্বামীজিকে প্রণামী দশ টাকা। এঁদেব ছবি ছাপিয়ে তাব নীচে এদেব অভিমত ছাপিয়ে দেব। আমাব বিশ্বাস তাতে খুব কাজ হবে।"

পাঠকজি দুটি ফোটোগ্রাফ বাব কবে বিশ্বদীপকে দিলেন। বিশ্বদীপ দেখলেন নিখুঁতকুমাবী সাবানটি হাতে নিয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন। গহনানন্দ গম্ভীব। বিশ্বদীপ বুঝলেন নবনীবাবু বোধহয পাঠকজিব কাছে আব কলকে পাবেন না। একটু বিমর্ষ হলেন। প্রতিশোধ নেবাব চেষ্টা কববে না তো লোকটা? ঘোষাল কি—এ চিন্তা কিন্তু বেশীদূব এগোল না। পাঠকজি নিজেই একটুকবো কাগজে লিখে প্রশ্ন কবলেন -"ডাক্তাব ঘোষাল যে আর্টিস্টকে তোমাব কাছে পাঠিয়েছিল তাব নাম কি নবনীবাবু?" বিশ্বদীপ মাথা নাডতেই তিনি আবাব লিখলেন "তিনি আমাব কাছে গিয়েছিলেন হাত দেখাতে। লোকটি ভালো। কিন্তু ওব সত্যি সম্ভাবনা নেই। ওইটে জানতেই গিয়েছিলেন। ওকে আমবা অন্যভাবে কাজ দিতে পাবব। আমাদেব সাবানেব প্যাকেটেব উপব যে ছবি থাকে, কিংবা বাক্সে যে ছবি থাকে তা উনি আকতে পাবেন। বলেছি সাধাবণ ফুল লতাপাতাই যেন আঁকেন। বেশী কেবদানি কবলে খাবাপ হয়ে যাবে। আমাদেব সাবানটা তো ঠিক বিলাসেব জিনিস নয় ওটা হল এক দৈব ওষুধ। অম্বব স্বপ্নে পেয়েছিল ওটা, আফ্রিকাব জঙ্গলে সে ছিল যখন, যখন তাব নাক মুখ সব গলে' গলে' পডছিল, যখন এক আমি ছাডা তাব আব কেউ সঙ্গী ছিল না, তখন একদিন বাত্রে হঠাৎ সে উঠে বললে স্বপ্নে ওষুধ পেয়েছি, শীগগিব টুকে নাও। দেশে ফিবে নিম্ব এ দিয়ে সাবান তৈবি কোবো। আব বিলিও। সেইগুলো দিয়েই এই সাবান তৈবি কবিয়েছি কিন্তু বিলোতে পাবিনি। ভেবে দেখেছি বিলোলে কুবেবেব ঐশ্বর্যও শেষ হয়ে যায। তাই এটা নিয়ে সামান্য লাভ বেখে ব্যবসা ফেঁদেছি। বিশেষ কবে তোমাব জন্যেই আবও এসব কবতে হয়েছে আমাকে। অম্বব বলেছিল তুমি দেশেব জমিজমা নিয়ে থাকবে আব তাব জমানো যে পঁচাত্তব লাখ টাকা আছে তা দিয়ে সাবান তৈবি হবে। কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম তুমি ববাবব বিলেতে মানুষ হযেছ, তুমি ওই ঘোব পাডাগাঁয়ে গিয়ে থাকতে পাববে না তাই এখানেই সাবানেব ব্যবসাটা গডে তুললুম। এখানে তোমাদেব যে ক'খানা বাডি আছে তাব থেকে মাসে হাজাব টাকাব বেশী আয হয না। তোমাব যে বকম খবচেব হাত, ভেবে দেখলুম, ও টাকায তোমাব কুলুবে না, তাই সাবানেব ফ্যাক্টবি কবেছি। তবে এব থেকে খুব বেশী লাভ কবি না। এসব কথা তোমাকে আগে বলিনি, আজ বললুম, কাবণ ক্রমে ক্রমে তোমাকে সবই বলতে হবে। তোমাব বাবা তাঁব যথাসর্বস্ব আমাব নামে লিখে দিয়ে গেছেন, তা আমি তোমাব নামেই শেষ পর্যন্ত লিখে দেব। কিন্তু তাব আগে সব কথা বলতে হবে তোমাকে—।"

পাঠকজি একটু ঝুঁকে খস খস করে লিখে চলেছিলেন। লেখা শেষ করে বিশ্বদীপকে কাগজটা এগিয়ে দিলেন। পড়ে চমকে উঠলেন বিশ্বদীপ।

"বাবার কথা তো আপনি কিছুই বলেননি আমাকে! বলেননি কেন!"

পাঠকজি লিখলেন, "বলবার সময় আসেনি এখনও। সময় এলেই বলব। তুমি যে সমস্ত সম্পত্তির মালিক এইটেই এখন লোকের কাছে প্রচার থাকুক। লাউপুরের কোনও খবর রাখ?"

"এখুনি আদুবাবু এসেছিলেন। পাঁচ হাজার টাকা চাইছেন, সেখানে নাকি খুন জখম দাঙ্গা নানারকম কাণ্ড হয়েছে। ভাবছি টম্‌সনকে ওঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দেব।"

পাঠকজি লিখলেন, "তা দাও। আদুবাবুর সঙ্গে আমিও দেখা করব। এখানে যদি আবার আসে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। ফ্যাকটারিতে যে স্ট্রাইক হয়েছে তার কি করছ? তোমার টোটোবাবু কিছু করতে পারলেন?"

বিশ্বদীপ বললেন, "না, আমি নিজেই দেখা করব তাদের সঙ্গে ভেবেছি। আপনি উঠছেন নাকি!"

ঘাড় নেড়ে পাঠকজি হঠাৎ উঠে চলে গেলেন।

অভিভূত হয়ে ব'সে রইলেন বিশ্বদীপ। পাঠকজিকে আরও রহস্যময় মনে হতে লাগল। নিজের বাবা মাকে তাঁর মনেও নেই। তাঁরা তাঁকে লণ্ডনে টম্‌সন পরিবারের কাছে রেখে বরাবর বিদেশে বাস করেছেন। যেখানে থাকতেন তার কোনও ঠিকানা কখনও দেননি তাঁকে। টমসন পরিবারের কাছে মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতেন পাঠকজি। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে কিছু টাকাও জমা করে দিয়েছিলেন তাঁর নামে। তিনি যখন ওখানকার পড়া শেষ করে প্রাণীতত্ত্ব (Zoology) নিয়ে গবেষণা করছেন তখন পাঠকজি একদিন এসে হাজির হলেন ইংলণ্ডে—বললেন তোমার বাবা সম্প্রতি মারা গেছেন। মা অনেক আগেই মারা গিয়েছেন। তাঁদের ইচ্ছাক্রমেই এসব সংবাদ তোমাকে দেওয়া হয়নি। তাঁরা তোমার কাছে আত্মপ্রকাশ করতে চাননি। কেন চাননি তাও তাঁরা প্রকাশ করতে মানা করে গেছেন। যে বাবা মাকে কখনও দেখেন নি তাঁদের জন্য একটা অস্পষ্ট কৌতূহল ছাড়া আর কিছু ছিল না বিশ্বদীপের। টম্‌সন সাহেবের মাকেই তিনি মায়ের মতো ভক্তি করেছেন। তিনিও মারা গেছেন কিছুদিন আগে। কিন্তু পাঠকজি এ কি কথা বললেন আজ? তাঁর বাবার হাত পা গলে গলে পড়ছিল? চালমুগরার তেল এ সাবানের প্রধান উপকরণ.....তাহলে কি..... আর ভাবতে পারলেন না বিশ্বদীপ। আর একটা কথাও হঠাৎ মনে হল—পাঠকজি তাঁর নামে ব্যাঙ্কে দশ লাখ টাকা জমা করে দিয়ে বলেছিলেন, এ টাকা তুমি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছ। তোমার বাবা আমাকে তোমার গার্জেন নিযুক্ত করে গেছেন। তোমার হয়েই আমি সাবানের কাজটা শুরু করছি। তোমার লাউপুরের জমিজমার ব্যবস্থা তুমিই কর। পাঠকজি কিন্তু আজ বললেন যে পঁচাত্তর লাখ টাকা আছে আমার? এত টাকার কথা এতদিন তো বলেননি তিনি! কোথায় আছে এ টাকা? কার নামে আছে? হঠাৎ একটা অস্পষ্টতার কুয়াশায় ঘিরে এল চারিদিক। লাল কুয়াশা। তারপর সেই লাল কুয়াশার উপর পড়ল নীলের আভা। লাল কুয়াশা মিলিয়ে গেল,

ফুলে উঠল মানসপুরের আকাশ নীলকান্তমণির মতো তার রং সেই ফুল ওলা গাছটা নেই বধূসরা নদীর ধারে নানা রঙের স্বপ্নের মধ্যে বসে আছে তিন পাহাড়া। আর কেউ নেই মনে হচ্ছে কতকগুলো রঙ যেন ভেসে বেড়াচ্ছে মেঘের মতো। তাদের ভিতর দিয়ে ... তিনজনকে দেখা যাচ্ছে। তারপর আপিস মিলিয়ে গেল। ট্রামের শব্দ ...

।। পাঁচ ।।

হঠাৎ একরাশ সবুজরঙের মেঘকে ঠেলে বেরিয়ে এলেন সাগরসঙ্গম ... একমুখ হেসে বললেন, "একি মশায়, হঠাৎ পালিয়েছিলেন কোথা আমার সঙ্গে দেখা করবেই। বধূসরাও নানারকম খাবার নিয়ে আপনার খোঁজ করছিলেন। কিন্তু আপনাকে পাওয়া গেল না। বধূসরা কি করবেন ভাবছিলেন, এমন সময় হিল্লোলা এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল বলল, ওর খাবারটা আমাকে দিন, আমি খেয়ে ফেলি। পরে ওকে ফিরিয়ে দেব। অবাক হলেন বধূসরা। বললেন, খেয়ে ফেললে আবার ফিরিয়ে দেবে কি করে? হিল্লোলা এক পাক নৃত্য করে বলল, এবার যখন ওর সঙ্গে দেখা হবে, তখন ওকে একটা চুমু দেব খাবার খেলে যে আনন্দ পেত তার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ পাবে। হিল্লোলা হাসতে হাসতে খেয়ে ফেললে আপনার খাবারগুলো। সে এখনি আসবে। দোলনায় দুলতে গেছে আপনি হঠাৎ ডুব মেরেছিলেন কোথা? আমার একটা ভারী মজার অভিজ্ঞতা হয়েছে এবার। শুনুন সেটা

'বলুন। চলুন, ওই ঘাসের উপর বসা যাক গিয়ে "

ঘাসের উপর গিয়ে বসলেন তাঁরা। বিশ্বদীপের মনে হল যেন দামী কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে কে

"কি গল্প আপনার, বলুন এবার "

"গল্প কেন হতে যাবে। আমরা যা বলি তা সত্যি কথা। আপনার শ্রীমন্ত হঠাৎ পরশপাথরের দ্বীপ খুঁজতে ব্যস্ত আমি তখন ময়ূরপংখীর একধারে চোখ বুজে শুয়ে ছিলাম ও বলছে বটে ঝড় তুফান অনেক হয়েছে, কিন্তু আমি জানি কিচ্ছু হয়নি। যা কিছু হয়েছে তা ওর মনে। পরশপাথরের দ্বীপ পাওয়া যাবে কি যাবে না এই অনিশ্চয়তাই ওর মনে ঝড় তুলেছিল। হয়তো সেই মানসিক অস্বস্তির সময় সপ্তর্ষিদের দেখে থাকবে, আমি কিছু জানি না। আর আমার মনে হয় কুষ্ঠদ্বীপের ব্যাপারটাও ওর কল্পনা। ওর সন্দেহ হয়েছে যে ওকে কুষ্ঠব্যাধি আক্রমণ করেছে। একবার ও চিল্‌কা হ্রদে ঢুকে পড়েছিল মাছের সন্ধানে। সেখানে এক কুষ্ঠরোগীর বাড়িতে ছিলও কিছুদিন। তাই ওর ধারণা হয়েছে যে ওরও বুঝি কুষ্ঠ হয়েছে। তাই ও নানারকম কল্পনা করে —"

"শ্রীমন্ত কোথায় গেল, তাকে দেখছি না— '

"সে কদলবাবুর কাছে গেছে। একবার চীনদেশে গিয়েছিল বুঝলেন, সেখানে চায়ের নেশাটি রপ্ত করে এসেছে। যেখানে চায়ের সন্ধান পায় সেইখানেই চলে যায়। কদলবাবুর বাড়ির চা নাকি উৎকৃষ্ট। আমারও যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমি আপনার অপেক্ষায় বসে ছিলাম। কেমন একটা বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল, আবার আপনি আসবেন "

"আর অসাধ্যসাধন?"

"সে মুরুব্বীর সঙ্গে গেছে তোড়-জোড় পণ্ডিতের কাছে। ওই আর একটা লোক। সারাজীবন ধরে তোড়-জোড়ই করছে। নানারকম বই যোগাড় করেছে, কিন্তু পড়া আর হয়ে উঠছে না। কেবল তোড়-জোড়, তোড়-জোড় আর তোড়-জোড়। অসাধ্যসাধন খবর পেয়েছে ওর কাছে গণেশসংহিতা বলে অমূল্য গ্রন্থ আছে নাকি একটি। মুরুব্বী ভরসা দিয়েছে যোগাড় করে দেবে। সেই সন্ধানে গেছে"

"এইবার শুনি আপনার অভিজ্ঞতাটা"

"শুনবেন, শুনবেন, শুনবেন?"

হঠাৎ সাগর-সঙ্গম মহানন্দে তুড়ি দিয়ে দিয়ে নাচতে লাগল। তারপর হঠাৎ থেমে বলল, "কেউ আমার কথা শুনতে চাইছে এ ঘটনা ঘটলে এমন আনন্দ হয়। আসলে, জানেন, পৃথিবীতে কেউ কারো কথা শোনে না, সবাই নিজের কথা নিয়েই ব্যস্ত। সবাই তাই অন্যমনস্ক, মানে, নিজের কথাটাও শুনতে পায় না, শোনবার চেষ্টা করছে অনবরত। অপরের কথায় হাঁ হাঁ করে সায় দিয়ে যায় কেবল। একরকম পুতুল আছে দেখেছেন, একটু টোকা দিলেই মাথা নাড়তে থাকে— আমরা অনেকটা সেই রকম। কারো কথা শুনছি না, বুঝছি না, মাথা নেড়ে যাচ্ছি কেবল। আপনি সত্যি শুনবেন কথাটা?

"শুনব"

'তাহলে চোখ বুজুন। আজকে আকাশের যে রকম নীল জ্যোতি আর বাঁশবনে সবুজের যে রকম ঝলক তাতে ঠিক অন্যমনস্ক হয়ে যাবেন। চোখটা বুজে ফেলুন।"

বিশ্বদীপ সত্যিই চোখ বুজলেন।

সাগর-সঙ্গম যেন বাঁশীর সুরে কথা বলতে লাগলেন। মনে হতে লাগল যেন দূর স্বপ্নলোক থেকে ভেসে আসছে তাঁর কথাগুলি।

"দেখুন, এবারেও আমি কমলে কামিনী দেখেছি। নীল সমুদ্র আর সবুজ সমুদ্র যেখানে মিশেছে এবার সেখানে হঠাৎ দেখলাম অসংখ্য কমল ফুটে আছে। সাধারণ কমল নয়, খুব বড় বড়। তার একটার উপর যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি খুব রূপসী, কিন্তু সেকেলে কমলে কামিনীর মতো নয়। পরনে শাড়ি নয়, ব্রিচেস্। কোমরে রিভলভার। গায়ে মিলিটারি কোট। পায়ে বুট। হাতে একটা দূরবীন, সেই দূরবীনেই চোখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আর সেই দূরবীনের দুটো লেন্স থেকে শব্দ বেরুচ্ছে—কোথায়, কোথায়, কোথায়। আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এবার হাতী নেই। কোথায়, কোথায়, কোথায়—এই শব্দ ক্রমশঃ আকাশ ছেয়ে ফেললে। তারপর এরোপ্লেনের শব্দে রূপান্তরিত হল সেটা। চেয়ে দেখি দূরে এরোপ্লেন আসছে, এক আধটা নয়, অসংখ্য। শীতকালে হাঁসের দল আসে যেমন, তেমনি। ক্রমে ক্রমে কাছে এল তারা। খুব কাছে এসে পড়ল যেটা তার থেকে বম্ পড়ল। আর কমলে কামিনী হাঁ করে গিলে ফেললে সেই বমটা। তারপর ক্রমাগত বোমাবর্ষণ হতে লাগল, আর তার সবগুলো গিলে ফেলতে লাগল কমলে কামিনী। আশ্চর্য কাণ্ড! শুনলে বিশ্বাস করতুম না, কিন্তু স্বচক্ষে দেখলুম। তারপর দেখলুম চতুর্দিক আলোয় আলো হয়ে গেছে। চোখধাঁধানো আলো।

যতরকম আলো কল্পনা করতে পারেন—সূর্যের আলো, চাঁদের আলো, গ্যাসের আলো, নিয়নের আলো সব রকম আলো মিলে মিশে সে এক আলোর সমুদ্র। এরোপ্লেন নেই। সেই বিরাট আলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কেবল কমলে কামিনী। আলোর প্রতিমা। তার রূপের বর্ণনা করবার ক্ষমতা নেই। হঠাৎ আমার বুকের ভিতর থেকে একটা প্রণামের নদী বেরিয়ে পড়ল কলকল করে, আর লুটিয়ে পড়ল গিয়ে সেই আলোক-প্রতিমার পায়ের উপর। প্রণাম-নদীর জল রামধনু রঙের। সেই নদী কমলে কামিনীর পায়ে লুটিয়ে পড়তেই অদ্ভুত রূপান্তর হল একটা। আলোর কমলে কামিনী আবার পুরোনো কমলে কামিনী হয়ে গেল। আমার দিকে চেয়ে হেসে বলল—আমরাই তোমাদের শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। তোমাদের পুরাণে একটা গল্প প্রচলিত আছে যে সমুদ্রের যত বিষ মহাদেব গলাধঃকরণ করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। কিন্তু একটা জিনিস তোমাদের চোখে পড়েনি। বিশ্বের যত বিষ আকণ্ঠ পান করছে ঘরে ঘরে তোমাদের মেয়েরা, তাদের শুধু কণ্ঠ না, সর্বাঙ্গ নীল হয়ে গেছে সে বিষে! তোমরা দেখেও তা দেখ না। তোমরা চিরকাল হাতী, অবয়ব প্রকাণ্ড, কিন্তু চোখ ছোট। নিজেদের স্বার্থের জন্য ওদের দু'পায়ে দলে যেতেও তোমাদের আপত্তি নেই। তাই আমি এতকাল হাতী গিলেছি। কিন্তু এখন দেখছি পুরুষের প্রতাপ বোমার রূপ ধারণ করেছে। তাই এখন বোমা গিলছি। তোমাদের আমরাই বাঁচাব! আমরা, মানে, মেয়েরা। তোমরা আগে ছিলে হাতী, এখন হয়েছ বোমা। সব গিলে ফেলব আমি। এই শুনে হঠাৎ আমি বাঁদর হয়ে তড়াক তড়াক করে লাফাতে লাগলাম। কতক্ষণ লাফিয়েছিলাম জানি না, লাফাতে লাফাতে বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। যখন জ্ঞান হল তখন দেখলাম আপনার শ্রীমন্ত আমাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। সূর্যাস্তের রং পড়েছে আমার মুখে। দিগন্তহীন এক সমুদ্র দিয়ে হুহু করে চলেছে আমাদের ময়ূরপংখী। সমুদ্রের জল লাল। ব্যস, আমার কথাটি ফুরোলো, নটেগাছটি মুড়োলো। ব্যস, চললাম। শ্রীমন্ত আর অসাধ্যসাধনও এসে গেছে। ও বাবা শ্রীমন্ত প্রজাপতির জুড়ি হাঁকিয়ে আসছে দেখছি।"

বিশ্বদীপ সত্যিই দেখলেন দুটি বড় বড় বহুবর্ণবিচিত্র প্রজাপতি একটি ছোট্ট গাড়ি টেনে আনছে। গাড়িটা মনে হল মেঘ আর রং দিয়ে তৈরি। খুব হালকা। যেন ভেসে আসছে।

"রুদলবাবু এত সব অদ্ভুত জিনিস সংগ্রহ করে রেখেছেন। আশ্চর্য! অথচ লোকটা মহাপুরুষ। যে যা চাইবে তক্ষুনি দিয়ে দেবেন। অসাধ্যসাধনের কাণ্ড দেখুন—"

বিশ্বদীপ দেখলেন শালপ্রাংশু মহাভুজ অসাধ্যসাধন একটি চলন্ত বৃক্ষের মতো আসছেন। আর তাঁর পিছনে সারি সারি কুলি—প্রত্যেকের মাথায় বইয়ের বোঝা। গণেশসংহিতা।

"ব্যস, চললুম—"

সাগর-সঙ্গম, শ্রীমন্ত, অসাধ্যসাধন সব অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর বিশ্বদীপ অনুভব করলেন একটা প্রকাণ্ড কাশগাছ ঠিক তাঁর পাশ থেকে উঠে দুলছে, আর কাশের ফুল তাঁর ঠোঁট ছুঁয়ে ছুঁয়ে সরে যাচ্ছে লীলাভরে। কাশফুল তো ছিল না এখানে, হঠাৎ এল কোথা থেকে!

"আমি হিল্লোলা। আপনার ধার শোধ করে দিলুম।"

কলকণ্ঠে হেসে মূর্তিমতী হল হিল্লোলা।

"আব বাকী চাবজন কোথায়?"

"মুকব্বী তাদেব নিয়ে ঘুবছেন পোকাব ধান্দায়। সবুজ-ফুটকি পোকাটা খুব শিকাবী, সে ছোট ছোট পোকা ধবে খায়। মুকব্বীব ইচ্ছে তাকে নিবামিষ খাওযাবেন। তাতে সে বাজী হবে কেন? গঙ্গাফড়িং জংবাহাদুবও পোকা ধবে খায়। সে সাফ বলে দিয়েছে নিবামিষ খেতে পাববে না। মুকব্বী তাকে হালুযাব লোভ দেখিয়েছিলেন, সে বাজী হযনি। এখন মুকব্বী এক নতুন ফন্দী ধবেছেন। সবুজ-ফুটকি পোকাটি পোকা বটে, কিন্তু প্রেমিকও। আমাদেব পাঁচজনকেই সে ভালবেসে ফেলেছে। মুকব্বী চেষ্টা কবেছেন আমবা যেন ওকে নিবামিষাশী হবাব জন্য অনুবোধ কবি। মুকব্বীব বিশ্বাস আমাদেব অনুবোধ ও বাখবে। আব ও যদি আমাদেব অনুবোধ মেনে নিয়ে হালুযা খায় তাহলে জংবাহাদুবও শেষ পর্যন্ত খাবে। কাবণ জংবাহাদুব ওকে খাতিব কবে খুব। লাল ফুটকিও ওদেব সঙ্গে জুটেছে। আমাকে যেতে বলেছিল আমি যাই নি। আমি ওসব অসংগত অনুবোধ কবতে পাবব না। আমি ভাবলাম তাব চেয়ে তোমাব ঋণটা শোধ কবে দিই। আচ্ছা, তুমি অমন গোমড়া মুখ কবে আছ কেন বল তো?"

বিশ্বদীপ হেসে বললেন, "মনেব ভিতবে খানিকটা জমাট অন্ধকাব হয়ে আছে কিছুতেই সেখানে আলো পৌঁছচ্ছে না—"

"আলো সব জাযগায় পৌঁছতে পাবে না তো। মাঝে মাঝে অন্ধকাবই আলো হয়ে যায়। আপনি সোমবস যোগাড় কবতে পাববেন? সোমবসেব অদ্ভুত ক্ষমতা। সব অন্ধকাবকে সে আলো কবে দেয়"

"হুইস্কি ব্র্যাণ্ডি শ্যামপেন, শেবি যোগাড় কবতে পাবি, কিন্তু সোমবস কোথা পাব। বেদে তাব কথা পড়েছি—"

"শুনি এক-একদিন পদ্মফুলেব মধুতে শবৎ শশীব জ্যোৎস্না পড়লে সোমবস হয় খুব ভোবে পদ্মফুল থেকে সংগ্রহ কবতে হয় তা প্রজাপতি হয়ে। আপনাবা যাকে 'মথ' বলেন তাবা এ বিষয়ে ওস্তাদ তাই তাদেব সর্বাঙ্গে অত বং। আমাব কয়েকটি 'মথ' বন্ধু আছে, তাবা আমাকে আলোব পাত্রে দিয়ে গেছে খানিকটা। আমি নিয়ে আসব একদিন।"

আমি কবে আসব তাব তো ঠিক নেই—তুমি কবে আসবে"

"আমাবও ঠিক নেই। তবে জানি এলেই দেখা হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি মনেব নল সঙ্গে কবে আনবেন সোমবস এমনি ঢক ঢক কবে খাওযা যায় না। মনেব নল ডুবিয়ে আস্তে আস্তে খেতে হয়। ওই ওবা আসছে, ওদেব কাছে একথা বলবেন না যেন। তুফানীটা ভাবী হিংসুটে ও হয়তো এখুনি আপনাকে আলাদীনেব প্রদীপ দিতে চাইবে। ওব কাছে আছে সেটা—"

একটি সরু শুকনো ডাল হাতে কবে মুকব্বী এল। এসেই বিশ্বদীপকে বললে, "একটা সুসংবাদ আছে। কদলবাবু বলেছেন এবাব ধান কাটবেন না। বলেছেন ধান যখন আপনি মাটিতে পড়ে যাবে তখন তা কুড়িয়ে নেবেন। বুলবুলিদেব সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। বুলবুলিব

পেট ভরে খেয়ে নেবে। তারপর যা বাঁচবে তা তারা কুদলবাবুর গোলায় জমা করবে। এ এক মস্ত ব্যাপার হল। সবুজ ফুটকি এমন একটা মহত্ত্বের উদাহরণ দেখেও হালুয়া খেতে রাজী হচ্ছে না কেন বুঝতে পারছি না।"

সবুজ ফুটকি ডালটায় বসেছিল। সে টিক টিক টিক করে বললে, "আমি বুঝতে পারছি সব। কিন্তু এ ও আমি বুঝতে পারছি তোমার হালুয়া যত ভালই হোক ও খেলে আমি বাঁচব না। এই অপ্সরীরা আমাকে অনুরোধ করছেন এঁদের অনুরোধ উপেক্ষা করবার সাধ্য আমার নেই, কিন্তু আমি বলছি হালুয়া খেলে আমি বাঁচব না।"

তুফানী, তুহিনা, তরলা আর হাওয়া সমস্বরে বলে উঠল "তুমি মরে প্রমাণ কর যে সত্যি তুমি আমাদের ভালবাস। তুমি সত্যিই যদি মরে যাও আমরা তোমাকে বাঁচিয়ে দেব তখন অবশ্য তোমার এ চেহারা থাকবে না। তুমি হবে অপ্সর। তোমার গায়ের রং হবে গোলাপী, মাথার চুল আর গোঁফ হবে বেগুনী, গায়ে ফুটকি থাকবে না, থাকবে জরির পোশাক, তখন টিক টিক্ টিক টিক করে কথা বলতে পারবে না, কণ্ঠে তোমার তখন সা রে গা মা খেলবে। ইন্দ্রের সভাতেও তোমার ডাক পড়তে পারে—'

সবুজ ফুটকি বললে, "আমি কিন্তু সবুজ ফুটকিই থাকতে চাই। অপ্সরী হবার বাসনা নেই। তোমাদের চুলে বাঁধে বুকে এক আধবার যদি বসতে দাও, তাহলেই আমি ধন্য হব"

মুরব্বী চুপ করে ছিল। বললে "তুমি তাহলে পোকাই খাবে, হালুয়া খাবে না?"

সবুজ ফুটকি বললে, 'যে পোকাদের আমরা খাই তাদের জন্যে আপনার দরদ কেন বুঝতে পারছি না '

মুরব্বী বললে, দরদ নয়, কর্তব্য। লাখখানেক পোকার এক ডেলিগেশন এসেছিল আমার কাছে "

সবুজ ফুটকি বললে "ওদের আমরা খাই বলে আপনারা বেঁচে আছেন ওদের স্বভাব তো জানেন? ওরা সুযোগ পেলেই আপনাদের কানে কিংবা নাকে ঢুকে যাবে। আচ্ছা, কুদলবাবুর কাছে চলুন তিনি যা বলেন তাই করব"

"কুদলবাবু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী। তিনি তোমাকে হালুয়া খেতে বাধ্য করবেন না কখনও। কিন্তু স্বেচ্ছায় যদি খাও তাহলে খুশী হবেন"

অপ্সরীরা সবাই আবদেরে মেয়ের মতো বলে উঠল— "চলুন, আমরা কুদলবাবুর কাছেই যাই, সেখানে ভালো লবেঞ্চুস আছে—

"তোমরা যাও তাহলে, আমি যাচ্ছি ধানক্ষেতে। তাদের খবরটা দিতে হবে। আমি পরে যাব"

মুরুব্বী চলে গেল।

বিশ্বদীপের মনে হল একটা তৈলপক্ক বাঁশের লাঠি যেন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে।

সবুজ-ফুটকিও উড়ে চলে গেল আর তার সঙ্গে উড়ে গেল অপ্সরীরাও পাঁচটি ফুলের পাপড়ির মত। তারপর বিশ্বদীপ হঠাৎ দেখতে পেলেন সিংহ সামনে দাঁড়িয়ে। তার কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত সিংহবদনে অদ্ভুত করুণ একটা মিনতি ফুটে রয়েছে। তার ফাটা ঠোঁট দুটো

কাঁপছে, চোখের দুটো পাতাই লোমহীন, দুটো পাতার কোলে কোলে সূক্ষ্ম ক্ষতের চিহ্ন। মনে হ'চ্ছে লাল কাজল পরিয়ে দিয়েছে কে যেন! রক্তের কাজল। মিনতিভরা দৃষ্টি তুলে সে নীরব হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ভাঙা-ভাঙা কণ্ঠে বলল, "আমায় মাপ করুন আপনি। আপনাকে যা বলেছি তা সত্যি কথা। কিন্তু বড় অপ্রিয়। এ অপ্রিয় সত্য বলে আপনার মনে ব্যথা দেবার অধিকার আমার নেই। তাছাড়া সত্য কি তাও তো জানি না। কুৎসিতকে ঘৃণা করবার প্রবৃত্তি যিনি দিয়েছেন তিনিই তো ভগবান, তিনিই তো চিবসুন্দর, তিনিই করুণাময়। তিনিই একদিন কুৎসিতকে সুন্দর করে নেবেন, আব যখন তা সম্ভব হবে তখনই পোকা লাগা বাঁকা বেগুনটা সুস্থ সতেজ বেগুনের পাশে নিজের জোরে নিজের দাবিতে দাঁড়াতে পাববে। বক্তৃতা করে তা হবে না। মানুষ সুন্দরকে চিবকাল ভালবাসবে। আব কুৎসিতকে চিবকাল ঘৃণা করবে। হঠাৎ কোনদিন কোনও মানুষ হয়তো সুন্দর কুৎসিতেব পার্থক্য ভুলে যাবে, তখন সে হয়তো কুষ্ঠরোগীকে স্পর্শ করবে, আলিঙ্গন করবে, সেবা কববে, যেমন কর্বেছিলেন যিশু, শ্রীচৈতন্য, গান্ধী, সে মানুষ আসবে হযতো আবাব, কিন্তু সে আসবে যদি আমবা তাকে সৃষ্টি কবি। আমাদেব অন্তরেব বিশুদ্ধ নিঃস্বার্থ কামনাই সৃষ্টি কবে ওদের। কেবল বক্তৃতায কোনও কাজ হবে না। সেই মহামানবকে সৃষ্টি করবাব ভাব আমাদেরই, কাবণ আমরাই আতুব। অপ্রিয় কথার ঢিল ছুঁড়লে তিনি আসবেন না। আমি অন্যায় করেছি আজ। আমাকে ক্ষমা করুন।"

বিশ্বদীপের মনে হ'ল সিংহের চোখ বেয়ে রক্তের অশ্রু ঝরছে। তারপব—ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন ঝন।

।। ছয় ।।

"হ্যালো, কে, আমি বিশ্বদীপ কথা বলছি। ও, ওরা সব ফ্যাকটারিতে জড়ো হয়েছে। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি এখুনি—"

টোটো ফোন করছিল। বিশ্বদীপ তাড়াতাড়ি উঠে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটাবি অনিমেষ চৌধুরীকে বলে গেলেন—"যদি কোন দবকারী কাজ থাকে তাহলে আমাকে ফ্যাকটারিতে 'ফোন' কোরো। 'ফোন' না পেলে আমি সোজা বাড়ি চলে যাব। আদুবাবু যদি আসেন তাঁকে আমার বাড়িতে যেতে বোলো।"

বিশ্বদীপের গাড়িটি বেশ দামী। অস্টিন সমারসেট্। বিলেত থেকে আসবার সময় কিনে এনেছিলেন। নিজেই চালান। ক্লীনার রণছোড় দেও, ভালো ড্রাইভার, তাকে ড্রাইভারেরই মাইনে দেন বিশ্বদীপ, কিন্তু কখনও গাড়ি চালাতে দেন না। রণছোড়ের ঘুমোবার শক্তি অসাধারণ। যে-কোনও স্থানে, যে-কোনও অবস্থায় সে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। বিশ্বদীপ গাড়ির ভিতর তাকে ঘুমুতে দেন না। গাড়ি 'লক্' করা থাকে। গ্যারেজের ভিতর গাড়িরই একপাশে মাটিতে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল রণছোড়। গারেজেই সে ছোট বিছানা এনে রেখেছে। পুরোনো শতরঞ্জি একটি আর ছোট ময়লা একটি বালিশ। বিশ্বদীপ এসে দেখলেন রণছোড়ের নাক

ডাকছে। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে বইলেন তাব দিকে। সুস্থ সুন্দব চেহাবা। অথচ যে সব পুষ্টিকব খাদ্য খেলে শবীব ভালো থাকে ডাক্তাববা বলেন, তা ওব ভাগ্যে বোধহয় জোটে না। মাইনে তো একশ' পঁচিশ টাকা। বিবাট সংসাব পালন কবতে হয়। দিনেব বেলা ছাতু খায়, বাত্রে ভাত কিংবা কটি। মাছ মাংস ক্কচিৎ কদাচিৎ। অথচ আমবা । গাড়ি খোলাব শব্দে বণছোড তড়াক কবে উঠে পড়ল এবং সেলাম কবল মিলিটাবি কায়দায়। এটা সে ববাববই কবে থাকে। সকালে গাড়ি পবিষ্কাব কবা এবং যখন তখন মিলিটাবি কায়দায় সেলাম কবা—এই তাব একমাত্র কাজ। বিশ্বদীপ ওকে মিলিটাবি পোশাকও কিনে দিয়েছেন। খাকী স্যুট পবেই থাকে সর্বদা

ফ্যাকটাবিতে পৌঁছে দেখলেন টোটো গেটেব কাছে মুখ সূচালো কবে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বদীপেব গাড়ি থামতেই সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল, "ওবা সব ফ্যাকটাবিব পিছনেব দিকে বড় হলটায় বসে আছে আমি কতকগুলো পয়েন্ট লিখে বেখেছি। সেগুলিব উপব লক্ষ্য বেখে আপনি ওদেব সঙ্গে কথা বলবেন। ওবা খুব ঘুঘু একটু ফাঁক পেলেই ক্যাঁক কবে চেপে ধববে। বিশেষত ওই ধাকড়টা।" টোটো একটা কাগজেব টুকবো এগিয়ে দিল বিশ্বদীপকে। বিশ্বদীপ সেটাব দিকে একনজব চেয়ে দেখলেন তাবপব সেটা প্যান্টেব পকেটে পুবে ফেললেন

হলেব ভিতবে যেতেই ধাকড় এগিয়ে এসে সেলাম কবে দাঁড়াল [illegible] লোক। মাথাটা প্রকাণ্ড। কুচকুচে কালো থ্যাবড়া নাক [illegible] তাব বাংলা মর্ম হচ্ছে এই —

"আমাদেব মধ্যে দুটো দল হয়ে গেছে। একদল বলছে মাইনে তিনগুণ কবে দিলে আমাদেব আব দাবি নেই। এদেব দলপতি হচ্ছে বামু। বামুব দলে চিবঞ্জি, চন্দা, মিশবি, সনঝা আব গুবকি আছে। আব আমাব যেটা দল তাবা বলছে আমাদেব মাইনে দ্বিগুণ হলেও চলবে। কিন্তু আমাদেব অসুখেব সময় আপনাকে ভালো চিকিৎসাব ব্যবস্থা কবতে হবে জিনিসপত্রেব দাম যদি আবও বেড়ে যায়, তাহলে সেই অনুসাবে আমাদেব মাইনেও বাড়াতে হবে। আমাব দলে আছে কেশিয়া, খুদবি, কাবা, শাম, শামাব মা বুলিয়া, খুদবিব মা আব বিবি। মঙ্গবা কোনও দলে যায় নি। আমাদেব সবাইয়েব কথাই আপনি শুনুন এবং ইনসাফ মাফিক যা হয় একটা ব্যবস্থা কবে দিন।"

বিশ্বদীপ খানিকক্ষণ চুপ কবে বইলেন। তাবপব বললেন, "আমি আমাব কথাটাই আগে বলি, তাবপব তোমাদেব কথা শুনব। প্রথমেই তোমাদেব বলে দিচ্ছি যে যদিও আমি দামী পোশাক পবি, মোটবে চড়ি এবং নানাবকম বিলাসিতা কবি, কিন্তু আমি তোমাদেবই মতো একজন মজুব মাত্র। জন্ম থেকেই যে আওতায় আমাকে মানুষ হতে হয়েছে সেই আওতাব প্রভাব আমি অতিক্রম কবতে পাবিনি। বিলেতে জন্মেছি, বিলিতী স্কুল কলেজে লেখাপড়া কবেছি, বিলিতী ধবনে মানুষ হয়েছি, তাই আমাব চালচলন হয়তো একটু বিলিতীগোছেব হয়ে গেছে। যদিও এতে দোষেব কিছু নেই, তবু এব জন্য আমি লজ্জিত। আমি তোমাদেব মতো হতে চেষ্টা কবছি, হয়তো একদিন তাই হব, কিন্তু একটু দেবি লাগবে। এইবাব আমাদেব ব্যবসাব কথা। এই 'পবিষ্কাব' সাবানেব ব্যবসাতে ঠিক কত লাভ হয় আমি জানি না। পাঠকজি জানেন। তোমাদেব মাইনে বাড়িয়ে দিলে আমাদেব ব্যবসা টিকবে কি না তাও আমি

জানি না, পাঠকজি জানেন। কাবণ, যদিও ব্যবসা আমাব নামে, কিন্তু পাঠকজিই আসল মালিক। তিনি একটু আগে আমাকে বলছিলেন যে খুব কম লাভ বেখে তিনি এই সাবানেব ব্যবসা কবেন। কম লাভ বাখাব উদ্দেশ্য যে এ সাবান বহুবকম চর্মবোগ, এমন কি কুষ্ঠবোগেও উপকাবী। আমাব বাবা স্বপ্নে এই সাবান তৈবি কববাব উপাদান পেয়েছিলেন। আমাদেব যদি অফুবন্ত টাকা থাকত তাহলে বিনালাভে এ সাবান আমবা বিতবণ কবতে পাবতুম। কিন্তু তত টাকা আমাদেব নেই। যদি বিনামূল্যে বিতবণ কবি তাহলে কিছুদিন পবে এ ফ্যাকটাবি বন্ধ কবে দিতে হবে। প্রতিটি সাবান তৈবি কবতে চাব আনা কবে খবচ হয়। আমবা বাজাবে এটা বাবো আনা কবে বিক্রি কবি। যে আট আনা লাভ হয় তাব থেকে ফ্যাকটাবিব জিনিসপত্র, ওষুধ, বিদেশী মেশিন এই সব কেনা হয়। আমি আপিসেব কাজকর্ম দেখি বলে মাসে পাঁচশ' টাকা পাই। পাঠকজি কিচ্ছু নেন না। তোমাদেব যা মাইনে দেওয়া হয় তা বাজাবেব 'বেট' অনুসাবেই দেওয়া হয়। তোমবা অন্য কোথাও এব থেকে যদি বেশী পাও, তোমাদেব আটকে বাখাব অধিকাব আমাদেব নেই। তবে আমাব একটা প্রস্তাব আছে। সেটা তোমাদেব বলছি, পাঠকজিকেও বলব। আমাকে এবং পাঠকজিকে নিয়ে আমাদেব ফ্যাকটাবিতে সবসুদ্ধ একশ' বাবোজন কাজ কবে। এব মধ্যে দু'জন মেথব আব ঝাড়ুদাব আছে। আমাব ইচ্ছে, আমবা এই ব্যবসাব সবাই মালিক হই। এব থেকে যা লাভ হবে তা আমবা সবাই সমানভাবে ভাগ কবে নেব। আমাব মনে হয় তাহলে ব্যবসাটা ভালো চলবে আব তোমাদেবও কোনও ক্ষোভ থাকবে না। আমাদেব আপিসে আমি আব পাঠকজি আছি তোমাদেব দিক থেকে দু জন প্রতিনিধি সেখানে বাখতে পাব। ব্যবসাব কাজ ঠিকমতো চলছে কি না তা তাবা দেখবে এবং সেজন্য আলাদা পাবিশ্রমিক পাবে আমাকে তোমবা যা দেবে তাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকব। আমাব এ প্রস্তাবটা তোমবা বিবেচনা কবে দেখতে পাব '

ধাকড ঘাডটা ঈষৎ বেকিয়ে দাঁডিয়ে বইল খানিকক্ষণ। তাবপব বলল, "আমবা হুজুব ব্যবসাব কিছু বুঝি না। নগদ মজুবিব কথা বুঝি। এ মজুবিতে আমাদেব পোষাচ্ছে না সেই কথাই আপনাকে বলছি।"

"অন্য কোথাও কি তোমবা এব চেয়ে বেশী মজুবি পাচ্ছ?"

"এখনও পাই নি। আপনি যদি না দেন, আমাদেব খুঁজতে হবে।"

"আব কাবো কিছু বলবাব আছে?"

বামু এগিয়ে এল। সে এতক্ষণ পাগডি বেঁধে বসে ছিল। উঠে দাঁডিয়ে পাগডিটা খুলে কাঁধে বেখে হাত দুটি জোড কবে নমস্কাব কবলে বিশ্বদীপকে। তাবপব বলল, "হুজুব, আমবা হিসেব কবে দেখেছি যে আমবা এখন যা মজুবি পাচ্ছি, তাব তিনগুণ না পেলে আমাদেব সংসাব চলবে না। আপনি শুধু যদি চাল ডাল তেল নুন লকড়িব হিসাব চান তাহলে এখনই আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পাবি সেটা। আমি আমাব বাডিব খবচাব হিসাবটা লিখে এনেছি।"

বিশ্বদীপ বললেন, "আমি তোমাব কথা অবিশ্বাস কবছি না। আমি তোমাব কথা বলব পাঠকজিকে। কিন্তু আমাদেবও দেখতে হবে তোমাদেব সব দাবি মিটিয়ে ব্যবসা টিকবে কি না। তাই বলছিলাম তোমবাও এ ব্যবসাব অংশীদাব হও।"

"ব্যবসাব কিছু বুঝি না আমবা। আমি প্রথমে চাল ডাল মসলাব একটা দোকান কবেছিলাম, কিন্তু আমাব গোতিযা আব দোস্তবা সে দোকানকে খেয়ে ফেলল, সবাই কর্জা

চায়। কর্জা না দিলে ঝগড়া হয়, লোকে নিন্দা করে। তাই দোকান করলে কর্জা দিতেই হয়। আপনাদের এ সাবুনের ব্যবসা বড় ব্যবসা, লাখ লাখ টাকার 'হিলডোল' হয়, আমরা মুরুখ লোক, আমরা এসব ব্যাপারে কোন পাত্তা পাব না। ধাকড় ঠিকই বলেছে, আমরা মজুর, নগদ মজুরির কথাই বুঝি—"

এবার মহুযা দাঁড়াল ভিড়ের মধ্যে। সে পিছন দিকে ছিল দু'হাত দিয়ে পথ করে নিয়ে সামনের দিকে এল। ছিপছিপে রোগা মেয়ে। রূপসী বলতে সাধারণতঃ যা বোঝায় তা নয়। কপালের উপর একটা কাটা দাগ। রং খুব কালো নয়, মেটে মেটে। ছোট ছোট চোখ, কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দৃষ্টি। নাকের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। গাছ-কোমব করে শাড়ির আঁচলটা বাঁধা। হাতে কয়েকগাছ লাল গালার সরু চুড়ি। সে এসে পরিষ্কার বাংলায় বললে, "বিশ্বদীপবাবু, আপনি যে এত মহৎ তা আমি জানতাম না। আমি কল্পনাও করতে পারি নি যে আপনি আমাদেব সবাইকে আপনার ব্যবসাতে সমান অংশীদার করতে চাইবেন। আপনার প্রস্তাবে আমি সর্বান্তঃকরণে রাজী আছি। আর আমার বিশ্বাস আমি এদেরও রাজী কবাতে পারব!"

বিশ্বদীপ একটু অবাক হয়ে গেলেন।

"তুমি ফ্যাকটাবিতে কি কাজ কর?"

"আমি কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেণ্টে মিস্টার সিন্‌হার অ্যাসিসটেণ্ট্

"ও। কতদূব লেখাপড়া করেছ তুমি"

"ঢাকায় আই এস. সি পর্যন্ত পড়েছিলাম। তারপর দেশ ভাগ হয়ে গেল। বাবা মা মারা গেলেন, আমি অনেক কষ্টে এখানে পালিয়ে এসেছিলাম। পড়াশোনার আর সুযোগ পেলাম না। তাই হাতের কাছে যা পেয়েছি তাই করছি। আপনাব ফ্যাকটারিতে ছ'মাস কাজ করছি।"

"তুমি আমাব এ প্রস্তাবে রাজী আছ শুনে খুশী হলাম। তোমাদের কষ্ট দিয়ে আমি নিজে একা বড়লোক হব এরকম ইচ্ছা আমাব নেই। দেখ তুমি এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। আমিও পাঠকজিকে ব্যাপাবটা বলব"

বিশ্বদীপ উঠে পড়লেন।

ধাকড় তখন বললে—"কি ঠিক হল তাহলে বাবু—"

"তোমাদের মাইনে বাড়াব। তোমাদের সংসার যাতে সচ্ছল হয় সে ব্যবস্থা আমি করব। তবে কি উপায়ে সেটা হবে তা এখনি বলতে পারছি না। তিনটে প্রস্তাব এসেছে, তিনটেই আমি পাঠকজির সঙ্গে আলোচনা করব। তোমরাও নিজেদের মধ্যে আলোচনা কর। করে তোমাদের মতামত আমাকে জানিও।"

মহুয়া বলল, "আমার সব কথা এখনও আপনাকে বলা হয় নি। আমরা যদি আপনার ব্যবসার অংশীদার হই, তাহলে আমাদের দৈনিক খরচ আমরা পাব তো? তা না পেলে আমাদের সংসার চলবে না। আমরা রোজ যা নেব তা আমাদের প্রাপ্য লাভের অংশ থেকে আপনারা নেবেন এই ধরনের একটা ব্যবস্থা হলে ভালো হয়।"

"বেশ, পাঠকজিকে এ কথাও বলব। পাঠকজি নামে ম্যানেজার, কিন্তু আসলে তিনিই মালিক।"

বিশ্বদীপ বেরিয়ে এলেন। টোটো বাইরে অপেক্ষা করছিল।

সে বলল—"এঃ, আপনি তো সব মাটি করে দিলেন! ঝাড়ুদার, মেথর, কেমিস্ট সব সমান অংশীদার হবে। এ কি বললেন আপনি ওদের! তাছাড়া ব্যবসা আপনার, আপনি ওদেব সমান অংশ দিতে যাবেন কেন! দিস্ ইজ সিলি!"

বিশ্বদীপ এমন একটা মুখভাব করলেন যেন কিছুই শুনতে পাননি। সোজা গাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন। রণছোড় সেলাম করে কপাট খুলে দিল। বিশ্বদীপ গাড়িতে চড়ে বসে স্টার্ট দিলেন।

টোটো কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপব দু'হাত উল্‌টে বলল—"যাঃ বাবা!"

।। সাত ।।

ওয়ালটেয়ারে বিদুলার সঙ্গে শ্যামল সোম তো গিয়েইছিল আরও গিয়েছিল তাব অন্তবঙ্গ বন্ধু দু'জন, অনন্ত রায় আর অনঙ্গ সেন। এদের ইতিহাসটা আগে বলি। অনন্ত আর অনঙ্গ দু'জনেই শ্যামলের বাল্যবন্ধু। বাল্যকালে ভবানীপুরে এক স্কুলে পড়ত। তাবপর ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় অনেক দিন। শ্যামল যখন বিলেত থেকে ঘুরে এল তখনও অনেকদিন ওদের পুনর্মিলন ঘটেনি। হঠাৎ একদিন চিৎপুব স্ট্রীটে চেক-চেক লুঙ্গি-পরা এক রুটি ওলাকে দেখে শ্যামল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আভাসে অনন্তর মুখটা তার মনে পড়ল। সেই রকম হৃষ্টপুষ্ট গোলমুখ, চোখ দুটি টানা-টানা। বাল্যকালে মুখটা কচি কচি ছিল মনে হল, এখন তাতে গোঁফ দাড়ি গজিয়েছে। শ্যামল আবার সাইনবোর্ডটার দিকে চেয়ে দেখল— "সব রকম ভালো পাঁউরুটি এখানে পাওয়া যায়।" ডাক্তার তাকে ব্রাউন ব্রেড খেতে বলেছিল কিছুদিন আগে। কিন্তু শ্যামবাজার অঞ্চলে ও জিনিসটা পাওয়া যাচ্ছিল না। এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করল, "এখানে কি ভালো ব্রাউন ব্রেড পাওয়া যাবে?"

"যাবে"

"দিন একটা—"

পাঁউরুটি নিয়ে দাম দিয়ে শ্যামল প্রশ্ন করল—"একটা কথা জিগ্যেস করছি যদি কিছু মনে না করেন? আপনার নাম কি অনন্ত?"

"হ্যাঁ। কেন বলুন তো—"

"আমার নাম শ্যামল সোম। মনে হচ্ছে এককালে আমরা একসঙ্গে পড়তাম ভবানীপুরে"

"ও, সারটেনলি—"

পরক্ষণেই হুড়মুড় করে এগিয়ে এল অনন্ত। টেবিল থেকে এক থাক পাঁউরুটিও পড়ে গেল হুড়মুড় করে। এগিয়ে এসেই আলিঙ্গনবদ্ধ করে ফেললে সে শ্যামলকে। তারপর দুজনে ভিতরে গিয়ে বসল।

"তুই তো বিলেত গিয়েছিলি? অনঙ্গ বলেছিল--"

"হাঁ। মাসখানেক আগে ফিরেছি—"

"কি হয়ে ফিরেছিস?"

"ভ্যাগাবণ্ড। Swollen-headed vagabond. বার দুই ফেল করে একটা বি. এ. ডিগ্রি যোগাড় করতেই ফতুর হয়ে গেলাম। তারপর পালিয়ে আসতে হল। একটা মেয়ে এইসা পিছুতে লাগল যে আর কিছুদিন থাকলেই 'জালবদ্ধ বিহঙ্গম' হয়ে যেতাম। তা হবার ইচ্ছে ছিল না, সরে পড়লাম। এখানে এসে প্রাইভেট ট্যুসনি করছি। এখনও বন্দরে পৌছুতে পারিনি"

"বন্দর মানে?"

"বাঙালীর ছেলের একটি মাত্র বন্দরই তো আছে—চাকরি"

"তুই কবি হয়েছিস দেখছি।"

"বেকার লোকেরাই সাধারণতঃ কবি হয়। তুই কি করছিস।"

"এই দোকান। সিকস্থ ক্লাসের পর স্কুল ছেড়ে দিতে হল। বাবা মা দু'জনেই গত হলেন। কলিমুদ্দিনের একটা রুটির দোকান ছিল, সেইখানে সে আমাকে ফেরিওলা বহাল করে নিলে। তোমরা আজকাল মুসলমানের নাম করলেই চটে যাও। কিন্তু আমি ওই কলিমুদ্দিন আলীর কাছে কৃতজ্ঞ। অনেক আত্মীয়স্বজন আছে আমার, অনেক ঘোষ বোস মিত্তির গুহ চাটুজ্যে বাঁড়ুয্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি, কেউ সাহায্য করে নি। সাহায্য করেছিল ওই গোখাদক কলিমুদ্দিন। তার দোকানেই কাজ শিখি। সে-ই আমাকে রোজ এক টাকা করে দিত। তারপর সে-ই বলল— 'তুমি সব কাজ শিখেছ, এইবার চিৎপুরের দিকে নিজের একটা দোকান কর। বেশী রোজগার হবে।' ঠিক সেই সময় রোগা লম্বা সুঁটকো এক ভদ্রলোকও জুটে গেলেন। তিনি বললেন—'আমার মেয়েকে যদি বিয়ে কর, আমি তোমায় দোকান করে দেব।' কলিমুদ্দিনই বরকর্তার কাজ করলে। বলল, 'চিৎপুরে একটা ছোটখাটো দোকান করতে হলে হাজার পাঁচেক টাকা চাই। সে টাকাটা নগদ অগ্রিম জমা দিতে হবে। আপনি যদি সেটা অনন্তর নামে পোস্টাফিসে জমা করে আমার কাছে 'পাস' বুকটা এনে দেন, বাকিটা আমি করে দেব।' কলিমুদ্দিন গোপনে আমাকে বললে, 'ও বাপের মেয়ে সুন্দরী হবে না। তবু বিয়ে কর, যদি টাকাটা দেয়। পছন্দ না হয় পরে আর একটা বিয়ে কোরো। যদি টাকা রোজগার করতে পার আওরতের অভাব হবে না।' কলিমুদ্দিনের জীবনদর্শন মোটেই জটিল নয়।"

. এমন সময় আর একজন খদ্দের এল। তাকে পাঁউরুটি দিয়ে অনন্ত আবার এসে বসল শ্যামলের কাছে।

অনন্ত বলল, "তোর সময় নষ্ট করিয়ে দিচ্ছি না তো"

"মোটেই না। সন্ধ্যাবেলা একটা টুাসনি করতে হয়, সমস্ত দিন চাকরির চেষ্টায় টো-টো করে ঘুরতে হয়। অঢেল সময় আমার হাতে। যখন খুব বিরক্তি ধরে তখন চলে যাই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলে। সেখানে কোন গাছতলায় বসে কবিতা লিখি। আমি এখানে বসলে তোর কোনও অসুবিধা হবে কি না বল। আমার কিছু করবার নেই"

"আমার কিছু অসুবিধা হবে না। অনঙ্গকে একটা ফোন করে আসি দাঁড়া। পাশের

দোকানেই ফোন আছে। সে-ও চলে আসুক। তোর কথা শুনলেই লাফিয়ে চলে আসবে সে।"

অনন্ত ফোন করে ফিরে এল।

"তুই থাকিস কোথা?"

"একটা মেসে। একটি ঘরের জন্যে মাসে তিরিশ টাকা দিতে হয়। বাকি ৪৫ টাকায় আমার সমস্ত মাস চলে। ভাল করে চলে না, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে—"

অনন্ত একটু হাসল।

শ্যামল তখন বলল, "তোর ক'বছর বিয়ে হয়েছে?"

"সাত বছর—"

"তোর বউয়ের সঙ্গে একদিন আলাপ করে আসতে হবে। কোথায় তোর বাসা—"

"বাসা বউবাজারে। কিন্তু আমার বউয়ের সঙ্গে আলাপ করে সুখ পাবি না। তার চেয়ে তোকে নয়নতারার কাছে নিয়ে যাব একদিন। তাকে তোর ভাল লাগবে।"

"সে আবার কে?"

"চলতি সামাজিক ভাষায় সে আমার 'রক্ষিতা'। কিন্তু আসলে সে-ই আমার সব। তার কাছে গিয়েই শান্তি পাই। আমার বউ খুব কালো, তাতেও আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু সর্বদাই যেন ফোঁস ফোঁস করছে, মানুষ নয়, যেন কেউটে সাপ। মুখ সর্বদাই তোলো হাড়ি। ভাবটা সে যেন কোনও কুইন ভিকটোরিয়া, এতদিন বাপের ঘর আলো করে বসেছিল, আমি যেন তার বাপকে ঠকিয়ে বিয়ে করেছি তাকে। সর্বদা মুখ গোঁজ করে বসে থাকে। কাঠ বাঁজা। দিনরাত রেডিও, সিনেমা, মাসিকপত্র আর নবেল নিয়ে বসে আছে। সংসারের কুটোটি নাড়ে না। যেদিন রাঁধবার লোক আসে না, সেদিন বাজার থেকে খাবার কিনে আনতে হয়। দোকান থেকে ফিরে গিয়ে কোনওদিন তাঁর হাসিমুখ দেখিনি। কোনদিন সে আমার জন্যে একটু খাবারও তৈরি করে রাখে নি। কোনদিন জল গামছা এগিয়ে দেয়নি। দোকান থেকে ফিরে গিয়ে মনে হত যেন জেলে গিয়ে ঢুকলাম। আজকাল দোকান থেকে ফিরে নয়নতারার বাড়িতে যাই। বাড়ি ফিরি রাত্রি বারোটার পর। নিজের ঘরটিতে তালা লাগিয়ে রেখে আসি। সেইটি খুলে শুয়ে পড়ি। নয়নতারার ওখানেও শুতে পারতুম। কিন্তু কলিমুদ্দিন মানা করলে। বললে—যত রাতই হোক, বাড়ি ফেরা চাই। তা না হলে ঢি ঢি পড়ে যাবে। তোকে নয়নতারার কাছে নিয়ে যাব। দেখবি কি সুন্দর ব্যবহার। সত্যিকার মেয়েমানুষ। নরম মন, নরম ব্যবহার সেবা করবার জন্য সর্বদাই ব্যগ্র। নিজে হাতে আমার জন্যে রোজ নতুনরকম খাবার তৈরি করে রাখে। আমি গেলে নিজে-হাতে আমার পায়ের জুতো খুলে, পা ধুইয়ে দেয়। জামা গেঞ্জি খুলে ভিজে গামছা দিয়ে গা মুছিয়ে দেয়। চুল আঁচড়ে দেয়—তুই হাসছিস? যা বলছি, একটিও মিথ্যে নয়"

"গানটান গাইতে পারে?"—শ্যামল জিগ্যেস করল।

"পারে হয়তো। আমি ওসব জিগ্যেস করিনি। নয়নতারাও আমাকে কিছু বলেনি। দেখ ভাই, আমরা একটু যত্ন-আত্তি পেলেই বর্তে যাই। গানটান বুঝিও না, চাইও না। না চাইতেই

তোমাদের রেডিওব দৌলতে যা পাচ্ছি দিনরাত তাই যথেষ্ট। কান ঝালাপালা হয়ে গেছে!"

"অনঙ্গ কি করছে—?"

"সে এম. এ পাস করেছিল। কিন্তু হয়ে গেল থার্ড ক্লাস। চাকরি জুটল না। আমি কিছু টাকা দিয়েছিলাম, সে নিজেও কিছু যোগাড় করেছিল ধারধোর করে। সামান্য কিছু ক্যাপিটাল নিয়ে বইয়ের দোকান করেছে সে। ভালই চলছে এখন।"

এরপর উপর্যুপরি আরও কয়েকজন খদ্দের এল অনন্তর। তারপরই ট্যাক্সি করে এসে পড়ল অনঙ্গ। অনঙ্গকে দেখে শ্যামল অবাক। মাথায় কদমছাঁট চুল। গোঁফ দাড়ি কামানো। টিকোলো নাক। পরনে খদ্দরের পাঞ্জাবি। পায়ে বিদ্যেসাগরী লাল চটি একজোড়া। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। শ্যামলের মনে হল এ যেন একটা আবির্ভাব! অনঙ্গ এসেই শ্যামলকে জড়িয়ে ধরে বলল "আমি তোর কথা রোজ ভাবি। তুই বিলেতে থেকে যে কবিতা দুটো আমাকে পাঠিয়েছিলি তা ওয়াণ্ডারফুল। এখনও কবিতা লিখছিস কি?"

"ও ছাড়া আর তো কিছু করবার নেই। অনেকগুলো খাতা ভরে গেছে—"

"আমাকে দিস। আমি ওর থেকে বেছে বেছে ছাপব।"

"ছাপবি?"

সত্যিই অবাক হয়ে গেল শ্যামল সোম। তার কবিতা ছাপবে অনঙ্গ।

"দেখ ভাই অনঙ্গ, তুমি আমার বন্ধু। তুমি যদি পাহাড় থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করতে চাও, তাহলে আমি যেমন তোমাকে তা করতে দেব না, তেমনি আমার কবিতাও তোমাকে ছাপতে দেব না। কবিতা কেউ আজকাল পড়ে না এদেশে। বিশেষত আমার কবিতা কেউ পড়বে না, আমি 'ঘোড়া'ব সঙ্গে 'মোড়া' বা 'থোড়া' মেলাবার জন্যে কবিতার ভাবকে দুমড়ে দিতে পাবি না। আর তোমাদের আধুনিক কবিদের আবছা ঝাপসা কবিতা লেখার ক্ষমতাও আমাব নেই। সুতবাং আমার কবিতা বাজারে কাটবে না। এমন কি পোকাতেও কাটবে কি না সন্দেহ। সুতরাং তোমাকে এ গহ্বরে ঠেলে দিতে আমি রাজী নই।"

অনঙ্গ বলল, "দেখ ভাই শ্যামল, গহ্বরে না ঢুকলে অনেক সময় রত্ন পাওয়া যায় না, তোমাকে এ কথা বলে খোশামোদ করতে চাই না। তোমার কবিতা হয়তো রাবিশ, কিন্তু একটা কথা জেনে রাখো I know my business ওসব কথা পরে হবে, এখন তুই কি করছিস বল।"

সেদিন তিন বন্ধুর পুনর্মিলনের পর একটা জিনিস ঠিক হয়ে গিয়েছিল। ঠিক হয়ে গিয়েছিল মৃত্যু ছাড়া আর কেউ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না। অনন্তর ভুঁড়ি হয়েছিল একটু, লুঙ্গির কসিটা বার বার খুলে যাচ্ছিল তার। সে কসিটা আবার ভাল করে গুঁজে বলল, "আমার আর একটা প্রস্তাব আছে শোন। তুমি যতদিন না ভালো একটা চাকরি যোগাড় করতে পারছ ততদিন আমি তোমাকে বিনাপয়সায় রোজ একটা করে ব্রাউন ব্রেড দেব। না, না, একটা কথা শোন। আমি মহত্ত্ব প্রকাশ করছি না, আমি সেই ধার শোধ করবার চেষ্টা করছি যা এখনও শোধ হয় না। সেই ছেলেবেলায় তুমি রোজ তোমার টিফিন থেকে

আমাকে ভাগ দিতে, মনে আছে? ব্যস্, আর কোনও কথাটি নয়। রোজ তোমার ঠিকানায় একখানা করে রুটি পৌঁছে যাবে!"

অনঙ্গ বলল, "আমি অবশ্য তোমার কাছে ঋণী নই। কিন্তু আমি একটা জিনিস নি-খরচায় করে তোমার কিছু উপকার করতে পারি হয়তো। তুমি আমার দোকান থেকে বই নিয়ে পড়তে পার, একটি জিনিস কেবল তোমায় দেখতে হবে বই যেন জখম বা ময়লা না হয়। আমার দোকানে ইংরেজি বইয়ের স্টক খুব নিন্দনীয় নয়। গেলেই দেখতে পাবে—যেও একদিন। অনন্ত তোমার দৈহিক খাবার যোগাচ্ছে, আমি তোমাব মানসিক খাবার যোগাব।"

শ্যামল ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, "আমাকে একটা কাগজ দাও।"

"কি হবে?"

"দাও না। এনি কাগজ—"

অনন্ত পাঁউরুটি যে কাগজে মুড়ে দেয় সেই ব্রাউন পেপার এগিয়ে দিলে একটা। শ্যামলের পকেটে কলম ছিল। সে টেবিলের উপব কাগজটা বেখে লিখতে লাগল ঃ--

একটা রঙীন ঘুড়ি আকাশে উড়ছিল
বেশ উড়ছিল খানিকক্ষণ।
তার পরই—ভো কাট্টা।
টাল খেতে খেতে পড়ল সে গিয়ে
একটা কণ্টকাকীর্ণ বাবলা গাছেব উপর,
ধু ধু প্রান্তরে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে ছিল গাছটা।
ঘুড়ি তার সঙ্গী হল।
বোবা বাবলা বোবা হয়েই রইল।
তারপর একদিন যা ঘটল
তা বিস্ময়কর।
ওই তেপান্তর ধু ধু মাঠে কোথা থেকে
হাজিব হ'ল দুটো ছেলে।
একজনের হাতে লগি একটা
আর একজনের হাতে লাটাই।
আস্তে আস্তে লগি দিয়ে
ঘুড়িটাকে নামিয়ে ফেলল তারা।
তারপর সেটাকে উড়িয়ে দিলে আকাশে।
ঘটনা সামান্য,
তবু বলছি জয় জয় জয়।
উর্বশীই সব সময়ে অমৃতকুম্ভ আনেন না

দুপুর রোদে, তেপান্তর মাঠে
লগি হাতে দুটো ছেলে সেদিন যা নিয়ে এল
তা অমৃতই।

অনঙ্গ বলল, "বেশ হয়েছে।"

অনন্ত কসি গুঁজে বলল, "আমাকে দাও ওটা, আমি বাঁধিয়ে রেখে দেব। নীচে ডেট দিয়ে নাম সই করে দাও।"

শ্যামল কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেললে কাগজটা। তারপর বলল, "ভাল কবিতা আর একটা লিখে দেব।"

এরপর প্রায় বছর তিনেক কেটে গেছে। তিন বন্ধুর বন্ধুত্ব গাঢ়তর হয়েছে আরও। শ্যামল সোম ভাল চাকরি পেয়েছে একটা। অনঙ্গর দোকানের একজন পুরোনো খদ্দের হঠাৎ ভি আই পি হয়ে গেলেন একদিন। তিনিই সুযোগ সুবিধা করে দিলেন। শ্যামল কিন্তু এখনও অনঙ্গর দোকান থেকে রোজ একখানা করে বই নিয়ে আসে, আবার পড়ে ফেরত দেয়। অনন্তও রোজ একটা করে ব্রাউন ব্রেড দিয়ে যাচ্ছে তাকে বিনা পয়সায়। ঘনিষ্ঠতাটা এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে উঠেছে যে পয়সা দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না আর। অনন্তর বক্ষিতা নয়নতারা আর তার স্ত্রী বিজনবালা দুজনের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে শ্যামলের। দুজনকেই ভালো লেগেছে তার। বিজনবালাকে যতটা খারাপ লাগবে ভেবেছিল ততটা লাগেনি। তার মনে হয়েছে বিজনবালার পায়ে অনন্ত রূপ জুতো জোড়াটি ভাল ফিট করেনি, একটু বেশী টাইট হয়েছে। তাই বিজনবালা স্বস্তি পাচ্ছে না। সে যে আবহাওয়ায় মানুষ সে আবহাওয়াটা এখনও ঘিরে আছে তাকে সর্বক্ষণ। সেই আবহাওয়ার স্বামী হিসাবে অনন্ত অচল। তার স্লিম হওয়া উচিত ছিল স্মার্ট হওয়া উচিত ছিল, বড় চাকরি করা উচিত ছিল তাকে নিয়ে যখন-তখন যেখানে সেখানে আস্ফালন করবার মতো কোনও একটা তাক-লাগানো যোগ্যতা থাকা উচিত ছিল, কিন্তু অনন্ত ভুঁড়িওলা নাদুসনুদুস পাঁউরুটি ওলা মাত্র। এককালে নাকি ফেরি ওলা ছিল। বিজনবালা আধুনিকা, সে পার্টিতে যেতে চায়, মহিলা সমিতিতে মাতব্বরী করতে চায়, হোমগার্ডস-এ নাম লেখাতে চায়, নভেল পড়তে চায়, সাহিত্যজগতের খবর রাখতে চায়, ফুটবল খেলোয়াড়, হকি খেলোয়াড়, সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীদের খুটিনাটি জীবনচরিত জানতে চায় —ছেলেবেলা থেকে এইসবই করেছে সে। কিন্তু রং কালো আর দাঁত উঁচু বলে কোনও আধুনিক অভিজাত সমাজে ঢোকবার টিকিট সে পেল না। বিয়ে করতে হল পাঁউরুটি-ওলা অনন্তকে, যার বুকভরতি লোম, থলথলে ভুঁড়ি, হলদে দাঁত, মুখে বিড়ির গন্ধ। অনন্তর ইচ্ছে বিজন রান্নাঘরে ঢুকে তার জন্যে নানারকম রান্না করুক, তার জন্যে মোজা সোয়েটার বুনুক, সে আপিস থেকে ফিরলে তার ঘামে-ভিজে জামা গেঞ্জি নিজে হাতে খুলে সাবান জলে ভিজিয়ে দিক, অনন্তর ফিরতে দেরি হলে তার অপেক্ষায় জানলার গবাদে ধরে দাঁড়িয়ে থাকুক। সে খেতে বসলে পাখা হাতে তার সামনে বসে হাওয়া করুক। এসবে অভ্যস্ত নয় বিজন কোনওকালে। ছেলেবেলায় সে নাচ শিখেছে, গান শিখেছে, গীটার শিখেছে, সেতার শিখেছে, মোটরে করে যখন যেখানে খুশি গেছে। কখনও আলিপুরে,

কখনও বন্ধুর বাড়ি, কখনও বোটানিকাল গার্ডেন, কখনও বা সিনেমা। উবু হয়ে বসে মসলা বাটা বা রুটি বেলা সে শেখেনি কখনও রাঁধতেও জানে না। পান সাজতেও না। পুডিং তার প্রিয় খাদ্য, কিন্তু অনন্ত মোটেই তা ভাল বাসে না। ফুচকাও না। অথচ স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে সে কি আনন্দে যে একটার পর একটা ফুচকা খেত তাব স্মৃতি এখনও মনে পড়ে তার। যদিও সে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করতে পারেনি, কিন্তু কলেজের অনেক মেয়ে তার বান্ধবী। তাদের কাছ থেকে সে কত মজার মজার গল্প যে শুনত......অনন্ত কিন্তু ভিন্ন জগতের লোক। ময়দা, চিনি, তাড়ি আর পাঁউরুটি এ ছাড়া সে আর কিছু জানে না। আর জানে কলিমুদ্দিন, আর খদ্দের। শ্যামল সহৃদয় মন নিয়ে এর সঙ্গে আলাপ করেছে এবং এই বন্দিনী বিহঙ্গমকে মাঝে মাঝে মুক্ত হাওয়ায় ছেড়ে দেবার চেষ্টা করেছে। অনন্ত বাধা দেয়নি। শ্যামল সুযোগ পেলেই তাকে সিনেমায় থিয়েটারে নিয়ে যায়, সাহিত্যিক বা গানের জলসায় কার্ড যোগাড় করে দেয়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলে বেড়াতেও নিয়ে যায় মাঝে মাঝে। শ্যামল লক্ষ্য করেছে তার মনের মতো পরিবেশ পেলে বিজনবালার চেহারা বদলে যায়। তার মধ্যেও সেই ঔৎসুক্য, সেই কমনীয় লজ্জা, সেই ভীরু মিনতি, সেই অনির্বচনীয় আকৃতি আছে যা চিবকাল কবিতার খোরাক যুগিয়েছে। সে অনন্তকে একদিন বলেছিল, "তুমি মাছকে জল থেকে তুলে ডাঙায় এনেছ বলেই ও ছট্‌ফট করছে। ওর আসল রূপ তুমি দেখতে পাচ্ছ না। ওকে ঠিকমতো পেতে হলে ওকে জলে ছেড়ে দিতে হবে।" অনন্ত হেসে উত্তর দিল, 'আমি ডাঙার মানুষ, ওকে জলে ছেড়ে দিয়ে আমি কি ছিপ কাঁধে করে ওর পেছু পেছু ঘুরে বেড়াব! ওকে তো ছেড়েই দিয়েছি, যা খুশী করুক। জলে-স্থলে আকাশে যেখানে গিয়ে সুখ পাবে পাক। আমাকে দিক্ না করলেই হল!"

"তুমি একটু সাঁতার শেখ না," হেসে জবাব দিয়েছিল শ্যামল, "ও যে জগতের লোক সেখানেও আনন্দেব খোরাক আছে।"

অনন্ত কোনও জবাব না দিয়ে হেসে একটি বিড়ি ধরিয়েছিল কেবল। মাঝে মাঝে অনন্তর সঙ্গে শ্যামল বিজনবালার কাছে যায়। শ্যামল গেলে একটা নূতন চঞ্চলতা জাগে তার, অপটু হস্তে নিজেই চা করবার চেষ্টা করে, কোন কোন দিন হালুয়াও।

নয়নতারাকে দেখে কিন্তু সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেছে শ্যামল। নয়নতারার বয়স হয়েছে। চল্লিশের কাছাকাছি, আরও নাকি বেশী হতে পারে। কিন্তু মনে হয় যেন ষোড়শী যুবতী। এই ধারণাই শ্যামলের অনেকদিন ছিল। একদিন বয়সের প্রসঙ্গ ওঠাতে নয়নতারা নিজেই বলল, "দেখুন, দেখে মেয়েমানুষের বয়স আন্দাজ করা যায় না। আমার বয়স কত বলুন তো?"

"কুড়ির মধ্যেই নিশ্চয়"—শ্যামল বলেছিল।

"চল্লিশ পেরিয়ে গেছে।"

মুচকি হেসে চোখ নীচু করে, মাথার কাপড়টা ঈষৎ টেনে যে ভাবে কথাটা বলেছিল নয়নতারা তার ছবি এখনও আঁকা আছে শ্যামল সোমের মনে। তার এ-ও মনে হয়েছিল মেয়েটি হয়তো মিথ্যা কথা বলছে, যা মেয়েরা সাধারণতঃ করে না, নিজের বয়স বাড়িয়ে

বলা, তাই করে সে হয়তো নিজের অসাধারণত্ব প্রমাণ করতে চাইছে। তার চলনে বলনে ভাবে ভঙ্গিমায়, চেহারায় প্রৌঢ়ত্বের কোনও লক্ষণই দেখতে পায়নি সে। কিন্তু এ নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামাবার সময়ও পায়নি, প্রয়োজনও বোধ করেনি। তার আচরণে, তার অনবদ্য ভদ্র ব্যবহারে, তার আন্তরিক সেবাপরায়ণতায় সে ক্রমশঃ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মা আর প্রেয়সির এমন একটা শোভন সংমিশ্রণ যে সম্ভব তা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। প্রথম দিন গিয়ে গানবাজনার কথা পেড়েছিল শ্যামল। অনন্তকে বলেছিল, ''উনি গানটান জানেন নিশ্চয়। একটু শোনাতে বল না।''

নয়নতারা তখন পাশের ঘরে ছিল।

অনন্ত বলল, ''আমি তো খোঁজ করিনি। হয়তো জানে। আমি আগেই তো বলেছি দোকান থেকে যখন ফিরি তখন আর গানটানের কথা মনে আসে না। মনে হয় জামা কাপড় ছেড়ে হাত পা মুখ ধুয়ে একটু জিরুই। ওগো শুনছো—''

নয়নতারা পাশের ঘর থেকে এল।

''শ্যামল জিগ্যেস করছে তুমি গানটান কিছু জান কি না। ও কবি লোক তো। যদি জানা থাকে শোনাও ওকে দু'একটা।''

নয়নতারা লজ্জিত হয়ে পড়ল। তারপর মাথার কাপড়টা একটু টেনে আনতনয়নে বলল, ''এককালে জানতুম। কিন্তু ওঁব কোন শখ নেই বলে চর্চা নেই তেমন।''

''তবু শোনাও একটা।''

নয়নতারা শুধুগলায় মৃদুকণ্ঠে আলাপ শুনিয়েছিল সেদিন। অমন সুন্দর আলাপ শুধু গলায় যে হতে পাবে তা শ্যামলের জানা ছিল না। গান সম্বন্ধে তার নিজেরও বিশেষ জ্ঞান ছিল না, তবু সে অবাক হয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল সে। তারপর বলল, ''এ তো অতি চমৎকার। আমি গানের কিছু বুঝি না, তবু খুব ভালো লাগল। কি গাইলেন?

''পূরবী--''

''ওস্তাদ রেখে শিখেছিলেন নিশ্চয়—''

''হ্যাঁ। ছেলেবেলায় অনেকদিন ওস্তাদের কাছে শিখেছিলাম। থাক ওসব কথা—। শিঙাড়া করেছি, নিয়ে আসি।''

পরমুহূর্তেই পাশের ঘরে চলে গিয়ে দু'থালা ভরতি গরম শিঙাড়া নিয়ে এল। তার মুখের ভাব দেখে শ্যামলের মনে হয়েছিল সে যেন নীরব ভাষায় বলছে—যা বোঝ, তাই এনেছি, নাও। মুখে কিন্তু সে বলল, ''আপনি যে সুরের এমন সমঝদার হবেন তা ভাবতে পারিনি। শিঙাড়াগুলো কেমন হয়েছে দেখুন তো।'' শিঙাড়াও চমৎকার হয়েছিল। তারপর অনেকবার শ্যামল অনন্তর সঙ্গে নয়নতারার বাড়ি গেছে। কিন্তু গানের প্রসঙ্গ আর সে উত্থাপন করতে পারেনি। তার প্রথম দিনেই মনে হয়েছিল ও প্রসঙ্গের অন্তরালে হয়তো বেদনাদায়ক কোনও রহস্যময় যবনিকা আছে, যা সরাবার চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কিছুদিন পরে ও প্রসঙ্গ আর মনেও ছিল না তার। নয়নতারার সেবাপরায়ণতাই ক্রমশঃ এত বড় হয়ে উঠেছিল

তার কাছে যে তার অন্য কোনও গুণ আছে কি না কিংবা থাকা উচিত কি না এসব কথা মনেই পড়েনি তার। নয়নতারাকে সে কোনও বিদুষী অধ্যাপিকা, বা নৃত্যগীতপটীয়সী নর্তকীরূপে আর কল্পনাই করতে পারে না। একটি উপমাই তার সম্বন্ধে বার বার মনে হয় শ্যামলের। সে যেন বিরাট একটা দীর্ঘিকা, স্বচ্ছ সলিলে, পরিপূর্ণ, স্নিগ্ধ নীলাভ কৃষ্ণকান্তিতে মনোরম। তীরে ছায়াশীতল গাছের শ্রেণী, দূরে সুন্দর একটি বাঁধানো ঘাট। সেখানে অবগাহন করা যাবে, তৃষ্ণার জল পাওয়া যাবে, কিছু না করেও যদি কেবল তীরে বসে থাকা যায় তাহলেও তৃপ্তি পাওয়া যাবে। নয়নতারার সঙ্গে সে দিদি সম্বন্ধ পাতিয়েছে। তার সঙ্গে অন্য কোনরকম সম্বন্ধের কথা ভাবতেও পারে না সে। অনন্তর সঙ্গে তার যৌন সম্পর্ক আছে কি না তা সে জানে না, জিজ্ঞাসাও করেনি। কিন্তু মনে হয় অনন্তকে ও সেবা দিয়েই বশ করেছে। অনন্ত রোজ দোকান থেকে ফিরে এগারোটা বারোটা পর্যন্ত নয়নতারার কাছে থাকে, তারপর একটি রিক্‌শা করে বাড়ি যায়। একদিন শ্যামল অনন্তকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি দিদির নাগাল পেলে কি করে? অনন্ত নির্বিকারভাবে উত্তর দিয়েছিল—কলিমুদ্দিনই ওর খবর দেয় আমাকে। তার এক বন্ধুর কাছে ও ছিল দিনকতক। বন্ধুটি মারা যায়। বিধবার মতোই ও বাস করছিল। তারপর আমি গিয়ে ওকে নিয়ে আসি। প্রথমে আসতে চায়নি, কিন্তু কলিমুদ্দিন অনেক করে বলাতে রাজী হল। অনেক কষ্টে রাজী করাতে হয়েছে। আলাদা বাড়ি ভাড়া করে তবে ওখানে নিয়ে এলুম, কিন্তু মাস দুই যাইনি। দূর থেকেই কেবল খবর নিতুম। একদিন দেখলুম ও রঙীন শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর আমি যখন গেলুম তখন বললে, আপনি বসুন, আপনার জন্যে রোজ খাবার করে রাখি। কিন্তু আপনি আসেন না। আমি বসতেই আমার জুতোর ফিতে খুলতে বসে গেল। ব্যস্‌, সেইদিন থেকেই শুরু আর কি। শ্যামলের মনে হয় নয়নতারা তার জীবনেও একটা পরম প্রাপ্তি। তার বিশ্বাস কোথাও যদি সে আশ্রয় না পায় নয়নতারার কাছে পাবে। বিজনের কাছেও সে যায়। যায় কৌতূহল নিয়ে। সে জানে, অনুভব করে বিজনের মধ্যেও সেই চিরন্তনী নারী আছে, তার আভাস মাঝে মাঝে সে পেয়েছে, কিন্তু তার হাতের সুধাপাত্রটি এখনও দেখতে পায়নি। সে জানে কোথাও না কোথাও সেটি আছে। আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার উদগ্র কাঁটাগুলোর আড়ালে সেটিকে দেখা যাবেই একদিন। ফণীমনসার গাছে ফুল ফুটবে। জীবন এইভাবেই চলছিল তিন বন্ধুর। অনঙ্গর জীবনে কোনও নারীর আবির্ভাব হয় নি এখনও। তার চরিত্র পাথর আর আগুনের সমন্বয়। বেলা দশটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত দোকানে থাকে। দিনের বেলায় খায় দুধ আর ফলমূল। রাত্রে কোনও ভালো হোটেলে গিয়ে ইংরেজি খানা খায়। সে শ্যামলকে বলেছিল, আমি বিয়ে করব না। কারণ স্বপ্নকে বিয়ে করা যায় না। তাছাড়া স্বপ্নও একটা বা একরকম নয়। রোজ তাদের রূপ বদলায়, রং বদলায়। ওদের নিয়েই আমি ভালো আছি। একটা বাস্তব বউ এনে তাকে কষ্ট দিতে চাই না। দেশবিদেশের সাহিত্য আর তাদের নিয়ে আলাপ আলোচনা করেই তার সময় কাটে। সন্ধ্যের পর তার দোকানে যে আড্ডাটা বসে সেখানে অনেক নামজাদা অধ্যাপকও আসেন। তাঁদের সঙ্গে আসেন আরও অনেক নামজাদা অধ্যাপকও আসেন।

তাদের সঙ্গে আসেন আরও অনেক নামজাদা লোক যাঁরা ঠিক সাহিত্যিক নন। এই আড্ডাতেই একজন ভি আই পি-র সাক্ষাৎ পেয়েছিল শ্যামল। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন চাকরি করে দেবেন। কিন্তু অনেকদিন তার কাছ থেকে কোনও খবর পাওয়া গেল না। তখন অনঙ্গ তাকে একদিন নিয়ে গেল পাঠকজির কাছে। পাঠকজির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তার একজন অধ্যাপকের মাধ্যমে। অধ্যাপকটি বলেছিলেন পাঠকজি হাত দেখে এবং চোখ মুখ দেখে অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। সত্যি অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী করলেও। কোন তারিখে শ্যামলের চাকরির চিঠি আসবে সে তারিখটি পর্যন্ত বলে দিলেন। সেই থেকে শ্যামল পাঠকজির ভক্ত হয়েছে। সেইখানেই বিশ্বদীপের সঙ্গে আলাপ হল একদিন। বিশ্বদীপের স্বপ্নালু চোখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। আরও অবাক হয়ে গিয়েছিল তাঁর রূপ দেখে। শুধু 'কন্দর্পকান্তি' বললে ও রূপের বর্ণনা হয় না। ওর রূপে এমন একটা কিছু আছে যা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তারপর যখন বিশ্বদীপের সঙ্গে আলাপ হল, তখন শ্যামলের মনে হল এর সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব করতে না পারি তাহলে জীবনই বৃথা। বন্ধুত্ব হতেও দেরি হল না। তার কবিতা শুনেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন বিশ্বদীপ। বস্তুতঃ মনে হল বিশ্বদীপের সমস্ত সত্তা বন্ধুই খুঁজে বেড়াচ্ছে যেন সারাজীবন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষ্যাপার মতো নুড়ির জঙ্গলে যেন সারাজীবন খুঁজছেন পরশপাথর এখনও খুঁজছেন কিন্তু পাননি। তাই ওর খোঁজারও শেষ হয়নি এখনও। নূতন লোক পেলেই সাগ্রহে আলাপ করতে যান। শ্যামলের সঙ্গে সহজেই বন্ধুত্ব হয়ে গেল। শ্যামলের কবিতা শুনতে শুনতে তার চোখে মুখে যে ভাব ফুটে ওঠে তা অসাধারণ মনে হয় তিনি যেন নায়গ্রা প্রপাত দেখছেন কিংবা চেয়ে আছেন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের দিকে। কবিতা পড়া শেষ হয়ে গেলেও চোখ মুখের সে উদ্দীপ্ত ভাব নিবে যায় না, অনেকক্ষণ থাকে। একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন একদিন।

"কবিতা ছাপাবার চেষ্টা করবেন না। ভাল কাগজে রং আর তুলি দিয়ে লিখে পুঁথির মতো রেখে দিন ওগুলো লুকিয়ে। অধিকাংশ মানুষই এখনও বর্বর, তারা কবিতার মর্যাদা দিতে পারে না। ভগবানও বোধহয় একথা জানেন। তাই তিনি মণি সৃষ্টি করে তাকে লুকিয়ে রেখেছেন খনির অন্ধকারে, মুক্তা সৃষ্টি করে তাকে স্থান দিয়েছেন সেই শুক্তির মধ্যে যে গভীর সমুদ্রবাসী। কবিতা ছাপা হলেই তা খেলো হয়ে গেল। শেকসপীয়র থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেরই ওই দুর্দশা। অনেকে কেনে কিন্তু পড়ে না, অনেকে পড়ে কিন্তু বুঝতে পারে না। কবিতার অর্থ বোঝবার সামর্থ্য অধিকাংশ লোকেরই নেই। ডিগ্রীধারী সবজান্তা একদল লোক আছেন তারা কবিতা জবাই করেন। তা ও ধারালো ছুরি দিয়ে নয় ভোঁতা ছুরি দিয়ে। আপনার কবিতার সে দুর্দশা যেন না হয়।"

এসব ঘটনার কিছুদিন পরেই আলাপ বিদুলার সঙ্গে। চমকে গেল শ্যামল বিদুলা যেন নানারঙের বাল্‌বের একটা বিরাট তোড়া, অবিশ্বাস্য দক্ষতায় নিজেকে প্রকাশিত করেছে বহুশাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট বহুবর্ণবিচিত্র ঝাড়লণ্ঠনের বিস্ময়কর শোভায়। সর্বদাই যেন ঝলমল করছে। তার চারদিকে যে অসংখ্য অতসী কাচ দুলছে তার প্রত্যেকটি থেকে প্রতি দোলনেই বিচ্ছুরিত হচ্ছে নূতন রশ্মি, নূতন বিস্ময়। সে অপূর্ব, কিন্তু সে প্রকৃতির স্বাভাবিক শোভা নয়, মানুষের তৈরী শিল্পসভ্যতার নানা কারুকার্যে সে মণ্ডিত। তার রূপ অনবদ্য, তার হাসি সুন্দর,

তার ছলা-কলা, লীলা-লাস্য সবই মনোহর, সবই আকর্ষণ করে, কিন্তু সাহস করে খুব কাছে যাওয়া যায় না। নয়নতারার সঙ্গে বিদুলার কোন মিল নেই। একজন সুসজ্জিত আধুনিক ড্রয়িংরুম, আর একজন স্বাভাবিক কুঞ্জবন। বিজনবালার সঙ্গেও মিল নেই বিদুলার। আধুনিক সভ্যতার ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থপরতাই কাঁটার মতো উদগ্র হয়ে আছে তার চারদিকে, সে সভ্যতার শোভা সে আহরণ করতে পারেনি। বিদুলাকেও সে নিজের কবিতা শুনিয়েছে, বিদুলা উদ্ভাসিত হয়ে উঠবার ভান করেছে, কিন্তু তার এ উচ্ছ্বাস যে মেকী তা বুঝতে দেরি হয় নি শ্যামলের। আর একটা জিনিসও বুঝতে দেরি হয় নি,—দু' একদিন যাতায়াতের পরই সে বুঝেছিল যে বিদুলা বিশ্বদীপকে ভালোবাসে। তবু সে বিদুলার কাছে মাঝে মাঝে যায়, বিশ্বদীপের কাছেও যায়, তাদের মধ্যে সেই বস্তু গড়ে উঠেছে যাকে আধুনিক ভাষায় বলে 'ফ্রেণ্ডশিপ্' কিন্তু যা গভীর কিছু নয়। কিন্তু মনোরম।

ওয়ালটেয়ারের বাড়িটা অনঙ্গই যোগাড় করেছিল। সমুদ্রের কাছেই বেশ বড় বাড়ি। কথা ছিল অনঙ্গ আর অনন্ত দু'দিন মাত্র থাকবে সেখানে। এই দু'দিনের জন্য তারা দোকানে লোক ঠিক করে এসেছিল। শ্যামল এসেছিল এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে। বিদুলার সঙ্গে ছিল চাকর, রাঁধুনী আর দারোয়ান। বিদুলা তিন চারবার করে সমুদ্রে স্নান করত। সমুদ্রের সঙ্গে খেলা করবার জন্যেই যেন এসেছিল সে। সেদিন সকালে অনন্ত অনঙ্গ আর শ্যামল তিনজনেই বসেছিল সমুদ্রের ধারে। বিদুলা স্নান করতে গিয়েছিল একটু দূরে নির্জন জায়গায়। অনঙ্গ একটা ফরাসী গল্প সংগ্রহের ইংরেজি অনুবাদ পড়ছিল। শ্যামল বসেছিল সমুদ্রের দিকে চেয়ে আর বকবক করে যাচ্ছিল অনন্ত। ওয়ালটেয়ারে সমুদ্রের সান্নিধ্যে এসে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন হয়েছে অনন্তলালের। তার মনের দুয়ার যেন খুলে গেছে।

সে বলছিল, "দেখ ভাই শ্যামল, এখানে এসে মনে হচ্ছে আমার মনটা যেন হাওয়া হয়ে গেছে আর ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে সমুদ্রের ঢেউগুলোর উপর। এতো ভালো লাগছে দোকানটোকানের কথা মনেই পড়ছে না"

শ্যামল গম্ভীরভাবে বলল, "নয়নতারার কথা---?"

"নয়নতারা এখানে বেমানান। ঘরের কোণে যে প্রদীপ সুন্দর তা কি এখানে মানায়?"

"তুইও যে কবি হয়ে উঠলি দেখছি। মানায় কি না তা জিজ্ঞেস করিনি। মনে পড়ছে কি না তাই জিজ্ঞেস করছি। তোর মনের ভিতর তো একটা ঘরের কোণ আছে, সেখানে প্রদীপ জ্বলছে কি না।"

"না, জ্বলছে না, মাইরি বলছি। মনে হচ্ছে সব যেন উড়ে গেছে। আমাদের পাশের গলিতে মাঝে মাঝে প্রমোদ ভট্চাজ গীতা-টিতা পড়ে, ভূমার কথা বলে। সেখানে গেছি মাঝে মাঝে, কিন্তু ঢুলেছি কেবল। কিচ্ছু বুঝতে পারি নি। এখন যেন বুঝতে পারছি ভূমা কি"

অনঙ্গ বই থেকে মুখ তুলে বলল, "তুমি আজই সন্ধ্যের ট্রেনে ফিরে যাও। ভূমার ছোঁয়াচ লাগলে তোমার দোকান টিকবে না। তুমি গাঁইয়া লোক, যদিও কলকাতায় থাক, দুটো সমুদ্রের ধাক্কা তুমি সইতে পারবে না। আজই ফিরে যাও। তোমার দোকান উঠে গেলে সেটা একটা ন্যাশানাল লস্ হবে বলে মনে করি। ভালো রুটি আজকাল দুর্লভ।"

অনন্ত স্মিতমুখে বিঁড়ি ধরিয়ে বলল, "দেখ্ অনঙ্গ, লেখাপড়া শিখে তুই একটি আস্ত

পাগোল হয়েছিস দেখছি। মাথার উপর থেকে আকাশ লোপ পেয়ে যাবে, কিংবা পায়ের তলায় মাটি থাকবে না একথা যেমন ভাবা যায় না, তেমনি আমার পাঁউরুটির দোকান থাকবে না একথাও ভাবা যায় না। আমি তোদের কাছে আমার মনটা একটু খুলে ধরেছিলুম আর অমনি তোরা ঠাট্টা শুরু করে দিলি। কিন্তু দুটো সমুদ্র তুই কোথায় পেলি, আমি তো একটা দেখছি ''

'আর একটা সমুদ্র, সমুদ্রে স্নান করতে গেছে ''

''বিদুলাকে তুই সমুদ্র বলিস। আমি তো মনে মনে ওর নামকরণ করেছি চণ্ডী''

অনঙ্গ বলল, ''আমি বলিনি। শ্যামল বলেছে। শ্যামল ওর নামে কবিতা লিখেছে একটা এখানে।''

''কই শোনায়নি তো আমাকে—''

অনন্ত শ্যামলের দিকে ফিরে বলল, ''দেখ শ্যামল, তুমি ও মেয়ের সঙ্গে প্রেম কর আমার আপত্তি নেই, কিন্তু ওকে বিয়ে করবার চেষ্টা কোরো না। ওকে সামলাবার তাগদ তোমার নেই। বেশী ঘনিষ্ঠ হলে ওর সঙ্গে ভেড়ার মতো থাকতে হবে।''

অনন্ত বলল, শ্যামল ভেড়া হয়ে গেছে এ কল্পনা করা শক্ত। সত্যিই শক্ত।

অনন্ত তার উত্তরে বলল ''তাহলে ভেড়া না বলে খানসামা বলছি। যে মেয়ে দুধের সরের সঙ্গে জুঁইফুল বেটে সর্বাঙ্গে মাখে, যার আতরের শিশিটা বাঘর বোয়ালের মতো দেখতে যার তোয়ালেকে ভেলভেট বলে ভুল হয় তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কি শ্যামলের কম ?''

শ্যামল বলল 'আমি পাল্লা দিচ্ছি না তো, আমি কেবল কবিতা লিখছি। আমি সয চন্দ্র সমুদ্র হিমালয় নিয়ে কবিতা লিখেছি, কিন্তু ওদের বিয়ে করব, কিংবা ওদের সঙ্গে পাল্লা দেব একথা একবারও ভাবিনি। বিদুলার সম্বন্ধেও ভাবি নি।''

অনঙ্গ বলল, ''কিন্তু তোমার চোখমুখের ভাব থেকে যা প্রকাশ পায় তার উৎস ঠিক নিরাসক্ত কবির নির্বিকার সৌন্দর্য বন্দনা বলে তো মনে হয় না। তাই অনন্তকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু আমার মতে কবিদের দুটি জিনিস প্রয়োজন। প্রথম প্রেম, দ্বিতীয় প্রশংসা। তোমার মনে যদি প্রেম জেগে থাকে আমি আপত্তি করব না। বরং বড় বড় কবিদের নজির তুলে তোমাকে সমর্থন করব। বায়রনের কথা ছেড়ে দাও, পৃথিবীর প্রায় সব কবিই কোন না কোন সময় প্রেমে পড়েছেন এবং যখন পড়েছেন তখনই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি ফুলে ফলে শোভায় বিস্ময়কর হয়েছে। প্রেমে পড়, বিদুলা দেবী প্রেমে পড়বার মতো মেয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু পাঁকে পোড়ো না, সেখান থেকে তোমাকে তোলবার মতো ক্রেন আমার বা অনন্তর নেই।''

অনন্ত বলল, ''আমার দোকানের পেছনে একটি ঘর খালি হয়েছে। দোতলা বাড়ি, চমৎকার উঠোন, কল আছে, রান্নাঘর আছে, বাথরুম আছে। আমার মনে হয় শ্যামল একটি গেরস্তঘরের মেয়েকে বিয়ে করে ফেলুক। ফেলুর একটি ডাগরডোগর মেয়ে আছে, জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব করতে পারে, সেদিন দেখলুম গাছকোমর বেঁধে ঝাড়ু নিয়ে বালটি বালটি জল ঢেলে উঠোন পরিষ্কার করছে। ফেলুর বউ বছর-বিয়ানী। দশটি

ছেলেমেয়ে। সক্কলকার হ্যাঁপা ওই মেয়েটাই সামলায়। শ্যামলের যদি মত থাকে ওই মেয়েটির সঙ্গে সম্বন্ধ করতে পারি। আমার বিশ্বাস ওকে বিয়ে করলে শ্যামল আরাম পাবে আর এই সব ঘোড়া-রোগ থেকে মুক্তিও পাবে।"

অনঙ্গ বলল, "শুনেছি বসন্তরোগের টিকে নেওয়ার পরও কারও কারও বসন্ত হয়। আমার মনে হয় শ্যামলের মনটা এখন আগে একটু থিতুক, তারপর ওর বিয়ের কথা ভাবা যাবে। ঝড় তো বেশীক্ষণ থাকে না—"

অনন্ত সমুদ্রের দিকে চেয়ে নাক চোখ মুখ কুঁচকে মাথা চুলকোতে লাগল। তারপর বলল, "এ তো ঝড় নয়, এ যে চুলকোনি। এ ব্যামো সহজে যায় না। তাছাড়া ও মাগী যে রকম চণ্ডী দেখছি –"

শ্যামল হঠাৎ ব'লে উঠল, "এ আলোচনা এখন বন্ধ কর। বিদুলা দেবী আসছেন।"

তবু অনন্ত মৃদুকণ্ঠে বলল, "ওর নাকটা দেখেছ? ঠিক যেন টিয়াপাখীর ঠোঁটের মতো। মনে হয় এখুনি ঠুকরে দেবে। আমার তো ওর সঙ্গে কথা কইতে ভয় করে।"

একটু পরেই বিদুলা এসে গেল। আলুলায়িতকুন্তলা। চুল প্রচুর। শ্যামলের মনে হল একরাশি কালো ফেনা যেন আছড়ে পড়ছে দেহ-তটের উপর। পরিধানে একটি রূপোলা জড়িপাড় মেহেদিরঙের শাড়ি। এসেই হেসে বলল, "চলুন ভিতরে যাই। চা বা কফি কিছু একটা খাওয়া যাক।"

অনঙ্গ বলল, "আপনার ফরমাশ মতো আনারস আনিয়েছি গোটাচারেক সেটার কি এখনই সদগতি করবেন?"

বিদুলা এমন একটি মিষ্টি হাসি হাসল যেন আনারসের সদগতি করাটাই বুঝি একটা পরম উপভোগ্য আনন্দদায়ক ব্যাপার। বলল, "না, আনারস আনিয়েছি, আনারস দিয়ে মাংস রাঁধব বলে। এ রান্নাটি নতুন শিখেছি। আজ আপনাদের খাওয়াব। চলুন যাওয়া যাক—"

ভিতরে গিয়ে দেখা গেল বিদুলার নির্দেশে তার রাঁধুনী প্রচুর খাবারের আয়োজন করেছে ছানার একরকম নোনতা খাবার, ডিম-আলুর পুর দিয়ে শিঙাড়া, খোসা ছাড়ানো মটরশুঁটির ঘুগনি, তাছাড়া কেক বিস্কুট অনেক রকম। অনন্ত একটু চা খেলে শুধু।

"আপনি কিচ্ছু খেলেন না যে—"

"আমার মুড়ি খাওয়া অভ্যাস। এসব পেটে সইবে না— "

"সইবে, সইবে। এই ছানার নিমকিটা খেয়ে দেখুন। খুব সহজে হজম হয়। ওবেলা আপনার জন্যে মুড়ি আনাব।"

চা পর্ব শেষ হয়ে গেলে অনঙ্গ বলল—"এবার শ্যামলের কবিতা শোনা যাক – "

"আপনি কি বই পড়ছিলেন।"

"ওটা ফরাসী গল্পের ইংরেজি অনুবাদ। অ্যালবার্ট কামুর একটা গল্প পড়লাম "

"কি গল্প।"

"দি গেস্ট। নূতন স্বাদ পেলাম গল্পটির মধ্যে। ভারু বলে মাস্টারটির চরিত্র অদ্ভুত রঙে এঁকেছেন উনি। খুনী আসামীটাও বেশ।"

"কামুর ও লেখাটা আমি পড়ি নি। 'দি ফল্' পড়েছি। বড্ড বেশী morbid মনে হয়।"

"Morbid কথাটা আজকাল খুব চালু হয়েছে। কিন্তু ও'দিয়ে এ যুগেব সব লোকেদেব, বিশেষ কবে লেখকদেব, বিচাব কবা চলে না বোধহয়। এ যুগে সবাই morbid। কিন্তু প্রত্যেকেব চেহাবা আলাদা। বৃন্তহীন বললে সব ফুলকেই হয়তো বোঝায়, কিন্তু 'বৃন্তহীন' শব্দটি দিয়ে জবাব আব বজনীগন্ধাব বৈশিষ্ট্য ফোটানো যায় না।"

বিদ্‌লা হঠাৎ উঠে একটা সুদৃশ্য আতবদানী থেকে উৎকৃষ্ট গোলাপী আতব 'স্প্রে' কবে দিল সবায়েব গায়ে। তাবপব সেটা বেখে দিয়ে বলল, "কামুব কি বৈশিষ্ট্য দেখেছেন আপনি?"

সব কবিদেব মতো উনিও পাঁকেব মধ্যে পঙ্কজ খুঁজতে বেবিয়েছিলেন। অবশ্য ওঁব পঙ্কজ ওব নিজেব পঙ্কজ নিজেব স্বপ্ন, নিজেব সৃষ্টি। যে পৃথিবী নিষ্ঠুব, যে পৃথিবী বিরূপ, যে পৃথিবীব দয়া মায়া স্নেহ প্রেমও ক্ষণিক অভিনযমাত্র, সেই পৃথিবীতে উনি ভদ্রলোকেব একটা জগৎ সন্ধান কবেছেন সাবাজীবন হয়তো আবিষ্কাব কবতেন সে জগৎ কিন্তু বড তাডাতাডি মাবা গেলেন। হার্ডিও সাবাজীবন ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, তাব কাব্যেব প্রধান সুবই নিষ্ঠুব নিয়তিব কাছে পবাজয়েব সুব, তাকেও অনেক morbid কবেন। আমাদেব শ্যামলকেও সে হিসাবে morbid বলা চলে। ও কালকে যে কবিতাটা লিখেছে সেটা দেখেছেন—"

"না, উনি দেখান নি তো। কেন জানি না, উনি কেমন যেন সহজ হতে পাচ্ছেন না।"

শ্যামল অনেকক্ষণ কোনও কথা বলেনি। সে প্রাণপণ চেষ্টা কবছিল সপ্রতিভ থাকবাব এব সেইজন্যেই বোধহয় সহজ হতে পাবছিল না।

বলল "আমি যখন একলা থাকি তখনও সহজ থাকতে পাবি না। আমাব মন এমন এক জগতে ঘুবে বেডায় যেখানে মনে হয় এখুনি বুঝি ধাক্কা খাব কোথাও। জগৎটা অপবিচিত এব অস্পষ্ট। কবিতাটা শুনবেন সত্যি?"

নিশ্চয। এখানে কি আব কববাব আছে--"

শ্যামল পডতে লাগল -

অন্ধকাবে বেবিয়েছিলাম
সমুদ্র খুঁজতে
যে সমুদ্র
দিনে অনেক দূবে স'বে যায়
বাত্রে কাছে আসে ঃ
যে সমুদ্রেব বার্তা পাই
আকাশেব ইন্দ্রধনুতে,
ঘননীল অপবাজিতাব নিগূঢ ইঙ্গিতে,
মখমল কোমল গোলাপেব
গাঢ লাল বহস্যেব কুহেলিতে।
যে সমুদ্রেব বত্ন
প্রেযসীব অঙ্গে,
আশাব মঞ্জবীতে,

হতাশার দুরাশায়,
যে সমুদ্র সমুদ্রই নয়
যা আমার মন,
যা আমাকে ঘিরে আছে
অথচ যাকে আমি পাই না,
সেই সমুদ্রের কল্লোল শুনছি,
চিরকাল শুনছি।
তাকেই খুঁজতে বেরিয়েছিলাম
সেদিন অন্ধকারে ঃ
গিয়েছিলাম অন্ধকারের পরপারে
যেখানে আদিত্যবর্ণ পুরুষ নয়
যেখানে আমার জ্বলন্ত সত্তা জ্বলছে
জ্যোতির্ময়ী রক্তিম ঊষার শোভায়।
সেই ঊষার আলোকে দেখলাম
সমুদ্রও সমুদ্রস্নান করছে।
তাকেও ঘিরে আছে একটা মহাসমুদ্র
সেই সমুদ্রে
সে ডুবছে, ভাসছে
সাঁতার কাটছে
সেই মহাসমুদ্রের তরঙ্গশীর্ষে
ভেসে বেড়াচ্ছে উচ্ছ্বসিত ফেনার মতো
আমার নাগালের বাইরে
আবার অন্ধকার নেবে এল
সমুদ্র ঢেকে গেল।

এমন সময় চাকরটা টেলিগ্রাম নিয়ে এল। টোটো টেলিগ্রাম করেছে বিদুলাকে— Come immediately বিদুলার সমস্ত মুখটা পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। তার মনে হল নিশ্চয় বিশ্বদীপেরই কিছু হয়েছে।

বলল, "আমাকে আজই ফিরতে হবে। ট্রেন কখন?"

"ট্রেন রাত্রে"—অনন্ত জবাব দিল।

"এখান থেকে প্লেন পাওয়া যাবে না বোধহয়।"

"না।"

অনন্ত বলল, "আমাকেও ফিরতে হবে আজ। অনঙ্গ তুই থাকবি কি?"

"আমি আর একদিন থাকতে পারতুম। কিন্তু আর থেকে কি হবে। চল সবাই ফিরেই যাই।"

শ্যামল কিছু বলল না।

বিদুলা চাকরটাকে ডেকে বলল, "মাংসটা এখনি কেটে পরিষ্কার করে রাখ আর আনারস দুটোও কুটে ফেল। চল আমি দেখিয়ে দিচ্ছি - ভেবেছিলাম আজ বিকেলে ওটা করব। কিন্তু বিকেলে গোছগাছ করতে হবে।"

চাকরের সঙ্গে বেরিয়ে গেল সে। খানিকক্ষণ পরেই ফিরে এসে শ্যামলের দিকে চেয়ে হেসে বলল, "আপনার কবিতা মনে নেশা ধরিয়ে দেয়। মনে হচ্ছে যেন লিকার খেয়েছি।"

যে হাসিটা হাসল তা হয়তো তার পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু অনন্তর মনে হল ঢং, শ্যামলের মনে হল পুষ্পবৃষ্টি। অনঙ্গর কিছুই মনে হল না।

।। আট ।।

বিশ্বদীপ ফ্যাকটারি থেকে সোজা গেলেন ডাক্তার ঘোষালের ক্লিনিকে। গিয়ে দেখলেন অনেক রুগী বসে আছে কিন্তু ঘোষাল নেই। তিনি যে নূতন বাড়িটা করাচ্ছেন সেইটের তদারক করতে গেছেন। বিশ্বদীপ সেখানে গেলেন। গিয়ে দেখেন প্রখর রোদে একটা টুলে বসে তিনি ইট গোনাচ্ছেন এবং নির্দেশ দিচ্ছেন সেগুলো ভিজিয়ে রাখতে। বিশ্বদীপকে দেখে তিনি উঠে দাড়ালেন এবং বললেন, "আসুন ত্রাণকর্তা, সিমেন্ট কই।"

"সিমেন্ট লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নিন। ফ্যাকটারির গুদোমে আছে - "

ঘোষাল গালে হাত দিয়ে বিস্ময়ের ভান করে বললেন, "আমি আশা করেছিলুম আপনি ট্রাক ভাড়া করে সিমেন্টটা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, not only that, ট্রাকের ভাড়াটাও দিয়ে দেবেন।"

বিশ্বদীপ হেসে ফেললেন।

"না, না, হাসির কথা নয়। আমি পাইওনিয়ার। আমি এরোপ্লেনে করে চিন্তার যে জগতে পৌঁছে গেছি সেখানে পৌঁছতে আপনাদের আরও এক শতাব্দী লাগবে অন্তত, কারণ আপনারা হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছেন। বেকারসমস্যাই পৃথিবীতে আজকাল সর্বপ্রধান সমস্যা। অনেকে আধপেটা খেয়ে থাকে কিন্তু তাদের মাথা গোঁজবার একটা জায়গা আছে --বাবা, কাকা, মামা, জেঠা, শ্বশুর, anybody ---কিন্তু এমন একদলও আছে যারা খেতেও পায় না, শুতেও পায় না। এরাই dangerous, এরা পকেটমার, ছিঁচকে চোর, মিথ্যুক ভিখিরি, বিনা টিকিটের প্যাসেঞ্জার, পলিটিকাল দাঙ্গাবাজ, বিদ্রোহী বেপরোয়া বীর—সব কিছু হতে পারে। লে মিজারেব্‌ল্‌স বইয়ে এদেরই চিত্র এঁকেছেন মহাকবি হিউগো। এদের অসীম সম্ভাবনা। এদের যদি অন্তত মাথা গোঁজবার একটা জায়গা করে দেওয়া যায় তাহলে হয়তো এরা অসম্ভব কিছু একটা করে ফেলতে পারে। ফ্যারাডে, রানা প্রতাপ, স্যার আর এন মুখার্জি, বীরেন চাটুজ্যে হয়তো এঁদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। তাদের অন্তত একটা থাকবার আস্তানা করে দেওয়া দরকার। আমি গরীব লোক, কোনক্রমে একটা আস্তানা খাড়া করছি, আশা করছি আপনারা সাহায্য করবেন। কিন্তু এ-ও জানি আপনারা করবেন না—"

ঘোষাল পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে বিশ্বদীপকে দিলেন।

"আসুন। হাজার টাকা আছে। আর কত লাগবে—"

"না, না, টাকা আমি নেব না। কাল নাগাদ সিমেণ্ট পেয়ে যাবেন। আমি আপনার কাছে অন্য একটা দরকারে এসেছিলাম।"

"ডাক্তারি পরামর্শ?"

"হ্যাঁ।"

"ডাক্তারি পরামর্শ তো আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে দিই না!"

"এখন কি ব্যস্ত আছেন?"

"আছি। কিন্তু তবু আপনার সহিত যাইব। আমি এখন আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য। আপনি যখন আমার সিমেণ্টের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন তখন আপনি আমার প্রভু। বলুন কোথায় যাইবেন—আমার ক্লিনিকে না আপনার বাড়িতে।"

আমার বাড়িতে গেলেই সুবিধা হয়—"

"চলুন। যেখানে বলেন সেখানেই যাইব।"

ডাক্তার ঘোষাল ইচ্ছা করে মাঝে মাঝে শুদ্ধ বাংলা বলেন। এটা তাঁর রসিকতার একটা বিশেষ ধরন।

বিশ্বদীপের বৈঠকখানার কোচের উপর বসে ঘোষাল পাইপটি ধরালেন। তারপর বললেন, "কি বলবেন এবার বলুন—I am now receptive."

"আমার উরুতের ওই বোদা ভাবটা তো যাচ্ছে না। এক বছর হয়ে গেল—"

আমি তো আপনাকে অনেকবার বলেছি ওটা হয়তো অনেকদিন থাকবে। হয়তো সারাজীবন। আর কোথাও তো কিছু হয়নি? ব্যাস্ তাহলে আপনি ওই ওষুধ খেয়ে যান আর ওই তেলটা মালিস করতে থাকুন।"

বিশ্বদীপও চুপ করে রইলেন, তারপর তিনিও পাইপ ধরালেন।

"এই জিগ্যেস করবার জন্যে আপনি আমাকে এতদূর টেনে আনলেন?"

"আমার কি বিয়ে করা উচিত?"

"ডাক্তার হিসেবে যদি জিগ্যেস করেন তাহলে বলব উচিত নয়। আপনার স্ত্রীর হয়তো infection না-ও হতে পারে কিন্তু আপনার ছেলেমেয়েদের হবার সম্ভাবনা আছে, যদি তাদের আপনি নিজের কাছ থেকে সরিয়ে না রাখেন। এই হল ডাক্তারি মত। আর মানুষ হিসেবে আমার মত হচ্ছে যদি কোন মহীয়সী মহিলা সব জেনেশুনে আপনার সঙ্গে মাল্য বিনিময় করতে রাজী হয় তাহলে করে ফেলুন বিয়ে। তারপর অদৃষ্টে যা আছে তা হবে এবং যখন হবে তখন তার ব্যবস্থা করা যাবে, in the meantime খানিকটা আমোদ করে নিন না, ক্ষতি কি! আমাদের শাস্ত্রে বলে আমাদের শরীরে সব রকম রোগের জীবাণু ঢুকছে বেরুচ্ছে, কতকগুলো আড্ডা গেড়েই আছে, সংস্কৃতে বলেছে—শরীরং ব্যাধিমন্দিরং, পৃথিবীতে অদ্যাবধি যত বিয়ে হয়েছে, যত প্রেমালিঙ্গন হয়েছে, তা হয়েছে একটি ব্যাধিমন্দিরের সঙ্গে আর একটি ব্যাধিমন্দিরের। সুতরাং লেপ্রসি নামক ব্যাসিলাসের সম্বন্ধে অত বেশী রকম শুচিবায়ুগ্রস্ত হবার কোনও কারণ দেখি না। আমরা সমুদ্রে শয্যা পেতেই আছি, শিশিরকে ভয় করবার কোন মানে হয় না।"

"কিন্তু এসব কথা শুনে কি কোনও মেয়ে আমাকে বিয়ে করতে রাজী হবে।"

"কিছুই অসম্ভব নয়। মানুষ বড় বিচিত্র জীব। সে সব করতে পারে। আমি একটি লোককে জানি সে অসতী মেয়েকে অসতী জেনেও বিয়ে করেছে, কারণ তাকে সে ভালোবাসত। ভালোবাসায় সব অসম্ভব সম্ভব হয়। সে লোকটি গ্রেট ম্যান, শুধু গ্রেট নয়, ভেরি গ্রেট!"

"কি রকম? অসতী মেয়েকে বিয়ে করেছে?"

"গল্পটা তাহলে বলি। লোকটির প্রথমপক্ষে একটি বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু ছেলে হচ্ছিল না। কেন হচ্ছে না জানবার জন্যে সে আমার কাছে এল। সেই তার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। আমি তার সিমেন পরীক্ষা করে দেখলুম তার ছেলে হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। মেয়েটার মধ্যে কোনও দোষ পেলুম না। হঠাৎ একদিন শুনলুম মেয়েটা আত্মহত্যা করেছে। চুকেবুকে গেল, এরকম হামেশাই হচ্ছে। বছরখানেক পরে ছোকরার সঙ্গে আবার দেখা। উস্কখুস্ক চুল, তাগড়া চেহারা, মুখময় গোঁফ দাড়ি, দেখে হঠাৎ ডাকাত বলে মনে হল। চিনতেই পারিনি প্রথমে। পরে পারলাম। বললে, কোন কাজ পাচ্ছি না। দু'দিন খেতে পাইনি। যদি কিছু ব্যবস্থা করে দেন। তখন আমার বাড়িটা হচ্ছিল। বললাম, যদি মাটি কোপাতে পার কাজ আছে। আমার বাড়ির ভিত খোঁড়া হচ্ছে সেইখানে চলে যাও। বিনা প্রতিবাদে চলে গেল। দিন পনরো মাটিও কোপালে, তারপর হঠাৎ আবিষ্কার করলুম সে একজন আর্টিস্ট। আমার কন্ট্রাকটর বললে, দুপুরে যখন খাওয়ার ছুটি থাকে তখন ও খেতে যায় না, গাছতলায় বসে ছবি আঁকে। ডেকে পাঠালুম। বললাম, তোমার ছবি দেখাও। ছবি দেখে তাক লেগে গেল। সব ছবিগুলো কিনে নিলুম। বললুম, তোমাকে আর কোদাল চালাতে হবে না, তুলি চালাও। আমারই বাড়ির পিছন দিকের একটা ঘরে তাকে থাকতে দিলুম। কিছুদিন পরে দেখি সুটকো রোগা বেণী-দোলানো স্যাণ্ডাল-পরা একটা মেয়ে রঙীন শাড়ি পরে তার কাছে আসতে আরম্ভ করেছে। শুনলুম সেও নাকি আর্টিস্ট। আপত্তি করবার কোন হেতু খুঁজে পেলুম না। ও মশায়, দিনকতক পরে ছোকরা এসে আমাকে সেই প্রশ্নই জিগ্যেস করলে, যা আপনি আজ করছেন। আমার কি বিয়ে করা উচিত? আপনাকে যা বললাম, তাকেও তাই বলেছিলাম। বলেছিলাম, মেয়েটিকে সব কথা খুলে বল, বল যে আমার সন্তান হবার আশা নেই, এ জেনেও যদি সে রাজী থাকে, ঝুলে পড়। ছোকরা বলল, একটি মেয়ে তো নিঃসন্তান জীবন যাপন করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে, এ-ও যদি তা-ই করে! বললাম, করতে পারে, না-ও করতে পারে। সবাই একরকম হয় না। তবে you must be prepared to face hysteria.—ওটা কোন-না-কোন আকারে দেখা দেবেই। শুনে ছোকরা চুপ করে রইল, তারপর চলে গেল। মাস কতক কেটে গেল, কোন সাড়াশব্দ নেই। ভাবলুম ফাঁড়া বোধহয় কাটল। কিন্তু দেখলুম কাটেনি।"

ঘোষালের পাইপ নিবে গিয়েছিল, সেটা ভাল করে ধরিয়ে আবার তিনি শুরু করলেন।

"হঠাৎ একদিন এসে বলল আলেয়ার পেটে ভারী ব্যথা হচ্ছে। একটু যদি দেখেন—। দেখলুম গিয়ে। নিয়ে গেলুম হাসপাতালে। Acute Abdomen.পেট কাটতে হল। লম্বা ইনসিশন (incision) দিতে হয়েছিল। পেটে হাত ঢুকিয়ে খুঁজতে খুঁজতে একজায়গায় obstruction পেলুম প্রায় তলপেটের কাছাকাছি। সেই সময় লক্ষ্য করলুম ইউটেরাসটি বেশ

বড়, সম্ভবত gravid, তিনমাস পোয়াতি মনে হল। একটু অবাক হলুম। দিন তিনেক যমে মানুষে টানাটানি চলল, তারপর বেঁচে গেল মেয়েটা। ছোকরা মেয়েটার শিয়রে দিনরাত বসে থাকত। মেয়েটা যখন একটু ভালো হল তখন খবরটি তাকে বললুম। বললুম—ওর সঙ্গে আর বেশী মাখামাখি কোরো না, ও পোয়াতি হয়েছে। শুনে ছোকরা প্রথমটা গুম হয়ে রইল, তারপর সবেগে বেরিয়ে গেল। আমি ভাবলাম একটা খুনখারাপি না হয়, অনুতাপ হতে লাগল, খবরটা বলে হয়ত ভুল করেছি। আমাদের প্রফেসনাল এটিকেটের বাইরে গেছি। পরদিন শুনলাম আমার বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে সে। আরও চিন্তা হল। প্রায় মাসখানেক আর দেখাও পেলাম না। তারপর যখন তার কথা ভুলব-ভুলব করছি, তখন দেখি সে একদিন একটি হলদে খাম হাতে করে বিকশিতবদনে আমার বৈঠকখানায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আলেয়াকে বিয়ে করবে, নেমন্তন্ন করতে এসেছে। বললে, ছেলেপিলে না হলে ওর জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে এই ভয়ে ওকে বিয়ে করিনি। কিন্তু যখন আপনার কাছে শুনলুম ও সন্তানসম্ভবা, তখন সে ভয়টা কেটে গেল। ওকে সব খুলে বলেছি, ওরও সব কথা জেনেছি আমি। সব জেনেশুনেই আমরা বিয়ে করছি। বিয়ে হয়ে গেল, একটি সুন্দর খোকা হল, একটি খোলার ঘর ভাড়া করে বেশ সুখে ছিল ওরা। আমি ওকে দিয়ে কিছু ছবি আঁকালুম। যে সব রোগীর মুখ চোখ চেহারা দেখেই রোগ ধরা যায় সে সব রোগীর অনেক ছবিও আঁকিয়েছি ওকে দিয়ে। বেশ সুখে ছিল। এখন কিন্তু আবার নূতন একটা ভূত ওর কাঁধে চেপেছে। বললে একদিন—আমারও যাতে একটা ছেলে হয় তার ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতে হবে। শুনছি আজকাল নাকি একরকম ইন্‌জেকশন বেরিয়েছে, আপনি তো সবই জানেন —। কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ইন্‌জেকশনগুলো বেশী দামী। তাই দিচ্ছি, ওর শখ মিটুক। শুনছি জ্যোতিষীদের কাছেও নাকি হাত দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। একদিন আমার কাছে এসে বললে, আমার সিমেন আবার পরীক্ষা করে দেখুন। আমি বলেছি—আর পরীক্ষা করবার দরকার নেই। যে রকম কড়া ইন্‌জেকশন নিয়েছ তাতে আমার মনে হয় সব ঠিক হয়ে গেছে। আমি জানি, ও ঠিক হবে না। কিন্তু সে কথা ওকে বলে লাভ নেই। একদিন মহানন্দে এসে খবর দিয়ে গেল—আলেয়া আবার নাকি সন্তানসম্ভবা। মেয়েটা আপনাদের স্ট্যাণ্ডার্ডে অসতী। ওরা কিন্তু খুব সুখে আছে। আমি এইটেই আসল মনে করি, you must adjust your সমাজ, your morals, your economy, your politics accordingly. সুখ শান্তিই কাম্য। আমি যে মেয়েটাকে মানুষ করেছিলুম সে ছিল মুসলমানের মেয়ে, আমি অনায়াসে তাকে শুদ্ধি করে নিয়ে হিন্দু ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারতুম, একটা কাহার ছেলে টাকার লোভে রাজীও হয়েছিল, কিন্তু আমি মেয়েটাকে জিগ্যেস করলুম, তোর কি ইচ্ছে। সে বলল, আমি মুসলমানকে বিয়ে করলেই সুখী হব। তাই দিলুম—"

ডাক্তার ঘোষালের আবার পাইপ নিবে গিয়েছিল। সেটাতে আবার তামাক পুরে ধরাতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ছকু একটা রঙীন ট্রের উপর দু'গ্লাস রঙীন ঠাণ্ডা পানীয় নিয়ে এসে হাজির হল দ্বারপ্রান্তে। তাকে এসব করতে কেউ বলে নি, কিন্তু এইটেই তার বিশেষত্ব, তার অন্যমনস্ক মনিবের অনুচ্চারিত হুকুম তামিল করে সে ভারী একটা গর্ব বোধ করে। এটা তার বাহাদুরী। বিশ্বদীপও এজন্য তার উপর খুশী।

দুজনেই গ্লাস দুটো তুলে নিলেন।

ঘোষাল বললেন, "আপনি বিদুলাকে ব্যাপারটা বলুন না খুলে, তারপর তাকে আমার কাছে রেফার করে দিন—"

বিশ্বদীপ সবিস্ময়ে ভুরু দুটো তুলে চেয়েছিলেন ঘোষালের দিকে। বিদুলার খবর উনি পেলেন কি করে! ঘোষালের মুখে একটি নীরব হাসি প্রায় আকর্ণবিস্তৃত হ'য়ে উঠল। বললেন, "আমি সব জানি, সব খবর রাখি"

"কে বললে আপনাকে?"

"হাওয়া—"

একটু চুপ করে থেকে বিশ্বদীপ প্রশ্ন করলেন, "আপনি যে আর্টিস্টের কথা এতক্ষণ বললেন তিনিই কি নবনীবাবু, যাকে আপনি আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন?"

"নামটা বলা আমার পক্ষে উচিত হবে না। You may guess anything. আমি লোকটিকে শ্রদ্ধা করি, both as an artist and as a man."

পাশের ঘরে ফোনটা বেজে উঠল।

ঘোষাল বললেন, "আমি তাহলে উঠি এখন। কাল তাহলে সিমেণ্ট পাচ্ছি তো?"

"নিশ্চয়—"

ঘোষাল চলে গেলেন।

ফোন ধরে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন বিশ্বদীপ।

"হ্যালো, আমার এখানে আসতে চান? এখনি? মাপ করবেন, কে আপনি তা ঠিক চিনতেই পারছি না।"

"আমি মহুয়া। একটু আগেই তো আপনার সঙ্গে কথা হল আমাদের মীটিংয়ে। আপনার প্রস্তাব নিয়ে আমি আলোচনা করেছি সকলের সঙ্গে। এখনও ঠিক কোন মীমাংসায় আসতে পারিনি। ধাকড়ই বাধা দিচ্ছে বেশী। সে বলছে আমরা বেশী টাকা চাই না, বেশী টাকা পেলে আমরা বরবাদ হয়ে যাব। আর রামু বলছে আমরা ব্যবসার কিছু বুঝি না, বাবুরা আমাদের ঠকাবেন। সে জানতে চাইছে ব্যবসার অংশীদার হলে মাসে আমরা কত টাকা করে আশা করতে পারি।"

"সে কথা পাঠকজিকে জিগ্যেস না করে বলতে পারব না। আমার প্রস্তাবও পাঠকজির অনুমোদনসাপেক্ষ। তাঁর সঙ্গে আগে কথা কয়ে নি—"

"এ ছাড়া আমার একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারও বলতে চাই আপনাকে। আসব?"

"এস—"

একটু পরেই একটা রিক্‌শ করে এসে হাজির হল মহুয়া। বিশ্বদীপ লক্ষ্য করলেন তার কানের পাশে আর গলার কাছে পাউডার লেগে রয়েছে। মহুয়া এসেই প্রণাম করল তাঁকে। তারপর ঘাড় নীচু করে মুখখানা ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিশ্বদীপ আবার লক্ষ্য করলেন তার ঘাড়ের কাছে দু'একটি পাতলা চুল ফ্যানের হাওয়ায় উড়ছে। এল লক্ষ্য করলেন বড রোগা মেয়েটি, গলার কাছের হাড় দুটো উঁচু হয়ে রয়েছে।

"বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন—"

মহুয়া সসংকোচে একটা গদি-আঁটা চেয়ারে বসল। তারপর মাথা আরও নীচু করে মৃদুকণ্ঠে বলল, "আজ আপনার মহত্ত্বের পরিচয় পেয়েছি বলে আপনাকে এ কথা বলতে সাহস করছি। এটা আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত কথা, যদি কিছু না-ও করতে পারেন, কাউকে যেন বলবেন না।"

"কি বল—"

"এটা হয়তো আপনার কাছে বলাও আমার উচিত হচ্ছে না। কিন্তু আর যে কি করব তা-ও ভেবে পাচ্ছি না।"

"কি বল, শুনিই না।"

"আমার যিনি 'বস্' মিস্টার সিন্‌হা, তিনি কিছুদিন থেকে রোজ আমার কাছে আসা-যাওয়া আরম্ভ করেছেন। এতে লোকে নানা কথা বলাবলি করছিল। শামার মা আমার সঙ্গে থাকে, তাকে জিগ্যেস করলুম কি করা যায়। শামার মাকে দেখেছেন? তালের মতো ভারী মুখ তার। তার উপর সর্বদা গালে পান গুঁজে থাকে। সহজে কথা কয় না। কোন উত্তর দিলে না। দ্বিতীয়বার জিগ্যেস করাতে বললে, আসছে আসুক না। দেখাই যাক না ওর দৌড় কতদূর, যদি বিয়ে করে ভালোই তো। ঘর বাঁধতে পারবি। শামার মায়ের অবস্থা একটু ভালো। শামা একটা র‍্যাশন শপের মালিক। আমাদের অনেকে তার দোকান থেকে জিনিস কেনে, আমিও কিনি। সেইজন্যে শামা আর শামার মায়ের খুব প্রতিপত্তি ফ্যাকটারির কুলি মহলে। কাল সন্ধ্যাব সময় আমি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম, সেই সময় মিস্টার সিনহা এসেছিলেন। সেই সময় শামাও বাড়িতে ছিল। শামা নাকি মিস্টার সিন্‌হাকে গলায় গামছা দিয়ে টানতে টানতে বের করে দিয়েছে বাড়ি থেকে। এ নিয়ে আমাদের পাড়ায় ভারী হৈচৈ হয়েছে। আমি যখন ফিরলুম তখনও দেখি শামা আর শামার মায়ের বচসা থামেনি। শামা বলছে, আমি মহুয়াকে বিয়ে করতে চাই। ও যদি আমাকে বিয়ে না করে তাহলে ওকে আমি আমার বাড়িতে থাকতে দেব না। লোকে নিন্দা করছে। শামার মা বলছে, তোমাকে স্বজাতের মেয়ে বিয়ে করতে হবে। মহুয়াকে আমি ভালবাসি, কিন্তু সে বাঙালীন, কোন্ জাত ঠিক নেই, ওকে আমি পুত্রবধূ করতে পারব না। এসব কথা শুনে কাল রাত্রেই আমি শামার বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। সমস্ত রাত শেয়ালদ' ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্মে ছিলাম। প্ল্যাটফর্ম থেকেই আজ মীটিংয়ে গিয়েছিলাম। মীটিংয়ের পর শামার মা আমাকে বাড়িতে ফিরে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল, কিন্তু আমি যাই নি। শামার মা আমাকে বলল যে রামুর দল তার হাতের মুঠোর মধ্যে, সবাই প্রায় শামার দোকানে ধারে জিনিসপত্তর কেনে—আমি যা ঠিক করব তাই হবে। মীটিংয়ের পর আমি মিস্টার সিন্‌হার বাড়িতেও গিয়েছিলাম। তাঁকে বললাম সব। এ-ও বললাম যে আমার এখন মাথা গোঁজবার কোনও জায়গা নেই। তিনি ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর কপালে কয়েকবার আঙুল ঠুকে বললেন, এক কাজ করতে পারি। তুমি আমার বাড়িতে ঝি হয়ে বহাল হয়ে যাও। আমার ঝিটা কাল থেকে আসছে না। আমার স্ত্রী ভারী অসুবিধায় পড়েছেন। আমার বাড়ির পিছনে একটা 'লাম্বার রুম্' আছে, সেটা পরিষ্কার করে নিয়ে তুমি থাকতেও পার। মিস্টার সিন্‌হা যে বিবাহিতা তা আগে আমি জানতাম না। বললাম, আচ্ছা, দেখি অন্য কোথাও চেষ্টা করে যদি

কিছু পাই। কিন্তু কোথাও কিছু পাচ্ছি না। শিয়ালদ'র পুলিসরাও তাড়া করছে, থাকতে দিচ্ছে না। কি যে করব তাই ভাবছি। আপনি কি কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন? আমি ফ্যাকটারির কাজের পর পড়াশোনা করতে চাই। একটা নাইট কলেজে ভরতি হতে পারব এ ভরসা দিয়েছেন একজন অধ্যাপক। কিন্তু একটা ঘর যোগাড় করতে পারছি না। ফ্যাকটারির পিছন গুদোমঘরের পাশে ঘর আছে কয়েকটা—"

"সে ঘর তোমাকে দিলে অন্য শ্রমিকরাও চাইবে। পাঠকজি তাতে রাজী হবেন না। তিনি গুদোমঘরের কাছে দারোয়ান ছাড়া কাউকে থাকতে দিতে চান না। আচ্ছা, আপাতত তুমি এইখানেই থাক। ছকু—"

ছকু আসতেই তিনি বললেন, "বাগানের ওধারে যে ঘরটা আছে সেটা একে খুলে দাও। দুটো ঘরই খুলে দাও। দুটোই তুমি ব্যবহার করতে পার।"

মহুয়া প্রণাম করে চলে গেল।

বিশ্বদীপের হাতা ওলা প্রকাণ্ড বাড়ি। জায়গার অভাব নেই।

মহুয়া চলে যাবার পর টোটো হাজির হল হঠাৎ।

"আপনার বাগানের ঘরের চাবিটা দিন তো। ওখানেই আমার খরগোসগুলোকে রাখব ভেবেছি। দিদি ও নিয়ে দিনরাত খ্যাচ খ্যাচ করে "

ও ঘর দুটো তো মহুয়াকে থাকতে দিয়েছি।'

'মহুয়াকে?'

হ্যাঁ।'

You mean আমাদের ফ্যাকটারির মহুয়াকে?"

হ্যাঁ—"

"কেন?"

"বিপদে পড়েছে বেচারী—'

ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইল টোটো।

বিশ্বদীপ বললেন, "তোমার খরগোসগুলোকে আমার ল্যাবরেটারিতে দিয়ে দাও। যদিও আজকাল ল্যাবরেটরির কাজ তেমন করি না, কিন্তু করবার ইচ্ছে আছে। যে সব প্রাণী উদ্ভিদ্‌ভোজী তাদের নিয়ে একটা experiment করব।"

"মেরে ফেলবেন না তো।"

. "আরে না না। তাদের প্রত্যেককে কেবল একরকম উদ্ভিদ খেতে দেব। কাউকে কপিপাতা, কাউকে পালংশাক, কাউকে দুব্বো ঘাস, কাউকে ছোলা, কাউকে শিম। তারপর তাদের stool মাইক্রসকোপে পরীক্ষা করে দেখব, হজম হবার পর সেই বিভিন্ন উদ্ভিদ্‌গুলির কি রকম রূপান্তর হয়েছে। দরকার হলে সেগুলোর ফোটো তুলব, কিংবা ছবি আঁকব।"

টোটোর ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হয়ে গেল।

"এসব উদ্ভট চিন্তা আপনার মাথায় ঢোকে কি করে বলুন তো। আমার খরগোসগুলো ঘাস ছাড়া কিছু খাবে না। পরশু জ্যামমাখানো পাঁউরুটি দিয়েছিলাম, স্পর্শ করলো না—"

"দু'দিন উপোস করিয়ে রাখলে সব খাবে।"

মহুয়া আবার প্রবেশ করল এবং টোটোকে নমস্কার করে বিশ্বদীপের দিকে চেয়ে বলল, "আমার জিনিসপত্র যা আছে নিয়ে আসছি তাহলে। খাটটা বিক্রি করে দিয়েছি, আপনার ঘরের মেজে তো পাকা। আমি মাটিতেই শোব। ওই টাকা দিয়ে বরং বই কিনব কিছু—।"

বিশ্বদীপ বললেন, "আমার কাছে পুরোনো কিছু বই আছে—Elementary Chemistry Physics-এর। তোমার যদি কাজে লাগে নিতে পার।"

মহুয়ার মুখে একটা সলজ্জ কৃতজ্ঞতার আভা ফুটে উঠল।

"পুরোনো বই চলবে কি? আচ্ছা, এসে দেখব।"

মহুযা চলে যাবার পর টোটো অনেকক্ষণ ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বলল, আচ্ছা, চলি—" সহসা সবেগে বেরিয়ে গেল। কিছুদূর গিয়ে তার মনে হল বিদুলাকে খবব দেওয়া উচিত। টেলিগ্রাম করে দিল একটা।

টোটো চলে যাবার পর চুপ করে বসে রইলেন বিশ্বদীপ। নিজেকে বড় অসহায় মনে হতে লাগল। যে সমাজে তিনি বাস করছেন, যে সমাজে তাঁকে বাস করতে হবে, সে সমাজ তো অনুকূল নয। কোথায়ই বা যাব! তারপর তাঁব মনে হল পাঠকজির সঙ্গে স্ট্রাইকের বিষয়ে একটু কথা কওয়া দরকার। তাঁর সঙ্গে কথা কইতে হলে টালিগঞ্জে তাঁর বাসায় যেতে হবে। তিনি ফোন নেন নি। কোনওরকম বিলাসিতাকেই প্রশ্রয় দেননি তিনি। প্রকাণ্ড একটা ঘরে বিরাট একটা বিছানা মেজেতে পেতেছেন, তারই একধারে একটা কাঠের ডেস্কের সামনে বসে চিঠিপত্র লেখেন। চিঠিপত্র লিখেই সাধারণতঃ তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে হয়। তোতলা বলে তিনি আপিসে আসেন না। আগে স্বপাকে খেতেন, এখন শুকুল বলে একটি মিথিলাবাসী রাঁধুনী রেখেছেন, নিজে এখন আর পেরে ওঠেন না। শুকুল শুধু রাঁধুনী নয়, সে তাঁর চাকর, কোচোয়ান, প্রাইভেট সেক্রেটারি, এমন কি বন্ধুও। শুকুলের একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। সে তাঁব মুখ দেখেই তাঁর মনের কথা টের পায়। পাঠকজির চোখের দৃষ্টি থেকেই সে বুঝতে পারে তিনি কি চান, তাঁর মেজাজ কেমন। শুকুলকে পার না হয়ে পাঠকজির কাছে পৌঁছবাব উপায় নেই। বিশ্বদীপ চুপ করে বসে রইলেন। উঠতে ইচ্ছে করল না। চলে গেলেন মানসপুরে।

।। নয় ।।

মানসপুরে গিয়ে বিশ্বদীপ দেখলেন ধানগাছগুলো সব শস্যভারে শুয়ে পড়েছে মাঠে, আর অসংখ্য বুলবুলির দল পাকা ধানের শীষ মুখে করে উড়ে যাচ্ছে রুদলবাবুর গোলার দিকে। বিরাট একটা কোলাহল পড়ে গেছে। সবিস্ময়ে এই অপূর্ব দৃশ্য দেখছিলেন বিশ্বদীপ। উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে চারদিক, ঘননীল আকাশে মেঘের লেশমাত্র নেই। বাঁশপাতি পাখির দল ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াচ্ছে আকাশে। আর লক্ষ লক্ষ বুলবুলি ছুটেছে রুদলবাবুর গোলার উদ্দেশে। কোথায় তাঁর ধানের গোলা? বুলবুলির দল দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। মানসপুর কত বড়? কোথায় তার শেষ? এই সব কথাই মনে হচ্ছিল বিশ্বদীপের। হঠাৎ থপ্ করে কি যেন একটা পড়ল তাঁর কাঁধের উপর। তারপর তিনি শুনতে পেলেন কে যেন আকুলকণ্ঠে বলছে—"আপনার বুকপকেটটা একটু ফাঁক করুন। আমি ঢুকে পড়ি—"

বুকপকেটটা ফাঁক কবতেই বিশ্বদীপেব মনে হল বংবাহাবী ঢুকে পডল তাব ভিতব।

"আমাকে কোনও অন্ধকাব জাযগায নিযে চলুন।"

দক্ষিণদিকে একটু দূবে কযেকটা গাছকে ঘিবে ফেলেছিল তেলাকুচো লতা। এই উজ্জ্বল বোদে মনে হচ্ছিল একটা ঘনসবুজ দুর্গ যেন দাঁডিযে আছে। সেই দিকেই গেলেন বিশ্বদীপ। কাছে গিযে আবিষ্কাব কবলেন ভিতবে ঢোকবাব একটা পথও আছে। ঢুকে দেখলেন বেশ অন্ধকাব। বংবাহাবী তাঁব পকেট থেকে আস্তে আস্তে বেবিযে গিযে উডে বসল একটা পাতাব উপব।

"এমন চমৎকাব একটা জাযগা আছে, আমি তো দেখতে পাইনি। আঃ বাঁচলুম— "

বিশ্বদীপ দেখলেন বংবাহাবীব বং মলিন হযে গেছে। ডানা থেকে মাঝে মাঝে বং উঠে গেছে যেন। মনে হল খুব যেন শ্রান্তক্লান্ত।

"তোমাব শবীবটা খাবাপ নাকি।"

"খুব খাবাপ। মুকুব্বী আমাকে দিনেব জগতে এনেছে বটে, কিন্তু এ জগতে আমি থাকতে পাবছি না। নওবঙ্গী আব সোনাহলুদ আমাব সঙ্গে খুব ভদ্রতা কবেছে, সকলেব সঙ্গে আলাপ কবিযে দিযেছে, সবাই ভদ্র ব্যবহাবও কবেছে আমাব সঙ্গে। ফিঙে পাখীও আশ্বাস দিযেছে আমাকে কিছু বলবে না। তবু কিন্তু আমাব ভালো লাগছে না। আমাব মনে হচ্ছে ওদেব ভদ্রতাটা যেন মৌখিক, ওবা যেন মুকুব্বীব খাতিবেই আমাকে কিছু বলছে না। আমি ওদেব আপনাব লোক হযে যেতে পাবিনি। আপনাব লোক হলে মাঝে মাঝে ঝগডা হত কেউ গালাগালি দিত, তা ববং ভালো লাগত। কিন্তু এখানে দেখা হলেই সবাই মুচকি হেসে নমস্কাব কবে আব ভদ্রতাব বেডায ঘিবে ফেলে নিজেদেব। সে বেডা পাব হযে ওদেব কাছে যাবাব উপায নেই। আমি ক্লান্ত হযে পডেছি। ভাবছিলাম দিনেব আলোয আব বেরুব না। বাত্রিব প্রগাঢ নিবিডতায যে সুখ পেযেছি দিনেব আলোয তা নেই। দিনেব আলো সব নগ্ন কবে দেয, তাই প্রত্যেকে এক একটা আববণে ঢেকে বাখে নিজেদেব। সে আববণ ভেদ কববাব সাধ্য আমাব নেই। ওদেব কঠিন আববণে মাথা ঠুকে ঠুকে আমি মৃতপ্রায হযেছি। আমি দিনেব আলো থেকে পালাতে চাই। কিন্তু মুশকিল হযেছে, ক'দিন থেকে বাত আব আসছে না, সূর্য অস্ত যাচ্ছে না। সূর্যদেব বলেছেন, রুদলবাবুব সব ধান যতক্ষণ না বুলবুলিবা গোলায তুলে দিচ্ছে ততক্ষণ তিনি মানসপুব থেকে অস্ত যাবেন না। কাবণ বাত হলে বুলবুলিবা কাজ কবতে পাববে না, আব ধান বেশীদিন জমিতে পডে থাকলে পচে যাবে। আমি কি কবি বলুন তো—"

বিশ্বদীপ বললেন, "তুমি এইখানেই থাক খানিকক্ষণ। আমি ফিবে যাবাব সময তোমাকে না হয সঙ্গে নিযে যাব। আমাব বাডিতে একটা 'ডার্ক রুম' আছে সেইখানে না হয থেকো।"

"ডার্ক রুম কি?"

"ফোটো তুলে যেখানে ডেভেলাপ কবি। আমাব সঙ্গে ছোট একটা ক্যামেবা থাকে, এখনও আছে, দাঁড়াও তোমাব ফটো তুলি।"

পকেট থেকে ছোট ক্যামেবাটা বাব কবে বংবাহাবীব ছবি তুললেন একটা।

"তুমি তাহলে এইখানেই বস। আমি আসছি একটু পবে।"

বিশ্বদীপ বেবিযে চেনা কাউকে দেখতে পেলেন না। ধানক্ষেতটা পেবিযে সিংহেব খোঁজে

যাবেন ভাবছিলেন, এমন সময় ধানক্ষেতের মাঝে যে কাক-তাড়ুয়াটা ছিল সেটা হঠাৎ কথা কয়ে উঠল।

"বিশ্বদীপবাবু, কখন এলেন? আমি রুদলবাবুর ধানক্ষেত পাহারা দিচ্ছি, কাকেরা বড় জ্বালাতন করছে।"

কাক-তাড়ুয়া রূপান্তরিত হয়ে গেল মুরুব্বীতে। প্রবীণ একজন মজুর যেন। বিশ্বদীপের কাছে এসে বলল, "কাণ্ডটা দেখেছেন। আকাশে সূর্য পর্যন্ত থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। আর কি খাটানটাই খাটছে ওই বুলবুলিরা—"

বিশ্বদীপ ক্যামেরা বার করে ফোটো তুললেন, একটা মুরুব্বীর আর একটা ধানক্ষেতের।

"ওটা কি বস্তু?"

"ক্যামেরা। ওতে ছবি তোলা যায়।"

"ও, রুদলবাবুর কাছে ওর নাম শুনেছি। রুদলবাবু নানারকম জিনিস সংগ্রহ করেছেন, এটা কিন্তু তাঁর নেই। তাঁর মনে বাইরের ছবিকে ধরে রাখা আর পাখীকে খাঁচায় পুষে রাখা এক জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ। প্রতিমুহূর্তে কত ছবি হচ্ছে আর মুছে যাচ্ছে। এইটেই স্বাভাবিক। পাখীরা যেমন দল ধরে থাকে, ছবিরাও তাই। একটা ছবিকে দল থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার কোনও মানে হয় না। আপনি কোন্ দিকে যাবেন? রুদলবাবুর সঙ্গে দেখা হবে না। তিনি কপাট বন্ধ করে নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছেন। আর চাকরদেরও বলেছেন ঘুমুতে। অর্থাৎ তিনি যে বুলবুলিদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছেন এইটে দেখাতে চান। আমাকেও ঘুমুতে বলেছিলেন। কিন্তু আমার ঘুম হয় না। না দিনে না রাত্রে। খুব যখন ক্লান্ত লাগে তখন বধূসরা নদীতে গিয়ে ডুবে বসে থাকি খানিকক্ষণ। ওতেই আমার ঘুমের কাজ হয়ে যায়। বধূসরা কিন্তু উন্মনা হ'য়ে পড়েছে ক'দিন থেকে। আপনার ওই সাগর-সঙ্গম ওকে বলে গেছে যে সব নদীকেই শেষ পর্যন্ত সাগরে মিলতে হবে। যে নদী সাগরে পৌঁছতে পারল না তার জীবনই বৃথা। কথাটা শুনে ও উতলা হয়েছে একটু। এখানে কাছেপিঠে সাগর নেই, আছে পাহাড়ের ওপারে। কিন্তু পাহাড় পেরিয়ে বধূসরা যাবে কি করে। অথচ ওর মনে মনে ইচ্ছেটা ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠছে বুঝতে পারছি। রুদলবাবুকে বলব, দেখি তিনি কি বলেন।"

বিশ্বদীপ জিগ্যেস করলেন, "বধূসরা নদী কোথায় গিয়ে পড়েছে- -"

"পড়েছে গিয়ে উৎপলেশ্বরী বিলে। সে-ও সাগরেরই মতো। এপার ওপার দেখা যায় না। সব রকম পদ্ম ফোটে সেখানে। এমন কি নীলপদ্ম পর্যন্ত। নানারকম হাঁস যদি দেখতে চান, তাহলে চলে যান উৎপলেশ্বরী বিলে। সেদিন রাজহংস দুটো এসেছিল ওই বিল থেকেই। আপনি যখন এলেন তখন তারা চলে গিয়েছিল। তারা সাধারণতঃ কোন শব্দ করে না। কিন্তু সেদিন বধূসরার অনুরোধে কথা বলেছিল। প্রথম হাঁসটি বললে, 'আমার মনে হয় বলবার কিছু নেই।' দ্বিতীয় হাঁসটি বললে, 'আমি এ কথার সমর্থন করি।' এই বলে তারা দুটি সাদা মেঘের মতো উড়ে চলে গেল হিমালয়ের দিকে। বছরে একবার করে উৎপলেশ্বরী বিলে আসে তারা। বধূসরার কিন্তু উৎপলেশ্বরী বিলে আর মন ভরছে না, সে সাগর চায়। এখন যদি তার কাছে যান আর তার সঙ্গে যদি দেখা হয়, কেবল সাগরের কথা বলবে। আমি

ওকে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে সাগরে যাওয়ার অনেক বিপদ আছে, রবিন্সন ক্রুশোর গল্পটা বললুম ওকে। শুনে একটু হেসে বললে, আমি কচি খুকী নই যে ও গল্পে ভুলব। সাগরে বিপদ আছে বলেই তো সেখানে যেতে চাই। এই বলে ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে আর অদৃশ্য হয়ে গেল। আরে, আবার কাকের দল এসে হাজির হয়েছে। আমি চললুম।''

মুরুব্বী তাড়াতাড়ি চলে গিয়ে আবাব কাক-তাড়ুয়া হয়ে গেল।

কলিং বেলটা ঝনৎকাব দিয়ে উঠল। মিলিয়ে গেল মানসপুব। ছকু এসে খবব দিল পাঠকজি এসেছেন।

।। দশ ।।

পাঠকজি এসে তাঁর কাঠের চেয়ারটিতে গিয়ে বসলেন। তিনি গদি-আঁটা চেযাবে বসে অস্বস্তি ভোগ করেন। তিনি বসতেই ছকু কাঠেব ছোট টেবিলটি এগিয়ে দিলে তাঁর সামনে। ছকু জানে তিনি লিখে কথাবার্তা কন। পাঠকজি আসাতে বিশ্বদীপ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। তাঁরই যাওয়া উচিত ছিল। বললেন, ''আমিই যাচ্ছিলাম এখনি।''

পাঠকজি প্রশান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। বিশ্বদীপের মনে হল একটা মৃদু হাসির আভা যেন ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর চোখমুখে। শুকুল ঘরে ঢুকে তাঁর কাগজ-পত্রেব ব্যাগটি একপাশে রেখে, মসলার কৌটোটি তাঁর হাতে দিয়ে বলল, ''আমি গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছি, ঘোড়ার জন্য ঘই কিনতে হবে।'' পাঠকজি তার দিকে চেয়ে ডান হাতের দুটো আঙুলও তুললেন। শুকুল বলল, ''মনে আছে, দুটো খাতাও আনব।'' শুকুল বেরিয়ে গেল। পাঠকজি মোটব চড়েন না, তাঁর একটি সেকেলে ভিক্টোরিযা গাড়ি আছে। সেইটেতে চড়েই তিনি ঘোরাফেরা করেন। শুকুলই গাড়ি চালায়, ঘোড়ারও তত্ত্বাবধান করে। পাঠকজি তারপব ব্যাগ থেকে কাগজ, কাববন পেপাব আব পেনসিল বাব করলেন। প্রথমেই লিখলেন, ''স্ট্রাইকের কি হল?''

''এখনও কিছু হয় নি। দুটো দল হয়েছে। একটা দল বলছে, দ্বিগুণ মাইনে চাই। জিনিস-পত্রের দাম যদি আরও বাড়ে তাহলে আরও মাইনে বাড়াতে হবে। এ ছাড়া তারা তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করতে বলছে। দ্বিতীয় দল বলছে, মাইনে তিনগুণ করে দিলেই তারা সন্তুষ্ট। আর কিছু চায় না আপাতত। আমি ওদের কাছে একটা প্রস্তাব দিয়েছি। আমি বলেছি, তোমরাও আমাদের এ ব্যবসায়ের অংশীদার হও। এটা আমাদের সকলের ব্যবসা হোক। যা লাভ হবে তা আমরা সমান অংশে ভাগ করে নেব। মহুয়া বলে একটি মেয়ে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে। সে ওদের কারো দলে নয়। সে বলেছে, ওদের বুঝিয়ে সে আমার প্রস্তাবে রাজী করাবে। এখন আপনি বলুন ওদের কি করা উচিত— ''

পাঠকজির মুখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে গেলেন বিশ্বদীপ। মনে হ'ল তিনি যেন দম বন্ধ করে আছেন। কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে লিখলেন, ''ওদের দূর করে দাও। আমি ভেবেছি আপাতত ফ্যাকটারি দিনকতক বন্ধ রাখলেও ক্ষতি নেই। আমাদের সাবানের স্টক যথেষ্ট আছে। তারপর কম লোক রেখে কম সাবান তৈরি করব আর সাবানের দাম

বাড়িয়ে দেব। তাতেই মনে হয় পুষিয়ে যাবে। যদি না পোষায় তাহলেও কি করব আমি ভেবে রেখেছি। অম্বরের ইচ্ছা ছিল না আমরা এ সাবান নিয়ে ব্যবসা করি। তাই ভেবেছি ব্যবসা যদি না চলে তাহলে ব্যবসা আর করব না, ওটা দানই করে দেবো কোন লেপ্রসি চিকিৎসককে। তোমার বন্ধু ডাক্তার ঘোষাল কেমন লোক?"

"লোক তো খুব ভালো। লেপ্রসির চিকিৎসাও করেন। বেশ সুনাম আছে। কিন্তু বড্ড বেশী খামখেয়ালী।"

"দরকার হলে তাঁর সঙ্গেই যোগাযোগ করা যাবে। আপাতত তুমি স্ট্রাইকারদের বলে দাও যে বাজারের রেট অনুসারেই আমরা তাদের মাইনে দিচ্ছি। এর বেশী আর এক পয়সাও বাড়াতে পারব না।"

এই কথাগুলি লিখে কাগজটি এগিয়ে দিলেন পাঠকজি এবং জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তাঁর ভয় হচ্ছিল বিশ্বদীপ হয়তো আপত্তি করবেন এবং তারপর চটে যাবেন। বিশ্বদীপ হয়তো জানেন না, কিন্তু পাঠকজি বিশ্বদীপকে মনে মনে শুধু যে সমীহ করেন তাই নয়, ভালওবাসেন। সুতরাং তিনি একটু ভয়ে ভয়েই চেয়ে রইলেন বিশ্বদীপের দিকে। বিশ্বদীপের কানের ডগা দুটো লাল হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, "আপনি সেদিন বলেছিলেন যে সাবানের ব্যবসায়ের জন্য আপনি দশ লাখ টাকা রেখেছেন। সে টাকা কি ভাবে ব্যয় হবে তা কি আপনিই ঠিক করবেন? তা যদি হয় তাহলে আমি ওর মধ্যে থাকব না। আমি আমার রিসার্চ নিয়ে থাকব, বিলেতে একটা ল্যাবরেটরিতে ভালো কাজের সুযোগ পেতে পারি—হয়তো সেখানেই চলে যাব।"

পাঠকজি তাড়াতাড়ি লিখলেন, "তুমি যা খুশি করতে পার। ব্যবসা তোমার, তোমার মতেই তা চলবে। আমি তোমাকে সৎপরামর্শ দিয়েছি কেবল। তা নেওয়া না নেওয়া তোমার ইচ্ছা। টমসন সায়েবকে খবর পাঠিয়েছি, তিনি এখনি হয়তো আসবেন। আদুবাবু কি এসেছিলেন এখানে? আমার কাছে যাননি।"

"না, এখানেও আসেন নি এখনও"

কিছুক্ষণ চুপ করেই রইলেন উভয়ে।

তারপর বিশ্বদীপ হঠাৎ বললেন, "আমার বাবা মায়ের কথা জানতে বড় কৌতূহল হচ্ছে। তাঁদের কথা কবে বলবেন?"

পাঠকজির চিবুকের নীচের দিকের মাংসটা একটু থরথর করে উঠল। মসলার কৌটোটি খুলে মসলা খেলেন একটু। তারপর লিখতে লাগলেন।

"সেকথা এখুনি বলতে পারি। আগে থাকতে তোমার মন খারাপ করে দেবার ইচ্ছে ছিল না। ভেবেছিলাম তোমার বিয়ের আগে সব কথা তোমাকে বলব। কারণ তোমার যা হবার তা তো হবেই, কি হবে তা এখনও বলা যাচ্ছে না, কিন্তু বিয়ে করবার আগে তোমার বাবা মায়ের ইতিহাসটা শুনতে হবে তোমাকে। তুমি যাকে বিয়ে করবে তাকেও শোনাতে হবে—তোমার বাবা মা দুজনেরই কুষ্ঠ হয়েছিল। তোমার বাবারই আগে হয়েছিল, আমরা যখন স্কুলে পড়ি তখনই ও বলত আমার উরুতের একধারটা অসাড় মনে হচ্ছে। একজন ডাক্তার দেখলেন, কিছু ওষুধও দিলেন, কিন্তু কোনও ফল হল না। সেই সময়ই ওর বিয়ে হয়েছিল।

উরুতের বোদা-ভাবটা যে শেষে কুষ্ঠরোগে দাঁড়াবে, এটা কেউ বুঝতে পারেনি তখন। যখন বোঝা গেল তখন অম্বর তোমার মাকে বললে, তুমি আলাদা থাক, তোমার আলাদা থাকার সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোমার মা কিছুতে রাজী হল না। তোমার বাবা যখন বিলেতে পড়তে গেল, তখন তোমার মা-ও গেল তার সঙ্গে। বললে, ওকে একলা ছেড়ে থাকতে পারব না। ওদের অবস্থা খুব ভালো ছিল, টাকাকড়ির অভাব হল না। লাউপুরের বিষয়সম্পত্তি ছাড়াও তখন ওদের কলিয়ারি ছিল দুটো। ওরা বিলেত চলে গেল। আমি তখন কাশীতে টোলে পড়াশোনা করছি। কিছুদিন পরে হঠাৎ এক 'কেব্‌ল' আর কিছু টাকা এসে হাজির। কেব্‌লে লেখা, টাকা পাঠালুম, অবিলম্বে চলে এস। খুব বিপদে পড়েছি। চলে গেলুম। চলে যাওয়া সহজ ছিল আমার পক্ষে। কারণ আমার বাবা মা অনেকদিন আগেই গত হয়েছিলেন। সংসারে আর কেউ ছিল না। বিয়েও করি নি, তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আর বিয়ে করবার অবসরও পাইনি। গিয়েই দেখলুম তার সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ হয়েছে। সে অবশ্য তখন ডি-এস-সি পেয়েছে ফিজিক্‌সে। কাজও করছে একটা ল্যাবরেটরিতে। অম্বর আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। সে আমাকে টেলিগ্রাম করেনি, করেছিল তার স্ত্রী দময়ন্তী। দময়ন্তী আমাকে আড়ালে বলল, অম্বর নাকি দুবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। ওঁর একজন সাহেব বন্ধু ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করেন, তিনিই ওঁর কাছে থাকেন সদাসর্বদা। একসঙ্গে পড়েছিলেন দুজনে। খুব ভালো লোক। আফ্রিকায় নাকি ওঁদের হীরের ব্যবসা আছে। উনি ওঁকে আফ্রিকায় নিয়ে যেতে চাইছেন। বলছেন সেখানকার ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে। সেখানে নাকি ওঁদের বড় একটা ল্যাবরেটরি আছে। ঘরে বসেই কাজ করতে হবে। চেনাশোনা কোনও লোক কাছেপিঠে নেই, তাই মনের শান্তি নষ্ট হবে না। আমি ঠিক করতে পারছি না, কি করা উচিত। তাই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। তারপর অম্বরের কাছে শুনলাম, দময়ন্তী সন্তানসম্ভবা। অম্বর বললে, তুমি এসে গেছ, ভালোই হয়েছে। ছেলে মেয়ে যা-ই হোক তার ভারটা তোমায় নিতে হবে। আমাদের সংস্পর্শে তাকে আর রাখব না। দময়ন্তীরও একটা প্যাচ দেখা দিয়েছে—"

এই সময় বাধা পড়ল। মিস্টার টমসন এসে হাজির হলেন। ক্যাম্বিসের জুতো, থান, পাঞ্জাবি-পরা ধপধপে ফরসা রং, মাথায় টাক, চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। তবু কিন্তু বাঙালী বলে মনে হচ্ছে না। সায়েবই মনে হচ্ছে। মুখের ভাব অত্যন্ত ভদ্র বিনীত। ঘরে ঢুকেই পরিষ্কার বাংলায় বললেন, "ও, পাঠকজিও আছেন, নমস্কার, নমস্কার। বিশু, আমি একটা মুশকিলে পড়েছি। তোমার লাউপুরের ম্যানেজার যাদুবাবু আমার কাছে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন সময় পেলে আমাকে নিতে আসবেন। লাউপুরে নিয়ে যাবেন। কিন্তু এখনও তো তাঁর দেখা নেই। লিখেছেন তাঁর সেখানে জরুরী কাজ আছে, আসবার সময় যদি না পান, সোজা তিনি চলে যাবেন সেখানে। আমি যেন টাকা নিয়ে সেখানে পরে আসি। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা"

"বসুন। কথা ছিল আদুবাবু আপনাকে নিয়ে যাবেন। লাউপুরে নাকি নানারকম হাঙ্গামা হয়েছে। সেখানকার পুলিস নাকি আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করছে। তাই আমি ভাবছিলাম আপনি

সেখানে গেলে ঠিক বুঝতে পারবেন দোষটা কাদের। পুলিস লাইনে তো আপনি অনেকের চেনা, ওখানকার দারোগা আপনাকে দেখলে হয়তো অন্যায় করতে সাহস করবেন না। তাই বলছিলাম যদি—''

টমসন স্মিতমুখে চেয়েছিলেন এবং মনে মনে এই 'যদি' টার প্রতীক্ষা করছিলেন। কথাটা তিনি হেসে সম্পূর্ণ করে দিলেন—''যদি আমি দয়া করে সেখানে যাই, এট্‌সেট্‌রা এট্‌সেট্‌রা। বিশু, ইউ আর এ ডারলিং। তুমি কিন্তু একটা কথা ভুলে যাও যে তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই। আমার মায়ের দুধ খেয়ে তুমি মানুষ হয়েছ। আমরা দুজনে একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। তোমার বিপদে যদি আমি না গিয়ে দাঁড়াই তাহলে আই কানট্‌ জাস্টিফাই মাই এক্‌জিস্‌টেন্স! লিসি আর আমি জিনিস-পত্র গুছিয়ে এতক্ষণ আদুবাবুর অপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু তিনি এলেন না দেখে তোমার কাছে এলাম। কোন্‌ দিক দিয়ে যেতে হবে আমাকে বলে দাও, আমি এখনই বেরিয়ে পড়ব। আমাকে একটা চিঠিও দিয়ে দাও।''

পাঠকজি এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন। এ শুনে খসখস করে তিনি লিখলেন-- ''আপনি একা সেখানে যেতে পারবেন না। দুরূহ পথ। গেলেও কলকে পাবেন না, আদুবাবু আরও দুরূহ। আমি আপনার সঙ্গে যাব। চারটের সময় ট্রেন আছে, তাহলে আর দেরি করবেন না, চলুন যাই।'' তারপর তিনি বিশ্বদীপের দিকে চেয়ে আর একটা স্লিপ লিখলেন— ''গাড়িটা এখানেই রেখে যাচ্ছি। শুকুল ফিরলে বোলো যে আমরা লাউপুরে রওনা হয়েছি। সেখানে পৌঁছে খবর দেব।''

পাঠকজি উঠে পড়লেন।

বিশ্বদীপ জিগ্যেস করলেন, ''টাকা সঙ্গে আছে তো?''

পাঠকজির কোমরে লম্বা একটা গেঁজে থাকে। সেটা কোমর থেকে খুলে দেখলেন। তারপর ঘাড় নেড়ে জানালেন আছে—দু'হাতের দশটি আঙুল তুলে জানালেন দশ হাজাব টাকা আছে—

''আপনারা কোথা যাবেন?''

''সোজা স্টেশনে যাওয়াই তো ভালো।''

টমসন বললেন, ''লিসিকেও তুলে নিতে হবে।''

বিশ্বদীপ বললেন, ''চলুন আমিই তাহলে পৌঁছে দিয়ে আসি আপনাদের। ছকু—''

ছকু একটা ট্রেতে কয়েক পেয়ালা চা নিয়ে আসছিল।

''চায়ের এখন দরকার নেই। শুকুল এলে বোলো সে যেন গাড়ি নিয়ে বাড়ি চলে যায়। বোলো পাঠকজি লাউপুরে গেছেন, কয়েকদিন পরে ফিরবেন।''

''তুমি আবার কষ্ট করছ কেন, আমরা রাস্তায় একটা ট্যাক্সি ডেকে নিতাম''

''না, না, চলুন—''

তিনজনে বেরিয়ে গেলেন।

।। এগার ।।

বিদুলা ওয়ালটেয়ার থেকে ফিরে সোজা চলে এল বিশ্বদীপের বাড়িতে স্টেশন থেকেই। টোটো তাকে আনবার জন্য গাড়ি নিয়ে স্টেশনে গিয়েছিল।

"তুমি গাড়িতে বস, আমি খবরটা নিয়ে আসি"—টোটো নামতেই দারোয়ানটা সেলাম করে দাঁড়াল।

বলল "সাহেব এখন ঘুমুচ্ছেন, কারো সঙ্গে দেখা করবেন না। কাল সমস্ত রাত ঘুম হয় নি। ডাক্তার সাহেব একটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছেন আর আমাকে এখানে বসিয়ে রেখে গেছেন যাতে কেউ এসে ওঁকে না ওঠায়।"

টোটোর পিছু-পিছু বিদুলাও নেমেছিল। সব শুনে সে ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর টোটোর দিকে ফিরে বলল, "তুমি বাড়ি যাও। আমি এখানেই ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করব। তুমি গিয়ে গাড়িটা পাঠিয়ে দিও।"

টোটোর যাবার ইচ্ছে ছিল না। সে একটু ইতস্তত করতে লাগল কিন্তু বিদুলার আদেশ অমান্য করবার সাহস তার নেই। তবু একটু ঘুরিয়ে বলল, "গাড়িটা পাঠিয়ে দিতে বলছ? কিন্তু রহিম এখনও হয়তো ফেরেনি।"

রহিম বিদুলার ড্রাইভার।

"তাহলে গাড়িটা এখানেই থাক। তুমি বরং একটা ট্যাক্সি করে চলে যাও"

"তোমার ব্যাগটা তাহলে নামিয়ে রেখে যাই। যদি কিছু দরকার হয়। আমি বলি কি তুমি বাড়ি গিয়ে স্নান করে কিছু খেয়ে তারপর এসো। সমস্ত রাত ট্রেনে এসেছ। এভাবে কতক্ষণ বসে থাকবে"

বিদুলার চোখ দুটো যেন টর্চের মতো জ্বলে উঠল। সেই জ্বলন্ত দৃষ্টি টোটোর মুখের উপর পড়তেই ঘায়েল হয়ে পড়ল বেচারা। বলল, "তবে থাক," বলেই হনহন করে হেঁটে বেরিয়ে গেল। মোড়ে গিয়ে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলল, "সিলি—"

বিদুলাকে দারোয়ান চিনত।

সে আর একবার সেলাম করে বলল, "মা, আপনি তাহলে বসবেন চলুন, আমি পাখাটা খুলে দিচ্ছি—"

ড্রইংরুম খোলাই ছিল। জানালাগুলো বন্ধ ছিল খালি। দারোয়ান এসে সেগুলো খুলে দিল। বিদুলা বসেই দেখতে পেল ঘরের কোণে মাটিতে বসে আছে একটি রোগা মেয়ে, ময়লা রঙীন কাপড় পরা। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমুচ্ছে। অঘোর ঘুমচ্ছে। বিদুলা নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখছিল তাকে। দারোয়ান বলল, "মহুয়া মাইজি! সাহেবের অসুখের খবর পেয়ে কাল সমস্ত রাত এখানে বসেছিল। সাহেবের ঘরে হুকু ছাড়া কারও ঢোকবার হুকুম ছিল না। তবু মহুয়া মাইজি সারারাত এখানে বসে ছিল যদি হুকুর মুখ থেকে কোনও খবর পায়—"

"মেয়েটি কে—"

"ফ্যাকটারিতে কাজ করে। কোথাও থাকবার জায়গা পায় নি বলে সাহেব ওকে এখানে বাগানের ঘরে থাকতে দিয়েছেন।"

টোটোর মুখে এসব কথা স্টেশনেই শুনেছিল বিদুলা। দারোয়ান পাখাটা ঠিক করে দিয়ে বেরিয়ে গেল। পাখার হাওয়াটা গায়ে লাগতেই ঘুম ভেঙে গেল মহুয়ার। সে চোখ চেয়ে হতভম্ব হয়ে বসে রইল কয়েক মুহূর্ত, মনে হল এ কোন্ অচেনা জায়গায় এসেছে সে। তারপরই সব মনে পড়ল। মুখ ফিরিয়েই দেখতে পেল বিদুলাকে। তাড়াতাড়ি উঠে হেঁট হয়ে

নমস্কার করল তাকে। বিদুলাকে সে চিনত। তারপর উঠে সসংকোচে একপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। বিদুলা নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল, এমন একটা ভাব করতে লাগল যেন তাকে দেখতে পায়নি। তারপর তার নজরে পড়ল কয়েকখানা কাগজ। পাঠকজি কাল যে সব কাগজে লিখে লিখে বিশ্বদীপের সঙ্গে কথা কইছিলেন সেই কাগজগুলো সামনের টেবিলেই ছড়ানো ছিল। বিদুলা সেইগুলো তুলে পড়তে লাগল। একটু পরেই ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে গেল তার। এসব কি!—এসব কার কথা? কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে যেন একটা মর্মবমূর্তির মতো হয়ে গেল। সত্যিই মনে হতে লাগল একটু ঝুঁকে ভ্রূকুঞ্চিত করে শঙ্কা, বেদনা আর বিষাদের প্রতিমূর্তি যে বসে আছে, সে জীবন্ত মানবী নয়, সে মর্মরমূর্তি। কে এসব লিখেছে। যাদের কথা লিখেছে তারা কি বিশ্বদীপের বাবা মা? না, না, না, হতেই পারে না, একটা দৃঢ় অবিশ্বাসের দুর্গে নিঃশব্দ প্রতিবাদের মতো বসেছিল সে। একটা সংবাদ কেবল বিরাট একটা গাঁইতির মতো সে দুর্গেব দেওয়ালে আঘাত হানছিল। সে সংবাদটি হচ্ছে, বিদুলা জানত পাঠকজি বিশ্বদীপের সঙ্গে লিখে লিখে কথা কন, আর এও জানত তিনি বিশ্বদীপেব পিতৃবন্ধু। এ পাঠকজিরই হস্তাক্ষর। বিদুলা চেনে।

"আশ্চর্য, আসতে আসতে ঠিক আমার মনে হচ্ছিল এখানে আপনার দেখা পাব। এবকম প্রিমনিশন্ (premonition) আমার মাঝে মাঝে হয়। ভয় হচ্ছে, শেযকালে মহাপুরুষটুকুষ হয়ে যাব না তো?"

বিদুলা চোখ তুলে চেয়ে দেখল ডাক্তার ঘোষাল হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে আছেন। সে জানতেও পারেনি তিনি কখন এসেছেন।

"নমস্কার। বিশ্বদীপের কি হযেছে?"

"ভযানক মাথা ধরেছিল কাল। রাত দুটোর সময আমাকে ফোন করে। আমি এসে একটা ইন্‌জেকশন দিয়ে গিয়েছিলাম ঘুমের জন্য। এখনও ওঠে নি?"

"কই কোন সাড়াশব্দ তো পাইনি। আপনাব বারণ আছে শুনে ভিতবে যাই নি।"

"ভালো করেছেন। আমি দেখে আসি চুপিচুপি"

ঘোষাল হেঁট হয়ে পায়ের জুতোর ফিতে খুলতে লাগলেন। জুতো খুলে নিঃশব্দ চবণে তিনি চলে গেলেন ভিতর দিকে। গিয়ে দেখলেন, বিশ্বদীপ উঠে দাড়ি কামাচ্ছে। তার শোবাব ঘরেই দাড়ি কামাবার ব্যবস্থা থাকে।

"বাঃ, ফিট্?"

বিশ্বদীপ হাসিমুখে ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, "হ্যাঁ ভালো আছি। কাল আর একটা ব্যাপারও ঘটেছিল। কাল রাত্রে আমি খেতেই ভুলে গিয়েছিলাম। ছকু খাবার দিয়ে আমাকে যখন ডাকল আমি বললাম যাচ্ছি একটু পরে। তারপরে ভুলেই গেলাম, মানে এমন একটা—"

ঘোষাল বললেন, "বুঝেছি। প্রথমেই আপনাকে একটা ধন্যবাদ দিই। আপনার দৌলতে আজ আমার একবার কোমরের exercise হয়েছে। আর একবারও হয়তো হবে। হেঁট হয়ে জুতোর ফিতে খুলেছি। চাকরে আজকাল জুতো পরিয়ে দেয়, আর খুলেও নেয়। উইল ইউ বিলিভ? ও, আসল কথাটাই তো বলতে ভুলে গেছি, শ্রীমতী বিদুলা এসে বসে আছেন—"

"বিদুলা? কখন এসেছে?"

"নো আইডিয়া। অনন্তকাল থেকেই তো উনি আপনার দিকে আসছেন, আপনার ড্রইংরুমের সোফায় কখন এসে পৌঁছেছেন তা ঠিক বলতে পারব না। না, না, এভাবে যাবেন না। তোয়ালেটা ঘাড় থেকে নাবান, মুখটা ধুয়ে ফেলুন, চুলটা একটু আঁচড়ে নিয়ে, ভালো একটি ড্রেসিং গাউন পরে তারপর যান। সব জিনিসেরই তো একটা ডেকোরাম আছে। দেখি পাল্‌সটা—"

ঘোষাল অনেকক্ষণ ধরে নাড়ী দেখেন চোখ বুজে। তাই দেখলেন, তারপর বললেন, "ঠিক আছে। আজ রাত্রে শোবার আগে একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে নেবেন আমি পাঠিয়ে দেব। আপনি আসুন, আমি ততক্ষণ বিদুলা দেবীর সঙ্গে একটু পর-চর্চা করি গিয়ে—"

বিদুলা তেমনি নিশ্চল প্রতিমার মতোই বসে ছিল।

"বিশ্বদীপ উঠেছে?"

'হ্যাঁ। বেশ ভালো আছে। আসছে এখুনি"

ডাক্তার ঘোষাল চেয়ারে বসে আবার জুতো পরতে লাগলেন।

ছকু ট্রেতে করে কফি আর কিছু খাবার নিয়ে এল।

বিদুলা বলল, "আমি স্নান না করে কিছু খাব না। আপনি খান, আমি ছেঁকে দিচ্ছি—"

ডাক্তার ঘোষালের তখন চোখ পড়ল পাঠকজির লেখা কাগজগুলোর উপর।

"কি এগুলো?"

"কি জানি, আমিও বুঝতে পারছি না—"

ডাক্তার ঘোষাল কাগজগুলো তুলে পড়তে লাগলেন। তারপর বিদুলার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি পড়েছেন নাকি?"

"পড়লুম তো—"

"আমার দুজন পেশেণ্টের হিস্ট্রি পাঠকজি এখানে রেখে গেছেন।"

"তোমার বাবা, তোমার মা এসব লিখেছেন কেন—কার বাবা, কার মা"

"তোমার। আমার পেশেণ্টদের একটি ছেলে আছে তার নাম 'তোমা', ডাক নাম। ভালো নাম তম্বরু-বিলাস। দিন ও কাগজগুলো আমাকে। পাঠকজি নিশ্চয় বিশ্বদীপবাবুকে দিয়ে গিয়েছিলেন আমার দেখা না পেয়ে। বিশ্বদীপবাবুর এমনভাবে এগুলো ফেলে রাখা উচিত হয় নি।"

ঘোষাল কাগজগুলো মুড়ে নিজের পকেটে পুরে ফেললেন। উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বিদুলার মুখ। মর্মরমূর্তিতে প্রাণ সঞ্চারিত হল। ঘোষাল এ সুযোগটা নিতে ইতস্তত করলেন না।

বললেন, "আপনার কাছে অনেকদিন থেকে একটা আর্জি পেশ করব ভাবছিলাম, কিন্তু সুযোগ পাইনি। এখন সেটা নিবেদন করব কি?"

"নিশ্চয়—"

"আমি 'বেকার-ভবন' বলে একটা বাড়ি তৈরি করছি বোধ হয় শুনেছেন। সে ভবনে পঁচিশজন বেকার বিনা পয়সায় থাকতে পারবে। কিন্তু খবরটা বাজারে চাউর হবামাত্র হাজার হাজার বেকার এসে বলবে, আমি বেকার, আমাকে থাকতে দাও। বলা বাহুল্য এদের মধ্যে অনেক মিথ্যাবাদী, অনেক সুবিধাবাদী থাকবে। এদের ছেঁটে ফেলে দিয়ে মোটা-দানার প্রকৃত বেকার বার করতে হবে। বেকারদের মধ্যেও ফার্স্টক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস আছে।

যারা সুস্থ, সবল, কিন্তু কাজ করতে চায় না এবং যাদেব কোথাও কোন আশ্রয় নেই—এবাই হল ফার্স্ট ক্লাস বেকাব। এই স্ট্যাণ্ডার্ডে আমি সেকেণ্ড ক্লাস আর থার্ড ক্লাস বেকারদের ডেফিনিশনও ঠিক করেছি। এদের বাছবার জন্য একটা কমিটি চাই। সে কমিটিতে থাকবেন বিশ্বদীপবাবু, কবি শ্যামল সোম, পুস্তকবিক্রেতা অনঙ্গ সেন, রুটিওয়ালা অনন্ত রায়, আর অনন্ত রায়ের পত্নী বিজনবালা, শিল্পী নবনী দাস, আর আমাব ইচ্ছে আপনিও থাকুন এতে।"

"আপনি থাকবেন না?"

"না। I shall be your most obedient servant. আপনাদেব আদেশ এবং নির্দেশ আমি বশংবদ ভৃত্যেব মতো পালন কবব"

"বেকারদের কাজের কোন ব্যবস্থা করবেন?"

"না, সে দাযিত্ব আমবা নেব না। তাদেব খেতেও দেব না। তবে আমবা তাদেব বলব কিছু-না-কিছু একটা কব। অন্তত ভিক্ষে কর। সেটাও একটা কাজ। আব মাঝে মাঝে তাদেব সঙ্গে গিযে আড্ডা দেব। নানারকম গল্প বলব। ইতিহাসেব গল্প। ইতিহাসে তো আপনি পাবঙ্গমা শুনেছি। বেকাবদেব সম্ভাবনা কি এবং কতখানি তা আপনাব মুখ থেকে শুনলে আমাব বিশ্বাস ওবা প্রেরণা পাবে। আপনি আমার প্রস্তাবে রাজী হবেন কি।"

সুমিষ্ট হাসি হেসে বিদুলা বলল, "বেশ। আপনাব কথা অমান্য করবাব শক্তি আমাব নেই। তবে কি জানেন, আমাব নির্দিষ্ট কোনও কাজ নেই বলেই সময়ও নেই, আমি সর্বদাই যেন ব্যস্ত—"

"কি নিয়ে ব্যস্ত—"

"নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বারো তেরো ঘণ্টা নিজেকে নিয়েই কেটে যায়। মাঝে ইতিহাসের কতকগুলো গল্প লিখেছি, অনঙ্গবাবু সেগুলো ছাপছেন, তাব সঙ্গে কতকগুলো বেখাচিত্র দিলে ভালো হত, আমি এককালে আঁকতুম, ভাবছিলুম নিজেই আঁকব। আঁকতে গিয়ে কিন্তু হতাশ হলাম। ভালো হল না। আপনি এখনি আর্টিস্ট নবনী দাসেব কথা বললেন, তিনি কেমন আঁকেন?"

"চমৎকার! প্রথম শ্রেণীর আঁকিয়ে। কি রকম ছবি চান তাকে বুঝিয়ে দিলে সে ঠিক এঁকে দেবে। পেটে অবশ্য বিদ্যে বেশী নেই। কিন্তু আঁকে খুব ভালো। কি ধরনেব ছবি দিতে চান—"

"মাদাম পম্পাডোর, পাইলেট্, জোয়ান অব আর্ক, ক্লিওপেট্রা, টমাস বেকেট্, বানা প্রতাপ, লছমীবাঈ—এই সব—"

"আমার বিশ্বাস ও পারবে। ওকে পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে?"

"দেবেন—"

এই সময় বিশ্বদীপ ঢুকলেন।

"তুমি কতক্ষণ এসেছ?"

বিদুলা নির্নিমেষে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, "অনেকক্ষণ। স্টেশন থেকে সোজা এখানে এসেছি—"

"কে তোমাকে খবর দিলে? আমার তেমন তো কিছু হয়নি"

ডাক্তার ঘোষাল উঠে দাঁড়ালেন।

"এইবার আমি যাব। বিদুলা দেবী, আমি বিশ্বদীপ বাবুকে দু' মিনিটের জন্য বাইরে নিয়ে যাচ্ছি। সিমেণ্ট সম্বন্ধে একটু প্রাইভেট টক্ আছে—জাস্ট টু মিনিট্‌স্"

বিশ্বদীপকে নিয়ে ঘোষাল বাইরে চলে গেলেন।

বেশ একটু দুরে গিয়ে বললেন, "সিমেণ্টের কথা নয়। সিমেণ্ট পেয়ে গেছি। আজ ঢালাই হবে। আমি আপনাকে ডেকেছি অন্য কারণে। বোধহয় কাল আপনার সঙ্গে পাঠকজির কথা হয়েছিল। তিনি আপনার বাবা মায়ের কথা বলেছিলেন কি? যাইহোক কাগজগুলো টেবিলে পড়ে ছিল। বিদুলা দেবী সেগুলি আদ্যোপান্ত পাঠ করে স্নান্দ্বব্ধজনন্দ্রনন্দ্বস্তু হয়ে বসেছিলেন। এমন সময় আমি এলুম। এসেই একমুঠো ধুলো নিক্ষেপ করলুম আপনার প্রেয়সীর চোখে। বললুম—আমার দুটি পেশেণ্টের ইতিহাস পাঠকজি লিখে রেখে গেছেন। তাদের ছেলের ডাক নাম 'তোমা', ভাল নাম তম্বরু-বিলাস। কারণ তাঁর লেখায় 'তোমার বাবা মা' 'তোমার বাবা মা' কথাগুলো আছে। বিদুলাও এখনই বোধ হয় আপনাকে, কথা জিগ্যেস করবেন, আপনি প্রাঞ্জল ভাষায় নির্জলা মিথ্যেটি বলে দেবেন। পাঠকজিকে বলবেন, তিনিও যেন বলেন। লেখাগুলো আমি নিয়ে যাচ্ছি। পুড়িয়ে ফেলব। ব্যস্ চললুম—"

বিশ্বদীপ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটা কথা মনে হল, কথাটা যেন আলোর মতো ব্যাপ্ত হয়ে গেল তাঁর সমস্ত সত্তায়—সবাই আমাকে ভালবাসে। কেন ভালবাসে? কি গুণ আছে আমার? কিছুই তো নেই। তাবপরই মনে হল বিদুলাব সঙ্গে এ মিথ্যাচার কত দিন করবেন তিনি। কিন্তু এ-ও তিনি জানেন সত্যকথা বললে বিদুলা সরে যাবে। বিদুলা তাঁকে ভালবেসেছে তাঁব রূপেব জন্য। তাঁর মনের, তাঁব অন্তবতম সত্তার পবিচয় সে তো পায়নি, পাবার সুযোগই হযনি। হয়তো একদিন সুযোগ পাবে, তখন হয়তো তাঁকে আরও ভালবাসবে, কিন্তু সে সুযোগ কি পাবে সে? যে পথ বেয়ে সে আসছে সে পথ রূপেব পথ সেই চির-উজ্জ্বল সনাতন পথ, সে পথ যদি লুপ্ত হয়ে যায় তাহলে—। হঠাৎ ঠিক করে ফেললেন, না মিথ্যা আচরণই করতে হবে। যতদিন পারা যায় মিথ্যাটাকেই তিনি আঁকড়ে থাকবেন। তাছাড়া, কে জানে, হয়তো সেরেও যেতে পারে।

"তুমি কি করছ ওখানে একা দাঁড়িয়ে—"

বিদুলা বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন বিশ্বদীপ।

"আমি তাহলে এখন যাই। তুমি তো ভালোই আছ দেখছি!"

"না, না, এর মধ্যে যাবে কি। চা খাও—"

"আমি স্নান না করে কিছু খাই না"

"ব্যাগ তো এনেছ দেখছি, এখানে স্নানও করে নাও। দাঁড়াও আমি ফিবপোতে ফোন করছি!"

"কেন?"

"এইখানেই ব্রেকফাস্ট দিয়ে যাবে ট্যাক্সি করে। চেনা লোক আছে আমার, এখুনি এসে যাবে—"

প্রতিবার করবার আগেই বিশ্বদীপ চলে গেলেন ফোন করতে।

বিদুলার ব্যাগে সম্পূর্ণ এক সেট পোশাক ছিল, এমন কি এক জোড়া জুতো পর্যন্ত। সবই

নীল রঙের। ওয়ালটেয়ারে যে সমুদ্রের কাছে সে ছিল সেই সমুদ্রেরই স্বপ্ন যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে বসেছিল বিশ্বরূপের ড্রইংরুমে। মহুয়া সম্বন্ধে বিদুলা কোনও উল্লেখ পর্যন্ত করেনি। টোটো যে তাকে টেলিগ্রাম করেছিল সে কথাটাও সে গোপন করত, কিন্তু তার মনে হল কথাটা গোপন থাকবে না, কারণ শ্যামল সোম আর তার বন্ধু দুজন সেখানে ছিল।

বলল, "টোটো যে এমন ভীতু তা আমি জানতাম না। আমি আরও দু'একদিন থাকতুম ওখানে, কিন্তু টোটোর এক টেলিগ্রাম গিয়ে হাজির, come immediately. স্টেশনে বললে আমার একা থাকতে ভয় করছিল। তার মুখেই শুনলাম তুমি অসুস্থ—"

একটু থেমে তারপর বলল, "টেলিগ্রামটা পেয়েই কিন্তু আমার মনে হয়েছিল তোমার কিছু হয়েছে নিশ্চয়। তোমার কথা সর্বদাই মনে হচ্ছিল, উদারায় বাজছিল যে সুরটা টেলিগ্রামটা যাওয়ামাত্র সেটা যেন তারায় বাজতে লাগল। আর থাকতে পারলুম না। ডাক্তার ঘোষালও একটা আশ্চর্য কথা বললেন। বললেন তিনি প্রত্যাশা করছিলেন যে আমাকে এসে দেখবেন। তুমি অবশ্য আমার কথা ভাবছিলে না তা আমি জানি, নানা কাজে ব্যস্ত ছিলে তুমি, তোমাদের স্ট্রাইকের কি হল—"

বিদুলা সহজ, স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছিল।

বিশ্বদীপ তার সামনে ছোট একটা টাইপরাইটার নিয়ে একটা চিঠি টাইপ করে যাচ্ছিলেন। বিলেতের যে ল্যাবরেটরিতে তাঁর সহপাঠী ও বন্ধু তাঁকে আহ্বান করেছিল কাজ করবার জন্যে তারই চিঠির জবাব দিচ্ছিলেন তিনি। তাঁর সহপাঠী তাঁকে লিখেছিল—তুমি যদি আস তাহলে থাকবার আলাদা একটি কোয়ার্টার্স পাবে। মাইনে কত পাবে তা আমি ঠিক জানি না। কিন্তু আমাদের প্রফেসার তোমাকে পেলে আর কাউকে নেবেন না বলেছেন, তাই মনে হয় আমরা যা পাচ্ছি তা তুমি নিশ্চয় পাবে। আর মস্ত সুবিধা নিজের খুশিমতো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। বিশ্বদীপ অকপটে তাকে সব কথা খুলে লিখছিলেন। লিখছিলেন ডাক্তার সন্দেহ করছেন আমার লেপ্রসি হয়েছে—এ জেনেও কি প্রফেসার আমাকে কাজ দেবেন। এটা আমার আগে জানা দরকার।....

এ চিঠিটা বিদুলা চলে যাবার পরও তিনি লিখতে পারতেন। চিঠিখানা মাসখানেক আগে এসেছে, এতদিন উত্তর দেওয়ার কথা মনে হয় নি—ফিরপোর লোকটাকে বিল দেবার সময় চেকবুক বার করতে গিয়ে চিঠিটা বেরিয়ে পড়ল। বিশ্বদীপ যেন বেঁচে গেলেন।

বিদুলার সঙ্গে মুখোমুখি বসে তার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে তিনি যেন ভরসা পাচ্ছিলেন না। ডাক্তার ঘোষাল তাঁকে যে মুখোশটা পরতে বলে গেলেন, যে মুখোশ তিনি পরেছিলেন, কিন্তু তাঁর ভয় হচ্ছিল বিদুলার প্রদীপ্ত দৃষ্টির আঘাতে সে মুখোশ খুলে যাবে। বিদুলার দৃষ্টিটাকে তাই তিনি এড়াবার চেষ্টা করছিলেন প্রাণপণে। চিঠিটা পেয়েই তাই বললেন, "একটা জরুরী চিঠির জবাব লিখতে হবে এখুনি। তুমি বস আমি চট করে লিখে ফেলছি ওটা—"। তাড়াতাড়ি পাশের ঘর থেকে নিজের শৌখিন ছোট টাইপরাইটারটা এনে টাইপ করতে শুরু করে দিলেন। স্ট্রাইকের কথা উঠতে টাইপরাইটারের দিকেই চেয়ে বললেন, "এখনও কিছু ঠিক হয়নি। আমার ইচ্ছে সকলকে সমান অংশীদার করে নি। কিন্তু দেখলুম পাঠকজির তাতে মত নেই। অথচ আমার এ-ও বলছেন, তুমি যা করবে তাই হবে। কি করব ঠিক করতে পাচ্ছি না—"

'আমি এসে দেখলুম ওই কাঠের টেবিলটায় পাঠকজির লেখা খানকয়েক কাগজ রয়েছে। পড়ে অবাক হয়ে গেলুম -''

''ও, হ্যাঁ, উনি দুজন কুষ্ঠরোগীর ইতিহাস লিখে রেখে গিয়েছিলেন ডাক্তার ঘোষালকে দেবেন বলে -''

হ্যাঁ ডাক্তার ঘোষাল তাই তো বললেন নিয়েও গেলেন তিনি কাগজগুলো—''

বিশ্বদীপ টাইপ করে যেতে লাগলেন।

বিদুলা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়েছিল তার মুখের দিকে। এমন একটা অপূর্ব সুন্দর মুখ সে আর দেখেনি কখনও। দেখে দেখে যেন আশ মেটে না। ও মুখে মেয়েলী ভাব নেই ওর কমনীয়তা পেলব নয়, তা বলিষ্ঠ, পুরুষ তবু সুন্দর। একটা ছবিতে সে সমাধিমগ্ন মহেশ্বরের যে মুখ দেখেছিল সেই মুখ। ছবিটা একজন তিব্বতী শিল্পীর আঁকা, হিমালয়ের পটভূমিকায়। একজন আমেরিকান টুরিস্ট কিনে নিয়ে যাচ্ছিল ছবিখানা। জাহাজে দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে। লোকটা বুড়ো মাতাল। কারও সঙ্গে বিশেষ কথা কইত না। ওই ছবিটার সামনে অর্ধনিমীলিত নয়নে বসে গ্লাসের পর গ্লাস মদ খেয়ে যেত বিশ্বদীপ সেই রহস্যময় মহাদেব। বিশেষ করে একটা রহস্যের কোনও সমাধান করতে পারছিল না বিদুলা বিশ্বদীপ এরদিন ও তার কাছে প্রণয় নিবেদন করেনি একদিনও কোন অশোভন আচরণ করেনি, একদিনও বিবাহের প্রস্তাব করে নি। তাকে ঈর্ষান্বিত করবার জন্য মাঝে মাঝে সে অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার ভান করেছে ইদানীং যেমন শ্যামল সোমের সঙ্গে কিন্তু বিশ্বদীপের মনে কোনও ঈর্ষা জাগাতে পারেনি তার হঠাৎ ওয়ালটেয়ারে চলে যাওয়ারও গোপন উদ্দেশ্য ওই। কিন্তু কই, বিশ্বদীপ তো বিচলিত হল না। অথচ সে জানে, খুব ভাল করে জানে যে বিশ্বদীপ তাকে ভালবাসে সে অনুভব করে যে বিশ্বদীপ সদাসর্বদা তার কথাই ভাবে তার কথা ছাড়া আর কিছু ভাবে না, তার নারী প্রকৃতির নিগূঢ় যে শক্তি দিয়ে এটা সে নির্ভুলভাবে অনুভব করেছে কিন্তু বাইরে বিশ্বদীপ নির্বিকার। কেন, এর রহস্য আজও আবিষ্কার করতে পারেনি বিদুলা। সত্যিই, মহাদেব না কি। -

''তুমি তোমার ফ্যাকটারির সম্বন্ধে যা ভেবেছ তা ঠিকই ভেবেছ। ওদের হাতেই ছেড়ে দাও সব, ওরা ওটা চালিয়ে যা লাভ করতে পারে করুক। তোমার তো টাকার খুব অভাব নেই। কি হবে তাহলে টাকার জন্যে এই হতভাগা সভ্যতার আস্তাকুঁড়ে মুখ জুবড়ে পড়ে থাকবার। চল আমরা বেরিয়ে পড়ি কোথাও। জাপান যাই চল। যে সময় চেরী ফুল ফোটে সেই সময় যাব আমরা—কি বল?''

বিশ্বদীপ এইবার তার দিকে চোখ তুলে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, ''সেও তো সভ্যতার আঁস্তাকুড। নর্থ পোল বা সাউথ পোলে যেতে পারি, সাহারায় যেতে পারি, ঘন অরণ্যে যেতে পারি, হিমালয়ে যেতে পারি, মহাসমুদ্রে ছোট একখানা জাহাজ নিয়ে পাড়ি দিতে পারি। কিন্তু তা কি পারব? একা থাকবার সাধনা তো করিনি কখনও।''

''একা থাকবে কেন। আমিও তো থাকব।''

''পারবে? একখানা শাড়ি পরে তুমি ক'ঘণ্টা থাকতে পার? একরকম খাবার ক'দিন ভাল লাগে। সর্বদা যদি একা আমাকে নিয়ে থাক তাহলে আমাকেও ভালো লাগবে না।''

"তুমি নিজেকে শাড়ি আর খাবারের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে গেলে? তুমি জীবন্ত মানুষ, ক্ষণে ক্ষণে তোমার রূপ বদলায়—"

"বদলায় জনতার পটভূমিকায়। জনতা যদি না থাকে তাহলে আমি বদলাব না, তুমিও বদলাবে না। অসহ্য মনে হবে তখন পরস্পরের সঙ্গ। শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যই মানুষের মনকে পূর্ণ করতে পারে না। মানুষ একজন স্রষ্টা, সৃষ্টি করবার প্রেরণা, সৃষ্টি করবাব উপাদান, সৃষ্টি করবার সুযোগ তার চাই। রবিন্‌সন ক্রুশো যা যা করেছিল তা করবার প্রেবণা আর সুযোগ যদি তাব না থাকত তাহলে ওই দ্বীপে সে একা থাকতে পারত না, পাগল হয়ে যেত!"

"তোমাব মতে তাহলে মানুষ কিছুতেই নির্জনবাস করতে পারে না?"

"পারে, কিন্তু সেখানে দ্বিতীয় লোকেব স্থান নেই। নির্জনবাসী মানুষের একটি মূর্তিই আমরা সার্থকভাবে কল্পনা কবতে পেরেছি, সে মূর্তি তার ধ্যান-মূর্তি!"

বিশ্বদীপ চিঠিটা টাইপবাইটার থেকে খুলে নিলেন, তাবপর ঠিকানাটা টাইপ করতে লাগলেন। খামটাব চেহাবা দেখে বিদুলা বলল, "বিলেতে লিখছ নাকি কাউকে- "

"হ্যাঁ—"

"বিলেতেই তোমাব অধিকাংশ বন্ধুবান্ধব, না? আব একদিনও তো বিলেতেই কাকে যেন চিঠি লিখছিলে---"

"হ্যাঁ, সারাজীবন তো প্রায় ওইখানেই কেটেছে--"

"আচ্ছা বিশ্বদীপ, তোমার বাবা মাও কি বিলেতে ছিলেন? তাঁদের কথা তো একদিনও বলনি আমাকে—"

বিশ্বদীপ চুপ করে রইলেন। ঠিক কি উত্তর দেবেন হঠাৎ মাথায় এল না।

"তোমার বাবা মা-ও বিলেতে ছিলেন নাকি—"

"সব বলব তোমাকে একদিন। এখন চল একটু বেড়িয়ে আসি—"

"কোথায়?"

"যেখানে হক। মোটরে লম্বা একটা দৌড়, শ'খানেক মাইল—"

"চল। আমার মোটরটা নিয়েই যাই--"

বিদুলা সোৎসাহে উঠে দাঁড়িয়েছিল, এমন সময় ফোন বাজল।

বিশ্বদীপ চলে গেলেন পাশের ঘরে ফোন ধরতে।

"হ্যালো, হ্যাঁ, আমি বিশ্বদীপ। না, না, চিন্তার কোনও কারণ নেই, ভালো আছি। না, আজ আপিস যাব না। আজ রবিবার, কাজের তাড়া থাকলে আজও যেতুম, কিন্তু তাড়া নেই। হ্যাঁ, বিদুলা এখানে আছে। কথা বলবেন? ধরে থাকুন তাহলে—"

বিশ্বদীপ ফিরে এসে বললেন, "শ্যামলী সোম ফোন করছিল। সে-ও নাকি আজ ফিরেছে, তোমার সঙ্গে? ডাক্তার ঘোষাল ওকে ফোন করেছিলেন, তার কাছ থেকে ও আমার মাথাধরার খবর পেয়েছে। ফোন ধরে আছে, তুমি ওর সঙ্গে কথা বল গিয়ে—আমি ততক্ষণ কাপড়-চোপড় পরে নিই"

বিদুলা চলে গেল পাশের ঘরে। আলাপ হতে লাগল।

"নমস্কার। স্টেশনের ভিড়ে আপনাদের আর খবর করতে পারি না। টোটোর সঙ্গে দেখা

হতেই খবর পেলুম বিশ্বদীপ অসুস্থ। তাই স্টেশন থেকেই চলে এসেছি এখানে। ও, হ্যাঁ, ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তিনি আমাকেও বলছিলেন কি একটা কমিটির মেম্বার হবার জন্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাঁর বেকারভবনের ব্যাপার। মাথায় ছিট আছে একটু ভদ্দরলোকের, না?

কলকণ্ঠে হেসে উঠল বিদুলা।

"হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই, ওরিজিনালিটি আছে বইকি! আমি তো রাজী হয়েছি ওঁর কমিটিতে যেতে। উনি কমিটিতে যাদের নেবেন বললেন তাদের সবাইকে আমি চিনি। দুটি লোক ছাড়া, অনন্ত বাবুর স্ত্রী বিজনবালা আর শিল্পী নবনী দাসের সঙ্গে পরিচয় নেই। তবে নবনী দাসের সঙ্গে দু'এক দিনের মধ্যেই পরিচয় হবে। ও, তাহলে তো খুব ভালো হয়, নিয়ে আসুন বিজনবালাকে একদিন আমার কাছে। পরশু বিকেলে? হ্যাঁ, আমি ফ্রি আছি। আমার ওখানেই চা খাবেন। আমি খুব খুশী হব। আমার হয়ে আপনি নিমন্ত্রণ করবেন তাঁকে। আপনার কবিতাও কিন্তু আনবেন কিছু। না, না, সত্যিই খুব ভালো লাগে, বিশ্বাস করুন। না, বিশ্বদীপকে নিমন্ত্রণ করব না। ও নিমন্ত্রণ করলে যায় না। হঠাৎ এসে বিব্রত করেই বেশী আনন্দ পায় ও। হুঁ, এখুনি বেরুচ্ছি আমি। বিশ্বদীপও বেরুবে। আচ্ছা, আচ্ছা, ছেড়ে দিচ্ছি।"

বিশ্বদীপ সত্যিই হঠাৎ আবেগের মুখে ঠিক করেছিলেন বিদুলার সঙ্গে লম্বা একটা চক্কর দিয়ে আসবেন। কিন্তু ঘরে ঢুকে পোশাক বদলাতে গিয়ে তাঁর মনে হল, যা মনে হল তাকে ভয়ই বলতে হয়। অথচ ঠিক ভয় নয়। তাঁর অন্তর্যামী সহসা যেন তাঁকে প্রশ্ন করে বসল—অতক্ষণ তুমি ওর সঙ্গে কি কথা বলবে? এর আগে এতক্ষণ তো তুমি ওর কাছে এমন একটানা থাকো নি। এতক্ষণ একসঙ্গে থাকলে অনিবার্যভাবে যে সব আলোচনা উঠে পড়তে পারে তার জন্য তুমি কি প্রস্তুত আছো? বিয়ে করবে? না, প্লেটোনিক প্রণয়ে সন্তুষ্ট থাকবে? বিয়ে যদি কর তাহলে সব কথা ওকে খুলে বলতে হবে। তা তুমি পারবে না। দূর থেকে তার স্বপ্ন দেখেই যদি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাও, তাহলে বেশীক্ষণ তার কাছে না থাকাই ভালো। যে প্রেয়সীকে বাহুপাশে বাঁধতে পারবে না, তার সান্নিধ্য এড়িয়ে যাওয়াই উচিত। সান্নিধ্যের ছোঁয়াচে রঙীন স্বপ্নও ময়লা হয়ে যায়, আর সাবান দিয়ে সে স্বপ্নকে কাচা যায় না....।

জামা কাপড় না বদলেই বেরিয়ে এলেন বিশ্বদীপ।

"বিদুলা, আমার এখন বেরুনো চলবে না। একটা [illegible]-এর কথা ভুলে গিয়েছিলাম। এক ভদ্রলোকের জন্য অপেক্ষা করতে হবে এখন তাছাড়া ডাক্তার ঘোষালকে না জিগ্যেস করে এমনভাবে বেরিয়ে পড়াটা ঠিক হবে না—"

বিদুলার উৎসুক নয়নের দৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়ে গেল। সে ভেবেছিল দূরে কোনও মাঠের কোনও গাছতলায় বসে বিশ্বদীপকে হয়তো সত্যিই সেই কথা সে আজ ব'লে ফেলবে যা কোনও নারী প্রথমে কোন পুরুষকে বলে না। কিন্তু মুখে সে যা বলল, তার সুর একেবারে আলাদা।

"সেই ভালো। আজ তোমার না বেরোনই উচিত। আজকের দিনটা পুরো রেস্ট্ নাও। আমি যাচ্ছি তাহলে। আমি থাকলেই বকবক করব। তোমার ঠিক রেস্ট্ হবে না—চলি—"

বিদ্‌লা চলে গেল। যাবার সময় দেখল মহুয়া বাগানের সেই ঘরের সামনে বসে কড়া মাজছে একটু দাঁড়াল সে, তারপর চলে গেল। মোটর স্টার্ট করার শব্দ পাওয়া গেল। বিশ্বদীপ খোলা জানলাটার দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর শুয়ে পড়লেন ইজি চেয়ারটায়।

।। বারো ।।

মানসপুরের আকাশে বাতাসে অদ্ভুত একটা আলো ঝলমল করছে। রোদ নয়, জ্যোৎস্না নয়, অদ্ভুত ধরনের সোনালী বাদামী রঙের অদৃষ্টপূর্ব আলোয় ভরে গেছে চারিদিক। বিশ্বদীপের মনে হতে লাগল সত্যিই তিনি যেন রূপকথার দেশে এসেছেন। এসেই তিনি রুদলবাবুর দেখা পেয়ে গেলেন। রামায়ণে রামের যেমন ছবি দেখেছিলেন, বাহুমূলে কেয়ূর, কর্ণে কুণ্ডল, গলায় রত্নহার, মাথায় মুকুট, হস্তে ধনুর্বাণ, রুদলবাবুও ঠিক যেন তেমনি। বিরাট এক মণিমাণিক্যখচিত সিংহাসনে বসে আছেন, তার তাঁর সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে এক রাক্ষস। বীভৎস তার চেহারা। নাকের কাছে প্রকাণ্ড আঁচিল। ঠোঁট দুটো ফোলা ফোলা একটা চোখ পচে গেছে, আর একটা চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। হাতের আঙুল নেই। সর্বাঙ্গে ঘা। ঘায়ে পোকা কিলবিল করছে কিন্তু তবু সে বিরাটকায়।

বিশ্বদীপকে দেখে রুদলবাবু তাড়াতাড়ি সিংহাসন থেকে নেমে এলেন।

"আসুন আসুন, বসুন —"

বিশ্বদীপ ইতস্তত করতে লাগলেন। একটিমাত্র সিংহাসন রয়েছে, সেটাতে গিয়ে বসাটা কি শোভন হবে? কিন্তু পরমুহূর্তেই সবিস্ময়ে দেখলেন ঠিক আর একটা অনুরূপ সিংহাসন মূর্ত হ'য়ে উঠল প্রথম সিংহাসনটার পাশে।

"আসুন, বসুন— "

দুজনে গিয়ে দুটো সিংহাসনে বসলেন। ব'সে বিশ্বদীপ লক্ষ্য করলেন মাথার উপর যে গাছটি রাজছত্রের মতো দাড়িয়ে ছিল সেটিও যেন আর একটু বিস্ফারিত হয়ে গেল।

বিশ্বদীপ হেসে প্রশ্ন করলেন, "রুদলবাবু, আজ আপনার এমন অদ্ভুত পোশাক কেন—"

"যে পোশাক পরে একদা শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষস রাক্ষসী বধ করে দেশকে নির্ভয় করেছিলেন এই রাক্ষসটিকে বশীভূত করবার জন্য আজ আমি সেই পোশাক পরাই সমীচীন মনে করলাম। অবশ্য বাইরে পোশাকটা পরেছি স্রেফ অভিনয়ের জন্য, অভিনেতার পোশাক পরে বেশ একটা আনন্দও পাওয়া যায় আর তার একটা সামাজিক দামও আছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি যে রুদলবাবু ছিলাম তাই আছি। হাতে ধনুর্বাণ নিয়েছি বটে কিন্তু ধনুর্বাণ দিয়ে এই রাক্ষসকে আমি বশ করিনি। আমার আসল অস্ত্র ভদ্রতা আর ভালবাসা। রূপকের সাহায্য নিয়ে যদি বলি, আর রূপকের সাহায্য ছাড়া এসব কথা ঠিক বলাও যায় না, তাহলে বলতে হবে ধনুকটি হচ্ছে নিঃস্বার্থপরতা আর বাণটি হচ্ছে প্রেম। ও ছাড়া কাউকে সত্যিকার বশ করা যায় না—"

বিশ্বদীপ মানসপুরে এসে সাধারণতঃ বিস্মিত হন না। যা হয় তা যত অসম্ভবই হোক, তিনি মেনে নেন। কিন্তু রুদলবাবুর এ কথায় তিনি একটু বিস্মিত হলেন। কৌতূহলও হল একটু।

"কুষ্ঠরোগকে আপনি বশীভূত করেছেন?"

কন্দলবাবু হেসে বললেন, "না। সে কাজ ডাক্তারদের, বিজ্ঞানীদের। আমি কুষ্ঠরোগের ভয়টাকে বশীভূত করেছি। সামনে রাক্ষসরূপী যাকে দেখছেন সে কুষ্ঠরোগ নয়, সে কুষ্ঠরোগের ভয়। কুষ্ঠরোগের চেয়েও তা ভয়ংকর। আপনি সিংহকে তো চেনেন? আমি রোজ তাকে আলিঙ্গন করেছি। হঠাৎ একদিন দেখলাম ভয় আর নেই। সে পরাজিত হয়েছে এই মূর্তি ধ'রে হাতজোড় ক'রে সে একদিন সামনে এসে দাঁড়াল। তখন বললুম, দাঁড়াও এ ব্যাপারটাকে একটা কাব্যের রূপ দিতে হবে। তাই এইসব কাণ্ডকারখানা। আমি এই রাক্ষসটাকে বললাম, তোমার এই ভয়ংকর রূপকে আমি মনোহর করে দেব। তোমাকে দেখে আর কেউ ভয় করবে না, ভালবাসবে। তুমি আর ভয় থাকবে না, হয়ে যাবে ভালবাসা দেখুন না কি মজা হয় "

হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল চারিদিকে। কালো মখমলের মতো একটা যবনিকা নেমে এল যেন।

কন্দলবাবু বললেন, "ড্রপ সিন পড়ে গেল। এখুনি উঠবে আবার।"

একটু পরেই আলো হয়ে গেল সব। অদ্ভুত কোমল একটা সবুজ আলোয় তন্দ্রাতুর হয়ে স্বপ্ন দেখছে দশদিক। আর সেই কুষ্ঠরাক্ষসকে প্রদক্ষিণ করছে একদল সবুজ পাখি। কি পাখি, কোন্ জাতের পাখি তা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু তারা যে সবুজ, তারা যে চিরন্তন প্রাণের প্রতীক এটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। প্রত্যেক পাখির মুখে চমৎকার একটি সাদা ফুল সেই ফুল দিয়ে তারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে রাক্ষসকে। হঠাৎ দেখা গেল পাখিরা অন্তর্ধান করেছে আর অসংখ্য ফুলের মালা দুলছে রাক্ষসের গলায়। আর আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে তার। গায়ে যে সব ঘা ছিল তা নেই, হাতে আঙুল গজিয়েছে। গলায় বুকে কুষ্ঠের কোনও চিহ্ন আর নেই মুখটা কিন্তু এখনও বীভৎস, নাকের গহ্বরটা এখনও ভয়াবহ, চোখ দুটো এখনও তেমনি আছে। কন্দলবাবু হাততালি দিয়ে উঠলেন। আবার সব অন্ধকার হয়ে গেল। এ যেন অন্যরকম অন্ধকার। বিশ্বদীপ বিলেতে একবার ঘোর বর্ষায় একটা চার্চে ঢুকেছিলেন। সেই চার্চে সেদিন যে নিবিড় অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল, সেই অন্ধকার যেন এখানেও ঘনিয়ে এল। সেই চার্চে অন্ধকারকে বাঙময় করে বিশপের বক্তৃতা গম্ভীর সংগীতের মতো মুগ্ধ করে রেখেছিল সকলকে। এখানকার অন্ধকারকে স্পন্দিত করেও তেমনি একটা সংগীত যেন গুঞ্জরিত হতে লাগল। সেই সংগীতে কোনও কথা নেই, কেবল সুর, গভীর বেদনার সুর, আকুল প্রার্থনার সুর। বিমূঢ়ের মতো বসে রইলেন বিশ্বদীপ। কতক্ষণ এ সুর বেজেছিল তা বুঝতে পারেননি বিশ্বদীপ। কিন্তু হঠাৎ যখন তাঁর চমক ভাঙলো, তখন মনে হল সাগর পার হয়ে এলেন তিনি, কান্নার সাগর। তারপর অন্ধকার স্বচ্ছ হতে লাগল ধীরে ধীরে। যখন তা অবলুপ্ত হল তখন বিশ্বদীপ দেখতে পেলেন একটা দুগ্ধধবল মেঘ ঘিরে রয়েছে কুষ্ঠ রাক্ষসকে। একটু পরেই কিন্তু বুঝতে পারলেন ওটা মেঘ নয়, ওটা অপরূপ একটা সাদা ওড়না। তারপরই দেখতে পেলেন তরলার মাথাটা। সে কুষ্ঠ রাক্ষসের গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। দেখতে দেখতে তরলা মিলিয়ে গেল। তারপর এল তুহিনা, তার ওড়নাও সাদা, কিন্তু সে অন্যরকম সাদা, বরফের উপর যেন জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হচ্ছে। তুফানী এল জরদারঙের ওড়নায় সেজে, হাওয়া এল হাওয়ার মতোই, তার ওড়না স্বচ্ছ। সবশেষে এল হিল্লোলা

সোনালী মেঘের মতো ভাসতে ভাসতে। সবাই তারা একে একে চুম খেয়ে গেল কুষ্ঠরাক্ষসকে। হাততালি দিয়ে হেসে উঠলেন রুদলবাবু।

"এইবার দেখুন, রাক্ষস কোথা?"

বিশ্বদীপ দেখলেন কন্দর্পকান্তি সুপুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন একজন।

"ভয় ভালবাসা হয়ে গেল। এইবার বল কি খাবে? মুরুব্বী, খাওয়ার আয়োজন করেছ তো—"

এতক্ষণ যে গাছটি রাজছত্রের মতো পিছনে দাঁড়িয়েছিল সে হঠাৎ রূপান্তরিত হল মুরুব্বীতে।

"সব রকম। স্বয়ং দ্রৌপদী এসে রান্নার ভার নিয়েছেন"

"দ্রৌপদীকে পেলে কোথা থেকে?"

"তিনি নিজেই এসেছেন। বললেন, মহাপ্রস্থানের পথে যেতে যেতে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন। কেউ তাঁর দিকে ফিরেও তাকায়নি। তাই তিনি মনের দুঃখে মর্ত্যের সমতলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ভাবছিলেন কোনও গরীব গৃহস্থের ঘরে দাসীবৃত্তি করে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। বললেন, রানী হয়ে দেখলাম কোন সুখ নেই। দাসী হয়ে দেখি যদি সুখ পাই। তোমাদের মানসপুরের কাছাকাছি আসতেই অদ্ভুত একটা টান অনুভব করলাম। কে যেন আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এল। আমি তখন সবিনয়ে বললাম— আমরা ভালবাসার অদৃশ্য জাল বিছিয়ে দিয়েছি যে চারিধারে। আপনি হয়তো সেই জালে পা দিয়েছিলেন। দ্রৌপদী খানিকক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, আমাকে কি আপনারা দাসী করে রাখবেন? আমি বললাম, এখানে রাজা-প্রজা-মনিব চাকর কিচ্ছু নেই। আপনি যেভাবে থাকতে চান সেইভাবে থাকতে পারবেন। আজ আমাদের এখানে একটা ভোজ আছে, আপনি এসে গেছেন ভালই হয়েছে। দ্রৌপদী একটু হেসে বললেন, বেশ তো চলুন আপনাদের রান্নাঘরটা কোথা—"

কলিং বেলটা বেজে উঠল। ছকু এসে বলল, "ডাক্তার ঘোষাল এসেছেন।"

ডাক্তার ঘোষাল এসে ঢুকলেন, এক হাতে এক শিশি ওষুধ আর এক হাতে একটা ছবি।

"মাপ করবেন, অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছি বলে চলে এলুম। এই আপনার ওষুধ, দরকার হলে রাত্রে এক দাগ খাবেন। দু'ঘণ্টার মধ্যে যদি ঘুম না হয় তাহলে আর এক দাগ খাবেন। ওষুধটা পাঠিয়ে দিতে পারতুম, কিন্তু আমাকে আসতে হল এই ছবিটার জন্যে। দেখুন—"

বিশ্বদীপ দেখলেন, একটি নধর গাভীর ছবি। তার পাশে দুটি বাছুর রয়েছে। একটি ছোট, খুব ছোট, মনে হয় সদ্যপ্রসূত; আর একটি বড়।

"যে আর্টিস্টের কথা সেদিন বলেছিলাম তারই আঁকা এই ছবি। ছবির সঙ্গে একটি চিঠিও পাঠিয়েছে। সেটি পড়ে শোনাচ্ছি—

মান্যবরেষু,

ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে বুধী নামে একটি গাই ছিল, তার দুটি বাছুর হয়েছিল। দুটি বাছুরকেই খুব ভালবাসতাম আমি। অবস্থা বিপর্যয়ে তাদের হারিয়েছি, কিন্তু বাছুর দুটির কথা আজও আমার মনে পড়ে। আজ একটা কথা ভেবে অবাক্ লাগছে। বাছুর দুটোর বাপ কে

ছিল তা নিযে মাথা ঘামাইনি কখনও। আজ ওদেব ছবি এঁকে পাঠালাম, কাবণ গত ববিবাবে আলেযাব আব একটি ছেলে হযেছে। ধপধপে ফবসা সুন্দব ছেলে। আমি জানি ও আমাব ছেলে নয। আব একটা ল্যাববেটবি থেকে আমি সিমেন পবীক্ষা কবিযেছিলাম। ইনজেকশনে কোনও ফল হযনি। আপনি জানতেন কোনও ফল হবে না, তাই ইনজেকশনেব দাম নেননি, আব আমাকে আশ্বাস দিযেছিলেন এইবাব ঠিক হযে গেছে। আপনি মহৎ, আপনাকে প্রণাম জানাই। কিন্তু আমাকে মিথ্যা আশ্বাস দেওযাব দবকাব ছিল না, আমাব ভাগ্যকে আমি মেনে নিযেছি। শুধু তাই নয, যে বিধাতা আমাকে এত দুঃখকষ্টেব মধ্যে ফেলেছেন তাকে আমি একটি জিনিসেব জন্য প্রত্যহ প্রণাম কবি। তিনি আমাকে ভালবাসবাব ক্ষমতা দিযেছেন। আমি আলেযাকে ভালবাসতে পেবেছি। আলেযা তো অনেক জিনিসই বাইবে থেকে আনে নিজেকে অলংকৃত কববাব জন্য। বাজাব থেকে ফুল আনে, এসেন্স আনে, নিজেব পছন্দমতো জামাকাপড আনে, আযনা, সাবান, ফুলদানী আনে, ছেলে দুটোকেও না হয এনেছে কি হযেছে তাতে। ও নিযে আমি মোটেই মাথা ঘামাই না যেমন ঘামাতুম না বুধীব বাছুবেব বেলায। হযতো আমাব উপমাটা ঠিক হচ্ছে না, তবু ওই উপমাটা আমাব খুব লাগসই মনে হযেছে। আমাব বিশ্বাস আছে ছেলে দুটিকেও আমি ভালবাসতে পাবব। এই ছবিটি আপনাকে উপহাব দিলাম। আমাব অনেক ছবি আপনি কিনেছেন, এটা আপনাকে উপহাব দিচ্ছি। আমাব প্রণাম গ্রহণ করুন। আমি কাল আপনাব সঙ্গে দেখা কবব। ’

ডাক্তাব ঘোষাল এই পর্যন্ত পড়ে থেকে গেলেন।

“নামটা আমি প্রকাশ কবব না। You may guess anything আমাব এখন বসবাব সময নেই। অনেক রুগী বসে আছে। তাছাডা একটা অস্ট্রেলিযা ফেবত ইনজিনিযব ছোকবা ফিঙেব মতো আমাব পিছুতে লেগেছে, সে আমাকে বোঝাতে চায যে বাডিটা ঠিক লেটেস্ট স্টাইলে হযনি। I hate latest style. কিন্তু সেকথা ওব মুখেব উ ন বলতে পাবছি না, আমাব এক বন্ধুব ছেলে। আচ্ছা চলি—”

ডাক্তাব ঘোষাল চলে গেলেন।

বিশ্বদীপেব হঠাৎ মনে পডল তিনি মানসপুবে কযেকটা ফোটো তুলেছিলেন— বংবাহাবীব, ধানক্ষেতেব আব মুরুব্বীব। তাডাতাডি ক্যামেবাটা নিযে চলে গেলেন ডার্ক রুমে। মনে পডল বংবাহাবীকে তিনি এখানে নিযে আসবেন বলেছিলেন, কিন্তু আনা হযনি। হযতো এখনও সে তাঁব অপেক্ষায সেই অন্ধকাব ঝোপে বসে আছে। ফোটোগুলো ডেভালাপ কবে দেখলেন একটা ফোটোও ওঠেনি। একটাও না। অথচ তাঁব ক্যামেবাটা খুব ভালো ক্যামেবা। হঠাৎ তাঁব ঘাডেব উপব থপ্‌ কবে কি একটা যেন বসল।

“ভয পাবেন না, আমি বংবাহাবী—”

“তুমি চলে এসেছ! কি কবে এলে?”

“আপনি মনে কবলেন যে। মুরুব্বী আমাকে খুব ভালো একটা উপায শিখিযে দিযেছে। মনে কবলেই আমি অন্ধকাব জাযগায চলে যেতে পাবি। যেখানে খুশি যেতে পাবি। যে অন্ধকাব ঝোপটায আপনি আমাকে নিযে গিযেছিলেন, সে বোজ আমাকে মনে কবে। বোজ

সেখানে যাই। আপনি আজ যেই আমাকে মনে করেছেন অমনি চলে আসতে পেরেছি। সিংহের কাছে গিয়েছিলাম একদিন, সে আপনার কথা বলছিল —"

হঠাৎ আবার ফোনটা বেজে উঠল। বিশ্বরূপ ডার্ক রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। কাঁধে হাত দিয়ে দেখলেন, বংবাহারী নেই।

ফোন করছিল শ্যামল সোম।

"ও, আপনি বাড়িতে আছেন? বিদুলা দেবী একটু আগে ফোন করেছিলেন আবার। আজ তাঁর বাড়িতে আমার একজন বন্ধুর স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার কথা আছে। চায়ের নিমন্ত্রণ আছে আমাদের সেখানে। বিদুলা দেবী বললেন, তিনি নিমন্ত্রণ করলে হয়তো আপনি যাবেন না, কিন্তু আমি বললে যাবেন। তাই ফোন করছি। আসবেন? বিদুলা দেবী একজন আর্টিস্টকেও খবর পাঠিয়েছেন আসবার জন্যে। খুব ভালো আর্টিস্ট নাকি- "

"নবনী দাস কি? আমি তাকে চিনি। সত্যিই বড় আর্টিস্ট। অনন্ত রায়? আপনার বাল্যবন্ধু? ও, না তাঁর সঙ্গে তো আলাপ নেই। অনঙ্গবাবুর সঙ্গেও নেই। সকলকে নিমন্ত্রণ করেছে বিদুলা? পাঁচটা? দেখি, শরীর যদি খারাপ না হয়, তাহলে যাব না, এখন বেশ ভালো আছি। খেয়ে আর একবার ঘুমোবার চেষ্টা করব। ইনসোমনিয়ার জন্যেই মাথাটা ধরেছিল। আচ্ছা, আচ্ছা—"

বিশ্বদীপ একটু উৎসাহিত বোধ করতে লাগলেন। ভিড়ের মধ্যে তিনি ভালোই থাকেন।

আবার ফোন বাজল।

"ও, বিদুলা? হ্যাঁ এক্ষুনি ফোন করেছিলেন শ্যামলবাবু। আমি বিকেলে যাব।'

"আমাকে খুশী করবার জন্যে আসবার দরকার নেই। শ্যামলবাবুকে আমি বলিনি তোমাকে অনুরোধ করতে। তিনিই কথাটা তুললেন, তখন আমি বললুম বলে দেখতে পারেন। আমার বলবার মুখ নেই কারণ নিমন্ত্রণ করলে উনি প্রায় আসেন না।"

বিশ্বদীপের মনে হল বিদুলার গলাটা যেন ধরা ধরা। বললেন, "যাব। আমি কেন যে যাই না তা তুমি জান, সময়ই পাই না। তাছাড়া, না, আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পাচ্ছি না, থাক। আজ যাব। হ্যালো, হ্যালো--"

বিদুলা ফোন ছেড়ে দিয়েছিল। চেয়ারে বসতেই বিশ্বদীপের মনে হল কার যেন একটা ছায়া পড়েছে দ্বারপ্রান্তে।

"কে ওখানে—"

সসংকোচে মহুয়া এসে দাঁড়াল।

"আপনি কেমন আছেন?"

"ভালো আছি। তোমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো—"

"না"

তারপর একটু থেমে সে বলল, "আমাদের সম্বন্ধে কি ঠিক হল শেষ পর্যন্ত? ধাকড় আর রামু এসেছিল একটু আগে। তারা বলছে সাহেব যখন ভরসা দিয়েছেন সব ঠিক করে দেবেন, তখন আমাদের আর চিন্তা নেই। আমরা কাজে জয়েন করছি—কাল"

"বেশ। পাঠকজি বাইরে গেছেন, তিনি আসুন। একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই।"

মহুয়া তবু দাঁড়িয়ে রইল।

"আরও কিছু বলবে?"

"যদি আপনি রাগ না করেন, বলি। আমি আর মিস্টার সিনহার অ্যাসিস্‌টেণ্ট হয়ে কাজ করতে চাই না। আমাকে অন্য কোনও একটা কাজ দিন। আমাকে আর যে কাজ দেবেন তাই আমি করতে পারব।"

"মিস্টার সিনহা যদি না থাকেন তুমি ল্যাবরেটরির কাজ চালাতে পারবে?"

"আমিই তো চালাই –"

"আচ্ছা, পাঠকজি আসুন। সে ব্যবস্থাও হবে।"

মহুয়া আস্তে আস্তে চলে গেল।

।। তেরো ।।

পাঠকজি, টমসন সাহেব আর টমসন পত্নী লিসি লাউপুরে পৌঁছে দেখলেন আদুবাবু নেই। কাছারিবাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন তাঁরা। পুরাতন চাকর বিরজু ছিল, সে-ই তাঁদের অভ্যর্থনা করল। সে বলল, "নায়েবমশাই এখনও কলকাতা থেকে ফেরেননি।" বলেই সে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে এমন একটা ভিজা বিড়াল গোছ ভাব করতে লাগল যে সন্দেহ হল পাঠকজির। তিনি তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে কাগজ পেনসিল বার করে টমসন সাহেবকে নির্দেশ দিলেন, "আপনি জিগ্যেস করুন থানা এখান থেকে কতদূর। আর বলুন যে আমরা আগে থানায় গিয়ে দারোগা সাহেবের সঙ্গে কথা বলে তারপর এখানে এসে ভাতেভাত বেঁধে খাব। ও যেন খানিকটা দুধ যোগাড় করে রাখে, আর উনুনটা জ্বেলে রাখে যেন—"

বিরজু সব শুনে বলল, "আমি পুরুষোত্তম সিংকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে সব ব্যবস্থা করবে—"

সে এমনভাবে চলে গেল যে মনে হল যেন পালিয়ে গেল। ভ্রূকুঞ্চিত করে পাঠকজি চেয়ে রইলেন সেদিকে। তারপর টমসনের দিকে চাইতেই তিনি দেখলেন, লিসি যে বাস্‌কেটটি সঙ্গে করে এনেছিলেন তার থেকে খাবার বার করছেন। চৌকির উপর খবরের কাগজ বিছিয়েছেন, তার উপর বিছিয়েছেন একটি ধপধপে সাদা ন্যাপকিন। প্লেটও দু'একটা বেরিয়েছে। পাঠকজির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বললেন, "আপনি খাবেন তো?"

পাঠকজি ঘাড় নেড়ে জানালেন খাবেন।

তারপর একটুকরো কাগজ বার করে লিখলেন, "খাব না একথা আপনার মাথায় এল কি করে। আমি স্বপাক খাই, হাঙ্গামা বাঁচাবার জন্যে। জাত বাঁচাবার জন্যে নয়। আর একটা কথাও জেনে রাখুন, আমি সর্বভুক। বিলেতে বীফ বেকন সব খেয়েছি। এখন অবশ্য কাঁচকলায় রুচি হয়েছে। আপনি কি এনেছেন?"

লিসি বললেন, "আলুসিদ্ধ, পাউরুটি, ডিমসিদ্ধ, আর জেলি। কয়েকটা আপেলও আছে।"

পাঠকজি লিখলেন, "তোফা হবে। আপাতত ওই খাওয়া যাক। পরে রান্নার ব্যবস্থা করা যাবে।"

খেতে খেতে টমসন জিগ্যেস করলেন, "একটা কথা জানতে চাই পাঠকজি। আশাকরি আমার এ কৌতূহল আপনি মার্জনা করবেন। বিশ্বদীপকে আমাদের কাছে রেখে আপনি তার বাবা মাকে নিয়ে চলে গেলেন। শুনেছিলাম অম্বরবাবুর এক বন্ধুর হীরের কারবার ছিল আফ্রিকায়, সেইখানেই কাজ নিয়ে—"

পাঠকজি লিখলেন, "ওসব কথা আমি কিছুই বলব না। বিশ্বদীপও জানে না। তাকে কিছুটা বলেছি, পরে সবটাই বলব, তার কাছ থেকেই শুনবেন। অম্বর আর দময়ন্তীর কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে তাদের কথা গোপন রাখব।"

"আপনি তো জানেন বিশ্বদীপকে আমার মা নিজের ছেলের মতো মানুষ করেছিলেন। ওকে আমি নিজের ভাইয়ের মতো মনে করি, ওর টানেই এদেশে এসেছি, এদেশে চাকরি করেছি, রিটায়ার করবার পরও যেতে পারিনি। আমাদেরও ছেলেমেয়ে কিছু হয়নি। বিশ্বদীপই আমাদের সব। কিছুদিন আগে লিসি একটা চিঠি পেয়েছে আফ্রিকা থেকে। সেখানে ওর এক বান্ধবী আছে। সে লিখেছে, অম্বরবাবুর নাকি কুষ্ঠ হয়েছিল এবং তিনি নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন—"

পাঠকজি আবার লিখলেন, "আমি কিছুই বলব না। বিশ্বদীপই সব কথা বলবে আপনাকে একদিন।"

এমন সময় পুরুষোত্তম সিং এসে হাজির হ'ল। তার নামটা যত জমকালো, চেহারাটা তত নয়। রোগা লিকলিকে চেহারা, মুখে সিংহের ছাপ নেই, মুখখানি যেন একটি কিশোরী মেয়ের। চোখের দৃষ্টিতে কৌতুক ও লজ্জা। মুখে বয়সের ছাপ পড়েনি। বয়স কত আন্দাজ করা যায় না। এসে প্রণাম ক'রে সসংকোচে দাঁড়িয়ে রইল একধারে।

পাঠকজি টমসন সাহেবের মারফত প্রশ্ন করলেন, "আদুবাবু কোথা?"

"আমি ঠিক জানি না। বিরজু ব'লে বেড়াচ্ছে তিনি কলকাতা থেকে ফেরেননি। কিন্তু আমি ইউসুফ মিঞার কাছ থেকে খবর পেয়েছি তিনি কাল ফিরেছেন।"

"ইউসুফ মিঞা কে?"

"এখানে তাঁর আবগারির দোকান আছে। আদুবাবু সেখান থেকে গাঁজা কেনেন"—বলেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল সে।

টমসন সাহেব ও লিসি হেসে ফেললেন। পাঠকজির মুখ কিন্তু আরও গম্ভীর হয়ে গেল, চোখের দৃষ্টি থেকে ছুটে বেরুল আগুন।

টমসন জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি এখানে কি করেন?"

"আমি এখানকার পাঠশালার পণ্ডিত। বিশ্বদীপবাবুই স্কুল স্থাপন করে আমাকে এখানে

বহাল কবে গেছেন। আব একটা অদ্ভুত কাজও দিয়ে গেছেন আমাকে। এ অঞ্চলের যত কুষ্ঠরোগী আছে তাদের খাওয়া-পরা আব চিকিৎসাব ব্যবস্থা কবতে হয় আমাকে। বেশী রোগী অবশ্য নেই, তিনটি আছে। এখানে ডাক্তারও নেই। আমিই আনড়ার ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিয়ে ওষুধ নিয়ে আসি। আনড়া এখান থেকে দশ মাইল দূরে। এজন্য বিশ্বদীপবাবু আমাকে মাসে একশ' টাকা নিতে বলেছিলেন আদুবাবুর কাছ থেকে। কিন্তু আদুবাবু কিছুই দিতে চান না—"

কথাটা বলেই পুরুষোত্তম যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ল। তাবপব প্রসঙ্গ পবিবর্তন কবে বলল, "আপনাদেব জন্য কি কবতে হবে বলুন, আমি সব কবে দিচ্ছি"

টমসন সাহেব বললেন, "শুনলাম, এখানে নাকি দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়ে গেছে খুব। থানাটা কত দূরে—"

"থানা খুব বেশী দূরে নয়, কিন্তু কোনও দাঙ্গাহাঙ্গামা কথা তো শুনিনি"

টমসন সাহেব বললেন, "চলুন, তাহলে থানাটাই ঘুবে আসা যাক প্রথমে। সেইখানেই সব খবব পাওয়া যাবে।

খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, তিনজনেই পুরুষোত্তম সিংহেব সঙ্গে থানা অভিমুখে বওনা হ'যে গেলেন।

তাঁবা চলে যাওযাব একটু পবেই কাছাবিবাড়িব কোনের দিকের একটা ঘরেব জানলা খুলে গেল এবং দেখা গেল আদুবাবু সেই জানলা দিয়ে উকি মাবছেন। তারপব তিনি সন্তর্পণে বেবিয়ে এলেন ঘব থেকে। বাবান্দাব এক কোণে এক বাইক ঠেসানো ছিল। সেইটেতে চড়ে' উধাও হ'যে গেলেন তিনি নিমেষে। পাঠকজিবা যেদিকে গেছেন ঠিক তার উল্‌টো দিকে গেলেন।

থানাব দিকে যেতে যেতে পুরুষোত্তম সিংহ আব একটি খবর বললে যা পাঠকজি ইতিপূর্বে শোনেননি। এটা অবশ্য আশ্চর্য কিছুই নয়, পাঠকজি লাউপুরের ব্যাপাব নিয়ে মাথাই ঘামাননি কোনদিন। বিশ্বদীপই যা করবাব করেন। পুরুষোত্তম সসংকোচে বলল, বিশ্বদীপবাবু যখন এখানে এসেছিলেন তখন তিনিই আমাকে এখানকার ম্যানেজার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাতে রাজী হইনি। কারণ, আমি জানি আমি আদুবাবুর সঙ্গে পারব না। তবে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি যাতে ওঁর জমিদারির কাজকর্ম ভালভাবে চলে। আদুবাবুকে কিন্তু পেরে ওঠা শক্ত। উনি কখন কোন দিক দিয়ে কি যে ক'রে ফেলেন কিছু বুঝতে পারি না। এই দেখুন না, দাঙ্গাহাঙ্গামা কিছু হয়নি অথচ আপনাদের এখানে অনর্থক টেনে এনেছেন।"

থানায় গিয়ে দেখা গেল থানার দারোগা চিৎবিহারী চৌধুরী টমসন সাহেবের পূর্বপরিচিত। টমসন সাহেব যখন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ছিলেন তখন তিনি নাকি কনেস্টবল হয়ে বহাল হন। টমসন সাহেব যদিও চিনতে পারলেন না তাঁকে, কিন্তু তিনি টমসন সাহেবকে দেখে গদ্‌গদ, অভিভূত, উচ্ছ্বসিত, কৃতার্থ—ওই ধরনের যত রকম হওয়া সম্ভব তা হলেন এবং করজোড়ে

দাঁড়িয়ে একটি কথাই বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে লাগলেন, "আপনি দেবতা, আপনি যে এখানে আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন তা আমাব স্বপ্নাতীত ছিল।" খুব খাতির করে সাড়ম্বরে বসালেন সকলকে। দাঙ্গাহাঙ্গামার কথা শুনে বললেন, "না সে সব কিছু হয় নি। কিন্তু একটা জিনিস হয়েছে যা আরও সাংঘাতিক। আদুবাবু পাগল হয়ে গেছেন। অনেকদিন থেকেই সন্দেহ করছি ব্যাপারটা, কিন্তু এখন আর সন্দেহ নেই"

"কোথায় তিনি—"

"ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন চারিদিকে। আমি লোক পাঠাচ্ছি তাঁকে ধরে আনতে। ধরেই আনতে হবে, কারণ এমনিতে তিনি আসবেন না।"

বেরিয়ে গেলেন তিনি এবং দু'জন কনেস্টবলকে বললেন আদুবাবুকে ধ'রে আনতে।

সকলকে সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজন কববার জন্যে সাগ্রহে আমন্ত্রণ করলেন তিনি। কিন্তু পাঠকজি ঘনঘন মাথা নাড়াতে টমসন সাহেব বললেন, "আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু পাঠকজি স্বপাক খান। আমরাও ওঁর সঙ্গে খাব। আপনি আমাদেব আদুবাবুব সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন তাড়াতাড়ি।"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই। সেটা তো আমার কর্তব্য। আপনারা অন্তত একটু কবে প্রসাদ খেয়ে যান। আমাব ঠাকুরেব প্রসাদ। এই ঘরে আসুন।"

পাশেব একটি ঘরে প্রবেশ করেই তাঁরা প্রথমে দেখতে পেলেন প্রকাণ্ড একটি ছবি। হৃষ্টপুষ্টকায় ভুঁড়ি-ওলা টাক-মাথা বিরাটদেহ প্রখরদৃষ্টি ব্যক্তিটি নীবব ভাষায় যেন বললেন, "ও, তোমরাও এসেছ। আসবেই জানতাম—"

চিৎবিহারী বললেন, "আমার গুরুদেব ঘনিষ্ঠানন্দ পুরী। আমি রোজ এঁর পুজো কবি। কিছু প্রসাদ খান।"

প্রসাদে আপেল খোবানি আঙুর জাতীয় ভালো ভালো খাদ্যই ছিল। পাঠকজি কিন্তু প্রসাদও নিলেন না। তিনি মাথা নেড়ে হাতজোড় করলেন। টমসন এবং লিসি খেলেন একটু একটু।

ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এসে টমসন বললেন, মিস্টাব চৌধুরী, কিছু মনে কববেন না। আপনার গুরুদেবকে দেখে আমার একটা মুখ মনে পড়ে গেল। আমি যখন মধ্যপ্রদেশে ছিলাম তখন ঠিক এই চেহারার একটি ডাকাত ধরেছিলাম তার নামে অনেকগুলো খুনের চার্জ ছিল, তার ফাঁসি কিন্তু হয়নি। ঠিক এই চেহারা। চেহারার মিল অবশ্য থাকে, কিন্তু এরকম মিল আমি দেখি নি—"

চিৎবিহারী একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "ইনি চিরকাল হিমালয়ে কাটিয়েছেন। দৈবাৎ একবার কুম্ভমেলায় আমার সঙ্গে দেখা হয়, তারপর থেকে আমি এঁর সঙ্গ ছাড়িনি। অনেকদিন পরে যমুনোত্রীর মন্দিরে আমাকে উনি দীক্ষা দেন। অনেকদিন আমাকে ঘুরিয়েছিলেন। হিমালয়ের এক গুহায় উনি সম্প্রতি দেহরক্ষা করেছেন—"

লিসি এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি।

বললেন, "উনি যদি ডাকাতও হতেন তাহলেও আমরা ওঁকে অশ্রদ্ধা করতাম না।

বামাযণেব মহাকবি বাল্মীকি তো দস্যু ছিলেন। দস্যুও ঋষি হ'তে পাবেন একথা আমবা মানি -"

"আচ্ছা, এবাব তাহলে যাওযা যাক- -"

পাঠকজিব মুখভাব লক্ষ্য কবে টমসন আব থাকতে চাইলেন না। কাছাবিতে ফিবে গিযে তাঁবা দেখলেন দুটো কযলাব উনুনে আঁচ এসে গেছে এবং বিবজু তাঁদেব আগমন প্রতীক্ষায দাঁড়িযে আছে। একটু পবেই পুরুষোত্তম নানাবকম তবকাবি, চাল, ডাল, বাসনপত্র নিযে হাজিব হযে গেল। সে ওঁদেব থানায পৌঁছে দিযেই চলে এসেছিল। টাটকা মাছও এনেছিল সে কিছু।

পাঠকজি একটি কাগজেব টুকবায লিখলেন—"আজ শুধু ভাতেভাত খাব না। ডালেব ছেঁচকি কবব, বেসন দিযে কুমড়োফুল ভাজা, আব মাছেব ঝাল। আশা কবি আপনাদেব সম্মতি আছে--"

টমসন ও লিসি সানন্দে সম্মতি জানালেন।

বিকেলেব দিকে দাবোগা চিৎবিহাবী চৌধুবী এলেন। এসে বললেন, "আদুবাবুকে ধবেছি, কিন্তু তাকে আনা গেল না, কাবণ তাঁকে বেঁধে বাখতে হযেছে। তাঁব নিজেব বাড়িব একটা ঘবেই আছেন তিনি। আপনাবা যদি দেখতে চান, চলুন -দুটো পালকি আসছে। হেঁটে আপনাবা যেতে পাববেন না, বাস্তা ভালো নয"

পালকি কবেই গেলেন তাঁবা। গিযে দেখলেন দাবোগাবাবু আগেই পৌঁছে গেছেন সাইকে কবে। পালকি থেকে নেমেই স্তম্ভিত হযে দাঁড়িযে পড়তে হল তাঁদেব। বাড়িব ভি[illegible] থেকে কান্নাব হাহাকাব উঠছে।

চিৎবিহাবী বললেন, "আসুন, এই ঘবে—"

বাবান্দাব দিকে একটি ঘবেব তালা খুললেন তিনি।

"আসুন —"

ভিতবে গিযে দেখা গেল বক্তচক্ষু আদুবাবুব দুটি হাত পিছমোড়া ক'বে জানলাব সঙ্গে বাঁধা বযেছে। এঁদেব দেখে ডাক কবে লাফিযে উঠলেন তিনি। তাবপব বললেন, "এসেছেন হুজুববা। আসুন, আসুন। দেখুন আমি কেবল নৌকো বাইছি। সংসাব তবণী। বিবাট তুফান। তবু থামিনি। হেঁইও হেঁইও। হুঁশিযাব, খববদাব। হেঁইও হেঁইও। সাতটি জোযান মেযে আইবুড়ো হযে বসে আছে। একটি আধটি নয, সেভেন। বড়টাকে কাঁধে নিযে ফেবিওলাব মতো ঘুবে বেড়াচ্ছি দ্বাবে দ্বাবে। কোথাও পাত্তা পাচ্ছি না। মহৎ বাঙালী সমাজ, উচ্চশিক্ষিত বাঙালী সমাজ, অগ্রণী বাঙালী সমাজ, কিন্তু কলকেটি কেউ দেয না। মিনিমাম পাঁচ হাজাব। তাই দাঙ্গাহাঙ্গামা, ফৌজদাবী ইত্যাদি ইত্যাদি। হেঁইও হেঁইও, মাবো জোযান হেঁইও—"

আদুবাবু দুলতে লাগলেন, যেন তবঙ্গতাড়িত নৌকোতে ব'সে আছেন।

পাঠকজি ভ্রূকুঞ্চিত কবে দাঁড়িযে বইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপব সবাই বেরিয়ে এলেন ঘব থেকে। ফিববার মুখে লিসি টমসনকে বললেন, "তুমি বলছিলে কলকাতায় বসে বসে

তোমার ভালো লাগছে না। আমারও লাগছে না। এসো না এখানে এসে আমরা থাকি। এখানে অনেক কাজ করতে পারব। বিশুরও উপকার হবে, আমরাও কাজ পাব।"

"খুব ভালো হয়। দেখি বিশু কি বলে।"

কাছারিতে ফিরে এসেই পাঠকজি একটুকরো কাগজে লিখলেন—"আপনারা সত্যিই যদি এখানে থাকতে পারেন তাহলে মস্ত বড় একটা সমস্যার সমাধান হয়। বিশু রাজী হবে, আমারও আপত্তি নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, আপনারা থাকতে পারবেন কি? আমার মনে হচ্ছে আদুবাবু পাগলামির অভিনয় করছেন আর দারোগা চিৎবিহারীর সঙ্গে তার ষড় আছে।"

টমসন বললেন, "সে সন্দেহ আমারও হয়েছে। তাই আরও মনে হচ্ছে যে, আমাদের আসা দবকার। কলকাতায় ফিরে যা হয় ঠিক করা যাবে।"

।। চোদ্দ ।।

সেদিন বিদুলাব বাড়িতে আড্ডাটা খুব জমেছিল। বিশ্বদীপও গিয়েছিলেন, যদিও একটু দেরিতে। বিদুলা তাঁর আশেপাশে ঘুরছিল একটা রঙীন প্রজাপতির মতো, যা বলছিল তা বুঝতে পারছিলেন না বিশ্বদীপ, মনে হচ্ছিল একটা নতুন ছন্দ যেন ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বিদুলা যখন টেবিলে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য আলাদা একটা সোনালী পিয়ালাতে চা ঢালছিল তখন বিশ্বদীপের মনে হচ্ছিল সে যেন নেই, তার একটা প্রতিচ্ছবি, তার একটা প্রতীক যেন দাঁড়িয়ে চা ছাঁকছে। তাঁর মনের যে অন্তরতম লোকে তিনি নিয়ে যেতে চান বিদুলাকে, বস্তুত যেখানে না নিয়ে যেতে পারলে বিদুলাকে পাওয়াই যায় না, এবং যেখানে যাবার জন্য বিদুলাও বোধ হয় উৎসুক সেই অন্তরতম লোকের পথে দাঁড়িয়েছিল সিংহ। তার গায়ে সেই শতচ্ছিন্ন বহুবর্ণবিচিত্র ময়লা আলখাল্লা, কাঁধের সেই লাঠিটার দু'ধারে ঝুলছে তার সংসার, আর তার দৃষ্টিতে অদ্ভুত একটা নির্বাক প্রশ্ন—এখানে ওকে আনবে? না, বিশ্বদীপ সহজ হতে পারছিলেন না বিদুলার কাছে। বিদুলাও পারছিল না। বিশ্বদীপের মনে হচ্ছিল বিদুলা একটা অদৃশ্য দেওয়ালের গায়ে মাথা খুঁড়ছে, আলোর মতো স্বচ্ছ আর হীরের মতো কঠিন দেওয়ালটা. দেওয়াল বলে বোঝা যায় না, কিন্তু বিদুলা বুঝেছে, সেই দেওয়ালটার উপর মাথা খুঁড়ছে সে। অসহায় হয়ে পড়েছে, বিশ্বদীপ বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু বিদুলার অসহায় ভাব আর কেউ দেখতে পায়নি। শ্যামল সোমের সঙ্গে বিদুলা সোৎসাহে কাব্য আলোচনা করছিল, আর্টিস্ট নবনী দাসকে সে বুঝিয়ে দিচ্ছিল ঠিক কি রকম করে তার বইয়ের ছবি আঁকতে হবে। অনঙ্গ সেনের দোকানে নতুন কি কি বই এসেছে তা জানতে চাইছিল আগ্রহভরে। বলছিল—"আপনি যেটা নিজে পড়ে আমাকে কিনতে বলবেন সেইটে কিনব। সমালোচকদের কথায় বিশ্বাস করে অনেকবার ঠকেছি"—তারপর হেসে উঠেছিল তার অনবদ্য কলকণ্ঠে। অনন্ত রায় সাদামাটা গেঁয়ো লোক, সে একটু দূরে দূরেই সরে থাকতে চাইছিল, কিন্তু বিদুলা ছাড়েনি তাকেও। বলছিল, "ময়দার সঙ্গে বেসন মিশিয়ে যদি পাউরুটি করা যায় তাহলে কেমন হয়।" পাউরুটির গল্পই করতে লাগল সে নানা ছাঁদে। কিন্তু বিশ্বদীপ বুঝতে পারছিলেন বিদুলা অসহায় হয়ে পড়েছে, সে ওই অদৃশ্য কঠিন স্বচ্ছ দেওয়ালে মাথা

খুঁড়ে যাচ্ছে—তাই বিজনবালার সঙ্গে তার আলাপে অত উচ্ছ্বাস, অত বিস্ময়, মেকি-আন্তরিকতার অত ছড়াছড়ি। বিজনবালা মেয়েটিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বিশ্বদীপের। দেখতে কুৎসিত বলে নয়, বিজনবালাকে দেখে তাঁর মনে হচ্ছিল একটা কাক যেন কাকতুয়া বলে পরিচিত করতে চাইছে নিজেকে। আর বিদুলা তার সঙ্গে এমনভাবে কথা কইছিল যেন অমন কাকাতুয়া আর সে দেখেনি। কিন্তু বিশ্বদীপ অনুভব করছিলেন—ও অসহায়ভাবে মাথা খুঁড়ে চলেছে খালি, কঠিন স্বচ্ছ দেওয়ালটার কাছে কিছুতেই পরাভব স্বীকার করতে চাইছে না, ঢেকে রাখতে চাচ্ছে নিজেকে, বিশ্বদীপের কাছে কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে না। কিন্তু বিশ্বদীপ সব বুঝতে পেরেছিলেন, তার গল্প গান হাসির অন্তরালে দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি অসহায় বিদুলাকে। বিদুলাও কি তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল? এইসব স্বপ্নের ভিড়েই পথ হারিয়ে ফেলছিলেন তিনি বারবার সেদিন। তবু মাঝে মাঝে শ্যামল সোমের কবিতার লাইনগুলোই যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তাঁকে বিদুলার কাছাকাছি। বিশেষতঃ এই লাইনগুলো ঃ তোমার কাছে এসে দেখি আরও দূরে চলে গেছি। তোমার কাছে যে পথ দিয়ে আসা যায় তার মাপ মাইল দিয়ে হয় না, তার মাপ মুহূর্ত দিয়ে, যে মুহূর্ত অসীমকে সীমার মধ্যে আনে, যে মুহূর্তের মধ্যবিন্দুতে অনাদি অনন্ত আলিঙ্গনবদ্ধ হ'য়ে আছে, যে মুহূর্তে স্বার্থ নিঃস্বার্থ অবলুপ্ত হয়ে রূপান্তরিত হয় অরবিন্দের সুষমায়—সে মুহূর্ত এখনও আসেনি। তাই তোমার অতি কাছে এসেও মনে হচ্ছে অনেক দূরে আছি। সে মুহূর্ত, সেই অসম্ভব বিস্ময় এখনও সম্ভব হয়নি। তাই তুমি দূরে আছ। বিশ্বদীপের মনে হচ্ছিল তারই মনের কথা যেন বাজছে শ্যামল সোমের কবিতার সুরে। বিদুলা মুগ্ধ হবার চেষ্টা করছিল, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল, শ্যামলকে রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বলতেও বাধছিল না তার—কিন্তু বিশ্বদীপ অনুভব করছিলেন বিদুলা ওই দুর্ভেদ্য দেওযালটার সামনে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেবল, তার কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে। অনঙ্গ সেনও একটা মজার কথা বলেছিল। বলেছিল, আমরা সবাই স্লেভ (slave), পোশাক-পরিচ্ছদে বড়লোকের নকল করি, লোক-লৌকিকতাতেও তাই, আমাদের প্রেমনিবেদনেও অনন্যতা নেই, সেই ফুল ছবি কবিতা চলেইছে তো চলেছে, সাহিত্যের রুচির ক্ষেত্রেও তাই। যেহেতু নেহরুর টেবিলে রবার্ট ফ্রস্টের দু'লাইন কবিতা পাওয়া গেছে অমনি সঙ্গে সঙ্গে রবার্ট ফ্রস্টের ভক্ত হয়ে উঠল অনেকে। হুহু করে ওর বই বিক্রি হচ্ছে। আমাদের slave হওয়ার দিকেই প্রবণতা বেশী, তাই বোধ হয় প্রেমের পথে ভক্তিই শেষ কথা। মীরা তো স্পষ্ট করে বলেই গেছেন—ম্যয় নে চাকর রাখো জী! শ্যামল মনে হচ্ছে এখনও কোথাও আত্মসমর্পণ করেনি, কারণ কবিতায় ও এখনও যুক্তির অবতারণা করছে! কবিতাটা ভালো, কিন্তু ওতে চিঁড়ে ভিজবে না, অবশ্য শ্যামল যে কোন চিঁড়ে ভেজাবার চেষ্টা করছে তা আমি বলছি না। বিশ্বদীপের দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল অনঙ্গ সেন। সায় দিয়ে বিশ্বদীপও হেসেছিলেন একটু অনন্ত বললে—লোকে যখন অভিভূত হ'য়ে পড়ে তখনই slave হয়। আমার দোকানের পাশে ওই যে রোগা হোমিওপ্যাথ ডাক্তারটা আছে, কুঁজো হয়ে ময়লা টেবিলটার পাশে বসে থাকে, ছোট্ট একটু ছাগলদাড়ি আছে, চোখের কোণে পিঁচুটি, আধময়লা জামা-কাপড়—হঠাৎ একদিন দেখলাম এক হোমরাচোমরা ধনী মাড়োয়ারী তার slave হয়ে গেছে। হাতজোড় ক'রে এসে বসে থাকে

প্রায়ই। শেঠজির নাকি কুষ্ঠ হয়েছিল, ডাক্তারবাবুর দু'ফোঁটা ওষুধে সেরে গেছে। উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বদীপ। তখনই ইচ্ছে করছিল ডাক্তারের নাম ঠিকানাটা টুকে নিতে। কিন্তু সাহস হ'ল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা মতলবও ফেঁদে ফেললেন মনে মনে। ভাবলেন—শ্যামল, অনঙ্গ আর অনন্তকে তিনি নিজের গাড়ি করে পৌঁছে দেবেন, আর সেই সময় দেখে আসবেন ডাক্তারবাবুর দোকানটা। কাষ্ঠমুখ নবনী দাস আর্টিস্ট একধারে চুপ করে বসে ছিল। সে অনুভব করেছিল বিদ্যায় বুদ্ধিতে সে এদের সকলের চেয়ে অনেক ছোট। সাহিত্য, কবিতা প্রভৃতি নিয়ে যে সব আলোচনা চলছে সে সব আলোচনায় যোগ দেবার তার অধিকার নেই—এ কথা সে জানত তাই চুপ করে ছিল। আর একটা কারণেও চুপ করে ছিল সে। সে জানত যে বিশেষ জগতে তার নিজের কৃতিত্ব আকাশচুম্বী সে জগতে এঁদেরও প্রবেশাধিকার নেই। অথচ এঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের মহাসমঝদার বলে মনে করেন এবং সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা এঁদেরই মন রেখে তাকে গ্রাসাচ্ছাদান সংগ্রহ করতে একটা কফি করে দিই? শিঙাড়াগুলো গরম আছে এখনও। খাবে?"

"দাও—"

বিশ্বদীপ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অবলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল বিদুলার ড্রইংরুম। মানসপুরে চলে গিয়েছিলেন তিনি।

মানসপুরে গিয়ে প্রথমেই দেখা হল বধূসরার সঙ্গে। বধূসরা একটা তমালগাছের তলায় উন্মনা হয়ে বসে ছিল দূরের দিকে চেয়ে। বিশ্বদীপ তাকে দেখে চমকে গেলেন। বধূসরা, না বিদুলা? আশ্চর্য, বিদুলার মুখের একটা আদল পড়েছে বধূসরার মুখে। বিস্মিত হয়ে বধূসরার দিকে চেয়ে রইলেন বিশ্বদীপ। দিগন্তের দূর পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে কি ভাবছে বধূসরা? অনেকক্ষণ বিশ্বদীপের মুখে কোনও কথা সরেনি। বধূসরাও টের পায়নি কিছু। এমনিভাবেই হয়তো অনেকক্ষণ কেটে যেত। কিন্তু গাছের উপর জংলাশাড়ি-পরা কোকিল বধূ হঠাৎ জোরে খিকখিক করে হেসে উঠল। চমক ভেঙে গেল বধূসরার। সে ঘাড় ফিরিয়ে বিশ্বদীপকে দেখে একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল।

"আপনি কতক্ষণ এসেছেন—"

"এই তো আমি এলাম—"

"পাহাড়ের দিকে অমনভাবে চেয়েছিলেন কেন—কি দেখলেন ওখানে"

চুপ করে রইল বধূসরা কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, "পাহাড়ের ওপারে সমুদ্র আছে।" বলেই চুপ করে গেল আবার।

তারপরই বিশ্বদীপের মনে হল বধূসরার সমস্ত সত্তা গান গাইছে। সে গানের ভাষা নেই তবু তা শোনা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে, এমন কি দেখাও যাচ্ছে। তমালগাছের পাতাগুলো কাঁপছে থরথর করে, জংলাশাড়ি-পরা কোকিল-বধূ হঠাৎ উড়ে চলে গেল যেন নিরুদ্দেশ যাত্রায়, নওরঙ্গী আর সোনা-হলুদ সবুজ নলখাগড়ার পাতায় বসে আস্তে আস্তে ডানা খুলছে আর মুড়ছে, একঝাঁক বাঁশপাতি দল বেঁধে উড়ে বেড়াচ্ছে যেন সবুজ আশার মতো। আকাশের মেঘের দল স্বপ্নাচ্ছন্ন, মাঠের আল ধরে সারি সারি পোকার দল চলেছে। লাল -

ফুটকি, নীল ফুটকি সবাই চলেছে। চলেছে সেইখানে যেখানে সবাই যেতে চায় কিন্তু পৌঁছতে পারে না... যেখানে শুধু গান পৌঁছয়। বধূসরার সমস্ত সত্তা গান গাইছে। সে গান বিশ্বদীপও স্পষ্ট বুঝতে পারলেন। বধূসরার সমস্ত সত্তা যেন বলছে—ওগো সাগর, শুনেছি, তুমি অগাধ, অপাব, অতল, বিশাল, বিবাট; শুনেছি আকাশের সঙ্গে তোমার মিতালি, শুনেছি তুমি বত্নাকর, শুনেছি তুমি বহুবল্লভ, অসংখ্য নদীর কল্লোলিত কামনা চবিতার্থ করেছ তুমি, আবও কত কি শুনেছি... এর পর বধূসবার গান আর বোঝা গেল না। মনে হল গানের উপর যেন আছড়ে পড়ছে অসংখ্য ঢেউ, সমুদ্রের কল্লোলে যেন ঢেকে যাচ্ছে সব। বধূসরার মনের শেষ কথাটি যেন শেষ হয়েও যাচ্ছে না।

হঠাৎ বিশ্বদীপ দেখতে পেলেন—পাহাড়গুলোর কুষ্ঠ হয়েছে। বড় বড় ঘা দগদগ করছে ওদেব সর্বাঙ্গে।

"ও কি, এক কামড় খেয়েই যে থেমে গেলে। বাকিটা খাবে না? ভালো হয়নি বুঝি—"

বিশ্বদীপ অপ্রস্তুতমুখে বাকি আধখানাও খেয়ে ফেললেন।

"শুধু ভালো নয়, চমৎকার হয়েছে, দাও, আবও খাব"

গপগপ কবে খেতে লাগলেন। অবাক হয়ে দেখতে লাগল বিদুলা। হঠাৎ তাব চোখে জল এসে পড়ল। সে যেন নিঃসংশয়ে বুঝতে পারল বিশ্বদীপ যা করছে তা স্বাভাবিক নয়। ও যেন তাব নাগালেব বাইবে চলে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বদীপ ফেববাব সময় অনঙ্গ, শ্যামল, অনন্ত আব বিজনবালাকে নামিয়ে দিযে এলেন তাদের বাড়িতে। অনন্ত তার দোকানেই নেমে গেল। বিশ্বদীপ তার দোকানের সামনে সেই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারটিকেও দেখলেন। ছোট্ট ছাগলদাড়ি আছে (ইংরেজিতে যাকে বলে 'গোটি')—বকের মতো একাগ্র মুখভাব। একাগ্র দৃষ্টি পুস্তকে নিবদ্ধ। ছোট্ট মানুষটি। চোখে মুখে নাকে কেমন যেন একটা তীক্ষ্ণ ছুঁচের ভাব।

বিজনবালাকে যখন নামিয়ে দিলেন তখন সে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। বিশ্বদীপকে প্রণাম করে বলল, "আমার কোনও গুণ নেই, তবু যদি আপনাব কোন কাজে লাগতে পারি, নিজেকে ধন্য মনে করব। আমার কথা মনে থাকবে কি আপনার?"

অনঙ্গ আর অনন্ত আগেই নেমে গিয়েছিল। গাড়িতে ছিল কেবল শ্যামল। বিজনবালাব কাণ্ড দেখে সেও অবাক হয়ে গেল।

বিশ্বদীপ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "নিশ্চয়ই থাকবে। আপনি কি কাজ করবেন আমায় বলুন"

"আমি বিয়ের আগে বাবার চিঠি টাইপ করতুম। আপনার চিঠি টাইপ করে দিতে পারি। মাইনে চাই না। আমি কাজ চাই, যে কোনও কাজ। সময় নিয়ে কি যে করব আমি ভেবে পাই না—"

বিশ্বদীপ বললেন, "একটা কাজ আমি করব ভেবেছিলাম কিন্তু করে উঠতে পারি নি।

আপনি তাহলে সেইটে করুন। যেখানে যত বিজ্ঞাপন পাবেন সংগ্রহ করুন, সেগুলোক পরে নানা শ্রেণীতে ভাগ করতে পারা যাবে। কোন বিজ্ঞাপন কোথায় পেলেন, কোন তারিখে পেলেন পাওয়ামাত্রই টুকে রেখে দেবে এ খবরগুলো। আমার বিশ্বাস এর থেকে পরে অনেক রকম চিন্তাব ও আনন্দের উপকরণ পাওয়া যাবে—"

"বেশ তাই কবব—"

বিশ্বদীপ চলে গেলে শ্যামল সোম সবিস্ময়ে বলল, "এ কি ব্যাপার বৌদি—"

"লোকটি দেবতা। আপনার কৃপায় আজ আমার দেবদর্শন হয়ে গেল। এজন্য আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব—"

"দেবতা কি করে বুঝলেন? দেবতা মাপবার মাপকাঠি আছে নাকি কাছে?"

"মেয়েমানুষদের মনের মধ্যে নিখুঁত নির্ভুল মাপকাঠি থাকে। সেটা যে কি তা আপনাকে বোঝাতে পারব না—"

বিজনবালা আর কোন কথা না বলে ভিতরে ঢুকে গেল আর সদর দরজায় খিল বন্ধ করে গটগট করে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

শ্যামল কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে, তারপর মুচকি হেসে সে-ও চলে গেল। সে বিজনবালাকে ভালবাসে না। সে বিজনবালারূপ অদ্ভুত পুতুলটাকে নানাভাবে ঘুবিয়ে ফিরিয়ে দেখছে কেবল, আর উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছে। শ্যামল যদিও সাহিত্যের ছাত্র, তার মনটা কিন্তু বিজ্ঞানীর মতো। কবিতা নিয়েই শুধু নয়, জীবন নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবাব অদম্য কৌতূহল তার। কয়েকদিন থেকে একটা কথা তার মাথায় ঘুরছে, অনন্তকে কথাটা সে বলে নি এখনও, হঠাৎ ঠিক করে ফেললে সেইদিনই বলবে। গলি থেকে বেরিয়েই ট্যাক্সি পেয়ে গেল একটা। অনন্তর দোকান তখনও বন্ধ হয় নি। সে বসে হিসাব করছিল। বিস্মিত হয়ে বলল, "কি হঠাৎ ফিরলে যে আবার"

"হিসাব শেষ করে নাও একটা কথা বলবার আছে—"

"কি কথা—"

"হিসাব শেষ কর আগে। আমি না হয় আর এক কাপ চা খেয়ে আসি। এখুনি আসছি"

শ্যামল বার বার চা খায়। পাশের চায়ের দোকানটায় গিয়ে ঢুকল। ফিরল প্রায় আধঘন্টা পরে। তখন অনন্ত তার খেরোর খাতা বেঁধে ফেলেছে।

"কি বলবে বল—"

"আমি অনেকদিন থেকেই কথাটা তোমাকে বলব ভাবছি—" বলে শ্যামল চুপ করে গেল।

"কি কথা?"

তারপর ওস্তাদ ঘাতক যেমন এক কোপে পাঁটার মুণ্ডটা উড়িয়ে দেয় তেমনিভাবে আচম্বিতে শ্যামল বলল, "তুমি কি জান যে তুমি একটি খুনে?"

"আমি?"

"হ্যাঁ, তুমি। Slowly এবং inexorably একটি স্ত্রীলোককে হত্যা করে চলেছ তুমি। সেটা খেয়াল আছে?"

অনন্ত খুব নির্বিকাবভাবে একটু মুচকি হেসে একটি বিড়ি ধবিয়ে ফেলল। তাবপব বলল, "ও সেই পুবোনো কাসুন্দি। এত বাত্তিবে আব ওসব ঘাঁটবাব ইচ্ছে নেই। চল ওঠা যাক। বেশ বাত হয়েছে—"

"আজ বৌদি কি কবলে জান? বাস্তাব মাঝখানে বিশ্বদীপ বাবুকে গড হয়ে প্রণাম কবে বললে, আমাকে যাহোক একটা কাজ দিন। আমি আব পাবছি না। শুনে আমাব মনে হল যেন আর্তনাদ কবে উঠল। বিশ্বদীপবাবু চলে গেলে আমাকে বললে— আমাব জীবন ধন্য হয়ে গেল, আজ দেবদর্শন কবলুম। তুমি হয়তো তোমাব পাঁউকটি-বুদ্ধি নিয়ে এব অন্য মানে কববে কিন্তু আমি জানি এসব হচ্ছে—helpless cries of an agonised soul"

"বাংলা কবে বল, ইংবেজি বিদ্যে আমাব বেশীদূব নেই।"

"আমি একটা কথা সোজা তোমাকে জিগ্যেস কবতে চাই—তুমি বৌদিকে এমনভাবে অবহেলা কবছ কেন- "

"অনেকবাব তো বলেছি। যে পথ কাঁটায ভর্তি, যে পথ এবড়োখেবড়ো, যে পথে চললে বাব বাব হোঁচট খেতে হয সে পথে আমি চলতে পাবি নি বলেই চলা ছেড়ে দিযেছি- "

'তাহলে আইনত ওকে ছেড়ে দাও। ও আব কাউকে বিয়ে কবে সুখী হোক—"

"কে ওকে বিয়ে কববে। করুক না, আমাব আপত্তি নেই।"

"কিন্তু আইনত ও সেটা পাবে না। আগে বিবাহ বিচ্ছেদ কবতে হবে। ও অবশ্য সেটা কবতে পাবে, অনাযাসে বলতে পাবে—তুমি একটি বক্ষিতা নিয়ে আছ—"

"আমাব যে বক্ষিতা আছে তা ও জানে না।"

"তা আমি জানি। ওকে যদি মুক্তি দিতে চাও আমি ওকে কথাটা বলতে পাবি, ডিভোর্সেব সব ব্যবস্থাই কবতে পাবি—"

অনন্ত মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি চাপতে চেষ্টা কবছিল।

"একটা কথা মনে হচ্ছে, বলব?"

"বল—"

"আজ হঠাৎ ওকে নিয়ে এত উত্তেজিত হযেছ কেন বুঝতে পাবছি না। তুমিই কি ওকে বিয়ে কবতে চাও নাকি—"

এবাব শ্যামল হো হো কবে হেসে উঠল।

"আমি একটা খাঁচাব পাখীকে ছেড়ে দিতে চাই বলেই যে তাকে বিয়ে কবতে চাই এ বুদ্ধি তোমাব মাথায ছাড়া অন্য কাবো মাথায গজাতো না। আমি কিন্তু আসলে যা বলতে চাচ্ছি সেটা বলাই হয়নি এখনও। তুমি ওব সঙ্গে একটু ভদ্র ব্যবহাব কবো। ও তোমাব গেঁযো mentality-ব সঙ্গে খাপ খাওযাতে পাচ্ছে না বলে ওকে তুমি যে আইনেব সুযোগ নিয়ে কাপুরুষেব মতো মেবে ফেলবে সেটা কি ভালো? ওব দিকে একটু মন দাও, ভালবাসাব একটু অভিনয় কব, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—"

"দেখ ভাই, আমি কাঁটা বাছতে পাবি না বলে মাছ খাওয়াই ছেড়ে দিযেছি। ও যে শজারু, ওকে আমি বুকে জড়িয়ে ধরব কি কবে।"

"অভিনয় কর—"

অভিনয় করতে আমি পারি না, তাছাড়া অভিনয় দু'দিনেই ধরা পড়ে যায়—"

"তা যায়, কিন্তু এ-ও শোনা গেছে যে অভিনয় করতে করতে অনেক সময় অভিনেতা আর অভিনেতা থাকে না। যে ভূমিকায় সে অভিনয় করছে সেই ভূমিকার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় সে। তুমি কিছুদিন যদি অভিনয় কর তাহলে হয়তো সত্যিই তুমি একদিন বিজনবালার প্রেমে পড়ে যাবে। এ রকম ঘটনা সত্যিই ঘটেছে—"

"কিন্তু তুমি এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছ কেন—"

"প্রথম কারণ—আমার মাথা আছে বলে, দ্বিতীয় কারণ—তুমি আমার বন্ধু, তুমি যে একটা পিশাচ হবে এ আমি সহ্য করতে পারি না বলে, তৃতীয় কারণ—বৌদিকে দেখে আমার কষ্ট হয় বলে। তুমি চাইছ বৌদি বরাবর কেবল তোমার গোড়ে গোড় মিলিয়ে চলবে আর তুমি তার ভালো-লাগা মন্দ-লাগার তোয়াক্কাও করবে না—এ অসম্ভব ব্যাপার আমি চলতে দেব না—"

শ্যামল দুম করে একটা কিল মেরে বসল টেবিলের উপর। ভয় পেয়ে গেল অনন্ত। দেখল শ্যামলের চোখ দুটো কপালের দিকে ঠেলে উঠেছে, নাকের ছ্যাঁদা দুটো বড় হয়ে গেছে। অনন্ত শ্যামলকে সত্যিই ভালবাসত, তাই এই কাণ্ড দেখে শশব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। কি কাণ্ড করবে ছোকরা!

বলল "আহা চটাচটির দরকার কি। কি করতে হবে সেইটেই বল না খুলে—"

শ্যামল বলল, "তুমি দোকান থেকে সোজা বাড়ি যাবে। বাড়ি গিয়ে বৌদিকে নানারকম ফরমাশ করবে। বলবে আমার জুতোর ফিতে খুলে দাও, বলবে আমি আজ শুক্‌ত খাব রান্না কর, যদি না করে, তার সঙ্গে ঝগড়া করবে!"

"ঝগড়া করলে অশান্তি হবে কেবল। ও গজগজ করা ছাড়া আর কিছুই করবে না—"

"যদি না করে তাহলে তোমার সেবা করবার জন্যে লোক বাহাল কর একজন। নয়নতারাকেই নিয়ে যাও তোমার বাড়িতে!"

"বল কি! নয়নতারা এতে রাজী হতে পারে কখনও—"

"দিদিকে আমি যতদূর জানি তাতে মনে হয় হবে। She is a gem—দু'বেলা তোমার বাড়ি গিয়ে তোমাকে সেবা করে আবার চলে আসবে। তুমি দুপুরে কিংবা অন্য সময় তার বাড়িতে যেতে পার। কিন্তু বৌদিকে নিয়ে তুমি মাঝে মাঝে সিনেমা যাবে, পার্টিতে যাবে, পিকনিকে যাবে। দিনরাত কেবল পাঁউরুটি নিয়ে বসে থাকলে চলে? আর একথাটাও তোমার ভোলা উচিত নয় যে বৌদির বাবার টাকাতেই তুমি এই পাঁউরুটির দোকান খুলতে পেরেছিলে। বৌদিকে কষ্ট দিলে মহাপাপ হবে তোমার—"

অনন্ত বাঁ-হাত দিয়ে মাথায় দু'চারবার হাত বুলিয়ে শেষে বলল, "বেশ, তুমি যখন ক্ষেপেছ, তখন তাই করা যাবে। কিন্তু আমি জানি ওতে কোনও ফল হবে না। তবে নয়নতারাকে আমি বলতে পারব না, তুমি বোলো"

"বলব। আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি—কাল সকালে দিদির কাছে যাব—"

শ্যামল বেরিয়ে গেল। ফুটপাথ ধরে একা হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে গিয়ে হাজির হল চৌরঙ্গীতে। আরও খানিকটা হেঁটে গড়ের মাঠে গিয়ে যখন পৌঁছল তখন সেখানে গিয়ে বসল একটা খালি বেঞ্চিতে। খানিকক্ষণ বসবার পর নিজেকে আবিষ্কার কবল সে। আবিষ্কার করল তার জীবনের মহাশূন্যতাকে। এই শূন্যতাকে পূর্ণ করতে চায় সে কবিতা লিখে, বিদুলার সঙ্গে আলতো আলতো প্রেমালাপ করে, বিজনবালার ব্যর্থ জীবনকে সার্থকতার পথে এগিয়ে দেবার চেষ্টা করে, অনঙ্গের সঙ্গে সাহিত্যচর্চা করে। হঠাৎ সে আবিষ্কার করল শূন্যতা শূন্যতাই আছে। আর সেই শূন্যতায় সঞ্চরণ করছে একটা আকুল ক্রন্দন, তার ভাষা নেই, সুর নেই, ছন্দ নেই, তা স্পষ্ট নয় কিন্তু তা যে কান্না, তাতেও সন্দেহ নেই। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল সে, তারপর আবার শুরু করল হাঁটতে। চোখের সামনে নানাবঙের আলো জ্বলছে, নিবছে, দু'পাশ দিয়ে জনস্রোত বয়ে চলেছে—কিন্তু তাব শূন্যতা পূর্ণ হচ্ছে না, —হবার নয়। সে নিজেই জানে না কিসে তা পূর্ণ হবে।

সেদিন বিশ্বদীপ অনেক রাত্রে ফিরে দেখলেন মহুয়া তখনও তাঁর অপেক্ষায় বারান্দার একধারে বসে আছে। তিনি গাড়ি থেকে নামতেই সে আস্তে আস্তে নিজের ঘরেব দিকে চলে যাচ্ছিল। বিশ্বদীপ ডাকলেন তাকে।

"তুমি এখনও ঘুমোও নি?"

"না"

"কেন—?"

"এমনি"

আব কিছু না বলে সে চলে গেল।

।। পনেরো ।।

দিন পনেবো পরে।

বিশ্বদীপ আপিসে বসেছিলেন। ধাকড় আর রামু এসে প্রণাম করে দাঁড়াল।

বিশ্বদীপ বললেন, "দাঁড়িয়ে আছ কেন। ওই চেয়ারে বস। তোমরা তো এখন ব্যবসাব সমান অংশীদার। বস তোমাদের সঙ্গে একটা কথা আছে। মহুয়া কোথায়?"

"সে কারখানায় কাজ করছে। সে বলছে আপনি যা ঠিক করে দেবেন তাই সে মেনে নেবে। আমাদেরও তাই মত।"

"দাঁড়িয়ে রইলে কেন। বস—"

"আপনার সামনে হুজুর 'কুরসি'তে বসতে 'লাজ' লাগছে—" ধাকড় অপ্রস্তুতমুখে মাথাটা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

রামু বলল, "আমাদেৰ হুজুর কুরসিতে বসার 'আদত্' (অভ্যাস) নেই। দাঁড়িয়েই আমরা ভালো থাকি"

বিশ্বদীপ একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "তোমরা দুজন আর মহুয়া—এই তিনজনেই কি সব শ্রমিকের হয়ে ব্যবসার কাজকর্ম দেখবে? অবশ্য আমিও থাকব"

ধাকড় মাথা চুলকে বলল, "আমরা তো কিছুই বুঝি না।"

"আমি বুঝিয়ে দেব। আমাদের ব্যবসার একটা হচ্ছে বিজ্ঞাপনের দিক, আর একটা হচ্ছে মাল আমদানির দিক, আর একটা হচ্ছে মাল রপ্তানীর দিক। এই তিনটে দিক তোমরা তিনজনে দেখাশোনা কর। আমি আপিসের হিসাবপত্র, চিঠি লেখা এইসব নিয়ে থাকব। তোমাদের নিজেদের কাজকর্ম ছাড়াও সন্ধ্যের পর এইসব দেখতে হবে। এসবের জন্য আপিসে অন্য লোকও আছে, তোমরা তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে সব করবে।"

রামু বলল, "আমরা ওসব পারব না বাবু। অত মেহনত আমাদের পোষাবে না। আমরা সন্ধ্যাবেলা একটু বিশ্রাম করি, সিনেমায় যাই—"

বিশ্বদীপ বললেন, "বেশী কাজ না করলে বেশী টাকা পাবে কি করে। বাজারে সমস্ত ফ্যাকটরিতে মজুরদের যা মাইনে, আমরা তাই তোমাদের দিচ্ছিলাম, কিন্তু তোমরা তাতে সন্তুষ্ট নও। তোমাদের সকলকে ব্যবসার অংশীদার করে নিতে চাইছি তাতেও তোমরা রাজী হচ্ছ না। বলছ ব্যবসা দেখাশোনার দায়িত্ব তোমরা নিতে পারবে না। বেশী খাটতেও পারবে না। কিন্তু এটা জেনে রেখো বেশী খাটতে না পারলে বেশী রোজগাব করা যায় না।"

ধাকড় মাথা চুলকে বসল, "আমরা মুরুখ মানুষ হুজুর, ব্যবসার কিছু বুঝি না। ব্যবসা আমাদের হাতে পড়লে চৌপট হয়ে যাবে।"

"তোমাদের সব শিখে নিতে হবে। আমি কাল সব হিসেব দেখেছি। গত বছর আমাদেব খরচখরচা বাদ দিয়ে পনেরো হাজার টাকা লাভ হয়েছিল। এ টাকাটা আমরা ব্যবসা বাড়াবার কাজে লাগিয়েছি। তোমরা যদি এর অংশীদার হও, আর এ বছরও যদি অত লাভ হয়, তাহলে তোমাদের প্রত্যেকে তোমাদের মাইনে ছাড়া বছরে একশো সওয়াশো টাকা করে পাবে। ব্যবসা যদি বাড়াতে পারো, আরও বেশী পাবে।"

রামু হাত উলটে বলে বসল, "বছরে একশো সওয়াশো টাকার জন্যে অত ঝঞ্ঝাটে আমরা যেতে চাই না। আমাদের মাইনে বাড়িয়ে দিন—"

"ব্যবসাটা নিজেরা চালিয়ে দেখ তোমাদের মাইনে বাড়ানো চলবে কিনা। আমি সবই তো তোমাদের হাতে তুলে দিতে চাইছি। ভয় পাচ্ছ কেন, আমরা তো তোমাদের পিছনে থাকবই তোমরা কি চিরকালই সামান্য মজুর থাকবে? তোমাদেরও বড় ব্যবসাদার হয়ে দেশের ভালোমন্দের চিন্তা করতে হবে। আমেরিকার বড় বড় কোটিপতিদের মধ্যে অনেকে খুব সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন। কেউ সামান্য চাষার ছেলে, কেউ সামান্য জনমজুর। পারবে না কেন? লেগে পড়।"

এ বক্তৃতা শুনে ধাকড় আর রামু দুজনেই চুপ করে রইল। তারপর ধাকড় বলল, "কিন্তু আমরা আমাদের অংশ থেকে আগোড় (অগ্রিম) কিছু নিতে পারব কি?"

বিশ্বদীপ বললেন, " এ সম্বন্ধে পাঠকজির সঙ্গে কথা হয়েছিল। তিনি বলেছেন অগ্রিম নেওয়া চলবে না। বছরের শেষে তোমাদের যা পাওনা তা হিসাব করে নগদ দিয়ে দেওয়া

হবে। আর এর জন্যে তোমাদের বেশী মেহনত করতে হবে। এ ব্যবস্থায় তোমরা যদি রাজী না থাক, আমরা তোমাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হব। তোমরা জিনিসটা ভালো করে ভেবে দেখ, তাবপর যা ভালো মনে কর তা আমাকে এক সপ্তাহের মধ্যে জানিয়ে দিও।''

ধাকড় আর রামু প্রণাম করে চলে গেল।

চুপ করে বসে রইলেন বিশ্বদীপ। তাঁর মনে হল—কেন এসব করছি! তাঁর তো টাকার দরকার নেই। তিনি কি সত্যিই এইসব অশিক্ষিত ভীরু মজুরদের বড় ব্যবসাদার করতে চান? তারপরই তাঁর হঠাৎ মনে হল কাজ না থাকলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন। কাজ দিয়ে হোক, অকাজ দিয়ে হোক, জীবনকে নিশ্ছিদ্র নিরবসর করে রাখতে হবে সর্বদা। নিজের চারিদিকে একটা ধাঁধা সৃষ্টি করতে হবে, সৃজন করতে হবে প্রহেলিকার যবনিকা। বিলাতে যদি বিসার্চ করবাব সুযোগ পান থাকতে পারবেন কি সেখানে বিদুলাকে ছেড়ে? বিদুলা এখানে থাকবে আর তিনি —।

''আসতে পারি?''

''আসুন''

প্রবেশ করলেন মিস্টার সিনহা। ফ্যাকটরির কেমিস্ট্রি বিভাগের কর্তা। প্যান্ট-বুশশার্ট-নীল-চশমা-পরা স্মার্ট ভদ্রলোক। পরিষ্কার কামানো, কিন্তু কামানো সত্ত্বেও সারা মুখে কেমন যেন একটা নীলচে ভাব। দুটো ঠোঁটই মোটা। চিবুকটি মাংসল এবং তার মাঝখানে একটা গর্ত। এই গর্তটির জন্য তিনি নিজে কামাতে পারেন না, নাপিতের সাহায্য নিতে হয়। চওড়া ভুরুব নীচে চক্ষু দুটি বুদ্ধিদীপ্ত। কিন্তু চোখের দৃষ্টির মধ্যে প্রসন্নতা নেই। চতুর চালাক ভাব আছে, একটা হিংস্রতাও যেন মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে সে দৃষ্টি থেকে। মাংসল নাক, কান দুটিও বেশ বড় বড়। মুখটাও বড়। তিনি এসেই কাজের কথা পাড়লেন।

''আমাকে নোটিশ দিয়েছেন কেন, স্যার? আমার কাজেব কোন ত্রুটি হয়েছে কি? আমি তো যথাসাধ্য—''

''না, আপনার কাজের কোনও ত্রুটি পাইনি আমরা। মাসে তিনশ টাকা মাইনে দিয়ে কেমিস্ট রাখবার সামর্থ্য নেই আমাদের ফার্মের। ওযার্কাররা বেশী মাইনের দাবি করে স্ট্রাইক করেছে। তাদেব নইলে আমাদের চলবে না, কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের কাজটা আমি নিজেই চালিয়ে নিতে পারব।''

''আপনি? শুনেছিলাম আপনি Zoology-র লোক—''

বিশ্বদীপ হেসে বললেন, ''কেমিস্ট্রিও জানি কিছু কিছু।

এস-সি.তে কেমিস্ট্রি পড়তে হয়েছিল তো। সাবান তৈার করবার মতো বিদ্যে আমাব আছে—''

''তা তো নিশ্চয়ই, তা তো নিশ্চয়ই। তাহলে চার্জটা কি আমি আপনাকেই দিযে যাব?''

''আপনি কবে যাবেন?''

''আপনার নোটিশ পাওয়ার পরই আমি বিজ্ঞাপন দেখে কয়েক জায়গায় কাজের চেষ্টা করেছিলাম। একটা ভাল ফার্মে চাকরি পেয়ে গেছি। তারা আমাকে এই সপ্তাহেই জয়েন করতে বলেছে—''

"বেশ, আপনাকে আজকেই ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি মহুয়াকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে চলে যান। তার কাছ থেকে আমি বুঝে নেব।"

"একটা লিখিত order দিন তাহলে—"

"আপিস থেকে একটু পরে সে order যাবে আপনার কাছে। যাবার আগে আপনার মাইনেটাও নিয়ে যাবেন।"

"চলে যাবার আগে আপনাকে আর একটা কথাও বলে যাওয়া আমি কর্তব্য মনে করি"

"কি বলুন—"

"ওই মহুয়ার সম্বন্ধে। ও একটি জাতসাপ। She is a viper. ওকে বিশ্বাস করবেন না, ওর সংস্রবেও আসবেন না। শুনলাম আপনি ওকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন, তাই আপনাকে সাবধান করা উচিত মনে করেই এই কথাগুলো বললাম।"

বিশ্বদীপের একবার মনে হল মহুয়ার কাছে মিস্টার সিনহার সম্বন্ধে যা শুনেছেন তা বলেন। কিন্তু কথাটা মনে হওয়া মাত্র তাঁর ভদ্রমন সংকুচিত হয়ে উঠল।

শুধু বললেন, "ধন্যবাদ। আর কিছু বলবার আছে আপনাব?"

"না। আচ্ছা, তাহলে চলি, নমস্কার।"

একটা দায়-সারা গোছ নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন মিস্টার সিনহা। বিশ্বদীপের আবার মনে হল এইসব অকাজ দিয়ে কতদিন নিজেকে ভুলিয়ে বাখতে পারব। মনে হল বিদুলা অপেক্ষা করছে আমি কবে তাকে গিয়ে বলব তুমি এস। কিন্তু আমি পাবছি না, বিবেক বাধা দিচ্ছে, পাঠকজি বলেছেন বিয়ে করবার আগে সব কথা খুলে বলতে হবে। সিংহ বাধা দিচ্ছে তার রহস্যময় ইঙ্গিত দিয়ে। মনে পড়ল রুদলবাবু কুষ্ঠ-ভীতিকে জয় করেছিলেন। কিন্তু বিদুলা তো রুদলবাবু নয়, বিদুলা পারবে না। বিদুলাকে এই নিদারুণ পরিস্থিতির সামনেও সে নিয়ে যেতে পারবে না। হঠাৎ ইনার পকেটে হাত ঢুকিয়ে হোমিওপ্যাথিক শিশিটা বার করলেন তিনি। ডাক্তার কারফরমা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন সারিয়ে দেবেন। বলেছেন, ও কুষ্ঠ নয়, ও শুধু নিউরাইটিস। কিছুদিনের মধ্যেই সেরে যাবে। কিন্তু আর একটা কাণ্ডও করেছেন তিনি। অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ সব বন্ধ করে দিয়েছেন। বলেছেন, আগে আমি আপনাকে যে ওষুধ দেব তা আপনার রোগের ওষুধ নয়, আগে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের বিষগুলো আপনার শরীর থেকে বার করতে হবে। বিশ্বদীপ বড় বিজ্ঞানী, তবু তিনি ডাক্তার কারফরমার কথা বিশ্বাস করেছেন। হ্যাঁ করেছেন, কারণ তিনি আশ্বাস দিয়েছেন ভালো হয়ে যাবে। ডাক্তার ঘোষাল সে আশ্বাস দিতে পারেন নি। তিনি কেবল নানারকম ট্যাবলেট খাইয়ে যাচ্ছেন আর বলছেন অপেক্ষা করুন, ধৈর্য চাই...।

কপাট ঠেলে পাঠকজি প্রবেশ করলেন। শুকুল ঘরে ঢুকে তাঁর ব্যাগ দিয়ে গেল। তারপর বলল "বিলাইতি খইনি কোথাও পাচ্ছি না। সাঁওতালি খইনি একরকম পাওয়া যাচ্ছে, সেটারও বেশ তেজ আছে, সেটা কিনব?"

পাঠকজি ঘনঘন মাথা নেড়ে বারণ করলেন। তারপর কাগজ বার করে লিখলেন— "হাতীবাগান বাজারে রামকিষুণ মুদির কাছে পাবে। তার কাছে যদি না থাকে তাহলে আমার

নাম করে বললে সে যোগাড় করে দেবে। সারাজীবন ঐ খইনি খেয়েছি, বুড়ো বয়সে সাঁওতালি খেতে পারবো না।"

শুকুল একদৃষ্টে তার প্রভুর দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। এই জবাব পাবে তা সে জানত তবু রাগ-অনুরাগ-মিশ্রিত একটা দৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে রইল তার বিস্ফারিত চোখে। একটু বাধা সৃষ্টি করতেও চেষ্টা করল সে, যদিও জানত সেটাও টিকবে না।

"অতদূর যেতে আসতে সময় লাগবে কিন্তু, রান্নার যোগাড় কবে আসি নি।"

পাঠকজি একটা অগ্নিদৃষ্টি হেনে লিখলেন—"সে জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। যা বলছি তাই কর।"

শুকুল বেরিয়ে গেল।

তখন পাঠকজি বিশ্বদীপকে সম্বোধন করে লিখলেন—'টমসনের চিঠি পেয়েছ? ওঁরা ওখানেই থাকবেন ঠিক করেছেন। তোমাব জন্যে যে বাংলোটা আলাদা কবা আছে সেইটেই পছন্দ হয়েছে ওঁদেব। লিসি লিখেছেন তাঁর বাসনপত্র ফার্নিচার সব যেন ওখানে পাঠিয়ে দেওযা হয়।"

বিশ্বদীপ বললেন, "আমিও চিঠি পেয়েছি। তাঁর সব জিনিসপত্র পরশু পাঠিয়ে দিয়েছি। আব একটা জিনিসও করেছি, আপনাকে না জিজ্ঞাসা করেই, রাগ করবেন না আশা করি—"

পাঠকজি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চেযে বইলেন খালি, কোন উত্তর না দিয়ে।

"আমি টমসনকে 'পাওযার অব এটর্নি' পাঠিযে দিয়েছি। ও যখন লাউপুরে থাকবেই ঠিক করেছে তখন ওখানকাব সব ভার নিক আর যা ভালো বোঝে তাই করুক। আইনত সে অধিকারটা ওকে দিযে দিলুম। লিসির সেলাইয়ের কলটা ভেঙে গেছে দেখলাম, নতুন কলও একটা পাঠিয়ে দিয়েছি তাকে, আর কিছু উল আব বোনবাব সরঞ্জাম। ওখানে তো এসব জিনিস পাওযা যায না—"

পাঠকজি তৎক্ষণাৎ কাগজে খসখস কবে লিখলেন—"খুব ভালো কাজ করেছ। এমন সুবুদ্ধিব পরিচয় ইদানীং তুমি দাওনি। সেখান থেকে লোক ফিরেছে? কাকে পাঠিয়েছিলে?

"টোটো গেছে। আর দুজন চাকর। তাদের এখনি ফিরবার কথা—"

পাঠকজি লিখলেন—"তোমার স্ট্রাইকাবরা কি বলে—"

"আপনি যা বলেছিলেন তাই বলেছি ওদের। ওরা এখনও কিছু ঠিক করতে পারেনি"

পাঠকজি লিখলেন—'আমার মনে হয় ওরা অংশীদাব হতে রাজী হবে না। ওই মজুরিতেই কাজ করবে ওরা, দেখো। যদি করে তাহলে প্রত্যেককে বছরে পঁচিশ টাকা করে বোনাস দেব আমরা। এখন সেকথা বলো না। ওরা যদি এই মজুরিতেই ভালোভাবে কাজ করে তাহলেই আমরা ওটা দেব। মিস্টার সিনহার কি হল?"

"তাকে নোটিশ দিয়েছি। মনে হয় এই সপ্তাহেই সে চলে যাবে—"

"যতদূর শুনেছি লোকটি সুবিধার নয়। প্রাণপণে আমাদের অনিষ্টের চেষ্টা করবে। আমাদের সাবানের পুরো ফরম্যুলা ও জানে কি?"

এটা লিখে ভ্রূকুঞ্চিত করে চাইলেন তিনি বিশ্বদীপের দিকে।

"সবটা জানে না। আফ্রিকান সেই রূটের অ্যালকহলিক একস্ট্র্যাক্ট আমি নিজেই করি। ওকে প্রয়োজন মতো মেপে দি। সেটা ও জানে না—"

পাঠকজির ভ্রূ মসৃণ হয়ে গেল।

"আফ্রিকার সে রূট কিন্তু খুব বেশী নেই। আমাদের সেখানকার এজেন্টকে এবার চিঠি লিখতে হবে—"

পাঠকজি লিখলেন—"আমি লিখে দিয়েছি। কংগোর একটা জঙ্গল থেকে সেটা সংগ্রহ করতে হয়—"

"আচ্ছা, ও ওষুধে বাবার কি কোনও উপকার হয়েছিল?"

পাঠকজি লিখলেন—"না. সে ওটা ব্যবহার করবার সুযোগই পায়নি। স্বপ্ন দেখবার দিন কয়েক পরেই ও মারা যায়। ওর সে স্বপ্নের কথা আমাকে বলে যায়। স্বপ্নটা অদ্ভুত। স্বপ্নে দেখেছিল কংগোর জঙ্গলে যেন একজন নিগ্রো তান্ত্রিক সব পশুদের ঘা সারিয়ে দিচ্ছে। বাঘ, সিংহ, হাতী, ময়াল সাপ, সকলের গায়ে বড় বড় ঘা, এক বিরাটকায় নগ্ন নিগ্রো গাছের রস নিংড়ে নিংড়ে তাদের ঘায়ে দিচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে সেরে যাচ্ছে তাদের ঘা। শেষকালে একটা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোক এসে হাজির হল। নিগ্রোটা একটা বুনো লতা দেখিয়ে বললে—ওতে তোমার ঘা সারবে। ওর শেকড়ের রস আর ওর পাতার স্পর্শ খুব উপকারী। এই বনের ভিতর আরও কিছুদূর যদি চলে যাও তাহলে এই লতার জঙ্গল আছে দেখতে পাবে। সেখানে যদি গিয়ে বাস করতে পার তাহলে তুমি সেরে যাবে। কিন্তু সেখানে বাস করতে পারবে না। বিষাক্ত সাপ আছে সেখানে অনেক। লতার সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে থাকে সে সাপ। এই স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল অম্বরের। সে আমাকে বললে, তুমি সব কথা টুকে নাও। আর একটা কাগজ দাও আমাকে, ছবি এঁকে দিই। অম্বর খুব ভালো ছবি আঁকতে পারত। যদিও কুষ্ঠরোগে তার আঙুলগুলো মোটা মোটা হয়ে গিয়েছিল তবু সেই লতার পাতা আর নিগ্রো তান্ত্রিকের চেহারা সে এঁকে দিয়েছিল আমাকে। বলেছিল এই লতা খুঁজে বার কর, আর জগতের কুষ্ঠরোগীদের সুস্থ কর। সে মারা যাবার পরে অনেক খুঁজে প্রায় বছরখানেক পরে সেই নিগ্রো তান্ত্রিককে আবিষ্কার করি। ছবি না থাকলে পারতাম না। পরে দেখলাম ওই লতার শিকড় ওদেশে অনেকেই কুষ্ঠরোগে ব্যবহার করে। আমি যতটা পেরেছিলাম সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। তারপরে ওখানে একটি এজেন্ট নিযুক্ত করে এসেছিলাম, সে আমাকে পাঠায়। এজন্য তাকে বছরে হাজার টাকা দিই আমরা, তা তো তুমি জানো। তোমার শরীর আজকাল কেমন আছে?"

বিশ্বদীপ সত্য কথা বলতে পারলেন না। ঘুরিয়ে বললেন, 'ভালোই আছি—"

পাঠকজি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর আবার লিখলেন—"দেখ বিশু, তোমাদের নিয়েই আমার সারাজীবন কাটল। আমার নিজের সংসার পরিবার কিচ্ছু নেই। তোমাদের কেন্দ্র করেই আমার সব। অম্বরকে কথা দিয়েছিলাম তুমি যদি সুস্থ থাকো তাহলে তোমাকে সংসারী করে দিয়ে, তোমার টাকাকড়ি তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে তারপর আমি ছুটি নেব, তার আগে নয়। তোমার শরীর

যখন ভালো আছে, আর তোমার বিয়ের বয়সও যখন হয়ে গেছে তখন আমার মনে হয় এবার সদ্বংশের একটি সুশ্রী মেয়ে দেখে তুমি বিয়ে কর। তোমার লাউপুরের জমিদারি ছাড়া, আর এই সাবানের ব্যবসায়ে যে দশ লাখ টাকা খাটছে তা ছাড়া তোমার পঁচাত্তর লক্ষ টাকা আমার কাছে গচ্ছিত আছে। টাকাটা এখানে নেই, আছে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে। আমারই নামে আছে। সেটা এবার তোমার নামে ট্রান্সফার করে দেব—''

''কিন্তু আপনি সেদিন বলেছিলেন মনে হচ্ছে ব্যবসাতে যে টাকা খাটছে সেটা ওই পঁচাত্তর লক্ষ টাকা থেকে নেওয়া—''

''না। এ দশ লক্ষ টাকা অম্বর আমাকে আলাদা করে দিয়েছিল, বলেছিল, আমার জন্যে তুমি এত কষ্ট করেছ, এ টাকা দিয়ে জীবনটাকে তুমি ভোগ কর—কিন্তু ভোগ বলতে সাধারণ লোকে যা বোঝে আমি তা বুঝি না। আমার সে রকম ট্রেনিং নেই। ভোগ করবারও একটা ট্রেনিং থাকা দরকার। সুতরাং ও টাকাটা আমার কাছেই পড়েছিল ব্যাঙ্কে। তারপর মৃত্যুকালে অম্বর আমাকে যখন সব টাকাই দিয়ে গেল, তখন ও টাকা খরচ করবার আর প্রশ্নই রইল না। ওই টাকার সুদ থেকে আমার সমস্ত প্রয়োজনীয় খরচ আমি চালিয়েছি, তোমার পড়া শোনার খরচ দিয়েছি, টমসন পরিবারকে মাসে মাসে তোমার জন্যে টাকা দিয়েছি। কলকাতায় তোমার জন্যে বাড়ি কিনেছি ছটা। এর জন্যে অবশ্য তোমার বাবার কলিয়ারিগুলোকে বিক্রি করতে হয়েছিল। ভোগ কববাব জন্যে অম্বর আমাকে যে দশ লক্ষ টাকা দিয়েছিল সেইটে দিয়েই আমি সাবানের ব্যবসা করেছি। তোমাকে এত কথা খুলে কখনও বলিনি, কারণ বলবার দরকার ছিল না। সব টাকাই তোমার। সত্যিই তুমি মস্ত ধনী একজন। লেখাপড়াও ভালো শিখেছ। আশা করা যায় একটি বউ পেলে তুমি সুখী হবে। কিন্তু আমি ভরসা করে আশা করতে পারছি না। যদিও তোমার জন্মসময়টা আমি ঠিক জানি না, টমসন বলেছিল সে হাসপাতালেব রেকর্ড নাকি তোমাকেই দিয়েছিল। তুমি বলছ সে সব হারিয়ে ফেলেছ। তবু আমি দশাঙ্গ বিদ্যাব যতটুকু জানি তার থেকে আমি যা বুঝেছি তাতে আমি আশ্বাস পাই না। দেখতে পাই তোমার পিছনে একটা কালো ছায়া সর্বদা ঘুরছে। আশঙ্কা হয় সেই ছায়া হয়তো শেষ পর্যন্ত সব গ্রাস করে ফেলবে। এটা অবশ্য আমার আন্দাজ। সত্য না-ও হতে পারে। অনেক সৌভাগ্যবান লোকের পিছনে আমি ওইরকম ছায়া ঘুরতে দেখেছি...''

পাঠকজি লেখা থামিয়ে চুপ করে রইলেন।

তারপর হঠাৎ আবার লিখলেন—''তুমি বিয়ের সম্বন্ধে কিছু ঠিক করেছ কি. মানে কোনও বিশেষ মেয়েকে তোমার পছন্দ হয়েছে কি?''

''আমি ও বিষয়ে এখনও মনস্থির করতে পারিনি। আমার বাবার আর মায়ের যে ইতিহাস আমি শুনলাম তা আমি কাউকে বলতে পারব না। যদি পারি তাহলে আপনাকে জানাব। আচ্ছা, একটা কথা জানতে কৌতূহল হচ্ছে। বাবা এত টাকা পেলেন কোথা থেকে।''

''একজন বড় হীরকব্যবসায়ীর সঙ্গে তোমার বাবার খুব বন্ধুত্ব ছিল। তিনিই ওকে নিয়ে যান আফ্রিকায়। সেখানে ওঁরই এক ল্যাবরেটরিতে অম্বর কাজ করত। সেই সময় অম্বর

হীরের সম্বন্ধে কি যেন একটা গবেষণা করে, আর তার ফলে ব্যবসায়ে অনেক টাকা লাভ হয়। এজন্য প্রায় এক কোটি টাকা দিয়ে সেই গবেষণার সব তত্ত্ব কিনে নেন সাহেবটি। অম্বরকে তিনি বরাবর খুব সাহায্য করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অম্বরের আর তোমার মায়ের চেহারা এত বীভৎস হয়ে উঠল যে তারা আর লোকালয়ে থাকতে চাইত না। জঙ্গলে জঙ্গলে তাঁবু ফেলে ফেলে থাকত...''

আবার নীরব হয়ে গেলেন পাঠকজি। ভ্রূকুঞ্চিত করে সামনের দেওয়ালের দিকে চেয়ে রইলেন। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে শুকুল এসে গেল।

''কিছুদূর গিয়েই একটা ছোট দোকানে পেয়ে গেলাম বিলাইতি খইনি। হাতীবাগানে আর যেতে হল না—''

পাঠকজি উঠে পড়লেন।

''চললেন আপনি?''

মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেলেন পাঠকজি।

পাঠকজি চলে যাবার পর ডাক্তার ঘোষালের ফোন এল।

''কেমন আছেন? সেদিন বিদুলা দেবীর বাড়িতে শুনলাম বেকাব-ভবন কমিটিব সবাই 'মীট' করেছিলেন। এ-ও শুনলাম সেখানে বেকাব ছাড়া আর সব বিষয়েরই আলোচনা আপনারা করেছেন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটাব মর্মে আপনারা প্রবেশ করেছেন। নির্জলা বেকাররাও নিজেদের সম্বন্ধে কখনও আলোচনা করে না। সাধাবণত তাদেরও আলোচ্য বিষয় হয়—গভর্নমেন্টের অপটুতা, সাহিত্যের অসারতা, সিনেমা-থিয়েটারের ভালো-মন্দ—এইসব। আমি অবশ্য এসব কথা বলবার জন্যে আপনাকে ফোন করিনি। আমি ফোন করেছি অন্য কারণে। আপনি আপনার লরি-ড্রাইভাব আফজাল খাঁকে একদিনের জন্য spare করতে পারবেন?''

''তা পাবব না কেন? কিন্তু ওকে আপনার কি দরকার? লরি করে মালটাল আনাবেন নাকি?

''উনি একটি মহাপুরুষ। এ শহরে কংক্রিট-রহস্য কেউ জানেন না। জানেন কেবল ডাক্তার শ্রীকান্ত ঘোষাল। কিন্তু ডাক্তার শ্রীকান্ত ঘোষাল পরশু থাকছেন না, আর সেই দিনই তাঁর ছাতঢালাই হওয়ার কথা। এখানকার একজন বুড়ো সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার আমাকে বললেন—আপনার ড্রাইভার আফজাল খাঁও এ বিষয়ে একজন expert—ওরকম expert তিনি নাকি দেখেন নি। আগে এক ঠিকেদারের অধীনে কাজ করত। ওকে অপমান করে বলে প্রকাশ্য দিবালোকে তার বুকে ছোরা বসিয়ে দিল সে। মোকোদ্দমা লড়ে জিতেছিল, ফাঁসি হয়নি, জেল হয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে এল যখন, তখন ও ড্রাইভার। জেল সুপারিনটেণ্ডেন্টের একটা ভাঙা গাড়ি ঠিক করে, ড্রাইভারি শিখে লাইসেন্স নিয়ে বেরিয়ে এল। এদিক ওদিক করেছিল দিনকতক, তারপর আপনার কাছে গেছে। কেমন কাজ করে?''

''চমৎকার। আমার ভাঙা লরিটাকে ঠিক করেছে।''

"করবেই তো, ও যে মহাপুরুষ। পরশু তরশু আমি থাকব না, ও যদি আমার ছাদ-ঢালাই করবার ভারটা নেয় নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে পারি।"

" কোথায় যাচ্ছেন?"

"বলব না, কারণ বললে বিশ্বাস করবেন না। আর বিশ্বাসও যদি করেন হাসবেন, অবজ্ঞার হাসি, you poor people, এ ছাড়া আর কোনও হাসি আপনারা হাসতে জানেন না। সুতরাং বলব না"

"আচ্ছা, আমি কাল সকালেই আফজালকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।"

"রাগ করলেন তো?"

"না, না, রাগ করব কেন"

"হ্যাঁ করেছেন, আপনার টোন থেকেই বুঝতে পারছি সেটা। কথাটা কিন্তু বলবেন না কাউকে। আমি যাচ্ছি আসাম। সেখানে এক জঙ্গলে এক পাহাড়ের উপর প্রকাণ্ড এক দেবদারু গাছ আছে। সেই দেবদারু গাছের মগডাল থেকে পূর্ণিমার চন্দ্রোদয় নাকি অপূর্ব দেখায়। সূর্যোদয় আরও অপূর্ব। তাছাড়া সে জঙ্গলে বাঘ আছে। আমি এক ঢিলে দুই পাখী মারব ঠিক করেছি। আমার লোক চলে গেছে। ওই গাছের উপর মাচান বেঁধে রাখবে আর একটা মোষের বাচ্চা বেঁধে রাখবে তার কাছে। পূর্ণিমার দিন সেখানে পৌঁছতে হলে পরশু আমাকে এখান থেকে বেরুতেই হবে—"

"আর আপনার রুগীবা—"

"তারা হয় অপেক্ষা করবে, না হয় অন্য ডাক্তারের খোঁজ করবে। আসল কথা কি জানেন, ওসব আর ভালো লাগে না। তার চেয়েও deeper কথা হচ্ছে, আমার সত্যিকার কাজ কিছু নেই, রুগী চরিয়ে বেড়াই, বাড়ি করি, পোষ্যপুত্র পোষ্যকন্যা নিয়ে মানুষ করি—কিন্তু এসব বাইরের কাজ। এসবে মন ভরে না। আমিও একজন বেকার। তাই মন ভরাবার জন্যে মাঝে মাঝে পালিয়ে যাই বনে-জঙ্গলে। Satisfied? আফজাল তাহলে কাল আসছে?"

"নিশ্চয়ই—"

"গুড্। ছেড়ে দিচ্ছি—"

বিশ্বদীপের মনে হল ডাক্তার ঘোষালও তাঁর আপন জন, তাঁকে তিনি ভালবাসেন, কিন্তু সত্যিই কি তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ? কই তাঁকে তো তিনি সব কথা খুলে বলতে পারলেন না। পাঠকজিকেও তো সব কথা খুলে বলেন নি। বিদুলাকেও না—পৃথিবীতে সত্যিই কি তাঁর অন্তরঙ্গ আছে কেউ, যাকে সব কথা তিনি অসংকোচে বলতে পারেন, সব শুনেও যার এতটুকু ঘৃণা বা অনুকম্পা হবে না......

মানসপুরেও অন্ধকার চারিদিকে। বর্ষা নেমেছে। অন্ধকারের সমুদ্রে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে অসংখ্য কদম্বফুল, আকাশের বিজলীরাও নেমে এসেছে মানসপুরের কাননে কান্তরে, তন্বী চঞ্চল আলোক-প্রতিমার মতো সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছে সকলে, প্রত্যেকের গলায় দুলছে

জুঁইফুলের মালা। অসংখ্য ময়ূর বধূসরা নদীর ধারে সারিবদ্ধ হয়ে সংবর্ধনা করছে এদের পেখম তুলে, তাদের কেকারবে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে আকাশ বাতাস, মেঘের পানসিতে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে উন্মত্ত ডাহুক-ডাহুকীর দল। মাঠের এক জায়গায় জল জমেছে, আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আছে অসংখ্য সরু সরু সবুজ ঘাস, মাঠের আনন্দ যেন মূর্ত হয়ে রয়েছে তাদের সূচীমুখ সবুজ আগ্রহে; তাদের মধ্যে আসর জমিয়েছে লম্ফ সিং সদলবলে। বিশ্বদীপকে দেখে বাঁ চোখটা একটু কুঁচকে সে তাঁকে জানিয়ে দিল, দেখছেন তো ব্যাপার খুব ঘনীভূত। বিশ্বদীপ সেই স্বপ্নময় অন্ধকারে অন্যমনস্ক হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন একটা বড় কালো মেঘের মতো কি যেন ভেসে ভেসে আসছে তাঁব কাছে। খুব কাছে যখন এল তখন বুঝতে পারলেন—মেঘ নয়, হাঁস। কুচকুচে কালো রঙেব হাঁস, চোখ দুটো জ্বলছে পদ্মরাগ মণির মতো। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন দু'ফোঁটা গাঢ় রক্তেব মতো দুটো চুনিও রয়েছে যেন তাব চোখের কোণে।

হাঁস কথা কইল। বলল, "আমি দময়ন্তীর হাঁস। দময়ন্তীর দুঃখে আমাব বং হয়ে গেছে কালো। দময়ন্তীর দুঃখে আমার অশ্রু হয়েছে রক্তবিন্দু। দময়ন্তী কোথা, তাকেই আমি খুঁজছি"

ধীরে ধীরে আবার ভেসে চলে গেল সে।

তারপর বিশ্বদীপ দেখলেন ছাতা মাথায় দিয়ে বাঁ হাতে কোঁচাব কাপড়টা তুলে আর ডান হাতে ছাতির বাঁটটা ধরে ছপছপ করে কে একজন এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। কাছে আসতেই বিশ্বদীপ মুরুব্বীকে চিনতে পারলেন।

"কি ব্যাপার আজকে বলুন তো—"

"ঘনঘোব ব্যাপার। বধূসরাকে সামলানো যাচ্ছে না। তার আকুল প্রার্থনা বিচলিত করেছে ইন্দ্রকে। তিনি চেবাপুঞ্জীর সমস্ত মেঘকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বধূসরা দু'কূল ভেঙে উদ্দাম হয়ে ছুটেছে পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের তলায় গিয়ে মাথা খুঁড়ছে। ইন্দ্রদেব নাকি অভয় দিয়েছেন প্রবল বর্ষণে পাহাড়কে ডুবিয়ে দেবেন। বধূসরা পাহাড় পেরিয়ে তখন ওপারে সমুদ্রের সঙ্গে মিশবে। এসবের কোনও মানে হয়?"

বিশ্বদীপের মনে হল এতক্ষণে সমস্যার একটা সমাধান পাওয়া গেল। পাহাড়টা যে কোনও সমস্যাই নয়, বস্তুতঃ কোনও বাধাই যে সমস্যা নয় এটা বধূসরা প্রমাণ করে ছাড়বে এবার।

"বধূসরা এখন কোথায়?"

"আমিও তো তাকেই খুঁজছি। কিন্তু সে তো এখন দু'কূলপ্লাবিনী, আত্মহারা, উন্মাদিনী। তাকে তো এখন পাওয়া যাবে না, অথচ রুদলবাবু বলছেন তাকে আমার কাছে নিয়ে এস আমি তাকে বুঝিয়ে বলি। বানে সমস্ত ফসল ডুবে গেছে, এখানকার যত ইঁদুর, ছুঁচো, বিছে, সাপ সবাই গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে রুদলবাবুর বাগানের গাছে গাছে। বড় বড় গোখরো সাপ চন্দনগাছের ডালে ডালে জড়িয়ে আছে। টিট্টিভপাখীরা মহা চিৎকার আরম্ভ করেছে, তাদের সব ডিম ভেসে গেছে—কি কাণ্ড বলুন তো! আমি চলি, দেখি যদি বধূসরাকে কোথাও ধরতে পারি। পাব না জানি, কিন্তু রুদলবাবুর হুকুম তো অমান্য করা যায় না, পাই না পাই ঘুরতে হবে—"

ছপছপ করতে কবতে মুরুব্বী অদৃশ্য হয়ে গেল। মুরুব্বী চলে যাওয়ার পর আর একটা ব্যাপারে বিস্মিত হলেন বিশ্বদীপ। চারিদিকে বৃষ্টি পড়ছে অথচ তাঁর গায়ে লাগছে না কিছু। বিস্ময়ের পরই কিন্তু একটা অস্পষ্ট বেদনা বোধ করলেন। তাঁর মনে হল মানসপুরের আপন লোক হয়ে যেতে পারেননি তিনি। এখানে এখনও তিনি অপরিচিত আগন্তুক। এখানকার বৃষ্টি পর্যন্ত ভদ্রতা করছে তাঁর সঙ্গে। রংবাহারীর কথা মনে পড়ল। দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত বিমর্ষভাবে। তারপর বধূসরা নদীর দিকেই গেলেন আস্তে আস্তে। গিয়ে দেখেন সত্যিই বিস্ময়কব ব্যাপার। ছোট নদী বধূসরা নেই, সে সমুদ্র হয়ে গেছে নিজেই। নীল তার জলের বং, সর্বাঙ্গে ছোটবড় অসংখ্য ঢেউ—দূরে নীল পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে মূর্তিমতী আকুলতার মতো সে যেন উথলে উঠেছে। দূরে পাহাড়ের গায়ে কালো কালো ওগুলো কি কাঁপছে? মেঘ না বধূসরার চুল, না তার বিরহ? নির্নিমিষে দাঁড়িয়ে বইলেন বিশ্বদীপ বোমাঞ্চিত হয়ে। তাঁব মনে হচ্ছিল, তিনি বিদুলাব অন্তবই যেন প্রত্যক্ষ করছেন। তারপর হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন ছোট্ট খেলনাব মতো একটা ময়ূবপংখী তাঁর পায়ের কাছে এসে ভিড়ল। আর সে ময়ূরপংখী থেকে ছোট ছোট বামনের মতো নেমে এল তিনজন। নেমে তাবা ময়ূবপংখীটাকে খেলনাব মতোই জল থেকে তুলে সেটাকে একটা বড় পাথবের আড়ালে বেখে দেখতে দেখতে নিজেবা বড় হযে গেল যেন মন্ত্রবলে। অসাধ্যসাধন, শ্রীমন্ত-প্রতিম আব সাগব-সঙ্গ মকে বিশ্বদীপ চিনতে পারলেন। বিশ্বদীপেব মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। হাসিমুখে এগিযে এল সাগব-সঙ্গম।

"খুব তাক লেগে গেছে, না? আমাদেবও লেগে গেছে। অসাধ্যসাধন আবব-তন্ত্র ভাগ্যে পড়েছিল, আর ভাগ্যে শ্রীমন্ত ওকে আরব দেশ থেকে তন্ত্রটা এনে দিযেছিল— তা না হলে তো মহামুশকিলে পড়ে যেতাম"

বিশ্বদীপ একটু হাসবাব চেষ্টা করে বললেন, "এখনও ঠিক মাথায় ঢুকল না—"

"না ঢোকবাবই কথা। শ্রীমন্ত একবার আববসমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল, সেখানে এক আরব বেদুঈনের সঙ্গে ভাব হল আমাদেব। সে বললে, একবার এক হিন্দু পণ্ডিতকে বন্দী করেছিল তারা। পণ্ডিত বলে আমার কাছে পয়সাকড়ি কিছুই নেই আছে শুধু একটি শাস্ত্র—তার নাম মায়ামন্ত্র-দীপিকা। শাস্ত্রটি অদ্ভুত। এটা নিয়ে আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। শেখ কিছুক্ষণ ভেবে বললেন— বেশ। কিন্তু ও শাস্ত্রের নাম বদলে দিতে হবে। মায়ামন্ত্র-দীপিকা নাম কেটে ওর নাম করে দাও আরবী তন্ত্র। পণ্ডিত প্রাণের ভয়ে তাই করলেন। সেই তন্ত্রটি আমার কাছে আছে, আমাকে যদি পঞ্চাশটি আশরফি দাও, ওটি তোমাদের দিতে পারি। শ্রীমন্ত সেবার জাফরান আর লবঙ্গ বিক্রি করে অনেক টাকা উপার্জন করেছিল। সে বললে, আমাদের পণ্ডিত বন্ধুর জন্যে চল এটা কিনে নিয়ে যাই। আমি তো এর ভাষা এক বর্ণ বুঝতে পারছি না। অসাধ্যসাধন বইটি পড়ে কিন্তু বলল, এ অদ্ভুত বই। এতে যে-সব মন্ত্র আছে তা গান্ধর্বী মন্ত্র। এ মন্ত্র পাঠ করলে বড় ছোট হয়ে যায় আর ছোট বড় হয়। এ মন্ত্র হাতীকে পিঁপড়ে আর পিঁপড়েকে হাতি করতে পারে। আমরা পাহাড় থেকে আগে হেঁটে আসতাম। কিন্তু দেখেছেন তো বধূসরা বান ডাকিয়ে কি কাণ্ড করে বসে আছে। আমাদের ময়ূরপংখী এত

কম জলে চলে না। তার জন্য সাগর চাই। তাই শ্রীমন্ত অসাধ্যসাধনকে বললে— তুমি ময়ূরপংখীটাকে ছোট করে দাও আর আমাদেরও ছোট করে দাও। আমরা ওপারে গিয়ে রুদলবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে আসি। রুদলবাবু মনে মনে ক্রমাগত আমাদের ডাকছেনও। বধূসরাকে সাগরের স্বপ্ন আমিই দেখিয়েছি, কিন্তু ও যে এমনভাবে ক্ষেপে যাবে তা তো কল্পনা করিনি। অসাধ্যসাধন মন্ত্রবলে পাহাড়কে ছোট করে দিতে পারে—কিন্তু আমরা যাব কোথা। কাছেপিঠে তো আর পাহাড় নেই। এ এক সমস্যায় পড়া গেছে।"

বিশ্বদীপ প্রশ্ন করলেন, "আপনাদের পাহাড়টা ঘুরে সমুদ্রে পৌঁছান যায় না?"

"যায়। কিন্তু যেখান থেকে ঘুরতে হবে সেখানে বিরাট মরুভূমি আছে একটা। আমরা তার নাম দিয়েছি তৃষ্ণা রাক্ষসী। সেখানে গেলেই বধূসরাকে ও শোষণ করে ফেলবে। চলুন, আগে রুদলবাবুর কাছেই যাওয়া যাক।"

রুদলবাবুর কাছে গিয়ে দেখা গেল তিনি তানপুবায় দেশ রাগিণী আলাপ করছেন তন্ময় হয়ে তাঁর বাগানের উঁচু চৌতারায় বসে। ইঁদুর, ছুঁচো, বিছে, সাপ, কীটপতঙ্গের দল মুগ্ধ হয়ে শুনছে সে আলাপ। বিশালকায় অসাধ্যসাধনও মুগ্ধ হয়ে গেলেন, তিনিও চোখ বুজে বসে পড়লেন রুদলবাবুর পাশে আর ধীরে ধীরে দুলতে লাগলেন। শ্রীমন্ত আব সাগব-সঙ্গমও বসলেন, কিন্তু তাঁদেব মুখে মুগ্ধভাব ফুটল না। শ্রীমন্তের ভুরু কুঁচকে গেল। আর সাগর-সঙ্গমের মুখে ফুটল মুচকি হাসি বিশ্বদীপও বসলেন একধারে, কিন্তু তাঁর মনে হতে লাগল। কি যেন একটা করা হয় নি, কি যেন একটা বাকি আছে—তারপব হঠাৎ মনে পড়ল। সিংহেব সঙ্গে এখনও দেখা হয় নি তাঁর। সিংহ কোথায়? এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন। কোথাও দেখতে পেলেন না তাকে। ক্রমশ তাকে দেখার আগ্রহটা এতো বাড়ল যে আর সব যেন ঢেকে গেল, ঝাপসা হয়ে গেল চতুর্দিক। অবলুপ্ত হয়ে গেল রুদলবাবুর গানের আসর, অবলুপ্ত হয়ে গেল তিনজন পাহাড়ী। সমস্ত অবলুপ্ত হয়ে জাগল কেবল একটি মাঠ— মাঠের অপর প্রান্তে প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো বড় বড় পত্রহীন গাছ তাদের আঁকাবাঁকা শাখা আকাশে মেলে দিয়ে—আর সেই মাঠে একা ভিজছে সিংহ। তার সর্বাঙ্গে দগদগে ঘা, কিন্তু ঘাগুলো ঘায়ের মতো নয়, ফুলের মতো। মনে হচ্ছে সিংহ যেন ফুলের অলংকার পরে বসে আছে। তার সিংহবদনে ফুলের সুষমা, তা আর বীভৎস নয়, তা সুন্দর। নির্বিকার সিংহ ভিজছে বসে বসে। তার জিনিসগুলোও ভিজছে। হঠাৎ কয়েকটা বড় বড় শকুনি এসে হাজির হল। একটা শকুনি তার বিরাট পক্ষ বিস্তার করে স্থির হয়ে রইল সিংহের মাথার উপর। আর তার জিনিসগুলোর উপর ডানা ছড়িয়ে বসল আরও দুটো শকুনি। শকুনিরা সিংহকে ভিজতে দেবে না, নষ্ট হতে দেবে না তার জিনিসপত্র। অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন বিশ্বদীপ। একটু পরেই চোখাচোখি হল সিংহের সঙ্গে। সিংহ বলল, "তুমি একটু আগে ভাবছিলে অন্তরঙ্গ কেউ আছে কি না পৃথিবীতে? কেউ নেই। তোমার অন্তরঙ্গ তুমি আর তোমার দুঃখ। সুখ নয়, সুখেরা পারাবত, তারা আসে আর উড়ে যায়। দুঃখই তোমার চিরন্তন বন্ধু। মাঝে মাঝে রুদলবাবুরা এসে তোমার ক্ষতকে ফুলের মতো সুন্দর সাজে সাজাবেন, শকুনিদের নিযুক্ত করবেন তোমাকে বৃষ্টি থেকে বাচাবার জন্যে। কিন্তু সে সব

টিকবে না শেষ পর্যন্ত। ক্ষত ক্ষতই থাকবে, বৃষ্টি তোমাকে ভিজিয়ে দেবেই। রুদলবাবুরা মহৎ লোক, কিন্তু তাঁরা সৃষ্টির চিরন্তন সত্যকে উলটে দিতে পারেন না। কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্তরা চিরকাল ঘৃণিত হয়ে থাকবে সমাজে, কারণ মানুষের সৌন্দর্যবোধ আছে, তারা কুৎসিতকে আঁকড়ে ধরবে কেন? অভিনয় করে ধরতে পারে, কিন্তু প্রাণ থেকে ধরবে কেন? এই দুঃখকেই মেনে নিয়ে থাকতে হবে, আত্মসমর্পণ করতে হবে ভাগ্যের কাছে রুদলবাবুর হাসির শব্দে মিলিয়ে গেল সিংহ। বিশ্বদীপ সবিস্ময়ে দেখলেন তাঁর সামনে বিচিত্র একটি স্বর্ণসিংহাসনে বসে আছেন এক দিব্যকান্তি পুরুষ। রুদলবাবু আবার হা-হা করে হেসে উঠলেন, তারপর বললেন,

''দেবরাজ ইন্দ্র, আপনি যে এত তাড়াতাড়ি এসে যাবেন তা প্রত্যাশা করি নি।''

ইন্দ্র বললেন ''আপনি যে পাঁচটি দূতী পাঠিয়েছেন, তারা ইন্দ্রাণীর প্রিয় সহচরী। শুনলাম আপনারা তাদের নাম দিয়েছেন তুহিনা, তরলা, হিল্লোলা, তুফানী আর হাওয়া। আপনারা নাম দেন, কিন্তু আমি নাম দিতে পারি না, আমি জানি ওরা প্রত্যেকেই অপরূপা। আপনাদের বধূসরাও অপরূপা। তার প্রার্থনায় বিচলিত হয়ে আমি মেঘদের পাঠিয়েছি। আবার এই পাঁচটি অপরূপার আগ্রহে আপনার কাছেও আসতে হয়েছে। আদেশ করুন কি করতে হবে –''

'আপনার মঘবা আমার মানসপুরকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। তার একটা বিহিত করুন''— রুদলবাবুর চোখ দুটো হাস্যপ্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু আপনাদের বধূসরা যে সাগরের সঙ্গে মিলতে চায় ওই পাহাড়কে না ডোবাতে পারলে তো তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে না। তাই ওই পাহাড়কে ডোবাতে চাই''

মেঘমন্দ্রকণ্ঠে অসাধ্যসাধন বলে উঠলেন, ''পাহাড়কে ডোবাতে পারবেন না। আমি মন্ত্রবলে পাহাড়কে ক্রমাগত উঁচু করতে থাকব।''

সকলেই অসাধ্যসাধনের দিকে চাইলেন। সন্দেহ রইল না যে অসাধ্যসাধন চটেছেন।

অসাধ্যসাধন বলতে লাগলেন, ' আপনারা প্রেম নিয়ে খেলা করবেন আর তার জন্যে আমাদের এতকালের বাসস্থান ডুবে যাবে তা আমি হতে দেব না--''

রুদলবাবু আবার হেসে উঠলেন। হাততালি দিয়ে দিয়ে হাসতেই লাগলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, ''নিশ্চয়ই না।

হু হু করে গাড়ি চলেছে। বিশ্বদীপের মনে হল এমনি গাড়ি চড়েই যদি স্থান আর কালের সীমা পার হয়ে যেতে পারতাম। তাঁর মনে হতে লাগল স্থান আর কালের সীমা তিনি যদি পার হয়ে যেতে পারতেন তাহলে হয়তো স্মৃতির সীমাও পার হয়ে যেতেন। স্থান আর কাল নিয়েই তো স্মৃতি। এই স্মৃতির হাত থেকে মুক্তি পেলে হয়তো তিনি ভাবতে পারতেন, হয়তো ভাবতে সাহস করতেন যে, তিনিও স্বাভাবিক সহজ সামাজিক লোক। কিন্তু তিনি স্মৃতির যে জগতে বাস করেন সেখানে একটিও স্বাভাবিক লোক নেই। পাঠকজির মতো বন্ধুবৎসল লোক কি স্বাভাবিক? টমসন-দম্পতি কি স্বাভাবিক? ডাক্তার ঘোষাল? আর্টিস্ট নবনী দাস? কবি শ্যামল সোম, রুটি-ওলা অনন্ত, বই-ওলা অনঙ্গ এরা কেউ তো স্বাভাবিক নয়। বিজনবালা, মহুয়া, ধাকড়, বামু, আফজাল—এমন কি ওই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার

কারফরমা? সবাই অস্বাভাবিক। যারাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছে কেউ সাধারণ লোক নয় সবাই অসাধারণ। সেইজন্যে মাঝে মাঝে তাঁর সন্দেহ হয় হয়তো তিনিও অস্বাভাবিক, তিনিও অসাধারণ। কিন্তু তিনি অসাধারণ হতে চান না। সাধারণ লোকের তুচ্ছ সুখদুঃখে আন্দোলিত হয়ে, সাধারণ লোকের মতো আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে, তাদের ভালবাসা ঘৃণার স্বাদ গ্রহণ করতে করতে তিনি অতি সাধারণ জীবনযাপন করতে চান। সাধারণ লোকের মতোই তিনি অন্যায় করতে চান, অসাধু হতেও তাঁর আপত্তি নেই। সাধারণ লোক হলে তিনি বিদুলাকে এতদিন পেতে পারতেন, কিন্তু তাঁর অতি-শুচি, অতি-ভদ্র অসাধারণ বিবেক তাঁকে বাধা দিচ্ছে, তাঁকে অগ্রসব হতে দিচ্ছে না, তিনি একদল অস্বাভাবিক অসাধারণ লোকদের ভিড়ে নিজেব দুর্ভাগ্যেব জন্য গলা ছেড়ে কাঁদতে পর্যন্ত পারছেন না, কেবল আত্মগোপন করছেন, মুখোশের পর মুখোশ পবছেন। সিংহ তাঁকে বলে দিয়েছে, শেষ পর্যন্ত কিছুই লুকনো যাবে না, তবু তিনি লুকোতে চেষ্টা করছেন। বিদুলাই বা তাঁব কাছে আসছে না কেন? কেন সে ইতস্তত কবছে? পুরুষরাই এগিয়ে গিয়ে সর্বপ্রথম প্রণয় নিবেদন করবে এই হাস্যকর নিয়মের শৃঙ্খলে সে নিজেকে বেঁধে রেখেছে কেন? প্রেম তো সব শৃঙ্খলই ছিন্ন করে। বিদুলা এ শৃঙ্খল ছিঁড়তে পারছে না কেন? কেন? কেন? কেন? তাঁর চেতনায় হাতুড়ির মতো এই প্রশ্নটাই বার বাব আঘাত কবতে লাগল। চোখ বুজে তিনি বসে রইলেন পিছনের সীটে হেলান দিয়ে। অনেকক্ষণ কেটে গেল। তারপর হঠাৎ তিনি উঠে বসলেন। চোখ খুলে দেখলেন অন্ধকাব চাবিদিকে।

"রণছোড়, আমরা কতটা রাস্তা এসেছি?"

"দো শ' মাইল—"

" গাড়ি ঘোবাও, চল বাড়ি ফিরি এবার।"

গাড়ি যখন বিদুলার বাড়িব সামনে থামল তখন রাত দুটো। বিশ্বদীপ টর্চ জ্বেলে তাঁর হাতঘড়িটা আর একবার দেখলেন ভালো করে। হ্যাঁ, দুটোই। টর্চ নিবিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে বাড়িটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। নীচে বাইরের একটা ঘরে আলো জ্বলছে। নিবিড় অন্ধকারের পটভূমিকায় জানালাটা মনে হচ্ছে যেন একটা আলোর ছবি, রূপকথালোকের বাতায়ন যেন। অনেকক্ষণ মুগ্ধ লোলুপ দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রইলেন সেদিকে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন জানলার উপর কালো মতো কি যেন রয়েছে একটা। আর একটু কাছে গিয়ে বুঝতে পারলেন রংবাহারী বসে আছে। তাঁকে দেখেই রংবাহারী পাখা কাঁপাতে লাগল। বিশ্বদীপের মনে হল একটা আনন্দের ফুলঝুরি যেন জ্বলে উঠল। সেই কাঁপনের ভাষাও বুঝতে পারলেন তিনি।

"ও আপনি! এতদিন পরে এলেন! আমি আপনার বিদুলার কাছে রোজ আসি। রোজ এসে এই জানলার কাচে বসে থাকি। কি সুন্দর যে আপনার বিদুলা! একটু আগে লিখছিল। এখন ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু আলোটা নেবায় নি। টেবিলের উপর মাথা রেখেই ঘুমিয়েছে। না এখান থেকে দেখা যাবে না। ওই বারান্দা দিয়ে যান। কপাট খোলাই আছে। আর কেউ

নেই কাছেপিঠে। চাকররা সব শুয়ে পড়েছে। আমার মতো বিদুলাও নিশুতি বাতে একা থাকতে ভালবাসে। কাউকে কাছেপিঠে থাকতে দেয না। আমি কিন্তু চুপটি কবে এই জানলাটিতে এসে বসি। আপনি যান না ওদিক দিয়ে—''

বিশ্বদীপ এগিয়ে গেলেন বারান্দার দিকে। বাবান্দায় উঠেই ডান দিকে দেখতে পেলেন বিদুলাব ঘবটা। ঘবের কপাটটা আধখোলা। সন্তর্পণে গিয়ে উঁকি দিলেন। বিদুলা টেবিলের উপর মাথা বেখে ঘুমুচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন কাঁদছে। আলুলায়িত কুন্তল স্তূপীকৃত হয়ে আছে—যেন একরাশ ঘন অন্ধকাব। আস্তে আস্তে ঢুকলেন তিনি ঘরেব মধ্যে। টেবিলেব কাছে গিয়ে দেখলেন অঘোরে ঘুমুচ্ছে বিদুলা। মুখেব সবটা দেখা যাচ্ছে না, গালেব খানিকটা দেখা যাচ্ছে। পুবাতন উপমাটা মনে পড়ল বিশ্বদীপেব, মেঘেব ভিতব থেকে চাঁদ উঠছে। কযেক মুহূর্ত নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে বইলেন। তাবপব চোখে পড়ল পাতলা ছাপা শাড়িব আঁচলটা বুকেব কাছে কাঁপছে ফ্যানেব হাওযায। তাবপব দেখতে পেলেন সুদৃশ্য খাতাটা। আব একটু এগিযে গেলেন। সমস্ত শবীব বোমাঞ্চিত হযে উঠল। খাতাব উপব গোটা গোটা অক্ষবে লেখা বযেছে—''বিশ্বদীপ সুন্দব। সুন্দব সুন্দব সুন্দব সুন্দব। আকাশেব মতো সুন্দব, আলোকেব মতো সুন্দব, কুসুমেব মতো সুন্দব। সে সুন্দব বলেই তাকে ভালবাসি, তাই তাব রূপেব সাগবে ঝাঁপ দিযেছি। সে ভালো কি মন্দ, ধনী কি নির্ধন এসব ভাববাবও আমি সময পাইনি। সে সুন্দব, সে কমনীয সে অলোকসামান্য সে জ্যোতির্ময, সে অনবদ্য, আমাব অন্তবেব সমস্ত অর্ঘ্য তাব পাযে উজাড কবে অপেক্ষা কবছি যে কখন আসবে।'' বিশ্বদীপ আব একবাব চেয়ে দেখলেন বিদুলাব দিকে। মনে হল আত্মসমর্পণ মূর্ত হয়ে উঠেছে তাব সর্বাঙ্গে, তাব অন্ধকাব নিবিড় কালো চুলে, তাব কম্পমান নিচোলে। তিনি তাকে সব কথা খুলে বলবেন বলে এসেছিলেন, কিন্তু লেখাটা পড়ে মনে দ্বিধা জাগল। আবও কযেক মুহূর্ত দাঁডিযে থেকে ধীবে ধীবে আবাব বেবিয়ে এলেন তিনি।

বাড়ি ফিবে দেখলেন গেটের কাছে মহুযা বসে আছে। তাঁকে দেখেই সে উঠে দাঁড়াল, তাবপর ধীবে ধীরে তার ঘরের দিকে চলে গেল। তিনি যে নিবাপদে ফিরেছেন এইটুকু জানবার জন্যেই সে যেন বসেছিল।

ছকু খাবার গরম করে বেখেছিল। কিন্তু তিনি বিশেষ কিছু খেলেন না। একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লেন। চোখ বুজতেই বধূসরা এসে দাঁড়াল তাঁর চোখের সম্মুখে। বধূসরাব চোখেমুখে আনন্দ ঝলমল করছে। মনে হল সে যেন মূর্তিমতী জযজযন্তী সুব।

বলল, ''সাগবকে আমি পেয়েছি। মণিমাণিক্যখচিত একটি চমৎকার গামলায় কবে অসাধ্যসাধন সাগরকে দিয়ে গেছেন আমাব কাছে। আমার সারা দেহে মনে সাগরের কল্লোল এখন। উৎপলেশ্বরীও আকুল হয়ে উঠেছে। অত বড় সাগর ছোট হযে এসেছে আমার বুকে, আশ্চর্য নয়? এসেছে কিন্তু, দেখবেন?''

বধূসরা মিলিযে গেল। বিশ্বদীপ দেখলেন বধূসরা নদী দুলে দুলে কলস্বরে বয়ে চলেছে, তার ঊর্মিমালায় সাগরের মহিমা।

।। ষোলো ।।

শ্যামল সোম সত্যিই একদিন কথাটা পাড়ল নয়নতারার কাছে। সব শুনে নয়নতাবা বলল, "আমার কিচ্ছু আপত্তি নেই। তোমরা যাতে সুখী হও তাই আমি করব। তোমাদের সুখী কবাই আমাব জীবনের ব্রত। তোমার বন্ধু যা বলবেন তাই হবে। তবে তোমার বউদি কিছু মনে কববেন না তো?"

"মনে হয় কববেন না। কাবণ তোমাকে আমরা নিয়ে যাব অনন্তব দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া হিসাবে। তুমি সেখানে রান্না করবে, অনন্তর একটু-আধটু সেবা করবে, তারপব রাত্রে আবাব এখানে ফিবে আসবে। এ বাড়িটা তোমাব যেমন আছে তেমনি থাকবে। অনন্ত তাব বউকে একদম দেখে না সমস্ত দিন দোকানে থাকে, সন্ধের পব তোমাব কাছে যায়। তুমি যদি ওখানে গিয়ে থাকো, তাহলে অনন্ত যাবে ওখানে; বউটাব কাছে থাকবে খানিকক্ষণ। এবকম করতে করতে হয়তো মাযাও বসে যাবে একটা। বউদিকে দেখে ভাবী কষ্ট হয় আমার। সংসাবের কাজে একটুও মন নেই, সেবা কবতে জানে না, কেমন নিজেকে নিযেই আছে। তুমি হযতো ওকে শুধবে দিতে পাববে। অনন্তব যদি মা বা দিদি থাকত তাহলে হয়তো এসব হত না। তোমাব যেতে তাহলে আপত্তি নেই?"

নযনতাবা বলল, "বলছ যখন যাব। কিন্তু তোমার এ নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন বল তো?"

শ্যামল সোম মুচকি হেসে চুপ করে রইল।

তাবপর হঠাৎ জিগ্যেস কবল, "একটা কথা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমাকে তুমি ভালবাস বলে হযতো এককথায় বাজী হয়ে গেলে। এতে তোমার আত্মসম্মানে ঘা লাগবে না তো?"

নযনতাবা মুচকি হেসে হাত উলটে বলল, "ঘটি বাটি বাক্স তোরঙ্গর আবাব আত্মসম্মান থাকে নাকি। জানতুম না তো"

শ্যামল সোমেব মনে হল সে হঠাৎ যেন নযনতারার অন্তরলোকেব একটা গোপন কক্ষে গিযে হাজির হয়েছে। চক্ষু বিস্ফাবিত করে বলল, "তুমি নিজেকে এত ছোট মনে কব?"

"ছোট মনে করব কেন? ঘটি বাটি বাক্স তোরঙ্গ কি ছোট জিনিস? ও নইলে পৃথিবীব কাবো কি চলে? আর যারা নিজেদের মানুষ বলে পরিচয় দেয় তাবাই বা কি এমন বড়। অনেক মানুষ তো দেখলুম। তুমি আত্মসম্মানের কথা বলছিলে, কারই বা আত্মসম্মান আছে বল!"

শ্যামল চুপ কবে রইল। এ উত্তর শুনবে সে প্রত্যাশা করেনি।

নয়নতারা আবার তাকে জিগ্যেস করল, "তুমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন বল তো—"

"আমার নিজের যে কেউ নেই দিদি। কিছু নিয়ে তো একটা থাকতে হবে। আগে চাকরির চেষ্টায় ঘুরতুম, অনেক সময় কেটে যেত। এখন চাকরি পেয়ে গেছি, তাই হাতে সময় প্রচুর। চাকরি তো দশটা পাঁচটা, বাকি সময়টা কি করি"

" শুনেছি তুমি কবিতা লেখ"

"লিখি। কিন্তু কবিতা রোজ লেখা যায় না। ওবা প্রজাপতিব মতো মনের বাগানে মাঝে মাঝে আসে। যখন আসে তখন ধরবাব চেষ্টা করি। ওই চেষ্টাটাই কবিতা। কিন্তু ওরা রোজ তো আসে না।"

এর পর নয়নতারা যা বলল তা আরও বিস্ময়কব মনে হল শ্যামল সোমের। মনে হল এতদিন সে নয়নতারার কিছুই বোঝেনি।

"তুমি ভগবান মানো?"

"না।"

"ভগবানই তো কবিতা। কবিতা মানো অথচ ভগবান মানো না, এ তো ভাবি আশ্চর্য, তুমি মানো, কিন্তু জানো না যে মানো। ভগবানই কবিতার প্রজাপতি হয়ে আসেন তোমাব মনে। নানা রূপে তিনি আসেন। তাঁকেই ধরবার চেষ্টা কর, দেখবে তোমার, সময় ভালোভাবে কেটে যাবে।"

"তুমি ভগবান মানো?"

"হ্যাঁ। আমা‌র গোপাল আছে।"

"যে গোপাল তোমার জীবনকে দুঃখময় করেছেন সে গোপালকে ভালবাস তুমি?"

"আমিই আমার জীবনকে দুঃখময় কবেছি, গোপাল তো করেনি। তাছাড়া আগে যেটা দুঃখ বলে মনে হত এখন তা আব দুঃখ বলে মনে করি না। খড়কুটো ভেসে চলেছে, খড়কুটোব আবাব সুখ দুঃখ কি"

"দিদি তুমি গ্রেট। চললাম। এবার বউদিব সঙ্গে কথা বলে দেখি—"

বিজনবালা একগাদা বিজ্ঞাপন নিয়ে বসেছিল সাইকেলের বিজ্ঞাপন, ঘড়ির বিজ্ঞাপন, শাড়ির বিজ্ঞাপন, ওষুধের বিজ্ঞাপন, গহনার বিজ্ঞাপন—আরও নানা রকম বিজ্ঞাপন। প্রত্যেক বিজ্ঞাপনের জন্য সে আলাদা আলাদা ফাইল করে সেগুলো গুছিলে রাখছিল, এমন সময় শ্যামল সোম হাজির হল গিয়ে।

"এসব কি হচ্ছে—"

"কতগুলো বিজ্ঞাপন পেয়েছি দেখুন। এই শাড়ির বিজ্ঞাপনের ছবিটা কি সুন্দর—! সব আলাদা আলাদা করে রাখছি। বিশ্বদীপ বাবুকে ফোন করেছি, তিনি আসবেন বলেছেন আজ। জানেন, উনিও আমার জন্য নানারকম বিজ্ঞাপন যোগাড় করেছেন। কি মজা!"

"আর একটা মজার খবর আছে—"

"কি"

"অনন্তর এক দূরসম্পর্কের দিদি এসেছেন। অনন্ত তাঁকে মাসিক কিছু টাকা সাহায্য করতে চায়। ভদ্রমহিলা এখানে ছোট একটা বাসা ভাড়া করে আছেন। খুব কষ্টে আছেন কিন্তু মুখ ফুটে টাকা চাইতে পারছেন না। অনন্ত যখন বলল, আমি তোমাকে মাসে মাসে কিছু সাহায্য করব, তখন তিনি বললেন, আমি ভিক্ষে নেব না। তবে তোমার যদি গেরস্থালির কোন কাজ

থাকে তা করে দিয়ে তার বদলে কিছু নিতে পারি। তাই অনন্ত তাঁকে এখানকার রাঁধুনীর কাজে বাহাল করেছে। দু'বেলা এখানে রেঁধে-বেড়ে সকলকে খাইয়ে বাড়ি চলে যাবেন।....."

বিজনবালা এ সংবাদে পুলকিতই হল। তার জন্য তার স্বামী একটা রাঁধুনী রাখছে এটা তো বন্ধুবান্ধব মহলে বলে বেড়াবার মতো কথা। তার বন্ধুবান্ধব মহল অবশ্য খুব বড় নয়, তবু পাড়ার দারোগাবাবুর বউ, লাইফ ইনসিওরেন্সের দালাল চণ্ডীবাবুর বউ, পাঁচু কেরানীর বউ এবং আরও দু'চারজনের সঙ্গে তার একটু-আধটু মেলামেশা আছে বইকি। তাদের কাছে সে নিজের বাপের বাড়ির গল্পটা খুব ফলাও করে বলে, যদিও তার বাবা বা বাপের বাড়ির লোকেরা তার তেমন কোন খবর নেন না। কোনক্রমে মেয়ের বিয়েটা দিয়ে বিজনবালার বাবা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। বিজনবালার মা থাকলে হয়তো খবর নিতেন কিন্তু তিনি বহুকাল মারা গেছেন। তবু বিজন তার বাবা আর বাপের বাড়ির গল্পই করে ফেনিয়ে ফেনিয়ে। তাদের বাড়িতে যে একটা পুরোনো আমলের বড় দেওয়ালঘড়ি আছে, যেটা পনের মিনিট অন্তর অন্তর বাজে, তাদের যে স্প্যানিয়েল কুকুর আছে, তাদের বাড়ির মেজে যে মার্বেল দিয়ে বাঁধানো—এই সব গল্পই করে সে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। এইবার সে বলতে পারবে তার জন্যে তার স্বামী একটা আলাদা রাঁধুনী রেখে দিয়েছে। চেনাশোনা কারও বাড়িতে রাঁধুনী নেই, সব ঠিকে ঝি, সবাই নিজে রান্না করে। চণ্ডীবাবু সেদিন একটা কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড বাহাল করেছেন। বিজনবালার রাঁধতে মোটেই ভালো লাগে না। সে রাঁধতে জানেও না তেমন। কেউ তো শেখায়নি, জানবে কি করে।

বিজনবালা বলল, "হঠাৎ আপনার বন্ধুর এ সুমতি দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। রান্নাঘরের ধোঁয়ায় আর গরমে সত্যিই বড় কষ্ট হত আমার। ওই দাইটাকেই কিছু পয়সা দিতুম, সেই যা হোক করে দিয়ে যেত। ভদ্রমহিলা রাঁধতে পারেন তো?"

"শুনেছি চমৎকার রাঁধেন"—একটু ইতস্তত করে শ্যামল বলল, "অনন্তও বললে কাল থেকে সকাল সকাল সে বাড়ি ফিরবে।"

"ও তাই নাকি"

এ খবরটায় খুব সন্তুষ্ট হল না বিজনবালা। স্বামী অনেক রাত্রে ফেরে এই সুযোগ নিয়ে সে সিনেমা-টিনেমা যায়, একটি মহিলা সমিতিতে গিয়েও পাণ্ডাগিরি করে, অনন্ত সকাল সকাল বাড়ি ফিরলে সে-সব আবার বন্ধ হয়ে যাবে না তো।

"আজ উঠি বউদি। আমাকে অনঙ্গের কাছে যেতে হবে—"

"একটু চা করে দি?"

"না। তার চেয়ে চলুন পাড়ায় নতুন যে রেস্তোরাঁটা খুলেছে সেখানে বসে কফি আর চিংড়ি কাটলেট খাওয়া যাক। আমিই খাওয়াব আজ আপনাকে। আপনি তো প্রায়ই আমাকে খাওয়ান—"

চিংড়ি কাটলেটের উপর বিজনবালার খুব লোভ। তার চোখ দুটো প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু শ্যামলের শেষের কথা কটি শুনে বেচারীর মুখে বিষাদের ছায়া পড়ল একটা।

"আমি আপনাকে কোনদিনই তো কিছু খাওয়াতে পারি নি। কালে ভদ্রে দু'এক কাপ বাজে চা খাইয়েছি হয়তো।"

"তাই বা কে খাওয়ায় এ বাজারে। চলুন, আর দেরি করবেন না।"

রেস্তোরাঁয় গিয়ে শ্যামল সোম ছ'খানা কাটলেটের অর্ডার দিল। অবাক্ হয়ে গেল বিজনবালা।

"অত কাটলেন কে খাবে—?"

"আপনি চারখানা, আমি দুখানা।"

"আমি চারখানা খেতে পারব না।"

"তাহলে খানদুই নিয়ে যান অনন্তর জন্যে। খাবার সময় গরম করে দেবেন। বলবেন আমি কিনে দিয়ে গেছি। খুব খুশী হবে।"

দূরের একটা ঘড়িতে টং টং করে এগারোটা বাজল। অনন্ত এখনও আসে নি। অবশ্য অনন্তর ফিরতে এর চেয়েও বেশি রাত হয় প্রায়। বিশ্বদীপ আসবেন বলেছিলেন, কিন্তু কই তিনিও তো এলেন না। বিজনবালা জানলার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সামনেব খোলার ঘরের চালে রাস্তার আলো পড়েছিল। সেই চালের উপর দিয়ে একটা সাদা বিড়াল আস্তে আস্তে অগ্রসর হচ্ছিল পাশের বাড়ির ছাদে যাবে বলে। রোজই যায়। বিজনবালা প্রায়ই দেখতে পায় ওকে। কিন্তু কোনদিন যে কথাটা মনে হয়নি সেদিন তা হল। বিড়ালদের যদিও ঘড়ি নেই কিন্তু ওরা ঠিক সময় ঠিক কাজটি করে। রোজ রাত এগারোটার পর ওপাশের বাড়ির ছাদে যায়। মানুষের ঘড়ি আছে কিন্তু মানুষ ঘড়ি ধরে কাজ করে কি সব সময়ে?

.....বিশ্বদীপের গাড়িটা এসে দাঁড়াল। বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল বিজনবালাব। অত বড় লোক এসেছেন তার এই বাড়িতে, কি দিয়ে অভ্যর্থনা করবেন তাঁকে? তাড়াতাড়ি জানলা থেকে সরে গিয়ে সে বিছানার চাদরটা আর একবার ঝেড়ে ফেললে তাড়াতাড়ি, তারপর চেয়ারের কুশনটা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চুলটাও ঠিক করে নিলে তাড়াতাড়ি। হঠাৎ অনন্তর গলা শুনতে পেল সে। অনন্তই আগে এসে ঘরে ঢুকল। সে-ই অভ্যর্থনা করল।

"আসুন, আসুন, গরীবের কুঁড়েঘরে আপনি যে আসবেন এ তো আমার কল্পনাতীত ছিল। আসুন—"

একটা ফাইল বগলে করে বিশ্বদীপ ঢুকলেন। বিজনবালাকে নমস্কার করে বললেন, "এই নিন। কয়েকরকম বিজ্ঞাপন আছে এর মধ্যে। আরও যোগাড় করে দেব। এগুলোকে 'ক্লাসিফাই' করে সাজান আগে। তারপর ওর থেকে কোন প্রবন্ধ খাড়া করা যাবে পরে। আগে 'ডেটা'গুলো সংগ্রহ হোক"

অনন্ত একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিছুই মাথায় ঢুকছিল না তার। কয়েকদিন থেকে সে দেখছিল যে বিজনবালাও নানারকম বিজ্ঞাপন কেটে কেটে ফাইলে রাখছে। এ ভদ্রলোকও একগাদা বিজ্ঞাপন বগলে করে এনেছেন। ব্যাপার কি।

সে সরল মানুষ, সরল ভাবেই বলল, "বিজনও কয়েকদিন থেকে বিজ্ঞাপন নিয়ে মেতেছে। আপনিও একগাদা বিজ্ঞাপন এনেছেন দেখছি। ব্যাপার কি?"

বিশ্বদীপ হেসে বললেন, "গুরুগম্ভীর কিছু নয়। ছেলেখেলা। সময় কাটাবার জন্যে অনেকে ব্যবসা করে, তাস খেলে, রেস নিয়ে মাতে, ছবি আঁকে, কবিতা লেখে—আমি আপনার স্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছি বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে। ওতে বেশ সময় কাটবে"

"ওকে রান্নাবান্নার কাজে যদি মন দিতে বলতেন তাহলে আমার একটু সুবিধে হত।"

"ও তাই বুঝি! আমিও ও-বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। ছকুই আমার ভরসা। মিসেস রায়ের ওদিকে ঝোঁক নেই বুঝি—"

বিজনবালা মাথা নেড়ে জানাল, নেই।

বিশ্বদীপ অনন্তর দিকে হাসিমুখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "আমারও অভিজ্ঞতা আপনার মতো। আমার সুবিধার জন্য কেউ কিছু করুক যখনই এ প্রত্যাশা করেছি তখনই ঠকেছি। তাই আর সে প্রত্যাশা করি না। জানেন, পৃথিবীতে আমার সত্যিকার আপন লোক কেউ নেই। যারা আমার আশে-পাশে ঘোরে তারা একটা-না একটা স্বার্থের জন্যই ঘোরে। আমি একা। তাই নিত্য নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করবার আমার এত আগ্রহ। যদি অসম্ভব সম্ভব হয়, যদি সত্যিকার বন্ধু পেয়ে যাই একজন। আচ্ছা, চললুম। বিজ্ঞাপন আরও কিছু যোগাড় হলে পাঠিয়ে দেব। আচ্ছা নমস্কার।"

"আমার বিজ্ঞাপনগুলো দেখবেন না?"

"আজ থাক। আর একদিন দেখব।"

নমস্কার করে একটু দ্রুতবেগেই নেমে গেলেন বিশ্বদীপ। হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে তিনি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন একটু। তিনি এসেছিলেন ডাক্তার কারফরমার কাছে ওষুধ নিতে। সেই সময়েই অনন্তকে এসে বলেছিলেন, "চলুন, আপনার বাড়ি যাব। আপনার স্ত্রীকে কিছু দিতে হবে।"

"কি?"

"বিশেষ কিছু নয়। যখন দেব তখন দেখবেন"—তারপর একটু হেসে বলেছিলেন, "সেদিন মীটিংয়ে আলাপ হয়েছিল আপনার স্ত্রীর সঙ্গে। বলেছিলাম আসব একদিন, তাই এমনি আর কি, এদিকে এলাম, ভাবলাম একবার—"

কথাটা অসমাপ্ত রেখে থেমে যেতে হয়েছিল বিশ্বদীপকে।

"চলুন, চলুন, এ তো আমার সৌভাগ্য, পরম সৌভাগ্য—"

অনন্ত রায় রুটি-ওলা হলেও কি করে ভদ্রতা করতে হয় তা সে জানে। তার ভদ্রতাটা মুখোশও নয়, আন্তরিক। সে কিন্তু এদের মতিগতি বুঝতে পারে না। তার বাল্যবন্ধু শ্যামলও তার কাছে রহস্য। অনঙ্গটাও কেমন যেন। টাকা রোজগার করছে, সুস্থ সবল শরীর, কিন্তু বিয়ে করবে না। কদমছাঁট চুল ছেঁটে দিনরাত বই পড়ছে আর বক্তৃতা করছে।

বিশ্বদীপ অনন্তর বাড়ি থেকে সোজা মাঠে গেলেন। সেখানে মাঠের চারদিকেই ঘুরে বেড়ালেন অনেকক্ষণ। বিদুলার অজ্ঞাতসারে তার মনের যে খবরটা তিনি জেনে ফেলেছিলেন সেই খবরটা শূলের মতো বিঁধেছিল তাঁর চেতনায়, অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক একটা পরম সুখ তীব্র

মদিরার মতো সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছিল তাঁর শিরায় উপশিরায়। তিনি ঠিক করতে পারছিলেন না কি করবেন। সিংহের কথাটাই বার বার মনে পড়ছিল—শেষ পর্যন্ত কিছুই লুকোনো যাবে না। যাবে না? ডাক্তার কারফরমার ওষুধে পায়ের বোদা-ভাবটা কিন্তু কমেছে একটু। কিন্তু তবু তাঁর অর্ন্তযামী সিংহের কথাতেই সায় দিচ্ছে—যাবে না, যাবে না, শেষ পর্যন্ত লুকোনো যাবে না। কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থাকবার জন্যেই তিনি বিজনবালার কাছে যাবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও তো বেশীক্ষণ থাকা গেল না। বেশীক্ষণ কোথাও থাকা যায় না, মনে হয় এখুনি বুঝি অসাবধানে আত্মপ্রকাশ করে ফেলব। হঠাৎ নজরে পড়ল—গাড়িতে পেট্রোল কমে গেছে। তাড়াতাড়ি একটা পেট্রোল পাম্পের দিকে এগিয়ে গেলেন। যে ছেলেটি পেট্রোল দিতে এল তার বয়স কম, চোখে-মুখে যৌবনের প্রসন্ন দীপ্তি।

রণছোড় সঙ্গে ছিল না, বিশ্বদীপ নিজে গিয়েই পেট্রোল ট্যাঙ্কের ক্যাপটার খুলে দিলেন। পেট্রোল নেওয়া হয়ে গেলে গল্প জুড়ে দিলেন তার সঙ্গে। তার জীবনের খুঁটিনাটি সব খবর সংগ্রহ করলেন। বাপ মা ছেলেবেলায় মারা গেছে। বাড়ি ভাগলপুর জেলার পুরৈনি গ্রামে। দেশে তিন বিঘে জমি আছে, সে জমির দেখাশোনা তার কাকা করে। বিয়ে হয়েছে, গওনা হয়েছে, বউ তার চাচীর কাছেই আছে এখন। সে কিন্তু বউয়ের কাছে যেতে পারে না। ছুটি পেতে পারে, কিন্তু যাওয়া আসার ভাড়াই প্রায় কুড়ি টাকা। তাছাড়া গেলে শুধু হাতে যাওয়া যায় না, তাব চাচীব জন্যে আর বউয়ের জন্যে অন্তত একখানা করেও শাড়ি নিয়ে যেতে হবে। তার মানে আরও পঁচিশ টাকা চাই। অত টাকা সে জমাতে পারেনি এখনও। কলকাতা শহরে এত খরচ—কবে যে জমাতে পারবে তারও ঠিক নেই। বিশ্বদীপ নাটকীয় কাণ্ড করে বসলেন একটা। পেট্রোলের দাম চুকিয়ে দেবার পর আরও পাঁচখানা দশটাকার নোট বার করে বললেন, "এই নাও, তোমার বউয়ের সঙ্গে মোলাকাত করে এস—"

অবাক হয়ে চেয়ে রইল ছেলেটি। সে প্রথমে বুঝতেই পারল না ব্যাপারটা।

"আপনি টাকা দিচ্ছেন কেন হুজুর।"

"বাড়তি টাকা এখন আমার হাতে আছে, তাই দিলাম। তোমার যদি এতে আনন্দ হয়, আমারও আনন্দ হবে। আমি তোমার পর নই, আমিও তোমার আপন লোক।"

টাকাটা একরকম জোর করেই তার হাতে গুঁজে দিলেন। ছেলেটির চোখ দুটি জলে ভরে উঠল। সে সেলাম করে সরে দাঁড়াল।

গাড়ি যখন স্টার্ট নিয়ে একটু দূর এগিয়েছে তখন সে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এল—"হুজুর আপনার নাম কি, পাতা কি— "

বিশ্বদীপ তাঁর নিজেব একখানা কার্ড বার করে দিলেন তাকে।

বিশ্বদীপ অনঙ্গ সেনের বইয়ের দোকানের সামনে দিয়ে ফিরছিলেন। দেখলেন দোকান তখনও খোলা। গাড়িটা থামিয়ে নামলেন তিনি। শুনতে পেলেন অনঙ্গ সেন বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলছে—"না, না, মানুষ এখনও পেছিয়ে আছে অনেক। মানুষ যুগে যুগে মুখোশ আর পোশাক বদলাচ্ছে খালি, ভিতরে সে যেমন পশু ছিল এখনও তেমনি পশু আছে। যে সাম্য

আমাদের লক্ষ্য সেখানে আমরা এখনও পৌঁছইনি। সাম্যবাদীর পোশাক পরে সাবেক ক্ষমতালোলুপ পুঁজিবাদীরাই রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ দখল করে রেখেছে এখনও। যে উদারতা, যে নিঃস্বার্থপরতা, যে নিষ্ঠা, যে স্বাবলম্বন প্রকৃত সাম্যবাদের পটভূমিকা হওয়া উচিত, তা আমাদের কারো নেই। আমরা সবাই মতলববাজ পশু। নেতারা দাবা-খেলোয়াড়, কখনও হারছেন কখনও জিতছেন। কে? ও আপনি, আসুন, আসুন।"

বিশ্বদীপ হেসে বললেন, "এই দিক দিয়ে ফিরছিলুম। আপনার বক্তৃতা শুনে নেমে পড়লাম। মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করছেন নাকি—"

শ্যামল সোম হেসে বলল, "আর কিছু করবার নেই বলে ওই নিয়ে একটু বাগাড়ম্বর করা যাচ্ছে। অনঙ্গ বলে ভালো। বসুন"

বিশ্বদীপ বললেন, "আপনি যা বললেন তার খানিকটা আমি শুনেছি। আপনার মত তাহলে ধর্মই কি আমাদের পরিত্রাণের উপায়—"

অনঙ্গ হেসে বলল, "আমার কোনও মত নেই। কিসে কি হবে তা জানি না। ইতিহাসের নজিরও আমার অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। যে যুগে তৈমুর লং বা নাদির শাহ এদেশে এসেছিলেন সে যুগে এদেশে অনেক ভালো লোকও ছিল নিশ্চয়। কিন্তু ইতিহাসে তাদের উল্লেখ নেই, উল্লেখ আছে ওই পিশাচ দুটোর। পিশাচরাই ইতিহাসের প্রধান ব্যক্তি, ভদ্রলোকেরা নন। ধর্মের কথা বলছিলেন? একজন বড় ইংরেজ লেখক বলেছেন—When I consider the history of religion, I find no warrant for affirming that its services have out-weighed its disservices, Jesus Christ, the greatest and I think, the sanest of enthusiasts, lit the fires of the Inquisition and set up the Pope at Rome. Mahomet deluged the earth with blood and planted the Turk on the Bosphorus. Saint Frances created a horde of sturdy beggars. Luther declared the Thirty Years War...."

অনঙ্গ গড় গড় করে মুখস্থ বলে গেল।

"ইংরেজ লেখকটি কে?"

"Lowes Dickinson আমাদের দেশেও অনেক মহাপুরুষ জন্মেছেন—বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী—কিন্তু তার ফল কি হয়েছে? আমরা যেমন পশু ছিলাম তেমনি আছি। আর প্রত্যেক মহাপুরুষকে কেন্দ্র করে একদল ভণ্ড গুলতানি করছে। মহাত্মাজির অহিংসার মন্ত্র, প্রেমের বাণী তাঁকেও বাঁচাতে পারেনি, দেশকেও পারেনি। দেশ দু'টুকরোই হয়নি, টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতাব বিষ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ গেছে, লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহারা হয়েছে। আমি অহিংসার মন্ত্র বা প্রেমের বাণীকে ছোট করছি না, আমি বলছি দেশের উপর ওসবের সত্যিকার কোন প্রভাব পড়েনি। স্বার্থপরতাই পশুর ধর্ম, আমরা সেই পশুত্বের ঊর্ধ্বে উঠতে পারিনি এখনও। আর তা যতক্ষণ না পারছি ততক্ষণ সাম্যের বাণী মুখের বুলি মাত্রই হয়ে থাকবে। তাই শ্যামলকে বলছিলাম, তুমি অধ্যাপক হয়েছ, তোমার দায়িত্বই সব

চেয়ে বেশী। পশুকে মানুষে রূপান্তরিত করতে হবে। তবেই তো সে দুর্গম গিরি কান্তার মরু পার হয়ে আদর্শলোকে দেশকে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু আমাদের শিক্ষালয়ে সেই কাজটাই হচ্ছে না। আমরা এখনও কতকগুলো অমানুষ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ম্যাজিস্ট্রেট, মন্ত্রী, লেখক আর কেরানী সৃষ্টি করে চলেছি...''

ঘড়িতে টং টং করে বারোটা বাজল। শ্যামল উঠে পড়ল।

''এবার তোমার বক্তৃতা থামাও। অনেক রাত হয়ে গেল। আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। তুমি তো আলোটি নিবিয়ে এইখানেই শুয়ে পড়বে।''

বিশ্বদীপও উঠে পড়লেন।

''চলুন, আপনাকে নাবিয়ে দিয়ে যাই—''

অনঙ্গ তখনও উত্তেজিত হয়ে বসে ছিল।

হঠাৎ বলল, ''ও, হ্যাঁ, সত্যিই অনেক রাত হয়ে গেছে। আচ্ছা নমস্কার!''

বিশ্বদীপ সেদিনও ফিবে দেখলেন মহুয়া গেটের পাশে চুপ করে বসে আছে। তাঁর গাড়ি গেটে ঢুকতেই সে উঠে চলে যাচ্ছিল। বিশ্বদীপ তাকে ডাকলেন।

''তুমি এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ কেন?''

''এমনি। ঘুম হয় না, তাই বসে থাকি।''

আর কিছু না বলে চলে গেল সে আস্তে আস্তে।

বিশ্বদীপ খাওয়া সেবে যখন শুলেন তখন তাঁর মুদিত চোখের সামনে বিদুলার সেই খাতার পাতাখানা ভেসে উঠল। তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—''বিশ্বদীপ সুন্দর। সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর, সুন্দব. ..''।

।। সতেরো ।।

টমসন সায়েবের একটা চিঠি ও চেক পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন বিশ্বদীপ। টমসন লিখেছেন,—বাংলাতেই বড় বড় হরফে ছোটছেলের মতো লিখেছেন,—

''প্রিয় বিশু,

লাউপুরে আসিয়া আমি আর লিসি পরম আনন্দে আছি। তুমি যে জিনিসগুলি পাঠাইয়াছ তাহা পাইয়া লিসি আনন্দের সপ্তম স্বর্গে উঠিয়াছে। তোমার পুরুষোত্তম ছেলেটি চমৎকার। উহার স্বভাব আদর্শ ক্রিশ্চান মিশনারিদের মতো। ওর পুরুষোত্তম নাম সার্থক। আদুবাবু লোকটিও খারাপ নন। খুব বুদ্ধিমান। তোমার জমিদাবির সমস্ত কিছু তাঁহার নখদর্পণে। কিন্তু তোমাদের সমাজে কন্যাদায় একটা মস্ত বড় সমস্যা। সেই সমস্যার চাপে উনি সব সময়ে নীতিসম্মত পথে চলিতে পারেন না। পাঁচ হাজার টাকা পণ দিলে উঁহার বড় মেয়েটির বিবাহ এখনই হইয়া যায়। আমি ঠিক করিয়াছি টাকাটা আমিই দিব। এই সঙ্গে পাঁচ হাজার টাকার

একটা চেক পাঠাইতেছি। তুমি আমার ব্যাঙ্ক হইতে টাকাটা তুলিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিও। আদুবাবুর সহায়তা আমার কাম্য। আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম তোমার এখানকার বিষয়সম্পত্তি হইতে বৎসরে অনায়াসে ত্রিশ হাজার টাকা আয় হইতে পারে। কিন্তু সেজন্য আদুবাবুর পূর্ণ সহযোগিতা চাই। লিসি তাহার ছোট ছোট মেয়েগুলিকে পড়াইতেছে। মেয়েগুলি বুদ্ধিমতী। লিসির ইচ্ছা এখানে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও খোলা হোক। তোমার বাংলোর দক্ষিণ দিকে লিসি একটি কিচেন গার্ডেন কবিতেছে। আমি বাম দিকে একটি ফুলের বাগান করিতে চাই। দেশী ফুল কিছু লাগাইয়াছি। তুমি কিছু সিজন ফ্লাওয়ারের ভালো বিচি এবং দুই ডজন ভালো গোলাপগাছ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে। লিসি বলিতেছে তোমার জন্য একটি কার্ডিগ্যান বুনিবে। তোমার যদি পুরাতন কার্ডিগ্যান থাকে সেটি পাঠাইয়া দিও। মাপ পাঠাইলেও চলিবে। আমরা এখানে খুব ভালো আছি। প্রত্যহ নদীতে স্নান করি। ব্যাডমিন্টন ও টেনিস খেলার আয়োজনও করিতেছি। তুমি আশা করি ভালো আছ। আমাদের ভালবাসা লও। পাঠজিকে নমস্কার দিও। ইতি—

তোমাবই টমসন

বিশ্বদীপ তৎক্ষণাৎ উত্তর লিখে দিলেন।

ভাই টমসন,

তোমার পত্র পাইয়া খুব আনন্দিত হইলাম। তোমার চেকটা ফেবত পাঠাইতেছি। আদুবাবুর কন্যার বিবাহের টাকা আমিই দিব। তাহাকে বলিয়া দিও তাহাব সব কন্যাব বিবাহেব সমস্ত খরচ আমাব স্টেট হইতেই দেওযা হইবে। আদুবাবু আমাদের পুবাতন কর্মচারী। সে যাহাতে স্বচ্ছন্দে ও নিরুদ্বিগ্নভাবে থাকিতে পারে তাহাব ব্যবস্থা আমাবই কবা উচিত। সে যদি পূর্বেই আমাকে সব কথা খুলিযা বলিত আগেই এ ব্যবস্থা কবিযা দিতাম। তুমিই লাউপুরের মালিক হইযা থাক এবং লাউপুরের উন্নতির জন্য যাহা ভালো মনে কব বিনা দ্বিধায় তাহা কর। লিসি বালিকা বিদ্যালয় খুলিতেছে শুনিয়া খুব খুশী হইলাম। ওখানে আমার অনেক জমি পড়িয়া আছে, যেখানে তোমাদের পছন্দ হয় সেখানেই একটা ছোটখাটো বাড়ি কবিয়া লও বালিকা বিদ্যালযের জন্য। পুরুষোত্তমকে যে তিনটি কুষ্ঠবোগীর সেবাব ভাব দিয়া আসিয়াছি, তাহাদের ঔষধ পথ্যের সব ব্যবস্থা করিয়া দিও। আজ ছয় হাজার টাকা তোমার নামে ইনসিওর করিয়া পাঠাইব। লিসিকেও আমার একটা পুরাতন কার্ডিগ্যান ও একজোড়া পুবাতন মোজা পাঠাইতেছি—আমার এক জোড়া মোজাও দরকার। আরও কিছু উলও পাঠাইতেছি। তোমরা আনন্দে আছ এ সংবাদে সত্যই অত্যন্ত খুশী হইয়াছি। ইচ্ছা করিতেছে তোমাদের কাছে গিয়াই থাকি। কিন্তু তাহা হইবার নয়, আমার ভাগ্য যে আমাকে শেষ পর্যন্ত কোথায় লইয়া যাইবে তাহা জানি না। একটা ভয়ংকর আতঙ্ক আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। ভুলিয়া থাকিবার জন্য আমি নিত্য নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করিতেছি, তাহাদের সুখদুঃখের সহিত নিজেকে জড়াইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু তবু আমার অশান্তি দুর হইতেছে না। নানারকম লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া একটা জিনিস বুঝিলাম, কাহারও মনে শান্তি নাই। সকলেই অন্ধ। আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে এমন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির সাক্ষাৎ এখনও পাই নাই।

তুমি ও লিসি আমার ভালবাসা জানিবে। আদুবাবুকে নমস্কার ও পুরুষোত্তমকে আশীর্বাদ দিও। পুরুষোত্তম ছেলেটি সত্যই ভালো। ইতি—

তোমারই বিশ্বদীপ।

চিঠিটা লিখে চুপ করে বসে রইলেন বিশ্বদীপ। এর পর আর কি করবার আছে? যার কথা সর্বদাই মনে গাঁথা রয়েছে তার কথাই মনে পড়ল। বিদুলা। বিদুলার সঙ্গে কয়েকদিন দেখা হয়নি, বিদুলাকে তিনি এড়িয়ে চলছেন, ভয় করছে তার কাছে যেতে। দুপুরে তিনি যখন বাড়ি ছিলেন না তখন বিদুলা নাকি ফোন করেছিল, ছকু বললে। ভদ্রতার খাতিরেও ফোন করে তার খবরটা নেওয়া উচিত। কিন্তু কি বলবেন ফোনে? সত্যি যেটা বলা উচিত সেটা তো বলা যাবে না কিছুতে। একটু ইতস্তত করে তবু ফোনটা তুললেন।

"হ্যাঁলো, হ্যাঁ আমিই। শুনলাম তুমি দুপুরে ফোন করেছিলে। আমি একটু মার্কেটিং করতে বেরিয়েছিলাম। কোনও দরকার ছিল নাকি? ও, তুমি শুনেছ। আমি ভেবেছিলাম ব্যাপারটা কেউ জানতে পারেনি। তোমার চাকরটা তো আমাকে কিছু বলেনি। আমি তোমার ঘরে ঢুকে দেখলাম তুমি ঘুমুচ্ছ, তাই পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলাম। তোমার চাকরকে দেখিনি তো। ও, সে দোতলা থেকে আমার গাড়িটা দেখেছিল শুধু? নেমে এসে আমাকে দেখতে পায়নি কারণ আমি তো দু'মিনিটির বেশী ছিলাম না। এখনি আসবে? না, না, এখন এসো না। আমাকে এখন বেরুতে হবে। শ্যামল তোমাকে আর একটা কবিতা লিখে পাঠিয়েছে? তাই নাকি? দেখব পরে। তোমার মনে হচ্ছে একথা? হ্যাঁ সত্যিই এড়িয়ে চলছি একটু। তোমার কাছে যাব বলে যাত্রা করেছি অনেকদিন আগে কিন্তু এখনও তোমার কাছে পৌঁছতে পারিনি। কেন পারিনি তা যেদিন বলতে পারব সেদিন পৌঁছেও যাব। আমার মনের অবস্থা রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন আগে একটা গানে লিখে গেছেন—"দাড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে।" আরে না, না,—ওসব কিছু নয়। তুমি—"

হঠাৎ বিদুলা ফোনটা কেটে দিলে। কি সর্বনাশ, এখুনি এসে পড়বে না তো। বিশ্বদীপ তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। মোটরটা বাইরেই ছিল। বিশ্বদীপকে বেরিয়ে আসতে দেখেই সেলাম করে উঠে দাঁড়াল রণছোড়।

"রণছোড়, আমার ব্যাঙ্কে চল। সেখান থেকে চাঁদনী যাব। এই চিঠিটাও পোস্ট করতে হবে।"

বেরিয়ে পড়লেন বিশ্বদীপ। যাবার আগে আলমারি থেকে একটা কার্ডিগ্যান আর একজোড়া মোজাও নিয়ে নিলেন। টমসনকে টাকা আর লিসিকে কার্ডিগ্যান, মোজা আর উল পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে প্রায় ঘন্টা দেড়েক সময় লাগল। ক্ষিধে পেয়েছিল। তবু বাড়ি ফিরতে সাহস হল না—যদি বিদুলা সেখানে বসে থাকে! এখন বিদুলার সঙ্গে দেখা হলে এখনই তাকে সব কথা বলতে হবে। কিন্তু তাঁর পায়ের বোদা-ভাবটা সম্পূর্ণরূপে না সেরে গেলে কোনও কথা তাকে বলা যাবে না। বলতে হলে বলতে হবে—আমি তোমাকে পাবার যোগ্য নই। আমার কুষ্ঠ হয়েছে। কিন্তু একথা তিনি এখন কিছুতেই বলতে পারবেন না। চৌরঙ্গীতে গিয়ে একটা হোটেলে ঢুকে কিছু খেয়ে নিলেন। আপিসে ফোন করে জানলেন

তেমন দরকারী কাজ কিছু নেই। কেউ দেখা করতে আসেনি। ভাবলেন, এখন কোথায় যাওয়া যায়। মনে পড়ল আর্টিস্ট নবনী দাসের কথা। তার ঠিকানাটা যোগাড় করেছিলেন। ঠিক করে ফেললেন সেইখানেই যাবেন। খোঁজ করবেন বিদুলার পোট্রেটটায় সে হাত দিয়েছে কি না। বিদুলার একটা ফোটো দিয়েছিলেন তাকে।

.....নবনী দাস গলির গলি তস্য গলির ভিতরে একটা একতলা বাড়িতে থাকেন। নম্বরও অদ্ভুত—৩২/৪৭/এ বাই সি বাড়ির সামনে কোনও 'নেম প্লেট' নেই। কড়া নাড়তে নবনী দাসই বেরিয়ে এলেন।

"ও আপনি, আসুন আসুন"

নবনী দাস অভ্যর্থনা জানালেন বটে কিন্তু তাঁর চোখে মুখে সে ভাব ফুটে উঠল না। বিশ্বদীপের মনে হল একটু যেন বিরক্তই হয়েছেন।

"আমি বিদুলার সেই পোট্রেটটার খবর নিতে এসেছিলাম সেটাতে হাত দিয়েছেন কি?"

"সেইটিই তো এখন আঁকছিলাম। আসুন"

বিশ্বদীপ ঢুকে দেখলেন বাড়ির ভিতরের দিকে একটা বারান্দায় একটি সুন্দব ছেলে খেলা করে বেড়াচ্ছে।

"আপনার ছেলে বুঝি"

"হ্যাঁ। আসুন, এইদিকে।"

ঘরের ভিতর চমৎকার একটি দোলনা টাঙানো ছিল। দেখেই বিশ্বদীপ বুঝতে পারলেন এ দোলনা শিল্পী নবনী দাসের সৃষ্টি, এ জিনিস বাজারে পাওয়া যায় না। একটি শতদল পদ্ম যেন দুলছে। পদ্মের মাঝখানে ছোট্ট একটি বিছানা আব তাতে হাত পা নেড়ে খেলা কবছে একটি শিশু।

"বাঃ, চমৎকার দোলনা তো। আপনি করেছেন নিশ্চয়—"

নবনী দাস কোনও উত্তর দিলেন না, তাঁর মুখে আনন্দের একটা ছটা আভাসিত হয়ে মিলিয়ে গেল শুধু।

"আসুন—"

ভিতরের দিকে একটা বড় বারান্দায় গিয়ে উপস্থিত হলেন বিশ্বদীপ। একটি তরুণী একটা মোড়ায় ঈষৎ বেঁকে বসেছিল। তাঁকে দেখেই উঠে দাঁড়াল সে। উদ্দাম যৌবন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে মেয়েটির সর্বাঙ্গে। তার পীবর স্তনযুগল, করীমুণ্ডের মতো নিতম্ব, পেলব বাহুলতা, আবেশময় দৃষ্টি, বিম্বওষ্ঠাধর যেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে নীরবে—দেখ, দেখ, দেখ আমাদের দেখ। বিশ্বদীপ ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত বিব্রত হয়ে পড়লেন। তারপর নমস্কার করে নবনী দাসের দিকে চেয়ে বললেন, "ইনিই কি মিসেস দাস?"

"হ্যাঁ। আলেয়া, ইনিই হচ্ছেন বিশ্বদীপবাবু। এঁর জন্যেই পোট্রেটটা আঁকছিলুম এখন—"

আলেয়া লীলাভরে হাত তুলে নমস্কার করল। তারপর ঘর থেকে সুদৃশ্য একটি মোড়া বার করে বলল, "বসুন।"

মোড়ায় বসে বিশ্বদীপের চোখে পড়ল পোট্রেটখানা। মেয়েটি যেভাবে বেঁকে মোড়ায়

বসেছিল, পোর্ট্রেটের ছবিটাও ঠিক সেইভাবে বসেছে, নারীদেহের যৌবন-মহিমা অদ্ভুতভাবে ফুটে উঠেছে ছবিতে। মুখটা কিন্তু বিদুলার, চোখের দৃষ্টি সলজ্জ, সন্নত, আর সমস্ত দেহের উপর কুয়াশার মতো একটা পাতলা ওড়না, ওড়নার খানিকটা অংশ মাথা আর মুখকেও ঢেকে রেখেছে।

"বাঃ, চমৎকার হয়েছে তো ছবিখানা। শেষ হয়ে গেছে নাকি এখুনি দেবেন?"

"না। তবে আপনি যদি ঘন্টাখানেক বসেন আর আলেয়া যদি এখন 'সিটিং' দিতে রাজী হয়, তাহলে আজই দিয়ে দিতে পারি।"

"আপনার স্ত্রীই আপনার মডেল নাকি?"

"ও সামনে বসে না থাকলে আমি ছবিই আঁকতে পারি না! বিশেষত মেয়েদের পোর্ট্রেট—"

বিশ্বদীপ অবাক হলেন, কিন্তু কোনও মন্তব্য করলেন না। ছবিটার দিকেই চেয়ে রইলেন নির্নিমেষে। সত্যিই অপূর্ব হয়েছে ছবিটা।

"আজ তাহলে উঠি—"

"বেশ। কাল আমি দিয়ে আসব ছবিটা।"

বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে একটু ইতস্তত করে বিশ্বদীপ বললেন, "আপনার পারিশ্রমিকটা এখনই দিয়ে দেব কি?"

"দিন।"

"কত দেব।"

"আপনার যা ইচ্ছে।"

বিশ্বদীপ পকেট থেকে চেকবুক বার করে একখানা হাজার টাকার চেক লিখে দিলেন।

নবনী দাসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপিসে গেলেন বিশ্বদীপ। বিদুলা কি সেখানে যাবে? অসম্ভব নয়। তবু আপিসে যেতে হবে একবার। আশা-আশঙ্কার দোলায় দুলতে দুলতে আপিসে গিয়ে হাজির হলেন যখন, তখন বেলা সাড়ে তিনটে। গিয়ে শুনলেন বিদুলা এসেছিল। একটা চিঠি রেখে গেছে। ছোট চিঠি।

বিশু,

ফোনে তোমার এলোমেলো কথা শুনে আমি বড় ঘাবড়ে গেছি। তোমার বাড়ি গিয়েছিলাম, এখানেও এসেছিলাম। কি বলতে চাও তুমি, সামনাসামনিই বল না। আমি ধাঁধা বুঝতে পারি না। কখন এলে তোমার দেখা পাব, ফোন করে জানিও। আমি ফোনের অপেক্ষায় বাড়িতেই থাকব।

—বিদুলা

এর পরই এল ধাকড় আর রামু।

ধাকড় সেলাম করে বলল, "হুজুর, যে সিনহা সাহেব এখানে ছিলেন তিনি আর একটা কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছেন। তিনি বলছেন এই সাবুন বানাবেন। আমাদেরও ডাকছেন, বলছেন তোমরাও চলে এস, মজুরি ডবল দেব আমরা।"

বিশ্বদীপ বললেন, "ভয় দেখিয়ে আমাকে কাবু করতে পারবে না ধাকড়। আমি এখুনি এই কারবার বন্ধ করে দিতে পারি। তাতে আমার কিছু ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমি তোমাদের যা দিয়েছিলাম তা আর কেউ তোমাদের দেয় নি। তোমাদের এই ব্যবসার মালিক করে দিয়েছিলান আমি।"

রামু বলল. "আমরা ব্যবসা চালাতে পারব না হুজুর। সব বরবাদ হয়ে যাবে। আমাদের মজুরি কিছু বাড়িয়ে দিন, আমরা এখানেই কাজ করব। আট আনা করে বাড়িয়ে দিলেই আপাতত চলবে, তকলিফসে চলবে, কিন্তু চলবে।"

বিশ্বদীপ বললেন, "আমি তোমাদের বাজারের রেট অনুসারে মাইনে দিচ্ছি। অন্য জায়গায় যদি বেশী পাও যাও—আমি তোমাদের আটকাব না"

হঠাৎ মহুয়া প্রবেশ করল। সে বাইরে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। বিশ্বদীপ দেখলেন তার পাতলা ঠোঁট দুটো কাঁপছে, চোখের দৃষ্টিতে চাপা আগুন।

সে বলল, "ওবা যদি যেতে চায় যাক। আমি অন্য মজুর যোগাড় করে আনব। ওরা যত লোক মিলে কাজ করত আমরা তার অর্ধেক লোক নিয়ে সে কাজ করে দেব। শামার মা আমাকে সাহায্য করবে বলেছে। আমিও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছি তারা রাজী আছে। এরা একশ' জন কাজ করে। আমরা পঞ্চাশ জনে সে কাজ করে দেব। আমরা ব্যবসাব অংশীদার হতে চাই। আপনাব সব শর্তে আমরা রাজী—"

"বেশ। তাই হবে"

বিশ্বদীপ উঠে পড়লেন।

বাড়ি ফিরতেই ছকুর সঙ্গে দেখা।

সে বলল, "বিদুলা-মা এখুনি ফোন করেছিলেন। তিনি বললেন বাবু এলেই আমাকে ফোনে জানিয়ে দিও, আর তাঁকে বোলো আমার জন্য যেন অপেক্ষা করেন।"

খবরটা শুনে পাংশুমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন বিশ্বদীপ।

ছকু বলল, "আপনাব খাবার কি গরম করে আনব।"

"না। আমি বাইরে খেয়েছি।"

তারপর হঠাৎ তিনি মনস্থির করে ফেললেন।

ছকুকে বললেন, "আমাকে এখুনি একটা দরকারী কাজে কলকাতার বাইরে যেতে হচ্ছে। এখুনি বেরুব আমি। আমার জিনিসপত্র ঠিক করে দাও।"

তিনি তাড়াতাড়ি আলমারি খুলে দেখলেন তাঁর কাছে নগদ প্রায় হাজারখানেক টাকা আছে। ব্যাঙ্কে ফোন করলেন। এজেন্টের সঙ্গে চেনা ছিল।

"এখুনি একটা জরুরী দরকারে বাইরে বেরুতে হচ্ছে। আপনাদের আজকের অ্যাকাউন্ট কি ক্লোজড হয়ে গেছে? হয়নি? তাহলে আমি যাচ্ছি এখুনি। আমার কিছু টাকার দরকার—ধন্যবাদ।"

বিশ্বদীপ বেরিয়ে যাবার পর ছকু ফোন করলে বিদুলাকে।

"বাবু এখনি এসেই আবার বেরিয়ে গেলেন—"

"কোথায় গেলেন—"

"কোথায় গেলেন তা বলে যাননি। বললেন কলকাতার বাইরে যাচ্ছেন একটা দরকারী কাজে।"

"কবে ফিরবেন?"

"তা-ও বলে যাননি"

ফোনটা ধরে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল বিদুলা।

হাওড়ায় গিয়ে বিশ্বদীপ খোঁজ করে জানলেন অমৃতসর মেলে দুটো ফার্স্ট ক্লাস বার্থ পাওয়া যেতে পারে। একটা আপার একটা লোয়ার। মানে একটা কুপেই খালি আছে। দুটো বার্থের টিকিটই কিনে ফেললেন বিশ্বদীপ। তাড়াতাড়ি গিয়ে কুপেটা দখল করে জানলা কপাট বন্ধ করে বসে রইলেন, কি জানি বিদুলা এখানেও যদি এসে পড়ে। এসে হয়তো বলবে— আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আসবে কি? আসতে পারবে কি? চোখ বুজে দুরুদুরু হৃদয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি।

"তুমি ভেবেছ, আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে, তা আমি হতে দিচ্ছি না।"

তারপর হঠাৎ চমকে উঠলেন। টং টং টং করে ঘণ্টা বাজছে। ট্রেন ছেড়ে দিল বিদুলা আসেনি। ট্রেনের গতিবেগ বাড়তে লাগল ক্রমশঃ।

।। আঠারো ।।

মানসপুরের মাঠ কাশফুলে ছাওয়া। হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে একটা। যতদূর দৃষ্টি যায় কাশফুল দুলছে। মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বিশ্বদীপ। তারপর বললেন, "তোমরা কোথা থেকে এলে—"

তাঁর কাছে যে কাশফুলগুলো ছিল থেমে গেল তাদের দোলন। কয়েকজন বলল, "ভেসে এসেছি। বধূসরা দু'কূলপ্লাবিনী হয়েছিল, সে-ই আমাদের ভাসিয়ে এনেছে পলিমাটি আর বালির সঙ্গে। রুদলবাবু বলেছেন তোমরা যতদিন খুশি এখানে থাকো। তাই আমরা আছি—"

"রুদলবাবু কোথা—"

"তিনি তো সর্বত্র আছেন। এখনই হয়তো দেখা পেয়ে যাবে তাঁর।"

"মুরুব্বীকে চেন?"

"না। তবে একজন বহুরূপীকে চিনি। ওই যে মাটির ঢেলার উপর গঙ্গাফড়িং বসে আছে সামনের পা দুটো তুলে, ও একটু আগে মানুষ ছিল, একটা ঝারি নিয়ে জল দিচ্ছিল আমাদের গোড়ায়। হঠাৎ গঙ্গাফড়িং হয়ে গেল।"

বিশ্বদীপ দেখলেন সত্যিই বেশ একটা বড় গঙ্গাফড়িং বসে আছে মাটির ঢেলার উপর। মনে হল সামনের পা দুটো নেড়ে নেড়ে যেন ডাকছে তাঁকে। এগিয়ে গিয়ে দেখলেন মুচকি

মুচকি হাসছেও। কাছে যেতেই ফড়িংটা তড়াক করে লাফিয়ে বিশ্বদীপের কাঁধের উপর বসল আর কানের কাছে তার লম্বা গলাটা বাড়িয়ে চুপিচুপি বলল, "মধু খাবে? তাহলে রুদলবাবুর ওখানে চল। সেখানে এক অদ্ভুত মৌচাক হয়েছে। ওই যে বাঁ দিকের সরু পায়েচলা পথটা এঁকেবেঁকে শালবনের ভিতর ঢুকে গেছে ওইটে দিয়ে চল। কাশফুলদের মাড়িও না। ওরা চটে গেলে রুদলবাবুও চটে যাবেন সঙ্গে সঙ্গে আর অমনি গ্রীষ্মকালে এসে পড়বে মানসপুরে। সে মহা কষ্ট।"

গঙ্গাফড়িংকে কাঁধে করে বিশ্বদীপ চলতে লাগলেন। রাস্তায় দেখা গেল শাহী বুলবুল আর টুনটুনিরা খেলা করছে দল বেঁধে। গঙ্গাফড়িং চুপিচুপি বলল, "আসলে ওরা হাডুডুডু খেলছে। কিন্তু মুখ্যুর দল, খেলার নিয়মই জানে না। হুড়োহুড়ি করছে খালি—"

শালবন পার হয়ে বিশ্বদীপ একটা স্ফটিকের বাড়ি দেখতে পেলেন। একটা নীলাভ দ্যুতি বিকীর্ণ হচ্ছে বাড়িটার সর্বাঙ্গ থেকে। গঙ্গাফড়িং বলল, "এই বাড়িটাই এখন রুদলবাবুর পছন্দ। পরিষ্কার করবার জন্যে চাকর দরকার হয় না, কোনও ময়লা জমে না ওর গায়ে। রং করবার জন্যে রাজমিস্ত্রীও দরকার হয় না। ঘন্টায় ঘন্টায় ওর রং আপনি বদলাচ্ছে। এখন নীল দেখছেন তো? একটু পরে গোলাপী রং হয়ে যাবে, তারপর কমলা—বিশ্বকর্মা বানিয়ে দিয়ে গেছে।"

বিশ্বদীপ দেখলেন রুদলবাবু দক্ষিণ দিকের বারান্দায় এক বিরাট মৌচাকেব দিকে চেয়ে তন্ময় হয়ে বসে আছেন। মৌচাকের নীচে বিরাট একটা কারুকার্যখচিত সোনার গামলা। সেই গামলায় টপ টপ করে মধু পড়ছে। গামলার আশেপাশে অনেক সোনার বাটি, প্রত্যেকটি মধুপূর্ণ। কাছে একটা হাতাও রয়েছে দেখতে পেলেন বিশ্বদীপ। গঙ্গাফড়িং বিশ্বদীপের কানে কানে বলল, "গামলাটা যেই মধুতে ভরপুর হচ্ছে অমনি রুদলবাবু হাতা দিয়ে তুলে তুলে বাটিতে বাটিতে আলাদা করে রাখছেন, আর সব্বাইকে ডেকে ডেকে খাওয়াচ্ছেন। এ এক মহা আপদ হয়েছে। কাঁহাতক মধু খাওয়া যায়! আমি পঞ্চাশ বাটি খেয়েছি, আব পারা যায় না। সেই ভয়ে গঙ্গাফড়িং সেজে বসে আছি। এইবার আপনার পালা। বেশী খাবেন না যেন। মধু ভয়ানক গরম—"

বিশ্বদীপকে দেখে সোচ্ছ্বাসে সংবর্ধনা করলেন রুদলবাবু। "আসুন আসুন আসুন। অনেকদিন পরে এলেন। আসুন—"

পাশেই মখমলের একটা আসন ছিল তাতেই বসলেন বিশ্বদীপ। গঙ্গাফড়িং তড়াক করে লাফিয়ে বেরিয়ে গেল।

রুদলবাবু মৌচাকটা দেখিয়ে বললেন, "দেখুন কি কাণ্ড—"

বিশ্বদীপ অনেকদিন আগে উপনিষদের একটা ইংরেজি অনুবাদ পড়েছিলেন। তাতে ঊর্ধ্বলমূ নিম্নশাখ এক বিরাট বৃক্ষের বর্ণনা পড়েছিলেন তিনি। মৌচাকটা দেখে সেই বৃক্ষের কথা মনে হল তাঁর। মৌচাকে অসংখ্য মৌমাছি গুঞ্জন করছে, দলে দলে উড়ে আসছে, বসছে, আবার উড়ে যাচ্ছে। বিশ্বদীপ সত্যিই বিস্মিত হয়ে গেলেন। এত বড় মৌচাক তিনি দেখেননি কখনও।

রুদলবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "এ তো অদ্ভুত কাণ্ড করেছেন আপনি—"

"আমি কিছুই করিনি। করেছে ওই মৌমাছিরা। হয়েছিল কি জানেন, সে এক আজগুবী গল্প। মৌমাছিদের এক রানী একবার আমার এখানে অতিথি হয়েছিলেন। কথায় কথায় তাঁকে আমি একদিন বললুম, আপনাদের প্রতি আমি খুব অন্যায় করেছি, সেজন্য আমি অনুতপ্ত। আগে আমি জানতাম না যে মৌচাকে আপনারা যে মধু করেন তা আপনাদের বাচ্চাদের জন্য। মধু খুব ভালবাসতাম, আপনাদের বাচ্চাদের ধ্বংস করে অনেক মধু খেয়েছি আমি। তারপর সত্যকথাটা হঠাৎ একদিন শুনলাম। সেদিন থেকে আর মধু খাই না। দুধও অনেকদিন আগে ছেড়ে দিয়েছি। মাংসও খাই না। বধূসরার জলে কিছু নিঃস্বার্থপর মাছ আছে, তারা মাঝে মাঝে আমাদের জন্য স্বেচ্ছায় আত্মদান করে। বধূসরার তীরে তখন আমাদের মাছ-ভাজা-খাওয়ার জলসা বসে যায়। মৌমাছিদের রানী আমার কথা শুনে হেসে বললেন, আপনার জন্য আমিও মধুর ব্যবস্থা করে দেব। আমার কর্মীরা আপনার বাড়িতেই মৌচাক তৈরী করবে আর তাতে মধু সঞ্চিত হবে কেবল আপনারই জন্যে। তার কয়েকদিন পরেই দেখি এই বিরাট মৌচাক ঝুলছে আমার ছাদ থেকে। সর্বদা মধুতে টলমল করছে। টপটপ করে পড়ছে সর্বদা। কত লোককে যে খাইয়েছি। আপনিও খান। এ সাধারণ মধু নয়, এ প্রেমের মধু—"

একটা বাটি এগিয়ে দিলেন বিশ্বদীপের দিকে। এক চুমুক খেয়েই বিশ্বদীপের সারা দেহে মনে যেন একটা আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল। সাগ্রহে সবটা খেয়ে ফেললেন।

"আর এক বাটি নিন।"

বিশ্বদীপ আর আপত্তি করতে পারলেন না। বরং তাঁর লোভ হল। বাটির পর বাটি মধু খেতে লাগলেন। তারপর মনে পড়ল সিংহের সঙ্গে এখনও দেখা হয় নি।

"সিংহ কোথা?"

"আছে কোথাও। মাঝে মাঝে দেখা হয়। আমার মনে হয় ও তপস্বী। একা একা দূরে দূরে থাকে। সবাইকে মধু খাইয়েছি, কিন্তু ও খায় নি। বললে, প্রেমের মধু খাওয়ার মতো মন হয়নি এখনও আমার। এখনও আমার মনে রাগ আর ঘৃণা জমে আছে। এখন আমার ও মধু মিষ্টি লাগবে না, তেতো মনে হবে। এখন থাক, পরে খাব। আমি আর পীড়াপীড়ি করিনি। মন-মরজি লোক, ওকে না ঘাঁটানোই ভালো। ওই যে যাচ্ছে—"

বিশ্বদীপ দেখলেন সিংহ তার বোঝা দুটো কাঁধে ঝুলিয়ে চলেছে। পরনে সেই বিচিত্র আলখাল্লা।

"আমি যাই, ওর সঙ্গে একটু দেখা করে আসি।"

বিশ্বদীপ উঠে সিংহের অনুসরণ করলেন।

কিছুদূরে প্রকাণ্ড একটা তেঁতুলগাছ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে একা দাঁড়িয়েছিল। তার তলায় গিয়ে সিংহ বোঝা নামাতেই বিশ্বদীপ হেসে তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন। সিংহের মুখেও ফুটে উঠল সেই মর্মন্তুদ হাসিটা।

"তোমাকেও পালাতে হল তো শেষ পর্যন্ত। আমি জানতুম পালাতে হবে। সংসারে আমাদের ঠাঁই নেই। ওরা মুখে সহানুভূতি জানাবে, উপকার করবার চেষ্টা করবে, হয়তো

উপকারও করবে, কিন্তু তোমার কাছে আসবে না। ওরা সাবধানী, ওরা সৌন্দর্যলোলুপ, ওরা আলাদা জাত, ওরা আমাদের কেউ নয়। তুমি বড়লোক ফার্স্ট ক্লাসে চড়ে পালাতে পেরেছ। আমাদেব হেঁটে পালাতে হয়েছিল। একদিন রাত্রে চুপিচুপি উঠে পালিয়েছিলুম। এখনও পালিয়ে পালিয়েই বেড়াচ্ছি।

তীব্র তীক্ষ্ণ হুইসল-এ অন্ধকাব বিদীর্ণ হচ্ছিল। মানসপুর মিলিয়ে গেল। বিশ্বদীপ শুযেছিলেন, উঠে বসলেন। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্টেশন নয়। চতুর্দিকে অন্ধকার। অন্ধকারে অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে। আবার ট্রেনটা চলতে শুরু করল। বিশ্বদীপ আবার চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন।

....হঠাৎ দেখলেন উপরের বাংক থেকে পাঁচটি মেয়ে উঁকি মেরে দেখছে তাঁকে। অপূর্ব সুন্দরী। তারপর চিনতে পারলেন—তরলা, তুহিনা, তুফানী, হাওয়া আর হিল্লোলা। সঙ্গে সঙ্গে কলকণ্ঠে হেসে উঠল তাবা।

"আপনাব ভয় নেই, আমরা আপনাব সঙ্গে আছি। মাঝে মাঝে আমাদেব চা খাওযাবেন খালি।"

ট্রেনটা দুলতে লাগল। বিশ্বদীপের মনে হল বধূসবাব তবঙ্গদোলায দুলছেন তিনি।

।। উনিশ ।।

পাটনায নেমে পড়েছিলেন বিশ্বদীপ। স্টেশনের বেস্ট রুমে বসে চিঠি লিখছিলেন পাঠকজিকে।

শ্রীচরণেষু,

আমার ভালো লাগছিল না বলে আমি বেড়াতে বেরিয়েছি। ফ্যাকটাবিব দেখাশোনা আপনি করবেন। যে মজুররা বেশী মজুরিব লোভে অন্য জায়গায় যেতে চাইছিল তাদেব যেতে বলেছি । মহুয়া বলেছে সে মজুর যোগাড় করে আনবে। তাকে বলেছি মজুরদের আমি ব্যবসার অংশীদার করে নেব। আমার এই ইচ্ছাটা আপনি পালন করবেন আশা করি। মহুয়া মেয়েটি ভালো, তার উপরই সব ভার দিয়ে দেবেন। আমি ভালো আছি। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন। কবে ফিরব ঠিক নেই। ইতি—

প্রণত বিশ্বদীপ

।। কুড়ি ।।

তারপর অনেক জায়গায় ঘুরলেন বিশ্বদীপ। এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, চণ্ডীগড়, অমৃতসর, কাশ্মীর। কাশ্মীরে বোট হাউস ভাড়া করে ঘুরে বেড়ালেন কিছুদিন। কিছুদিন পরে আর ভালো লাগল না। নেমে এলেন দিল্লীতে। দিল্লীর রাস্তায় হঠাৎ দেখা হল বিজনবালার সঙ্গে।

"এ কি, আপনি এখানে—"

"আমি পালিয়ে এসেছি। আমি স্বামীর সঙ্গে থাকতে পারলাম না। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলুম যে মেয়েটিকে তিনি রাঁধুনী বলে বাড়িতে এনেছেন সে তাঁর রক্ষিতা। সেইদিনই গৃহত্যাগ করলুম আমি। আমার স্কুলের এক বান্ধবীর বিয়ে হয়েছে এখানে তাঁর স্বামী একজন পদস্থ অফিসার। তিনিই আমাকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়েছেন টেলিফোন আপিসে। সেই চাকরিই করছি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমে আপনার কাছেই গিয়েছিলাম, কিন্তু শুনলাম আপনি বাড়িতে নেই, কলকাতার বাইরে গেছেন, কবে ফিরবেন তার ঠিক নেই। বান্ধবীর ঠিকানাটা ছিল আমার কাছে, সেইদিনই দিল্লী চলে আসি। চাকরি পেয়ে গেছি। ভালোই আছি এখন। আলাদা বাসা করেছি একটা। যাবেন? আরও অনেক রকম বিজ্ঞাপন যোগাড় করেছি আমি, দেখাতুম তাহলে আপনাকে। যাবেন?

বিজনবালার চোখে-মুখে একটা উৎসুক আগ্রহ ফুটে উঠল।

বিশ্বদীপ হেসে বললেন, "না। এখনই ট্রেন ধরতে হবে আমাকে— ।"

"ও। আচ্ছা, যাই তাহলে—"

বিজনবালা হেঁট হয়ে প্রণাম করল তাঁকে। তারপর চলে গেল একটা রিকশ ডেকে। ঘাড় ফিরিয়ে তাঁর দিকে চাইলে একবার। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন বিশ্বদীপ। তারপর তিনিও হাঁটতে শুরু করলেন। একবার মনে হল এখানে একজন ভালো হোমিওপ্যাথকে কন্‌সাল্‌ট কবলে কেমন হয়। ডাক্তার কারফরমা মাত্র সাত দিনের ওষুধ দিয়েছিলেন। সে তো কবে ফুরিয়ে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় তাঁর তিন মাস কেটে গেল। তাঁর উরুতের সেই বোদা ভাবটা কমেনি। আজকাল একটু যেন ব্যথা-ব্যথাও করছে। তারপর ঠিক করলেন কলকাতায় ফিরে যা হয় কবা যাবে। স্টেশনে গিয়ে তিনি কিন্তু কলকাতার টিকিট কাটলেন না। কাটলেন হরিদ্বারের। সেখানে গিয়ে একটা পাণ্ডার আশ্রয়ে রইলেন কিছুদিন। নিরামিষ খাওয়াতে অভ্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু কিছুদিন পর তাও ভালো লাগতে লাগল। গঙ্গার ধারে বসে গঙ্গাব কলকলধ্বনি শুনতেন। একদিন গভীর রাত্রে একা বসে ছিলেন। জ্যোৎস্না উঠেছিল সেদিন। মনে হল একটি কিশোরী মেয়ে গঙ্গা থেকে উঠে এসে হাসিমুখে দাঁড়াল তাঁর সামনে। তার সর্বাঙ্গে জ্যোৎস্নার জরি ঝলমল করছে। চোখে কৌতুকদীপ্তি।

"আমাকে চিনতে পারছেন?"

অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন বিশ্বদীপ।

"আমি বধূসরা। সাগরের কাছে চলেছি। পৃথিবীর সব নদীতে ছড়িয়ে দিয়েছি নিজেকে। সব নদীই সাগরে যায়।"

তারপর হঠাৎ সে মিলিয়ে গেল। আর তার দেখা পাননি। দেখা পাবার আশায় আরও দুমাস ছিলেন তিনি হরিদ্বারে। বিদুলা কিন্তু তাঁকে ছাড়েনি একমুহূর্ত। নিদ্রায় জাগরণে শয়নে স্বপনে তাঁর প্রতি মুহূর্তটি জুড়ে সে অহরহ তাঁকে নীরব ভাষায় ডাকছিল—এসো, এসো, তুমি ফিরে এসো।

হঠাৎ একদিন বিশ্বদীপের মনে পড়ল দিল্লীর এম্‌ব্যাসিতে এক সায়েবের কথা তিনি শুনেছিলেন একজনের কাছে। নামটা খুব পরিচিত বলে মনে হয়েছিল। ভেবেছিলেন দেখা

করবেন। কিন্তু ভুলে গিয়েছিলেন আর দেখা করা হয়নি। সেইদিনই হরিদ্বার থেকে দিল্লী গেলেন। খোঁজ করে দেখা করলেন সেই সায়েবের সঙ্গে। যা ভেবেছিলেন তাই, এঁব সঙ্গে বিলেতে পড়েছিলেন তিনি। তাঁকে বললেন, "আমি বিলেতে একটা ল্যাবরেটরিতে কাজ পেতে পারি। যদি পাই চলে যাব। কিন্তু আজকাল শুনছি পাসপোর্ট পাওয়া মুশকিল।"

সায়েব বললেন, "তুমি আমার কাছে চলে এসো—আমি তোমার যাবার ব্যবস্থা করে দেব with family."

দিল্লীতে বিশ্বদীপ দিন দুই ছিলেন। সেখান থেকে চলে এলেন তিনি কাশীতে। কেন জানি না ইচ্ছা হল বাবা বিশ্বেশ্বরের কাছে থাকেবন কয়েকদিন। গিয়ে একটা হোটেলে উঠলেন। রোজ সকালে গিয়ে বাবা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে বসে থাকতেন। বিশ্বেশ্বরের গলিতে গিয়ে খেলনা কিনে বিতরণ করতেন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের। ভিখারীদের পয়সা দিতেন। একদিন হঠাৎ লক্ষ্য করলেন সবাই যেন একটু বিশেষ ভাবে চাইছে তাঁর দিকে। কেন চাইছে? বুঝতে পারেননি তখন। হোটেলে ফিরে বুঝতে পারলেন। হোটেলওলা জিগ্যেস করল, "বাবুজি, আপনার মুখে কি চোট লেগেছে?"

"চোট? না—"

ঘরে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মনে হল তাঁর গালে কে যেন একটা চড় মেরেছে। ডান গালের খানিকটা লাল হয়ে উঠেছে, নাকের ডান পাশটাও। লেপ্রসির প্যাচ!

সেইদিনই চিঠি লিখলেন তিনি বিদুলাকে।

বিদুলা,

তোমার কথা প্রতিমুহূর্তে ভেবেছি। আমাকে তুমি একদণ্ড ছেড়ে থাকনি। তোমাকে যে কথাটা বলতে পারিনি বলে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি সেই কথাটা বলবার আজ সময় এসেছে। কারণ, আর তা লুকিয়ে রাখা যাবে না। আমার মুখের উপরই সে কাহিনী রক্তাক্ষরে লেখা হয়ে গেছে। সংক্ষেপেই বলছি। আমার বাবা মা দুজনেরই কুষ্ঠব্যাধি ছিল। আমাকে যদিও তাঁরা আলাদা করে রেখেছিলেন তবু সে ব্যাধির প্রকোপ থেকে আমি রক্ষা পাই নি। ডাক্তার ঘোষালকে দেখিয়েছিলাম, তাঁর অনেক ওষুধ খেয়েছি, তেমন কোনও উপকার পাইনি। তিনি কেবলই বলতেন, অধীর হবেন না, অপেক্ষা করুন। কিন্তু আমি বেশীদিন অপেক্ষা করতে পারিনি। আমি চেয়েছিলাম তাড়াতাড়ি ব্যাধিমুক্ত হয়ে তোমার কাছে যাব। তাই একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে আশ্বাস পেয়ে তাঁর ওষুধ খাচ্ছিলাম। কিন্তু তা-ও বেশীদিন খেতে পারিনি। তোমাকে এড়াবার জন্যে আমাকে পালিয়ে আসতে হল। তোমাকে সত্যকথাটা বলবার সাহস আমার ছিল না। আজ সকালে দেখলাম মুখের উপর বেশ বড় একটা লাল প্যাচ হয়েছে। আমি কুষ্ঠব্যধিগ্রস্ত, কিন্তু বিশ্বাস কর আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে সর্বান্তঃকরণ দিয়ে চাই। এসব শোনার পরও তুমি যদি আমাকে গ্রহণ করতে চাও তাহলে আমার বাসার ঠিকানায় সেটা জানিয়ে দিও। আমি দিন পনেরো পরে ফিরব। আমার ভালবাসা জেনো। ইতি— বিশ্বদীপ

।। একুশ ।।

বিশ্বদীপ যখন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলেন তখন রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। ট্রেনটা লেট ছিল। স্টেশনে নেমে ট্যাক্সি পেতে আরও ঘণ্টাখানেক সময় গেল। যখন বাড়ি পৌঁছলেন তখন রাত প্রায় এগারোটা। চোরের মতো নিজের বাড়িতে প্রবেশ করলেন। দারোয়ান জেগে ছিল, সে সেলাম করে উঠে দাঁড়াল। ভিতরে ঢুকে দেখলেন বাড়ি অন্ধকার।

"ছকু কোথা?"

"সে বাড়ি গেছে। মহুয়ার কাছে চাবি আছে—"

মহুয়া এসে চাবি খুলে দিলে। বাইরে ঘরের আলোটা জ্বলে উঠতেই সে-ও সবিস্ময়ে চেয়ে রইল বিশ্বদীপের মুখের দিকে।

"আপনার মুখে কি হয়েছে বাবু—"

"কুষ্ঠ। আমার চিঠিপত্র কোথা?"

একগোছা চিঠিপত্র এগিয়ে দিয়ে মহুয়া আস্তে আস্তে চলে গেল। প্রথমেই বিদুলার চিঠিখানা চোখে পড়ল। সুন্দর নীল খামে গোটা-গোটা অক্ষরে ঠিকানা লেখা। তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়ে চিঠিখানা বার করলে বিশ্বদীপ। ছোট চিঠি।

বিশু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। কি আঘাত যে পেয়েছি তা বর্ণনা করবাব সাধ্য আমার নেই। তোমার ওই সুন্দব মুখে লেপ্রসির প্যাচ হয়েছে একথা আমি কল্পনাও করতে পারি না। ও দৃশ্য আমি দেখতেও পারব না। যে অনিন্দ্যকান্তি রাজপুত্রকে আমি ভালবেসেছিলুম তাকে বুকে নিয়েই আমি চললুম। ফিরে এসে আমাকে তুমি আর দেখতে পাবে না। ইতি— বিদুলা

"মহুয়া—মহুয়া—"

মহুয়া বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল, ভিতরে এসে দাঁড়াল।

"বিদুলার খবর কি জান?"

"তিনি কয়েকদিন আগে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন"

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন বিশ্বদীপ। অনেকক্ষণ পরে বিলেতের একখানা চিঠি নজরে পড়ল। তাঁর অধ্যাপক চিঠি লিখেছেন—" তোমার যখন লেপ্রসি হয়েছে তখন তোমাকে কাজ দিতে পারব না।"

পরদিন খুব ভোরে উঠে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছিলেন বিশ্বদীপ। দারোয়ানকে ডেকে বললেন, "রণছোড়কে গাড়ি বার করতে বল।"

মহুয়া এসে দাঁড়াল।

"এখনই বেরুবেন?"

"হ্যাঁ। আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। টেবিলের উপর একখানা চিঠি রইল। পাঠকজিকে দিয়ে দিও সেটা।"

"কোথায় যাচ্ছেন আপনি?"

"জানি না। তবে আর এখানে ফিরব না"

মহুয়া চলে গেল। কয়েক মিনিট পরেই ছোট একটা পুঁটুলি নিয়ে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াল এসে।

"আপনাকে আমি একা যেতে দেব না। আমিও যাব আপনার সঙ্গে"

"তুমি? কেন?"

নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইল মহুয়া। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, "আপানর সেবা করবার জন্যে তো একজন লোক চাই"

"কিন্তু আমার কুষ্ঠ হয়েছে যে—"

"তা হোক। আমি যাব—"

"না, না, সে হয় না—"

"আমি কিছুতেই আপনাকে একলা যেতে দেব না।"

।। বাইশ ।।

আফ্রিকার এক জঙ্গলের কাছে ছোট একটা বাড়িতে বসে ছিলেন বিশ্বদীপ। মানসপুরের দিগন্তবিস্তৃত মাঠ প্রসারিত হয়ে ছিল তাঁর চোখের সামনে। কাছেই একটা বকুলগাছে অজস্র ফুল। বিদুলা সেই গাছের তলায় বসে পিয়ানো বাজাচ্ছিল। তরলা, তুহিনা, তুফানী, হাওয়া আর হিল্লোলা নাচছিল সেই বাজনার সঙ্গে। একটু দূরে সিংহ তার বোঝা দুটো কাঁধে নিয়ে যাচ্ছিল আর একটা গাছের তলায়। বধূসরার তীরে পিকনিক হবে নাকি আজ, পাহাড়ীরা আসবে, তারই আয়োজনে মেতে আছে মুরুব্বী।

মহুয়া হঠাৎ এসে বলল, "পাঠকজি এসেছেন।"

মানসপুর মিলিয়ে গেল। সত্যিই পাঠকজি এলেন। এসেই একটা কাগজ বাড়িয়ে দিলেন তাঁর দিকে। তাতে লেখা রয়েছে—'অবাক হয়ো না। তোমার বাবা মাকে নিয়ে জীবনের অনেকদিন কাটিয়েছি। বাকি জীবনটা তোমাকে নিয়েই কাটবে। ভয় পেয়ো না। একজন ভালো ডাক্তারকে খবর দিয়েছি, তিনি আসবেন একটু পরে। সব ঠিক হয়ে যাবে। আজকাল অনেক ভালো ওষুধ বেরিয়েছে।"

বিশ্বদীপ বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। আবার মানসপুর মূর্ত হয়ে উঠল তাঁর চোখের সামনে। পাঠকজি মিলিয়ে গেলেন, তাঁর জায়গায় এসে দাঁড়ালেন রুদলবাবু। তিনিও হেসে বললেন, "ভয় কি, ভালো হয়ে যাবে—"

বিদুলার পিয়ানোতে অপূর্ব গৎ বাজতে লাগল।

এরাও আছে

॥ এক ॥

শশধর কুণ্ঠিত মুখে এসে দাঁড়াল দ্বারপ্রান্তে। তার মুখ দেখে মনে হল যেন যা ঘটেছে তার জন্যে সেইই দায়ী। বিষুণবাবুর মেজাজ সপ্তমে চড়ে ছিল। সকাল থেকে চা খেতে পাননি। শশধরের দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন—"দুধ পেলে না?"

"আজ্ঞে না, গাইটা পিয়ে গেছে। বাছুরটাকে ভাল করে বাঁধেনি"

"তোমার বউটা অকর্মার ধাড়ি দেখছি—"

বউয়ের সম্বন্ধে কেউ কটূক্তি করলে শশধরের মনে ব্যথা লাগে। বীণা বড়লোকের মেয়ে। অদৃষ্টের ফেরে তার হাতে পড়েছে। কিন্তু কোনদিন মুখ ভার করে থাকে না। যথাসাধ্য করে সে। নিজের হাতে গোয়াল পর্যন্ত পরিষ্কার করে। রান্নাবান্না কাপড় কাচা বাসন মাজা এসব তো করেই। অন্য কেউ হলে সে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করত। কিন্তু বিষুণবাবুর মুখের উপর সে কড়া কথা বলতে পারল না। কেবল বলল—"দোষ আমারই। বাছুরের গলার দড়িটা আপনি খুলে খুলে যায়, আমাকে বলেছিল নতুন একটা কিনে আনতে কিন্তু আমি রোজই ভুলে যাই"।

"কি ফেরি করিস আজকাল—"

"আলুকাবলি"

"এখন চা খাই কি করে তাই বল। হনুমানটা যে আমাকে এমন বিপদে ফেলে যাবে তা আগে ভাবিনি। তাহলে ওকে ঘরের চাবি দিতুম না। একটি গোটা পাঁউরুটি আর এক টিন কনডেন্স্‌ড্‌ মিল্ক (condensed milk) সাবাড় করে দিয়ে গেছে—"

"হনুমান কে?"

"আমার মূর্তিমন্ত ভাগ্নেটি। ওই যে চোংপ্যান্টপরা ছেলেটা আসে মাঝে মাঝে আমার কাছে। দেখিস নি? কাল ওয়ার্কশপে কাজ করছি এসে বলল—"মামা বাড়ি ফিরবে কখন?" বললাম—'ডাক্তারবাবুর গাড়িটা স্টার্ট না করে তো যেতে পারছি না। কি হয়েছে বুঝতে পারছি না ঠিক। আমার ফিরতে দেরি হবে। কি চাস তুই? বললে, 'আমি খানিকক্ষণ গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চাই। তোমার চাবিটা দাও তাহলে।' ও ছোকরা প্রায়ই একটা না একটা হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে। আমাকেই শেষে উদ্ধার করতে হয়। দিয়ে দিলাম চাবিটা। বাড়ি ফিরলাম তিনটের সময়। জানিস তো ওয়ার্কশপের পাশেই হিরণ ঠাকুরের হোটেলেই খাই আমি। খাওয়াদাওয়া সেরেই এসেছিলাম। এসে দেখি ঘরে তালা বন্ধ। হাঁকাহাঁকি করতেই পাশের বাড়ির মকু মাসি এসে চাবিটা দিলে আমাকে। বললে—আপনার ভাগ্নে যাবার সময় আপনার ঘরের চাবিটা আমার হাতে দিয়ে বলল— আমি চন্দননগর যাচ্ছি, মামাকে চাবিটা দিয়ে দিও। এসেই শুয়ে পড়লাম। হিরণ ঠাকুর খাবার নিয়ে এসে আমাকে ওঠালে রাত্রি নটার সময়। খেয়েদেয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। ভোরে উঠে স্টোভ জ্বেলে চায়ের জল চড়ালাম। তারপর

কনডেন্‌স্‌ড্‌ মিল্কের টিনটা আনতে গিয়ে দেখি টিনের তলায় একটা চিঠি রয়েছে। চিঠিতে লেখা—'মামা, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছিল। তোমার ঘরে অন্য কোনও খাবার না থাকাতে এবং আমার কাছে চন্দননগরের ভাড়ার বেশী পয়সা ছিল না বলে কন্‌ডেন্‌স্‌ড্‌ মিল্ক দিয়ে পাঁউরুটিটি খেয়ে ফেললাম। অহিন শালা আমার পিছনে লেগেছে। বলছে আমার নাক কেটে দেবে। দেখা যাক কে কার নাক কাটতে পারে। আমি এখন চন্দননগর চললুম। পরে দেখা করব।' কাণ্ড দেখ! আজ রবিবার। সব দোকান বন্ধ। কনডেনস্‌ড্‌ মিল্ক পাওয়া যাবে না। আশা ছিল তোমার গাই আছে তুমি একটু দুধ এনে দিতে পারবে। কিন্তু তোমার গাই তো পিইয়ে দিয়েছ। এখন উপায়। চা না খেয়েই বেরুতে হবে নাকি"

শশধর মাথা চুলকে বললে—"চায়ের দোকান থেকে চা এনে দি"

"দোকানের চা আমি খেতে পারি না। বমি হয়ে যাবে"

"তাহলে অন্য কোথাও দেখি একটু। হরি ময়রা সন্দেশের জন্য দুধ কেনে। যদি ছানা না কাটিয়ে ফেলে থাকে তো—"

এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আধঘোমটা-দেওয়া একটি মেয়ে একটি ছোট্ট ঘটি এনে ঠুক্‌ করে নাবিয়ে দিল দ্বারের সামনে।

"কোথা থেকে দুধ পেলি—"

মেয়েটি ফিসফিস করে বললে—"নন্‌তি পিসির ছাগল আছে। সেখানেই গিয়ে পেলুম।"

বিষুণবাবু জিগ্যেস করলেন—"কে ও মেয়েটি—"

অপ্রস্তুত মুখে শশধর উত্তর দিলে—"ও আমার বউ বীণা"

মেয়েটি ছুটে পালিয়ে গেল।

"বাঃ, খুব করিতকর্মা দেখছি। তোর চেয়ে ভালো। আমি চিনতে পারিনি"

শশধরের হাসি আকর্ণ বিশ্রান্ত হয়ে গেল।

"স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চড়া। তুইও চা খেয়ে যা। চার কাপ কর। তোর বউয়ের জন্যেও এক কাপ নিয়ে যাস টিপটে করে"। শশধর খুশী হয়ে স্টোভ জ্বালাতে বসে গেল। তার উচিত ছিল এখন বাড়ি গিয়ে আলুকাবলি রাঁধতে বউকে সাহায্য করা, অন্ততঃ আলুগুলো ছাড়িয়ে দেওয়া—রোজই দেয়—কিন্তু বিষুণবাবুকে চা না খাইয়ে এখন যাওয়া অনুচিত হঠাৎ এই কথাটা তার মনে হল।

শশধরের সঙ্গে বিষুণবাবুর কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই। আর্থিক বাধ্যবাধকতাও নেই কোনও। বিষুণবাবু কিছুদিন আগে তাকে বলেছিলেন আমি তোকে শ'পাঁচেক টাকা যোগাড় করে দিচ্ছি—তুই তোদের বারান্দায় একটা ফুলুরি, বেগুনী, আলুকাবলি, পেঁয়াজির দোকান কর। ভালো চলবে। শশধর রাজী হয় নি। ফেরিওলার কাজই তার পছন্দ। টো টো ক'রে ঘুরতে ভালবাসে। ঘুরতে ঘুরতেই একদিন সে দেখা পেয়েছিল বীণার একটা বাড়িতে। সেখানে তখন ভাড়াটে ছিল ওরা। শশধর তখন ঘুগনি ফেরি করত। বেণী দোলানো বীণার সঙ্গে সেই সময়ই তার আলাপ হয়। বীণা রোজ ঘুগনি কিনত তার কাছ থেকে। তারপর অনেক ব্যাপার ঘটে গেছে। বিয়ে করেছে সে বীণাকে। বিয়ের ব্যাপারে বিষুণবাবু অনেক

সাহায্য করেছিলেন। তিনি যে পুলিস অফিসারের গাড়ি সারান তাঁকে দিয়ে চাপ দিয়েছিলেন বীণার বাপের উপর। বিষুণবাবুর কাছে শশধর কৃতজ্ঞ এ জন্য। শুধু এ জন্যই নয়, আরও অনেক কারণে। বিষুণবাবু খামখেয়ালী রগচটা লোক, কিন্তু উঁচু মন। বিয়ে করেন নি, রোজগারও কম করেন না, নামজাদা মোটর মেকানিক কিন্তু হাতে একটি পয়সা থাকে না। বিদ্যাসাগরের মতো স্বভাব কেউ এসে কেঁদে ধরলেই হল যা থাকে দিয়ে দেন।

স্টোভ জ্বালতে জ্বালতে হঠাৎ শশধর জিগ্যেস করল—"আপনার ভাগনার নাম হনুমান?" বলেই খিক খিক করে হেসে ফেলল সে।

"হনুমান নাম আমিই দিয়েছি। আসল নামটা আরও অদ্ভুত"

বিষুণবাবু বিড়ি ধরালেন একটি। সিগারেটের চেয়ে বিড়িই বেশী পছন্দ করেন তিনি। বলেন ছেলেবেলায় যখন ভাগলপুরে অমলবাবুর কারখানায় কাজ শিখেছিলাম তখন বিড়িই খেতাম। তখন পয়সার অভাবে খেতাম, এখন বিড়ি ছাড়া আর কিছু ভালই লাগে না। শশধর চায়ের জল চড়িয়ে দিয়ে চুপ করে রইল। ভাগনের সম্বন্ধে আর কৌতূহল প্রকাশ করলে না। রগচটা মানুষ কখন কোন কথায় দপ ক'রে জ্বলে উঠবেন বলা যায় না।

বিষুণবাবু বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—"আমার ভাগনের আসল নাম শুনবি? অনুমান কর"

"কি অনুমান করব"

"তার নামই অনুমান কর। কর ওদের উপাধি। নাম অনুমান। আমি সেটাকে হনুমান করে দিয়েছি-—"

"কর তো বাঙালীদের উপাধি। আপনি তো অবাঙালী—কর আপনার ভাগনে হল কি করে? আপনার নাম তো বিষুণ দুবে। তাই না?"

"ওর মা আমার আপন বোন নয়। ওর বাবা ভুপেন মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল যখন তখন তার মেয়ে মালতীর বয়স আট বছর। মা আগেই মারা গিয়েছিল। অনাথা হয়ে পড়ল মালতী। শেষে আমার ঘাড়েই পড়ে গেল। মানুষ করে বিয়ে দিলুম। পাটনায় বিপিন কর আমাদের সঙ্গেই কাজ করত। তারই হাতে পায়ে ধরে মালতীর সঙ্গে বিয়ে দিলুম। তারই ছেলে ওই ছোকরা। বাপ মা নাম রেখেছিল গণপতি। কিন্তু ছোকরা বড় হয়ে সেকেলে নাম বদলে ফেলে অনুমান নাম রাখলে নিজের। মানে আধুনিক হল। আসলে মস্তান হয়েছে একটি। মালতী বিপিন দু'জনেই মারা গেছে। হনুমানটাকে লেখা-পড়া শেখাবার চেষ্টা করেছিলাম। পাটনা স্কুলে ভরতি করে দিয়েছিলাম। একদিন স্কুলের মাস্টারের সঙ্গে মারামারি ক'রে বসল। রাসটিকেট করে দিলে। দূর করে দিলে বোর্ডিং থেকে। আমি তখন পাটনা থেকে চলে এসেছি এখানে। ওকে খরচ দিয়ে বোর্ডিংয়েই রেখেছিলাম। এখানে এসে হাজির হল। মোটরের কাজ শেখাবার চেষ্টা করলাম। শিখল না। এইখানে সব বখা ছেলেদের সঙ্গে মিশে মস্তান হয়েছে। মাঝে মাঝে আমার উপর এসে হামলা করে। প্রায়ই পুলিস কেসে পড়ে। আমার জানাশোনা ওই পুলিস অফিসারটি আছে বলে বেঁচে যাচ্ছে তা না হলে এতদিন জেল হয়ে যেত—"

শশধর বললে—"ছেলেটি কিন্তু ভারি মিশুক। কথাবার্তা চমৎকার—"

"তুমি কিন্তু মিশো না ওর সঙ্গে। ও দেশোদ্ধার করতে চায়। তুমি ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না"

"না, আমি পাল্লা দিতে যাব কেন"

"তুমি ওর সঙ্গে কথাই বোলো না। রাজনীতি চোরাবালির মতো জিনিস, কখন যে তলিয়ে যাবে বুঝতেই পারবে না।"

শশধর চুপ করে রইল। বিষুণবাবুর সঙ্গে তর্ক করতে সাহস হল না তার। ওঁর ভাগনের সঙ্গে তেমন আলাপও হয় নি। দূর থেকে দেখেছে দু'একবার। দেখে ভালো লেগেছে। মনে হয়েছে বেশ 'স্মার্ট' ছেলেটি। কিন্তু ওর সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য করলেন না বিষুণবাবু। চা-পর্ব নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হল। বিষুণবাবু উবু হয়ে বসে তাঁর বড় গেলাসটিতে দু' কাপ চা খেলেন। সবচেয়ে ভালো চা কেনেন তিনি—খান কিন্তু গেলাসে। কাপ কেনবার শখ নেই। শশধর বীণার জন্যে চা নিয়ে চলে যাচ্ছিল বিষুণ-বাবু তাকে থামিয়ে বললেন—"একটু দাঁড়াও—"

শশধর দাঁড়িয়ে পড়ল।

"আমার ওই জামাটার ইনার পকেটে হাত ঢোকাও। পঁচিশটা টাকা আছে। ওর থেকে দশটা টাকা বের করে নাও। বঙ্কিমের ওষুধের দোকান চেন তো? সেইখানেই গিয়ে বলো যে আমাকে তিনি যে ওষুধের কথা বলেছিলেন তা যেন দেন এক শিশি। ওই ওষুধ তোমার বীণাকে দাও গিয়ে। কপালে যে কাটা দাগটা আছে ওই ওষুধ রোজ লাগালে দাগ না কি থাকবে না। ওটা লাগাতে বল—"

"ওষুধের দাম দশ টাকা!"

"ঠিক জানি না। বাকি যা থাকবে তা বীণাকেই দিয়ে দিও, বোলো আমি দিয়েছি। দুধের দাম—"

বিষুণবাবু মুচকি হাসলেন।

"আরও পাঁচটা টাকা নিয়ে যাও। একটিন দুধ, দু বাণ্ডিল বিড়ি আর কিছু হরতুকি কিনে এন—"

"তা আনব। ওষুধটা কিন্তু কিনবো না"

"কেন—"

"বীণা লাগাবে না। একটি কথাও শোনে না"

"শুনবে। আলবৎ শুনবে। আমার নাম করে বোলো। অমন সুন্দর মুখে অমন বিশ্রী একটা দাগ কি ভালো দেখায়? ওটা শুনেছি ভালো ওষুধ। লাগাতে বোলো—"

"আমি আপনাকেই ওষুধটা এনে দেব। আপনি বলবেন ওকে লাগাতে। আমি বললে শুনবে না"

বিষুণবাবু চোখ পাকিয়ে শশধরের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন—"তোমার বউ তোমার কথা শোনে না একথা বলতে লজ্জা করে না তোমার"

চুপ করে রইল শশধর।

বিষুণবাবু বললেন—"অতিরিক্ত 'নাই' দিয়ে বউকে মাথায় তুলেছ। তাই কথা শোনে না। ঘোড়া সোয়ার বোঝে, বুঝলে?"

শশধর একটু মুচকি হেসে দাঁড়িয়ে রইল।

"দাঁড়িয়ে আছ কেন। টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়। তুমি ফেরিতে বেরুবে ক'টার সময়—"

"দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে বেরুব। আলুকাবলি বিকেলের দিকেই বেশী বিক্রি হয়—"

"আলুকাবলি রান্না করে কে? বীণাই না কি—"

"দু'জনে মিলে করি। কিন্তু আজ তো এখানে আটকে গেছি। আপনি আবার বাজারে যেতে বলছেন—"

"কিছু করতে হবে না তোমাকে। তুমি বাড়ি গিয়ে আগে নিজের কাজ কর। আমি শিবেকে দিয়ে আনিয়ে নেব, সে এক্ষুণি আসবে—"

শশধর তবু দাঁড়িয়ে ঘাড় চুলকোতে লাগল।

"কি দাঁড়িয়ে রইলে যে!"

শশধর অপ্রস্তুত মুখে তবু দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর বলল—"আমি ঝপ্ করে গিয়ে কিনে আনছি। বেশী দেরি হবে না। যাই?"

"যাও। ছাড়বে না যখন, যাও। বীণার কাছে দেরির জন্যে আমাকে দায়ী কোরো না কিন্তু।"

"না তা করব কেন। আমি যাব আর আসব। আপনি তিনটের সময় কোথায় থাকবেন? ওয়ার্কশপে তো—"

"কেন—"

"তিনটের সময় আপনাকে আলুকাবলি খাইয়ে আসব"

শশধর মুচকি হেসে টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

শশধর চলে যাওয়ার পর বিষুণবাবু সেই কাজটি করলেন যেটি তিনি আর কারও সামনে কখনও করেন না। কাজটি যে মন্দ তা তিনি জানেন—তাই ছেলেছোকরাদের সামনে ও কাজটি করেন না। ট্রাঙ্ক থেকে একটি হুইস্কির বোতল বের করে গ্লাসে বেশ খানিকটা ঢেলে নির্জলাই পান করে ফেললেন। বাইরে আওয়াজ পেয়েই বোতলটি তাড়াতাড়ি আবার লুকিয়ে ফেললেন ট্রাঙ্কে।

ডাক্তারবাবুর চাকর ধন্‌শা এসে হাজির হল।

"চলুন আপনি, গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না"

"আবার স্টার্ট নিচ্ছে না? কি হল আবার"

ধন্‌শা স্বল্পভাষী। সে কোনও উত্তর না দিয়ে চেয়ে রইল শুধু।

"কি হল আবার! কথা বলছ না কেন"

"কি হল তাই জানবার জন্যেই তো বাবু আপনাকে ডাকছেন। আমি বাসন মাজি মোটরের কি হল কেমন করে বুঝব। বাজে কথা জিগ্যেস করছেন কেন"

"আচ্ছা তুমি যাও আমি যাচ্ছি—"

"আপনার জন্যে ট্যাক্সি এনেছি আমি। ডাক্তারবাবুর গাড়ি ময়ূরগঞ্জে গিয়ে থেমে গেছে। তিনি বাড়িতে লোক পাঠিয়েছিলেন খাবার নিয়ে যেতে। সেই লোক আমাকে বললে ট্যাক্সি ক'রে আপনাকে নিয়ে যেতে। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে চলুন—"

"আমাকে তো আগে ওয়ার্কশপে যেতে হবে। কিছু যন্ত্রপাতি নিতে হবে তো। ময়ূরগঞ্জে তো হবিব মিস্ত্রীর কারখানা আছে—"

"সে এসেছিল। বাবু তাকে গাড়ি ছুঁতে দেন নি। বলেছেন বিষুণ মিস্ত্রী ছাড়া আর কাউকে গাড়ি ছুঁতে দেবেন না তিনি। হবিব মিস্ত্রীর ট্যাক্সিটাই ভাড়া করেছেন সমস্ত দিনের জন্য—সেই ট্যাক্সি নিয়ে আপনি যেখানে খুশি যান। আমি চললাম, আমার এক কাঁড়ি বাসন মাজতে হবে এখন। কাল রাত্রে ভোজ হয়েছিল—আমি চলি—ট্যাক্সিটা রইল—"

"চল। আমি তোমাকে নাবিয়ে দিয়ে যাই। ওয়ার্কশপ থেকে জিনিসপত্র নিয়ে তারপর ময়ূরগঞ্জে যাব—"

বিষুণবাবু একটা কৌটো বার করে কিছু লবঙ্গ এলাচ দারচিনি বার করে মুখে ফেলে দিলেন। ডাক্তারবাবু মুখে যদি মদের গন্ধ পান তাহলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবেন।

ওয়ার্কশপে গিয়ে বিষুণবাবু দেখলেন একজন শাঁসালো ব্যক্তি তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। স্বয়ং মোহনদাস ঝুনঝুনিয়া।

'বিষুণবাবু, আমার গাড়ির ব্রেকটা ঠিক করে দিতে হবে—"

"হালিম তুমি ব্রেকটা খোল। আমি ময়ূরগঞ্জে যাচ্ছি—"

"ময়ূরগঞ্জ, কেন?"

"ডাক্তারবাবুর গাড়ি সেখানে আটকে গেছে। সেখান থেকে ট্যাক্সি পাঠিয়েছেন"

"আমার কাজটা তাহলে—"

"হালিম খুলুক না ততক্ষণ। আমি এসে পড়ব, নিজেই দেখে দেব—"

"কিন্তু আমার একটু. জরুরী দরকার ছিল। আপনি আমার কাজটা করে দিয়ে যদি যেতেন—"

"আমাকে এখনই যেতে হবে সেখানে। আমি এসে আপনার ব্রেক ঠিক ক'রে দেব, হালিম খুলুক না—"

মোহনদাস একটু অপমানিত বোধ করলেন। কিন্তু সে ভাবটা চেপে রেখে বললেন—"আপনাকে বেশী মজুরি দেব, যা চাইবেন তাই দেব, আমার কাজটা ক'রে দিয়ে তবে যান, প্লীজ—"

"মাফ করবেন। এখন পারব না।"

নিজের জিনিসপত্র নিয়ে ট্যাক্সি চড়ে ময়ূরগঞ্জের দিকে রওনা হলেন বিষুণবাবু। ড্রাইভার রবি বিষুণবাবুর চেনা লোক। বিষুণবাবুর চেনা মহল সুবিস্তৃত। রবির দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি ময়ূরগঞ্জে আছ না কি আজকাল"

"হ্যাঁ, হবিব এ ট্যাক্সিটা কিনেছে, এইটেই চালাচ্ছি আমি—"

"লাইসেন্স পেয়েছ—"

রবি চুপ করে রইল। তারপর বলল—"না। হবিবের লাইসেন্স আছে আমি এখনও কবতে পারি নি। তবে গাড়ি চালাতে শিখে গেছি। আপনি যদি এস-পি-কে অনুরোধ করেন আমার লাইসেন্সটা টপ করে হয়ে যাবে"

"তুমি যদি আমার ওয়ার্কশপে কাজ শিখতে তাহলে তোমার সব হ'ত। কিন্তু তুমি ওই বাগদীর মেয়েটার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে এমন একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুললে—যে শেষকালে তোমাকে পালাতে হল। আমিও আর তোমাকে রাখতে পারলাম না। যাক, হবিবের কাছে আশ্রয় পেযেছ ভালই হয়েছে। দেখো ওখানে আবাব পা হড়কে যায় না যেন। মেয়েমানুষ তো সব জায়গায় গিজগিজ করছে। নিজেকে সামলে চলতে হবে—"

"বিষুণদা আপনি বিশ্বাস করুন। আত্‌রি'কে ফাঁসিয়েছিল শ্রীনাথ উকিল। আমি শুধু দূত হয়ে গিয়েছিলাম। মাঝ থেকে আমাকে সবাই ধ'রে পিটিয়ে দিলে—"

"দেখ রবি আগেই তোমাকে আমি স্নেহ করতাম। এখন তোমার কথা শুনে স্নেহ উথলে পড়ছে—"

"তাব মানে?"

"মানে মনে হচ্ছে যাব এমন অনর্গল মিথ্যে কথা বলবাব ক্ষমতা তাকে প্রচুর স্নেহ কবা উচিত। মনে হচ্ছে তুমি একজন উঠ্‌তি নেতা—"

"সত্যি বলছি বিষুণদা, আপনি বিশ্বাস করুন। আমি—"

হঠাৎ গর্জন করে উঠলেন বিষুণবাবু—।

"চুপ কর শালা হারামজাদা। আতব আমাকে নিজে সব কথা খুলে বলেছে। তুমি যদি ব্যাটাছেলে হতে তাহলে ওই গবীবের মেয়েটাকে বিয়ে ক'র'ত, কুকুরের মতো পালাতে না। শশধর যেমন করেছে, সে মরদকা বাচ্চা। তাকে আমি সাহায্য করেছিলাম, তোমাকেও করতাম তুমি কিন্তু শালা সটকে পড়লে—"

রবি চুপ কবে গেল। সামনের দিকে তাকিয়ে রইল বিস্ফারিত চক্ষে। বিষুণের সঙ্গে আব বাক্যালাপ করতে সাহস হল না তার। লোকটার হাত চলে, হয়তো মেরেই বসবে।

একটু পরে বিষুণবাবুই কথা কইলেন। এবাব তাঁব কণ্ঠস্বর বেশ স্নেহার্দ্র। রবির কাঁধে হাত রেখে বললেন "তোমার ভালোর জন্যেই বকলুম তোমাকে। তোমার বুড়ো বাবা তোমারই মুখ চেয়ে আছেন, তুমি যদি বিগড়ে যাও তাহলে তিনি যাবেন কোথা। ট্যাক্সি চালাবার জন্যে হবিব তোমাকে দিচ্ছে কত করে—কতদিন ট্যাক্সি চালাচ্ছ—"

"এখনও একমাস হয় নি। বলেছে শেয়ার দেবে—"

"শেয়ারটেয়ারে ঢুকো না এখন। একটা বাঁধা মাইনে করে নাও। তোমার বাবাকে কিছু দিতে হবে। হিরণ ঠাকুর বলছিল তিন মাস তিনি হোটেল চার্জ দেননি।"

রবি কোন উত্তর না দিয়ে সামনের দিকেই চেয়ে রইল।

বিষুণবাবু বললেন, "তোমাকেই দিতে হবে সেটা। তাই বলছি একটা মাইনে করে নাও।

তাঁকে মাসে গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিলেই খুশী হবেন তিনি। এর কমে তাঁর চলবেও না। হিরণ ঠাকুরকেই মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা দিতে হয়। আর পাঁচ টাকা হাতখরচ— "

এ খবরে রবির মুখে ভাষা ফুটল।

"হিরণ ঠাকুরেব ওখানে শুনেছি দেড় টাকা ক'রে পার মিল (Per Meal) —তাহলে তো মাসে নব্বই টাকা হওয়া উচিত"

কিন্তু তোমার বাবা সেখানে একবেলা খান। রাত্রে। দিনের বেলা তিনি ঘোঁতাই মল্লিকের বাড়ি পূজো কবেন, সেখানেই মায়ের প্রসাদ পেয়ে আসেন। তুমি কি তোমার বাবার খোঁজখবরও রাখ না নাকি আজকাল—"

ববি কোনও উত্তর দিল না, সামনের দিকে চেয়ে রইল।

"উত্তব দিচ্ছ না কেন হে"

একটা বাজারেব ভিতব দিয়ে তারা যাচ্ছিল, রবি একটা গাছতলায় গাড়ি দাঁড় করাল।

"গাড়ি দাঁড় করালে যে—"

"পেঁয়াজ, গরমমসলা, জাফরান আর আলু কিনতে হবে। সেরখানেক ঘি আব সেবখানেক তেলও চাই। তেল ঘি কি করে নিয়ে যাব ভাবছি। বাসন আনতে ভুলে গেছি—"

"ওসব কি হবে—"

"হবিবের মেয়ে জামাই এসেছে। তাদের 'অনাবে' ডাক্তারবাবু 'ফিস্ট' দিচ্ছেন। খাসী কাটা হয়েছে একটা। আমাকে এই মসলাগুলো নিযে যেতে বলেছেন—কিন্তু ঘি আব তেল নেব কি করে ভাবছি। না নিয়ে গেলে—"

রবি মাথা চুলকোতে লাগল। .

বিষুণবাবু অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তার দিকে।

"তেল ঘি কিনতে এসেছ, বাসন আন নি! ষাঁড়ের গোবর কোথাকার!"

নেবে পড়লেন বিষুণবাবু।

সামনের একটা টিনের দোকানে অনেক খালি টিন ছিল নানা মাপেব। সেই দিকে এগিয়ে গেলেন বিষুণবাবু।

"টিন সব পরিষ্কার আছে তো"

হ্যাঁ। সব টিন ধুয়ে রাখা আছে"

দুটো টিন বেছে কিনে ফেললেন তিনি। তারপর রবির দিকে ফিরে বললেন—"নাও। এইবার চটপট কিনে ফেল জিনিসগুলো—"

রবি বাজার করতে লাগল।

ময়ূরগঞ্জে গিয়ে বিষুণবাবু দেখলেন ডাক্তারবাবু একটা গাছতলায় ইজিচেয়ারে বসে আছেন। আশেপাশে আরও দু'চারটি চেয়ার পড়েছে। পাড়ার লোকজনের সঙ্গে বেশ গল্প জমিয়েছেন ডাক্তারবাবু। স্থানীয় স্কুলের একজন শিক্ষকের দিকে চেয়ে তিনি বলছিলেন—"প্রগতি প্রগতি করছেন কিন্তু কথাটা খোলসা করে তো বলছেন না। খাচ্ছেন দাচ্ছেন বিয়ে করছেন ছেলেমেয়ে হচ্ছে চাকরি করছেন ব্যবসা করছেন অর্থাৎ আপনার পূর্বপুরুষরা যা যা

করতেন আপনারাও তাই করছেন এর মধ্যে প্রগতি কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। কতকগুলো সামাজিক আইন-কানুন বদলেছে বটে—বামুনের ছেলে প্রকাশ্যে শোর গরু মুর্গি মদ খাচ্ছে, জাতিভেদ প্রথা ভেঙে যাচ্ছে, ছেলেমেয়েরা যাকে খুশি বিয়ে করছে, ধর্ম না মানাটাই রেওয়াজ হয়ে পড়েছে—নানা কাণ্ড হয়েছে, ও রকম মাঝে মাঝে হয়েই থাকে—কিন্তু মূল সুরটা ঠিক আছে অর্থাৎ আহার নিদ্রা মৈথুনের সুর, ভোগের সুর। ওকে প্রগতি বলছেন কেন। আপনি গন্ধবণিক আপনার মেয়ে একজন কায়স্থের ছেলেকে বিয়ে করেছে। বেশ তো করেছে, আগেও এরকম কাণ্ড হয়েছে, সমাজে তা স্বীকৃতিও পেয়েছে। আমাদেব দেশের বাধু ভট্চায্যির রক্ষিতাটি কি জাতেব ছিল তা আমবা কেউ খোঁজ কবি নি, কিন্তু যদিও তাদের রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে হয়নি তবু তিনি আমবণ রাধু ভট্চায্যিব কাছে স্ত্রীর মতোই ছিলেন। আমরা তাঁকে জ্যাঠাইমা বলতুম। তাঁর গর্ভের ছেলেকে ভট্চায্যিমশাই বিষয়েব অংশও দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রগতি প্রগতি বলে তিনি লাফালাফি কবেননি। আপনি এটাকে প্রগতি বলছেন কেন। আগে আমবা কাঁসাব থালায় খেতাম, এখন প্লেটে খাচ্ছি—এটা কি মস্ত একটা প্রগতি বলতে চান আপনি—আগে ক্ষীর খেতুম এখন পুডিং খাচ্ছি এটা কি প্রগতি— ? প্রগতির সংজ্ঞা কি আগে সেটা স্থিব করুন—''

গাড়িটা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল বিষুণ আব কালবিলম্ব না কবে গাড়ির হুড্টা তুলে দেখল একবাব। তাবপর স্টার্ট দিল হ্যাণ্ডল দিয়ে। কিছু হল না।

ডাক্তাবধাবু উঠে পড়লেন।

''ও বিষুণ এসে গেছে। ভেরি গুড। আজ তুমি খাবে এখানে। হবিবের জামাই এসেছে। হবিব গাড়িটা খুলতে যাচ্ছিল আমি খুলতে দিলুম না। বললুম তুমি ভালো বিরিয়ানি বাঁধতে পার তাই বাঁধ গিয়ে। আমি বিষুণকে ডেকে পাঠাচ্ছি। সে আমাব গাড়ির ধাত চেনে—''

ডাক্তারবাবু কাছে আসতেই সে গাড়ির তলায় ঢুকে পড়ল। তাব ভয় হল ডাক্তারবাবু হয়তো ব্র্যাণ্ডিব গন্ধ পাবেন।

ডাক্তারবাবু আবার গিয়ে চেযারে বসলেন।

ডাক্তারবাবু বসতেই স্কুলেব শিক্ষক নিখিলবাবু বললেন—''প্রগতি কথাটার ডেফিনিশন তো ওই কথাটাব মধ্যেই বয়েছে। যা প্রকৃষ্টরূপে গতি তাই প্রগতি—''

''কোন দিকে গতি, সামনে না পিছনে—মনুষ্যত্ব থেকে পশুত্বের দিকে, না, মহামনুষ্যত্বের দিকে। দু' দিকেই প্রকৃষ্ট গতি হতে পারে—''

''সামাজিক আর্থিক সব বাধাকে এগিয়ে চলাই প্রগতি''

নিখিলবাবু এইবাব জোরে এক টিপ নস্যি নিলেন। তাঁর ভাব দেখে মনে হল তিনি যেন দাবা খেলায় কিস্তি দিয়েছেন।

''মানুষ চিবকালই বাধাকে অতিক্রম করবাব চেষ্টা করছে। তার এই চেষ্টাই তার প্রাণধর্মের লক্ষণ, কিন্তু ইতিহাস বলছে যে একটা বাধা সরালে আর একটা বাধা এসে হাজির হয়। অন্নাভাব দূর করে মানুষ যখন অন্ন-প্রাচুর্যের যুগে এসে পড়ল তখন তার সঙ্গে এল অন্ন-পরিপাক-সংক্রান্ত নানাবিধ রোগ, রোগ সারাবার জন্য নানারকম ওষুধের কাণ্ডকারখানা,

কারখানাকে কেন্দ্র করে শ্রমিকধনিক সংঘর্ষ ইত্যাদি ইত্যাদি। ভেবেছিলাম রাশিয়ায় বুঝি প্রগতি তার বাঞ্ছিত মূর্তি পেয়েছে। কিন্তু খবর পেলাম সেখান থেকেও লোক পালাচ্ছে, অনেক ভালো ভালো লোক অন্য দেশে গিয়ে বসবাস করছে। আমার বিশ্বাস মানুষ যতক্ষণ পশু থাকবে ততক্ষণ তার সমস্যা মিটবে না। গোঁফ কামিয়ে, গোঁফ ছেঁটে কাপড়ের বদলে প্যাণ্ট পরে, অসবর্ণ বিয়ে করে আসল সমস্যাটা অর্থাৎ পশুত্বের সমস্যাটা মিটবে না। প্রাগৈতিহাসিক যুগের পশু আর আধুনিক পশুতে খুব বেশী তফাত নেই। প্রগতি প্রগতি বলে সেটা লোপ করা যাবে না, চক্ষুষ্মান ব্যক্তি-মাত্রেই সেটা দেখতে পাবে। আমি কি বলি শুনবেন?"

"বলুন—"

"প্রগতি প্রগতি বলে লাফালাফি করবেন না। যা করছেন চুপচাপ করে যান। আপনার মেয়ে বুদ্ধিমতী সে একটি ভালো ছেলেকে বিয়ে করেছে, বেশ করেছে। আশীর্বাদ করি সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করুক তারা। তবে ওটাকে প্রগতি বলবেন না। কোদালকে কোদাল বলাই উচিত।"

ডাক্তারবাবু হাসিমুখে মাস্টারমশাইয়ের দিকে চেয়ে রইলেন। মাস্টারমশাই একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলেন। আর একজন বললেন, "কোদালকে কোদাল বললে অনেক সময় নিন্দে হয় যে। তাই ওটাকে আমরা সেতার বা গীটার ব'লে চালাতে চাই"

হো হো করে হেসে উঠলেন অনেকে।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন তরুণ ডাক্তার বিনয় মল্লিক।

"আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করছি। আপনি প্র্যাকটিস ছেড়ে দিলেন কেন—"

"আমার আর টাকার দবকার নেই। আমি বিয়ে করি নি, নিকট আত্মীয়ও নেই কেউ তেমন। তোমরাই আমার আত্মীয়। টাকা রোজগার করে আর কি করব? বাবা যা বিষয়আশায় রেখে গেছেন আর আমি নিজে আগে যা রোজগার করেছি তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। টাকার পিছনে ছুটোছুটি করে কি আর হবে?—"

গাড়ির তলা থেকে বেরিয়ে এসে বিষুণ হুড্ খুলে কি দেখছিল। সে বলল—"কয়েকটা জিনিস কিনে আনতে হবে।"

"বেশ নিয়ে এস। ট্যাক্সিটা করেই চলে যাও। ওটা আমি সমস্ত দিনের জন্যই ভাড়া করেছি। টাকা নিয়ে যাও—"

ডাক্তারবাবু পকেট থেকে মনিব্যাগ বার করলেন।

"এই একশ' টাকার নোটটা নিয়ে যাও। ভাঙিয়ে এনো—"

বিষুণ ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু বললেন—"মোটরটা আমাকে বড্ড খরচ করায়। কিন্তু ওটাকে ছাড়াতেও পারি না। ভালো অষ্টিন গাড়ি পঁচিশ বছর আমার কাছে আছে, ওর উপর মায়া বসে গেছে

একটা। আমিও বুড়ো হয়েছি আমার গাড়িও বুড়ো হয়েছে। ওই বুড়োকে নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব—নতুন গাড়ি আর কিনব না"

ডাক্তারবাবুর বয়স এখন পঁয়ষট্টি। পঁচিশ বছর আগে তিনি যখন নূতন গাড়িটি কিনেছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ। নূতন গাড়ি কিনে তিনি যাঁর ওখানে প্রথমে গিয়েছিলেন, এবং যিনি তাঁর গাড়ির প্রথম আরোহিণী হয়েছিলেন তাঁর নাম মিস অমিতা রায়। তিনি স্কুলের হেডমিস্ট্রেস ছিলেন। মার্জিতরুচি বিদুষী মহিলা। ডাক্তারবাবু এই রূপসী এবং তরুণী অমিতা রায়ের প্রেমে পড়েছেন এই গুজবটা নিয়ে অনেকের রসনা আন্দোলিত হয়েছিল তখন। অমিতা রায়কে প্রায়ই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ডাক্তারবাবুর গাড়িতে দেখা যেত। কিন্তু এ গুজবের অবসান ঘটল যখন হঠাৎ একদিন একটা ভালো চাকরি পেয়ে অমিতা দেবী দিল্লী চলে গেলেন। ডাক্তারবাবুর আচরণে এমন কিছু কেউ লক্ষ্য করল না যার জোরে গুজবটাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। ডাক্তারবাবু যেমন প্র্যাকটিস করছিলেন তেমনি করতে লাগলেন, এতটুকু বিচলিত হয়েছেন বলে মনে হল না কারও। তারপর অমিতা রায়কে ভুলেই গেল সবাই! যে স্কুলের তিনি হেডমিস্ট্রেস ছিলেন সে স্কুলটাও উঠে গেল কিছুদিন পরে। ডাক্তারবাবু কিন্তু অমিতা রায়কে একেবারে ভোলেন নি। তাঁব সঙ্গে পত্রালাপ করতেন তিনি। সে সব পত্রে কি থাকত তা অবশ্য জানা যায় নি। ডাক্তারবাবু কখনও কাউকে বলেন নি সে কথা। কারণ ডাক্তারবাবুকে যদিও সবাই ভালবাসত, কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গ কেউ ছিল না। তিনি ধনী দরিদ্র সকলের সঙ্গে মিশতেন, সবার উপকার করবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু আসলে একক জীবন যাপন কবতেন তিনি। বাড়িতে তাঁর পুরোনো চাকর নটবব এবং পুবোনো ঝি ক্ষেন্তির মা ছাড়া আর কেউ ছিল না। নটবরই ছিল বাড়িব কর্তা আর ক্ষেন্তিব মা ছিল গিন্নী। দু'জনে ঝগড়া হত রোজই, দু'জনের ঝগড়ার মধ্যস্থতা কবা ডাক্তারবাবুব একটা নিত্য কর্মেব মধ্যে ছিল, কিন্তু একটা বিষয়ে তারা দু'জনেই একমত ছিল বরাবর—ডাক্তাববাবুব যাতে কোনও কষ্ট না হয়। দু'জনে মিলেই ঘরের সব কাজ করত তারা। রাঁধতও দু'জনে। ডাক্তারবাবু ইদানীং নিরামিষ তরকারি বেশী পছন্দ করতেন, সেগুলো রাঁধত ক্ষেন্তির মা, মাছ মাংস রাঁধত নটবব। নিরামিষ খেলেও ডাক্তারবাবু মাছ মাংস পরিত্যাগ করেন নি। নটবর মাছ মাংস পোলাও রান্নাতে একজন ওস্তাদ ছিল না কি। এদেরই তত্ত্বাবধানে ডাক্তার-বাবুর জীবন কাটত। এককালে ডাক্তারবাবুর ডাক্তার হিসাবে খুব নাম ছিল, ইদানীং কিন্তু রোগী দেখে আর পয়সা নেন না। হুজুক নিয়ে থাকতেই ভালবাসেন আজকাল। আজ যেমন হবিবের জামাই মেয়েকে খাওয়াবেন বলে মেতেছেন। তাঁর জীবনে আর দুটি প্রিয় লোক তাঁর ড্রাইভার লোচন আর মিস্ত্রী বিষুণ। হবিবকেও ভালবাসেন তিনি খুব, তাকে একবার সঙীন নিমোনিয়া থেকে তিনিই বাঁচিয়েছিলেন, কিন্তু হবিবকে তিনি নিজের গাড়ি ছুঁতে দেন নি কোনদিন। হবিবের ভাইয়ের বিয়ের সময় ডাক্তারবাবু নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। মুগ্ধ হয়েছিলেন বিরিয়ানি আর কোর্মা খেয়ে। বলেছিলেন এতো ভালো বিরিয়ানি তিনি না কি আর খান নি। হবিব হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললে—আমিই রেঁধেছি বিরিয়ানি। 'তুমি!' অবাক হয়েছিলেন

ডাক্তারবাবু— বলেছিলেন—"তাহলে মোটর সারাবার কারখানা করেছ কেন, ভালো একটা হোটেল খোল। তোমার রান্না খাওয়ার জন্যে লোকে ভিড় করে আসবে।"

দিন দুই আগে ডাক্তারবাবু পান্না ঝিলে গিয়েছিলেন পিকনিক করতে পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে। খুব হৈ হৈ করেছিলেন তাদের নিয়ে। খাওয়া হয়েছিল খিচুড়ি, মাছ ভাজা আর বেগুন ভাজা। তার সঙ্গে ছিল চাটনি আর রসগোল্লা। ছেলেমেয়েদের আবৃত্তি হয়েছিল, গানও হয়েছিল। প্রত্যেককে একটা করে প্রাইজ দিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু।

তারও কিছুদিন আগে তিনি গাজিপুরের কুমোরপাড়ায় গিয়ে সরস্বতী পুজো করেছিলেন এক কুমোরের বাড়িতেই। সব কুমোরদের খাইয়েছিলেন তিনি। আর তাদের গড়া প্রতিমা দেখে খুব তারিফ করেছিলেন তাদের, প্রত্যেককে একটি করে বাসন্তী-রঙে-রাঙানো চাদর উপহার দিয়েছিলেন। প্রায় একশ'জন লোক খেয়েছিল কুমোরপাড়ার।

এই ধরনের হুজুক নিয়েই আজকাল থাকতে ভালবাসেন তিনি। মাঝে মাঝে মাছ ধরতে যান নানা জায়গায়, বিলে খালে পুকুরে গঙ্গায়, যেখানে যখন সুবিধে। যেখানেই যান নিজের মোটরে করে যান সঙ্গে থাকে লোচন, নটবর আর ক্ষেন্তির মা। আর থাকে রান্নাব জিনিসপত্র, বাসনকোসন, স্টোভ, কয়লার তোলা উনুন। যেখানেই যান সেখানেই একটা খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা সঙ্গে নিয়ে যান আর সেখানকার ছেলেমেয়েদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান। অনেক রাখাল বালকও তাঁর দলে জুটে যায়।

এই সবই ভালবাসেন তিনি আজকাল।

।। দুই ।।

বীণা মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল—"আমি ও ওষুধ লাগাব না"

শশধর মটরশুঁটি ছাড়াচ্ছিল, হেসে জবাব দিল—"বিষুণদাকে বোলো সে কথা"

"তুমি বোলো"—আবার মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল সে। সে সাবু তৈরি করছিল। সাবুটা নাবিয়ে বলল—"আমি মান্‌তি মাসীকে সাবুটা দিয়ে আসি, আমার হয়তো একটু দেরি হবে, আমি মুকুজ্যে গিন্নীর কাছে যাব লেবু আনতে। একটু লেবু দিয়ে না দিলে মাসী সাবুটা খেতে পারবে না। তুমি ততক্ষণ আলুগুলো ঠিক করে রাখ—"

"বিষুণদাকে বলেছি তিনটের সময় তাঁকে আলু-কাবলি দিয়ে আসব। তখন তিনি আমাকে জিগ্যেস করবেন তুমি ওষুধটা লাগিয়েছ কি না—"

"বলে দিও লাগাই নি, লাগাব না"

"লাগাবে না কেন। এর কোন মানে আছে—"

"কপালের এই কাটা দাগটা আমার বাবার স্মৃতিচিহ্ন। তিনি মেরেছিলেন বলেই দাগটা হয়েছে। তিনি এখন নেই, কিন্তু দাগটা আছে। ওটা থাক—"

সাবু নিয়ে বেরিয়ে গেল বীণা।

শশধরের মনে পড়ল বীণার বাবা একটা লোহার ডান্‌ডা দিয়ে বীণার মাথায় আঘাত করেছিলেন। বীণা চার দিন অজ্ঞান হয়ে হাসপাতালে ছিল। এবং এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে বিষুণদা এস. পির সাহায্যে চাপ দিয়েছিলেন বীণার বাবার উপর। তাঁকে অ্যারেস্ট করে থানায় পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে বলেছিলেন তোমার মেয়ের বয়স হয়েছে, সে যদি স্বেচ্ছায় কোনও গরীবের ছেলেকে বিয়ে করতে চায় তাতে বাধা দেবার তোমার কোনও অধিকার নেই, এ জন্যে তাকে অমনভাবে মারবারও তোমার কোনও অধিকার নেই। এ জন্যে তোমাব নামে 'কেস' করব আমরা। আর এ-ও বলে দিচ্ছি এ জিনিস যদি আদালতে গড়ায় তাহলে ভবিষ্যতে তোমার মেয়ের বিয়ে হওয়া মুশকিল হবে। পুলিসের বড় সাহেবের এই কথা শুনে সুশীলবাবু (বীণার বাবা) তার সঙ্গে বীণার বিয়ে দিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত। বীণার কপালের কাটা দাগটা তাদের বিয়েরও স্মৃতিচিহ্ন—শশধরের মনে হল। বিষুণদা ওটাকে মুছে দেবার জন্য ব্যস্ত কেন? তারপরই তার মনে হল বিষুণদা চেষ্টা না করলে বীণার সঙ্গে তার বিয়েই হত না। বিষুণদা বিয়ের সময় বীণাকে আড়াই শ' টাকা খরচ করে একটা বেনারসী শাড়ি কিনে দিয়েছিল এটাও মনে হল পরক্ষণেই। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল বিষুণদাকে সে তিনটের সময় আলুকাবলি খাইয়ে আসবে বলেছিল। বীণা বেরিয়ে গেল, কখন ফিরবে কে জানে। দেরি হলে সেই চড়িয়ে দেবে আলুকাবলি, কিন্তু বীণার হাতে রান্নাটা ভালো হয়। আর একটা কথা মনে পড়ল তাব বীণা বলছে সে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেব জন্য একটা পাঠশালা বসাবে তাদের বারান্দায়। বীণা ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিল। অ আ ক খ তাদের শেখাতে পাববে নিশ্চয়ই। বলছে এক টাকা করে মাইনে নেব ছেলেমেয়ে পিছু। যারা খুব গবীব তাদের কাছে কিছু নেব না। বীণাব খুব একা একা লাগে। শশধর তো টো টো করে চারদিকে ঘুবে বেড়ায। পাঠশালা কবলে কিছু আয়ও হতে পারে—এই সব নানা কথা মনে হতে লাগল শশধরের। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল বিষুণদার ভাগ্নে অনুমানের কথা। একটিন কন্‌ডেন্‌স্‌ড মিল্ক দিয়ে একটা বড় পাঁউরুটি খেয়ে ফেলেছে—বাহাদুরি দিতে হয় ছোকরাকে। এলোমেলো নানারকম কথা ভিড় করতে লাগল তার মনে। শশধর একটা জিনিস নিয়ে বেশীক্ষণ একনাগাড়ে ভাবতে পারে না। তার মন নদীর স্রোতের মতো, কত রকম জিনিস ভেসে আসছে তাতে। হঠাৎ মনে পড়ল আগা সাহেবের কথাটা। প্রায় বছর দুই আগে তার কাছ থেকে কুড়ি টাকা ধার নিয়েছিল, প্রতি মাসেই চড়া হারে সুদ দিয়ে যাচ্ছিল, কাবুলিটা ঠিক তাকে রাস্তায় ধ'রে ফেলে, তার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া শক্ত, প্রতি মাসে টাকায এক আনা ক'রে সুদ দিতে হত। দু' বছরে তিরিশ টাকা সুদ দিযেছে। কিন্তু কুড়ি টাকা একসঙ্গে শোধ করে দেওয়ারও সামর্থ্য নেই তার, আগা সাহেব টাকাটা নিতেও চায় না, সে সুদ চায়। সেদিন কিন্তু একটা অদ্ভুত কাণ্ড হল স্কুলের সামনেই আগা সহেব ধরে ফেলল তাকে। তার কাছে পাঁচ সিকে পয়সা ছিল, ইচ্ছে করলে সুদটা দিয়ে দিতে পারত, কিন্তু হঠাৎ সে কেমন যেন মরিয়া হয়ে বলে ফেলল—"আগা সাহেব, মাপ কর আর আমি কিছু দিতে পারব না। আমি দু'দিক দিয়ে মার খাচ্ছি। তোমার কাছ থেকে টাকা ধার করে যে শাড়িটা কিনেছিলাম সেটা কাজে লাগে নি, অথচ তোমাকে প্রতি মাসে সুদ দিয়ে যাচ্ছি—!"

আগা সাহেব জিজ্ঞেস করল, "কাজে লাগেনি কেন।"

"আমার বউয়ের পছন্দ হয়নি সেটা"—বলেই সে আগা সায়েবের দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে বলল—"তোমাকে সেই শাড়িটাই এনে দিচ্ছি, আমাকে তুমি রেহাই দাও।"

আগা সায়েব তার দিকে হাসিমুখে চেয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর বলল—"আচ্ছা ঠিক হায়। তুমহারা বহু কাহে নেহি পসন্দ কিয়া?" শশধর বলল—"লাল রঙের শাড়ি তার পছন্দ নয়। হালকা সবুজ চায় সে। বড়া জিদ্দি আর খুঁতখুতে হ্যায়।"

বীণাকে লুকিয়ে আগা সাহেবকে তার পরদিন শাড়িটা দিয়ে দিয়েছিল সে। ভেবেছিল এইবার বুঝি রেহাই পেল। রেহাই কিন্তু পেল না। পরদিন সকালে আগা সায়েব তার বাড়িতে এসে হাজিব। এসে হাঁকাহাঁকি করছে—"এই বহুমায়ি, তুম্‌হাবা বাস্তে শাড়ি লাযা হ্যায়। ই ভি নাপসন্দ কবো তো হাম বড়া হুজ্জুৎ করেঙ্গে। হালকা সবজ্ হ্যয়—"

বীণা বেরিয়ে আসতেই আগা সাহেব তাকে সেলাম করে তার হাতে শাড়ির বাক্সটা দিয়ে একমুখ হেসে চেয়ে রইল তার দিকে তারপর বলল—"হামারা বিবি ভি বড়া জিদ্দি হায। মগর উয় লাল বং পসন্দ করতি হে। তুম্-হারা শাড়ি উসিকো দেঙ্গে। তুম এই শাড়ি লেও—হালকা সবজ্ হ্যয়"

শশধর আগা সাহেবের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। বীণাও কম অবাক হয়নি। এ কি কাণ্ড। একটা কাবুলিওলা এসে তাকে শাড়ি দিচ্ছে কেন সে বুঝতেই পারেনি প্রথমে। শশধরের দিকে চাইতে শশধর বললে—শাড়িটা নাও, আমি তোমাকে বুঝিযে দেব ব্যাপাবটা। শশধর পবে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। খুব খুশী হয়েছিল বীণা। ববীন্দ্রনাথেব কাবুলিওলাব মতো তার জীবনেও যে আর একজন কাবুলিওলা জুটবে এ তার কল্পনাতীত ছিল।

এখন রোজ একটু বেশী করে আলুকাবলি করতে হয়, কারণ কাবুলিওলার সঙ্গে দেখা হলেই আলুকাবলি দিতে হয় তাকে। সে প্রথম দিন দাম দিতে গিয়েছিল কিন্তু শশধর নেয়নি। এখন আগা সাহেব তার বড়াভেইয়া হয়ে গেছে। আগা সাহেব একদিন হিং দিয়েছিল তাকে। বীণা হিংয়ের ফোড়ন দিয়ে কচুরি আর মাংস তৈরি করে খাইয়েছিল আগাকে। আগা ভারি খুশী। বলেছে সে যখন দেশে যাবে তখন তার জন্যে একটা কাবুলি দোপাট্টা নিয়ে আসবে। আগার সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ এখন এত সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে এটাকে আর আশ্চর্যজনক ঘটনা বলে মনেই হয় না শশধরের।

আগার কাছে আর একদিন টাকা ধার চেয়েছিল শশধর। আগা বলেছিল তোমাকে আমি ধার দেব না। ভেইয়ার সঙ্গে ব্যবসা করি না আমি। কখনও ধার করবে না। যা রোজগার কর খরচ তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। যদি না পার আমাকে ভার দাও। আমি সব ঠিক করে দেব। শুধু আলুকাবলি বিক্রির উপরই নির্ভর করতে হয় না শশধরকে। তার কিছু জমি আছে, সারা বছরের খাবার ধান হয়েও উদ্বৃত্ত থাকে অনেকটা। সেটা বিক্রি করে সে। ভাল দামই পায়। বীণার বাবা হঠাৎ মারা গিয়েছিলেন। উইল করে যেতে পারেননি। তাঁর সম্পত্তি কিছু পেয়েছে বীণা। একটি ছোট বাড়ি পেয়েছে সে। ভাড়া মাসে পঞ্চাশ টাকা। এ টাকাটা

বীণার হাত-খরচ। বসত বাড়িটিও শশধরের পৈতৃক বাড়ি। শশধরের বাবা মা দু'জনেই পরলোকগমন করেছেন। তার ভাইবোনও নেই কেউ। বাইরের দিকে একটা বড় বারান্দা এবং তৎ-সংলগ্ন ছোট একটি ঘর আছে। শশধরের ইচ্ছা ছিল ওখানে একটি ক্লাব করে। কিন্তু বীণার এতে ঘোর আপত্তি। বাড়ির বারান্দায় সে পাড়ার ছেলেদের আড্ডা বসাতে দেবে না। এখন ঠিক করেছে নিজেই ছোট্ট একটি পাঠশালা করবে বারান্দায়।

আগা সায়েব যেদিন এসে সংসারের ভার নিতে চাইল সেদিন সে সোজা বীণার কাছেই চলে এসেছিল। বলেছিল—শোশো হামার কাছে ফিন রূপিয়া করজা করতে চায়। হামি দিব না। হামি বলেছি, তোমার রোজগার আর সংসার হামার কান্‌ধা পর দিয়ে দাও, হামি সব ঠিক করে দিব।

শশধরকে আগা সাহেব শোশো বলে ডাকে।

বীণা বলেছিল—আপনি ধার দেবেন না। ঠিকই বলেছেন আপনি। সংসারের জন্যে টাকার দরকার হয় না। ওর মাথায় নানারকম বাজে খরচের বুদ্ধি জোটে। একটা বাঁশী কেনবার অনেকদিন থেকে ইচ্ছে। তাই বোধহয় ধার চাইছে। ধার দেবেন না। আমি সংসার খরচ থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে ওকে বাঁশী কিনে দেব।

আগা সায়েব হেসে জবাব দিয়েছিল—সাবাস্।

এসব কাহিনী পুরোনো। আগা সায়েব মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যায়—সব ঠিকসে চলতা কি নেই। কখনও খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করে না। অনেকদিন সে আসে নি। হয়তো অন্য কোথাও চলে গেছে। শশধর তার কথা ভাবল একবার। তারপরই ভুলে গেল। মন দিল আলুর দিকে। অনেক আলু ছাড়াতে হবে। বীণা কখন আসবে কে জানে।

আলু ছাড়াতে ছাড়াতে তার আলুওলা জীবেনের কথা মনে হল হঠাৎ। জীবেন—শশধরের মতে—অতি সজ্জন। তাকে ধারে আলু দেয়, পেঁয়াজ লঙ্কা কাবুলি মটর সবই তার দোকান থেকে কেনে। দামের জন্য কখনও পীড়াপীড়ি করে না; বলে, যখন সুবিধে হয় দিও। শশধর হাতে পয়সা জমলেই তার ধার শোধ করে দেয়। কিন্তু সে জীবেনের ভক্ত তার সুর-বোধের জন্য। কি সুন্দর বাঁশী যে বাজায়। শশধরের ছোট একটা বাঁশের বাঁশী আছে কিন্তু জীবেনের মতো সে বাজাতে পারে না। ভৈরবী, পূরবী, মালকোষ কি চমৎকারই না বাজায়। তার বাঁশীটা অবশ্য অনেক ভালো ক্ল্যারিওনেট। শশধরেরও একটা ক্ল্যারিওনেট কেনবার ইচ্ছে। জীবেন বলেছে তাকে সে শিখিয়ে দেবে সে যদি ক্ল্যারিওনেট কেনে একটা। নিজের বাঁশী সে বাজাতে দেয় না কাউকে। সে বলেছে শশধরকে কিন্তু শিখিয়ে দেবে।

এই নিয়েই কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইল সে।

তারপর তার মনে পড়ল ভগবতী মাঝির কথা। সে বলেছে তাকে বিনা পয়সায় খেয়া পার করে দেবে, ওপারে গেলে আলুকাবলি বেশী বিক্রি হতে পারে। কারণ ওপারে কোনও ফেরিওলা যায় না। সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়ল ভগবতীর ভাই জগন্নাথের কথা। হুজুকে পড়ে আর টাকার লোভে সে এক রাজনৈতিক মিছিলে গিয়েছিল কয়েকদিন আগে। পুলিসের কাছে মার খেয়ে হাতটি ভেঙেছে। হাসপাতালে শুয়ে আছে এখন। হাসপাতালে গিয়ে তাকে

একটু আলুকাবলি খাইয়ে এলে কেমন হয়। বিস্কুট খেতে ভালবাসে জগন্নাথ। হঠাৎ উঠে পড়ল শশধর। উঠে তার আলনায় টাঙানো কামিজটা থেকে মনিব্যাগটা বার করে দেখল। বিষুণবাবু ওষুধ কেনবার জন্য যে দশটা টাকা দিয়েছিলেন তার থেকে সাড়ে চার টাকা ফিরেছে। টাকাটা বীণাকে দিয়ে দিতে বলেছিলেন। কিন্তু বীণাকে সে এ বিষয়ে কিছু বলেনি। এই টাকা থেকে জগন্নাথের জন্য ছোট এক টিন বিস্কুট নিয়ে গেলে কেমন হয়—বীণাকে পরে বললেই হবে।

বীণা কিন্তু এসে পড়ল।

এসেই বলল—মানতি মাসী কি বলে জান? তোর তৈরী আলুকাবলি আমাকে দিয়ে যাস বিকেলে। মুখটা একেবারে যেন পচে আছে। সাবু আর খেতে পারি না। আমি বলে এসেছি নিয়ে আসব। কিন্তু আমার মনে হল তার আগে শৈলেনবাবুকে জিগ্যেস করা উচিত। তিনি চিকিৎসা করছেন। তিনি সাতদিন সাবু খাইয়ে রাখতে বলেছেন। আলুকাবলি খাইয়ে যদি ফের জ্বর আসে। গেলাম শৈলেনবাবুর ডিসপেন্সারিতে। বললাম, মাসি আর সাবু খেতে পারছেন না। বিকেলে একটু তরকারি দেব? হাঁ হাঁ করে উঠলেন শৈলেনবাবু। বললেন—সাবুর বদলে বার্লি দিতে পার। একটু নুন আর লেবু দিয়ে ভালই লাগবে। তরকারি দেবে কি? মোটে চার দিন জ্বর ছেড়েছে।

বললাম—বার্লিও উনি খেতে পারবেন না। প্রথম দু'দিনই তাই দিয়েছিলাম, নুন লেবু দিয়েই দিয়েছিলাম, কিন্তু উনি খেয়েই ওয়াক তুলতে লাগলেন। আজ অতি কষ্টে সাবুটা খাইয়েছি। ডাক্তারবাবু বললেন—হর্লিক্স্ দিতে পার। কিন্তু আমি ছাঁড়বার পাত্রী নই, বললাম তার সঙ্গে যদি সামান্য একটু— ছোট্ট চামচের এক চামচ—তরকারি দিই তাহলে কি খুব ক্ষতি হবে। ডাক্তারবাবু হেসে ফেললেন, বললেন—বেশ দিও, নরম আলুভাজা দিও। কোনও মসলা যেন না থাকে। আর এক চামচের বেশী নয়। কিন্তু হর্লিক্স্ কোথা পাওয়া যাবে। মানতি মাসীর তো কেনবার সামর্থ্য নেই। আমার কাছে পাঁচটা টাকা আছে। তুমি দেখ তো কানাইয়ের দোকানে পাওয়া যায় কি না। দাম যদি পাঁচ টাকার বেশী হয় তাহলে ধারেই নিয়ে এস।

শশধরকে তখন বলতে হল—বিষুণবাবু ওষুধ কেনবার জন্য দশটা টাকা দিয়েছিলেন তার থেকে সাড়ে চার টাকা ফিরেছে। বিষুণবাবু ও টাকা তোমাকেই দিয়েছেন, আমি ভেবেছিলাম ও টাকা দিয়ে জগন্নাথের জন্যে বিস্কুট কিনে নিয়ে যাব।

জগন্নাথ আবার কে—জিগ্যেস করল বীণা।

তখন জগন্নাথের কাহিনীটা বলতে হল শশধরকে। বীণা জগন্নাথকে দেখেছে, কিন্তু পুলিসের ব্যাপারটা জানত না। শুনে বললে—বেশ হয়েছে। ছেলেটা অতি পাজী। জিতু কাকার লাউ চুরি করে পালাচ্ছিল একদিন। সমর ধরে ফেলেছিল হাতে-নাতে। ওকে বিস্কুট কিনে দিয়ে আসতে হবে না। তুমি হর্লিক্স্ কিনে নিয়ে এস। শশধর একটু মর্মাহত হল। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও অনুভব করল প্রতিবাদ করা নিষ্ফল। হর্লিক্স্ কিনে আনতে হবে। বীণা আবার বলল, তুমি তো আলু কিছুই ছাড়াওনি দেখছি। সব আমি তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে ফেলি।

তুমি যাও হর্লিক্‌স্‌টা নিয়ে এস। শশধর বেরিয়ে পড়ল। একটু দূরে গিয়েই কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে। তার প্রাণের বন্ধু ন্যাড়া মাঠে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল দাঁড়িয়ে পড়ল শশধর।

"কি রে ন্যাড়া—"

"কে শশধর। একবার আয় না ভাই। লাটাইটা ধর তো। আমি চট্‌ করে খেয়ে আসি। মা ডাকাডাকি করছে—"

মাঠের পাশেই তার বাড়ি। সে শশধরের হাতে লাটাইটা ধরিয়ে দিয়ে হনহন করে বাড়ির দিকে চলে গেল। লাটাই ধরে দাঁড়িয়ে রইল শশধর।

"চট্‌ করে আসিস ভাই—"

"এক্ষুনি আসছি—"

শশধর লাটাই ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘণ্টা দেড়েক পরে ফিরে বীণাকে বলল—"কানাইয়ের দোকানে হর্লিক্‌স্‌ ছিল না। আমি বোস ব্রাদার্স থেকে কিনে আনলাম।" আব একটা কথা সে অবশ্য বলল না। ছোট এক প্যাকেট বিস্কুটও কিনেছিল সে। সেটা রেখে এসেছে ন্যাড়ার বাড়িতে। ফেবি করতে যখন বেরুবে তখন নিয়ে যাবে জগন্নাথের জন্য।

।। তিন।।

হবিবের রান্নাবান্না শেষ হল প্রায় বেলা বারোটার সময়। সে ডাক্তারবাবুকে এসে বলল—"এইবার আপনি স্নান করুন। আপনার গরম জল তৈরি হয়ে গেছে—"

"আমি ঠিক খাওয়ার আগে স্নান করব—"

"খাবার তো তৈরি—"

"আগে তোমার মেয়ে জামাইদের খেতে দাও, আমি তাদের বসে খাওয়াব। আমার কি আগে খেয়ে নিলে চলে!"

"বেশ তো একসঙ্গেই বসুন না—"

"অন্যান্য নিমন্ত্রিত যাঁরা আছেন, তাঁদেরও বসিয়ে দাও। আমি শেষে খাব। ক্ষিধেও খুব হয়নি এখন, সকাল বেলা খাওয়াটা বেশী হয়েছিল। নটবর একগাদা খাইয়ে দিয়েছে সকালে। আমি পরে খাব।"

আসল কারণটা কিন্তু ডাক্তারবাবু বললেন না। সকাল বেলা রোজ তিনি যা খান, আজও তাই খেয়েছিলেন। তাঁর ক্ষিধেও যে পায়নি তা নয়, কিন্তু তিনি খেলেন না কারণ বিষুণ এখনও খায়নি। সে জিনিসপত্র কিনে এনে গাড়ির নীচে ঢুকেছে। গাড়ির কাজ শেষ না করে সে খাবে না। ডাক্তারবাবুও ঠিক করেছেন তার সঙ্গেই খাবেন, কিন্তু কথাটা ভাঙেননি। তিনি বিষুণকে গিয়ে জিগ্যেসও করলেন না যে আর কত দেরি। কাজের সময় বিষুণকে বিরক্ত করলে কাজ ভাল হয় না, বিষুণও চটে যায়—এটা তিনি জানেন। এ বিষয়ে তাঁর নিজের

চরিত্রের সঙ্গে বিষুণের চরিত্রের মিল আছে। তাঁকেও কেউ তাগাদা করলে তিনি চটে যান। যখন প্র্যাক্‌টিস করতেন তখন কেউ যদি জিগ্যেস করত জ্বরটা কবে ছাড়বে বা ব্যথাটা কবে কমবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতেন আমি গণৎকার নই ভগবানও নই, বলতে পারি না। আমার জ্ঞানবুদ্ধি মতো চেষ্টা করছি যবে সারবার সারবে। তারপরই সঙ্গে সঙ্গে হেসে বলতেন অত ঘাবড়াচ্ছো কেন, ঘাবড়ে কোনও লাভ আছে? এই কথাগুলি এমন আত্মীয়তার সুরে বলতেন যে তাঁর রূঢ় কথাগুলি কারও মনে ব্যথা দিত না। চেনাশোনা যাদের নিমন্ত্রণ করেছিল হবিব তারা সবাই খাওয়ার জন্য ভিতরের দিকে চলে গেল। ডাক্তারবাবু হবিবকে ডেকে বললেন মেয়ে জামাইকে যখন খেতে দেবে তখন আমাকে ডেকো। আমি তাদের সামনে বসে খাওয়াব। হবিব মুসলমান, তাদের বাড়িতে 'পরদা' আছে, কিন্তু ডাক্তারবাবুর কথা স্বতন্ত্র। তিনি বাড়ির লোক। হবিব বললে চাচা সাহেব এলেই ওরা খেতে বসবে। চাচা সাহেবকে আনতে গাড়ি গেছে। হবিবের চাচা মীর সাহেব পাশের গ্রামে থাকেন। ডাক্তারবাবুর বন্ধুস্থানীয় লোক। বড় জোতদার। দিলদরিয়া মেজাজ। কিন্তু একটু ভীতু প্রকৃতির। হবিব তাঁকে আনতে ঘোড়ার গাড়ি পাঠিয়েছে। মোটরে তিনি পারতপক্ষে চড়তে চান না। হবিবের ছেলে আবু তাঁকে আনতে গেছে। ডাক্তারবাবু পকেট থেকে সিগার কেস বার করলেন। তারপর অনেক বেছে বেছে একটি মাঝারি সাইজের সিগার ধরালেন। তাঁর সিগার কেসে কয়েক রকম সিগার থাকে। একরকম সিগার খেতে ভালোবাসেন না তিনি। খুব ছোট সাইজের সিগারও আছে, আবার খুব মোটাও আছে। একটি মাঝারি সাইজেব সিগার ধরালেন তিনি। তারপর চেয়ে রইলেন বিষুণের পা দুটোর দিকে। মোটরেব তলা থেকে বিষুণের পা দুটো বেরিয়ে ছিল। অপরিচ্ছন্ন ফাটা ফাটা পা, গাঁট গাঁট আঙুলগুলো ডাক্তারবাবুর মনে হল নিশ্চয়ই খালি পায়ে হাঁটতে হয়েছে ওকে অনেক দিন। বিষুণের অতীত জীবন কি ছিল তা তিনি জানেন না। কিন্তু তার পা দুটো দেখে শ্রদ্ধা হল তার উপর। 'স্ট্রাগল' করতে হয়েছে লোকটাকে, মনে হল তাঁর। মনে হল আমেরিকার মতো দেশে থাকলে আরও অনেক উন্নতি হত বিষুণের। অমন একটা ভালো লোক, ভালো মিস্ত্রী, কেউ ওর কদর করল না। কোনক্রমে একটা ওয়ার্কশপ করে দিনগুজরান করছে। লোকটাও অদ্ভুত একগুঁয়ে ধরনের। কারো সাহায্য নিতে চায় না। ডাক্তারবাবু ওকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। নেয় নি। ডাক্তারবাবুর কাছে কোনও পয়সা নিতে চায় না। একদিন পীড়াপীড়ি করাতে বলেছিল, "ডাক্তারবাবু, আমি মহাপাপী, নিজের মা বাবাকে খেতে দিইনি, ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়েছিলুম। একবার দুর্ভিক্ষ হল। তখন আমি দুমকায় একটা কারখানায় চাকরি করি। খবর পেলাম মা বাবা দু'জনেই মারা গেছেন। শেষ জীবনটায় তাঁরা ভিক্ষে করতেন না কি। দু'জনেই রাস্তায় মরে পড়ে ছিলেন। সম্ভবত অনাহারেই মারা গিয়েছিলেন তাঁরা! আমি তাঁদের একমাত্র ছেলে, তাঁদের খোঁজ নিইনি। আমি মহাপাপী। ভাল লোকদের সেবা করে করে প্রায়শ্চিত্ত করছি সেই পাপের।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "আমি ভালো লোক তাই বা তোমায় কে বললে। আমার তো নানান দোষ আছে।"

বিষুণ এর কোনও উত্তর দেয়নি। মাঝে মাঝে ডাক্তারবাবু বিষুণকে কিছু উপহার দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিষুণ তাও নেয়নি। একটা গরমের স্যুট করাবার জন্যে কাপড় কিনে দিয়েছিলেন, বিষুণ কিন্তু নিলে না সেটা। বললে, "এত দামী কাপড়ের জামা আমি কখনও পরিনি ডাক্তারবাবু। পরলে সোয়াস্তি পাব না। আপনি যদি অনুমতি করেন এই দিয়ে নরেশের জন্য কোট প্যাণ্ট করিয়ে দিই।

ডাক্তারবাবু জিগ্যেস করলেন—"নরেশ কে?"

"নরেশ শামু মিস্তিরের ছেলে—ছোট ছেলে—ওর আপনি চিকিৎসা করেছেন কতবার"—বিষুণ নরেশের বিস্তৃত পরিচয় দিয়ে শেষে বললে—"বড়লোকের ছেলে, বদ্ ছেলেদের সঙ্গে মিশে লেখাপড়া শেখেনি—মিস্তিরমশাই মারা গেছেন—বড় ভাই দুটো ওকে দেখে না। আমার ওয়ার্কশপে এসেছে কাজ শিখতে। ছেঁড়া জামা পরে আসে। অথচ ওর গায়ে একদিন ভেলভেটের কোট দেখছি। আপনি অনুমতি দিলে—।

অনুমতি দিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। কিন্তু তিনি মনে মনে একটু বিপদে পড়েছিলেন। বিষুণ তাঁর গাড়ির ধাত চেনে, তাকে দিয়েই তিনি গাড়ি সারাতে চান, অথচ সে কিছুতেই তাঁর কাছ থেকে কোনও মজুরি নেবে না, কোনও উপহার দিলে নেবে না—এ তো মহা মুশকিল। শেষকালে তিনি একটা কৌশল করেছেন। নিজের লাইফ ইন্‌সিওরেন্স করিয়েছিলেন অনেক আগে। তার 'নমিনি' ঠিক করা হয়নি। বিষুণকে নমিনি ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বিষুণ হাজার দশেক টাকা পেয়ে যাবে। তাঁব মতে বিষুণ ইজ্ এ গ্রেট ম্যান। বিষুণ যে মদ খায় তা তিনি জানেন। কিন্তু সেটা সে যে তাঁর কাছ থেকে লুকোতে চায় এটাই তাঁর মতে গ্রেটনেসের একটা লক্ষণ।

বিষুণ মিস্ত্রির পা দু'টোর দিকে চেয়ে এই সব ভাবছিলেন ডাক্তারবাবু। এমন সময় চতুর্দিক প্রকম্পিত করে একটা মোটর সাইকেল এসে হাজিব হল। তাতে আবার একটা সাইড করাও রয়েছে। তাতে বসে আছে কালো গগল্‌স্ পরা এক ছোকরা। যিনি মোটর চালাচ্ছিলেন তাঁর চোখেও কালো গগল্‌স্। দু'জনেই চোঙ্ প্যাণ্ট পরা। দু'জনেরই গায়ে হাফশার্ট আর হাতে রিস্টওয়াচ। গাড়িটা ডাক্তারবাবু যেখানে বসেছিলেন তার সামনেই এসে থামল গর্জন করে। সাইড কারে যিনি বসেছিলেন তিনি নেমে এলেন, নিজের হাতঘড়িটার দিকে একবার চেয়ে দেখলেন, তারপর এগিয়ে এলেন ডাক্তারবাবুর দিকে। একটা নমস্কার পর্যন্ত না করে বললেন—"আমার মামা আছে এখানে?"

ডাক্তারবাবু উত্তর দিলেন—"তুমিই বা কে, তোমার মামাই বা কে—"

"আমার মামা বিষুণবাবু, মোটর মেকানিক, শুনলাম এখানে একটা মোটর ইনেসপেক্‌শন করতে এসেছেন—"

"ও বাবা, বিষুণের যে এমন লায়েক ভাগনা আছে তা তো জানতুম না—"

"আমার মামা কোথায় বলতে পারেন—"

"সে আমার মোটরে কাজ করছে। কি দরকার তোমার"

"জরুরী দরকার। কোথায় তিনি—"

"ওই যে মোটরের তলায় শুয়ে আছে। বেরুবে একটু পরে, তারপর কথা বোলো। বস এইখানে"

একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন তিনি।

"আমার কিন্তু বসবার সময় নেই। আমাকে পাঁচটার মধ্যে চন্দননগর পৌঁছতে হবে। সাড়ে পাঁচটার সময় পার্টি মীটিং আছে। সেই জন্যেই আমি আমার বন্ধুর মোটর বাইক ক'রে এসেছি"

আবার সে মোটরের দিকে এগোতে যাচ্ছিল।

"ওদিকে এখন যেও না। কাজের সময় কথা বলে বিরক্ত কোরো না ওকে"

দাঁড়িয়ে পড়ল অনুমান কর। ডাক্তারবাবুর বলবার ভঙ্গীতে এমন একটা আদেশের সুর ছিল যে দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজ মূর্তি ধারণ করল ছোকরা।

"আমি আমার মামার সঙ্গে কথা বলব আপনি তাতে বাধা দিচ্ছেন কেন। জরুরী দরকার আছে আমার—"

"কেউ মারাটারা গেছে নাকি। বিপদ হয়েছে কোনও? জরুরী মানে?"

"মারা যায় নি। কিন্তু বিপদে পড়েছি আমি। অবিলম্বে কিছু টাকা চাই।"

"অবিলম্বে তো হবে না। একটু অপেক্ষা করতে হবে।"

"অপেক্ষা করা তো অসম্ভব। তাড়াতাড়ি হবে বলে আমি সুশীলদাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম, উনি ওঁর মোটর বাইকে লিফ্‌ট দিলেন আমাকে, ওঁকে আটকে রাখব কি করে! ওঁকে ফিরে গিয়ে পার্টি মীটিংয়ে বক্তৃতা দিতে হবে।"

ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করলেন—"কত টাকা দরকার তোমার"

"সুশীলদা কত টাকা দরকার"

সুশীলদা এগিয়ে এলেন এবং বললেন—"চাঁদা আদায় ক'রে পার্টি ফাণ্ডে তোমার ৭৫ টাকা জমা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তুমি ৫০ মাত্র জমা দিয়েছ। বাকি ২৫ আজকের মধ্যেই জমা না দিলে তোমার নাম কাটা যাবে। রণদা তোমার জন্যে চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করবে—"

ডাক্তারবাবু জিগ্যেস করলেন—"রণদা কে"

"আমাদের অডিটার"

"ও। আচ্ছা, আমি তোমাকে টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি। তুমি আমাকে রসিদ দিয়ে টাকাটা নিয়ে যাও"

"রসিদ!"

"হ্যাঁ লিখে দাও যে আমি বিষুণবাবুর ভাগনা ডাক্তার-বাবুর কাছ থেকে পঁচিশ টাকা নিয়ে গেলাম। লিখে তার নীচে নিজের নামটা সই করে দাও—আর নিজের ঠিকানাটাও লিখে দাও"

"তার মানে?"

"মানে তো সোজা। বুঝতে পারছ না কেন। তোমার মামাকে দেখিয়ে বলব তোমার ভাগনে এই টাকা আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে"

"তার চেয়ে আমি ওঁকে গিয়ে সোজাসুজি বলি না—"

"না, এখন কাজের সময় ওকে বিরক্ত করতে পারবে না—"

"এ তো মহা জবরদস্তি দেখছি"

এর পরই অনুমান কর চীৎকার ক'বে উঠল,—"মামা, ও মামা—"

হবিব সেই সময় বাইরে এসেছিল। ডাক্তারবাবু তাকে বললেন—হবিব এ ছোকরাকে বার করে দাও তো এখান থেকে"

হবিব এগিয়ে এল। তার পিছু পিছু এল আরও গোটা দুই লোক।

"কি চান আপনি—"

"আমি মামার সঙ্গে দেখা করতে চাই"

ডাক্তারবাবু বললেন—"মামার সঙ্গে তার বাড়িতে গিয়ে দেখা কোরো। এখানে দেখা হবে না"

হবিব বললে—"যান যান এখান থেকে—"

"জোব করে তাড়িযে দেবেন না কি!"

"দবকাব হলে তাই দেব। এটা আমার বাড়ি, এক ডাকে পাড়াব সবাই এসে হাজিব হবে। হাঙ্গাম হুজ্জৎ না করে মানে মানে সবে পড়ুন—"

ডাক্তারবাবু আবার বললেন—"তোমার টাকাব দবকার, টাকা তো দিচ্ছি বাপু, বসিদ দিয়ে নিযে যাও। তোমাব মামাব সঙ্গে বুঝে নেব আমি। এতে আপত্তি করছ কেন—"

অনুমান তখন বলল—"পঁচিশ টাকায় হবে না। গোটা পঞ্চাশেক টাকা দরকাব আমাব।"

"বেশ তাই নাও। শুধু বসিদ লিখে দাও একটা—"

"কাগজ কলম তো সঙ্গে নেই"

"হবিব একে কাগজ কলম দাও তো—"

"আসুন আমাব সঙ্গে—"

হবিবের পিছু পিছু চলে গেল অনুমান কর।

একটু পরেই ফিরে এল রসিদটা নিয়ে। ডাক্তারবাবু তাকে টাকা দিতে যাচ্ছেন এমন সময় বিষুণ বেরিয়ে এল মোটরের তলা থেকে।

"এ কি হনুমান তুমি এখানে!"

"আমি মামা তোমার কাছে এসেছিলাম। গোটা পঞ্চাশেক টাকাব বড্ড দরকার পড়েছে—"

"আমি এক পয়সা দেব না তোমাকে, রাসকেল কোথাকার! বেরিয়ে যাও এখান থেকে। ডাক্তারবাবু আপনি টাকা দিচ্ছেন নাকি—আপনি টাকা দিচ্ছেন কেন—দেবেন না—"

"কি করব। ছোকরা যে নাছোড়, তোমাকে কাজের সময় বিরক্ত করতে যাচ্ছিল, তাই—"

বিষুণ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অনুমানের দিকে।

অনুমান যেন চুপসে গেল।

হাত কচলে কচলে বলতে লাগল—"টাকা না পেলে আমার ইজ্জৎ থাকবে না মামা। দোহাই তোমার। সকাল থেকে অনেক জায়গায় চেষ্টা করেছি, কোথাও টাকা পাইনি। পেলে তোমার কাছে এতদূর ছুটে আসতাম না—"

"লোফারকে কে টাকা দেবে। আমিও দেব না। তুমি যাও এখান থেকে—"

ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল অনুমান।

তাকে দেখে ডাক্তারবাবুর কষ্ট হ'তে লাগল।

"বিষুণ, ও তোমার ভাগ্নে তো—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"তাহলে দিয়ে দি ওকে টাকাটা। বিপদে পড়েছে বেচারা।"

তারপর অনুমানের দিকে চেয়ে বললেন, "তোমাকে একটি শর্তে কিন্তু টাকাটা দেব। তোমাকে আমার বন্ধু হ'তে হবে। খাওয়াদাওয়া হয়েছে তোমার—?"

"না। আমি সমস্ত সকাল টাকাটা যোগাড় করবার জন্য ঘুরছি।"

"তাহলে এখানেই খেয়ে যাও। তোমার বন্ধুকেও ডাক। দু'জনেই খেয়ে যাও এখানে। হবিব এদের দু'জনকে খাইয়ে দাও। ওরা আমাদের দোস্ত হয়ে গেছে। হয়ে গেছ তো? না, মনে দ্বিধা আছে এখনও—"

অনুমান কোনও জবাব না দিয়ে মুচকি হেসে চুপ করে রইল।

"আসুন- -"

হবিব তাদের ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল।

বিষুণ ডাক্তারবাবুর দিকে চেয়ে বলল—"ওকে আশকারা দিয়ে অন্যায় করলেন ডাক্তারবাবু। বারবার এসে জ্বালাবে আপনাকে। অকালকুষ্মাণ্ড একটি—"

"দেখা যাক না ওর দৌড় কতদূর। গাড়ি ঠিক হল"

"হয়েছে বোধহয়। দেখি এইবার স্টার্ট করে"

বিষুণ গাড়ির কাছে গিয়ে হ্যাণ্ডেল দিয়ে স্টার্ট করলে গাড়িটা। তারপর 'সেল্‌ফ' দিয়েও স্টার্ট করল অনায়াসে।

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ডাক্তারবাবুর মুখ।

"লোচন তুমি একবার চালিয়ে দেখে নাও।"

লোচন গিয়ে বসল গাড়িতে এবং গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেল ট্রায়াল দেবার জন্যে।

ডাক্তারবাবু বিষুণকে বললেন—"তুমি এইবার স্নান কর। একসঙ্গে খাব দু'জনে"

।। চার ।।

"শশধর শশধর—"

শশধরের বাড়ীর সামনে হাঁকাহাঁকি করছিল বিষুণবাবু।

শশধর বাড়ি ছিল না। বীণা বেরিয়ে এল।

"উনি বাড়িতে নেই—

"ও ফেরি করতে বেরিয়ে গেছে বুঝি। তুমিই তাহলে নিয়ে নাও এগুলো-

" কি নেব—"

"বিরিয়ানি আর মাংস। ডাক্তারবাবু আজ ময়ূরগঞ্জে হবিবের বাড়িতে ফিস্ট দিচ্ছিলেন। খুব খেয়েছি আমরা। হবিব বললে অনেক বেঁচে গেছে সঙ্গে কিছু নিয়ে যাও। তোমার ওয়ার্কশপের লোকদের দিও। তাদের দিয়েও দেখ-াম অনেকখানি বেঁচে গেছে, তাই তোমাদের জন্য নিয়ে এলাম। এই বাসনগুলো থাক তোমার কাছে এখন, আমি পরে নিয়ে যাব। হবিবকে পাঠিয়ে দিতে হবে—"

বিষুণ ট্যাক্সি থেকে নেমে দুটো হাঁড়ি দিয়ে গেল বীণাকে।

বীণার ঘরে আধময়লা ছেঁড়া ফ্রক পরা একটি ছোট মেয়ে বসেছিল। বয়স বছর সাতেক হবে। তার দিকে চেয়ে বীণা বললে—"ঝুমরি তোর কপাল ভালো দেখছি আজ। তোকে পান্তা ভাত দেব ব'লে বসিয়ে রেখেছি—বিরিয়ানি এসে গেল তোর ভাগ্যে। নে খা—ওই কাঁসিটা নিয়ে আয়—"

কাঁসিটা নিয়ে কুণ্ঠিতভাবে ঝুমরি দাঁড়াল এসে। বীণা যখন হাঁড়ি থেকে বিরিয়ানি বার করে দিলে তখন ঝুমরি বলল—"এ সব কি। রং করা ভাত? আগে খাই নি কখনও"

"খেয়ে দেখ না। একে বিরিয়ানি বলে। মাংসও নে একটু—"

ঝুমরি একপাশে বসে খেতে লাগল।

"কেমন লাগছে -"

"খুব চমৎকার"

"তুই খেয়ে উনুনটা ধরিয়ে দে। এগুলো গরম করে রেখে দি। রাত্রে খাব—"

ঝুম্‌রি চেটেপুটে সব খেয়ে ফেললে। তারপর কাঁসিটি মেজে যথাস্থানে রেখে দিলে। তারপর বাইরে থেকে কাঠ এনে উনুন ধরাতে বসল। ঝুমরি বীণার হাত নুড়কুৎ। ওরা মা চাকরানীর কাজ করে বেড়ায় চার পাঁচটা বাড়িতে। ঝুমরি বীণার কাছে এসে বসে থাকে। ছোটখাটো ফাইফরমাস খাটে। তার বদলে বীণা ওকে একটু আধটু খেতে দেয়। পয়সাও দেয় মাঝে মাঝে। রোজ ওর জন্যে আলুকাবলি রেখে দেয় একটু। এতেই ঝুমরি খুব খুশী। বীণা বলেছে ওকে একটা নতুন ফ্রক কিনে দেবে। শশধরের সময় হচ্ছে না বলে কিনে আনা হচ্ছে না। উনুন ধরানো হলে বীণা এক গামলা জল চড়িয়ে দিল তাতে। তারপর মুখঢাকা দুটো অ্যালুমিনিয়মের কৌটোতে আলাদা আলাদা করে বিরিয়ানি আর মাংস রেখে গরম জলের উপর বসিয়ে দিলে সেগুলো একে একে।

ঝুমরি খালি হাঁড়ি দুটো মাজতে যাচ্ছিল।

বীণা বললে— "তুই পারবি না। আমি মেজে রেখে দেব। তুই বরং আলুর খোসাটোসাগুলো বাইরে ফেলে দিয়ে আয়—"

আলুকাবলির জন্য যেখানে আলু ছাড়ানো হয়েছিল সেখানটা পরিষ্কার করে ফেললে ঝুমরি।

"এইবার মানতি মাসীর জন্যে একটু হর্লিক্‌স্ করি—"

গরম জলের গামলাটা নাবিয়ে ছোট একটা কেতলিতে গরম জল চড়িয়ে দিলে বীণা।

হর্লিক্‌স্ তৈরি করতে বেশী দেরি হল না তার। কেতলিতে করেই হর্লিক্‌স্ নিয়ে গেল সে। আর সামান্য একটু আলুকাবলি ছোট্ট একটি বাটি করে লুকিয়ে নিল আঁচলের আড়ালে।

"ঝুমরি তুই বোস। আমি মানতি মাসির বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি। আমি না ফেরা পর্যন্ত কোথাও যাসনি যেন।

ঝুমরি ঘাড় নেড়ে জানাল সে বসে থাকবে। সে জানে বীণাদি এর জন্যে তাকে অন্ততঃ একটা পাঁচ নয়া দেবে।

বীণাকে দেখেই মানতি মাসী বললে—"কি আনলি আবার।"

"হর্লিক্‌স্ এনেছি। ডাক্তারবাবু সাবুর বদলে হর্লিক্‌স্ দিতে বললেন—"

"তুই মুখপুড়ি ডাক্তারের কাছে গেসলি না কি! ও ডাক্তার কিচ্ছু জানে না। হর্লিক্‌স্ আমি খাব না। মিষ্টি জিনিস মুখে আর রুচছে না আমার। আমাকে একটু তরকারি এনে দে। হর্লিক্‌স্ আবার কোথা থেকে পেলি তুই"

"ছিল আমাব কাছে। একটু খেয়ে দেখো না। হর্লিক্‌স্ খেয়ে নাও, তাবপব তবকাবি দেব একটু। আলুকাবলি এনেছি, বেশী কিন্তু দেব না"

এক চুমুকে হর্লিক্‌স্ খেয়ে মানতি মাসী বললে—"বিচ্ছিরি। কেন যে লোকে পযসা দিয়ে এসব কিনে খায়। তোর কাছে ছিল? তুই খাস না কি"

বীণা মিথ্যা কথা বলল।

"মাঝে মাঝে খাই। আমার তো বেশ লাগে। শরীরে বেশ বল পাই। এটুকু তুমি খেয়ে নাও মানতি মাসী—"

"তুই আমাকে জ্বালালি মুখপুড়ি। ভাত ডাল তরকারি না খেলে শরীরে বল হয় না।"

"দুদিন পরে তাও খাবে। আজ এটা খেয়ে নাও। তারপর আলুকাবলি দিয়ে একটু ভালো মুখ কোরো—"

মানতি মাসী সহসা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন—"তুই আমার জন্যে এত করে মরছিস কেন। আমি তো তোর কেউ নই। আমি মরে গেলেই বা কি ক্ষতি হবে কার—"

"মাসী এইবার আমি রাগ করব। ওসব বাজে কথা বলছ কেন। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। আমার বাড়ি গিয়ে অনেক কাজ আছে—"

মাসী আর কিছু না বলে হর্লিক্‌স্ খেয়ে ফেললেন। তারপর আলুকাবলি খেয়ে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

"ওমা কি চমৎকার হয়েছে। মোটে এইটুকু এনেছিস"

"পরে বেশী দেব। আজ এই খেয়েই আবার জ্বর না এলে বাঁচি"

"কিচ্ছু হবে না। আর একটু আনলেই পারতিস। আলুকাবলি তো নয় যেন অমৃত"

মানতি মাসীকে খাইয়ে বীণা আবার বাড়ির দিকে ফিরল।

মানতি মাসী ছোট একটি ঘর ভাড়া করে থাকেন। এককালে নাকি অবস্থা ভালো ছিল। স্বামী পুত্র সব মরে গেছে। বিষয় আশয় বিকিয়ে গেছে দেনার দায়ে। মানতি মাসী একাই

থাকেন এখন। নানারকম কাজ জানেন। কাঁথা সেলাই, জামা সেলাই, উল বোনা, মোজা বোনা এইসব কাজ করে রোজগার করেন কিছু। বড় লোকের বাড়িতে বিয়ে পৈতের সময়ও মানতি মাসীর ডাক পড়ে। খুব ভাল রাঁধতে পারেন তিনি। এই সব করেই যা রোজগার হয় তাতেই দিন কেটে যায় তাঁর। এককালে নাকি বড় পরিবারের মেয়ে ছিলেন, কিন্তু সে বড় পরিবার কালের অতলে কবে কোথায় তলিয়ে গেছে। মানতি মাসী যতদিন সুস্থ ছিলেন নিজের সম্ভ্রম বজায় রেখে কারও সাহায্য না নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন, কিন্তু অসুখে পড়েই বিপদে পড়ে গেছেন। পাড়ার ছেলেমেয়েরা সবাই ভালবাসত তাঁকে। তাদেরই সাহায্যে আর ওই ডাক্তারবাবুর দয়ায় এ ধাক্কাটা সামলে গেলেন। শশধর আর বীণা—বিশেষ ক'রে বীণা তাঁর যে সেবাটা করেছে তা তাঁর আপনজনরাও করত না বোধহয়। কলকাতায় তাঁর কিছু কিছু আপনজন আছে কিন্তু তারা খবরটা পর্যন্ত নেয় না। বীণা তাঁর অসুখের সময় রাত জেগেছে, ওষুধ খাইয়েছে, এমন কি মলমূত্র পর্যন্ত পরিষ্কার করেছে। ডাক্তারের বাড়ি বার বার গেছে, বাড়ি থেকে পথ্য তৈবি করে এনে খাইয়েছে। অথচ বীণার সঙ্গে তাঁর কতটুকু আলাপ। তাঁর কাছে উল বোনা শিখতে আসত। কয়েক রকম প্যাটার্ণ শিখিয়ে দিয়েছেন তাকে। বড় ভালো মেয়েটি। শশধরও ভালো। কিন্তু বীণার তুলনা হয় না। বীণা চলে যাওয়াব পর মানতি মাসীর মনে একটি বাসনা জাগল। বীণার জন্য তিনি মেরুন রঙের একটি উলের ব্রাউজ বুনে দেবেন ভালো হয়ে উঠে। কিছু টাকা জমিয়ে রেখেছেন তিনি, বিপদে আপদের দিনে কাজে লাগবে বলে। বেশী নয় শ'খানেক টাকা। পোস্টঅফিসে জমা আছে। সেই টাকা বার করে উল কিনবেন তিনি বীণার জন্য। পাড়ার হরিপদবাবু কলকাতা যান। তাঁর হাত দিয়েই উল আনান তিনি কলকাতা থেকে। কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটে তাঁর একটি চেনা দোকান আছে, বেশ ভাল উল দেয়। মেরুন রঙের উলের স্যাম্পল তাঁর আছে। সেইটা দিয়ে দেবেন তিনি হরিপদবাবুকে ঠিক ওই রকম রঙের যেন হয়। বীণা চলে যাওয়ার পর এইসব কথাই ভাবতে লাগলেন মানতি মাসী।

মানতি মাসীর বাড়ি থেকে বেরিয়েই বীণার দেখা হয়ে গেল ঢোং প্যাণ্ট পরা বিকাশের সঙ্গে। ফক্কড় ছোকরা। শশধরের ফ্রেণ্ড। রাস্তায় বীণাকে একলা পেলেই একটু ইয়ার্কি করবার চেষ্টা করে। একটু এগিয়ে এসে বলল—"বীণা আজ কার বাড়িতে বাজতে গিয়েছিল?"

বীণা কোনও উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেল।

বিকাশ নাছোড়। পিছু পিছু এসে তার সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে হেসে বলল—"এত রাগ কেন বান্ধবী—"

"রাস্তা ছাড়ুন"

'রাস্তা তো সকলের। তোমার একলার নয়—"

আর একটু এগিয়ে এল বিকাশ।

এর পর বীণা যা করল তা অপ্রত্যাশিত। সে বিকাশের গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিকাশ। তারপর হেসে উঠল। চীৎকার

করে কবিতায় বলল 'তিরস্কারই পুরস্কার মোর।' এই বলে আবার তার পিছু পিছু আসতে লাগল দ্রুতবেগে। বীণা ছুটতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কি হত বলা যায় না, কিন্তু ডাক্তারবাবুর মোটরখানা এসে পড়াতে বীণা ছুটে গিয়ে তার সামনে হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল। মোটর থেমে গেল। ডাক্তারবাবু মোটরে ছিলেন। হবিবের বাড়ি থেকে ফিরছিলেন তিনি।

"কি হয়েছে? "

"ওই ছেলেটা আমার পিছু পিছু তাড়া করেছে—"

"কোন ছেলেটা"

বিকাশ তখন দাঁড়িয়ে পড়েছে। পালাবে কিনা ভাবছে।

"ওই ছেলেটা? দামোদরের ছেলে মনে হচ্ছে—ওহে শোন এদিকে—"

বিকাশকে এগিয়ে আসতে হল।

"কি কাণ্ড করছ তুমি। এর পিছু নিয়েছ কেন? ভদ্রলোকেব ছেলে না তুমি। এসব কি কাণ্ড! এস গাড়িতে উঠে বস।"

বিকাশ ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল।

ডাক্তারবাবু তখন বীণার দিকে ফিরে বললেন—"তুমি কোথায় থাক। তুমিও উঠে বস। তোমাকেও পৌঁছে দিচ্ছি। কোথায় থাক তুমি—"

"আমায় পৌঁছে দিতে হবে না। কাছেই আমাব বাড়ি—"

"কার মেয়ে তুমি—"

"আমার বাবার নাম ছিল সুশীল। আমরা পাশের গাঁয়ে কুণ্ডু পাড়ায় থাকতাম। আমার বাবা মা কেউ নেই, দু'জনেই মারা গেছেন—"

"ওঠ গাড়িতে ওঠ, তোমার বাড়িটা দেখে যাই—"

একটু গিয়েই বীণা বললে—"থামান। এইটে আমার বাড়ি—"

"আরে এই বাড়ি তো আমার চেনা। শশধরের বাড়ি তো? তুমি শশধরের কে হও—"

বীণা লজ্জায় মাথা হেঁট করল।

শশধর বাড়িতেই ছিল। বেরিয়ে এল সে।

"আরে, ডাক্তারবাবু যে। আপনি একে কোথায় পেলেন"

"এ রাস্তায় আমার মোটর থামিয়েছিল। ওই ছোকরা বিরক্ত করছিল একে রাস্তায়। ওকে চেনো না কি?"

"চিনি বই কি। বিকাশ তো"

বিকাশ বললে—"আমি কিচ্ছু করিনি, শুধু একটু রসিকতা করেছিলাম। উনি চটাস করে আমার গালে একটা থাপ্পোড় মেরে বসলেন। তারপরই ডাক্তারবাবুর মোটরটা এসে পড়ল। বিশ্বাস করুন—আমি—"

বীণা ভিতরে ঢুকে পড়েছিল।

"ও মেয়েটি তোমার কে হয়—"

"ও আমার বউ—"

ডাক্তারবাবু বলে উঠলেন—"বাহাদুর মেয়ে তো—"

তারপর বিকাশের দিকে চেয়ে বললেন—"তুমি পরের বউয়ের সঙ্গে রাস্তায় রসিকতা করতেই বা গেলে কেন। কাজটা ভাল করনি। মাপ চাও ওর কাছে। শশধর তোমার বউকে ডাক—"

শশধর ডাক দিতেই বীণা বেরিয়ে এল।

ডাক্তারবাবু আদেশের ভঙ্গীতে বললেন—"তুমি ওর পায়ে হাত দিয়ে বল, আমার দোষ হয়েছে আমাকে মাপ করুন। আর কখনও এমন করব না—"

বিকাশ ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল।

"যা বলছি কর। তা না হলে সোজা তোমায থানায় নিয়ে গিয়ে রমজান দারোগার কাছে দিয়ে আসব। সে অসভ্য লোকদের শায়েস্তা করতে জানে—"

বিকাশ দেখল বেগতিক। ডাক্তারবাবু চটেছেন। যা বলছেন তা না করলে ঠিক থানায় নিয়ে যাবেন।

বাধ্য হয়ে তখন সে বীণার পা ছুঁয়ে বলল—"আমায় মাপ করুন। আর কখনও এমন করব না।"

"দ্যাট্স গুড্"—সহর্ষে বলে উঠলেন ডাক্তারবাবু।

তাবপর শশধরের দিকে চেয়ে বললেন—"তোমার আলুকাবলি তৈরি হয়ে গেছে? দাও ওকে কিছু। আমি তো তোমার বাঁধা খদ্দের। রোজই কিনি। আজ যখন তোমার বাড়িতে এসে গেছি তখন আমার ভাগটা এখানেই দিয়ে দাও, আমার বাড়ি পর্যন্ত তাহলে আর হাঁটতে হবে না তোমাকে—এই নাও।"

ডাক্তারবাবু একটা টাকা বার কবে দিলেন।

"সবটাই ওকে দাও। আমার আজ গুরুতর খাওয়া হয়েছে হবিবের বাড়িতে। আজ আর কিছু খাব না।"

বীণা ঘবে গিয়ে অনেকটা আলুকাবলি বার করে দিল বিকাশকে। দেখা গেল তাব সঙ্গে দুটি সন্দেশও এনেছে সে। বিকাশের হাতে সেটা দিয়ে এক গ্লাস জল নিয়ে এল সে। বিকাশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেয়ে ফেললে সবটা।

ডাক্তারবাবু জিগ্যেস করলেন—"আলুকাবলি কেমন হয়েছে"

"চমৎকার"

"রোজই চমৎকার হয়। আমি তো ওর বাঁধা খদ্দের। কে রাঁধে, তুমি না তোমার বউ"

শশধর ঘাড় চুলকে বললে—"আমার বউ। ওই সব করে—"

"তাহলে তো ও মস্ত বড় আর্টিস্ট দেখছি। ওকে একটা প্রাইজ দিতে হয়।"

বীণা মুচকি হেসে ঘরের ভিতর চলে গেল।

ডাক্তারবাবু বিকাশকে বললেন—"চল তোমাকে তোমার বাবার কাছে জমা দিয়ে আসি। দামোদর একজন পণ্ডিত লোক, তাঁর ছেলে হয়ে তুমি এ কি কাণ্ড করলে বল দেখি—"

বিকাশ মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলল—"বাবাকে কিন্তু কিছু বলবেন না যেন।"

হো হো করে হেসে উঠলেন ডাক্তারবাবু।

"না না আমি তত বেরসিক নই। কারো নামে চুকলি করি না। কিন্তু আমাকে কথা দিতে হবে তুমি এবার ভদ্র হবে। নাও উঠে বস। লোচন চল এবার—"

ডাক্তারবাবুর গাড়ি চলে গেল।

বীণা ঘবে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আলমারির পিছন দিক থেকে ঘরর ঘরর করে শব্দ হচ্ছে একটা। আলমারির পিছন দিকে গিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। ঝুমরি নাক ডাকাচ্ছে। ঘেমে নেয়ে গেছে মেয়েটা।

শশধরকে বললে—"ঝুমরির কাণ্ড দেখ। আমি মানতি মাসীর ওখানে যাবার সময় ওকে বলে গেলাম—তুই বাড়ি পাহারা দে, আমি আসছি এখুনি। মেয়ের পাহারা দেবার ছিবি দেখ—"

শশধর বলল—"ওর দোষ নেই। আমি এসে দেখলাম ও বাইরের দরজাব কাছে বসে ঢুলছে। আমি বললাম তুই বাড়ি যা। ও বললে দিদি আমাকে এখানে থাকতে বলে গেছে। আমি তখন বললাম তাহলে ঘুমো ওইদিকে শুয়ে—তাই আলমারির পিছনে গিয়ে শুয়েছিল—"

"ঝুমরি ঝুমরি ওঠ—"

ধড়মড়িযে উঠে পড়ল ঝুমরি। ঘুমিয়ে পড়েছিল ব'লে লজ্জিত হয়ে পড়ল খুব।

"বাড়ি যা এবার। এই নে—"

পুজোর জন্যে সন্দেশ আনিয়েছিল বীণা। একটি অবশিষ্ট ছিল সেটি দিয়ে দিলে ঝুমবিকে। ঝুমরি খুশী মুখে সন্দেশটি খেয়ে চলে গেল।

"আমাকে খেতে দাও এবার"—শশধর বীণাব দিকে চেয়ে একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে ফেললে এবং বীণা জিজ্ঞাসা কববার আগেই বলল—"আমার ফিরতে আজ দেরি হয়ে গেছে—"

"কি করছিলে, এতক্ষণ"

"সত্যি কথা বললে রাগ করবে না তো?"

"রাগ করব কেন—"

"ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলাম। ন্যাড়া আমাকে একটা লাটাই আর ঘুড়ি যোগাড় করে দিল। কেটে দিয়েছি ওর ঘুড়ি—"

"খেয়ে তো এখুনি বেরুতে হবে ফেরি করতে। বিশ্রাম হবে না আজ। শরীরটি খারাপ না হয়—"

"কিচ্ছু হবে না। দাও খেতে—"

"আজ বিষুণবাবু পোলাও মাংস দিয়ে গেছেন। ওই গরম জলে বসিয়ে রেখেছি। আর একটু গরম করি দাঁড়াও"

"বিষুণদা দিয়ে গেছেন? হঠাৎ?"

"ডাক্তারবাবু কোথায় না কি ফিস্ট করছিলেন—"

"ও। উনি মাঝে মাঝে ফিস্ট করেন। এবেলা কি খাব, ভাত না পোলাও—"

"ভাত ওবেলা খেও। ভাত এবেলা আর রাঁধি নি। মাছেব ঝাল করেছি। ওবেলা গরম ভাত রেঁধে দেব—"

"বেশ, বেশ। খাসা হবে—"

খাওয়াদাওয়া শেষ করে শশধর বললে—"কটা বেজেছে এখন?"

"সাড়ে চাবটে—"

"তাহলে একটু গড়িয়ে নি। বড্ড খাওয়া হয়ে গেছে। পাঁচটার সময় আমাকে উঠিয়ে দিও—"

শশধব বিছানায শুয়ে পড়ল।

।। পাঁচ ।।

ডাক্তাববাবু নিজের বাড়ির প্রশস্ত বারান্দায ইজিচেয়ারে শুয়ে 'ঠাকুমাব ঝুলি' পড়ছিলেন। শিশুপাঠ্য বই পড়তে তিনি খুব ভালবাসেন। ধর্মগ্রন্থ বা খবরের কাগজ পড়েন না। উচ্চাঙ্গেব সাহিত্যেব দিকেও ঝোঁক নেই। বলেন—ওসব আমাব মাথায় ঢোকে না। তিনি বাংলা ইংরেজীতে যত শিশুপাঠ্য বই আছে তা কিনেছেন। যে বইগুলো ভালো লাগে বার বাব পড়েন। Alice in Wonderland, কঙ্কাবতী, Mary Tood's Last Term— এই ধরনেব বই তিনি এতবার পড়েছেন যে মুখস্থ হয়ে গেছে। তাঁব বন্ধু রিটায়ার্ড মুন্সেফ রঞ্জন সেন তাঁর রুচি পরিবর্তন মানসে একবার তাঁকে একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়তে দিয়েছিলেন। দু'চার পাতা পড়েই ডাক্তারবাবু আঁৎকে উঠলেন—ওরে বাবা এ যে খুনজখমের ব্যাপার দেখছি। দশ পাতা পড়তে না পড়তেই দুটো খুন হয়ে গেল—ও আমি পড়ব না, ওতে আমাব তৃপ্তি হবে না। 'ঠাকুমাব ঝুলি'ও তাঁর অনেকবার পড়া বই। আবার পড়ছিলেন সেদিন।

এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে অনুমান কর এসে হাজিব হল। এসে প্রণাম কবল না মুচকি হেসে দাঁড়িয়ে রইল। ডাক্তারবাবুই শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন—"কি হে কি খবর তোমার বস বস—"

কাছে একটা চেয়ার ছিল, সেইটের উপর বসল অনুমান।

"তোমার পার্টির ঝামেলা মিটে গেছে?"

"হ্যাঁ, ও পার্টি আমি ছেড়ে দিয়েছি। বড্ড বখেড়া করে, তাছাড়া ওদের আইডিয়ালের সঙ্গে আমাব মিলছেও না আজকাল"

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন—"তুমি কি কর—"

প্রশ্নটা শুনে একটু হকচকিয়ে গেল অনুমান।

তারপর ঢোঁক গিলে বলল—"আমাদের পার্টির জন্যে ক্যানভাস করে বেড়াই—"

"কি পার্টি—"

"শঙ্করদা যে নতুন পার্টিটা করেছেন—অল ইণ্ডিয়া ইউথস লীগ—"

"কি কাজ সে পার্টিব"

"দেশের উন্নতি করা। দেশ যে ডুবে যাচ্ছে দেখছেন না"

ডাক্তারবাবু খানিকক্ষণ চুপ কবে রইলেন। তারপর হেসে বললেন, "দেশের সেবা করবার জন্যে কোন পার্টি গড়বাব প্রয়োজন নেই। তোমার আশেপাশেই অনেক দুঃস্থ লোক পাবে তাদের সেবা কবলেই দেশ-সেবা কবা হবে। আমি জিগ্যেস কবেছিলাম—তুমি কি কব। অর্থাৎ নিজেব গ্রাসাচ্ছাদনেব জন্যে কি ব্যবস্থা করেছ? চাকরি, না ব্যবসা—"

"ব্যবসা করি না। আই হেট্ ব্যবসা। ব্যবসাদারবাই শেষে ক্যাপিটালিস্ট্ হয়। আমি দেশের সেবক হয়ে চিরকাল দেশের সেবা করব—"

"কিন্তু তোমার অন্নবস্ত্র যোগাবে কে"

"দেশই যোগাবে। যে পার্টি দেশেব সেবা কবছে তাবাই আমাদের কিছু কিছু দেয়—"

"ও। তাব মান পার্টির চাকরি কর। মন্দ নয় এটা, পার্টি যদি নির্ভবযোগ্য হয়। গভর্নমেণ্ট চাকরিই অবশ্য সবচেয়ে ভালো। তুমি লেখাপড়া করেছ কত দূব"

চুপ করে রইল অনুমান।

তাবপর বলল, "ছেলেবেলা থেকেই আমি দেশের কাজ কবি। লেখাপড়াব দিকে তেমন মন ছিল না। সুযোগও পাইনি—"

ডাক্তাববাবু হো হো কবে হেসে উঠলেন।

"তোমাব সব খবব আমি বিষুণেব কাছ থেকে পেয়েছি। তোমাব সব খবব জানি আমি। মিথ্যে কথা বলছ কেন। মিথ্যে কথা বলা মহাপাপ। আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব কবতে চাই, তুমি যদি মহাপাপী হও তাহলে তো পাববো না। সকলেব পড়তে ভালো লাগে না জানি, বদসঙ্গে মিশে অনেকে কুপথে চলে যায এও মানি, দুঃখদাবিদ্রের জন্যও অনেকে অকাজ কুকাজ কবে এও কারও অজানা নয। পৃথিবীতে এসব অহবহ হয। সেই মানুষকেই আমি সেবা মানুষ বলি যে নিজের ভুল দোষ ত্রুটিকে স্বীকাব করতে দ্বিধা করে না। পৃথিবীতে কাব দোষ নেই? সবাবই একটু আধটু দোষ আছে। মিথ্যে কথা বলে নিজেব দোয ঢাকতে যাওয়াটাই কাপুরুষতা, ওইটেই মহাপাপ। এ কাজ আব কোবো না ভাই। তোমাব পার্টি তোমাকে কত মাইনে দেয়?"

"মাইনে ঠিক দেয না। মাঝে মাঝে টাকা দেয। গড়পড়তা মাসে গোটা পঞ্চাশেক টাকা হয়ে যায়"

"খেতেটেতে দেয়—"

"রোজ দেয় না, মাঝে মাঝে দেয়"

"এ কাজ ভালো লাগে তোমার? সত্যি কথা বল—"

অনুমান চুপ করে রইল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর বলল—"ভাল না লাগলেও করতে হয়। এ ছাড়া আর কি করব বলুন। ক্লাস নাইন পর্যন্ত বিদ্যে। অন্য চাকরি কোথায় পাব? মামা মোটরের কাজ শেখাতে চেয়েছিলেন কিন্তু ওই নোংরা কাজ শিখতে ইচ্ছে হল না আমার। সর্বদা কালিঝুলি মেখে থাকতে হয়, তাছাড়া সর্বদা খাটুনি, রোদ নেই বৃষ্টি নেই—"

"ঠিক বলেছ। মোটরের কাজ সবাই পারে না। আমার লোচন তো এত বাবু যে একটি নাট্ বলটু পর্যন্ত ঘোরাবে না। সর্বদা ফিটফাট হয়ে থাকতে চায়। তবে ড্রাইভ করে চমৎকার। তুমি ওই পার্টির চাকরিই করবে বরাবর ঠিক করেছ না কি"

"তাছাড়া আর উপায় কি। কাজটাও ভালো, দেশের কাজ—"

"দেখ দেশের কাজ করছি বলে যারা হাটেমাঠে বক্তৃতা করে বেড়ায় তারা দেশের কাজ কতদূর করে তা জানি না তবে নিজেরা শেষ পর্যন্ত বেশ হোমরাচোমরা হয়, বেশ গুছিয়েগাছিয়ে নেয়। দেশের দুর্দশা তো একটুও কমেনি কোথাও। অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, শিক্ষার অভাব, চিকিৎসার অভাব, চাকরির অভাব, ভব্যতার অভাব, —নানারকম অভাবে দেশ মৃতপ্রায়। চোর ডাকাত গুণ্ডাদের শাসন করবার লোক নেই। শাসনকর্তাও হয় অপটু, না হয় অসাধু। দেশের কাজ করবে এই মনে করে তুমি যদি কোন পার্টিতে যোগ দিয়ে থাক তাহলে তোমার ভুল ভাঙতে বেশী দেরি হবে না। দেশের কাজ কেউ করে না, দেশকে কেউ ভালবাসে না। যারা ভালবাসে তারা কোন পার্টিতে যোগ না দিয়েই দেশের সেবা করতে পারে। একজন ক্ষুধার্তকে খেতে দেওয়া মানেই দেশ-সেবা, একজন আতুর সেবা করা মানেই দেশ-সেবা। কোনও পার্টিতে যোগ না দিয়েও ত করা যায়। আমি ভাবছি পার্টির চাকরি করলে তোমার স্বচ্ছন্দে চলবে কি না। যতদূর বুঝতে পারছি চলবে না। তোমাকে ওরা যে মাইনে দেয়, আমার বাড়ির চাকর তার চেয়ে বেশী মাইনে পায়। আমি একটা কথা ভাবছি, বিযুণের সঙ্গেও কথা হয়েছে এ বিষয়ে। বিষুণকে আমি খুব ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি। তুমি যদিও তার নিজের ভাগনে নও, কিন্তু তবু তোমার জন্যে ও কি না করেছে বল। তোমাকে ভালও বাসে খুব। তাই ভাবছি—অবশ্য তার আগে তোমার মতটা জানা দরকার—"

"কি বলুন --"

"তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমার এখানেই তুমি থাকতে পার। আমি তোমার খাওয়া-পবার সব ভার নিতে রাজী আছি। তাছাড়' তোমার ওই পার্টি তোমাকে মাসে মাসে যে পঞ্চাশ টাকা দেয় তাও দেব। তুমি আমার কাছে থাকবে আর আমার ফাইফরমাশ খাটবে। আমি বুড়োমানুষ সংসারে আমার কেউ নেই তোমরা পাঁচজন এসে আমার বাকি দিন ক'টা কাটিয়ে দাও—"

অনুমান বলল—"আমাকে কি কি করতে হবে—"

"প্রথমত তোমাকে অনেস্ট হতে হবে। মিথ্যে কথা বলা চলবে না। আমাকে নিজের লোক মনে করতে হবে, কোনও জিনিস মনে চেপে রেখে ভেতর-বুদে হয়ে থাকা চলবে না। মনের কথা সব খোলাখুলি বলবে আমাকে। আর কাজ? আমার ফাইফরমাশ খাটা। কোথাও ধর কোনদিন মাছ ধরতে গেলুম, তার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত তোমাকে করতে হবে। কোথাও হয়তো ঘুড়ি-ওড়ানো কমপিটিশন করলাম, কিংবা হয়তো চড়ুইভাতি করলাম তার ব্যবস্থা তুমি করবে। নানারকম খেয়ালে থাকি তো, একজন সহকারী পেলে ভালো হয়। লোচনটা সব পারে না, তাই একজন লোক খুঁজছি—"

হঠাৎ স্থানীয় দারোগা যতীনবাবু এসে হাজির হলেন। তাঁর সঙ্গে একজন পুলিশ কনেস্টবল।

"এই যে এখানেই আছে দেখছি। আপনার নাম কি অনুমান কর"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"আপনার নামে ওয়ারেন্ট আছে। আপনি অহিন বলে একটি ছেলের নাকে ছুরি মেরেছেন, আপনাকে অ্যারেস্ট করলুম আমি—"

ডাক্তারবাবু বলে উঠলেন—"সে কি! ওকে যে আমি কাজে বহাল করলুম এখুনি"

"করবেন না। ডেনজারাস ক্যারেকটার—"

"কিন্তু করে ফেলেছি যে। তাহলে ওর হয়ে কেস লড়তে হয়—"

দারোগাবাবু কনেস্টবলকে বললেন—"তুমি একে থানায় নিয়ে যাও"

অনুমান হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল—"আমাকে বাঁচান ডাক্তারবাবু"

"ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন তুমি থানায় যাও"

কনেস্টবলের সঙ্গে অনুমান থানায় চলে গেল।

যতীনবাবু ডাক্তারবাবুকে জিগ্যেস করলেন—"এই লোফারটার উপব আপনার সহানুভূতি কেন"

"ও লোফার বলেই। দেশসুদ্ধ সবাই তো লোফার। স্বাধীনতাব পব থেকে সাবা দেশটাই লোফারের দেশ হয়ে গেছে। কারও ভদ্রভাবে সৎপথে থাকবার উপায় নেই। তাই চারদিকে নানা রকম পার্টি আব গুণ্ডা বদমায়েশের দল। আব তাছাড়া আছে নানা ধরনেব কালোবাজাবি আব খোশামুদে। এরাই নাকি গভর্নমেন্টকে হাত করে রেখেছে শুনি। সত্যি মিথ্যে অবশ্য জানি না। এ ছোকরার অনেক দোষ আছে তা আমি জানি। সব জেনে শুনেই ওকে বাহাল করেছিলাম, ভেবেছিলাম নিজের কাছে রেখে সদ্ব্যবহার করে যদি ওকে ভাল কবা যায়। ও একজনকে ছুরি মেরেছিল? বলেন কি! কাকে ছুরি মেবেছে—"

"সে-ও একজন নামাজাদা গুণ্ডা। কিন্তু তাকে শাসন করবার অধিকাব তো ওই ছোকবাব নেই। সে অধিকার আমাদের—"

"কিন্তু আপনারা শাসন করতে পারছেন কি? রোজই তো চারিদিকে নানা ধরনের বে-আইনী কাণ্ড হচ্ছে শুনতে পাচ্ছি—"

"আমরা যতদূর পারি করছি। আচ্ছা, উঠি এবার তাহলে। আমার কথা যদি শোনেন এ ধরনের লোকের সংস্রবে আপনি থাকবেন না। আপনি ভালোমানুষ লোক, এদের চেনেন না—"

"খুব চিনি। ওরা অসহায়। আপনারা যদি ওর নামে কেস করেন আমি ওকে ডিফেণ্ড (defend) করব। লোচন নরেনবাবু উকীলকে ডেকে আন তো। আপনার স্ত্রী কেমন আছেন দারোগাবাবু—"

"খুব ভাল আছে। খুব ভাল ওষুধ বাতলেছেন। বেল খাওয়ার পর থেকে পেটের আর কোনও কষ্ট নেই"

"ওইটেই চালিয়ে যান"

"আচ্ছা—"

লোচন বেরিয়ে এসে বলল—"গাড়িটা নিয়ে, না এমনিই যাবো"

"গাড়িটা নিয়েই যাও। যদি আসতে চান নিয়ে এস"

।। ছয় ।।

বিষুণ একটা বড় গাড়ি খুলেছিল। তার ডিফারেনশিয়াল ঠিক করছিল। একজন বড়লোকের গাড়ি। অনেক টাকা দেবে। বিষুণ গাড়ির তলায় ছিল। এমন সময় থানা থেকে একজন কনেস্টবল এসে বলল—"বিষুণবাবু আপ থানামে চলিয়ে—দারোগা সাহেব বোলাতে হে"

"থানায়? এখন তো যেতে পারছি না। পরে যাব। ডাকছেন কেন—"

"আপকো ভাগনাকো অ্যারেস্ট কিয়া গিয়া হ্যয়। অগর আপ জামিন হোইয়ে তো উসকো ছোড় দিয়: যায গা। আপ চলিয়ে—"

"আমার ভাগনা? অনুমান?"

"জি হাঁ—"

"আমি ওর জামিন হব না। তোমরা ওকে নিয়ে যা খুশি করো—"

"ই বাত ভি থানামে যাকে বোলনে পড়ে গা। আপ চলিয়ে—"

"এ তো মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল। হালিম তুমি তাহলে এগুলো পেট্রল দিয়ে সাফ করে রাখ। আমি থানা থেকে ঘুরে আসছি—"

বিষুণ শুধু গায়েই গাড়ির নীচে ঢুকেছিলেন। গামছা দিয়া পা হাত পা মুছে কারখানার কালি-ঝুলি মাখা লম্বা কোটটা পরেই বললেন—"চল"।

থানায় গিয়ে দেখলেন—অনুমান থানার বারান্দায় বসে আছে একধারে। বিষুণকে দেখেই ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল।

"মামা বিশ্বাস কর আমার কোন দোষ নেই। ওই অহিন একটা ছোরা নিয়ে আমারই নাক কাটতে এসেছিল, আমি তখন আত্মরক্ষার জন্য একটা পেন-নাইফ ওর মুখের দিকে ছুঁড়ে দি। তাতে ওর নাকে সামান্য একটু লেগেছে। ওই আমাকে প্রথমে মারতে এসেছিল—"

বিষুণ তার দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দারোগাবাবুর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

"এই যে বিষুণবাবু আসুন। এই ছোকরা কি আপনার ভাগনে?

"হ্যাঁ—"

"ও তো একটা ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়েছে। ও অবশ্য বলছে যে অহিন ছোরা নিয়ে ওকে মারতে গিয়েছিল, ও সেল্‌ফডিফেন্সে একটা পকেট-পেন-নাইফ ওর মুখের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল। তা যদি হয় তাহলে ওকে আমরা ছেড়ে দেব। সাজাও বিশেষ কিছু হবে না। তবে

আপনাকে ওর জামিন হতে হবে। এস-পিকে ফোন করেছিলাম তিনি বললেন বিষুণবাবু যদি জামিন হন ছেড়ে দিন। কোর্টে যেদিন মকর্দমা হবে সেদিন কোর্টে হাজির থাকলেই চলবে''

বিষুণবাবু বললেন—''এ ঝুঁকি আমি নেব কেমন করে বলুন। ও ছেলে আমার কনট্রোলের বাইরে। কোথায় থাকে কি করে কিচ্ছু জানি না''

''কিন্তু কেউ জামিন না হলে ছেড়ে দিই কি ক'রে। লক্‌আপে রাখতে হয়''

''তাই রাখুন—''

এমন সময় একটা গাড়ি এসে ঢুকল। ডাক্তারবাবুর গাড়ি। গাড়িতে নরেনবাবু উকীল আর ডাক্তারবাবু।

বিষুণকে দেখেই তিনি বললেন—''কি কাণ্ড হয়েছে শুনেছ তো আমি তোমার ভাগনাকে বহাল করে নিয়েছি—''

''কিন্তু ওরা বলছে ওকে এখন ছাড়বে না''

'আমি আর নরেন দু'জনেই জামিন হব। ছাড়বে না মানে?''

ডাক্তারবাবু আর নরেনবাবু দারোগা সাহেবের ঘরে গেলেন।

দারোগা বললেন—''আপনাবা যদি জামিন হন এক্ষুনি ছেড়ে দেব। তবে যেদিন মকর্দমা হবে সেদিন ও যেন কোর্টে হাজির থাকে দেখবেন''

নরেনবাবু বললেন—''নিশ্চয় থাকবে, আমরা কথা দিচ্ছি—''

''বেশ''

বিষুণ সবিস্ময়ে দেখছিল সব।

একটু গলাখাঁকারি দিয়ে এগিয়ে গেল সে ডাক্তারবাবুর কাছে। মৃদুকণ্ঠে বলল, ''আপনি ডাক্তারবাবু এর জামিন হচ্ছেন নাকি''

''তাছাড়া আর উপায় কি। ও আমার কাজে বহাল হয়েছে—''

বিষুণ আর কিছু না বলে চুপ করে রইল। কি বলবে ভেবে পেল না।

ডাক্তারবাবুকে সে ভাল করেই চেনে।

ডাক্তারবাবুর গাড়ি চড়েই সকলে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে ফিরে এলেন। অনুমানও এল।

ডাক্তারবাবুর গাড়ি থেকে নেমেই অনুমানের হাতে দশটা টাকা দিয়ে বললেন, ''কিছু ভালো মিষ্টি কিনে নিয়ে এস। আমি তোমাকে কাজে বহাল করলুম এবং পরস্পর পরস্পরের বন্ধু হয়ে থাকব এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হলুম—এই ব্যাপারটাকে মিষ্টান্নসহযোগে স্মরণীয় করা যাক। কি বল নরেন—''

নরেনবাবু বললেন—''আমার ডায়াবিটিস আছে আমি মিষ্টি খাই না''

''তাহলে কিছু নোনতা খাবারও এন''

''আমি পরে এসে খেয়ে যাব, এখন চললুম। আমার একজন মক্কেল এসে বসে আছে—''

''আচ্ছা তাহলে যাও। পরে এসো কিন্তু—''

''আসব''

নরেনবাবু চলে গেলেন।

বিষুণ একধারে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। চুপ করেই রইলেন তিনি।

"বিষুণ অমন গুম হয়ে আছ কেন। কিছু বক্তব্য থাকে তো বলেই ফেল না"

"কাজটা আপনি ভালো করলেন না ডাক্তারবাবু। ওসব বখা ছেলেদের চেনেন না আপনি। আপনাকে হয়তো বিপদে ফেলে দেবে। কাজটা—"

বিষুণ থেমে গেলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন—"অবিবেচনার হল—এই তো? দেখ বিষুণ সারাজীবন ধরে আমি এই রকম অবিবেচনার কাজ করেছি। ওই যে মোটরটা নিয়ে তুমি প্রায়ই হিমশিম খাও সেটা বেচে দেওয়াই সুবিবেচনার কাজ ছিল। আমি যা করি তার কোনটাই বুদ্ধিমানেরা করে না। কিন্তু এতেই আমার আনন্দ। দেখি না, ছোকরাকে যদি বাগাতে পারি। টোপ তো গিলেছে মনে হচ্ছে—"

"কিন্তু আমার সন্দেহ আছে বাগাতে পারবেন কি না। ও নানারকম খেল দেখাবে আপনাকে"

"দেখাক না। সেবার বোসমশায়ের দীঘিতে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। একটা রুই টোপ গিলেছিল বেলা দশটায়। কিছুতেই ওঠে না। সুতো ছেড়ে ছেড়ে অনেকক্ষণ খেলতে দিলাম। সমস্ত দিনই খেলল ব্যাটা। সন্ধ্যা নাগাদ টেনে তুললাম—ইয়া বড় দশসেরি রুই। দেখাই যাক না তোমার ভাগনা কি খেল খেলে। দেখ দুষ্ট ছেলেদেরই আমি ভালবাসি। ভালবাসার জোরেই তারা কাবু হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। তোমার ভাগনেও হবে—। খেলুক না কত খেলবে। আমিও তো খেলতে চাই। তুমি রাগ করছ না তো। তুমি রাগলেই বিপদ—"

"না, না আমি রাগ করব কেন। আমি ভাবছি আপনি না বিপদে পড়েন ওকে নিয়ে—"

"দেখাই যাক না। তুমি বস। খাবার খেয়ে তবে যেও। গাড়িটা তো ভালই চলছে। কতদিন চলবে—"

"কিছুদিন চলবে এখন"

লোচন কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সে বলল—"হর্নটা ঠিক বাজছে না।—"

"ও ঠিক করে দেব। কারখানায় নিয়ে যেও কাল"

ডাক্তারবাবু বললেন—"বিষুণ তুমি বস। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

বিষুণ চেয়ারে বসলেন না। কাছেই একটি বেঞ্চি ছিল তারই উপর বসলেন।

ডাক্তারবাবু একটি ছোট সিগার ধরালেন।

"বিষুণ তুমি কেমন যেন মন-মরা হয়ে আছ মনে হচ্ছে। কাজকর্ম কেমন হচ্ছে তোমার ওয়ার্কশপে—"

"তা আপনাদের আশীর্বাদে ভালই। সব কাজ নিতে পারি না—"

"কেন"

"নিজের হাতে যতটা করতে পারি ততটাই নিই। খদ্দেরদের আমি ঠকাতে চাই না। বিশ্বাসযোগ্য কাজের লোক নেই। সব ফাঁকিবাজ আর চোর—"

ডাক্তার মুখার্জি হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন—"দেখ

বিষুণ এদেশ রাতারাতি ইংলণ্ড, জার্মানী বা আমেরিকা হয়ে যাবে না। তোমার কারখানাতেও যুধিষ্ঠির বা বিদুর, বুদ্ধ বা চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ এসে চাকরিতে বহাল হবে না। হাতের কাছে যাদের পেয়েছ তাদের নিয়েই কাজ চালাতে হবে। সব দেশেই পাজী ফাঁকিবাজ লোক আছে, সব যুগেই ছিল, সব যুগেই থাকবে—এদের নিয়েই চলতে হবে। এদের নিয়েই যতটা পার আনন্দ ক'রে যাও—"

বিষুণ চুপ করে রইল।

"তোমার ভাগনেকে আমি বহাল করলুম বলে দুঃখিত হওনি তো"

"না, দুঃখিত হব কেন। আমার ভয় আপনাকেই ও বিব্রত করবে নানাভাবে। আমি ওর ভালো করবার চেষ্টা কম করিনি, কিন্তু কিচ্ছু হল না তো—"

"হবে হবে। দেখি দিনকতক বেয়ে চেয়ে—"

হবিবেব ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াল ডাক্তাববাবুর বাড়ির সামনে। ড্রাইভাব রবি এসে একগোছা নোট ডাক্তারবাবুর হাতে দিয়ে বলল—"হবিব বললে সে আপনার কাছ থেকে ট্যাক্সিব ভাড়া নেবে না"

"কি কাণ্ড! সমস্তদিন ওর গাড়িটা আটকে রাখলুম, ভাড়া নেবে না কেন! পেট্রলের দামটা অন্তত নিক—"

"ও কিচ্ছু নেবে না।"

তারপর রবি নেবে গিয়ে একটা কাগজের বড় বাক্স নিয়ে এল।

"এই শালটা আপনাকে উপহার পাঠিয়েছে হবিব। ওর মেয়ের প্রণামী এটা।

ডাক্তার বাবু নির্বাক হয়ে গেলেন।

হঠাৎ তাঁর চোখ দুটো জলে ভরে উঠল।

বিষুণের দিকে চেয়ে বললেন—"তুমি একটু আগে বলছিলে এদেশের সবাই চোর, ভাল লোক নেই। হবিবকে তুমি কি বলবে? হবিবও ছেলেবেলায় গুণ্ডাপ্রকৃতির ছিল, মারপিট করে বেড়াত, আমিই দুবার ওকে পুলিসের হাত থেকে ছাড়িয়েছি। সেই গুণ্ডা আজ কি হয়েছে দেখ—"

রবির দিকে ফিরে বললেন—"তুমি দাঁড়াও। আমি একটা চিঠি দিচ্ছি—"

ঘরের ভিতর ঢুকে একটা চিঠি লিখলেন হবিবকে।

"হবিব, আমি তোমার মেয়েকে একটা পাঁচশো টাকার চেক পাঠাচ্ছি। ওকে ওর পছন্দ মতো কিছু কিনে দিও। ইতি"

চিঠি আর চেক একটা খামে মুড়ে রবির হাতে দিলেন।

"এটা দিও হবিবকে"

বিষুণ উঠে দাঁড়ালেন।

"ডাক্তারবাবু, আমি এবার যাই। কাজ ফেলে এসেছি। রবি তুমি আমাকে নাবিয়ে দিয়ে যাও"

"হ্যাঁ হ্যাঁ আসুন না"

বিষুণ ও রবি চলে গেল।

ডাক্তারবাবু সিগারটা আবার ধরিয়ে টানতে লাগলেন। চেয়ে রইলেন দূরে কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে। গাছটাকে মনে মনে বললেন, "তুই আর কত ফুল ফুটিয়েছিস, আমার মনে যে ফুল ফুটেছে তার সীমা সংখ্যা নেই—"

ধীরে ধীরে পা দোলাতে লাগলেন।

।। সাত ।।

বিষুণবাবুকে পৌঁছে দিতে গিয়ে রবি কিন্তু বিপদে পড়ে গেল। দেখা হয়ে গেল তার বাবার সঙ্গে। তিনি বিষুণের কারখানার একধারে সঙ্কুচিত হয়ে বসে ছিলেন। মুখময় কাঁচাপাকা দাড়ি, পরণে একটা ছেঁড়া কামিজ। মাথার চুল তৈলহীন অবিন্যস্ত। সর্বাঙ্গে জরার প্রকোপ। মূর্তিমান দারিদ্র্য। উনিই যে ছিমছাম টেরেলিনের বুশশার্ট পরা রবির বাবা একথা ভাবা শক্ত।

বিষুণ নেমে তাকে নমস্কার করে বললেন—"এই যে বিপিনবাবু এসে গেছেন দেখছি। ক'টাকা চাই আপনার—"

"হিরণ ঠাকুরকে আজ কিছু না দিলে সে খাওয়া বন্ধ করে দেবে—"

বিষুণবাবু রবির দিকে ফিরে বললেন—"তোর কাছে আছে কিছু?"

"আমাব কাছে দশ টাকা আছে, কিন্তু পেট্রল কিনতে হবে। হবিবের টাকা—"

"ও টাকাটা তোমার বাবাকে দাও। ময়ূরগঞ্জে ফেরবার মতো পেট্রল আছে তো—"

"আছে"

"তবে আর কি। তুমি ময়ূরগঞ্জে ফিরে যাও। আমি হবিবকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। টাকাটা দিয়ে দাও তোমার বাবাকে"

রবি টাকাটা বিষুণের হাতে দিয়ে আড়চোখে চাইতে লাগল তার বাবার দিকে। দেখল তার বাবা কাঁদছেন।

বিষুণ ভিতরের দিকে চলে গেলেন। একটু পরেই ফিরে এলেন আবার। তাঁর হাতে আরও দু'খানা দশ টাকার নোট।

"বিপিনবাবু, আপনি এই তিরিশ টাকা নিয়ে যান এখন। হিরণ ঠাকুরের সঙ্গে আমি কথা কইব। সব ঠিক হয়ে যাবে, ভাববেন না"

বিপিনবাবু ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে গেলেন বিষুণবাবুকে।

আঁতকে পেছিয়ে গেলেন বিষুণবাবু।

"ছি ছি কি করেন, আপনি আমার বাবার বয়সী"

"তুমিই আমার বাবা—"

ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলেন বিপিনবাবু।

"আপনি এখন যান। আপনার ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবেই। আচ্ছা আপনি লেখাপড়া কতদূর করেছিলেন—"

"আমি সেকালের এনট্রান্স পাস। নৈহাটিতে মাস্টারি করতুম। কিন্তু যখন স্বদেশী হাঙ্গামা শুরু হল তখন তাতে জড়িয়ে পড়েছিল আমারই একটি প্রিয় ছাত্র। সে নাকি বোমার আড্ডায় যাতায়াত করত। পুলিস যখন তাকে ধরতে এল, তখন আমি তাকে লুকিয়ে রেখেছিলাম। ছেলেটা পালাল বটে, কিন্তু আমি ধরা পড়ে গেলাম। আমার চাকরী গেল। তারপর থেকে আর চাকরি পাইনি। ট্যুশনি ক'রে দোকানে খাতা লিখে সংসার চালিয়েছি। রবিকে মানুষ করবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু পারিনি। সবই অদৃষ্ট—"

"আচ্ছা আপনি যান—"

বিপিনবাবু চো'খ মুছতে মুছতে চলে গেলেন।

বিষুণ তখন রবির দিকে ফিরে বললে, 'হবিবকে কি লিখেছি, শোন। লিখেছি, –ভাই হবিব, তোমার ড্রাইভার রবির বাবা খেতে পাচ্ছেন না। তাই তুমি পেট্রল কেনবার জন্যে যে দশ টাকা ওকে দিয়েছিলে তা ওর কাছ থেকে নিয়ে ওর বাবাকে দিয়েছি। ওর বাবার জন্যে মাসে পঞ্চাশ টাকা দরকার। রবি তোমার কাছে কাজ করছে ওকেই দিতে হবে সে টাকাটা। আমি তোমাব কাছ থেকে নিয়ে আসব প্রতি মাসে।

তুমি রবিব পাওনা থেকে সেটা উসুল করে নিও। কেমন? এখুনি যেতাম তোমাব কাছে। কিন্তু হাতে কাজ আছে। পরে যাব। রবির বাবাব খাবার ব্যবস্থা করতেই হবে তোমাকে' বিষুণদা—

রবি অপ্রসন্ন মুখে চিঠিটা শুনল।

তারপর বলল—"আমার বাবার এক দূর সম্পর্কের দাদা আছেন কাশীতে। তিনি অবস্থাপন্ন লোক। বাবা তাঁর কাছে গিয়ে অনায়াসে থাকতে পারেন"

"তা হয়ত পারেন। কিন্তু যতক্ষণ তিনি এখানে আছেন ততক্ষণ তাঁর ভরণপোষণ তোমাকে করতে হবে। তুমি তাঁর ছেলে"

"কিন্তু আমারি সাধ্যে না কুলুলে আমি কি করব"

"সাধ্যে যাতে কুলোয় সে ব্যবস্থা আমরা করব। হবিব যদি না পারে আমি করব। আমার এখানে তুমি যদি ভালোভাবে কাজ কর আমি তোমাকে মাসে একশ' টাকা করে দেব। তার থেকে তুমি অনায়াসে পঞ্চাশ টাকা তোমার বাবাকে দিতে পার—"

রবি চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল সামনের দিকে। তারপর গাড়িটা ঘুরিয়ে চলে গেল বোঁ করে।

বিষুণ আবার নিজের কাজে মন দিলেন। ঢুকে পড়লেন গাড়ির নিচে। একটু পরে গাড়ির মালিক রামসদয়বাবু এলেন। বড় ব্যবসাদার তিনি। এখানেও তার গদি আছে একটা। রামসদয় বসাক ধনী লোক।

"বিষুণ, আমার গাড়ির কত দূর। সব খুলে ফেলেছ দেখছি। দেরি হবে মনে হচ্ছে—"

বিষুণবাবু বেরিয়ে এসে বললেন—"দিন দুই লাগবে—"

"দিন দুই আমি এখানে আছি। আমার এখানকার গদিতেও গরদা জমেছে অনেক।

সেগুলো সাফ করতে অন্তত দু'দিন লাগবে। বিশ্বাসযোগ্য লোক তো পাই না, নিজেকেই সব করতে হয়। দশখানা চিঠির জবাবই দেওয়া হয়নি''

বিষুণবাবু বললেন—''আপনি যদি রাখেন একটি বিশ্বাসযোগ্য লোক আপনাকে দিতে পারি। লেখাপড়া জানে, সৎ লোক। কিন্তু বয়স হয়েছে, দৌড় ঝাঁপ করতে পারবেন না তবে চিঠিপত্রের উত্তর দিতে পারবেন, আপনার গদিকে পাহারা দিতে পারবেন--''

''দৌড় ঝাঁপ করবার লোক আছে আমার। কিন্তু কেউ অনেস্ট নয়। আমার সন্দেহ হচ্ছে গোলা থেকে কয়েক বস্তা ছোলা পার হয়ে গেছে। অথচ কাউকে ধরবার উপায় নেই। ছেলে দুটো ইংল্যাণ্ড আমেরিকা করে বেড়াচ্ছে। ব্যবসার দিকে তাদের মন নেই। আমি একা ক'দিন সামলাই বল—। তোমাব লোকটি কি এখানকার লোক?''

''হ্যাঁ আপনিও চেনেন বোধ হয়। বিপিনবাবু। বলেন তো আপনার কাছে পাঠিয়ে দিই''

''বেশ দিও। কত মাইনে নেবে—''

''সে আপনি বিবেচনা করবেন। তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনেব খবচ উঠে গেলেই তিনি রাজী হবেন। লোকটি খুব ভালো—''

''বিপিনবাবু? এক বিপিনবাবু আমাব ছোট ছেলেকে পড়াতেন। তিনিই কি? আচ্ছা পাঠিয়ে দিও আমার কাছে কথা কয়ে দেখব''

''উনি আগে প্রাইভেট টিউশন করতেন শুনেছি। হয়তো আপনার ছেলেকে পড়িয়েছেন। পাঠিয়ে দেব আপনাব কাছে—''

রামসদয়বাবু চলে গেলেন।

বিষুণও আবার ঢুকে পড়লেন গাড়ির নিচে।

।। আট ।।

বীণা মুশকিলে পড়েছিল। মানতি মাসীর আবার জ্বর হয়েছে। শৈলেনবাবুর কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলতে সাহস হচ্ছিল না তার। মাসীকে দু'দিন আলুকাবলি খাইয়েছিল সে, যদিও খুব সামান্যই, কিন্তু তৃতীয় দিনেই কম্প দিয়ে জ্বর এল আবার। শৈলেনবাবুর কাছে যেতে সাহস হচ্ছিল না তার। ভাবছিল, বুড়ো ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে বললে কেমন হয়। যদিও তিনি প্র্যাকটিস করেন না, কিন্তু প্রবীণ ডাক্তার তো। তাঁকে বললে তিনি নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করবেন একটা। ভাল লোক খুব। কিন্তু তাঁর কাছে যাবে কে। শশধর সেই যে বেরিয়ে গেছে এখনও ফেরেনি। অথচ মাসীর খুব জ্বর। ফিরলেও সে যেতে রাজী হবে কিনা সন্দেহ, বলবে শৈলেনবাবুর কাছেই আবার যাওয়া উচিত, তিনি গোড়া থেকে চিকিৎসা করছেন। বকুনি তো খেতেই হবে, আলুকাবলি খাওয়াতে গিয়েছিলে কেন। কিন্তু বীণা ঠিক করেছে সে শৈলেনবাবুর কাছে আর যাবে না। বারান্দায় বেরিয়ে দেখল একটা খালি রিক্‌শা যাচ্ছে রিক্‌শাটাকে থামিয়ে সে জিগ্যেস করল—বুড়ো ডাক্তারবাবুর বাড়ি সে চেনে কি না।

রিক্‌শাওলা বলল—তাঁর বাড়ি কে না চেনে। আপনি যাবেন? বীণা বললে—যাব আবার ফিরে আসব। কত নিবি? দেড় টাকা চাইছিল রিক্‌শাওলাটা। এক টাকায় রফা হল। বীণা ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ডাক্তারবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দেখল তিনি রামসদয়বাবুর সঙ্গে বসে গল্প করছেন। রামসদয়বাবুর মস্ত একটা পুকুর আছে, সেখানে না কি অনেক মাছ। ডাক্তারবাবু সেখানে আজ মাছ ধরতে যাবেন, তারই আয়োজন হচ্ছে। স্বয়ং রামসদয়বাবু এসেছেন তাঁকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবেন বলে। অনুমান কর চার টোপ ছিপ, হুইল, সুতো প্রভৃতি ঠিক করছে। নটবর আর ক্ষেন্তির মা খাস্তা কচুরি আর আলুর দম তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ডাক্তাববাবু রামসদয়বাবুকে বলছিলেন—"আপনার ও পুকুরে বড় বড় রুই কাতলা আছে শুনেছি। কিন্তু ওটা আপনার প্রাইভেট পুকুর, তাই ওখানে যাইনি কোনদিন। আপনিও তো এখানে থাকেন না যে আপনার কাছ থেকে অনুমতি নেব। আজ আপনি নিজে থেকে নিমন্ত্রণ করলেন এতে ভাবি খুশী হয়েছি। কবে এসেছেন আপনি?"

"আমি দিন চারেক হল এসেছি। আপনার মতো লোক আমাব পুকুবে মাছ ধরবে এতো আমার পরম সৌভাগ্য। আমি না থাকলেও আপনি যখন খুশি যাবেন, আমি বলে দিয়ে যাব মালীটাকে। ওই ব্যাটারাই সব চুরি করে খেয়ে ফেলে বুঝলেন না? বলা বইল আপনি যখন খুশি যাবেন—"

বীণা বাবান্দার নীচে সসঙ্কোচে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ ডাক্তাববাবুর নজর পড়ল তাব দিকে।

'কি গো, তুমি এখানে হঠাৎ। কিছু দবকার আছে না কি—"

"হ্যাঁ, মানতি মাসী বড় অসুস্থ। তাকে একবার দেখতে হবে। সেই জন্যেই আমি এসেছি"

"আমি তো আজকাল প্র্যাকটিস কবি না। শৈলেনের কাছে যাও—"

"তিনিই তো দেখছিলেন। কিন্তু আবার কাল থেকে কম্প দিয়ে জ্বর আসছে—"

তারপর একটু থেমে আস্তে আস্তে বললে—"আমারও দোয আছে। সেই জন্যে ভয়ে শৈলেনবাবুর কাছে যেতে পারছি না—"

"তুমি আবার কি দোষ করলে—"

"মাসী সাবু বার্লি খেতে পাচ্ছিল না তাই দু'দিন একটু করে আলুকাবলি দিয়েছি তাকে। শৈলেনবাবু তরকারি দিতে মানা করেছিলেন—"

"আলুকাবলি খেলে জ্বর হয় না। তোমার মাসীর বাড়ি কতদূর?"

"চণ্ডীতলার কাছে—"

"চল তাহলে দেখে আসি। লোচন গাড়ি বার কর—"

তারপর রামসদয়াবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—"চলুন, আপনাকে নামিয়ে দিই—"

বীণা বলল—"আমি রিক্‌শাতে এসেছি। রিক্‌শাতেই চলে যাচ্ছি। আমি মানতি মাসীর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকব"

"রিক্‌শায় যাওয়ার দরকার কি। গাড়িতেই চল না তুমি। আমাদের সব্বাইকে কুলিয়ে যাবে—"

বীণা রিক্‌শাওলার ভাড়াটা দিয়ে দিলে। বারো আনা দিতে হল।

রামসদয়বাবু বীণার সম্বন্ধে একটু কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। ফিসফিস করে ডাক্তারবাবুকে প্রশ্ন করলেন—"কে মেয়েটি?"

"ও হচ্ছে শশধরের বউ। ওই যে শশধর আলুকাবলি ফেরি করে বেড়ায়। ভারী ভালো মেয়েটি, ভারী তেজী—"

রামসদয় চক্ষু বিস্ফারিত করে দেখছিলেন বীণাকে।

অল্পবয়সী মেয়েদের সম্বন্ধে রামসদয়বাবুর একটু দুর্বলতা আছে। এই 'আলু'—দোষের জন্য তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের কাছে তিনি হেয়। তাঁর কর্মচারীরাও এই জন্যে তাঁকে শ্রদ্ধা করে না। তাঁর ছেলে দুটি তাঁকে ত্যাগ করে বিদেশে গিয়ে ব'সে আছে তারও কারণ না কি এই। স্ত্রী বেঁচে থাকলে এই ষাট বছরের বুড়োকে হয়তো শায়েস্তা ক'রে রাখতে পারতেন, কিন্তু তিনি অনেকদিন আগেই মারা গেছেন। বুড়ো টাকার কুমীর। মেয়েদের পিছনে অনেক টাকা খরচ করেছেন, এখনও করতে পিছপাও নন।

তাঁর দৃষ্টি দেখে বীণার একটু অস্বস্তি হচ্ছিল।

লোচন যখন গাড়ি বার করল তখন রামসদয় বললেন, "তুমি আমার পাশে এসে বস।"

"আমি এইখানে বসছি"

বীণা লোচনের পাশে গিয়ে বসল। রামসদয় ও ডাক্তারবাবু পিছনের সীটে বসলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন—"লোচন, আগে রামসদয়বাবুকে নামিয়ে দাও। রামসদয়বাবু আমি তিনটে নাগাদ আপনার বাগানবাড়িতে যাব?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ যখন খুশি। মালীকে বলে দিচ্ছি সে সব ব্যবস্থা করে দেবে।"

"আপনিও মাছ ধরবেন না কি"- -জিগ্যেস করলেন ডাক্তারবাবু।

"না, ওসব বাতিক আমার নেই। ছেলেরা শখ করে পুকুরে মাছ ছেড়েছিল, কিন্তু তারা তো সব বিদেশে। পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খাচ্ছে, আমাকে এইখানেই নাবিয়ে দিন—"

চৌরাস্তায় নেমে গেলেন রামসদয়বাবু। যাওয়ার আগে আর একবার দেখে গেলেন বীণাকে তির্যক দৃষ্টি হেনে।

ডাক্তারবাবু বললেন—"এইবার চল শৈলেনের কাছে—"

বীণা বলে উঠল— "সেখানে কেন। তিনি তো আমাকে দেখলেই বকবেন। তরকারি খাওয়াতে মানা করেছিলেন তিনি—"

"না না বকবে না। আমি তোমার হয়ে ওকালতি করব—"

শৈলেনবাবুর ডিসপেন্সারির সামনে মোটর থামতেই বেরিয়ে এলেন তিনি।

"নমস্কার। আসুন—"

"আমি এখন আর নাবব না। তোমার একটা রুগীকে দেখতে যাচ্ছি তাই তোমার অনুমতি নিতে এলাম। এর মানতি মাসীকে তুমি দেখছিলে—"

"হ্যাঁ। প্যারাটাইফয়েড হয়েছিল। কেমন আছে?"

বীণা ঘাড় হেঁট ক'রে বসে ছিল।

"আবার কম্প দিয়ে জ্বর আসছে বলছে। তাই সন্দেহ হচ্ছে হয়তো বি-কোলাইও আছে—"

"তা হতে পারে। এর জন্যে আপনার কাছে যাওয়ার দরকার ছিল না। আমাকে খবর দিলেই আমি দেখে আসতাম—"

"তা জানি। ও কিন্তু আমার কাছে এসেছে অন্য কারণে। তুমি তরকারি খাওয়াতে বারণ করেছিলে, কিন্তু দু'দিন ও তরকারি খাইয়েছে। তাই ভয়ে তোমার কাছে আর আসেনি"

"তরকারি খাওয়াতে গেল কেন!"

"না, না, ওকে বোকো না। আমাকে জিগ্যেস করেছিল—আমিই বলেছিলাম তা দাও না একটু তবকারি। একটু তরকারি খেলে কি এমন চণ্ডী অশুদ্ধ হবে। আজকাল তো টাইফয়েড রুগীদেব 'সলিড্' খাবাব খেতে দিচ্ছে—"

ডাক্তারবাবুর এই মিথ্যাভাষণ শুনে অবাক হয়ে গেল বীণা। শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ল তাব মন। চুপ করে মাথা হেঁট করে বসে রইল সে। ডাক্তাববাবু বলে যেতে লাগলেন—"বক্‌তে হলে আমাকে বকো। ও বেচারীকে কিছু বোলো না।"

শৈলেনবাবু বললেন—"না, না, আমিও তো বলেছিলাম একটু তরকারি দিতে—আমি ওবেলা গিয়ে দেখে আসব"

"আমি যাচ্ছি দেখতে। তোমারই রুগী তোমাকে তো যেতেই হবে। এখন যেতে পারবে না?"

"চলুন তাহলে যাই। কাছেই তো ওদের বাড়ি"

শৈলেনবাবুকে নিয়ে ডাক্তারবাবু দেখলেন মানতি মাসীকে।

ডাক্তারবাবু ব্যবস্থা করলেন—চারটের সময় যখন কম্প দিয়ে জ্বর আসছে তখন সকালের দিকে একটু তরকারি খেলে আপত্তি নেই। ওতে কিছু হবে না। শৈলেনবাবুও আপত্তি কবলেন না এতে।

দু'জনে পবামর্শ করে ওষুধের প্রেসক্রিপশনও লিখলেন।

"ওষুধ নিয়ে আসবে কে—"

বীণা বলল "আমিই যাব। মাসীর তো আর লোক কেউ নেই—"

ডাক্তারবাবু নিমেষে হৃদয়ঙ্গম করে ফেললেন ব্যাপারটা। বললেন— "তোমাকে তো নিজের ঘরসংসার দেখতে হবে"

মানতি মাসী বললেন—"ও ই তো সব করছে বাবা। আর জন্মে ও আমাব মা ছিল—"

গলাটা ধরে এল তাঁর।

ডাক্তারবাবু বললেন—"আমার ড্রাইভার লোচন আপনার ওষুধটা দিয়ে যাবে, খোঁজখবরও করবে। যা দরকার ওকে বলবেন—"

মানতি মাসী, বীণা দু'জনেই চুপ করে রইল।

"এবার তবে যাই আমরা। শৈলেন 'বিজি' (busy) লোক, ওকে বেশীক্ষণ আটকে রাখা ঠিক নয়। তুমিও যাবে না কি—"

বীণা বললে—"আমি একটু পরে যাব। আমার বাড়ি বেশী দূরে নয় এখান থেকে"

বীণা মানতি মাসীকে বলল—"আমি তোমার জন্যে ভেজিটেবল স্ট্যু করে আনি তাহলে মাসি। আলুকাবলি আর দেব না এখন। কি বল?

"না, দরকার নেই। স্ট্যু মানে ঝোল তো? ঝোলটা খুব পাতলা করিস না--"

"না, না ভাল করেই করব। একটু পরেই আসছি আমি। ওষুধটা এলে তুমি খেও একদাগ। আমি রান্নাটা করেই চলে আসব তোমার ঝোল নিয়ে—"

"আচ্ছা—"

বীণা ফিরে এসে দেখল শশধর আর বিকাশ বারান্দায় বসে আছে। শশধর বিড়ি খাচ্ছিল বীণাকে দেখে সেটা ফেলে দিল। বীণা বেশী বিড়ি খাওয়া পছন্দ করে না।

বীণা হেসে বললে—"আমি মানতি মাসীর ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলাম। বুড়ো ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে সব খুলে বললাম তাঁকে। কি ভালো লোক যে উনি, আমাকে শৈলেনবাবুর ওখানে নিয়ে গেলেন, বললেন আমিই তরকারি দিতে বলেছিলাম ওকে, দোষ আমারই। তারপর দু'জনে মানতি মাসীর বাড়িতে এসে সব ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলেন।"

বিকাশ একধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সেদিনকার ঘটনার পর থেকে সে এখনও একটু আড়ষ্ট হয়ে আছে। খুব সহজ হতে পারেনি। বীণা তার দিকে চেয়ে হেসে বলল—"আসুন। অমন করে মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন—"

"না, আমি যাচ্ছি, আমার কাজ আছে "

"একটু চা খেয়ে যান—"

হো হো করে হেসে উঠল শশধর।

"সেদিন তোমার যে মূর্তি ও দেখেছে, তাতে আর সাহস পাচ্ছে না। ভাব তো হয়ে গেছে, তবে আর ভয় কি!"

বিকাশ ঘাড় বেঁকিয়ে বলল—"ভয় আমি কাউকে করি না। তবে সামান্য একটা রসিকতাকে ও যে এমনভাবে নেবে তা আমি ভাবতে পারিনি!"

বীণা হঠাৎ গলবস্ত্র হয়ে হাতজোড় করে বললে—"আমার অন্যায় হয়েছে, ক্ষমা করুন। আসুন, চা খেয়ে যান—"

"চল চল। লেট বাইগনস্ বি বাইগনস্"

শশধর বিকাশের হাত ধরে টেনে ভিতরে নিয়ে গেল।

বীণা স্টোভ জ্বালতে বসল। বিকাশের দিকে হাসি-মুখে চেয়ে বলল—"আজ কিন্তু ঘরে খাবার নেই। মুড়ি আছে, খাবেন?"

বিকাশ হেসে বলল—"আর প্রতিবাদ করবার সাহস নেই। যা দেবে তাই খাব"

হো হো করে হেসে উঠল শশধর।

।। নয় ।।

শশধরের বাড়ির সামনে যে ঘরটা অনেকদিন থেকে বন্ধ হয়ে পড়েছিল তার মালিক যে রামসদয়বাবু একথা বাজারের অনেকে জানত। অনেকে ঘরটা ভাড়া নিয়ে দোকান করতে চেয়েছিল। কিন্তু রামসদয়বাবু মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাড়া চাওয়াতে কেউ আর অগ্রসর হয়নি।

ঘরটা খালিই পড়ে ছিল। হঠাৎ দেখা গেল সেই ঘরটার তালা খোলা হয়েছে, জন মজুররা সাফ করছে ঘরের ভিতরটা। চুনকামও করা হচ্ছে বাইরেটা। তারপর শোনা গেল রামসদয়বাবু নিজেই ওখানে কিসের একটা দোকান খুলবেন না কি। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল রামসদয় নিজেই সেখানে বসেছেন রাস্তার ধারে একটা চেয়ার পেতে। চেয়ে আছেন বীণার বাড়ির দিকে। বীণার সঙ্গে হঠাৎ একবার চোখাচোখি হয়ে যাওয়াতে বীণা জানলাটা বন্ধ করে দিলে। রোদে তবু বসে রইলেন তিনি। একটু পরে শশধর বাজার করে ফিরল। রামসদয়বাবুকে সে চিনত। নমস্কার কবল।

"এইটেই আপনার বাড়ি না কি—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"তাহলে তো ভালই হল"

শশধর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। কেন ভাল হল তা বুঝতে পাবল না সে।

"আপনিই তো আলুকাবলি তৈরি করে ফেরি করেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"আপনার আলুকাবলির খুব নাম। সকলেই প্রশংসা করে। আমিও এখানে একটা তেলেভাজার দোকান দেব ভাবছি। ভালো লোক খুঁজছি একজন। আপনি তো এই লাইনের লোক, ভিড়ে যান না আমার সঙ্গে"

শশধর একটু অবাক হয়ে গেল।

"আমি?"

"হ্যাঁ, কেন নয়। আপনিই চালান দোকানটা। টাকা যা লাগে আমি দেব। আমি তো এখানে থাকি না, আপনিই মালিক হয়ে থাকুন না"

শশধর মুচকি হেসে চুপ করে রইল।

"এখানে তেলেভাজার দোকান খুব ভালো চলবে। আপনিই চালান দোকানটা, সামনেই তো আপনার বাড়ি"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"খুব ভালো হবে। আপনি ফেরি করে রোজ কত রোজগার করেন"

"টাকা চারেকের বেশী হয় না"

"বেশ, আমি আপনাকে দৈনিক চার টাকা করে দেব—আপনিই এসে আমার দোকানটার ভার নিন। রাম-বাগানের মুনে ছোঁড়াটা এসব কাজে ওস্তাদ। তাকে বলেছি, কাজ করবে সে। আপনাকেই দোকানের মালিক করে দেব, আপনার হুকুম মতো সেই সব করবে। আপনার আলুকাবলি তৈরি করে কে, আপনি? খুব নাম—"

"আমি করি না, আমার বউ করে।"

"ও তাই না কি! তাহলে আপনার বউকেও নিয়ে আসুন না আমাদের কোম্পানির মধ্যে। তিনিই মালকাইন হোন। তাঁকেও মাইনে দেব। চলে আসুন আপনারা—"

শশধর বলল—"আমি পারব না। চাকরি করা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। বিষ্ণুদা আমাকে একটা দোকান করে দিতে চেয়েছিলেন আমি রাজী হইনি।"

"ফেরি করে আর কত রোজগার হবে—"

"আমার খুব বেশী রোজগারের দরকার নেই। আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসি, তাই ফেরি করি"

"বেশ, আপনি ফেরিই করুন আপনার বউ আমাদের দোকানের ভারটা নিন—আমাদের দোকানের জিনিসই ফেরি করুন আপনি"

"আচ্ছা, তাকে জিগ্যেস করি। সে একটা ইস্কুল করতে চাচ্ছে আমাদের বারান্দায়, বোধহয় রাজী হবে না"

শশধর ঢুকে পড়ল নিজের বাড়িতে।

ঢুকেই দেখা হয়ে গেল বীণার সঙ্গে।

"ও মিনসে কি বলছিল তোমাকে—"

"উনি এখানে একটা তেলেভাজার দোকান করবেন। আমাকে বলছিলেন আপনি এবং আপনার স্ত্রী এসে যদি দোকানটার ভার নেন –"

"আমাদের খেয়েদেয়ে তো আর কাজ নেই ওঁর দোকানের ভার নিতে যাব! সকাল থেকে ওইখানে বসে আছে মুখপোড়া, আর বার বার জানলার ভিতর দিয়ে আমাকে দেখবার চেষ্টা করছে। আমি শেষে জানলাটা বন্ধ করে দিলাম—"

"ও কে জান? রামসদয় বসাক। টাকার কুমীর একটি। আমরা যদি ওর দোকানের ভার নিতে রাজী হই আমাদের দু'জনকেই উনি ভালো মাইনে দেবেন বলছিলেন—"

"ঝাড়ু মারি ওর মাইনের মুখে। অতি পাজী লোক, ওকে আমল দিয়ো না মোটে—"

"পাজী লোক তুমি জানলে কি করে"

"চোখের দৃষ্টি থেকে—নাও"

বীণা তাক থেকে কি একটা এনে শশধরের মুখে ধরল।

"কি ওটা—"

"নারকোল কোরা। আজ ছাঁচি কুমড়ো রাঁধছি, তাই নারকোল কুরেছিলাম। একটু বেঁচে গিয়েছিল—"

"তুমি খেলে না—"

"আহা! ওইটুকু তো বেঁচেছিল, ওতে ভাগ বসালে কতটুকুই বা থাকত। বাজারটা রেখে তুমি তাড়াতাড়ি চান করে নাও। মা কালীর ওখানে পুজোটা দিয়ে এস। মানতি মাসীর জন্যে মানত করেছিলাম। মায়ের দয়ায় জ্বর আর আসেনি। তুমি ফিরে এলে তবে মাসীর জন্যে স্ট্যু আর ভাত নিয়ে যাব। চালগুলো বড্ড পুরোনো এনেছ তুমি, মানতি মাসী বলছিল মোটে স্বাদ নেই। আমিও আজ মুখে দিয়ে দেখলুম একেবারে বিস্বাদ"

"রোগীকে ওই চালই দিতে হয়—"

"তুমি স্নান ক'রে নাও"

শশধব নিকটবর্তী পুকুরে স্নান করে।

তেল মেখে সে যখন বেরুল তখনও রামসদয় বসে আছেন।

"গিন্নীকে জিগ্যেস করলেন?"

"সে রাজী হল না। আমাদের দ্বারা হবে না"

শশধর আব দাঁড়াল না হনহন করে এগিয়ে গেল।

রামসদয়বাবু একটু মুষড়ে পড়লেন। তিনি ভেবেছিলেন এই ফাঁদ পেতে তিনি চিড়িয়াটিকে ধরতে পারবেন। টাকা দিয়ে সবাইকে কেনা যায় এই তাঁব বদ্ধমূল ধারণা। তিনি ভাবতে লাগলেন কি উপায়ে টাকাটা খেলালে তাঁব মনস্কাম সিদ্ধ হবে।

তাঁর প্রধান ভৃত্য মাধব এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

বললে—"বাবু ও মুনেকে দিয়ে কাজ হবে না। সে পেঁয়াজি বেগুনি ভাজে বটে, কিন্তু তার মা বলছিল ছোঁড়া তাড়িখোর। প্রাযই তাড়ি খেয়ে প'ড়ে থাকে। তার মা-ই বললে ও ভদ্দরলোকেব কাছে চাকরি করতে পারবে না"

রামসদয় ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন ক্ষণকাল।

তারপর বললেন—"হুঁ। আচ্ছা তুমি যাও। দোকান একটা করতেই হবে এখানে। দেখি কি হয়—তুমি বিযুণেব কাছে গিয়েছিলে?"

"তিনি বললেন কাল গাড়ি দেবেন—"

'একটা রিকশা ডাক তাহলে। এই রোদে আব হাঁটতে পাবব না"

[illegible] রিকশা করে যাচ্ছিলেন। পথে একটি লোক খুব ঝুঁকে প্রণাম কবলেন [illegible]।

[illegible] ঠিক চিনতে পাবলাম না তো"

"[illegible] টোল ছিল আমার—"

[illegible] আপনাকে আমবা তো শিবোমণিমশাই বলেই জানতুম [illegible]"

[illegible] বললেন "এখন আর শিবোমণি নই। এখন আমবা বাস্তাব ধুলো। সবাই মাড়িয়ে যাচ্ছে—"

"সে কি কথা, সে কি কথা। আপনার টোল উঠে গেল কেন"

"কালের গতিকে। এখন আর সংস্কৃত পড়তে চায় না কেউ। তাছাড়া যে দশ বিঘে জমির আয়ের উপব নির্ভর করে টোল চালাতুম সে জমির আয়ের উপর নির্ভর করে টোল চালানো যায় না। আমার ছেলেটাকে ইংরেজী স্কুলে দিয়েছিলাম যদি দু'একটা পাসটাস করে চাকরিবাকরি পায়, কিন্তু ছেলে ম্যাট্রিকটা পর্যন্ত পাস করতে পারে নি। মস্তানি করে বেড়াচ্ছে। সবই পূর্বজন্মের কর্মফল। অনেকদিন পরে আপনাকে দেখলাম। ভালো আছেন তো—"

"যা যুগ পড়েছে এতে কারো ভালো থাকবার তো জো নেই।

ব্যবসাতে নানা ঝামেলা। ট্যাক্স তো বেড়েই চলেছে। তার উপর ঘেরাও, শ্রমিকদের দাবি,

মাবধোর, হাঙ্গাম হুজ্জুৎ—এসব লেগেই আছে। কোনক্রমে চালিয়ে যাচ্ছি। আমার ছেলে দুটোওতো বিদেশে। তারা যে বুড়ো বাপের পাশে এসে দাঁড়াবে তারও তো কোনও লক্ষণ দেখছি না, কোনক্রমে চালিয়ে যাচ্ছি—আপনার ছেলে কি করে—বয়স কত?"

"বয়স বছর চব্বিশ। করে না কিছুই। ফুটবল খেলে, ক্রিকেট খেলে, এখানকার লাইব্রেরির কিসে উন্নতি হয় তার জন্যে চেষ্টা করে— হাতেলেখা কাগজের এডিটর হয়েছে, তাতে কবিতা লেখে!"

"লেখক না কি। তাহলে তো অনেক গুণ। কবিতা লেখে? বলেন কি। সে তো ভারী শক্ত কাজ মশাই। কি রকম কবিতা—"

"আমি তো প'ড়ে মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পা'রি না"

"আপনার কথা শুনে একটা মতলব আমার মাথায় আসছে। আপনার ছেলের নাম কি—"

"বিকাশ—"

"বাঃ বেশ ভালো নাম, আধুনিক নাম। বিকাশকে পাঠিয়ে দেবেন আমার কাছে দেখি যদি কিছু করতে পারি। এখুনি পাঠিয়ে দিন—"

"সে কি বাড়িতে থাকে যে এখুনি গিয়ে দেখা পাবি। কখন আসে, কখন যায় তা টেরও পাই না। আমাকে এড়িয়ে চলে, আমি যেন ওর শত্রু। তবে এখন খাওয়ার সময় হয়তো গিয়ে দেখা পেতেও পারি। কি মতলব আপনার মাথায় এসেছে বলুন তো—বলব তাহলে ওকে সেটা—"

"বাজারে আমার একটা ঘর বহুদিন থেকে খালি পড়ে আছে। কোনও ভাড়াটে জোটে না। তাই ভেবেছি নিজেই ওখানে ছোটখাটো একটা দোকান করব"

"কিসের দোকান—"

"প্রথমে ভেবেছিলাম তেলেভাজার দোকান করব একটা। কিন্তু তেলেভাজাব দোকানের ভার নিতে পারে এরকম লোক তো দেখছি না। তাই ভাবছি একটা মনোহারির দোকানই খুলব ওখানে। এখানকার কোনও ছোকরা যদি দোকানটার ভার নেয় আমি রাজী আছি। আপনার ছেলে যখন কবি তখন মনে হয় মনোহারি দোকানের নাম শুনলে রাজী হবে। দোকানে যখন খদ্দের থাকবে না তখন কবিতাও লিখতে পারবে। আসল কথা একটি সৎ ভদ্র বংশের ছেলে চাই আমি, যে চুরিচামারি করবে না—"

"আচ্ছা, আমি বলে দেখব ওকে। যায় তবে তো—"

"জোর করে পাঠিয়ে দিন। আমি কথাবার্তা বলে বাগ নামিয়ে নেব। জোর করে জুতে না দিলে কি গরুতে জোয়াল টানে। জুতে দিন—"

"আচ্ছা। নমস্কার—"

"নমস্কার, নমস্কার"

।। দশ ।।

রামসদয়বাবুর পুকুরে ডাক্তারবাবু মহাসমারোহে মাছ ধরতে বসেছিলেন। বাড়ি থেকে তাঁর জন্যে একটি ইজি চেয়ার এনে পাতা হয়েছিল। আর সেই বৃহৎ ছাতাটিও গাড়া হয়েছিল

চেয়ারের পিছনে। এ ছাতাটি তিনি অনেকদিন আগে কিনেছিলেন একটা 'সেল' থেকে। যখন বাইরে বেরোন এটি নিয়ে যান। মাঠে পুঁতে দিলে অনেকখানি ছায়া হয়। ডাক্তারবাবু রোদ সহ্য করতে পারেন না। একটি সিগার ধরিয়ে প্রকাণ্ড ছিপটি ফেলে ফাৎনার দিকে চেয়ে বসেছিলেন তিনি। অনুমান পাশেরই আমগাছতলায় একটা কম্বল বিছিয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল। প্রথমে এসে সে ডাক্তারবাবুর চেয়ারের পাশেই বসেছিল ফাৎনাটার দিকে চেয়ে। কিন্তু ডাক্তারবাবু একটু পরেই লক্ষ্য করলেন অনুমান ঢুলছে!

"কি হে ঢুলছ কেন"

"দুপুরে ঘুমোনো তো অভ্যাস অনেকদিন থেকে। তাই ঢুল আসছে—"

"ঘুমিয়ে নাও। গাড়িতে একটা রাগ আর কুশন আছে, ওই গাছতলায় পেতে শুয়ে পড়। শরীরকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি। শুয়ে পড়—"

অনুমান সেই থেকে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। দুপুরে মাছ মাংস প্রচুব খাওয়া হয়েছে। ডাক্তারবাবু ভাত খাননি, চারখানা রুটি খেয়েছেন কেবল। মালীর ঘরে ক্ষেন্তির মা আর নটবর লুচি আর আলুর দম নিয়ে অপেক্ষা করছে। সঙ্গে চায়েব সরঞ্জামও আছে। এমন কি স্টোভ পর্যন্ত। ডাক্তারবাবু হুকুম করলেই চায়ের জল চড়িয়ে দেবে। ডাক্তাববাবু হঠাৎ হাত থেকে সিগাবটা ফেলে দিলেন। ফাৎনাটা ডুবেছে। দু'হাত দিয়ে খ্যাঁচকা মারলেন একটা। কিছু উঠল না। জলের ভিতর একটা প্রবল আলোড়ন দেখা গেল শুধু। বুঝলেন একটা বড় মাছ টোপ গিলেছে, বঁড়শিটাও তাব গলায় বিঁধেছে সম্ভবতঃ। হুইল থেকে সুতো ছাড়তে লাগলেন, মাছটাকে খেলানো দরকার। অনুমানেব দিকে চাইলেন একবার। দেখলেন তার নাক ডাকছে। নটবর মালীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিল তাকে ইশারা করে ডাকলেন। নটবরও একজন অভিজ্ঞ মাছ-শিকারী, সে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে অনেক জায়গায় মাছ ধরতে গেছে, অনেক অভিজ্ঞতা আছে তার। নটবর আসতেই তিনি বললেন—"ওরে মনে হচ্ছে একটা বড় মাছ টোপ গিলেছে। দেখ তো—"

ছিপটা তিনি নটবরের হাতে দিলেন।

নটবর ছিপটা হাতে নিয়ে একটু টানাটানি করে বলল—"এ যে বেশ বড় মাছ মনে হচ্ছে বাবু। খেলাতে হবে।"

"তুমি খেলাও তাহলে। আমি দুটান চুরুট খেয়ে নি ততক্ষণ।"

নটবর চেয়ারের সামনে বসে পড়ল। যে চুরুটটা ডাক্তারবাবু ফেলে দিয়েছিলেন সেইটে তুলেই আবার ধরালেন সেটা। পা দুলিয়ে দুলিয়ে টান দিতে লাগলেন সেটাতে। একটু পরেই বাগানের মালীটা সেলাম করে এসে দাঁড়াল।

"তুমি বাবুর কাছে কতদিন আছ মালী।"

"ছ মাস"

"তোমার বউ ছেলেমেয়ে কোথায়—?"

"সব রোজগার করতে বেরিয়ে গেছে হুজুর। একার রোজগারে সংসার চলে না। ছোট ছেলেটাকে পর্যন্ত কাজ করতে হয়। সে মজুমদার বাবুদের গরু চরায়—"

"ক'টি ছেলেমেয়ে তোমার—"

"আমার মেয়ে মারা গেছে হুজুর। তার একটি ছেলে আমার কাছেই মানুষ হচ্ছে! আর মেয়ে নেই। বাকি তিনটি ছেলে।"

"বাঃ। নটবর শুনে রাখ। ওরা কাজ থেকে ফিরবে কখন—"

"সন্ধ্যের আগে কেউ ফিরবে না। আমার নাতিটাও ওর বড় মামার সঙ্গে চলে যায়। আমার বড় ছেলে মাঠে জন খাটে, তার সঙ্গেই থাকে ও। মামাকে খুব ভালবাসে ছেলেটা"

"বাঃ, বাঃ"—অকারণ পুলকে ডাক্তারবাবু পুলকিত হয়ে উঠলেন। পকেট থেকে মনিব্যাগ বার করে পা দোলালেন খানিকক্ষণ। তারপর জিগ্যেস করলেন—"তোমার নাতি কি ভালবাসে"

"সব ভালবাসে হুজুর। মুড়ি, বাতাসা, সন্দেশ, লুচি, রুটি, ফুলুরি, আচার—"

"আমি খাবারের কথা বলছি না। কি খেলনা ভালবাসে তোমার নাতি— "

"পুতুলটুতুল মেয়েলী খেলনা ওর পছন্দ নয়। একটা তিনচাকাওলা সাইকেল কিনতে চেয়েছিল একবার। দব করে দেখলাম দশ টাকার কমে হয় না। অত টাকা কোথায় পাব হুজুর বললুম—পরে কিনে দেব"

ডাক্তারবাবু মনিব্যাগ থেকে একটি দশ টাকাব নোট বার কবলেন।

"এই নাও। কিনে দিও—"

মালী এটা প্রত্যাশা কবে নি।

"না, না বাবু আপনি দিচ্ছেন কেন"

"দিচ্ছি, কারণ ও শুধু তোমার নাতি নয়, আমারও নাতি!"

মালী টাকাটা হাতে কবে দাঁড়িয়ে রইল তবু।

"ইতস্তত করছ কেন, তুমি যে আপনাব লোক। নাতিকে সাইকেল কিনে দিও"

মালী বললে—'আপনার বাড়িতে কোনও ছেলেপিলে দেখিনি তো বাবু। তারা কি সব বিদেশে থাকে"

হা হা করে হেসে উঠলেন ডাক্তারবাবু।

"আমার আপনার লোক নেই। তোমরাই আমার আপনার লোক"

মালীটা হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল।

"ওই বাবু আসছেন। চেয়ার নিয়ে আসি একটা"

ছুটে চলে গেল সে। ডাক্তারবাবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন রামসদয় আসছেন।

"নমস্কার। হল কিছু?"

"একটা কি যেন গিলেছে টোপটা। মাছ কি না জানি না। দিঘড়ায় একবার একটা কাছিম আমাকে খুব জ্বালিয়েছিল। অনেকক্ষণ পরে যখন টেনে তুললাম দেখি মাছ নয়, প্রকাণ্ড একটা কাছিম। কাছিমের মাংসও অবশ্য উৎকৃষ্ট মাংস। নটবর রেঁধেও ছিল ভালো—"

মালী চেয়ার নিয়ে এল।

রামসদয় বসলেন।

তারপর বললেন—"আপনার চাকরই বুঝি মাছ ধরছে। আপনি দর্শকমাত্র—"

"না, আমিই এতক্ষণ ছিপটা ধরে ছিলাম। ফাৎনাটা যখন ডুবল তখন টেনে মনে হল বড় মাছ, অনেকক্ষণ খেলাতে হবে। তাই নটবরকে ডেকে বললাম তুই ছিপটা ধর, আমি ততক্ষণ সিগারে দু'টান দিয়ে নিই। নটবর সুতো ছেড়েছিস?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। অনেক সুতো ছেড়েছি। এইবার আস্তে আস্তে গোটাতে হবে"

"দে আমাকে দে—"

ডাক্তারবাবু ছিপটি হাতে নিয়ে বসলেন আবার। হুইল দিয়ে সুতো গোটাতে লাগলেন।

রামসদয় একটু ইতস্তত করে বললেন—"আপনার জন্যে সামান্য জলখাবারের আয়োজন করেছি"

"বাঃ, আমিও কিছু খাবার এনেছি সঙ্গে। আপনাকেও খেতে হবে। দাঁড়ান এ ব্যাপাবটা আগে মিটে যাক, তারপর খাওয়াদাওয়া—"

রামসদয় বুঝলেন যে কথা বলবার জন্যে তিনি ডাক্তারবাবুকে মাছ ধববাব নিমন্ত্রণ করেছিলেন সে কথা এখানে বলা যাবে না।

"আপনি তাহলে বসুন। আমি চট্ করে ঘুরে আসছি এখুনি। বিষ্ণুকে একবাব তাগাদা দিতে হবে। সে আমার মোটরটা এখনও দেয় নি"

"নিখুঁত না হলে তো ও দেবে না। ওকে তাড়া দেবেন না, তাড়া দিলে ওব মেজাজ বিগড়ে যায়, কাজ ভালো হয় না। ওকে আপনমনে কবতে দিন"

"আজই ওব দেবাব কথা। দেখি কতদূর কি করলে—"

রামসদয়বাবু চলে গেলেন।

ঘণ্টা দুই পরে যখন ফিরলেন তখন ডাক্তাববাবু মাছটা তুলে ফেলেছেন। প্রায় পাঁচসেবি একটা রুই মাছ।

হর্ষোৎফুল্ল লোচনে রামসদয়ের দিকে চেয়ে বললেন— "সাক্সেস্‌ফুল। এইবার একটা বঁটি যোগাড় করুন। আপনাকে খানিকটা দিয়ে যাই—"

"না, না আমাকে দিতে হবে না। আপনিই গোটা মাছটা নিয়ে যান"

"আমার বাড়িতে তো খাবার লোক নেই। তাছাড়া মাছ ধবে কখনও আমি একা খেতে পারি না। পাঁচজনকে না দিয়ে তৃপ্তি হয় না। আপনার মালীকে কিছু দিয়ে যাব। আপনিও খানিকটা নিন"

"আমি নিয়ে কি করব। আমার কি রাঁধবার লোক আছে। যে ক'দিন এখানে থাকি হোটেলে খাই—"

"বেশ, তাহলে রাত্রে আমার ওখানে খাবেন আজ—"

অনুমানের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল সে বিস্ফারিত চোখে মাছটার দিকে চেয়েছিল।

"অনুমান তুমি একটা বঁটি যোগাড় করে মাছটাকে কুটিয়ে ফেল দিকি"

মালীটা দূরে দাঁড়িয়েছিল। সে এগিয়ে এসে বললে—"আমি বঁটির ব্যবস্থা করছি আসুন—"

অনুমান তার পিছু পিছু গেল।

ডাক্তারবাবু বললেন—"নটবর এইবার চায়ের ব্যবস্থা কর। আর আমাদের খাবারগুলো নিয়ে এস। মালীর জন্যে জন ছয়েকের মতো খাবার রেখে দাও। আমাকে খান দুইয়ের বেশী লুচি দিও না। বেশী খেতে পারব না এখন"

রামসদয়বাবু বললেন—"আমিও কিছু খাবার আনিয়েছি আপনার জন্যে—চলুন বৈঠকখানায়"

"ও সে কথা ভুলেই গেছি। নটবর রামসদয়বাবুর জন্যও কিছু খাবার নিয়ে এস। একটু বেশী করেই এনো"

"আমার জন্যে আবার কেন"

"আমিই বা তাহলে আপনার খাবার খাব কেন। চলুন না মশাই একসঙ্গে আনন্দ করা যাক। বাগড়া দিচ্ছেন কেন। চলুন—"

উভয়ে বাগানবাড়ির বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হলেন।

চা খাওয়ার পব আসল কথাটি পাড়লেন রামসদয়।

বললেন—"আপনি প্রবীণ ডাক্তার। আপনার কাছে একটা পরামর্শ চাই। আমার শবীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না, কি করি বলুন তো—"

"কি হয়েছে—"

"দুর্বলতা বোধ করি। কলকাতার কয়েকজন ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম তাঁরা এই সব ওষুধ দিয়েছেন"

একতাড়া প্রেসক্রিপশন বার করলেন তিনি।

প্রেসক্রিপশনগুলো উলটে উলটে দেখতে লাগলেন ডাক্তারবাবু।

"ওরে বাবা, সবই যে কামোদ্দীপক ওষুধ দেখছি—"

"হ্যাঁ, একটু দুর্বলতা হয়েছে আমার। কি করি বলুন তো। কোনও ওষুধেই তো কোন উপকার পাচ্ছি না"

"একটা সত্যি কথা শুনবেন?"

"কি বলুন—"

"যে যৌবন চলে গেছে সে আর কিছুতেই ফিরবে না। ওষুধ খাওয়ার কোনও দরকার নেই। পুষ্টিকর খাবার খান"

"তা তো খাই। সের খানেক দুধ খাই। চারটে কাঁচা ডিম খাই। কলকতায় যখন থাকি তখন রোজ একটা করে ফাউল খাই। মাছও খাই দু'বেলা—"

"তবু কিছু হচ্ছে না?"

"আজ্ঞে না"

"তাহলে আর হবে না! আচ্ছা, উঠি এবার আমি। রাত্রে যাবেন আমার ওখানে—"

"এখুনি উঠছেন কেন, আর একটু বসুন না"

"না আর বসব না, অনেক জায়গায় মাছ বিলোতে হবে। আজ চলি—"

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন।

ক্ষুব্ধ হয়ে বসে রইলেন রামসদয়।

।। এগারো ।।

রামসদয়বাবু সত্যিই কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর বাজারের সেই ঘরটিতে মনিহারি দোকান খুললেন একটি। বিকাশই সে দোকানের কর্মচারী নিযুক্ত হল। কিন্তু যে ব্যাপারটি বিশেষ করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেটি হচ্ছে যে রামসদয়বাবু নিজেও সে দোকানের একধারে একটি চেয়ার পেতে রোজ বসতে লাগলেন। বিষুণের কথায় রবির বাবাকেও নিযুক্ত করেছিলেন তিনি মাসিক পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিয়ে। তার উপরেই তিনি এখানকার গদির কাজকর্ম দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। বিপিনবাবুর কর্ম-পদ্ধতি তাঁর খুব ভালো লেগেছিল। কাজে বহাল হয়েই প্রথমে তিনি গুদামের সমস্ত মাল নিজেব সামনে দাঁড়িয়ে ওজন কবিয়ে একটি খাতায লিখে রেখেছিলেন, তাবপর গুদামের চাবিটি নিজেব কাছে রেখে বামসদয়কে বলেছিলেন—"এটা আমাব জিম্মায থাকাই ভালো, না, আপনি বাখবেন?" বামসদয বিপিনের কাছেই চাবিটা দিয়ে বলেছিলেন, "আমি তো এখানে সব সময়ে থাকব না। এ গদির ভাব আপনার উপব আপনাব কাছেই সব থাকা ভালো। দু'দিনেব ভিতবই হিসাবপত্রেব খাতা সব ঠিক ক'রে ফেলেছেন বিপিনবাবু। সব চিঠিপত্রেবও জবাব দিয়ে দিয়েছেন। এখানকাব গদি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে বামসদয এখন নিজেব 'হবি' (hobby) চর্চায মনোযোগ দিয়েছেন। তাঁব 'হবি' কমবযসী সুন্দবী মেয়ে দেখলে তাব পিছু পিছু ঘোবা এবং যতক্ষণ সম্ভব ততক্ষণ তাকে দু'চোখ ভবে নিবীক্ষণ কবা। এর বেশী আব কিছু করবাব সামর্থ্য নেই তাঁর। ডাক্তাববাবু সেদিন যে কথাটা বললেন—"যে যৌবন চলে গেছে সে আব ফিববে না"—একথা কলকাতাব অনেক ডাক্তারও বলেছে তাঁকে। কিন্তু তিনি দমেন নি। কবিবাজ এবং হকিমদের শরণাপন্ন হয়েছেন। তাঁরা নানা রকম উত্তেজক ওষুধও দিয়েছেন তাঁকে। কিন্তু, হায, সে সব ওষুধেও ফল হয় নি কোনও। শেষকালে তিনি বুঝছেন সত্যিই চিবতবে সামর্থ্য হারিয়েছেন তিনি। কিন্তু দেখতে তো দোষ নেই? দেখেও যে একটা সুখ আছে সে সুখ থেকে কেন বঞ্চিত হবেন তিনি যতক্ষণ দেখবার শক্তি আছে। যদিও প্রায হাজার খানেক টাকা খরচ হয়ে গেল মনিহারি দোকানটা করতে, বিকাশকেও যদিও মাইনে গুণতে হবে কিছুদিন, (বিকাশ যে মনিহারি দোকানটা চালাতে পারবে এ বিশ্বাস তাঁর নেই) তবু তিনি বীণার বাড়ির সামনে বসবার যে একটা সাময়িক আস্তানা করতে পেরেছেন এতেই মহা খুশী তিনি। দোকানে একটি ইজ্‌জি চেয়াব পেতেছেন, সেখানে সকাল বিকেল এসে বসেন আব বীণার জানলার দিকে চেয়ে থাকেন নির্নিমেষে। বীণা কিন্তু জানলা খোলে না। বাবান্দাতেও আসে না। ওই বারান্দাতে সে ছোট ছেলেমেয়েদের একটা স্কুল করবে ভেবেছিল, কিন্তু রামসদয়বাবু বাড়ির সামনে দোকান করাতে সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে আপাতত। বীণাকে বাড়ির সামনে এখন কদাচিৎ দেখা যায়। সে খিড়কি দুয়ার দিয়ে বাইরে বেরোয। তাদের খিড়কি দুয়ার খুললেই একটা সরু গলি। সেই গলিটা অনেক এঁকেবেঁকে অনেক দূবে গিয়ে বড় রাস্তায় পড়েছে। এই গলি দিয়েই আজকাল বীণা যাতায়াত করে বাইরে কোথাও যাওয়ার দরকার হলে। মানতি মাসীর ওখানেই রোজ যেতে হয় তাকে। যদিও তাঁর জ্বর

ছেড়েছে, কিন্তু নিজে রেঁধে খাওয়ার মতো শক্তি পাননি এখনও। বীণাই রোজ খাবার দিয়ে আসে তাঁকে টিফিন কেরিয়ারে। রামসদয় একদিন তার বাড়িতেই এসে হাজির হয়েছিলেন এ সত্ত্বেও। বীণা তখন আলুকাবলি রান্না করছিল। শশধর বাড়িতে ছিল না। বাইরের কপাটটা ভেজানো ছিল। কপাটটা ঠেলে ঢুকে পড়লেন রামসদয় একদিন দন্ত-বিকশিত করে।

"কি গো ঠাকরেণ, কেমন আছ তোমরা। তোমাদের বাড়ির কাছে এলুম, তবু একদিনও দেখা পাই না। ভালো আছ তো সব—"

বীণা মাথায় কাপড় টেনে উঠে দাঁড়াল। হাতে খুনতি। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আমরা ভাল আছি। কি চাই আপনার?"

দন্ত আরও বিকশিত করে রামসদয় বললেন, "কিছুই চাই না। এমনি খবর নিতে এলুম। কি বাঁধছ, খাসা গন্ধ বেরিয়েছে তো"

"আলুকাবলি চড়িয়েছি। আপনি এখন যান, ব্যস্ত আছি আমি।"

"আলুকাবলি আমাকেও একটু দিও'

"উনি যখন ফেরি করতে বেরোন তখন ওঁব কাছ থেকেই নেবেন"

"বেশ বেশ তাই নেব। রোজ আমার চাই কিন্তু। অগ্রিম দাম কিছু দিয়ে যাচ্ছি—"

পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে আর একটু হেসে বললেন—"এইটে বাখ—"

"দাম ওকেই দেবেন"

বীণা উনুন থেকে আলুকাবলিব ভাবী বড় কড়াইটা দুম করে নাবিয়ে পাশেব ঘবে চলে গেল। আব ফিরল না। রামসদয় কযেক মিনিট দাঁড়িযে বইলেন তাবপব বেবিয়ে গেলেন।

বীণাদের পাশের বাড়িতে থাকেন চণ্ডী সরকার। বীণা তাঁদের বাড়িতেই গিযেছিল তাঁকে ডেকে আনতে। কিন্তু গিয়ে দেখল তিনি বাড়িতে নেই। তাঁর মেযে টুনটুন বলল—"বাবা মাঠে গেছেন। ফিবতে দেরি হবে। কি দবকার তোমার বল না।" টুনটুনের কাছে এসব কথা বলা ঠিক হবে না মনে হল বীণাব। চণ্ডীবাবুর স্ত্রী রাঁধছিলেন। তিনি বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে।

"বীণা নাকি। এ সময় হঠাৎ—"

"না এমনি। কাকাবাবুব সঙ্গে একটু দরকাব ছিল। পরে আসব"

বীণা বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। গলিটা নির্জন। নির্জন গলি দিয়েই হাঁটতে লাগল সে। শশধর কোথায় গেছে, কখন ফিববে তার ঠিক নেই। একা বাড়িতে ফিরতে ভরসা হল না বীণার। সে হাঁটতেই লাগল। হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ল তার বাবার কথা, মায়ের কথা, কাকার কথা তার দূর সম্পর্কের এক পিসিমার কথা, শশধরের জন্য যে জীবন সে ছেড়ে এসেছে, যে জীবনে এখন আর কোনমতে ফেরবার উপায় নেই, সেই জীবনটাই হঠাৎ যেন হুড়মুড় করে এসে হাজির হল সামনে। শশধরকে গোপনে প্রশয় দিয়েছিল বলে তার বাবা একটা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মেরে ছিলেন তার মাথায়। সে মরেও যেতে পারত, কিন্তু মরে নি। হাসপাতালে দিন দুই অজ্ঞান হয়ে ছিল খালি। মনে পড়ল ওই মারের জন্যই শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়েছিল তার। বিষুণবাবু এস.পি-র সাহায্য নিয়ে তার বাবার মত করিয়েছিলেন। মাথার

কাটা দাগটার উপর সে একবার হাত বুলিয়ে দেখল। মনে পড়ল এই দাগটার জন্য বিষুণবাবু ওষুধ কিনে দিয়েছিলেন। সে ওষুধ যেমনকার তেমনি আছে। হঠাৎ বীণার মনে হল বিষুণবাবু তার হিতৈষী, তাঁকে গিয়ে সব ব্যাপারটা খুলে বললে কেমন হয়। কিন্তু কি বলবে তাঁকে গিয়ে। কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল। অথচ এ লোকটার হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় কি। একেবারে বাড়ির সামনে এসে বসেছে, আজ ঘরের ভিতর এসে ঢুকেছিল। হঠাৎ মনে হল ডাক্তারবাবুর কাছে যাব? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, না এসব কথা তাঁকে গিয়ে বলতে পারব না। কিছু দূর হাঁটবার পর হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সমাধান হয়ে গেল সমস্যাটার।

"আদাব, আদাব, বহুমায়ীজি কাঁহা যাতি হো—"

সেই কাবুলিওলা। অনেকদিন পরে দেশ থেকে ফিরেছে। চেহারাটা আরও বলিষ্ঠ হয়েছে। হাতে প্রকাণ্ড লাঠি। মুখে প্রশান্ত নির্ভয় হাসি। বীণার সঙ্গে আধা-হিন্দী আধ-বাংলা ভাষায় তার যে কথা হল সরল বাংলা অনুবাদ করলে তা এই দাঁড়ায়।

"আগা সাহেব, বড় বিপদে পড়ে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছি ভয়ে"

"ভয়! কিসের ভয়, কাকে ভয়? কি হয়েছে খুলেই বল না"

"আমার বাড়ির সামনে রামসদয়বাবু দোকান খুলেছে একটা। অতি পাজী লোক, সব সময় আমার জানলার দিকে চেয়ে থাকে। মনে হয় যেন গিলে খাবে। আমার স্বামী এখন বাড়ি নেই, সে একটু আগে আমার বাড়িতে ঢুকেছিল আমাকে দশটা টাকা দিতে গিয়েছিল, আমি পালিয়ে এসেছি—"

নাসারন্ধ্র স্ফীত হল কাবুলিওলার, আগুন ছুটে বেরুল চোখের দৃষ্টি থেকে। বললে—"আমার সঙ্গে চলো। সব ঠিক করে দিচ্ছি। ভয় পেয়ে পালিয়ে এলে কেন, জুতো মেরে তাড়িয়ে দিলেই পারতে হারামীকে।"

বাড়ির কাছাকাছি এসে বীণা বললে—"আমাদের বাড়ির সামনে ওই দোকানটা। আমি ভিতরে যাচ্ছি"

খিড়কি দরজা দিয়ে বীণা ভিতরে চলে গেল।

কাবুলিওলা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দরাজ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "রামসোদয়বাবু কৌন হ্যয়—"

বিকাশ একটা টুলে বসেছিল। পাশেই বসেছিলেন রামসদয়বাবু। বিকাশ রামসদয়বাবুকে দেখিয়ে দিতেই কাবুলি গর্জন করে উঠল—"আপ মেরা বেটীকা ঘরমে বিনা এত্তেলা দেকে কাহে ঘুসে থে"

"তোমার বেটীর ঘরে!—"

কাবুলি বীণার ঘরটা দেখিয়ে—"হাঁ—ই হামারা বেটীকা ঘর হ্যয়, বীণা হামারা বেটী হ্যয়, হামারা বহুমায়ী হ্যয়। আপ কাহে উহা গয়ে থে—"

অপ্রস্তুত মুখে নির্বাক হয়ে বসে রইলেন রামসদয়।

কাবুলি মাটিতে লাঠি ঠুকে বলল—"অয়ন্দা ফির এইসে কিয়া তো ইয়ে ডাণ্ডা দেকে

তোমহারা শর্ ফাড় দেঙ্গে। সমঝা? বহুৎ রুপিয়া হ্যয় তুমহারা, না? আপনা রুপিয়া আপনা জেবমে রাখখো। হামরা বেটীকো মৎ লালচাও। ফির কুছ্ কিয়া তো হাড্ডি চুরচুর কর দেঙ্গে।"

কাবুলি চোখ পাকিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর চলে গেল। রামসদয় নীরব।

কাবুলিওলা যখন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল তখন রামসদয়বাবুর বাকস্ফূর্তি হল।

"এ তো ভয়ানক লোক দেখছি। থানায় একটা খবর দিয়ে আসি। আজকাল দারোগা কে—"

বিকাশ বললে—"ঠিক জানি না। আপনি কি বীণাদের বাড়ি গিয়েছিলেন না কি?"

"হ্যাঁ। বলতে গিয়েছিলাম আমাকেও রোজ যেন আলুকাবলি দেয়। তাই নিয়ে এত কাণ্ড। মজা দেখাচ্ছি ব্যাটা কাবলেকে—"

"কখন গিয়েছিলেন আপনি। আমি আসবার আগে?"

"হ্যাঁ। আমি থানায় চললুম।"

রামসদয়বাবু একটা রিকশা ডেকে চলে গেলেন।

বিকাশ খানিকক্ষণ বসে রইল। তারপর হঠাৎ সে শশধরকে দেখতে পেল। সে এতক্ষণে বাড়ি ঢুকছে।

"শশধর কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

"আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম জগন্নাথকে দেখতে। ডাক্তাররা বলছেন হাতটা না কি কেটে ফেলতে হবে। যদি সত্যিই কেটে দেয় তাহলে কি হবে বল দেখি—"

শশধরের মুখে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে এল।

"তোমার বাড়িতে এদিকে যে হুলুস্থূল কাণ্ড। এক আগাসায়েব এসে বাবুকে শাসিয়ে গেল।"

"কি হয়েছে?"

"আমিও ঠিক জানি না।"

শশধরের সাড়া পেয়ে কপাটটা খুলে দিলে বীণা। বিকাশও তার দোকান থেকে নেমে এল। খোলা কপাটের সামনে দাঁড়িয়ে বলল—"আসতে পারি?"

"আসুন না। আপনি তো বন্ধু। ও মুখপোড়ার কাছে জুটেছেন কেন?"

বিকাশ ঘরের ভিতর ঢুকতেই বীণা বাইরের কপাটটা বন্ধ করে দিল।

শশধর বললে—"কি হয়েছিল বল দেখি?"

"তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

"হাসপাতালে গিয়েছিলাম। শুনলাম জগন্নাথের হাতটা কেটে দেবে। তাই খবরটা নিতে গিয়েছিলাম। ভারী মুশকিলে পড়েছে বেচারা।"

"আমিও কম মুশকিলে পড়িনি।"

"কি রকম?"

বীণা তখন সব খুলে বলল।

"আমি তো ভয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। কারো দেখা না পেয়ে হনহন করে যাচ্ছিলাম বিষ্ণুবাবুর কাছে। এমন সময় আগা সাহেবের দেখা পেয়ে গেলাম রাস্তায়।"

বিকাশ এতক্ষণ একটি কথা বলেনি।

সব শুনে হঠাৎ বলে উঠল—"আমি ঠিক করে ফেললাম"

"কি ঠিক করলে—"

"এ দোকানে আর চাকরি করব না"

বেরিয়ে গেল তারপর। দোকানে তালা লাগিয়ে বাড়ি চলে গেল। বাড়িতে গিয়ে দেখা হ'ল দামোদরের সঙ্গে। তিনি খাওয়াদাওয়া করে উপনিষদ পড়ছিলেন।

"এখনই বাড়ি চলে এলি যে এত সকাল সকাল"

"আমি ওখানে আর চাকরি করব না"

"কেন"

"ও লোকটা লম্পট। শশধরের বউ বীণাকে বিরক্ত করবার জন্যে ওর বাড়ির সামনে দোকান খুলেছে। আমি ওর মধ্যে থাকব না। আপনি দোকানের চাবিটা ফিরিয়ে দেবেন ওঁকে।

তালার চাবিটা সে দামোদরের সামনে ফেলে দিয়ে ভিতরে চলে গেল। টেনিস র‍্যাকেট হাতে করে বেরিয়ে এল একটু পরে।

"আমি ক্লাবে চললাম—"

র‍্যাকেট ঘোরাতে ঘোরাতে চলে গেল। দামোদরের মনে পড়ল এই দামী র‍্যাকেটটি তার ছোটমাসী উপহার দিয়েছিল তার জন্মদিনে। দামোদর সামনের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর মনে ক্ষীণ আশা জেগেছিল মুদীর ধারটা এবার শোধ করতে পারবেন হয়তো। সে আশা মরীচিকার মত মিলিয়ে গেল। আবার উপনিষদে মন বসাতে চেষ্টা কবলেন। ডাক্তারবাবু উপনিষদ শুনতে চেয়েছেন তাঁর কাছে। ডাক্তারবাবুর কাছে বহুভাবে ঋণী তিনি। বরাবর তাঁর বাড়িতে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেছেন। কখনও কিছু চাননি তিনি প্রতিদানে। কাল নিজমুখে বললেন—"উপনিষদের নাম অনেক শুনেছি, কিন্তু ওর ভিতর কি আছে তা জানি না। আপনারা সাহায্য না করলে তা জানাও যাবে না। কিন্তু আপনাকে বলতে সাহস পাই না—"

দামোদর বলেছিলেন—"সে কি কথা। কালই আসব আমি—" সেই জন্যেই উপনিষদ খুলে বসেছিলেন আজ। কিন্তু তাঁর বারবার মনে হতে লাগল, বিকাশ এ কি করলে! তাঁর মনে হল যে ব্রহ্মকে চোখ দিয়ে দেখা যায় না, কান দিয়ে শোনা যায় না, সেই ব্রহ্ম কি এই বিকাশের মধ্যেও বিকশিত?

সেদিন সন্ধ্যার সময় তিনি ডাক্তারবাবুকে উপনিষদ শোনাতে গিয়ে কিন্তু হতাশ হলেন। তিনি যখন উচ্ছ্বাস-ভরে কেনোপনিষৎ পাঠ করছিলেন তখন ডাক্তারবাবু শুয়ে ছিলেন একটা ইজিচেয়ারে। হঠাৎ দামোদর লক্ষ্য করলেন তাঁর নাক ডাকছে। উপনিষদ পাঠ বন্ধ রেখে সবিস্ময়ে চাইলেন তিনি ডাক্তারবাবুর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলেন ডাক্তারবাবু।

"ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। না? তবে কিছু কিছু শুনেছি। 'অন্তঃকরণের সাহায্যে যাঁকে লোকে চিন্তা করতে পারে না, কিন্তু যাঁর দ্বারা অন্তকরণ সমুদ্ভাসিত হয়, —চমৎকার। আজ থাক। কাল আবার আসবেন।"

দামোদর একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই উপনিষদ পাঠ বন্ধ করলেন।

ডাক্তারবাবু একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, "পণ্ডিতমশাই, আপনার কাছে একটা

আবেদন আছে আমার। আমি আমাদের শাস্ত্রেব ভালো ভালো তত্ত্বগুলো শুনতে চাই। শোনা উচিত মনে করি। কিন্তু নিরেট তো, গল্প-উপন্যাস আর ডাক্তারি প্রবন্ধ ছাড়া অন্য কিছু মাথায় ঢোকে না। শাস্ত্রকথা শুনলে ঘুম পায়। তবু কিন্তু শুনব। রোজ আসতে হবে আপনাকে। আর এজন্যে মাসে মাসে কিছু প্রণামীও আপনাকে নিতে হবে। আপনি না বলতে পারবেন না।''

এই বলে ডাক্তারবাবু একটি একশ' টাকার নোট বার করে দামোদরের পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলেন।

নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন দামোদর।

দামোদরের যে অতি কষ্টে সংসার চলছে এ খবর শুনে থেকেই ডাক্তারবাবু ভাবছিলেন কি করে পণ্ডিতমশাইকে সাহায্য করা যায়। এমনি টাকা দিলে তিনি নেবেন না, তাই এই কৌশল করতে হয়েছিল। এ কৌশল কিন্তু ব্যর্থ হয়ে গেল।

দামোদর বললেন—''যদিও আমি খুব অভাবগ্রস্ত লোক কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ, আমি শিক্ষক, আমি বিদ্যা বিক্রয় করতে পারব না। যখন আমার টোল ছিল তখনও আমি কোনও ছাত্রের কাছ থেকে মাইনে নিতাম না। মাত্র চারটি ছাত্রের ভরণপোষণ করতে পারতাম আমার জমি থেকে। সবাই শাক ভাত খেয়েই আনন্দে থাকতাম। কিন্তু সে সব দিন আর নেই। আমার জমিও হাতছাড়া হয়ে গেছে। সবই বদলে গেছে। সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। খুব কষ্টে আছি। তবু আমি আপনার কাছ থেকে টাকা নিতে পারব না। তাছাড়া আপনাব কাছে আমার অনেক ঋণ; আমার ছেলে বিকাশটা যদি মানুষ হত, কিছু রোজগার করত তাহলে নিশ্চিন্ত হতাম। বেকার হয়ে বসে আছে ছেলেটা। ওর যদি কোথাও একটা চাকরি জোটে—''

''লেখাপড়া কতদূব করেছে? বাংলা জানে তো—''

'তা জানে''

''তাহলে আমি একটা চাকরি ওকে দিতে পারি। আমার একটা ছোটখাটো লাইব্রেরী আছে। তাতে আছে অনেক পুরাতন মাসিক-পত্র আর সেকালের বই। অনেক ভালো ভালো প্রবন্ধ আছে সে সব বইয়ে। আমাব ইচ্ছে সেগুলো সংকলন করে আবার ছাপাই। তা না হলে ওগুলো হারিয়ে যাবে শেয পর্যন্ত। আপনার ছেলে যদি সেগুলো একটা খাতায় টুকে দেয়—''

''হ্যাঁ তা সে দিতে পারে—''

''তাহলে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। টাকাটা আপনি রাখুন পণ্ডিতমশায়—ওটা আপনার ছেলের অগ্রিম মাইনে স্বরূপই দিলাম মনে করুন, না হয়—''

''আমার ছেলের মাইনে আমার ছেলেকেই দেবেন। সে এ কাজ করতে রাজী হবে কি না তা সেই জানে। আজকালকার ছেলেদের ঠিক চিনি না আমি। আমি ওকে বলব আপনার সঙ্গে দেখা করতে''

দামোদর উঠে পড়লেন।

''চলুন আপনাকে পৌঁছে দি। লোচন গাড়ি বার কর—''

''না, না, গাড়ি বার করবার দরকার কি, এটুকু আমি হেঁটেই চলে যাব অনায়াসে। রাতও তো বেশী হয় নি—''

"আমার দরকার আছে।"

ডাক্তারবাবু নোটটা কুড়িয়ে পকেটে পুরে ফেললেন।

দামোদরের বাড়িতে পৌঁছে ডাক্তারবাবু সটান ভিতবে ঢুকে গেলেন।

"কই মা কই—"

শীর্ণা রুগ্না দামোদরের পত্নী বেরিয়ে এলেন। তাঁর পরনে ছিন্ন বস্ত্র। মুখে একটা সভয ঔৎসুক্য।

ডাক্তাববাবু বললেন—"মা আজ আমার জন্মদিন। আমার জন্মদিনে আমার মা একটি সদব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে দক্ষিণা দিতেন। আমি ম্লেচ্ছ হয়ে গেছি। চাকব দাই আমার রান্না কবে। সদব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবার অধিকার আমি হারিয়েছি। কিন্তু এবাব ঠিক করেছি দক্ষিণাটা আমি দেব। পণ্ডিতমশাইকে দেবার যোগ্যতা আমার নেই কিন্তু আপনি মা আপনাকে আমি অনায়াসেই দিতে পারি। আশীর্বাদ করুন আমাকে—"

তিনি প্রণাম করে একশ টাকার নোটটি বাখলেন তাঁব পদপ্রান্তে। তারপব উঠে যখন দাঁড়ালেন তখন দেখলেন দামোদব নির্নিমেষে চেয়ে আছেন তাঁর দিকে। তাঁব চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে।

ডাক্তাববাবু কিছু না বলে বেরিয়ে এলেন।

গাড়িতে যেতে যেতে ভাবলেন---'আমার জন্মদিন কবে তা আমি জানি না। আমাব মা আমার জন্মদিন কবতেন এ কথাও মিথ্যে, কারণ আমি যখন চাব মাসের তখনি তিনি মাবা গেছেন। তবু আজ আমার জন্মদিন। আজ আমি সেই জগতে নব-জন্ম গ্রহণ করলাম যেখানে পণ্ডিত দামোদরের মতো ব্রাহ্মণেরা আছেন। তাঁকে আজ সামান্য সাহায্য করতে পেরেছি এতেই আমি কৃতার্থ'

।। বারো ।।

রামসদয়বাবু থানায় গিয়ে দেখলেন তাঁর পরিচিত কেউ নেই। তাঁকে কেউ বসতে পর্যন্ত বলল না। তিনি খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে জিজ্ঞাসা করলেন—"দারোগাবাবু কোথায়"

"এই ঘরের ভিতরে"

ঘরেব ভিতরে ঢুকে যতীনবাবুর দেখা পেলেন তিনি। যতীনবাবু মুখ তুলে চাইতে খুব ঝুঁকে প্রণাম কবলেন রামসদয।

"কি চাই? কে আপনি?"

"আমায় নাম রামসদয় বসাক। এখানে আমার একটা গোলা আছে। কলকাতায় থাকি আমি। সম্প্রতি এখানে একটা মনিহারি দোকান খুলেছিলাম। কিন্তু এক কাবুলিওলার অত্যাচারে বিব্রত হয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি—"

"কাবুলিওলা? এখানে তো একটিমাত্র কাবুলিওলা আছে, আফজল খাঁ। সে তো খারাপ

লোক নয়, লোকের বিপদে আপদে টাকাকড়ি দেয়, অনেকের টাকা ছেড়েও দেয় শুনেছি। সে খুব পপুলার লোক, সবাই তাকে ভালবাসে। সে আপনাকে বিব্রত করেছে? কেন, কি হয়েছিল—"

এখানেই রামসদয়বাবু গুলিয়ে ফেললেন। কি হয়েছিল তা সঠিক বোঝাতে পারলেন না তিনি। বোঝাতে গেলে যে সব কথা বলতে হয় তা দারোগাবাবুর কাছে বলবার সাহস হল না তাঁর। কি বুঝতে হয়তো কি বুঝবেন। তিনি আমতা আমতা করে বললেন—"লোকটা আমাকে মারবে বলে শাসিয়েছে। তাই আমি—"

যতীনবাবু হেসে বললেন—"আগে মারুক তো, তারপর দেখা যাবে। আমি যে কাবুলিওলার কথা বলছি সে কিন্তু খারাপ লোক নয়। যাই হোক, আপনার কথা আমার মনে থাকবে, আমি নোট করে নিচ্ছি—"

রামসদয়বাবু বাড়ি ফিরে এলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চাকরটা বলল—"এই নিন চাবি। দামোদরবাবু দিয়ে গেছেন—"

"কিসের চাবি"

"দোকানের। দামোদরবাবু বললেন বিকাশ আর দোকানে কাজ করবে না, তাই চাবিটা দিয়ে গেছে—"

রামসদয় চাবিটা নিয়ে যদিও মুখে বললেন—"ও কাজ না করে আর একজন করবে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না" কিন্তু মনে মনে তিনি অনুভব করলেন এখানে এই মফঃস্বলে লোক পাওয়া খুব সহজ হবে না। এখানে সকলেই তাঁর উপর মনে মনে চটা, কেউ প্রসন্ন নয়। এখানে হঠাৎ বিশ্বাসী লোক পাওয়া শক্ত হবে তাঁর পক্ষে। ওই ছোঁড়া ভদ্রবংশের ছেলে। কবিতাই লিখুক আর যা-ই করুক চুরিচামারি করত না। পরদিন সকালে গিয়ে তিনি বিপিনবাবুকে বললেন "বিকাশকে আমার মনিহারি দোকানে একটা চাকরি দিয়েছিলাম সে কেন জানি না চাকরিটা ছেড়ে চলে গেছে আমাকে একটা বিশ্বাসী ছোকরা খুঁজে পেতে দিতে পারেন? মাসে পঞ্চাশ টাকা মাইনে দেব। দোকানে বসে টুকিটাকি জিনিসপত্র বিক্রি করবে, আর তার একটা হিসেব রাখবে। আমিও গিয়ে বসব সেখানে মাঝে মাঝে, কিন্তু বুড়ো হয়েছি আমি তো বিক্রি করতে পারব না। বিশ্বাসযোগ্য একটি লোক দেখুন আপনি—"

বিপিনবাবু বললেন—"বিশ্বাসযোগ্য লোক পাওয়া শক্ত।"

"শুনেছি আপনার একটি ছেলে আছে। সে কি করে?"

"সে মোটর ড্রাইভারি করে"

"কত মাইনে পায়"

"তা আমি ঠিক জানি না"

"সে ওখানে যা পাচ্ছে তাই আমি দেব। মোটর চালাতে জানে এরকম একটা লোক আমিও খুঁজছি। আমার ড্রাইভারটা বদমায়েশি আরম্ভ করেছে। আমার ড্রাইভারটা যদি সরে পড়ে তাহলে ওই দু'চারদিন কাজ চালিয়ে দিতে পারবে। আপনি তাকে ডেকে পাঠান"

বিপিনবাবু চুপ করে রইলেন।

তারপব বললেন—"আমার ছেলেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। তার ঝুঁকি আমি নিতে পারব না"

"তাই না কি! আপনি তার বাপ হয়ে একথা বলছেন?"

বিপিনবাবু চুপ ক'রে বইলেন।

বামসদয় বলে উঠলেন—"উঃ কালে কালে কি হল!"

বামসদয় নিজেই গিয়ে দোকানটা খুললেন।

দোকান খুলে চেয়ারে বসে রইলেন বীণার বন্ধ জানলার দিকে চেয়ে।

এরপর একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল।

বীণার জানলায় ছোট একটা ফুটো ছিল। বীণা সেই ফুটোয় চোখ দিয়ে দেখল রামসদয়বাবু তার জানলার দিকে চেয়ে আছেন। লোকটার গালের চামড়া ঝুলে পড়েছে, চোখের কোলে কালি, মাথাব সামনের দিকটায় টাক, চিবুকের মাঝখানে একটা গর্ত মতন। তার বাবার চিবুকেও ওই রকম গর্ত ছিল। লোকটা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে তার জানলার দিকে। অসহায় ক্ষুধার্ত দৃষ্টি। চিবুকটার দিকে চেয়ে আবার তার বাবাকে মনে পড়ল। তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে হল তার। মনে হতেই একটা অদ্ভুত উত্তেজনায় ভবে উঠল তাব অন্তর। যে আবেগে সে একদিন শশধরের মতো একটা ফেরিওলাকে বিয়ে কববে বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়েছিল সেই আবেগই নূতন রূপে জেগে উঠল তার মনে। ওকে জয করবই। এই কথাগুলোও সে বলল মনে মনে। শশধর বাড়ি নেই। আজও সে তার বন্ধু জগন্নাথের খবব নিতে হাসপাতালে বেরিয়ে গেছে। বীণার আলুকাবলি রান্না হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। নিজেদের জন্য ইকমিক কুকারে সে মাংস ভাত আগেই চড়িয়ে দিয়েছে। মানতি মাসীব রান্নাটাও হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর কাছে যাবার আগেই সে ব্যাপাবটা করে ফেলতে চায়।

ঝুমরি মটরশুটি ছাড়াচ্ছিল। বিকেলে ঘুগনি হবে।

বীণা বললে—"ঝুমরি, ওই বড় প্লেটটা নিয়ে আয় তো। চামচেটাও আনিস"

প্লেট আর চামচ আসতেই বীণা বেশ খানিকটা আলুকাবলি বার করে প্লেটে বাখল। তাবপব রাখল একটা ছোট চামচ প্লেটের পাশে।

তারপর চিঠি লিখতে বসে গেল।

শ্রীচরণেষু,

আপনাব থুতনিতে যেমন গর্ত আছে আমার বাবার থুতনিতেও তেমনি ছিল। আমার বাবা অনেকদিন আগে মারা গেছেন। আপনাকেই আমি বাবা বলে ডাকব। কাল আপনার প্রতি যে অভদ্র আচরণ করেছি তার জন্যে আমি লজ্জিত। আলুকাবলি এখনই তৈরি করেছি, আপনার জন্যে পাঠালাম খানিকটা। রোজ পাঠাব। আপনাকে দাম দিতে হবে না। বাবার কাছ থেকে মেয়ে কখনও দাম নেয়?

প্রণতা বীণা

ঝুমরিকে বলল—"তুই এই খাবার আর চিঠিটা দিয়ে আয় ওই বুড়োকে। তারপর এক গ্লাস জল নিয়ে যাস। আমি মানতি মাসীর কাছে যাচ্ছি। তুই বাড়িতে থাকিস আমি না ফেরা পর্য্যন্ত।"

মানতি মাসীর বাড়ি থেকে বীণা ফিরছিল। মাথায় কাপড় ছিল না, বেণীটা দুলছিল পিঠের

উপর। বীণা পারতপক্ষে মাথায় কাপড় দেয় না, খোঁপাও বাঁধে না। কুমারী অবস্থায় যেভাবে ঘুরে বেড়াত এখনও তেমনি বেড়ায়। হনহন ক'রে ফিরছিল সে। রামসদয়বাবুর খবরটা জানবার জন্যে খুব উৎসুক হয়ে উঠেছিল সে। হঠাৎ ঘ্যাচ্ করে একটা মোটর থেমে গেল তার পাশে। মোটরে বিষুণবাবু। একটা মোটর ট্রায়াল দিতে তিনি বেরিয়েছিলেন। বীণাকে তিনি জিগ্যেস করলেন—"তোমার কপালেব কাটা দাগটার জন্যে একটা ওষুধ পাঠিয়েছিলাম তুমি লাগাও নি?"

বীণা ঘাড় হেঁট করে রইল। তারপর বলল, "না লাগাই নি। ওটা আমার বাবার স্মৃতিচিহ্ন। ওটা থাক্—"

বিষুণ এ উত্তব প্রত্যাশা কবেননি। হঠাৎ তার নিজের বাবা মার কথা মনে পড়ল যাঁরা না কি অনাহারে ভিখারীর মতো মাবা গেছেন। তাঁদের কোনও স্মৃতিচিহ্ন কি আছে তাঁর কাছে? নেই। হঠাৎ যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন তিনি। হঠাৎ মনে হল তাঁরও কিছু একটা করা উচিত বাবা মার জন্য। কিন্তু কি করবেন? মাথায় এল না।

বীণা ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়েই ছিল।

বিষুণবাবু জিগ্যেস কবলেন— "ওষুধটা কোথা"

"বাড়িতেই আছে। পাঠিয়ে দেব আপনাব কাছে?"

"আমিই গিয়ে নিয়ে আসব একদিন। আর সব খবর ভালো তো?

"ভাল"

বিষুণবাবু চলে গেলেন। তাঁর একবার মনে হয়েছিল বীণাকে একটা 'লিফট' দিয়ে দেন, কিন্তু সেটা হয়তো দৃষ্টিকটু হবে বলে তা আব করলেন না। বিষুণবাবু কিন্তু ভাবতে লাগলেন—"বাবা মার স্মৃতিরক্ষার জন্য কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু কি করা যায়। বীণা মেয়েটা শিক্ষা দিয়ে দিলে আমাকে। ডাক্তারবাবুকে জিগ্যেস করলে কেমন হয়, কি কবলে ভালো হয়—"

বাড়ি ফিরে এসে বীণা দেখল রামসদয়বাবুর দোকান বন্ধ। ভিতরে ঢুকতেই ঝুমরি বলল—"বুড়ো বাবু তোমার জন্যে অনেকক্ষণ বসে ছিলেন। একটু আগেই চলে গেছেন। একটা চিঠি লিখে রেখে গেছেন।" বীণা যে চিঠি লিখেছিল তারই নীচে পেন্সিল দিয়ে লিখেছেন। কাগজের দু'পিঠ ভরে গেছে।

"তুমি আমাকে বাবা বলে সম্বোধন করেছ। কিন্তু তোমার বাবা হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। আমি অতি পাজী লোক। তুমিই বরং আমার মা হও। বকুনিটকুনি দিয়ে শায়েস্তা করে ফেল আমাকে। আমার ছেলেরা বৌমারা আমেরিকায়। আমার অভিভাবক হওয়ার লোক নেই। তুমি আমার অভিভাবক হও। তোমাদের বাড়ির সামনে যে দোকানটা করেছি সেটা উঠিয়ে দেব ভাবছি। যে প্রয়োজনে করেছিলাম তা শেষ হয়ে গেল। তুমিই সেটা শেষ করে দিলে। গোড়াতেই বলেছি আমি পাজী লোক। কিন্তু আমার একটা ক্ষমতা আছে, আমি ভালো লোক, খাঁটি জিনিস চিনি। তোমাকে মা বলে তাই এত সহজে চিনতে পারলাম। তোমার আলুকাবলি চমৎকার, দাম আমি দেব না। কিন্তু মা-কে একটা প্রণামী দেওয়ার ইচ্ছে

হচ্ছে। যদি অনুমতি কব তো বলি। আমাব এই দোকানটা তোমবাই চালাও না। দোকানেব জিনিসপত্রগুলো তোমাকে এমনি দেব। বাড়িব ভাড়াও আমি নেব না। আমাব ভয় হচ্ছে তুমি হয়তো বেগে উঠবে। যদি বেগে ওঠ তাহলে আমাকে থেমে যেতে হবে। তুমি যা বলবে তাই হবে কাল সকালে আসব। আমাব প্রণাম নাও।

ইতি বামসদয়"

বীণা চিঠিটা হাতে কবে দাঁড়িয়ে বইল খানিকক্ষণ। হঠাৎ উদ্দীপনাবশে সে যা কবেছিল তাব ফল যে এমন সুদূবপ্রসাবী হবে তা সে কল্পনা কবেনি। আনন্দে গবে তাব বুকটা ভবে উঠল। কিন্তু পবক্ষণেই মনে পড়ল বুড়োব চোখ দুটো। সে চোখে যে দৃষ্টি সে দেখেছে সে দৃষ্টি দেখবাব পব কি ও লোককে বিশ্বাস কবা উচিত? কি কবা উচিত ভাবছিল এমন সময় শশধব এসে ঢুকল। উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল—"আজ জগন্নাথ একটু ভাল আছে। ডাক্তাববাবুবা বলছেন হাত কেটে ফেলতে হবে না। বাঁচা গেল। হ্যাঁ, এক্ষুণি বিষ্ণুবাবুব সঙ্গে দেখা হল। তিনি আগামী ববিবাব ভিকিবিদেব খাওযাবেন। তোমাকে বেশী কবে আলুকাবলি বানাতে হবে। তাব সব খবচ তিনি দেবেন। কিন্তু আমি ভাবছি খবচ নেওযাটা কি উচিত হবে?"

বীণা বললে— "আমি মানতি মাসীব বাড়ি থেকে যখন ফিবছিলাম তখন আমাব সঙ্গেই দেখা হয়েছিল বাস্তায। গাড়ি থামিয়ে জিগ্যেস কবলেন আমি ওষুধটা লাগাচ্ছি কি না। বললাম সত্যি কথা। উনি বাগ কবলেন না বললেন ওষুধটা নিয়ে যাবেন এসে। তখন তো ভিকিবি খাওযাবাব কথা বললেন না"

"আমাকে কিন্তু বলেছেন আমি এখখুনি ওব গ্যাবেজ থেকেই আসছি

"গ্যাবেজে গিযেছিলে কেন"

"বিষ্ণুবাবুকে বলতে গিযেছিলাম জগন্নাথেব দাদাটাব জন্য। তাকে যদি উনি অ্যাপ্রেণ্টিস হিসাবে নেন আব কিছু মাইনে দেন তাহলে ওদেব বড উপকাব হয। ওব দাদাটা বেকাব বসে আছে। জগন্নাথেব বাবা মোটে পঁচাত্তব টাকা মাইনে পান। তাতে ওদেব সংসাব চলে না। বিষ্ণুবাবু এত ভালো লোক। শুনেই বললেন আচ্ছা, পাঠিয়ে দিও। যদি ভালো কবে কাজ কবে আমি আপাতত বোজ এক টাকা কবে দেব কাজ শিখলে আবও বাড়িযে দেব তোমাব হাতে কাব চিঠি—"

বীণা হেসে বললে— "আমি এক কাণ্ড কবে বসে আছি। কবে বসলাম তো, এখন ভাবছি এব পব কি কবা উচিত"

"কি হযেছে?"

বীণা আনুপূর্বিক সব খুলে বলল আমাব চিঠিব উপবেই তিনি উত্তব লিখে দিযে বাড়ি চলে গেছেন এই দেখ

শশধব ভ্রূ কুঞ্চিত কবে চিঠিটা পড়ল চিঠিটা পড়ে তাব মুখে হাসি ফুটল

"বুড়োকে ঘাযেল কবে ফেলেছ দেখছি। আগা সাহেবেব ধমক যা পাবেনি তুমি তাই কবেছ

"কাল যখন আসবে তখন কি বলবে তাকে"

"আমি বলব কেন যা বলবার তুমিই বোলো। বাড়ির আসল মালিক তো তুমি—"

"আহা, আমি কাল সকালেই চলে যাব মানতি মাসীর কাছে। আমি ওর সঙ্গে দেখা করব না"

"রাম কহো। ও দোকান নিয়ে আমি কি করব। দোকানে ঠায় বসে থাকা কি আমার পোষায়? আমাদের যা আছে তাতেই তো আমাদের সংসার স্বচ্ছন্দে চলে যায়। আমি আলুকাবলি ফেরি করি শখের জন্য। রোজ কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই, বেশ লাগে। কাল নদী পেরিয়ে ওপারে গিয়েছিলাম, চমৎকার একটা চাঁপা গাছ দেখলাম চৌধুরীদের বাগানে। তার মালী বলেছে আমাকে ফুল পেড়ে দেবে একদিন। নিয়ে আসব তোমার জন্যে। ওপারে একটা পুকুরে পদ্মও ফুটেছে খুব দেখলাম। ওখানে একটি ছেলের সঙ্গে ভাব করে এসেছি। কিশোরী তার নাম। তোমার তৈরি আলুকাবলি খেয়ে সে তো মুগ্ধ। আমি দাম নিতে চাইনি, সে জোর করে দিয়ে দিল। বলল তাদের ক্লাবে আমাকে নিয়ে যাবে একদিন। খুব বিক্রি হবে সেখানে"

বীণা হাসিমুখে সব শুনছিল। তার এই ভবঘুরে আড্ডাবাজ সরল স্বামীটির দৈনিক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনতে খুব ভালো লাগে তার।

"তার মানে, তুমি সারাজীবনই আলুকাবলি ফেরি করে বেড়াবে" "হ্যাঁ। যতক্ষণ চলচ্ছক্তি থাকবে ততদিন তার কিছু করব না। ফেরিওলা ছিলাম বলেই তো তোমাকে পেয়েছি ঘরে বসে থাকলে কি তোমার দেখা পেতুম"

"দেখো আবার যেন কাউকে জুটিয়ে এনো না"

"পাগল হয়েছ!"

দু'জনেই হো হো করে হেসে উঠল।

"তুমি সত্যিই বড়োর সঙ্গে দেখা করবে না?"

"না। ওর চোখের দৃষ্টি ভাল নয়। তুমি বাড়িতে থেকো, আমি মানতি মাসীর বাড়িতে চলে যাব। তুমি বোলো আমি অচেনা পরপুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করি না। আর বোলো আপনার দোকানও আমরা চাই না। ও দোকান আমরা চালাতে পারব না"

"আমি ওসব বলতে পারব না। আমিও বাড়ি থেকে পালাব।"

"তুমিও পালাবে? সেটা কি পুরুষমানুষের মতো কাজ হবে। আমি মেয়েমানুষ আমার পালানোটা শোভা পায়। তুমি পালাবে কেন"

"আমি বুড়ো ভদ্রলোকের মুখের উপর কটকটিয়ে ওসব কথা বলতে পারব না"

"কটকটিয়ে বলবে কেন, ভদ্রভাবেই বলবে। তোমাকে থাকতে হবে"

শশধর বিব্রতভাবে ঘাড় চুলকুতে লাগল।

।। তেরো ।।

রামসদয়বাবু হঠাৎ এমনভাবে রং বদলে ফেললেন কেন একথা যাঁরা ভাবছেন তাঁরা রামসদয়বাবুদের চেনেন না। অনেকদিন পরে কলকাতা থেকে এসেই রামসদয়বাবু এবার প্রায়

সকলের মুখেই ডাক্তারবাবুর জয়জয়কার শুনতে পেলেন। সকলেই ওঁকে ভালবাসে সকলেই ভক্তি করে। রামসদয়ের ঈর্ষা হল একটু। ওই বিষুণ মিস্ত্রীটা তাঁর গাড়ি সারাতে আড়াইশ' টাকা নিয়েছে, অথচ ও নাকি ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে এক পয়সাও নেয় না। শুধু তাই নয়. ডাক্তারবাবুর গাড়ির কাজ ও সবার আগে করে। তাঁর বাগানের মালীটা ডাক্তারবাবুর কথায় গদগদ, দামোদর পণ্ডিত বলেন উনি দেবতা। সবাই ওঁর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত। উনি নাকি ডাক্তার খুব ভালো। কতটা ভালো তা পরীক্ষা করবার জন্যেই সেদিন ওঁকে মাছ ধরতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন ওঁর বাগানবাড়িতে। তাঁর রোগের সম্বন্ধে যা বললেন তা তো রীতিমত অপমানজনক। 'এ জীবনে যৌবন আর ফিরবে না'—এ কথা কে না জানে। যৌবনকে যদি ফেরাতে পারিস তবেই না তুই বড় ডাক্তার! বাঘের চর্বি আর গণ্ডারের শিং দিয়ে ওষুধ তৈরি করে দিয়েছিল একজন হাকিম, বেশ ফল হয়েছিল তাতে। অবশ্য বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। তাছাড়া অষুধের দামও বড্ড বেশী। একশ' টাকা করে তোলা। বরাবর খাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ওই হাকিম এই নীতিবাগীশ ডাক্তারের চেয়ে ঢের ভালো। চারিদিকে ডাক্তারবাবুর প্রশংসা শুনে শুনে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন রামসদয়। খুব দয়ালু, খুব দাতা, গরীবদের মা বাপ। রামসদয়কে কেউ পোঁছে না। রাস্তায় কারো সঙ্গে দেখা হলে কেউ নমস্কারও করে না। তিনি একজন গণ্য-মান্য লোক—কলকাতায় ব্যবসা আছে, এখানেও গোলা আছে—একথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না কেউ। সামান্য একটা কাবুলীওলা তাঁকে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অপমান করে গেল। হঠাৎ তাঁর মনে হল তিনিও কি মহৎ হতে পারেন না? আলবৎ পারেন। মহত্ত্ব আস্ফালন করবার জন্যে যে টাকাব দরকার সে টাকা তাঁর আছে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না এবং সেই তাঁর মহত্ত্ব-কীর্তন করবে কা কা করে। বিপিনকে আর বিকাশকে তিনি বহাল করেছিলেন সম্প্রতি। এর মধ্যেও তাঁর মহত্ত্ব-আস্ফালনের ভাব ছিল একটু। দুটো বেকার গরীব লোককে বহাল করে তিনি যেন দেখাচ্ছিলেন তিনিও গরীবের উপকার করতে পারেন। যদিও এ উপকার নিঃস্বার্থ নয়, যদিও এর মধ্যেও এক ঢিলে দুটো পাখী মারবার মতলব প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু তিনি ওদের বহাল ক'রে যে মহত্ত্ব প্রকাশ করেছেন এই ভ্রান্তির মোহ আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল তাঁকে। তাঁর মনে এ আশাও হচ্ছিল এখানে যদি কিছুদিন থাকেন তিনি তাহলে ওই ডাক্তারবাবুকে নিষ্প্রভ করে দিতে পারবেন। তারপরই ঘটল শেষের ঘটনাটা। তাস খেলতে বসে ভাল হাত পেলে খেলোয়াড় যেমন আনন্দিত হ'য়ে ওঠে তেমনি আনন্দিত হয়েছিলেন তিনি সেদিন বীণার চিঠিটা পেয়ে। আশ্চর্য মেয়ে ওই বীণা। ফনফনে লতার মতো জীবন্ত, সর্বাঙ্গে রূপ উথলে পড়ছে, অথচ বুদ্ধি কি তীক্ষ্ণ। তাঁকে বাবা বলে বসল! একগাদা আলুকাবলি পাঠিয়ে দিয়ে বললে—রোজ পাঠাব, দাম দিতে হবে না। ভেবেছিল এক চালে তাঁকে মাৎ করে দেবে। কিন্তু তিনিও খেলোয়াড় হিসাবে কম নন। তিনিও তাকে মা বলে সমস্ত দোকানটাই দান করে দিলেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা হল যতই খেলোয়াড় মেয়ে হোক এ টোপ যদি গেলে তাহলেই তো কেল্লা ফতে। মা যখন সেজেছে তখন ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তাকে করতেই হবে। লোকত ধর্মত সেটা দৃষ্টিকটুও হবে না। আর হলেই বা কি। রামসদয় কারো তোয়াক্কা করেন না কি! আর ঘনিষ্ঠতা করতেই তো চান

তিনি। এমন একটা চমৎকার মেয়ে তাঁর আশেপাশে ঘুরঘুর করবে এর বেশী তো কিছু কাম্য নেই তাঁর। আর ঘনিষ্ঠতা যদি হয় তাহলে কোথাকার জল যে কোথায় দাঁড়াবে, তা-ই বা কে বলতে পারে। পাতানো-মায়ের মেকী সম্বন্ধ ক'দিনই বা টিকবে। অথচ এ কথাটা রাষ্ট্র হয়ে যাবে যে রামসদয়বাবু তাঁর দোকানটা ফেরিওলা শশধরকে দান করেছেন তাদের দুঃখে বিচলিত হয়ে। এ শহরে ডাক্তারবাবুর এমন দান কি আছে একটাও! রামসদয় আশা করছিলেন যে পরদিন সকালে তিনি গদগদ শশধর আর বিগলিতা বীণার দেখা পাবেন। কিন্তু গিয়ে দেখলেন কেউ নেই। ঘরের কপাট বন্ধ। তালা ঝুলছে। ঝুমরি মেয়েটা বারান্দায় বসেছিল। সে এসে একটা চিঠি দিলে তাকে। বলল—"বাবু আপনাকে দেবাব জন্যে একটা চিঠি রেখে গেছেন। ওঁরা কেউ বাড়িতে নেই"

"কোথায় গেল"

"তা তো জানি না"

ঝুমবি চিঠিটা দিয়ে চ'লে গেল।

রামসদয় চিঠিটা খুলে পড়লেন।

মান্যবরেষু,

আপনি কাল বীণাকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাব জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আপনাব দোকান আমরা নিতে পারব না। কাবণ দোকান চালাবার সামর্থ্য আমাদের নেই। আমার বন্ধু বিকাশ আপনার দোকানে কাজ করত, সে হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেল কেন বুঝতে পারছি না। সে এখন ডাক্তারবাবুর কাছে চাকরি করছে শুনলাম। আপনি যদি দোকানটা দান করতে চান তাকেই দিন না। তাছাড়া আপনি দোকান করে সেটা দানই বা কবছেন কেন তাও আমার মাথায় ঢুকছে না। আপনি কি এখানকার পাট তুলে দিতে চান? যাই হোক আমরা আপনার দোকানের ভার নিতে অপারগ। একটু কাজে বাইরে যেতে হচ্ছে বলে আপনার সঙ্গে দেখা হল না! আমাদের সভক্তি নমস্কার জানবেন। ইতি

বিনীত শশধর

রামসদয় নির্নিমেষে চিঠিটার দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর দৃষ্টির যদি দাহিকা-শক্তি থাকত চিঠিটা পুড়ে যেত। রামসদয় চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে পুরে রাখলেন। তিনি সহসা কোন চিঠি ছেঁড়েন না। এই চিঠিটা পড়ে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর কাছে। বিকাশ হঠাৎ তাঁর দোকানের চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেল কেন সেটা এবার স্পষ্ট বুঝতে পারলেন। ডাক্তারবাবু তাকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছেন। আচ্ছা অভদ্র লোক তো! রাগে আপাত-মস্তক জ্ব'লে উঠল তাঁর। মোটরে উঠে বসলেন। বললেন—"ডাক্তারবাবুর ওখানে চল—"

"কোন ডাক্তারবাবু—"

"আরে যে ডাক্তারবাবু দয়ার সাগর, মহত্ত্বের পর্বত, চেন না তাঁকে—"

"আজ্ঞে না"

"সেদিন যিনি বাগানবাড়িতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন—"

"ও বুড়ো ডাক্তারবাবু"

রামসদয় অস্ফুট কণ্ঠে স্বগতোক্তি করলেন—"ঘাগি—"

ডাক্তারবাবুর বাড়ির সামনে এসে যখন তাঁর গাড়ি দাঁড়াল তখন বিকাশ বারান্দায় বসে একটা ছেঁড়া মাসিক পত্র থেকে 'বৈদিক ভারত' নামে প্রবন্ধটি টুকছিল। বারান্দার আর একধারে বসে অনুমান বন্দুক সাফ করছিল। আজ ডাক্তারবাবু সদলবলে শিকারে বেরুবেন। হবিব আসবে একটু পরেই। সে-ই খবর পাঠিয়েছে বীজপুরের জলায় অনেক হাঁস এসেছে। আরও জন দুই বন্দুকধারী আসবে তার সঙ্গে। ট্যাক্সি নিয়ে রবিও আসবে। ডাক্তারবাবু ভিতরে দাড়ি কামাচ্ছিলেন। রামসদয়বাবু নেমে তির্যক দৃষ্টিতে চাইলেন বিকাশের দিকে। তারপর বললেন—"ডাক্তারবাবু কোথা- "

অনুমান উত্তর দিল।

আপনি বসুন। নটবর, বাবুকে খবর দাও। বল রামসদয়বাবু এসেছেন"

রামসদয় বসলেন না। দাঁড়িয়েই রইলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন ডাক্তারবাবু।

"আরে রামসদয়বাবু যে। বসুন। নটবর এইখানেই কফি দিয়ে যা। রামসদয়বাবুর জন্যে এক কাপ আনিস"

রামসদয় উত্তপ্ত কণ্ঠে বললেন—"আমি কফি খেতে এখানে আসিনি। আমি আপনার কাছে একটা জবাবদিহি চাইতে এসেছি"

অবাক হয়ে গেলেন ডাক্তারবাবু।

"জবাবদিহি। কিসের জবাবদিহি—।"

"আমি এই বিকাশ ছোকরাকে আমার দোকানে বহাল করেছিলাম। আপনি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই তাকে বহাল করে ফেললেন এটা কি রকম ভদ্রতা মশাই? ওর এত আস্পর্ধা যে দোকানের হিসেবপত্তর আমাকে না বুঝিয়ে চাবিটা ফেরত দিয়ে বলে পাঠিয়েছে যে আমি আর আপনার চাকরি করব না! এখন বুঝতে পারছি ওর এ আস্পর্ধা হল কি করে"

আকাশ থেকে পড়লেন ডাক্তারবাবু।

"আপনার যে দোকান আছে আর সে দোকানে বিকাশ যে চাকরি করত তা আমি কিচ্ছু জানি না তো। দামোদরবাবু একদিন কথায় কথায় বললেন ছেলেটা বেকার বসে আছে যদি ওর একটা চাকরির ব্যবস্থা হয় তাহলে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হই। আমার একজন লোকের দরকার ছিল তাই আমি ওকে বহাল করলুম—"

তারপর বিকাশের দিকে ফিরে বললেন—"তুমি এঁর চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলে কেন?"

"যে মুহূর্তে বুঝতে পারলাম উনি শশধরের বাড়ির সামনে দোকান করেছেন বীণার উপর কুদৃষ্টি হানবার জন্যে সেই মুহূর্তেই আমি ছেড়ে চলে এসেছি। উনি দোকানে গিয়ে রোজ আমার পাশে বসে থাকতেন শশধরের বাড়ির জানালার দিকে চেয়ে। একদিন বাড়ির ভিতরেও ঢুকেছিলেন—"

"চোপ রও—"

গর্জন করে উঠলেন রামসদয়। পায়ের জুতো খুলে হাতে নিলেন।

"ছি, ছি এসব কি ব্যাপার—"

শশব্যস্ত ডাক্তারবাবু বিকাশকে আড়াল ক'রে দাঁড়ালেন।

"জুতোপেটা করব তোমাকে হারামজাদা। আমার দোকান থেকে জিনিসপত্র চুরি করে এখন আমার নামে যা তা বলে বেড়াচ্ছ? মুখ থেঁতো করে দেব তোমার জুতিয়ে"

বিকাশ জবাব দিল—"যা বলছি তা সত্যি কথা। আপনার দোকানের জিনিস যেমন ছিল তেমনি আছে। সামান্য যে ক'টা জিনিস বিক্রি হয়েছিল তার দাম আর তার হিসেবও আপনার টেবিলের ড্রয়ারেই আছে। দেখে মিলিয়ে নিন গিয়ে। বেশ চলুন, আমিই মিলিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সঙ্গে কেউ একজন সাক্ষী থাকলে ভালো হয়। আমি গরীব, আমি মূর্খ, কিন্তু আমি চোর নই--"

হঠাৎ বিকাশ কেঁদে ফেললো। তার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল। তারপর ডাক্তারবাবুর দিকে চোখ তুলে বললে—"আমি গরীব অসহায় বলে লোকটা আমার উপর অত্যাচার করবে, আর আপনি তাই দাঁড়িয়ে দেখবেন—সত্যি বলছি আমি নির্দোষ"

ডাক্তারবাবু বিচলিত হলেন।

বললেন—"রামসদয়বাবু আপনি শান্ত হোন। আপনার দোকানে কি কি জিনিস ছিল তার একটা ফর্দ আছে তো"

"আছে। দোকানেই আছে—"

"তবে চলুন চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে ফেলা যাক। বিকাশ এখানেই থাক। আমরা দু'জন যাই চলুন, মিলিয়ে দেখি আপনার কোনও জিনিস খোয়া গেছে কি না। যদি কোনও জিনিস খোয়া গিয়ে থাকে তার খেসাবত আপনি নিশ্চয়ই পাবেন"

"আপনি আমার সঙ্গে যাবেন? আপনার যাওয়ার দরকার কি?"

"ছেলেটার ভার যখন নিয়েছি তখন ওর বিপদে-আপদে ওর পাশে দাঁড়াতে হবে বই কি- -"

"না, না, আপনার যাওয়ার দরকার নেই। যাকগে যা হবার তা হয়ে গেছে। ও নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করব না। তবে শিক্ষা হয়ে গেল একটা—"

রামসদয় সুর বদলে ফেললেন হঠাৎ।

ডাক্তারবাবু বললেন—"না, আপনাকে যেতেই হবে। আমি জানতে চাই আপনার কোনও জিনিস চুরি গেছে কি না—"

"গিয়ে থাকে যাকগে—"

ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে উঠল।

"আপনি যদি না যান তাহলে আপনার নামে বিকাশ 'কেস' করবে যে আপনি তাকে এতগুলো লোকের সামনে চোর বলে অপমান করেছেন। ও সত্যি চোর কি না সেটা আদালতে যাচাই হবে। আমি এখনি গিয়ে আপনার দোকানে তালা দিয়ে আসব। তারপর থানায় যাব। থানার লোক এসে মিলিয়ে দেখবে সব জিনিস ঠিক আছে কি না"

কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে যে সাপ বেরিয়ে পড়বে তা রামসদয় ভাবেন নি। যে ডাক্তারবাবুকে সহজ সরল বলে মনে হয়েছিল, তিনি যে হঠাৎ এমনভাবে বেঁকে দাঁড়াতে পারেন এও কল্পনাতীত ছিল তাঁর। এ নিয়ে যদি থানা পুলিস কোর্ট আদালত হয় তাহলে কোথাকার জল

যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলা যায় না, এখানে কেউ তাঁকে সুনজরে দেখে না, সবাই তাঁর বিরুদ্ধে গিয়ে সাক্ষী দেবে, টিটকিরি পড়ে যাবে চারদিকে। আরও নরম হয়ে গেলেন রামসদয়।

বললেন, "বেশ বেশ চলুন। মিলিয়েই নেওয়া যাক। আপনি যখন ছাড়বেন না, ঝোঁক ধরেছেন, চলুন"

ঠিক এই সময়ে আগা সাহেব আফজল খাঁ এসে হাজির হল।

"আদাব ডাকটার সাহেব। আপকো লিয়ে এক আচ্ছা শাল লায়া হুঁ—"

তারপর তার দৃষ্টি পড়ল রামসদয়ের দিকে। আগুন ফুটে উঠল চোখের দৃষ্টিতে। বলল—"রামসোদয়বাবু, হামারা বহুমায়ীকো খবর লেনে কা কোশিষ আব কিযা থা?"

রামসদয় উত্তর দিলেন না তরতর করে বারান্দা থেকে নেমে মোটরে গিয়ে উঠলেন। হা হা করে হেসে উঠল আফজল খাঁ।

ডাক্তারবাবু জিগ্যেস করলেন—"কি ব্যাপার খাঁ সাহেব—"

"কুছ্ নেহি। আপকো লিয়ে একঠো আচ্ছা শাল লায়া হুঁ— "

"আমি এখন বেরুচ্ছি। আব একদিন এসো—"

'বহুৎ খুব—"

"লোচন গাড়িটা বার কর। বেরুতে হবে। রামসদযবাবু আপনি একটু দাঁড়ান—"

"আমার গাড়িতেই আসুন না"

ডাক্তারবাবু এ কথার জবাব দিলেন না, দাঁড়িয়েই রইলেন। লোচন গাড়ি বাব কবল। গাড়িতে গিয়ে চড়লেন তিনি। রামসদয়বাবু গাড়ি চালিয়ে আগেই চলে যেতে পাবতেন, কিন্তু সে সাহস তিনি কবলেন না।

"চলুন এবার যাওয়া যাক" —গাড়ি থেকে মুখ বার কবে ডাক্তাববাবু বললেন।

দুটো মোটর একসঙ্গে বেরিয়ে গেল।

ঘণ্টা দুই পরে ডাক্তারবাবু ফিরলেন। বিকাশ তখনও বসে টুকছিল।

ডাক্তারবাবু হাসিমুখে তাব দিকে একতাড়া নোট ছুঁড়ে দিলেন। বিকাশ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল—"টাকা কিসের?"

'টাকা তোমাব। খেসারত আদায় করেছি। যখন দেখা গেল দোকানেব জিনিসপত্র সব ঠিক আছে তখন রামসদয়বাবুকে বললাম তাহলে আপনি ওই ব্রাহ্মণের ছেলেকে এভাবে অপমান করলেন কেন। আপনাকে খেসারত দিতে হবে। যদি না দেন তাহলে আমরা মকোর্দমা করব। অনেক হেজ্জাহেজ্জি করে একশ' টাকা আদায় করে এনেছি। চিঠিও লিখিয়ে এনেছি একটা। এই নাও।" পকেট থেকে একটা চিঠিও বার করে বিকাশের হাতে দিলেন। তাতে লেখা ছিল।

প্রিয় বিকাশবাবু,

ডাক্তারবাবুর সামনে আমার মনিহারির দোকানের জিনিসপত্র এবং টাকাকড়ি মিলাইয়া দেখিলাম। সব ঠিক আছে। আপনার উপর মিথ্যা সন্দেহ করিয়াছিলাম বলিয়া আমি দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করিবেন। ইতি

শ্রীরামসদয় বসাক।

ডাক্তারবাবু হাসিমুখে বিকাশের দিকে চেয়ে ছিলেন।

বিকাশ হঠাৎ উঠে এসে প্রণাম করল তাঁকে।

"এ কি, এ কি, একি কাণ্ড! চল এবার তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। হবিব এখুনি এসে পড়বে দলবল নিয়ে"

হঠাৎ ক্ষেন্তীর মা বেরিয়ে এসে বলল—"বাবু, যে মাংস আজ আপনারা নিয়ে যাবেন সে মাংস কিন্তু নটবর রেঁধেছে। আমাকে ছুঁতে দেয়নি। আমি বললাম শেষে একটু আদা-পেঁয়াজের রস খানিকটা ঘিয়ের সঙ্গে ঢেলে দাও। তা ও দিলে না। মাংস যদি খারাপ হয় আমাকে দোষ দেবেন না"

বলেই চলে গেল সে ভিতরে।

ডাক্তারবাবু হাসিমুখে তার পিছনে পিছনে ভিতরে চ'লে গেলেন।

।। চোদ্দ ।।

বিষুণ মিস্ত্রী ভিখারী ভোজের প্রচুর আয়োজন করেছিলেন। ট্যারা দিয়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন ভিখারী-দের। আশপাশের চার পাঁচখানা গাঁয়ে খবর পৌঁছেছিল যে বিষুণবাবু রবিবার দিন বিকেলে ভিখারীদের খাওয়াবেন ডাক্তারবাবুর বাগানে। ডাক্তারবাবুর বাড়ির ঠিক পাশেই তাঁর শখের আমবাগান কুড়ি বিঘে জমির উপর। প্রথম যৌবনে এই বাগান নিয়ে খুব মেতেছিলেন তিনি। নানারকম আমের গাছ লাগিয়েছিলেন। তখন হেড-মিস্ট্রেস অমিতা রায়ও ছিলেন এখানে। তিনিও এ ব্যাপারে উৎসাহিত হয়েছিলেন খুব। তিনিই লক্ষ্ণৌ থেকে 'দশেরি' আমের দশটা কলম আনিয়ে দিয়েছিলেন ডাক্তারবাবুকে। শুধু আনিয়ে দেন নি নিজের হাতে পুঁতেও ছিলেন সেগুলি বাগানের পূর্বপ্রান্তে। গাছগুলি এখনও আছে। এখন ডাক্তারবাবুর বাগান সম্বন্ধে যদিও আর তেমন উৎসাহ নাই কিন্তু ওই 'দশেরি' গাছগুলি এখনও তিনি মাঝে মাঝে দেখতে যান। মাঝে মাঝে মালীকে দিয়ে গাছগুলির তলা খোঁড়ান এবং সারও দেন। বাগানটিতে অনেক জায়গা আছে বলেই বিষুণ মিস্ত্রী ভিখারী-ভোজনের জন্য এই জায়গাটি নির্বাচন করেছেন। তাঁর গ্যারেজের সামনেই বড় রাস্তা, সেখানেই ভিখারীদের বসিয়ে খাওয়ালে চলত, ব্যাপারটা হয়তো সকলের দৃষ্টিও আকর্ষণ করত, কিন্তু বিষুণবাবুর মনঃপূত হল না এটা। ভিখারীরা ভিখারী বলেই কি রাস্তায় বসিয়ে তাদের খাওয়াতে হবে, বিশেষত এটা যখন সে তার মা-বাবার স্মৃতিতর্পণ হিসেবেই করছে তখন এটাকে একটা ভব্য রূপ দিতে হবে। কিন্তু কোথায় করবেন প্রথমে ঠিক করতে পারছিলেন না, একবার ভেবেছিলেন যেখানে হাট বসে সেখানে করলে কেমন হয়, কিন্তু জায়গাটা বড় দূর, শহরের একেবারে বাইরে। তারপর হঠাৎ ডাক্তারবাবুর বাগানটার কথা মনে পড়ল তাঁর। ডাক্তারবাবুকে গিয়ে বলতেই সোল্লাসে তিনি রাজী হয়ে গেলেন।

"ভিখারীদের খাওয়াবে তুমি? খুব ভাল কথা। আমার বাগানটা নিশ্চয়ই ব্যবহার করতে পার—"

তারপর একটু থেমে বললেন—"কিন্তু একটি শর্তে—"

"কি বলুন "

"আমিও খাওয়াব ওদের কিছু। তাতে তুমি বাধা দিতে পারবে না"

বিষুণ বললে "আমার মা বাবার আত্মার তৃপ্তি হবে বলেই এই ভোজের আয়োজন করেছি আমি। এর সমস্ত খরচটা আমারই করা উচিত। আপনি করবেন কেন। কি খাওয়াতে চান বলুন, আমিই তার ব্যবস্থা করব"

ডাক্তারবাবুর চোখে মুখে একটা বেদনার ছায়া পড়ল যেন। তিনি বিষুণ মিস্ত্রীর দিকে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন, "দেখ বিষুণ, আমি তোমাদের আপন লোক মনে করি আমার এখন মনে হচ্ছে তোমরা কিন্তু আমাকে আপন লোক মনে কর না। তোমার দাদা যদি আজ একথা বলত তুমি কি আপত্তি করতে? তুমি কি ভাবতে পারতে তোমার বাবা মার আত্মার এতে তৃপ্তি হবে না? যাক এই যখন তুমি ভাবছ তখন আমার আর বলবার কিছু নেই আমার বাগান তুমি ব্যবহার কর যতদিন খুশি ব্যবহার কর– "

কথা অসম্পূর্ণ রেখে হঠাৎ ভিতরের দিকে চলে গেলেন ডাক্তারবাবু। বিষুণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু পরেই আবার বেরিয়ে এলেন তিনি। বিষুণের পিঠ চাপড়ে হেসে উঠলেন

"বেশ বেশ, তুমি যা বলবে তাই হবে। আমি তোমার ভিখারীদের সঙ্গে বসে কেবল খাব না, তাও দেবে না- "

হঠাৎ বিষুণ মিস্ত্রী একটা নাটকীয় কাণ্ড করে বসলেন।

হেঁট হয়ে ডাক্তারবাবুর পা দুটো ধরে বললেন, "আমাকে ক্ষমা করুন আপনি। আপনি ভিখারীদের যা খাওয়াতে চান খাওয়াবেন আমি আর আপত্তি করব না। আমি মূর্খ তাই আপনাকে বুঝতে পারিনি—আমাকে ক্ষমা করুন"

"এ কি কাণ্ড? ওঠ, ওঠ। সত্যি তোমার আপত্তি নেই?"

"না".

"তাহলে ওদের আমি দই খাওয়াব। মহিষাবপুরে গিয়ে দীনু গোয়ালাকে আজ বলে আসছি, মণ দুই—কত লোক হবে বল তো। তিন মণই বলে আসি তাহলে —"

"যথেষ্ট হবে"

"তাহলে ওই কথাই রইল। তোমার মেনু কি?"

"খিচুড়ি, দুটো নিরামিষ তরকারি, চারখানা করে লুচি, দু'রকম সন্দেশ আর বোঁদে"

"বেশ। দইটা তাহলে বেমানান হবে না। রান্না কোথায় হবে "

"এইখানেই হবে। আমি জন পাঁচেক রাঁধুনী ঠিক করেছি। বীণা বলেছে সে আলুকাবলি বানাবে—"

"আলুকাবলি না করে শুকনো শুকনো আলুর দম করুক। বীণা কে"

"শশধরের বউ—"

"ও মনে পড়েছে। ওইটুকু মেয়ে পারবে ও?"

"শশধরও থাকবে ওর সঙ্গে। তাছাড়া ওদের মানতি মাসী পাড়ার দু'চারটি মেয়েকে নিয়েও আসবেন, তরকারি কুটবেন তাঁরা—"

"ও মানতি মাসী। তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম একদিন। এখন বেশ ভালো হয়ে গেছেন তো"

"হ্যাঁ। কাল তাঁব বাড়ি গিয়েছিলাম। বেশ বল পেয়েছেন শবীরে"

"ভিখাবী ছাড়া বাইবেব লোকও খাবে নিশ্চয—"

"তা খাবে বই কি। আমাব গ্যারেজে যাবা কাজ কবে তাবা সপবিবারে খাবে। হবিবদেবও বলেছি। আমাব কাছে যাবা মোটর সাবায় তাদেরও বলেছি আমি। এদেব জন্যে একটু আলাদা ব্যবস্থা কবতে হবে"

"আলাদা ব্যবস্থা, মানে? আলাদা মেনু? তা কবতে যেও না। সেটা খাবাপ দেখাবে। ভিখাবীবা যা খাবে সবাই তাই খাবে। তা যদি না খাওযাও ভিখারীদের অপমান করা হবে সেটা। নিমন্ত্রণ কবে অপমান কবাটা কি ঠিক হবে? ভদ্রলোকদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা কবতে যেও না। সবাই একবকম খাবে"

"বেশ তাই হবে"

"সবাই ভিখাবীদেব সঙ্গে ব'সে খেলে সেটা আবও ভালো দেখাতো। কিন্তু তা হযতো সবাই বাজী হবে না। যাবা আলাদা খেতে চায তাদেব না হয আমার বাড়িব বাবান্দাতেই বসিযে দিও। চাবিদিকে চাবটা বাবান্দা আছে, কুলিযে যাবে—"

"চেযাব টেবিলেব ব্যবস্থা কবব কি—"

"না, না। বাজে খবচ কবতে যেও না, মাটিতে বসেই খাবে সবাই। তুমি ববং কিছু আসনেব যোগাড় কব। এখানকাব কাকে কাকে নিমন্ত্রণ কবেছ—?"

আমাব কাছে যাঁবা মোটব সাবান তাঁদেব বলেছি। আর দু'চার ঘর চেনাশোনা। বেশী হবে না। এ ভোজে সবাইকে নিমন্ত্রণ কবা উচিতও নয। কাল তো বামসদয়বাবু আমাকে অপমানই কবে বসলেন। বললেন, "আমি কি ভিখিরি যে আমাকে কাঙালী ভোজনে নিমন্ত্রণ করছেন?' আমি বললাম—'ডাক্তারবাবুর বাড়িতেই খাওয়াদাওযা হবে। আপনাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা থাকবে। আমার মা-বাবার স্মৃতির উদ্দেশ্যেই এই ভোজ, আপনি গেলে খুব খুশী হব।' রামসদয়বাবু বললেন—'ও বাবা ডাক্তাববাবুব বাড়িতে! তাঁব মতো মহৎ লোকেব বাড়িতে আমার মতো ক্ষুদ্র লোকের যাওয়াটা শোভা পায় না। মাপ করবেন, আমি যেতে পাবব না'—কি আর করব চলে এলাম। লোকটা সুবিধের নয়। আমার অনুরোধে ববির বাবাকে উনি চাকরি দিয়েছিলেন একটা। শুনছি তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন এখানে গোলা রাখবেন না। কিন্তু শ্রীনাথ উকিলের বখাটে ভাইটাকে বহাল করেছেন দেখলাম। প্যাঁচোয়া লোক। কাল আমি যখন গিয়েছিলাম তখন দেখলাম শ্রীনাথ উকিল ওঁর কাছে বসে আছে, মনে হল কি যেন একটা মন্ত্রণা করছে, আমাকে দেখে থেমে গেল—"

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন—"করুকগে। ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। ভোজের সব ব্যবস্থা করে ফেলেছ তো?"

"প্রায়। মাটির খুরি গেলাস অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। শালপাতাগুলো এখনও পাইনি। আজ সন্ধ্যে নাগাদ পেয়ে যাব। আপনার গাড়ি ভাল চলছে তো—"

"ফার্স্টক্লাস। কোনও 'ট্রাবল' নেই। কিছু গড়বড় হলেই তুমিই তো আগে খবর পাবে"

"আমি চলি এখন। সাগরমলের গাড়িটা খুলতে হবে"

বিষুণ মিস্ত্রী চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই ডাক্তারবাবু বুঝতে পারলেন রামসদয়বাবু শ্রীনাথ উকিলের সঙ্গে কি মন্ত্রণা আঁটছিলেন। ডাকপিওন একটি রেজিস্টার্ড উইথ্ অ্যাকনলেজমেণ্ট ডিউ চিঠি দিয়ে গেল তাঁকে। বসিদে সই করে চিঠি নিলেন তিনি। দেখলেন চিঠির প্রেরক হচ্ছেন উকিল শ্রীনাথ মিত্র। চিঠিতে তিনি যা লিখেছেন তার সারমর্ম এই যে তিনি তাঁর মক্কেলের হয়ে এ চিঠি লিখছেন। তাঁর মক্কেল শ্রীরামসদয় বসাক বাজারে একট মনিহারি দোকান খুলে তাতে বিকাশ ভট্টাচার্য নামক একজন ছোকরাকে কর্মী হিসাবে বহাল করেছিলেন। উক্ত ভট্টাচার্য একদিন হঠাৎ সবে পড়ল এবং পরে দোকানের চাবিটি তার বাবা দামোদর ভট্টাচার্য মাবফত ফেরত দিয়ে জানিযে দিল সে আর চাকরি করবে না। রামসদয়বাবু দোকান খুলে দেখলেন পাঁচ শত টাকার জিনিস অন্তর্ধান করেছে। এর পবেই তিনি খবর পেলেন যে উক্ত বিকাশ ভট্টাচার্যকে আপনি নাকি বহাল করেছেন। তিনি নিজে আপনাব বাড়িতে গিয়ে খবরটা দিলেন। এব পর আপনি যা করলেন তা খুবই আশ্চর্যজনক। আপনি কয়েকটি গুণ্ডা সমভিব্যাহাবে তাঁর দোকানে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনি এখনি লিখে দিন যে আপনাব দোকান থেকে কোন জিনিস চুরি যায়নি। যদি না দেন এই গুণ্ডারা আপনার দোকান তছনছ ক'রে দেবে। আত্মরক্ষার্থে তিনি একটি কাগজে আপনার নির্দেশ অনুযায়ী লিখতে বাধ্য হলেন যে দোকান থেকে কোন জিনিস চুরি যায়নি। কিছুদিন আগে আফজল খাঁ নামে একটি কাবুলিওলাও আপনার প্ররোচনায় বামসদয় বাবুকে নাকি শাসিয়ে গিয়েছিল। এ বিষয়ে থানায় তিনি একটি রিপোর্টও করেছেন। আপনি অবিলম্বে যদি পাঁচশত টাকা খেসারত দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলেন ভালই, অন্যথায় আমরা আদালতে আপনার নামে নালিশ করব।"

চিঠিটা পড়ে ডাক্তারবাবু বিকাশ আর অনুমানকে ডাকলেন। চিঠিখানা তাদের হাতে দিয়ে বললেন—"রামসদয়বাবুর কাণ্ড দেখ। লোকটার মতিচ্ছন্ন হয়েছে—"

বিকাশ অনুমান দু'জনই চিঠিখানা পড়ে দেখল। ইংরেজিতে লেখা বলে সবটা তাদের বোধগম্য হল না, কিন্তু তারা এটুকু বুঝতে পারল রামসদয় ডাক্তারবাবুর নামে একটি মিথ্যা মকদ্দমা করতে চাইছে।

ডাক্তারবাবু বললেন—"অনুমান তুমি গাড়ি করে নরেন উকিলের কাছে যাও। তাকে এ চিঠিটা দিয়ে এস আর বলে এস ওতে যা লেখা আছে তা সর্বৈব মথ্যা। এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত সে যেন জানায় আমাকে। ওখানে বেশী দেরি কোরো না। আমি মহিয়ারপুরে যাব দীনু গোয়ালার কাছে। দইয়ের ফরমাশ দিতে হবে"

অনুমান গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আতরি মেয়েটাকে মনে আছে আপনাদের? একবার মাত্র তার নাম উল্লেখ করেছি আগে। এই আতরির জন্যেই রবি বকুনি খেয়েছিল বিষুণ মিস্ত্রীর কাছে। উদগ্রযৌবনা মেয়ে। যদিও ভদ্র কায়স্থকুলে তার জন্ম কিন্তু তথাকথিত ভদ্র জীবন যাপন করবার সুযোগ পায়নি সে। কেউ ছিল না তার। মা বাবা ছেলেবেলাতেই মারা গিয়েছিলেন। আতরিই তাঁদের একমাত্র সন্তান ছিল। সে মানুষ হয়েছিল তার বাগদিনী দাইমার বাড়িতে। সেই ছিল তার অভিভাবক। বাগদিপাড়ায় বাগদীদের মধ্যেই মানুষ হয়েছিল সে। তার বাগদিনী দাইমাও যখন মরে গেল তখন তার আর কোন অভিভাবকই রইল না। বাগদী মায়ের দু'টি বড় বড় ছেলে ছিল, তারা আতরিকে বোনের মতই দেখত, কিন্তু শাসন করতে পারত না। কারণ তারাও সচ্চরিত্র ছিল না। চুরির অপরাধে বড় ভাইটার জেল হয়ে গিয়েছিল, ছোট ভাইটা চাকরী করত একটা ফ্যাকটরিতে, আর রোজ মদ খেয়ে গড়াগড়ি দিত রাস্তায়। আতরিই লক্ষ্মণকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যেত রোজ। তাকে বকত, মারত, তার পায়ে মাথা খুঁড়ত, সেবাও করত। আবার নবোদ্ভিন্নযৌবনা আতবি যখন জোয়ান ছোঁড়াদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করত তখন লক্ষ্মণ ধমকাত তাকে। অর্থাৎ কখনও আতরি লক্ষ্মণের অভিভাবক হত, কখনও লক্ষ্মণ আতরির। এইভাবেই চলছিল।

কিন্তু বেশী দিন এভাবে চলল না। লক্ষ্মণ দেখল ভদ্রলোকের ছেলেরাও আতরির জন্যে উতলা হয়ে পড়েছে। বিপিনবাবুর ছেলে রবি আর ওই মাতাল উকিল শ্রীনাথ মিত্র দু'জনেই প্রলুব্ধ করতে লাগল তাকে। শ্রীনাথ উকিল নিজে আসত না, লোক পাঠাত। শ্রীনাথ উকিল প্রস্তাব পাঠাল মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে সে আতরিকে দাই হিসেবে বহাল করতে চায়। মাইনে ছাড়াও বকশিস পাবে মাঝে মাঝে। গয়না শাড়ি তো পাবেই। শ্রীনাথ মিত্র বিবাহিত লোক, কিন্তু তার স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনাও নেই। ভদ্রমহিলা বন্ধ্যা, স্বামীকে ছেড়ে বাপের বাড়িতেই থাকেন। রবি গরীবের ছেলে, নিজেও বেকার ছিল তখন, তাই সে আতরিকে টাকার লোভ দেখাতে পারে নি, মিনতিভরা প্রণয় নিবেদনই করে যাচ্ছিল কেবল। আরতি ঠিক করতে পারছিল না কি করা উচিত। তবে এটা সে অনুভব করেছিল যে সংসারসমুদ্রের কোনও ঘাটে তাকে নোঙর ফেলতেই হবে। এভাবে ভেসে ভেসে কতদিন বেড়াবে সে? যে দুটো ঘাট আপাতত দেখা যাচ্ছে তার কোনটা নির্বাচন করলে তার জীবনসমস্যার সমাধান হবে এইটে সে ঠিক করতে পারছিল না। রবিকে তার ভালো লেগেছিল, কিন্তু সে গরীব, খুবই গরীব, কিন্তু কি সুন্দর চেহারা আর কথাগুলিও কেমন মিষ্টি। শ্রীনাথ লোকটাকে পছন্দ হয়নি আতরির। কিন্তু ওর টাকা আছে। বউটাও এখানে থাকে না। চেষ্টা করলে আতরিই একদিন ও বাড়ির সর্বেসর্বা হতে পারবে—এ সম্ভাবনাটাকেও সে তুচ্ছ করতে পারছিল না। শেষে একদিন লক্ষ্মণকেই সে সব খুলে বলল। লক্ষ্মণকে সে ছোটদা বলে ডাকত যদিও, কিন্তু আসলে সে তার বন্ধুস্থানীয় ছিল। মনের কোনও কথা সে গোপন রাখত না তার কাছে। বলল, "ছোটদা তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। তোমরা তো আমার বিয়েটিয়ে দিতে পারবে না। আমাকে নিজেই একটা ব্যবস্থা করে নিতে হবে। দুটো মিন্সে আমার পিছু নিয়েছে। এক ওই উকিল শ্রীনাথ, সে পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিয়ে আমায় রাখতে চায়।

বকশিস, শাড়ি, গয়না এসবও দেবে বলেছে। কিন্তু লোকটার বউ আছে, বাঁজা বউ ঝগড়া করে বাপের বাড়ি চলে গেছে, শুনলাম সেখানে না কি একটা ইস্কুলে মাসারি করছে। আব দ্বিতীয়জন হচ্ছে, বিপিনবাবুব ছেলে রবি। রবিকে আমার খুবই পছন্দ, কিন্তু ও যে বড্ড গরীব। এখন কি করি বল তো। আমি ঠিক করতে পাচ্ছি না''

লক্ষ্মণ খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে রইল।

তারপর বলল—''বোনাই হিসেবে শ্রীনাথ উকিলই ভালো। মালদার লোক—''

আতরি বললে—'ওই রবিকেই আমার পছন্দ কিন্তু। কেমন কার্তিকের মতো চেহারা—''

''গরীব কার্তিক নিয়ে কি করবি তুই! ওদেব তো দু'বেলা অন্ন জোটে না শুনেছি—''

''কিন্তু ছেলেটি সত্যিই ভালো ছোটদা। তাছাড়া ওরা কায়স্থ। আমাদের পালটি ঘর''

''দেখ আতবি যদি গুড় খেয়ে থাকিস তাহলে আমার কিছু বলবার নেই। নিজেই পস্তাবি একদিন কিন্তু।''

''না, না তুমি ভেবে বল কি করব''

''আচ্ছা এক কাজ করি তাহলে। তোর আপত্তি নেই তো?''

''কি কববে বলই না, শুনি''

''বিষুণদার কাছে চলে যাই। লোকটা খুব সাচ্চা লোক। বুদ্ধিও আছে। তাব কাছে গিযে পবামর্শ নিই?''

''কেন তোমাব মাথায় কিছু আসছে না?''

''আমি তো মুখ্যু মাতাল একটা। আমার মাথায় যা এসেছিল তা তো বললুম, কিন্তু তোব দেখছি ওই রবির দিকেই টান। এবকম অবস্থায কি কবা উচিত তা আমার মাথায় আসছে না। বিষুণদাকেই জিগ্যেস করি। কি বল—''

আতরি চুপ করে বইল একটু। তারপর বলল—''বেশ, যা ভাল বোঝ কর''

লক্ষ্মণ চলে গেল একদিন, বিষুণ মিস্ত্রীর কাছে।

বিষুণ লক্ষ্মণকে ভালবাসতেন। তাঁর মতে লক্ষ্মণের দোষ অনেক, কিন্তু গুণও আছে। প্রধান গুণ মিছে কথা বলে না, চুরি করে না। খেটে খায়। যে বোন তার নিজের বোন নয় তাকে প্রতিপালন করে। মদ খায় অবশ্য, এটাকে বিষুণ মিস্ত্রী দোষের মধ্যে ধরেন না, মদ তিনিও তো খান। তাঁর মতে, দোষ হচ্ছে মদ খেয়ে মাতলামি করা। লক্ষ্মণ মদ খেয়ে মাতলামি করে না, নেশা বেশী হলে রাস্তার ধারে শুয়ে পড়ে। আতরি যখন তাকে বকতে বকতে তুলে নিয়ে যায় তখন কোনও অসভ্যতা করে না তার সঙ্গে, ভাল-মানুষের মতো টলতে টলতে তার পিছু পিছু যায়। এই সব গুণের জন্য বিষুণ ভালবাসতেন লক্ষ্মণকে।

সেদিন সকালে লক্ষ্মণ যখন বিষুণ মিস্ত্রীর ওখানে গেল তখন তিনি ব্র্যাণ্ডির বোতলটি বার করে গেলাসে খানিকটা ঢেলেছেন। তিনি সাধারণতঃ কারো সামনে মদ খান না, কিন্তু যেহেতু লক্ষ্মণও ওই এক রসের রসিক তাই লক্ষ্মণের সামনে লুকো-ছাপার কোনও প্রয়োজন অনুভব করলেন না তিনি। গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, ''লক্ষ্মণ যে। কি খবর—''

লক্ষ্মণ ভক্তিভরে প্রণাম করে বসল একধারে।

"এলুম, একটা দরকার আছে। আপনি পান করে নিন তারপর বলব"

লক্ষ্মণ মাঝে মাঝে শুদ্ধ কথা বলে। বিষুণ লক্ষ্মণের প্রলুব্ধ দৃষ্টির দিকে চেয়ে আর একটি গ্লাস বার করলেন। তাতে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি ঢেলে এগিয়ে দিলেন সেটা লক্ষ্মণের দিকে। লক্ষ্মণ আর একবার প্রণাম করলে, তারপর সসম্ভ্রমে হাত বাড়িয়ে নিলে সেটা।

"বিলিতী বুঝি— "

"হ্যাঁ"

"রং আর গন্ধ থেকেই মালুম হচ্ছে সেটা। আমাকে একটু জল দিন। নির্জলা বিলিতী মাল পেটে সইবে না। ধেনো খাই তো—"

বিষুণ কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে তাকে দিলেন। নিজেও মিশিয়ে নিলেন খানিকটা জল। একটু হেসে বললেন, "আমি আগে নির্জলাই খেতাম। কিন্তু বনু কম্পাউণ্ডার মানা করে দিলে সেদিন। নির্জলা খেলে না কি লিভার খারাপ হয়"

লক্ষ্মণ বললে—"গলাও জ্বালা করে"

তারপর তারিয়ে তারিয়ে মদ্যপান করতে লাগল লক্ষ্মণ।

বিষুণ আলমারি খুলে নোনতা বিস্কুট বার করলেন। কয়েকটা লক্ষ্মণকে দিয়ে বললেন— "খা। ভালই লাগবে ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে।" নিজেও নিলেন দু'খানা। মদ খাওয়া শেষ হলে বিষুণবাবু বললেন, "কি দরকার তোর, বল। আমাকে বেরুতে হবে এখুনি—"

"আতরিকে চেনেন তো—"

"খুব চিনি। ও তো শুনছি তোদের পাড়া মাতিয়ে তুলেছে—"

"আতরি কিন্তু নিষ্পাপ। অনেকে ওর পিছনে ঘুরঘুর করছে বটে কিন্তু এখনও ওর পা পেছলায় নি। ভদ্দর-লোকের ছেলেও আছে দু'জন। আমি একটু মুশকিলে পড়েছি। আতরিও পড়েছে। তাই আপনার কাছে একটু পরামর্শ করতে এলুম—"

"এতে আর পরামর্শের কি আছে। লাঠি মেরে হাঁকিয়ে দে সব ব্যাটাকে"

"তা দিতে পারি। বাগদী পাড়ায় ষণ্ডা ছোঁড়ার অভাব নেই। কিন্তু ভিতরে একটা কথা আছে। আতরিই তুলেছে কথাটা—"

"কি কথা"

"আসল কথা হচ্ছে কি জানেন, আতরি হচ্ছে কায়স্থের মেয়ে, আমাদের সমাজে ওর বিয়ে হবে না। ওকে নষ্ট করবার লোক জুটবে, কিন্তু বর জুটবে না। যে দুটি ভদ্রলোক আতরির দিকে ঝুঁকেছে, তারা দু'জনেই কায়স্থ। শ্রীনাথ উকিল, আর বিপিনবাবুর ছেলে রবি। শ্রীনাথ উকিল বলে পাঠিয়েছে ওকে এখন মাসে পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিয়ে বহাল করবে। শ্রীনাথের স্ত্রী থেকেও নেই। তাই শেষ পর্যন্ত হয়তো আতরিকে ও বিয়েই করে ফেলবে। আতরি অবশ্য যদি ওকে ভাল ক'রে খেলাতে পারে। কিন্তু আতরির ওকে তেমন পছন্দ না, ওর পছন্দ রবিকে। রবি এদিকে ছেলে নিন্দের নয়, কিন্তু ভারী গরীব যে। আতরি বলছে আমাকে নিজের হিল্লে নিজেই করে নিতে হবে, তোমরা চিরকাল আমার ভার নিতে পারবে

না। দুটো ভদ্রলোক এখন আমার দিকে ঝুঁকেছে আমি কাকে বেছে নিই সেটা তোমরা ঠিক করে দাও''

বিষুণবাবু বললেন—''আচ্ছা আতরিকে পাঠিয়ে দিস আমার কাছে। আমি তার সঙ্গেই কথা কইব''

''আতরি কি আসতে চাইবে''

''না আসতে চায়, আমি তার কাছে যাব। ব্যাপারটা তার মুখ থেকেই শুনতে চাই। তাকেই আমি যা বলবার বলব''

''বেশ, বলব তাকে''

লক্ষ্মণ প্রণাম করে উঠে চলে গেল।

শ্রীনাথ মিত্র উকিলের সম্বন্ধে বিষুণেরও ভালো ধাবণা ছিল না। প্রথম প্রথম যখন প্র্যাকটিস আরম্ভ করে তখন থার্ডহ্যাণ্ড ভাঙা ফোর্ড কিনেছিল একটা। বিষুণ খেটেখুটে খাড়া করে দিয়েছিলেন মোটরটাকে। কিন্তু শ্রীনাথের কাছ থেকে একটি পয়সা আদায় কবতে পারেননি। নানা বাহানা করে টাকাটা দেয়নি। শেষ পর্যন্ত বলেছিল আপনি যে 'বিল' পাঠিয়েছেন তা আমি কলকাতার একজন মোটর মেকানিককে দেখিয়েছিলাম। তিনি বললেন যা হওয়া উচিত তার তিনগুণ 'বিল' করেছেন আপনি। এ টাকা আমি দেব না, আপনাব ইচ্ছে হয় আপনি আমার নামে 'কেস' করতে পারেন। বিষুণ 'কেস' কবেনি। দিনকতক পরে মোটবের আবার কি যেন বেগড়াল, অচল হয়ে পড়ল গাড়িটা। বিষুণকে আবাব ডেকেছিলেন শ্রীনাথ মিত্তির। বিষুণ আর যাননি। হবিবকেও টিপে দিয়েছিলেন, হবিব যেন গাড়িতে হাত না দেয়। হবিব বিষুণের ভক্ত, বিষুণের কাছেই কাজ শিখেছে সে। সে শ্রীনাথ মিত্তিরকে সোজা বলে দিলে আমি পারব না। কিছুদিন পরে শ্রীনাথকে মোটরটা জলের দামে বিক্রি কবে দিতে হল। এখন সাইকেলে করেই ঘোরাফেরা করেন। বিষুণবাবু এও জানতেন যত কুচক্রী লোকের সঙ্গে ভাব লোকটার। মিথ্যে মকদ্দমা সাজাতে ওস্তাদ। গুজব স্ত্রীর উপরও না কি অত্যাচার করত খুব। আতরিকে সে কেন বহাল কবতে চায় তা অস্পষ্ট রইল না বিষুণেব কাছে। বিয়ে তো করবেই না, শেষ পর্যন্ত হয়তো মাইনেও দেবে না। এই সব কথা ভাবতে ভাবতেই গ্যারেজের দিকে চলেছিলেন বিষুণ মিস্ত্রী। গ্যারেজে গিয়ে ভাগ্যক্রমে রবিব সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল। রবি মাঝে মাঝে তাঁর গ্যারেজে আসত। রবিকে তিনি আপ্রেন্টিস করে নিয়ে কাজ শেখাতে চেয়েছিলেন বিপিনবাবুর খাতিরে। রবি নিমরাজী গোছ হয়েছিল। কিন্তু বিষুণ দেখলেন রোজ সে আসে না, মাঝে মাঝে আসে, আব এসে কাজ না ক'রে আড্ডা দেয় খালি। বিষুণ একদিন ধমকে দিলেন তাকে।

''তুমি কি খালি বকবক করবার জন্যে এখানে আস না কি। কাজ শিখতে চাও তো লেগে পড়। এই গাড়ির প্লাগগুলো খুলে পরিষ্কার কর—''

রবি দাঁত বের করে বলেছিল, ''ভেবে দেখলুম আমি ওসব পারবনা। আমি ড্রাইভারি শিখতে চাই''

''তাহলে তাই শেখ গিয়ে। এখানে বসে আড্ডা মারছ কেন''

"হালিমের কাছে এসেছি। ওর শালার একটা গাড়ি আছে সেই গাড়িটা নিয়ে শিখব আমি। হালিম আমাকে নিয়ে যাবে বলেছে—"

সেদিনও রবির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বিষুণের।

"রবি শোন। তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে"

রবিকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বিষুণ কোন ভূমিকা না করেই প্রশ্ন করলেন—"আতরি মেয়েটার সঙ্গে তোমার ভাব হয়েছে?"

রবি ঢোঁক গিলে বললে—"আতরি মেয়েটার সঙ্গে? হ্যাঁ মাঝে মাঝে দেখা হয়"

"লক্ষ্মণ এখুনি এসেছিল। তার মুখে সব শুনেছি। সে বললে তুমি নাকি খুব জমিয়েছ আতরির সঙ্গে। আতরিরও তোমাকে ভালো লেগেছে। লক্ষ্মণ জিগ্যেস করতে এসেছিল এখন কি করা উচিত। তোমার কাছে একটা কথাই জানতে চাই—তুমি ওকে বিয়ে করতে রাজী আছ? আতরি বাগদীর ঘরে মানুষ হয়েছে কিন্তু ও কায়স্থের মেয়ে। বিয়ে করতে রাজী আছ?"

"বিয়ে করতে? বাবাকে জিগ্যেস করি—"

"প্রেম করবার সময় কি বাবার মত নিয়েছিলে?"

ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল রবি। অনেক প্রশ্ন করেও তার মুখ থেকে আর কোন উত্তর বার করতে পারলেন না বিষুণ মিস্ত্রী।

"ভীরু নপুংসক কোথাকার—"

বিষুণ মিস্ত্রী রেগেমেগে চলে গেলেন। রবিও স'রে পড়ল।

এর দুদিন পরে আতরি একদিন সকালে তাঁব বাড়িতে এল। তিনি বললেন—"আমি সব শুনেছি। তোমার কি রবিকেই বেশী পছন্দ?"

ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল আতরি।

"রবি কিন্তু তোমাকে বিয়ে করবে না। তাকে আমি জিগ্যেস করেছিলাম। ওর আশা তুমি ছেড়ে দাও"

"শ্রীনাথবাবুর চাকরিটাই নেব তাহলে?"

"ও লোকটাও পাজী—"

"আমি কিন্তু এভাবে আর থাকতে পারছি না। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। ছোটদা কতদিন আমার ভার বইবে? শ্রীনাথবাবুর চাকরিটাই নিচ্ছি আমি। এত মাইনে আব কেউ দেবে না—"

"মাইনে হয়ত দেবেই না। অতি পাজী লোক!"

"আমি ওকে বলব মাইনে প্রতি মাসে যদি অগ্রিম দাও তাহলেই আমি কাজ করব"

"ওরকম লোকের কাছে ইজ্জৎ বাঁচিয়ে কাজ করতে পারবে?"

"নিশ্চয়। জোর করে আমার ইজ্জৎ নষ্ট করবে সে রকম মরদ এখনও জন্মায়নি। যদি বেচাল দেখি ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব"

খুশী হলেন বিষুণ মিস্ত্রী।

"বেশ তাহলে ওইখানেই কাজ নাও"

এসব অনেক আগের ঘটনা।

বামসদয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শ্রীনাথ উকিল যখন ডাক্তারবাবুকে চিঠি দিয়েছিলেন তখনও আতরি শ্রীনাথবাবুর বাড়িতেই চাকরি করছিল নিজের ইজ্জৎ পুবোপুরি বজায় রেখেই। তাব সদম্ভ আত্মমর্যাদার কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল শ্রীনাথকে। আতবির দাবি অনুযায়ী প্রত্যেক মাসেই অগ্রিম মাইনে দিতে হচ্ছিল তাঁকে। একজোড়া ভালো শাড়িও কিনে দিয়েছিলেন. মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন বলেই শ্রীনাথকে এসব করতে হচ্ছিল। কিন্তু যেদিন তিনি তার ইজ্জতেব আবরু উন্মোচন করবার চেষ্টা করলেন সেইদিনই ফোঁস ক'রে উঠল আতরি। বললে—"আজ যা করেছেন করেছেন, অন্যদিন যদি এবকম বেয়াদপি করেন আমি চাকরি ছেড়ে চলে যাব আর ঢাক পিটিয়ে রাষ্ট্র করে দেব সব।

"আমার কি তাহলে কোন আশা নেই"

করুণকণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন শ্রীনাথ।

আতবি বলল—"আছে. যদি আপনি পুরুত ডেকে আমাকে বিয়ে করেন। আমবাও কায়স্থ, আমার বাবার উপাধি ছিল ঘোষ। আপনি আমাদেব পালটি ঘব—"

"কিন্তু আমাব যে বউ আছে। বিয়ে করব কি করে? আইনে যে বাধে—"

"তাহলে আমাব ছায়া মাড়াবেন না। আমি আপনাব সব কাজ করে দেব. কিন্তু যা বলছেন তা পারব না। ও কথা যদি ফের বলেন আর আপনার বাড়ি আসব না"

"না না. না আসবে না কেন? বহাল করেছি যখন থাকো তুমি। তোমাব অমতে কিচ্ছু করব না আমি"

শ্রীনাথ ভাবছিলেন বোধহয় কালক্রমে আতরি হয়তো নবম হয়ে যাবে। খেলাতে হবে কিছুদিন। আতরিও ভাবছিল কিছুদিন পরেই বাবু হয়তো বিয়ে কবতে রাজী হয়ে যাবেন, খেলাতে হবে কিছুদিন।

এইভাবেই চলছিল।

আতবিকে দেখে রামসদয়ও আসতে আরম্ভ করেছিলেন শ্রীনাথের বাড়িতে। ববির বাবা বিপিনবাবুকে বরখাস্ত করে তাঁর গুদোমে বহাল করেছিলেন শ্রীনাথেব দূর সম্পর্কের গবেট ভাই বসন্তকে। বসন্ত শ্রীনাথের বাড়িতে চাকরেব মতো থাকত ফাইফরমাই খাটত বান্নাও করত। কিন্তু আতরিকে বহাল করার পর শ্রীনাথ অনুভব করলেন ভাইটাকে বাড়ি থেকে সরাতে হবে। রামসদয় যখন নিয়মিতভাবে আসতে লাগলেন তাঁর বাড়িতে তখন তাঁকে একদিন বললেন. "আপনার তো অনেক ব্যবসা, আমার বেকার ভাইটাকে কোথাও লাগিয়ে দিন না।"

"আমার এখানকার গুদোমে বিপিনবাবু আছেন, লোকটা কাজের কিন্তু বড্ড বুড়ো. দৌড়ঝাঁপ করতে পারে না. বিপিনবাবুকে বিদেয় করে দিয়ে ওকেই বহাল করি। বিপিনকে রাখব না"

আতরি ঠিক পাশের ঘরের মেজেতে বসে তরকারি কুটছিল। দুটো ঘরের মাঝখানে যে

কপাট ছিল সেটা বন্ধ ছিল না। এ ঘরের কথাবার্তা ওঘরে শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। 'বিপিনবাবু' নামটা শুনেই সে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। বিপিনবাবু রবির বাবা। রবির সম্বন্ধে তার দুর্বলতা ছিল তখনও। সে খবর পেয়েছিল রবি মোটর ড্রাইভারের কাজ শিখছে। সে যদি ড্রাইভার হয় আর তারপর যদি সে বিয়ে করতে চায়......এই ধরণের রঙিন স্বপ্ন এখনও তার মনের আকাশের প্রত্যন্ত প্রদেশকে রঞ্জিত করে রেখেছিল। সে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল ওরা বিপিনবাবু সম্বন্ধে কি আলোচনা করছে।

রামসদয়বাবু বললেন—''বিপিনকে আমি সরাতে চাই। আর একটা কারণে। বিপিন হচ্ছে বিষুণ মিস্ত্রীর লোক। বিষুণের কথাতেই ওকে বহাল করি। পরে আবিষ্কার করলুম বিষুণ হচ্ছে আপনাদের ওই মহামহিম ডাক্তারবাবুটির ভক্ত একজন। বিপিনকেও কথায় কথায় একদিন জিগ্যেস করলাম ডাক্তারবাবুর কথা। বিপিন সংক্ষেপে বললেন—উনি দেবতা। দেখলাম ওরে বাবা। এ রকম ভক্তিমান লোকের সঙ্গ তো বেশীদিন সহ্য করতে পারব না। তারপর আমার দোকানের কাণ্ডটা হয়ে গেল। ডাক্তারবাবুর স্বরূপটি স্বচক্ষে দেখলাম। কিন্তু কি করব, চুপ করে থাকতে হল। ইট খেয়ে যে পাটকেলটি মারব সে রকম সামর্থ্য তো নেই আমার—''

উকিল শ্রীনাথ বললেন—''নেই কেন। আমি তো আছি। আপনি যদি আপত্তি না করেন ওর নামে মকদ্দমা ঠুকে দিই একটা—''

''কি মকদ্দমা ঠুকে দেবেন- ''

''মিথ্যে মকদ্দমা। লোকটাকে জব্দ করাই তো উদ্দেশ্য আমাদের। প্রথমে একটা চিঠি দিই যে আপনি গুণ্ডা নিয়ে আমার দোকানে গিয়ে জোর ক'রে আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন যে আমার দোকানের সব জিনিস ঠিক আছে। যদিও আমার পাঁচশ' টাকার জিনিস পাওয়া যাচ্ছিল না তবু আমি প্রাণের ভয়ে ওকথা লিখে দিয়েছিলাম। আপনি যদি ওই পাঁচশ টাকা আমাকে না দেন তাহলে আমি আপনার নামে কেস করব''

''তারপরে - ''

''যদি আপনাকে টাকাটা দিয়ে দেয় ভালই। যদি না দেয় তাহলে কেস করব—''

''কেস করলে জিততে পারবেন?''

''মিথ্যে সাক্ষী তৈরী করতে হবে। রামু, ঘনা, কেশব, যদু এই চারটে গুণ্ডা আমার কাছ থেকে টাকা খেয়ে প্রায়ই মিথ্যে সাক্ষী দেয়। ওরা কোর্টে গিয়ে বলবে যে ডাক্তারবাবু ওদের নিয়ে আপনার দোকানে গিয়েছিলেন টর্চ কিনে দেবেন বলে। দোকানে গিয়ে ডাক্তারবাবু কিন্তু আপনাকে ভয় দেখিয়ে একটা কাগজে লিখিয়ে নিলেন যে আপনার দোকান থেকে কিছু চুরি যায়নি। ওরা বলবে—আমরা প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। ডাক্তারবাবু বলছিলেন আমাদের প্রত্যেককে একটা ভাল টর্চ কিনে দেবেন। উনি অনেককে অনেক জিনিস উপহার দেন, আমরা ভেবেছিলুম আমাদেরও বুঝি দেবেন। দোকান থেকে বেরিয়ে এসে উনি আমাদের প্রত্যেককে দশ টাকা করে দিয়ে বললেন তোমরা অন্য জায়গা থেকে টর্চ কিনে নাও—''

''এ কথা বলবে ওরা?''

"টাকা পেলে আলবাৎ বলবে। তবে ওদের কিছু দিতে হবে"

"তা দেব"

"আর কিছু না হোক লোকটাকে বিব্রত করা তো হবে। আপনার উকিল আমি আছি, আমাকে কিছু দিতে হবে না আপনার। ডাক্তারবাবুর উকিল বোধহয় নরেনবাবু, তিনি আশা করি ডাক্তারবাবুর কাছে মোটা 'ফি'ই নেবেন, সিনিয়র লোক তিনি। যাই হোক ঠুকে তো দেয়া যাক এক নম্বর, আর কিছু না হোক লোকটা হিমশিম খেয়ে যাবে। কি বলেন, আপনার মত আছে?"

"বেশ তো"

"তাহলে লেগে পড়ি। প্রথমে এই কাগজটায় জট্ ডাউন (jot down) কবে নি আমাদেব কি কি কবতে হবে। প্রথম ডাক্তারবাবুকে হুমকি দিয়ে একটা চিঠি লেখা, দ্বিতীয় চিঠিব জবাবের জন্য দশ দিন অপেক্ষা কবা, তৃতীয় ওই গুণ্ডাগুলোব সঙ্গে কথাবার্তা কবে তাদের হাত করা, চতুর্থ কেস ঠুকে দেওয়া, পঞ্চম আমাদেব নামজাদা ক্রিমিনাল উকিল মিস্টাব লাহিড়ীর সঙ্গে পরামর্শ করা, সম্ভব হলে তাঁকে আমাদের পক্ষে নিযুক্ত করা—আপাততঃ এই পাঁচটা কাজ কবতে হবে—"

আতরি পাশের ঘরে বসে সব শুনছিল। মনেব ভিতর আগুন জ্বলছিল তাব। এখানে যে লোকটিকে সে সবচেয়ে বেশী ভক্তি করে সেই ডাক্তারবাবুকে ওবা মিথ্যে মকদ্দমায জড়াবাব চেষ্টা করছে? ববির বাবাকে চাকবি থেকে ববখাস্ত কবেছে সে ডাক্তাববাবুকে 'দেবতা' বলেছিল বলে। বিষুণ-বাবাকে ঠাট্টা করেছে সে ডাক্তাববাবুব ভক্ত বলে! বাবান্দায তোলা উনুনটায় আঁচ গনগন কবছিল, আঁচ গনগন করছিল আতরিব মনেও। কিন্তু সে একটি কথা বলেনি। অগ্নিগর্ভ পর্বতেব মতো বসেছিল চুপ কবে। এমন সময় বাড়িব সামনে একটা হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড বেধে গেল। দারুণ চীৎকার চেঁচামেচি। কে যেন কাকে মারছে। বামসদয়বাবু ও শ্রীনাথবাবু তাড়াতাড়ি উঠে বাইবে গেলেন। একটা রিক্‌শাওয়ালকে ধরে মারছে সবাই। তার অপরাধ সে নাকি একটা ছোট ছেলেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিযেছে। মাথা কেটে গেছে ছেলেটার।

রামসদয় আর শ্রীনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই আতরি ঘরে এসে ঢুকল। দেখল শ্রীনাথ যে কাগজে মকদ্দমার পয়েন্টগুলো জট্ ডাউন করেছিল সেই কাগজখানা শতরঞ্জির উপর পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে কাগজটা তুলে নিল সে। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

।। ষোল ।।

বিষুণের কাঙালীভোজন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়ে গেল। দীনু গোয়ালাকে ফরমাশ দিয়ে ডাক্তারবাবু যে দই আনিয়েছিলেন তা খেয়ে ধন্য ধন্য করতে লাগল সবাই। বীণার আলুর দমও উতরেছিল খুব। বীণা শুধু রাঁধেই নি, গাছকোমর বেঁধে পরিবেশনও করেছিল। মানতি মাসী এসেছিলেন। বীণা ওরই মধ্যে তাঁর জন্যে আলাদা করে ঝোলভাত করে

দিয়েছিল। মানতি মাসী কুটনো কোটায় সাহায্য তো করেই ছিলেন, পানও সেজেছিলেন। তারপর ভোজের পর মাজা বাসনগুলি গামছা দিয়ে মুছে মুছে সাজিয়ে রেখেছিলেন। অনুমান আর বিকাশও খুব খেটেছিল, বিষুণের সমস্ত ফাইফরমাশ, ডাক্তারবাবুর ফাইফরমাশ এমন কি বীণারও ফাইফরমাশ খেটেছিল তারা। শশধর ভাঁড়ার ঘরের চার্জে ছিল। ডাক্তারবাবু কাঙালীদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে খেয়েছিলেন। হবিবের সঙ্গে রবিও এসেছিল। হবিব বিষুণের হাতে পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে বললে—"রবির বাবার জন্যে এই টাকা এনেছি।"

"প্রতি মাসেই দেবে তো?"

"সেই শর্তেই ওকে একশ টাকা মাইনে দিয়ে বহাল করেছি।"

"ওর লাইসেন্স হয়েছে?

"হয়ে গেছে"

"ট্যাক্সি কেমন চলছে? একশ' টাকা মাইনে দিয়ে পোষাবে?

"সব খরচ-খরচা বাদ দিয়ে রোজ প্রায় দশ টাকা আন্দাজ বাঁচে আমার"

"তাহলে তো ভালই"

হাববকে ডাক্তারবাবুর বারান্দাতেই খেতে দেওয়া হল। ডাক্তার শৈলেনবাবু, দারোগা যতীনবাবু, উকিল নরেনবাবু, জন কয়েক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকও এসেছিলেন। তাঁরাও বারান্দায় ব'সে খেলেন। ডাক্তারবাবু স্বয়ং তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন, তাদের। ডাক্তারবাবু নরেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "শ্রীনাথবাবু আমাকে যে চিঠিটা পাঠিয়েছেন সেটা দেখেছ তো। কি করা যায় বল তো—"

"কি আর করবেন, গ্যাঁট হয়ে বসে থাকুন। আপনার হয়ে একটা জবাব দিয়ে দিয়েছি তাকে—"

"কি জবাব দিলে—"

"দিলাম যে আপনার চিঠি পেয়ে আশ্চর্য হলাম। আপনি চিঠিতে যে সব কথা লিখেছেন তা সত্য নয়। আপনি অবিলম্বে যদি চিঠিটি প্রত্যাহার করে না নেন তাহলে আইনত আমি আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করব"

"আইনত আত্মরক্ষা করব মানে? মকদ্দমা করব? তা আমি করতে চাই না নরেন। তুমি মিটিয়ে নাও। এর জন্যে যদি কিছু টাকা লাগে তা না হয় আমি দেব। শ্রীনাথকে ডেকে মিটিয়ে নাও তুমি। কারো সঙ্গে ঝগড়া বা মনোমালিন্য রাখতে চাই না আমি।"

'কিন্তু ওরা যদি মকদ্দমা করে আপনাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হবে। আপনার সম্মান যাতে নষ্ট না হয় তা আমাদের দেখতে হবে বইকি। আপনি আমার উপর সব ছেড়ে দিন না, আমি সব ব্যবস্থা করছি। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ, আমরাও শঠ হতে জানি তা বুঝিয়ে দেব ভদ্রলোককে।"

"কি করবে তুমি? কারো সঙ্গে অভদ্রতা কোরো না যেন"

"না, না, অভদ্রতা করব কেন। ও আপনাকে অপমান না করলে কিছুই করতাম না। কিন্তু সে ধৃষ্টতা ওর যখন হয়েছে তখন হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব আমি, ও যে কত পাজী তা প্রমাণ

করে দেব আদালতে। যা বলব তা একটিও মিথ্যে নয় সব সত্যি। আরে, সেই মেয়েটা এখানেও এসেছে দেখছি—"

বিষুণ কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

"বিষুণ ওই মেয়েটাকে ডাক তো—"

"আতরিকে?"

"ওর নাম আতরি নাকি? ওই যে ডুরে শাড়ি-পরা মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে—"

"হ্যাঁ, ওই তো আতরি। আতরি এদিকে আয় নরেনবাবু তোকে ডাকছেন—"

আতরি কাছে এসেই ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করলে প্রথমে। তারপর আর সকলকেও করলে।

ডাক্তারবাবু জিগ্যেস করলেন—"মেয়েটি কে?"

আতরিই উত্তর দিল।

"আমি ননী ঘোষের মেয়ে। তিনি হরিগঞ্জে তেল কলে চাকরি করতেন। আপনি কতবার চিকিৎসা করেছেন তাঁর—আমারও ছেলেবেলায় চিকিৎসা কবেছেন আপনি"

"ননীবাবু? "ও মনে পড়েছে। তিনি তো কাটোয়ায় মারা গিয়েছিলেন শুনেছি।"

"হ্যাঁ। কলেবা হয়েছিল। কাটোয়ায তেল নিযে গিয়েছিলেন। সেইখানেই কলেবা হয়। আর ফেরেন নি। আমি এখানেই থেকে গেলাম!"

"কোথায় থাকো?"

"আমার মা খুব ছেলেবেলায় মাবা যান। বাগদীপাড়ার দাইমা মানুষ করেছেন আমাকে। সেইখানেই আছি—"

"ও"

নরেনবাবু এবার প্রশ্ন করলেন!

"তুমি সেদিন আমার কাছে গিয়েছিলে। মকদ্দমা ঠুকে দি তাহলে?"

"দিন—"

"শেষকালে পিছিয়ে যাবে না তো। তুমি লিখতে পড়তে পার?"

"বাংলা পারি—"

"তাহলে কাল যেও আমার বাড়িতে। আমি বাংলায় একটা দরখাস্ত লিখে রাখব। তার তলায় তোমাকে সই করতে হবে। সই করতে পারবে তো?"

"পারব—"

"কাল তাহলে ন'টার সময় এসো"

"আচ্ছা"

আতরি চলে গেল। আতরিকে বিষুণবাবু নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আতরি হয়তো আসত না, কিন্তু রবি এসেছে এই খবরটা পেয়ে সে এসেছিল। আতরি চলে আসবার পর বিষুণ মিস্ত্রী এগিয়ে এলেন।

নরেনবাবু জিগ্যেস করলেন, "আপনি চেনেন ওই মেয়েটাকে—"

"খুব চিনি—"

"ও কি এখনও শ্রীনাথ উকিলের বাড়িতে কাজ করছে?"

"না, না। যেদিন আপনার ওখানে গিয়েছিল সেইদিনই ও কাজ ছেড়ে দিয়েছে। আমিই ওকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম।"

"তাই না কি— "

"সেইদিনই ও আমাকে একটা কাগজ দিয়ে গেছে। পেন্সিল দিয়ে ইংরেজিতে লেখা। শ্রীনাথের ঘরে এটা না কি কুড়িয়ে পেয়েছিল। আমিও ভাল বুঝতে পারিনি। দেখুন তো—"

বিষুণ তাঁর কোটের ইনার পকেট থেকে কাগজটি বার করে নরেনবাবুকে দিলেন। সেটা পড়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল নরেনবাবুর মুখ।

"এই তো ব্রহ্মাস্ত্র পেয়ে গেছি। আর বাছাধন যাবেন কোথা"

দারোগা যতীনবাবু আর ডাক্তারবাবু একটু দূরে সরে গিয়ে নিম্ন কণ্ঠে আলাপ করছিলেন। ডাক্তারবাবু যতীনবাবুকে বলছিলেন, "নরেন যে রকম ঝুঁকেছে তাতে মনে হচ্ছে ও মকদ্দমা করবেই। কিন্তু আমার সেটা ইচ্ছে নয়। আপনি বলে কয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিন মশায়। মকদ্দমা করলেই আমাকে আদালতে যেতে হবে, উকিল জেরা করবে, ভিড় জমে যাবে—এসব আমি বরদাস্ত করতে পারব না। আপনি নরেনকে বুঝিয়ে বলুন—ও নরেন এদিকে শোন যতীনবাবুর সঙ্গে কথা কও—"

নরেনবাবু এগিয়ে এলেন। বিষুণ চলে গেলেন আতরির কাছে গিয়ে বললেন—"তুই যে কাগজটা এনে দিয়েছিস, নরেনবাবু বললেন সেটা নাকি ব্রহ্মাস্ত্র। অনায়াসে শ্রীনাথকে ঘায়েল করা যাবে। রবি এসেছে, দেখেছিস? ও ড্রাইভারির লাইসেন্স পেয়ে গেছে"

আতরি অন্যমনস্ক হবার ভান করল যেন কিছু শুনিতে পায়নি। তারপর বলল—"খুব খেয়েছি। এবার বাড়ি যাই। ছোটদা দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্যে"

দূরে লক্ষ্মণ সত্যিই তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল, দু'জনে বাড়ি চলে গেল।

নরেনবাবু বললেন, "আপনি ভাবছেন কেন। যে কাগজ হাতে পেয়েছি তাতে বাছাধন নিজের ফাঁদেই ধরা পড়েছেন। ওকে জানিয়ে দেব আপনারই ছাপা 'লেটারহেড'-ওয়ালা কাগজে আপনার হাতের লেখায় আমরা অকাট্য প্রমাণ পেয়েছি যে আপনি ডাক্তারবাবুর নামে একটা মিথ্যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তাছাড়া আতরির কেসটাও কালকে রুজু করে দেব!"

"আতরির আবার কি 'কেস'"—জিগ্যেস করলেন ডাক্তারবাবু।

"আতরি বলছে উনি ওর উপর বলাৎকার করতে গিয়েছিলেন। ওঁর চাকর হিনুয়া সাক্ষী আছে"

যতীনবাবু বললেন—"ও আমার কাছে একটা দরখাস্ত করুক না। আমি লোকটাকে অ্যারেষ্ট করে ফেলি"

ডাক্তারবাবু বারবার বলতে লাগলেন—"না, না, ওসব কিছু করতে যেও না তোমরা। মিটিয়ে ফেল। দেখ, ঝগড়াঝাঁটি করে লাভ হয় না শেষ পর্যন্ত—"

শেষ পর্যন্ত উকিল নরেনবাবু বলে গেলেন "আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি ঠিক টিট্ করে দেব ওকে"

যতীনবাবু বললেন—"আপনি ঘাবড়াবেন না। আমরা আপনার পক্ষে আছি। ভাববেন না কিছু"

চলে গেলেন তাঁরা। একটু পরে একে একে সবাই চলে গেলেন। বিষুণ মিস্ত্রীও। বারান্দার একধারে ইজিচেয়ারে শুয়ে পায়ের পাতা নাচাতে লাগলেন ডাক্তারবাবু। তারপর হঠাৎ উঠে পড়লেন তিনি।

"লোচন, লোচন—"

"লোচন এসে হাজির হল।

"গাড়ি বার কর। বেরুব"

"বেশী দূরে যেতে হবে কি? পেট্রোল বেশী নেই—"

"বেশী দূরে যাব না। শ্রীনাথ উকিলের বাড়ি যাব। বাড়িটা চেন তুমি?"

"চিনি"

"সেইখানে চল। আমাকে নাবিয়ে দিয়ে পেট্রোল কিনে এনো—"

শ্রীনাথ আশা করেন নি যে ডাক্তাববাবু তাঁর বাসায় এসে হাজির হবেন। বামসদযবাবুও উপস্থিত ছিলেন সেখানে।

"নমস্কার নমস্কার। আপনিও আছেন এখানে ভালই হ'ল। আমি আপনাব কাছেও যাব ভেবেছিলাম। এখানেই দেখা হয়ে গেল ভালই হল!"

শ্রীনাথ বা রামসদয় কারো মুখ দিয়েই কোন কথা সরছিল না। শ্রীনাথ ভিজা বিড়ালেব মতো আর রামসদয় গরু-চোরেব মতো চেয়ে বইলেন তাঁর দিকে। তাঁকে বসতে পর্যন্ত বললেন না। ডাক্তারবাবু নিজেই একটা চেয়াব টেনে বসে পড়লেন। তাবপর বললেন, "আপনাদের রেজিস্টার্ড চিঠি আমি পেয়েছি। আমার উকিল নরেন হযতো তার জবাব দিয়েছে আপনাদের। কিন্তু আমি এসেছি আপনাদের কাছে একটা সোজা কথা জানবার জন্য। আপনারা জানেন চিঠিতে যে কথা আপনারা লিখেছিলেন তা সর্বৈব মিথ্যে। কিন্তু ওরকম ডাহা মিথ্যে কথা লিখে আমাকে বিব্রত করছেন কেন সেইটে আমি জানতে চাই। আমার অপরাধটা কি, কেন আমার উপর আপনাদের রাগ সেইটে আমাকে জানিয়ে দিন। কারো মনে দুঃখ দেবার ইচ্ছে নেই আমার, কারও রাগের কারণ হয়ে থাকতেও চাই না। আপনি সেদিন যদি ওই গরীব বিকাশকে সকলের সামনে ওরকমভাবে অপমান না করতেন তাহলে আমি ওর পক্ষ নিতাম না, আপনার দোকানেও যেতাম না, ওকে অপমান করার জন্য খেসাবত আদায়ও করতাম না। ওই গরীব বেচারীর মুখ দেখে আমার সত্যি খুব কষ্ট হয়েছিল বলেই এসব করেছি। কিন্তু আপনাদের মনেও কষ্ট দেবার ইচ্ছে নেই আমার। আপনাদের সঙ্গে মকদ্দমা করবারও ইচ্ছে নেই, আমি ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাই। যে পাঁচশ টাকা আপনারা অন্যায়ভাবে আমার কাছে দাবি করেছেন, সেই পাঁচশ টাকাও আমি আপনাদের দিয়ে দেব যদি তাতে আপনাদের মনের গ্লানি ধুয়ে যায়। আমি আপনাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না, ভাব করতে চাই। এই কথাটা বলতেই এসেছি আপনাদের কাছে—"

ডাক্তারবাবু হয়তো আরও কিছু বলতেন কিন্তু তাঁকে থেমে যেতে হল। বাইরের বারান্দা থেকে একটি লোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"শ্রীনাথবাবু বাড়িতে আছেন?"

"আছি। ভিতরে আসুন—"

একটি লোক এসে প্রবেশ করল।

"আমি নরেনবাবুর কাছ থেকে আসছি। তিনি আপনাকে একখানা চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিটা নিয়ে এই পিওনবুকে আপনার নামটা সই ক'রে দিন"

পিওনবুকে নাম সই করে চিঠিটা নিলেন শ্রীনাথবাবু। তারপর চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলেন।

ডাক্তারবাবু জিগ্যেস করলেন—"নরেন উকিলের চিঠি না কি—"

শ্রীনাথ বললেন—"হ্যাঁ—"

"নরেন মকদ্দমা করবার জন্যে ক্ষেপেছে খুব। আমার কিন্তু মকদ্দমা করবার ইচ্ছে নেই। আমার কথা আপনাদের অকপটে সব বলেছি। আশা করি ব্যাপারটা আপনারা ভালো ক'রে ভেবে দেখবেন। আমি উঠি তাহলে—"

নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন তিনি। রামসদয় যেমন চুপ করে বসে ছিলেন তেমনি চুপ করে বসেই রইলেন, একটা প্রতি-নমস্কার পর্যন্ত করলেন না। শ্রীনাথও না। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে চিঠিটাই পড়ছিলেন।

প্রীতিভাজনেষু,

আপনি ডাক্তারবাবুর নামে যে চিঠি পাঠিয়েছেন তা আমার হস্তগত হয়েছে। ডাক্তারবাবুর পক্ষে আমিই লড়ব। যে সমস্ত সাক্ষী এবং মালমসলা যোগাড় করেছি তাতে আমি ও মকদ্দমা জিতব এ বিশ্বাস আমার আছে। এ চিঠি সে জন্য লিখছি না, ডাক্তারবাবুর ব্যাপার কোর্টেই নিষ্পত্তি হবে। আমি অন্য একটা ব্যাপারে এই চিঠি লিখছি। শ্রীমতী আতর ঘোষ নামে যে মেয়েটি আপনার বাড়িতে কাজ করত সে আমার কাছে একটি চিঠি লিখেছে। লিখেছে যে আপনি নাকি তার উপর বলাৎকার করতে গিয়েছিলেন। আপনার চাকর হিনুয়া নাকি দেখেছিল ব্যাপারটা। শ্রীমতী আতর আপনার বিরুদ্ধে 'কেস' করতে চায়। একজন উকিলের বিরুদ্ধে এরকম একটা কুৎসিত মকদ্দমা আদালতে ওঠে এটা আমার ইচ্ছে নয়। এটা আপোষে মিটমাট হয়ে গেলেই ভালো হয়। আপনি যদি খেসারতস্বরূপ শ্রীমতী আতরকে হাজার খানেক টাকা দিতে রাজী হন তাহলে আমি মিটিয়ে দিতে পারব। আমার মনে হয় প্রকাশ্য রাস্তার উপর নিজেদের ডার্টি লিনেন (dirty liaen) বার না করাই উচিত।

আপনার সম-ব্যবসায়ী হিসাবে এই সৎযুক্তি আপনাকে দেওয়া উচিত মনে হল বলেই এ চিঠি লিখলাম। আশা করি কিছু মনে করবেন না। নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি। ভবদীয়

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার

চিঠিটার দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন শ্রীনাথ।

"কি লিখছেন নরেনবাবু"—রামসদয় জিগ্যেস করলেন।

"দেখুন"

রামসদয় চিঠিটা পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে তাঁর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে গেল। দুবার পড়লেন তিনি চিঠিখানা তারপর বললেন, "লোকটা তো খুব ঘাগি দেখছি—"

শ্রীনাথ কোনও উত্তর দিলেন না।

রামসদয় প্রশ্ন করলেন—"ভাবছেন কি—"

"ভাবছি হাজার টাকা খরচ করে ওই মেয়েটাকে হাত করব কি না। করলে কিছু সুবিধে হবে কি না"

রামসদয় নিজের মাথায় একবার বাঁ হাতটা বুলিয়ে বললেন, "আমি উকিল নই, কিন্তু আপনার চেয়ে আমার বয়স বেশী, সেই জোরেই বলছি এখন আমাদের পিছিয়ে আসাই ভালো। অন্ততঃ, আমি এর মধ্যে আর থাকতে চাই না। ডাক্তারবাবু একটা গুড় জেশচার (good gesture) করে গেলেন, আসুন আমরা ওইটের সুযোগ নিই। পিছিয়ে আসাও শুনেছি অনেক সময় উঁচুদরের রণকৌশল। এখন আমরা এগিয়ে গিয়ে যদি ডাক্তারবাবুকে আলিঙ্গন করি তাহলে সেটা দেখতে শুনতেও ভাল হবে, আমরাও হাঁপ ছাড়বার সময় পাব। তারপর আবার বাগে পেলে ক্যাঁক্ করে চেপে ধরবো লোকটাকে। কি বলেন?"

শ্রীনাথ বললেন, "বেশ। তাই করা যাক। কিন্তু আমি ভাবছি ওই মেয়েটার কথা। ওকে হাজার টাকা দিয়ে দেব?"

"সে আপনি বুঝুন মশাই। আমি ওর ভিতরে নাক গলাতে যাব না।"

শ্রীনাথ মরিয়া হয়ে বলে ফেললেন—"নাক গলাতে হবে না আপনাকে। আপনি আমাকে কিছু অর্থসাহায্য করুন। এই মেয়েটার মুখ বন্ধ করতে হলে যে টাকার দরকার তা আমার নেই। আর ও যদি কেস ঠুকে দেয় তাহলে একটা কেলেঙ্কারী হবে—"

"আমি টাকা দেব কেন! কি আশ্চর্য!"

"আপনার জন্যেই তো এত সব কাণ্ড। আপনি শশধরের বউ বীণাকে নিয়ে যে সব কাণ্ড করেছেন তা আমি শুনেছি। আপনি যদি এখন পিছিয়ে যান তাহলে আমি সব কথা প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হব।"

"কি কথা প্রকাশ করবেন আপনি?"

"প্রকাশ হলে শুনবেন সেটা। এখন কিছুই বলব না"

উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে রইলেন।

।। সতেরো ।।

ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আবার একটা ভোজের আয়োজন হয়েছিল। রামসদয়বাবু এবং শ্রীনাথ উকিল যে মকদ্দমা করবেন না, তাঁরা যে দু'জনেই এসে তাঁকে প্রণাম ও আলিঙ্গন করে গেছেন এই আনন্দে অধীর হ'য়ে ডাক্তারবাবু উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। শুধু

খাওয়াদাওয়া নয় গানবাজনাও হবে। অনুমান, বিকাশ দু'জনেই যে গান গাইতে পারে তা সহসা আবিষ্কার করেছেন ডাক্তারবাবু। তাদের জন্য হার্মোনিয়ম যোগাড় করে এনেছেন তিনি নাট্য-সমিতি থেকে। তারা দু'জনেই গান গাইবে।

রামসদয়বাবু আগেই এসেছিলেন। তিনি বলছিলেন, "এসব হাঙ্গামা কেন করতে গেলেন ডাক্তারবাবু। তুচ্ছ কারণে আমাদের মনোমালিন্য হয়েছিল সেটা মিটে গেছে, বাস্ ওইখানেই শেষ করে দেওয়া উচিত ছিল ব্যাপারটা। আপনি এত কাণ্ড করতে গেলেন কেন বুঝতে পারছি না ঠিক"

"এতে তো বোঝবার কিছু নেই। আমার স্বভাবটাই ওই রকম। আনন্দ পাওয়াই উদ্দেশ্য জীবনে। আমরা বড় বড় উৎসবের দরবারে যাওয়ার টিকিট পাই না, কাশ্মীর বা সুইজারল্যাণ্ড যাওয়ার অবসর নেই সুযোগও নেই আমাদের। আমাদের সম্বল এই সব সামান্য জিনিস। মাথার উপর আকাশ, উঠোনে দুববো ঘাস আব সন্ধ্যামণি ফুল আব বন্ধুবান্ধবেরা। এদেব নিয়েই আনন্দ করি। আপনারা আমাব বন্ধু হলেন এটা কি তুচ্ছ জিনিস? মোটেই না। সুঠাম থাকলে আমাব মনের কথা বুঝত—"

"সুঠাম কে—"

"মেডিকেল কলেজে যখন পড়তুম তখন সে আমার সহপাঠী ছিল। তাবও মনটা ছিল আমাব মতন। সেও আনন্দ খুঁজে বেড়াত খালি। জানি না সে এখন কোথায় আছে, বেঁচে আছে কি না। শুনেছিলাম সে বিলেত গিয়েছিল, খুব বড় ডাক্তার হয়ে এসেছিল। তারপর আর দেখা হয় নি। সুঠাম হারিয়ে গেছে আমার জীবন থেকে। সবাই হারিয়ে যায়, তাই যে যতক্ষণ কাছে আছে তাকে নিয়ে আনন্দে মেতে থাকাই উচিত। আনন্দের কোন উপলক্ষই তুচ্ছ নয়, কোন উপকরণই ছোট নয়"

মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে শুনছিলেন রামসদয়।

ডাক্তারবাবুর কথা শেষ হতেই তিনি বললেন, "এসব অতি উচ্চাঙ্গের কথা, আপনার মুখেই মানায়। আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করতে পারি কি, যদি আপনি অনুমতি দেন—"

"অনুমতির দরকার কি! কি আশ্চর্য! বলুন কি জানতে চান—"

"আপনি বিয়ে করেন নি কেন। না, করেছিলেন—?"

হেসে উঠলেন ডাক্তারবাবু।

বললেন, "না করিনি। যোগাযোগ হয়ে ওঠেনি—"

হাসলেন বটে, কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন একটু।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এলেন শ্রীনাথ উকিল।

ডাক্তারবাবু বললেন—"আপনি শুনলাম শামি কাবাব ভালোবাসেন। বিষুণকে বলেছি তার ব্যবস্থা করতে। হবিব এসে গেছে—"

"আপনি শুনলেন কোথা থেকে—"

"আতরি বলে যে মেয়েটি আপনার বাড়িতে কাজ করত সেই না কি বলেছে বিষুণকে। বিষুণের কাছ থেকে আমি শুনলুম। বললুম 'ব্যবস্থা করে' ফেল তাহলে। হবিবকে খবর দাও।' হবিব এসে গেছে—"

শ্রীনাথবাবু চেয়ারটা ডাক্তারবাবুর চেয়ারের কাছে নিয়ে এসে নিম্নকণ্ঠে বললেন—"সেই ব্যাপারটার কি হল—"

"নরেনকে বলেছি আমি মিটিয়ে ফেলতে। সে বলেছে মিটিয়ে দেবে। কিন্তু একটি কাজ করতে হবে আপনাকে"

"কি—"

"মেয়েটির কাছে মাপ চাইতে হবে"

শ্রীনাথ চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন, "প্রাইভেটলি চাইতে পারি—কিন্তু সকলের সামনে—মানে বুঝতেই পারছেন—"

"ও প্রাইভেটলি আপনার সঙ্গে দেখা করবে না। তবে কাল ওকে আমি ডেকে পাঠাতে পারি। আমার সামনেই আপনি মাপ চাইবেন। সেখানে আর কেউ থাকবে না। আমার মনে হয় রবিও যদি সেখানে থাকে ভালো হয়—"

"রবি কে—"

"হবিবের ট্যাক্সি চালায় ছোকরা। বিষুণের ঘটকালিতে ওর সঙ্গে রবির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে শুনছি। মেয়েটি যে নির্দোষ একথা রবি জানলে ভালো হয় –

শ্রীনাথ একটু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। তারপর বললেন, "বেশ, তাই হবে। আপনি ব্যবস্থা করুন—"

"ভোজটা মিটে যাক। তারপর করা যাবে। নরেন তো এখুনি আসবে—"

ক্রমে ক্রমে অতিথিরা আসতে লাগলেন।

যতীন দারোগা, রবি ড্রাইভার, রবির বাবা বিপিনবাবু, বিকাশের বাবা দামোদরবাবু, শৈলেনবাবু ডাক্তার আরও অনেক লোক এসে বসতে লাগলেন চেয়ারে। অনেক চেয়ার পাতা ছিল বারান্দায় এবং মাঠে-টাঙানো সামিয়ানার নিচে। নরেনবাবু এলেন একঝুড়ি শিঙাড়া আর কয়েকটা মালা নিয়ে।

"পীতাম্বর ময়রার দোকানে যতগুলো শিঙাড়া পেলাম কিনে আনলাম। আমাদের মাননীয় অতিথিরা, মানে রামসদয়বাবু আর শ্রীনাথবাবু শিঙাড়া ভালবাসেন শুনেছি। আর এই মালাগুলো আপনারা পরস্পরের গলায় পরিয়ে দিন। আপনাদের ঝগড়া যে মিটে গেছে মাল্য বিনিময় করে সেটা পাকা করে নিন"

হো হো করে হেসে উঠলেন সবাই। ডাক্তারবাবু আগে গিয়ে রামসদয় এবং শ্রীনাথকে মালা পরিয়ে দিলেন। শ্রীনাথ এবং রামসদয়ও ডাক্তারবাবুকে পরালেন। ডাক্তারবাবুর চোখমুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

শশধর লুচি ভাজার ভার নিয়েছিল, বিষুণ মিস্ত্রী তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে রঙীন কাগজের শিকল দিয়ে সাজ্জাচ্ছিলেন সামিয়ানাটা। বীণা আলুর দম রান্না শেষ করে পান সাজতে বসেছিল। কাবুলীওলা তাকে যে শাড়িটা দিয়েছিল সেইটে পরেই এসেছিল সে। চমৎকার দেখাচ্ছিল তাকে। পান সাজতে সাজতে তার একটা কথা মনে পড়ে গেল। সে ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে বললে—"দাদু, তোমাকে না বলেই আমি আমার ছেলেকে নিমন্ত্রণ করেছি। সে একটু পরে আসবে—"

"তোমার ছেলে! সে আবার কে"

"কাবুলিওলা আফজল খাঁ। তার আজ আমাদের বাড়িতে খাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমরা তো এখানে চলে এলাম, তাই তাকেও আসতে বলেছি এখানে—"

"বেশ করেছ। ভালো করে খাইয়ে দিও – "

ক্ষেন্তিব মা ভাব নিয়েছিল মাছের, মানতি মাসী নিরামিষ রান্নার, নটবর মাংসেব আব পোলাওযেব, হবিব বাগানের একটা ঘরে তার সহচবদের নিয়ে শামি কাবাব তৈরি করছিল। দই আন ক্ষীব নিয়ে হাজির ছিল মহিয়ারপুরের দীনু গোয়ালা। মিষ্টান্নের ভার নিয়েছিল পীতাম্বর ময়বা।

বারান্দাব একধাবে একটা শতরঞ্জিব উপর হার্মোনিয়মটা বাখা ছিল। ডাক্তাববাবু হাঁক দিলেন--"কই বিকাশ তোমবা এস এবাব—"

বিকাশ বেবিয়ে এল। অনুমানও বেরিয়ে এল তাব পিছু পিছু। তার হাতে ডুগি তবলা।

বিকাশ গান ধরল—"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া—"

অনুমান সঙ্গৎ করতে লাগল।

বিকাশের গলা ভাল। বেশ জ'মে উঠল। বিকাশের গান শেষ হলে অনুমান গান ধবল—"গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে"

বিকাশ তখন বাঁয়া তবলা নিয়ে বসল।

কাবুলিওলা আফজল খাঁ কখন এসে পিছনের দিকে দাঁড়িয়েছিল কেউ টের পায়নি। অনুমানের গান শেষ হতেই সে এগিয়ে এসে বলল—"আদাব—"

"এস, এস, আফজল বোসো"

ডাক্তারবাবু দাঁড়িয়ে উঠে সংবর্ধনা করলেন তাকে।

আফজল খাঁ কিন্তু বসল না। সে বলল. সেও তার দেশের নাচ-গানের কিছু নমুনা দেখাতে চায় এই জলসায়, যদি ডাক্তার সাহেব অনুমতি দেন।

"নিশ্চয়, নিশ্চয়—"

আফজল খাঁ উপরে উঠল না। বারান্দার নীচে যে খালি জমিটা পড়ে ছিল তারই উপর সে শুরু করে দিল তার কাবুলী নাচ আর গান। গানের ভাষা কেউ বুঝল না, কিন্তু তার বীরত্বব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী তার উদাত্ত কণ্ঠস্বর, তার উদ্ভাসিত চোখমুখ মুগ্ধ করে দিল সবাইকে। হাততালি দিয়ে উঠল সবাই। এমন কি রামসদয়বাবুও। আফজল খাঁর নাচগান শেষ হলে

ডাক্তারবাবু তার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। আফজল খাঁ দু'হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করল ডাক্তারবাবুকে। সেদিন সন্ধ্যায় ডাক্তারবাবুর বাড়িতে সত্যিই আনন্দলোক মূর্ত হয়ে উঠল।

।। আঠারো ।।

এর পর দু'সপ্তাহ কেটে গেছে। রামসদয়বাবু কলকাতায় ফিরে গেছেন। তিনি মনে-প্রাণে স্বীকার করে গেছেন যে ডাক্তারবাবু লোকটি সত্যিই ভালো। শ্রীনাথের সমস্যারও সমাধান হয়েছে। আতবিব ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়েছেন ডাক্তারবাবু। তাঁর এবং রবির সামনে তিনি আতরিব সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁকে কোনও কথা বলতে দেননি ডাক্তারবাবু। নিজেই বলেছিলেন, "আতর তোমার কাছে শ্রীনাথবাবু এসেছেন মাপ চাইতে। যা হয়ে গেছে তার জন্যে উনি দুঃখিত। তুমি এ নিয়ে আর বেশী হইচই কোরো না"

আতর ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল।

সে বলল—"আপনি যা বলবেন তাই হবে"

এই বলেই সে প্রণাম করে বেরিয়ে গিয়েছিল। রবিও অনুগমন করেছিল তাব। শ্রীনাথবাবুব মন গ্লানিহীন হয় নি। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান লোক। এটা বুঝেছিলেন ডাক্তাববাবু যতক্ষণ এদের পক্ষে আছেন ততক্ষণ এদের তিনি কিছুই করতে পারবেন না সুতরাং মানে মানে সবে থাকাই ভালো। যদিও প্রসন্ন মনে নয় তবু তিনি ডাক্তারবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতাও অনুভব করছিলেন একটা। ডাক্তারবাবু না থাকলে নরেন উকিল তাঁকে মহাবিপদে ফেলে দিত। হযতো এ শহর ছেড়ে চলেই যেতে হত তাঁকে। কিন্তু ডাক্তারবাবু লোকটির সম্বন্ধে একটা কৌতূহলও জেগেছিল তাঁর। পরের জন্য লোকটা বেফয়দা এমনভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়েন কেন? কি লাভ ওঁর এতে? পয়সাই তো খরচ হয় খালি। উনি সেদিন বলছিলেন আনন্দলাভই ওঁর জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু আনন্দলাভ তো অন্য উপায়েও হতে পারে। সবাই তো আনন্দই চায়। কিন্তু পরের ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে নানারকম ঝামেলা সহ্য করার মধ্যে যে কি আনন্দ থাকতে পারে তা তাঁর মাথায় ঢোকে না। সেদিন যে অত টাকা খরচ করে ভোজ দিলেন—এর কোনও মানে হয়? সেদিন তিনি জিগ্যেসও করেছিলেন ডাক্তারবাবুকে— "নানা লোকের নানা ঝঞ্ঝাট পোয়াতে আপনার ভালো লাগে?"

ডাক্তারবাবু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—"ভালো না লাগলেও করতে হয় বিবেকের তাড়ায়। ওই বিবেকই আসল মালিক, তিনিই আনন্দের ভাণ্ডারী। তাঁর নির্দেশ মতো চললে তিনি ওই আনন্দ ভাণ্ডার থেকে কিছু আনন্দ বখশিস দেন। সে বখশিস যারা পেয়েছে তারাই জানে তার মূল্য কি। ওই আনন্দের লোভেই বিবেককে মেনে চলি যতটা পারি"

শ্রীনাথবাবুর লোভ হয়েছিল তর্ক করবার। কিন্তু তিনি সে লোভ সংবরণ করেছিলেন, ভেবেছিলেন কি দরকার লোকটাকে ঘাঁটিয়ে। নিজের কাজ উদ্ধার হয়ে গেছে এখন সরে পড়াই উচিত। বলেছিলেন—"ও তাই বুঝি। আচ্ছা চলি তাহলে নমস্কার"

চলে এসেছিল।

এই ঘটনার দিন কয়েক পরেই ডাক্তারবাবুকে বিবেকের মুখোমুখি হতে হল আবার।

একটি চিঠি এসেছিল। সেটি দ্বিতীয়বার পড়ছিলেন তিনি।

শ্রীচরণেষু,

অনেকদিন পরে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। আমার হাতের লেখা আপনি হয়তো পড়তে পারবেন না। আমি আজকাল চোখে ভালো দেখতে পাই না। ক্রমশঃ সব ঝাপসা হয়ে আসছে। আমি এখন রিটায়ার করেছি। এলাহাবাদে এক বন্ধুর বাড়িতে আছি। আমার তো আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। এইখানেই কোথাও একটা ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে থাকব আর কোনও হোটেলে খাব। যা পেনসন পাই—মাসে দেড়শ' টাকা—তাতে কোনক্রমে কুলিয়ে যাবে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আমি যদি অন্ধ হয়ে যাই তাহলে কি হবে। আমি দিল্লীর একজন বড় ডাক্তারকে চোখ দেখিয়েছিলাম। তিনি ওই আশঙ্কাই প্রকাশ করেছেন। বয়স তো পঞ্চান্ন পেরিয়ে গেছে এখন চোখ ক্রমশঃ খারাপের দিকেই যাবে। অন্ধই হয়ে যাব শেষকালে। আপনাকে এসব কথা লিখছি তার কারণ সেই বহুকাল আগে যখন আমি আপনাদের শহরে হেডমিস্ট্রেসগিরি করতাম তখন আপনাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, সেখান থেকে যখন চলে আসি তখন আপনার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলাম যে চিঠিপত্রের মাধ্যমে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করব। আপনাকে ভালো লেগেছিল বলেই সে প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করেছি। মাঝে মাঝে চিঠি লিখেছি, আপনার উত্তরও পেয়েছি। ইদানীং অনেকদিন চিঠি লিখিনি আপনাকে। আজ মনে হল চোখটা যে রকম খারাপ হয়ে আসছে তাতে আপনাকে ভবিষ্যতে আর হয়তো চিঠি লিখতে পারব না। আপনাদের শহরে যখন ছিলাম তখনকার দিনগুলো স্বপ্নের মত মনে হয়। কিন্তু সে সব স্বপ্নের তো সমাধি হয়ে গেছে। জীবনে ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার, যে অন্ধকারে কেউ আলো জ্বালতে পারবে না। আপনাকে একটা অনুরোধ শুধু করছি। টাকা পাঠিয়ে আমাকে বিব্রত করবেন না। বহুদিন আগে আপনি একবার আমার জন্মদিনে একশ' টাকা পাঠিয়েছিলেন একটা শাড়ি কিনে নেবার জন্য। তখন আপনাকে যা বলেছিলাম আজও আবার সেই কথাই বলেছি, টাকা পাঠাবেন না। আমাদের মধ্যে যে পবিত্র সম্পর্কটা আছে টাকার স্পর্শে তা কলঙ্কিত হয়ে যাবে, আমি সেটা চাই না। অল্প কয়েক দিনের জন্য আপনার সঙ্গে আমার যে মধুর সম্পর্ক হয়েছিল তা অমলিনই থাকুক। সেই পবিত্র স্মৃতি নিয়েই আমি যেন মরতে পারি। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আমার ঠিকানাটা ওপিঠে লিখে দিলাম।

ইতি
প্রণতা
অমিতা রায়

বহুকাল পূর্বে যে মিস অমিতা রায় এখানে হেডমিস্ট্রেস ছিলেন তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দর মুখখানা ডাক্তারবাবুর মানসপটে ভেসে উঠল। তাঁর গাড়িটাও তখন নূতন ছিল। নিজেই ড্রাইভ করতেন তিনি। পাশে বসে থাকতেন মিস রায়। যেদিন তিনি চলে গেলেন সেদিনের কথাও মনে পড়ল। স্টেশনে তাঁকে তুলে দিতে গিয়েছিলেন ট্রেনে। ট্রেন যখন ছাড়ছে তখন

দেখতে পেলেন অমিতার চোখে জল টলমল করছে। সেই শেষ দেখা। তারপর আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি তাঁর। চিঠিপত্র পেয়েছেন মাঝে মাঝে। অমিতা অন্ধ হয়ে যাচ্ছে? ভ্রুকুঞ্চিত করে বসে রইলেন তিনি। তারপর পায়ের পাতা নাচাতে লাগলেন ইজিচেয়ারে শুয়ে। তারপর উঠে পড়লেন বারান্দায় পায়চারি করলেন খানিকক্ষণ। আবার শুলেন ইজিচেয়ারে। আবার পায়চারি করলেন। আবার পড়লেন চিঠিখানা। তারপর ইজিচেয়ারে শুয়ে চোখ বুজে রইলেন খানিকক্ষণ।

তারপর চোখ খুলে হাঁক দিলেন—"লোচন—"

ড্রাইভার লোচন এসে দাঁড়াতেই বললেন—"তুমি একবার গাড়ি নিয়ে বিষুণের কাছে দাও। তাঁকে ডেকে নিয়ে এস একবার"

লোচন চলে গেল। আবার চোখ বুজে শুয়ে রইলেন ডাক্তারবাবু।

একটু পরে অনুমান গোটা দুই ছিপ নিয়ে হাজির হল।

"আজ গোপালগঞ্জে মাছ ধরতে যাওয়ার কথা আছে, আমি সব ব্যবস্থা করেছি। চার ফেলে এসেছি সেই পুকুরে। খেয়েদেয়ে বেরুবেন কি?"

"আজ আর বেরুব না"

অনুমান একটু অবাক হল। ডাক্তারবাবুর এরকম ভাবান্তর সে আগে লক্ষ্য করেনি। একটু ক্ষুণ্ণমনে চলে গেল সে।

"বিকাশ. বিকাশ—"

বিকাশ পাশের ঘরে বসে টুকছিল।

সে বেরিয়ে আসতেই ডাক্তারবাবু বললেন, "ডাকঘরে যেতে হবে তোমাকে। কিছু টাকা বার করতে হবে, আর একখানা চিঠি রেজিস্ট্রি করে পাঠাতে হবে। আমার টেবিলের ড্রয়ার টেনে দেখ উইথ্‌ড্রয়াল ফর্ম আছে কি না। যদি না থাকে নিয়ে এস ডাকঘর থেকে"

বিকাশ ঘরের ভিতর ঢুকে গিয়ে একটু পরে বলল—"উইথ্‌ড্রয়াল ফর্ম আছে। এখনি যাব কি"

"একটু পরে। বিষুণ আসুক—"

একটু পরেই বিষুণ এসে পড়লেন।

"বিষুণ এসেছ? একটা জরুরী কাজে আমাকে এলাহাবাদ যেতে হবে। আমার গাড়ি করেই যাব। তোমাকেও থাকতে হবে আমার সঙ্গে। রাস্তায় যদি বেগড়ায়—"

"আমি একটা নতুন গাড়ি যোগাড় করে দিতে পারি আপনাকে, এলাহাবাদ তো অনেক দূর—"

"না আমি নতুন গাড়িতে যাব না। আমার বুড়ো গাড়ি নিয়েই যাব। তুমি যদি সঙ্গে থাক তাহলে আর ভাবনা কি। হবিবকে বলে তার একটা 'লরি'ও নেব। তাতে তোমার জিনিসপত্র নিয়ে নিও। তোমার কারখানার কি হবে তাই ভাবছি—"

"কদিন বাইরে থাকবেন?"

"তাতো ঠিক বলতে পারছি না। যেতে আসতেই তো অনেক সময় লেগে যাবে—"

"দিন সাতেক লাগবে। ওখানে ক'দিন থাকবেন?"

"যদি যাই তাহলে দিন দুই থাকব।"

'''কবে যাবেন''

''যদি যাই সপ্তাহখানেক পরে যাব।''

''যদি বলছেন কেন—''

''যাওয়া নাও হতে পারে। যদি একটা টেলিগ্রাম আসে তাহলে যাব না—''

''ও''

বিষুণ কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বললেন—''বেশ, ঠিক আছে। যাব আপনার সঙ্গে। আমি ব্যবস্থা করে ফেলছি। তবে হবিবের 'লরি'টা নিতে চাইছেন কেন। ''আমার যন্ত্রপাতির জন্যে একটা 'লরি' তো দরকার নেই''

''আমার সঙ্গে আরও লোক থাকবে যে। হবিব, দামোদর পণ্ডিত, শশধর, তার বউ বীণা, নরেন উকিল যদি যেতে চায় সেও যাবে, যতীন দারোগাকেও বলব—''

বিষুণ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

''এত লোক নিয়ে যাবেন!''

বিষুণের বিস্মিত দৃষ্টি দেখে ডাক্তারবাবু হেসে ফেললেন।

''ধরে নাও না এলাহাবাদে যমুনার তীরে পিক্‌নিক্ করতে যাচ্ছি আমরা''

''তাই না কি''

ডাক্তারবাবু অন্য প্রসঙ্গে উপনীত হলেন।

''যে ক'দিন তুমি থাকবে না তোমার ব্যবসার ক্ষতি হবে তো। আমি সে ক্ষতিপূরণ করব। তুমি 'না' বলতে পাবে না। হবিবকেও বলে দিও 'লরির ভাড়া নিতে হবে—''

বিষুণ মৃদু হেসে চুপ করে রইলেন। কোন জবাব দিলেন না।

বিষুণ চলে গেলে ডাক্তারবাবু শ্রীমতী অমিতা রায়কে একটা চিঠি লিখে ফেললেন।

''বিকাশ, এই চিঠিটা রেজেস্ট্রি করে দাও। আর সেভিংস ব্যাংক থেকে হাজাব তিনেক টাকা তুলতে হবে। আমি উইথড্রয়াল ফর্মে সই করে দিচ্ছি। আব পোস্টমাস্টাবকে একটা চিঠিও লিখে দিচ্ছি। টাকাটা এখুনি চাই না। দিন সাতেক পরে পেলেও চলবে। সাতদিন পরে আমি এলাহাবাদ যাব। তুমি আর অনুমান এখানে থাকবে। তোমাদের উপরই বাড়ির ভার থাকবে। আর এলাহাবাদ থেকে আমি চিঠি লিখব তোমাদেব''

''আচ্ছা—''

বিকাশ পোস্টাফিসে চলে গেল।

।। উনিশ ।।

শ্রীমতী অমিতা রায় ডাক্তারবাবুর চিঠিখানা পড়ছিলেন।

কল্যাণীয়াসু,

অমিতা, তোমার চিঠি পেয়েছি। আমারও শেষ জীবনে একা একা আর ভালো লাগছে না। আমিও একজন সঙ্গিনী চাই। যে প্রস্তাবটা অনেকদিন আগে করব ভেবেছিলাম কিন্তু যা

চক্ষুলজ্জাবশতঃ করতে পারিনি সেই প্রস্তাবটা আজ করছি। আমি তোমাকে বিয়ে কবতে চাই। তোমাব জন্য নয় আমার নিজেরই প্রয়োজনে এ প্রস্তাব করছি। আমার মনে হয় এতে তোমারও সমস্যার সমাধান হবে, আমিও শেষ জীবনটা সুখে থাকতে পারব। তোমার যদি এতে আপত্তি থাকে আমাকে টেলিগ্রামে জানিও সেটা। তোমার টেলিগ্রাম না পেলে আমি গিয়ে হাজির হব। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত অপেক্ষা করব তোমার টেলিগ্রামের। টেলিগ্রাম না এলে বুধবার (২১শে এপ্রিল) আমি রওনা হব এখান থেকে। আশীর্বাদ জেন।

ইতি হিরন্ময়

দিন দশেক পরে সবাই দেখল ডাক্তারবাবুর বাড়ি ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। গেটের উপর তৈরী হয়েছে নহবতখানা। সেখানে নহবত বাজছে সকাল থেকে। বিকাশ আর অনুমান ভোজের আয়োজনে ব্যস্ত। একটু পরে ডাক্তারবাবুর গাড়িটা এসে গেটে ঢুকল। গাড়িটাও ফুলে ফুলে সাজানো। পদ্ম আর গোলাপই বেশী।

ডাক্তারবাবু হাসিমুখে গাড়ি থেকে নামলেন। তারপর হাত ধরে নামালেন শ্রীমতী অমিতা বায়কে। তিনি একটি লাল বেনারসী শাড়ি পরে আছেন, কিন্তু মাথার চুলগুলি সব শাদা সেই শাদার উপর সিঁদুর অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে। ডাক্তারবাবু হাত ধরে ধবে তাকে নিয়ে এলেন বাবান্দায়। সত্যি তিনি প্রায় অন্ধ হয়ে গেছেন।

বীণা শাঁখ বাজাতে লাগল।

নবীন দত্ত

।। এক ।।

আকাশ-পাতাল ভাবছিলেন নবীন দত্ত। নামে নবীন হলেও বয়সে প্রবীণ। বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। সমস্ত মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি। অর্থাভাবে ব্লেড কেনা হয় নি। গায়েব গেঞ্জিটা শতছিদ্র। পরনে কালো রঙেব মাদ্রাজি লুঙ্গি। কালো রঙের লুঙ্গিই আজকাল কেনেন, কাবণ ময়লা হলেও দিন আষ্টেক দশ বেশ পরা যায়, সাবান দেবার দরকার হয় না। হাতেব ও পায়ের নখগুলিও বড় বড়। নিজেই ছুবি দিয়ে কেটে নেন। কয়েকদিন থেকে ছুরিটি খুঁজে পাচ্ছেনা না। সন্দেহ হচ্ছে তাঁর বড় দৌহিত্র প্রতাপ সেটি গাপ করেছে। ছুরিটি সেকালের রজার্সেব ছুবি। আজকাল যে সব ছুরি পাওয়া যায় তাতে কিছু কাটা যায় না। প্রতাপ কলেজে পড়ে, সেদিন এসেছিল, ছুরিটার ওপর তার অনেক দিন থেকেই লোভ। চেয়েও ছিল একবাব, তিনি দেন নি। এবার চুরি করেছে। এম.এ পড়ছে, কিন্তু চোর। পরীক্ষাও হয়তো চুরি কবে পাশ করে। কিন্তু এ নিয়ে নবীন দত্ত আধঘন্টার বেশী মাথা ঘামান নি। কোনও বিষয় নিয়েই তিনি বেশীক্ষণ মাথা ঘামান না। কারণ মাথা ঘামাবার বিযয অসংখ্য। কত মাথা ঘামাবেন? নির্বিকাব হতে চেষ্টা করেন। সব সময়ে কিন্তু পারেন না। একটা লাট্টু মনেব মধ্যে হরদম ঘুবছে বন বন করে--অর্থাভাব। পেনসনটি আছে অবশ্য ---মাসে মাত্র দেড়শ টাকা। সেটিও আদায কবতে প্রতি মাসেই নাস্তানাবুদ হতে হয। আব একটি সম্বল আছে একতলার বাড়ি ভাড়া। বিটায়াব করার পর যথাসর্বস্ব খবচ করে--- মানে, দেশেব সব বিষযসম্পত্তি বেচে, এক কাঠা জমির উপর চোঙ্ মার্কা এক চারতলা বাড়ি কবেছিলেন। একতলায একজন ভাড়াটে আছে। দোতলায় বড় ছেলের বিধবা বউ দুই মেয়েকে নিয়ে থাকে। তেতলায় থাকেন তাঁর গৃহিণী তাঁর বিধবা শুদ্ধাচারিণী মাকে নিয়ে। চারতলায থাকে তাঁব ছোট ছেলে। ভাল নাম অহঙ্কার, ডাক নাম দুম্। দুমকায় জন্মেছিল বলে সবাই তাকে দুমকা বলে ডাকত ছেলেবেলায়। সেইটেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ দুম্। দুম্ বিয়ে করে নি। কিন্তু সে একাই একশ। তার এই চারতলায় দুখানা ঘরে তাব শোবার বিছানা, বিছানার চারদিকে বই, একদিকে রেডিও, আর একদিকে জামাকাপড়, আর একদিকে ছবি আঁকবার ইজেল, রঙেব বাক্স, তুলি আর এক দিকে ফোটো তোলবার ক্যামেরা। আর একটা ঘরে কেবল ছবি, স্বদেশের বিদেশের নানারকম ছবি। কিছু দেওয়ালে টাঙানো, কিছু মেঝেতে স্তূপীকৃত। বাথরুমে একটা টেবিল আর একটা টুল। টেবিলেব উপর আপিসের ফাইল। সেইখানে বসেই আপিসের কাজ করে রাত্রে। দুম্ কখন বাড়িতে থাকে, কখন থাকে না, কেউ বলতে পারে না। দিনে প্রায়ই থাকে না। বাড়িতে খায় না, হোটেলে খায়। রাত্রে ফিরেই ঘরে খিল দিয়ে কাজ করে। কখনও ছবি আঁকে কখনও পড়ে, কখনও আপিসের ফাইল ক্লিয়ার করে। সে যখন, এম, এস. সিতে রসায়ন শাস্ত্রে ফার্স্ট ক্লাস পেল তখন নবীন দত্তই তাকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তাঁর পূর্বতন এক বন্ধু মার্লো সাহেবের কাছে। মার্লো

সাহেবই তাকে জার্মানীর এক ব্যবসায়ী ফার্মে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মাইনে বোধহয় ভালই পায়— ঠিক কত তা নবীন দত্ত জানেন না, জিজ্ঞেসও করেন নি। কিন্তু সে প্রথম মাইনে পেয়েই শ' দুই টাকা নবীন দত্তকে এনে দিয়েছিল। নবীন দত্ত বলেছিলেন—এখন আমার দরকার নেই। তুমি টাকা ব্যাংকে রেখে দাও, যখন দরকার হবে নেব। কিন্তু আজ পর্যন্ত নেন নি। এক তলা ভাড়া দিয়ে মাসে শ' দুই টাকা পান। তাছাড়া নিজে টিউশনিও করেন দু' জায়গায়। এককালে ভালো প্রফেসার ছিলেন। এককালে অনেক কিছুই ছিলেন তিনি। গায়ক, লেখক, বিপ্লবী, রাজনৈতিক, কাগজের সম্পাদক— অনেক কাজই করেছেন তিনি জীবনে। এখন চারতলা বাড়িটার চিলেকোঠায় একা থাকেন। দিনে স্বপাকে খান। চাল, কিছু তবকারি আর দুধ এক সঙ্গে সিদ্ধ করে সেইটে খান বেলা দেড়টা দুটোর সময়। রাতে আর কিছু খান না। টিউশনি করে ফেরেন রাত দশটায়, এসেই শুয়ে পড়েন ছাতে। শীত গ্রীষ্ম আকাশের তলাতেই শুয়ে থাকেন। বৃষ্টি পড়লে অবশ্য ঘরে ঢুকতে হয়। দশটাব সময় এসে শুয়ে পড়েন বটে, কিন্তু ঘুম হয় না। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করেন রাত বারোটা পর্যন্ত। তাঁর বড় ছেলে অলঙ্কার কৃতবিদ্য হয়েছিল, ভালো চাকরিও পেয়েছিল। দুটি মেয়ে হয়েছিল তাব। বড়টি দশ বছরের এখন, ছোটটি আট বছরের। হঠাৎ মারা গেল অলঙ্কাব করোনাবি অসুখে। মেয়ে দুটির পড়াশোনার খরচ আছে, তারপর বিয়ে। না, ঘম আসে না নবীন দত্তের চোখে। তিনি এপাশ ওপাশ করেন। ঘুমের জন্য একটা ট্যাবলেট তাঁর এক ডাক্তাব ছাত্র ব্যবস্থা করেছিল। খেয়েছিলেন কদিন। তবু ঘুম হয় না। এখন আর খান না।

তাঁর বড় বৌমা সাবিত্রী বি. এ. পাশ। একটা আপিসে চাকরি নিয়েছিল। বাড়ি থেকে বেশ কিছুদূর হেঁটে 'বাস' ধরতে হত । রূপসী সে—এই তার অপরাধ। একদল অসভ্য ছোঁড়া তার পিছনে লাগল। হাত ধরে টানলও একদিন। চীৎকার করা সত্ত্বেও কেউ এসে বর্বরগুলোকে শাস্তি দিলে না। ভীড় জমে গেল, কিন্তু ভীড়ের ভিতর থেকে কেউ এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করল না এর। মজা দেখতে লাগল কেবল। সাবিত্রী তার পর থেকে ঘবে বসে আছে। বর্বর দেশে ভদ্রলোকের বাস করা মুশকিল। কিন্তু তবু বাস করতে হবে। সাবিত্রী দুশো টাকা মাইনে পেত তার মেয়েদের পড়াশোনার সব খবচ চালাতে পারত— কিন্তু তা আর হল না। অপমানিত হওয়া সত্ত্বেও সাবিত্রী আবার সেই আপিসে যেতে চেয়েছিল কিন্তু নবীন দত্ত আর যেতে দেন নি। বলেছিলেন, এই অসভ্য দেশে সভ্য কিছু করা যায় না। তুমি বাড়িতেই থাকো, মেয়ে দুটিকে মানুষ কর। আমি যতদিন বেঁচে আছি খরচ চালিয়ে যাব। টিউশনি করে যে দুশো টাকা পান তা সাবিত্রীকেই দিয়ে দেন। বাকি থাকে সাড়ে তিনশো টাকা। তার থেকে পঁচিশ টাকা পাঠাতে হয় তাঁর কাশীবাসিনী মাকে, জোর করে কাশী চলে গেছেন মা। বার্ধক্যে তীর্থবাস করাই কর্তব্য মনে করেন। নবীন দত্ত তাঁকে বাধা দেন নি। দশ টাকা পাঠাতে হয় তাঁর এক গরীব আত্মীয়াকে, পঞ্চাশ টাকা দিতে হয় তাঁর এক ভাগ্নেকে, সে লক্ষ্ণৌ শহরে বি. এ. পড়ে। তাঁর একমাত্র বোন কালীর বিয়ে হয়েছিল লক্ষ্ণৌ শহরের প্রবাসী বাঙালী শিবসেবকের সঙ্গে। কালীর পুত্রটি খুব শৈশবে কিছুদিন ছিল নবীন দত্তের কাছে। বহুকাল আগে। শিবসেবকের একটা কাপড়ের দোকান ছিল আর ছিল একটি দজ্জাল বিধবা

ভগ্নী। নাম বিশাখা। কালীর ছেলে দেবনাথকে সেই মানুষ করেছিল। দেবনাথ যে বছর আই. এ. পাশ করল সেই বছরই শিবসেবক মারা গেলেন। অনেক দিন থেকে ভুগছিলেন তিনি। চিকিৎসা করাতেন না। বিশাখার প্রতাপে কোন ডাক্তারই না কি তাঁর বাড়িতে আসত না। দু'দিন জ্বর না ছাড়লেই বিশাখা ডাক্তারকে তেড়ে যেত। জ্বর কমাতে পার না অথচ ফি নিয়ে যাচ্ছ! টাকা কি খোলামকুচি না কি! শিবসেবকের যক্ষ্মা হয়েছিল। শিবসেবক মারা যাওয়ার পর বিশাখা একদিন দেবনাথকে নিয়ে হাজির হল নবীন দত্তের কাছে। বলল—তোমাদের ছেলে তোমাদের কাছে দিয়ে গেলাম। এর ভার বইবার সামর্থ্য আমার নেই। আমি আমাদের পৈতৃক বাড়ির অর্ধেকটা ভাড়া দিয়ে নিজের খরচ চালিয়ে নেব। কিন্তু ওর পড়ার খরচ, খাওয়ার খরচ তাতে চলবে না। বাড়ির অর্ধেকটা ভাড়া দিলে বড় জোর পনেরো কুড়ি টাকা পাব। নবীন দত্ত বললেন—কত টাকা হলে ওখানে তোমাদের চলে? বিশাখা বললে—ওকে যদি কলেজে পড়াতে চান তাহলে টাকা পঞ্চাশেক লাগবে। দেবনাথও তাই বললে—হ্যাঁ, ওর কমে চলবে না। দেবনাথ ভালো ছেলে। ফার্স্ট ডিভিসনে আই. এ. পাশ করেছে। নবীন দত্ত বললেন—বেশ তোমরা লক্ষ্ণৌতেই ফিরে যাও। আমি প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দেব। সেই থেকে দিয়ে যাচ্ছেন। অলঙ্কার যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন কষ্ট হয়নি। এখন কষ্ট হচ্ছে, কারণ সাবিত্রীকে দুশো টাকা দিতে হচ্ছে মাসে মাসে। সে ওইতেই নিজেদের খরচ চালিয়ে নেয়। নিজের আর মেয়ে দুটির জন্যে আলাদা রান্না করে তাদের স্কুলে ভরতি করেছে, ওই থেকে তাদের কাপড়-জামাও কিনে নেয়। শৌখিন কাপড় আর কেনা হয় না। মোটা সাধারণ জামা কাপড় পরে। আর একটা মুশকিল হয়েছে তাঁর শাশুড়ীকে নিয়ে। শ্যালক দুটিকে যে কোন লোক যদি শালা বলে খুব একটা অন্যায় হয় না। দুটিই মূর্খ শযতান। বউগুলিও জুটেছে তেমনি। মায়ের সেবাযত্ন করে না এবং কেন করে না তার দীর্ঘ জবাবদিহি আওড়ায়। নবীন দত্ত শাশুড়ীকে নিজের কাছে এনে রেখেছেন। নবীন দত্তের স্ত্রী পারুলবালা মাকে নিয়েই থাকেন। তাঁর জন্যে রান্না করেন, তাঁর সর্বাঙ্গে তেল মালিশ করেন, তাঁর কাপড় আর বিছানা কাচেন রোজ। কারণ, বৃদ্ধা মা রোজই প্রায় বিছানায় মলমূত্রে মাখামাখি হয়ে পড়ে থাকেন। ওঠবার সামর্থ্য নেই চোখের দৃষ্টি কমে গেছে। চিঁচিঁ করে কি যে বলেন বোঝা যায় না। কানেও বোধহয় কম শোনেন। কিছু বললে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন, কোনও উত্তর দেন না। মাঝে মাঝে কপালে হাত ঠেকান খালি। চোখ দিয়ে জল পড়ে অনবরত। মাকে নিয়েই পারুলবালা সব সময় ব্যস্ত। নবীন দত্ত তাই স্বপাক খান। শাশুড়ীর জন্য নবীন দত্তের মাসে প্রায় শ' দেড়েক টাকা খরচ হয়। রোজ আপাদমস্তক সরষের তেল মালিশ করতে হয়। সরষের তেল আজকাল দুর্মূল্য। কাপড় বিছানা কাচতে সাবানও অনেক লাগে। তাছাড়া সরু আলোচাল কিনতে হয়। দুধও লাগে প্রায় সেরখানেক করে। পারুলবালা মায়ের জন্যে রাঁধেন, নিজেও ওইখানে খেয়ে নেন। তিনি এককালে মাছ ছাড়া ভাত খেতে পারতেন না। এখন কটা বাঙালীই বা মাছ খেতে পায়? বহুদিন বাড়িতে মাছ ঢোকে না। আলু ভাতে, ডাল ভাতে দিয়েই ভাতটা খেয়ে নেন পারুলবালা। ওর সঙ্গে একটু ঘি থাকলে ভালো লাগত। কিন্তু ঘি কেনবার পয়সা কোথায়। পারুলবালার মা-ও বড়লোকের মেয়ে ছিলেন,

পাকুলবালাব বাবাও বড চাকবি কবতেন, সুতবাং দুধ ঘি মাছমাংসেব অভাব ছিল না কোন দিন। এখন মাকে গলা গলা সিদ্ধ ভাতে ভাত খাওয়ান পাকুলবালা। দুধটা একটু ঘন কবে না দিলে মা খেতে পাবেন না, তাই দুধটা ঘন কবেই দেন, কিন্তু মুশকিল হয়েছে ঘন দুধ পেটে সহ্য হচ্ছে না। অথচ মা পাতলা দুধ কিছুতেই খেতে চান না। সংসাবেব সব খবচ মিটিয়ে নবীন দত্তেব হাতে একশ' পঁযষট্টি টাকা থাকে। কিন্তু তা ও থাকে না শেষ পর্যন্ত। মেয়েব বিয়েব সময় বাড়ি বাঁধা দিয়ে যে টাকা ধাব কবেছিলেন তা এখনও শোধ হয় নি। প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা কবে দিয়ে যাচ্ছেন। এ ঋণ তাঁব জীবনকালে শোধ হবে না বোধহয়। বাড়িটা শেষে বিক্রি হয়ে যাবে। তা ছাড়া বাড়িব ট্যাক্স আছে। সে-ও প্রায় মাসে পঁচিশ টাকা কবে। অলঙ্কাব যখন বেঁচে ছিল তখন বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো জ্বলত। অলঙ্কাব মাবা যাবাব পব তিনি ইলেকট্রিক আলো বন্ধ কবে ঘবে ঘবে আবাব প্রদীপ আব লণ্ঠন চালু কবেছিলেন। কিন্তু দুম চাকবি পাবাব পব আবাব ইলেকট্রিক কানেকশন নিয়েছে। ইলেকট্রিক বিল সে ই দেয়। কাবণ তাব ইলেকট্রিক চাই। হাই পাওয়াবেব বালব জ্বালিয়ে ছবি আঁকে। সব খবচ মিটিয়ে নবীন দত্তেব কাছে একশ টাকাও থাকে না। তাব থেকেও মাঝে মাঝে তিনি পুবোনো বইয়েব দোকান থেকে বই কেনেন। দুই নাতনীব জন্য টুকিটাকি জিনিস কেনেন। কখনও লজেনস, কখনও ডালমুট, কখনও সন্দেশ। সব দিন পাবেন না, মাঝে মাঝে কেনেন। তাব নিজেব জন্য খবচ হয় দৈনিক প্রায় আড়াই টাকা। দুধ, চাল, তবিতবকাবি কিনতেই দু টাকাব মতো খবচ হয়। মাসেব শেষে হাতে বিশেষ কিছু থাকে না। সবাই নিজেব কাজ নিজেই কবে নেয়। ঝি চাকব বাখবাব সামর্থ্য নেই। তবু কিন্তু মুখপুড়ি বোজ আসে একবাব। নবীন দত্তেব যখন সচ্ছল অবস্থা ছিল তখন মুখপুড়ি ঝি ছিল তাঁদেব বাড়িতে। তখন যৌবন ছিল আদর্শবাদী নবীন দত্তকে ভক্তি কবত সে। হয়তো ভালোও বাসত মনে মনে। দেখতে কুৎসিত মেয়েটা। নাম জিগ্যেস কবাতে বলেছিল আমাব নাম মুখপুড়ি। বলে হেসেছিল মুখে কাপড় দিয়ে। এসব অনেক দিন আগেকাব কথা। মুখপুড়ি এখন প্রৌঢ়া হয়েছে। এখন সে ঝি গিবি কবে না। তাব ছেলে কোন কাবখানায় ভালো কাজ কবে। মাকে আব এখন ঝি-গিবি কবতে দেয় না। মুখপুড়ি কিন্তু নবীন দত্তেব বাড়িতে আসে বোজ একবাব কবে। কখনও কাপড় কেচে দেয়, কখনও আবাব বাসন মেজে দেয়। নবীন দত্তেব চিলেকোঠায় উঠতে সাহস পায় না। কখনও পাকলেব ঘবে, কখনও সাবত্রীব ঘবে বসে গল্প কবে। নবীন দত্ত বাড়িতেও থাকেন না প্রায়। যেদিন থাকেন সেদিন মুখপুড়ি যাবাব আগে তাঁকে ভক্তিভবে প্রণাম কবে যায় গলায় আঁচল দিয়ে খোলা দ্বাবেব সামনে। ভিতবে ঢুকতে সাহস পায় না। নবীন দত্ত তন্ময় হয়ে থাকেন নিজেব লেখা নিয়ে। নবীন দত্ত নিজেব নিদারুণ হতাশাটাকে ঠেকিয়ে বাখেন লেখা দিয়ে। কিছু নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকতে চান তিনি। মুখপুড়ি যখন এসে প্রণাম কবে তখন লেখা থেকে মুখ তুলে তাব দিকে চান। বলেন—মুখপুড়ি ভালো আছিস? মুখপুড়ি কোনও উত্তব দেয় না, ঘাড় হেঁট কবে চলে যায়। আবাব লেখায় মন দেন নবীন দত্ত। একদিন মুখপুড়ি চলে যাবাব খানিকক্ষণ পরে নবীন দত্ত লক্ষ্য কবলেন একখানা নোট উড়ে বেড়াচ্ছে তাঁব ঘবেব সামনে। উঠে গিয়ে দেখলেন দশ টাকার নোট একখানা। কোথা থেকে এল এটা? তাঁব

নিজের টাকাকড়ি তো বাক্সে থাকে। এ নোটটা কোথা থেকে এল বুঝতে পারলেন না। তারপর তাঁর হঠাৎ মনে হল মুখপুড়ি এসেছিল সেই ফেলে যায় নি তো? আলাদা করে রেখে দিলেন সেটা। তার পর দিনই তাঁর বড় নাতনী রেবতী একটি রেকাবিতে করে চারটি সন্দেশ, আর তাঁর ছোট নাতনী পার্বতী একটি নতুন কাপড় নিয়ে হাজির হল।

"তোমাব আজ জন্মদিন না কি দাদু? পিসিমা তোমার জন্যে তাই এসব নিয়ে এসেছে—"

'পিসিমা মানে? মুখপুড়ি?'

'হ্যাঁ। পিসিমা তো রোজ আসে। কাল দিদার কাছে শুনল যে আগে তোমার প্রতি বছর জন্মদিনে না কি ভারি ধুম হত। অনেকদিন আগে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। পিসিমা বলল, এখন বন্ধ হয়ে গেছে না কি? আমি যখন ছিলাম তখনও তো হয়েছে। উনি ভীম নাগের সন্দেশ খেতে ভালবাসতেন বলে ভীম নাগের সন্দেশ আনানো হত। আমিও তো খেয়েছি। দিদা বললে, আজকাল আর হয় না, পয়সায় কুলোয় না। অলু চলে যাওয়ার পর আর কিছু হয় না। তাই পিসিমা আজ তোমার জন্যে কাপড় আর ভীম নাগের সন্দেশ এনেছে। আমাদেব জন্যেও এনেছে একটা করে।"

নবীন দত্তের মনের ভাব যা হল তা অবর্ণনীয়। কিন্তু সে ভাব তিনি প্রকাশ করলেন না। একটা সন্দেশ তুলে খেলেন। আর কাপড়টা রেখে দিলেন কোণের দিকে আলনায়। কোণের দিকে দড়ির একটা আলনাতে তাঁর জামাকাপড় থাকে। তারপর তিনি বললেন—মুখপুড়িকে পাঠিয়ে দে। রেবতী পার্বতী চলে গেল ছুটে? একটু পরে মুখপুড়ি এসে দাঁড়াল।

'তুমি সেদিন আমার ঘরের সামনে একটা দশ টাকার নোট ফেলে গেছ। টাকাকড়ি অমন অসাবধানে রাখো কেন? ভাগ্যে আমি দেখতে পেয়েছিলাম, উড়ে বেড়াচ্ছিল নোটটা। এই নাও। আর এই পাঁচটা টাকাও নাও, আমার জন্মদিনে আশীর্বাদ করলাম তোমাকে।'

মুখপুড়ির একবার ইচ্ছা হল বলে, আমি ও টাকাটা আপনাকে প্রণামী স্বরূপই দিয়েছিলাম। কিন্তু সাহস করে আপনার হাতে দিতে পারি নি। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারল না, ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। নবীন দত্তের হাত থেকে টাকাটা নিয়ে আর একবার ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল, তারপর চলে গেল। নবীন দত্ত চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর তাঁর জাবদা খাতাটা বার করে লিখলেন।

'মুখপুড়ি ইজ গ্রেট! মহীয়সী নারী। ও লেখাপড়া জানে না। ওর বংশপরিচয়ও সাধারণ। যতদূর জানি ওর বাবার উপাধি ঘোয। কায়স্থ হতে পারে, গয়লাও হতে পারে। কিন্তু ওর মহত্ত্ব এত বেশী যে ও অনায়াসে জাতিকলের গণ্ডী পেরিয়ে গিয়ে স্বমহিমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর সে সম্বন্ধে ও সচেতন নয়, তা নিয়ে আস্ফালন করে না কখনও। সেজন্য আরও গ্রেট। আমাদের সমাজে আস্ফালন প্রিয় অনেক নর-নারীর সঙ্গে দেখা হয় প্রত্যহ। তার কথায় কথায় বার বার আত্মমহিমা প্রচার করে। মুখপুড়ি তাদের মতো ধনী নয়, তাদের মতো ডিগ্রিধারী নয়, তাদের মতো উচ্চপদাধিকারী নয়। তবু ও তাদের চেয়ে অনেক বড়। সেদিন ও দশটা টাকা আমাকে দেবে বলেই এনেছিল, কিন্তু সাহস করে দিতে পারে নি। তাই দুয়ারের সামনে রেখে গিয়েছিল। আজ যখন আমি ফেরত দিলাম তখনও ও

আপত্তি করল না। আমি যে পাঁচ টাকা ওকে দিলাম তা যে এখন দেওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর তা ও ভালো করেই জানে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ও বিনা প্রতিবাদে সেটা নিল—এখানেই ওর মহত্ত্ব। ওর বিনয়, ওর ভদ্রতা মুগ্ধ করেছে আমাকে। এই মুখপুড়িরাই আমাদের সমাজকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অবশ্য আর কত দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে জানি না। আমরা দ্রুতগতিতে নতুন রকম পশু হয়ে যাচ্ছি, যে পশুর একমাত্র লক্ষ্য টাকা আর আত্মসুখ। ভক্তি শ্রদ্ধাকে অনেকেই শিকেয় তুলে রেখেছে। তাদের ভালো কথা বললে— তারা বলে— আর জ্ঞান দিতে হবে না। কবি টি. এস. ইলিয়ট দুঃখ করে বলেছেন—

Where is the life we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?
The cycles of heaven in twenty Centuries.
Bring us further from God, and nearer to Dust.

যেখানে অধিকাংশ লোকই পশু কিংবা পশুবৎ তাদের মধ্যে থেকে আদর্শ বজায় রাখা খুব শক্ত। কিন্তু তবু এই শক্ত কাজটাই করতে হবে, তা না হলে বেঁচে থাকার কোনও অর্থ হয় না। তবে, একটা জিনিস বুঝেছি, অপরকে ভালো করা যায় না, প্রত্যেকেই নিজের মতে নিজের পথে চলতে চায়। যা করা সম্ভব সেটা নিজেকে ভালো করা। তা-ও শক্ত।

নবীন দত্তের এই খাতাটার নাম আধুনিক ভাষায় হয়তো 'জার্নাল' কিন্তু নবীন দত্ত নিজেকে যদিও অতি আধুনিক বলে প্রচার করেন, কিন্তু খাতাটার কোন নামকরণ করেন নি। খাতাব প্রথম পাতায় কেবল লেখা আছে শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং। খেরোয় বাঁধানো মোটা খাতা একটা। এ খাতায় নবীন দত্ত সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যাবে। এমন অনেক গূঢ় খবর যা বাইরের লোকে জানে না। যেমন ধরুন, অর্থাভাব সত্ত্বেও তিনি কেন তাঁর ছেলে দুমের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছেন না, এই খবরটা। খবরটা অতি তুচ্ছ। কিন্তু এই খবরটার আলোকে নবীন এবং দুম্ দুজনেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একদিন একখানা পোস্টকার্ড কুড়িয়ে পেয়েছিলেন নবীন। সেই পোস্টকার্ডটি পড়ে তাঁর যা মনে হয়েছিল তা তাঁর জাবদা খাতায় লেখা আছে। উদ্ধৃত করছি।

"সিঁড়িতে একটি পোস্টকার্ড কুড়িয়ে পেয়েছি। পোস্টকার্ডটি খুব সম্ভবতঃ দুমের প্যান্টের পকেট থেকে পড়ে গেছে। কোনও বন্ধুকে চিঠি লিখে পোস্ট করবে বলে নিয়ে যাচ্ছিল বোধহয়, কিন্তু পোস্ট করা হয় নি, পকেট থেকে পড়ে গেছে। কিছুদিন আগেই দুম একটা ভালো চাকরি পেয়েছে। বন্ধুকে লিখেছে, "আমার ভাই কত রকম জিনিস কেনবার শখ, কিন্তু টাকায় কুলোয় না। একটা চাকরি পেয়েছি, মাইনে খুম কম নয়, কিন্তু তাতেও আমার কুলোবে না, কারণ বাবাকে তো প্রতি মাসে কিছু দিতে হবে। আমার ছবি কেনার শখ, ছবি আঁকার শখ, তা ছাড়া ফোটো তোলার বাতিকও আছে। আমি প্রকৃতির ছবি তুলি। মানুষের ছবি কদাচিৎ। অনেক ফড়িঙের, অনেক প্রজাপতির, অনেক ফুলের, অনেক সূর্যাস্তের এবং অনেক সূর্যোদয়ের রঙীন ছবি তুলেছি। সবগুলিই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। ধার করে করেছি

এসব। এখন চাকরি পেয়েছি, ভেবেছিলাম সে ধারগুলো শোধ করব। কিন্তু বাবাকেও যে প্রতি মাসে কিছু দিতেই হবে। ভাই, চাকরি পাওয়া সত্ত্বেও আমি যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরে রয়ে গেলাম। দেখি, এখন কতদূর কি করতে পারি। বাবাকে যদি টাকাটা না দিতে হত তাহলে হয়তো তোমার ধারটা তাড়াতাড়ি শোধ করতে পারতাম। আমি জানি তুমি বড়লোকের ছেলে, সামান্য হাজার টাকা তোমার কাছে কিছু নয়, কিন্তু এ-ও জানি, ওটা আমাকে পরিশোধ করতেই হবে, না করলে স্বস্তি পাব না। তবে তোমাকে কিছুদিন সবুর করতে হবে।' এ চিঠিটা আমি পোস্ট করে দিয়েছিলাম, আর সেই দিনই ঠিক করেছিলাম দুমের কাছ থেকে কোনও টাকা নেব না। ও নিজেই বিপন্ন, ওকে আরও বিপন্ন করতে চাই না। বাজে খেয়ালে টাকা নষ্ট করছে বলে ওকে ভর্ৎসনাও করতে চাই না আমি কোনটা বাজে কাজ, কোনটা আসল কাজ তা আমিই কি জানি? মনে হচ্ছে পিতা হিসাবে আমারই বরং এ বিপদে ওকে অর্থসাহায্য করা উচিত। কারণ ও যা করছে তা সৃষ্টিধর্মী কাজ। কোনও দুর্নীতিমূলক কাজ হলে বাধা দিতাম। দিতাম কি? ওকে বাধা দেবার শক্তি আমার আছে কি? তবু ঠিক করলাম ওর কাছ থেকে টাকা নেব না।''

এই জাবদা খাতায় লেখা ছাড়া তাঁর আর একটা অবলম্বন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার ওই চিলেকোঠার ঘরে একটিমাত্র ছবি টাঙানো আছে। বিদ্যাসাগরের ছবি, মাঝে মাঝে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন তিনি। কোন বিপদে পড়লে ছবিটার দিকে চেয়ে ভাবেন এ অবস্থায় পড়লে বিদ্যাসাগর কি করতেন। নবীন দত্তর জীবনে কোনও ঠাকুর দেবতা নেই। পুজোবাড়িতে পাঁচজনের সামনে ঠাকুর দেবতাকে প্রণাম করেন তিনি অবশ্য । নিজের মতামত প্রকাশ করে বাহাদুরি দেখাবার ইচ্ছে তাঁর হয় নি কখনও। কোনও রকম বাহাদুরি দেখানোটা 'ভালগার' মনে হয় তার কাছে। হ্যাঁ, তিনি ঠাকুর দেবতার কাছে প্রণত হন তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নন, তবু হন। হন সামাজিকতা বজায় রাখবার জন্য। হন আর একটা কারণেও। ঠাকুর দেবতা ভগবান কিছুই যে নেই, এরও অকাট্য কোন প্রমাণ কি তিনি পেয়েছেন? পান নি। সুতরাং নাস্তিক্য নিয়ে বাহাদুরি করবার মতো জোর নেই তাঁর মনে। ওসব নিয়ে মাতামাতি করেন না তিনি। বিদ্যাসাগরের ছবি যেমন তাঁকে নীরব ভাষায় বলেছিল, দুমের কাছ থেকে টাকা নিও না, তেমনি বলেছিল ঈশ্বরটিশ্বর নিয়ে বেশী মাথা ঘামিও না। ঈশ্বরচন্দ্র নিজেও এ বিষয়ে খোলাখুলি কিছু বলেন নি। বুদ্ধদেবও বলেন নি। ও প্রশ্নের সামনে চিরকাল একটা রহস্য যবনিকা দুলছে। দুলুক। নবীন দত্ত ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না ঠিক করেছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, তবু মাঝে মাঝে ঘামাতে হচ্ছে। এ নিয়ে কারো সঙ্গে তর্ক করেন না অবশ্য, কিন্তু নিজেরই মনে বারবার প্রশ্ন জাগে। ভগবান সত্যিই কি নেই? এত বড় নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করলে কে তাহলে? আপনি-আপনি ঘটনাচক্রে হয়ে গেছে? ধোঁয়া দেখলে যেমন মনে হয় কোথাও না কোথাও আগুন আছে, তেমনি সৃষ্টি দেখলেই মনে হয় নিশ্চয় এক বা একাধিক স্রষ্টাও আছেন। এই স্রষ্টার স্বরূপ নিয়ে অনেক বিদ্বান ব্যক্তি মাথা ঘামিয়েছেন। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তিরা নবীন দত্তকে বিশেষ আশ্বাস দিতে পারেন নি। তাঁরা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির আস্ফালন করেছেন কেবল। সে আস্ফালন মাঝে

মাঝে বেশ চমকপ্রদ, মাঝে মাঝে বেশ কৌতূহলজনক, মাঝে মাঝে 'বাঃ' বলতে ইচ্ছে হয়েছে তাঁর। কিন্তু তার থেকে মনের স্থায়ী কোন অবলম্বন পান নি নবীন দত্ত। যখন চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে তখন আলো জ্বালতে পারে নি কেউ। সার্কাস বা ম্যাজিক দেখে যেমন সাময়িক বিস্ময় বোধ করেছেন, ওই সব বড় বড় দার্শনিকদের বই পড়েও তেমনি করেছেন। যে সত্যের উপর নির্ভর করা যায়, যে সত্য সমস্ত সন্দেহ নিরসন করে দেয়, সে সত্যের দেখা কখনও পান নি। অথচ এ রকম সত্যকে অপরোক্ষ করেছেন এ রকম লোকের অভাব আমাদের দেশে নেই একথাও তো ঐতিহাসিক সত্য। এই সেদিনই তো শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, মহর্ষি রমণ এদেশে ছিলেন। তাহলে—অন্ধকারের মধ্যে ওই 'তাহলে'-টাই প্রলুব্ধ করে তাঁকে মাঝে মাঝে—আলেয়ার মতো। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয় ও রকম লোক এখনও আছেন কি? থাকলেও তিনি কোথায় আছেন, কে তার সন্ধান দেবে, তাঁর কাছে গেলেও তিনি কি তাঁকে প্রশ্রয় দেবেন, যদি দেনও তাঁর উপদেশ তিনি কি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করতে পারবেন এই বৃদ্ধ বয়সে? এই সব কথা মনে হয় মাঝে মাঝে। যদিও তিনি আধ্যাত্মিক নন, তবু এই সব চিন্তা অনেক সময় অন্যমনস্ক করে দেয় তাঁকে। এই অন্যমনস্ক হয়ে থাকাটাও তাঁর একটা বিলাস, অমীমাংসিত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় যেমন অনেকে, অনেকটা তেমনি। সেদিন— যেদিন এই গল্পের আরম্ভ সেদিন কিন্তু এসব নিয়ে ভাবছিলেন না তিনি, ভাবছিলেন আর একটা বিষয় নিয়ে। আকাশ পাতাল ভাবছিলেন। তাঁর এক ছাত্র তাঁকে একটি প্রস্তাব দিয়েছে। তিনি এককালে নামজাদা অধ্যাপক ছিলেন। যদি নোট বই লিখতেন তাহলে বড়লোক হতে পারতেন, কিন্তু তিনি লেখেন নি। তাঁর ধারণা নোট বই লিখলে সেটা চালাবার জন্যে এমন সব লোকের দ্বারস্থ হতে হয় যাদের দ্বারস্থ হবার প্রবৃত্তি তাঁর কোনদিন হয়নি। এ-ও তাঁর কানে গেছে এসব ব্যাপারে ঘুষ ঘাসও না কি দিতে হয় নানা জায়গায়। তাই ও চেষ্টাই তিনি করেন নি কখনও। তাঁর ছাত্রটি এসে বলছে—আপনি স্যার অনুমতি দিন, আমিই সব করি। আমিই নোট বুক লিখব, আমিই তার প্রকাশের ব্যবস্থা করব, আমিই যেখানে যাবার যাব—আপনি শুধু আপনার নামটি ধার দিন আমাকে। গ্রন্থকার হিসাবে আপনার নামটি ছাপব আমি আর এর জন্যে আপনাকে লাভের অর্ধাংশ দেব। যদি বইটা চালাতে পারি বছরে আপনাকে হাজার পাঁচেক টাকা অনায়াসে দিতে পারব। আমি কোথাও চাকরি যোগাড় করতে পারছি না, সর্বত্রই নেপোটিজম। আমার এক বন্ধু ভালো ছাপাখানা করেছে, সে বলেছে, বইটা কম লাভ নিয়ে ছেপে দেবে আপনি যখন আমাদের পড়াতেন তখন যে নোট দিতেন তা সব আমার টোকা আছে,. বিজেনের কাছেও আছে। আপনি শুধু নামটি ধার দিন আমাদের। ছাত্রটিকে সোজা 'না' বলতে পারেন নি নবীন দত্ত। বলেছিলেন, ভেবে দেখব, পরের রবিবার এসো তুমি। ছাত্রটি চলে যাবার পর থেকেই এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন তিনি। টাকার তাঁর সত্যিই দরকার খুব। মেয়েদের বিয়ের জন্যে যে দেনাটা করে বাড়ি বাঁধা রেখেছেন সেটা শোধ করতে পারলে তিনি যেন স্বস্তি পান। নগদ পাঁচ হাজার টাকা যদি পাওয়া যায় তাহলে দেনাটা শোধ হয়ে যাবে। রিটায়ার করার পর প্রভিডেন্ট ফানডের যে টাকা তাঁর পাওনা হয়েছে তার

এখনও হিসেবই হয়নি নাকি। অনেকবার হাঁটাহাটি করেও পান নি টাকাটা। পেলে তাঁর স্ত্রীর নামে একটা fixed deposit করে দেবেন ভেবেছেন। কিন্তু আমাদের স্বাধীন গভর্নমেন্টের অধীনে আরও স্বাধীন আমলাতন্ত্রের যে কেরানীরা কাজ করেন তাদের কবল থেকে সে টাকা করে উদ্ধার করতে পারবেন কে জানে।

পারুলের সঙ্গে আজকাল তাঁর প্রায় সম্পর্কই নেই। সে তার মাকে নিয়ে থাকে। সাবিত্রীর সঙ্গে মাঝে মাঝে হয়তো গল্প করে, কিন্তু তাঁর কাছে আসে না। এসে হয়তো সুখ পায় না। জীবনসঙ্গিনী কিন্তু সঙ্গ দিতে পারে না। পারুল আর মুখপুড়ি দুজনে প্রায় এক জাতের লোক, মুখপুড়ির সঙ্গে রোজ গল্প করে পারুল। যে সব প্রসঙ্গ নিয়ে করে, সে সব প্রসঙ্গে দখল নেই নবীন দত্তের। কৌতূহলও নেই, আগ্রহও নেই। নবীন দত্ত মানিকতলার বিলেতফেরত বউটির কাণ্ডকারখানা নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না, পারুলবালারও বিজ্ঞান ইতিহাস বা দর্শন নিয়ে মাথা ঘামাবার সামর্থ্য নেই সুতরাং জমে না। এক বিষয়ে দুজনের মতের কোন অমিলও আছে। পারুলবালা দুমের উপর অসন্তুষ্ট। বিয়ে করে নি, যা রোজগার করে নিজেই খরচ করে ফেলে পারুলবালার বিশ্বাস নবীন দত্তের আসকারা পেয়েই ছেলেটা উচ্ছন্ন গেছে নবীন দত্ত যদি গোড়া থেকেই রাশ টেনে ধরতেন তাহলে ছেলেটা এমন হত না। নবীন দত্ত কিন্তু দমের উপর প্রসন্ন। তিনি ওকে শাসন করতে চেষ্টা করতেন না বস্তুত কাউকেই তিনি জীবনে শাসন করেন নি। দুমকে অবশ্য করেন নি কারণ ওই খেয়ালী ছেলেটার মতিগতি মন্দ করত তারে। যদিও তিনি একথা বলেন নি কাউকে, কিন্তু তাঁর মনে হত ওর খাপছাড়া খেয়ালি ধরনধারণ প্রতিভাবান লোকের লক্ষণ প্রতিভাবান পুরুষেরা বাধা ধরা পথে কেতা দুরস্ত হয়ে চলে না সব সময় সাধারণ ছেলের দুটো রঙীন প্রজাপতির রঙীন ফোটো তোলবার জন্যে দুপুর রোদে টো টো করে ঘুরে বেড়ায় না। পড়াশোনাতেও দুম অসাধারণ। ওর থীসিস পড়ে এক জন জার্মান বিজ্ঞানী খুব প্রশংসা করেছেন। যে জার্মান ফার্মে ও চাকরি পেয়েছে সেখানে ওকে কেরানীগিরি করতে হয় না। গবেষণা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে হয় জার্মানিতে। ওর চাকরি দশটা পাঁচটা আপিসের চাকরি নয়। অধিকাংশ সময় কাটাতে হয় লাইব্রেরিতে না হয় ল্যাবরেটরিতে। চরক সুশ্রুত পড়তে যেতে হয় কবিরাজদের কাছে। দুমের সম্বন্ধে ভাবনা নেই নবীন দত্তের। ও নিজের পথ কেটে নিজেই বেরিয়ে যাবে। নবীন দত্তের ভয় উনি নিজে ওর স্বচ্ছন্দে চলার পথে বিঘ্ন হয়ে না দাঁড়ান। অনেক দিন আগে তার এক সতীর্থ পরমেশ রায় তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন— তোমার ছেলেরা কি তোমাকে দেয় কিছু? নবীন উত্তর দিয়েছিলেন— আমি ওদের কাছ থেকে নিই না কিছু। বিজ্ঞের মতো হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—শাক দিয়ে মাছ আর কত ঢাকবে ভাই। নিতে চাইলেও আজকালকার ছেলেরা দেবে না কিছু। আজকাল যে জেনারেশন গ্যাপ হয়েছে সে গ্যাপ লাফিয়ে পার হওয়া শক্ত। কথাটা শুনে চটে উঠেছিলেন নবীন। বলেছিলেন—লক্ষ্মীছাড়া পরিবারে জেনারেশন গ্যাপ সেকালেও ছিল, আর একালেও আছে। যে সব পরিবারে বাপ মা-রা ছেলেদের দায়িত্ব নেয় না, যাদের ছেলে মেয়েরা পথে-ঘাটে কুকুর বিড়ালের মতো মানুষ হয়, অনেক সময় যাদের পিতৃপরিচয়ও অস্পষ্ট—এদের মধ্যে

জেনারেশন গ্যাপ তখনও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু ভদ্র ভালো পরিবারে নেই। কর্তব্যপরায়ণ ছেলেমেয়ে, কর্তব্যপরায়ণ বাপ মা এখনও এদেশে অনেক আছে। সেখানে গ্যাপ ট্যাপ নেই। জেনারেশন গ্যাপ কথাটি বিলিতি প্রপাগাণ্ডা। প্রত্যেক পরিবারে পিতামাতা আর পুত্রকন্যাদের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করবার একটা কৌশল। বিদেশীরা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়। ওতেই ওরা ওস্তাদ। ওরা হিন্দু মুসলমানে ঝগড়া লাগিয়েছে, ভাষায় ভাষায় ঝগড়া লাগিয়েছে, ধনিক আর শ্রমিক নামক দুটো দল তৈরি করে তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করেছে। 'ক্ষয়' শব্দটার সঙ্গে 'অব' উপসর্গ জুড়ে অবক্ষয় নামে এমন একটা আওয়াজ সৃষ্টি করেছে যেন মনে হচ্ছে ওই অবক্ষয় আগে ছিল না, এখন হয়েছে, এবং আমরা যতদিন স্বাধীন থাকব, চলতে থাকবে। ওই বিদেশী ধূর্তেরা আমাদের দেশের লোককে টাকা দিয়েই এই সব বিষ ছড়াচ্ছে এই দেশে। বোকারা চিরকাল গরীব ছিল, পিছনে পড়ে ছিল, আগেও ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। বুদ্ধিমানরা যে কোন পরিস্থিতিতেই ওপরে উঠে যাবে। এসব নতুন কিছু নয়। বিদেশী শত্রুদের ভাঁওতায় ভুলো না। নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে ভাববার চেষ্টা কর। ভালো মন্দ সব সময়েই ছিল, সব সময়েই থাকবে। আমি তো আমার চেনাশোনা যে কটি ভালো পরিবার জানি, সেখানে জেনারেশন গ্যাপ নিয়ে কোনও হা-হুতাশ শুনি নি। যেখানে শুনেছি সেখানে পরিবারটাই খারাপ—সেখানে মদ মেয়েমানুষেব মৈচোট্। সেখানে শুধু জেনারেশন গ্যাপ কেন সবই ফরদাফাঁই। এ ধরনেব পরিবার আজকাল ডিগ্রির জোরে, চাকরির জোরে কিংবা রাজনীতির জোরে অনেক সময় ওরা ভদ্র পরিবার বলে পরিচিত হয়। কিন্তু ওরা ভদ্র নয়, ওরা ছদ্মবেশী ছোটলোক। নবীন দত্তের এই আকস্মিক উষ্মায় পরমেশবাবু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন একটু। বলেছিলেন—অত চটছ কেন? আজকাল ছেলেমেয়েদের কাণ্ড কারখানা যা দেখি তাতে পিলে চমকে যায়। যা খুশি করে বেড়াচ্ছে। কাজের মতো কাজ একটাও করছে না। সবই পায় অকাজ। এরও উত্তর দিয়েছিলেন নবীন দত্ত। বলেছিলেন—ওদের আমরাই কাজে লাগাতে পারছি না। আমাদের শিক্ষাটাও বর্তমানে ভুল পথে চলছে। যে ভালো মিস্ত্রি হতে পারত সে হচ্ছে কেরানী, যে বড় শিল্পী হতে পারত সে হচ্ছে কেরানী, যে বড় ব্যবসায়ী হতে পারত সে হচ্ছে কেরানী। দেশে ভালো দরজি নেই, ছুতোর নেই, সৎ ব্যবসায়ী নেই, আছে কেবল ঝাঁক ঝাঁক ডিগ্রিধারী কেরানী, যাদের পেটে বিদ্যেও নেই, অন্য কোন কাজ করবার যোগ্যতাও নেই, যাদের একমাত্র লক্ষ্য চাকরি—যে চাকরিও তারা ভালোভাবে করে না। ছেলেবেলা থেকে ওরা পাকা ইমারতে বসে ফ্যানের তলায় মানুষ, তাই পরবর্তী জীবনেও কোনও ইমারতে চেয়ার টেবিলের সামনে ফ্যানের তলায় বসে চাকরি করতে চায়। হয়তো চাওয়াটা স্বাভাবিক। নিজেরা মেহনত করে কিছু করতে পারে না, কিন্তু অবসর সময়ে মেহনতী মানুষদের নিয়ে বক্তৃতা করে। এদের আমরা যদি কাজে লাগাতে পারতাম তাহলে দেশের চেহারা ফিরে যেত। কিন্তু আমরা ওদের কাজের লোক না করে ক্রমাগত সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে যাচ্ছি যেখানে বিশ্বের বিদ্যা দূরে থাক সামান্য বিদ্যালাভও হয় না, যেখানে মানুষকে অমানুষ করবার নানা আয়োজন ও উদাহরণ সর্বদা মজুত। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েই কিন্তু চাকবি চাই।

বেকার সমস্যা—। রাজনৈতিক আন্দোলন, কাগজে কাগজে ফাটাফাটি। চাকরি-দেনেওয়ালাদের সর্বাঙ্গ তৈলাক্ত, সুপারিশ, ঘুষ। এই হচ্ছে, বুঝলে। আমাদের ছেলেদের আমরাই বিপথে ঠেলে দিচ্ছি। ওদের দোষ দিও না, দোষ আমাদের। তোমার ছোট ছেলেটা কি করছে? পরমেশ কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন—এবারও আই.এ. ফেল করেছে ভাই। কি যে করি—। নবীন দত্ত বললেন, ওকে কলেজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পত্রপাঠ কোনও কাজে লাগিয়ে দাও। যে কোন কাজ। ফেরি করুক, রিকশা টানুক, মোটর ড্রাইভারি শিখুক, এনি ওয়ার্ক। পরমেশ আপত্তি করলেন। বললেন—ওকথা আজকাল অনেকেই বলছে। কিন্তু একটা ভদ্রলোকেব ছেলের পক্ষে ফেরিওলা বা রিকশাওলা হওয়াটাই কি আদর্শ হওয়া উচিত? একথা শুনে অধীর হয়ে উঠেছিলেন নবীন দত্ত। বলেছিলেন, দেখ ভাই, আদর্শের সঙ্গে পেশার কোনও সম্পর্ক নেই। মানুষ হওয়াই সকলের আদর্শ হওয়া উচিত। তা যে কোন কাজ করেই হওয়া সম্ভব। যার বড় হবার আগ্রহ আছে. সে যে কোনও অবস্থা থেকেই তা হতে পারে। ওদেশের অনেক বড় লোক অনেক নিম্নস্তর থেকে জীবন শুরু কবেছিলেন, কেউ চায়েব দোকানে কাপ ডিস ধুতেন, কেউ কাগজ ফেরি করতেন, কিন্তু তাতে তাঁদের বড় হওয়া আটকায় নি। এদেশেও বিস্তর উদাহরণ আছে। স্বাধীন পেশা কবলেই মনুষ্যত্ব বজায় থাকে, চাকরি করলে প্রায় থাকে না। আমি তো কাউকে বরাবর ফেরিওলা বা রিকশাওলা বা মুটে হয়ে থাকতে বলছি না। কিন্তু কুঁড়ে হয়ে ঘরে বসে থাকার চেয়ে, কিংবা রাজনৈতিক দলের খপপ্রে পড়ে শ্লোগান দিয়ে বেড়ানোর চেয়ে—ওসব কাজ ঢেব ভালো, ঢের সম্মানজনক।

পরমেশ খোঁচা দিতে ছাড়েন নি। বলেছিলেন—তবে তোমার দুটি ছেলেকেই চাকরিতে ঢুকিয়েছিলে কেন? সদর্পে উত্তর দিয়েছিলেন নবীন দত্ত—আমি ঢোকাই নি, ওরা নিজেদের জোরে ঢুকেছিল, কমপিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে নিজেদের বিদ্যার জোরে। সবাই যদি ওদের মতো চাকরি পায় পাক না। কিন্তু খোলামকুচির টুকরো যদি হীরের দরে বিকোতে চায় তাহলেই তো মুশকিল। কথাটা বলেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন নবীন দত্ত। নিজের ছেলেদের সম্বন্ধে এ রকম আস্ফালন করাটা ভালো হল কি? কিন্তু ঝোঁকের মাথায় এ রকম অনেক অশোভন কাজ করে ফেলেন তিনি। পরে আপসোস হয়। অলঙ্কার মারা যাওয়ার পর তাঁর মাঝে মাঝে অযৌক্তিকভাবে মনে হয়েছিল পরমেশের কাছে নিজের ছেলে নিয়ে অমন গর্ব করেছিলাম বলেই কি ভগবান অলঙ্কারকে কেড়ে নিলেন? ভগবান কি ইচ্ছে করলেই কিছু দিতে পারেন বা কেড়ে নিতে পারেন? এসব অমীমাংসিত প্রশ্নের কোন জবাব নেই, তব কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন নি তিনি। বার বার মনে হয়েছিল, এখ্যারেন

সেদিন বিদ্যাসাগরের ছবির দিকে চেয়ে বসেছিলেন নবীন দত্ত। ভাবছিলেতিনি, আর তো আসবে। তার লেখা নোট বুকে নিজের নামটা ধার দেবেন কি না ভেসে আসছিল নি। এ অবস্থায় পড়লে বিদ্যাসাগর কি করতেন? ছবিটার দিকে। নবীন দত্তের মনে হয় নিজের খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়িতে হাত বুলোচ্ছিলেন।

একটা। দূরে কোথায় যেন কারখানা আছে, সেখান

কোনও শক্তিশালী দানব বুঝি অত্যাচার করছে কারো উপর। ওই শব্দটা যেন অত্যাচারিতের আর্তনাদ। যখন প্রথমে বাড়ি করে এখানে এসেছিলেন তখন শব্দটা খুব খারাপ লাগত। এখন সয়ে গেছে। হঠাৎ খাপছাড়াভাবে মনে পড়ল অলঙ্কারের প্রথম মেয়ে রেবতী যখন হল তখন খুব কাঁদত মেয়েটা। দিনরাত কাঁদত। অসহ্য মনে হত প্রথম প্রথম। তা-ও পরে সয়ে গিয়েছিল। এখন রেবতী কাঁদে না, হাসে। হাসি থেকে মুক্তো ঝরে। আবার বিদ্যাসাগরের ছবির দিকে চাইলেন তিনি । হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল তাঁর। বিদ্যাসাগর নিজেই তো অনেক স্কুলপাঠ্য বই লিখে নিজে ছাপিয়ে বাজারে বার করতেন। বইয়ের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের নাম কোথাও ধার দেন নি তো কখনও। সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ তিনি ছেড়ে দিলেন রসময় দত্তের সঙ্গে মতের মিল হল না বলে। বলেছিলেন, আলু পটল বেচে খাব। কিন্তু আলু পটল বেচতে হয় নি। ইংরেজি ভাষা শিখলেন নিজের চেষ্টায়। শোভাবাজার রাজবাড়ির জামাতা অমৃতলাল মিত্র এবং শ্রীনাথ দত্তের কাছে রোজ ইংরেজী শিখতে যেতেন। ক্রমশ নিজে বই লিখতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে 'বাসুদেব চরিত', তারপর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', তারপর 'বাংলার ইতিহাস।' তারপর ছাপাখানা করলেন নীলমাধব মুকুজ্যের কাছে টাকা ধার করে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মার্শাল সাহেব তাঁর ছাপা বই কিনলেন অনেক। ধার শোধ হয়ে গেল। হু হু করে অনেক কথা মনে পড়ল নবীন দত্তের। কে যেন তাঁর মনের ভিতর বলে উঠল—বই বেচে টাকা রোজগার করতে চাও তো নিজে লেগে পড়। নাম ধার দেবে কেন? ফাঁকি দিয়ে কিছু হয় কি? ছাত্রটি যদি সত্যি ভালো ছেলে হয় সে ব্যবসায়ে তোমার সহকারী হোক। মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিদ্যাসাগরের সহকারী ছিলেন এ বিষয়ে। তারপরই মনে হল আজকাল মার্শাল সাহেবের মতো লোক পাওয়া যাবে কি? পাওয়া যাবে কি নীলমাধব মুকুজ্যে আর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মতো বন্ধু? আরও খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন বিদ্যাসাগরের ছবির দিকে কেমন যেন ক্ষোভ ঘনিয়ে উঠল মনের ভিতর। এ যুগে কি সবই খারাপ? সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, তা হতেই পারে না। বিদ্যাসাগরের সময়ে খারাপ লোক যে অনেক ছিল তার প্রমাণ আছে। তাঁর ঘরে ডাকাতি করেছিল, তাঁর ঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল, তাঁকে ঠকিয়েছিল, তাঁর নামে কুৎসা ছড়িয়েছিল। কিন্তু যে যুগেও বিদ্যাসাগর ভালো লোকের দেখা পেয়েছিলেন। এ যুগেও ভালো লোক নিশ্চয়ই আছে। আমি নাগাল পাই নি। কেন পাই নি? সবার মধ্যেই একটা না একটা খুঁত দেখতে পেয়েছি। মার্শাল সাহেব, নীলমাধব মুকুজ্যে, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দুর্গাদাস বাঁড়ুয্যে—এঁরা কি নিখুঁত ছিলেন? নিখুঁত মানুষ তো হতেই পারে না। নিশ্চয়ই কিছু খুঁত ছিল তাঁদের। তবু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। ভালবাসার জোরেই খুঁতকে উপেক্ষা করা যায়। বিদ্যাসাগর ওদের ভালবাসতে পেরেছিলেন বলেই ওঁরা ওঁর অকৃত্রিম বন্ধু হয়েছিলেন। এর পরেই একটা নিদারুণ সত্যের মুখোমুখি হলেন তিনি। তাঁর জীবনে প্রকৃত বন্ধু একটাও নেই। তাঁর চাকরি জীবনে যে সব সহকর্মীর সঙ্গে চাকরি করতেন তাঁদের একজনকেও বন্ধু করতে পারেন নি তিনি। সবারই সঙ্গে কেমন যেন একটা মুখোশ পরা সম্পর্ক ছিল। ঈর্ষাও ছিল পরস্পরের মধ্যে। বিলেত-

ফেবত ডক্টাব সেনকে তাঁব মনে হত চালিযাত। বিলেত ফেবত বলে তাদেব সবাইকে ডিঙিযে ওপবে উঠে গেছে। এজন্য ঈর্যাও হত। ঘৃণা কবতেন প্রফেসাব মিত্রকে ছাত্রীদেব সঙ্গে প্রেম কবতেন বলে। অনুকম্পা হত প্রফেসাব মুখার্জিব উপব। ছাত্র-ছাত্রীদেব মনোহবণ কবতে পাবেন নি ভদ্রলোক, তোত্‌লা ছিলেন একটু। তাঁব ক্লাসে পা ঘযত, শিস দিত সবাই কোনদিন বোর্ডে লেখা থাকত— আই, ক্লডিযাস। বোমান সীজাব ক্লডিযাস তোত্‌লা ছিলেন আই ক্লডিযাস ববার্টসেব লেখা বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রফেসাব মুখার্জি প্রাযই বেগে ক্লাস থেকে বেবিযে আসতেন। তোতলামিব জন্যেই কাবো সঙ্গে মিশতেন না বোধহয। নবীন দত্ত শুনেছিলেন লোকটা নাকি বিদ্যাব জাহাজ। একজন হোমবা চোমবা সাহেবেব পৃষ্ঠপোষকতাব জোবে চাকবিটি পেযেছিলেন। সব সমযে তাব তোতলামি থাকেও না। ভয পেলে বা বেগে গেলেই কথাগুলো আটকে যায। লোকটাব উপব অনুকম্পা হত নবীন দত্তেব। যাব প্রতি অনুকম্পা হয তাব সঙ্গে বন্ধুত্ব হয না। পবমেশ লোকটা দুঃখী। তিনবাব বিযে কবেছে। দেখা হলেই দুঃখেব কাঁদুনি গায আব ঘোঁট কববাব চেষ্টা কবে। ওব সঙ্গেও মেলে নি নবীন দত্তেব। এক পাল ছেলেমেযে নিযে টিউশনি কবে, নোট লিখে, ধাব কবে আব নানা বকম শেযাব কিনে, নানা ফন্দিফিকিব কবে সংসাব চালায লোকটা বন্ধুত্ব হওয়া দূবে থাক লোকটাকে দেখলেই অঙ্গ জ্বলে যায নবীন দত্তেব। প্রফুল্ল আইচ লোকটাব সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে পাবতো। ও লোকটাব অনেক গুণ। কিন্তু মুখে এমন গন্ধ আব হন্দহন্দ কবে এমন অনর্গল বকে যে মুখ দিযে থুথু ছিটকে বেবোয— ওব কাছে বসাই শক্ত। বন্ধুত্ব হবে কি কবে? তবে ওব প্রবন্ধ পড়ে মুগ্ধ হন নবীন দত্ত। না, নবীন দত্ত কাবো সঙ্গে বন্ধুত্ব কবতে পাবেন নি। যখন বিপ্লবী ছিলেন, মানে যখন পলিটিকস কবতেন তখনও মনেব মতো মানুষ পান নি। সেখানেও যেন একটা প্রতিযোগিতা, সেখানেও দলেব যিনি কর্তা তাব মন বাখবাব জন্যে ঠেলাঠেলি ভীড। সেখানেও নির্বাচন, সেখানেও নিজেব দলে লোক টানবাব জন্যে অশোভন প্রযাস এবং তাব জন্যে অনেক সময অসাধু আচবণ। সেখানে বন্ধুত্ব তো হযই নি কাবো সঙ্গে, দলাদলিব ঘূর্ণাবর্তে পড়ে হাবুডুবু খেযেছিলেন কিছুদিন। সেখান থেকে পালিযে বেঁচেছিলেন শেষ পর্যন্ত। তাবপব কাজ কবেছিলেন কযেকটা সামযিক পত্রিকাব আপিসে সেখানেই ওই কুৎসিত দলাদলি। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে হিংসে কবে মনে মনে—বিশেষত সে যদি প্রতিভাবান হয, প্রত্যেকেবই চেষ্টা কি কবে অপবকে চেপে আমি পাদপ্রদীপেব সামনে দাঁড়াব। প্রফেসাবি যতদিন পান নি ততদিন পেটেব দাযে এই নবকবাস কবতে হযেছিল তাকে কিছুদিন। যেদিন তাঁব লেখা না ছেপে এক কাগজেব মালিক তাঁব এক মোসাযেবেব লেখা ছাপলেন সেদিন বড় কষ্ট হযেছিল তাঁব। মুখ ফুটে বলতে পাবেন নি কিছু, চাকবিতে ইস্তফা দিযে চলে আসবাব মতো কোমবেব জোবও ছিল না তখন। পারুলকে নিযে তখন স্যাঁতসেঁতে একটা একতলা বাড়িতে থাকতেন, একটি মেযে হযেছে—যা পেতেন তাতে অত্যন্ত টানাটানি কবে চলত। সুতবাং চাকবিটা ছাড়তে পাবেন নি। সেখানে হোমবাচোমবা কাবো সঙ্গে বন্ধুত্ব হওযা সম্ভবই ছিল না, সবাই তাঁবা নিজেদেব লাটবেলাট মনে কবতেন, তাঁব সঙ্গে মুখে একটা ভদ্রতা বজায বাখতেন বটে, কিন্তু মনে মনে কবতেন অনুকম্পা।

এদের কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে কি করে? বন্ধুত্ব মানে প্রেম। এদের মধ্যে একজনও প্রেম জাগায় নি তাঁর মনে। জাগিয়েছিল বরং রামরতন। সে ছিল প্রুফরীডার। কমবয়সী ছেলেটা। অর্থাভাবে লেখ পাড়া শিখতে পারে নি। কিন্তু ভারী সুন্দর স্বভাব ছিল তার। ভালো প্রুফ দেখত। মাইনে পেত মাত্র পঞ্চাশ টাকা। তাকে ভালোবেসে ছিলেন নবীন দত্ত। বাড়ি ফেরার পথে তারই সঙ্গে গল্প করতে করতে যেতেন ট্রাম ধরবার জন্যে। মাঝে মাঝে তার বাড়িও গেছেন। বাড়িতে বিধবা মা ছিলেন কেবল। আপনার মাকে দেখেছিলেন তাঁর মধ্যে। সত্যি বাঙালী মায়ের রূপ দেখেছিলেন। তাঁর আগ্রহে মাঝে মাঝে চা আর মুড়ি খেতেন তিনি বামরতনের বাড়িতে। কখনও কখনও বেগুনিও ভেজে দিতেন তিনি তার সঙ্গে। চা করতেন। অতি ছোটখাটো ঘরোয়া সুখদুঃখের গল্প করতেন, পলিটিকস বা সাহিত্য, চীন বা বাশিযা নিয়ে আসর জমাবার ক্ষমতাই ছিল না তাঁর। পাড়াপড়শীর কথাই বলতেন বেশী। বামরতন তাঁব বন্ধু হতে পারে নি কিন্তু। বুদ্ধির জগতে অনেক পার্থক্য ছিল দু'জনেব। স্নেহ করতেন তিনি বামরতনকে। তারপব বামরতনও হারিয়ে গেল। যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল আব ফেরে নি। নবীন দত্ত তার বাড়িতে তবু গিয়েছিলেন একদিন। দেখলেন সেখানে অন্য ভাড়াটে। বাড়িওলা বললেন— রামরতনের মা দেশে গেছেন। তাঁব দেশ কোথায তা তিনি বলতে পারলেন না। ওরা হাবিয়ে গেল নবীন দত্তর জীবন থেকে। অতীতের এই সব স্মৃতি মন্থন করতে কবতে আব একবার তিনি বিদ্যাসাগবেব ছবিটাব দিকে চেয়ে দেখলেন। অদ্ভুত একটা কৌতুক যেন চকমক করছে তাঁব চোখেব কোণ দুটিতে। মনে হল তাঁব অবস্থা দেখে মনে মনে হাসছেন যেন তিনি। যেন বলছেন—বাপু, ও বকম কি হয় কখনও? মানুষ কি না ভালোবেসে থাকতে পাবে? তুমিও ভালোবেসেছ নিশ্চয়, কাকে ভালোবেসেছে সেটাও তোমার অজানা নেই। কিন্তু সত্যটাকে আমল দিতে লজ্জা হচ্ছে তোমাব। লজ্জাব কি আছে এতে। সহসা বিদ্যুৎ-চমকের মতো সত্যটা উদ্ভাসিত হল নবীন দত্তের মনে। মনে পড়ল অলঙ্কারকে আর দুমকে। দুটি ছেলেকেই ভালোবেসেছিলেন তিনি। কেবল পিতৃসুলভ ভালোবাসা নয়। ওরা যদি মেয়েমানুষ হত তাহলে এটাকে অনায়াসে রোমান্টিক ভালোবাসাও বলা চলত। অপত্যস্নেহের উপর এমন একটা রঙের ছোপ লেগেছিল যা সত্যিই মাতিয়ে তুলেছিল তাঁকে। তাঁর এভাব তিনি গোপন রাখতেন। ওদের কাছেও তা প্রকাশ করেন নি কখনও। বরং ওদের কাছে একটু বেশী গম্ভীর হয়ে থাকতেন। রোমান্টিক বলছি এই কারণে যে রোমান্সের রমণীয়তা, অনিশ্চয়তা, আশা আশঙ্কা সবই ছিল সে ভালোবাসার মধ্যে। অলঙ্কার অনেক দিন আগে চলে গেছে। ওর মেয়ে দুটোকে তত ভালো লাগে না কিন্তু। কেমন যেন লোভী লোভী ধরনের। বোধহয় দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হচ্ছে বলেই ওরকম হয়েছে। ভালো লাগে না, কিন্তু মায়া হয়। অলঙ্কার তাঁর স্বপ্নলোক আলো করে এখনও আছে। মাঝে মাঝে চোখ বুঁজে তার কথা ভাবেন। তাঁর ছেলেরা রূপবান নয় কেউ। অলঙ্কার তো কালোই ছিল। বেঁটেও ছিল একটু। কিন্তু চোখের দৃষ্টি কী স্বপ্নময়। মনে হত সে যেন এ জগতের লোক নয়।. সর্বদাই অন্যমনস্ক হয়ে থাকতো। পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল, ইতিহাসের ছাত্র ছিল সে। ইতিহাসের রূপকথালোকেই ঘুরে বেড়াত যেন। নবীন দত্ত সে

স্বপ্নলোকে প্রবেশ কবতে পাবতেন না। ইতিহাসেব বই পডলেই ঘুম পেত তাঁব। অলঙ্কাব কিন্তু ওই ইতিহাসেব অবণ্যে কিসেব যেন সূত্র খুঁজে বেড়াত। মনে হত যেন পবশমণি খুঁজছে। নবীন দত্তব মনে হয়—হয়তো এখনও খুঁজছে। অনেক দূবে মনেব সুদূব প্রত্যন্ত প্রদেশে এখনও তিনি মাঝে মাঝে দেখতে পান স্বপ্নাচ্ছন্ন অলঙ্কাবকে। মাঝে মাঝে তাঁব মনে হয় সে চলে গেছে ভালই হয়েছে। বেঁচে থাকলে বাস্তবেব রূঢ় আঘাতে তাব স্বপ্ন ভেঙে যেত। ইব্যাসমাস (Erasmus) কিংবা শেলীব (Shelly) মতো কষ্ট পেতে হত। গেছে, বেশ গেছে। ভোগেও নি বেশী। হঠাৎ হার্টফেল। এক মিনিটেই সব শেষ। বেশ গেছে। অলঙ্কাব আব নাগালেব মধ্যে নেই, তাকে ইচ্ছে কবলে আব দেখতে পাবেন না, শোকেব জ্বালা নেই, ক্ষতিব দুঃখ নেই, কিন্তু ওই বোমান্টিক ভাবটা এখনও আছে। মনে হয় ঘোব অন্ধকাবেব মধ্যে অনেকদূবে যেন একটা আলোকিত বন্দব দেখতে পান। সেদিকে মনে মনে আকুল হয়ে চেয়ে থাকেন তিনি। এ আকুলতা বোমান্টিক আকুলতা, যে আকুলতা নিয়ে বাধা মথুবাব বাজা শ্রীকৃষ্ণেব কথা ভেবে বিবহেব কুয়াশায় পথ হাবাত। অলঙ্কাবেব যবনিকা পড়ে গেছে, কিন্তু পড়েও যেন পড়ে নি। যবনিকাব ওপাবে এমন একটা জ্যোতির্ময় লোক দেখা যাচ্ছে যাব জ্যোতি অনির্বাণ।

দুম যদিও অন্যবকম, একেবাবে অন্যবকম, তবু তাকেও ঠিক ওই বকম বোমান্টিক ভালোবাসাই বেসেছেন নবীন দত্ত। আবও বেশী কবে বেসেছেন কাবণ দুম আবও গোপনচাবী অত্যন্ত স্বল্পভাষী সে। বাড়িতে কখন আসে কখন যায়, তাও জানা যায় না সবসময়ে। তাব পদশব্দ বা কথা শোনবাব জন্য নবীন দত্ত উৎকর্ণ হয়ে থাকেন, কিন্তু ক্বচিৎ শুনতে পান। খুব ছেলেবেলায় তাকে নিজে যখন পড়াতেন তখন লক্ষ্য কবেছিলেন খুব কম সময়েব মধ্যে সে পড়া শিখে ফেলত আব বাকি সময়টা সে কাটাত বাড়িব চাবদিকে ঘুবঘুব কবে। ড্রয়াব খুলে কখনও এটা হাঁটকাচ্ছে, কখনও ওটা ঘাঁটকাচ্ছে, কিংবা বাড়িব সামনে যে ছোট মাঠটা ছিল সেই মাঠে গিয়ে হয় ঘুড়ি ওড়ান দেখছে, না হয় প্রজাপতিব সন্ধান কবছে। না-হয় হাঁ কবে চেয়ে আছে আকাশেব দিকে। প্রতিবেশীব বাড়িতে যাওয়া মানা ছিল, পাড়াব ছেলেদেব সঙ্গে বেশী মিশতে দিতেন না তিনি নিজেব ছেলেদেব। তবু বাইবে গিয়ে মাঠে দাঁড়িয়ে দুম যেন বাইবেব বিশ্বেব স্পর্শলাভ কববাব চেষ্টা কবত। কেমন যেন একটা উৎসুক কৌতূহলী ভাব। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোবীদেব মনেব ভাব যেমন হয় অনেকটা তেমনি। আব একটা উপমাও তাঁব মনে হত। ঐতিহাসিক উপমা কিন্তু খুব লাগসই নয়। কোথায় যেন পড়েছিলেন যে প্রাচীনকালে ফিনিশিয়ানবাই সর্বপ্রথম সমুদ্রযাত্রা কবেছিল। অকূল সমুদ্রে পাল তুলে নৌকো ভাসিয়েছিল অজানা দেশেব উদ্দেশে, সমুদ্র আব আকাশ যে চক্রবাল বেখায় মিশেছে সেই সীমাবেখা তাবাই নাকি লঙ্ঘন কবেছিল সর্বপ্রথম। তাদেব এই চবিত্রেব সঙ্গে দুমের খানিকটা মিল আছে, কিন্তু অমিলও অনেক। তাবা ছিল অর্থগৃধ্নু বেনেব দল, সংস্কৃতিব ধার ধারত না, তাদেব কোন পিরামিড নেই, টাওয়াব আব ব্যাবেল নেই, তাদেব টাকাব গুদাম টায়ার আব সিডন কবে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। দুম কিন্তু টাকাকড়ি বিষয়ে ঠিক উল্টো। খবচ কবেই ফতুব চিবকাল। নবীন দত্ত ছেলেদেব হস্টেলে বেখে পড়িয়েছিলেন। একদিন হঠাৎ

লক্ষ্য করলেন দুম বড্ড রোগা হয়ে গেছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন টাকা ধার করে একটা টাইমপিস কিনেছে। সেই ধাব শোধ করছে জলখাবাব না খেয়ে। জিজ্ঞেস কবেছিলেন--টাইমপিসটা কোথা? টাইমপিসটা ছিল, কিন্তু গোটা ছিল না। দুম সেটাব যন্ত্রপাতি খুলে খুলে দেখেছিল। বললে—আমি ওটা আবার ঠিক কবে দিতে পারি কিন্তু দুটো স্ক্রু (screw) হারিয়ে গেছে। অনেক দোকানে খুঁজেছি পাই নি। নবীন দত্ত মুখে ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন, মনে মনে কিন্তু তিনি এমন একটা লোকে চলে গিয়েছিলেন যার আভাস আমরা মাঝে মাঝে পাই, কিন্তু যা প্রায়ই আমাদের নাগালের বাইরে থাকে।

হঠাৎ নবীন দত্তের মনে হল, আমি যদি বইয়েব ব্যবসা কবি দুম আমার সহকাবী হবে কি? হবে না। সে রসায়ন নিয়ে গবেষণা কবছে, তাব সঙ্গে দোকানদারী খাপ খাবে না। কবলে কি তিনি খুশী হতেন? না, হতেন না। দুম দোকানেব আপিসে বসে কেবানীগিবি কবছে বা বই বেচবাব জন্যে ইস্কুলে ইস্কুলে ঘুবে বেড়াচ্ছে এ কল্পনা করাও অসহ্য তাঁব পক্ষে। কিন্তু তবু তিনিই আবাব তাব সহকারিতাও কামনা কবতেন। তিনি জানেন সোনাব পাথব বাটি হওযা অসম্ভব, কিন্তু আশ্চর্য অসম্ভবের দিকেই মনটা ঝুঁকে পড়তে চায বাব বাব সেকালেব অ্যালকেমিস্টদেব মতো, যারা অ-সোনা থেকে সোনা বানাতে চাইত।

আবাব চাইলেন তিনি বিদ্যাসাগবেব ছবিব দিকে। দেখলেন চোখেব কোণে কৌতুকেব সে ছটা আর নেই। বিদ্যাসাগব যেন ভাবছেন, কি যেন ভাবছেন একটা। একটি ভাবনাই তিনি সারা জীবন ভেবেছিলেন— কি কবে এই হতভাগা দেশের উন্নতি কবা যায়। সেই ভাবনাটাই আবার পেয়ে বসেছে না কি তাঁকে। যে যুগে তিনি বিধবা বিবাহ দেবাব জন্য প্রাণপণ করেছিলেম। তাঁব একটা জোবালো যুক্তি ছিল ছোট ছোট মেয়ের সঙ্গে অনেক বুড়োব বিয়ে হয়, ফলে অকালবৈধব্য হয় তাদের, তাদের আবার বিয়ে না দিলে তারা কু-পথে যাবে। মেয়েদেব লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিলেন, তারা যদি লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পাবে তাহলে পেটের দায়ে কু-পথে যাবে না। এখন বিদ্যাসাগব এ দেশের শত শত কুমাবী অবিবাহিতা মেয়েদের দেখতে পান নি? সচ্ছল অবস্থার ব্যভিচাবিণী মেয়েদের খবব রাখেন কি, যারা মোটরে চড়ে অভিসারে যায়— যাদের মধ্যে সধবা, বিধবা, কুমাবী সব আছে? হঠাৎ বিদ্যাসাগরের চোখের ভাষার রং বদলে গেল, মনে হল রেগে গেলেন তিনি। বাঙ্ময হয়ে উঠল তাঁর দৃষ্টি, তুমি আমার কথা ভাবছ কেন, নিজের চরকায় তেল দাও। পশু চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে, কামড়াবে, লাথি ছুঁড়বে, পেখম মেলবে, নাচবে, কুঁদবে। ওদের নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নি, চেষ্টা করেছিলাম অসহায় কতকগুলো ভদ্র মেয়েকে বাঁচাতে। তাদের মধ্যে কিছু বেঁচেছে, এইতেই আমি খুশী। তুমি আমার কথা ভেবো না, নিজের চরকায় তেল দাও। বইয়ের ব্যবসা যদি করতে চাও, নিজে ব্যবসাতে নাম। প্রায সঙ্গে সঙ্গেই সেই ছেলেটি এসে হাজির হল। নবীন দত্ত বললেন—বেশ, নোট তুমি বার কর। আমি নতুন নোটও তোমাকে লিখে দেব। নগদ টাকা দিতে হবে না। আমি তোমার দোকানে গিয়ে বসব রোজ। যা লাভ হবে আধাআধি আমরা নেব। তুমি রাজী আছ?

ছেলেটি একটু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর বলল 'আমাদের দোকানে আপনি বসতে পারবেন না স্যার। সে একটা গলির গলি তস্য গলির মধ্যে। কোনক্রমে একফালি ঘর পেয়েছি। উপরে নীচে, আশেপাশে সব দোকান চারদিকে ময়লা, ভ্যাপসা গন্ধ, মানুষগুলো পোকার মতো কিলবিল করছে , আপনি সেখানে এক মিনিটও বসতে পারবেন না। আপনার দোকানে বসবার দরকার কি স্যার?' 'আমি নিজেই দেখতে চাই ব্যবসাটা। তাতে তো তোমাদের সুবিধেই হবে। হিসেবপত্র আমিই রাখব। তোমরা বাইরে ঘুরবে। কেন সেখানে বসতে পারব না বলছ? আমি এককালে বস্তিতে খোলার ঘরে থাকতুম।' রাখাল হেসে বললে, 'আপনাদের আমলে বস্তিও বাসযোগ্য ছিল। এখন ভদ্রপাড়াও বাসের অযোগ্য হয়ে গেছে। আমাদের যেখানে দোকান সেটা তো একটা নরক।' নবীন দত্ত চটে উঠলেন। বললেন, 'আমি বাপু নরকেই যদি বসতে পারি তোমার আপত্তি কেন। তোমার দোকান যাতে ভালোভাবে চলে সেই চেষ্টাই করব বলে ওখানে বসতে চাচ্ছি। শুধু আমার নামটা ধার দেব কেন, ব্যবসাটার যাতে উন্নতি হয় সেই চেষ্টা করব। তোমার আপত্তি কেন এতে।' রাখাল চুপ করে রইল। তারপর বলল—'একটা কথা জিজ্ঞেস করছি স্যার, কিছু মনে করবেন না। নবীন দত্ত বললেন, 'কিছু মনে করব কি না, সেটা নির্ভর করছে তুমি কি জিগ্যেস করবে তার উপর। অত ভণিতার দরকার কি কি বলতে চাও বল না। ' রাখাল মাথা চুলকে একটু ইতস্তত করে বলল—'আপনি কি অবিশ্বাস করছেন আমাদের? তাই কি দোকানে বসতে চাইছেন?' নবীন দত্ত হেসে ফেললেন। বললেন 'বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নই আসে না এখন। কিছুদিন না মিশলে তো বোঝাই যায় না কে কেমন। তবে ভদ্রলোকমাত্রেই বিশ্বাস করতে চায়। ঠকতে পারি এ সম্ভাবনা আছে জেনেও করতে চায়। তোমাকে পড়িয়েছি, ছাত্র হিসাবে তুমি ভালো ছিলে তোমাকে অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ তো নেই। আমি দোকানে বসতে চাইছি, কারণ আমিও একটা কাজ চাই। দোকানে বসেই লেখাপড়া করব। তোমাদের ব্যবসাটাও দেখব। তার মানে তোমাদের মতো আমিও এখন বেকার। আমিও একটা কাজ চাই।' রাখাল বললে - 'আপনি কিন্তু স্যার ওখানে বসে লেখাপড়া করতে পারবেন না। চারদিকে খালি হট্টগোল।' এর পর নবীন দত্ত কি বলতেন কি করতেন তা আর জানা গেল না। দুম দুম করে দুম এসে হাজির হল। বলল, ''বাবা, আজই আমি জার্মানি যাচ্ছি। কিছু টাকা তোমার কাছে দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ যদি কোনও দরকার হয় খরচ কোরো, আর তুমি বাড়িতে থেকো। মায়ের শরীরটা ভালো নয়। দিদিমার শরীর আরও খারাপ। দরকার হলে কোন বড় ডাক্তারকে ডেকো।' নবীন দত্ত হকচকিয়ে গেলেন। বললেন 'হঠাৎ জার্মানি যাচ্ছিস কেন? এত টাকাই বা পেলি কোথা?'

'আমি বেল নিয়ে কিছু রিসার্চ করেছি। পেপারগুলো ওদের পাঠিয়েছিলাম। ওরা আমার সঙ্গে এ বিষয়ে সামনাসামনি আলাপ করতে চায়। টাকা ওরাই দিয়েছে আমি বলেছিলাম বাড়িতে কিছু টাকা রেখে না গেলে আমি যেতে পারব না। ওরা সে টাকাও দিয়েছে। হয়তো পরে আমার মাইনে থেকে অ্যাডজাস্ট করে নেবে। জানি না—'

নবীন দত্ত নোটের গোছার দিকে চেয়ে বললেন—'কত টাকা আছে এতে?'

'পাঁচ হাজার টাকা।'

নবীন দত্ত গুম্ হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

'কখন যাবি?'

'দুঘন্টা পবে আমার প্লেন ছাড়বে।'

'পাসপোর্ট, ভিসা?'

' সে হয়ে গেছে। আমি চললুম তাহলে।'

প্রণাম করে দুম্ চলে গেল। তখখুনি ফিরে এল আবার।

'আমি রাঘবকে বলে গেলাম সে এসে তোমাদেব রোজ খোঁজখবব নেবে। যদি কিছু দরকার হয় তাকেই বোলো।'

'বাঘব কে?'

'রাঘব আমাব বন্ধু। আমার আপিসে কাজ কবে।'

'এসব হাঙ্গামা করতে গেলে কেন?'

'হাঙ্গামাটা কি?'

'একজন ভদ্রলোক বোজ আসবেন আর জিগ্যেস কববেন কি আমাদেব দবকাব এই বাধ্যবাধকতার মধ্যে কেন ফেলছ তাঁকে? আর সব দবকাব কি সকলকে বলা যায় সব সময়ে—তুমি মানা কবে দাও ওঁকে।'

'দবকার বোঝ, তুমিই মানা করে দিও। চললুম—' আবাব নেমে গেল দুম্।

নবীন দত্ত চুপ করে রইলেন। রাখাল একটু মুচকি হেসে বললে—'উনিই কি আপনাব ছেলে এ. দত্ত?'

'এ. দত্ত বলছ কেন? অমল দত্ত, অধীর দত্ত, অবিনাশ দত্ত, অসভ্য দত্ত, অলস দত্ত, অগা দত্ত —সবাই এ-দত্ত। ও তার একটাও নয। ও হচ্ছে অহঙ্কাব দত্ত। আমাব নোটবুকে তুমি যেন এন. দত্ত ছেপো না। নবীন দত্ত ছাপবে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, নবীন দত্তই ছাপব। নামটা ছাপবার অনুমতি দিচ্ছেন তাহলে?'

'দিচ্ছি, কিন্তু একটি শর্তে। তোমাদের দোকানে গিয়ে যখন বসবার উপায় নেই, আমার ছেলে না ফেরা পর্যন্ত বাড়িতেই থাকতে হবে আমাকে, কিন্তু দোকানের সব কাগজপত্র আমার কাছে প্রতি রবিবারে নিয়ে এস। আমি বাড়িতে বসেই তোমাদের দোকানের খবর রাখব। খবর রাখব তোমাকে অবিশ্বাস করছি বলে নয়। কর্তব্য বলে।'

রাখাল বলল—'বেশ, তাই হবে। এখন তবে যাই।'

প্রণাম করে রাখাল চলে গেল।

নবীন দত্ত চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর নিজের জাবদা খাতাটা পেড়ে লিখলেন—

দুম্ দুম্ করে জার্মানি চলে গেল। আমাদের দেশের অতীশ দীপঙ্কর তিব্বত গিয়েছিলেন অনেক কষ্ট করে জ্ঞান আহরণের জন্য। পায়ে হেঁটে হিমালয়ের শীতকে উপেক্ষা করে গিয়েছিলেন তিনি। আমাদের সব ছেলেরা এখন যান এরোপ্লেনে করে। অতীশ দীপঙ্করের

সময় প্লেন থাকলে তিনিও হয়ত প্লেনেই যেতেন। অতীশ দীপঙ্কর আর দুমের উদ্দেশ্য একই—জ্ঞান আহরণ। তবু কিন্তু কেন জানি না, অতীশকে উচ্চতর আসনে বসাতে ইচ্ছে করছে আমার। মনে হচ্ছে—রেল, প্লেন, জাহাজ যদি না থাকত তাহলে কি দুম জার্মানি যেত? বলতে ইচ্ছে করছে—যেত নিশ্চয়ই যেত কিন্তু আমার মনের মধ্যে অতিঅভিজ্ঞ হতাশাবাদী যে লোকটি আছে, সে বলছে যেত না। এ সংশয় নিরসন করা যাবে না। সুতরাং এইখানেই থামলুম। এই পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে কি করি এখন? ব্যাঙ্কে রাখব? তাহলেই তো ইনকম ট্যাক্সের লোকেরা ধরবে। ঠিক আছে, আমার ঘরে যে বড় পিতলের ফুলদানীটা আছে, যাতে এখন ফুল সাজাবার ক্ষমতা নেই আমার, যাতে এখন নানাবিধ আবর্জনা জমে আছে, সেইখানেই রাখব টাকাগুলোকে। রেখে তাব উপর একটা ময়লা রুমাল গুঁজে দেব। ওর চেয়ে বেশী সাবধানতা অবলম্বনের দরকার নেই। আমার ঘরে কেউ আসে না। দুম্ বলে গেছে আমি যেন বাড়ি থেকে না বেরুই। তার মায়ের শরীর খারাপ, তার দিদিমা এখন-তখন। তা কি আমি জানি না? তাঁদেব কিছু হলে ডাক্তার ডাকতেই তো ছুটোছুটি করতে হবে আমাকে। দূরে শুনতে পাচ্ছি একদল চোং-প্যান্ট-পবা ছেলে হই হই কবছে ঃ মাঠে হাল্লা কবছে ঃ ক্রিকেট খেলছে তাবা। তাদেব এ উৎসাহ আমার মনে উদ্দীপনা সঞ্চাব কবছে না, বাগ হচ্ছে। তাব মানে, আমি ওদেব কাছ থেকে অনেকদূর সবে এসেছি। বুড়ো হয়ে গেছি। বুড়ো হওয়াটা কোন অপরাধ নয়, স্বাভাবিক নিয়মে সবাই বুড়ো হয়। বুড়ো বযসেবও একটা আলাদা রূপ আছে, যা তরুণদের নেই, কিন্তু সেই রূপকে অক্ষত অক্ষুণ্ণ বাখতে হলে সংসারের হই-হুল্লোড় থেকে দূরে থাকতে হয়। আমাদের দেশের জ্ঞানীবা বিধান দিয়েছিলেন পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ। কিন্তু এ যুগে সে বন নেই। আছে নানা রকম শৌখীন বন সেখানেও ভীড়, সবাই গিয়ে পিকনিক করে। তাই নিজেই নিজের চাবদিকে একটা 'তফাৎ যাও' মনোভাব সৃষ্টি কবেছি। কারো কাছে যাই না, কাউকে কাছে আসতেও উৎসাহ দিই না। তবু আসে, ক্রমাগত আসে। আমি তট, ওবা ঢেউ। ক্রমাগত ধাক্কা মাবছে।'

জাবদা খাতাটা মুড়ে রেখে আবার চুপ করে বসে বইলেন। বিদ্যাসাগবেব দিকে চাইলেন একবাব। বিদ্যাসাগর যেন বললেন, দেখ বাপু, আর যা-ই কর, নাকে কেঁদো না। বিধবা-বিবাহ দিতে গিয়ে আমাব যখন ৮৪,০০০ টাকা দেনা হয়েছিল তখনও আমি নাকে কাঁদিনি। আমার হয়ে যাঁরা নাকে কেঁদে জনসাধারণের ভিক্ষাপাত্র প্রসারিত করছিলেন তাঁদের আমি মানা কবেছিলাম। মনে হচ্ছে তুমিও কৃপা ভিক্ষা করছ। ভিক্ষা পেলেও সে কৃপা তুমি নেবে কেন? তোমাব ছেলেব টাকাটা রেখে দাও সে এলে ফেরত দিয়ে দিও। ও তোমাকে ঘরে বন্দী হয়ে থাকবার হুকুম দিয়ে গেল। তোমার স্বাধীনতার দাম কি মাত্র পাঁচ হাজার টাকা?'

খাতাটা তুলে রেখে ঘড়ি দেখলেন দেড়টা বেজেছে। এইবার খেতে হবে। ইকমিব কুকারে চাল-ডাল, দুধ, আলু, পটোল চড়িয়ে দিয়েছেন সকালে। এতক্ষণে হযে গেছে নিশ্চয়। উঠে কুকারটায় হাত দিয়ে দেখলেন। এখনও একটু গরম আছে। খেতে যাবেন এমন সময় দুমের মা এসে হাজির হল। তাঁর হাতে একটা বাটি।

'মা আজ আদা লাউ খেতে চেয়েছিলেন। তাই করেছিলাম, একটু। তোমার জন্যেও এনেছি, তুমি তো ভালোবাসতে আগে—'

প্রফুল্ল হলেন নবীন দত্ত।

'এখনও বাসি। দুম তোমার সঙ্গে দেখা করে গেছে?'

'গেছে। আমার ভালো লাগছে না। কি যে ও করবে শেষ পর্যন্ত ভগবানই জানেন। অত দূর দেশে এখন হঠাৎ গেলই বা কেন, তা-ও বুঝতে পারছি না। বায়েদের ছেলেটা বিলেত গিয়েছিল আব ফেরে নি। সেইখানেই বিয়ে করে বসবাস করছে। আর আসবেও না শুনছি—'

'এ দেশে ফিবে কি লাভ হত' এ দেশে আমরা কি সুখে আছি? এখানে তোমার ছেলের উন্নতি হলে কেউ খুশি হত না। সকলেরই বুক জ্বলত, চোখ টাটাত। বিষকুম্ভ পয়োমুখ আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা—। সামনে খুব গদগদ পিছনে ফিরলেই ভুরু নাচায়।'

'কিন্তু এদের মধ্যেই আমরা এতকাল বেঁচে আছি তো। এদের নিয়ে আমাদের সাধ-আহ্লাদও মিটেছে এতকাল।'

'আমাদের পূর্বপুরুষরা মধ্য এশিয়া থেকে এদেশে এসেছিলেন, জান?'

'তাই না কি?'

'দাও তোমার তবকারিটা শুধু মুখেই খেয়ে ফেলি। আমার ওই ঘ্যাটের সঙ্গে ভালো লাগবে না।'

পারুলবালা বাটিটা দিলেন।

বললেন -'আমিই তো তোমাকে ফুটিয়ে দিতে পাবি দুটো। কিন্তু তোমাব শখ ওই রকম ঘ্যাট কবে খাওয়া.'

'চমৎকাব হয়েছে আদা লাউ। সেদিনেব পোস্তটাও বেশ হয়েছিল। মা কেমন আছেন এখন?'

'মা আর বাঁচবেন না। আমরা যত্নেব ত্রুটি কবছি না। তবুও মনে শান্তি নেই। ছেলেদের নাম করছেন দিনরাত; ওরা তো একবার এসে খোঁজও করে না।'

নবীন দত্ত কোন উত্তর দিলেন না। আদা লাউয়েব বাটিটা চেটে চেটে খেতে লাগলেন। শালাদের সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করে পারুলবালার মনে কষ্ট দিতে চান না তিনি।

পারুলবালাকে বললেন, 'ইকমিকটা খোল। খাওয়াটা শেষই করে ফেলি। বেরুতে হবে একবার।'

পারুলবালা ইকমিকটা খুলে দেখলেন একটা বাটিতে রয়েছে কি রকম যেন একটা থকথকে জিনিস। আর একটা বাটিতে একটা ঝিঙে, একটা আলু আর একটা বেগুন। নীচের বাটিতে ডাল খানিকটা। মুসুর ডাল।

'নামিয়ে ওই থালায় ঢেলে দাও। সব চটকে খেয়ে ফেলব।'

'নুন তেল দেবে না।'

'দরকার নেই।'

'ওপরেব বাটিতে এটা কি?'

'চরু। ঘি দুধ আর চাল। ভালো চরু ইকমিকে হয় না। যা হয় বেশ লাগে।' পারুলবালা সবগুলো একটা কানা উঁচু থালায় ঢেলে দিলেন। সেগুলো চটকে ফেললেন নবীন দত্ত।

তারপর সপাসপ করে খেয়ে ফেললেন সেটা। পারুলবালা নীরবে দেখলেন, হঠাৎ তাঁর বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। মনে হল এই লোকটার খাওয়ার তদ্বিরৎ করবার জন্য তাকে চব্বিশ ঘন্টা ব্যস্ত থাকতে হত। মাছ, মাংস নানারকম নিরামিষ তরকারি, ক্ষীর, দই সব রকম ব্যবস্থা রাখতে হত। আর আজ ওই লোকটা যেন পিণ্ডি গিলছে।

বললেন —'এসব ভালো লাগে? আগে তোমার খাওয়ার কত শখ ছিল।'

'আগে তো কত কিছু ছিল। মাথায় কোঁকড়া চুল ছিল, এখন আছে? আগে ফুলেল তেল মাখতাম এখন মাখি? আগে মাসে বারোশো টাকা রোজগার করতুম, এখন করি, পৃথিবীর নিয়মই এই। সব বদলে যায়। তুমি বদলাও নি? তোমার মাথার সামনে টাক পড়েছে, গাল তুবড়ে গেছে, কোমরে ব্যথা, বুক ধড়ফড়। আগে এসব ছিল? আগের কিছুই থাকে না। ওই কৌটোটাতে দেখ তো হরতুকি আছে কিনা—'

পারুল কৌটোটা তাক থেকে পেড়ে খুলে দেখলেন।

'না নেই। কাল মুখপুড়িকে দিয়ে আনিয়ে নেব।'

'আমি এখুনি বেরব। কিনে আনব। মুখপুড়িকে ফরমাস কোরো না, ও দাম নিতে চায় না। তোমার খাওয়া হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'শুয়ে পড়গে তাহলে। আমি বেরব।'

নবীন দত্ত উঠে ময়লা খদ্দরের পাঞ্জাবিটা পরে ফেললেন।

পারুলবালা উঠে নেমে গেলেন। নবীন দত্ত স্যাণ্ডালটা পায়ে দিতে গিয়ে দেখলেন একটা জুতোর স্ট্র্যাপ প্রায় ছিঁড়ে গেছে। তখনই মোটা ছুঁচ আর মোটা সুতো বার করে দুটো ফোঁড দিয়ে নিলেন স্ট্র্যাপটাতে। রাস্তায় মুচি পেলে সারিয়ে নেবেন। টাকা পয়সার ছোট্ট থলিটি হাতে নিয়ে ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন নবীন দত্ত। কিন্তু চারতলায় দুমের ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন আবার। দুয়ারটা হা হা করছে খোলা। কপাটটা বন্ধ পর্যন্ত করে যায় নি ছেলেটা। ঘরের ভিতর ঢুকলেন নবীন দত্ত। ঢুকেই দেখলেন ঘরে অসংখ্য সিগারেটের টুকরো। কোণে ক্যামেরাটা রয়েছে। মাটিতে একটা আধ ময়লা চাদর ঢাকা বিছানা। বিছানায় এলোমেলো অনেক বই। ঘরের দেওয়ালেও বইয়ের শেলফ। সব বই ঠাসা। বিজ্ঞানের বই। তিনি কিছু বোঝেন না। হঠাৎ যেন নজরে পড়ল একটা আলমারিতে কিছু আধুনিক ইংরেজি নাটক রয়েছে। পাশের ঘরে ছবির স্তূপ। চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন নবীন দত্ত। কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগলেন। আরও মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ করে। তারপর নেমে গেলেন।

রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড় এই দুপুরেও। ময়দানে কি একটা হচ্ছে না কি। পিলপিল করে লোক ছুটছে সেদিকে। কেউ কাউকে চেনে না, অথচ পাশাপাশি ছুটছে। নবীন দত্তকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেল এক গগলস পরা ছোকরা। হনহন করে চলেছে দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে। চাকরিহীন বেকার, পেটে বিদ্যে নেই, কিন্তু চালচলন দেখে মনে হয় এক একটি নবাব। নবীন

দত্ত ভাবলেন এ আমাদেরই দোষ, আমরা ওদের গড়তে পারি নি, শিব গড়তে বাঁদর গড়েছি। হঠাৎ একটি মেয়েকে দেখলেন। বয়স কত তা বোঝার উপায় নেই। মুখ দেখে মনে হয় তিরিশ পেরিয়ে গেছে। বব্ করা চুল, চোখে কাজল, পিঠের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে, কাপড়টা পরেছে নাভির অনেক নিচে. হাতে গয়না নেই, আছে শুধু একটা ঘড়ি। আর এক হাতে শিকলের মতো কি একটা জড়ানো। মুখে খুকী খুকী ভাব। স্যান্ডাল টেনে টেনে চলেছে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে। সে যুগে হলে এ জাতীয় চেহারাকে পতিতার পর্যায়ে অনায়াসে ফেলে দিতে পারতেন, কিন্তু এ যুগে তা যায় না। কারণ অধিকাংশেরই ওই বেশ। এ দেশের অধিকাংশই বেশ্যা হয়ে গেছে এ কথা ভাবতে পারলেন না নবীন দত্ত। মনে মনে রবীন্দ্রনাথের সেই লাইনটা আওড়ালেন—ও আমার, এ তোমার পাপ। তারপর তিনি আর কোনও দিকে না চেয়ে হনহন করে চলতে লাগলেন। যাচ্ছিলেন তিনি ধীরেশ বিশ্বাসের কাছে। লোকটি তাঁর পেনসন-উদ্ধারের ব্যাপারে খুব সাহায্য করেছে তাঁকে। তার একটি মেয়ে আছে, তাঁরই ছাত্রী, তার জন্যে খুব ভাল একটি পাত্রেব খোঁজ পেয়েছেন তিনি। পাত্রেব বাবার সঙ্গে আলাপ আছে নবীন দত্তের। কিন্তু তিনি থাকেন টালিগঞ্জে। তাঁর ফোন আছে, ধীরেশেবও আছে। ধীরেশের বাড়িতে গিয়ে তাকে ফোন কববেন বলেই যাচ্ছিলেন। নবীন দত্ত যেতে যেতে ভাবছিলেন—ফোন তো করব, কিন্তু ভদ্রলোক আমার কথা কি শুনবেন। এদেশে সম্বন্ধ করে বিয়ের ব্যাপার আগেকার চেয়েও জটিল হয়ে গেছে। আগে কুরূপা মেয়েকে টাকা দিয়ে পার করা যেত। আজকাল কুরূপা মেয়েদের বিয়েই হয় না। হয়, যদি তারা নিজেরাই ফাঁদ পেতে কাউকে ধরতে পারে। আমেরিকায় নাকি ছেলেমেয়েবা date করে সম্মিলিত হয, সম্মিলন-অভিসারে যাওয়ার আগে মায়েরা তাদের পিল খাইয়ে দেন যাতে তারা গর্ভবতী না হয়ে পড়ে। ও দেশের কুৎসিত সমাজ চিত্র ওদেশের এক নাট্যকার টেনেসি উইলিয়ামস লিখেছেন তাঁর 'এ ক্যাট অন এ হট টিন রুফ' নাটকটাতে। সেই সমাজের নকল করছি আমরা। ভদ্র মেয়েরা সিনেমায় ঢোকবার জন্য উৎসুক, চাকরি করবার জন্যে 'কিউ' দিচ্ছে নানা অফিসের দরজায়, দেহও বিক্রি করছে অনেকে, আর তাদের দেহকে লক্ষ্য করে সাহিত্য সৃষ্টি করছে মনে মনে লম্পট সাহিত্যিকের দল। অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিলেন নবীন দত্ত। হঠাৎ ফুটপাথের উপর হোঁচট খেলেন, তাঁর অমজবুত স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গেল। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন এক ছোকরার ঘাড়ে। সে সহানুভূতি দেখাল না। বলল—রাস্তা দেখে চলতে পারেন না মশাই। নবীন দত্ত মাপ চাইলেন তার কাছে। স্যাণ্ডাল দুটো খুলে হাতে নিলেন। হাতে নিয়েই পথ চলতে লাগলেন। চিৎপুরের সেই চেনা মুচিটার কাছে যাবেন, বরাবর তার কাছেই জুতো সারান। খালি পায়েই হাঁটতে লাগলেন। মুচিটি যেখানে বসে তার পাশেই একটি ডাক্তারবাবুর চেম্বার। তাঁর সঙ্গে তেমন আলাপ নেই নবীন দত্তের। আলাপ আছে তাঁর কম্পাউন্ডারটির সঙ্গে। কম্পাউন্ডারের ভাই তাঁর ছাত্র। ছেলেটি পড়াশোনায় তেমন ভালো নয়, কিন্তু রাজনীতিতে পরিপক্ক। উগ্র কমিউনিস্ট। সম্ভবত গরীব বলে। কিন্তু ছেলেটির মধ্যে একটি আন্তরিকতা লক্ষ্য করেছেন নবীন দত্ত, তাই তাকে ভালোবাসেন। প্রায়ই পড়া বলে দেন তাকে, বিনা পয়সায়। কম্পাউন্ডারবাবু তাই খাতির করেন তাঁকে।

'আসুন, আসুন মাস্টার মশাই।'

মুচিকে জুতো জোড়া দিয়ে ডিসপেন্সারিতে উঠে বসলেন নবীন দত্ত। মুচি জুতোটা উলটে পালটে দেখলে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর বললে—

'এ জুতো ফেলে দিন বাবু। এ আর চলবে না।'

'সে আমিও বুঝেছি। কিন্তু এখন জুতো কেনবার পয়সা নেই। আগে ন সিকে আড়াই টাকা খরচ করলে চীনেবাজারে ভালো জুতো পাওয়া যেত। এখন কুড়ি বাইশ টাকার কমে কোনও জুতো পাওয়া যায় না। এটাই একটু মেরামত করে দাও বাবা তুমি '

'একে রিসোল করতে হবে, স্ট্র্যাপগুলোও নতুন দিতে হবে। মেরামতি খরচ পড়বে তিন টাকা—'

কম্পাউন্ডারবাবু বললেন—'খরচ যা-ই পড়ুক। ওটা করে দাও তাড়াতাড়ি।'

নবীন দত্ত টাকার থলিটা বার করে দেখলেন তাঁর কাছে কত আছে। তিন টাকা আছে কি না। খুচরোই বেশী ছিল। গুনে গুনে দেখলেন তিন টাকা আশি নয়া আছে। নিশ্চিন্ত হলেন। আশি নয়ায় ধীরেশের বাড়ি গিয়ে পৌঁছতে পারবেন। তারপব ধীরেশেব কাছ থেকে কিছু ধার করে বাড়ি ফিববেন।

ধীবেশ বিশ্বাস রোগা ছিপছিপে লোক। বয়স প্রায় আশির কাছাকাছি। গোঁফ দাড়ি কামানো লম্বা গোছের মুখ। নাকটি খুব টিকালো। মাথায় চুল বেশী নেই, যা আছে তা শাদা। সোজা-ভাবে আঁচড়ানো। কখনও তেড়ি কাটেন নি। দাঁত পড়ে নি এখনও। চোখের দৃষ্টিও ভালো আছে। পড়বাব সময় কেবল তিনি চশমা ব্যবহার করেন। ব্রিটিশ আমলে উঁচু সরকারি কাজ করতেন। এখনও তাঁকে পবিচিত পুরাতন গভর্নমেন্ট কর্মচারীরা খাতির করে। তাই তিনি নবীন দত্তের পেনসন আর প্রভিডেন্টফন্ডের ব্যাপারে সাহায্য করতে পেরেছেন। আর একটা ব্যাপার, ধীবেশ বিশ্বাস নাস্তিক প্রকৃতির লোক। ঈশ্বরের প্রতিই শুধু নয়, সব মানুষের প্রতিও তাঁর যেন একটা অবিশ্বাসের ভাব। একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ হয় নবীন দত্ত। তিনি তাব নামই দিয়েছেন একসেপশন (exception) দত্ত। তিনি কাউকে বিশ্বাস করেন না। বলেন, সবাই চোর, স্বার্থপর, মতলববাজ, তিনি কাউকে শ্রদ্ধা করেন না, বলেন শ্রদ্ধেয় কেউ নেই, সব ধড়িবাজ ভণ্ড। কিন্তু নবীন দত্তকে তিনি বিশ্বাস করেন, শ্রদ্ধাও করেন। এতদিন তাঁকে দেখছেন কোনদিন তার মধ্যে মেকি কিছু দেখতে পান নি। আন্তরিকতার অভাব দেখতে পান নি। এই লোকটির সত্যনিষ্ঠা মুগ্ধ করেছে তাঁকে। কখনও কথার খেলাপ করেন নি, সত্যকথা স্পষ্টভাষায় বলতে ভয় পাননি। মাঝে মাঝে বলেন—'একসেপ্‌শন দত্ত, তুমি বাঙালীর পোশাকে সায়েব একজন। সাহেবদের মধ্যেও খারাপ অনেক আছে, কিন্তু ভালো যারা আছে তারা পয়লা নম্বরের। তুমি সেই পয়লা নম্বরের লোক। কি করে এদেশে জন্মালে হে।'

নবীন দত্ত উত্তর দিয়েছিলেন, 'পয়লা নম্বরের সাহেবের উপমা দিলেন, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ওটা অপমান। আমাদের দেশেও অনেক পয়লা নম্বরের লোক ছিলেন, এখনও আছেন, যারা প্রণম্য। তাঁদের পায়ের নখেরও যুগ্যি নই আমি। আমার স্বপক্ষে এইটুকু শুধু

বলতে পারি আমি ভালো থাকবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সব সময়ে পারি নি। আর একটা অনুরোধ, আমার প্রশংসা কখনও আমার সামনে করবেন না। বড্ড অস্বস্তি লাগে।'

ধীরেশ বিশ্বাস বললেন, 'বেশ তোমার প্রশংসা করব না। কিন্তু তুমি যে বললে এখনও দেশে প্রণম্য লোক আছেন—একটা নাম কর দিকি—'

নবীন দত্ত একজনের নাম করলেন।

'ও এই তোমার প্রণম্য লোক? ও লোকটা 'রেড এরিয়া'য় রেগুলার যাতায়াত করে জান এ খবর? আমি পুলিসের লোক, অনেক প্রণম্য ব্যক্তির হাঁড়ির খবর রাখি।'

নবীন দত্ত একটা আশ্চর্য উত্তর দিয়েছিলেন তাকে।

বলেছিলেন—' তা সত্ত্বেও উনি প্রণম্য। যার বাড়িতে ভালো রান্না হয় না, অথচ যিনি খাদ্যরসিক, তিনি যদি হোটেলে নিজের পয়সা খরচ করে খান, তাতে আমি অন্যায় কিছু দেখি না। যে লোকটির নাম করলাম তিনি একজন দিকপাল বিদ্বান তো বটেই, মানুষ হিসেবেও খুব বড়। অনেক গরীব ছাত্রকে পড়ান, অনেক দুঃস্থ আত্মীয়কে অর্থ সাহায্য করেন, পারতপক্ষে বিদেশী জিনিস কেনেন না, কারো খোশামোদ করেন না, তার প্রকাণ্ড বাড়ির একতলাটা বিনা পয়সায় ছেড়ে দিয়েছেন নাইট স্কুল করবার জন্যে। তাঁর স্ত্রী বিয়ে হবার এক বছর পরেই মারা যান। ছেলেপিলে নেই। তবু বিয়ে করেন নি। আব একটা প্রধান গুণ যা আজকাল প্রায় বিরল হয়ে এসেছে আত্মপ্রচার উনি করেন না কখনও। সেজন্য অনেক লোক তাঁর নামও জানে না।'

ধীরেশবাবু হেসে জবাব দিয়েছিলেন—'সবই মানলুম। কিন্তু ওই 'রেড এরিযা'ব কথাটা কিছুতে ভুলতে পারি না। এক কলসী দুধে চোনা পড়ে গেছে খানিকটা। আমাব কাছে মনুষ্যত্বের প্রধান লক্ষ্য চরিত্রবল। আমি পঞ্চান্ন বছব বয়সে বিয়ে করেছিলাম। তার কারণ আমার ভাইদের মানুষ করতে হয়েছিল, বোনদের বিয়ে দিতে হয়েছিল। তাই যৌবনে বিয়ে করবার অবসর পাই নি, কিন্তু তা বলে বিপথে যাই নি একদিনও। যাওয়ার সুযোগ ছিল, পুলিসে চাকরি করতাম। আমাদের ওপরওলা টেগার্ট সাহেবও যেতেন একটি মেয়ের কাছে। সেজন্য ঘৃণা করতাম তাকে। বিয়ের পরও বউ আমার বাঁচল না। ওই একটি মেয়ে প্রসব করে মারা গেল। ওই মেয়েটিকেই আগলাচ্ছি এখন। আর বিয়েও করি নি রেড এরিয়াতেও যাই নি—'

এসব আলোচনা অনেক দিন আগে হয়েছিল।

নবীন দত্ত প্রথমে ছিলেন শিশুর মাস্টার মশাই, পরে হয়েছিলেন কাকাবাবু। শিশু এখন শিশু নেই, এম এ পাস করেছে, ডক্টরেট পেয়েছে বয়স প্রায় তিরিশের কাছাকাছি। এখন ধীরেশ বিশ্বাসের মহাচিন্তা শিশুর বিয়ে নিয়ে। আসলে তিনি চান না যে শিশু বিয়ে করে অন্য কোথাও চলে যাক। এ-ও চান না কোন ছোকরা তাঁর বাড়িতে এসে ঘর-জামাই হয়ে থাকে। শিশু অন্য কোথাও চাকরি করুক, সকাল দশটা হতে না হতেই নাকে মুখে যাহোক চারটি গুঁজে সন্ধ্যা পর্যন্ত আপিস করুক—এটাও তাঁর মনঃপূত নয়। তিনি চান শিশু সারা দিনরাত তাঁর কাছেই ঘুরঘুর করুক, তাঁকে বকুক, তাঁর নানা অপটুতার বন্যায় পটুতার বাঁধ হয়ে

হামে-হাল দাঁড়িয়ে থাকুক। কিন্তু ধীবেশ বিশ্বাস এসব কথা কাউকে বলতে সাহস কবেন না। তাঁব সব চেয়ে ভয় নবীন দত্তকে। নবীন দত্ত অনেক দিন থেকেই বলছেন—শিশুব এবাব বিয়ে দেওয়া দবকাব। ধীবেশ বিশ্বাসও বলেছেন, হ্যাঁ, দেখ না একটা ভালো ছেলে। ভালো ছেলেব অনেক সন্ধান এনেছেন নবীন। কিন্তু ধীবেশ একটা না একটা খুঁত বাব কবে নাকচ কবে দিয়েছেন তাদেব। কেউ বেঁটে, কেউ বেশী লম্বা, কেউ খুব গবীব, কেউ বেশী বডলোক, কাবও মায়েব হাঁপানি কাবো ঠাকুর্দা যক্ষ্মায় মাবা গিয়েছিলেন, কেউ বেশী নব, কাবো ইচ্ছে জার্মানি, ইংলণ্ড বা আমেবিকায় গিয়ে বসবাস কববে—এই ধবনেব নানা অজুহাতে ধীবেশ একেব পব এক অনেক ভালো পাত্রকে অমনোনীত কবেছেন। তাঁব পক্ষে খুঁত বাব কবা সহজ, কাবণ গভর্নমেন্টেব পুলিস বিভাগেব (বিশেষ কবে আই. বিব) অনেকেব সঙ্গে তাঁব আলাপ। পাত্রেব খবব পেলেই তাদেব লাগিয়ে দেন। তাবা একট না একটা খুঁতেব খবব এনে হাজিব কবেন। নবীন দত্তও কিন্তু না-ছোড। তিনি একেব পব এক পাত্রেব খবব এনে যাচ্ছেন। সৎপাত্রেব খবব পেলেই তিনি তাব সঙ্গে গিয়ে দেখা কবেন। কথাবার্তা কয়ে তাব যদি ভালো লাগে তাহলে তিনি প্রথমে শিশুকে জিগ্যেস কবেন- এই পাত্র তোব পছন্দ হবে? শিশুব ববাবব এক উত্তব আপনাবা যা ঠিক কববেন তাই হবে, কেবল আমাব একটি শর্ত বিয়েব পবও আমি লেখাপডা কবব। নবীন দত্তবও তাই মত। তখন তিনি পাত্রেব খবব ধীবেশকে বলেন। ধীবেশ মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন—দাডাও আগে খবব টবব নি। তাবপব বলব। এব পব তিনি খববটি তাঁব ঘনিষ্ঠ পুলিস বন্ধুদেব কাছে চালান কবে দিয়ে বলেন খুঁত বাব কব।

এবাব নবীন দত্ত যে পাত্রটিব খবব এনেছিলেন সেটি প্রায় নিখুঁত। ধীবেশবাবুব চবেবা সবাই এসে বলেছিলেন না ভালো পাত্র। বংশ ভালো ওদেব পবিবাবেব কাবও বিরুদ্ধে খাবাপ কোন খবব নেই। সবাই একবাক্যে প্রশংসা কবল ওদেব। পাত্রটি ভালো। তবে বং ফবসা নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মাথাব সামনেব দিকে একটু টাকও আছে। তাঁদেব মতে পাত্রটি সুপাত্র, টাক বা বঙে কিছু আসে যায় না। খববটি সংগ্রহ কবে গুম হয়ে বসে আছেন ধীবেশ বিশ্বাস। নবীন দত্ত খবব পাঠিয়েছে আজই সে এসে ফোন কববে পাত্রপক্ষকে। সশঙ্কিত হয়ে বসেছিলেন ধীবেশ বিশ্বাস। একটু পবেই ধীবেশবাবু বিস্মিত হলেন। যা কোনও দিন হয় না, তাই আজ ঘটল। নবীন দত্ত এলেন বিকশা কবে। মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বিক্‌শা থেকে নেমেই বললেন—'বিকশ'ব ভাডাটা মিটিয়ে দিন। আমাব কাছে পয়সা নেই।'

'মাথায় কি হয়েছে—'

'ক্রিকেটেব বল লেগেছে। ছেলেবা বাস্তা ব্লক কবে ক্রিকেট খেলছে দুপুব বেলা। আমাব মাথায় লেগে গেল হঠাৎ। একটা ছেলে বলল— দেখছেন না খেলা হচ্ছে, এদিক দিয়ে আসছেন কেন মশাই। এমনভাবে বললে যেন বাস্তাটা তাব বাবাব। কিছু বললাম না, পাব হয়ে গেলাম সেখানটা। তাবপব একজন ভদ্রলোক বললেন, আপনাব মাথা দিয়ে বক্ত পড়ছে যে। তখন দেখলাম, আমাব জামাতেও বক্ত পডেছে।' 'একটু গিয়েই মিত্তিবদেব ডিসপেনসাবি আছে সেখানে গিয়ে ওষুধ লাগিয়ে নিন'—এই উপদেশটি দিয়ে ভদ্রলোক চলে

গেলেন। মিত্তিরদের ডিপেনসারির যিনি কম্পাউণ্ডার ছিলেন তিনি তোতলা। তো তো করে বললেন যে ওষুধ ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদির দাম দেড় টাকা পড়বে। দেড় টাকা ছিল না, তাই ট্রামে করে মেডিকেল কলেজে গেলাম। সেখান থেকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়ে আসছি। ফেরবার সময় কিছুদূর ট্রামে এলাম। তারপর ট্রাম ফুরিয়ে গেল। নেমে ভাবলাম 'বাস' ধরি। কিন্তু কিছুদূর হেঁটেই মাথা ঘুরে উঠল। তাই রিক্‌শা করেই চলে এলাম। ফোনে আজ কথাটা শেষ করে ফেলতে চাই। তাঁদের চিঠিও লিখেছি যে আজ তাঁদের ফোন করব। তাঁরা হয়তো আমার ফোনের অপেক্ষা করবেন। তুমি পাত্রটির সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছ?'

'নিয়েছি। রিপোর্ট তো ভালই। কিন্তু শুনছি রং কালো আর মাথায় টাক।

'শিশুকে বলেছ?'

'না।'

'বল। সেই ঠিক করুক এ পাত্র সে পছন্দ করবে কি না। কন্যা বরয়তে রূপং—'

ধীরেশের ডাকে শিশু নেমে এল নীচে।

আসতেই নবীন দত্ত বললেন—'ওগো শিশুসমা, আমরা একটি ভালো পাত্র পেয়েছি। শোনা যাচ্ছে তার রং কালো আর টাক আছে। তোমার যদি আপত্তি থাকে—'

শিশুকে শিশুসমা নবীন দত্তই করেছেন। বলেছিলেন, ওর নামটার মধ্যে কায়দা করে সুষমা ঢুকিয়ে দিলাম।

শিশু এসে বললে—'কাকাবাবু, ওঘরে চলুন। সব বলব। শরবৎ খাবেন?'

'খেতে পারি—'

পাশের ঘরে গিয়ে শিশু বললে—'কাকাবাবু, আমার বিয়ের জন্য চেষ্টা করবেন না।'

'কেন—'

বাবার ইচ্ছে নেই। বাবা চান না আমি তাঁকে ছেড়ে কোথাও যাই। অথচ তিনি আপনার কথাও ঠেলতে পারছেন না। নানারকম খুঁত বার করেছেন তাই। আমি বিয়ে নাই করলাম। আমিই তো বাবার একমাত্র অবলম্বন। আমি চলে গেলে সত্যি ওঁর কষ্ট হবে খুব। আমি বিয়ে করব না। আপনি ফোনে ওদের বলে দিন—ছেলের মাথায় টাক আছে বলে ও পাত্র পছন্দ নয় আমাদের।'

'তুই ঠিক থাকতে পারবি?'

'পারব একথা জোর করে বলা যায় কি। চেষ্টা করব। এমন কিছু করব না যাতে আপনাদের মনে কষ্ট হয়।'

'আমাদের মনের কষ্টের কথা ভাবছ কেন তুমি। আমাদের মনে কষ্ট হবে বলে কোন ভালো কাজও তুমি করবে না? তাহলে তো মুশকিল। এই যে দুম হঠাৎ জার্মানি চলে গেল, আমার মনে কষ্ট হয়েছে, তার মায়ের মনেও হয়েছে। তাহলে কি দুমের মায়ের আঁচল ধরে বসে থাকা উচিত ছিল? ছিল না। সে ঠিক কাজই করেছে। আমাদের কথা তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি নিজে যা ভালো বোঝ তাই কর। তুমি লেখাপড়া শিখেছ। তোমার যদি মনে হয় বাবার জন্যে এখন তুমি বিয়ে করবে না, বেশ তো, করো না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি দেখি

তুমি গালে চুন-কালি মেখে ঘুবে বেডাচ্ছ তাহলে তোমাব সঙ্গে সংস্রব বাখা শক্ত হবে আমাব পক্ষে । তুমি যদি চুনকালি মাখাটা ভালো মনে কবো মেখো, আমাদেব মনোকষ্ট হবে কি না এ নিযে মাথা ঘামিও না, তুমি লেখাপডা শিখেছ, প্রাপ্তবযস্ক হযেছ, তোমাব স্বাধীনতায হস্তক্ষেপ কববাব প্রবৃত্তি আমাব নেই, তবে আমাদেব স্বাধীনতাতেও হস্তক্ষেপ কবতে পাবে না তুমি।'

শিশু হাসিমুখে চেযেছিল নবীন দত্তেব দিকে।

'কি স্বাধীনতা।'

'তোমাব সংস্রব ত্যাগ কববাব স্বাধীনতা—'

'ইস তা কি পাববেন? পাবলে কববেন।'

শিশু ঠোঁট ফুলিযে চলে যাচ্ছিল, নবীন দত্ত ডাকলেন আবাব।

'শোন— শোন—'

'কি?'

'আমাকে এত দুর্বল বলে মনে কবিস তুই, বেশ, এখনি আমি চললাম আব আসব না এ বাডিতে।'

নবীন দত্ত বেবিযে যেতে উদ্যত হতেই শিশু বলে উঠল ' কি যে অবুঝেব মতো আপনি কবেন কাকাবাবু। আপনি শববৎ খেতে চেযেছিলেন আগে সেইটে খান। তাব পব বলুন, আপনাব মাথায ব্যাণ্ডেজ কেন—'

'একটা বল লেগেছিল বাস্তায। ছেলেবা খেলছিল।'

' কি পাজী সব ছেলেবা হযেছে আজকাল । বাস্তায বল খেলবে?'

'পাজী ছেলেবা নয, পাজী আমবা। গণ্ড গণ্ডা ছেলেব জন্ম দিযেছি, অথচ তাদেব ঘবে থাকবাব জাযগা নেই, খেলবাব মাঠ নেই, বাস্তায বাস্তায দলে দলে কুকুব বেডালেব মতো ঘুবছে আব হুডোহুডি কবছে। কী কববে, কোথায যাবে ওবা—'

'খুব লাগে নি তো—'

'অজ্ঞান হই নি যখন, তখন গুরুতব কিছু নয।'

'আপনি ভিতবে চলুন। শববৎ খেযে তবে যাবেন।'

'আব ও ভদ্দবলোকদেব ফোনও কবতে হবে। টাকাব কথা বলব না, সবল সত্য কথাই বলব। বলব আমি আগে জানতাম না যে মেযেব বাপেব ইচ্ছেই নেই মেযেব বিযে দেবাব। সেইজন্যে চেষ্টা কবছিলাম, আমাকে মাপ কববেন।'

শিশু বললেন—'ফোনটা আপনি কববেন কেন? আমিই কবি—'

'তুমি? কেন?'

'আপনি তো ঘুব-পথে যেতে পাববেন না। আমি বলব ছেলেব কুষ্ঠি পাঠান, মেযেব কুষ্ঠিব সঙ্গে মিলিযে দেখতে হবে—'

শিশু মুচকি হেসে চেযে বইল নবীন দত্তেব দিকে। হাসলে তাব গালে টোল পডে।

'স্টুপিড্ কোথাকাব'

শিশু এক ছুটে ভিতরে চলে গেল।

তার পিছনে নবীন দত্তও গেলেন। কিন্তু শিশুর নাগাল পেলেন না। শিশু রোগা ছিপছিপে, তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। নবীন দত্তকে ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভাঙতে হল। তেতলায় উঠে দেখেন ধীরেশ বিশ্বাস একা গুম হয়ে বসে আছেন। শিশু নেই। বিশ্বাস মশাই নবীন দত্তকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু কিছু বলবার আগেই নবীন দত্ত বললেন- 'আপনি মেয়ের বিয়ে দিতে চান না এ কথাটা আমাকে আগে খুলে বললেই পারতেন। আমার এত হয়রানি হত না।' সামনে যে মোড়াটা ছিল সেইটিতেই বসে পড়লেন নবীন দত্ত। ধীরেশ তবুও গুম।

নবীন দত্ত বললেন—'আপনি যে এতটা স্বার্থপর তা ধারণা ছিল না। নিজের সুখের জন্যে মেয়েকে নিজের কাছে রেখে দেবেন চিরকাল—এ তো ভাবাই যায় না-'

ধীরেশ বিশ্বাস বললেন—'আজকাল ছেলেদের যে রকম মতিগতি দেখছি, একজন পুলিশ অফিসার হিসাবে আমার যা অভিজ্ঞতা, তাতে আমি বুঝেছি মেয়েকে কারো সঙ্গে বিয়ে দেওয়া মানেই তার হাত পা বেঁধে একটা অনিশ্চিত গহ্বরের মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া সে গহ্বরে সাপ বিছে বাঘ ভালুক দৈত্য দানব পাঁক আগুন সব কিছু থাকাই সম্ভব। তাছাড়া দিলেই ছেলে হবে, এক একটা ছেলে হওয়ার কি ভয়ঙ্কর 'রিসক' তা জানেন?'

নবীন দত্ত ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়েছিলেন ধীরেশবাবুর দিকে। তিনি যেন ধীরেশ বিশ্বাসকে নূতন করে আবিষ্কার করছিলেন। তাঁর প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না তিনি, চুপ করেই রইলেন।

ধীরেশবাবু কাতর ভাবে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন—'তাছাড়া এই বুড়ো বয়সে, আমি কার কাছে থাকি বলুন।'

'বেশ মেয়ের কাছেই থাকুন। আমার ধারণা ছিল অন্য রকম। আমি জানি মেয়ে হলে তাকে সৎপাত্রে অর্পণ করাই কর্তব্য। আমারও দুটি মেয়ে আছে, তাদেরও আমি কম ভালোবাসতুম না, কিন্তু তাদের নিজের সেবার জন্যে কাছে রাখি নি, বিয়ে দিয়েছি, তার জন্যে বাড়ি বাঁধা দিতে হয়েছে আমাকে, তবু দিয়েছি। কিন্তু আপনার মত দেখছি অন্য রকম। এখন সমাজ বলে কিছু নেই, টাকাই সমাজ, টাকাই ভগবান, যে যা খুশী করছে। আপনিও করুন। আপনার ফোনটা কোথা। সেই ভদ্রলোকদের ফোন করে দি তারপর চলে যাই।'

শিশু এক গ্লাস শরবৎ নিয়ে ঢুকল।

'আপনার এখন যাওয়া হবে না কাকাবাবু। আমি ডাক্তার সেনকে ফোন করেছি। তিনি এসে আগে আপনার মাথার চোটটা দেখুন। এইখানেই খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি আপনার।'

'আমি খেয়ে এসেছি—'

'তাহলে শরবৎটা খেয়ে ওঘরে বিশ্রাম করবেন চলুন। ডাক্তার সেন আপনাকে দেখে যান, তারপর আমি আপনাকে ট্যাক্সি করে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

'আমার কিচ্ছু হয় নি।'

'ডাক্তার সেন এসে দেখে যান না। যদি কোনও ওষুধ বা ইনজেকশন দেন—'

'কি বিপদ, আমার কিচ্ছু হয় নি, কেন জ্বালাচ্ছিস আমাকে—'

শিশু মুচকি হেসে তাঁব দিকে চেয়ে বইল।

গালে টোল পড়ল।

'শববৎটা খেয়ে ফেলুন।'

শিশু আসাব সঙ্গে সঙ্গে ধীবেশ বিশ্বাস পাশেব ঘবে চলে গিয়েছিলেন। নবীন দণ্ড খেয়ে জামাব হাতায মুখটা মুছে ফেললেন।

'চল এবাব ফোনটা কবে ফেলি। সে ভদ্রলোকবা আমাব ফোনেব জন্য অপেক্ষা কবছেন।'

'চলুন। কিন্তু বাবাব দোষ দেবেন না। ববং বলুন মেয়েটি বিয়ে কবতে চাইছে না।'

ঘন্টা তিনেক পবে নবীন দত্তেব সঙ্গে শিশু নেবে এল দোতলা থেকে।

'তুমি নাবলে কেন—'

'আমি আপনাকে ট্যাক্সি কবে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'কি দবকাব! আমি ট্রামে বাসে চড়তেই অভ্যস্ত, বেশ চলে যাব।'

'না, আমি আপনাকে একলা যেতে দেব না। এই ট্যাক্সি—'

ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল একটা।

'উঠুন– '

ট্যাক্সিব কপাটটা খুলে দাঁড়িয়ে বইল। উঠতে হল নবীন দত্তকে। তাবপব শিশুও উঠল।

ট্যাক্সিতে উঠে শিশুব দিকে চেয়ে ভ্রূকুঞ্চিত কবে নবীন দত্ত বললেন—'আমাব উপব এমন জববদস্তি কবিস কেন বল তো - '

শিশু অন্যদিকে মুখ ফিবিয়ে চেয়ে বইল, কোন উত্তব দিল না।

'কি বে কথাব কোনও জবাব দিচ্ছিস না।'

শিশু তবু মুখ ফিবিয়ে বইল।

নবীন দত্ত জোব কবে তাব মুখটা নিজেব দিকে ফিবিয়ে নিলেন। শিশু মুচকি হাসল। তাব গালে টোল পড়ল, কিন্তু নবীন দত্ত দেখলেন তাব দুই চোখে জল টলমল কবছে।

' এ কি কাণ্ড।'

শিশু কোনও জবাব দিলে না। ট্যাক্সি ছুটতে লাগল। সমস্ত পথটা শিশু কোন কথাই বলল না। নবীন দত্তও চুপ কবে বইলেন। নবীন দত্তকে বাড়িতে নামিয়ে কিন্তু শিশু কথা কইল।

'আমি এই ট্যাক্সিতেই ফিবে যাচ্ছি।'

নবীন দত্তকে প্রণাম কবে সে ট্যাক্সিতে উঠে বসল । নবীন দত্ত চুপ কবে দাঁড়িয়ে বইলেন, একটা কথাই বাববাব তাঁব মনে জাগতে লাগল—ওর চোখে জল কেন।

।। দুই ।।

রাখাল এসেছিল।

সঙ্গে ছিল এক তাড়া প্রুফ আব বগলে একটা হিসাবেব খাতা আব ফ্ল্যাট ফাইল একটা

'ওগুলো কি ফাইনাল প্রুফ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ফোর্থ প্রুফ।

নবীন দত্ত প্রথম পাতাতেই তিনটে বানান ভুল বার করলেন।

'এ তো ভুলে ভরতি দেখছি। কে প্রুফ দেখেছে?'

'প্রেসের লোকেরা—'

'প্রেসের প্রুফ রীডাররা সাধারণত মূর্খ হয়। ভাষা-জ্ঞান না থাকলে ভালো প্রুফ দেখা যায় না। তোমরা দেখে দাওনি কেন?'

'বিকাশ তো পেটের অসুখে ভুগছে। আর আমাকে নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই—'

'ওই লোকটিকে চেন?'

বিদ্যাসাগরের ছবিটি দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'বিদ্যাসাগর। ও ছবি কে না চেনে।'

'উনি তোমাব চেয়ে বেশী কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তবু নিজেব বইয়েব প্রুফ নিজে দেখতেন।'

রাখাল নীরব হয়ে বইল।

নবীন দত্ত বললেন—'স্কুল কলেজ পাঠ্য বই নির্ভূল ছাপা হবে। তা না হলে ছেলেরা ভুল শিখবে। তুমি নিজে আর একবার প্রুফটা দেখো। তাবপব আমি আবাব দেখব।'

প্রুফটা ফেলে দিলেন নবীন দত্ত।

'দেখি হিসেবের খাতাটা দেখি—'

হিসেবের খাতা দেখে বললেন। 'এই যে কাগজ কিনেছ, কি ধবনেব কাগজ তা তো লেখ নি। খালি লিখেছ কাগজ এত টাকা। নগদ দাম দিয়ে কিনেছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'দেখাও সেটা।'

রাখাল ফাইলটা খুলে দেখাল।

'এতেও তো লেখা আছে শুধু 'পেপার'। কি পেপার তা তো লেখে নি'— রাখাল চুপ করে রইল।

'কোন্ দোকান থেকে কিনেছিলে? এ ক্যাশমেমোতে তো দোকানের নাম ছাপা নেই দেখছি—'

'ওটা ব্ল্যাক থেকে কিনেছি—'

'কেন? খোলা থেকেই কিনতে হবে। আমরা চোরদের শরিক হব কেন?'

চুপ করে রইল রাখাল।

গলার সুর চড়িয়ে নবীন দত্ত আবার প্রশ্ন করলেন—' আমরা কি চোর?'

'না, চোর নই। কিন্তু খোলা বাজারে কাগজ নেই, দেরিতে বই বেরুলে বই কেউ কিনবে না।'

'না কিনুক। আমরা লাভ খুব বেশী রাখব না। পনেরো পারসেন্ট লাভ হলেই খুশী হব আমরা। চোর প্রকাশকদের দলে ভিড়তে চাই না আমি। বুঝলে?'

'বুঝেছি স্যার। চোরের দলে আমাদেরও ভিড়বার ইচ্ছে নেই। কিন্তু কি করি তাহলে যে ব্যবসা চালানো যায় না।'

'নিশ্চয় যায়। বিদ্যাসাগর চালিয়েছিলেন কি করে? বিদ্যাসাগরের জীবনীটা আর একবার পড়-- '

নবীন দত্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হিসাব দেখতে লাগলেন। রাখাল বসে উসখুস করতে লাগল। তার সিগাবেট খাওয়া অভ্যাস। কিন্তু এখানে খাওয়া সম্ভব নয়।

'আপনি দেখুন, আমি একটু ঘুরে আসছি স্যার।'

'কোথায় আবার ঘুরতে যাবে এখন!'

'একটু চা খেয়ে আসি গলির দোকানটা থেকে।'

'সকালে খাও নি?'

'খেয়েছি—'

'তবে আবাব কেন?'

'সকালে চা ছাড়া তো আর কিছু খাই না। তাই খিদে পেয়ে যায়।'

'ছোলা-ভিজে খাও না কেন? গুড় আর ছোলা ভিজে?'

'দুটোই আজকাল অগ্নিমূল্য।'

আবার ধমকে উঠলেন নবীন দত্ত।

'অগ্নিমূল্য হলেও খেতে হবে। না খেলে বাঁচবে কী করে? এই যে টেরিলিনেব শার্টটা পবে এসেছ এটাব দাম কত?'

'এটাও বেশ দামী। কিন্তু একবার কিনলে অনেক দিন চলে। আব ধোপাব খবচ লাগে না, একবার সাবান দিয়ে—'

'শুধু গায়ে থাকলেই বা ক্ষতি কি। না-খেয়ে দামী জামা গ'য়ে দেওয়ার কোন মানে হয় না।'

বিপদে পড়ে গেল রাখাল।

হঠাৎ উঠে পড়লেন নবীন দত্ত।

'আমার ভাঁড়ারে তো কিছু নেই। দেখি আমার গিন্নীর ভাঁড়ারে কিছু আছে কি না। থাকবার কথা নয়। আজকাল বড্ড গরীব হয়ে পড়েছি আমরা।'

উঠে নেমে গেলেন নিচে। রাখাল ছাতে দাঁড়িয়ে সিগারেটের বাক্স থেকে আধখানা সিগারেট বার করে চট করে ধরিয়ে ফেলল সেটা। সে আজকাল পুরো সিগারেট খায় না, আধখানা খায়। সিগারেটও অগ্নিমূল্য। যখন ঠোঁট পুড়তে থাকে তখন ফেলে দেয় সেটাকে। ফেলত না, অনেকগুলো টুকরো থেকে সিগারেট বানাতে পারত যদি ভালো সিগারেট পেপার পাওয়া যেত। কিন্তু ভালো সিগারেট পেপার আজকাল পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় তা অগ্নিমূল্য। সবই অগ্নিমূল্য। দেশ যদি সীতার সঙ্গে উপমা দেওয়া যায় তাহলে বলতে হয় রাবণের পরাধীনতা থেকে উদ্ধার করে তাঁর অগ্নিপরীক্ষা করা হচ্ছে। এইবার বোধ হয় তিনি পাতাল প্রবেশ করবেন। এই সব কথা মাঝে মাঝে মনে হয় রাখালের। রাখাল একটু কবি-প্রকৃতির। সাহিত্যের ভালো ছাত্র সে। হঠাৎ তার ভয় হল— স্যার এসে যদি সিগারেটের

গন্ধ পান! একটু পরেই নবীন দত্ত এলেন। কিন্তু সিগারেটের গন্ধের কথা উল্লেখ করলেন না। বললেন—'গিন্নী, তোমার জন্যে হালুয়া তৈরি করছেন। খেয়ে যেও। ভালো হবে না। কারণ, ভালো সুজি, চিনি, ঘি সবই দুর্লভ। তবু যা হচ্ছে খেয়ে যাও। আর একটা কথা শুনে রাখ। আগে ভালো খাবার, তারপর যদি পয়সা বাড়তি থাকে, তাহলে পোশাক। জমকালো শৌখীন পোশাক না হলেও চলে। তালতলার চটি আর শাদা উড়ুনি পরে বিদ্যাসাগর একদিন বাংলাদেশকে জাগিয়েছিলেন। নেকেড ফকির মহাত্মা গান্ধী জগৎ মাতিয়েছিলেন এসব আদর্শ তোমরা ভুলে যেও না। প্রুফগুলো আর একবার দেখব। হিসেবের খাতাও তোমাদের ঠিক নেই। যাদের টাকা দিয়েছ তাদের নাম থাকলেই শুধু চলবে না। ঠিকানাও চাই। কুলি ও ঠেলা-ওয়ালা সবার নামও লিখে রাখবে। সম্ভব হলে ঠিকানাও। তোমার এ হিসাবের খাতা বিশ্বাসযোগ্য খাতা হয় নি। যা হয়েছে তা তো আর সংশোধন করবার উপায় নেই। এবার থেকে যা যা বললাম তুমি তাই কোরো। আর ব্ল্যাক থেকে কিছু কিনো না, তাতে আমাদের ব্যবসা থাক বা যাক কিছু এসে যায় না। ভালো বই সত্যি যদি বার করতে পার ব্যবসা চলবে। ভালো ইংরেজি বই অনেক টাকা দাম দিয়েও আমরা কিনি। খেলো বই শস্তা হলেও কিনি না। ভালো ইংরেজী প্রকাশকরা বাজে বই বার করেন না। ফিচলেমি ছুঁচোমিও করেন না, তাই তাঁদের ব্যবসা বিশ্বব্যাপী।—'

আরও কিছু উপদেশ হয়তো দিতেন, কিন্তু হল না। পারুলবালা একটা ডিসে হালুয়া নিয়ে উপস্থিত হলেন। 'খাও বাবা, ভালো হালুয়া আজকাল আর করাই যায় না। জিনিসপত্র পাওয়া যায় না। খাও—'

রাখাল খেয়ে দেখল অপরূপ হয়েছে হালুয়া। মনে পড়ল তারা যখন পাটনায় থাকত তখন মা এই রকম হালুয়া করতেন। পাটনা থেকে অনেক দিন চলে এসেছে তারা, মা-ও মারা গেছেন অনেকদিন। এই হালুয়া তাকে অনেক দূর নিয়ে গেল নিমেষের মধ্যে।

বলল—'বাঃ অপরূপ! অনেক দিন আগে মায়ের হাতে এই রকম হালুয়া খেয়েছি—'

রাখাল তাড়াতাড়ি উঠে এঁটো হাতেই প্রণাম করলে পারুলবালাকে।

পারুলবালা সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে রইলেন এক ধারে। তারপর সসঙ্কোচেই বললেন—'বেঁচে থাকো বাবা। দেশের মুখোজ্জ্বল কর।'

নবীন দত্ত হেসে বললেন—'তা পারবে কি না সন্দেহ আছে। চোরাবাজারীদের সঙ্গে এর মধ্যেই মেলামেশা আরম্ভ করেছে।' তারপর ধমকের সুরে বলে উঠলেন—'ফের যদি দেখি তুমি কালোবাজারে কাগজ কিনেছ তাহলে আমি আর তোমাদের সংস্রবে থাকব না—'

'আর কিনব না স্যার।'

প্রণাম করে কাগজপত্র গুটিয়ে রাখাল চলে গেল। তার মনে হতে লাগল আজ সে এমন একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল যা এককালে মোটেই অসাধারণ ছিল না, কিন্তু যা আজকাল দুর্লভ। হ্যাঁ, সেকেলে বাঙালী বাড়ি আজকাল সত্যিই দুর্লভ। আজকাল খুব কম বাড়িতেই স্নেহময়ী মা দেখা যায়। আজকাল ঘরে ঘরে সমাজসেবিকা, বড় লেখিকা, বড় কংগ্রেসকর্মিণী, দেশবিখ্যাত নেত্রী, বড় অভিনেত্রী, এ সবই আছে— সেকালের স্নেহময়ী মা

নেই। যা আছে ত মুখোশ পরা, তাদের হাব ভাব, নিতান্তই লোকদেখানো। মাতৃহীন রাখাল অনেকদিন পরে পারুলবালাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

পারুলবালা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তাকে জিগ্যেস করলেন —'আজও দমের কোন চিঠি পত্র আসে নি?'

'না। এখনও আসে নি তো। পিওনের আসবার সময় অবশ্য এখনও যায় নি।'

তবুও দাঁড়িয়ে রইলেন পারুলবালা।

নবীন দত্ত বললেন—'তুমি অত ভাবছ কেন?'

'সাধ করে কি আর ভাবছি? ভাবনা হয়, কি করব। সেই গিয়ে একবার পৌঁছে সংবাদ দিয়েছে, আর চিঠি লেখে নি দুমাস হয়ে গেল।'

'আমি তো জানি সব' - একটু ঝাঁঝালো স্বরেই উত্তর দিলেন নবীন দত্ত। ' কিন্তু আমিও তো নিরুপায়। দুশো বার উঠ বোস করলে এখনি যদি তার চিঠি এসে যেত তা হলে প্রাণ তুচ্ছ করেও আমি তাও করতাম কিন্তু তাতে তো কিছু হবে না। বৃথা আমাকে বলছ কেন? ছেলে যখন সাবালক হয়েছে, নিজে রোজগার করতে শিখেছে, নিজের ভালোমন্দ বুঝতে শিখেছে, তাকে আঁচলে বেঁধে রাখবার চেষ্টা কোরো না। করলে নিজেই দুঃখ পাবে, আর কারো কিছু হবে না। ছেলেমেয়ে বড় হলেই নাগালের বাইরে চলে যায়। এটা মেনে নাও।'

'তোমার চিন্তা হচ্ছে না?'

'হচ্ছে বই কি। আমি তো পাষাণ নই। কিন্তু তোমার মতো দিনরাত মুখ গোমড়া করে আমি বেড়াচ্ছি কি?'

পারুলবালা আবার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন বড় বৌমা কাল এক জায়গায় ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল। তোমাকে বলেছিল কি'— ভ্রূকুঞ্চিত করে চুপ করে রইলেন নবীন দত্ত। পারুলবালা বলল, 'বৌমার এক কলেজের মাস্টার নাকি ওকে একটা ভালো চাকরি দিতে পারেন। দরখাস্ত করতে বলেছিলেন। কাল ইন্টারভিউ দিয়ে এসেছে। তোমাকে বলে নি কিছু?'

'না। চাকরি করতে চাইছে কেন। আমি তো ওর জন্যে টিউশনি করছি —'

'ও বলছিল বাবা বুড়ো বয়সে আমাদের জন্যে এত পরিশ্রম করবেন সেটা আমার ভালো লাগছে না। আমি আবার চাকরিই করবো।'

'তাতো করবে। কিন্তু ওর রূপকে লুকুবে কি করে? রূপসী দেখে বউ করেছিলে, সেই রূপই যে এখন অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওর। রাস্তায় বেরুবার উপায় নেই। একদল ছোঁড়া পিছু নেবে। উফ্, দেশটা দেখতে দেখতে কত নেবে গেল। এই দেশে বিদ্যাসাগর বিবেকানন্দ জন্মেছিল, বিশ্বাস হয়?'

পারুলবালা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন— 'এ চাকরিটা যদি হয়, হেঁটে আপিস যেতে হবে না। মোটর এসে নিয়ে যাবে, মোটরে পৌঁছে দিয়ে যাবে।'

'তাই নাকি।'

ভ্রূকুঞ্চিত করে নবীন দত্ত নীরব হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

'কোন আপিসে চাকরি?'

'তা জানি না। তবে ওর প্রফেসারটির নাম জানি। খগেশ্বর হাজরা।'

'ও, খগেশ্বর? সে তো অলঙ্কারের সঙ্গে পড়ত। খুব ভালো ছেলে ছিল। বিলেতের বড় ডিগ্রী আছে। খুব বন্ধুত্ব ছিল অলঙ্কারের সঙ্গে। বিরাট বড়লোক।'

'আমাদের বিপদের কথা শুনেই বোধহয় চাকরিটি যোগাড় করে দিচ্ছে। বউমা তোমাকে কিছু বলে নি?'

'না। সাহস পায় নি হয়তো। আমি তাকে চাকরি নিতে মানা করেছিলাম। এই অসভ্য দেশে ভদ্র মেয়েদের রাস্তায় বেরোন উচিত নয়। কিন্তু মোটরে যদি যাতায়াত করবাব সুযোগ পায় তাহলে আপত্তি করব না। টাকার তো সত্যিই দরকার। আমি ভাবছি টাকার যদি সুবিধে হয়, ওর মেয়ে দুটোকে কোন ক্রিশ্চান স্কুলের বোর্ডিংয়ে বেখে দেব। ওর মা যদি ওদের দেখাশোনা করবার সুযোগ না পায়, তাহলে ওদের লেখাপড়া হবে না।'

'ক্রিশ্চান স্কুলের বোর্ডিংয়ে কেন?'

'ক্রিশ্চান স্কুলেই আজকাল ভালো পড়াশোনা হয়। অন্য জায়গায রাজনীতি হয, আব কিছু হয় না। মাস্টাররা হয় অনপুযুক্ত, নয় অসাধু, নয় দুইই। বাড়িতে পড়ানোই সব চেয়ে ভালো। কিন্তু পড়াবে কে? ভালো প্রাইভেট টিউটার পাওয়াও সমস্যা আজকাল। বিশেষত মেয়েদের জন্যে—'

পারুলবালা ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছিলেন। ওই ভাবেই তিনি দাঁড়ান। দাঁড়ালে ডানদিকটা একটু কাত হয়ে থাকে। রোগা পাতলা মানুষ তিনি, এভাবে দাঁড়ালে বেশ মানায় তাকে। যৌবনকালে খুবই মানাতো। তাঁর দিকে চেয়ে সেই যৌবনকালের ছবিটা হঠাৎ মনে পড়ল নবীন দত্তের। তাঁর ষোড়শী বধূকে বহুদিন পরে তিনি যেন দেখতে পেলেন—যে তাঁর কলেজ যাবার সময় নিজে হাতে দু' খিলি পান সেজে নিজে তাঁর মুখে পুরে দিত। তখন ওব হাতে বাজু ছিল। কানে দুল ছিল। এখন নবীন দত্ত পান খান না, হরতুকি খান। পারুলও আব কোনও গয়না পরে না। হাতে খালি শাঁখা আর নোয়া। মেয়েদের বিয়েতে অধিকাংশ গযনাই মেয়েদের দিয়ে দিয়েছেন।

হঠাৎ নবীন দত্ত বললেন— 'পান খেতে ইচ্ছে করছে। নীচে থেকে দু' খিলি পান সেজে পাঠিয়ে দাও তো।'

'পান খাবার ইচ্ছে হল যে আজ—'

'এমনি—'

পারুলবালা চলে গেলেন।

নবীন দত্তের আবার ভাবনা হল। সাবিত্রী চাকরি করবে? খগেশ্বর ওর চাকরি করে দিচ্ছে? অলঙ্কারের খুব বন্ধু ছিল। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল ইংরেজিতে। অলঙ্কারের বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিল। সাবিত্রীকে একটা হার উপহার দিয়েছিল বিয়ের সময়। বড়লোকের ছেলে খগেশ্বর। অলঙ্কার তো মারা গেছে অনেক দিন আগে। এতদিন তো ও কোনও খবর

নেয় নি। এতদিন পরে তার বউকে চাকরি যোগাড় করে দিচ্ছে এর মানে কি! সাবিত্রী কি ওকে লিখেছিল না কি কিছু? আগে কোন বিবাহিত মেয়ে স্বামীর বন্ধুকে চিঠি লিখত না, পারুল তাঁর কোন বন্ধুকে চিঠি লেখে নি কখনও, লেখবার কথা ভাবতেও পারে না। কিন্তু আজকালকাব মেয়েবা পারে, চিঠি লেখেও। লেখাটা যে খুব অন্যায় তা মনে করেন না নবীন দত্ত। কিন্তু তিনি জানেন, পরপুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করলে অযথা নানা রকম অবাঞ্ছিত ফ্যাঁকড়া, ইংরেজিতে যাকে বলে কমপ্লিকেশন—হতে পারে। বিশেষত বিধবার পক্ষে। মেয়ে মানুষের মন লতার মতো। কাছে শক্ত, সমর্থ কাউকে পেলে আঁকড়ি বার করে তার উপর নির্ভর করতে চায়। মোটর পাঠিয়ে আপিসে নিয়ে যাবে, আবার দিয়ে যাবে? নবীন দত্তের ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হয়ে গেল। কিন্তু বেশীক্ষণ কুঞ্চিত হয়ে থাকল না, বড় দৌহিত্র প্রতাপ্ এসে প্রবেশ করলেন। হাতে একটা বাটি।

'মা তোমাব জন্যে খাবার পাঠিয়েছে।'

'কি খাবাব?'

'আগে দেখতে দেব না। তুমি চোখ বুঁজে হাঁ কর। খেয়ে বল জিনিসটা কি—'

নবীন দত্ত চোখ বুঁজে হাঁ করলেন। প্রতাপ বাটি থেকে একটা ছোট পানতোয়াব মতো বার করে ঢুকিয়ে দিলে তাঁর মুখে। নবীন দত্ত খেয়ে বললেন—'খেতে মন্দ হয নি। তবে ছানার নয়।'

'কিসেব বল না?'

'আলু বোধহয। মিষ্টি আলু?'

'না। ডিমেব সঙ্গে পোস্ত দানা গুলে বড়ার মতো করে ভেজে সেগুলো বসে ফেলেছে। ভালো হয় নি?'

'চমৎকাব। আর একটা দে—'

হাত পাতলেন নবীন দত্ত।

'দাদু, তোমার হাতে নখ এত বড় বড় কেন।'

'তার কারণ তুমি, আমার ছুরিটি চুরি করে নিযে গেছ। নাপিতেব দেখা পাচ্ছি না।'

'বাঃ, চুবি করতে যাব কেন! তুমি তো দিয়েছ আমাকে। প্রথমে যখন চেয়েছিলাম তখন অবশ্য 'না' বলেছিলে। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন চাইলাম তুমি চুপ করে রইলে। আমি ভাবলাম মৌনং সম্মতি লক্ষণং, তাই নিয়ে গেলাম। আচ্ছা, আমি তোমাকে একটা ভালো 'নেলকাটার' কিনে দিয়ে যাব।'

'আমি সেকেলে লোক, নেল কাটার দিয়ে নখ কাটতে পারব না। ওই ছুরিটার উপর তোমার এত লোভ কেন? তোমরা তো ব্লেড দিয়ে দাড়ি কামাও, নেল কাটার দিয়ে নখ কাটো, ফাউন্টেন পেন দিয়ে লেখ—ছুরি নিয়ে কি কর তুমি—'

'কিচ্ছু করি না। আমার একটা ওলড্ কিউরিয়সিটি বাক্স আছে, তাতে রেখে দিয়েছি। তোমার ছুরির বাঁটটা দেখেছ? অদ্ভুত! প্রকাণ্ড একটা কুমীর খোদাই করা আছে ওর উপর। দেখেছ? তোমাকে আর একটা ছুরিই এনে দেব তাহলে—'

আজকালকাব ছুবিতে কিছু কাটা যায না।'

'তাহলে তোমাব নখেব কি ব্যবস্থা হবে?'

'বঞ্জিত নাপিত দেশে গেছে, সে ফিরুক, তখন কেটে নেব। ও কথা থাক—'

'বঞ্জিত যদি দেশ থেকে না ফেবে, তাহলে তুমি নখই কাটবে না?'

'তখন প্রতাপকে বহাল কবব। বঞ্জিতেব মৃত্যুসংবাদ না আসা পর্যন্ত তাব জন্যে অপেক্ষা কবতে হবে।'

হো হো কবে হেসে উঠল প্রতাপ।

'আচ্ছা একগুঁযে লোক তো তুমি—'

'আমাব কথা থাক তোমাব কথা বল। পডাশোনা কেমন হচ্ছে?'

'পডাশোনা তো কবি না। কলেজে প্রফেসাববাও পডায না, আমবাও পডি না পডে হবেই বা কি? কলেজে যা পডতে হয বাইবে তো তা কাজে লাগে না। বাবা বলেছেন পাশ কবলেই তাঁব আপিসে ঢুকিয়ে দেবেন। তাঁব আপিস মানে কযলাব কাববাব। সেখানে শেকসপিযব, মিল্টন বা ববীন্দ্রনাথেব স্থান নেই। সেখানে খদ্দেব পটানোই কাজ আব আপিসেব মামুলী কেবাণীগিবি। সবকাব মশাই যদি আগেই বিটাযাব কবতেন তাহলে আমাকে এম এ পডতে হত না। বাবা বললেন-- যতদিন সবকাব না বিটাযাব কবছে ততদিন এম এ টা পডে ফেল। ইতিমধ্যে পাবিস তো বি সি এস টা দিযে ফেল সবই বোজগাবেব পন্থা দাদু। আব ওসব সাহিত্য টাহিত্য আমাব ভালোও লাগে না তেমন মাথাতেও ঢোকে না।'

'পবীক্ষা পাশ কববি কি কবে?'

'টুকে। কিংবা নোট পডে। তোমাব নোটবইটা শুনেছি বেশ ভালো। আমাকে কযেকটা ইমপবট্যান্ট কোশ্চেন লিখে দেবে দাদু?'

'আমবা সেকেলে লোক তো আমাদেব কাছে সবই ইমপবট্যান্ট মনে হয।'

'প্লীজ, দাদু বলে দিও—দু একটা কোশ্চেন। তুমি তো মাঝে মাঝে পেপাব সেটাব হতে শুনেছি--'

'ভুল শুনেছ। আমি খোসামোদ কবতে পাবি না। দূর্গা বলে বইগুলো একবাব পডেই ফেল না। দেখ না কেমন লাগে। ছুবিব বাঁট দেখে মুগ্ধ হযেছ, ওথেলো বা হ্যামলেট পডলেও হবে—'

'বড খটমট। কেউ বুঝিযে দেয না।'

'নোট দেখে পড। যেখানটা বুঝতে পাববে না আমাব কাছে এসো বুঝিযে দেব।'

'তোমাব নোটবইগুলো কবে বেরুবে?'

'বাখাল জানে। আমি বলতে পাবব না। ছাপা হচ্ছে, এইটুকু শুনেছি। একটু আগে একটা প্রুফ এনেছিল, ভুলে ভবতি। আবাব আনতে বলেছি—'

'কিন্তু পবীক্ষার আগে যদি না বেবোয়, তাহলে তো বিক্রিই হবে না।'

'বাখাল চেষ্টা কবছে। দেখি কতদূব কি কবতে পাবে—'

'আমি উঠি এখন—'

'এত তাড়া কিসের—বস না।'

'রবীন্দ্রসদনে ব্যালে নাচ হচ্ছে। সেটা দেখব, টিকিট কিনেছি। চলি কেমন?' প্রতাপ চলে গেল।

গালে হাত দিয়ে বসে রইলেন নবীন দত্ত। তথাকথিত আধুনিক যুগের ছোপ তাঁর পরিবারেও লেগেছে। তাঁর আর এক বন্ধু নগেন ভট্‌চায্যির কথা মনে পড়ল। তাঁর ছেলে বিয়ে করেছে এক সোনার বেনের মেয়েকে। যে বংশে তার জন্ম, সে বংশের মর্যাদাবোধ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা নেই ছোকরার। সে সত্যেন দত্তের একটা কবিতা আউড়ে দিয়েছে যে জাতিভেদ মানে না—জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানব জাতি। মানব জাতির মধ্যে কিন্তু চিরকাল নানারকম জাতি আছে। নানা বিভিন্ন নামে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র সব সমাজে চিরকাল আছে, সব সমাজে চিরকাল থাকবে। আজকাল অনেক ব্রাহ্মণ পতিত হয়েছে, নগেনের বংশে সুরেনই তো অব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের বংশে কোনও গুণই তার মধ্যে নেই। প্রকাশ—সে সোনার বেনের মেয়েকে বিয়ে করেছে, প্রেমে পড়ে। এই প্রেমটা কিন্তু কামেরই ছদ্মবেশ। ত্যাগের কষ্টিপাথরে প্রেমের বিচাব হয়। ও ছোকরা কিছুই ত্যাগ করে নি। বাপের তৈরি পাকা ইমারতে সুখে বাস করেছে, মেয়েটিও নাকি বেশ শাঁসালো। নগেন ভট্টাচার্যেব বংশে অনেক বড় বড় পণ্ডিত জন্মেছিল, সেকালের গোঁড়া পরিবাব ওরা, বাড়িতে শালগ্রাম শিলা আছে। মেয়েটি না কি কোন ধর্মই মানে না। জুতো খটখটিয়ে ঠাকুরঘরের সামনে দিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে ববড্ হেয়ারের বাহার তুলে যাতায়াত কবে। শ্বশুর শাশুড়ির মনে যে আঘাত লাগতে পারে এ জ্ঞান সে মেয়েটাব নেই, ছেলেটাবও নেই। নিজের বংশের মর্যাদাবোধই নেই ওদের। ওরা খালি স্বার্থ চেনে, টাকা চেনে, সুবিধা চেনে, প্রয়োজনের জন্য রং বদলাতে মুখোশ বদলাতে আপত্তি নেই ওদের। তাতে বাপ মার মনে আঘাতই লাগুক বা বংশমর্যাদা চুলোয় যাক—ওরা দৃকপাত করবে না। ওরা আধুনিক। নিজেদের গায়ে 'আধুনিক' এই ছাপ লাগিয়ে ওরা যে কোনও বেলেল্লাগিরি করবে এবং ওদের দাবি তা সহ্য করতে হবে। বলতে হবে—ওরা আজকালকার ছেলেমেয়ে, ওরা তো করবেই। আধুনিক সাহিত্য মানে দুর্গন্ধ কামসাহিত্য। তাতে নাকি বাস্তবতা ফুটেছে। আগেকার কবিরা না কি অবাস্তব স্বপ্নলোকে বাস করতেন। জীবনের ছাপ নেই ওদের কৃষ্টিতে। নবীন দত্ত কিন্তু জানেন তা সত্ত্বেও টিকে থাকবেন মিল্টন, সেকসপীয়র, শেলি, কীটস, মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ। ভেসে যাবে এরাই—এই হেঁজিপেঁজি হা-ঘরে আধুনিকের দল যারা রাস্তায় উলঙ্গ হয়ে দুহাত দিয়ে উন্মাদের মতো বে-আব্রু হয়ে গুহ্য আর বস্তিপ্রদেশ চুলকুচ্ছে। তারা কখনও স্থান পাবে না জগতের রসিক সমাজে। কখনও পায় নি। রাস্তার কুকুর বেড়াল পাখীপক্ষীরাও ওই বাস্তব কর্ম আবহমান কাল থেকে করছে, কিন্তু সাহিত্যিক বলে কেউ গণ্য করেনি তাদের। বরং তাদের নিয়ে প্রতিভাবন কবিরা কখনও ক্বচিৎ যে অবাস্তব কাব্য সৃষ্টি করেছেন তাই সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। থাকবেও। এরা একটা ময়লা প্রদীপ নিয়েই নাড়াচাড়া করছে। তার মলিনতা নিয়েই যত আস্ফালন। সেটাকে আলাদিনের প্রদীপ করতে

পারেনি । পারেনি, কিন্তু বাহাদুরির অন্ত নেই, ওই অক্ষমতা নিয়েই লম্ফঝম্ফ করছে ওরা। করুক। কুকুর বেড়ালদের থামানো যায় না, এদেরও যাবে না। এখন চারিদিকে অন্ধকার। অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করতে হবে সূর্যের জন্য। সূর্য উঠলে ফুল ফুটবে। সূর্য উঠবেই একদিন। সে দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য যেন থাকে। এই সব কথাই এলোমেলো ভাবে ভাবছিলেন নবীন দত্ত। হঠাৎ তাঁর সাবিত্রীর কথাটা আবাব মনে পড়ল। ইন্টারভিউ দিয়ে এসেছে? তাকে জানায় নি কেন। সাহস হয নি? সাহস না হবার কাবণ কি? তিনি মানা করবেন এ আশঙ্কা কেন করেছিল সাবিত্রী? তিনি তো আগে ওকে চাকরি কবতে অনুমতিই দিয়েছিলেন, ওর রূপই ওর চাকবির পথে বাধা হল বলে তিনি মানা করেছিলেন। এখন যদি মোটরে যাতায়াত করার সুযোগ পায—চাকরি করুক না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রাচীন প্রবচন তাঁর মনে পড়ল—ঘোমটার নীচে খ্যামটা। এ খ্যামটা নাচ চিরকাল চলছে। এ থামানো যায় নি, থামানো যাবে না। মানুষেব মধ্যে পশুত্ব যতদিন থাকবে ততদিন এটা চলবে। সুতরাং—। তাঁব চিন্তাধারা থমকে গেল। তাবপব বললেন--যা চলছে চলুক। বলেই উঠে পড়লেন। তাঁকে টিউশনি কবতে যেতে হবে।

নবীন দত্তের দুটি টিউশনি। দুটিই ছেলে। মেয়েদের টিউশনি তিনি নেন নি। একজন ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের জন্য মাসে আড়াই শ' টাকা দিতে বাজী হয়েছিলেন। টিউশনিটি নিযেও ছিলেন তিনি। কিন্তু পড়াতে গিযে মেয়ের সাজসজ্জা দেখে ভড়কে গেলেন। ঠোঁটে রং, চোখে কাজল, গালে রুজ, পেন্ট করা মুখ, বব্ করা চুল, প্রায় অনাবৃত যৌবনপুষ্ট দেহ, ন্যাক ন্যাকা কথা দেখে তাঁর ঘৃণা হল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যাকে দেখে ঘৃণা হচ্ছে তাকে তিনি ঠিকমতো পড়াতে পারবেন না। ছাত্র ছাত্রীকে ভালো না লাগলে তাদেব পডানো যায না। ফাঁকি দিয়ে সময় হরণ করা যায়, কিন্তু তাকে শিষ্যারূপে গ্রহণ করা যায না। নবীন দত্ত তার পরদিন থেকে আব যান নি, লিখে পাঠিয়েছিলেন—আমি পারব না, মাপ কববেন। প্রায সঙ্গে সঙ্গেই ভাগ্যে তিনি আর একটি টিউশনি পেযে গেলেন, তা না হলে একটু মুশকিলেই পড়তে হত তাঁকে। তাঁব একটি ছাত্র আগেই ছিল। সে মাসে একশ' করে টাকা দিত। সপ্তাহে দু' দিন করে পড়াতেন তাকে। কিন্তু সাবিত্রীর চাকরিতে ইস্তফা দেওয়াব পব আরও একশ টাকা রোজগার করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। মেয়ে ছাত্রীটিকে পড়ালে তাঁর অভাবেব অতিরিক্ত কিছু টাকা হাতে জমত, কিন্তু তা আর হল না। তাঁর প্রথম ছাত্রটি আর একটি মেয়ে জুটিয়ে দিয়েছিল তাঁকে। সপ্তাহে তিন দিন পড়বে, মাসে দেড়শ' টাকা করে দেবে। কিন্তু মেয়ে শুনেই রাজী হলেন না নবীন দত্ত। বললেন—মেয়ে ছাত্র আমি পড়াতে পাবব না। তুমি তার জন্যে মেয়ে প্রফেসার খুঁজে দাও। কোনও পুরুষ ছাত্র যদি আমার কাছে পড়তে চায়, আর আমার যদি তাঁকে পছন্দ হয় তবেই আমি পড়াব। আমি কুলী নই যে পয়সা পেলে যে কোনও মোট বইব। আমি অধ্যাপক, যাকে পড়াব তাকে যদি ভালো না লাগে তাহলে তাকে পড়ানো যাবে না ঠিকমতো। মন খিঁচড়ে থাকলে পড়ানো যায় না।

'তবে ক্লাসে এতদিন কি করে পড়াতেন স্যার'—জিজ্ঞাসা করেছিল ছেলেটি।

নবীন দত্ত উত্তর দিয়েছিলেন—'ক্লাসে লেকচার দেওয়া আমার চাকরি ছিল, ক্লাসে এক

ঘন্টা লেকচার দিতাম। এক মিনিটও ফাঁকি দিই নি। ক্লাসকেই পড়াতাম। কোনও বিশেষ ছেলে বা মেয়েকে নয়। আমার লেকচার থেকে কোনও ছাত্র বা ছাত্রী কোনও শিক্ষা পেয়েছে কি না—গড নোজ। আমি জানি না। ক্লাসের পর দু' একজন ছাত্র-ছাত্রী আমার কাছে মাঝে মাঝে এসেছে, তাদের যথাযোগ্য সাহায্য করেছি। ব্যস এর বেশী আমি আর কি করেছি। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-শিক্ষকের অন্তরের যোগ কদাচিৎ হয়। যেখানে হয় সেখানে সুফল ফলে। তাই আমি আমার মনের মতন ছাত্র বেছে নিতে উৎসুক। বাজে মার্কা ছেলেকে পড়িয়ে তার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার সরল অর্থ তার বাবা মাকে ঠকানো। আমার অভাব আছে সত্যি—কিন্তু ঠক হতে পারব না।'

নবীন দত্তের এই ছাত্রটি তাঁর অনেকদিনের পুরাতন ছাত্র। বাংলায় এম. এ. পাশ করেছে। এবার ইংরেজিতে দিতে চায়। বড়লোকের ছেলে, একমাত্র ছেলে। কিন্তু ভারী ভালো ছেলেটি। বিনয় নাম। নামের মর্যাদা ও রেখেছে। বি. এ. পড়বার সময় নবীন দত্ত ওকে ইংরেজিতে কোচ করেছিলেন। অনার্স পেয়েছিল। বাংলাতেও অনার্স পেয়েছিল। বাংলাতেও ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। এবার ইংরেজিতে দেবে। নবীন দত্ত পড়ান তাকে।

বিনয় বলল—'আপনি যা চাইছেন তা আজকাল পাওয়া শক্ত। একটি জানাশোনা ছেলে টিউটার খুঁজছে। ছেলেটি খারাপ নয়। কিন্তু তার চওড়া জুলফি আছে—

'ও ছেলে আমি পড়াতে পারব না।'

বিনয় হেসে বললে—'ভালো অধ্যাপকরা যদি এদের না পড়ান তাহলে এদের গতি কি হবে।'

নবীন দত্ত সংক্ষেপে বললেন—'দুর্গতি।'

'ওদের হয়ে ওকালতি করতে লাগল।

'ওরা ফ্যাসানের স্রোতে ভেসে চলেছে, ওদের বাইরেটাই একটু কিম্ভূত গোছের। ভিতরে ওরা সবাই খারাপ নয়। ভূপেন জুলফি রেখেছে বটে, কিন্তু ছেলেটি ভালো।'

'কিন্তু ওদের মধ্যে অনেকেরই মন বিষিয়ে দিয়েছে আজকালকার বাজে নেতা, বাজে সাহিত্যিক, আর বাজে প্রফেসারগুলো। ওরা অনেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে যেহেতু ওরা যুবক সেই হেতু ওদের অভব্যতা করবার অধিকার আছে। ওরা ওদের বুলি মুখস্থ করে বলতে শিখেছে এদেশের ভদ্রলোক মাত্রেই শোষক সম্প্রদায়ের লোক। ওরা জেনারেশন গ্যাপের থিয়োরি আউড়ে জাহির করে বেড়াচ্ছে গত যুগের সঙ্গে এ যুগের আকাশ পাতাল তফাৎ হয়ে গেছে। সুতরাং ওরা নতুন-কিছু হয়েছে। হলে আপত্তি করতাম না, কিন্তু হয়নি, মুড়ি মুড়িই আছে—নামটা হয়েছে চাল-ভাজা। নানা রকম প্যাকেটে মোড়া আছে যদিও। অধিকাংশই আবার মিয়োনো!'

'আমি ভূপেনকে নিয়ে যাব একদিন আপনার কাছে—'

' এসো'।

জুলফি সত্ত্বেও ভূপেন ছেলেটিকে ভালো লেগে গেল নবীন দত্তের। ভূপেন এসেই প্রথমে প্রণাম করল, তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। চোখে মুখে সম্ভ্রম আর একটু ভীতু ভীতু হাসি।

বিনয় বলল—'এই সাব ভূপেন। ইংরেজিতে এম. এ. পড়ছে। আপনার কাছে পড়তে চায়—'

' টুকে পরীক্ষা পাশ করবার দিকে ঝোঁক আছে না কি?'

'আজ্ঞে না—'

'নেই কেন। সবাই তো ওই করছে। ডিগ্রীর ছাপ মারা একটা কাগজ পাওয়াই তো উদ্দেশ্য। তার জন্যে আমার কাছে প্রাইভেট পড়বার দরকাব কি—কোনও চোরের সন্ধান নাও।'

ভূপেন বলল--'আমি ডিগ্রীর জন্য পড়ছি না সার। ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা করতে চাই। এম. এ. ক্লাসে ভরতি হয়েছি, কারণ, ভালো লাইব্রেরির সাহায্য পাব, ভালো অধ্যাপকদের দেখা পাব, এই জন্যে। আপনি যদি আমাকে পড়ান তাহলে তো সেটা ভাগ্য বলে মনে কবব আমি।'

ভূপেনেব মুখেব দিকে চেয়ে নবীন দত্ত প্রশ্ন করলেন--'জুলফি রেখেছ কেন?'

'রাখতে হয়েছে, কাবণ ওটা উত্তবাধিকার সূত্রে পেয়েছি। বাবাব, ঠাকুবদাব, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ—এই চাব পুরুষেব ছবি আমাদেব বাড়িতে আছে। প্রত্যেকেবই জুলফি।

'তাই নাকি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। জাতে আমরা রাজপুত। মেবারের কাছে আমাদের পূর্বপুরুষবা থাকতেন। তাবপব অনেক দিন আগে তাঁরা বাজনৈতিক কাবণে বাংলাদেশে চলে আসেন। সাত পুরুষ আমরা বাংলা দেশে বাস কবছি। এখন আমরা বাঙালী।'

তাবপর একটু হেসে বঁলল—'জুলফিটা আমাকে ঠিক মানায় না। কিন্তু বংশের প্রথা বলেই বেখেছি—আমার মায়ের ওটা ইচ্ছে।'

নবীন দত্ত খুব খুশি হলেন মনে মনে । বললেন—'বেশ, তোমায় পড়াব। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটু বাজিয়ে নেব। চসার পড়েছ'?

'ক্যানটারবেরি টেল্‌স পড়েছি—'

'বেশ। নিজের ভাষায় চসার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখে এনে দেখাও আমাকে। পনেরো দিন সময় দিলুম।'

'কিন্তু আমি আজ থেকেই আপনার শিষ্য হলুম। ভালো দিন দেখে বেরিয়েছি,—'

এই বলে হেঁট হয়ে সে প্রণাম করল এবং একটি একশ টাকার নোট তাঁর পায়ের কাছে রেখে দিল।

'ওটা কি?'

'গুরুদক্ষিণা।'

'দক্ষিণা শেষে দিতে হয়। আগে নেব না।'

'তাহলে প্রণামী বলে নিন।'

'না —তা-ও নেব না। ওসব ভড়ং করবার যোগ্যতা আমার নেই। আসল কথা, তোমার প্রবন্ধটা দেখে আগে ঠিক করি তোমাকে নেব কি না। তারপর টাকাকড়ির কথা হবে। দেখ,

যেদিন থেকে আমরা বিদ্যা বিক্রয় করতে শুরু করলাম সেই দিন থেকে আমাদের অধঃপতন শুরু হয়েছে। গুরু যেদিন অর্থের দাস হল, অর্থদাতা শিষ্যের চাটুকার হল, সেইদিনই আমাদের বারোটা বেজে গেছে।'

'কিন্তু আপনাদের সংসার চলবে কিসে?'

'সেটা দেখবেন দেশের রাজা বা স্টেট। যে বিদেশের নকল আমরা করেছি সেখানেও ভালো অধ্যাপকদের অর্থাভাবে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হয় না। ভালো অধ্যাপককে স্টেট গুরুর আদরেই রাখেন সেখানে। কিন্তু এখানে সে সব হবার উপায় নেই। ইংরেজদের আমলে গুণের কিছু কদর তবু ছিল, এখন একদম নেই। এখন ভাইপো-ভাগনেদের দবাদবা, রক্ষিতার আত্মীয়দের ববরবা, এখন ভদ্রলোক বিপন্ন। সভায় সভায় যে সব আদর্শের আস্ফালন, কার্যকালে সে সব আদর্শের মূলোচ্ছেদ। বাইরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন। যাক এসব বলে আর কি হবে। নিয়তিকে ওলটানো শক্ত। তবু চেষ্টা করতে হবে। ওই চেষ্টা ওই পুরুষকারই আমাদের একমাত্র ভরসা এখন।'

হঠাৎ থেমে গেলেন নবীন দত্ত।

তারপর বললেন—'প্রফেসারদের একটা দোষ কি জান, মহা বাক্যবাগীশ তারা। বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলে থামতে জানে না। আচ্ছা, আজ তুমি চলে যাও। 'এসে'টা লিখে এনো।'

ভূপেন সাত দিন পরেই লিখে এনেছিল প্রবন্ধটা।

নবীন দত্তের এতো ভালো লেগেছিল যে তিনি বলেছিলেন--'বেশ, তোমাকে পড়াব। মাইনে না দিলেও পড়াব। চমৎকার হয়েছে লেখটা--'

ভূপেন চক্ষু অবনত করে বলেছিল – 'মাইনে কিন্তু নিতে হবে।'

'বেশ।'

নবীন দত্তের এই দুটি ছাত্র তাঁর ছেলের মতন। এদের উপর মনে মনে অনেকখানি নির্ভর করেন তিনি। বাইরে অবশ্য এদের কাছ থেকে এক মাইনে ছাড়া অন্য কিছু নেন নি। কারো কাছে কোনও কিছু চাইতে তাঁর ভারী লজ্জা হয়। মনে হয় মাথা কাটা যাচ্ছে যেন। নিজের ছেলেদের কাছেও কখনও কিছু দাবি করেন নি তিনি। তারা স্বেচ্ছায় যখন যা দিয়েছে তা ই নিয়েছেন। কিন্তু তা-ও সব সময়ে নিজের কাজে লাগান নি। দুম্ যে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে গেছে তা স্পর্শ করেন নি এখনও তিনি। অথচ এ জন্য মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়—এটা আমার চরিত্রের দোষ। সবার সঙ্গে মিলে মিশে গলাগলি করে থাকতে পারি না. এটা কি আমার গুণ নাকি? তাঁর সান্ত্বনা বিদ্যাসাগরেরও এ দোষ ছিল। বিদ্যাসাগরের ছবির দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। মনে মনে প্রশ্ন করলেন—ইয়ং সাহেবের সঙ্গে আপনি ঝগড়া করেছিলেন কেন? মেরী কার্পেন্টারের সঙ্গেও তো আপনার মতের মিল হয় নি, ফট করে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেন। বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাজকৃষ্ণ বসু, এদের সঙ্গেও আপনি ঝগড়া করেছিলেন, কার সঙ্গেই বা মতের মিল হয়েছিল আপনার? ভাইদের সঙ্গে, ছেলের সঙ্গে, বীরসিংহের লোকদের সঙ্গেও — কারও সঙ্গে তো আপনার বনে নি। বিদ্যাসাগরের নির্বাক ছবি নির্বাক হয়েই রইল। নবীন দত্তের মনে হল

একটি নীরব উত্তর ফুটে উঠেছে কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টিতে। তা যেন বলছে— মায়ের সঙ্গে আমার মতের কখনও অমিল হয় নি। ছবিটার দিকে আরও খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে নবীন দত্ত নেমে গেলেন। টিউশনি করতে যেতে হবে বালীগঞ্জে বাসে বেশ কিছুক্ষণ লাগবে। তারপর ইচ্ছে আছে শিশুসমার খবর নেবেন একটু। তার বাড়িতে যাবেন না—ফোন করবেন। ভূপেনের বাড়িতে ফোন আছে। মেয়েটাকে খুব স্নেহ করেন তিনি। কিন্তু তাকে ঠিক বুঝতে পারেন না। মাঝে মাঝে মনে হয়, কাকেই বা বুঝতে পেরেছেন তিনি। সবাই তো দুর্জ্ঞেয় রহস্য এক-একটি। দুম্‌কে বুঝতে পেরেছেন? পারেন নি। পারুলকে পেরেছেন? পারেন নি।

রাস্তায় নেবেই একটা পিঠকাটা জামা-পরা মেয়ের দেখা পেলেন। বুকেব কাপড়টা প্রায় খোলা। প্রকৃতি যে তাঁকে একজোড়া স্তন দিয়েছে এইটে বিজ্ঞাপিত করতে করতে চলেছে। কোনও ছোঁড়া ওর ওপর যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে খুব দোষ দেওয়া যাবে কি? প্রকৃতি স্ত্রীলোকমাত্রকেই স্তন দিযেছেন, ওতে ওব নিজের কৃতিত্ব কিছু নেই। কৃতিত্ব আস্ফালন করাটাও অশোভন। কিন্তু বোকা মেয়েটা তা বোঝে না। ছ্যা, ছ্যা, আমবা কোথায় নেবে গেছি।

বাস এসে পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন নবীন দত্ত। সেখানেও গুঁতাগুঁতি ঠেলাঠেলি অসভ্যতার চরম। তবু তার মধ্যেই একটি মহিলা নিজের সীট ছেড়ে উঠে পড়ল—'আপনি আমার সীটে বসুন।'

'কে আপনি?'

'আমি আপনাব ছাত্রী ছিলাম বিদ্যাসাগর কলেজে।'

প্রণাম কবল মেয়েটি।

এই ভীড়েই হঠাৎ যেন স্বর্গ হাতে পেলেন তিনি।

শ্যামবর্ণা রোগা মেয়েটিকে স্বর্গের দেবী বলে মনে হল তাঁর।

'তুমি বস। আমি বেশ তো দাঁড়িয়ে আছি—'

'না, না। আপনি বসুন।'

জোর করে বসিয়ে দিলে মেয়েটি তাঁকে তার সীটে। বসেই নজরে পড়ল ওদিকের সীটে একটা চকরবকরা শার্ট পরা নীল চশমা চোখে জুলফিদার ছোকরা খ্যা খ্যা খ্যা করে হাসছে। চোখ বুজে রইলেন নবীন দত্ত।

ভূপেন্দ্রকে শেকসপীয়রের ক্লিওপেট্রা ও বার্ণার্ড শ'র ক্লিওপেট্রা নিয়ে একটা তুলনামূলক সমালোচনা লিখতে বলে নবীন দত্ত শিশুসমাকে ফোন করছিলেন।

'শিশু, কেমন আছিস?'

'ভালই তো আছি। আপনি আব আসেন না কেন?'

'রাগ হয়েছে। তাছাড়া সময়ই বা কই। রোজগার করে সংসার চালাতে হয় তো। ব্যস্ত থাকি। তা ছাড়া রাগও হয়েছে—'

'আমার উপর?'

'না। তোর বাবার উপর—'

'বাবার খুব অসুখ। সেই জন্যই আপনার কাছে যেতে পারি নি।'

'কি হয়েছে?'

'ডাক্তার ক্যানসার সন্দেহ কবছে।'

'সে কি! কোথায় ক্যানসার হয়েছে?

'প্রস্টেটে—'

'তাই নাকি। আমি যাচ্ছি একটু পরে—'

'কোথা থেকে ফোন কবছেন?'

'বালিগঞ্জ থেকে।'

'ট্রামে বাসে আসতে অনেক দেরি হবে তো?'

'হ্যাঁ, ঘন্টা দেড়েক লাগবে।'

'আপনি ঠিকানাটা বলুন না, গাড়ি পাঠিয়ে দিই।'

'না। গাড়ি পাঠাতে হবে না।'

ফোন কেটে দিলেন নবীন দত্ত।

ঘন্টা দুই পরে ধীরেশেব কাছে গিয়ে দেখলেন ধীরেশ বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁকে দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন তিনি।

'নবীন, আমি তো এবার চললুম। তুমি শিশুর বিয়ে দাও এবার।'

নবীন চুপ করে রইলেন। একটু পরে বললেন—'একেই তো রোগে কষ্ট পাচ্ছেন। মেয়ের বিচ্ছেদযন্ত্রণা কি এর উপর সইতে পারবেন? ওসব কথা এখন থাক—'

ধীবেশের চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল পড়তে লাগল। তার দিকে চেয়ে চুপ কবে বসে রইলেন নবীন দত্ত।

।। তিন।।

ধীরেশের মৃত্যুর ঠিক পাঁচ দিন পবেই তাঁর শাশুড়ীরও মৃত্যু হল। ধীবেশ হাসপাতালে ছিলেন। মৃত্যুর দুদিন আগে তিনি অজ্ঞানও হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে নবীন দত্ত তাঁকে দেখতে গিয়ে দেখলেন নির্বাক হয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছেন। চোখ দিয়ে জল পড়ছে। শিশু দুহাতে মুখ ঢেকে বসে আছে তার মাথার শিয়রে। নবীন দত্ত পাশের টুলটিতে সন্তর্পণে বসলেন। ধীরেশবাবুর জন্যে একটা আপেল আর একটা কমলালেবু নিয়ে গিয়েছিলেন। সে দুটো নীরবে রেখে দিলেন পাশের টেবিলে। চারদিকে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। নার্সরা সন্তর্পণে যাতায়াত করছেন। দূরে কোথায় যেন একটা ফোন বেজে উঠল।

একটু পরে একটি নার্স এসে বললেন—'আপনিই কি নবীন বাবু?'

'হ্যাঁ কেন—'

'আপনার স্ত্রী ফোন করছেন—আপনি এখুনি বাড়ি চলে যান। আপনার শাশুড়ির অবস্থা ভালো নয়।'

নবীন দত্ত উঠে দাঁড়ালেন। তারপর শিশুসমার কাছে গিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন—'আমি বাড়ি যাচ্ছি। আমার শাশুড়ীর অবস্থা খারাপ' —বলেই চলে যাচ্ছিলেন। একটু দূরে গিয়ে দেখলেন শিশুও তার পিছু পিছু আসছে।

'তুমি উঠে এলে কেন?'

'ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি সে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

'ধীরেশবাবুর সম্বন্ধে ডাক্তাররা কি বলছেন?'

' বলছেন কোন আশাই নেই।'

'গাড়িটা এখানেই থাক। ধীরেশবাবুর জন্য কোনও জরুরি ওযুধপত্র দরকার হতে পারে—'

'সব আনিয়ে রাখা হয়েছে। আপনি নিয়ে যান গাড়িটা। একজন ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে যান। টাকা আছে আপনার কাছে?'

'আছে—। তুমি যাও বাবার কাছে বস গিয়ে—'

শিশু শুনল না। তাঁর পিছু পিছু গিয়ে ড্রাইভারকে বলে এল—এঁকে নিয়ে যাও।

প্রকাণ্ড বড় ডজ গাড়ি। ধীরেশবাবু মাত্র কয়েকদিন আগে 'এমব্যাস' থেকে কিনেছিলেন। ইচ্ছে ছিল শিশুকে নিয়ে ভারতভ্রমণে বেরুবেন। তা আর হল না।

তাঁর একজন ছাত্র-ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বিখ্যাত ডাক্তারদের চেয়ে অবিখ্যাত যুবক ডাক্তারদের উপর তাঁর বিশ্বাস বেশী। এই ছেলেটি আই. এস. সি. পড়বার সময় তাঁর কাছে ইংরেজি পড়েছিল। ভারী ভালো ছেলেটি। সেই তাঁর গৃহচিকিৎসক, পারুলের মায়ের চিকিৎসা সেই বরাবর করছে।

তাঁর শাশুড়ীর জ্ঞান ছিল। বুকে অসহ্য ব্যথা।

অমিয় তাঁকে পরীক্ষা করে বলল—করনারি।

'কি রকম বুঝছ?'

'ভালো নয়। পালসের অবস্থা খুব খারাপ। তবু যা করা দরকার আমি করছি।'

'কোনও নামজাদা ডাক্তারের সঙ্গে 'কনসল্ট' করতে চাও?'

'করতে পারি। কিন্তু তাতেও যে ফাঁড়াটা কাটবে তা মনে হয় না। তবু ডাকুন একজনকে—'

একজন বড় ডাক্তারেরই নাম করলে সে। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বললেন—' এঁকে ডাকলেই পাওয়া যায় না। অনেক আগে 'কল' বুক করতে হয়।'

'তুমি যা ভালো বোঝ কর।'

অমিয় ট্যাক্সি করে বেরিয়ে গেল এবং নিয়ে এল একজনকে। তিনিও বললেন—হোপলেস। এবং ওই একটি কথা বলার জন্য তাঁকে চৌষট্টি টাকা ফি দিতে হল। দিলেন নবীন দত্ত। সেইদিনই তিনি এক ছাত্রের কাছ থেকে মাইনে পেয়েছিলেন।

ঘন্টা দুই পরে মারা গেলেন তাঁর শাশুড়ী।

পারুল সাবিত্রী রেবতী পার্বতী সবাই মড়া-কান্না শুরু করলে। নবীন দত্ত পাশের বাড়িতে গেলেন তাঁর শালাদের খবর দেবার জন্য। পাশের বাড়িতে ফোন আছে।

নবীন দত্ত বললেন—'সৎকার সমিতিতে খবর দাও তারা সব ব্যবস্থা করবে।'

তাঁর বড় শালা বললেন, 'মায়ের মৃতদেহ মোটরে করে নিয়ে যাওয়া হোক এটা আমরা চাই না। মা সেকেলে লোক ছিলেন, সেকেলে ধরনেই নিয়ে যাওয়া হোক তাঁকে।'

ছোটশালা বললেন—'আমি একটা ভালো খাট কিনে আনছি—'

খাট কিনে নিয়ে এলেন তিনি। পারুলবালার ঘন ঘন ফিট হচ্ছিল। তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সাবিত্রী আর তার মেয়েরা। নবীন দত্ত পাড়ায় বেরুলেন শব-বাহক সংগ্রহ করবার জন্য। পাড়ায় দশ বারো জন লোক রাজী হল। কিন্তু তারা যা চাইল তা তিনি প্রত্যাশা করেন নি। কারণ ওদের মধ্যে একজন কিছুদিন আগে তাঁকে অনুরোধ করেছিল এক সংস্কৃতি সভায় পৌরোহিত্য করবার জন্য। সে লোকটি অবশ্য সোজাসুজি তাঁর কাছে বলতে পারে নি। আব একজন লোকের মারফত জানিয়েছে। তিন বোতল ব্র্যান্ডি বা হুইস্কি চাই। শুনে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। শালাদের এসে বললেন—' আমি চাই না যে কতকগুলো মদ্যপ মাকে বয়ে নিয়ে যায়। তোমবা 'সৎকার সমিতি'কেই খবর দাও।'

বড় শালা হরবিলাস বললেন— 'আপনি ও নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন। আমবা ওদের সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি।।'

ছোট শালা হরিবিলাস ফোড়ন দিলেন...' মদ তো দিতেই হবে। ওটা তো রেওযাজ হয়ে গেছে। সবাই তো মদ খাচ্ছে আজকাল। শুধু পুরুষবা নয়, মেয়েবাও। কোথায় আছেন আপনি জামাই বাবু---'

নবীন দত্ত কিছু না বলে সোজা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে নিমতলা ঘাটে যখন পৌঁছলেন তখন অন্ধকার। দেখলেন একটা চিতা জ্বলছে। সেই দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলেন তিনি। তাঁর শাশুড়ীর শবদেহ এল অনেকক্ষণ পরে। খাটটা নাকি খুব ভারী ছিল।

।। চার ।।

শাশুড়ীর শ্রাদ্ধের সময় পারুলবালা তাঁর বাপের বাড়িতেই ছিলেন। তাঁর ভায়েরা যদিও তাঁর মায়ের জীবদ্দশায় তেমন খোঁজখবর করেন নি কিন্তু মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধটা করলেন জাঁকজমক করে। আসল শ্রাদ্ধটা যদিও হল 'তিলকাঞ্চন' কিন্তু শ্রাদ্ধের ভোজটা হল শুধু দ্বাদশজন ব্রাহ্মণ ভোজনের ভোজ নয়, শালাদের বন্ধুবান্ধবদের ভোজ। হোটেল থেকে খাবার আনানো হয়েছিল। শাশুড়ীর দশ হাজার টাকার একটা ইনসিওরেন্স করা ছিল। পুত্ররাই সে টাকা পাবে। অতগুলো টাকা যখন পাওয়া যাবে তখন মায়ের শ্রাদ্ধকে উপলক্ষ্য করে কিছু আমোদ আহ্লাদ করা বোধ হয় অনুচিত হবে না—এই যুক্তিই বোধহয় জেগেছিল ছেলেদের

মনে। মায়ের যে সব গয়না কাপড় ছিল তা দুই বউই ভাগ করে নিয়েছিল। পারুলবালাকে তারা দিয়েছিল পুরোনো বিবর্ণ বোম্বাই শাড়ি একটি। পারুলবালা বলেছিলেন—ওটাও তোমাদের থাক, আমার কিছুরই দরকার নেই। মায়ের শেষ সময়ে যে সেবা করতে পেরেছি এইটেই আমার পরম ভাগ্য। বউদের এ শুনে নাকি মুখ ভার হয়েছিল। নবীন দত্ত শ্রাদ্ধের দিন গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ভোজে যোগদান করেন নি। শালারা পীড়াপীড়ি করাতে বলেছিলেন—সেকালে আমরা যে ধরনের ভোজ খেয়ে তৃপ্তি পেতাম সে ধরনের ভোজ তো হচ্ছে না। আজকাল হয় না। সেই সুগন্ধ চালের ভাত, মুগের ডাল, ভাজাভুজি, ছ্যাঁচড়া, ডালনা, ঝোল, ঝাল, অম্বল, ক্ষীর পরমান্ন—এসব আজকাল কেউ খায়ও না, রাঁধতেও জানে না। হোটেলের খাবার আমার সহ্য হয় না। আমি স্বপাকে খাই, তাই খাব গিয়ে। অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও চলে এসেছিলেন তিনি। পারুলবালা চলে আসেন নি। কাজ শেষ হবার দুদিন পরে এলেন। এসেই তিনি সোজা চলে গেলেন নবীন দত্তের চিলে কোঠার ঘরে। নবীন দত্ত তখন তাঁর ইকমিক কুকার থেকে সিদ্ধ ডাল ভাত তরকারি ঢালছিলেন একটা থালার উপর। পারুলবালা এসেই প্রথমে জিগ্যেস করলেন—'দুমের কোন খবর এসেছে'?

'না।'

পারুলবালা চুপ করে দাঁড়িয়ে স্বামীর খাওয়া দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন—'কাল থেকে আমি তোমার জন্যে রাঁধব।'

নবীন দত্ত খেতে খেতে তাঁর মুখের দিকে চাইলেন একবার। তারপর আবার খেতে লাগলেন।

পারুলবালা বললেন, 'আমার তো এখন আর কিছু করবার নেই—আমি কি নিয়ে থাকব।'

'কেন, তোমার নাতনীরা তো আছে।'

'বউমা চাকরি পেয়েছে। সে রেবতী আর পার্বতীকে নিয়ে যাবে বলছিল।'

'নিয়ে যাবে? কোথায়?'

'আমি ঠিক জানি না। শুনছি যে চাকরি পাবে, সেটা নাকি স্কুলের হেড মিস্ট্রেসের চাকরি। স্কুলের কাছেই কোয়ার্টার আছে। খগেশ্বর বলছে আপনার শ্বশুর শাশুড়ী যদি আপত্তি না করেন তাহলে আপনি ওই কোয়ার্টারেই থাকতে পাবেন। আর যদি আপত্তি করেন তাহলে বাড়ি থেকেই মোটরে যাতায়াত করবেন। বউমার ইচ্ছে ওই কোয়ার্টারে গিয়ে থাকা—'

'মানে আমাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চায়?'

পারুলবালা চুপ করে রইলেন।

নবীন দত্ত বললেন—'তাকে ডাকো তো একবার। ব্যাপারটা পষ্টাপষ্টি জেনে নিই।'

'সে বাপের বাড়ি গেছে। যখন ফিরবে তখন পষ্টাপষ্টি জেনে নিও। কিন্তু আমি দুমের জন্য বড্ড অস্থির হয়ে উঠেছি। জার্মানির ঠিকানা কি, সেখানে টেলিগ্রাম, কি ট্রাংক কল করা যায় না? দাদা বলছিল—যায়—'

'যায়। কিন্তু তাতে অনেক ঝঞ্ঝাট, বেশ কিছু খরচও আছে। আমি তার ঠিকানা ফোন নম্বর সব লিখে দিচ্ছি, তোমার দাদার সাহায্যে যা করবার তুমিই কর না।'

'তুমি করবে না?'

'না। ওসব ঝঞ্ঝাট আমি পোয়াতে পারব না। দুমের জন্যে আমারও চিন্তা হচ্ছে কিন্তু আমি ও নিয়ে মাতামাতি লাফালাফি করতে পারব না। আমি জানি, সে ভালো আছে। খারাপ থাকলে একটা খবর নিশ্চয় আসত। তোমার ছেলেকে চেন না? কিছু একটা নিয়ে মত্ত হয়ে আছে সে। তাই চিঠি লিখছে না। আবার যখন খেয়াল হবে লম্বা লম্বা চিঠি লিখবে।'

পারুলবালা রুষ্ট মুখে ঈষৎ বেঁকে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আর কিছু না বলেই নেমে গেলেন নিচে।

সেইদিনই বিকেলবেলা সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা হল নবীন দত্তের। বাপের বাড়ি থেকে ফিরেই সে এসেছিল নবীন দত্তের চিলে কোঠায়। সাবিত্রী মনে মনে আধুনিকা, অর্থাৎ আধুনিক যুগের চাল চলনের স্রোতে ভাসতে চায়। যখন বিয়ে হয় নি, তখন ভেসেছিল। কিন্তু বিয়ের পর নবীন দত্তের আওতায় এসে দমে গিয়েছিল বেচারী। বুদ্ধিমতী মেয়ে, বুঝতে পারলে এ বাড়িতে থেকে নবীন দত্তের প্রবল ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা করা শক্ত। যে লোকটা কারো কাছ থেকে কিছু চায় না, বরং সব্বাইকে যথাসম্ভব দিতেই চায়, তাকে সমীহ করতেই হয়। সাবিত্রী মনে মনে সত্যিই শ্রদ্ধা করত নবীন দত্তকে। কারণ সে বুঝেছিল নবীন দত্ত বাইরে প্রাচীনপন্থী হলেও সত্যিই আধুনিকতা বিরোধী নন। তিনি ছিলেন উন্নাসিকতা-বিরোধী। আধুনিকতার স্বাভাবিক প্রকাশকে ভদ্র মন নিয়ে শ্রদ্ধা করেন তিনি। চটে যান ঢং দেখানে। সাবিত্রী অসাধারণ রূপসী। ঐ রূপের জন্যই পারুলবালা তাকে পছন্দ করে বিয়ে দিয়েছিলেন অলঙ্কারের সঙ্গে। সাবিত্রীর কুলে কোথায় কি যেন একটা খুঁত ছিল, নবীন দত্ত দোনোমোনো করছিলেন বিয়ে দেবেন কি না, কিন্তু পারুলবালার জেদই জয়ী হয়েছিল শেষকালে। অলঙ্কারও মুগ্ধ হয়েছিল সাবিত্রীকে দেখে। অতিবড় রূপসীকে বউ করে এনে নবীন দত্ত মনে মনে একটু ভীত ছিলেন। বি. এ. পাস করে বিয়ে হয়েছিল তার। ইচ্ছা ছিল ইউনিভারসিটিতে এম. এ পড়ে। অনার্স পেয়েছিল বি.এ. তে। নবীন দত্ত আপত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন ঘরের বউয়ের আবার ডিগ্রি নিয়ে কি হবে। তবে বাড়িতেই যত ইচ্ছা পড়াশোনা তুমি করতে পার। আমিই তোমাকে সাহায্য করব। তুমি বাড়িতে বসে এম.এ.র কোর্সটা পড়ে ফেল না। সাবিত্রী তা পড়ে নি। নভেল নাটক পড়েছিল যথেষ্ট। কিছু কিছু কমিউনিস্ট সাহিত্যও। এ সবের জন্যে নবীন দত্তের সাহায্য নিতে হয় নি। তারপর হঠাৎ বিধবা হল সে। পরিবারে একটা আকস্মিক বজ্রপাত হল যেন। মানুষটা তো গেলই, সঙ্গে সঙ্গে অনেক টাকার আয়ও চলে গেল। শোকের ঝড়টা যখন প্রশমিত হল তখন সাবিত্রী একদিন নবীন দত্তকে বলল—'আমি একটা চাকরি যোগাড় করেছি। আপনি অনুমতি দেন তো সেটা নিয়ে নি। মাইনে দুশ টাকা।'

নবীন দত্ত বিস্মিত হলেন।

'কি করে চাকরি যোগাড় করলে তুমি—'

'আমার বাবার এক বন্ধু করে দিয়েছেন। একা আপনার উপরই বড্ড চাপ পড়েছে। তার উপর দিদিমাও এসে রয়েছেন। ঠাকুরপোর পড়া এখনও শেষ হয় নি। তাই ভাবলুম আপনি যদি আপত্তি না করেন চাকরিটা নি—'

খবরটা শুনে নবীন দত্ত খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান যুক্তি বাদী লোক।

আপত্তি করলেন না। সাবিত্রী চাকরি করতে লাগল। কিন্তু নবীন দত্তের মনের নেপথ্যে যে ভয়টা অশরীরী হয়েছিল এতদিন, সেটা শরীরী হয়ে আত্মপ্রকাশ করল। পথে গুণ্ডার হাতে পড়ল সাবিত্রী। সেইদিন থেকে সাবিত্রীর চাকরি খতম করে দিলেন নবীন দত্ত। তিনি বুঝলেন, ও গুণ্ডার দেশ, ছোটলোকের দেশ, এখানে দেবতারা বিহার করেন না, নারীরাও পূজা পায় না। একদা বেথুন কলেজের গাড়িতে যে সংস্কৃত শ্লোকটা কর্তারা লিখেছিলেন সেটা এ দেশের পক্ষে হাস্যকর, বেনাবনে মুক্ত ছড়ানো।

সাবিত্রীকে দেখে সোজা প্রশ্ন করলেন—'শুনলাম তুমি আবার চাকরি নিচ্ছ।'

মাথা হেঁট করে সাবিত্রী বলল—'হ্যাঁ, নিয়েছি। একটা স্কুলের হেড মিস্ট্রেসগিরি। নতুন স্কুল হয়েছে. আমাকেই সেটা ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে —'

'স্কুলের নাম কি।'

'জগন্মাতা বালিকা বিদ্যালয়। খগেশ্বরবাবুই স্থাপন করেছেন এটি নিজের মায়ের নামে। সব খরচ তাঁরই। স্কুলের বাড়ি করে দিয়েছেন, হেড মিস্ট্রেসেরও বাড়ি করে দিয়েছেন। আপনার ছেলেব তো সহপাঠী উনি, তাই আমাকে চিঠি লিখেছিলেন যে আপনি আপাতত এসে স্কুলটাব ভার নিন। আমি গিয়েছিলাম। মিস্টার হাজরা বললেন--আপাতত আমরা নিচের দিকের কয়েকটা ক্লাস আরম্ভ করছি। আস্তে আস্তে বড় করব। আপনি এসে এদের ভার যদি নেন আপনাকে মাসে তিনশ করে দেব। সেটা বেড়ে ক্রমশ পাঁচশ হবে। তাছাড়া ফ্রি কোয়ার্টার্স। আব আমি যদি ওখানে গিয়ে না থাকি তাহলে মোটরে কবে নিয়ে যাবেন. আবার পৌঁছে দেবেন।'

'তুমি কি কোয়ার্টার্সে থাকবে ঠিক করেছ?'

'আমি কিছুই ঠিক করি নি। আপনি যা বলবেন তাই কবব।'

'খগেশ্বরের সঙ্গে দেখা করবার আগে তো আমাকে জিগ্যেস কব নি। করলে আমি আপত্তি করতাম না। নিজের আত্মসম্মান বাঁচাবার জন্যেই করতাম না। আজকাল সকলেই স্ব ইচ্ছায় চলতে চায়. চলতে পারলে তো ভালই, আপত্তি করবার কি আছে। অলঙ্কার যদি বেঁচে থাকত তাহলে সে কি করত তা জানি না। না, আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। তুমি যা ভালো বোঝ তাই কর।'

সাবিত্রী কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে বসে রইল।

তারপর বলল—'কোয়ার্টার্সে থাকাই সুবিধা। রেবতী পার্বতীকেও ওই স্কুলে ভবতি করে দেব। আমি একটা কথা বলছিলাম—'

একটু ইতস্ততঃ, করে থেমে গেল সাবিত্রী।

'কি কথা—'

'আপনি আর মাও গিয়ে যদি থাকতেন ওখানে বড় ভালো হত। দোতলা বাড়ি। কিছু কষ্ট হত না আপনাদের। এ বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দিলে আরও শ পাঁচ ছয় টাকা আয়ও বাড়ত আমাদের—'

'না। তা পারব না। তুমি আলাদা থাকতে চাও থাক গিয়ে। আমরা যাব না। চিরকাল স্বাধীনভাবে থেকেছি, বুড়ো বয়সে কারো আওতায় থাকতে পারব না।'

সাবিত্রী বলল—' আপনি কিন্তু টিউশনি করতে পারবেন না।'

'কি নিয়ে থাকব তাহলে। সারাজীবন ছেলে পড়িয়ে এসেছি। যতক্ষণ শক্তি থাকবে ছেলেই পড়াব। আর জিনিসপত্রের দাম যা বাড়ছে ক্রমশ পেন্সনে আর কুলোবেও না। তাছাড়া, ভাগ্নেটা আছে, সে মানুষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে টাকা দিতে হবে। তুমি ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। মাথা ঘামিয়ে কেউ কিছু কবতে পারে না। যা হবার তাই হয়।'

নবীন দত্ত উঠে জামা গায়ে দিতে লাগলেন।

'কোথায় যাবেন এখন—'

'অনেক জায়গায় যেতে হবে। প্রথমে যেতে হবে লাইব্রেরিতে।'

' সাবিত্রী বলল—' আমি তাহলে চাকরিটা নিই।'

'নাও।'

'আপনি রাগ করছেন না তো বাবা।'

'কিছু মাত্র না। বাগ করব কেন?'

কিন্তু তাঁব কণ্ঠস্বরে যে উত্তাপ বিকিরিত হল তা তিনি গোপন করতে পারলেন না।

সাবিত্রী প্রণাম করে নেমে গেল নিচে।

।। পাঁচ ।।

নবীন দত্তের দিন কেটে যাচ্ছিল। এ যুগে যেমনভাবে কাটা সম্ভব তেমনি ভাবে কাটছিল। অগ্নিমূল্য খাদ্যদ্রব্য কিনেও তাঁর কুলিয়ে যাচ্ছিল, কারণ বাড়িতে তিনি আব পারুলবালা ছাড়া আর কেউ ছিল না। বারো টাকা কে জি পাকা পোনা, আর সাড়ে তিন টাকা কে জি সরু চাল কেনা অসম্ভব হচ্ছিল না তাব পক্ষে। কাবণ দুজনে আর কত খাবে। তবু দৈনিক দশ বাবো টাকা খরচ। মুখপুড়ি এখনও রোজ আসে। সেই বাজার কবে। পারুলবালার রান্নার সাহায্যও করে। পারুলবালা তাকে পর মনে করেন না। মাঝে মাঝে শাড়ি সেমিজ কিনে দেন তাকে। একটা আংটিও কিনে দিয়েছেন নগদ টাকা দিতে সঙ্কোচ হয় তাকে। নবীন দত্তও মনে মনে শ্রদ্ধা করেন মুখপুড়িকে, কিন্তু তার সঙ্গে খুব বেশী মাখামাখি করাটাও পছন্দ করেন না তিনি। অথচ মুখপুড়ি পারুলবালার অন্তরঙ্গ—সে অন্তরঙ্গতায় ফাটল ধরাবার সাধ্য নেই তাঁর, বাসনাও নেই। বরং মাঝে মাঝে মনে হয় তাঁর—আহা, আমি যদি কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পারতাম। পারলে এমন নিঃসঙ্গ হতে হত না আমাকে। মাঝে মাঝে মনে হয় ছেলে দুটো কাছে থাকলে বোধহয় তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হত। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধলেন। অলু মরে গেল, দুম্ সরে গেল। দুমের খবর এসেছে। সে অপরূপ কয়েকটা রঙীন ফোটো পাঠিয়েছে। তার সঙ্গে একটা চিঠিও লিখেছে—জার্মান ফার্মের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। বেলের সম্বন্ধে যে সব তথ্য বার করেছিলাম তা ওদের বিক্রি করে দিয়ে মোটা টাকা পেয়েছি। পরের তাঁবেদারি করতে ভালো লাগল না। যদি কোনওদিন নিজের ল্যাবরেটরি করতে পারি আবার গবেষণা করব। আমার তোলা কয়েকটা ফোটো এখানকার একটা কাগজ ছেপেছিল। ভালো পয়সা দিয়েছে। আমার ফোটো সুখ্যাতিও অর্জন করেছে। শুধু তাই নয়, গুণগ্রাহীও হয়েছে দু

একজন। বিশাল সম্পত্তির অধিকারিণী এক ধনী কন্যারও ফেটোগ্রাফির দিকে খুব ঝোঁক। তিনি আমার ফোটো দেখে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন এসে। পৃথিবীতে যেখানে যত 'বিউটি' আছে যে সবের ফোটো তোলবার উচ্চকাঙ্ক্ষা আছে তাঁর। আমাকে সঙ্গে নিয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমি ভাবছি এ সুযোগ ত্যাগ করব না। তিনি এজন্য আমাকে মাসে যে হাত খরচ দিতে চাইছেন তার পরিমাণ মাসে দশ হাজার টাকা। মেয়েটির বাবা আমেরিকার একজন বড় বিজনেস ম্যাগনেট। মেয়েটি তাঁর একমাত্র সন্তান। জার্মানিতে ফোটো তুলতেই এসেছে। আমার সঙ্গে আকস্মিক যোগাযোগ হল। এ ধরনের মেয়ে আমাদের দেশে দেখি নি। হার্ভার্ডে এম. এ.। চার পাঁচটা ভাষা জানে। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলি গড় গড় করে মুখস্থ বলতে পারে। আমার কাছে বাংলা শিখতে চাইছে। মেয়েটির উৎসাহ প্রবল বন্যার মতো। তা বলে ভেবো না ওর তোড়ে আমি ভেসে গেছি। তবে মেয়েটিকে ভালো লেগেছে। ও যদি আমাকে সত্যিই ওর সঙ্গে পৃথিবী ভ্রমণে নিয়ে যায় আমি যাব ওর সঙ্গে। কারণ এ সুযোগ জীবনে আর দ্বিতীয় বার পাব না। তোমরা আশা করি ভালো আছ। দিদিমা কেমন আছেন? তোমাদের জন্যও আরও কিছু টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করছি আমি। তুমি বিশ্রাম নাও। অর্থোপার্জনের জন্য শরীরপাত করবার দরকার নেই। মাকে চিঠি লিখতে বোলো। আমার নূতন ঠিকানাটা নিচে লিখে দিলাম। এই চিঠির কাগজে যে হোটেলের ঠিকানা ছাপা আছে, সে হোটেল আজই আমি ছেড়ে দেব। নূতন ঠিকানায় কাল চলে যাব। এই ঠিকানাতেই চিঠি দিও। বৌদি, রেবতী, পার্বতী মুখপুড়ি দিদি কেমন আছে? বৌদিকে আবার একটা চাকরিতেই লাগিয়ে দাও। ঘরে চুপচাপ বসে কি করবে। বেরতী পার্বতীকে ভালো একটা বোর্ডিংয়ে দিয়ে দাও। তুমি মা ও বৌদি আমার প্রণাম জেনো। পার্বতী রেবতীকে আশীর্বাদ দিও। ইতি প্রণত দুম্

চিঠিখানা পড়ে নবীন দত্তের মনে যে প্রতিক্রিয়া হল তার মূলে নিহিত আছে নিদারুণ অভিমানে, যে অভিমানের ছবি কবিরা নানা বর্ণে এঁকেছেন বিরহী প্রেমিক প্রেমিকার মনস্তত্ত্বকে কেন্দ্র করে। নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তাঁরা। নবীন দত্তের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিক্রিয়াটা অদ্ভুত রকম হল। তিনি সোজা গিয়ে জামনীতে দুমকে একটা 'কেবল (cable) করলেন Thanks, Need not send money. Nabin Dutta.

নবীন দত্ত পারুলবালাকে জানান নি যে তিনি টাকা পাঠাতে মানা করেছেন। পারুলবালা চিঠিখানা পড়ে চুপ করে রইলেন। চুপ করে থাকাই তাঁর স্বভাব। নীরবতাই তার একমাত্র ব্যক্তিত্ব। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো তাঁর চিন্তাধারা লোকচক্ষুর অগোচরে থাকে। কল্পনা করতে লাগলেন দুম টাকা পাঠালে তিনি একটা বালুচরী শাড়ি কিনবেন, আর কিনবেন নবীন দত্তের জন্যে একটা ভালো কাশ্মীরী শাল। লোকটা ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরেই সারা জীবনটা কাটাল। শেষ বয়সে একটু ভালো জামা কাপড় পরুক না। একটা গরদের পাঞ্জাবি এবং তাঁতের ভালো ধুতিও কিনে দেবেন ঠিক করলেন তিনি। কিন্তু দুম কবে আসবে? এক মেম ছুঁড়ির কথা লিখেছে, শেষে ওকে বিয়ে টিয়ে করবে না তো! তা যদি করে তাহলে তো তাঁর সব সাধ আহ্লাদ শেষ হয়ে গেল। ও মেমকে নিয়ে যদি এদেশে আসেও তাহলে বাঙালী মায়ের সাধ আহ্লাদ মেম বউ মেটাতে পারবে না। ভালো হলেও পারবে না । কেক কখনও

সন্দেশের স্বাদ মেটাতে পারে? লজ্জা বলেছিল (লজ্জা তাঁর মেয়ে, প্রতাপের মা) তাদের পাড়ায় একটি ছেলে বিলেতে গিয়ে মেম-বউ এনেছে। বউটি ভালো মেয়ে। সুক্তো চচ্চড়ি খেয়ে বাঙালী সংসারে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না কিছুতেই। তেল ক্রমাগত ভেসে উঠছে জলের উপর। মিশছে না। ছেলেটি ডাক্তার। বউকে নিয়ে বিলেতেই চলে যাবে ঠিক করেছে শেষ পর্যন্ত। ছেলের মা বোনেরা প্রথম প্রথম গদগদ হবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে নি। অনেক গাদ ও খাদ বেরিয়ে পড়েছে না কি। পারুলবালা নীরবে ভাবেন খালি। নবীন দত্ত তাঁর ভাবনার অংশ নেন না। নিতে চান না, নিতে পারেনও না। পারুলবালা তাই তাঁর কাছে প্রায় চুপ করেই থাকেন। নবীন দত্ত দুবেলা তাঁর কাছে খেতে আসেন অবশ্য। দুমের কথা কিছু বলেন না। খানও অন্যমনস্ক হয়ে। সেদিন হঠাৎ ভাজা মুগের ডালের প্রশংসা করেছিলেন। পারুলবালা মায়ের সেবা করছিলেন যতদিন ততদিন মাছ খান নি। নবীন দত্তও মাছ খেতেন না। ইদানীং কিন্তু পারুলবালা মাছ কিনছেন আড়াই শ' গ্রাম করে। মুখপুড়ি তাঁকে বলেছে সধবা মানুষের নিরামিষ খাওয়া স্বামীর পক্ষে অমঙ্গলজনক। একটু আঁশমুখ করতেই হবে সধবার।

ইদানিং খবচ কিছু কমেছে, তাই মাছ কিনছেন পারুলবালা। নবীন দত্ত মাছের ঝোল খুব ভালোবাসতেন। একদিন হঠাৎ বললেন, 'আমাকে মাছ খাইয়ে লোভী করে তুলছ। পয়সার টানাটানি হলে মহাকষ্টে পড়ে যাব। অভ্যস্ত জিনিস পাইলে সুখ নাই, না পাইলে দুঃখ—বলে গেছেন একজন মস্ত বড়লোক।' এর উত্তরে পারুলবালা সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিলেন না। তারপর বললেন—'পয়সার টানাটানি হবে কেন, দুম অত রোজগার কবছে। সেই খরচ চালাবে।'

'ওর টাকা আমি নেব কেন।'

'নেবে না ই বা কেন।'

'নিলে স্বস্তি পাব না। কারো হাত-তোলা হয়ে থাকি নি কখনও। নেবার দরকারও তো নেই। লক্ষ্ণৌতে আর টাকা পাঠাতে হবে না। দেবনাথ পাশ কবে চাকরি পেয়েছে একটা। ভালো ছেলে দেবু। লিখেছে আপনি ও মাসীমা আমার কাছে এসে থাকুন।'

পারুলবালা দেবনাথের উপর খুব প্রসন্ন ছিলেন না। যখন এ বাড়িতে বধূ হয়ে এসেছিলেন তখন তার মা কালী তাঁকে ভারী জ্বালিয়েছিল। দেবনাথ হওয়ার অনেক দিন পর পর্যন্ত বাপের বাড়িতে ছিল কালী। স্বামীর একটু বা'র টান ছিল বলে ঝগড়া ঝাঁটি করে চলে এসেছিল। নবীন দত্তের মা সর্বাঙ্গসুন্দরী (লোকে সংক্ষেপে বলতো সর্ব-ঠাকরুন) যেতে দেন নি মেয়েকে তখন। দেবুর তখন বছরখানেক বয়স। দুমের বয়স তখন তিন বছর, অলুর পাঁচ বছর। দেবুর সঙ্গে ওদের কি যে পক্ষপাতিত্ব করতেন মা তা আজও পারুলবালার মনে আছে। দেবুকে আলাদা ফলের রস খাওয়ানো হত, দুধ ছাড়া আলাদা হরলিকসও কিনে দিতেন ওকে। কলী পারুলবালার নামে গোপনে নানারকম লাগান ভাঙান করত, ফলে নানারুকম লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করতে হয়েছিল পারুলবালাকে। মা এখন কাশীবাস করছেন, কালী মারা গেছে, পারুলবালা কিন্তু কিছু ভোলেন নি। কালীর ননদ বিশাখা মানুষ করেছিল দেবনাথকে। বিশাখা সম্বন্ধে পারুলবালার ধাবণা ভালো। মেয়েটা দজ্জাল কিন্তু খারাপ নয়।

দেবনাথকে নবীন দত্ত মাসে মাসে টাকা দিচ্ছিলেন এতে আপত্তি করেন নি পারুলবালা। তবে তাঁর মনে হয়েছিল নিজে না খেয়ে ময়লা জামা কাপড় পরে বুড়ো বয়সে টিউশনি করে ভাগ্নেকে টাকা পাঠানোর কোনও মানে হয় না। এসব মনে হয়েছিল কিন্তু কিছু বলেন নি। নবীন দত্তের কোনো আচরণেরই প্রতিবাদ করেন নি তিনি কখনও। নবীন দত্ত তাঁর রুগ্না মাকে এনে আশ্রয় দিয়েছিলেন এটাও তো ভুলতে পারেন না তিনি। তিনি নবীন দত্তকে ভয় করেন, ভক্তি করেন আর সব সময়ে বুঝতেও পারেন না। বুঝতে না পারলেও অবোধের মতো তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। ওইটেই তার অভ্যাস হয়ে গেছে। দুমের টাকা নেবেন না একথা শুনে মনে মনে ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হল না। চুপ করেই রইলেন। একটা কথা তিনি মনে মনে ভালো করেই জানেন দুম্ তাঁরও ছেলে। দুমের উপর তাঁর অধিকারও কিছু কম নয়। জানেন, কিন্তু সে কথা বললেন না।

নবীন দত্ত দুপুরে খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে গেলেন। গেলেন রাখালের খোঁজে তার দোকানে। প্রতি রবিবারে এসে তার হিসাবপত্র দেওয়ার কথা। কয়েক সপ্তাহ থেকে সে আর আসছে না। দোকানে গিয়েও তাকে পান নি। একটা ফড়ে গোছের ছোঁড়া বসে থাকে, সে দরকারি কথার জবাবে কেবল বলে—জানি না। রাখাল কোথায় জানতে চাইলে বলে জানি না। কখন দোকানে আসবে জিজ্ঞেস করলেও বলে, জানি না। এই জানি না—মার্কা ছোকরাকে সেদিন গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ছাপাখানা থেকে বই ছেপে এসেছে? এর উত্তরেও সে যথারীতি বললে জানি না, তখন নবীন দত্ত বললেন, তুমি কিছুই যখন জান না, তখন এ দোকানে বসে কি করছ তুমি? তাকের উপরে রাখা একটি ছোট গণেশমূর্তিকে দেখিয়ে বললে—ওইখানে ধূপ জ্বেলে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিই আর পাহারা দিই। নবীন দত্ত দেখলেন একটা ছোট্ট কাচের টেবিলের সামনে একটা টিনের চেয়ার রয়েছে। ছোঁড়াটা সিঁড়ির একধারে বসে। তার আশপাশে অসংখ্য বিড়ির টুকরো। রাখাল ঠিকই বলেছিল, জায়গাটা নরক-কুণ্ড বিশেষ। চারিদিকে আবর্জনার স্তূপ। পাশাপাশি আরও অনেকগুলো দোকান। সকলেরই ওই অবস্থা। কিন্তু আর সব দোকানের মালিকরা দোকানে বসে আছেন। রাখালই কেবল অনুপস্থিত। নবীন দত্ত ঠিক করলেন রাখাল যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ তিনি অপেক্ষা করবেন তার জন্য। সেই টিনের চেয়ারে গিয়ে বসলেন তিনি। লক্ষ্য করতে লাগলেন সামনের দোকানের ছোকরাটিকে। সেও মাঝে মাঝে তার দিকে চাইছিল। হঠাৎ ছোকরাটি দোকান থেকে নেবে এসে নবস্কার করে প্রশ্ন করল—'আপনিই কি অধ্যাপক নবীন দত্ত?'

'হ্যাঁ' কেন—'

'রাখালবাবু আপনার নোট ছাপছেন?'

'ছাপাব বলে তো এনে রেখেছ অনেকদিন। ইদানিং তার কোন খবরই পাচ্ছি না, তাই নিজেই এলাম।'

'তাঁকে আর বিকাশবাবুকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।'

'কেন?'

'নকশাল সন্দেহ করে।'

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন নবীন দত্ত।

ছোকরাটি তখন ইতস্ততঃ করে বলল—' আমরাও নোট ছাপি। আপনার নোটের ম্যানাসক্রিপ্ট কি রাখালবাবুর কাছে?'

'হ্যাঁ।'

ছোকরাটি কেমন যেন রহস্যময় ভাবে চেয়ে রইল তাঁর দিকে।

তাবপর বলল—'তাহলে তো উদ্ধার হওয়া শক্ত।'

উঠে পড়লেন নবীন দত্ত। উঠে বই পাড়া দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। হঠাৎ একটা দোকানে চোখে পড়ল—হ্যামলেট সাজানো রয়েছে অনেক। আর বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—নোটস বাই প্রঃ এন দত্ত। দাঁড়িয়ে পড়লেন। প্রফেসাব এন. দত্ত কে আবার? একখানা বই চেয়ে নিয়ে দেখলেন। এ তো তাঁরই নোট। দেখলেন ছেপেছে সেই সামনের দোকানের ছেলেটি। তার দোকানের উপর সাইনবোর্ডে যে নাম ঝুলছিল এ তো সেই নাম। থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। ভাবলেন একবার গিয়ে জিগ্যেস করেন এ নোট তোমরা পেলে কোথা থেকে। কিন্তু হঠাৎ নিদারুণ বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে গেল তাঁর। তিনি হনহন করে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন। মনে হতে লাগল— চোর, চোর, চোর, সব চোর। ওই রাখালটি ওব সঙ্গে সড় করেছে। কিন্তু রাখালকে চোর বলে মনে হয নি তো তাঁব। বিকাশকেও না। দুজনেই তাঁব ছাত্র, অনেকদিন ধবে দেখছেন তাদের। ওরা চোর? কলেজ স্ট্রীট থেকে বেবিয়ে মির্জাপুব স্ট্রীটে পড়লেন। হঠাৎ এক পুবাতন বন্ধু ব্রজেন চাটুজ্যের সঙ্গে দেখা। পাইকপাড়ায় যখন থাকতেন তখন ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী ছিলেন। ভদ্রলোকেব সাহিত্য চর্চার দিকে ঝোঁক ছিল। নিম্নলিখিত রূপ আলাপ হল।

ব্রজেন্দ্র। আরে নবীন বাবু যে। নমস্কার, অনেকদিন পরে দেখা হল। খবব কি সব।

নবীন। দেবাব মতো সুখবর কিছু নেই। সবই দুঃসংবাদ। এইমাত্র আবিষ্কার করলাম—একজন প্রকাশক আমাব হ্যামলেটের নোটটা চুরি করে ছেপেছে।

ব্রজেন্দ্র। ছাপবেই তো, এ যে চোরের দেশ মশাই। সাহিত্য ক্ষেত্রেও ওই ব্যাপার। পুকুর চুরি করছে সব। আমি একটা কয়লার দোকান করছি মশাই—রোজই কিছু না কিছু চুবি হচ্ছে। চোর ধরবার জন্যে ওই কয়লাগাদার উপর দিনরাত বসেই বা থাকি কি করে বলুন! আচ্ছা চলি, হাওড়া যেতে হবে। কয়লার ওয়াগন এল কি না খোঁজ নিতে যাচ্ছি। কয়লা এসেছে কিনা এই খবরটি জানবার জন্যেও কিছু ঘুষ দিতে হয়। কোথায় আছেন মশাই আপনি! ঊর্ধ্বে অধে সম্মুখে পশ্চাতে, লড়াই করুন খালি ছ্যাঁচোড়ের সাথে। আচ্ছা চলি। নমস্কার।

নবীনবাবু হাঁটতে হাঁটতে একটি কথাই ভাবতে লাগলেন কেবল—হেরে যাব? শেষকালে হার মানতে হবে? চোখের উপর বিদ্যাসাগরের ছবিটা ভেসে উঠল। তাঁকে প্রশ্ন করলে—'আপনার জীবনীতে পড়েছি আপনর বাবা কাশী যাবার আগে নাকি স্বপ্ন দেখেছিলেন আপনার বাড়ি শ্মশান হয়ে যাবে। খবরটা ভুল না তো, তিনি হয়তো দেখেছিলেন বাংলা দেশটাই শ্মশান হয়ে যাবে। বিদ্যাসাগরের ছবি যেন উত্তর দিলেন—কোন শ্মশানও বেশী দিন শ্মশান থাকে না হে।

বাড়ি ফিরে এসে দেখেন রাখাল শুষ্কমুখে বসে আছে। সে তাঁর পা জড়িয়ে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল।

'সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার, সর্বনাশ হয়েছে—'

'ওঠ, ওঠ, পা ছাড়—ব্যাপার কি?'

একটা পুঁজে ভরতি ফোঁড়া হঠাৎ ফেটে গেলে যে রকম আরাম হয় নবীন দত্ত সেই রকম একটা আরাম অনুভব করলেন। রাখাল তাহলে চোর নয়। চোর হলে ফিরে আসত না।

রাখাল আত্মস্থ হয়ে বসল অনেক কষ্টে। তবুও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কোন কথাই বলতে পাবল না খানিকক্ষণ। মাথা হেঁট করে বসে রইল খালি। নবীন দত্তই প্রশ্ন কবতে লাগলেন।

'তুমি এলে কোথা থেকে? আমি একটু আগে তোমার দোকানে গিয়েছিলাম। দেখলাম দোকানে যে ছোঁড়াটা বসে আছে সে তো কিছুই জানে না।'

বাখাল চুপ করে বসে রইল।

'আমি কিন্তু কিছু খবর নিয়ে এসেছি। তোমার সামনে যে দোকনদারটা আছে সে বললে তোমাদের নকশাল সন্দেহ করে না কি পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। ফিরে আসছিলুম, হঠাৎ চোখে পড়ল একটা দোকানে হ্যামলেটের নোট স্তূপীকৃত করা আছে। গ্রন্থকার প্রফেসার এন দত্ত। একটা বই নিয়ে খুলে দেখলাম—সব আমারই নোট। ছাপিয়েছে ওই সামনের দোকানদারটা। এ কি করে সম্ভব হল?'

রাখাল তবুও নীরব।

'ব্যাপারটা কি খুলে বল না। চুপ কবে আছ কেন?'

'প্রথম কারণ আমরা গরীব। দ্বিতীয় কারণ কতকগুলো ধনী জুয়াচোর আমাদেব ঠকাচ্ছে। আমবা কোন প্রতিকার করতে পারছি না।'

'ও সব তো সব দেশে চিরকাল হয়। তোমার কি হয়েছে তাই বল।'

'আমি বইটা প্রথমে যে প্রেসে দিয়েছিলাম সেখানে শস্তা বলেই দিয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম সেখানে নির্ভুল ছাপা হওয়া অসম্ভব। আপনি রাগ করতে লাগলেন। তখন ওই সামনের দোকানদারটি বললে—আমাকে দিন, আমি নির্ভুল করে ছেপে দেব। আমাদের প্রেস আছে। ভালো প্রুফ-রীডারও আছে। আপনি ও প্রেসে যে রেট দিচ্ছেন সেই রেটেই আমরাও ছেপে দেব। বিশ্বাস করে দিয়ে দিলাম তাকে ম্যানাসক্রিপট। কোন রসিদও নিলাম না। তার দুচার দিন পর পুলিশ এসে হাজির একদিন। বলল—লালবাজার যেতে হবে। গেলাম। সেখানে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখে, তারপর জেরা শুরু করলে। অফিসারটি ভালো লোক ছিলেন, তিনি আমাদের ছেড়ে দিলেন। কিন্তু তারপর থেকেই সন্দেহ হচ্ছে স্পাই আমাদের পিছনে লেগেই আছে। আর এটাও এখন বুঝতে পেরেছি ওই সামনের দোকানদারটির সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে ওই স্পাইটির। একদিন দোকানে যাওয়ার ঠিক পরেই সামনের দোকানে এসে বসল। আমি যতক্ষণ রইলাম ততক্ষণ বসে রইল। তারপর আমরা যেই দোকান থেকে নামলাম সে-ও উঠে পড়ল। দেখলাম আমার পিছু পিছু আসছে। যতক্ষণ বাড়িতে থাকি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। বিকাশ কানপুরে চলে গেছে। সেখানে তার কাকা বড় পুলিশ

অফিসার। সে আমাকে চিঠি লিখেছে, তুই লালবাজারে গিয়ে সেই অফিসারটির সঙ্গে দেখা কর। দেখা করেছিলাম। তিনি বললেন—আপনি দু একজন গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকে গুড ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট নিয়ে আসুন। একটা সার্টিফিকেট হলেই হবে। কোন গভর্নমেন্ট অফিসার, বা প্রফেসর, বা নামজাদা ডাক্তার—এই ধরনের লোক হওয়া চাই। আপনি স্যার, আমাকে একটা সার্টিফিকেট লিখে দিন।'

নবীন দত্ত বললেন—' আমি তো গণ্যমান্য লোক নই। আমার সার্টিফিকেটে কাজ হবে না। তাছাড়া আমি তোমার কতটুকু জানি বল? তোমাকে কলেজে পড়িয়েছি, এই জানি। তোমার ক্যারেক্টার সম্বন্ধে কিছুই জানি না। তুমি কোন পলিটিক্যাল নেতার কাছে যাও। তাঁরাই আজকাল গণ্যমান্য। পুলিশের কাছে তাঁদের কথারই ওজনও আছে—'

'আমি তো কাউকেই চিনি না স্যার।'

চুপ করে বসে রইল রাখাল।

'তোমার মতলবটা কি বল দেখি—'

'আপনি আমার ব্যবস্থা করুন একটা স্যার। আমাকে কেউ চেনে না, আমার বাবা গরীব কেরানী—'

আবার তার গলাব স্বর কাঁদ কাঁদ হয়ে এল।

'আমি কি করব। এ তো মহা মুশকিলে ফেললে দেখছি? খেয়ে এসেছ?'

'না। সকাল নটায় খেয়ে বেরিয়েছি। রাত্রে আবার ফিরে গিয়ে খাব।'

'সেই স্পাইটা কোথায়?'

'আপনার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে বোধহয়।'

'এতো মহা বিপদ দেখছি।'

ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন তিনি হতভাগা ছেলেটার দিকে। ভয়ানক রাগ হল। ইচ্ছে হল ঠাস ঠাস করে চড়িয়ে দূর করে দেন তাকে। হঠাৎ বিদ্যাসাগরের ছবিটা চোখে পড়ল। মুখে মৃদু হাসি, চোখ দুটি করুণায় ভরা। হন হন করে নিচে নেমে গেলেন। দেখলেন মুখপুড়ি কুটনো কুটছে। পারুলবালা রুটি বেলছেন।

'আমার একটি ছাত্র এসেছে। কিছু খাবার পাঠিয়ে দাও তো।'

তিনি বুঝলেন এ সময় খাবার দেওয়া আসুবিধাজনক।

তবু বলে চলে এলেন। একটু পরে মুখপুড়ি এক প্লেট গরম সিঙাড়া দিয়ে গেল।

'সিঙাড়াগুলো খেয়ে নাও। খেয়ে বাড়ি চলে যাও। আমার সার্টিফিকেটে কিচ্ছু হবে না।'

রাখাল নীরবে সিঙাড়াগুলি খেতে লাগল। সত্যিই খুব খিদে পেয়েছিল তার। নবীন দত্ত বিদ্যাসাগরের ছবির দিকে নির্নিমেষে চেয়ে বসে রইলেন। হঠাৎ রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল তাঁর। ওই ব্রাহ্মণকে এ দেশের লোকেরা সারা জীবন ঠকিয়েছে। দুহাতে তাঁর কাছ থেকে হাত পেতে নিয়েছে আর আড়ালে তাঁকে গাল দিয়েছে। বাড়িটা পর্যন্ত পুড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বাসঘাতক পরশ্রীকাতর বদমাইশের দল সব। এই ছোঁড়াটাও সেই সব রক্তবীজের বংশধর। এখন আমাকে কাঁদছে সুযোগ পেলেই তুড়ি লাফ দেবে।

সিঙাড়াগুলো শেষ করে এক গ্লাস জল ঢকঢক করে খেয়ে ফেললে রাখাল।

'এবার বাড়ি যাও। আমার সার্টিফিকেটে কোনও লাভ হবে না। তাছাড়া তোমার ক্যারেক্টর কেমন তা আমি জানি না। সার্টিফিকেট দিতে পারব না।'

'আমি কি করব তাহলে স্যার।' —করুণকণ্ঠে বলল রাখাল। টপ টপ করে আবার জল ঝরে পড়ল তার চোখ দিয়ে।

'আমি কি করে বলি বল।'

হঠাৎ বিদ্যাসাগরের ছবিটার দিকে আবার চোখ পড়ল তাঁর। দেখলেন চোখ দুটি যেন জীবন্ত। করুণায় পরিপূর্ণ। আর তাতে অতি প্রচ্ছন্ন স্নিগ্ধ একটা হাসি নবীন দত্ত এর থেকে কি বুঝলেন কে জানে। রাখালকে বললেন—'একটু বস তাহলে। ভেবে দেখি।'

তারপর অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। রাখাল ঘরের ভিতর চুপকরে বসে রইল।

মিনিট পনেরো পরে হঠাৎ ঘরের ভিতর ঢুকলেন নবীন দত্ত। 'হয়েছে, চল যেতে হবে এক জায়গায়।'

তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়ে আর নতুন চপ্পলটা পায়ে দিয়ে পয়সার থলিটা পকেটে পুরে নিলেন। পারুলবালার জেদে নতুন চপ্পল কিনতে হয়েছিল এক জোড়া।

'চল।'

রাখাল উঠে অনুসরণ করতে লাগল।

রাস্তায় নেমে রাখাল জিগ্যেস করলেন 'কোথায় যাবেন?'

'শিশুসামার কাছে। সে আমার ছাত্রী। সে কোন উপায় করতে পারে।'

ট্রামে করে কিছুদূর গিয়ে বাস ধরলেন একটা। শিশুসামার বাড়িতে পৌঁছলেন যখন তখন আটটা বেজে গেছে। বাড়ির একতলার গেটে বিরাটকায় এক হিন্দুস্থানী দারোয়ান ছিল। সে বলল, 'মাঈজি আছেন।'

আগে কোন দারোয়ান ছিল না।

'খবর দিজিয়ে।'

'আভি খবর দেনা মনা হ্যায়। আপ লোগ বৈঠিয়ে। মাঈজি রেওয়াজ কর রহিঁ হে।'

নবীন দত্ত বললেন—'এক টুকরো কাগজ দিজিয়ে। হাম নাম লিখ দেতা হ্যায়। পৌঁছা দিজিয়ে।'

দারোয়ান নবীন দত্তের ভাব-ভঙ্গী দেখে আর আপত্তি করতে সাহস করল না। কাগজ দিলো। নাম লিখে দিলেন নবীন দত্ত।

সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে এল শিশুসমা। এসে প্রণাম করে বললে—'কাকাবাবু, খবর না দিয়ে এমন হঠাৎ এলেন যে—'

'চল ওপরে চল, বলছি।'

ওপরে গিয়ে দেখেন একটি বৃদ্ধ ওস্তাদ এবং একটি তবলচি বসে আছেন। আর রয়েছে একটি সেতার এবং বাঁয়া তবলা এক জোড়া। শিশুসমা বললে —' ওস্তাদজি, আজ কাকাবাবু এসেছেন, আজ আর বাজাব না। কাল আসবেন—'

ওরা চলে গেল।

'তুই গান বাজনা শিখছিস?'

শুধু বাজনা। সেতারটা শিখছি। কি আর করি বলুন, কি নিয়ে থাকব। আপনি তো ভুলে

গেছেন একেবারে'—রাখালকে দেখিয়ে বললে —'ইনি কে?'

'আমার একজন ছাত্র। তবে তোমার চেয়ে কয়েক বছর সিনিয়ার। বিপদে পড়েছে তাই তোমার কাছে এসেছি। তোমার বাবা তো বড় পুলিশ অফিসার ছিল। তোমার আলাপ আছে কোনও অফিসারের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ আছে। অনেকেই আমাকে ভালোবাসেন। আমার খোঁজখবর নিতে বাড়িতেও আসেন কেউ কেউ। কেন?'

'রাখাল বিপদে পড়েছে। দেখ, যদি উদ্ধার করাতে পার।'

সব শুনে শিশুসমা বললে, 'চেষ্টা করব। আমার মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে। কোনও প্রমাণ তো পায় নি আপনার বিরুদ্ধে?'

'না। কোনও নকশালের সঙ্গে আমার আলাপই নেই।'

'তাহলে ঠিক হয়ে যাবে।'

নবীন দত্ত বললেন, 'তুমি তাহলে ওর ভার নিচ্ছ তো?'

শিশুসমা হেসে বললেন, 'বেশ নিলাম।'

'আমি তাহলে চলি?'

'বা, কিছু খেয়ে যাবেন না। বসুন।'

'বসছি একটু। কিন্তু খাব না কিছু। খেলে পারুলবালা রাগ করবে।'

'সে আবার কে?'

'তোমার কাকীমা। সে রেঁধে বেড়ে বসে আছে। এখন কিছু খেলে আর খেতে পারব না।'

।। ছয় ।।

নবীন দত্তের দিন কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু শান্তি ছিল না মনে। অর্থের অভাব আর ছিল না। বিনয় আর ভূপেনের বাড়ি গিয়ে তাদের পড়াবার ইচ্ছা আর ছিল না তার। বস্তুত তাদের তিনি বলেই দিয়েছিলেন তাঁর আর তাদের পড়াবার যোগ্যতাই নেই। তারা নিজেরাই এত পড়াশোনা করেছে যে তার চেয়ে বেশী তিনি আর কিছু দিতে পারবেন না তাদের। তিনি অবান্তর হয়ে গেছেন। তাই তিনি তাদের চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন আমি আর যাব না। যানও নি। কিন্তু তারা নিজেরাই আসতে আরম্ভ করেছে, আর মাসে মাসে টাকা দিয়ে যাচ্ছে। নবীন দত্ত কিছুতেই তাদের নিবৃত্ত করতে পারছে না। তাঁর সন্দেহ হয়েছে ওরা বোধহয় পড়ার ছুতোয় তাকে অর্থ সাহায্য করছে। অর্থাৎ অনুগ্রহ করছে। অথচ রূঢ় হয়ে তাদের প্রত্যাখ্যান করতে পারছেন না, এইটে তার এক মহা অশান্তির কারণ হয়েছে। ছেলে দুটোকে ভালোবাসেন নবীন দত্ত, শ্রদ্ধাও করেন। তাই এদের উপর খুব রূঢ় হতে পারছেন না। আর একটা অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছেন পারুলবালা। তিনি বলছেন আমি দুমকে না দেখে আর থাকতে পাচ্ছি না। দুম যদি এখানে না আসে তিনিই সেখানে যাবেন। তাঁকেও সঙ্গে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছেন। দুম তার মাকে হাজার দশেক টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। ধনকুবের

নন্দিনী বান্ধবীটিই নাকি দিয়েছে টাকাটা। বলেছে, তোমার মা-বাবাকে এখানে আনিয়ে নাও। পারুলবালা যাওয়ার জন্যে ব্যগ্র, নবীন দত্ত যাবেন না বলে দিয়েছেন। এ ব্যাপ্যরটাকে কেন্দ্র করেও একটা অশান্তির আগুন ধূমায়িত হচ্ছে। পারুলবালা মাঝে মাঝে শাসাচ্ছেন তুমি যদি না যাও, আমি একাই চলে যাব। প্রতাপ আমাকে নিয়ে যাবে বলেছে। নবীন দত্ত 'না' বলেছেন, তবু পারুলবালা আশা করে আছেন তার 'না'কে 'হ্যাঁ' করবেন তিনি। নবীন দত্তের প্রিয় তরকাবিগুলি রোজ রেঁধে যাচ্ছেন। তাঁর হাতের রান্না অতি উত্তম, নবীন দত্ত চেয়ে চেয়ে খাচ্ছেন, কিন্তু আসল ব্যাপারে অনড় হয়ে বসে আছেন। দুম তাঁকে আর চিঠি লেখেন নি। দুম চেনে তাঁকে। পারুলবালাও চেনেন, কিন্তু তাঁর ধারণা পাষাণকেও মোমের মতো গলিযে ফেলবাব ক্ষমতা আছে তাঁর। তৃতীয় অশান্তি হয়েছে সাবিত্রীকে নিয়ে। অলঙ্কারের বন্ধু খগেশ্বব হাজরা একদিন এসেছিলেন তাঁর কাছে। এসে প্রণাম করে বললে—'আপনাকে আজ নিমন্ত্রণ কবতে এসেছি। আমাদের স্কুলে আপনি একবার পাযের ধূলো দিন। এটা সকলেব ইচ্ছে।'

'সকলেব মানে?'

'আমাদেব ওয়ার্কিং কমিটির—'

ওয়ার্কিং কমিটির যে সব সভ্যদের সে নাম বললে, তাদেব মধ্যে তাঁর চেনা দু' চারজন প্রফেসার ছিল। পরমেশও ছিল। শুনেই তাঁর মনটা কেমন বিষিয়ে উঠল। তিনি আন্দাজ করলেন সাবিত্রী আর খগেশ্বরকে নিয়ে তারা মনে মনে একটা ঘোঁট পাকাচ্ছে নিশ্চয়। তাঁব নিজের মনেও কি সন্দেহের ছায়াপাত হয় নি? চুপ কবে বইলেন নবীন দত্ত।

'আপনি যেদিন যাবেন আমি মোটব নিযে আসব। মা-ও যদি যান, আবও খুশী হব আমরা।'

নবীন দত্ত সহসা প্রশ্ন করলেন।

'স্কুলের সঙ্গে তোমাব সম্পর্ক কি?'

'আমিই স্কুলের মালিক। আমাব মায়ের নামে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেছি। নিচেব কয়েকটা ক্লাস এখন আরম্ভ হয়েছে, পরে ওটাকে হায়ার সেকেন্ডারি পর্যন্ত করবার ইচ্ছা আছে—'

'টাকা সব তোমার?'

'হ্যাঁ। গভর্নমেন্টের সাহায্য নিলে বাধ্যবাধকতার মধ্যে যেতে হয় তাই সে সাহায্য নিই নি।'

'ওরা এ ইস্কুল recognise করবে?'

'করেছে। না করবার তো কোনও কারণ নেই। ওদের নিয়ম অনুসারেই তো সব হয়েছে। একজন মন্ত্রীও আমাদের স্কুলের পেট্রন হয়েছেন, আমাদের ইচ্ছে আপনিও একজন পেট্রন হন।'

'না, না আমি ওসব দলে বেমানান। তুমি তো প্রফেসারি করছিলে, ছেড়ে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ। আজকাল যা অবস্থা তাতে ভদ্রভাবে আত্মসম্মান বজায় রেখে প্রফেসারি করা যায় না। প্রফেসাররা আজকাল এক একটা রাজনৈতিক দলে ভিড়ে গেছেন। ইউনিভার্সিটিতেও আজকাল তোয়াজ তদ্বির ধরাধরির ফলাও কারবার চলছে। তাই ওখানে থাকতে পারলাম না—'

'কি করছ আজকাল তাহলে?'

'একটা বইয়ের দোকান করেছি। আমাদের কয়েকটা বাড়ি থেকে আয়ও কিছু—'

নবীন দত্ত জানতেন খগেশ্বর ধনীর একমাত্র সন্তান। তাই আর কিছু বললেন না।

যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল খগেশ্বর। খগেশ্বর ভালো ছেলে এবং অলঙ্কারের প্রিয় বন্ধু বলে তাঁর সম্বন্ধে দুর্বলতাও ছিল নবীন দত্তের। বললেন—'আচ্ছা, যাব একদিন। আসছে রবিবারে এসো।

রবিবারে গেলেন পারুলবালাকে নিয়ে। নাতনীদের দেখবার জন্যে উৎসুক হয়েছিলেন পারুলবালা। গিয়ে দেখলেন সাবিত্রী সুখেই আছে। নাতনীরাও। তাদের গায়ে দামী দামী জামা। মাথায় চকচকে ক্লিপ। সাবিত্রী ঘরে একটি ফ্রিজ আছে, দামী টেপ রেকর্ডার আছে, রেকর্ড প্লেয়ার আছে। রেডিও তো আছেই। সাবিত্রীকে অবশ্য আগেও নবীন দত্ত বিধবার বেশ পরতে দেন নি কিন্তু এখন তার পোষাকের চটক তাঁর কাছেও খুব দৃষ্টিকটু ঠেকল। মাথায় সিঁদুর নেই কিন্তু গলায় হার পরেছে, হাতে চুড়ি বালাও আছে। পরণে বেশ দামী শাড়ি, ব্লাউসের পিঠ কাটা ঘাড়ের দিকটাও বেশ উন্মুক্ত। ঘৃণায় সমস্ত মনটা ভরে গেল নবীন দত্তের। তিনি কিছু বললেন না। চুপ করে বসে রইলেন। সাবিত্রী ভালো ভালো খাবার এনেছিল তাঁর জন্যে। একটিও খেলেন না। এই পরিবেশে পারুলবালাও কেমন যেন ভড়কে গেলেন। সহজভাবে কথাবার্তা বলতে পারলেন না। দু' চারটে মৌখিক লৌকিক আলাপ হল শুধু। নাতনীরা অবশ্য উচ্ছ্বসিত হয়ে নানা গল্প করতে লাগল। তারা চিড়িয়াখানায় গেছে, সিনেমায় গেছে, নেহরু গার্ডেনে গেছে। রেবতীর নাচের স্কুলে ভরতি হয়েছে। নবীন দত্ত নীরব হয়ে বসে রইলেন। তাঁর সমস্ত মন দখল করে রইল অলঙ্কার। আসবার সময়ে খগেশ্বর অনুরোধ করলেন—'প্রতি রবিবারেই এখানে আসুন না।'

নবীন দত্ত হঠাৎ উত্তর দিলেন ইংরেজিতে। বললেন—' I am not blind. Good bye

আর যান নি সেখানে।

কিন্তু সমস্ত মন জুড়ে যে তুষের আগুন জ্বলছে মনে হচ্ছে তা আর নিববে না। পারুলবালা প্রথম দিনে ফিরে একটি কথাই শুধু বলেছিলেন—'যা ভয় করেছিলাম তাই হয়েছে।' ও বিষয়ে আর আলোচনাই হয় নি। কেউই কম্বলটা তুলতে সাহস পায় নি। কম্বলের তলায় যে বীভৎস মড়াটা শুয়ে আছে তার মুখদর্শন করবার ইচ্ছা ছিল না কারোর। পারুলবালা বারবার একটা কথাই বলছিলেন—'চল, আমরা দুমের কাছে চলে যাই।'

নবীন দত্ত বলেছিলেন—'দেখ, যে জন্যে আমি সাবিত্রীকে চাকরি করতে মানা করি নি, দুমের খামখেয়ালীপনার মুখে লাগাম দিই নি, সেইজন্যে তোমাকে অনুরোধ করছি, আমাকে নিয়ে টানাটানি কোরো না।'

'কি সেটা?'

সেটা স্বাধীন ইচ্ছা। কারও স্বাধীন ইচ্ছায় আমি বাধা দিই নি, দেব না। কিন্তু আমার স্বাধীনতাতেও হস্তক্ষেপ করতে দেব না কাউকে।'

পারুলবালা ঠিক বুঝতে পারলেন না। তাঁর মাথায় ঢুকল না। পারুলবালা নবীন দত্তের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন— 'সমাজে বাস করলে কারো স্বাধীন ইচ্ছা থাকে না কি। সারা জীবনটাই তো পরের ইচ্ছায় চলেছি।'

নবীন দত্ত কোনও উত্তর দিলেন না। গুম হয়ে বসে রইলেন। পারুলবালা যাওয়ার পর নিজের জাবদা খাতাটা পেড়ে লিখতে শুরু করলেন

'পারুল যা বলে সেটা ত সত্যি সভ্য সমাজে থাকলে খানিকটা স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয় কিন্তু আদর্শ বিসর্জন দিতে হয় যে সমাজে সে সমাজ অসভ্য বর্বর সমাজ। সমাজে স্বাধীনতা বিসর্জন দিই পরের হিতার্থে, কিন্তু আদর্শ বিসর্জন দিই নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করবার জন্য। পুরাণের সাবিত্রী স্বামীকে বাচাবার জন্য যমের পিছু পিছু ধাওয়া করেছিল একালের সাবিত্রীরা ভোগী স্বামী মরতে না মরতেই আর একটা পুরুষে আসক্ত হয় ভোগের লোভে। ভোগের লোভে বার বার পথ বদলানো মত বদলানো আধুনিক রীতি। এই রীতিকে অনুসরণ করছে পাশ্চাত্ত্য দেশ। তাদের মতো আমাদের শক্তি সামর্থ্য নেই তবু আমরাও তাদের ব্যর্থ অনুকরণ করছি। ওদেশের চিন্তাশীল লেখকদের বই পড়ে মনে হয়েছে যদিও ভোগের সমুদ্রে ওরা সাঁতার কাটছে, কিন্তু শান্তি পাচ্ছে না। আমরা নকল নবীশ ভোগের প্রচুর উপকরণ আমাদের নেই তাই আমাদের অশান্তি আরও বেশী। ভোগে একটা আপাত আনন্দ পাওয়া যায় বেশীক্ষণ সেটা থাকে না। তারপর অশান্তির আগুনে দগ্ধ হতে হয়। সে আগুন তুষানলের মতো। আমিও আগুনে পুড়েছি, এখনও পুড়ছি। কারণ আমিও ভোগের কাঙাল। তবে আমার একটা সান্ত্বনা আছে ভোগের জন্য আমি কখনও আদর্শ বিসর্জন দিই নি। কিন্তু এই সান্ত্বনাটুকু নিয়েও কি আমি সুখী হয়েছি? হই নি। তার কারণ—আমার অহঙ্কার। আমি মনে মনে কল্পনা করেছি, সবাই আমার মতে চলুক। দুম বিদেশে না গিয়ে এদেশেই থাকুক, কিরণ সাবিত্রী আমার পুত্রবধূ হয়েই কাটিয়ে দিক সারাজীবনটা। আমি অবশ্য আমার কর্তৃত্বের নিয়ম তাদের উপর চাপাই নি তাদের নিজের পথেই চলতে দিয়েছি। কিন্তু এজন্য আমার দুঃখ হয় নি একথা বললে মিথ্যে কথা বলা হয়। মনে খুবই আঘাত লেগেছে। পৃথিবীসুদ্ধ লোক আমার মনের মতো হোক এ আশা করলেই চোট খেতে হবে এবং সেটা হজম করে ফেলতে হবে। বাইরে সেটা প্রকাশ করলেই খেলো হয়ে যাব। সুতরাং যদিও মুখোশকে আমি ঘৃণা করি তবু আমাকে ওই মুখোশই পরে থাকতে হবে একটা। মানে, বাইরে যতই না আস্ফালন করি আমি নিষ্কাম নির্বিকার হতে পারি নি। সুখে বিগত স্পৃহ বা দুঃখে অনুদ্বিগ্ন থাকবার মতো মনের জোর আমার নেই। আমি ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ পালন করতে অক্ষম। তাই দুঃখ পাচ্ছি। এটা আমার ন্যায্য পাওনা। আমি শুধু আমার ছেলে বউয়ের উপর কর্তৃত্ব করতে চাই নি অপর ছেলে মেয়েদের উপরও কর্তৃত্ব করবার লোভ আমার ষোল আনা। শিশুসমা, রাখাল, ভূপেন, বিনয় - এদের উপরও আমি আমার হুকুমের দাবী চাপাতে ব্যস্ত আমার স্পর্ধা সীমাহীন। ওদের আমি খুব ভালোবাসি তা ঠিক এবং সেইজন্যই মনে হয়েছিল ওরা সবাই আমার হুকুম মতো চলবে।। তা যখন চলে নি তখন বুঝতে হবে আমার ভালোবাসাতেই কোনও খুঁত আছে বোধহয়। কিম্বা ভালোবাসার হয়তো এখন শক্তিই নেই যার জোরে তা অপরের স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বমতে আনতে পারে। সে হয়তো আমারই পায়ের

দড়ি। আমি অবশ্য কারো স্বাধীন ইচ্ছায় কখনও বাধা দিই নি। এইটুকুই হয়তো আমার সান্ত্বনা, কিন্তু এর জন্যে আমি মনে মনে অনেক কষ্ট পেয়েছি এইখানেই আমার পরাজয়।

আমার ব্যক্তিগত কথা থাক। দেশের দিকে চেয়েও তো তেমন আশ্বাস পাই না। স্বাধীনতার সাতাশ বছর কেটে গেল, আমরা কতদূর এগিয়েছি? ইংরেজদের আমলে আমাদের অনেক দুঃখ ছিল, অনেক অপমান, অনেক গ্লানি আমাদের জীবনকে বিষাক্ত করে রাখত, স্বাধীনতা পেয়েও তা কিন্তু কমে নি। সকলেই স্বার্থপর। সকলেই অসাধু। সেই সেকালের মাৎস্যন্যায়ের যুগ আবার ফিরে এসেছে যেন। দেশে মানুষ নেই, কেউ দেশকে ভালোবাসে না, কোন মহৎ আদর্শ নেই, দেশেব ছেলে মেয়েদের চবিত্র গঠনের কোনও প্রয়াস নেই। এখনও বিশ্ববিদ্যালয় কেরাণী তৈরিব কারখানা হয়ে আছে। বিদেশীদেব নানা চক্রান্তের আভাস পাওয়া যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বিদেশীদের কাছে ঋণে আমাদেব মাথাব চুল পর্যন্ত বিকিয়ে গেছে। নাঃ, আর ভাবতে ইচ্ছে কবছে না। এইখানেই থামি--

লেখা বন্ধ কবে আবার বিদ্যাসাগরেব ছবিটার দিকে চাইলেন। মনে হল ওই লোকটাও এ দেশের ভালো করতে গিয়ে সারাজীবনটা কষ্ট পেয়েছে। সবাই ওকে ঠকিয়েছে।

হঠাৎ মনে হল বিদ্যাসাগরের চোখের দৃষ্টি যেন প্রখর হয়ে উঠল। তিনি যেন বললেন—' আমাব কথা ভাবতে হবে না তোমাকে। তুমি নিজের চবকায তেল দাও—'

।। সাত ।।

শিশুসমা বাখালকে শুধু উদ্ধাবই করে নি, আবও অনেক কিছু কবেছিল। রাখালের দোকানেব সামনেব যে দোকানদারটি নবীন দত্তের নোট —এন দত্ত নাম দিয়ে চুরি করে ছেপেছিল তাব নামে মোকদ্দমা রুজু কবে দিয়েছিল সে। তাব বাবা ধীরেশবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন একজন বড় এটর্নি। তিনিই এ ব্যাপাবে তদ্বিব করছেন। শিশুসমা একদিন এসে নবীন দত্তকে বললে সব। ভেবেছিল নবীন দত্ত বুঝি খুব বাহবা দেবেন। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। চুপ করে রইলেন।

'আপনাকে কিন্তু সাক্ষী দিতে হবে।'

'আমি ও সব পারব না।'

'শক্ত তো কিছু নয়, আদালতে গিয়ে শুধু বলবেন ওই এন, দত্তের নোটবুকে যা ছাপা হয়েছে তা আমারই লেখা, ওর পাণ্ডুলিপি রাখালের কাছে ছিল, তাকেই আমি ছাপবার অনুমতি দিয়েছিলাম, অন্য কাউকে দিই নি। আর একটা কি মজা হয়েছে জানেন? ওরা বলছে, এন. দত্ত নবীন দত্ত নয়, নিবারণ দত্ত।'

নবীন দত্ত হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন।

'আমি ওসব জোচ্চোরের ছায়া স্পর্শ করব না। আমাকে তুমি রেহাই দাও।'

'বেশ আপনাকে কোর্টে যেতে হবে না, আপনি লিখে দিন যে ওই এন. দত্ত মার্কা নোটবুকটা আপনারই, আর আপনিই সেটা ছাপবাব অনুমতি রাখালকে ছাড়া আর কারুকে

দেন নি। কোর্ট যদি আপনাকে শমন করে আপনি বলবেন—আমি খুব অসুস্থ। ডাক্তারের সার্টিফিকেট আমি যোগাড় করব—'

'আমি মিথ্যা কথা বলব কেন?'

'মিথ্যে কেন? আপনি সত্যিই তো খুব সুস্থ নন।'

নবীন দত্ত ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন মেয়েটার মুখের দিকে। না ছোড়বান্দা জোঁক যেন একটা।

তাঁর ছাপা প্যাডটা নিয়ে শিশুসমা যা চাইছিল তাই লিখে দিলেন। না দিলে উঠবে না মেয়েটা।

শিশুসমা মুচকি হেসে বললে—' এইতেই হবে বোধহয়। যদি না হয় আপনাকে কোর্টে যেতে হবে না। যাতে বাড়িতে এসেই আপনার সাক্ষী নেওয়া হয় সে ব্যবস্থা করব।'

হঠাৎ নবীন দত্ত জিজ্ঞেস করলেন—' তুই এত কাণ্ড কবছিস কেন?'

'আমার রোখ চড়ে গেছে।'

উত্তরটা শুনে খুশী হলেন নবীন দত্ত।

প্রণাম করে শিশুসমা চলে গেল।—সে চলে যাবার পব একটা কথা মনে হল নবীন দত্তের—রাখাল তো আজকাল আসে না। ব্যাপাব কি।

।। আট ।।

নিমতলার শ্মশান ঘাটে গিযে বসেছিলেন নবীন দত্ত। মাঝে মাঝে এখানে আসেন তিনি। জায়গাটা যদিও মনোরম নয় তবু আসেন। ওই নিমতলা ঘাটেই তাঁর বাবা মহাপ্রয়াণ করেছেন। এই ঘাটেই তিনি আগুন দিয়েছেন তাঁর মুখে। তাঁকেও অবশেষে এইখানে আসতে হবে। তাঁর সংসারযাত্রার এইটেই শেষ স্টেশন। মনে হল তার মুখে আগুন দেবে কে? অলঙ্কার আগেই চলে গেছে, দুমও জার্মানিতে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল এসব বাজে কথা ভেবে সময় নষ্ট করছি কেন। ওটা কি খুব দরকারি কথা? কেউ না কেউ দেবেই। তারপর হঠাৎ মনে হল তাঁকে নিমতলায় নিয়ে আসবার লোক কি জুটবে? পারুলও তো ছেলের কাছে চলে যাবে বলে কোমর বাঁধছে। সাবিত্রী আর তাঁর পৌত্রী দুটি তাঁর নিকটতম আত্মীয়। কিন্তু তারা—হঠাৎ তাঁর মনে হল প্রথম জীবনে অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য কনট্রাসেপশন-এর (contraceptpion) শরণাপন্ন হয়েছিলেন তিনি। এখন তাঁর মনে হল অন্তত একটা মূর্খ ছেলেও যদি থাকত তাহলে তিনি যেন বর্তে যেতেন। বিদ্বান না হয়ে মূর্খ হলেই যেন বেশী ভরসা পেতেন তিনি। কারণ মূর্খ হলেই সে তার কাছে থাকত, বিদ্বান হলে দূরে চলে যেত। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মন আত্মধিক্কারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ছি, ছি, এত স্বার্থপর তিনি? নিজের স্বার্থেব জন্য এই হাস্যকর ঘৃণ্য কল্পনাও তাঁর মনে জাগছে? আশ্চর্য! মনের কদর্য পশুটা মরতে চায় না কিছুতেই। আত্মসুখের আশায় কান ধরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে পশুটা। স্তম্ভিত হয়ে একটা জ্বলন্ত চিতার দিকে চেয়ে বসে রইলেন নবীন দত্ত। মনের নেপথ্যে আলো-আঁধারিতে চিন্তার একটা মিছিল চলছিল, সে দিকে লক্ষ্য ছিল না তাঁর। সমস্ত অতীত

জীবনটাই যেন অস্পষ্ট মিছিলের রূপ ধরে চলেছিল। হঠাৎ সেই মিছিলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর দিকে যেন প্রকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন— 'দেখ, আমি আমার একমাত্র ছেলেকে ত্যাগ করেছিলাম। শেষ বয়সে আমার আপন লোক কেউ আমার পাশে ছিল না। আমার তেজ সহ্য করতে পারে নি কেউ। কারো সঙ্গে আপোস করি নি আমি। যা ভালো বুঝেছি তা করেছি। মাথা চিরকাল উঁচু ছিল কিন্তু সুখী হই নি। সুখ যদি পেতে চাও আপোস করতে হবে, খোশামোদ করতে হবে, নিজের আদর্শকে দুমড়ে মুচড়ে নিজেকে খাপ খাওয়াতে হবে আর পাঁচজন ইতরের সঙ্গে। যদি পার সুখ পাবে, নচেৎ নয়।' বিদ্যাসাগর হঠাৎ এলেন আবার মিলিয়ে গেলেন। ডাক্তার ছিলিস এ কল্পনা? মনে হল যেন প্রত্যক্ষ দেখলেন।

বল হরি, হরিবোল।

আর একটা মড়া চলল।

নবীন দত্ত উঠে পড়লেন।

বরাবর হেঁটে বেড়ান। নিতান্ত দরকার না হলে তিনি ট্রামে বাসে চড়েন না। সেদিনও হাঁটছিলেন। আজকাল রাস্তায় হাঁটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তায় ভিড় তো আছেই, ফুটপাথেও পা ফেলবার জায়গা নেই। ফুটপাথেও সারি সারি দোকান বসেছে। ফুটপাথেই দরকার। পথেই বসবাস করতে হচ্ছে অনেককে। খবরের কাগজে এ সব নিয়ে লেখালেখি করেছেন অনেকে। নবীন দত্তও মনে করেন ব্যাপারটা অন্যায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হয় এরা যারা ফেরিওয়ালা সারা ভারতবর্ষের লোকই তো কলকাতায় এসে ভিড় করেছে। বাইরের কাউকে আসতে দেব না, এ কথা কি বাংলাদেশ বলতে পারে? অন্য সব দেশে প্রাদেশিকতা আছে, বাংলাদেশ চিরকাল তার প্রতিবাদ করেছে। এখন কি সে বলতে পারে না তোমরা কেউ এসো না? আর সকলকে বাদ দিয়ে সে কি চলতে পারবে? অন্য প্রদেশবাসীদের সঙ্গ ও সাহচর্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে তার পক্ষে। সে কি একলা থাকতে পারে? এই সব ভাবতে ভাবতে পথ চলছিলেন তিনি। হঠাৎ একটা ঝকঝকে সাদা মোটর গাড়ি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'স্যার'

চেয়ে দেখেন ভূপেন গাড়ি চালাচ্ছে, বিনয় তার পাশে বসে আছে। তাঁকে দেখে নেমে পড়ল ওরা।

'আপনার বাড়ি থেকে আসছি। অবশ্য দুদিন হল ফিরে এসেছি। মা বললেন, আপনি আজকাল প্রায়ই বেরিয়ে যান। অথচ আমরা—'

'আমি তো তোমাদের বলেছি, আমি আর তোমাদের পড়াব না। তোমরা আমার চেয়ে বেশী বিদ্বান হয়ে গেছ। অন্য ভাষা শেখ এবার। জার্মানি, ফরাসী, স্প্যানিশ বা রাশিয়ান। এ সব পড়াবারও ভালো লোক না কি পাওয়া যায়। তাদের খোঁজ কর।'

'আমরা বড় একটা কাজ আরম্ভ করেছি দুজনে। বইটার নাম দেব ড্রামা। ইংরেজিতেই লিখব। পৃথিবীর সব প্রধান প্রধান ভাষায় যত ভালো ভালো নাটক আছে, তারই আলোচনা করব। আমাদের কালিদাস, ভবভূতি, ভাস থাকবেন, গিরিশ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথও থাকবেন।

ভারতের অন্যান্য ভাষায় নাটকেরও সন্ধান নেব। আমরা! আপনাকে আমাদের 'গাইড' হতে হবে—'

আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন নবীন দত্ত—'আমি শ্রান্ত, ক্লান্ত, জর্জরিত--তাছাড়া আমার অত বিদ্যে নেই। আমাকে রেহাই দাও তোমরা—'

বিনয় বলল—'আচ্ছা. আপনি যা বলবেন, তাই হবে। কোথা যাচ্ছেন এখন --'

'বাড়ি যাচ্ছি—'

'চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিই।

নবীন দত্ত গাড়িতে উঠতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু রাস্তার মাঝখানে একটা 'সীন' করবার ইচ্ছা হল না তাঁর। উঠে পড়লেন। ভূপেন ছেলেটি খুব বুদ্ধিমান।

সে বলল—'স্যার, আপনিই আমাদের বরাবব পড়িয়েছেন। সাহিত্যের মর্মস্থলে আপনিই অমাদের নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন। আপনি তোতাপাখীর মতো নোট মুখস্থ কবান নি, আপনি সাহিত্য-বোধ জাগাতে চেষ্টা করেছেন আমাদেব মনে। আপনি সত্যিই আমাদের গুরু। এখন আমরা এ তো বড় একটা কাজে হাত দিতে যাচ্ছি, আপনাকে বাদ দিয়ে তা কি সম্ভব? আপনাকে স্যার, থাকতেই হবে। শেকসপীয়রের নাটকগুলো সম্বন্ধে আপনিই ভূমিকা লিখবেন।'

'কিন্তু আমাব বযস হয়ে গেছে, কিছু লিখতে ইচ্ছে করে না।'

'আপনাকে লিখতে হবে না। আপনি ডিকটেট করবেন, আমরা টুকে নেব।'

'লেখবার মেজাজও থাকে না যে সব সময়ে। তোমরা এলেই বিবক্তি ধরে, মনে হয় উঠলে বাচি এ রকম লোককে নিয়ে তোমাদের চলবে কি করে? আমাকে বাদ দাও।'

উভয়েই সমস্বরে বলে উঠল—' না স্যার, তা হয় না।'

নবীন দত্ত বুঝলেন, এদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। চুপ করে রইলেন। তাঁর বাড়ির সামনে তাঁকে নামিয়ে দিয়ে বিনয় বলল—'আমরা রোজই আসব স্যাব। যেদিন আপনার 'মুড' থাকবে সেই দিনই লেখাপড়া হবে— তা না হলে চলে যাব।'

'বেশ—'

ঘরে ঢুকেই নবীন দত্ত একটি পোস্ট কার্ড পেলেন। দেবনাথের পিসি বিশাখা লিখেছে। ছোট চিঠি।

মান্যবরেষু দাদা, দেবনাথকে আমি দূর করে দিলাম। ও কুলাঙ্গার। মতিচ্ছন্ন হয়েছে। একটা কৈবর্তের মেয়েকে বিয়ে করেছে। তুমিও ওকে বাড়িতে ঢুকতে দিও না। যদি আসে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দাও। আমি ঝাঁটাপেটা করে বিদেয় করেছি। প্রণাম নিও। বৌদিকে দিও। ইতি বিশাখা।

নবীন দত্ত পোস্ট কার্ডটার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন। যদিও এসব জিনিস আজকাল হচ্ছে তবু তিনি দেবনাথের কাছে এটা আশা করেন নি। তাঁর ধারণা ছিল ছোকরাটি ভালো। কিন্তু এ কি কান্ড!

বিদ্যাসাগরের ছবির দিকে চাইলেন। মনে হল তাঁরও চোখে মুখে একটা নীরব ব্যঙ্গ যেন ফুটে উঠল। শেষে মনে হল তিনি নীরব ভাষায় যেন বললেন—সহ্য কর। উপায় কি!

একটু পরেই পারুলবালা এসে বললেন—'চল খাবে চল।'

'এত তাড়াতাড়ি কেন?'

মুখপুড়ি বিকেলে খানিকটা মাংস দিয়ে গেছে। কালীঘাটে মানত ছিল ওর। পাঁঠা বলি দিয়েছিল। সেই মাংস কুকারে রেঁধেছি। গরম গরম লুচি দিয়ে এখনই খেয়ে নাও না। আটটা তো বাজে।'

'চল।'

খেতে খেতে নবীন দত্ত বিশাখার চিঠির কথা বললেন। পারুলবালা বললেন, এ খবর আমি তো সাত দিন আগেই পেয়েছি। তোমার কষ্ট হবে বলে বলি নি।'

'তুমি কি করে খবর পেলে?'

'দেবুই আমাকে চিঠি লিখেছে।'

উঠে গিয়ে একটি ইনল্যান্ডের চিঠি এনে দিলেন।

খাওয়া শেষ করে চিঠিটি পড়লেন নবীন দত্ত। ছোট্ট চিঠি।

"শ্রীচরণেষু —

মামীমা, আমি একটি অপরাধ করে ফেলেছি। জানি না আপনাদের কাছে ক্ষমা পাব কি না। মামাবাবুকে ভয়ে চিঠি লিখতে পারি নি। জানি না আপনার আশীর্বাদ পাব কি না। আমি একটি কৈবর্ত মেয়েকে বিয়ে করেছি। বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছি। আমার পদস্খলন হয়েছিল। এ জন্য আমি খুবই লজ্জিত। কিন্তু মনে হল –ওকে বিয়ে যদি না করি, তাহলে আরও লজ্জার কারণ ঘটবে। আপনাদের আশীর্বাদ সততই কামনা করি। ইতি— প্রণত দেবু।

'এ চিঠির তুমি কোনও উত্তর দিয়েছ?'

'একটা পোস্ট কার্ডে লিখে দিয়েছি, তুমি বাবা বাধা হয়ে বে লাইনে চলে গেলে এ খবরে খুব সুখী হতে পারলাম না। তবু আশীর্বাদ করছি সুখী হও। আর কি লিখব?'

নবীন দত্ত আর কিছু বললেন না। উপরে উঠে গেলেন। উপরে উঠে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুতে ঘুম এলো না। তারপর আলো জ্বেলে পড়বার চেষ্টা করলেন। ভালো লাগল না। বই বন্ধ করে আলো নিবিয়ে ছাতে এসে পায়চারি করতে শুরু করলেন। অনেকক্ষণ পায়চারি করলেন। মনের মধ্যে একটা ভাষাহীন কষ্ট টনটন করতে লাগল ফোড়ার মতো। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন, অগণ্য নক্ষত্র। ছেলেবেলায় যেমন দেখেছিলেন ওরা এখনও তেমনি আছে। স্বাতী আর চিত্রা দূরত্ব বদলায় নি। অভিজিৎও ঠিক জায়গায় আছে। আকাশ-গঙ্গাও তেমনি ভাবেই বইছে। ছেলেবেলায় যে সমাজ ছিল সেটাই বদলে যাচ্ছে শুধু। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন শেষে। চোখের উপর একটা ছবি ফুটে উঠল। একটা নদী যেন প্রলয়ঙ্করী হয়ে উঠেছে। ধস্ ভাঙছে। গ্রামের পর গ্রাম লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল—নদীটা কে? কিন্তু কোনও উত্তর এল না মাথায়। স্বপ্নে দেখলেন যেন বিদ্যাসাগর এসেছেন । বলছেন— নদী তুমি, নদী আমি। আমরাই গড়ছি, আমরাই ভাঙছি।

।। নয় ।।

কয়েকদিন পরে শিশুসমার চিঠি এল একটা। নবীন দত্ত প্রথমে বুঝতেই পারেন নি এটা

শিশুসমার ছিঠি। খামটা উলটে পালটে দেখলেন। হাতের লেখাটা চেনা মনে হল তবু বুঝতে পারলেন না কার চিঠি। তাঁরকাছে খামের চিঠি বড় একটা আসে না। খামটা খুলে অবাক হয়ে গেলেন কি এত লিখেছে শিশুসমা। ভ্রূকুঞ্চিত করে পড়তে শুরু করলেন।

শ্রীচরণেষু,

কাকাবাবু, আমার চিঠি পেয়ে আপনি একটু অবাক হবেন হয়তো। আগে তো কখনও আপনাকে চিঠি লিখি নি। লেখবার দরকারই হত না। আগে তো প্রায়ই আমার কাছে আপনি আসতেন। আজকাল আর আসেন না। মনে হয় আমার উপর রাগ করেছেন। কেন করেছেন তা জানি না। মকোদ্দমা করে আমি সেই জুয়াচোরটাকে জব্দ করেছি। আপনাব নোট সে দশ হাজার কপি ছেপেছিল। কোর্টের রায় অনুসারে সে বইগুলো এখন আমাদের দখলে এসেছে। রাখালই তাব বিলি ব্যবস্থা করছে। সে একটা ভালো দোকান ভাড়া করে বইয়ের ব্যবসায় আবার নেবেছে। টাকাকড়ি অবশ্য সবই আমি দিয়েছি। রাখাল বলছে সে আপনাকে না কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে বইটার জন্য আপনাকে পাঁচহাজার টাকা দেবে। সে টাকাটা সে আপনাকে দিতে চায়। আমিও ওর দোকানের অংশীদার হয়েছি। আপনি অনুমতি করলেই আমি আপনাকে গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসব। আপনার মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে আমি রাখালের ব্যাপারে এতো জড়িয়ে পড়েছি কেন। জড়িয়ে পড়েছি তার কারণ রাখাল ছেলেটা বড় অসহায়। প্রথমত ও খুব গরিব, দ্বিতীয়ত খুব বোকা আর ভীতু। সংসারে চলতে হলে শুধু ভালোমানুষ হলেই চলে না, পৌরুষ চাই। ও তো আপনার ছাত্র, পড়াশোনায় খুব ভালো, স্বভাব চরিত্রও চমৎকার, কিন্তু এতো মুখচোরা যে কারও সঙ্গে ভালো করে কথা কাইতে পারে না। কেরাণীগিরি পেলে ও হয়তো তা করতে পারত, কিন্তু চাকরিতে উন্নতি হত না। অথচ এতো ভালো, এতো নিরহঙ্কার, এতো সৎ যে কি বলব। তাই আমার মনে হয়েছে ওকে সাহায্য করা উচিত। আমারও তো কোনও কাজ নেই। সেতার শিখছি বটে, কিন্তু খালি সেতার নিয়ে কি সারাক্ষণ থাকা যায়? তাছাড়া আর একটা কথা আবার মনে হয়েছে। সুর নিয়ে সারাক্ষণ তন্ময় হয়ে থাকবার মতো মন আমার নয়। আমি ঠিক সুর শিল্পী গুণী নই। আমি ফ্যাসানের খাতিরে বাজনা শিখতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু ক্রমাগত ডারা ডাঃা করে আমার মন ভরছে না। বাবা যখন বেঁচে ছিলেন তখন বাবাকে নিয়ে অনেক সময় কাটত। এখন একা নিজেকে নিয়ে কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এমন সময় রাখলকে দিয়ে গেলেন আপনি। ভাবলাম ওর সঙ্গে বইয়ের ব্যবসাতে নেবে পড়ি। রাখালের মতো সৎ ছেলে যদি সাহায্যকারী হয় আর আমি যদি ভালো মূলধন দিতে পারি তাহলে ব্যবসাটা ভালোই চলবে বলে মনে হয়। আমি ভালো বইয়ের দোকান করতে চাই একটা। বাংলা, ইংরেজি আর সংস্কৃত বই রাখব ভেবেছি। ভালো হবে না? আর একটা অনুরোধ করতে ইচ্ছে করছে কিন্তু সাহস হচ্ছে না। আপনি আমাদের পেট্রন হবেন? মাঝে মাঝে আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব, আপনি আমাদের দোকানে আসবেন, আমাদের পরামর্শ দেবেন। আপনি যদি আপত্তি না করেন এর জন্য মাসে মাসে কিছু দক্ষিণাও আপনাকে দেব। আপনি আসুন আমাদের মধ্যে। আপনার উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকব। আমার সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি—প্রণতা

শিশুসমা

চিঠি পড়া শেষ করে তিনি স্বগতোক্তি করলেন—'সবাই টাকা দিয়ে আমাকে অনুগ্রহ

করতে চায়। সবাই সামনে এসে টাকার থলি নাড়ছে' তাঁর হঠাৎ মনে পড়ল দুম যাওয়ার সময়ে তাকে পাঁচহাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিল। সেটা তিনি রেখে দিয়েছিলেন ফুলদানীর মধ্যে, খরচ করেন নি। গিয়ে দেখলেন, টাকাটা তেমনিই আছে। একবার মনে হল দুমকে পাঠিয়ে দিই টাকাটা। আবার ভাবলেন একটু। নাঃ থাক, ছেলেটা কষ্ট পাবে। টাকাটা না হয় পারুলকেই দিয়ে দেব।

শিশুসমাকে ছোট্ট একটা চিঠি লিখলেন।

মা শিশুসমা,

আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আমার দ্বারা আর কিছু হবে না। আমি যা পেন্সন পাই তাতেই আমার বেশ চলে যাবে। বেশী টাকার দরকার নেই। টাকা না হলে সংসার চলে না তা ঠিক, কিন্তু বেশী টাকা হলে যে সব সমস্যা অনিবার্য তা সমাধান করবার শক্তি আমার নেই। আশীর্বাদ জেন। ইতি —শুভার্থী

নবীন দত্ত

।। দশ ।।

সামান্য ঘটনা। নবীন দত্তের মনে কিন্তু গভীরভাবে দাগ কাটল। মনে হল তাঁর মর্মের কোমলতম অংশে কে যেন ছুরি চালিয়ে দিলে। হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলেন। ফুটপাতে হঠাৎ হোঁচট খেলেন। পড়তে পড়তে সামলে গেলেন টাল খেয়ে। একজন লোক ধরে ফেলল তাঁকে। উপদেশও দিল—'রাস্তা দেখে চলতে পারেন না মশায়।' নবীন দত্ত তাঁকে নমস্কার করে আবার এগিয়ে গেলেন। কোনও জবাব দিলেন না। কিছুদূর গিয়ে দেখেন মোড়ে চার পাঁচটা ছেলে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। সকলেরই মাথায় বড় বড় চুল। মুখে গোঁফ দাড়ি। হিপির নকল। তাদের পাশ কাটিয়ে সরে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাদের মধ্যে থেকে কে একজন বলল, 'ওই দেখ শ্লা নবীন দত্ত যাচ্ছে। একের নম্বর হারামি বেটা, আমাকে ইংরেজিতে ফেল করিয়ে দিয়েছিল।'

নবীন দত্ত ঘাড় ফেরালেন না।

সোজা চলে গেলেন।

কিন্তু তাঁর অন্তরাত্মা বলতে লাগল—ধরণী দ্বিধা হও, প্রবেশ করি। বেরিয়েছিলেন হরতুকি কেনবার জন্য। একটি বিশেষ দোকান থেকে হরতুকি কেনেন তিনি। দোকানদারটি বুড়ো। তাঁকে খাতির করে, বেছে বেছে ভালো হরতুকি দেয়। শুধু দেয় না, জাঁতি দিয়ে কুঁচিয়ে টুকরো টুকরো করে দেয়। হরতুকি কিনে বাড়ি ফিরলেন। সেখানে একটি দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছিল। টেলিগ্রাম এসেছে—মা খুব অসুস্থ— অবিলম্বে চলে এস।

পারুলবালা মেয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন টালিগঞ্জে। এক ঘন্টা পরে কাশীর গাড়ি। সে গাড়ি ধরতে না পারলে আজ যাওয়া হবে না। তিনি ঠিক করলেন একাই যাবেন। নিচের ভাড়াটেদের সব কথা বলে একাই বেরিয়ে গেলেন তিনি ট্যাক্সি করে। কাশীর ট্রেন ধরলেন ঠিক।

মণিকর্ণিকার ঘাটে মায়ের চিতা পুড়ছিল।

তার দিকে চেয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছিলেন নবীন দত্ত। তাঁর বয়স চুয়াত্তর বছর। মা মারা

গেলেন চুরানব্বই বছর বয়েসে। দুঃখ করবার কি আছে এতে? নবীন দত্ত তবু শিশুর মতো কাঁদছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল—শুধু মা নয়, তাঁর সব যেন পুড়ে যাচ্ছে।

।। এগারো ।।

এক বছব কেটে গেছে।

নবীন দত্তের মতি গতি কিন্তু আজও বদলায় নি। কিন্তু এই এক বছরে অনেক কিছু ঘটে গেছে তাঁর জীবনে। পারুলবালা প্রতাপকে নিয়ে জার্মানি চলে গেছেন। তাঁর ছাত্র দুটিও—ভূপেন আর বিনয়— চলে গেছে আমেরিকায়। সেখানেই তারা বড় ইউনিভারসিটিতে চাকরি পেয়েছে। সেখানেই নাটক নিয়ে গবেষণা করবে তারা। শিশুসমার সঙ্গে রাখলের বিয়ে হয়েছে। বাখাল নিজেব বাড়ি ছেড়ে এখন শ্বশুর বাড়িতে থাকে। রাখালের বাবা কেরাণী ছিলেন, অতি কষ্টে একটা গলিতে জরাজীর্ণ বাড়িতে বাস করেন। রাখালই তাঁকে নাকি টাকা দেয় মাসে মাসে। বৃদ্ধ বহুকাল আগে বিপত্নীক হয়েছিলেন। বাখালের এক বিধবা বোন তাঁব দেখা শোনা করে। সাবিত্রীও বিয়ে করেছে খগেশ্বর হাজবাকে। শুধু তাই নয, সাবিত্রীব মেয়েদের পদবীও এখন নাকি দত্ত নেই, হাজরা হয়ে গেছে। দুম মাঝে মাঝে তাঁকে বৃত্তি পাঠায়। পারুলবালা গিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। সবই সেখানে নাকি চমৎকাব, অপূর্ব। দুমের বান্ধবী সেই মেয়েটি না কি স্বর্গের দেবী। নবীন দত্ত কোনও উত্তর দেন নি। একটি কাণ্ড তিনি করেছিলেন- বাড়িটা এক লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দিয়ে টাকাটা ব্যাংকে বেখে দিয়েছিলেন।

কারমাটাড়ে গিয়ে ছোট্ট একটা বাড়ি ভাড়া কবে একাই থাকেন এখন। একটা ছোঁড়া সাঁওতাল চাকর তাঁর রান্না বান্না করে।

বিদ্যাসাগরেব ছবিটা তিনি সঙ্গে এনেছিলেন।

বিদ্যাসাগরও শেষ বযসে কারমাটাড়ে ছিলেন—এইটেই তাঁর সান্ত্বনা। সমস্ত দিন তিনি মাঠে মাঠে ঘুবে বেড়ান, মনে হয় লাঞ্ছিত বিদ্যাসাগরের আত্মাকে তিনি খুঁজছেন। জানেন দেখা পাবেন না, তবু খুঁজছেন। কারণ, আর কিছু কববার নেই।

হরিশ্চন্দ্র

।। এক ।।

মুগমটব গ্রামের হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্তী নিজের প্রশস্ত বৈঠকখানা ঘরে নগ্নগাত্রে বসিয়া ভড়াক ভড়াক করিয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতেছিলেন। তাঁর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া একটি ভৃত্য তাঁহার মাথায় হাওয়া করিতেছিল। বারান্দায় একটি চাকর কয়েকটি লণ্ঠন, দুইটি হ্যাজাক বাতি এবং অনেকগুলি রেড়ির তেলের প্রদীপ লইয়া ব্যস্ত। সন্ধ্যা আসন্ন। এখনি ঘরে ঘবে আলো দিতে হইবে। হরিশ্চন্দ্রবাবুর বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নাই। কল নাই। আছে দুইটি কূপ এবং বাড়ির পিছনে আছে প্রকাণ্ড একটি পুষ্করিণী। তিনি গোয়ালার দুধ বা টিনের দুধ কিনিযা খান না। বাড়িতে অনেকগুলি গাই মহিষ পুষিয়াছেন। বাড়িতে বেডিও নাই। তিনি কিন্তু খুব সঙ্গীতপ্রিয় আমুদে লোক। প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর তাঁহাব বাড়িতে গানের আসর বসে। পাড়ার ছেলেরা আসিয়া গান বাজনা করে। যেদিন গানবাজনা হয় না সেদিন কথকতা হয়। গ্রামের পঞ্চানন পণ্ডিত আসিয়া কথকতা করেন। তাঁহার গলাটি সত্যই সুমধুর। হরিশ্চন্দ্রই তাঁহার সংসারের ভরণপোষণ করেন। কলিকাতায় তাঁহার একজন অধ্যাপক বাল্যবন্ধু আছেন। হরিশ্চন্দ্রের নির্দেশমত তিনি প্রতি মাসে একখানি করিয়া ভাল বাংলা বই তাঁহাকে ভি পি. যোগে পাঠান। বইটি পড়িয়া ভাল লাগিলে সেটি সযত্নে তুলিয়া রাখেন। ভাল না লাগিলে পড়াইযা ফেলেন। বলেন, ঘবে রাবিশ বাখিবাব জাযগা নাই।

হরিশ্চন্দ্র চাষী লোক। অনেক জমি আছে। বাজার হইতে কিছু কিনিয়া খাইতে হয় না। পুকুরে মাছ আছে, ছাগলও আছে অনেকগুলি। কিন্তু মাছ মাংসে তাঁহাব রুচি কম, যেদিন পুকুরে জাল ফেলা হয় সেই দিনই বাড়িতে মাছ হয়। বৃথা মাংস তিনি খান না। বাড়িতে দুর্গাপূজা, কালীপূজা হয়। সেই সময়ই তিনি মায়ের প্রসাদী মাংস খান। মুর্গী পুষিয়াছেন ব্যবসার জন্য। প্রথম জীবনে কুড়ি বছর বয়সে একটি দশ বছরের মেয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের এক বছর পরেই বিপত্নীক হন তিনি। আর বিবাহ করেন নাই। একটি নোলকপরা মেয়ের আবছা স্মৃতি অবলম্বন করিয়াই তিনি জীবনের প্রায় চল্লিশটা বছব কাটাইয়া দিয়াছেন।

হরিশ্চন্দ্রবাবুকে বিবাহ করিবার জন্য অনেকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। অনেকে বলিতেন, আপনি পিতার একমাত্র বংশধর, আপনি বিবাহ না করিলে আপনার বংশ লোপ পাইবে।

হরিশ্চন্দ্র বলিতেন, 'আমার পূর্বপুরুষেরা প্রত্যেকেই একাধিক বিয়ে করেছিলেন। সুতরাং আমাদের বংশ লোপ পাবে না। তাছাড়া আমার জন্মের দশ বছর আগে আমার একটি ভাই হয়েছিল। সে প্রয়াগে কুম্ভমেলা দেখতে গিয়েছিল আমার মামার সঙ্গে। সেই মেলায় সে হারিয়ে যায়। তার কোন খবর আর পাওয়া যায় নি। সে হয়তো বেঁচে আছে এবং বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। সুতরাং আমার বংশের জন্য আমি চিন্তিত নই। তোমরাও ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। বিয়ে করা মানেই একটা সঙ্গীন বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। আমি ওর মধ্যে যেতে চাই না। তাছাড়া আমার বউ তো আছে। উপানন্দের মত বউ তোমাদের কারো নেই। ছেলেবেলা

থেকে রোজ ওর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হচ্ছে, তবু এখনও ছাড়াছাড়ি হয় নি। এখনও রোজ দুজনে দুজনকে না দেখে থাকতে পারি না। ও পণ্ডিত লোক, আমি মুখ্যু চাষা, তবু আমাদের প্রেম অটুট আছে। ওর কলকাতায় বাড়ি আছে। কিন্তু সেখানে ও কখনও গিয়ে থাকে না। সে বাড়িতে গ্রামের ছেলেরা থেকে পড়াশুনা করে। উপানন্দ আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। ও আমাব মত বিয়ে করে নি। আমার তবু একবার বিয়ে হয়েছিল, ওর একবারও হয় নি। ও বলে, আমি বিয়ে করতে পারি এমন মেয়ে জন্মায় নি। সুন্দরী আছে, বিদুষী আছে, গাইয়ে, বাজিয়ে আছে—ওদের স্টেজে ভাল লাগে, ওদের বউ করা যায় না। আমরা তাই দুজন দুজনকে নিয়ে আছি। ওরও প্রকাণ্ড গোঁফ, আমারও প্রকাণ্ড গোঁফ, তবু ও আমার বউ, আমি ওর বউ- --', বলিয়া হাসেন তিনি। খিত্ খিত্ করিয়া শব্দ হয়। রোমাবৃত স্তনযুগল আন্দোলিত হইতে থাকে।

হরিশ্চন্দ্র দেখিতে সুন্দর নহেন। রং কালো, বুকভরা লোম। হস্ত দুইটি কমনীয় নহে। খসখসে। আঙ্গুলগুলি মোটা এবং গাঁট গাঁট। ইহার কারণ তিনি মাঠে প্রত্যহ গিয়া চাষীদের সহিত কাজ করেন। মুখটা গোল এবং সগুম্ফ। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। পা দুটিও চাষাড়ে। বাড়িতে শুধু পায়ে থাকেন। মাঠে যখন কাজ করেন তখনও জুতা পরেন না। গ্রাম্য মুচি নির্মিত এক জোড়া মহিষের চামড়ার জুতা আছে, কোথাও যাইতে হইলে তাহাই পরিধান করেন। খদ্দরের জামাকাপড় ছাড়া আর কিছু পরেন না। গ্রামে তিনি অনেক চরকা বিতরণ করিয়াছেন এবং তাঁতও বসাইয়াছেন। গ্রামে ছোটখাটো একটা খদ্দরের ব্যবসা গড়িয়া উঠিয়াছে। শুধু তাঁত নয়, কয়েকটি ঘানিও বসাইয়াছেন তিনি গ্রামে। সরিষার তেল এবং রেড়ির তেল দুইই গ্রামে হয। বাহির হইতে আমদানী করিতে হয় কয়লা এবং কেরোসিন তেল।

আগেই বলিয়াছি হরিশ্চন্দ্র সুরূপ নহেন. কিন্তু তাঁহার চলনে বলনে. চোখের দৃষ্টিতে এমন একটা পৌরুষ এবং মহিমা আছে যে তাঁহাকে দেখিলেই মুগ্ধ হইতে হয়। মনে হয একটা সরল বলিষ্ঠ আভিজাত্য যেন তাঁহার সর্বাঙ্গ দিয়া বিকিরিত হইতেছে। ও অঞ্চলে তিনি একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। কেহই তাঁহার কথা অমান্য করে না। নিজের রাজত্বে তিনি মুকুটহীন রাজা।

তামাক খাওয়া শেষ করিয়া তিনি চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গুপী গুণ্ডা কি ফিরেছে?'

'আজ্ঞে না, এখনও ফেরে নি।'

'তুই আমাকে আর এক কলকে তামাক সেজে দিয়ে উপার বাড়িতে যা। দেখ সেখানে কোনও খবর এসেছে কিনা—'

'যে আজ্ঞে।'

গোপী পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

তামাকের সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত। হরিশ্চন্দ্র বাজার হইতে তামাকও কেনেন না। নিজেরই জমিতে ভাল তামাকের চাষ করেন। সেই তামাক পাতা হইতে গোপী তামাক প্রস্তুত করে। সে এ বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ লোক। নানারূপ সুগন্ধ মশলা মিশাইয়া যে তামাক সে তৈয়ারি করে তাহা অম্বুরি তামাককেও হার মানাইয়া দেয়। পাশের ঘরটি তামাকেরই ঘর। সেখানে অনেক হুঁকা, শটকা, গড়গড়া ছাড়াও নানা আকারের প্রায় পঁচিশ ত্রিশটি কল্‌কে আছে। প্রত্যেকটিতে তামাক সাজা আছে। কয়েকটিতে তাওয়া দেওয়া। হরিশ্চন্দ্র তাওয়া-দেওয়া

কল্‌কেতে তামাক খান। গোপী একটি তাওয়া-দেওয়া কলিকার টিকাগুলিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া উপানন্দবাবুর বাড়িতে চলিয়া গেল।

হরিশ্চন্দ্র চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া একবার আড়মোড়া ভাঙিলেন। তাহাব পর কয়েকবার উঠবোস করিয়া ডাক দিলেন, 'জঙ্গী, জঙ্গী—'

একটি দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ ভৃত্য দ্বারে দেখা দিল।

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'স্নান করব। জল তোল।'

পাশেই উঠানে বেশ বড় ইঁদারা। ইঁদারার পাশেই একটি বাঁধানো চৌতারা। হরিশ্চন্দ্র সেখানে গিয়া বসিলেন। জঙ্গী তাঁহার মাথায় জল তুলিয়া ঢালিতে লাগিল। দশ বালতি ঠাণ্ডা জল ঢালিবার পর হরিশ্চন্দ্র উঠিয়া পড়িলেন। জঙ্গী তাহার হাতে একটি খদ্দরের গামছা দিল। গা মুছিয়া তিনি একটি খদ্দরের লুঙ্গী পরিধান করিলেন। যখনই কোন কারণে তিনি চিন্তিত বা বিষণ্ণ হইয়া পড়েন তখনই তিনি বার কয়েক উঠবোস করিয়া ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া ফেলেন। ইহাতে তাঁহার মনের গ্লানি কাটিয়া যায়।

ভিতর হইতে আর একটি চাকর আসিয়া বলিয়া গেল, 'মা আপনাকে ডাকছেন—।' হরিশ্চন্দ্র মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। হরিশ্চন্দ্র শৈশব হইতেই মাতৃহারা। তাঁহার এক দূর সম্পর্কের মাসী তাঁহাকে মানুষ করিয়াছেন। সেই মাসীকেই তিনি 'মা' বলেন। বাড়িব ভিতর যাইবামাত্র মা বলিলেন, 'অসময়ে চান করলি কেন? এখন খাবি আয়।'

'গরম লাগছিল। চান করে বেশ ভাল লাগছে। উপা আসুক না একসঙ্গে খাব।'

'উপা বাঘ শিকাব করতে গেছে। কখন ফিরবে তার ঠিক কি। তুই খেয়ে নে।'

'তেমন ক্ষিধে পায় নি এখনও।'

'পাবে কি করে। ঘি-গরমমশলা দেওয়া ঘন বুটের ডাল দু বাটি খেয়ে ফেললে—'

'তা অনেকক্ষণ হজম হয়ে গেছে। আর এক বাটি দাও তো এখুনি খেয়ে ফেলতে পারি। চমৎকার হয়েছিল ডালটা। অনেক দিন এত ভাল বুটের ডাল তুমি রাঁধ নি।'

'হয়েছে, হয়েছে। পুঁইশাকের ঘণ্টটা তো ছোঁও নি। সেটা কি খারাপ রান্না হয়েছিল?'

'তুমি এত রকম তরকারি কর যে সব খাওয়া যায় না, আর জানই তো পুঁইশাক আমি তত ভালবাসি না।'

'বাড়িতে কতগুলি লোক খায় রোজ। বেশি তরকারি রাঁধতেই হয়। আর বাড়ির চারদিকে অত শাকসব্জির ক্ষেত করেছ। রাঁধতে আমার খুব ভাল লাগে। আজ নারকেল পাড়িয়েছি অনেকগুলো। নাড়ু বানিয়েছি। তাই খা এখন। চান করেছিস, কিছু না খেলে পিত্তি পড়বে। আয়—'

মাসীমা হাঁক দিলেন, 'নকু, খাবার ঘরে ঠাঁই করে দাও। হরুকে খেতে দেব—'

মাসী ভাণ্ডার ঘরের দিকে ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইয়া গেলেন। হরিশ্চন্দ্র একটু বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন।

মাসীর বয়স ষাটের কোঠায়। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় তিনি এখনও যেন তন্বী যুবতী। মাথার চুল একটিও পাকে নাই। মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা। মুখে জরার চিহ্ন নাই। ঠোঁটদুটি খুব পাতলা। মুখভাবে এমন একটা তীক্ষ্ণতা আছে, চোখের দৃষ্টি এমন গম্ভীর অথচ স্নেহময় যে সকলে তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করে। চাকর-বাকর আত্মীয়-স্বজন দরিদ্র-

আশ্রিত লইয়া হরিশ্চন্দ্রের পরিবারে পঞ্চাশজন লোক। সকলেরই প্রতি মাসীর সমদৃষ্টি। যদিও তাঁহাব তিন চারজন সাহায্যকারিণী আছে, কিন্তু বাড়ির সমস্ত রান্না তিনিই করেন। বাহির হইতে কিছু কেনা হয় না। জলখাবারও বাড়িতে প্রস্তুত হয় তাঁহার তত্ত্বাবধানে। চিঁড়ে মুড়ি, নানা রকম নাড়ু, ছাতু, আটা সব বাড়িতেই হয়। দুধের নানারকম খাবারও প্রায় প্রত্যহই হয়। এ জন্য একজন ভাল হালুইকর বহাল করিয়াছেন মাসীমা। বাড়িতে প্রচুর দুধ। হরিশ্চন্দ্র গাই মহিষ দুই-ই পুষিয়াছেন। প্রত্যহ পনেরো কুড়ি সের দুধ হয়। দুধ তিনি বিক্রয় করেন না। বাড়ির সকলেই প্রত্যহ একটু কবিযা দুধ খায়। বাকি দুধে ছানা, ক্ষীর, দই হয়। সন্দেশও হয় নানারকম। হরিশ্চন্দ্রের সংসাব লক্ষ্মীর সংসার। ঐ সংসারের গৃহকর্ত্রীও ওই মাসী, যাহাকে সকলে 'মা' বলিযা ডাকেন। হরিশ্চন্দ্রের মায়ের এক দূর সম্পর্কের খুড়তুতো বোন ইনি। বাল-বিধবা। তাঁহার বাবার মৃত্যুর পর হরিশ্চন্দ্রের মা তাঁহাকে নিজের কাছে লইয়া আসেন। কারণ শৈশবেই কনক নিজেই মাকেও হারাইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের মায়ের নাম ছিল স্বর্ণলতা, মাসীর নাম কনকলতা। খুব বন্ধুত্ব ছিল দুইজনের। স্বর্ণলতার বড় ছেলে কৃষ্ণচন্দ্র যখন কুম্ভ মেলায় হারাইয়া গেল তখন তিনি বড় কাতর হইয়া পড়েন। সেই সময় হরিশ্চন্দ্রের বাবা রামচন্দ্র কনককে এ বাড়িতে লইয়া আসেন। কনককে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার অভিভাবক কেহ ছিল না। হরিশ্চন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল ইহার দশ বৎসর পরে এবং তাঁহার কিছুদিন পরেই রামচন্দ্রেব মৃত্যু হইল। স্বর্ণলতাও বিধবা-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিলেন না, এক বৎসব পরে স্বামীব অনুগমন করিলেন। সেই সময় হইতেই কনকের ওপরই হরিশ্চন্দ্রেব সমস্ত ভাব। তাঁহাব কনক নাম সকলে ভুলিয়া গিয়াছে। এ সংসারে এখন তাঁহাব নাম 'মা'।

খাবার ঘরে গিয়া হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন একটি কাঁসার রেকাবিতে চাবটি বেশ বড় বড় সন্দেশ এবং গোটা দুই কলা রহিয়াছে।

'এ সময়েই তো রোজ খাস। না খেলে পিত্তি পড়বে। উপা শিকারে গেছে, কখন ফিরবে ঠিক নেই—'

হরিশ্চন্দ্র আর আপত্তি করিলেন না। মা রাগিয়া গেলে একেবারে চুপ করিয়া যান এবং উপবাস করিতে থাকেন। তাই সহজে কেহ তাঁহাকে রাগাইতে চায় না। মা খুব কম খান। একাহারিণী। সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইবার পর বেলা দুইটার সময় ভাতে ভাত, দুধ, কিছু ফল এং মিষ্টান্ন ভোজন করেন।

এই স্বল্পভাষিণী রোগা-পাতলা মহিলাটি হরিশ্চন্দ্রের বিশাল সংসারের প্রাণস্বরূপিণী। হরিশ্চন্দ্র খাইয়া বাহিরে আসিতেই রহমৎ আসিয়া সেলাম করিল। রহমৎ তাঁহার মুরগি এবং হাঁসের রক্ষক। মাইল দুই দূরে বিরাট যে পোলট্রি আছে রহমৎ তাহারই দেখাশোনা করে। কার্যত সে-ই পোলট্রির মালিক। প্রতি মাসে পোলট্রি হইতে যাহা আয় হয় তাহা সে হরিশ্চন্দ্রকে আনিয়া দেয় এবং হরিশ্চন্দ্র ঘোড়ায় চড়িয়া সেদিন পনের মাইল দূরবর্তী ব্যাংকে গিয়া জমা দিয়া আসেন। রহমৎ আয়ের এক-তৃতীয়াংশ পায়।

হরিশ্চন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, 'রহমৎ, তুমি এ সময় এলে কেন?'

'মা ডেকে পাঠিয়েছেন—'

মা খাবার ঘর হইতে বাহির হইলেন।

'হ্যাঁ, আমিই ওকে ডেকে পাঠিয়েছি। উপার যে বন্ধুটি কোলকাতা থেকে এসেছেন তার সঙ্গে বাঘ শিকার করবেন বলে, তিনি নাকি রোজ মাংস খান। আমাদের বাড়িতে তো মাংস হবার উপায় নেই। তাই রহমতকে বলছি ও কিছু মুর্গি রান্না করে নিয়ে আসুক। উপা আর তার বন্ধু খাবে। রহমৎ তো রান্নাও করতে পারে ভাল। বাড়িতে অতিথি এসে খাবে, সে যা খায় তার ব্যবস্থা করতে হবে—'

'শুনেছি সে মদ্যও খায়', হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'তার ব্যবস্থাও করবে না কি—'

'না। কিন্তু সে যে খাবার রোজ খায় তার ব্যবস্থা না করলে অন্যায় হবে। রহমৎ, তুই পারবি তো—'

'হ্যাঁ মা, পারব। দুটো ভাল ব্রয়লার রেঁধে আমি নিয়ে আসছি একটু পরে। বাবুরা খাবেন কখন?'

'তারা এখনও শিকার থেকে ফেরেন নি, দশটা নাগাদ হলেই হবে—'

মা সব বিষয়েই পুরাতনপন্থী। কিন্তু হাতে একটি রিস্টওয়াচ আছে। সেটি দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'এখন ছ'টা বেজেছে—'

রহমৎ বলিল, 'দশটার মধ্যে আমি দিয়ে যাব—'

রহমৎ সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'মা, দাবা খেলবে নাকি এক হাত—'

'না বাবা, এখন আমার সময় নেই। বাড়িতে অতিথি খাবেন। আমি এখন রান্নাঘরে যাব—'

'উপা না থাকলে আমার সন্ধেটা কাটতে চায় না। সেতার বাজাই একটু—'

মা আর একবার তাহার হাতঘড়ির দিকে চাহিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। দাবা খেলায় তিনি সুদক্ষা। হরিশ্চন্দ্র তাঁহারই কাছে দাবা খেলা শিখিয়াছেন এবং প্রায়ই তাঁহার কাছে হারিয়া যান।

বাহিরে গিয়া বৈঠকখানা ঘরে দেখিলেন গড়গড়ার উপর আর একটি কল্কে বসাইয়া গুপী অপেক্ষা করিতেছে। হরিশ্চন্দ্র চেয়ারে উপবেশন করিতেই গুপী গড়গড়ার নলটি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিল। হরিশ্চন্দ্র এক টান দিয়া প্রশ্ন করিলেন—'গুণ্ডা এখনও ফেরে নি?'

'না—'

গুণ্ডা তাঁহার একটি ঘোড়ার নাম। তাহার পিঠে একটি সহিসকে উপানন্দের খবর লইতে পাঠাইয়াছেন। উপা যে বনে শিকার করিতে গিয়াছে তাহা মুগমটর গ্রাম হইতে আট ক্রোশ দূরে। উপা এবং তাহার বন্ধু কাল বৈকালে মোটরে করিয়া সেখানে গিয়াছে। দিন তিনেক আগে একটি মহিষের বাচ্চাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। বাঘটি মহিষ শাবকটিকে মারিয়াছে। তাহার নিকটে একটি মাচা প্রস্তুত করা হইয়াছে। উপানন্দ এবং তাঁহার বন্ধু ডক্টর সোম কাল বৈকালে গিয়া সেই মাচায় আরোহণ করিয়াছেন। আজ তাঁহাদের ফিরিবার কথা। কিন্তু তাঁহারা ফেরেন নাই। হরিশ্চন্দ্র চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছেন। হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'জামুকে আর টহলকে ডাক—'

হরিশ্চন্দ্রের ছয়টি বড় বড় ঘোড়া আছে।

জামু আর টহল দুই জন সহিস।

তাহারা আসিতেই হুকুম দিলেন, 'তিনটি ঘোড়া কস্। আমি একটাতে যাব, আর তোরা দুজন আব দুটোতে যাবি। সঙ্গে গোটা দুই বোরা আর কিছু শক্ত দড়ি নিতে হবে। আমরা থাম্বা জঙ্গলে যাব, যেখানে উপাবাবু বাঘ শিকার করতে গেছেন। আমাদের মোষের গাড়িটাকেও রওনা করে দে এক্ষুনি। বিলটা কোথা? তাকে ডাক, তাতেও দু'একজন লোক চলুক। বীরু আর রাম চলুক। দুটো আলোও নে—হ্যাজাক।'

একটু পরেই হরিশ্চন্দ্র সদলবলে থাম্বা বনের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পরে থাম্বা জঙ্গলে পৌঁছিয়া দেখা গেল—বাঘ মারা পড়িয়াছে, কিন্তু মুশকিল হইয়াছে মোটরটাকে লইয়া। সেটাকে কিছুতেই স্টার্ট করা যাইতেছে না। উপানন্দের ড্রাইভার নানাভাবে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু মোটরটিকে স্টার্ট করিতে পারে নাই। অনেক সময় মোটরকে কিছুদূরে ঠেলিয়া লইয়া গেলে মোটর স্টার্ট লয়। অনেক ঠেলাঠেলি করিয়াও কিন্তু উপানন্দের মোটর স্টার্ট লইতেছে না। পাঁচ ক্রোশ দূরে একটি ভাল মোটব মেকানিক আছে। তাহার নিকট লোক পাঠান হইয়াছে, সে এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন মবা বাঘটার কাছে বসিয়া দুই বন্ধু সিগারেট ফুঁকিতেছেন। হরিশ্চন্দ্র নামিযাই বলিলেন, 'যন্ত্রের দাসত্ব করছ তো? তোমার মেকানিক তো সমরু? তার কাছে ঘোড়ায় কবে একজন চলে যাক, আব তাকে ঘোড়া পিঠে চড়িয়ে নিয়ে আসুক।'

উপানন্দ উদ্ভাসিত মুখে হরিশ্চন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কোনও কথা বলিলেন না।

ডক্টর সোম বললেন, 'আপনিও চলে এলেন?'

'এলাম, তার কারণ উপা আমাকে মনে মনে ডাকছিল। ওরে, হ্যাজাকদুটো জ্বেলে ফেল। তোমরা এতক্ষণ বসে বসে কি করছিলে?'

'কিছু পক্ষী শিকারও করেছি। দুটো ক্লরিকান এবং দশটা হরিয়াল পেয়েছি—'

হরিশ্চন্দ্র হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'ওহো, বড় ভুল হয়ে গেল একটা। তোমাদের জন্যে কিছু খাবার আনলে হত। তোমরা তো অনেকক্ষণ খাও নি—'

হরিশ্চন্দ্রের কথা শেষ হইতে না হইতে হরিশ্চন্দ্রের জুড়ি গাড়িটি প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে আসিয়া হাজির হইল।

কোচোয়ান গণোরি নামিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল, 'মা আপনাদের জন্য খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

দেখা গেল গাড়ির ভিতর আর একটি চাকর তিনটি বড় টিফিন কেরিয়ার এবং এক কলসী জল লইয়া বসিয়া আছে।

উপানন্দ বলিলেন, 'আর একটা মুশকিলে পড়া গেছে। বাঘটা বেশ বড়। ওটাকে কি করে নিয়ে যাওয়া যায়? দুটো গরুর গাড়ি ডাকিয়েছিলাম। বাঘ দেখেই গরুগুলো ভড়কে পালাচ্ছে।'

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'সে ব্যবস্থা আমি করেছি। আমার মোষের গাড়িটা আসছে। আমি সঙ্গে কিছু বোরা আর দড়িও এনেছি। বাঘটাকে বোরা দিয়ে ঢেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেল। বাঘের চেহারা দেখলে গরু মোষ ঘোড়া—সবাই ভড়কে যাবে। ওটাকে বোরার মধ্যে পুরে ফেল। ওর জন্যে চিন্তা নেই, এখন মা যা পাঠিয়েছেন তার সদ্ব্যবহার কর।'

একটু পরেই মেকানিক সমরু একটি জিপ গাড়ি করিয়া আসিয়া হাজির হইল

হরিশ্চন্দ্র ও উপানন্দকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'আমি যন্ত্রপাতি সব নিয়ে এসেছি। দেখি কি হয়েছে।'

খানিকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিল, 'কারেন্ট আসছে না। মনে হয় ডিস্ট্রিবিউটারে কোনও গণ্ডগোল হয়েছে। ঠিক করতে একটু সময় লাগবে। কতক্ষণ লাগবে তা না খুলে বলতে পারছি না। মোটরটা এখন আমার জিম্বায় রেখে যান। আমি আমার গাড়ি করে আপনাদের বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি। আপনার ড্রাইভার বেচু সিং এখানে থাক। গাড়ি ঠিক হয়ে গেলে সে নিয়ে যাবে।'

উপানন্দ বলিল, 'বাঘ যাবে কিসে? বাঘ না নিয়ে আমি যাব না।'

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'আমার মোষের গাড়িটা এখুনি এসে পড়বে। সেটার উপর বাঘটাকে চাপিয়ে আমরা রওনা হয়ে যাব। বাঘকে ওরা বোরায় প্যাক করে ফেলেছে।'

'এখানে আর কে থাকবে ড্রাইভার ছাড়া?'

প্রশ্ন করিলেন ডক্টর সোম।

'দুটো ঘোড়া আর মহিষ থাক। মোষের গাড়িতেও লোক আসবে কয়েকজন। ওই যে এসে গেছে মোষের গাড়ি।'

মা প্রচুর খাবার পাঠাইয়াছিলেন। তিনজনে মিলিয়া একটি টিফিন কেরিয়্যারও তাঁহারা শেষ করিতে পারেন নাই। অবশিষ্ট খাবারগুলি তাঁহারা চাকরদের মধ্যে বিতরণ করিলেন।

মহিষের গাড়িতে আরও কিছু বোরা এবং দড়ি ছিল। সেগুলি দিয়া বাঘটিকে আর একবার আবৃত করা হইল।

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, বাঘের গন্ধ পাইলেও মহিষ দুইটি চঞ্চল হইতে পাবে।

'তোরা মোষদুটোকে খুলে দূরে নিয়ে যা।'

মহিষ দুইটাকে দূরে লইয়া যাইবার পর বাঘের বস্তাটাকে গাড়ির উপর চাপানো হইল। দারোয়ান বস্তার উপর কয়েকটা গাছের ডালও চাপাইয়া দিল। সঙ্গে দা ছিল, বনে গাছেরও অভাব ছিল না। অনেকগুলি ডাল কাটিয়া বাঘটিকে ঢাকা দেওয়া হইল। তাহার পর মোষ দুইটিকে আনিয়া গাড়িতে জুড়িয়া দিয়া হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'তোরা এগিয়ে যা, আমরা পিছু পিছু আসছি। আমি ঘোড়ায় যাব। ওরা মোটরে আসুক—'

একটু পরেই জিপে চড়িয়া এবং মারা পাখিগুলিকে লইয়া উপানন্দ এবং তাঁহার বন্ধু ডক্টর সোম রওনা হইয়া গেলেন।

সবাই চলিয়া যাইবার পর হরিশ্চন্দ্র ঘোড়ায় চড়িয়া থাম্বা জঙ্গলের ওপারে হিংচা গ্রামের দিকে গেলেন। হিংচা গ্রামের মোড়ল সূর্য মণ্ডলকে ডাকিয়া বলিলেন, 'সূয্যি, তুমি কয়েকজন লোক নিয়ে জঙ্গলের ওপারে যাও। উপানন্দের মোটরটা খারাপ হয়ে গেছে। সমরু সেটা সারাচ্ছে। তোমার উপর মোটরটার ভার দিয়ে যাচ্ছি। তুমি সেখানে চলে যাও। মোটর সারানো হয়ে গেলে তুমি মোটরটা নিয়ে উপানন্দের বাড়িতে পৌঁছে দিও। তোমার উপর এই ভারটা দিয়ে গেলাম—'

সূর্য মণ্ডল বলিল, 'আমি এখুনি যাচ্ছি। বাঘটা বড় উপদ্রব করছিল। সেটাকে মেরে বাবু আমাদের অনেক উপকার করেছেন—'

'তোমার উপর ভার দিয়ে চললাম তাহলে—'

'আমি এখুনি যাচ্ছি।'

'কিছু ভাল ধানের বীজ আনিয়েছি। তুমি যদি চাও, দেব তোমাকে। কাল গিয়ে নিয়ে এস—'

'যে আজ্ঞে।'

সূর্য মণ্ডল প্রণত হইল।

হরিশ্চন্দ্র ঘোড়ার মুখ ফিরাইলেন।

একটা কথা বলিতে ভুলিযাছি। গল্পটার কাল ইংরেজ রাজত্বের শেষ ভাগে। হরিশ্চন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধু উপানন্দ দুইজনেই বড় জমিদার। তাঁহাদের জমিদারি পাশাপাশি। ইংরেজ আমলে অনেক অত্যাচারী জমিদার এদেশে ছিলেন। কিন্তু এই গল্পে যাঁহাদের কথা বলিতেছি তাঁহারা ছিলেন ব্যতিক্রম। প্রজাদের হিতৈষী বন্ধু। জমিদারদের যেমন কাছারি নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি থাকিত ইহাদেরও সে সব ছিল। তাঁহারা খাজনা আদায় করিতেন, হিসাবপত্র রাখিতেন, গভর্ণমেণ্টের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেন, কিন্তু প্রজাদের মঙ্গলামঙ্গলের উপর তাঁহাদেব কোন হাত ছিল না। সে ভার ছিল হরিশ্চন্দ্র এবং উপানন্দের উপর। উপানন্দ নির্ভর করিত হরিশ্চন্দ্রের উপর। হরিশ্চন্দ্র প্রকৃতপক্ষে দুইটি জমিদারিরই মালিক ছিলেন। তিনি যাহা করিতেন তাহাই হইত। হরিশ্চন্দ্র নিজে সব করিতেন না। দুইটি জমিদারিতে একশতটি গ্রাম ছিল এবং প্রত্যেক গ্রামের স্বনির্বাচিত মোড়ল ছিল একজন। সেই মোড়লই গ্রামেব ছোটখাটো বিবাদ-বিসম্বাদেব বিচার করিতেন। গ্রামের মঙ্গল অমঙ্গলেব চিন্তাও তাঁহাকে করিতে হইত, প্রয়োজন বুঝিলে তিনি হরিশ্চন্দ্রের সহিত যোগাযোগ করিয়া সমস্যার সমাধান করিতেন। বছরে একবার কখিয়া একশত গ্রামের একশত মোড়লের সভা হইত মুগমটর গ্রামে। সভাটির নাম শতরঞ্জি। এই সভায় যে কোনও প্রজার যোগদান করিবার অধিকার থাকিত। এই সভাতেই গ্রামগুলির বিবিধ সমস্যা লইয়া আলোচনা করিতেন হরিশ্চন্দ্র প্রত্যহ সকালবেলায়। বৈকালে খেলাধুলা কুস্তি প্রভৃতি হইত। সন্ধ্যার পর হইত নাচ গান। সাতদিন ধরিয়া দীয়তাং ভূজ্যতাং চলিত। বহু লোক খাইত, বহু তাঁবু পড়িত। বহু হালুইকর ও রাঁধুনীরা আসিত। অনেক খড়ের ছোট ছোট গৃহ প্রস্তুত হইত গণ্যমান্য অতিথিদের জন্য। হাজার লোক বসিয়া যাত্রা বা নাচ গান উপভোগ করিতে পারে এরূপ প্রকাণ্ড একটি স্থানকে তিরপল দিয়া এবং বাঁশ দিয়া ঢাকা দেওয়া হইত। চারিদিক বাঁশ পুঁতিয়া মোটা কানাতে দিয়া আবৃত করা হইত। বহু ঝাড় লণ্ঠনে মোমবাতি জ্বলিত। উপানন্দের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটির বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র ইলেকট্রিসিটি জ্বালিতে দিতেন না। তাঁহার মতে, মৃদু স্নিগ্ধ আলোতেই নৃত্যগীত ভাল জমে। উগ্র আলো শিল্পের স্বপ্নকে নষ্ট করিয়া দেয়। অক্ষয় তৃতীয়া হইতে সাতদিন পর্যন্ত শতরঞ্জি হইত। গ্রামের লোকেরাই ছয়দিন নিজেরাই যাত্রা কথকতা গান বাজনা আবৃত্তি প্রভৃতি করিত। সপ্তম দিনে বাহির হইতে একজন প্রসিদ্ধ গায়ক বা গায়িকা আসিয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিতেন। হরিশ্চন্দ্র তাঁহাদের প্রাপ্য প্রণামী দিতেন এবং উপানন্দ দিতেন কোন বিশেষ উপহার। কখনও

দামী আংটি, কখনও শাল, কখনও বা আরও কিছু। আর প্রত্যেককে একটি মূল্যবান সেতার, এস্রাজ বা তানপুরাও দেওয়া হইত।

হরিশ্চন্দ্র ঘোড়া করিয়া কিছুদূর গিয়া দেখিলেন, জিপ গাড়িটি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কাছে গিয়া দেখিলেন, মোটবের একটি টায়ার ফাটিয়াছে, টায়ারটি বদলানো হইতেছে।

হরিশ্চন্দ্র দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

'কতক্ষণ দেরি হবে?'

'আধঘণ্টার মধ্যেই হয়ে যাবে।'

'বগীটা কি ফিরে গেছে?'

'বোধহয় ফেরে নি। আমরা অন্তত দেখি নি সেটাকে।'

'আমিও তো দেখলাম না সেটাকে আসবার সময়। গণোরি তাহলে নিশ্চয় তাড়িখানায় গেছে। ফিরবে এখুনি, এই রাস্তা দিয়েই যাবে। তোমাদের গাড়ি যদি ঠিক না হয়– ওই যে গণোরি আসছে।'

হরিশ্চন্দ্র ঠিকই অনুমান করিয়াছিলেন। গণোরি এবং সহিস উভয়েই তাড়ি পান করিয়াছে।

হরিশ্চন্দ্র সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না করিয়া বলিলেন, 'তোরা এখানেই থাক। মোটব যদি ঠিক না হয় তা বাবুকে নিয়েই তুই আয়। আমি এগোচ্ছি।'

হরিশ্চন্দ্র ঘোড়া ছুটাইয়া আগাইয়া গেলেন।

তিনি হয়তো মোটর ঠিক না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেন, কিন্তু তাঁহার মনে একটি আশঙ্কা জাগিতেছিল, আসিবার সময় তিনি মাকে বলিয়া আসেন নাই। মা হয়তো মনে মনে রাগ করিয়া বসিয়া আছেন। রাগ করিলে তিনি বকেন না, চেঁচামেচি করেন না, উপবাস করিতে আরম্ভ করেন। বেশী রাগ হইলে এক নাগাড়ে দুই-তিনদিন পর্যন্ত তাঁহাকে উপবাস করিতে দেখিয়াছেন হরিশ্চন্দ্র। তিনি মাকে বলিয়া আসেন নাই, তাহার কারণ, মা তাঁহাকে আসিতে দিতেন না। অথচ উপানন্দের জন্য তাহার মনটা ছটফট করিতেছিল। তাই মাকে না বলিযাই তিনি চলিয়া আসিয়াছিলেন। মা কিন্তু ব্যাপারটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জানিতে পারিয়াছেন এবং গাড়ি করিয়া খাবার পাঠাইয়াছেন। তিনি মনে মনে চটিয়াছেন কি?

হরিশ্চন্দ্র বাড়ি পৌঁছাইয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া অন্দরমহলে গেলেন।

'মা।'

ভাঁড়ার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন কনকলতা।

'কি, বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল? কোথা সে?'

'আসছে এখুনি। তার মোটর খারাপ হয়েছে।'

'সে আসবে কিসে?'

'চল, সব বলছি।'

হরিশ্চন্দ্র নিশ্চিন্ত হইলেন। কণ্ঠস্বরে রাগের উত্তাপ নাই।

।। দুই ।।

পরদিন সকালেই আহ্নিক করিয়া হরিশ্চন্দ্র মাঠে বাহির হইয়া গেলেন। মাঠে চাষীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাজ না করিলে হরিশ্চন্দ্রের ভাল লাগে না। উপানন্দ তাঁহার বাঘের চামড়া ছাড়ানো লইয়া ব্যস্ত রহিলেন। কয়েকজন মুচির সাহায্যে চামড়াটি ছাড়াইয়া, তাহার ভিতর নুন মাখাইয়া সব আজই কলিকাতা পাঠাইতে হইবে। সেখান হইতে সেটিকে পাঠানো হইবে কানপুরে। ডক্টর সোমকে লইয়াও উপানন্দ প্রায় সমস্ত দিনই ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি একজন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী। অচেনা-অজানা গাছের সন্ধানে তিনি নানা বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ান। অচেনা, অজানা গাছ দেখিলে তিনি তাহার রঙীন ফোটো তোলেন। তাহাদের ফুল ফল সংগ্রহ কবিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার ধারণা, আমাদের দেশের বনে-জঙ্গলে এখনও এমন গাছ আছে যাহাদের পরিচয় এখনও অনাবিষ্কৃত। তাহাদের আবিষ্কার করিবার জন্য তিনি সারা ভারত ভ্রমণ করেন এবং এজন্য প্রচুর অর্থও ব্যয় করেন। উপানন্দের কাছে আগেও আসিয়াছেন কয়েকবার। উপানন্দ তাঁর সহপাঠী। আর একটি আকর্ষণ, উপানন্দ একজন ভাল ফোটোগ্রাফার। তাহার বাড়িতে রঙীন ছবি প্রিণ্ট করিবার একটি চমৎকার 'ডার্করুম' তো আছেই, এনলার্জ করিবার অত্যাধুনিক ব্যবস্থাও আছে।

উপানন্দ বাঘের চামড়াটাকে দুইজন লোকের সঙ্গে কলিকাতায় একজন ট্যাক্সি-ডাবমিটের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি চামড়াটি লইয়া কানপুরে পাঠাইয়া দিবেন। লোক দুইজন চামড়াটি লইয়া স্টেশনের দিকে চলিয়া গেল। মুগমটর রেলওয়ে স্টেশন কয়েক মাইল দূরে।

উপানন্দ আসিয়া ডার্করুমের দরজায় টোকা দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিলেন ডঃ সোম।

'আমার কাজ হয়ে গেছে। চামড়াটা পাঠিয়ে দিলে?'

'হ্যাঁ। চল, এবার হরিশ্চন্দ্রের বাড়ি যাই। সে এতক্ষণ মাঠ থেকে ফিরে এসেছে। আমরা গেলে তবে খাবে।'

'তোমার এ বন্ধুটি একটু ছিটগ্রস্ত বলে মনে হয়।'

'একটু নয়, বেশ ছিটগ্রস্ত। ওই ছিটের জন্যই আমি ওকে ভালবাসি। ওর চরিত্রে এমন একটি রং আছে, যা দুর্লভ। সে রং সবাই দেখতে পায় না।'

'কি রকম?'

'কোন জমিদারকে কি তুমি মজুরদের সঙ্গে কাজ করতে দেখেছ?'

'ওইটেই তো মাথা খারাপের লক্ষণ।'

'আমার কিন্তু মনে হয়, ওটা মহাপুরুষের লক্ষণ। ওর সঙ্গে আলাপ করলে বুঝতে পারবে, ও আলাদা জাতের লোক। ওর ওখানে তো আজ নিমন্ত্রণ আছে আমাদের।'

'অসাধারণ লোককে আমি ভয় করি ভাই। নিমন্ত্রণ করেছেন যখন অবশ্যই যেতে হবে।'

উপানন্দ হঠাৎ ইংরেজিতে বলিলেন, 'He is a wonderful man. ও ইচ্ছে করলে আমাদের মত বড় বড় ডিগ্রী আনতে পারত, কিন্তু ও গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করবার পর পড়া ছেড়ে দিলে। বললে, এর বেশী বিদ্যের আমার দরকার নেই।'

'কোন্ ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেছে?'

'ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে পনেরো টাকা স্কলারশিপ পেয়েছিল, কিন্তু তারপর আর পড়লে না। বললে, গ্রাম ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। ওর চিন্তাধারা আমাদের মত নয়। ও তাদের সঙ্গেই মেশে যাদের আমরা ছোটলোক বলি। ও বলে, আমাদের ভারতবর্ষ ওদের মধ্যেই বেঁচে আছে। ওর মতে, আমরা সে ভারতবর্ষকে ক্রমশ ইংলণ্ড বা আমেরিকা করবার চেষ্টা করছি। আমাদের জমিদারিতে সবরকম পূজাপার্বণ ধুমধাম করে হয়, এমন কি শীতলা পূজা পর্যন্ত। পাড়ায়-পাড়ায় কুস্তির আখড়া করেছে ও। ফুটবল ক্রিকেট খেলার চেয়ে কপাটি খেলা, ধাপসা খেলায় ওর বেশী উৎসাহ। আমাদের জমিদারিতে অনেক 'কপাটি টিম' আছে। তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। ও প্রকাণ্ড একটা শিল্ড (shield) দিয়েছে, তার জন্যে—'

'আমাদের জমিদারি ও-ই দেখে, আমি খালি খরচ করি, আর কিছু করি না।'

এমন সময় অশ্বক্ষুর-ধ্বনি শোনা গেল। ঢং-ঢং শব্দে গাড়ির ঘণ্টাটা বাজিয়া উঠিল। সহিসের চীৎকার শোনা গেল, 'সাম্‌ হালকে।'

'ওই হরিশ্চন্দ্রের গাড়ি এসে গেল।'

একটু পরেই সহিস টহল আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।' 'বাবু, গাড়ি পাঠিয়েছেন।'

'আচ্ছা।'

টহল পুনরায় সেলাম করিয়া বাহির হইয়া গেল।

উপানন্দ ডক্টর সোমকে বলিলেন, 'জামাকাপড় বদলাতে চাও তো বদলে নাও। আমরা না যাওয়া পর্যন্ত ও যাবে না।'

একটু পরেই তাঁহারা দুইজন হরিশ্চন্দ্রের বাড়ির উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন।

হরিশ্চন্দ্র খালি গায়ে খালি পায়ে বাহিরেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। স্কন্ধে শুভ্র উপবীত, পরিধানে খদ্দরের ধুতি। তিনি দুই হাত বাড়াইয়া ডক্টর সোমকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন।

'এখন আপনি স্নান করেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, মাঠ থেকে ফিরে স্নান করি এই সময়। আসুন, ভেতরে বসা যাক।'

'আমি উপানন্দের বন্ধু, আমাকে আপনি বলছেন কেন, তুমি বলুন।'

'ঘনিষ্ঠতা বাড়ুক, তুই বলব।' হরিশ্চন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন। খিত্‌-খিত্‌ করিয়া শব্দ হইল।

ডক্টর সোম বলিলেন, 'আমি অতক্ষণ অপেক্ষা করব না, এখন থেকেই আরম্ভ করব। চল, ভেতরে চল।'

এবার সজোরে হাসিয়া ফেলিলেন হরিশ্চন্দ্র এবং বলিলেন, 'তোর ডাক নাম কি?'

'ডাক নাম ভুতু। ভাল নাম নয়নানন্দ।

'ওরে বাপরে! আমি ভুতু বলেই ডাকব।'

সকলকে লইয়া হরিশ্চন্দ্র তাঁহার বিরাট বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন। ডক্টর সোম দেখিলেন, আধুনিক ধরনের সৌখিন ড্রয়িংরুম নয়। এক ধারে দুইটি বড় বড় চৌকি রহিয়াছে, আর এক পাশে বেঞ্চিও আছে গোটা দুই। আর আছে বলিষ্ঠ আকৃতির কয়েকটা চেয়ার। চেয়ারে ছোট-ছোট গদি। গদি খদ্দরের। টেবিলও আছে গোটা দুই। টেবিলের উপর রহিয়াছে

সিগারেট, সিগার, একটি দেশলাই বাক্স এবং একটি বড় অ্যাশট্রে। সবগুলিই রহিয়াছে একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে সাজানো। আর একটি প্রকাণ্ড গড়গড়া নিঃশব্দে সুগন্ধ বিতরণ করিতেছিল।

'এস, বসা যাক সকলে।'

সকলে গিয়া ভিতরে বসিলেন। নকু চাকর আসিয়া প্রণাম করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, 'চা আনব না কফি—'

'কফিই আন', উপানন্দ বলিলেন।

একটু পরেই কফির সরঞ্জাম লইয়া নকু ও হীরু প্রবেশ করিল। তাহার পিছু পিছু আসিল আর একটি চাকর, মহেন্দ্র। তাহার হাতে একটি শ্বেতপাথরের গ্লাস। সেটি সে হরিশ্চন্দ্রের হাতে দিল।

ডক্টর সোম বলিলেন, 'ওটা আবার কি? তুমি কফি খাবে না?'

'এটা গুড়ের শরবৎ। আমি চা বা কফি খাই না।'

'গুড়ের শরবৎ কেন, চিনিও খাও না?'

'না। চিনি এখনও আমরা তৈরি করতে পারি নি। একটা দেশী চিনিব কারখানা বসাবাব চেষ্টায আছি। এখনও কিন্তু পেরে উঠি নি। তবে চিনিকে একেবারে বযকট করতে পারি নি। আমার মা নানারকম মিষ্টান্ন তৈরি করেন, তার জন্য চিনি কিনতে হয়। আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব চা-কফি খান, তাঁদের জন্যও চিনি কিনতে হয়। আমি কিন্তু গুড়টাই বেশী পছন্দ করি। নিজের জমিতে আখ হয়, তার থেকেই গুড় তৈরি করি। ওটা ঘরেব জিনিস, তাই ওব প্রতি আমার বেশী পক্ষপাতিত্ব। তোমরা কফি খাও, আমি এটা খেয়ে ফেলি।'

এক নিঃশ্বাসে তিনি শরবৎটা শেষ করিয়া ফেলিলেন। মহেন্দ্র গ্লাসটি লইয়া গেল। হরিশ্চন্দ্র গড়গড়ার নল তুলিয়া একটি টান দিলেন।

ডক্টর সোম কফির কাপে একটা চুমুক দিয়া বলিলেন, 'তাহলে খুব মানাতো যদি ওটা তুমি মাটির গ্লাসে খেতে।'

'ঠিকই বলেছ। আগে তাই খেতাম। মা গত বছর গয়া থেকে কিনে এনেছেন ওটা। উপহার দিয়েছেন আমার জন্মদিনে। ওটাও হোম-মেড বলতে পার। সমস্ত ভারতবর্ষকেই আমি আমার 'হোম' মনে করি। খাগড়ার কাঁসার বাসন, মালদহ-মুর্শিদাবাদের রেশমের কাপড়, বেনারসের বেনারসী কাপড় আমি বর্জন করি নি। আমার কোন শুচিবাই নেই। আমি স্বদেশীশিল্পের উৎসাহদাতা।'

উপানন্দ এতক্ষণ কোনও কথা বলেন নাই। এইবার বলিলেন, 'আমরা তাই নাম দিয়েছি স্বদেশী বাবা।'

হরিশ্চন্দ্র কোন উত্তর দিলেন না। চোখ দুইটি বড় বড় করিয়া গড়গড়ায় টান দিতে লাগিলেন। একটু পরেই তিনটি পাখা আসিয়া উহাদের পিছনে দাঁড়াইয়া হাওয়া করিতে লাগিল। তাহার পর আরও কয়েকটি চাকর ঘরে কয়েকটি লণ্ঠনও দিয়া গেল।

ডক্টর সোম বলিলেন, 'তুমি এ যুগে ইলেক্‌ট্রিসিটি বর্জন করেছ এটা বড় আশ্চর্য। উপানন্দের বাড়িতে আছে অথচ তোমার বাড়িতে নেই এটাও কম আশ্চর্য নয়। উপানন্দের বাড়ি থেকেই অনায়াসে তুমি কনেক্‌শন নিতে পার।'

উপানন্দ মুচকি হাসিয়া বলিলেন, 'ও ইলেক্‌ট্রিসিটি চায় না, স্বাধীনতা চায়।'

'তার মানে?'

এইবার উত্তর দিলেন হরিশ্চন্দ্র। 'তার মানে ইলেক্‌ট্রিসিটি নিলে এমন একটি যন্ত্রের অধীনে থাকতে হবে, যার সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না, যার যন্ত্রপাতি এদেশে পাওয়া যায় না, যার মিস্ত্রি এদেশে দুর্লভ। সুতরাং ও বাতি মাঝে মাঝে নিভবে। ও পাখা মাঝে মাঝে থেমে যাবে। তখন তোমাকে খোসামোদ করতে হবে ওই মিস্ত্রিদের, ছোটাছুটি করতে হবে সেই সব জিনিসের জন্য, যা এখানে পাওয়া যায় না। উপানন্দের আলো বার বার নিভছে। ওকেও এক সেট লণ্ঠন রাখতে হয়েছে। যন্ত্রের অধীন হলে দুর্গতি অনিবার্য।'

ডক্টর সোম বলিলেন, 'তোমার লণ্ঠনও একটা যন্ত্র।'

'লণ্ঠন প্রদীপ ঢিবরি—সবাই যন্ত্র। কিন্তু ও যন্ত্র খারাপ হলে আমরা ঠিক করতে পারি। ওসব যন্ত্র সস্তাও, বেশী খারাপ হলে ফেলে দিয়ে আর একটি কিনতে পারি। কিন্তু ইলেক্‌ট্রিক জেনারেটার খারাপ হলেই মুস্কিল। কাল তোমাদের মোটর নিয়ে কি দুর্গতি হয়েছিল ভেবে দেখ। তোমার মোটর ঠিক হয়েছে?'

'না। বলছে ডায়ানামাটা খারাপ হয়েছে।'

'ও এখন অনেক ভোগাবে। যন্ত্রের অধীন মানেই যন্ত্রণা।'

ডক্টর সোম বলিলেন, 'আধুনিক যুগটাই তো যন্ত্রের যুগ। যন্ত্রকে বাদ দিয়ে কি চলতে পার তুমি?'

'আমি চেষ্টা করি যতদূর সম্ভব বাদ দিয়ে চলতে। ঘোড়ার গাড়ি, ঘোড়া নিজের আয়ত্তের মধ্যে থাকে, কিন্তু মোটর রাখতে হলেই একটি মেকানিকের কবলে পড়ে গেলে তুমি। সে লোকটি যদি ভাল হয় তো ভাল, কিন্তু সে যদি অসৎ হয় তো তোমাকে ভোগাবে।'

'তোমার কোচোয়ান, সহিস কি সব সৎ?'

'অসৎ হলে তাদের দূর করে দি, তার বদলে আর একটা সহজে পাওয়া যায়। যন্ত্রের আর একটা কি দোষ জানো? যন্ত্র আমাদের পঙ্গু করে দেয়। ইলেক্‌ট্রিক লাইটের জোর আলোতে অভ্যস্ত হয়ে আমরা কম আলোয় আর দেখতে পাই না। আমাদের দেশে আগে আমাদের দিন আরম্ভ হত সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। আমরা সূর্যালোকেই সব কাজ করতাম। সন্ধ্যার পর ছিল বিশ্রামের সময়। তখন আমরা গল্প-গুজব করতাম, গান-বাজনা করতাম, তারপর সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়তাম। উঠতাম ব্রাহ্মমুহূর্তে। উঠে স্নান করতাম, পূজা করতাম। তারপর ভোর হতে না হতেই নিজের নিজের কাজে লেগে পড়তাম। অনেক বয়স পর্যন্ত চোখের দৃষ্টি ঠিক থাকত। ইলেকট্রিক আলো আমাদের চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। আজকাল ওই প্রখর আলো জ্বেলে দিন-রাত কাজ করছে সবাই। এত কাজ করে কি হবে? কতকগুলো মালটিমিলিয়নিয়ার আরও বড়লোক হবে।'

ডক্টর সোম বলিলেন, 'হোক না তাতে ক্ষতি কি?'

'ক্ষতি শেষ পর্যন্ত অ্যাটম বম। এই যন্ত্রসভ্যতাই আমাদের ধ্বংস করবে শেষ পর্যন্ত। মনুষ্যজাতি দেহে-মনে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। আমরা স্বাধীন নই, সব দিক থেকে পরাধীন। আমরা হাঁটতে পারি না, চোখে দেখতে পাই না, খেয়ে হজম করতে পারি না, জোরে কথা পর্যন্ত বলতে পারি না, মাইক চাই। আমাদের পূর্বপুরুষরা শক্তিমান পুরুষসিংহ ছিলেন। স্বাধীন

ছিলেন। বীর ছিলেন। তোমরা কাল যে বাঘটা মারলে এতে বীরত্ব কোথায়? লুকিয়ে দূর থেকে বন্দুক ছোঁড়ার মধ্যে বীরত্ব নেই। আমাদের পূর্বপুরুষরা লাঠি দিয়ে ঠেঙিয়ে বাঘ মারতেন। অনেকে বাঘের সঙ্গে হাতাহাতি সম্মুখসমর করে জয়ী হতেন। তোমাদের শিকার-কৌশল আছে, বীরত্ব নেই। কৌশলের জোরে আমরা নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে অনেক পশুপক্ষীকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। এবার মানুষকে নিশ্চিহ্ন করবার যন্ত্রও বেরিয়েছে। ভবিষ্যতে কি যে হবে কিছু বলা যায় না। গোটা কয়েক পাগলা প্লেনে করে উড়ে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করে দেবে হয়তো!'

হরিশ্চন্দ্র চোখ বড় বড় করিয়া গড়গড়ায় টান দিতে লাগিলেন।

উপানন্দ এতক্ষণ একটি কথাও বলে নাই, হাসিমুখে হরিশ্চন্দ্রের দিকে চাহিয়াছিলেন। এইবার বলিলেন, 'আমার মতে, সুতরাং যতক্ষণ বেঁচে আছি জীবনটাকে ভালভাবে ভোগ করে নি।'

ডক্টর সোম বলিলেন, 'আমারও তাই মত। যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ।'

হরিশ্চন্দ্র গড়গড়ায় ভড়াক-ভড়াক করিয়া টান দিলেন, তারপর প্রচুর ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, 'আমরা তাছাড়া আর করছি কি? সবাই তো জীবনকেই উপভোগ করছি। কিন্তু ওরই মধ্যে রুচির তারতম্য আছে। গরু ঘাস খেয়ে জীবন উপভোগ করে, বাঘ কিন্তু জীবন উপভোগ করে ওই গরুর ঘাড় মট্‌কে তার রক্ত পান করে, শিকারীর আনন্দলাভ ওই বাঘকে গুলি দিয়ে মেরে, তার চামড়া দিয়ে নিজের বৈঠকখানা সাজিয়ে। গরু বা বাঘ যা করে, তা না করে তার উপায় নেই। মানুষ বুদ্ধিমান স্বাধীন জীব, সে বহু কোটি বৎসর স্বৈরাচার চালিয়ে বুঝেছে যে, স্বৈরাচারে সুখ নেই। বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ তাই ধর্ম বিবেক নিঃস্বার্থপরতা স্বাবলম্বীতা প্রভৃতি গুণকে ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তুলেছে তার চরিত্রে এবং ফুটিয়ে তুলে সুখ পেয়েছে। সুখই আমাদের কাম্য। মানুষ এটা বুঝেছে যে, সুখের জন্য স্বাধীনতা অবশ্যই চাই, কিন্তু সে স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ হলে চলবে না, সে স্বাধীনতাকে সংযমের অঙ্কুশ দিয়ে শাসন করতে হবে। যন্ত্রযুগে নিজের বুদ্ধির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার আস্বাদ পেয়ে মানুষ কিন্তু অসংযত হচ্ছে ক্রমশ। তার মধ্যে পশুভাব বেড়ে যাচ্ছে এবং সেইটেই ভয়ের কথা। জীবনকে ভোগ কর কিন্তু কতকগুলো যন্ত্রের অধীন হয়ে শরীর মনকে পঙ্গু করে অসংযত ভোগের পক্ষপাতী আমি নই।'

ডক্টর সোম বলিলেন, 'তাহলে তুমি কি চাও বিজ্ঞানের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যাক?'

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'বিজ্ঞানের অগ্রগতি যদি মনুষ্যত্বের অগ্রগতিকে রোধ করে, তাহলে সে বিজ্ঞান নিয়ে আমরা কি করব? মরব?'

'মৃত্যু যদি অনিবার্য হয় মরতেই হবে।'

'অনিবার্য মানে?'

'বিজ্ঞানের অগ্রগতি বন্ধ করবে কি করে? যে মানুষ এককালে গরুরগাড়ি বানিয়েছিল, সেই মানুষই এখন রকেট চালিয়ে মহাকাশে যাচ্ছে। তার বুদ্ধি, তার প্রতিভা শেষ পর্যন্ত তাকে কোথায় নিয়ে যাবে তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। একটা কথা কিন্তু সুনিশ্চিত, মানুষ থামবে না, তার কৌতূহল কমবে না, বাড়বে।'

উপানন্দ বলিলেন, 'সে ও জানে। ওর বক্তব্য হচ্ছে, যতদিন সম্ভব ও নিজের চাষের তামাক নিজের গড়গড়ায় নিজের মনের মত করে খাবে।'

ডক্টব সোম হো-হো কবিযা হাসিযা উঠিলেন।

হবিশ্চন্দ্রও খিত্-খিত্ কবিযা হাসিযা উঠিলেন।

'উপা ঠিকই বলেছে। পৃথিবীব সব মানুষকে নিযন্ত্রিত কববাব সাধ্য আমাব নেই। আমি কেবল আমাব জীবন আমাব পছন্দ অনুযাযী নিযন্ত্রিত কবতে চাই। আমি এটা বুঝেছি, যন্ত্রেব অধীন হলে সুখ বাড়ে না, কমে। যত স্বাবলম্বী হতে পাবা যায তত সুখী হবো, এই হচ্ছে আমাব অভিজ্ঞতা। আমি মোটবে চড়ে ডাযনামাব এবং মিস্ত্রিব পাল্লায পড়ে ঘণ্টাব পব ঘণ্টা বাস্তায বসে থাকতে চাই না। হাঁটতে যদি পাবি, সবচেযে ভাল, না পাবি, ঘোড়া বা পালকি চড়ব।'

এমন সময ভিতব হইতে একটি চাকব একটি ট্রে-তে সাজাইযা তিনটি বেকাবিতে সন্দেশ এবং আবও তিনটি বেকাবিতে কাজু বাদাম লইযা প্রবেশ কবিল।

ডক্টব সোম বলিযা উঠিলেন, 'আবাব খাবাব কেন?'

চাকবটিব পিছনে পিছনে মা নিজে আসিযাছিলেন, তিনি বলিলেন, 'খেতে একটু বাত হবে বাবা। তোমবা এখন কিছু খেযে নাও, তাবপব গানেব আসবে বসো। বেশী কিছু দিই নি তো।'

মা আবাব ভিতব বাড়িতে চলিযা গেলেন।

'মাযেব আদেশ অমান্য কবা যাবে না। খাও।'

কাজু খাইযা ডক্টব সোম পুলকিত হইলেন।

'বাঃ। এমন চমৎকাব কাজু এখানে পেযেছ?'

'আমাব জমিতে হয। আমি পাবতপক্ষে বাইবেব জিনিস খাই না।

উপানন্দ মন্তব্য কবিলেন, 'ও দাকণ স্বাধীন এবং নিদাকণ স্বাবলম্বী এবং সুখী

তাঁহাব চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত হইযা উঠিল। হাসিভবা দৃষ্টিতে তিনি হবিশ্চন্দ্রেব দিকে তাকাইলেন। হবিশ্চন্দ্রেব চোখ দুইটিও হাস্যদীপ্ত হইযা উঠিল। তিনি বলিলেন, 'আব তোমাব বন্ধুটি হচ্ছে সম্পূর্ণ পবনির্ভবশীল কুঁড়েব বাদশা।'

উপানন্দ বলিলেন, 'না, সবটা বলা হল না।'

'এ ছাড়া আবাব কি?'

'বল, এবং সুখী। তুমি যখন খুব ভোবে উঠে স্নান কব, আমি তখন ঘুমোই, তুমি যখন মাঠে চাষীদেব সঙ্গে কাজ কব, আমি তখন সেতাব বা বেহালা বাজাই, তুমি যখন জমিতে পচা সাব দিতে ব্যস্ত, তখন আমি গোঁফে আতব লাগিযে ববীন্দ্রনাথেব কাব্য পড়ি। আমাব জমিদাবিব সমস্ত ঝঞ্ঝাট তুমি যখন সামলাও, আমি তখন ছবি আঁকি, না হয বেডিওতে গান শুনি। আমি ঠিক তোমাব উল্টো, কিন্তু আমিও সুখী।'

'আমি যখন থাকব না, তখন মজাটা বুঝতে পাববে।'

'তখন আব কেউ জুটে যাবে। স্বাবলম্বী হলে সুখী হওযা যায, পবনির্ভবশীল হলেও যায। শিশুবা মাযেব উপব নির্ভবশীল। তাবা কি অসুখী? তাবা বিষয চিন্তা কবে না, কেবল আনন্দেব খোঁজে থাকে।'

ঠিক এই সমযে বাহিবে মাদলেব শব্দ পাওযা গেল।

'সনাতন এসে গেছে।'

সনাতন একজন সাঁওতাল মাঝি। হরিশ্চন্দ্রের প্রজা। ভাল মাদল বাজাইতে পারে।

'এস সনাতন। ওরাও এসেছে তো?

'আজ্ঞা হাঁ। শুকরি, শিমুল আর চেরা এসেছে।'

'আয়, ভেতরে এসে বস্ তোরা। কলকাতার বাবুকে তোদের গান শুনিয়ে দে।'

শুকরি, শিমুল—দুইটি যুবতী সাঁওতাল কন্যা। তাহাদের হাতে বাঁশী। বাঁশের তৈরী।

'তোরা কিছু খেয়ে নে আগে।'

'আমরা খেয়ে এসেছি। পেট বেশী ভরা থাকলে গান গাওয়া যাবে না। আমরা মায়ের কাছে পরে গিয়ে খাব।'

ইহারা যদিও সাঁওতাল, কিন্তু বাংলা কথা বলিতে পারে, যদিও কথার টান একটু সাঁওতালী ধরনের।

'তোদের খরমুজ কি রকম হয়েছে?'

'খুব ভাল।'

ডক্টর সোম বলিলেন, 'আমি একবার সাঁওতালী গান শুনেছিলাম, সে কিন্তু বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে।'

'সেখানে গানের সঙ্গে নাচও ছিল নিশ্চয়। এখানে এরা শুধু গান গাইবে।'

একটু পরেই গান আরম্ভ হইয়া গেল। শিমুল, শুকরী দুইজনের গলাই অপূর্ব। বাঁশী ও মাদলের সহযোগে গান জমিয়া উঠিল।

হরিশ্চন্দ্র মাদলের তালে-তালে অঙ্গ দুলাইতে লাগিলেন।

গানের রচয়িতা সনাতন।

ঝিঙা ফুল হলুদ বরণ,
শশা ফুল শাদা,
দুই ভাল দুই ভাল দুই ভাল।
মহুয়া মাথায় টিপ পরে
ঝুমরি কানে দুল,
ওহো! দুইই ভাল দুইই ভাল দুইই ভাল।
মেঘ থেকে বৃষ্টি নামে
সূযযি থেকে রোদ,
আহা, দুইই ভাল দুইই ভাল দুইই ভাল রে।
তুই যদি মন্দ হ'স
মন্দ হবে সব,
তা না হলে সব ভাল সব ভাল সব ভাল রে সব।

মাদলের বাজনা, বাঁশীর সুর, শিমুল শুকরীর অঙ্গভঙ্গী সহকারে সুমিষ্ট গান একটা অপরূপ সুরলোক সৃষ্টি করিয়া ফেলিল।

বিশেষভাবে মুগ্ধ হইলেন ডক্টর সোম। বলিলেন, 'খুব ভাল লাগল। গানের সরল ভাব মেয়ে দুইটির অকৃত্রিম কণ্ঠস্বরে চমৎকার লাগল।'

গান শেষ করিয়া তাহারা ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'উপা, তুমি বেহালা বাজাও একটু। ওরে, ও ঘর থেকে আমার বেহালাটা দিয়ে যা তো।'

একজন চাকর বেহালা দিয়া গেল।

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'তুমি খালি ইমন আলাপ কর। আমি চোখ বুঁজে শুনি।'

বেহালায় উপানন্দ ইমন আলাপ শুরু করিলেন। হরিশ্চন্দ্র চোখ বুঁজিয়া বসিয়া রহিলেন। মনে হইল যেন সমাধিস্থ হইয়া গিয়াছেন।

ডক্টর সোম তাঁহার দিকে চাহিয়া একটু অবাক হইয়া গেলেন। এমন তন্ময়ভাবে গান শুনিতে তিনি আর কাহাকেও দেখেন নাই। মনে হইল, হবিশ্চন্দ্রের তৃষিত-সত্তা যেন অমৃত পান কবিতেছে। ডক্টর সোমও যেন ধীরে ধীরে সম্মোহিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইল যে যদিও তিনি সঙ্গীতজ্ঞ নহেন, গান-বাজনার বিশেষ কিছু বোঝেন না, তিনি উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী মাত্র, তবু এই ইমনের আলাপ তাঁহার মনে এমন একটা আনন্দ সঞ্চারিত কবিতে লাগিল যাহা বর্ণনা করিবার নয়, কিন্তু কাহার প্রভাবে তাঁহাব মন অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ বসে নিমগ্ন হইয়া গেল? মনে পড়িল, বহুকাল পূর্বে ভূমধ্যসাগবে জাহাজের ডেকে বসিযা দিগন্তপ্রপ্লাবিত পূর্ণিমা রাত্রির অবর্ণনীয় শোভায় এই রকমই কিছু একটা যেন তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। তখন মনে হইযাছিল, অবর্ণনীয় অসীম যেন তাঁহাকে স্পর্শ কবিয়াছে। তাহার হঠাৎ মনে পড়িল, এ যুগের বিখ্যাত ঋষি আইনস্টাইনও বেহালা বাজাইতেন। আর একটা কথাও তাঁহার মনে পড়িল, লণ্ডনে যখন তিনি ছাত্র, তখন 'লিসা'র প্রেমে পড়িয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার মন যে অপূর্বভাবে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত. তাহাই যেন উপানন্দ আজ বেহালায় আলাপ করিতেছে।

বেহালা শেষ হইবার পর তিনজনেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ। হরিশ্চন্দ্র অনেকক্ষণ চোখ বুঁজিয়াই বহিলেন। যখন চোখ খুলিলেন, মনে হইল, চক্ষু দুইটি সজল। কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না। চোখের জলও মুছিলেন না। দ্বারের দিকে চাহিয়া তাঁহার নজরে পড়িল. দুইটি স্কুলের ছেলে বসিযা আছে।

'ও, শিবু রামু এসেছিস! আয়, ভেতরে আয়।'

বালক দুইটি ভিতরে প্রবেশ করিল।

'তোরা কি মুখস্থ করে এনেছিস আজ?'

শিবু বলিল, 'আমি হেমচন্দ্রের 'বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে মুখস্থ করেছি।'

রামু বলিল, 'আমি করেছি রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিবাও মোবে।'

'বেশ, বল শুনি।'

বালক দুইটি গড়গড় করিযা কবিতা আবৃত্তি করিয়া গেল। খুশী হইলেন হরিশ্চন্দ্র। বলিলেন, 'বাঃ! কাল সকালে এসে গম নিয়ে যাস। আমি গুপীকে বলে দেব।'

ছেলে দুইটি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

ডক্টর সোম বলিলেন, 'এরা কে?'

উপানন্দের চক্ষু দুইটি হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কিন্তু কোন জবাব দিল না।

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'ওরা স্কুলের ছেলে। আমি প্রতি মাসে প্রাইজ দি কবিতা মুখস্থ করবার জন্যে। আগে নগদ এক টাকা করে দিতাম। পণ্ডিত মশায় মানা করলেন। বললেন, ওই পয়সায় ছেলেরা বিড়ি কিনে খাচ্ছে। এখন পয়সা দিই না। গম দিই পাঁচ সের। এতে ওদের বাপমায়েরাও খুব খুশী। গুপী, তামাক দে।'

উপানন্দ একটি কথাও বলেন নাই, হাসিমুখে ডক্টর সোমের দিকে চাহিয়াছিলেন। তিনি নীরবে যেন বলিতেছিলেন, দেখ, আমার বন্ধুটিকে ভাল করিয়া দেখ। পাশের ঘরেই তামাক

সাজিবার ব্যবস্থা। গোপী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক কলিকা তামাক দিয়া গেল। সুগন্ধে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। হরিশচন্দ্র মৃদু একটি টান দিলেন, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না। বেহালার সুরের প্রভাব তখনও তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, উপানন্দ প্রকৃত সন্ন্যাসী, তাই তাহার হাতে বেহালা অত সুন্দর বাজে। তাহার মন মোটেই বৈষয়িক নহে, তাহার অত বড় জমিদারিটার ভার আমার উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। কখনও জানিতেও চাহে না, কোন বছর কত আয় হইল। তাহার ব্যাঙ্কের পাশবুক, খাতাপত্র সব আমার কাছে। টাকার প্রয়োজন হইলে সে আমার কাছে টাকা চাহিয়া পাঠায় এবং আমি তাহাকে নগদ টাকা পাঠাইয়া দিই। আমার ম্যানেজারবাবুই সব হিসাব রাখে, সে একদিনও হিসাব দেখিতে চাহে নাই। বৈষয়িক ব্যাপারে তাহার মনই নাই। সে নিজের খেয়ালেই মত্ত হইয়া আছে। হঠাৎ তাহার মনে হইল, যে লোক এমন সুন্দর বেহালা বাজায়, সেই আবার খাম্বা জঙ্গলে গিয়া সমস্ত রাত মাচায় বসিয়া বাঘ মারে। হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ। হঠাৎ তাহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল।

'আচ্ছা উপা, এবার শতরঞ্জির সময় তুমি লক্ষ্ণৌ থেকে একজন ভাল বাঈজী আনিয়ে দেবে বলেছিলে, সে কথা মনে আছে তো?'

'খুব মনে আছে। আমি চিঠি দিয়েছি আমার বন্ধুকে। সে উত্তর দিয়েছে, বাঈজীটি সত্যিই খুব ভাল। সে কিন্তু মৌখিক নিমন্ত্রণ করলেই আসবে না। তাকে চিঠি লিখে নিমন্ত্রণ করতে হবে এবং তোমার আমার দুজনেরই সই চাই।'

'বেশ, তুমি চিঠি একটা লিখে নিয়ে এস, আমি তাতে সই করে দেব। বাঈজীটি সত্যিই ভাল তো? সিনেমার হাব-ভাব-ময়ী কোন ঢঙী নয় তো? কত নেবে?'

'পাঁচ হাজার টাকার কম তিনি কোথাও যান না। তাছাড়া, রাহা খরচ দিতে হবে। ওঁর বাবা একজন বড় ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর কাছেই উনি নাচ-গান সব শিখেছেন। ওঁর বাবা নাচ-গান শিখিয়ে এবং বড়লোকদের বাড়িতে গান গেয়ে প্রচুর টাকা রোজগার করতেন। মেয়েটির বিয়ে দেন নি, তাকেও নাচ-গান শিখিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে তিনি মারা গেছেন। মেয়েটি বাড়িতেই নাচ-গানের চর্চা করে। পারতপক্ষে বাইরে কোথাও যেতে চায় না। কিন্তু আমাদের কথা শুনে এখানে আসতে রাজি হয়েছে, তবে আমাদের স্বাক্ষরিত চিঠি চাই।

'মেয়েটির সঙ্গে তোমার বন্ধু দেখা করেছেন?'

'মেয়েটি কারো সঙ্গে দেখা করেন না। তাঁর একজন অভিভাবিকা আছেন, নাম ইমন বাঈ, তিনি প্রবীণা। তাঁর সঙ্গেই কথাবার্তা হয়েছে। তিনিও ওঁর সঙ্গে আসবেন। উনি একা কোথাও যান না।'

'তুমি উত্তর দিয়ে দিয়েছ?'

'দিয়েছি। লিখেছি, ওঁদের সব দাবীই আমরা পূরণ করব। ওঁদের থাকবার জন্য আলাদা বাড়িও আমরা দেব। তবে তোমার আর আমার সই করা চিঠি এখনও পাঠানো হয় নি।'

'কালই পাঠিয়ে দাও। আর আমার 'লক্ষ্মীভবন'টা ওদের থাকার ব্যবস্থা করে দেব।'

'বেশ!'

ডক্টর সোম এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এইবার কথা বলিলেন। 'তোমাদের এত জমি, তোমরা যদি ট্র্যাক্টর আনিয়ে মডার্ণ পদ্ধতিতে চাষ-বাস কর, অনেক টাকা রোজগার করতে পার।'

হরিশ্চন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'আমরা টাকা চাই না, সুখ-শান্তি চাই। যন্ত্র আনলেই

নানারকম যন্ত্রীদল আসবে, যন্ত্র সারাবার জন্যে মিস্ত্রির দল আসবে, তাদের মোটা মাইনে দিতে হবে, তাদের ধর্মঘট সামলাতে হবে। ওসব আমাদের পোষাবে না ভাই। এ আমরা বেশ আছি। আমাদের ফাল-লাঙল আমরাই তৈরী করি ভেঙে গেলে নিজেরাই সারিয়ে নি। একবার বিদেশী সার আনিয়ে কিছু জমিতে দিয়েছিলাম। ঢাউস ঢাউস পেঁয়াজ আলু হল, কিন্তু সব বিস্বাদ। কিছু জমি খারাপও হয়ে গেছে। আবার সেখানে গরু মোষ বসাচ্ছি—'

হরিশচন্দ্র হয়তো আরও বক্তৃতা করিতেন, কিন্তু বাহিরে খোলের শব্দ শুনিয়া থামিয়া গেলেন।

'গোবিন্দ নাকি? এস এস।'

কীর্তনিয়া গোবিন্দ দাস তাঁহার দলবল লইয়া প্রবেশ করিলেন।

'তোমরা সব চৌকিতেই বস।'

চৌকিতে উপবেশন করিয়া গোবিন্দ দাস জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ কি গান গাইব?'

'আজ মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব গানটা গাও'

গান শুরু হইয়া গেল এবং একটু পরেই ঘর জমিয়া উঠিল। একটু পরেই পীতাম্বর কবিরাজ আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং সকলকে নমস্কার করিয়া একপাশে বসিয়া রহিলেন। গান শেষ হইলে তিনি হরিশচন্দ্রকে প্রশ্ন করিলেন, 'আমাকে স্মরণ করেছিলেন কেন?'

'স্মরণ করেছিলাম আমাদের এই বন্ধুটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলে। ইনি একজন বড় উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। এঁর বিশ্বাস আমাদের দেশে অনেক গাছ আছে যার সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। ইনি অনেক অচেনা বুনো গাছের সন্ধানে ঘুরে বেড়ান। তাদের ফোটো তোলেন, তাদের ফুল ফল বীজ সম্বন্ধে এঁর কৌতূহলের অন্ত নেই। আপনিও তো এ বিষয়ে অনেক জানেন, আপনারা এ বিষয়ে একটু আলাপ করুন। ইনি উপস্থিত বাড়িতে আছেন। অনেক গাছপালার রঙীন ফোটো তুলেছেন।'

'বেশ তো, আমি কাল সকালেই যাব ওঁর কাছে। আমি যতটুকু জানি তা বলব ওঁকে, আর ওঁর কাছে শিখবও অনেক কিছু।'

ডক্টর সোম হাসিয়া বলিলেন, 'আপনাকে শেখাবার মত বিদ্যে আমার নেই। আমি কতকগুলো পরীক্ষায় পাশ করেছি, আর নানারকম গাছ গাছড়ার ফোটো তুলেছি। অনেকে যেমন টিকিট সংগ্রহ করে, আমি তেমনি নানারকম নাম না জানা গাছের পাতা ও ফুলের ছবি সংগ্রহ করি।'

পীতাম্বর খুব আনন্দিত হইলেন।

'বাঃ। কাল যাব আমি। এখন তবে উঠি।'

হরিশচন্দ্র হাঁক দিলেন, 'ওরে হীরু, একটা ঝুড়িতে করে কয়েকটা নারকোল কবিরাজ মশাইকে দে। তুই গিয়ে দিয়ে আয় ওঁর বাড়িতে। একটা লাউও দিস।'

পীতাম্বর বলিলেন, 'এবার চমৎকার লাউ হয়েছে আপনার।'

'খালি গোবর সার দিয়েছি।'

হরিশচন্দ্রের চক্ষু দুইটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

পীতাম্বর বলিলেন, 'গরু জানোয়ারটিকে আমরা যে এত খাতির করি, তার কারণ ও রকম উপকারী জানোয়ার আর দ্বিতীয় নেই। ওর কাছে আমরা নানাভাবে ঋণী।'

'কিন্তু গরুর যত্ন আমরা করি না। আমরা মুখে ওদের মা ভগবতী বলি, কিন্তু ওঁর সঙ্গে

ব্যবহার করি চণ্ডালের মত। ওদের ক্রমাগত খাটাই, একটুও বিশ্রাম দিই না। ওদের বাছুররা ওদের মা-র দুধ পেট ভরে খেতে পায় না। আমি ওদের জন্য প্রকাণ্ড একটা বন কিনেছি। সেখানে ওরা থাকবে। ঠিক করেছি, প্রত্যেক বাছুর অন্ততঃ তিনমাস মায়ের দুধ খাবে। তিনমাস বয়স না হলে কোনও গাই আমরা দুইব না। যে সব গরু লাঙল টানে তাদের সপ্তাহে এক দিন করে বিশ্রাম দিতে হবে। বুড়ো গরুরা সম্পূর্ণ বিশ্রাম পাবে। তাদের আর কাজ করতে হবে না। সেই জঙ্গলে ভাল ভাল ষাঁড়ও রাখব আমরা।'

পীতাম্বর বলিলেন, 'খুব ভাল কাজ করেছেন। কোথায় কিনেছেন বনটা?'

'উপার জমিদারি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে গভর্ণমেণ্টের প্রায় দুশো বিঘে এবড়োখেবড়ো পতিত জমি ছিল। শুনলাম, কলকাতার কোনও বড়লোক জমিটা কিনছেন ওখানে একটা মিল করবেন বলে। খবরটা পেয়েই আমি চমকে উঠলাম। সর্বনাশ, আমাদের জমিদারির পাশে মিল হবে! উপার এক সহপাঠী তখন ও অঞ্চলে কমিশনার। তিনি সাহায্য না কবলে ও জমি বেহাত হয়ে যেত। তাঁর সাহায্যে জমিটা পেয়েছি। এখন ওখানে একটা আদর্শ গো-নিবাস তৈরী করতে হবে।'

ডক্টর সোম বলিলেন, 'আমার চেনাশুনা একজন ভালো ভেটেরিনারি ডাক্তার আছেন। সরকারি চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন সম্প্রতি, গো-নিবাসের পরিচালক হিসাবে খুব ভাল হবেন বলে মনে হয়। যদি বল তো খবর দিই তাঁকে।'

হরিশ্চন্দ্র হাসিয়া উত্তর দিলেন, 'আমার গো-নিবাসের কর্তা হবে কিন্তু আমাদের হাবু গোয়ালা। সে বাল্যকাল থেকে আমাদের গরু চরাচ্ছে। সারাজীবন আমাদের গরু নিয়েই আছে। তাকেই গো-নিবাসের মালিক করে দেব। তোমার ভেটেরিনারি ডাক্তার যদি আসতে চান, তাঁকে হাবুর অধীনে কাজ করতে হবে। তিনি রাজী হবেন কি?'

'তাঁকে লিখে দেখব। তবে বিলেত ফেরত লোক.....'

'ও বাবা! তাহলে চাই না। বিলেত ফেরত লোকেরা প্রায়ই নাক-উঁচু হয়। একমাত্র উপাকেই দেখছি বিলেত গিয়েও নাকটা উঁচু হয় নি।'

এমন সময় ভিতর হইতে একটি ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, 'মা ডাকছেন খাবার দেওয়া হয়েছে।'

সবাই উঠিয়া পড়িলেন।

আহারের আয়োজন দেখিয়া ডক্টর সোম বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তিনি সর্বাপেক্ষা বিস্মিত হইলেন হরিশ্চন্দ্রের মাকে দেখিয়া। মাথায় আধ ঘোমটা দেওয়া, ধপধপে সাদা থান কাপড় পরা, নিরাভরণা কনকলতার মধ্যে তিনি এমন একটি অপূর্ব ব্যক্তিত্ব দেখিলেন যাহা তিনি আগে কখনও দেখেন নাই। ওই স্বল্পভাষিণী স্নেহময়ী মহিলাটির মধ্যে তাঁহার মনে হইল, যেন ভারতীয় সংস্কৃতি মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে চোখ-ধাঁধানো আড়ম্বর কিছু নাই, তাহা নিতান্তই সাদাসিধা অনাড়ম্বর বলিয়াই যেন বেশী সুন্দর। তাঁহার নিজের মাকে মনে পড়িল। তাঁহার মধ্যেও তিনি এইরূপ দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মায়ের একটি মাত্র 'ফোটো' তাঁহার কাছে আছে। সেটি সর্বদাই তাঁহার কাছে থাকে। এখানেও আনিয়াছেন। চেহারার মিল নাই, মিল আছে মুখের ভাবে। বিনয়, ভদ্রতা, স্নেহ, কর্তব্যবোধ, আত্মসম্মান, অন্তর্নিহিত তেজ ও শক্তির অনবদ্য প্রকাশ অনাড়ম্বর মহিমায় যেন অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে সে মুখচ্ছবিতে। ডক্টর সোম

বড়লোকের একমাত্র ছেলে। পিতামাতার মৃত্যুর পর তিনি আর সংসার পাতেন নাই। নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। ইংলণ্ডে, জার্মানিতে, ফ্রান্সে, আমেরিকায়, জাপানে, চীনে সর্বত্র গিয়াছেন। বিলাতে পরিবার সময় উপানন্দের সহিত তাঁহার আলাপ। খুব ভালো লাগিযাছিল তাহাকে। তাই মাঝে মাঝে এখানে আসেন। কনকলতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'মা, এত খাবার তো খেতে পারব না।'

'যা পার খাও বাবা। তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছি, কম করে কি দিতে পারি? যা পার খাও।'

'আপনি কোন্‌টা রেঁধেছেন?'

'মুর্গিটা ছাড়া আর সবই আমি রেঁধেছি।'

'আমি তাহলে শুধু তরকারিগুলো খাই।'

'বেশ। শেষে পায়েসটা খেও।'

সেদিন রাত্রে ভুরিভোজনের পর ডক্টর সোম উপানন্দের বাড়িতে গিয়া নিজের শুইবার ঘরে গিয়া খিল বন্ধ করিলেন। তাহার পর ইলেকট্রিক আলো ও পাখাটা চালাইয়া দিলেন। ইলেকট্রিসিটিহীন হরিশ্চন্দ্রের বাড়িতে তাঁহাব কষ্ট হইতেছিল। হরিশ্চন্দ্রকে তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার প্রগতিবিবোধী মনোবৃত্তি মোটেই ভালে লাগে নাই। তাঁহার মনে হইতেছিল, সে যেন এক মধ্যযুগীয় জমিদারের বাড়িতে সমস্ত সন্ধ্যাটা কাটাইয়া আসিল। যদিও তাঁহার পিছনে একজন চাকর একটা পাখা লইয়া সর্বদা হাওয়া করিতেছিল, যদিও কেবোসিনেব আলোগুলি ভালোই ছিল, তবু তাঁহার মন সেকেলে মনোবৃত্তিকে মানিয়া লইতে পারিতেছিল না। হরিশ্চন্দ্র লোকটিকে কিন্তু তাহার ভালো লাগিয়াছিল। হঠাৎ তাহার মাকে মনে পড়িল, তিনিও কি সেকেলে ছিলেন না? গোবর, গঙ্গাজল, পাদোদক, মানত, ব্রত, উপবাস, জাতিভেদ—সবই তো তিনি মানিতেন। ডক্টর সোম বাক্স খুলিযা মায়ের ছবিটি বাহিব করিলেন। গরদের একটি বিশেষ থলিতে ভেলভেটের বাক্সের ভিতর ছবিটি তিনি বাখিতেন। বাক্সটা বাহির করিয়া আবার তাঁহার মনে হইল, তিনিও কি সংস্কারমুক্ত? মায়ের ছবি রাখিবাব জন্য গরদের একটা থলি কেন করাইয়াছিলেন? তাহার পর মনে হইল, মায়ের মৃত্যুর অনেক পরে লিসার প্রেমে তিনি পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তবু তাহাকে বিবাহ করিতে পারেন নাই। কারণ তাঁহার ধারণা, মা বাঁচিয়া থাকিলে এ বিবাহে তিনি আপত্তি করিতেন এবং তাহাব আপত্তি সত্ত্বেও বিবাহ করিলে মনে নিদারুণ কষ্ট পাইতেন। তাই তিনি তাহাকে বিবাহ করেন নাই। এটা কি কুসংস্কার? তিনি বিবাহই করেন নাই। লিসাও বিবাহ করে নাই। সে আমেরিকায এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এবং পড়ায়। তাঁহারই জন্য তাঁহাকে বছরে দুইবার আমেরিকা যাইতে হয। লিসার ছুটির সময় যান তিনি।

দুইজনে দেশভ্রমণ করেন। ইয়োরোপের সব দেশে এবং আমেরিকায় তাঁহার ব্যাঙ্ক-এ্যাকাউন্ট আছে। অনেকগুলি দেশের ভাষাও তিনি শিখিয়াছেন। লিসা বিশ্ববিদ্যালযে ইংরেজি পড়ায় এবং নিজে অন্য ভাষা পড়ে। কুড়িটি ভাষা জানে সে। কয়েকটি ভাষায় উচ্চ ডিগ্রীও লাভ করিয়াছে। বাংলা চমৎকার জানে। বাংলাসাহিত্যে তার জ্ঞানও প্রচুর। ডক্টর সোমের সহিত বিবাহ হইলে উভয়েই সম্ভবত খুব সুখী হইত। কিন্তু মায়ের কথা মনে করিয়া ডক্টর সোম বিবাহ করেন নাই, কিন্তু তাহার ভালবাসা আজও অম্লান আছে। বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলে সংসারে তুচ্ছতার মধ্যে আবর্তিত হইলে, হয়তো এত অম্লান থাকিত না। লিসাকে চিঠি

লিখিবার জন্য দামী নানা রঙের কাগজের যে প্যাড তিনি ছাপাইয়াছেন তাহার শীর্ষদেশে রবীন্দ্রনাথের গানের এই লাইনটি ছাপা আছে—'নয়ন তোমায় পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে'। ডক্টর সোমের নাম নয়নানন্দ। লিসার সহিত মিলনের জন্য এখনও তিনি নব প্রণয়ীর মত উৎসুক। প্রেম যদি একপ্রকার মোহ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ডক্টর সোম এখনও সম্মোহিত হইয়া আছেন। তিনি বিশ্বের নানা স্থানে সারা বছর ঘোরেন, কিন্তু লিসার খুঁটিতেই তাঁহার মনটি এখনও বাঁধা আছে। তিনি মায়ের ছবিটি বাহির করিয়া দেখিলেন। বিশেষত্ব কিছুই নাই। থান কাপড় পরা মাথায় আধঘোমটা দেওয়া সাধারণ বাঙালী বিধবার ছবি। রূপ নাই, কিন্তু মুখভাবে সেই অবর্ণনীয় বৈশিষ্ট্যটি আছে যাহা তিনি কনকলতার মুখে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

ডক্টর সোম অনেকক্ষণ ছবিটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর সেটি গরদের থলিতে পুরিয়া ভেলভেটের বাক্সের ভিতর আবার রাখিয়া দিলেন।

তাহার পর যে অ্যালবামটায় লিসার ছবি আছে সেটা বাহির করিয়া লিসার যে ছবিটা কয়েকদিন পূর্বে আসিয়াছে সেইটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। লিসার মুখভাব সৌম্য, কিন্তু সেই সৌম্যতার সহিত একটু দুষ্টামিও তাহার চোখে এবং অধরপ্রান্তে যেন উঁকি দিতেছে। এই ছবিটির সহিত যে চিঠি সে লিখিয়াছে তাহাতেও তাহার দুষ্টামির একটু পরিচয় আছে। লিখিয়াছে, নয়ন কয়েকদিন হইতে একটু বিব্রত আছি। কলেজের একজন নামজাদা প্রফেসার আমার প্রতি একটু বেশী মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাকে একটা ভাল হোটেলে দুইদিন ডিনার খাওয়াইয়াছেন চারদিন সিনেমায় লইয়া গিয়াছেন এবং প্রায়ই আমার ফ্ল্যাটে আসিয়া কাব্য আলোচনা করিতেছেন। লোকটি সুদর্শন, বড়লোক এবং বিদগ্ধ। কি করব পরামর্শ দাও।

নয়নানন্দ উত্তর দিয়াছেন, ভালো জিনিস পৃথিবীতে বিরল লোকটিকে গ্রেফতার কর।

ইহার উত্তরও লিসা দিয়াছে। শুধু লিখিয়াছে হা, হা, হা, হা।

এ ধরনের দুষ্টামি লিসা প্রায়ই করে চিঠিতে। সে জানে কাল্পনিক প্রণয়ীর কথা নয়ন বিশ্বাস করিবে না। তবু দুষ্টামি করিয়া লেখে। আগেও আর একবার লিখিয়াছিল।

হঠাৎ আলো নিবিয়া গেল। পাখা বন্ধ হইল। নিশ্চয় মেসিনে কোন গণ্ডগোল হইয়াছে। টর্চ বাহির করিয়া ছবিগুলি বাক্সে বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলেন ডক্টর সোম। হঠাৎ হরিশ্চন্দ্রের মুখটা তাঁহার চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিল। হরিশ্চন্দ্র যেন তাহার দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছেন। আবার হঠাৎ আলোটা জ্বলিয়া উঠিল, পাখা চলিতে লাগিল। এবার তাঁহার মুখেও হাসি ফুটিল। আলোটা নিবাইয়া দিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন।

।। তিন ।।

হরিশ্চন্দ্র কি শীত কি গ্রীষ্ম বাড়ির মধ্যে প্রকাণ্ড উঠানে মস্তবড় একটি চৌকির উপর আকাশের নীচে শোন। শীতকালে লেপ গায়ে দেন, গ্রীষ্মকালে খালি গায়ে থাকেন। তাঁহার নিজের একটি ঘর আছে, কিন্তু সে-ঘরের ভিতর কখনও তিনি শোন না। বদ্ধ ঘরে তিনি থাকিতে পারেন না।

বর্ষাকালে শোন প্রকাণ্ড খোলা বারান্দায়, তাহার উপরটা ঢাকা আর চারিদিক খোলা। গুপী চাকরটি একটি দড়ির খাটিয়ায় তাহার নিকটেই শোয়। ভোর পাঁচটায় তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া তিনি যথারীতি উঠবোস করিলেন, ডনও টানিলেন কয়েকটা। গুপীও তাঁহার সঙ্গে উঠিয়াছিল। সে তখন এক বাটী সর্ষপ তৈল আনিয়া তাঁহার সর্বাঙ্গে মর্দন করিতে লাগিল। হরিশ্চন্দ্রও খানিকটা তেল লইয়া গুপীর পিঠে এবং মাথায় মাখাইয়া দিলেন। রোজই দেন। তাঁহার ধারণা, অপরের সাহায্য বিনা পিঠে ভালো করিয়া তেল মাখা যায় না।

তেল-মাখা-পর্ব শেষ হইলে গুপী ইঁদারায় গিয়া জল তুলিতে আরম্ভ করে এবং তিনি ইঁদারার ধারে গিয়া বসেন। ইঁদারার ধারে চৌবাচ্চাতে রাত্রেই জল তুলিয়া রাখা হয়। সেই জলে হরিশ্চন্দ্র স্নান আরম্ভ করেন। প্রথমেই উপবীতটি সাবান দিয়া পরিষ্কার করেন। গায়ে সাবান ঘষেন না, গামছা ঘষেন। তাহার পর গুপী ইঁদারার টাটকা জল তুলিয়া তাঁহার মাথায় ঢালিতে থাকে। পাঁচ বালতি জল ঢালার পর হরিশ্চন্দ্র উঠিয়া পড়েন এবং পূর্বাকাশের দিকে ফিরিয়া করজোড়ে সূর্যমন্ত্রটি পাঠ করেন। তাহার পর কাপড় ছাড়িয়া তিনি প্রবেশ করেন পূজার ঘরে। সেখানে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া আহ্নিক করিতে বসেন। আহ্নিক শেষ করিয়া মায়ের মহলে যান। সেখান গিয়া প্রথমে বসিয়াই প্রাতরাশ খাইতে হয়। কিছু ফল, কয়েকটি সন্দেশ এবং এক বাটী দুধ। তাহার পর তিনি মাঠে চলিয়া যান।

সেদিনও যথারীতি সব কাজ শেষ করিয়া তিনি মাঠের দিকে যাইতেছিলেন। সহসা মনে হইল, উপানন্দকে বাঈজী প্রসঙ্গে চিঠি লিখিতে আর একবার তাগাদা দিতে হইবে। না দিলে হয়তো সে ভুলিয়া যাইবে। কারণ কোনও ব্যাপারই তাহার বেশীক্ষণ মনে থাকে না। মনটা শিশুর মত।

উপানন্দের বাড়ি গিয়া হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন, কেহ নাই। কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া ডক্টর সোম বাহিরে গিয়াছেন। উপানন্দ মাঠে বড় ক্যামেরা লইয়া ফোটো তুলিতেছেন। উপানন্দের বাড়ির সংলগ্ন একটা প্রকাণ্ড মাঠ আছে। উপানন্দ সেখানে বাগান করেন নাই। নানারকম আগাছায় ভর্তি মাঠটা। হরিশ্চন্দ্র সেখানে গিয়া দেখিলেন, উপানন্দ সেখানে একটা সিনেমা তুলিবার বড় ক্যামেরায় ফোটো তুলিতেছে।

'এখানে কার ফোটো তুলছো?'

'একঝাঁক প্রজাপতির। ওই দেখ, এখনও রয়েছে কতকগুলো। একটু আগে সমস্ত মাঠটা ছেয়ে গিয়েছিল। কি চমৎকারই যে দেখাচ্ছিল। ভাবলাম, ছবিটা তুলে রাখি। এ উৎসব আর হবে না। তুমি আজ মাঠে যাও নি?'

'মাঠেই যাচ্ছি! তোমাকে মনে করিয়ে দিতে এলাম বাঈজীকে চিঠিখানা আজই লিখে রেজিষ্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দাও। শতরঞ্জির আর বেশী দেরি নেই তো।'

'চল, এখুনি লিখে দিচ্ছি। তোমাকেও সই করতে হবে।'

উপানন্দকে সাহায্য করিবার জন্য একজন ফোটোগ্রাফার ছিল, নাম রাতুলচরণ। তিনি ক্যামেরাটা ঠিক করিয়া ফোটো তুলিতে লাগিলেন। উপানন্দ হরিশ্চন্দ্রকে লইয়া বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর টেবিলে বসিয়া খুব দামী মোটা চিঠির কাগজে এই পত্রটি লিখিয়া ফেলিলেন ঃ

শ্রীযুক্তা শীর্ষা দেবী,

সুচরিতাসু,

আমার বন্ধু তবলচি আবিদ মিঞা এবং আপনার অভিভাবিকা ইমন বাঈজীর পত্র আমরা

পাইয়াছি। আমাদের শতরঞ্জি উৎসবে আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আসেন, আমরা সত্যই বড় আনন্দিত হইব। ইমন বাঈজী যে সব শর্ত দিয়াছেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। আপনাদের জন্য একটি আলাদা বাড়িরও ব্যবস্থা রাখিব। আগামী অক্ষয় তৃতীয়ার দিন আমাদের উৎসব আরম্ভ। অন্তত তাহার দুইদিন পূর্বে আপনি আসিলে ভালো হয়। বিশ্রাম করিতে পারিবেন। আপনার সম্মতিপত্র পাইলেই আমি আমাদের নায়েব মশাইকে পাঠাইয়া দিব, তাঁহার সঙ্গেই আসিবেন। আপনার যাহাতে কোনও অসুবিধা না হয় সে ব্যবস্থা আমরা যথাসাধ্য করিব। পত্রের উত্তর একটু তাড়াতাড়ি দিবেন, কারণ অক্ষয় তৃতীয়ার বেশী দেরি নাই। আমাদের প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি ভবদীয়—

'নাও, এইবার তুমি নাম সই কর। তারপর আমি করব।'

হরিশ্চন্দ্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পত্রটি পড়িলেন। তাহার পর বলিলেন, 'নামটি তো বড় বাহারের দেখছি। আমাদের চলতি বাংলায় শুরসো বলে একটা কথা আছে, যার সাহায্যে কপাটে শিকল তুলে দেওয়া যায়।'

উপানন্দ বলিলেন, 'হ্যাঁ, নামটি বাহাবে বটে, তবে শুনে আমার 'শুরসো'র কথা মনে হয় নি। মনে পড়িছিল, রাইডস হ্যাগার্ডের (Rides Haggard) 'She' বলে বিখ্যাত বইটার কথা। বইটার পুরো নাম 'She, who must be obeyed,' .....বইটা পড়েছ?'

'না, আমার ইংরেজি বিদ্যার দৌড় বেশীদূর নয়।'

তাহার পর চিঠিতে দুজনেই সহি করিয়া খামে পুরিলেন।

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'খামে পুরো ঠিকানা লিখে Registered with acknowledgement due লিখে দাও, আমি টহলকে ঘোড়ায় করে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে বড় পোস্টাফিসে গিয়ে পোস্ট করে আসুক। আমি চললুম, আমার দেরি হয়ে গেছে।'

চিঠিখানি লইয়া হরিশ্চন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

'তোমার বন্ধুটি কোথা?'

'তিনি কবিরাজ মশায়ের সঙ্গে বুনো গাছ দেখতে বেরিয়েছেন। কবিরাজ মশাই কতকগুলি গাছকে দুষ্প্রাপ্য বলছেন। তাঁর মতে ওগুলো তুলে এনে চাষ করা উচিত এবং সারা বছর ধরে ওগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। ওদের ফল-ফুল হয় কিনা, হলে কখন হয়, কেমন তাদের চেহারা, এসব না জানলে গবেষণা করা যায় না। নয়ন খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। সে আমাকে বলছিল, আমাকে কিছু জমি কিনে দাও। আমি ভাবছি, আমার বেগুনবাড়ির পঞ্চাশ বিঘে জমি ওকে দিয়ে দেব। তোমার আপত্তি আছে?'

'জমি তোমার, আমি আপত্তি করব কেন?'

'জমি আমার নয়, সবই তোমার। তুমি যা বলবে তাই হবে।'

'তাহলে ভাবতে দাও।'

হরিশ্চন্দ্র বাহির হইয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে জমিটার কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া শেষে ঠিক করিলেন যে জমির মালিকানা ডক্টর সোমকে দিবেন না। তিনি ভবঘুরে লোক, পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ান, কখন হয়তো খেয়ালের মাথায় জমিটা অপরকে বিক্রয় করিয়া দিবেন, তখন আমরা বিপদে পড়িব। তবে ওই জমিটাতে তিনি যদি বন্য গাছগাছড়ার চাষ করিতে চান, করিতে পারেন। কবিরাজ মহাশয় যদি তাহার ভার লইতে রাজি থাকেন, তাহা হইলে তিনি আপত্তি করিবেন না।

জমিতে পৌঁছিয়া তিনি দেখিলেন, কয়েকটি লোক তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। রোজই করে। গ্রামের লোক তাহারা, বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়াছে। বিপদে পড়িলে বা কোন পরামর্শ করিবার জন্য প্রাযই আসে। হরিশ্চন্দ্র সেদিন লাউ গাছের গোড়াগুলি খুঁড়িয়া দিবেন ঠিক করিয়াছিলেন, তাহাই করিতে করিতে গ্রামবাসীদেব সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন।

জাকলা গ্রামের ছবি মোড়লের দুই পুত্র সর্বদা কলহ করে, এখন তাহারা আলাদা-আলাদা থাকিতে চায়। হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'তোমার তো জমি অনেক, তাদের আলাদা জায়গায় বাড়ি করে দাও। তারা আলাদা থাকুক। দরকার হলে তোমার জমি থেকে তাদের খাবার জিনিষপত্র পাঠিও। কিন্তু বিষয় ভাগ করে দিও না।'

মোড়ল বলিল, 'আপনি যদি একটু বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলেন ওদের, আপনাকে ওরা খুব খাতির করে।'

'বুঝিয়ে-সুজিয়ে কোন লাভ হয় না শেষপর্যন্ত, তাছাড়া দুটো পবিবার একসঙ্গে গুঁতোগুঁতি করে শান্তিতে থাকতেও পারে না। আলাদা আলাদা থাকাই ভাল। কি করে ওরা?'

'একজন তো আপনার কাছারিতেই গোমস্তাগিবি করে, আব একজন ভণ্ড বাবাজীর আখড়ায় গিয়ে গান-বাজনা করে। তাব ইচ্ছে, একটা যাত্রার দল করা।'

'বেশ তো, যা ইচ্ছে করুক না। দেখো, যেন বোকে না যায়।'

মোড়ল খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, 'আপনি বা বললেন তাই কবব। এখন আমি তবে—'

'এসো।'

সে চলিয়া গেল, আর একজন আগাইয়া আসিল। বলিল, 'আমাব মেয়েব পেটে অনেক দিন থেকে একটা ব্যথা হচ্ছিল, কাল ডাক্তারবাবু বললেন, সদর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, পেটের ভিতরে নাকি ফোড়া হয়েছে। তাই আপনার পালকিটা চাইতে এসেছি।'

'বেশ, নিয়ে যেও, আমি বলে দেব।'

সে লোকটিও চলিয়া গেল।

তারপর আরও নানা ধরনের লোক একে-একে আগাইয়া আসিল। সকলেই প্রায প্রার্থী। কেউ কিছু বীজ চাহিল, কেউ দু'খানা লাঙ্গল ধার চাহিল কয়েক দিনেব জন্যে। আব একজন স্থানীয় পাঠশালার পণ্ডিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ কবিল, পণ্ডিত নাকি তাহাব নাতিব উপব অযথা অত্যাচার করে।

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'পণ্ডিত মশাযের বিরুদ্ধে কোনও নালিশ তোমার মুখে শুনতে চাই না। আমি আগামী সোমবারে তোমাদেব গ্রামে যাব। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করব। তোমাব ছেলের নাম কি?'

'ডাক নাম ভোম্বল, ভালো নাম ভোলানাথ দাস।'

'আচ্ছা, আমি গিয়ে খোঁজ করব।'

সকলে যখন চলিয়া গেল, তখন তিনি লাউ গাছের গোড়াগুলির তত্ত্বাবধানে মন দিলেন। অনেকখানি জমিতে নানা রকম শাকসব্জি লাগানো আছে। দূরে দূরে অন্যান্য চাকররাও কাজ করিতেছে। তিনি নিজের জন্য খানিকটা অংশ পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন, সেখানে তিনি নিজেই দেখাশোনা করেন। কাজ করিতে করিতে নানা রকম চিন্তাও করেন। আজ তাঁহার মায়ের

চিন্তাটা তাঁহাকে পাইয়া বসিল। আগেও এ চিন্তা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। তাঁহার নিজের মাকে মনে নাই। কনকলতাকেই তিনি মা বলিয়া জানেন, কনকলতাই বাড়ির কর্ত্রী, কিন্তু ইহাও তিনি জানেন, কনকলতা তাঁহার নিজের মা নন। তাঁহার মায়ের দূর সম্পর্কের বোন। তিনি বাল-বিধবা অনাথা ছিলেন বলিয়া বাবা তাঁহাকে আনাইয়া শিশু হরিশ্চন্দ্রের ভার তাহার উপর দিয়াছিলেন। সে-ভাব তিনি এতদিন যোগ্যতার সহিত বহন করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রও তাঁহাকে গৃহস্থালীর সর্বেসর্বা করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার বালিকা বধূর মৃত্যুর পর কনকলতা তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র উত্তর দিয়াছিলেন, 'দেখ মা, মায়েরা বাঘিনীর মতো। দুই বাঘিনী এক সংসারে শান্তিতে থাকতে পারেন না।'

'আমি বাঘিনী?'

'ওটা একটা উপমা দিয়ে বললাম। তবে তোমার ভয়ে সবাই থরথর করে কাঁপে।'

'তোর বউ যাতে না কাঁপে, তার ব্যবস্থা আমি করব।'

'তুমি যেমন আছ তেমনি থাকো। আমাকে ছেড়ে তুমি কোথাও থাকতে পারবে না। আমার মরবার পর তুমি যা খুশি কোরো। আমি বিয়ে করব না।'

ইহার পর কনকলতা আর বিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই, কিন্তু ইহার পর হইতেই এই চিন্তাটি হরিশ্চন্দ্রের মনে মাঝে মাঝে উদিত হইয়াছে। তাঁহার মনে হইয়াছে, মৃত্যুর কথা কিছু বলা যায় না, মায়ের আগেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তখন মায়ের অবস্থা কি হইবে? তিনি যদি সত্যিই আমার মা হইতেন, তাহা হইলে আইনত এই জমিদারির উপর তাঁহার দখল থাকিত। বাবা উইল করিয়া তাঁহাকে কিছু দিয়া যান নাই। তিনি ভাবিতেছেন, কোনও একটা ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন। কিন্তু কি ব্যবস্থা করিবেন? তাঁহার জমিদারির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীই বা কে হইবে? হয়তো ইহা শেষে গভর্ণমেণ্টের কবলে গিয়া পড়িবে এবং গভর্ণমেণ্ট তাঁহার আদর্শের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিবে না। বর্তমান যন্ত্রসভ্যতার নানা আড়ম্বরে তাঁহার আত্মসম্মান-অলঙ্কৃত স্বাধীন স্বদেশীয় আদর্শ অবলুপ্ত হইয়া যাইবে। সহসা তাঁহার মনে হইল, আমি আমার পূর্বপুরুষদের কি আদর্শ ছিল তাহা জানি কি? বাবার মুখে শুনিয়াছি, আমার প্রপিতামহ একজন নীলকর সাহেবের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে একজন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কৃপাদৃষ্টি নাকি তাঁহার উপর পড়ে। নীলকর সাহেব যখন দেশে চলিয়া যান, তখন নামমাত্র মূল্যে তাঁহার জমিদারিটি তিনি গঙ্গোদক চক্রবর্তীকে (হরিশ্চন্দ্রের প্রপিতামহ) বিক্রয় করিয়া যান। সেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহায়তায় আর একটি জমিদারিও তিনি বন্ধু শিবানন্দের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া কিনিয়াছিলেন। শিবানন্দ ছিলেন উপানন্দের প্রপিতামহ। তিনি একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। দুইটি জমিদারি পাশাপাশি ছিল। গঙ্গোদক কিন্তু ঋণ শোধ করিতে পারেন নাই। জমিদারিটাই শিবানন্দকে দিয়া দিয়াছিলেন।

হরিশ্চন্দ্রের মনে হইল, আমরা কি আমাদের পূর্বপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছি? সঙ্গে সঙ্গেই তাহার উত্তরটাও তাঁহার মনে আসিল। গঙ্গোদক চক্রবর্তী দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার ছিলেন। সাহেবদের খুব খোশামোদ করিতেন বলিয়া সাহেবরাও তাঁহাকে প্রশ্রয় দিতেন। তিনি চারটি বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু মাত্র একটি পত্নীরই একটি মাত্র পুত্র হইয়াছিল। তাহারই বংশধর হরিশ্চন্দ্র। গঙ্গোদকের পাঁচটি ভাই ছিল। তাঁহাদের তিনি পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। কে কোথায় আছেন তাহা তাঁহার জানা নাই। তাঁহার পিতামহ

যুধিষ্ঠির জমিদারির সর্বত্র জলসত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক তৃষ্ণার্ত লোককে একমুঠা ভিজা ছোলা, একটু গুড় এবং জল দেওয়া হইত। কিন্তু চাকরেরা এত ছোলা এবং গুড় চুরি করিতে লাগিল যে হরিশ্চন্দ্রের বাবা বিরক্ত হইয়া সমস্ত জল সত্র বন্ধ করিয়া দেন। পরিবর্তে তিনি নানা স্থানে কূপ ও কয়েকটি পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র সেগুলিও বজায় রাখিতে পারেন নাই। যাহাদের জন্য পিতা কূপ এবং পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন তাহারাই নানাভাবে সেগুলিকে নষ্ট করিয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের জমিদারির প্রত্যেকটি গ্রাম এখন পঞ্চায়েতের অধীন। তাহারাই সেখানকার সব ব্যবস্থা করে প্রয়োজন হইলে হরিশ্চন্দ্র তাহাদের অর্থ সাহায্য করেন। ওই ব্যবস্থাই এখনও চলিতেছে কিন্তু পঞ্চায়েতের নামে নানা অভিযোগ প্রায়ই তাহার কানে আসিতেছে। আমাদের দেশের লোক ধর্মপ্রবণ, বারো মাসে তেরো পার্বণের উৎসব সর্বত্র হয় কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অধিকাংশ লোকই প্রকৃত ধার্মিক নয়। অসাধু, লোভী, মিথ্যাবাদী, চোরের সংখ্যাই বেশী। হরিশ্চন্দ্রের ধারণা, ইহার মূল কারণ দারিদ্র্য। সেইজন্য তিনি প্রজাদের দারিদ্র্য মোচন করিতে সদা উৎসাহী। জমিদারির মধ্যে তিনি ডেয়ারি, পোলট্রি, চরকা চালানো, খদ্দর বুনিবার তাঁত, দেশী মুচিদের দিয়া সস্তায় দেশী জুতা বানানো, খাঁটি সর্ষার তেলের জন্য অনেক ঘানি স্থাপন করিয়াছেন এবং যতদূর সম্ভব প্রজাদের সহায়তায় কো অপারেটিভ প্রথাও প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনি পারতপক্ষে এমন কোনও বিলাতী যন্ত্র ব্যবহার করিতে চান না, যাহা মানুষকে বেকার করিয়া ফেলে। তাঁহার মনে হয়, সেফটি রেজার, নেল কাটার, ড্রাইং ক্লিনিং এর দোকান, নানা ফ্যাশানের বিদেশী বাসনপত্র, মিলের কাপড়— এ সবই বিজ্ঞানের জয় ঘোষণা করিতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহারা মানুষদের বেকার করিয়া দিতেছে, তাহাদের হাতের কাজ কাড়িয়া লইতেছে। সেকালের নাপিত, তাঁতি, কর্মকার, কম্ভকার ধোপা, এমনকি কৃষকদের প্রতি যে আত্মীয়সুলভ মনোভাব ছিল, তাহা এখন আর নাই। তাহারা বেকার হইয়া ক্রমশ, আমাদের শত্রু হইয়া উঠিতেছে। যাহাদের পূর্বপুরুষেরা সমাজে অপরিহার্য অঙ্গ ছিল, তাহারা আজ সমাজের কেহ নয়। যাহাদের পূর্বপুরুষদের প্রস্তুত মসলিন বা ঢেরা কোটা দেখিয়া জগৎ বিস্মিত হইত তাহাদের বংশধরেরা আজ আপিসের কেরাণী। তাহাদের শিল্পকে নষ্ট করিয়া আমরা যন্ত্রের দাসত্ব করিতেছি। এসব কথা হরিশ্চন্দ্র অনেকবার ভাবিয়াছেন, নিজের এবং উপানন্দের জমিদারিতে নিজের আদর্শকে মূর্ত করিবার প্রয়াসও পাইতেছেন। উপানন্দ যদিও তাহার সহিত একমত নহে -সে আধুনিক বিজ্ঞানের পক্ষপাতী কিন্তু সে কখনও হরিশ্চন্দ্রকে বাধা দেয় না। তাহার ভাবটা, হরিশ্চন্দ্র একটা experiment করিতেছে করুক না--যাহা অনিবার্য, তাহা তো শেষপর্যন্ত ঘটিবেই। সেই অনিবার্য ঘটনাটা কেমন হইবে তাহাও আগে আন্দাজ করাও শক্ত।

উপানন্দ নিজের চারিদিকে একটা আনন্দলোক সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যেই নিমগ্ন হইয়া থাকে। বেহালাটা বিদেশী না দেশী, ছবি আঁকিবার বা ফোটো তুলিবার ফিল্মগুলির অবস্থান কোথায়—ইহা লইয়া সে মাথা ঘামায় না। সে গোলাপগাছও বিলাত হইতে আনায় এবং কাচের ঘর বানাইয়া সে-ঘরে উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত করিয়া অনেক রকম কাণ্ড সে করিয়াছে নানা রকম গোলাপ ফুলের রং উপভোগ করিবার জন্য। সে রূপ-সন্ধানী খেয়ালী লোক। তাহার খেয়াল-লইয়াই সে মত্ত। জমিদারির ভার হরিশ্চন্দ্র বহন করে। বিষয়ের প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র লোভ নাই। বস্তুতঃ, কোনও বস্তুর প্রতিই তাহার আসক্তি নাই। অনেক টাকা খরচ করিয়া নানা রকম শখের জিনিস কেনে, কিন্তু শখ মিটিয়া গেলেই সেগুলির সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া যায়।

মনটা শিশুর মনের মত। আর একটা যে জিনিস হরিশ্চন্দ্রকে আকৃষ্ট করিয়াছে তাহা তাহার ব্রহ্মচর্য। বহু দেশে ঘুরিয়াছে, বিদেশে অনেকদিন লেখাপড়া শিখিয়াছে, কিন্তু কোনও স্ত্রীলোকের মোহে পড়িয়া সে বিপথে যায় নাই। সে বলে, ভালোবাসিতে পারি এমন স্ত্রীলোক আমার চোখে পড়ে নাই। মাঝে মাঝে সৌরভ পাইয়াছি, কিন্তু সেজন্য ফুলটাকে বিবাহ করিবার প্রবৃত্তি হয় নাই, এ বিষয়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমি একমত।

'ফুলের যা দিলে নাহি কোন ক্ষতি
অথচ আমার লাভ,
আমি চাই সেই, সেই সৌরভটুকু
অতনু অতল ভাব—'

কথাটা অনেকদিন পরে মনে পড়িল হরিশ্চন্দ্রের। তিনি একা একাই হাসিয়া উঠিলেন— খিত্ খিত্ করিয়া শব্দ হইল। তাঁহার নিজের যৌন-প্রকৃতির মুখে তিনি রাশ টানিয়া রাখিয়াছেন মাকে কথা দিয়াছিলেন বলিয়া। তিনি যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, সেইদিন কনকলতা তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'তুমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে তো?'

'কেন পারব না। তুমি তো বাল-বিধবা, তুমি নিজেকে ঠিক রেখেছ কি করে? আমিও পারব।'

'কথাটা মনে থাকে যেন। যদি তোমার নামে কোনদিন কলঙ্ক শুনি, সেইদিন আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব কিন্তু।'

হরিশ্চন্দ্র হাসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন।

'পারবে?'

'নিশ্চয় পারব!'

'পাপের বাড়িতে আমি থাকতে পারি না।'

'বেশ, দেখো।'

হরিশ্চন্দ্র এ পর্যন্ত তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন।

হরিশ্চন্দ্রের চিন্তাধারা বিঘ্নিত হইল। নিকটেই একটা গাছের উপর কয়েকটা শালিক পাখি আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল।

হরিশ্চন্দ্র উঠিয়া গিয়া গাছটার নীচে দাঁড়াইলেন এবং খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া দেখিতে পাইলেন, গাছটার উপরে একটা সাপ রহিয়াছে। আর-একটা ডালে শালিক পাখিদের বাসা।

ঠিক সেই সময় টহল সহিস আসিয়া প্রবেশ করিল। সে পোস্টাপিসে গিয়াছিল শীর্ষা দেবীর চিঠিটি রেজিষ্ট্রি করিতে। সে সেই রসিদটি হরিশ্চন্দ্রকে দিল। হরিশ্চন্দ্র রসিদটি পকেটে রাখিয়া দিলেন।

'ঝুমনা কোথা?'

'সে পটল ক্ষেতে বেড়া দিচ্ছে।'

'তাকে ডাক, ধনুকটা নিয়ে আসতে বল। ওই গাছে একটা সাপ উঠেছে। শালিকগুলো চেঁচাচ্ছে।'

টহল চলিয়া গেল। একটু পরেই তীরন্দাজ ঝুমনা তীর-ধনুক লইয়া হাজির। 'কোথা সাপ বাবু?'

'গাছের ওপর। ওই, দেখ।'

ঝুমনা স্বল্পভাষী। সে কিছু না বলিয়া ধনুকে তীর লাগাইয়া কয়েক মুহূর্ত সাপটার দিকে

চাহিয়া থাকিয়া তাহার তীর নিক্ষেপ করিল। তীর-বিদ্ধ সাপটা সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়িয়া গেল। দেখা গেল, সাপটি গোখ্‌রো সাপ।

ঝুমনা বলিল, 'সাপটার বিষদাঁত দুটো ভেঙে বিষের থলিটা আমি বার করে নেব।'

'কি করবি ও নিয়ে?'

'বিজন মাঝি সাপের বিষ কেনে। কলকাতায় বিক্রি করে। আমাকে দুটো টাকা দেবে।'

সাপটা লইয়া ঝুমনা চলিয়া গেল।

হরিশ্চন্দ্রের সাঁওতাল প্রজা অনেক আছে। তাহাদের মধ্যে একদল শিকারী আছে। হরিশ্চন্দ্র তাহাদের খুব উৎসাহ দেন। তাহাদের তীর-ধনুক, বল্লম, টাঙ্গী, তলোয়ার, গুপ্তি কিনিযা দেন তিনি। এছাড়া ছোট-বড় নানারকম লাঠিও ব্যবহার করে তাহারা। থাম্বা জঙ্গলে প্রায়ই শিকার করিতে যায় তাহারা। বন্যবরাহ, বন্য খরগোশ, শজারু তাহাদের প্রিয় খাদ্য। একবার একটা প্রকাণ্ড ময়াল সাপকে ফাঁস লাগাইয়া ধরিযাছিল। বাঘও মারিযাছিল এক-বার লাঠি ও বল্লম দিয়া। বাঘটার সহিত সম্মুখ সমরে আহত হইয়াছিল ঝুমনার বাবা। হবিশ্চন্দ্র তাহার চিকিৎসার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রায় তিন মাস শয্যায় ছিল সে। সে যখন সারিয়া উঠিল তখন একদিন সভা করিয়া বাঘ-আঁকা একটি স্বর্ণপদক তাহাকে উপহার দিয়াছিলেন এবং তাহাকে উপাধি দিয়েছিলেন 'ব্যাঘ্রজিৎ'--সেটা অবশ্য এখন সংক্ষেপে 'বাঘু' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সবাই তাহাকে 'বাঘু মোড়ল' বলিয়া ডাকে। বলিষ্ঠ বুকের উপর বাঘের থাবার চিহ্নটা তাহার গর্বের বস্তু। সে এখনও বেশ শক্তসমর্থ আছে। সাঁওতাল শিকার বাহিনীর দলপতি সে। ঝুমনা তাহারই ছোট ছেলে। হরিশ্চন্দ্র যখন মাঠে কাজকর্ম করেন তখন তাহার ফাইফরমাস খাটে সে। পাশেই যে দশ বিঘা জমি, সেটি তাহার বাবার। সে-জমির এক প্রান্তে ছোট একটা ঘর আছে, সেইখানেই সমস্ত দিন থাকে ঝুমনা। সমস্ত দিন তীর-ধনুক লইয়াই লক্ষ্যভেদ করিয়া বেড়ায়। একটা উড়ন্ত পাখিকে একদিন সে ভূপাতিত করিয়া হরিশ্চন্দ্রের নিকট বকুনি খাইয়াছিল।

'ওকে মারলি কেন? ওতো আমাদের অনিষ্ট করে নি। অনিষ্টকারী জীব জন্তুকে মারবি? নিরীহ পাখিকে মেরে কি হবে?'

ঝুমনা সাপটা লইয়া চলিয়া যাইবার পর শালিকদের চীৎকার থামিযা গেল। হরিশ্চন্দ্রও অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। খানিকক্ষণ পরে সেই চিন্তাটা তাঁহার মনে জাগিল—যাহা আজকাল প্রায় জাগে—তাহার অবর্তমানে এতবড় জমিদারির কি পরিণাম হইবে? শুধু তাঁহার নয়, উপানন্দের বিষয়েরই বা কি পরিণাম হইবে? উপানন্দ বলে, তুই যা খুশী কর। ওসব ঝঞ্ঝাট আমি বইতে পারব না। যতদিন বাঁচব সুখে বাঁচতে চাই। উপানন্দের সুখে বাঁচা মানে নিজের খেয়ালখুশী মত বাঁচা।

অনেক জমিদারের খেয়ালখুশী মানেই মদ মেয়েমানুষ এবং গভর্ণমেণ্টের খোশামোদ করিয়া কোন খেতাব লাভ করা। উপানন্দ পবিত্র-চরিত্র, শিল্পীলোক। অনেকগুলি যন্ত্র বাজাইতে পারে, চমৎকার ছবি আঁকে, ফোটো তোলে। শিকার করিবার ঝোঁকও আছে। সম্প্রতি ঝোঁক ধরিয়াছে, থাম্বা জঙ্গলের ভিতর একটা চারতলা বাড়ি বানাইবে। প্রত্যেক তলায় কেবল একটিমাত্র বড় ঘর থাকিবে। মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া একা থাকিবে। দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, নানারকম ক্যামেরা সব আছে তাহার। নানারকম বাদ্যযন্ত্র তো আছেই। সেদিন অনেক

টাকা খরচ করিয়া একটা পিয়ানো কিনিয়াছে। বিলাতে যখন পড়িতে গিয়াছিল তখনই পিয়ানো বাজানো শিখিয়াছিল। উপানন্দ নিজেকে লইয়াই সারাদিন থাকে। সন্ধ্যার সময় আসিয়া হরিশ্চন্দ্রের বাড়িতে খায় এবং গান-বাজনা করে। গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে কখনও যায় না। হরিশ্চন্দ্রকে ছাড়িয়া থাকিতে পাবে না সে। এই সুপুরুষ সচ্চরিত্র বিদগ্ধ গুণী বন্ধুটিকে ছাড়িয়া হরিশ্চন্দ্রও থাকিতে পারে না। উপানন্দকে সে শুধু ভালোবাসে না, শ্রদ্ধা করে। সে অনুভব করে, উপানন্দের মধ্যে এমন একটা কি আছে যাহা অবর্ণনীয়, যাহা তাহার নাগালের বাহিরে এবং যাহা অনবদ্য। গাছের গোড়াগুলি খুঁড়িতে খুঁড়িতে সে উপানন্দের কথাই ভাবিতেছিল. এমন সময় ঝুমনা আসিয়া খবর দিল, কবিরাজ মহাশয় এবং একজন সাহেব আসিতেছেন।

হরিশ্চন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইলেন, কবিরাজ মহাশয় এবং ডক্টর সোম আসিতেছেন।

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, 'ডক্টর সোম অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গাছ খুঁজে বার করেছেন। তার মধ্যে দু তিনটি গাছ তিনি চিনতে পেরেছেন।

ডক্টর সোম বলিলেন, 'তোমরা আমাকে বিশ-পঁচিশ বিঘে জমি দাও। কবরেজ মশাই সেখানে গাছগুলো লাগিয়ে তাদের জীবনচরিত্র পর্যবেক্ষণ করুন। ওদের ফুল-ফল, বিভিন্ন ঋতুতে ওদের কি-কি পরিবর্তন হয় সেটাও লক্ষ্য করে লিখে রাখুন, ওদের বংশবৃদ্ধি কি উপায়ে হয় সেটাও লক্ষ্য করুন, ওদের বীজ সংগ্রহ করে রাখুন। এর জন্য ওঁকে মাসিক পারিশ্রমিকও আমি অবশ্য দেব, উনি যদি নিতে রাজি থাকেন, কিন্তু সর্বাগ্রে কিছু জমি চাই। শুনলাম, উপানন্দের অনেকখানি জমি এমনি পড়ে আছে, ও যদি সেটা আমাকে বিক্রি করে......'

'ও বিক্রি করবে না।'

'আমি বলে দেখব যদি করে।'

'উপা তার জমিদারির ভার আমার ওপর দিয়ে দিয়েছে। আমি যা করব তাই হবে। আমি ওর জমিদারির ছটাক জমিও বিক্রি করব না। তবে তুমি যদি ওখানে কিছু গাছপালা লাগাতে চাও, আমি আপত্তি করব না, বরং খুশীই হব। কবিরাজ মশাই পণ্ডিত লোক, একটা মনোমত কাজ পাবেন। তুমি লাগাও না গাছ। তবে জমি বিক্রি আমি করব না।'

ডক্টর সোম হাসিয়া বলিলেন, 'লাগাতে যদি দাও তাহলেই আমি খুশী। কবিরাজ মশাই সব দেখাশোনা করবেন। জমি কিনবার লোভ আমার নেই। আমি কালই আমেরিকা চলে যাচ্ছি? কবে ফিরব—ফিরব কিনা জানি না। তোমাদের জমিদারিতে আমার এই সামান্য কয়েকটা গাছের স্মৃতি যদি কবিরাজ মশাই বাঁচিয়ে রাখতে পারেন, তাহলেই আমি খুশী হব। পণ্ডিত মশায়ের জন্য কিছু প্রণামী আমি রেখে যাব উপার কাছে। চল, এবার বাড়ি ফেরা যাক। উপা আমার জন্য না খেয়ে অপেক্ষা করছে।'

'তুমি যাও, আমার যেতে একটু দেরি আছে।'

হরিশ্চন্দ্র দূরে রাস্তার উপর মোটরটা দাঁড়াইয়া আছে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার আর-একবার মনে হইল, ইহারা এমন যন্ত্রের দাস হইয়া পড়িতেছে!

ইহার পর যে ঘটনাটি ঘটিল তাহা বেশ নাটকীয়। বাঘু একটি বৃদ্ধাকে টানিতে টানিতে লইয়া হাজির হইল।

'দেখুন হুজুর, রুইলা আপনার পূবদিকের ক্ষেত থেকে তরকারি চুরি করে পালাচ্ছিল। আপনি ওদের পাঁচ বিঘা নিষ্কর জমি দিয়েছেন, যাতে ওদের অভাব না থাকে। তবু দেখুন,

ওদের চুরি করা স্বভাবটা। ওর বেটা খেতুও একদিন আমার ক্ষেত থেকে কুমড়ো নিয়ে পালিয়েছিল।'

হরিশ্চন্দ্র কিছু বলিবার পূর্বেই খেতুর মা পেট-কাপড় হইতে তরকারিগুলি বাহির করিয়া মাটির উপর উজার করিয়া ঢালিয়া দিল এবং ছুটিয়া আসিয়া হরিশ্চন্দ্রের পায়ের উপর মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, 'আপনি আমাকে জুতো মারুন বাবু, আপনি আমাকে জুতো মারুন।'

'কি হল কি? তুই এসব কি করেছিস?' খেতু কি জমি চাষ করে না? পাঁচ বিঘে জমিতে তোদের চলে যাওয়া উচিত।'

'খেতু কি চাষ করে? সে জমিটা আধিতে দিয়ে দিয়েছে হকরুকে। হকরু যা খুশী তাই দেয়। আর সেটা বেচে খেতু তাড়ি খায়। আর হকরুর বিধবা বোন নাগিনের সঙ্গে ও জুটেছে। দিনরাত হকরুর বাড়িতেই পড়ে থাকে। ও আমার ছেলে নয় বাবা, শত্রু। কাল থেকে খেতে পাই নি, ঘরে চাল-ডাল কিছু নেই, হাতে পয়সাও নেই। তাই ভাবলুম, কিছু তরকারি নিয়ে যাই, সিদ্ধ করে খাব।'

খেতুর বাবা হরিশ্চন্দ্রের পুরাতন বিশ্বাসী চাকর ছিল। সর্পাঘাতে তাহার অকালমৃত্যু হয়। খেতুর বয়স তখন ষোল বছর। তাই তাহাকে তিনি পাঁচ বিঘা জমি দিয়াছিলেন। আশা করিয়াছিলেন, মা-বেটার গ্রাসাচ্ছাদন উহাতে চলিয়া যাইবে। এখন দেখিতেছেন, তাঁহার আশা সফল হয় নাই। কু-সঙ্গে মিশিয়া খেতু উচ্ছন্ন গিয়াছে। খেতুর মায়ের দুঃখ তিনি ঘুচাইতে পারেন নাই। আগেও যে কথা তাঁহার একাধিকবার মনে হইয়াছিল, সেই কথাই আবার মনে হইল, দেশের লোকের চরিত্র যতদিন না উন্নত হইতেছে, ততদিন দেশের উন্নতি হইবে না। আবার তাঁহার মনে হইল, এই যন্ত্র সভ্যতাই আমাদের ষড়রিপুকে উদ্দীপিত করিয়া আমাদের অমানুষ করিয়া ফেলিতেছে। এই খেতু ছেলেটা তাহাদের বাড়িতেই কাজ করিত। কিছুদিন আগে সে শহরে পলাইয়া গিয়া মিলে কাজ লইয়াছিল। সেখানেই তাড়ি খাইতে শিখিয়াছে। তিনি খেতুর মাকে বলিলেন, 'চুরি করে তুই অন্যায় করেছিস। তুই আমার বাড়িতে গিয়ে থাক, সেখানেই খাবি দুবেলা। আমি খেতুর কাছ থেকে জমি কেড়ে নেব। ম্যানেজারবাবুকে বলে দেব। তুই এখন এই তরকারিগুলো নিয়ে যা।'

খেতুর মা তরকারিগুলি তুলিয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

হরিশ্চন্দ্র আবার গাছ খোঁড়ায় মন দিলেন। হঠাৎ তাঁহার পাদোদক চক্রবর্তীর কথা মনে পড়িল। পাদোদক তাঁহার প্রপিতামহ গঙ্গোদকের ভাই পুণ্যোদকের বংশধর। গঙ্গোদকের এক ভাই ছিল পুণ্যোদক। তাঁহারই পৌত্র পাদোদক। সে বাঁকুড়া জেলার এক গ্রামে শ্বশুরালয়ে ঘরজামাই হইয়া থাকে। তাহার শালা একজন উকিল। শালার পরামর্শে সে হরিশ্চন্দ্রের জমিদারির কিছু অংশ দাবী করিয়া মোকদ্দমা করিয়াছে। গঙ্গোদক যখন ভাইদের পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন, তখন তিনি প্রত্যেক ভাইয়ের নিকট হইতে তাহাদের জমিদারির অংশ নগদ টাকা দিয়া কিনিয়া লইয়াছিলেন এবং সেসব দলিল এখনও মজুত আছে। সুতরাং মোকদ্দমা করিয়া পাদোদক কিছু করিতে পারিবে না, কিন্তু এই মোকদ্দমার হাঙ্গামা, এই মোকদ্দমার পিছনে যে ঈর্ষার মনোভাব, তাহা হরিশ্চন্দ্রের মনকে বড়ই চঞ্চল করিয়াছে। তিনি পাদোদককে কখনও দেখেন নাই। বস্তুতঃ গঙ্গোদকের ভাইদের কোনো খবরই তিনি রাখেন না। তাহারাও রাখে না। হরিশ্চন্দ্র শুনিয়াছেন, একজন বস্তারে আছেন, সেখানে একজন ধনী মহিলাকে বিবাহ

করিয়াছেন। আর একজন আছেন পাঞ্জাবে। মিলিটারিতে কাজ করেন। কিছুদিন আগে মোকদ্দমা করিয়া পাদোদক তাহার নামে যে উকিলের চিঠি দিয়াছেন তাহার উত্তরে তিনি জানাইয়াছিলেন আইনত পাদোদক কিছু পাইবে না। তবে সে যদি অর্থকষ্টে পড়িয়া থাকে হরিশ্চন্দ্র তাহাকে কিছু সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। এ চিঠির কোনও উত্তর আসে নাই। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের মনের ভিতর একটা বেদনা যেন মাঝে মাঝে টনটন করিয়া উঠিতেছে। আবার তাহার মনে হইতেছে, এতবড় বিষয়ের শেষ পরিণাম কি হইবে? এ বিষয়ের প্রতি আমার কেন এত মায়া? আবার মনে হইল, উপানন্দ আমার চেয়ে ঢের বেশী সুখী। সে নিরাসক্ত।

সেদিন তিনি সকাল সকাল মাঠ হইতে ফিরিয়া সোজা ম্যানেজারবাবুর বাড়িতে গেলেন। ম্যানেজার কুঞ্জলাল তাঁহার পিতৃবন্ধু রাধানাথ ন্যায়রত্নের পুত্র। তিনি পড়াশোনায় ভালো ছেলে ছিলেন বলিয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া উচ্চ শিক্ষা দিয়াছিলেন। বরাবর স্কলারশিপ পাইয়া তিনি এম. এ., বি. এল. পাশ করিয়া যখন গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন তখন রামচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'তুমি আর গ্রামের বাইরে যেও না। আমাদের জমিদারির দেখাশোনা কর। তোমাকে একশ' বিঘে জমি দিচ্ছি, তাছাড়া আড়াই শ' টাকা করে মাইনেও দেব। মাইনে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর কুড়ি টাকা করে বাড়বে, হাজার টাকা পর্যন্ত হবে। তোমার বাড়িও আমরা তৈরি করে দেব। তোমার বাবার টোলে একজন ভাল পণ্ডিত বহাল কর। আমাদের স্টেট থেকেই তাঁর ভরণ-পোষণ হবে।'

তখন হইতেই কুঞ্জলাল স্টেটের সর্বেসর্বা। হরিশ্চন্দ্র তাঁহার ব্যবহারের জন্য ঘোড়া, হাতী, পালকি, ঘোড়ার গাড়ি কিনিয়া দিয়াছেন। কুড়িজন লাঠিয়াল এবং দুইজন কিরিচ-বন্দুকধারী গুর্খা তাঁহার বাড়ি সর্বদা পাহারা দেয়। হরিশ্চন্দ্র নিজে যদিও আড়ম্বরপ্রিয় নন, কিন্তু তাঁহার স্টেটের ম্যানেজারের মর্যাদা ও আভিজাত্য যাহাতে জাঁকজমকপূর্ণ হয় এ বিষয়ে হরিশ্চন্দ্রের একটা শিশুসুলভ মনোভাব ছিল। ম্যানেজারের বাড়িটি রাজপ্রাসাদবৎ। হরিশ্চন্দ্র আসিয়াছেন খবর পাইয়া কুঞ্জলাল তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন।

'আপনি এই অসময়ে হঠাৎ এলেন যে, আমাকে খবর পাঠালে আমিই যেতাম।'

'মাঠেই মনে হল কথাটা। তাই মাঠ থেকেই চলে এলাম।'

'কি কথা?'

'একটা উইল করতে চাই।'

কুঞ্জলাল একটু বিস্মিত হইলেন। কোনও কথা বলিলেন না।

হরিশ্চন্দ্র বলিতে লাগিলেন, 'মৃত্যু কখন আসবে কিছু বলা যায় না। হঠাৎ মনে হল, আমি যদি আগে মারা যাই মায়ের কি হবে? তিনি তো আমার নিজের মা নন। আমি তাই উইল করতে চাই যে আমার অবর্তমানে মা এ সংসারে যেমন সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন তেমনি থাকবেন, তাঁর নির্দেশেই সংসারে সব কাজকর্ম চলবে। তাছাড়া প্রতি মাসে তিনি পাঁচশ টাকা করে হাতখরচ পাবেন। আর একটা কথা থাকবে সে উইলে। উপাই আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। এই উইলটা লিখে কালই তুমি আমার কাছে নিয়ে যাবে। এর সাক্ষী থাকবে তুমি আর স্কুলের হেডমাস্টার মশাই। আর কথাটা যেন গোপন থাকে।'

'তা তো থাকবেই। আমি কাল হেডমাস্টার মশাইকে নিয়ে যাব আপনার কাছে।'

বেশ। আমি তবে এখন উঠি।'

'গাড়ি করে আপনাকে পৌঁছে দিক।'

'না, আমি হেঁটেই যাব।'

হরিশ্চন্দ্র বাহির হইয়া গেলেন।

সেদিন সান্ধ্যবৈঠকে উপানন্দ একাই আসিলেন। হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে একা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

'তোমার বন্ধুটি কোথায়?'

'সে কলকাতা চলে গেল। তার বান্ধবী লিসা কলকাতায় এসেছে। বিকেলে তার টেলিগ্রাফ এসে হাজির, অবিলম্বে চলে এস। সন্ধ্যের ট্রেনে সে চলে গেছে। তোমার সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার সময় পায় নি। তোমাকে একটা চিঠি দিয়ে গেছে।'

হরিশ্চন্দ্র গড়গড়ায় টান দিতে দিতে পত্রটি পড়িলেন।

ভাই হরিশ্চন্দ্র,

উপানন্দ আমার অনেক দিনের বন্ধু। কিন্তু তার বাড়িতে এই প্রথম এসেছিলাম। এসে তোমাকে পেলাম। তোমার সঙ্গে আমাব মতেব মিল হয় নি। বিজ্ঞানের প্রগতিকে আমি বরণ করতে চাই, তুমি চাও না। চাইলে তোমাদের জমিদারির অনেক উন্নতি হত। মতের সঙ্গে মিল না হলেও তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। শ্রদ্ধা কববাব মত লোক পৃথিবীতে বেশী পাই নি। যে অল্প দু'চারজনকে দেখেছি তার মধ্যে তুমি একটি। আমি বিজ্ঞানী লোক, নানারকম experiment কবি। প্রণয় নিয়ে একটা experiment কর্বছি। সেই experiment-এব পাত্রী কলকাতায় এসে আমাকে ডাক দিয়েছেন, তাই আমাকে এত তাড়াতাড়ি চলে যেতে হল। তা না হলে আরও কিছুদিন থাকতুম। শুধু তোমাকে নয় তোমার মাকেও আমাব খুব ভাল লেগেছে। তাঁকে দেখে মনে পড়ছে আমার নিজের মাকে। তুমি আমার অকপট শ্রদ্ধা গ্রহণ কর। তোমার মাকে আমার প্রণাম জানিও। ইতি—

নয়ন

হরিশ্চন্দ্র গড়গড়ায় একটি লম্বা টান দিয়া চিঠিখানির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর চিঠিটি উপানন্দকে দিলেন। 'প্রেম নিয়ে experiment, বুঝতে পাবলাম না ঠিক।'

উপানন্দর স্বভাব, চট করিয়া কোনও কথার জবাব দেন না. হাসিমুখে নীরবে চাহিয়া থাকেন। তিনি হরিশ্চন্দ্রের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর একটি সিগারেট বাহির করিয়া নিপুণভাবে ধরাইলেন সেটি। তাহার পর বলিলেন, 'ও আমেরিকায় একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছে। মেয়েটি রূপসী, সেখানে এক কলেজে পড়ায়। অনেকগুলি ভাষা জানে। বাংলা ভাল জানে। বাংলা হাতের লেখা মুক্তোর মতো। মেয়েটি নয়নকে বিয়ে করতে চেয়েছিল কিন্তু নয়ন বিয়ে করে নি। বলেছে, তোমাকে ভালবাসি বলেই বিয়ে করব না। যে কোনও বাঁধনের ঘর্ষণে প্রেমের মৃত্যু হয়। তোমাকে আমি কোনও রকম বাঁধনে বাঁধতে চাই না। তোমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলাম। আমিও সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকতে চাই। আমি কেবল তোমাকে ভালবাসব। তুমি নিজে যথেষ্ট রোজগার কর, আমারও টাকার অভাব নেই। সুতরাং অর্থাভাবে কাউকে কারও অধীনতা স্বীকার করতে হবে না। মেয়েটিও এতে রাজি হয়েছে। কাউকে বিয়ে করে নি।'

হরিশ্চন্দ্র খিত্ খিত্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

'ও রকম পবিত্র প্রণয় তো এক পরম ব্রহ্ম ছাড়া আর কারও সঙ্গে হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দেশের সংযমী সাধুরা এই রকম প্রেমিক। তাঁরা নমস্য, কিন্তু নয়নবাবু কি সেই জাতের?'

'না, মোটেই তা নয়। ও ভোগী। আমার মনে হয়, এটা ওর এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট (experiment)। ও দেখতে চায় বন্ধনহীন ভালবাসা ধোপে টেকে কিনা। মেয়েটিকে কিন্তু ও সত্যিই খুব ভালবাসে। আর এও জানি, ওকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাও দিয়েছে ও।'

'নিজে কি ও সংযমী আছে?'

'তা জানি না ভাই। বিলেতে ছাত্রজীবনে দেখতুম মেয়েদের সঙ্গে ও খুব মিশত। এর বেশী আর কিছু জানি না। তবে ও একজন প্রতিভাবান লোক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রতিভাবান লোকেদের মাথায় একটু আধটু ছিট থাকে।'

'তুইও কম প্রতিভাবান নোস। তোর মাথা তো নানারকম ছিটের দোকান। অথচ তুই কোনও মেয়েমানুষকে ভালবাসিস নি।'

'আমি শিল্পী। আমি ভালবেসেছি মা সরস্বতীকে। তিনি নানা রূপে আসেন আমাব কাছে।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু তুই বিয়ে করলি না, আমিও করব না। আমাদের এতবড় বিষয়ের পরিণাম কি হবে তা কখনও ভেবেছিস?'

'ওসব ভাবনা তুমি ভাবো। তোমার যা খুশী তাই কর। আমি বাধা দেব না। তবে একটা কথা জেনে রাখ, সব বিষয়েরই পরিণাম এক। তা একজনের কাছে বেশী দিন থাকে না। লক্ষ্মী চঞ্চলা। সেই সেকালের হাম্মুরাবি রাজা থেকে অনেক রাজার খবর ইতিহাসে লেখা আছে, তাদের অনেক বিষয় ছিল, প্রবল প্রতাপ ছিল, কিচ্ছু টেকে নি। সব ভেসে গেছে। কারো নাম ইতিহাসের পাতায় আছে, কারো নেই। না থাকাটাই পৃথিবীর নিয়ম। যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ যদি আনন্দে বেঁচে থাকতে পারি তাহলেই যথেষ্ট। ওর বেশী কিছু চাই না, চাইলেও পাব না।'

'অনেকে মদ মেয়েমানুষ নিয়ে মেতে থাকে, সেটাকেও কি তুই ভাল বলবি?'

'আমাদের ওসব ভাল লাগে না, কিন্তু কারো যদি লাগে তাকে মন্দ বলতে পারি না। আমার শঙ্করাচার্যকে ভাল লাগে, ওমর খৈয়ামকেও ভাল লাগে। ভালবাসা পাওয়া জীবনে একটা পরম প্রাপ্তি। তা সবাই পায় না, যারা পায় তাদের তুমি নিন্দে করতে পার না।'

'আমি কিন্তু মদ মেয়েমানুষের ভেতর না গিয়েও ভালবাসার আস্বাদ পেয়েছি। যেমন আমি তোকে ভালবাসি।'

'আমার চেয়েও তুমি ভালবাসো তোমার ঐ অদ্ভুত খেয়ালটাকে।'

'কি খেয়াল?'

'তোমার যন্ত্র-বিরোধিতা। ওই নিয়েই মেতে আছ তুমি। তোমার যুক্তি আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু মানুষ একদিন বনে ছিল। যে পথে চলে সে আজ মহাকাশে গিয়ে পৌঁছেছে, সে পথের শেষ প্রান্তে হয়তো মহামুক্তি বা মহাবিনাশ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে। তবু কিন্তু সেই পথেই আমাদের চলতে হবে, ফেরবার উপায় নেই। কিন্তু তোমার এই পাগলামিটা আমার খুব ভাল লাগে। ওই জন্যেই তোমাকে আরও ভালবাসি। ওই জন্যেই তুমি অসাধারণ।'

'হয়েছে, হয়েছে। ভুল বলেছি, তোকে আমি একটুও ভালবাসি না। তুই বিলাসী, স্বার্থপর, ফোতোবাবু, নিজের সুখ ছাড়া আর কিছু বুঝিস না।'

হরিশ্চন্দ্র চোখ বড় বড় করিয়া ভড়াক্ ভড়াক্ করিয়া গড়গড়ায় টান দিতে লাগিলেন। উপানন্দ নীরবে হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন তাঁর মুখের দিকে। পরক্ষণেই গুপী ও নকু প্রবেশ করিল। গুপীর হাতে উপানন্দের বেহালা, নকুর হাতে একটি ট্রেতে কফির সরঞ্জাম। নকু কফির ট্রে টেবিলের উপর নামাইয়া দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল এবং হরিশ্চন্দ্রের জন্য শ্বেতপাথরের গ্লাসে গুড়ের শরবৎ লইয়া আসিল। হরিশ্চন্দ্র কিন্তু তামাকই খাইতে লাগিলেন। উপানন্দ জানেন, এ সময় কথা কহিলে হরিশ্চন্দ্রের রাগ আরও বাড়িয়া যাইবে। তিনি নীরবে কফির কাপে চুমুক দিতে লাগিলেন এবং নীরবেই কফির পেয়ালাটি শেষ করিয়া ফেলিলেন। নকু কফির খালি কাপ ভিতরে লইয়া গেল। হরিশ্চন্দ্রও গড়গড়ার নলটি নামাইয়া রাখিয়া শরবতের গ্লাসটি তুলিয়া ঢক ঢক করিয়া শেষ করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর উপানন্দের দিকে না চাহিয়াই বলিলেন, 'যে দেশে ঘরে ঘরে দারিদ্র্যের নানা মূর্তি, সে দেশের শিক্ষিত ছেলে হয়ে তুই হাজার হাজার টাকা বিলাসে খরচ করিস, তোর লজ্জা করে না?'

'না। যার রং কালো তাকে ফরসা করার ক্ষমতা আমার নেই। আমার সমস্ত জমিদারিটাই তো তোমার হাতে তুলে দিয়েছি, তুমিও চেষ্টার ক্রুটি করছ না, হচ্ছে কিছু? তোমার এই অম্বুরি তামাকের গন্ধ চারিদিকে প্রচার করছে যে তুমিও বিলাসী। তোমার ওই শ্বেতপাথরের গেলাসে কাগ্‌জি লেবুর রস দিয়ে গুড়ের শরবৎ খাওয়াও একরকম বিলাস। আমার বিলাস উড়ন্ত প্রজাপতির ছবি তোলা, তোমার মাঠে গিয়ে জমি খোঁড়া'। আমরা দুজনেই বিলাসী, কিন্তু আমাদের রুচি ভিন্ন। এক জায়গায় কিন্তু আমাদের মিল আছে?

'না, কোথাও মিল নেই।'

'আছে, আর সে মিল অচ্ছেদ্য। আমি রসস্রষ্টা, তুমি রসিক। তুমি নীতিবাগীশ, কিন্তু আমার আঁকা ন্যাংটা ভিখারিটার ছবিটা দেখে তুমি বাহবা দিয়ে উঠেছিলে সেদিন। তোমাকে বাজনা না শোনালে আমার তৃপ্তি হয় না, আর আমার বাজনা শোনার জন্যে তুমি উৎসুক হয়ে থাকো।'

হরিশ্চন্দ্র হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া উপানন্দের পিঠে গুম করিয়া একটা কিল বসাইয়া দিলেন, তাহার পর তাহার গলা জড়াইয়া তাহার ললাটে চপাৎ করিয়া একটা চুম্বন বসাইয়া দিলেন।

'ছাড়ো ছাড়ো, কি যে কর।'

হরিশ্চন্দ্র পুনরায় গিয়া নিজের আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন, 'তোর ওই ছবিটা ন্যাংটা ভিখারিণীর ছবি বলে ওতরায় নি। উতরেছে তুই ওর সামনে একটা উদ্ধত সাহেবের ছবি এঁকেছিস বলে। ওটা একটা ঐতিহাসিক সত্যের ছবি হয়েছে। আর একদিন দেখে আসব ছবিটা।'

'সে ছবিটা নয়নকে দিয়ে দিয়েছি। তারও খুব পছন্দ হয়েছিল।'

'অমন ছবিটা দিয়ে দিলি?'

উপানন্দ কিছু না বলিয়া হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পর মুহূর্তেই গুপী, নকু এবং জঙ্গী আসিয়া ঘরের জানালাগুলি বন্ধ করিতে লাগিল।

'জানালা বন্ধ করছিস কেন?'

'খুব বৃষ্টি আসছে। পশ্চিমদিকের আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে।'

'এখন এক পশলা জলের দরকারও খুব।'

হরিশ্চন্দ্রের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

প্রচণ্ড একটা বজ্র হানিয়া বৃষ্টি ঘোষণা করিল নিজের আগমনবার্তা এবং একটু পরেই ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া বৃষ্টি আসিয়া পড়িল।

'আজ আর কেউ আসবে না। তুই একটা বাজা কিছু।'

উপানন্দ চুপ করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণের জন্য যেন নিজের মনের অতলে তলাইয়া গেলেন। তাহার পর বেহালাটা বাহির করিয়া সুর বাঁধিতে লাগিলেন। হরিশ্চন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজিয়া ফেলিলেন।

বাহিরে ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, আর ঘরের ভিতরে উপানন্দ তন্ময় হইয়া যাহা বাজাইতেছেন, তাহাতে ঘরের সমস্ত পরিবেশটা যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের মনে হইতেছে, সব যেন অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, আছে শুধু একটা আকুল কান্না—তাহা সুরের ভাষায় যেন অবিরাম বলিয়া চলিয়াছে, তুমি কোথা, তুমি কোথা, তুমি কোথা। বাহিরের প্রবল বর্ষণও যেন রোদনময় হইয়া গিয়াছে। তাহাও যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, তুমি কোথা, তুমি কোথা, তুমি কোথা।'

হবিশ্চন্দ্রের চোখ দিয়াও জল পড়িতে ছিল। খানিকক্ষণ পরে উপানন্দেব বাজনা যখন থামিয়া গেল তখনও হরিশ্চন্দ্র চোখ বুঁজিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর চোখ খুলিয়া বলিলেন, 'রাস্‌কেল, কি কাণ্ড করলি বল দেখি?'

''দেশ' আলাপ করলাম।'

'তুই তো বেহালায় কাঁদলি, আমাকেও কাঁদালি।'

এমন সময় বাহিরের কপাটে কে যেন ধাক্কা দিল। গুপী পাশের ঘরেই ছিল, তাড়াতাড়ি আসিয়া কপাট খুলিয়া দিল।

প্রবেশ করিল একটি আপাদমস্তক-সিক্ত বালক। আসিয়া উপানন্দ এবং হরিশ্চন্দ্রকে প্রণাম করিল।

'কে তুমি?'

'আমি হারান দাসের ছেলে। স্কুলে থার্ড ক্লাসে পড়ি। একটা কবিতা মুখস্থ করেছি। আপনাকে শোনাতে এসেছি।'

'কোন্ গাঁয়ে বাড়ি?'

'মজুতপুরে বাড়ি আমাদের।'

'কি করেন তোমার বাবা?'

'মজুরি খাটেন। সাতদিন থেকে জ্বরে পড়ে আছেন।'

'এই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে তুমি এলে কেন, তুমিও অসুখে পড়ে যাবে যে।'

ছেলেটি মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

'তুমি আগে ভিজে জামা-কাপড় ছাড়, কিছু খাও, তারপর তোমার কবিতা শুনব। গুপী, একে ভেতরে নিয়ে যা।'

গুপীর সহিত ছেলেটি অন্দরমহলে চলিয়া গেল।

হরিশ্চন্দ্র উপানন্দের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'ও কেন এসেছে বল তো?'

'ও তো নিজেই বললে, কবিতা শোনাতে এসেছি।'

'এসেছে কবিতা শুনিয়ে চাল নিতে। ওর বাবার অসুখ, ঘরে বোধ হয় চাল বাড়ন্ত।' তাহার পর ম্লান হাসিয়া আবার বলিলেন, 'এই দেশ রাগিনী।'

উপানন্দ হাসিয়া উত্তর দিলেন, 'রাগিনী নয়, খবর। অত্যন্ত বেসুরো খবর। রাগিনী হলে সবার চোখ দিয়ে জল পড়ত, তোমার চোখ দিয়ে যেমন পড়ছে। তুমিও এদের দুঃখে কাঁদো না, কর্তব্যবোধে এদের দুঃখ মোচন করবার চেষ্টা কর। রাগিনী কাঁদায়। আমায় পাগল করে দেয়। দুঃখ আর দুঃখের রাগিনী এক জিনিস নয়। রাগিনী হচ্ছে শিল্পীর সৃষ্টি, আর দুঃখ হচ্ছে যুদ্ধের ক্ষত।'

'হয়েছে, হয়েছে, থাম।'

উপানন্দ চুপ করিয়া গেলেন এবং সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন তাঁহার বন্ধুর মুখের দিকে। তাহার পর তাঁহার সুদৃশ্য সিগারেট কেস হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইলেন। উপানন্দের সিগারেট-লাইটারটিও চমৎকার। খুব ছোট একটি রঙীন পাখি, চোখে ঈষৎ চাপ দিলেই চোখ ফাঁক করিয়া অগ্নি উদগীরণ করে।

হরিশ্চন্দ্র হাঁক দিলেন, 'গুপী, তামাক দিয়ে যা। তোর আম্বুরি তামাক ভাল লাগে না? তোকে অমন সুন্দর একটা গড়গড়া কিনে দিলাম, তুই একবারও ছুঁলি না সেটা। ক্রমাগত বিলিতি সিগারেট ফুঁকে যাচ্ছিস।'

'গড়গড়ায় আমার আপত্তি ওর ভড়াক শব্দটা। সিগারেট নিঃশব্দে এবং 'নীট'। গড়গড়া একটা জবড়জং ব্যাপাব।'

গুপী একটি কলকে গড়গড়ার মাথায় বসাইয়া দিয়া গেল।

হরিশ্চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছেলেটা কোথা?'

'মা তাকে খাওয়াচ্ছেন।'

একটু পরেই ছেলেটি আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। পরিধানে শুকনো কাপড় এবং খুব ঢিলা একটি খদ্দরের ফতুয়া। দুইটিই চন্দ্রশেখরের।

'কি কবিতা শোনাবে তুমি?'

'রবীন্দ্রনাথের।'

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করিয়া দিল ঃ

'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ওই
ভারত তবু কই—'

কবিতাটি বেশ বড়। আবেগভরে নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করিয়া হরিশ্চন্দ্র এবং উপানন্দ দুইজনকেই সে মুগ্ধ করিয়া দিল।

উভয়েই বলিয়া উঠিলেন, 'বাঃ!'

'রবীন্দ্রনাথের আর কোনও কবিতা মুখস্থ আছে তোমার?'

'আছে।'

'বল তো।'

'আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে,

হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।'

এই কবিতাটিও নিখুঁতভাবে আবৃত্তি করিল সে।

হরিশ্চন্দ্র গুপীকে বলিলেন, 'একে দশ সের চাল আর কিছু তরিতরকারি দিয়ে দে। আর গণোরিকে বল, একে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে আসুক। মজুতপুর এখান থেকে দেড় ক্রোশ পথ। ওহো, তোমার নামটাই জিগ্যেস করা হয় নি!'

'আমার নাম কমল।'

'তোমবা ক'টি ভাইবোন?'

'বোন নেই। আমরা তিন ভাই। আমার ছোট দু-ভায়ের নাম অমল আর বিমল।'

'তারা কি করে?'

'তারাও স্কুলে পড়ে।'

'তোমার বাবার চিকিৎসা কে করছেন?'

'হাসপাতালের ডাক্তারবাবু। তিনি একটা দামী ওষুধ কিনে খাওয়াতে বলেছেন, কিন্তু সেটা আমরা এখনও কিনতে পারি নি।'

'আচ্ছা, সে ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। খবব পাঠাব. তিনি রোজ তোমার বাবাকে দেখে আসবেন, আর যা-যা ওষুধ দবকাব দেবেন। খুব ভাল লেগেছে তোমাব আবৃত্তি। আবার এসো।'

কমল উভযকে প্রণাম করিয়া চলিযা গেল।

বাহিবে খোলের আওয়াজ পাওযা গেল।

'গোবিন্দ আসছে।'

কীর্তনিয়া গোবিন্দদাস তাহার দোহার্কি নিতাইকে লইযা ঘরে প্রবেশ করিল।

'বৃষ্টিতে আমবা আটকে পড়েছিলাম। রাত হয়ে গেছে, গান শুনবেন কি আজ?'

'এসেছ যখন শোনাও একটা। ছোটখাটো কিছু শোনাও।'

'বেশ।'

উপানন্দ বলিলেন, 'কানু কহে রাই' গানটা তোমার গলায় চমৎকার ওতরায়, সেটাই শোনাও।'

'বেশ।'

নাতিদীর্ঘ ভূমিকা করিয়া গোবিন্দদাস বলিতে লাগিল, 'কানু শ্রীরাধিকার প্রেম-সাগরে তলিয়ে গেছেন, তবু তার তল খুঁজে পাচ্ছেন না, তবু বুঝতে পারছেন না এর সীমা আছে কিনা? রাই কুল, মান সব্ব বিসর্জন দিয়েছেন। তিনি জানেন, আরও অনেক গোপিকার প্রেমে আকৃষ্ট হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ, তবু তাঁর প্রেম কমে নি। আরও বেড়ে যাচ্ছে। তিনি সমাজ সংসার কিছু চান না, তিনি চান কেবল শ্রীকৃষ্ণকে। বিস্মিত হয়ে গেলেন কানাই। বুঝলেন, এই বিশাল সর্বত্যাগী সর্বগ্রাসী প্রেমের মর্ম তিনি জানেন না, বুঝতেও পারছেন না, তারপরই খোলে চাঁটি পড়িল। গান গাহিয়া উঠিলেন সনাতন ঃ

'কানু কহে রাই কহিতে ডরাই
ধবলী চরাই মুই,
আমি তোমার প্রেমের কি-বা জানি....

হরিশ্চন্দ্র চোখ বুঁজিয়া শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার সহসা একটা অদ্ভুত জিনিস মনে হইল। মনে হইল, তাঁহার জীবনে এমন প্রেম আসে নাই, যে প্রেমের জন্য তিনি কুল মান প্রতিষ্ঠা সব বর্জন করিতে পারিয়াছেন। যে প্রেমের জন্য কলঙ্কও ভূষণ বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে। তিনি উপাকে ভালবাসেন বটে, কিন্তু সে ভালবাসা শ্রীরাধার প্রেম-মহাসাগরের তুলনায় গোষ্পদ মাত্র। প্রেমের জন্য বিরাট কিছু ত্যাগ করিবার সুযোগই পান নাই তিনি। কোনো নারীও তাঁর প্রেমে পড়িয়া সর্বত্যাগিনী হয় নাই। তাঁহার জীবনে অবশ্য অনেক নারী ছলা-কলার জাল বিস্তার করিয়া তাঁহাকে যে পথে প্রলুব্ধ করিয়াছিল তাহা প্রেমের পথ নয়, কামের পথ। তাহার মধ্যে ত্যাগ ছিল না, লোভ ছিল। তাহারা সামান্য কুলটা মাত্র। তাহাদের কাহারও ফাঁদে তিনি যে পড়েন নাই এজন্য তিনি গর্বিত, কিন্তু তাঁহার জীবনে প্রকৃত প্রেমের স্পর্শ যে একবারও আসিল না এজন্য অন্তরের অন্তঃস্থলে তাঁহার একটা গোপন ক্ষোভ জাগিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, উপা ঠিকই বলিয়াছে, তিনিও বিলাসী, তাঁহার বিলাসটা একটা স্বতন্ত্র ধরনের। উপা দামী সিগারেট খায়, তিনি দামী অম্বুরী তামাক খান। তাঁহার খদ্দর, তাঁহার স্বদেশীয়ানা, সবই বিলাস। তিনি নিজেকেই ভালবাসেন, আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারেন নাই। ভালবাসার জন্য সর্বত্যাগী হইতে হয়। তিনি সর্বত্যাগী নন, তিনি বিষয়ী জমিদার। তিনি মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন। নিজেকে অতি ক্ষুদ্র, অতি নগণ্য, অতিশয় বঞ্চিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

উপানন্দ তখন নিজের বেহালাটা তুলিয়া সনাতনের গানের সঙ্গে সুর মিলাইয়া বাজাইতেছিলেন, 'আমি তোমার প্রেমের কি-বা জানি'—কানুর এই স্বীকারোক্তিটা যেন শ্রীরাধার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল—মর্তলোক যেন অমর্তলোকে পরিণত হইল।

একটু পরে সসঙ্কোচে আসিয়া প্রবেশ করিল গুপী। বলিল, 'খাবার দেওয়া হয়েছে। মা ডাকছেন।'

গান বন্ধ হইয়া গেল।

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'গুপী, এদেরও খাবার এনে দে।'

উপানন্দ রোজ রাত্রে এখানেই খায়। হরিশ্চন্দ্রের সহিত উপানন্দও বাড়ির ভিতর গেলেন।

তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর গোবিন্দদাস গুপীকে অনুরোধ করিল, 'ভাই গুপী, বাবুর অম্বুরী তামুক আমাকে এক কল্কে খাইও ভাই।'

'খাওয়াব।'

ভিতরে খাবার সাজাইয়া হাতে পাখা লইয়া কনকলতা অপেক্ষা করিতেছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'শরীর ভাল আছে তো? মুখখানা থমথম করছে।'

উপানন্দ উত্তর দিলেন, 'গান শুনতে শুনতে ও কাঁদছিল। ছেলেবেলা থেকেই তো ও ছিচ্‌-কাঁদুনে।'

হরিশ্চন্দ্র কোন উত্তর দিলেন না।

কনকলতা তাঁহার কপালে হাত দিয়া দেখিলেন।

'গান শুনতে বসে অত কান্নাকাটি কিসের?'

হরিশ্চন্দ্র মৃদু হাসিলেন। কোনও উত্তর দিলেন না।

'বোসো। ও নিমাইয়ের মা, এইবার বড়াগুলো ভাজো গাওয়া ঘিয়ে।'

তাহার পর উপানন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'তোর তো নতুন তরকারি ভাল লাগে। খেয়ে দেখ তো, এটা পছন্দ হয় কিনা?'

উভয়েই খাইতে বসিলেন। কাঁসার থালাকে বেষ্টন করিয়া নানা রকম বাটীর সারি। একটু পরেই নিমাইয়ের মা দুইটি রেকাবীতে করিয়া বড়া ভাজা লইয়া আসিল।

'একটু ঠাণ্ডা হোক, এখন বড্ড গরম আছে।'

বড়া খাইয়া উপানন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। 'এটা তো অতি চমৎকার হয়েছে। কিসের বড়া এ?'

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'এর মধ্যে ছানার স্বাদ পাচ্ছি।'

কনকলতা বলিলেন, 'ছানার সঙ্গে টাটকা বুটের ছাতু পিষে ব্যাসনে ডুবিয়ে ভেজেছি। ভাল হয়েছে খেতে?'

'চমৎকার।'

বাহিরে উপানন্দের মোটরের হর্ণ শোনা গেল।

উপানন্দ চলিয়া যাইবার পর কনকলতা হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন, 'তুই আজ ঘরের ভেতরে শো। বাইরে পুবে হাওয়া দিচ্ছে।'

'বন্ধ ঘরে শুলে আমার ঘুমই হবে না। আমি ওই ঢাকা বারান্দায় শোব।'

কনকলতা ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং একটি কাঁথা লইয়া আসিলেন, 'এইটা বিছানায় থাক। শীত করলে গায়ে দিস।'

কাঁথাটি সচিত্রিত। কনকলতাই কিছুদিন আগে হরিশ্চন্দ্রের জন্য স্বহস্তে সেলাই করিয়াছিলেন।

হরিশ্চন্দ্র শুইবার পর কনকলতা তাঁহার মশারি গুঁজিয়া দিলেন। নকু একটা লণ্ঠন আনিয়া সেটা একধারে রাখিয়া গেল। সেই লণ্ঠনের আলোয় হরিশ্চন্দ্রের মনে হইল মায়ের মুখে যেন একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার ছাপ রহিয়াছে। তিনি উঠিয়া বসিলেন।

'মা, এদিকে সরে এসো তো? তোমার শরীরটা কি ভাল নেই? মুখটা কেমন যেন দেখাচ্ছে?'

'তুই শো। আমার কিছু হয় নি।'

হরিশ্চন্দ্র মশারি হইতে বাহির হইয়া মাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

'নিশ্চয় কিছু হয়েছে। দেখি, দাঁড়াও ভাল করে। তোমার সেই বুকের ব্যথাটা আর হয় নি তো?'

'হয়েছিল আজ খাবার পর। ছাড় আমাকে। শুয়ে পড়।'

'কবিরাজ মশাই যে ওষুধটা দিয়েছেন সেটা খাচ্ছ তো?'

'তুই ছাড় আমাকে। ওষুধ-টসুদ আমি খাই না। মরণই এখন আমার ওষুধ। ছাড় তুই আমাকে।

'এ কথা বলছ কেন মা?'

'তোকে মানুষ করবার জন্যে এ বাড়িতে এসেছিলাম। তুই মানুষের মত মানুষ হয়েছিস। আমার কাজ ফুরিয়েছে। এখন ওষুধ খেয়ে বেঁচে থাকবার দরকার নেই। তোর একটা বিয়ে দিয়ে যেতে পারলে আমার কর্তব্য সম্পূর্ণ হত। কিন্তু তুই তো বিয়ে করবি না।'

'তুমি থাকতে এ সংসারে দ্বিতীয় কোনও কর্ত্রী আসবে না। তোমাকে ওষুধ খেতেই হবে। তুমি না থাকলে এতবড় সংসার সামলাবে কে?'

'সামলাবার লোক ভগবান পাঠাবেন। তোর মা যখন চলে গেলেন, আমি এসেছিলাম। আমি যখন থাকব না, আর কেউ আসবে।'

'তুমি যদি ওষুধ না খাও আমি খাওয়া বন্ধ করে দেব।'

'বেশ, কাল থেকে খাব। তুই শো।'

হরিশ্চন্দ্রকে শোয়াইয়া আবার মশারি গুঁজিয়া দিয়া কনকলতা চলিয়া গেলেন। হরিশ্চন্দ্রের অনেকক্ষণ ঘুম আসিল না। বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া অবশেষে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। ভোরের দিকে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন, উপানন্দের আঁকা সেই উলঙ্গিনীর ছবিটা যেন জীবন্ত হইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, ঠোঁটদুটি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন, মেয়েটি শুধু উলঙ্গিনী নয়, জীর্ণা-শীর্ণা, যৌবনের কোন মহিমা তাহার অঙ্গে নাই। বুকের প্রতিটি হাড় গোনা যায়। আর তাহার আশে পাশে পিছনে দাঁড়াইয়া আছে বহু উলঙ্গ-উলঙ্গিনী নর-নারী, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা—সকলেরই চোখে জল। হরিশ্চন্দ্র চিনিতে পারিলেন, ইহারা তাঁহার প্রজার দল। সকলেই অশ্রুসিক্ত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। হরিশ্চন্দ্র সেই উলঙ্গিনী ভিখারিনীকে প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি কে মা?'

ভিখারিনী বলিল, 'আমি তোমাদের মা। ধর্ষিতা, মর্ষিতা, লুণ্ঠিতা, লাঞ্ছিতা, অপমানিতা মা। দারিদ্র্যের বিষে আমরা জর্জরিত। আমাদের অনেক দোষ। আমরা অলস, আমরা চোর, আমরা চরিত্রহীন, আমরা পরশ্রীকাতর পশুর দল। কিন্তু এককালে আমরা মানুষ ছিলাম, বহুকালের পরাধীনতা আমাদের পশু করে দিয়েছে। যুগে যুগে ডাকাতের দল এসে আমাদের সব কেড়ে নিয়ে গেছে, আমরা অমানুষ হয়ে গেছি! সবাই আমাদের ঘৃণা করে, একমাত্র তুমিই ব্যতিক্রম। এখনি তুমি দুঃখ করছিলে, তুমি কাউকে ভালবাসতে পার নি। তুমি আমাদের ভালবেসেছ। তুমিও রাধা, আমাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতিই তোমার শ্রীকৃষ্ণ। তার জন্য সর্বত্যাগী হতেও তুমি প্রস্তুত। সর্বত্যাগের আনন্দ হয়তো তুমি পাবে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে পাবে না। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণরা চিরকাল মথুরায় চলে গিয়ে রাজা হয়। আমাদের দেশে অনেক মহাপুরুষ দেশের জন্য অনেক ত্যাগ করেছেন, প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের দুর্দশা ঘোচে নি। বহু যুগের পাপের মলিনতা সহজে ঘোচে না। কিন্তু তোমার সর্বত্যাগী প্রেমের আনন্দ তুমি পাবে, তোমার শ্রীকৃষ্ণ হয়তো তোমাকে ধরা দেবে না, কিন্তু তারই নাগাল পাবার জন্য চোখের জল ফেলতে ফেলতে চিরকাল ছুটবে তুমি, আর সেই অনন্ত দুঃখের মধ্যেই পরম সুখও পাবে, সে সুখের তুলনা নেই।'

হঠাৎ একসঙ্গে ভোরের পাখীরা ডাকিয়া উঠিল। হরিশ্চন্দ্রের ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিলেন। তখনও তাঁহার স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাবটা কাটে নাই। মনে হইল, চোখ খুলিলেই বুঝি সেই উলঙ্গিনী ভিখারিনীকে দেখিতে পাইবেন।

।। চার ।।

ডক্টর সোম গ্র্যাণ্ড হোটেলে গিয়া লিসার সাক্ষাৎ পাইলেন। লিসা পাশাপাশি তিনখানি ঘর ভাড়া করিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

'লিসা, তুমি হঠাৎ চলে এলে কেন? আমিই তো তোমার কাছে যাব ভাবছিলাম ক'দিন পরে।'

'কেন এলাম বলছি। লম্বা ছুটি নিয়ে এসেছি।'

'বাঃ! চল, তোমাকে আমার দেশের বাড়িতে নিয়ে যাই। বাংলাদেশের ঘোর পাড়াগাঁ।'

লিসা মৃদু হাসিল। তাহার পর বলিল, 'কাপড়-চোপড় ছেড়ে আগে খাও কিছু।'

টং করিয়া ঘণ্টা টিপিতেই বেয়ারা আসিল।

'আমাদের চা দাও।'

নয়ন সোম নিজের ঘরে ঢুকিয়া প্রথমে বাথরুমে গিয়া স্নান করিলেন। স্নান করিতে করিতে মনে হইল, লিসার কি যেন একটা হইয়াছে। অনেকদিন পরে তাহার সহিত দেখা হইল, কিন্তু সে তেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল না তো! চোখের দৃষ্টিতে, মুখের হাসিতে সেই আলো জ্বলিয়া উঠিল না আগে যেমন উঠিত। এক বৎসর তাহার সহিত দেখা হয় নাই। নয়নবাবুর মনে হইল, লিসার মুখে যে পবিত্রতা, তা তাহার রূপের জন্য নহে, কিন্তু তাহার মুখে বুদ্ধির প্রতিভার এবং শুচিতার এমন একটা মহিমা আভাসিত হইত যাহা ডক্টর নয়ন সোমকে একদা মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি তাহার প্রেমে পড়িয়াছিলেন, লিসাও তাহাকে ভালবাসিয়াছিল, বিবাহও করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ডক্টর সোম তাহাকে বিবাহ করেন নাই। কেন করেন নাই সে কথা আগে বলিয়াছি। দেহ-সম্পর্ক-বিবর্জ্জিত প্রেম সম্ভব কিনা তাহা তিনি নিজের জীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহিয়াছিলেন। লিসাও তাঁহার এই উদ্ভট অস্বাভাবিক পরিকল্পনার নূতনত্বে মুগ্ধ হইয়াছিল এবং প্রেমের স্বপ্নলোকে তাহার সঙ্গিনী হইয়াছিল। এইভাবে পাঁচ বৎসর কাটিয়াছে।

চায়ের টেবিলে লিসা বলিল, 'তোমাকে যে কথা বলতে এসেছি তা বলবার আগে তোমাকে একটা কথা বলতে চাই, আমি এখনও তোমাকে ভালবাসি। তুমিও আশা করি বদলাও নি?'

'না, নিশ্চয় না। কিন্তু হঠাৎ একথা জিগ্যেস করছ কেন?'

লিসা একটু চুপ করিয়া রহিল, 'পাঁচ বছর আগে তোমার মনে রোমান্সের যে রং সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তা কি এখনও তেমনি উজ্জ্বল আছে?'

'সমুজ্জ্বল থাকবে বলেই তোমাকে বিয়ে করি নি। হ্যাঁ, তোমাকে আমি এখনও ঠিক তেমনি ভালবাসি। আর-একটা কথাও তোমাকে আমি বলি নি—যদিও আমরা পরস্পরকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলাম যে যৌন-ক্ষুধা মেটাবার জন্য দরকার হলে আমি অন্য স্ত্রী-সঙ্গ করতে পারব, তুমিও অন্য পুরুষ-সঙ্গ করতে পারবে। কিন্তু আজ তোমাকে আমি বলছি, বিশ্বাস কর, তোমার সঙ্গে আমার এই মানসিক সম্পর্ক হওয়ার পর আমি আর কোনও স্ত্রী-সঙ্গ করি নি। তোমাকেও স্পর্শ করি নি। আমি হিন্দু, আমি ব্রহ্মচর্যের পবিত্রতায় বিশ্বাস করি। আবার আমি বিজ্ঞানীও, তাই আমি জানি, এই যৌনক্ষুধার দাবী সকলে অগ্রাহ্য করতে পারে না। তাই তোমাকে স্বাধীনতা দিয়েছিলাম, প্রয়োজন হলে যদি তুমি অন্য পুরুষ-সঙ্গ করো, আমি আপত্তি করব না। প্রয়োজন হলে তুমি অনেক হোটেলে খাও, অনেক বাথ-রুমে যাও, কিন্তু তাদের প্রেমে পড় না। আমি তোমার মনটাই চেয়েছি কেবল, দেহটা চাই নি।'

লিসা একটু হাসিয়া বলিল, 'আমি তোমাকে এখনও ভালবাসি, কিন্তু মনে হচ্ছে আমাকে ও স্বাধীনতাটুকু না দিলেই ভাল হত! আমি অনেকদিন আত্মসংযম করেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারি নি। আমি কিন্তু বারবার তোমাকেই চেয়েছিলাম। অন্য পুরুষকে যখন আলিঙ্গন

করেছি, তখন মনে কল্পনা করেছি, তুমিই আমার সর্বাঙ্গ জড়িয়ে ধরেছ। অন্য পুরুষের দেহে তুমিই আবির্ভূত হয়েছ বারবার। আমার এ কথা বিশ্বাস কর তুমি নয়ন। এখন কিন্তু আর একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, আমার পেটে সন্তান এসেছে। তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি। বল, এখন কি করব?'

'সে কি! এই বার্থ কন্‌ট্রোলের যুগে— '

'আমি ওসব পছন্দ করি না। মনে হয়, আমি যেন ভ্রূণ হত্যা করছি। তাছাড়া আর একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ নয়ন, মেয়েদেব ক্ষুধা থাকে না, তার চেয়ে প্রবলতর একটা ক্ষুধা আছে, সেটা মাতৃত্বের ক্ষুধা।'

লিসার চোখ দুইটিতে যেন একটা অসীম আগ্রহ জ্বলজ্বল কবিতে লাগিল।

'এ সন্তানের বাবা কে?'

'তা জানি না। একাধিক লোকেব সঙ্গ কবেছি আমি। কিন্তু আর-একটা কথা জানি, এ সন্তানের জন্মেব সঙ্গে তুমিও জড়িত আছ, তোমাকেই প্রতি মুহূর্তে ধ্যান করেছি। তুমি ছাড়া কাউকে আমি ভালবাসি নি, তাই তোমাব কাছেই এসেছি। তুমি বল, এখন আমি কি করব?'

ডক্টর সোম কয়েক মুহূর্ত চুপ কবিয়া রহিলেন, তাহার পব বলিলেন, 'কি আব কববে, আমরা যেমন আছি তেমনি থাকব। তোমার সন্তানও থাকবে আমাদের কাছে। তোমাকে আমি সত্যিই ভালবাসি লিসা, তোমার দেহেরই অংশ তোমার সন্তান। তাকেও আমি ভালবাসব, তাকে মানুষ করব দুজনে মিলে। তুমি কিছু ভেবো না। বহুকাল আগে এক গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এই রকম প্রেমেব স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁব স্বপ্ন সফল হয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু আমার স্বপ্ন আমি সফল করবই।'

'তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

'না। মিথ্যাচার আমি করতে পারব না। আমি বিজ্ঞানী, আমি সত্য থেকে একচুল নড়ব না। বিয়ে নাই-বা হল। আমার তিনকুলে কেউ নেই। তোমাব মা-ও তোমাব বাবাকে ডিভোর্স কবে অন্যত্র বাস করছেন। তোমার বাবা মারা গেছেন শুনেছি। তুমি আর দেশে ফিবে যেও না, এখানেই থাকো। দেশে পাড়াগাঁয়ে আমার একটা বাড়ি আছে। সেখানেই চল, দিনকতক থাকি।'

লিসা মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর মাথা তুলিয়া চাহিল ডক্টর সোমেব দিকে। তাহার পর করুণ কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করিল, 'আমাকে বিয়ে করবে না তুমি?'

'বিয়ের জন্য অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? বিয়ে আমি করব না।'

'এত নিষ্ঠুর হবে তুমি?'

'নিষ্ঠুরতার প্রশ্নই নয় এটা। এটা সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন। যে সন্তানের আমি পিতা নই, আইনত তার পিতৃত্ব স্বীকার করতে বলছ কেন তুমি? আইনেব ছাপ নিয়ে হবেই বা কি? পৃথিবীতে অনেক বিখ্যাত লোকের পিতৃপরিচয় নেই। দা ভিন্‌চি জারজ ছিলেন। ও নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। দ্য ভিন্‌চির কীর্তিই তাঁকে অমর করে রেখেছে। তোমার আমার টাকার অভাব নেই। তোমার সন্তানকে মানুষের মত মানুষ করে তুলব।'

'তোমায় আমি বিয়ে করতে চাই নয়ন। আমায় সত্যি যদি তুমি ভালবাস, বিয়ে কর আমাকে। প্লেটোর স্বপ্ন পাগলের স্বপ্ন, ওই পাগলামিকে আঁকড়ে ধরে তুমি আমার জীবন

অশুচি করে দিয়েছ। তুমি যদি ঠিক সময়ে আমাকে বিয়ে করতে, আমার জীবন মধুময় হয়ে উঠত। বল, কেন আমায় বিয়ে কর নি, প্লেটোর পাগলামি নিয়ে experiment করবে বলে?'

নয়ন সোম বলিলেন, 'শুধু প্লেটো নয়, আর একটা কারণও ছিল। আমার মা, তিনি অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু-বিধবা ছিলেন। আমার মনে হয়েছিল, আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি, তাহলে তাঁর পরলোকগত আত্মা কষ্ট পাবে। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান ছিলাম।'

'তুমি আমার সঙ্গে কেন তবে এত ঘনিষ্ঠতা করেছিলে?'

'তোমাকে ভালবেসেছিলাম। এখনও বাসি। তাই দেখতে চেয়েছিলাম, প্লেটোর স্বপ্নটা আমার জীবনে সফল করতে পারি কি না।'

'পারি নি। তুমি আমার জীবনকে নষ্ট করেছ।'

'যা করেছি তা তোমার সম্মতি নিয়েই করেছি লিসা। তুমি একটা ঘুমের ওষুধের পিল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়। আমি একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি। তুমি একটু ঘুমোও।'

ডক্টর সোম ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার এক বন্ধু মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক। তাঁহার ঠিকানা জানা আছে তাঁহার। নীচে নামিয়াই একটি ট্যাক্সি পাইয়া গেলেন এবং ডক্টর সেনের বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

ডক্টর সেনকে লইয়া প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে ফিরিলেন তিনি। আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহা অপ্রত্যাশিত। লিসা নাই। হোটেলের সমস্ত খরচ মিটাইয়া দিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। রাখিয়া গিয়াছে মাত্র এই ক্ষুদ্র পত্রটি।

নয়ন,

আমি চললাম।

—লিসা।

।। পাঁচ ।।

শতরঞ্জি উৎসব আসন্ন। চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দুইদিন যাত্রা হইবে, দুইদিন কীর্তন। ছেলেছোকরারা একদিন 'মিশরকুমারী' থিয়েটার করিবে। স্ত্রীভূমিকায় পুরুষরাই গোঁফ কামাইয়া নামিবে। কবাটি খেলার ম্যাচ, কুস্তিগীরদের প্রতিযোগিতা, গ্রাম্য প্রদর্শনী, ছেলেদের আবৃত্তি, সাঁওতালদের নাচ-গান, ছোউ-নৃত্য, সবরকম আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করিয়াছেন হরিশ্চন্দ্র। মুগমটর গ্রান্টের খরচে খাওয়া-দাওয়ার বিরাট আয়োজন হইতেছে। গ্রাম্যশিল্পীরা চমৎকার একটি মঞ্চ নির্মাণ করিয়াছেন। শীর্ষাবাঈ সেই মঞ্চে নৃত্য এবং সঙ্গীত পরিবেশন করিবেন। উপানন্দ নিজের বাড়ি হইতে তার টানিয়া মণ্ডপটিকে বিদ্যুতায়িত করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু হরিশ্চন্দ্র তাহাতে রাজি হন নাই। তিনি পেট্রোম্যাক্স আলো এবং ঝাড়-লণ্ঠনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উপানন্দ তবু নিজের বাড়ি হইতে তিনটি থাম পুঁতাইয়া স্টেজের মধ্যে দুই-তিনটি বালব ঝুলাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি, হঠাৎ ঝড় উঠিয়া যদি আলো নিভিয়া যায় তখন এগুলি কাজে লাগিবে। হরিশ্চন্দ্র ইহাতে আপত্তি করেন নাই। উপানন্দ কলিকাতায় লোক পাঠাইয়া বাইজীর জন্য উৎকৃষ্ট বেনারসী কাপড় এবং শাল আনাইয়াছেন। একটি সোনার হারও

আনানো হইয়াছে, সেটি হরিশ্চন্দ্র নিজে তাঁহাকে উপহার দিবেন। পারিশ্রমিক ছাড়াই এসব তাঁহাকে দেওয়া হইবে। তাঁহার সঙ্গে অভিভাবিকারূপে যে প্রবীণা ইমন বাইজী আসিবেন, তাঁহার জন্যও অনেক উপহার আসিয়াছে। আসিয়াছে একটি ভাল তানপুরা এবং সেতার। শীর্ষা বাইজীকে আনিবার জন্য উপানন্দের প্রাইভেট সেক্রেটারী চিন্ময়বাবু চলিয়া গিয়াছেন। তাহাদের থাকিবার জন্য একটি সুন্দর বাগানবাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র উত্তেজনার তুঙ্গে বসিয়া আছেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা দুই বন্ধু নবনির্মিত মঞ্চটি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিলেন। চমৎকার সাজানো হইয়াছে। বিশেষত হরি কুমোরের তৈরি সরস্বতী প্রতিমাটি যেন জীবন্ত মনে হইতেছে।

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'উপা, এর মধ্যে বালবগুলো টাঙিয়ে তুই ছন্দ-পতন করে দিয়েছিস।'

'ভুনিকে বলেছি গোলাপী কাগজের পদ্মফুল বানিয়ে ওগুলো ঢেকে দিতে। ওগুলো তো জ্বলবে না, ঝড়টড় যদি আসে—'

'ঝড় এলে তোমার বালবও টিকবে না, ইলেকট্রিক আলোও জ্বলবে না।'

'থিয়েটারের স্টেজটা কেমন হয়েছে? চল, দেখে আসি।'

'ওটা বেশ মজবুত করে বাঁশ আর কাঠের শ্লিপার দিয়ে তৈরি করেছে কুঞ্জ। মোটা-মোটা তিবপল দিয়ে মুড়ে দিয়েছে। ভালই হয়েছে। চল, দেখে আসি।'

দুই বন্ধু পথে বাহির হইয়া পড়িতেই একদল স্কুলের ছেলে তাঁহাদের ঘিরিয়া ধরিল, 'আমরাও থিয়েটার করব, কিন্তু হাবুলদারা বলছে, করতে দেবে না।'

'কি বই করবে তোমরা?'

'রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট'।'

'আচ্ছা, হাবুলকে বলে দিচ্ছি। স্টেজে রোজই বোধ হয় একটা না একটা কি হবে। তাই যদি হয় তো তোমরা সব শেষে কোরো।'

'বেশ, তাই করব।'

বালকের দল খুশী হইয়া চলিয়া গেল। দ্বিতীয় স্টেজটি দেখিয়া উপানন্দ খুশী হইলেন। কিন্তু বলিলেন, 'মাঝে একটা খাম্বা গেড়ে এখানেও গোটা দুই বালব লাগিয়ে দিই?'

'আর কিছু করতে হবে না। ওটার জন্য কারবাইডের টাকা সে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে।'

'আমি ভাবছি ঝড়-টড় যদি ওঠে তাহলে?'

'তাহলে ইলেকট্রিকও টিকবে না। তোমার বাড়িতেও তো বারবার ইলেকট্রিক নিভে যায় শুনেছি।' কিন্তু এ আলোচনা আর বেশীদূর অগ্রসর হইল না। পিওন আসিয়া উপানন্দকে একটি টেলিগ্রাম দিল। উপানন্দ টেলিগ্রাম খুলিয়া পড়িলেন।

'আজই তো শুক্রবার?'

'হ্যাঁ, কেন? কার টেলিগ্রাম?'

'চিন্ময়ের। সে বাইজীকে নিয়ে আজই এসে পৌঁছচ্ছে। স্টেশনে গাড়ি পাঠাতে বলেছে।'

'যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তুমি তোমার কার'টা পাঠিয়ে দাও। আমার বগি-গাড়িটাও যাক। আর জিনিসপত্তর আনবার জন্যে মোষের গাড়িটাও যাক।'

'বেশ। চল তাহলে বাড়ি যাই। কলকাতার ট্রেন তো সাতটা নাগাদ এসে পৌঁছবে। তুমি তোমার গাড়ি দুটো এখুনি পাঠিয়ে দাও। আমার মোটর আধ ঘণ্টার ভেতর পৌঁছে যাবে। এখন চারটে বেজেছে।'

উপানন্দ তাঁহার হাতঘড়িটি দেখিয়া বলিলেন। হরিশ্চন্দ্র হাতঘড়ি পরেন না, ঘড়ির কোন প্রয়োজনই তাঁহার নাই।

উপানন্দ প্রশ্ন করিলেন, 'আমি কি স্টেশনে যাব?'

'পাগল নাকি! আমাদের লোকই তো নিয়ে আসছে তাকে। একটা বাইজীর কাছে অত হেদিয়ে পড়বার দরকার কি?'

উপানন্দ মুচকি হাসিয়া বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

'চল বাড়ি যাই। মাকে খবরটা দিই। বাগানবাড়িতে গগন ঠাকুর রান্নাবান্না করবে। রহমতকে বলেছি, সেও থাকবে। যদি মুসলমানি খানাটানা চায়, করে দিতে পারবে। চল—'

দুই বন্ধু গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। পথে একজন গোমস্তার সহিত দেখা হইল। সে আভূমি প্রণত হইয়া নিবেদন করিল, 'সানাইওয়ালারা আসছে। ওরা কি আজ থেকেই বাজাবে?'

'নহবৎখানা তো তৈরি হয়ে গেছে। বাজাক না। আবিদ মিঞা এসেছে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'চমৎকার বাজায়। হ্যাঁ, বাজাতে বল ওদের।'

সন্ধ্যার পর হরিশ্চন্দ্র বাহিরের ঘরে একা বসিয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতেছিলেন। উপানন্দ তখনও আসিয়া পৌঁছান নাই। বাইজীর আগমনবার্তা পাওয়া যায় নাই এখনও। তাঁহার বগি গাড়ি স্টেশন হইতে ফেরে নাই এখনও। বৈঠকখানার দেওয়ালে তাঁহার বাবার একটা অয়েল-পেণ্টিং ছবি টাঙানো রহিয়াছে। সেকালের কোন সাহেব শিল্পীকে দিয়া ছবিটি আঁকাইয়া ছিলেন তিনি। ছবিতে তিনিও নগ্নগাত্রে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতেছেন। হরিশ্চন্দ্র বহুদিন ছবিটির দিকে চাহিয়া দেখেন নাই। অনেকদিন পরে আজ ছবিটির দিকে চাহিয়া তাঁহার মনে হইল, ছবিটা তাঁহাকে কি যেন বলিতে চাহিতেছে। মুখে ঈষৎ হাসি, তাঁহার দিকে প্রসন্ন নয়নে চাহিয়া আছেন, কিন্তু তিনি যেন বলি-বলি করিয়াও কথা বলিতে পারিতেছেন না। বাইরে উপার মোটরের হর্ণ শোনা গেল। একটু পরেই একটি সবুজ সিল্কের শাড়ি-পরা অপরূপ সুন্দরী মেয়ে উপার পিছু পিছু প্রবেশ করিল।

'কই, কাকাবাবু কই?'

উপানন্দ বলিলেন, 'ওই যে—'

মেয়েটি আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল হরিশ্চন্দ্রকে।

হরিশ্চন্দ্র অবাক। তাঁহাকে কাকাবাবু বলার মানে?

'বসুন, বসুন আপনি।'

'আমাকে বসুন বলছেন কেন? আমি আপনার ভাইঝি।'

উপানন্দ সবিস্ময়ে নির্নিমেষে এই অপরূপ রূপসীর দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল, একটি গানের সুর যেন মানবী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের ভাইঝি?

রহমৎ প্রবেশ করিল। উপানন্দকে বলিল, 'ইমন বাইজী আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'চল যাচ্ছি।'

উপানন্দ চলিয়া গেলেন।

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।'

'আমিই সব বলছি। আপনার এক দাদা ছিলেন, তিনি ছেলেবেলার কার সঙ্গে যেন কুম্ভমেলা দেখতে যান। সেই মেলায় হারিয়ে যান তিনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আপনার বাবা খুঁজে পান নি তাঁকে। কুম্ভমেলায় ভীড়ের চাপে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে যান তিনি। হয়তো মারাই যেতেন, কিন্তু ভাগ্যক্রমে বিখ্যাত গায়ক গগনচাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গগনচাঁদ তাঁকে উদ্ধার করে নিজের বাড়ি পাঞ্জাবে নিয়ে যান। বাবা তখন খুব ছেলেমানুষ, তাঁর বাড়ির ঠিকানা তাঁকে বলতে পারেন নি। কেবল বলেছিলেন, তাঁর বাড়ি মুগ-মটর গ্রাম, বাবার নাম রামচন্দ্র চক্রবর্তী। গগনচাঁদ পাঞ্জাবে চাকরি করতেন, কিন্তু তিনি ছিলেন বাঙালী ব্রাহ্মণ। অপুত্রক ছিলেন তিনি, বিপত্নীকও ছিলেন। তিনি চাকরি করতেন আর গান বাজনা নিয়ে থাকতেন। তাঁর অনেক শিষ্য ছিল। বাবাকে তিনি গান-বাজনা শেখাতে লাগলেন। এইভাবেই বাবার শৈশবটা কেটে গেল। গগনচাঁদ তাঁব প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হলেন। এবং তিনি যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন তখন তিনি তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম শিষ্য। অনেক গানের সভায় তাঁকে নিয়ে যেতেন, অনেক মেডেল, অনেক পুরস্কার তখন পেয়েছিলেন তিনি। গগনচাঁদের আর-একটি বাঙালী শিষ্য ছিলেন, চন্দন চট্টোপাধ্যায়। তাঁব একটি সুন্দরী কন্যা ছিল। সেও গগনচাঁদেব কাছে সেতার শিখতে আসত। গগনচাঁদ তার সঙ্গে বাবার বিয়ে দিলেন। গগনচাঁদ বেশী দিন চাকবি করেন নি। গান বাজনা কবে তিনি যথেষ্ট উপার্জন করতেন। তাবপর হঠাৎ এক গানেব আসরেই তাঁব মৃত্যু হল। তাঁব মৃত্যুব পর দেখা গেল, তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাবাকে দিয়ে গেছেন। আমার তখনও জন্ম হয় নি। গগনচাঁদের মৃত্যুর পব আমাব দাদামশাই চন্দন চট্টোপাধ্যায় পাঞ্জাব থেকে চলে আসেন। আগ্রাব কাছে তাঁর একটা ছোট বাড়ি ছিল, সেখানেই নিয়ে গেলেন বাবাকে আর মাকে। গগনচাঁদ বাবাকে যে টাকা দিয়েছিলেন, তাই দিয়ে আগ্রায় তিনি ছোট একটি গানের স্কুল খুললেন এবং নিজে একজন নাচের শিক্ষকের কাছে নাচ শিখতে লাগলেন। গান-বাজনা তিনি ভাল করেই শিখেছিলেন, নাচেও নাম করে ফেললেন কিছুদিনেব মধ্যেই। পুরনো ওস্তাদের খ্যাতি যখন ও অঞ্চলে সকলের মুখে মুখে, সেই সময় আমার জন্ম হয়। আমার জন্মের ছয় মাস পরে আমার মা মারা যান। আমার দাদামশাই দিদিমা আগেই মারা গিয়েছিলেন। আমার মা ছিলেন তাঁদের একমাত্র সন্তান। সুতরাং তাঁর সম্পত্তি আমি পেলাম। মা মারা যাওয়ার পর বাবার এক ছাত্রী ইমন বাইজী আমার অভিভাবিকা হলেন। তিনি আমার জন্যে একজন ওয়েট নার্স বহাল করলেন। আমি যখন বড় হলাম তখন বাবা বললেন, তোর আর বিয়ে দেব না। তুই গান-বাজনা শেখ। নাচও শেখাব তোকে। তাই শিখতে লাগলাম। বাবাই একদিন কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন যে মুগমটর গ্রামে তাঁর বাড়ি। খুব ছেলেবেলায় কুম্ভমেলায় এসে তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন। গগনচাঁদ তাঁকে মেলা থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছেন। মুগমটর গ্রাম কোন্ প্রদেশের কোন্ জেলায় তা তাঁর মনে নেই। শুধু মনে আছে, তাঁর বাবার নাম রামচন্দ্র চক্রবর্তী। আর তাঁর এক বন্ধু ছিল, তার নাম ছিল বিহারীলাল। মায়ের মুখটা কেবল আবছাভাবে মনে পড়ে। আর কিছু মনে নেই। মুগমটর নামে কোন পোস্টাফিস বা স্টেশন নেই। তাই বাবা আর এ গ্রামের সন্ধান করতে পারেন নি। পরে গান-বাজনা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতেন যে মুগমটর নিয়ে আর মাথা ঘামান নি। আমিও

মুগমটরের খবর পেতাম না, যদি না আপনার বন্ধু উপানন্দবাবু আমাকে আপনাদের শতরঞ্জি উৎসবে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করতেন। তিনি আমার খ্যাতির কথা তাঁর এক বন্ধুর মুখ থেকে শুনেছিলেন। আমি দূরে গান গাইবার জন্য যাই না। কিন্তু মুগমটর নামটা শুনে আমি উৎসুক হলাম। উপানন্দবাবুর বন্ধুকে বললাম, আপনি একটু খোঁজ নিন তো মুগমটর গ্রামে রামচন্দ্র চক্রবর্তীর পরিবারেরা থাকেন কিনা। যদি থাকেন তাহলে আমি যাব।

উপানন্দবাবুই চিঠির জবাব দিয়েছিলেন। তাঁর থেকেই আমি জেনেছিলাম, আমার এক কাকা আছেন এবং তিনি একজন মস্ত জমিদার। বাবা কিছুদিন আগে মারা গেছেন। আমার নাচ-গানের খ্যাতিও অনেক হয়েছে, কিন্তু আমার আর এসব ভাল লাগছে না। আমি আর ফিরে যাব না, আপনার কাছেই থাকব।'

হরিশ্চন্দ্র নির্বাক হইয়া সব শুনিতেছিলেন। তাঁহার বিস্ময় তো সীমা অতিক্রম করিয়াছিলই, মাঝে মাঝে সন্দেহ হইতেছিল সবটাই বানানো গল্প নয় তো। তিনি একটা তুখোড় অভিনেত্রীর পাল্লায় পড়িয়া গেলেন নাকি? কিন্তু শীর্ষার চোখের দৃষ্টিতে এবং মুখেব শুচিতায় এমন একটা সরল আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে হরিশ্চন্দ্র সেটাকে অভিনয় বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেছিলেন না। বাবাব ছবিটার দিকে চাহিলেন। মনে হইল, মুখের মৃদু হাসিটা আর একটু সজীব হইয়াছে।

'যা শুনলাম, তা তো নভেলের গল্পের মত। তুমি কিছু খেয়েছ?'

'না। উপানন্দবাবু তাঁর বাড়িতে নামতে বলেছিলেন, আমি নামি নি, সোজা এখানে চলে এসেছি। আপনার সঙ্গে বাবার মুখের অনেক মিল আছে।'

'চল, ভেতরে মায়ের কাছে চল। আগে কিছু খাও।'

শীর্ষাকে লইয়া তিনি অন্দরের দিকে গেলেন। তাহাকে ভিতরে রাখিয়া একটু পরেই ফিরিযা আসিলেন। তাঁহার মনে হইল, যাহা শুনিলেন, তাহা এতই রহস্যময় যে বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া না দিলে সে রহস্যের সমাধান করা যাইবে না। উপানন্দ বুদ্ধিমান লোক, যদি ভিতরে কোনও চালাকি বা ফাঁকি থাকে সে ধরিয়া ফেলিবে। কিন্তু তাহার মুখের গদগদ ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে, সে শীর্ষাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। মুগ্ধ হইলে অনেক সময় বিচারবুদ্ধি গুলাইয়া যায়। তাঁহারও মেয়েটিকে খুব ভাল লাগিয়াছে। তাঁহার মনে হইতেছে, সত্যই এ যদি আমাব দাদা পূর্ণচন্দ্রের মেয়ে হয়, তাহা হইলে তাঁহার জীবনে নূতন আনন্দলোকের দ্বার খুলিয়া যাইবে। অপত্যস্নেহের স্বাদ তিনি কখনও পান নাই, মাতৃস্নেহের স্বাদও পান নাই। ভগবান কিন্তু কনকলতাকে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। শীর্ষাকে কি তিনিই পাঠাইয়াছেন তাঁহার অপত্যস্নেহের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য?

'গুপী, তামাক দে।'

বৈঠকখানায় একটা চেয়ারে বসিয়া তিনি চোখ বুঁজিয়া বসিয়া রহিলেন। মনের গহনে একটি আবছা-মূর্তি ফুটিয়া উঠিল—কিশোরী বালিকা মূর্তি আধ ঘোমটা দেওয়া, নাকে নোলক দুলিতেছে।

খুট করিয়া শব্দ হইল। গোপী তামাক লইয়া প্রবেশ করিল। হরিশ্চন্দ্র নীরবে গড়গড়ায় মৃদু মৃদু টান দিতে লাগিলেন। আবার তাঁহার চক্ষু দুইটি বুঁজিয়া আসিল। কিন্তু সেই বালিকা মূর্তিটি আর তাঁহার মনে ফুটিয়া উঠিল না। হরিশ্চন্দ্রের মনে হইল, সে যাহা বলিতে আসিয়াছিল তাহা

নীববে বলিযা চলিযা গিযাছে। হবিশ্চন্দ্রেব মনে হইল, আভাসে তিনি যেন তাহাব মর্ম বুঝিতে পাবিযাছেন। তাহা যেন নীববে বলিযা গেল, আমি তো তোমাকে কিছু দিবাব সুযোগ পাই না। ভগবান যাহাকে পাঠাইযাছেন তাহাকে ফিবাইযা দিও না।

হবিশ্চন্দ্রেব ইহাও মনে হইল এসব হযতো তাঁহাব মনগড়া [illegible] বলে wishful thinking। মেয়েটিকে ভাল লাগিযাছে বলিযাই [illegible]

উপানন্দেব মোটবেব হর্ণ শোনা গেল। উপানন্দ প্রবেশ [illegible]

'কেন?'

'ইমন বাইজীকে কিছু ভালো অম্বুবি তামাক দিযে আসুক।'

'তিনি তামাক খান নাকি?'

'আমি গিযে দেখলাম, তিনি তাকিযা ঠেস দিযে বসে তামাক খাচ্ছেন'

'বলিস কি।'

'তাঁব যে বাক্সে তামাক, টিকে ছিল সেটা ট্রেন থেকে নামানো হয নি। গড়গড়াটা [illegible] বিবাট মোবাদাবাদী গড়গড়া কিন্তু তামাকেব ডিবেটা নামে নি। বাইবে সমানে [illegible] খাচ্ছেন।'

'বাঙালী?'

'বাংলা কথা তো চমৎকাব বললেন। পবে আছেন কিন্তু ঢিলে [illegible] দেখতে ঠিক [illegible] আমেব মত।'

'মুসলমান নাকি?'

'বোধ হয না। [illegible] ওঁকে দিযে তোমাব ভালো তামাক খানিকটা পাঠিযে দাও এখুনি। আমাব গাড়িটা নিযেই যাক।'

হবিশ্চন্দ্র গোপীকে ডাকিযা বলিলেন, 'আমাদেব তামাক কটা আছে?'

'দু টিন আছে।'

'এক টিন বাগানবাডিতে দিযে আয। উপাব গাডি কবে যা।'

গোপী চলিযা গেল।

হবিশ্চন্দ্র উপানন্দকে বলিলেন, 'বোস। শীর্ষাব সঙ্গে আলাপ কবলুম। মহা সমস্যায পডেছি।'

'কি সমস্যা? কোথা গেলেন তিনি?'

'মাযেব কাছে। খাবাব খাচ্ছে।'

'সমস্যাটা কি?'

'ও বলছে, ও আমাব সেই হাবিযে যাওযা দাদাব মেযে। বলছে, আব আমি ফিবে যাব না। বাইজী যে ভাইঝি হযে যাবে এ তো স্বপ্নাতীত ব্যাপাব। কি কবা যায বল তো?'

উপানন্দ কিছুক্ষণ চুপ কবিযা বহিলেন। তাহাব পব বলিলেন, 'মেযেটিকে দেখে কিন্তু মনে হয না ও মিছে কথা বলছে। তাছাডা তোমাব ভাইঝি সেজে ওব লাভ কি। ওব অর্থাভাব নেই। আমাব বন্ধুর মুখে শুনেছি, ওব ইলেকট্রিক ফিটেড তিনতলা বাডি। মোটব আছে ব্যাঙ্কে টাকাও নাকি প্রচুব। ওখানে অনেক বড লোকেব ছেলে ওকে বিযে কববাব জন্যে উৎসুক ও কিন্তু কাউকেই আমল দেয না। সুতবাং টাকাব লোভে ও মুগমটব গ্রামে এসে তোমাব ভাইঝি

সেজে বসে থাকবে কেন? ওখানে ওর প্রতিষ্ঠা এবং খাতিরও খুব। এখানে আসবার কি প্রলোভন থাকতে পারে ওর?'

হরিশ্চন্দ্র ভুড়ুক-ভুড়ুক করিয়া গড়গড়ায় টান দিলেন এবং তাহার পর বলিলেন, 'তোর যুক্তিটা অকাট্য। মেয়েটিকে দেখে আমারও ভাল লেগেছে খুব।'

'খুব ভাল।'

'কিন্তু ওই ইমনবাইজী তো একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।'

'উনি কিন্তু কথা বার্তায় খুব ভদ্র।'

'মনে হচ্ছে মদ্দা মদ্দা ভাব। গলার স্বর কি রকম?'

'মনে হল, কোকিল-কণ্ঠী। এখনও রোজ রেওয়াজ করেন। সঙ্গে তানপুরা, সেতার আর ডুগি তবলা এনেছেন।'

এমন সময় হঠাৎ শানাই বাজিয়া উঠিল।

'আমাদের শানাইওলা এসে গেছে নাকি?'

'হ্যাঁ। আমিই তাদের বাজাতে বলেছি।'

'বাঃ! আবিদ ভালো বাজায়—জয়-জয়ন্তী ধরেছে।'

এমন সময় ভিতর হইতে শীর্ষা আসিয়া পড়িল।

'ঠাকুমা অনেক খাইয়ে দিলেন। কি চমৎকার পায়েস খেলাম। এমন পায়েস কখনও খাইনি।'

'তুমি বোসো। তোমাকে আরও দু-একটা কথা জিগ্যেস করব। তোমার বাবা তোমাকে মুগ-মটর গ্রামের কথা, তাঁর বাবার কথা, আত্মীয়স্বজনদের কথা কিছু বলেছিলেন কি, মনে আছে তোমার?'

'বিশেষ মনে নেই।'

শীর্ষা কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, 'বাবা বলেছিলেন, ঠাকুর্দার একটা পায়ে নাকি গোদ ছিল। ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আর একটা গল্প তিনি করতেন। এখানে আপনাদের এক পুকুরের পাড়ে নাকি একটা বড় বটগাছ ছিল, তার ডালপালা নাকি পুকুরের মাঝখান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাই পুকুরটার নাম ছিল বটপুকুর। বাবা নাকি সেই বটগাছে উঠে তার ডালে-ডালে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন নাকি পুকুরে পড়ে গিয়েছিলেন। অনেক নাকানি-চোবানি খেয়ে শেষে নাকি উদ্ধার পান।'

হরিশ্চন্দ্র হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, 'দুটোই সত্যি কথা। বাবার ডান পায়ে গোদ ছিল। আর বটপুকুর এখনও আছে, আরও অনেক বড় হয়েছে, তার ডালপালা পুকুরটাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। মাঝে মাঝে পুকুরটাকে পরিষ্কার করাই। বটগাছের পাতাগুলো আমার জমির সার হয়—তোমাকে কাল সকালে নিয়ে যাব বটপুকুরে। এবার আমার বিশ্বাস হয়েছে, তুমি আমাকে যা বলেছ তা সত্যি। তুমি সত্যি আমার সেই দাদার মেয়ে যাকে আমি কখনও দেখি নি।'

হরিশ্চন্দ্র আবেগভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এবং শীর্ষা বাইজীকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার শিরশ্চুম্বন করিলেন। তাঁহার চোখে জল ভরিয়া উঠিল, তিনি পাশের চেয়ারে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া শিশুর মত রোদন করিতে লাগিলেন।

উপানন্দ এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নাই। তাঁহার মনে যে কবিতা মূর্ত হইতে চাহিতেছিল তাহা অবর্ণনীয় কিন্তু ভাবটি এই

তো[illegible] শায় ছিনু
পথ পানে আঁখি দুটি মেলে
এতদিন পরে তুমি এলে

শীর্ষা হরিশচন্দ্রের এই ব্যবহারে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারও চোখে জল [illegible] পড়িল। উপানন্দের নির্নিমেষ মুগ্ধ দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। উপানন্দের দিকে একবারও চাহে নাই সে।

হঠাৎ শানাইটা বন্ধ হইয়া গেল। হরিশচন্দ্র চোখের জল মুছিয়া [illegible] দিকে চাহিলেন। এবং একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলিয়া গেলেন। শীর্ষার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'কেমন লাগল শানাই?'

'চমৎকার। এখানকারই শানাই?'

'হ্যাঁ, হোসেনপুরে থাকে। আমাদেরই প্রজা।'

'চমৎকার বাজায়।'

হরিশচন্দ্র বলিলেন, 'যার জন্যে তোমাকে পেলাম সেও একজন উঁচুদরের শিল্পী। সব রকম বাজনা বাজাতে পারে, ছবি আঁকতে পারে, ভাল ফোটো তুলতে পারে। কেমব্রিজের এম এ। অথচ গ্রাম ছেড়ে কোথাও যায় নি।'

'কোথায় থাকেন তিনি?'

'ওই তোমার সামনেই বসে আছে উপানন্দ রায় আমার একমাত্র বন্ধু। রোজ সন্ধ্যায় আমাকে বেহালা বাজিয়ে শোনায়। উপা, শোনা না একে তোর বেহালা। ওরে নকু উপার বেহালাটা নিয়ে আয়।

উপানন্দও অনিচ্ছুক ছিল না। তবু মুখে বলিল, 'উনি এখন ক্লান্ত, এখন কি ওর ভাল লাগবে?'

'গান-বাজনা আমার সব সময় ভাল লাগে। আমি ক্লান্ত নই, সমস্ত রাস্তা ঘুমুতে ঘুমুতে এসেছি। রাত্রে আর কিছু খাব না, ঠাকুমা যা খাইয়ে দিয়েছেন।'

নকু বেহালা দিয়ে গেল।

উপানন্দ বাজাইতে শুরু করিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সুরের যে পরিবেশ সৃষ্টি করিলেন তাহা শীর্ষাকে শুধু অভিভূত করিল না, অপ্রস্তুতও করিল। সে বুঝিতে পারিল না, কি সুর তিনি বাজাইতেছেন। এদেশের কোনও সুর নয়, অথচ কি চমৎকার। চারিদিকে নানা ভঙ্গীতে যেন আনন্দের লহরী বহিয়া যাইতেছে। বেহালা যেন সুরের ভাষায় বার বার বলিতেছে, আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি। বেহালা যখন থামিল, তখন হরিশচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, 'বাঃ।'

শীর্ষা বলিল, 'সত্যিই অপূর্ব। কিন্তু কি সুর বাজালেন, ধরতে পারলাম না তো?'

'এটা একটা ইটালিয়ান সুর। ওদেশে যখন ছিলাম, তখন একজন ইটালিয়ান গুরুর কাছে বেহালা শিখেছিলাম। তিনিই শিখিয়েছিলেন এটা।'

'ও অনেক রকম যন্ত্র বাজাতে পারে। ওর হাতের পিয়ানো যদি শোন, তাকে লেগে যাবে।'

শীর্ষা উঠিয়া পড়িল।

'আমি এবার একবার মাতাজীর কাছে যাই।'

হরিশ্চন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, 'উনি কি বাঙালী?'

'না, উনি দিল্লীর মেয়ে। ওঁর বাবাও গগনচাঁদের শিষ্য ছিলেন। আমার বাবার গুরুভাই ছিলেন তিনি। এক ট্রেন দুর্ঘটনায় ওঁর বাবা আর মা মারা যান। উনি ছিলেন বাবা-মার একমাত্র সন্তান। তখন ওঁর বয়স দশ বছর। আমার বাবা তখন ওঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। নিজের মেয়ের মত মানুষ করেন। বাবার কাছেই গান-বাজনা শিখেছেন। কিছুদিন পরে আমার মায়ের যখন মৃত্যু হল, তখন উনিই আমার ভার নিলেন। আমি জন্ম থেকেই ওঁকে দেখছি। যদিও আমার ওয়েট-নার্স ছিল, আরও অনেক চাকর-চাকরাণী ছিল, কিন্তু ওঁকেই আমি মাতাজী বলে ডেকেছি, আর সত্যিই উনি মাতৃস্নেহে আমাকে পালন করেছেন। আমি এখন যাব ওঁর কাছে। উনি যে ক'দিন আছেন, ওই বাগানবাড়িতেই আমি থাকব। তারপর উনি চলে গেলে আমি আপনার কাছে থাকব। আমার আর একটা অনুরোধ আছে কাকাবাবু।'

'কি?'

'আপনাদের যে ক'দিন উৎসব হবে, রোজ আমি গান গাইব, কিন্তু নাচব না। ওখানেও আমি নাচের মুজরো নিই না আজকাল, যদিও বাবা আমাকে খুব ভাল করেই নাচ শিখিয়েছিলেন। নাচলে তো অনেক টাকা রোজগার করা যায়। কিন্তু আমি নাকি....'

উপানন্দ প্রশ্ন করিলেন, 'কেন, নাচও তো একটা বড় শিল্প?'

'তা ঠিক। কিন্তু একজন যুবতী মেয়ে যখন নাচে, তখন তার নাচের শিল্প দেখতে পুরুষের দল ভীড় করে না। খুব কম লোকই নাচের শিল্প বোঝে। তারা যায় মেয়েটির দেহ দেখবার জন্য। অনেকের চোখে পাপের কলুষ আমি লক্ষ্য করেছি, অনেক অভব্য চিঠিও পেয়েছি আমি। তাই ঠিক করেছি আমি নাচব না। আমি মাতাজীর কাছে মাঝে মাঝে নাচি ঘরের কপাট বন্ধ করে দিয়ে। এখানে আপনি মান্যগণ্য জমিদার, আপনার ভাইঝি সবার সামনে খোলা স্টেজের ওপর নাচবে সেটা কি ভাল দেখাবে? আমি নাচব না কাকাবাবু।'

শীর্ষার কণ্ঠস্বরে একটা আবদারের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল। ইহাতে হরিশ্চন্দ্র, উপানন্দ দুজনেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

'বেশ তাই হবে।' হরিশ্চন্দ্র সোৎসাহে সায় দিলেন। উপানন্দ উঠিয়া পড়িলেন।

'চলুন তাহলে, আপনাকে মাতাজীর কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'চলুন।'

উপানন্দের সঙ্গে শীর্ষা চলিয়া গেল। হরিশ্চন্দ্র নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার নীচের ঠোঁটটা বার দুই কাঁপিয়া উঠিল। বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। বেশী বিচলিত হইলে তিনি সাধারণতঃ যাহা করেন তাহাই করিলেন। পাশের ঘরে উঠিয়া গিয়া উঠ-বোস করিলেন কয়েকবার। তাহার পর বলিলেন, 'ওরে নকু, জঙ্গীকে ডাক, চান করব।'

দীর্ঘকায় জঙ্গী আসিয়া কূয়া হইতে জল তুলিয়া তাহার মাথায় ঢালিতে লাগিল। স্নান করিয়া তিনি গোপীকে আর এক কল্কে তামাক দিতে বলিলেন। উপানন্দের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন তিনি। সে আসিলে একসঙ্গে খাইতে বসিবেন। সেদিন সন্ধ্যায় তাঁহার বাড়িতে

গ্রামের কোন শিল্পীরা আসে নাই। শ[illegible] কোন না কোন ব্যাপারে সকলেই ব্যস্ত। একটু পরেই উপানন্দ ফিরিয়া আসিলেন।

'মা ডাকছেন, চল এবার খাই গিয়ে। শীর্ষাকে কেমন লাগল?'

'অসাধারণ।'

খাইবার সময় কনকলতাও বলিলেন, 'মেয়েটি খুব ভাল। ও তোর দাদা পূর্ণেরই [illegible] কত আশ্চর্য জিনিসই যে ঘটে পৃথিবীতে। ও বলছে আর ফিরে যাবে না।'

'আমাকেও তাই বলছে। কেন বলছে? টাকার ওর অভাব নেই। ও আসত না [illegible] নামটাই ওকে টেনে এনেছে। দাদার কাছে বটপুকুরের কথা শুনেছিল, সে কথাও বললে।

কনকলতা বলিলেন, 'না, ও মিছে কথা বলছে না। ও আমাদেরই [illegible] থাকুক না। বাড়িতে জায়গার তো অভাব নেই। দোতলার ঘরগুলো তো সব [illegible]

উপানন্দ বলিলেন, 'তাহলে কিন্তু তোমার বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি আনাতে হবে [illegible] বাড়িতে শুনেছি ইলেকট্রিসিটি আছে।'

হরিশ্চন্দ্র কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর ঝাঁকিয়া উত্তর দিলেন [illegible] আমার বাড়িতে হবে না। আমার মা যখন এ বাড়িতে এসেছিলেন তখন ইলেকট্রিসিটি [illegible] তার নাতনীও বিনা ইলেকট্রিসিটিতে থাকতে পারবে। এই যে মা রয়েছে ইলেকট্রিসিটি [illegible] বলে কি অসুবিধে হয়েছে তার?'

'তোরা [illegible] কবিস না, খা।

[illegible] মুখে হরিশ্চন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন [illegible] কিনিতে চাহিয়াছিলেন হরিশ্চন্দ্র বাধা দিয়াছিলেন [illegible]

।। ছয় ।।

শতবর্ষ উৎসব মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া [illegible] সাতদিন ধরিয়া [illegible] আবাল বৃদ্ধ বনিতার জন্য নানা রকম আমোদ প্রমোদ [illegible] প্রতি বৎসরই [illegible] এবার শীর্ষা এবং ইমনবাঈয়ের [illegible] ছিল শীর্ষা [illegible] সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করিতেন ইমনবাঈ। গ্রামেরই [illegible] সঙ্গে সেতার বাজাইয়াছিল শীর্ষা নিজেই তানপুরায় আলাপ করিতে করিতে গান গাহিয়া মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল সকলকে। উপানন্দও প্রতিদিন একটা না একটা যন্ত্র আলাপ করিতেন একা। ইমনবাঈও একদিন একটি ভজন গাহিয়া অবাক করিয়া দিলেন সকলকে। শীর্ষাও অবাক হইয়া গিয়াছিল উপানন্দের বাজনা শুনিয়া। উপানন্দ দেখিতে সুন্দর, তাঁহার আচার-ব্যবহারও অনিন্দনীয়, কেম্ব্রিজের এম এ,—এ রকম লোক যে একটা পল্লীগ্রামে শিল্পসাধনায় তন্ময় হইয়া থাকিতে পারে তাহা শীর্ষা কল্পনা করিতে পারে নাই। ইনি কোনও বড় শহরে গেলে তো দেশ বিখ্যাত হইতে পারিতেন কিন্তু খ্যাতির মোহ উঁহাকে শিল্পসাধনা হইতে বিচ্যুত করে নাই। এই [illegible] শীর্ষা [illegible] তার কাকাবাবুকে [illegible] নয়, কাকাবাবুর প্রিয়তম বন্ধু গুণী উপানন্দ [illegible] সেই রকম আনন্দে বিভোর

অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে যে রকম আনন্দ ও বিস্ময়ে বহুকাল পূর্বে অভিভূত হইয়াছিলেন কলম্বাস আমেরিকা দেখিয়া। যে বিপুল শ্রদ্ধা তাহার মনকে আবিষ্ট করিতেছিল তাহা যে প্রেমেরই পূর্বাভাস তাহা সে প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু নারীদের অন্তর অনেকটা ফোটোগ্রাফিক প্লেটের মত। আলোকের সামান্যতম স্পর্শেও তাহাতে দাগ পড়ে। সে এখন বুঝিতে পারিল, উপানন্দও তাহাকে ভাল বাসিয়াছে যদিও তিনি মুখে কিছু বলেন নাই। তাঁহার আচার ব্যবহারে কোনও অভব্যতার চিহ্নমাত্র সে দেখিতে পায় নাই, কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টি নীরব ভাষায় যাহা বলিতেছিল তাহার অর্থ সুস্পষ্ট। শীর্ষা অবশ্য প্রায়ই অন্দরমহলে ঠাকুমার কাছে থাকিত, কিন্তু উপানন্দ সন্ধ্যার সময় আসিলে হরিশ্চন্দ্র প্রায়ই তাহাকে গান গাহিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইতেন। তখন মনে হইত, উপানন্দের দৃষ্টি যেন তাহাকে পূজা করিতেছে। বিব্রত হইয়া আনত মুখে সে বসিয়া থাকিত। হরিশ্চন্দ্র গান গাহিতে বলিলে গান গাহিত, না বলিলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। উপানন্দ প্রত্যহ বেহালা বাজাইতেন। শীর্ষার মনে হইত, বেহালা যেন তাহার স্তুতি করিতেছে। দেশ, বেহাগ, বাগেশ্রী, ভৈরবীরা যাহা প্রকাশ করিতেছে তাহা শুধু সুরের কেরামতিই নয়, উপানন্দের প্রাণের আকুতি। সে আকুতির স্পর্শ শীর্ষাকেও আকুল করিতেছে। শীর্ষা রূপসী এবং প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত শিল্পী। অনেকেই তাহাকে প্রণয় নিবেদন করিয়াছে, কিন্তু কেহই তাহাকে এত বিচলিত করে নাই। বাহিরে সে কিন্তু স্থির আছে। ইমনবাঈ শতবর্ষিকী উৎসব হইবার কয়েকদিন পরেই চলিয়া গিয়াছেন। যাইবার সময় সাশ্রু নয়নে হরিশ্চন্দ্রকে বলিয়া গিয়াছেন, 'ওর বাবার আদেশে ওকে আমি মানুষ করেছি, তিনি আমার গুরু ছিলেন। আমি আমার যথাসাধ্য করেছি। এখন ওকে ওর কাকার হাতে দিয়ে চললাম। আপনারই ওর ওপর বেশী দাবী। আমার দাবী স্নেহের। আইনত তার কোন মূল্য নেই। তাছাড়া ও এখানে থাকতে চাইছে। আমাকেও থাকতে বলছে। কিন্তু আমি আমার ভার আপনাদের ওপর চাপাতে চাই না। শীর্ষা বলেছে, আগ্রার বাড়িটা আর সেখানকার বিষয়সম্পত্তি আমাকে দিয়ে দেবে। আমি নিতে চাই নি, যে ক'দিন বাঁচব ওর বাড়িতেই থাকব। ব্যাংকে ওর অনেক টাকা, মাসে প্রায় পাঁচ শ' টাকা করে সুদ পায়। সে টাকা ও আমাকেই খরচ করতে বলেছে। ওখানে ওর যে মুন্সী আছে তাকে ও চিঠি লিখে দিয়েছে। ও বড় ভাল মেয়ে। বলেছে, আমার কাছে মাঝে মাঝে যাবে। পাঠিয়ে দেবেন ওকে।'

হরিশ্চন্দ্র বলিয়াছেন, 'আমিই ওকে নিয়ে যাব। দাদার নাকি একটা ছবি আছে সেখানে, সেটা আমি নিয়ে আসতে চাই।'

'সেটা আমি দেব না। আমার গুরুজীর ফোটোই তো এখন আমার জীবনে একমাত্র সম্বল। আমি কি নিয়ে থাকব বলুন?'

'বেশ, ওর থেকে আর একটা ফোটো করিয়ে নেব আমি।'

'তা হতে পারে। শীর্ষাকে নিয়ে আসুন তাহলে আগ্রায়।'

ইমনবাঈ চলিয়া যাইবার পর শীর্ষা কয়েক দিন কান্নাকাটি করিয়াছিল, কিন্তু কনকলতার আদর যত্ন এবং হরিশ্চন্দ্রের অপত্যস্নেহ, বিশেষত উপানন্দের নিঃশব্দ প্রেম তাহাকে ঘিরিয়া এমন একটা অপরূপ নূতন জগৎ সৃষ্টি করিল যে ইমনবাঈ-এর জন্য বিরহ বেশীদিন স্থায়ী হইল না।

খুব গরম পড়িয়াছিল। শীর্ষা সত্যই গরমে খুব কষ্ট পাইতেছিল। কনকলতা তাহাকে রাত্রে

হাত-পাখা দিয়া হাওয়া করিবার জন্য একজন ঝি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু শীর্ষা বলিল, 'পাশে বসে কেউ পাখা নাড়লে আমার ঘুম হবে না। আমি নিজেই পাখা নেড়ে ঘুমোব। ঝির দরকার নেই।'

কিন্তু কয়েকদিন পরে দেখা গেল, তাহার কপালে কয়েকটি বিষফোঁড়া দেখা দিয়াছে। কনকলতা বলিলেন, 'ও গরমের জন্যেই হয়েছে।'

তিনি চন্দন ঘষিয়া কপালে লাগাইয়া দিলেন। কিন্তু বেশী উদ্বেগ প্রকাশ কবিলেন উপানন্দ। তিনি বলিলেন, 'ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। ইলেকট্রিক ফ্যানে শোয়া ওর অভ্যাস। আমি আমার বাড়ি থেকে একটা লাইন টেনে ওর ঘরে একটা ফ্যান লাগিয়ে দিই।'

'আমাদেব ঘরে তো ফ্যান নেই। হাত পাখাতেই আমাদের চলে যাচ্ছে।'

'তুমি সব সহ্য করতে পাব। ও কিন্তু চিরকাল ফ্যানের হাওযায় অভ্যস্ত। ওকে এ রকমভাবে কষ্ট দেওয়া অন্যায। আমি কালই এর ব্যবস্থা কবব, তুমি বাধা দিও না।'

গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন হরিশ্চন্দ্র।

পরদিনই কয়েকটি বাঁশ পুঁতিয়া এবং বাঁশের ডগায তাব বাঁধিয়া উপানন্দ শীর্ষার ঘরে একটা টেবিল ফ্যান লাগাইয়া দিলেন। শীর্ষা কনকলতাকে বলিল, 'কাকাবাবুর যখন ইচ্ছে নয তখন আমিও ফ্যান চালাব না। আপনি খবর পাঠিয়ে দিন, ও-ফ্যান নিয়ে যাক।'

কনকলতা হাসিয়া বলিলেন, 'ওরা দুজনেই একগুঁয়ে। ওদেব ঝগড়া ওরাই মিটিয়ে নেবে, আমি ওর মধ্যে যাব না। তোর তো সত্যিই কষ্ট হচ্ছে, চালা না পাখাটা।'

'না, কাকাবাবু না বললে আমি চালাব না।'

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা দুই বন্ধুতে লাগিযা গেল।

হবিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'তুই তো জানিস আমি ওসব বিলিতি যন্ত্রেব বিবোধী। কেন বিরোধী, তাও বার বাব তোকে বলেছি। আমি দেশেব গরীব লোকদের ভালবাসি। যারা চাষী, যাবা খেটে খায, যারা শিল্পী, যাদের পূর্বপুরুষ এদেশে মসলিন বানাতো, প্রতিমা বানাতো, মন্দিব বানাতো—যন্ত্রসভ্যতা এসে তাদেব নিঃশেষ কবে দিয়েছে। এখনও যে দু-চারজন অতি কষ্টে বেঁচে আছে, আমি তাদেব পক্ষে। যন্ত্রসভ্যতার সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে তাদেব বাঁচানো চাই। তাই আমি আমাব বাড়িতে ওসব ঢুকতে দিতে চাই না।'

উপানন্দ স্মিত মুখে সব শুনলেন, তাহার পর বলিলেন, 'শীর্ষা কিন্তু কষ্ট পাচ্ছে, এটা ফ্যাকট্। তুমি মাছকে জল থেকে ডাঙায তুলে এনে জলের অপকাবিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছ। মাছটা কিন্তু যন্ত্রণায় ছটফট করছে।'

'দেখ, যারা নেশাখোর তারা নেশার জিনিস না পেলে প্রথম প্রথম ছটফট করে, তারপর ঠিক হয়ে যায়।'

'ওসব তর্ক তো অনেক করেছি। এখন তুমি দয়া করে অনুমতি দাও, শীর্ষা পাখাটা ব্যবহার করুক। তোমার ভয়ে ও পাখা চালাচ্ছে না।'

'আমি তো মানা করি নি।'

'মুখে মানা কর নি, কিন্তু ও বুঝেছে পাখা চালালে তুমি অসন্তুষ্ট হবে। আমি বুঝতে পারি না, তুমি এমন এক-বগ্‌গা একগুঁয়ে কেন?'

হরিশ্চন্দ্র কিছু না বলিয়া একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চোখ দুইটি জলে

ভরিয়া উঠিল। তাহার পর তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'তোরা বিলাসী, স্বার্থপর, তোরা বুঝতে পারবি না আমার ব্যথা কোথায়।'

হঠাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া তিনি ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। উপানন্দ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। তাহার পর অন্দরে প্রবেশ করিয়া কনকলতাকে প্রশ্ন করিলেন, 'সে গেল কোথা?'

'ঘরে খিল দিয়ে শুয়েছে। বলেছে, রাত্রে খাব না।'

'আমিও খাব না তাহলে। আমি বাড়ি চললাম।

'কি যে ছেলেমানুষের মত ঝগড়া করিস তোরা? বুড়ো খোকা সব।'

উপানন্দ বাড়ি চলিয়া গেলেন। বাড়ি গিয়া দেখিলেন, ডাকবাক্সে একটা খামে মোড়া চিঠি রহিয়াছে। অচেনা হাতের লেখা। চিঠিখানি খুলিয়া অবাক হইয়া গেলেন। লিসার চিঠি। বাংলাতে লিখিয়াছে। চমৎকার হাতের লেখা। দীর্ঘ পত্র।

উপানন্দ একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন এবং পড়িতে শুরু করিলেন :

মান্যবরেষু,

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনার বন্ধু নয়নের কাছে আমার নাম নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন। আমি তাঁহার বান্ধবী লিসা। আমাদের বন্ধুত্বটা যে সাধারণ পর্যায়ের নহে সে কথাও আপনি নিশ্চয় শুনিয়াছেন। নয়ন আমার প্রণয়ী। আমিও তাহাকে খুব ভালবাসি। আমাদের এ ভালবাসা অনেক দিনের। কিন্তু তবু আমাদের ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে। কেন হইল তাহা সংক্ষেপে বলি। নয়ন খামখেয়ালী লোক। মস্ত বড় বিজ্ঞানী। তাহার খেয়াল হইল, দেহ-সম্পর্ক-বর্জিত প্রেম---ইংরেজিতে যাহাকে 'প্লেটোনিক লাভ' বলে---তাহা বাস্তবে সম্ভব কিনা সে পরীক্ষা করিবে! আমাকে বিবাহ করিল না, পবিত্র প্রেম বিষয়ে বড় বড় বক্তৃতা দিল। বলিল, সে আমাকেই ভালবাসে, চিরকাল বাসিবে, কিন্তু আমাকে বিবাহ করিবে না। নিজে সে ব্রহ্মচর্য পালন করিবে। আমি তাহাকে বলিলাম, কিন্তু আমার দেহের তো একটা ক্ষুধা আছে। নয়ন বলিল, আত্মসংযম যদি করিতে না পার, অন্য পুরুষের সহিত সহবাস করিতে পার, সে স্বাধীনতা তোমাকে আমি দিলাম, কিন্তু চেষ্টা কর দেহের ক্ষুধা দমন করিতে। আমি দুই বৎসর চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারি নাই। আপনারা যাহাকে 'পদস্খলন' বলেন তাহাই আমার হইয়াছিল। নয়ন সারা পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ায়, সে যদি কাছে থাকিত তাহা হইলে এমনটা হয়তো হইত না। কিন্তু সে কখনও ইংলণ্ড, কখনও ফ্রান্স, কখনও জার্মানি, কখনও রাশিয়া, কখনও ভারতবর্ষ, কখনও চীন, কখনও জাপান, কখনও জাভায় ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু যেখানেই থাকিত প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখিত। কি সুন্দর চিঠি সে সব। প্রায় প্রতি চিঠিতেই লিখিত, তুমি চাকরি ছাড়িয়া দাও। যতদিন বাঁচি এসো, আমরা দুইজনে সারা পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াই। পৃথিবী যে কত সুন্দর, কত মনোরম, মানুষ যে কি বিচিত্র জীব, কি অদ্ভুত তাহার প্রতিভা, কি অপূর্ব তাহার সৃষ্টি তাহা দেখি। মাঝে মাঝে সে হঠাৎ আমার কাছে চলিয়া আসিত, আবার চলিয়া যাইত কয়েকদিন পরে। এই ভাবেই চলিতেছিল, কিন্তু বেশী দিন চলিল না। আমার পেটে একদিন সন্তানের সম্ভাবনা আমি অনুভব করিলাম। বর্তমান যন্ত্র-সভ্যতার যুগে জন্ম-নিরোধ করা যায়, কিন্তু আমি ও ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করি না। আমার মনে হয়, জন্ম-নিরোধ আমাদের অনেক সম্ভাবনাকে রোধ করে। জন্ম-নিরোধ প্রথা প্রচলিত থাকিলে

হযতো বেদব্যাসেব জন্ম হইত না, পৃথিবীব অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ববীন্দ্রনাথকেও আমবা পাইতাম না। ডাক্তাবদেব দ্বাবা পবীক্ষা কবাইযা আমি যখন নিঃসংশয হইলাম, তখন আমাব নিজেব প্রতি ঘৃণাও হইল। আমি আপনাদেব বামাযণ মহাভাবত পুবাণ কিছুকিছু পডিযাছি। আমি জানি, আপনাদেব শাস্ত্রে যে পঞ্চকন্যা প্রত্যহ স্মবণীযা, তাঁহাবা প্রত্যেকেই অসতী। আপনাদেব দেশে শকুন্তলা পতিতা বলিযা ঘৃণিতা নহেন। আপনাদেব দেশে বাক্ষস-বিবাহ, গান্ধর্ব বিবাহও সমাজে স্বীকৃত, কিন্তু আমি মনে মনে ভক্তি কবিযাছি সীতা সতী সাবিত্রী দমযন্তীকে। আমি তাঁহাদেব আদর্শ অনুসবণ কবিবাব প্রাণপণ চেষ্টাও কবিযাছি, কিন্তু পাবি নাই। নযন যদি আমাকে বিবাহ কবিত হযতো পাবিতাম। কিন্তু নযন হৃদযহীন বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীবা সত্য নির্ণযেব জন্য অসংখ্য গিনিপিগ, বানব হত্যা কবিতে কুণ্ঠিত হয না। নযন একটা ক্ষুধিতা মাতৃত্বলোলুপ নাবীব জীবন লইযা যে পবীক্ষা কবিযাছে আমি সে পবীক্ষায উত্তীর্ণ হইতে পাবি নাই।

যখন আমি নিঃসংশয হইলাম যে আমি গর্ভবতী তখন নযন আপনাব কাছে ছিল। আমি কলিকাতায চলিযা গেলাম এবং নযনকে টেলিগ্রাম কবিযা জানাইলাম, অবিলম্বে আমাব সহিত দেখা কব। সে আসিযাছিল, অবিলম্বেই আসিযাছিল, কিন্তু আসিযা যাহা বলিল তাহা আমি প্রত্যাশা কবি নাই। সে বলিল, বেশ তো, তোমাব ছেলেকে আমি মানুষ কবিব, কিন্তু তোমাকে বিবাহ কবিব না। আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি একজন [illegible] উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, তোমাব জানা উচিত, গাছেব জীবনেব সার্থকতা ফুলে, যে ফুল ফলে [illegible] হয় তাহাই সার্থক [illegible] বলিল, কিন্তু গাছেদেব বিবাহ হয না তুমি বিবাহেব জন্য [illegible] ভালবাসি, তোমাব সন্তানকে আমি মানুষ কবিব। সন্তানেব পিতৃ[illegible] আমি [illegible] পবে সঙ্গ কবিযাছিলাম, পিতাব খবব দিতে পাবিলাম না। নযন বলিল, তাহাব বাবাব নাম জানিবাব আমাব প্রযোজন নাই। সে তোমাব সন্তান, ইহাই আমাব কাছে তাহাব শ্রেষ্ঠ পবিচয। তুমি অনর্থক বিচলিত হইযাছ, একটা ঘুমেব বডি খাইযা ঘুমাইযা পড। আমি একজন ডাক্তাব ডাকিযা আনি। সে চলিযা যাইবাব পবই আমি সেই হোটেলটি ছাডিযা চলিযা গেলাম আব একটা হোটেলে। সেই হইতেই নযনেব সহিত আমাব ছাডাছাডি। আমি জানি না নযন এখন কোথায। আমি দীর্ঘ ছুটি লইযা আসিযাছিলাম। কলিকাতাতেই আত্মগোপন কবিযাছিলাম এতদিন। একটি নার্সিংহোমেব সহিত ব্যবস্থা কবিযাছিলাম, কিছুদিন আগে সেখানে আমি একটি মৃত-সন্তান প্রসব কবিযাছি। আমাব ছুটিও ফুবাইযাছে, এবাব দেশে ফিবিব। নযনকে এখনও আমি ভালবাসি। আমি বাকী জীবনটা তাহাবই জন্য অপেক্ষা কবিব। আপনাব বন্ধু যদি আবাব আপনাব কাছে আসে, এই চিঠিটি তাহাকে দেখাইবেন। তাহাব বর্তমান ঠিকানা জানি না বলিযাই আপনাকে এই পত্র দিলাম। আপনি নযনেব বন্ধু। সে আপনাকে খুব শ্রদ্ধা কবে। তাহাব বর্তমান ঠিকানা যদি জানা থাকে অনুগ্রহ কবিযা আমাকে জানাইবেন। পুনবায আমাব সশ্রদ্ধ নমস্কাব গ্রহণ করুন। ইতি—

লিসা

পত্রটি পড়িয়া উপানন্দ অনেকক্ষণ চুপ কবিযা বসিযা বহিলেন। লিসাব জন্য তাঁহাব দুঃখ হইল। সঙ্গে সঙ্গে আব একটা কথাও মনে হইল। তিনিও তো শীর্ষাব প্রেমে পডিযাছেন। এ প্রেমকে প্লেটোনিক প্রেম বলা যায? সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাব সমস্ত অন্তব প্রতিবাদ কবিযা উঠিল।

না, না, নিশ্চয় নয়। তিনি শীর্ষাকে সর্বতোভাবে চান। রবীন্দ্রনাথের লেখা একটা কবিতার লাইন মনে পড়িল, প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তবে'। তিনি স্থির করিয়া ফেলিলেন, কালই তিনি হরিশ্চন্দ্রের কাছে প্রস্তাবটা করিবেন। ইহাতে তো দোষের কিছু নাই। হরিশ্চন্দ্র তাঁহাব পালটি ঘর। বাবারও বন্ধু সে। উপানন্দ হঠাৎ উঠিয়া পড়িলেন এবং পিয়ানোতে একটা উদ্দাম গৎ বাজাইতে লাগিলেন। মনে হইল যেন আনন্দের ঝড় বহিতেছে। বাহিবে বগি গাড়ি আসিয়া থামিল। হরিশ্চন্দ্র গাড়ি হইতে নামিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই থামিয়া গেলেন। উপানন্দ তন্ময় হইয়া বাজাইয়া চলিযাছে। তাঁহার মনে হইল, সে যেন মর্ত্যলোকে নাই, অন্য কোনও লোকে চলিয়া গিয়াছে।

'উপা।'

পিয়ানো বন্ধ হইয়া গেল, উপানন্দ ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন হরিশ্চন্দ্র দাঁড়াইয়া আছেন।

'তুই না খেয়ে চলে এলি কেন? মা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। খাবি চল, মা বসে আছেন।'

উপানন্দ বিহ্বল দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া বহিলেন হরিশ্চন্দ্রের দিকে। তাহার পর বলিলেন, 'বোস, যাচ্ছি।'

'অনেক বাত হয়ে গেছে।'

'তুমি বোস না।'

হরিশ্চন্দ্র একটা চেয়ার টানিযা বসিয়া পড়িলেন। উপানন্দ বলিলেন, 'তোমার কাছে আমি একটা ভিক্ষে চাইছি। দেবে বল?'

'তোকে তো আমার অদেয় কিছু নেই। সবই তো দিয়েছি তোকে। তোব সব বকম খেয়ালই তো মিটিয়েছি। আবার কি চাই?'

'আমি শীর্ষাকে বিয়ে কবতে চাই। আমি তার প্রেমে পড়ে গেছি।'

কথাটা শুনিয়া হবিশ্চন্দ্র নির্বাক হইয়া গেলেন। ইহা তিনি প্রত্যাশা কবেন নাই। তাঁহাব ধারণা ছিল, উপানন্দ কখনও কোন নারীর মোহে পড়িবে না। তিনি নির্বাক হইয়াই রহিলেন।

উপানন্দ বলিলেন, 'চুপ করে আছো কেন?'

'অবাক হয়ে গেছি। তোর কাছ থেকে এটা প্রত্যাশা করি নি। হঠাৎ তোর এ মতিচ্ছন্নতা কেন?'

'তুমি ভুলে যাচ্ছো, আমি শিল্পী, আমি সুন্দরের উপাসক। মনের মত মেয়ে পেলে অনেক আগেই আমি বিয়ে করতাম, কিন্তু পাই নি। আজ সে নিজেই এসেছে আমার কাছে, আমার প্রাণে প্রথম একটি সুর সে নিজের অজ্ঞাতসারেই বাজিয়েছে, যা আর কেউ বাজাতে পারে নি, যা আমাকে পাগল করে দিয়েছে।'

হরিশ্চন্দ্র কেবল বলিলেন, 'তোর সম্বন্ধে আমার অন্যরকম ধারণা ছিল। ভাবতে পারি নি যে অসুর হঠাৎ হাড়গিলে পাখি হয়ে যাবে।'

'আমাকে যত খুশি গাল দাও, কিন্তু সত্যকে আমি অস্বীকার করতে পারব না। তোমার কাছে আমি গোপনও করতে পারব না। তুমি আমাকে বল, তুমি অনুমতি দেবে কিনা?'

'তোকে অদেয় আমার কিছু নেই সে তো আগেই বলেছি। কিন্তু প্রথমে মায়ের অনুমতি নিতে হবে, তারপর জানতে হবে শীর্ষার এতে মত আছে কিনা?'

'বেশ চল, মায়ের অনুমতি এখনি চেয়ে নিচ্ছি। শীর্ষা কি জেগে আছে?'

'না। মা তাকে খাইয়ে দিয়েছে। সে এখন বোধহয় ঘুমুচ্ছে।'

'বেশ, তার সম্মতিটা কাল তুমি জেনে নিও। সে যদি সম্মতি দেয় তাহলে তাকে কাল আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিও।'

'সে তোর বাড়িতে আসতে চাইবে না। আমার আর-একটা কথা কি মনে হচ্ছে জানিস?'

'কি?'

'শীর্ষাকে বিয়ে করে তুই একটা সুড়ঙ্গ কাটতে চাইছিস। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে যন্ত্র-সভ্যতাকে ঢুকিয়ে দিবি আমাদের জমিদারির মধ্যে।'

'আরে না, না।'

'আমি বুঝতে পেরেছি। অনেকদিন আগেই তোর মনে হয়েছে যে ইলেকট্রিসিটি তোদের স্বর্গে নিয়ে যাবে। আমার কিন্তু তা মনে হয় নি। তুই সুযোগ পেলেই এ নিয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করেছিস। শীর্ষা আসতে না আসতেই তোর মনে হয়েছে ইলেকট্রিসিটির অভাবে ওই স্বর্গের মন্দার কুসুম শুকিয়ে যাবে, তাই তাড়াহুড়ো করে একটা ফ্যান লাগিয়ে দিয়েছিস তার ঘরে। সে কিন্তু সত্যিই ভাল মেয়ে। ফ্যান চালায় নি।'

'কেন সব বাজে কথা বলছো। এ বিয়েতে তোমার মত আছে কিনা, এ বিয়েতে তুমি সুখী হবে কিনা, সেইটেই বল?'

'আমার অমত হবে কেন? তোর চেয়ে ভাল পাত্র কি পৃথিবীতে আছে? ওরা যদি আপত্তি না করে, এ বিয়ে হবে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, যে আদর্শকে আমি সারা জীবন আঁকড়ে ধরে আছি সেটা চুরমার হয়ে যাবে। যন্ত্র এবং যন্ত্র-চালকরা খেটে খাওয়া গরীবদের হাতের কাজ কেড়ে নেবে, স্বাধীনতা কেড়ে নেবে, তারা সবাই যন্ত্রের দাস হয়ে যাবে।'

'আবার তুমি বাজে বকবক শুরু করলে। এটা দেখছি তোমার ম্যানিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়ি চল, মা অপেক্ষা করে বসে আছেন।'

হরিশ্চন্দ্র কোনও উত্তর দিলেন না। উপানন্দ লক্ষ্য করিলেন, তাহার চক্ষু দুইটি আবার সজল হইয়া আসিয়াছে।

কনকলতা অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন।

তাঁহাদের দেখিয়া বলিলেন, 'দুই বন্ধুর ঝগড়া মিটল? কত রাত করলি বলতো? আর দেরি নয়, খেতে বসে যা।'

দুইজনে খাইতে বসিলেন। হরিশ্চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শীর্ষা কি ঘুমিয়ে পড়েছে?'

'পড়েছে বোধ হয়।'

উপানন্দ নীরবে খাইতেছিলেন। একটি কথাও বলেন নাই। হরিশ্চন্দ্রই কথাটা পাড়িলেন।

'উপা একটা অদ্ভুত আবদার করেছে। ভেবে দেখ, তুমি রাজি হবে কিনা?'

'কি আবদার?'

'ও শীর্ষাকে বিয়ে করতে চায়। তাকে নাকি ওর খুব ভাল লেগেছে। এখন তোমার মত আছে এতে?'

কনকলতাও ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, 'ভালই তো ঘরের মেয়ে ঘরেই থাকবে। মেয়ের বিয়ে তো দিতেই হবে, উপার মত

পাত্র কোথায় পাব আমবা? তবে এ বিষয়ে শীর্ষাব মতটাও নেওয়া উচিত। মেয়েটি খুব ভাল, তাব হাব-ভাবে যতটা বুঝেছি উপাকে ও খুব ভক্তি কবে। কাল বলছিল, আমি ওব মত গুণী দেখি নি। উনি যদি পাড়াগাঁয়ে না থেকে কোনও বড় শহবে থাকতেন, ভাবত জোড়া নাম হত ওঁব। আমি বললাম, ও গ্রাম ছেড়ে কোথাও যাবে না।'

হবিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'তবু তুমি ওকে জিগ্যেস কোবো একবাব।'

'কবব।'

'উপা বলছে, ওব যদি মত থাকে তাহলে ওব সঙ্গে ও একা একটু কথা বলতে চায়। ও কি বাজি হবে, ও তো উপাকে এড়িয়ে বেড়াতে চায়। সন্ধ্যাবেলা আমাদেব গানেব আসবে একেবাবে চুপ কবে বসে থাকে। উপাব বাজনা তন্ময় হয়ে শোনে। ও নিজেও কম বড় গুণী নয়, কিন্তু ওব কোনও আস্ফালন নেই।'

কনকলতা বলিলেন, 'ও তো উপাব বাড়িতে যায় নি একদিনও। গিয়ে দেখে আসুক না একদিন তাতে দোষটা কি আছে?'

উপানন্দ বলিলেন, 'আমি শুধু জানতে চাই ও সত্যি আমাকে বিয়ে কবতে চায় কিনা। ও যেন না মনে কবে, আমবা ওব ইচ্ছাব বিরুদ্ধে কিছু কবছি।

'বেশ, ওকে বলব। আমি না হয় ওব সঙ্গে যাব।

'যেও।

উপানন্দ খাওয়া শেষ কবিয়া যখন গাড়ি চলিয়া গেল তখন হবিশ্চন্দ্র কনকলতাকে বলিলেন, 'যা আমি তোমাব ঘাড়ে ভাব একটা বোঝা চাপিয়ে দিলাম।'

'কি বোঝা?'

'শীর্ষাকে

'তুমি যদি বিয়ে কবতিস তোব ছেলেপুলে হত না? শীর্ষা কি বোঝা? ও তো অলঙ্কাব। ও তোব দাদাব মেয়ে। রূপে গুণে লক্ষ্মী-সবস্বতী, যেন এক দেহে এসেছে আমাদেব বাড়িতে। আব ও যদি অত ভাল না হত তাহলেই বা কি? তোব দাদাব মেয়েব ভাবকে আমি বোঝা মনে কবতুম? তুই যখন ছোট ছিলি তখন এ সংসাবেব ভাব আমি নিয়েছি। যতদিন বেঁচে থাকব সে ভাব আমাকে বইতে হবে। তুই শুগে যা, অনেক বাত হয়েছে। আমি এখনি গিয়ে মশাবি গুঁজে দিচ্ছি।

পবদিন সকালে এক কাণ্ড হইল। হই চই পড়িয়া গেল চাবিদিকে। আগ্রা হইতে ধবধবে শাদা প্রকাণ্ড একখানা 'বুইক' গাড়ি আসিয়া হবিশচন্দ্রেব বাড়িব সম্মুখে দাঁড়াইল। চাপ দাড়িওলা পাঞ্জাবী ড্রাইভাব সেলাম কবিয়া হবিশচন্দ্রেব হাতে ইমনবাইজীব একটি পত্র দিল। পত্রটি বড় বড় অক্ষবে বাংলায় লেখা ঃ

হবিশ্চন্দ্রবাবু, আমাব নমস্কাব জানিবেন। নিবাপদে পৌঁছিয়াছি। শীর্ষাব গাড়িটি তাহাকে পাঠাইয়া দিলাম। আমাব প্রয়োজন নাই। আমি আজকাল কোথাও যাই না। বাড়িতেই থাকি।

গাড়িটা শীর্ষাই পছন্দ কবিয়া কিনিযাছিল। তাহাকেই পাঠাইয়া দিলাম। আশা কবি সে ভাল আছে। তাহাকে মাঝে মাঝে আমাব কাছে পাঠাইয়া দিবেন। আশা কবি আপনাবা কুশলে আছেন। উপানন্দবাবুকেও আমাব নমস্কাব জানাইবেন। তিনি একজন মস্ত গুণী লোক।

সেতারে অমন দববাবি কানাড়া আগে কোথাও শুনি নাই। ভগবান আপনাদেব মঙ্গল করুন। শীর্ষা-মাকে আশীর্বাদ পাঠাইলাম। সে যেন আমাকে চিঠি লেখে। ইতি—

আপনাদেব ইমন

হবিশ্চন্দ্র ড্রাইভাবকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, 'ড্রাইভাব সাহেব, আপনি থাকবেন তো?'

'হ্যাঁ, জনাব। শীর্ষা মাই যেতনা দিন বাখবে ভি উনকি সেবা করুঙ্গা।'

হবিশ্চন্দ্র উপানন্দকে একটি ছোট পত্র লিখিলেন ঃ

'উপা, ইমনবাইজী এই গাড়িটি পাঠিয়েছেন। গাড়িটি নাকি শীর্ষাব—তোব নামে পাঠিয়ে দিলাম। আমাব মোটব গাড়ি বাখবাব গ্যাবেজ নেই। ও বিষয়ে আমি কিছু বুঝিও না। তুই এটা বাখবাব ব্যবস্থা কব। আমি মাঠে চললাম। মাঠ থেকে তোব ওখানে যাব। তুই বাড়িতে আমাব জন্য অপেক্ষা কবিস সন্ধ্যাব সময়।'

শীর্ষা একটু বিব্রত হইল। কনকলতাকে বলিল, 'মায়েব কাণ্ড দেখুন। আমি তাকেই গাড়িখানা দিয়েছিলাম। তিনি ও বাব এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'তোমাব সখেব জিনিস তাই ফিরিয়েছেন হয়তো এখন। উপাব সঙ্গে দেখা কবিয়েছে যখন আপত্তি নেই, তখন চল, উপাব বাড়ি একটু ঘুবে আসি। সে তো মাকে নিয়ে যেতে বলেছিল। হয়তো তোমাব জন্যে অপেক্ষা কবছে।'

'না, সে আমাব ভাবি লজ্জা কববে ঠাকুমা।'

'এতে লজ্জাব কি আছে? উপা হয়তো তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস কববে। চল যাই। ড্রাইভাবকে বলি, আমাদেব গাড়িটা ওখানে নিয়ে চলুক এখুনি।'

'আমাব কিন্তু বড্ড লজ্জা কবছে ঠাকুমা।'

'কিসেব লজ্জা? আমাদেব দেশে মেয়েবা আগে থাকতে শ্বশুব বাড়ি দেখবাব সুযোগ পায় না। তুমি ভাগ্যবতী। সে সুযোগ পেয়েছ যখন না কেন? তাছাড়া যে তোমাব স্বামী হবে সে ই যখন ডেকেছে তোমাকে, যাবে না কেন? চল।'

শীর্ষাকে লইয়া কনকলতা যখন উপানন্দেব বাড়িতে পৌঁছাইলেন তখন উপানন্দ একটি প্যাস্টেল স্কেচ লইয়া মগ্ন ছিলেন। মুখ আঁকিতেছিলেন একটা। শীর্ষাবই মুখ। মোটব গাড়ি হইতে নামিয়া কনকলতাই প্রথমে ঘবেব ভিতব প্রবেশ কবিলেন। পিছনে সঙ্কুচিতা শীর্ষা।

'কই বে উপা, কোথায় তুই?'

'এই যে মা।'

শীর্ষা উপানন্দকে প্রণাম কবিল। কনকলতা ছবিখানাব দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া বহিলেন।

উপানন্দ বলিলেন, 'তোমাব নাতনীব ছবিই আঁকছিলাম, কেমন হয়েছে?'

'চমৎকাব হয়েছে। আমি তোব বাগানটা একটু ঘুবে দেখি। তুই যে ওকে কি জিজ্ঞেস কববি?'

'পাশেব দ্বাব দিয়া কনকলতা বাহিব হইয়া বাগানে নামিয়া পড়িলেন। উপানন্দ হাসিয়া বলিলেন, 'বোস।'

শীর্ষা সামনের চেয়ারটায় বসিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল। সঙ্কোচে এবং লজ্জায় তাঁহাব সর্বাঙ্গে আর-একটা যে রূপ ফুটিয়া উঠিল, তাহা শীর্ষা বাইজীব অঙ্গে আগে কখনও ফোটে

নাই। উপানন্দ পাশের তাক হইতে খুব ছোট একটা ক্যামেরা পাড়িয়া খুচ করিয়া একটা ফোটো তুলিয়া লইলেন। শব্দ শুনিয়া শীর্ষা মুখ তুলিল।

'তোমার প্রথম আগমনের ছবিটা তুলে রাখলাম।'

শীর্ষা মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, 'আমায় আপনি কিছু জিজ্ঞেস করবেন কি?'

'হ্যাঁ। দুটি প্রশ্ন। সত্য উত্তর দিও। প্রথম প্রশ্ন—আমাকে তোমার সত্যিই ভাল লেগেছে কি?'

শীর্ষা আনত মস্তকে প্রায় অস্ফুট স্বরে বলিল, 'লেগেছে।'

'দ্বিতীয় প্রশ্ন। তুমি বাইজী ছিলে। তোমাকে কেউ প্রণয় নিবেদন করেছিল কি?'

'অনেকে করেছিল।'

'তুমি কি তাদের মধ্যে কাউকে ভালবেসেছিলে?'

'না। আমি কারো চিঠির জবাব দিতাম না। কোন পুরুষকে আমার বাড়িতে ঢুকতে দিতাম না। আমার বাড়ির গেটে কিরিচধারী গুর্খা পাহারা দিত।'

উপানন্দ বলিলেন, 'তুমিও ইচ্ছে করলে আমাকে অতীত জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পার।'

শীর্ষা মৃদু কণ্ঠে বলিল, 'না, প্রয়োজন নেই।'

'কেন?'

শীর্ষা কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, 'আমার জানবার দরকার নেই। আমি অদৃষ্টকে মানি।'

কনকলতা প্রবেশ করিলেন।

'তোমাদের কথা হল?'

'হয়েছে।'

'তবে চল, এবার বাড়ি যাই। ও বেলা তোদের জন্যে ছানার পোলাও করব। তার আয়োজন করতে হবে।'

উপানন্দ বলিলেন, 'আজ হরিশ্চন্দ্র এখানেই আসবে। এখান থেকে আমরা যাব। হয়তো দেরি হবে একটু।'

শীর্ষাকে লইয়া কনকলতা চলিয়া গেলেন।

হরিশ্চন্দ্র আসিয়া দেখিলেন, উপানন্দ বেহালা বাজাইতেছেন। হরিশ্চন্দ্র আসিতেই উপানন্দ তাহা থামাইয়া দিলেন এবং হরিশ্চন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, হরিশ্চন্দ্রের মুখ হর্ষোৎফুল্ল।

'তোমার মুখ আজ বেশ হাসিখুশী দেখছি যে?'

'হ্যাঁ, মাঠে কাজ করতে করতে একটু আগে আমি একটা সিদ্ধান্তে এসেছি। আসবামাত্রই সমস্ত মনটা আনন্দে ভরে গেছে।'

'কি বিষয়ে সিদ্ধান্ত?'

'তোর বিয়ের বিষয়ে।'

'কি সিদ্ধান্ত?'

'তোদের বিয়েতে কোন খুঁত রাখবনা।'

'খুঁত মানে?'

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতায় আছে—'যা চেয়েছ তার বেশী কিছু দিব, বেণীর সঙ্গে মাথা।'

হরিশ্চন্দ্র খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

'হেঁয়ালি ভেঙে বল, বুঝতে পারছি না। বেণীটা কি, আর মাথাটাই বা কি?'

'বেণী হচ্ছে আমার ভাইঝি শীর্ষা, আর মাথাটা হচ্ছে আমার প্রিন্সিপল্ (Principle), আমার আদর্শ, তোরা যাকে বলিস আমার পাগলামি, আমার গোঁয়ার্তুমি, আমার সেকেলে মনোভাব। আমি ঠিক করলাম, আমার বাড়ি ইলেকট্রিফায়েড করে সেই ইলেকট্রিসিটির আলোয় তোদের বিয়ে দেব। যে মণ্ডপে শীর্ষা গান গেয়েছিল, সেই মণ্ডপটা এখনও আছে। সেটা নানা রঙের 'বাল্‌ব' দিয়ে সাজিয়ে দেব। সেইখানেই তাকে তোর হাতে সম্প্রদান করব আমি। তোর বাড়িতে যে 'জেনারেটার' (Generator) আছে সেটার শক্তি কত? তা দিয়ে কি হবে?

'সেটা খুবই শক্তিশালী। সমস্ত মুগমটর গ্রামকে ইলেকট্রিফাই করে দিতে পারে। সেই উদ্দেশ্যেই কিনেছিলাম ওটা। কিন্তু তুমি বাধা দিলে।'

'না, আর বাধা দেব না। আমি মাঠে বসে ভেবে দেখলাম, তোমাদের সুখের অন্তরায় হয়ে আমি সুখী হতে পারব না। তাই ঠিক করলাম, ওরা যদি সুখী হয়, আসুক না আমার বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি। আচ্ছা, আমাদের বাড়ি ইলেকট্রিফাই করতে ক'দিন সময় লাগবে?'

'তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত আমি তো কারেন্ট নিয়ে গেছি, আমার মনে হয়, মাসখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে। শহর থেকে কিছু মালপত্র আনাতে হবে, ইলেকট্রিক মিস্ত্রিও আনাতে হবে ক'জন।'

'সব ব্যবস্থা করে ফেল। মাসখানেক পরেই বিয়ে হবে।'

উপানন্দ বলিলেন, 'এতো তাড়াহুড়ো করছো কেন?'

'ইলেকট্রিক আলোতে আমাদের বাড়ি যখন ঝলমল করবে, তখন সেই বাড়িতে বিয়ে হবে তোর। তাড়াহুড়ো, করতে হবে বইকি। আমি এখন আর বসব না, বাড়ি চললুম। তুই এখনই মিস্ত্রির জন্যে লোক পাঠা।'

'কিছু খাবে না? গুড়ের শরবৎ করতে বলব?'

'না। আমি এখন বাড়ি গিয়ে স্নান করব, তোকে সুসংবাদটা দিতে এসেছিলাম।'

হরিশ্চন্দ্র উঠিয়া পড়িলেন। উপানন্দ লক্ষ্য করিলেন, হরিশ্চন্দ্রের চোখে অশ্রু টলমল করিতেছে।

।। সাত ।।

টাকা খরচ করিলে সব অসম্ভবই সম্ভব হয়। শহর হইতে বড় বড় ট্রাকে চড়িয়া বহু মিস্ত্রি সাজ-সরঞ্জাম লইয়া উপস্থিত হইল এবং এক মাসের মধ্যেই হরিশ্চন্দ্রের প্রকাণ্ড বাড়িকে বিদ্যুৎতাড়িত করিয়া ফেলিল। গানের মণ্ডপটি নানা রঙের বিদ্যুতের আলোকে সাজিয়া সত্যই অপরূপ হইয়া উঠিল। সেইখানেই হরিশ্চন্দ্র শীর্ষাকে সম্প্রদান করিলেন।

বহুরকম বাজনা-বাদ্যি, বহু লোক ভূরিভোজন করিলেন, বহু আতসবাজি পুড়িল, বহু দরিদ্র পেট ভরিয়া সুখাদ্য খাইল, নূতন কাপড়-জামা উপহার পাইল। আগ্রা হইতে ইমনবাঈও

আসিলেন। কোথাও কিছু ক্রটি রহিল না। উপানন্দের বিবাহ মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের পরদিন সকালে কিন্তু হরিশ্চন্দ্রকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল তাঁহার ঘরে এই চিঠিটি ঃ

উপানন্দ,

তোমার ভালবাসার পাত্রী, আমার দাদার মেয়ে শীর্ষাকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে কৃতার্থ হলাম। এবার আমি আমার ভালবাসার লোকেদের কাছে চললাম। তারা দরিদ্র, তারা অসহায়, তাদের নানারকম দোষ আছে। বর্তমান বিলাসিতার যুগে তারা বঞ্চিত, লুব্ধ, অনেকে চরিত্রহীন, অনেকে চোর। তবু তাদেরই আমি ভালবাসি, কারণ তারা বড় অসহায়, অথচ তারাই আমাদের দেশের লোক। আমি তাদের মঙ্গলের জন্যেই এতদিন চেষ্টা করেছি, পারি নি, কারণ আমি বিলাসের মধ্যে ছিলাম, তাই তাদের সম্মান পেয়েছি, ভালবাসা পাই নি। সর্বস্ব ত্যাগ করে তাই তাদের কাছেই চললাম। তাদের মধ্যে বাস করব, তাদের সঙ্গেই খেটে খাব। আমাকে খোঁজবার চেষ্টা কোরো না, আমি আর ফিরব না। তোমরা যন্ত্রসভ্যতার বিলাসে সুখে থাকো। মাকে আমার শতকোটি প্রণাম দিও। তিনি জীবনে অনেক শোক সহ্য করেছেন, আমার শোকও সহ্য করতে পারবেন, কারণ তিনি সর্বস্নেহা মা। ইতি—

হরিশ্চন্দ্র